দস্যুবনহুর সমগ্র

রোমেনা আফাজ

১

সূচীপত্র

০০১. দস্যু বনহুর

দস্যু বনহুর – রোমেনা আফাজ। দস্যু বনহুর সিরিজের প্রথম উপন্যাস

০১.

দস্যু বনহুরের ভয়ে দেশবাসী প্রকম্পমান। পথে-ঘাটে-মাঠে শুধু ঐ এক কথা-দস্যু বনহুর–দস্যু বনহুর! কখন যে কোথায় কার ওপর হানা দিয়ে বসবে কে জানে!

ধনীরা তো সব সময় আশঙ্কা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। তাদের ভয়ই বেশি। দস্যু বনহুরের জন্য কারও মনে শান্তি নেই। দস্যু বনহুর যে কে, কেমন তার আসল রূপ, তা কেউ জানে না। কোথা থেকে আসে সে, কোথায় চলে যায়, তাও কেউ বুঝতে পারে না। গভীর রাতে জমকালো একটা অশ্বপৃষ্ঠে দেখা যায় তাকে। গোটা শরীরে তার কালো পোশাক। মাথায় কালো কাপড়ের পাগড়ি। মুখে একটা কালো রুমাল জড়ানো। কোমরের বেল্টে গুলিভরা রিভালবার। বিশেষতঃ অন্ধকার রাতেই বনহুর হানা দেয়। শহরে-বন্দরে, গ্রামে, পথে-ঘাটে-মাঠে সব জায়গায় হয় তার আবির্ভাব।

বনহুরের নামে মানুষ যতই আতঙ্কিত হউক না কেন, আদতে বনহুর ছিল অত্যন্ত সুন্দর সুপুরুষ। মনও ছিল তার উদার—মহৎ। দস্যুবৃত্তি বনহুরের পেশা নয়—নেশা। খেয়ালের বশে সে দস্যুতা করত। দস্যুতায় বনহুর আনন্দ পেত।

হয়তো এক ধনীর বাড়িতে হানা দিয়ে তার সর্বস্ব লুটে নিয়ে বিলিয়ে দিত,সে দীন-হীন গরীবদের মধ্যে। নয় ফেলে দিত সাগরের জলে। অদ্ভুত ছিল বনহুরের চালচলন। বনহুরের প্রাণ ছিল যেমন কোমল, তেমনি কঠিন।

বনহুরের সবচেয়ে প্রিয় ছিল তার অশ্ব তাজ। যেখানে যেত বনহুর, তাজ হত তার সঙ্গী। নিজ হাতে সে তাজকে ছো্লা খাওয়াতো, গা ঘষে দিত, এমন কি তাজ যখন ঘাস খেত, বনহুর পাশে বশে খেত রুটি আর মাংস। মাঠে যখন চরতো, বনহুর বসে থাকতো তার পাশে। হয়ত শিস দিয়ে খাস খাওয়াতো।

তাজও তেমনি ভালবাসতো বনহুরকে। বনহুরের ইঙ্গিত তাজ বুঝতো। তাজ ছিল অত্যন্ত চালাক ও বুদ্ধিমান অশ্ব। তার গতিও ছিল উল্কার মত দ্রুত। অন্ধকারেও তাজ কোনদিন পথ হারাতো না।

দস্যুতা করতে গিয়ে অনেক সময় বনহুর তাজকে বাইরে রেখে প্রবেশ করতো অন্দরবাড়িতে। হয়ত ধরা পড়ে যাবার ভয়ে বনহুকে অন্য পথে প্রাচীর টপকে পালাতে হত। বনহুর শুধু একটি শিস দিত, সঙ্গে সঙ্গে তাজ গিয়ে হাজির হত তার পাশে। বনহুর প্রাচীরের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়তে তাজের পিঠে। তারপর আর কে পায় তাকে!

তাজের লাগাম ছিল না! বনহুর তাজের কাঁধের কেশ ধরে উবু হয়ে থাকে, তাজ ছুটতো হাওয়ার বেগে।

০২.

তাজের পিঠে ছুটে চলেছে বনহুর।

প্রান্তরের বুক চিরে গহন বনে প্রবেশ করলো বনহুরের অশ্ব। এবার তার গতি কিছুটা মন্থর হয়ে এলো। গহন বনের মধ্য দিয়ে সরু একটা পথ ধরে ছুটতে লাগলো তাজ। ভোরের আলো তখন গহন বনকে অনেকটা হাল্কা করে এনেছে।

বনের মধ্যে বহুকালের পুরানো এক রাজপ্রাসাদ। কালের কঠোর নিষ্পেষণে আজ সে প্রাসাদ শুধু ইটের স্তুপে পরিণত হয়েছে। এককালে সেখানে যে বিরাট এক রাজবাড়ি ছিল অনুমানে তা বুঝা যায়। আজ সে প্রাসাদের গায়ে বিরাট বিরাট অশ্বথ বৃক্ষ জন্মেছে। আগাছায় ভরে উঠেছে প্রাসাদের অন্তপুর। সেটা যেন ঐ ভগ্নপ্রাসাদের নিকটে এসে আরও ঘন হয়েছে।

বনটা ছিল শহর ছেড়ে অনেক দূরে। তাই কোন লোকজন এ বনে কোনদিন প্রবেশ করত না। শিকারীরা মাঝে মাঝে শিকারে আসত বটে, কিন্তু তারা বনের

খুব ভিতরে প্রবেশ করার সাহস পেত না। কাজেই ভগ্নপ্রাসাদটি ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে।

সেই ভগ্নপ্রাসাদের সম্মুখে এসে বনহুরের অশ্ব থেমে ছিল। লাফিয়ে নেমে দাঁড়ালো বনহুর। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন লোক এসে তাজকে ধরল। বনহুর ভগ্নপ্রাসাদের একটা দরজা লক্ষ্য করে এগুতেই দরজা খুলে গেল। ভিতরে প্রবেশ করল বনহুর, অমনি দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে থেকে তখন দেখলে মনে হবে, যেন একটা পাথরখণ্ড বা একটা মরচে ধরা লৌহপাত।

বনহুর দরজার ওপাশে পৌঁছতেই দু'জন সশস্ত্র দস্যু সসম্মানে সরে দাঁড়ালো।

বাইরে থেকে রাজপ্রাসাদটাকে ভগ্নস্তুপ বলে মনে হলেও আদতে ভিতরটা তার ভগ্নস্তুপ ছিল না। সুন্দর ঝকঝকে একটা রাজবাড়ি বলেই মনে হত। বাড়ির ভিতরের পথগুলো সাদা মার্বেল পাথরে গাঁথা। উঠানে সুন্দর সুন্দর ফোয়ারা, তার চারপাশে ফুলের বাগান।

বনহুর সে পথ ধরে সোজা এগিয়ে চলল। কিছুদূর এগুতেই সম্মুখে বিরাট বাঘের মুখের আকারে পাথরের মুখ হা করে রয়েছে। বনহুর বাঘের একটা দাঁতে পা দিয়ে চাপ দিতেই বাঘের জিভটা ভিতরে ঢুকে গেল, সেখানে দেখা গেল একটা সুড়ঙ্গ পথ, সে সুড়ঙ্গপথে দ্রুত এগিয়ে চলল সে।

মাটির নিচে রাজপ্রাসাদের মত আর একটা বাড়ি। পাশাপাশি কয়েকটা কক্ষ। প্রত্যেক কক্ষে বেলওয়ারী ঝাড় ঝুলছে। ঝাড়ের মধ্যে অসংখ্য মোমবাতি জ্বলছে।

মাঝখানের বড় একটা কক্ষে এক বৃদ্ধ শায়িত। শয্যাশায়িত ব্যক্তি যদিও বৃদ্ধ, তবু তার চেহারা বলিষ্ঠ। মস্তবড় গোঁফ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মানে বালা। হাতে বালা। লোকটা অসুস্থ, মাঝে মাঝে সে কোকিয়ে ছিল। চোখের রঙ ঘোলাটে হয়ে এসেছে। মাংসপেশীগুলো যদিও শিথিল হয়ে এসেছে, তবু দেখলে বুঝা যায়, এককালে তার শরীরে ছিল অসীম শক্তি। শয্যাশায়িত বৃদ্ধ দস্যু কালু খাঁ।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করলো।

পদশব্দে মুখ তুলে তাকালো কালুখা–কে, বনহুর?

হ্যাঁ বাপু। এগিয়ে এলো সে কালু খাঁর পাশে।

কালু খাঁ হাত দিয়ে নিজের বিছানায় একটা অংশ দেখিয়ে বলেন—বস বাছা।

বনহুর বসে ছিল কালু তাঁর পাশে, বৃদ্ধের একখানা হাত মুঠায় চেপে ধরে বলেন-বাপ, এখন তোমার কেমন লাগছে?

বৃদ্ধ ঘোলাটে চোখে বনহুরকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করে বলেন–বনহুর, আমি আর বাঁচবো না।

বনহুরের চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে–বাপু, আমি তোমার জন্য ভাল ডাক্তার নিয়ে আসব।

না বনহুর, ডাক্তারের আর প্রয়োজন হবে না। একটু থেমে পুনরায় ডাকে কালু খাঁ—বনহুর।

বল বাপু।

বৃদ্ধ কালু খাঁ ভয়ানক হাঁফাচ্ছিল! গেমে নেয়ে উঠেছে তার সমস্ত শরীর, অতি কষ্টে বলে সে-বনহুর, আজ বিদায়ের দিনে তোকে একটা কথা বলবো, যা এতদিন বলি বলি করেও বলা হয়নি।

বাপু, তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো, আমি সব শুনবো।

না না, তা হবে না, আজ না বললে হয়ত আর কোনদিন বলা হবে না।

বনহুর কালু খাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে-বাপু, তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

না রে না, কোন কষ্ট হচ্ছে না। বনহুর, একটু পানি দে দেখি বাছা।

বনহুর পাশের সোরাহী থেকে এক গেলাস পানি এনে কিছুটা পানি ঢেলে দিল কালু খাঁর মুখে।

বৃদ্ধ পানি খেয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলেনবনহুর, সরে আয়, আরও কাছে সরে আয়।

বনহুর আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বলেন—এই তো আমি তোমার পাশে বাপু।

বৃদ্ধ কালু খাঁ বলে ওঠে—বনহুর, আমি তোর বাপু নই। আমি তোর বাপু নই বনহুর। বৃদ্ধ কালু ঘা হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—তোকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। সে প্রায় বিশ বছর আগে বালিশের তলা থেকে একটা মালা বের করে বনহুরের হাতে দেয়—বিশ বছর আগে যখন তোকে কুড়িয়ে পাই, তখন এই মালাছড়া ছিল তোর গলায়। দেখ বনহুর, এই মালা তুই চিনতে পারিস কিনা?

বনহুর মালাছড়া হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে। হঠাৎ তার আংগুলের চাপে লকেটের ঢাকনা খুলে যায়। কি আশ্চর্য! লকেটের ভিতর তারই ছোটবেলার ছবি। পাশের ঢাকনায় আর একটা ফুটফুটে বালিকার ছবি, পাশাপাশি দু’খানা মুখ। বনহুর তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে লকেটের ছবি দু’খানার দিকে। ধীরে ধীরে তার মানসপটে ভেসে ওঠে বিশ বছর আগের একটা দৃশ্য.....

তরঙ্গায়িত নদীবক্ষে দুলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে একটা নৌকা। দু’জন মাঝি দাঁড় টানছে, একজন মাঝি বসে আছে হাল ধরে। নৌকার সম্মুখ পাটাতনের ওপর পাশাপাশি বসে খেলা করছে একটা বালক আর একটা বালিকা। বালকের বয়স আট-নয় বছর, আর বালিকার বয়স ছয়সাত। বালক ছবি আঁকছিল। বালিকা রুল দিয়ে ছবির ওপর আঁচড় কেটে ছবিটা নষ্ট করে দেয়। বালক অমনি মুখটা গম্ভীর করে ফেলে। বালিকা নিজের ভুল বুঝতে পেরে দুঃখিত হয়, বিনীত কণ্ঠে বলে রাগ করলে? ভুল হয়েছে, মাফ করে দাও মনির ভাই।

বালক খাতাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল নদীর জলে, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—দোষ করে মাফ চাইলেই বুঝি মাফ পাওয়া যায়.. বালক আর বালিকা মিলে এমনি ঝগড়া চলছে।

নৌকায় ছৈ-এর মধ্যে বসে রয়েছেন দু’জন মহিলা, তাদের অনতিদূরে একজন ভদ্রলোক বসে বসে বই পড়ছেন। ভদ্রলোক বালকের পিতা চৌধুরী মাহমুদ খান। আর দ্র মহিলাদের একজন বালকের আম্মা মরিয়ম বেগম, দ্বিতীয় মহিলা চৌধুরী মাহমুদ খানের বোন রওশন আরা বেগম। বালিকা রওশন আরা বেগমের কন্যা নাম মনিরা, আর বালকের নাম মনির।

ননদের কন্যার নাম সখ করে মরিয়ম বেগমই রেখেছিল–মনিরা বেগম। ভিতরে ভিতরে ছিল তার এক গোপন বাসনা। নিজের পুত্র মনিরের নামের সঙ্গে মনিরা নাম মিল করে রাখাই ছিল তার উদ্দেশ্য।

দেশের বাড়িতে বেড়াতে এসে শিশু কন্যাটিকে কোলে তুলে নিয়ে বলেছিল মরিয়ম বেগম রওশন আপা, একটা কথা বলবো?

রওশন আরা বেগম বলেছিল—বলো।

মরিয়ম বেগম বলেছিল—আমার পুত্রকে তোমায় দিলাম, তোমার কন্যাটিকে আমি চাই কিন্তু।

আনন্দের কথা। আমার মেয়ে নিয়ে তুমি যদি সুখী হও এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।

তারপর মনিরার এক জন্ম উৎসবে মরিয়ম বেগম দু'ছড়া মালা তৈরি করে পুত্র এবং ননদের কন্যাকে উপহার দেন। সে দিন ভাবী আর ননদের মধ্যে কথা নেয়া-দেয়ার পালা শেষ হয়ে যায়। হেসে বলেছিল মরিয়ম বেগম—এই মালা পরিয়ে দিয়ে আমি কথা পাকা করলাম, মনিরের সঙ্গে বিয়ে দেব মনিরার। সে মালা ছড়াই আজ বনহুরের হাতে। নীরব নয়নে তাকিয়ে আছে সে সম্মুখের দিকে—একটার পর একটা দৃশ্য ভেসে উঠছে তার মনের কোণে। যদিও অস্পষ্ট তবু বেশ মনে আছে, মায়ের সে কথার পর কিছুদিন যেতে না যেতে একদিন মনিরার আব্বা মারা গেল। খবর পেয়ে তার আব্বা চৌধুরী মাহমুদ খান স্ত্রী মরিয়ম বেগম ও পুত্র মনিরকে নিয়ে দেশের বাড়ি গেল। ফিরে আসার সময় শোকাতুরা বোনকে নিয়ে চলেন সঙ্গে করে।

নৌকা চলছে... সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসছে। মনির আর মনিরার ঝগড়া থেমে গেলেও রাগ পড়েনি। মনির উঠে গিয়ে পিতার পাশে বসলো। চৌধুরী মাহমুদ খান হেসে বলেন—এত গম্ভীর কেন মনির? মনিরার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?

গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে মনির–আমি ছবি আঁকছিলাম, মনিরা নষ্ট করে দিয়েছে।

হেসে বলেন চৌধুরী সাহেব-ও এই কথা। মা মনিরা, এদিকে এসো তো!

ভয়ে ভয়ে মনিরা গিয়ে দাঁড়ালো মামুর পাশে। চৌধুরী সাহেব তাকে আদর করে কোলে টেনে নিয়ে বলেন-তোমার মনির ভাইয়ের আঁকা ছবি নষ্ট করে দিয়েছ?

বালিকা মৃদুস্বরে বলে ভুল হয়েছে মামুজান। আমি মনির ভাইয়ের কাছে কত করে মাফ চাইলাম, মাফ করলো না।

সে কি মনির, ভুল করে মনিরা যদি একটু ক্ষতি করেই থাকে, তবে কি তা ধরতে হয়? এসো মনি, বলো তোমাকে আমি মাফ করে দিয়েছি।

মনির মনিরার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে—দিলাম ওকে মাফ করে।

ঠিক সে মুহূর্তে নৌকাখানা দুলে উঠলো। মাঝিদের মধ্য থেকে একজনের গলা শুনা গেল-হুজুর ঝড় উঠেছে, ঝড় উঠেছে, হুশিয়ার হুশিয়ার....

চৌধুরী সাহেব ছৈ-এর ভেতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

আকাশের দিকে তাকিয়ে মুখমণ্ডল তার ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো।

গোটা আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তার সঙ্গে বইছে দমকা হাওয়া।

মনির এসে দাঁড়িয়েছে পিতার পাশে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রচণ্ড ঝড় শুরু হল। মনিরাকে বুকে চেপে ধরে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে লাগলেন রওশনআরা বেগম। মরিয়ম বেগম পুত্রের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে ডাকাডাকি শুরু করলেন।

প্রচণ্ড ঝড়ের দাপটে নৌকাখানা মোচার খোলার মত দুলছে, চৌধুরী সাহেব চিৎকার করে মাঝিদের সাবধান হবার নির্দেশ দিচ্ছেন। অন্য কোনদিকে তার খেয়াল নেই।

একে অন্ধকার রাত। তার ওপর প্রচণ্ড দাপট। মাঝিরা মরিয়া হয়ে নৌকাখানা সামলাতে চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নৌকাখানাকে রক্ষা করতে পারলো না তারা। নদীবক্ষে নৌকাখানা তলিয়ে গেল।

খোদার হয়ত রহম ছিল। অল্পক্ষণেই ঝড়ের বেগ কমে এলো চৌধুরী সাহেব বুঝতে পারলেন, তাঁদের নৌকা গভীর নদীতে ডুবে যায়নি। নদীর একেবারে কিনারে এসে ডুবেছিল।

মাঝিদের সাহায্যে চৌধুরী সাহেব সপরিবারে তীরে পৌঁছতে সক্ষম হলেন। কিন্তু একি, মনির কোথায়। চৌধুরী সাহেব মরিয়ম বেগম, রওশন আরা বেগম, মনিরা সবাই আছে—শুধু নেই মনির।

মরিয়ম বেগম বিলাপ করে কাঁদতে লাগলেন। চৌধুরী সাহেব অন্ধকারেই পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করতে লাগলেন, আর পুত্রের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন।

এমন সময় ভোর হয়ে এলো। একমাত্র পুত্রের এই ভয়াবহ পরিণতির জন্য চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগম পাগল-পাগলিনী প্রায় হয়ে ছিল। রওশন আরা বেগমও কেঁদেকেটে আকুল হলেন।

ওদিকে স্রোতের টানে বহুদূর ভেসে গিয়েছিল মনির।

মদীর কিনারে বালির ওপর অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে সে। খোদার মহিমায় জীবন বেঁচে গেছে মনিরের।

এমন সময় নদীর কিনার ধরে এগিয়ে আসছিল দস্যু কাল খা। হঠাৎ তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে মনিরের দিকে। দেখতে পায় সুন্দর ফুটফুটে একটা বালক পড়ে আছে বালির ওপরে। বালকটি মৃত না জীবিত দেখার জন্য কালু ঋ বসে পড়ে তার পাশে।বুকে কান লাগিয়ে পরীক্ষা করে দেখে। যখন বুঝতে পারে বালক মৃত নয় জীবিত, তখন তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। একটা নতুন আশার আলো উঁকি দিয়ে যায় কালু খাঁর মনে। অতি যত্নে কাঁধে উঠিয়ে গহন বনের দিকে পা বাড়ায় সে,...

কালু খাঁ অস্ফুট কন্ঠে ডেকে ওঠে—বনহুর!

সম্বিৎ ফিরে পায় বনহুর, কালু খাঁর মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে—বাপু!

কালু খাঁ বলতে আরম্ভ করে—বনহুর, তারপর তোকে নিয়ে এসে আমি নিজের ছেলের মতই লালন-পালন করতে লাগলাম। দিন দিন বড় হতে লাগলি তুই। ভুলে গেলি তোর পিতামাতার কথা। একদিন ফিরে এসে দেখি, তুই বনের মধ্যে একটা ঝোপের পাশে খেলা করতে করতে ঘুমিয়ে ১২

পড়েছিস। ভোরের সূর্যের আলো পড়েছে তোর মুখে। অপূর্ব সুন্দর লাগছিল তোকে। যেন শিশিরমিগ্ধ একটা ফুল। কতক্ষণ যে আমি তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ আমার কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা শব্দ

বনহুর’!

বনহুর অস্ফুট কন্ঠে বলে ওঠে—বাপু!

হ্যাঁ, তারপর ধীরে ধীরে মনির মুছে গিয়ে তৈরি হলো আমার বনহুর। আমি তোকে খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগলাম। একদিন দস্যু কালু খাঁ পরাজিত হলো বনহুরের কাছে। জয়ী হলো সে। সেদিন আমার দস্যু—জীবন সার্থক হলো, নিঃসন্তান কালু খ্রী পুরত্ব লাভে সক্ষম হলো….. হঠাৎ অদ্ভুতভাবে হেসে ওঠে কালু খাঁ—হাঃ হাঃ হাঃ আমার সাধনা সার্থক হয়েছে। আমার বাসনা পূর্ণ হয়েছে। দস্যু কালু খাঁ মরে গেছে…. দস্যু কালু খাঁ মরে গেছে। সেখানে প্রতির্ষ্ঠিত হয়েছে দস্যু বনহুর। হাঃ হাঃ হাঃ, একদিন কালু খাঁর ভয়ে দেশবাসী প্রকম্পিত হয়ে পড়েছিল, আজ প্রকম্পিত হচ্ছে দস্যু বনহুরের ভয়ে। আমার সাধনা সার্থক হয়েছে, হাঃ হাঃ হাঃ হঠাৎ উঠে বসতে যায় কালু খাঁ, সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। বনহুর দু’হাতে তুলে ধরে ডাকে…. বাপু… বাপু….

কিন্তু কালু খাঁ তখন চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেছে। বনহুর কালু খাঁর প্রাণহীন দেহল বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে–বাপু… বাপু….

অমনি ছুটে এলো নূরী।

নূরী দস্যু কালু খাঁর পালিতা কন্যা। অবশ্য নূরীর পিতা দস্যু কালু খাঁরই একজন অনুচর ছিল। দস্যুতা করতে গিয়ে নিহত হয় নূরীর বাবা। সে হতে নূরী রয়ে যায় কালু খাঁর নিকটে।

বনহুর এই বনে খেলার সাথী হিসেবে নূরীকেই পেয়েছিল পাশে। বনহুরকে ভালবাসতো নূরী। কিন্তু বনহুরের মনে নূরী তখনও দাগ কাটতে পারেনি। বনহুর নিজকে নিয়ে নিজেই ব্যস্ত থাকতো।

নূরী ছুটে এসে কালু খাঁকে বিছানায় ঢলে পড়ে থাকতে দেখে আর্তনাদ করে ওঠে বাপু! এ কি হয়েছে তোমার!

বনহুর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেনূরী, বাপু চলে গেছে। বাপু চলে গেছে....

বিলাপ করে ওঠে নূরী—বাপু চলে গেছে। হায়, একি হলো! একি হলো–

বনহুর দু'হাতে মুখ ঢেকে ছোট বালকের ন্যায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

০৩.

আজ কদিন হলো কালু খাঁর মৃত্যু হয়েছে। ঘন বনের ছায়ায় কবর দেয়া হয়েছে তাকে। বনহুর দিনরাত সে কবরের পাশে বসে থাকে। এই গহন বনে সে যে ঐ একটা মানুষকেই ভালবাসতো। সে কোনদিন ভাবতে পারেনি–কালু খাঁ তার পিতা নয়।আজ বিশটা বছর ধরে বনহুর তাকেই চিনে এসেছে। জ্ঞান হবার পর থেকে দেখে এসেছে তাকে। তার যে কোন পিতা-মাতা ছিল, সে কথা ভাবতেও কষ্ট হতে লাগলো বনহুরের। সে যে শিক্ষা পেয়েছে সে শিক্ষা সভ্য সমাজের নয়, দস্যু কালু খাঁ তাকে নিজের মনের মত গড়ে তুলেছিল।

এহেন পিতৃসমতুল্য কালু খাঁর শোক সহসা ভুলা বনহুরের পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিন বনহুর কালু খাঁর কবরের পাশে বসে নীরবে চোখের পানি ফেলছিল। এমন সময় নূরী এসে দাঁড়ায় তার পাশে। বনহুরের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেহর, বাপু চলে গেছে, তার জন্য সবসময় মন খারাপ করে কোন লাভ হবে না।

মুখ তুলে বনহুর–নূরী, আমি যে বড় একা।

এই তো আমি আছি তোমার পাশে।

নূরী!

চলো হুর, সমস্ত অনুচর তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছে।

নূরী!

ভুলে যেও না হুর, তুমি দস্যুসন্তান।

না, আমি দস্যু-সন্তান নই, আমি দস্যু-সন্তান নই....

সেকি! এসব তুমি কি বলছো হুর?

নূরী জানত-বনহুর কালু খাঁরই পুত্র, তাই সে অবাক হয়ে কথাটা বলেন।

বনহুর বুঝতে পারলো, কথাটা সে ভুল করেছে। কাল তাঁর হাত ধরে সে শপথ করেছে, কোনদিন সে কাউকে বলবে না, সে দস্যু কালু খাঁর পুত্র নয়। না না, সে দস্যু-সন্তান, সে দ-সন্তান, উঠে দাঁড়ায় বনহুর, নূরীকে লক্ষ্য করে বলে–চলো নূরী, আজ হতে আমি ভুলে গেলাম সব।

০৪.

সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট বনহুর। সামনে কয়েকজন দস্যু দণ্ডায়মান। সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে—আজ আমরা মধুনগরের জমিদার বাড়িতে হানা দেব। মধুনগরের জমিদার বাসব নারায়ণ অতি দুষ্ট, শয়তান লোক। শুনেছি, একটা পয়সাও সে ভিখারীকে দান করে না। আমি চাই তার অর্থ নিয়ে ধুলোয় ছড়িয়ে দিতে। তোমরা প্রস্তুত?

সমস্বরে বলে ওঠে দস্যু দল–হ্যাঁ সর্দার।

বনহুর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, তারপর বেরিয়ে আসে কক্ষ থেকে। সমস্ত দস্যু তাকে অনুসরণ করলো।

বনহুর কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতেই নূরী এসে দাঁড়ালো তার সামনে। একটা গোলাপ ফুল তার দিকে এগিয়ে ধরে বলেন সে–হুর, তোমার যাত্রা শুভ হউক।

বনহুর ফুলটা নিয়ে গুঁজে দিল নূরীর খোঁপায়, তারপর ওর চিবুক ধরে একটু নাড়া দিয়ে বলেন–আল্লাহ হাফেজ!

তাজের পিঠে চড়ে বসলো বনহুর, সঙ্গে সঙ্গে তাজ উল্কাবেগে ছুটে চললো, সমস্ত দ্য অশ্ব ছুটিয়ে দিল তার পিছু পিছু।

গভীর রাত।

জমিদার বাসব নারায়ণ গভীর ঘুমে অচেতন।

অন্যান্য দস্যুদের নিয়ে জমিদার বাড়ির প্রাচীর টপকে অন্তপুরে প্রবেশ করলো। এক মুহূর্তে গোটা বাড়ি প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। যে যেখানে যা পেল, লুটে নিতে লাগলো। বনহুর প্রবেশ করলো জমিদার বাসব নারায়ণের কক্ষে।

দুগ্ধফেননিত বিছানায় বাসব নারায়ণ তখন সুখস্বপ্ন দেখছিল। বনহুর তার শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। রিভলবারের মৃদু আঘাত করে। ডাকলো-নারায়ণ মশায়, উঠুন।

ধড়মড় করে উঠে বসে বাসব নারায়ণ। সামনে তাকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল তার কণ্ঠ। যমদূতের মত কালো পোশাকে পরা বনহুরকে রিভলবার হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হৃদকম্প শুরু হলো তার। শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলোকে তুমি, কি চাও?

বনহুরের চোখ দুটো ধক্ করে জ্বলে উঠলো। গম্ভীর কণ্ঠে বলেন–দস্যু বনহুর!

জমিদার বাসব নারায়ণের আড়ষ্ট কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এলো অস্ফুট একটা শব্দ —দস্যু বনহুর!

হ্যাঁ।

কিন্তু, কি চাও আমার কাছে?

কি চাই জান না? টাকা—তোমার সমস্ত টাকা আমাকে এ মুহূর্তে দিয়ে দাও। নইলে এ দেখছো, এর এক গুলিতে তোমার টাকার মোহ ঘুচিয়ে দেব।

বাসব নারায়ণ থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বনহুরের পায়ের কাছে বসে ছিল —বাবা, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। টাকা কোথায় পাবো?

কোথায় পাবে? এসো আমার সঙ্গে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। বনহুর দু'পা এগুতেই বাসব নারায়ণ ছুটে গিয়ে সিন্দুক জড়িয়ে ধরলো।

বনহুর এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিয়ে সিন্দুক খুলে যত টাকা পয়সা, সোনা-দানা নিয়ে অন্তপুর থেকে বেরিয়ে এলো।

পরদিন গোটা শহরময় ছড়িয়ে ছিল দস্যু বনহুরের এ দুঃসাহসিক দস্যুতার কথা। পুলিশ মহলে পর্যন্ত ত্রাসের সঞ্চার হলো।

পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন চিন্তিত হয়ে পড়েন। তার বহু প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, কিছুতেই এ দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে সক্ষম হননি। তাঁর অভিজ্ঞ জীবনে এ যেন চরম পরাজয়।

পুলিশ সুপার মিঃ বশির আহমদ পর্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তিনি নিজেও বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য উঠে পড়ে লেগে যান। গোপনে প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ শঙ্কর রাওয়ের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং কেসটা তার হাতে অর্পণ করেন। অনুরোধ জানিয়ে বলেন, মিঃ রাও, আপনি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে দেশবাসীকে রক্ষা করুন।

মিঃ আহমদের কথা রাখবেন বলে আশ্বাস দেন মিঃ রাও। তিনি ভরসা দিয়ে বলেন—আমি আপনার অনুরোধ রাখবো, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের

আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো।

থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ রাও, আপনার ওপর আমার ভরসা রইলো। দেখুন এ ব্যাপারে আপনার যত টাকা-পয়সা এবং লোকজনের প্রয়োজন হবে পাবেন, পুলিশ ফোর্স সব সময়ের জন্য আপনাকে সাহায্য করবে।

মিঃ আহমদের গাড়ি বেরিয়ে যেতেই মিঃ রাওয়ের সহকারী গোপালবাবু এসে এজির হলেন, মিঃ রাওকে লক্ষ্য করে বলেন–কি হে, ব্যাপার কি? হঠাৎ যে পুলিশ সুপারের আগমন?

একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বলেন মিঃ রাও-ব্যাপার নতুন নয়, পুরানো।

পাশের সোফায় বসে পড়ে বলেন গোপালবাবু—পুরোনো? তাহলেই সেরেছে, রোগ সারতে অনেক ঔষধের প্রয়োজন হবে।

ঠাট্টা নয়, শুনো গোপাল।

বল, সব শুনতে রাজি আছি।

দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের নোটিস নিয়ে পুলিশ সুপারের আগমন হয়েছিল।

কি বললে, বনহুরকে গ্রেপ্তার? তুমি ঐ কেস হাতে নিলে নাকি?

না নিয়ে কি আর উপায় ছিল। পুলিশ সুপার যখন এসেছেন।

কিন্তু এ কথা ভেবে দেখলে না শঙ্কর, কোথায় দস্যু বনহুর, আর কোথায় তুমি। আজ পর্যন্ত পুলিশবাহিনী যার টিকিটি দেখতে পায়নি, তাকে গ্রেপ্তার করবে তুমি? যা খুশি করোগে, আমি কিন্তু ওসবের মধ্যে নেই।

গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠেন শঙ্কর রাও-কেউ যখন তার টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পায়নি, সে কারণেই আমি এগুতে চাই। দেখতে চাই কে এই বনহুর, কেমন তার শক্তি। গোপাল শনো, আরও সরে এসো আমার কাছে।

এলাম বল।

গোপাল, গত পরশু রাতে জমিদার বাসব নারায়ণের বাড়িতে হানা দিয়ে দস্যু বনহুর সর্বস্ব লুটে নিয়ে গেছে।

এ কথা আমি শুনেছি।

শুনো, সব কথা মন দিয়ে শুনো, তারপর যা হয় বল। আমি একটা বুদ্ধি এঁটেছি।

কি বুদ্ধি শুনি? হাতি ধরবার মত বনহুরকে গ্রেপ্তারের ফাঁদ পাততে চাও নাকি?

এক রকম তাই।

বল, তাহলে শুনি তোমার বুদ্ধির ফাঁদ কত মজবুত হবে?

শুনো, আমাকে পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুনের নিকট যেতে হচ্ছে। কিছু সংখ্যক পুলিশ প্রয়োজন।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু তোমার বুদ্ধির কৌশল কিছুটা শুনাও। পুলিশ নিয়ে বনহুরের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করবে নাকি?

না না, তা নয়, কথা হচ্ছে আগামী শনিবারে রায় বাহাদুর শ্যামাচরণের তিন লাখ টাকা তার দেশের বাড়ি থেকে শহরের বাড়িতে আনবে।

একথা তুমি জানলে কি করে?

জানতে হয় না, জেনেছি।

তার মানে?

মানে এই রকম একটা অভিনয় করতে হবে। আমি আজই একবার রায় শাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। তিনি যেন এই রকম একটা কথা সকলের মধ্যে রটিয়ে দেন এবং নিজের সই করা কয়েকটা কাগজ-যাক সব বলে আর কাজ নেই, পরে সব জানতে পারবে।

তবু একটু বল না?

তারপর কয়েকজন পাহারাদার সঙ্গে করে শ্যামাচরণ মহাশয়ের নায়েব দেশের বাড়ি থেকে মোটরে তিন লাখ টাকা নিয়ে রওনা দেব, কিন্তু আসলে তাদের কাছে কোন টাকা-পয়সা থাকবে না। দস্যু বনহুর জানবে তিন লাখ টাকা যাচ্ছে। এ সুয়োগ কিছুতে নষ্ট করা যায় না, তখন নিশ্চয়ই সে গাড়িতে হানা দেবে।

খাসা বুদ্ধি তোমার!

হ্যাঁ, খাসা বুদ্ধি এটেছি গোপাল। যে গাড়িতে টাকা আসছে, সে গাড়িকে অনুসরণ করবে পুলিশ ফোর্স, সকলের হাতেই থাকবে গুলিভরা রাইফেল। অতি গোপনে থাকবে, যেন কেউ জানতে না পারে।

উঠে পড়েন মিঃ শঙ্কর রাও-গোপাল তৈরি হয়ে এসো, এক্ষণি বেরুবো।

হাই তুলে উঠে দাঁড়ায় গোপালবাবু যাত্রা তোমার জয়যুক্ত হউক!

০৫.

বনহুর কক্ষে পায়চারী করছে। এক পাশে বিরাট একটা মশাল জ্বলছে। সম্মুখে দণ্ডায়মান তার অনুচরবৃন্দ। মশালের আলোতে দস্যু বনহুরের জমকালো পোশাক

চকচক করে উঠছে। বনহুরের আসনের সামনে একটা টেবিল, টেবিলে একখানা চিঠি খোলা অবস্থায় পড়ে আছে।

বনহুর কাগজখানা হাতে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলেন-এ চিঠি কোথায় পেলে?

একজন দস্যু বলে ওঠে—সূর্দার, একটা লোকের পকেট থেকে চিঠিখানা পড়ে গিয়েছিল, রহমান কুড়িয়ে এনে আমাকে দিয়েছে।

হঠাৎ বনহুর হেসে ওঠে হাঃ হাঃ করে। তারপর প্যান্টের পকেট থেকে ঐ রকম আর একখানা কাগজ বের করে ঐ কাগজখানার পাশে রাখে। তারপর ঐ দস্যুটিকে বলে—কাগজ দুখানা পড়ো।

দস্যুটি কাগজ দু'খানা হাতে তুলে নিয়ে বলে ওঠে—একি সর্দার, দুটোতেই যে একই কথা লেখা রয়েছে!

চিঠি দুটোতে লেখা ছিল—

নায়েব বাবু, আমার তিন লাখ টাকার
প্রয়োজন। আগামী পরশু আমার গাড়ি
পাঠাবো। কয়েকজন পাহারাদার সহ
ঐ টাকা নিয়ে আপনি স্বয়ং চলে আসবেন।
—রায় বাহাদুর শ্যামচরণ।

দস্যুটি কাগজ দু'খানা পড়া শেষ করে আবার টেবিলে রাখে। আশ্চর্য। দু'খানা কাগজের লেখা একই লোকের।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে—দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের এটা একটা নতুন ফন্দি। শুধু ঐ দুটি নয়, অমনি আরও অনেক চিঠি এখানে সেখানে গোপনে ছড়ানো হয়েছে। হাঃ হাঃ হাঃ, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে এমন লোক পৃথিবীতে আছে নাকি? যাক এবার তোমরা বিশ্রাম করোগে।

দস্যুগণ বেরিয়ে যায়। বনহুর নিজের বিশ্রামঘরে প্রবেশ করে।

এমন সময় নূরী এসে দাঁড়ায় সেখানে। মধুর কণ্ঠে ডাকে—হুর!

নূরী বনহুরকে আদর করে ‘হুর’ বলে ডাকতো।

বনহুর মাথার পাগড়িটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলে–কি খবর নূরী?

—হুর, তোমার দেখাই যে পাওয়া যায় না। সারাটা দিন তুমি কোথায় কাটাও?

বনহুর বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে মৃদু হেসে বলে–সারাটা দিন আমি তোমার পাশেই থাকি, তুমি আমাকে দেখতে পাও না নূরী?

নূরী বনহুরের পাশে গিয়ে বসে, তার জামার বোতাম খুলতে খুলতে বলে-মিছে কথা। আমি অন্ধ বুঝি?

নূরী, বনহুর কি মেয়েছেলে, তাই.....

হুর, আমি যে বড় একা। এ গহন বনে তুমি ছাড়া আর আমার কে আছে? নূরীর কণ্ঠে বেদনা ঝরে পড়ে।

বনহুর অবাক হয়ে তাকায় নূরীর মুখে।

নূরী বনহুরের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—এ বনে আসা অবধি আমি তোমাকে সাথীরূপে পেয়েছি, হুর। তুমিই যে আমার সব।

নূরী, তুমি আমাকে ধরে রাখতে চাও?

না, ধনে রাখতে চাইনে, কিন্তু.......

বুঝেছি, আবার যেন ফিরে আসি এ তো? হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে বনহুর—পাগলী আর কি!

না, আমি নই, তুমি পাগল। কিছু বুঝ না, বুঝতে চাও না। এখনও তোমার ছেলেমানুষি গেল না, হুর!

নূরী, এখন বিশ্রাম করবো। তুমি এখন যাও লক্ষ্মী মেয়ে।

বনহুরের কথায় নূরী অভিমানভরে উঠে দাঁড়ায়—আচ্ছা আমি যাচ্ছি। আর তোমাকে বিরক্ত করতে আসবো না।

খপ করে নূরীর হাত ধরে ফেলে বনহুর–রাগ হলো?

আমি রাগ করলে তাতে তোমার কি আসবে যাবে? ছেড়ে দাও আমার হাত।

নূরী, অভিমান করো না। একটু বিশ্রাম করেই আবার আমাকে বেরুতে হবে।

তার মানে, আবার এ রাতেই তুমি বেরুবে?

হ্যাঁ নূরী, আমার অনেক কাজ।

শুধু কাজ আর কাজ, আজ নাই-বা বেরুলে!

তা হয় না নূরী, বেরুতেই হবে।

নূরী ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

বনহুর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে ছিল বিছানায়।

০৬.

গভীর রাত। তাজের পিঠে চড়ে বসলো বনহুর। আজ শরীরে স্বাভাবিক সু, প্যান্ট-কোট-টাই, মাথায় ক্যাপ। পকেটে কিন্তু গুলিভরা রিভলবার।

গহন বন বেয়ে, নিস্তব্ধ প্রান্তরের বুক চিরে ছুটে চললো বনহুরের অশ্ব। ওর পেরিয়ে এক পল্লীতে এসে পৌঁছল বনহুর। এবার গতি অতি মন্থর এর নিল সে। শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললো। অদূরে দেখা যাচ্ছে ধবধবে সাদা রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়ের বাড়ি।

বনহুর এ বাড়ির সামনে গিয়ে অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়ালো।

মিঃ শঙ্কর রাও মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিল। কি করতে কি ঘটে গেল! এত বড় ফন্দিটাও তার টিকলো না। বরং বেচারা রায়বাহাদূর শ্যামাচরণ এত বড় একটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। লজ্জায় ক্ষোভে মরিয়া হয়ে উঠলেন শঙ্কর রাও।

পুলিশ মহলে আতঙ্কের সৃষ্টি হলো! মিঃ বশীর আহমদ পর্যন্ত বোকা বনে গেল: কারও মুখে যেন কোন কথা নেই।

সমস্ত পথে-ঘাটে-মাঠে, অলিগলিতে পুলিশ পাহারা রইলো। সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই তারা তাকে গ্রেপ্তার করবে। পুলিশমহল থেকে ঘোষণা করে দেয়া হলো, যে দস্যু বনহুরকে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় ধরে এনে দিতে পারবে, তাকে লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

অর্থের লোভে যে যাকে সন্দেহ হলো, ধরে নিয়ে এলো থানায়। একদিন গভীর রাতে কয়েকজন পুলিশ রাস্তায় পাহারা দিচ্ছিলো, এমন সময় একটা পাগল ছেড়া জামাকাপড় পরে আবোল-তাবোল বকতে বকতে চলে যাচ্ছিলো। পুলিশের দৃষ্টি আড়াল হয়ে যাবে, এমন সময় দু'জন পুলিশ ধরে ফেললো তাকে-এ বেটা, কোথায় যাচ্ছিস?

পাগল লোকটা মাথা চুলকাতে আরম্ভ করলো। পুলিশদের সন্দেহ আরও বাড়লো, একজন লাঠি উচিয়ে বসিয়ে দেবে আর কি, এমন সময় একটানে মুখ থেকে দাড়ি আর গোঁফ খুলে ফেলে বলেন পাগল লোকটা—আমি পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশরা 'বেকুফ বনে গেল। লম্বা সেলুট ঠুকে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সকলে। হৃৎপিণ্ড তখন ধক ধক করতে শুরু করেছে ওদের। না জানি এর জন্য কপালে কি আছে, এত কষ্টের পুলিশের চাকরিটা না খোয়া যায়।

মিঃ হারুন হেসে বলেন—হ্যাঁ, এই রকম সতর্ক থাকবে। পাগল কিংবা ভিখারী বলেও কাউকে খাতির করবে না। কথা ক'টি বলে চলে গেল ইন্সপেক্টার।

এতক্ষণে পুলিশগুলো হাফ ছেড়ে বাঁচলো।

নূরী একটা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে চিন্তিত মনে বসে আছে।

এমন সময় বনহুর এসে দাঁড়ালো তার পাশে। নূরীকে বিষণ্ন মুখে বসে থাকতে দেখে হেসে বলেন—কি এত ভাবছো বসে বসে?

তোমার যেন কোন ভাবনা নেই! এই দেখ দেখি। খবরের কাগজের একটা জায়গা মেলে ধরলো বনহুরের চোখের সম্মুখে—দেখেছো?

ওঃ তাই বুঝি এত ভাবনা? পরক্ষণেই হেসে ওঠে হাঃ হাঃ করে বনহুর, তারপর বসে পড় নূরীর পাশে।

নূরীর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে দু'ফোটা অশ্রু। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন–তোমার কি জীবনের এতটুকু ভয় নেই?

ভয়! কিসের ভয় নূরী?

তোমাকে যে জর্বিত কি মৃত ধরে দিতে পারবে, সে লাখ টাকা পাবে।

নূরী, আমার ইচ্ছে হচ্ছে আমি নিজেকে নিজেই ধরিয়ে দিয়ে এক লাখ টাকা গ্রহণ করি।

ছি! তোমার এত টাকার মোহ? টাকা? বনহুর টাকার পাগল নয় নূরী! সে চায় দুনিয়াটাকে দেখতে।

বেশ হয়েছে, অনেক দেখেছো, এবার মানুষ হবার চেষ্টা কর। কেন, আমি কি মানুষ নই?

মানুষ যদি হতে তবে এমন, সব আজগুবি কথা বলতে না। থাক, চল দেখি এবার কিছু খাবে।

বনহুর উঠে দাঁড়ায়—উঁহু, কিছু খাবো না, নূরী। কোথায় যাবে এই ভর সন্ধ্যায়?

প্যান্টের পকেট থেকে কয়েক তোড়া নোট বের করে নূরীর সামনে ধরে—এগুলো মালিককে পৌঁছে দিতে।

তার মানে?

প্যান্টের পকেটে টাকার তোড়াগুলো রাখতে রাখতে বলে বনহুর-ঐ যে সেদিন রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়ের নায়েবের কাছ থেকে টাকাগুলো নিয়ে এসেছিলাম তা এখনও মালিকের নিকটে পৌঁছে দেয়া হয়নি।

তুমি আশ্চর্য মানুষ।

কেন?

টাকা আনলেই বা কেন, আবার ফিরিয়ে দেবারই কি প্রয়োজন আছে?

নূরী, বনহুর সব পারে। ছলনা বা কৌশলে বনহুরকে বন্দী করা এত সহজ নয়, সেটাই জানিয়ে দিলাম। আর অযথা বৃদ্ধ, নায়েব মহাশয়কে বিপদগ্রস্ত করতে চাইনে। শ্যামাচরণ মহাশয় কিছুতেই এই তিন লাখ টাকা ছাড়বে না, বৃদ্ধ নায়েব বাবুকেই পরিশোধ করতে হবে, নয়তো হাজত বাস।

তাতে তোমার কি, যা হয় হউকগে।

তা হয় না নূরী, অযথা কাউকে কষ্ট দেয়া আমার ইচ্ছে নয়, আচ্ছা চলি, ভোরে ফিরে আসবো।

নিস্তব্ধ প্রান্তরে জেগে ওঠে বনহুরের অশ্ব-পদশব্দ। নূরী দু'হাতে বুক চেপে ধরে উঠে দাঁড়ায়, বুকের মধ্যে ধক ধক্ করে ওঠে, না জানি সে কেমনভাবে ফিরে আসবে।

রায়বাহাদুর শ্যামাচরণের বাড়ির পেছনে গিয়ে বনহুর তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো, তারপর প্রাচীর টপকে প্রবেশ করলো অন্তঃপুরে। একে গভীর অন্ধকার, তার উপরে বনহুরের শরীরে কালো ড্রেস থাকায় অন্ধকারে মিশে গেল সে।

অতি সহজেই রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়ের কক্ষের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

কক্ষে ডিমলাইট জ্বলছে। বনহুর পকেট থেকে একটা যন্ত্র বের করে অল্পক্ষণের মধ্যেই জানালার কাঁচ খুলে ফেললো, তারপর প্রবেশ করলো কক্ষে।

খাটের ওপর রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ শায়িত। গোটা রাত অনিদ্রায় কাটিয়ে এতক্ষণে একটু ঘুমিয়েছেন। তিন লাখ টাকার শোক কম নয়, টাকার শোকে তিনি অস্থির হয়ে পড়েছেন। যত দোষ ঐ নায়েব বাবুর। তিনি না জেনেশুনে অপরিচিত একটা লোককে বিশ্বাস করলেন, এত টাকা ছেড়ে দিল তার হাতে। না, এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করতে হবে। বৃদ্ধ পুরানো নায়েব বলে খাতির করলে চলবে না, জেল খাটাবেন। কিছুতেই রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ তাঁকে রেহাই দেব না.... এতসব ভাবতে ভাবতে কেবলমাত্র ঘুমিয়েছেন।

বনহুর শ্যামাচরণ মহাশয়ের খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর গায়ে মৃদু আঘাত করে ডাকলো—উঠুন।

রায়বাহাদুর ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসে তাকালেন সামনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করতে যাব, অমনি বনহুর রিভলবার চেপে ধরলো তার বুকে- খবরদার, চিৎকার করবেন না।

বনহুরের কালো অদ্ভুত ড্রেস, মুখে, গাল পাট্টা রায়বাহাদুরকে আতঙ্কিত করে তুললো। তিনি একটা ঢোক গিলে বলেন—তুমি কে?

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল-দস্যু বনহুর!

রায়বাহাদুর রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ছিল, চিৎকার করে বলেন–তুমিই দস্যু বনহুর!

হেসে বলেন বনহুর-হ্যাঁ।

আবার কি জন্য এসেছো? আমার তিন লাখ টাকা নিয়েও তোমার লোভ যায়নি?

ভুল বুঝেছেন রায়বাহাদুর মহাশয়, আপনার টাকা নেইনি, আপনার নিকটে পৌঁছে দেবার জন্যই আপনার নায়েব বাবুর কাছ হতে নিয়ে এসেছি। কারণ আপনি যেভাবে টাকা নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিলেন, সেভাবে আনাটা নিরাপদ নয়, তাই আমি–

ওঃ তাহলে তুমি টাকাটা অন্য কেউ লুটে নেবার পূর্বেই লুটে নিয়েছে, শয়তান কোথাকার!

দেখুন আমি শয়তান নই, শয়তানের বাবা। যাক বেশি বিরক্ত করতে চাইনে আপনাকে এ দুপুর রাতে। বুঝতেই পারছি আপনি এ তিন লাখ টাকার শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন। সে কারণেই আমি তাড়াতাড়ি এলাম, এ নিন আপনার টাকা। প্যান্টের পকেট থেকে তিন লাখ টাকার তোড়া বের করে রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়ের হাতে দিয়ে বলে—গুণে নিন।

রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়ের চোখে মুখে একরাশ বিস্ময় ঝরে পড়ে। একবার হস্তস্থিত টাকা আর একবার বনহুরের কালো গালপাট্টা বাধা মুখের দিকে তাকান তিনি। একি অবিশ্বাসের কথা, বনহুর তবে কি তাকে হত্যা করতে এসেছে? ভয়ে বিবর্ণ হয়ে ওঠে তার মুখমণ্ডল।

বনহুর পুনরায় বলে ওঠে—নিন টাকা গুণে নিন। এক পা পাশের চেয়ারে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ায় সে।

রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ কম্পিত হাতে টাকার তোড়াগুলো গুণে নিলেন।

বনহুর বলেন—ঠিক আছে তো?

হ্যাঁ, ঠিক আছে।

বনহুর এক টুকরা কাগজ আর কলম বাড়িয়ে ধরলো রায়বাহাদুর মহাশয়ের সামনে—একটা রসিদ লিখে দিন, আমি তিন লাখ টাকা বুঝে পেলাম।

শ্যামাচরণ কাগজ আর কলমটা হাতে নিয়ে লিখলেন।

বনহুর হেসে বলেন—নিচে নাম সই করুন।

শ্যামাচরণ মহাশয় নাম সই করে কাগজখানা বনহুরের হাতে দিল।

বনহুর কাগজখানা হাতে নিয়ে আর একবার পড়ে দেখলো, তারপর পকেটে রাখলো। রিভলবার উঁচিয়ে ধরে পিছু হটতে লাগলো সে, পরমুহূর্তে যে পথে এসেছিল সে পথে অদৃশ্য হলো।

এবার বনহুরের অশ্ব রায় মহাশয়ের দেশের বাড়ির সদর গেটে গিয়ে থামলো, অতি সতর্কতার সঙ্গে প্রাচীর টপকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলো সে। নায়েব বাবুর কক্ষ সেদিন চিনে নিয়েছিল বনহুর, আজ সে কক্ষের দরজায় আঘাত করলো।

নায়েব বাবুর চোখে ঘুম নেই, তিন লাখ টাকা যেমন করে হউক তাকে পরিশোধ করতেই হবে, না হলে নিস্তার নেই। কিন্তু কোথায় পাবেন তিনি অত টাকা। মাথার চুল ছিড়ছেন তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঠিক সে মূহুর্তে কক্ষের দরজায় মৃদু শব্দে নায়েব বাবু বিছানায় উঠে বসে বলেন—কে?

বনহুর পুনরায় শব্দ করে ঠুক ঠুক ঠুক.......

এবার নায়েব বাবু শয্যা ত্যাগ করেন। দরজা খুলে দিয়ে সম্মুখে বনহুরকে দেখেই চিৎকার করতে যান, সঙ্গে সঙ্গে বনহুর চেপে ধরে তার মুখভয় নেই, আজ

টাকা নিতে আসিনি। রায় বাহাদুর মহাশয়ের নিকটে টাকা পৌঁছে দিয়েছি, এই নিন রসিদ।

বৃদ্ধ নায়েব কম্পিত হাতে রসিদখানা হাতে নিয়ে হাবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না এ কথা।

বনহুর যেমনি এসেছিল, তেমনি বেরিয়ে যায়।

রাতের ঘটনা নিয়েই পুলিশ অফিসে আলোচনা চলছিল। রায়বাহাদূর শ্যামাচরণ মহাশয়কে দস্যু বনহুর সে তিন লাখ টাকা ফেরত দিয়ে গেছে, এটাই আলোচনার বিষয়বস্তু।

পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন, মিঃ শঙ্কর রাও, মিঃ গোপাল বাবু, রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয় এবং বৃদ্ধ নায়েব বাবু সকলেই উপস্থিত আছেন।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন—আশ্চর্য এই দস্যু বনহুর।

মিঃ শঙ্কর রাও বলেন—শুধু আশ্চর্য নয় ইন্সপেক্টার অদ্ভুত সে।

গোপাল বাবু হঠাৎ বলে বসে—সত্যি আশ্চর্য বলে আশ্চর্য। কেনই বা সে টাকা নিল, আবার কেনই বা ওভাবে ফিরিয়ে দিয়ে গেল! নিশ্চয়ই দস্যু বনহুর ভয় পেয়েছে।

শঙ্কর রাও, একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বলেন–ভয় পাবার বান্দা সে নয়। সে দেখিয়ে দিল, আমি সব পারি। কিন্তু বাছাধন জানে না শঙ্কর রাও কম নয়, আমি একবার দেখে নেব দস্যু বনহুরকে।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করেন চৌধুরী সাহেব। সহাস্যমুখে বলেনগুড মর্নিং।

সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে চৌধুরী সাহেবকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন, তারপর তিনি আসন গ্রহণ করার পর সবাই আসন গ্রহণ করলেন।

ইন্সপেক্টার সাহেব বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলেন-ব্যাপার কি চৌধুরী সাহেব, হঠাৎ যে?

কেন, আসতে নেই নাকি? হেসে বলেন চৌধুরী সাহেব।

ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন বলেন—এখানে কি মানুষ সহজে আসতে চায়?

তার মানে?

মানে যখন একটা কিছু অঘটন ঘটে, তখনই লোকে আমাদের এই পুণ্যভূমিতে পদধূলি দেন।

মিঃ হারুনের কথায় হেসে ওঠেন সবাই।

চৌধুরী সাহেব বলেন—সে কথা মিথ্যা নয় ইন্সপেক্টার সাহেব। তবে আমি অঘটন ঘটিয়ে আসিনি। এসেছি একটা সামান্য কথা নিয়ে।

একসঙ্গে সকলেই চোখ তুলে তাকালেন। মিঃ হারুন জিজ্ঞেস করলেন সামান্য কথা? বলুন, আপনার সামান্য কথাটাই আগে শোনা যাক। কিন্তু তার পূর্বে এদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দি। ইনি রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয় আর ইনি তাঁর নায়েব শঙ্কর বাবু আর ইনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ শঙ্কর রাও। উনি মিঃ রাওয়ের সহকারী গোপাল বাবু। এবার চৌধুরী সাহেবের পরিচয় দেন—আর উনি চৌধুরী মাহমুদ খান হাসানপুরের জমিদার।

চৌধুরী সাহেব আনন্দভরা কণ্ঠে বলে. ওঠেন—আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত খুশি হলাম। যদিও আপনাদের নামের সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় আছে।

রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয় উঠে দাঁড়িয়ে চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে হাত মিলান—আমিও অত্যন্ত খুশি হলাম, চৌধুরী সাহেব। আপনার সুনাম অনেক শুনেছি, কিন্তু দেখা হয়নি কোনদিন। আজ এখানে আমরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দিত হলাম।

চৌধুরী সাহেব বলেন—খবরের কাগজে যে সব ঘটনা পড়লাম এ সব কি সত্য রায়বাহাদুর সাহেব?

আজ্ঞে হ্যাঁ, সব সত্য। কথাটা অতি গম্ভীর কণ্ঠে বলেন রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়।

মিঃ হারুন হেসে বলেনমা হলে কি আর রায়বাহাদূর মহাশয়ের পুলিশ অফিসে পদধূলি পড়ে।

চৌধুরী সাহেবই বলে ওঠেন—আমি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলাম। আশ্চর্য এই দস্যু বনহুর। টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে সে মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে গেছে।

এবার মিঃ রাও কথা বলেন——কাকে আপনি মহহৃদয় বলছেন চৌধুরী সাহেব। শয়তান বদমাশ। দস্যুতার এটা একটা নতুন চাল।

কিন্তু শুনা গেছে, সে নাকি অনেক দীন দুঃখীকে মুক্তহস্তে দান করছে।

মিথ্যে কথা চৌধুরী সাহেব, সব আজগুবি কথা। কেউ স্বচক্ষে দেখেছে? দস্যু বনহুর কাকে টাকা দিয়েছে? শয়তানটা যে অতি ধূর্ত—এ কথা মিথ্যে নয়।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন—পুলিশকে একেবারে হন্তদন্ত করে মারছে। আমরা তো একেবারে নাজেহাল হয়ে উঠেছি, থাক সে কথা। এবার বলুন চৌধুরী সাহেব, আপনার কি কথা?

হ্যাঁ, এতক্ষণ আসল কথাটাই বলা হয়নি। দেখুন আপনারা সকলেই যখন এখানে উপস্থিত আছেন, তখন ভালোই হলো। আমি আপনাদের দাওয়াত করছি। আমার ভাগনী মনিরা বেগমের জন্ম উৎসব। অনুগ্রহ করে আজ সন্ধ্যায় আমার ওখানে যাবেন। এই নিন কার্ড। কার্ড বের করে নাম লিখলেন। তারপর প্রত্যেককে একখানা করে দিয়ে বলেন—মনে কিছু করবেন না। আপনাদের দাওয়াত করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দবোধ করছি।

রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয় হেসে বলেন—এটা তো খোশখবর। এলাম কোন কাজে, পেলাম দাওয়াত। সত্যি আজকের দিনটা আমার কড় শুভ যাচ্ছে।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন—মিথ্যে নয় রায়বাহাদূর সাহেব। শুধু আজকের দিন নয়, কালকের রাত থেকে আপনার শুভরাত্রি শুরু হয়েছে।

চৌধুরী সাহেব এবার মিঃ রাওকে লক্ষ্য করে বলেন—আপনারা নীরব রইলেন যে? গরীবালয়ে আসছেন তো?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, এতবড় একটা লোভ সামলানো কি সহজ কথা! নিশ্চয়ই আসবো।

ধন্যবাদ! একটু থেমে কি যেন চিন্তা করলেন চৌধুরী সাহেব। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলেন—আমি নিঃসন্তান। ঐ ভাগনীটাই আমার পুত্র এবং কন্যা। অনেক আশা, অনেক বাসনা নিয়েই ওকে আমি মানুষ করেছিলাম....যাক সে সব কথা, আপনারা মেহেরবানি করে আসবেন কিন্তু।

রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয় বলে ওঠেন—চৌধুরী সাহেব, শুনেছিলাম আপনার নাকি একটি পুত্রসন্তান ছিল?

ছিল,–বিশ বছর আগে তাকে হারিয়েছি। ইন্সপেক্টার, আপনাকে কি বলবো, আট বছরের সে বালকের স্মৃতি আজও আমরা ভুলতে পারিনি। বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে চৌধুরী সাহেবের কষ্ট আমার মনির ছিল অপূর্ব, অদ্ভুত ছেলে।

অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন মিঃ হারুন—চৌধুরী সাহেব না জেনে কথাটা বলে ভুল করেছি।

না না, আপনি কোন ভুল করেননি ইন্সপেক্টার সাহেব। আপনি না বললেও সদাসর্বদা তার স্মৃতি আমার হৃদয়ে আঘাত করে চলেছে। অনেক কষ্টে ঐ ভাগনীটাকে চোখের সামনে রেখে তাকে ভুলে আছি। আচ্ছা আজকের মত উঠি তাহলে–কথাটা বলে উঠে পড়েন চৌধুরী সাহেব।

সবাই তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানান।

০৭.

বাগানে বসে একটা মালা গাঁথছিল নূরী, গুন গুন করে গান গাচ্ছিলো। এমন সময় পেছনে এসে দাঁড়ায় রহমত, নূরীকে জিজ্ঞেস করলো-নূরী সর্দার কোথায়?

ফুলের মালা গাঁথতে গাঁথতেই বলেন নূরী—কি জানি কোথায় সে? আচ্ছা রহমত, শহর থেকে কখন এলে?

এই তো আসছি।

নতুন কোন খবর আছে তাহলে?

খবর না থাকলে কি আর অমনি ছুটে এসেছি।

শহরের বিভিন্ন জায়গায় দস্যু বনহুরের অনুচর ছড়িয়ে থাকতো। নতুন কোন খবর হলেই এসে জানাতে তারা রহমতের কাছে। রহমত খবর নিয়ে ছুটতে বনহুরের নিকট।

নূরী হেসে বলে—কি খবর রহমত, একটু বল না শুনি?

তুমি আবার শুনবে?

হ্যাঁ, বল?

শহরে এক ধনবান লোক আছেন, ভদ্রলোকের নাম চৌধুরী মাহমুদ খান। আজ সন্ধ্যার পর তার কন্যার জন্ম উৎসব হবে।

তাতে কি হলো? এ আবার নতুন খবর কি?

শুনোই না, চৌধুরী সাহেব তার কন্যাকে বহুমূল্যের একটা হীরার আংটি উপহার দেবেন।

তাই বল। নিশ্চয় খুব সুন্দর হবে সে আংটিটা?

আমি কি আর দেখেছি! তবে নিশ্চয়ই খুব সুন্দর হবে। এ আংটিটা যদি তোমার আংগুলে পরো, কি সুন্দর মানাতো!

সত্যি রহমত, আমি হুরকে বলবো, ঐ আংটি আমার চাই। মালা গাঁথা শেষ করে মালাটা ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে কথাটা বলে নূরী।

রহমত বলে—যাই সর্দার কোথায় দেখি।

চলে যায় রহমত। নূরী মালা হাতে উঠে দাঁড়ায়। মালা হাতে ঝরণার দিকে এগিয়ে চলে সে। হঠাৎ ওর নজরে পড়ে ঝরনার পাশে একটা পাথরখণ্ডে বসে আছেন বনহুর।

নূরী পা টিপে টিপে বনহুরের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর চট করে মালাটা ওর গলায় পরিয়ে দিয়ে বসে ছিল পাথরখণ্ডটার একপাশে। হেসে বলেন—খুব চমকে দিয়েছি, না? চমকাবার বান্দা বনহুর নয়। মালাটা হাতে নিয়ে নাড়াচড়া করতে থাকে সে।

নূরী আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসের, একটা খবর আছে।

বল!

রহমত এসেছে।

তারপর?

শহরে কোন এক চৌধুরী-কন্যার নাকি জন্ম উৎসব।

হ্যাঁ, সে উৎসবে আমারও দাওয়াত আছে।

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে নূরী—তার মানে?

মানে আমি যাব সে উৎসবে।

তাহলে তুমিও সে হীরার আংটির কথা জানতে পেরেছো? হুর, ঐ আংটি আমার চাই। বল দেবে আমাকে?

হ্যাঁ নূরী, সে হীরার আংটিটা তোমার ঐ সুন্দর আংগুলে অপূর্ব মানাবে।

হুর, সত্যি তুমি কত ভালবাস আমাকে।

উঠে দাঁড়ায় বনহুর। মালাটা খুলে অন্যমনস্কভাবে নূরীর হাতে দেয়। তারপর চলে যায় সে দরবার কক্ষের দিকে, যেখানে অনুচরবৃন্দ দাঁড়িয়ে আছে তার প্রতীক্ষায়।

০৮.

চৌধুরী বাড়ি।

আজ মনিরার জন্ম উৎসব। সকাল থেকে বাড়ির সবাই ব্যস্ত। ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র ঘসে-মুছে পরিষ্কার করা হচ্ছে। কয়েকজন পরিচারিকা নিয়ে মরিয়ম বেগম নিজেই এসব করেছেন।

আজ মনিরার মা নেই, রওশন আরা বেগম থাকলে তাকে এসব দেখতে হত না, আজ থেকে দু'বছর আগে তিনি কন্যার মায়া ত্যাগ করে জান্নাতবাসিনী হয়েছেন। ননদীনির কথা স্মরণ হতেই মরিয়ম বেগমের মনটা ব্যথায় টন টন করে উঠলো। দু'চোখ ছাপিয়ে গড়িয়ে ছিল দু'ফোটা অশ্রু।

মনিরার মনে আজ আনন্দের উৎস। তার সহপাঠিনীরা আসবে। বান্ধবীদের নিয়ে আমোদ-প্রমোদ করবে, হাসিগানে ভরে উঠবে আজকের সন্ধ্যাটা। মনিরা গুন গুন করে গান গাইছিল আর ঘুরে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ কক্ষে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়ায়।

মরিয়ম বেগম তাকে দেখতে পেয়েই গোপনে চোখের পানি মুছে ফেলেন। তারপর হেসে বলেন—মনিরা, এদিকে শুনো।

মনিরা এসে দাঁড়ায় তার পাশে—আমাকে ডাকছো মামীমা?

হ্যাঁ মা শুনো। বিকেলে কোন পাড়ি পরবে ঠিক করে গুছিয়ে রাখোগে, নইলে তখন তাড়াহুড়া করবে।

মামীমা, আমি তোমার একটা শাড়ি পরবো।

সেকি মা, আমার শাড়ি যে সব সেকেলে ধরনের।

হউক না, সে আমার ভালো। আজ আমার জন্ম উৎসব। তোমার শাড়ি হবে আমার আশীর্বাদ।

পাগলী মেয়ে কোথাকার, যদি সখ হয়েই থাকে, তবে এই নাও চাবি, আমার ট্রাঙ্ক খুলে যে শাড়িটা তোমার পছন্দ হয় বের করে নাও।

মনিরা চাবির গোছা হাতে নিয়ে মামীমার কক্ষে চলে যায়। ট্রাঙ্কের ঢাকনা খুলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় সে। ঝকঝক করছে নানা রঙবেরঙের শাড়ি। কোনটা জরীর বুটিদার, কোনটা জরী পেড়ে, কোনটা গোটাটাই জরীর তৈরি, বেনারসী, টিস্যু, নানারকমের গাড়িতে, ট্রাঙ্ক ভর্তি।

মনিরা এক-একখানা শাড়ি বের করে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো। ট্রাঙ্কের সমস্ত শাড়ি বের করে ফেললো মনিরা। হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে গেল ট্রাঙ্কের তলায়।

সুন্দর একখানা ছবি। মনিরা সব ফেলে ফটোখানা তুলে নিল হাতে। বিস্ময়ভরা নয়নে তাকিয়ে রইলো।.পাশাপাশি দুটি মুখ। একটা বালক আর একটা বালিকা। শুভ্র জ্যোৎস্নার মত নির্মল দুটি মুখ। মনিরা ফটোখানা হাতে নিয়ে ছুটলো মামীমার কক্ষে। মরিয়ম বেগমের সম্মুখে ফটোখানা মেলে ধরে বলে মনিরা— মামীমা, এ কাদের ছবি?

মরিয়ম বেগমের দৃষ্টি ছবি খানার ওপর পড়তেই চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো, অতি কষ্টে নিজকে সংযত রেখে বলেন তিনি–ও ছবি আবার বের করলি কেন মা?

আগে বল এ ছবি কাদের?

ও ছবি তোর আর মনিরের।

মনির। সে আবার কে, মামীমা?

ওরে, সে যে আমাদের সাত রাজার ধন, হৃদয়ের মণি ছিল, আমাদের ছেলে মনির।

হঠাৎ মনে পড়ে মনিরার একটা কথা, অনেকদিন আগে মা একদিন গল্পের ছলে বলেছিল—মনিরা, তোর মামুজান আর মামীমা তোকে যে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলোরে। বড় আশা ছিল, তোকে একেবারে নিজের করে নেবে, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হলো না।

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিল মনিরা—সে কি মা, আমি কি তাদের নিজেরই নই?

মা বলেছিল—তা নয়, তা নয়। থাক, আর শুনে কাজ নেই, তুমি পড়গে যাও।

মনিরাও কম জেদী মেয়ে নয়! আব্দার ধরে বসলো—তোমাকে বলতেই হবে মা, আমি না শুনে ছাড়ছিনে।

অগত্যা বলেছিল রওশন আরা বেগম—তোর মামুজান আর মামীমার একটা ছেলে ছিল—মনির! তারই জন্য ওরা তোকে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল, আমি কথা দিয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের সকলেরই দুর্ভাগ্য সে রত্ন রইলো না।

মনিরা অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো–মনির। মামীমা, মনির ভাই খুব সুন্দর ছিল বুঝি?

মরিয়ম বেগম বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন—হ্যাঁ, অপূর্ব সুন্দর ছিল আমার মনির, যেমন তুই। তাইতো তোর মায়ের কাছ থেকে তোকে চেয়ে নিয়েছিলাম।

মামীমা, তার কি হয়েছিল?

অসুখে সে মারা যায়নি, আমার মণি নৌকাডুবি হয়ে কোথায় ভেসে গেছে।

—তার লাশ তোমরা পেয়েছিলে?

না, অনেক খোঁজাখুজি করেও তার কোন চিহ্ন আমরা পাইনি।

–গলা ধরে আসে মরিয়ম বেগমের।

মনিরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ নয়নে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে—মামীমা, এই ছবি আমার ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখবো।

তোর যদি ভালো লাগে রাখ মা, কিন্তু ও ছবি যেন আমার চোখে না পড়ে।

মনিরা ছবিখানাকে বুকে আঁকড়ে ধরে মামীমার কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

নিজের কক্ষে প্রবেশ করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখলো মনিরের ছোট্ট ফুটফুটে মুখখানা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল, সুন্দর নীল বুদ্ধিদীপ্ত দু'টি চোখ, উন্নত নাসিকা। ছোট বালক হলেও তার সমস্ত মুখে ছড়িয়ে আছে অপূর্ব এক প্রতিভা। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে মনিরা। নিজের শয্যার পাশে টাঙ্গিয়ে রাখলো ছবিখানা।

আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে চৌধুরীবাড়ি। গাড়ি বারান্দায় অগণিত গাড়ি এসে ভীড় জমেছে। মনিরা মামার পাশে দাঁড়িয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। বান্ধবীরা আসছে কেউ বা ফুলের মালা, কেউ বা ফুলের তোড়া নিয়ে মালাগুলো পরিয়ে দিচ্ছে মনিরার গলায়।

অতিথিরা প্রায় সবাই এসে পড়েছেন। পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন, মিঃ শঙ্কর রাও, গোপালবাবু, রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয় এবং তার নায়েব বাবু পর্যন্ত

উৎসবে উপস্থিত হয়েছেন। এই উৎসবে শ্রেষ্ঠ অতিথি হবেন খান বাহাদুর হামিদুল হক এবং তাঁর পুত্র মুরাদ। কিন্তু এতক্ষণেও তারা এসে পৌঁছলেন না। ভিতরে ভিতরে কিছুটা চিন্তিত হয়ে ছিল চৌধুরী সাহেব।

খান বাহাদুর হামিদুল হক একজন ধনবান ব্যক্তি, তেমনি সম্মানিত ব্যক্তিও বটে। তার একমাত্র পুত্র মুরাদ বহুদিন লণ্ডনে শিক্ষালাভ করার পর সম্প্রতি দেশে ফিরে এসেছে। চৌধুরী সাহেবের ইচ্ছা মুরাদের সঙ্গে মনিরার বিয়ে দেব। হামিদুল হক সাহেবেরও এ ইচ্ছা। মনিরার অপূর্ব সৌন্দর্য এবং মহৎ ব্যবহার তাকে মুগ্ধ করেছিল। খান বাহাদুর সাহেবের বিপুল ঐশ্বর্য। ভবিষ্যতে নিঃসন্তান চৌধুরী সাহেবের সমস্ত ধনসম্পদ মনিরারই হবে। এই কারণেই খান বাহাদুর সাহেব পুত্র লণ্ডন থেকে ফিরে না আসতেই চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা অনেকটা পাকা করে রেখেছিল।

চৌধুরী সাহেব এবং তার আত্মীয়স্বজন যদিও মুরাদকে স্বচক্ষে দেখেননি, তবু কথা দিয়েছিল। এহেন অতিথিদের আগমনে বিলম্ব দেখে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে ছিল চৌধুরী সাহেব। তিনি মনিরাকে বলেন—মা, তুমি এখন ওদিকে গিয়ে দেখাশুনা করো। আমি আরও কিছুক্ষণ এখানে অপেক্ষা করি।

মাথা দুলিয়ে বলেন মনিরা—আচ্ছা আমি যাচ্ছি। মনিরা চলে যায়।

চৌধুরী সাহেব গাড়ি বারান্দায় পায়চারী করতে থাকেন।

মনিরা হলঘরে প্রবেশ করে। সম্মানিত অতিথিগণ, যে যার আসনে বসে বসে গল্প করছেন। মনিরার কয়েকজন বান্ধবী অর্গানের পাশে রসে গানবাজনা করছে। অনেকেই হাসি গল্পে মেতে উঠেছে। মাঝখানের টেবিলের ওপর স্তুপাকার প্রেজেন্টের জিনিসপত্র। কক্ষে নীল বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। হাসিগল্পে আর অর্গানের শব্দে স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। একটু পরেই টেবিলে খাবার দেয়া হবে।

শহরের এক প্রান্তে খানবাহাদুর হামিদুল হক সাহেবের বাড়ি। লণ্ডন ফেরত পুত্র মুরাদ সাজগোজ করে বেরুতেই রাত প্রায় আটটা বাজিয়ে দিল। নিজেই ড্রাইভ করে চললো মুরাদ, পেছনের আসনে হামিদুল হক সাহেব বসে রইলেন।

নির্জন পথ বেয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে।

ঠিক সে মুহূর্তে পথের ওপাশের ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো দুটো অশ্ব, একটাতে বনহুর স্বয়ং, অন্যটাতে বনহুরের প্রধান অনুচর রহমান। দু'জনের শরীরেই অদ্ভুত কালো ড্রেস, মুখে কালো গালপাট্টা বাধা। মোটরের সম্মুখে এসে পথ আগলে দাঁড়ালো তারা।

মুরাদ সামনে বাধা পেয়ে গাড়ি রুখতে বাধ্য হলো।

বনহুর রিভলবার উদ্যত করে বলেন—নেমে এসো।

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে খানবাহাদুর সাহেবের মুখমণ্ডল। মুরাদের অবস্থাও তাই। হঠাৎ এই বিপদের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না তারা। অগত্যা গাড়ি থেকে নেমে আসতে বাধ্য হলেন খান বাহাদুর সাহেব এবং মুরাদ।

বনহুর রিভলবার ঠিক রেখে রহমানকে ইঙ্গিত করলো।

রহমান দ্রুত মুরাদের শরীর থেকে কোটপ্যান্ট-টাই খুলে নিল।

রাগে, ক্ষোভে অধর দংশন করতে লাগলো মুরাদ। সেও কম নয়, হাতে একটা অস্ত্র থাকলে দেখিয়ে দিত মজাটা কিন্তু কি করবে, নীরব থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। খান বাহাদুর সাহেব ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা কে?

দস্যু বনহুর!

এ্যাঁ বল কি! কি চাও বাবা তোমরা? আমাদের নিকট তো কোন অর্থ নেই।

অর্থ চাই না। শুধু আপনারা গাড়িটা কিছুক্ষণের জন্য নেব। বনহুর তাদের বেঁধে ফেলার ইঙ্গিত করলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রহমান মুরাদ এবং খান বাহাদুর সাহেবকে মজবুত করে বেঁধে ফেললো, তারপর একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে বসিয়ে দিলো।

বনহুর ক্ষিপ্রহস্তে মুরাদের পোশাক পরে নিল, এক জোড়া গোঁফ লাগিয়ে নিল নাকের নিচে। কালো একটা চশমা চোখে পরলো, মাথার ক্যাপটা টেনে লুকিয়ে নিল সামনের দিকে বেশি করে। বনহুরের চেহারা একেবারে পাল্টে গেল। বনহুর

এবার রহমানকে লক্ষ্য করে বলেন-আমি যতক্ষণ না ফিরে আসি, ততক্ষণ তুমি এদের পাহারায় থাকবে।

ড্রাইভ আসনে উঠে বসে গাড়িতে স্টার্ট দেয় বনহুর।

বনহুরের অজানা কিছু নেই, সে অশ্বচালনা থেকে সব কিছুই চালনা করতে জানতো। বনহুরের একটা বুইক গাড়ি ছিল, সে গাড়ি বনহুর নিজেই চালাতো। শহরে বনহুরের একটা বাড়ি ছিল। সে বাড়িতেই গাড়িখানা থাকতো। মাঝে মাঝে বনহুর দরকার হলে সে বাড়িতে থাকতো।

বনহুর গাড়ি নিয়ে ছুটে চললো।

বনহুরের গাড়ি পৌঁছতেই চৌধুরী সাহেব চিনতে পারলেন, এ গাড়ি খান বাহাদুর সাহেবের। শশব্যস্তে এগিয়ে এলেন তিনি গাড়ির পাশে কিন্তু একি, খানবাহাদুর সাহেব কই? অপরিচিত এক যুবক বসে আছে ড্রাইভ আসনে। চৌধুরী সাহেব বুঝতে পারলেন এই যুবকই খান বাহাদুর সাহেবের লণ্ডন ফেরত পুত্র মুরাদ। চৌধুরী সাহেব সহাস্যে বলেন—নেমে এসো বাবা।

মুরাদ বেশি বনহুর মাথার ক্যাপটা আরও কিছুটা সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে ছিল।

মুরাদবেশী বনহুরের চালচলন দেখে কিছুটা আশ্চর্য হলেন চৌধুরী সাহেব তবু হেসে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার আব্বা এলেন না কেন?

বনহুর বলে ওঠে-হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় আসতে পারলেন না।

ব্যথিত কণ্ঠে বলেন চৌধুরী সাহেব-বড় আফসোসের কথা। তিনিই যে আজ আমার এই উৎসবে শ্রেষ্ঠ অতিথি।

দুঃখিতভাবে বলেন বনহুর-আব্বার অসুস্থতার জন্যই এত বিলম্ব হলো।

এসো বাবা।

চৌধুরী সাহেব মুরাদবেশী বনহুরকে নিয়ে হলঘরে প্রবেশ করলেন এবং দুঃখের সাথে বলেন-একটা দুঃসংবাদ, আমার বিশিষ্ট বন্ধু খান বাহাদূর সাহেব হঠাৎ

অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি আসতে পারলেন না। তাঁর পুত্র মুরাদ এসেছে।

কক্ষের সকলেই মুরাদবেশী বনহুরের মুখে তাকালেন। মনিরাও তাকালো, বান্ধবীরা তাকে নিয়ে আলাপ-ঠাট্টা শুরু করলো, কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো মনিরা।

চৌধুরী সাহেব সকলের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন—উনি পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন।

বনহুর হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করলো।

আর ইনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ শঙ্কর রাও, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

বনহুর তাঁর সাথে হ্যাণ্ডশেক করে বলেন—আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি, মিঃ রাও।

আর ইনি রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়।

রায়বাহাদুরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেন বনহুর উনি আমার পরিচিত।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ বলে উঠেন—এ্যা। এই কণ্ঠ যেন তার কাছে পরিচিত বলে মনে হলো, কিন্তু স্মরণ করতে পারলেন না, এ কণ্ঠ কোথায় তিনি শুনেছিলো।

বনহুর রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়কে ভাববার সময় না দিয়ে বলে ওঠে— মানে আপনার সঙ্গে আমি বিশেষভাবে পরিচিত–আব্বার মুখে প্রায়ই আপনার কথা শুনেছি।

রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ আশ্বস্ত হন।

চৌধুরী সাহেব সম্মানিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মুরাদবেশী বনহুরের পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর মনিরার সঙ্গে—এটা আমার ভাগনী মনিরা।

মনিরা! নামটা শুনতেই চমকে উঠলো বনহুর। এ নামটা যেন তার বহু পরিচিত। ভাল করে তাকালো সে মনিরার দিকে। মনিরার অপূর্ব সৌন্দর্য বনহুরকে মুগ্ধ করে ফেললো। মোহগ্রস্তের মত তাকিয়ে রইলো সে।

চৌধুরী সাহেবের কণ্ঠস্বরে সম্বিৎ ফিরে এলো বনহুরের—বসসা বাবা, বসো।

বনহুর আসন গ্রহণ করলো, কিন্তু মনের কোণে একটা ধাক্কা খেতে লাগলোমনিরা কে এ মনিরা–সে মনিরা…যার ছবি এখনও তার গলায় লকেটে রয়েছে। না, না, তা হতে পারে না, কত মেয়ের নামই তো মনিরা হতে পারে।

মনিরাকে বান্ধবীরা ধরে বসলো গান শুনাবার জন্য। অগত্যা মনিরা অর্গানের পাশে গিয়ে বসলো।

গান শেষে করতালিতে ভরে উঠলো উৎসব কক্ষ। চৌধুরী সাহেব হীরার আংটি পরিয়ে দিল মনিরার হাতে।

সকলের অজ্ঞাতে বনহুরের চোখ দুটো ধক করে জ্বলে উঠলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই টেবিলে খাবার দেয়া হলো।

খাওয়া-পর্ব শেষ হবার পর বিদায়ের পালা। মুরাদবেশী বনহুর উঠে দাঁড়ালো। চৌধুরী সাহেবের সংগে হ্যাণ্ডশেক করার পর হাত বাড়ালো পুলিশ ইন্সপেক্টার হারুনের দিকে, তারপর মিঃ শঙ্কর রাওয়ের সাথে হ্যাণ্ডশেক করে নিজের গাড়িতে চেপে বসলো।

তারপর সকলেই এক এক করে বিদায় গ্রহণ করলেন। চৌধুরী সাহেব সকলকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে হলঘরে ফিরে এলেন। হঠাৎ নজর গিয়ে ছিল সম্মুখের টেবিলে। একটা নীল রঙের খাম পড়ে রয়েছে। চৌধুরী সাহেব খামখানা হাতে উঠিয়ে নিয়ে ছিড়ে ফেলেন। একখানা নীল রঙের কাগজের টুকরো বেরিয়ে এলো। তিনি আলোর সামনে কাগজখানা মেলে ধরতেই চমকে উঠলেন, সেটাতে লেখা রয়েছে মাত্র ক’টি শব্দ।

“আপনাদের উৎসবে আমি এসেছিলাম।”
–দস্যু বনহুর

মুহূর্তে চৌধুরী সাহেবের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠলো। মনিরা এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর পাশে। বজ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো-ওটা কি মামুজান?

কাগজখানা মনিরার হাতে দিয়ে বলেন চৌধুরী সাহেব—পড়ে দেখ

মনিরা কাগজখানা হাতে নিয়ে দৃষ্টি ফেলতেই অস্ফুট শব্দকরে উঠলো—দস্যু বনহুর।

হ্যাঁ, সে এসেছিল!

দস্যু বনহুর তাহলে সত্যিই এসেছিল, মামুজান?

না, এলে এ চিঠি এলো কোথা থেকে…

চৌধুরী সাহেবের কথা শেষ হতে না হতে গাড়ি-বারান্দা থেকে মোটরের শব্দ ভেসে এলো। ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটলেন চৌধুরী সাহেব। না জানি এত রাতে আবার কে এলো? গাড়ি-বারান্দায় পৌঁছতেই আশ্চর্য হলেন। এ যে খান বাহাদুর সাহেবের গাড়ি। তাড়াতাড়ি পাশে গিয়ে দেখলেন, গাড়ির মধ্যে বসে রয়েছেন খান বাহাদুর হামিদুল হক এবং ড্রাইভার আসনে একটা যুবক।

চৌধুরী সাহেব আনন্দভরা কণ্ঠে বলেন—হক সাহেব আপনি এসেছেন? আসুন, আসুন।

খানবাহাদুর ও তাঁর পুত্র মুরাদ গাড়ি থেকে নেমে ছিল।

চৌধুরী সাহেব ব্যস্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—হঠাৎ আপনার কি অসুখ হয়েছিল?

খানবাহাদুর সাহেব বলেন—চলুন সব বলছি।

চৌধুরী সাহেব ওদের সংগে করে হলঘরে প্রবেশ করলেন। খানবাহাদুর সাহেব ধপাস করে একটা সোফায় বসে পড়েন। মুরাদও বসে পড়ে আর একটা সোফায়।

চৌধুরী সাহেব বলেন—আপনি হঠাৎ নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কি হয়েছিল?

কে বলেন আমি অসুস্থ হয়েছিলাম?

আপনার পুত্র মুরাদের মুখে জানতে পারলাম...

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে ওঠেন হক সাহেব—আমার পুত্র মুরাদ?

জ্বি হ্যাঁ, কিছু পূর্বে সে চলে গেছে।

আপনি এসব কি বলছেন চৌধুরী সাহেব? আমার পুত্র মুরাদ এই তো আমার পাশে বসা, ও তো এর আগে এ বাড়িতে কোনদিন আসেনি।

একসঙ্গে চৌধুরী সাহেব আর মনিরা চমকে উঠে তাকালো পাশের সোফায় উপবিষ্ট যুবকের মুখের দিকে চেয়ে।

চৌধুরী সাহেব ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করলেন-কিছুক্ষণ পূর্বে আপনার গাড়ি নিয়ে যে যুবক এসেছিল, সে তবে আপনার পুত্র মুরাদ নয়?

না, সে আমার পুত্র নয়, সে ডাকু.. অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে চৌধুরী সাহেব—ডাকু। সে যুবকই তাহলে দস্যু বনহুর।

হ্যাঁ, সে যুবকই দুস্য বনহুর-তারপর হক সাহেব সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন।

সব শুনে চৌধুরী সাহেবের কণ্ঠতালু শুকিয়ে এলো। এখন তাহলে উপায়, নিশ্চয়ই দস্যু হানা দেবার পূর্বে অনুসন্ধান নিয়ে গেল। চিন্তিতকণ্ঠে বলেন—এক্ষুণি পুলিশ অফিসে ফোন করে দিই, সমস্ত কথা তাঁদের জানানো উচিত।

চৌধুরী সাহেব আর বিলম্ব না করে তখনই পুলিশ অফিসে ফোন করলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মিঃ হারুন কয়েকজন পুলিশসহ পুনরায় চৌধুরীবাড়িতে উপস্থিত হলেন।

চৌধুরী বাড়ি এসে সমস্ত ঘটনা শুনে থ' মেরে গেল। এত বড় কথা। যে দস্যু সন্ধানে পুলিশমহলের কারও চোখে ঘুম নেই, অহরহ যার খোজে তারা হন্তদন্ত হয়ে শহরময় ছুটাছুটি করে মরছে, সে দস্যু বনহুর তাদের পাশে বসে একসঙ্গে খাবার খেয়ে গেল, এমন কি হাতে হাত মিলিয়ে হ্যাণ্ডশেক পর্যন্ত করে গেল। ছিঃ ছিঃ, এর চেয়ে লজ্জার কথা কি হতে পারে। প্রখ্যাত ডিটেকটিভ শঙ্কর রাওয়ের

চোখে পর্যন্ত ধূলি দিয়ে ছেড়েছে সে। এখন আর কি আছে, কয়েকজন পুলিশকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা রেখে ফিরে এলেন।

.

নিশীথ রাত।

গোটা বিশ্ব সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে।

বনহুরের অশ্ব চৌধুরীবাড়ির পেছনে এসে থামলো। তার শরীরে কালো ড্রেস, মাথায় পাগড়ী, মুখে কালো রুমাল বাঁধা।

আজ কদিন থেকে চৌধুরীবাড়ির কারও চোখে ঘুম নেই। চৌধুরী সাহেব স্বয়ং গুলিভরা রিভলবার হাতে হলঘরে পায়চারী করে করে রাত কাটান। মরিয়ম বেগমের চোখেও ঘুম নেই। গোটা রাত তাঁর অভ্রিয় কাটে। শুধু বিছানায় শুয়ে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করেন। হীরার আংটির জন্য তার কোন চিন্তা নেই, চিন্তা যত মনিরাকে নিয়ে দস্যু বনহুর হঠাৎ কিছু না অমঙ্গল ঘটিয়ে বসে।

মনিরা নিজের কক্ষে শুয়ে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। ঘুমাতে গিয়ে চমকে ওঠে সে। না জানি কোন মুহূর্তে তার হীরার আংটি লুটে নেবে হয়ত তাকে জীবনে মেরে ফেলতেও পারে। দস্যুর অসাধ্য কিছু নেই। ভয়ভীতি নিয়ে প্রহর গুণে মনিরা, তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

মনিরা হীরার আংটি আংগুলে রাখার সাহস পায়নি। আলমারীতে রেখে তালাবন্ধ করে দিয়েছে। দ্য হানা দিলে হীরার আংটি নিয়ে যাবে, তবু তার শরীরে যেন আঘাত না পায়।

আজ ক’দিন হলো মনিরা ঘুমায়নি, তাই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছে আজ মনিরা।

হলঘর থেকে চৌধুরী সাহেবের জুতোর শব্দ ভেসে আসছে। পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে মরিয়ম বেগমের চুড়ির টুনটান শব্দ। সদর গেটে সশস্ত্র পুলিশ দণ্ডায়মান।

জানালার শার্সী খুলে কক্ষে প্রবেশ করে বনহুর। ধীরে ধীরে অতি লঘু পদক্ষেপে মনিরার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। প্যান্টের পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে মনিরার নাকের সামনে ধরলো তারপর মনিরার বালিশের তুলা থেকে চাবির গোছা বের করে নিয়ে এগিয়ে চলে আলমারীর দিকে। অল্পক্ষণেই আলমারী খুলে বের করে আনে সে বহু মূল্যবান হীরার আংটি।

কক্ষে একটা নীলাভ ডিমলাইট জ্বলছিল, সে আলোতে বনহুরের হাতে হীরার আংটিটা ঝকঝক করে উঠে। আংটিটা প্যান্টের পকেটে রেখে এগিয়ে যায় সে মনিরার বিছানার পাশে। ছিন্নলতার ন্যায় মনিরার সুকোমল দেহখানা বিছানায় লুটিয়ে আছে। এলোমেলো চুলগুলো ছড়িয়ে আছে ললাটের চারপাশে। অপূর্ব দেখাচ্ছিল মনিরাকে। বনহুর নির্নিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর চলে যাবার জন্য যেমনি সে ফিরে দাঁড়াতে যায়, অমনি নজর গিয়ে পড়ে তার দেয়ালের ওপর। বিস্ময়ে চমকে ওঠে বনহুর। একি! এ তারই লকেটের ছবি। পাশাপাশি দুটি মুখ, সে আর মনিরা। আশ্চর্য! এ ছবি এখানে এলো কি করে? বনহুর নিজের গলার মালাছড়া জামার নিচে হতে টেনে বের করলো, তারপর লকেটের ঢাকনা খুলে ফেললো। একবার তাকালো সে দেয়ালের ছবিখানার দিকে তারপর পকেটে। এ যে একই ছবি! না, কোন ভুল নেই। তবে কি এই তার সে মনিরা, যে মনিরা শিশুকালে তার হৃদয় জয় করে নিয়েছিল? বনহুর ঝুঁকে ছিল মনিরার মুখের ওপর। এইতো সে তিলটা এখনও রয়েছে তার চিবুকের একপাশে। লকেটের ছবিখানার দিকে লক্ষ্য করে আশ্বস্ত হলো সে, এই তার সে মনিরা। আনন্দে বনহুরের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ফিরে পেয়েছে সে, তার মনিরাকে তাহলে ফিরে পেয়েছে। বনহুর বসে ছিল মনিরার পাশে, সযতে মনিরার ললাট থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে ভাল করে দেখতে লাগলো। কতদিন, কত যুগ পরে সে যেন ফিরে পেল তার মনিরাকে। বনহুরের ঠোট দু'খানা মনিরার ললাট স্পর্শ করলো।

এবার বনহুর মনিরার সুকোমল হাতখানা তুলে নিল হাতে, তারপর প্যান্টের পকেট থেকে বের করে আনলো হীরার আংটিটা, অতি যত্নে পরিয়ে দিল সে মনিরার আঙ্গুলে।

একটুকরা কাগজ বের করে তাতে লিখল–

"আমি এসেছিলাম" –দস্যু বনহুর।

কাগজখানা মনিরার বিছানার পাশে রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে।

.

বনহুরের অশ্ব গিয়ে থামতেই ছুটে এলো নূরী। বনহুরকে হাত ধরে নামিয়ে নিল সে। তারপর হেসে বলেন–এনেছো আমার হীরার আংটি?

চলতে চলতে বলে বনহুর–আনতে পারলাম না, একজন কেড়ে নিল।

মিথ্যা কথা। দস্যু বনহুরের কাছ হতে কেউ যে কিছু কেড়ে নিতে পারবে–এ আমি বিশ্বাস করতে পারিনে।

কেন? আমার চেয়ে কেউ কি বীরপুরুষ নেই?

না, আমার কাছে সব পুরুষের চেয়ে তুমিই শক্তিমান।

নূরীর কথায় হাসলো বনহুর। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলেন–তোমার এ বিশ্বাস অটুট রইলো কই! হীরার আংটি হাতে পেয়েও তোমার নিকট পৌঁছাতে পারলাম না।

নূরী বনহুরের দক্ষিণ হাত চেপে ধরলো সত্যি তুমি হীরার আংটি হাতে পেয়েও–

হ্যাঁ নূরী, আমি পরাজিত হয়েছি।

না, এ আমি বিশ্বাস করি না হুর, এ আমি বিশ্বাস করি না—

নূরী, সামান্য একটা হীরার আংটি তোমাকে এতখানি মোহগ্রস্ত করে ফেলেছে?

না হুর, শত শত হীরার আংটি আমার কাছে তুচ্ছ। আমি কিছুতেই ভাবতে পারিনে দস্যু বনহুরকে কেউ পরাজিত করতে পারে। তুমি সত্যি করে বল, কারও কাছে তুমি হেরে যাওনি?

নূরী, তোমার বিশ্বাস যেন অটুট থাকে। ইনশাআল্লাহ বনহুর কারও কাছে শুক্তির দিক দিয়ে পরাজিত হবে না।

নূরী আনন্দে অস্ফুটধ্বনি করে ওঠে-হর!

নিজের কক্ষে প্রবেশ করলো বনহুর। নূরী তার শরীর থেকে দস্যুর ড্রেস খুলে নেয়, তারপর উভয়ে বসে পড়ে পাশাপাশি। নূরী বনহুরের চুলে আংগুল বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, তুমি সত্যি বীরপুরুষ। তোমার শক্তির কাছে সমস্ত লোক পরাজিত, তোমার বুদ্ধির কাছে সবাই হেয়! হাজার হাজার লোকের চোখে ধূলো দিয়ে তুমি তোমার সাধনা পূর্ণ করে চলেছে। শত শত পুলিশবাহিনী তোমাকে পাকড়াও করার জন্য অহরহ ক্ষিপ্তের ন্যায় ছুটাছুটি করছে। কেউ তোমাকে আজও পাকড়াও করতে সক্ষম হলো না। তোমার এই ভূতপূর্ব বীরত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি। খোদা তোমাকে চিরদিন এমনি করে জয়ী করুন।

নূরী, তুমিই শুধু আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। আর কেউ আমার মঙ্গল কামনা করে না। সবাই চায় দস্যু বনহুরের পতন!

ছিঃ! ও কথা মুখে এনো না হুর; আমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগে, তোমার অমঙ্গল আমার কাছে মৃত্যুর চেয়েও কষ্টদায়ক।

বনহুর অবাক নয়নে তাকালো নূরীর অশ্রুসিক্ত চোখ দুটির দিকে। নূরী তাকে এত ভালবাসে কিন্তু ধীরে ধীরে নূরীর মুখ খানা মিলিয়ে গিয়ে সেখানে ভেসে ওঠে একটা সুন্দর ফুলের মত কোমল ঘুমন্ত মুখ। বনহুর দৃষ্টি নত করে কি যেন ভাবতে লাগলো।

নূরী বলেন—হুর, আজ তোমাকে যেন কেমন ভাবাপন্ন লাগছে। কি হয়েছে তোমার?

বললাম তো কিছু না। তুমি যাও নূরী, আমি এখন বিশ্রাম করবো।

কেন, আমি থাকলে তোমার কি খুব অসুবিধা হচ্ছে? আমি যাই। অভিমান ভরে উঠে দাঁড়ায় নূরী।

অন্যদিন হলে বনহুর ওর হাত চেপে ধরে পুনরায় বসিয়ে দিত কিংবা নিজেও উঠে দাঁড়িয়ে বলত—চললো আমিও যাই তোমার সঙ্গে, কিন্তু আজ বনহুর নীরব থেকে যায়।

নূরীর চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যায় সে।

বনহুর বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে দেয়, তারপর ধীরে ধীরে বুজে আসে ওর চোখের পাতা।

আড়ালে দাঁড়িয়ে নারী তাকিয়ে থাকে বনহুরের মুখে। বনহুরকে নিয়ে সে রচনা করে চলেছে এক স্বপ্নসৌধ। নূরীর মন চলে যায় দূরে, অনেক দূরে–সেখানে শুধু সে আর বহুর। কিন্তু বনহুরকে সে যতই আঁকড়ে ধরতে চায়, ততই যেন সে সরে পড়ে দূরে। কিছুতেই নূরী বনহুরের নাগাল পায় না। বিগত দিনের স্মৃতি হাতড়ে চলে নূরী। কিন্তু সেখানেও ফাঁকা লাগে, বনহুরের নাগাল সে কোনদিন পায়নি। কোথায় যেন ব্যবধান আছে দু'জনের মধ্যে।

আর ভাবতে পারে না নূরী, সমস্ত ভাবনা যেন তার খই হারিয়ে ফেলে। ধীরে ধীরে চলে যায় সে নিজের ঘরে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবে নূরী কত কথা, সে ছোট্ট হতে এত বড় পর্যন্ত। সব সময় সে বনহুরকে দেখে আসছে। এক সঙ্গে খেলা করেছে, এক সঙ্গে খেয়েছে, ঝর্ণায় সাঁতার কেটেছে, কিন্তু কৈ, বনহুরকে সে তো কোনদিন নিজের করে পায়নি। ব্যথায় গুমড়ে কেঁদে ওঠে নূরীর মন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে সে। বিশেষ করে আজকের কথাটা তার হৃদয়ে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নূরী, হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেংগে যায় তার, দেখতে পায় তার কক্ষের জানালার শিক বাঁকিয়ে কক্ষে প্রবেশ করতে যাচ্ছে একটা হিংস্র বাঘ। অন্ধকারে বাঘের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। মাত্র আর একটা শিক বাঁকাতে পারলেই বাঘটা তার কক্ষে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে।

নূরী ভয়ার্ত কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলো।

পাশের কক্ষে ঘুম ভেংগে গেল বনহুরের। নূরীর কক্ষ লক্ষ্য করে ছুটে চললো সে। কিন্তু পূর্বেই বাঘটা জানালার শিক ভেংগে কক্ষে প্রবেশ করলো।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করতেই বাঘটা লাফিয়ে ছিল তার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে বনহুর পড়ে গেল মাটিতে। নূরী আর্তনাদ করে দু'হাতে চোখ টাকলো। কিন্তু পরক্ষণেই নিজকে সামলে নিয়ে নিজের কোমর থেকে ছোরা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল বনহুরের দিকে। বনহুর ছোরাখানা লুফে নিয়ে বসিয়ে দিল বাঘটার বুকে। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি চললো বাঘ আর বনহুরের মধ্যে।

ততক্ষণে কক্ষে আরও বহু দস্যু এসে জড়ো হয়েছে। বাঘটা তখন ঢলে পড়লো মেঝেতে। বনহুর গায়ের. ধূলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু তার শরীরে কয়েকটা স্থান ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরছে দরদর করে।

নূরী এ দৃশ্য সহ্য করতে পারলো না, ছুটে এসে দু'হাতে নিজের ওড়নার কাপড় ছিড়ে বেঁধে দিতে লাগলো ওর ক্ষত স্থানগুলো। অন্যান্য দস্যু বনহুরের এই বীরত্বে আশ্চর্য হয়ে যায়। তারা ভাবতেও পারেনি তাদের সর্দার এত বড় একটা বাঘকে একাই সাবাড় করতে পারবে। সবাই বনহুরের জয়ধ্বনি করে ওঠে।

.

ভোরে ঘুম ভাঙতেই চোখ মেলে তাকালো মনিরা। মুক্ত জানালা দিয়ে ভোরের মিষ্টি হাওয়া তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালো। হাই তুলে উঠে বসলো সে। হঠাৎ তার নজর ছিল হাতের আংগুলে। একি! হীরার আংটি তার আংগুলে এলো কি করে? সে যে আলমারীতে উঠিয়ে রেখেছিল আংটিটা! তাড়াতাড়ি বালিশের তলায় হাত দিয়ে চাবি গোছা নিতে যায়, কিন্তু কোথায় চাবির গোছা! আলমারীর কপাটে চাবির গোছা ঝুলছে!

মনিরার বেশ স্মরণ আছে, শোবার পূর্বেও সে বালিশের তলায় চাবির গোছা হাত দিয়ে অনুভব করে নিয়ে তবেই শুয়েছে। তবে কি ঘরে কেউ এসেছিল? দরজার দিকে তাকালো সে। দরজা যেমন খিল দিয়ে আটকানো ছিল, ঠিক তেমনি আছে। ঘরে তাহলে কেউ আসেনি। মনিরা ধড়মড় করে শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো, অমনি তার নজর গিয়ে পড়ে বিছানার পাশে একটা কাগজের টুকরা পড়ে আছে। কাগজখানা হাতে উঠিয়ে নিয়ে এলোদস্যু বনহুর এসেছিল!

ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে পুনরায় তাকালো সে নিজের আংগুলে। দস্যু বনহুর তাহলে হীরার আংটি গ্রহণ না করে তার আংগুলে পরিয়ে দিয়ে গেছে। এর উদ্দেশ্য কি? অপমান, ঘৃণায় রি রি করে উঠলো মনিরার শরীর। কেন সে হীরার আংটি নিয়ে গেল না, কেন সে তাকে স্পর্শ করলো? এতই ঘুমিয়ে পড়েছিল সে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কি করে সে এক কথা মামুজান আর মামীমার কাছে বলবে। একটা দস্যু তার আংগুলে আংটি পরিয়ে দিয়ে যাবে–!

মনিরা দরজা খুলে মামীমার কক্ষে প্রবেশ করলো।

মরিয়ম বেগম কন্যা-সমতুল্যা ভাগ্নীকে হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছে মনিরা?

মনিরা ব্যস্তসমস্ত কণ্ঠে বলেন—এই দেখ মামীমা, আমার হীরার আংটি আলমারীতে রেখেছিলাম, কিন্তু রাতে আমার হাতের আংগুলে এসে পড়েছে।

কি আশ্চর্য কথা, এসব কি বলছিস তুই?

সত্যি মামীমা আলমারীতে হীরার আংটি বন্ধ করে রেখে ঘুমিয়েছিলাম, কিন্তু ভোরে দেখি হীরার আংটি আঙ্গুলে, আর চাবির গোছাও বালিশের তলায় নেই, আলমারীর গায়ে ঝুলছে।

সর্বনাশ, এ যে অদ্ভুত কথা!

এই দেখ-বনহুরের লেখা কাগজখানা মরিয়ম বেগমের হাতে দেয় মনিরা—এটা পড়ে দেখ।

কাগজখানা হাতে নিয়ে দৃষ্টি বুলাতেই অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন মরিয়ম বেগম—একি, দস্যু বনহুর এসেছিল।

ততক্ষণে মরিয়ম বেগমের আর্তচিৎকার শুনে ছুটে আসেন চৌধুরী সাহেব-কি হলো, কি হলো?

ওগো, দ্য হানা দিয়েছিল।

দস্যু!

হ্যাঁ, দস্যু বনহুর মনিরার কক্ষে হানা দিয়েছিল।

হীরার আংটি নিয়ে গেছে?

না গো, না।

তাহলে সে হীরার আংটি নিতে পারেনি?

নিয়েও নেয়নি। তার মানে?

এবার বলে মনিরা—মামুজান, রাতে শোবার পূর্বে আংটি খুলে আলমারীতে বন্ধ করে চাবির গোছাটা বালিশের তলায় রেখেছিলাম। ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি, আংটিটা আমার হাতের আংগুলে এসে গেছে, চাবির গোছা যেখানে রেখেছিলাম সেখানে নেই, আলমারীর গায়ে ঝুলছে। বিছানায় পড়ে আছে এই কাগজের টুকরাটা, পড়ে দেখ মামুজান।

কাগজের টুকরাখানায় নজর বুলিয়ে গম্ভীর হয়ে পড়েন চৌধুরী সাহেব। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর বলেন–এত সতর্কতার মধ্যেও সে আসতে পারলো! হলঘরে আমি, বাড়ির ভিতরে বন্দুকধারী পাহারাদার, সদর গেটে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। এর মধ্যেও দস্যু বনহুর হানা দিতে পারলো? হীরার আংটি নেয়নি সে, কিন্তু এমন কিছু নিয়ে গেছে, যা

হীরার আংটির চেয়েও মূল্যবান। দেখ দেখি, আমার ঘরের সিন্দুকটা।

সকলে ছুটলো চৌধুরী সাহেবের শোবার ঘরে। সে ঘরের জিনিসপত্র যেটা যেখানে সে রকমই আছে, সিন্দুকের পাশেও কেউ যায়নি। আশ্বস্ত হলেন চৌধুরী সাহেব।

মরিয়ম বেগম বলেন—দস্যু বনহুর হানা দিয়ে কিছু না নিয়েই চলে গেল, সত্যি বড় আশ্চর্যের কথা।

হ্যাঁ, অদ্ভুত ব্যাপার, যাক পুলিশ অফিসে ফোন করছি–বলেন চৌধুরী সাহেব।

মনিরা বলে ওঠে—কি দরকার মামুজান, সে যখন কোন অন্যায় করেনি, তখন অযথা এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে আর লাভ কি?

মরিয়ম বেগম বলে ওঠেন—না মনিরা, তা হয় না। বাড়িতে আরও কড়া পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে। শয়তানটা সুযোগ বুঝে আবার সর্বনাশ করে বসবে। হায় একি হলো, দস্যু বনহুরের নজর শেষ পর্যন্ত আমাদের ওপর এসে পড়ল। ওগো, তুমি পুলিশকে সব জানিয়ে আরও পাহারার ব্যবস্থা করো। আমি যে আর ভাবতে পারছি না। মরিয়ম বেগম মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

.

স্বামীকে খেতে দিয়ে বলেন মরিয়ম বেগম—ওগো, সেদিন মনিরার জন্ম-উৎসবে খানবাহাদুর সাহেব আর তার ছেলে মুরাদ ঠিকভাবে যোগ দিতে পারেননি, হঠাৎ এ দস্যুটা কি কাণ্ডই না করেছিল, আর একদিন ওদের দাওয়াত করে এসো না?

খেতে খেতে বলেন চৌধুরী সাহেব ঠিক বলছ। সে কথা আমার মনেই ছিল না। আজই আমি ফোন করে দেব, কাল বিকেলে তাঁরা যেন আসেন।

হ্যাঁ, তাই কর। কিন্তু কেবল ফোন করলে হবে না, তুমি নিজে গিয়ে দাওয়াত করে এসো। যা হউক দু'দিন পর মনিরাকে যখন মুরাদের হাতে স'পে দিতে হবে, তখন আগে থেকে ওদের মধ্যে একটা আলাপ-পরিচয় হওয়া ভাল।

তাহলে আমিই যাব?

আড়ালে দাঁড়িয়ে মনিরা মামুজান আর মামীমার কথা শুনে। কি জানি কেন যেন ভালো লাগে না মনিরার। সেদিন সে মুরাদকে ভালোভাবে লক্ষ্য করেছে, কিন্তু কৈ তার মনের কোণে ওর ছবি তো রেখাপাত করেনি? কোন আকর্ষণ অনুভব করেনি মনিরা হৃদয়ে। ধীরে ধীরে মনিরা চলে যায় নিজের কক্ষে। বিছানায় গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে, তাকায় সে ছবিখানার দিকে। নিস্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকে মনিরা। কি সুন্দর দুটি চোখ, অপূর্ব অদ্ভুত! মনিরার চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে, সত্যই কি মনির নদীর স্রোতে ভেসে গেছে, মারা গেছে সে? না না, সে হয়তো বেঁচে আছে, মস্ত বড় যুবক হয়েছে সে, আরও সুন্দর হয়েছে হয়তো কিন্তু কি করে তা হতে পারে। গভীর পানিতে ক্ষুদ্র একটা বালক কি করে বাঁচতে পারে? মনিরার মন যেন ডেকে বলে সে বেঁচে আছে, নইলে তার লাশ পাওয়া যেত। গভীর চিন্তার অতলে তলিয়ে যায় মনিরা।

.

খানবাহাদূর সাহেব আর মুরাদকে দাওয়াত করে এসেছেন চৌধুরী সাহেব। আজ বিকেলে আসবেন তাঁরা। মরিয়ম বেগম স্বহস্তে পাকশাক করছেন। চৌধুরী সাহেবের ব্যস্ততার সীমা নেই।

মরিয়ম বেগমের পাক শেষ হতে বেলা গড়িয়ে এলো। তিনি ছুটলেন মনিরার কক্ষে। তার চুল বাঁধা, কাপড় পরা শেষ হলো কিনা দেখতে, কিন্তু মনিরার কক্ষে

প্রবেশ করে অবাক হলেন তিনি। মনিরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছে। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে বালিশের উপরে! একখানা অপরিপাটি কাপড় পরনে। মরিয়ম বেগম রাগতকণ্ঠে বলেন—মনিরা, একি, এখনও তুমি শুয়ে আছ? ওঁদের যে আসার সময় হলো? বই থেকে মুখ না তুলেই বলে মনিরা—কাদের আসার সময় হলো মামীমা?

সে কি, খানবাহাদূর সাহেব আর তার ছেলে মুরাদ আসবে যে!

তাতে আমার কি?

আশ্চর্য করলি মনি, তাতে তোর কি, তা জানিসনে?

না তো? বই রেখে উঠে বসে মনিরা।

মুরাদের মত এত, উচ্চশিক্ষিত ছেলেকে কেন আমরা এত সমাদর করছি, এ কথা খুলে বলতে হবে তোকে?

বুঝেছি, আমি তোমাদের গলগ্রহ হয়েছি।

ছিঃ ছিঃ,! ওসব কি বলছিস মনি।

হ্যাঁ মামীমা, আমি তোমাদের চোখের বালি হয়ে পড়েছি। নইলে তোমরা আমাকে তাড়ানোর জন্য এত উঠে পড়ে লেগেছো কেন?

মরিয়ম বেগম মনিরার পাশে এসে বসে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন—আমরা তোমাকে তাড়ানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছি, এসব কি বলছো মনিরা? লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি ছাড়া আর কে আছে এই বুড়ো-বুড়ীর?

তবে যে সব সময় বিয়ে আর বিয়ে করে ব্যস্ত হচ্ছো?

পাগলী মেয়ে! এখন বড় হয়েছে, বিয়ে করতে হবে না?

না, আমি বিয়ে করবো না।

তা হয় না মনি, মেয়েছেলে কোনদিন বাপ-মার ঘর আগলে থাকতে পারে না। কথাটা একটু কঠিন কণ্ঠেই বলেন মরিয়ম বেগম।

মনিরাও অভিমানভরা গলায় বলে—মামীমা, তোমাদের ঘর আগলে থাকতে চাইনে। আমি বিয়েও করতে চাইনে।

মনিরা তুমি কচি খুকি নও। বয়সও তোমার কম হয়নি। সব বুঝতে শিখেছ, মুরাদের মত একটা সর্বগুণে গুণবান ছেলেকে হেলায় হারাতে পারি না। তুমি কাপড়-চোপড় পরে নিচে নেমে এসো।

এমন সময় চৌধুরী সাহেব কক্ষে প্রবেশ করেন—একি মা মনি এখনও তোমার হয়নি। লক্ষী মা আমার, চট করে জামাকাপড় পরে নাও।

মরিয়ম বেগম বেরিয়ে গেল। চৌধুরী সাহেব কন্যা-সমতুল্য ভাগনীকে আদর করে আরও বলেন—তারপর নেমে গেল নিচে।

মামুজান আর মামীমা বেরিয়ে যেতেই পুনরায় বইখানা মেলে ধরে মনিরা চোখের সামনে। কিন্তু মন আর বসে না, কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করে। বই রেখে উঠে পড়ে, কিছুক্ষণ মুক্ত জানালায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে নীল আকাশের দিকে। শুভ্র বলাকার মত ডানা মেলে সাদা সাদা মেঘগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে, সে দিকে তাকিয়ে কত কথা ভাবে সে।

হঠাৎ নিচে গাড়ি-বারান্দা থেকে ভেসে আসে মোটরগাড়ির শব্দ! মনিরা বুঝতে পারে, খান বাহাদূর এবং তার পুত্র মুরাদ পৌঁছে গেছেন। নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনিরা ড্রেসিংরুমে প্রবেশ করে। ড্রেসিংরুম থেকে যখন মনিরা বাইরে বেরিয়ে এলো তখন তাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। নিচে নেমে আসতেই শুনতে পেল চৌধুরী সাহেব বলছেন—ঠিক কথাই বলছেন খান বাহাদুর সাহেব, শুভ কাজ যতো শীঘ্র হয় ততোই ভালো। মনিরাকে যখন আপনার এত পছন্দ তখন কথা শেষ হয় না চৌধুরী সাহেবের, মনিরাকে দেখতে পেয়েই সহাস্যে বলেন—এই যে মা মনি এসে গেছে। এত বিলম্ব করলে কেন মা?

খান বাহাদুর সাহেবও চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে বলেন–কখন থেকে আমরা তোমার প্রতীক্ষা করছি মা বসে বসে।

মুরাদ সেদিন এভাবে মনিরাকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেনি, আজ মনিরাকে দেখে মুগ্ধ হলো সে। উঠে দাঁড়িয়ে সাহেবী কায়দায় মনিরাকে সম্ভাষণ জানালো।

মনিরা কোন উত্তর না দিয়ে একটা সোফায় বসে ছিল।

এ কথা সে কথার মধ্য দিয়ে খাওয়া দাওয়া শেষ হলো।

মুরাদ এক সময় বলে বসলো—চলুন না মিস মনিরা, একটু বেড়িয়ে আসি।

চৌধুরী সাহেব বলে ওঠেন—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, যাও মা একটু বেড়িয়ে এসো!

মনিরা মৃদুকণ্ঠে বলেন—মামুজান, আজ আমার শরীর ভালো নেই।

খান বাহাদুর সাহেব হেসে বলেন—বাইরের হাওয়াতে শরীর সুস্থ বোধ হবে, যাও মা যাও।

মরিয়ম বেগমও তাদের সঙ্গে যোগ দিল—মুরাদ যখন বলছে, তখন যাও মনিরা!

মনিরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালো।

মুরাদ খুশি হলো। আনন্দসূচক শব্দ করে বলেন—থ্যাঙ্ক ইউ, চলুন মিস মনিরা।

ড্রাইভ আসনের দরজা খুলে ধরে বলে মুরাদ-উঠুন।

মনিরা তার কথায় কান না দিয়ে পেছনের আসনে উঠে বসলো।

মুরাদ মনে মনে একটু ক্ষুন্ন হলেও মুখখাভাবে তা প্রকাশ না করে ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

গাড়ি ছুটে চলেছে।

মুরাদ সিগারেট থেকে একরাশ ধোঁয়া পেছন সিটের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলেন—এখন কি সুস্থ বোধ করছেন?

মনিরা সে কথার জবাব না দিয়ে বলেন—চলুন কোথায় যাব।

মৃদু হাসলো মুরাদ—কোথায় যেতে ইচ্ছে বলুন তো? ক্লাবে, না লেকের ধারে।

ক্লাবে আমি যাই না।

কেন? বাঙ্গালী মেয়েদের যত গোঁড়ামি। বিশ্রী ব্যাপার! বিলেতে কিন্তু এসব নেই। চলুন লেকের ধারেই যাওয়া যাক।

লেকের ধারে এসে মুরাদের গাড়ি থেমে ছিল। নেমে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে ধরে বলেন–আসুন।

মনিরা নেমে চলতে শুরু করলো।

লেকের ধারে গিয়ে বসে ছিল মনিরা। মুরাদও বসলো তার পাশে, ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো সে।

মনিরা বিরক্তি বোধ করলো, সরে বসলো সে।

মুরাদ হেসে বলেন—মিস মনিরা, আমি বুঝতে পারিনে এ দেশের মেয়েরা এত লজ্জাশীলা কেন——আমি বিলেতে সাত বছর কাটিয়ে এলাম কিন্তু কোন মেয়ের মধ্যে এমন জড়তা দেখলাম না, ওরা যে কোন পুরুষের সঙ্গে প্রাণখোলা ব্যবহার করতে পারে।

মনিরা গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে—মিঃ মুরাদ, আমি সেজন্য দুঃখিত। মেয়েদের অত স্বাধীনতা আমি পছন্দ করিনে।

ছিঃ! ছিঃ আপনি দেখছি একদম সেকেলে ধরনের! মেয়েরাই তো আজকাল দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে আনছে। তারা এখন পুরুষের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে শিখেছে, তাইতো দেশ ও জাতির এত…

মুরাদের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে মনিরা—অইতে দেশ ও জাতির এত অবনতি।

অবনতি! এ আপনি কি বলছেন মিস মনিরা?

হ্যাঁ মিঃ মুরাদ, বিশেষ করে আমার চোখে।

তার মানে?

মানে মেয়েরা আজকাল বিলেতী চাল ধরেছে! বিলেতী চাল চালতে গিয়ে এত অধঃপতনে নেমে গেছে তারা, যা বলার নয়। এমন সব উদ্ধৃষ্ট পোশাক-পরিচ্ছদ

পরতে শুরু করেছে তারা, যা মুসলিম সমাজের কাছে অত্যন্ত হেয়। টেডী পোশাক পরতে গিয়ে মেয়েরা প্রায় উলঙ্গ হয়েই চলাফেরা করছে। আর দু'দিন পর তারা যে আরও কত নিচে নেমে যাবে, ভাবতেও মনে ঘৃণা জন্মে।

মুরাদ আশ্চর্য হয়ে শুনছিল মনিরার কথাবার্তা। হেসে বলেন—মিস মনিরা, আপনি দেখছি বড় নীরস ধরনের মেয়ে। টেডী পোশাক মানুষকে কত মানায়, বিশেষ করে মেয়েদের। মিস মনিরা, আপনি এসব অনুভব করতে পারেন না।

আমি অনুভব করতে চাইনে। চলুন, এবার ওঠা যাক।

সেকি! এরি মধ্যে উঠতে চাচ্ছেন? মিস মনিরা, সত্যি আপনার অপরূপ সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। যদিও আপনার মন সেকেলে ধরনের কিন্তু আপনার চেহারা একেলে মেয়েদের চেয়ে অনেক সুন্দর। বিলেতী মেয়েরা কোন ছার!

দেখুন আমার সৌন্দর্যের প্রশংসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু পুনরায় আমি একথা শুনতে চাইনে।

মিস মনিরা, অদ্ভুত মেয়ে আপনি। আমি জীবনে বহু মেয়ের সঙ্গে মিশার সুযোগ লাভ করেছি, আপনার মত আশ্চর্য মেয়ে আমি কোনদিন দেখিনি। সে সব মেয়েরা পুরুষের মুখে নিজেদের প্রশংসা শুনার জন্য সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে।

প্লীজ মিঃ মুরাদ শুনতে চাইনে। উঠে দাঁড়ায় মনিরা।

মুরাদ চট করে ওর হাত চেপে ধরে—আমি উঠতে দিলে তো উঠবেন! বসুন আমার পাশে।

মনিরা বিরক্ত হয়, তবু বসে পড়ে বলে—সন্ধ্যা হয়ে এলো, মামুজান উদ্বিগ্ন হবেন।

হেসে ওঠে মুরাদ হাঃ হাঃ করে—কি যে বলেন মিস মনিরা, আপনার মামুজান নিশ্চিন্ত আছেন। আসুন, এই সন্ধ্যেটা আমরা লেকের নিরিবিলিতে কাটিয়ে যাই। মনিরার হাত ধরে আকর্ষণ করে মুরাদ।

মুরাদের কণ্ঠস্বর আর মনোভাব বুঝতে পেরে মনে মনে শিউরে ওঠে মনিরা। অস্বস্তি বোধ করে সে। এ জনহীন নির্জন লেকের ধারে একটা জঘন্য যুবকের

পাশে মনিরা নিজকে বড় অসহায় মনে করে। সে হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে।

কিন্তু মুরাদের বলিষ্ঠ হাতের মুঠা থেকে কিছুতেই নিজের হাতখানাকে মুক্ত করে নিতে পারে না মনিরা। ঠিক সে মুহূর্তে কোথা হতে একটা তীরফলক এসে বিধে গেল মুরাদের পায়ের কাছে মাটিতে।

মুরাদ মনিরার হাত ছেড়ে দিয়ে তাকালো চারদিকে, কিন্তু কোথাও কোন জনপ্রাণী নজরে পড়ে না।

মুরাদ তীরখানা হাতে উঠিয়ে নিতেই দেখতে পায়, সেটাতে এক টুকরা কাগজ আটকানো রয়েছে। তাড়াতাড়ি কাগজখানা খুলে নিয়ে মেলে ধরে চোখের সম্মুখে। যদিও সন্ধ্যার অন্ধকার ঝাপসা হয়ে এসেছে, তবু বেশ নজরে পড়ে, কাগজখানায় লেখা আছেঃ

'সাবধান'
–দস্যু বনহুর

.

মুরাদের হাত থেকে কাগজখানা খসে পড়ল! ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠলো তার মুখমণ্ডল।

মনিরা বুঝতে পারে নিশ্চয়ই এই কাগজে এমন কিছু আছে, যা মুরাদের মত শয়তানকেও ভীত করে তুলেছে। মনিরার মুখখানাও বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। ভয়-জড়িত কণ্ঠে বলে মনিরা—চলুন এবার ফেরা যাক।

ঢোক গিলে বলে মুরাদ—চলুন।

গাড়িতে বসে ভাবে মনিরা, দস্যু বনহুর তাহলে তার পিছু নিয়েছে। কি ভয়ঙ্কর কথা! তবু মনে মনে বনহুরকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারে না সে, বনহুর যদি সে মুহূর্তে ঐ তীর ছুঁড়ে সাবধান করে না দিত তাহলে কি যে হত! মুরাদের কবল থেকে কিছুতেই নিজকে রক্ষা করতে পারতো না। মনে প্রাণে খোদাকে ধন্যবাদ জানায় মনিরা।

গাড়িতে বসে আর কোন কথা হয় না। কারণ ইতোপূর্বে মুরাদ একবার দস্যু বনহুরের কবলে পড়েছিল। কত ভয়ানক এ দস্যু বনহুর সে জানে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে গাড়ি চালিয়ে চলে সে।

.

দস্যু বনহুরের আস্তানা।

একটা সুউচ্চ আসনে দস্যু বনহুর উপবিষ্ট। সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান তার অনুচরবৃন্দ। মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, যেখানে পাকার করে রাখা হয়েছে সেদিনের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—আজ তোমরা যা লুট করে এনেছে তা গরীব-দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করে দাও।

একজন বলে ওঠে—সর্দার, এসব বহুমূল্য দ্রব্য।

হুঙ্কার ছাড়ে বনহুর–আমি যা বললাম তাই করবে।

আচ্ছা সর্দার।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো নিয়ে যাও সব।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অনুচর এক একটা ঝোলা কাধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বনহুর সোজা চললো বিশ্রামকক্ষে।

কক্ষে প্রবেশ করতেই নূরী এসে দাঁড়ালো পাশে, অভিমানভরা কণ্ঠে বলেন—হুর, আজকাল সব সময় তুমি শহরেই পড়ে থাক কেন বলত?

যখন যেখানে কাজ, সেখানেই থাকি।

তা বলে তুমি আমাকে একা ছেড়ে—

তাছাড়া তো কোন উপায় নেই নূরী।

হুর, তুমি না থাকলে আমি বড় কষ্ট পাই।

মিছেমিছি কষ্ট পাও কেন বলতো? নাসরীন আছে, সায়রা আছে, রুখসানা আছে.....

হাজার জন থাক, তবু তোমার অদর্শন অসহনীয় হুর।

নূরী!

হুর তুমি আমার, বলল তুমি আমাকে ভালবাস? বলো, চুপ করে রইলে কেন, বলো?

বাসি।

সত্যি! আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে খুশির আবেগে উঠে দাঁড়ায় নূরী, তারপর হেসে বলেহর, অনেকদিন হলো তুমি আমার নাচ দেখতে চাওনা, আজ দেখবে?

যদি তোমার ইচ্ছে হয়, নাচো।

নূরী মনের আনন্দে নাচতে শুরু করলো।

বনহুর আনমনে তাকিয়ে রইলো নূরীর দিকে।

এমন সময় দরজার বাইরে থেকে ডাকলো একজন অনুচর–সর্দার।

কে রহমান? এসো।

নূরীর নাচ থেমে যায়, কক্ষে প্রবেশ করে রহমান-সর্দার!

বলো কি খবর?

সর্দার, পুলিশবাহিনী রহমতকে গ্রেপ্তার করেছে।

বলো কি!

হ্যাঁ সর্দার। আমরা যখন বন্ধনী সেতু পার হচ্ছিলাম, তখন পুলিশ ফোর্স আমাদের ঘেরাও করে ফেলে এবং তুমুল লড়াইয়ের পর আমাদের একজনকে নিহত আর রহমতকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশবাহিনীর দু'জন নিহত হয়েছে।

হুঁ বুঝতে পেরেছি, কিন্তু তোমরা যে ঐ পথে যাবে, একথা পুলিশবাহিনী জানতে পারলো কি করে?

সে কথা আমি জানি না সর্দার।

এবার গর্জে উঠলো বনহুর—তোমরা রহমতকে উদ্ধার না করে ফিরে এলে কেন?

সর্দার, প্রত্যেকটা পুলিশের হাতে গুলিভরা রাইফেল ছিল। তাছাড়া—

আমি কোন কথা শুনতে চাইনে, কেন তোমরা তাকে না নিয়ে ফিরে এলে, বলো?

সর্দার! ভীত কণ্ঠস্বর রহমানের।

এমনি কি তারা রহমতকে নিয়ে শহরে পৌঁছে গেছে?

সর্দার, এখনও তারা পৌঁছতে পারেনি, রহমত গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঘোড়া নিয়ে ছুটে এসেছি।

যাও তাজকে প্রস্তুত করো, আমি এক্ষণি যাব।

বেরিয়ে যায় রহমান।

নূরী ছলছল চোখে বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়—তুমি একাই যাবে?

মাথায় পাগড়ী জড়াতে জড়াতে বলে বনহুর-হ্যাঁ।

কিন্তু পুলিশ ফোর্স রয়েছে আর রয়েছে গুলিভরা রাইফেল–

বনহুর কাপুরুষ নয়।

হুর!

এমন সময় পুনরায় রহমান কক্ষে প্রবেশ করে—সর্দার, তাজ প্রস্তুত।

নূরী রিভলবারখানা বনহুরের হাতে তুলে দিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলে–খোদা হাফেজ।

পুলিশ ফোর্স রহমতকে বন্দী করে নিয়ে চলেছে। লাশগুলোও তাদের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়েছে। গাড়ি উল্কা-বেগে ছুটে চলেছে।

পেছনে ছুটে আসছে তাজের পিঠে দস্যু বনহুর।

একে অন্ধকার রাত, তার ওপর ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে, সে সঙ্গে বইছে দমকা হাওয়া। বনহুরের অশ্বপদশব্দ পুলিশদের কানে পৌঁছে না।

অতি নিকটে পৌঁছে যায় বনহুর!

বনহুর মোটরের আলো লক্ষ্য করে এগুচ্ছে। মাত্র কয়েক মিনিট। বনহুরের অশ্ব খুব কাছে এসে গেছে। হাওয়ার বেগটাও যেন আরও বেড়েছে। সাঁ সাঁ করে শব্দ হচ্ছে। সে শব্দ ভেদ করে বনহুরের অশ্ব এগিয়ে আসছে।

মোটরের পাশ কেটে চলে যায় তাজ, বনহুর লাফিয়ে পড়ে ড্রাইভ আসনে। সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের গুলিতে ড্রাইভারের রক্তাক্ত দেহটা মুখ থুবড়ে পড়ে যায় গাড়ির মধ্যে। পুলিশরাও অন্ধকারে গুলি ছুঁড়তে থাকে, কিন্তু নিজেদের গুলিতে নিজেরাই মরতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভয় পেয়ে সমস্ত পুলিশ এদিকে ওদিকে পালিয়ে গেল।

বনহুর রহমতের হাত পায়ের বাঁধন কেটে দিয়ে তুলে নিলো তাজের পিঠে। তারপর ছুটে চললো হাওয়ার বেগে।

পরের দিন এই ঘটুনা নিয়ে সারা দেশে হুলস্থুল পড়ে গেল। পুলিশমহলে ভীষণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। মাত্র একজন দস্যু এতগুলো পুলিশকে পরাজিত করে বন্দীকে নিয়ে পালাতে সক্ষম হলো, অথচ কেউ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারলো না।

মিঃ হারুন এবং আরও অন্যান্য পুলিশ অফিসার মিলে শংকর রাওয়ের সঙ্গে গোপন আলোচনা চালাতে লাগলেন, কি করে এ দস্যুকে পাকড়াও করা যায়।

শংকর রাও ছদ্মবেশে বেরিয়ে ছিল, সঙ্গে গোপাল বাবুও চললেন। শংকর রাও গ্রাম্য বৃদ্ধের বেশে, গোপাল বাবুর শরীরে ছেড়া জামা-কাপড়, ঠিক একজন গ্রাম্য যুবক যেন। শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেফিরে বেড়াতে লাগলেন তাঁরা।

সারাটা দিন ঘোরাফেরা করে ক্লান্ত হয়ে ছিল। সম্মুখে একটা হোটেল দেখে উঠে ছিল তারা সে হোটেলে।

হোটেলে প্রবেশ করতেই একজন চিৎকার করে উঠলো—ভাগো। হিয়াসে।

শংকর রাও বৃদ্ধের অনুকরণে গলার স্বরকে বদলে নিয়ে বলেন–দু'কাপ চা খাব বাবু সাব।

অন্য হোটেল দেখো গে, ভাগো এখান থেকে।

শংকর রাও মনে মনে ভীষণ রেগে গেল। গোপাল বাবুকে সঙ্গে করে হোটেল থেকে বেরুতে যাব, ঠিক সে মুহূর্তে কয়েকজন লোক প্রবেশ করলো হোটেলে।

শঙ্কর রাও থমকে দাঁড়ালেন, লোকগুলোর চেহারা যেন সন্দেহজনক বলে মনে হলো তার কাছে।

শঙ্কর রাও গোপাল বাবুর গা টিপে দিল। তারপর পকেট হাতড়ে দশ টাকার একখানা নোট বের করে এগিয়ে দিল হোটেলের, ম্যানেজারের দিকে—শুধু দুকাপ চা।

ঐ চেয়ারে বসো। হোটেলের ম্যানেজার এক কোণের দুটি চেয়ার দেখিয়ে বলল।

শঙ্কর রাও আর গোপাল বাবু বসে ছিল এক পাশের দুটো চেয়ারে।

যে লোকগুলো কিছু পূর্বে হোটেলে প্রবেশ করেছিল, তারা ওদিকে কয়েকখানা চেয়ারে গোলাকার হয়ে বসে পড়ে।

বয় তাদের সম্মুখে কয়েকখানা মদের বোতল আর পেয়ালা রেখে যায়। মদ পান করতে করতে কি যেন সব আলাপ চলে তাদের মধ্যে। শঙ্কর রাও চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কান পাতেন। কে একজন বলছে—কাজ হাসিল করতে পারলে বহুৎ টাকা মিলবে। এরপর আরও কি কি যেন কথাবার্তা চললো, বুঝা গেল না।

শঙ্কর রাও আর গোপাল বাবু সেদিনের মত পথে নেমে ছিল। সে হোটেল সম্বন্ধে সন্দেহ তাদের ঘনীভূত হলো।

পরদিন দু'জনে ভিখারীর বেশে এসে বসলেন, হোটেলের অদূরে বটতলায় একটা কম্বল বিছিয়ে ভিক্ষে শুরু করলেন শঙ্কর রাও ও গোপাল বাবু কিন্তু দৃষ্টি তাদের রইলো সে হোটেলের দিকে।

সন্ধ্যে হয় প্রায়। চারদিক ঝাপসা হয়ে এসেছে। লাইটপোস্টগুলো জ্বলে উঠবে একটু পরে, ঠিক সে সময় একটা কালো রঙের মোটর এসে থামলো হোটেলের সম্মুখে।

গাড়ি থেকে নেমে এলো এক কাবুলিওয়ালা। হোটেলে প্রবেশ করতেই হোটেলের ম্যানেজার লোকটাকে সাদর সম্ভাষণ জানালো। আরও কয়েকজন বলিষ্ঠ চেহারার লোক তাকে কুর্ণিশ জানিয়ে হোটেলের ভিতরে নিয়ে গেল।

শঙ্কর রাও আর গোপাল বাবু বটতলা থেকে সব দেখলেন। গোপাল বাবু চোখ টিপে বলেন–শঙ্কর, তুমি যাই বলল, ঐ বেটাই দস্যু বনহুরের লোক।

সত্যি?

আমার সে রকমই মনে হচ্ছে।

.

আজকাল মুরাদকে আর দাওয়াত করতে হয় না। প্রতিদিন একবার করে চৌধুরীবাড়িতে আসা চাই-ই। যদিও মনিরা তাকে বেশ এড়িয়ে চলে, তবু মুরাদ মনে কিছু করে না, বরং কিসে মনিরা তাকে ভালবাসবে তাই করে। মুরাদ এলে অত্যন্ত খুশি হন চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগম। মনিরাকে মিশার সুযোগ

দিয়ে সরে থাকেন তাঁরা, কিন্তু মনিরা সে সুযোগ চায় না, মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হয় সে।

মনিরাকে নিয়ে প্রায়ই বেড়াতে যাবার প্রস্তাব করে মুরাদ। চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগম খুশিভরা কণ্ঠে সম্মতি জানান, কিন্তু মনিরাকে কিছুতেই রাজি করাতে পারেন না তাঁরা।

একদিন মনিরা নিজের ঘরে শুয়ে আছে।

মুরাদের গাড়ি এসে থামলো বারান্দায়। চৌধুরী সাহেব তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। মুরাদ জিজ্ঞেস করলো—মনিরা কোথায়?

ব্যস্তকণ্ঠে বলেন চৌধুরী সাহেব—দেখি উপরে আছে বুঝি? তুমি বসো।

আজ বসবো না চৌধুরী সাহেব। কাল আমি বলে গেছি মনিরাকে একটা ফাংশনে নিয়ে যাব। দেখুনতো ওর কাপড়-চোপড় পরা হয়েছে কিনা?

আচ্ছা বাবা—আমি দেখছি। চৌধুরী সাহেব ব্যস্ততার সঙ্গে উপরে উঠে যান। সম্মুখে স্ত্রীকে দেখতে পেয়ে বলেন—মনি কই? মুরাদ এসেছে, ওকে নাকি কোন ফাংশনে নিয়ে যাবে, কালই বলে গেছে বেচারা, দেখতো তৈরি হয়েছে কিনা!

তাই নাকি, সে কথা তো তুমি আমাকে বলেনি, কি যে মেয়ে বাবা মরিয়ম বেগম মনিরার কক্ষের দিকে চলে যান, কিন্তু কক্ষে প্রবেশ করে অবাক হন, বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলেন—এ ভরসন্ধ্যায় বিছানায় শুয়ে আছিস কেন মনিরা?

কেন, শুতে দোষ আছে নাকি?

মুরাদ এসেছে!

তাতে আমার কি মামীমা?

সেকি, কাল নাকি সে তোকে বলে গেছে, আজ কোন ফাংশনে যাবে।

কোন ফাংশনে যাবার সখ আমার নেই।

মুরাদ যখন বলছে তখন যা না বাছা।

তা হয় না মামীমা, সে আমার কে যে তার সঙ্গে যাব?

পাগলী মেয়ে! দুদিন পর সে তোর স্বামী......

মামীমা...চিৎকার করে মরিয়ম বেগমকে থামিয়ে দেয় মনিরা।

মরিয়ম বেগম থ' মেরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন মনিরার মুখের দিকে, তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে যান!

চৌধুরী সাহেব উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতীক্ষা করছিল, স্ত্রীকে বিষণ্ন মুখে। ফিরে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন-কি হলো? মনিরা....

ও কথা আমাকে আর বলো না।

সেকি! মুরাদ যে দাঁড়িয়ে আছে।

তাকে যেতে বলো, মনিরা যাবে না।

কি মুস্কিল! হঠাৎ আবার কি হলো তার?

মাথাটা নাকি বডড় ধরেছে, কয়েকবার বমিও হয়েছে।

তাই নাকি, তাহলে তো ডাক্তার ডাকতে হয়!

ডাক্তার ডাকার আগে মুরাদকে বিদায় করে দাও।

আচ্ছা বলছি। নিচে নেমে যান চৌধুরী সাহেব।

মুরাদ ঘন ঘন পায়চারী করছিল, চৌধুরী সাহেবকে দেখে এগিয়ে আসে—মনিরা কই?

বড় দুঃখের কথা বাবা, মনিরার ভয়ানক জ্বর এসেছে। যেমন বমি তেমনি নাকি মাথাধরা...

হঠাৎ কেমন জ্বর তার?

খুব বেশি।

আমি তাকে একটু দেখতে পারি কি?

হ্যাঁ…না না, তুমি আবার কষ্ট করে…

এতে আর কষ্টের কি আছে, কই চলুন তো একবার দেখে আসি।

তোমার ফাংশনের বিলম্ব হয়ে যাবে।

তা হউক।

চৌধুরী সাহেব কিছু বলার পূর্বেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে চললো মুরাদ।

মরিয়ম বেগম আড়ালে থেকে সব শুনছিল। তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বেরিয়ে আসেন-কাল ভোরে এসে দেখে যেও বাবা, এখন একটু ঘুমাচ্ছে।

তা হউক, আমি ওকে জাগাবো না। উপরে উঠে মরিয়ম বেগমকে জিজ্ঞেস করলো মুরাদ-মনিরা কোথায়?

একটা ঢোক গিলে বলেন মরিয়ম বেগম—ঐ যে ঐ ঘরে।

কক্ষে প্রবেশ করে এগিয়ে যায় মুরাদ মনিরার বিছানার দিকে—মনিরা, তোমার নাকি অসুখ? মাথায় হাত দিতে যায় মুরাদ। আজকাল মুরাদ মনিরাকে তুমি বলে সম্বোধন করে।

মনিরা চট করে সরে বসে বলে—খবরদার, গায়ে হাত দেব না।

তোমার নাকি অসুখ?

কে বলেন আমার অসুখ?

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে চৌধুরী সাহেব আর মরিয়ম বেগমের মুখ অন্ধকার হয়ে যায়।

মুরাদের গলা শোনা যায়—তোমার মামুজান আর মামীমা বলেন।

মিছে কথা! আমার কোন অসুখ করেনি!

থ্যাঙ্ক ইউ, ভেরী গুড। তাহলে তৈরি হয়ে নাওনি কেন?

আমি আপনার সঙ্গে কোথাও যাব না।

মনিরা!

আমি না গেলে আপনি কি করতে পারবেন?

তোমার মামুজান আর মামীমা এর জবাব দেব।

মামুজান আর মামীমার মতে আমার মত নয়—একথা ভুলে যাব না মিঃ মুরাদ।

মনিরা, এত সাহস তোমার?

হ্যাঁ, আমি…কিছু বলতে যাচ্ছিলো মনিরা। সে মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করেন চৌধুরী সাহেব—মনিরা কি হচ্ছে, এসব পাগলামি..

মুরাদ রাগতভাবে বলে ওঠে—চৌধুরী সাহেব, আমি বুঝতে পেরেছি আপনাদের চালাকি। এত মিথ্যাবাদী আপনারা!

মুরাদের অশালীন কথা শুনে ভীষণ রেগে গেল চৌধুরী সাহেব, বলেন—মুরাদ, বিয়ে দেব বলে কথা দিয়েছিলাম, বিয়ে তো আর দেইনি। এখানে তোমার কোন অধিকার নেই। তুমি যেতে পারো।

বেশ, আমিও দেখে নেব, কথা দিয়ে কি করে কথা পাল্টান। বলেই খট খট করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল মুরাদ।

তখনকার মত মুরাদ চলে গেলেও বাইরে থেকে বিষধর সাপের মত ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো, সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে। গুণ্ডাদের আস্তানা হলো তার সম্বল। শয়তানদের সঙ্গে চললো তার গোপন আলোচনা। হাজার হাজার টাকা সে ছড়িয়ে দিতে লাগলো গুণ্ডাদের মধ্যে, যেমন করে হউক মনিরাকে তার চাই।

সেদিন মনিরা কোন এক ফাংশন থেকে ফিরছিল। নিজেদের গাড়ির বিলম্ব দেখে অন্য একটা ভাড়াটিয়া গাড়ি নিয়ে রওনা দিল সে।

গাড়ি ছুটে চলেছে, মনিরা জনমুখর রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল। ভাবছিল মুরাদের কথা, জীবন থাকতে অমন অভদ্র লোককে সে স্বামী বলে গ্রহণ করতে পারবে না। এজন্য মামুজান আর মামীমা খুশি নন, তবু কি করবে মনিরা? নিজেকে তো আর বলি দিতে পারে না! ঐশ্বর্যের কাঙ্গাল সে নয়! হঠাৎ মনিরার চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়। গাড়িখানা থেমে পড়েছে।

মনিরা বাইরের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায়, এ তো শহরের পথ নয়। কখন যে গাড়িখানা তাকে নিয়ে এক নির্জন গলির মধ্যে এসে পড়েছে, সে খোয়াল নেই মনিরার।

মনিরা জিজ্ঞেস করলো—ড্রাইভার, এ তুমি কোথায় আনলে?

ড্রাইভার কেমন ধরনের একটা বিদঘুটে হাসি হেসে বলেন—ঠিক জায়গায় এসে গেছি, এখন নেমে পড়ন দেখি।

ড্রাইভারের কণ্ঠস্বর এবং মুখের ভাব লক্ষ্য করে শিউরে উঠলো মনিরা। বিবর্ণ মুখে সে কিছু বলতে গেল, কিন্তু বাইরে নজর পড়তেই আড়ষ্ট হয়ে গেল তার কণ্ঠ। ভয়ঙ্কর চেহারার কয়েকজন বলিষ্ঠ লোক দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে চেয়ে। কেমন যেন দুষ্টমির হাসি.তাদের সকলের মুখে।

একজন লোক এগিয়ে এলো গাড়ির পাশে। গম্ভীর কণ্ঠে বলেন সেনেমে আসুন চট করে।

মনিরার দেহে তখন প্রাণ আছে কি না সন্দেহ। কি করবে এখন সে? এদের হাত থেকে পরিত্রাণের তো কোন উপায় নেই। তবু কন্ঠে সাহস সঞ্চার করে নিয়ে বলেন—তোমরা আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন? কি তোমাদের উদ্দেশ্য?

তোমার বদলে টাকা চাই। নেমে এসো।

নামবো না, কিছুতেই আমি নামবো না। আমাকে তোমরা বাড়িতে পৌঁছে দাও, যত টাকা চাও দেব।

হা-হা করে হেসে উঠলো লোকটি—আমরা অত বোকা নই, টাকা আমরা তোমার মামুজানের নিকট হতে চাই না। তোমাকে পেলে টাকার অভাব হবে না।

মনিরা দাঁতে দাঁত পিষে বলে—শয়তান কোথাকার! শিগগির আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও, নইলে পুলিশে ধরিয়ে দেব। মনিরা নিজকে বাঁচাবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে। কিন্তু দুর্বল অসহায়া একটা রমণীর কথায় ভয় পাবার বান্দা ঐ লোকেরা নয়।

লোকটা পুলিশের নাম শুনে আরও জোরে হেসে ওঠে। তারপর হাসি থামিয়ে বলে—আমি পুলিশের বাবা, পুলিশ আমার কি করবে।

মনিরা চমকে উঠলো, বিস্ময়ভরা ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো–তুমি কে, দস্যু বনহুর?

হ্যাঁ, তুমি দেখছি সহজেই আমাকে চিনে ফেলেছ।

দস্যু বনহুর! বদমাইশ কোথাকার। বহুদিন থেকে তুমি আমার পেছনে লেগেছ। আমি মরবো, তবু তোমার হাতে নিজকে সঁপে দেব না।

দেখি কেমন করে না দাও। বলিষ্ঠ লোকটা গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলো এবং জোরপূর্বক মনিরাকে টেনে নামিয়ে ফেললো।

মনিরা ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো-বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও.....

ঠিক সে মুহূর্তে আর একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে এবং সংগে সংগে একটা যুবক ট্যাক্সি থেকে নেমে এসে ঝাঁপিয়ে ছিল বলিষ্ঠ লোকটার ওপর। গুণ্ডার দল হঠাৎ এই বিপদের জন্য প্রস্তুত ছিল না, যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো। বলিষ্ঠ লোকটা আর যুবকে চললো ভীষণ ধস্তাধস্তি। বেশ কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পর বলিষ্ঠ লোকটা কাবু হয়ে এলো, সে পরাজিত হয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিল।

গলিটার মধ্যে অন্ধকার তখন জমাট বেঁধে উঠেছে। মনিরা গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছিল, আর যুবকটার মঙ্গল কামনা করছিল। ঠিক এই সময়ে যুবকটা যদি এসে না পড়তো তবে কি হত, ভাবতে পারে না সে।

ভয়ঙ্কর লোকটা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতেই মনিরা ছুটে গেল যুবকের পাশে। বিনীতকণ্ঠে বলেন–আপনার শরীরে আঘাত লাগেনি তো?

যুবক সোজা হয়ে দাঁড়াতেই মনিরা বিস্ময়ে শুদ্ধ হয়ে গেল। পাশের লাইটপোস্টের আলোতে সে দেখলো—প্যান্ট কোট টাই পরা একটা যুবক-অদ্ভুত অপূর্ব সুন্দর তার চেহারা।

যুবক অন্য কেউ নয় দস্যু বনহুর। সে দূর থেকে মনিরার গাড়িখানাকে লক্ষ্য করছিল, কিন্তু পথের মধ্যে হঠাৎ একটা এক্সিডেন্ট হয়, সে কারণে কিছু বিলম্ব হয় তার। তবু ঠিক সময়ে পৌঁছতে পেরেছে বলে মনে খুশি হয়েছে। বনহুর বিষ্ময়ভরা নয়নে তাকিয়ে আছে মনিরার মুখের দিকে।

মনিরা সম্বিৎ ফিরে পায়। দৃষ্টি নত করে নিয়ে বলে–কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব ভেবে পাচ্ছিনে, আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন!

হেসে বলে বনহুর–আপনাকে শয়তানের কবল থেকে রক্ষা করতে পেরে নিজেও কম আনন্দিত হইনি।

ভয়ার্ত দৃষ্টি নিয়ে চারদিকে তাকালো মনিরা। তারপর চাপাকণ্ঠে বলেন–জানেন ওরা কে?

না তো, আমি কি করে জানবো?

দস্যু বনহুর আমাকে আক্রমণ করেছিল!

সত্যি!

হ্যাঁ, আপনি না এলে আমার উদ্ধার ছিল না, জানেন তো দস্যু বনহুর কত ভয়ঙ্কর!

হেসে বলে বনহুর–হ্যাঁ, দস্যু বনহুরের নাম শুনেছিলাম, আজ তার সঙ্গে লড়াই হলো।

আপনার বীরত্বে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আপনি কি করে যে অমন ভয়ঙ্কর দস্যুটাকে পরাজিত করলেন।

আর এখানে বিলম্ব করা ঠিক নয়, দস্যু বনহুর আবার হানা দিতে পারে। চলুন, আমার গাড়িতে আপনাকে পৌঁছে দি।

চলুন।

বনহুর নিজের গাড়ির দরজা খুলে ধরে–উঠুন।

মনিরার মাথাটা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে–কত দ্র, মহৎ এই যুবক! গাড়িতে উঠে বসে মনিরা।

বনহুর ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে স্টার্ট দেয়।

গাড়িতে বসে মনিরা এই যুবকটির কথা ভাবছে। তার জীবনে এই যুবকটি যেন খোদার একটি দান। বারবার যুবকের মুখখানা দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে তার।

.

বনহুর ড্রাইভ আসন থেকে হাত বাড়িয়ে পেছন সীটের দরজা খুলে ধরলো– চৌধুরীবাড়ি এই শহরের সবাই চেনে। নামুন, বাড়িতে যান।

আপনি নামবেন না?

আজ নয়, আর একদিন।

গাড়ি-বারান্দার উজ্জ্বল আলোতে মনিরা ভালো করে দেখলো বনহুরকে। মন যেন ওকে ছেড়ে দিতে চাইলো না, কিন্তু অপরিচিত এক যুবকের কাছে কি অধিকার আছে তার।

বনহুর গাড়িতে স্টার্ট দিল, মনিরা তখনও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে।

গাড়িখানা দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই মনিরা হলঘরে প্রবেশ করলো।

চৌধুরী সাহেব একটা পত্রিকা দেখছিল, মনিরার পদশব্দে কাগজখানা রেখে মুখ তুলেন—একি মা, এত রাত হলো যে?

মনিরা তার পাশের সোফায় বসে পড়ে বলেন–মামুজান, জীবনে যে বেঁচে ফিরে এসেছি, এই ভাগ্য।

কেন মা, কোন এক্সিডেন্ট–

না মামুজান, দস্যু বনহুর আমাকে আক্রমণ করেছিল।

বলিস কি মনি দস্যু বনহুর।

হ্যাঁ, ভাগ্যিস এক ভদ্র যুবক আমাকে বাঁচিয়ে নিলেন, নইলে আর কোনদিন তোমরা আমাকে ফিরে পেতে না।

ওগো শুনছো? শুনো, শুনো–চৌধুরী সাহেব স্ত্রীকে ডাকাডাকি শুরু করলেন।

মরিয়ম বেগম এবং চৌধুরী সাহেব মনিরার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে আড়ষ্ট হয়ে গেল, মুখে যেন তাদের কথা নেই।

কিছুক্ষণ লাগলো তাদের নিজেদের সামলাতে। কি ভয়ঙ্কর কথা! প্রকৃতিস্থ হয়ে বলেন চৌধুরী সাহেব মনি, যে তোমাকে রক্ষা করলে তাকে ঘরের দরজায় এসে ওভাবে ছেড়ে দেয়া তোমার উচিত হয়নি মা।

মরিয়ম বেগম স্বামীর কথায় যোগ দিল—শুধু রক্ষা নয়, মনিরার জীবন আমাদের মান-ইজ্জত সব বাঁচিয়েছে সে। মনিরা, তুমি শিক্ষিত মেয়ে, কি করে বিদায় দিলে? মনে একটু বাঁধলো না?

আমি তাকে নামতে অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু উনি বলেন আজ নয়, অন্য দিন আসবেন।

পাগলী মেয়ে, তাই বুঝি তুই তাকে ছেড়ে দিলি? জিদ করলে নিশ্চয়ই সে না নেমে পারতো না।

ভুল হয়েছে মামীমা।

এবার চৌধুরী সাহেব বলেন–তার পরিচয়টা জেনে নেয়াও কি তোমার উচিত ছিল না? কি তার নাম, কোথায় থাকে–

মামুজান, আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম।

সত্যি, গো, দস্যু বনহুরের কবলে–এ যে কী সাংঘাতিক ব্যাপার, ভাবলেও আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠছে। মনিরা, কোনদিন তুই একা বাইরে যাবিনে।

হ্যাঁ মামীমা, আর অমন কাজ করবো না।

.

সেদিন মনিরা একটা বইয়ের দোকানে প্রবেশ করলো কতকগুলো বইয়ের অর্ডার দিয়ে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় তার পাশে দাঁড়ালো এক যুবক, মনিরা মুখ তুলে তাকাতেই তার চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, হেসে বলেন– আপনি?

বনহুর বলে ওঠে–আপনি দেখি আমাকে মনে রেখেছেন?

কি যে বলেন, কোনদিনই আপনাকে ভুলবো না। কি বাঁচাই না সেদিন পনি আমাকে বাঁচিয়েছেন! আজ কিন্তু আর আপনাকে ছাড়ছিনে।

তার মানে?

মানে অতি স্বচ্ছ। মামুজানের হুকুম, আপনাকে তার নিকটে ধরে নিয়ে যেতে হবে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, সেদিন আপনাকে বিদায় দিয়ে কি বকাটাই না খেলাম। যেমন বকলেন মামুজান, তেমনি মামীমা।

তাহলে তো এক বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে আর এক বিপদে পড়েছিল?

মিথ্যে নয়। হ্যাঁ একটা কথা, মনে কিছু নেবেন না?

বলুন?

আপনার পরিচয়টা?

ওঃ হ্যাঁ, পরিচয়টা এখনও আপনাকে দেয়া হয়নি। আমার নাম মনিরুজ্জামান চৌধুরী, ঠিকানা ৩৬/৩, বাগবান রোড চলুন না আজ আমার বাড়িতে, এই তো এখান থেকে একটু দূরে।

না, তা হয় না। আপনিই আজ চলুন, পরে একদিন নিশ্চয়ই আপনার ওখানে যাব।

কিন্তু আমি তো আজ যেতে পারছিনে মিস মনিরা!

অবাক হয়ে তাকায় মনিরা বনহুরের মুখে। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে–আপনি আমার নাম জানলেন কি করে?

হেসে বলে বনহুর কারও নাম জানতে ইচ্ছে থাকলে অমনি জানা যায়। সেদিন আমি জেনে নিয়েছি।

বেশ লোক কিন্তু আপনি।

বনহুর আর মনিরা একসঙ্গে হাসতে থাকে।

বইগুলো প্যাক করে মনিরার সম্মুখে রাখে দোকানদার।

মনিরা ক্যাশমেমো দেখে টাকা মিটিয়ে দেয়, তারপর বনহুরকে লক্ষ্য করে বলে আজ কথা দিতে হবে, কবে তাহলে আসছেন?

আমার বাড়ির এত নিকটে এসে যখন চলে যাচ্ছেন তখন আমার যাওয়া–তা যাব একদিন।

না, তা হবে না।

তাহলে—

আচ্ছা চলুন।

মনিরা বনহুরের গাড়িতে চেপে বসে।

ড্রাইভ আসনে ওঠে বনহুর। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলে–অজানা অচেনা একজনের সঙ্গে যেতে মনে ভয় হচ্ছে বুঝি?

কি যে বলেন–আপনার সঙ্গে ভয়, আপনি তো ডাকাতের বাবা!

তাহলে ভরসা আছে আমার ওপর?

খুব।

আরও অনেক হাসিগল্প চলে।

বিরাট একটা বাড়ির সম্মুখে এসে বনহুরের গাড়ি থেমে ছিল।

মনিরা বাড়িখানার দিকে তাকিয়ে অবাক হলো–এ যেন রাজ প্রাসাদ।

বনহুর ড্রাইভ আসন থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো–নেমে পড়ুন।

মনিরা নেমে দাঁড়ালো।

বনহুর মনিরাকে নিয়ে এগুতেই দারোয়ান সেলুট ঠুকে সরে দাঁড়ালো।

মনিরা অবাক হয়ে চারদিকে দেখতে দেখতে এগুতে লাগলো। সেকি প্রকাণ্ড বাড়ি! গেটের পর গেট, ঘরের পর ঘর। প্রত্যেকটা ঘরে বেলওয়ারীর ঝাড় ঝুলছে। মূল্যবান সরঞ্জামে ঘরগুলো সাজানো, কিন্তু মনিরা আশ্চর্য হলো, এত বড় বাড়িটায় শুধুমাত্র ঐ একটা যুবক।

অনেকগুলো ব্যালকনি পেরিয়ে একটা সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করলো মনিরাকে নিয়ে বনহুর। মনিরা তখনও অবাক হয়ে চারদিকে দেখছে। তার মামুজানও মস্ত বড়লোক, কিন্তু এত বড় বাড়ি তো তাদের নয়। রাজ-রাজার বাড়ি যেমন হয়, এ বাড়িটাও ঠিক তেমনি।

বনহুর হেসে বলেন–বসুন।

মনিরা বসে পড়ে বলে–এত বড় বাড়ি অথচ লোকজন তো দেখছিনে? আপনার বাবা-মা?

কেউ নেই।

আপনার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে?

ওসব ঝঞ্ঝাটও নেই আমার।

এত বড় বাড়িটায় আপনি একা থাকেন?

চিরদিন যে একা, সে কোথায় পাবে সঙ্গী, বলুন। আপনি বসুন, আমি একটু চা-নাস্তার ব্যবস্থা–

না না, ওসব কিছু লাগবে না, বরং আপনি বসুন।

তা হয় না মিস মনিরা, আপনি আমার অতিথি। বনহুর বেরিয়ে যায়।

মনিরা অবাক হয়ে ভাবে, অদ্ভুত এই যুবক। যার এত আছে, তার আবার সঙ্গীর ভাবনা? রূপ-গুণ-ঐশ্বর্য সর আছে এর কিন্তু কেন সে একা নিঃসঙ্গভাবে জীবন কাটায়? ইচ্ছে করলেই যে কোন মেয়েকে সে গ্রহণ করতে পারে। যে নারী ওকে স্বামীরূপে পাবে সে ধন্য হবে, সার্থক হবে তার জীবন কিন্তু কেন সে এতদিনও বিয়ে করেনি?

মনিরা আনমনে উঠে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে কক্ষ থেকে। ওপাশে রেলিংয়ের ধারে দাঁড়াতেই আশ্চর্য হয়। কত রকমের ফুলগাছ শোভা পাচ্ছে বাগানে। ফুরফুরে হাওয়া আর অজানা ফুলের সুরভি তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালো। মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে মনিরা।

কখন যে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বনহুর, খেয়াল করতে পারেনি মনিরা। বনহুর হেসে বলে কি দেখছেন অমন করে?

কি সুন্দর অপূর্ব! আচ্ছা জামান সাহেব, আপনি ফুল বুঝি খুব পবাসেন?

হ্যাঁ চলুন, চা-ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

কেন আপনি ওসব ঝামেলা করতে গেল! পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে মনিরা আর বনহুর।

চা-নাস্তার সঙ্গে সঙ্গে বনহুর আর মনিরার গল্প চলে। মনিরা এখন অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। বনহুরের দৃষ্টির মধ্যে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছে সে। বনহুরের হাসির মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে নিজকে। কথায় কথায় সন্ধ্যা হয়ে আসে, সেদিকে খেয়াল নেই মনিরার। বনহুর স্মরণ করিয়ে দেয়–মিস মনিরা, আপনার ফেরার সময় হয়েছে, বিলম্ব হলে আপনার মামুজান নিশ্চয় চিন্তিত হবেন।

উঠে দাঁড়ায় মনিরা সত্যি আমার যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

বনহুর একটু হাসলো।

মনিরা আর বনহুর গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো। মনিরা বলেনজামান সাহেব, আপনি আমাকে পৌঁছে দিচ্ছেন তো?

আমি ড্রাইভার দিচ্ছি, সে আপনাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে।

না, তা হবে না! আমি কোন ড্রাইভারকে বিশ্বাস করি না।

হো হো করে হেসে ওঠে বনহুর খুব ভয় পেয়ে গেছেন দেখছি। কিন্তু আমাকেই বা আপনার এত বিশ্বাস কেন? আমি যদি আপনাকে নিয়ে পালাই?

পৃথিবীর কাউকে বিশ্বাস না করলেও আপনার ওপর আমার অবিশ্বাস হবে না। সত্যি জামান সাহেব, আপনি কত মহৎ!

বুঝেছি, আপনি আমাকে আজই আপনার মামুজানের নিকটে হাজির করতে চান।

তাহলে আপনি বুঝতে পেরেছেন আমার মনোভাব, চলুন।

বনহুর আর বিলম্ব না করে ড্রাইভ আসনে উঠে বসে।

চৌধুরীবাড়ি।

চৌধুরী সাহেব, পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন, মিঃ শঙ্কর রাও ও গোপাল বাবু মিলে আলোচনা চলছিল। কয়েকদিন পূর্বে মনিরার সে আক্রমণ ব্যাপার নিয়েই

আলোচনা চলছিল। দস্যু বনহুর যে হঠাৎ ওভাবে মনিরার ওপর হামলা করে বসবে, এ যেন একটা অদ্ভুত ব্যাপার। চৌধুরী সাহেব কন্যা-সমতুল্যা ভাগনীকে নিয়ে খুব চিন্তায় ছিল। দস্যু বনহুরের দৃষ্টি যে তার ওপর পড়েছে, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। কি করে এ দস্যুর কবল থেকে মনিরাকে রক্ষা করা যাবে, এ নিয়ে আজ কদিন হলো পুলিশ অফিসে ঘোরাফেরা করছেন। আজ নিজে যেতে না পারায় ফোনে মিঃ হারুন সাহেবকে চৌধুরীবাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিল। যখন চৌধুরী সাহেব পুলিশ অফিসে ফোন করেন, তখন মিঃ হারুনের পাশে রাও এবং গোপাল বাবু উপস্থিত ছিল।

শঙ্কর রাও মিঃ হারুনের নিকট ঘটনাটা শুনে থাকতে পারলেন না, তিনিও'গোপাল বাবুকে নিয়ে মিঃ হারুনের সঙ্গে চৌধুরীরাড়িতে উপস্থিত হলেন।

সবাই মিলে আলোচনা চলছে, এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে মনিরা আর বনহুর। মনিরা আনন্দভরা কণ্ঠে বলে ওঠে–মামুজান, ইনিই সেদিন আমাকে দস্যু বনহুরের কবল থেকে রক্ষা করেছিল।

সকলেই একসঙ্গে বনহুরের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

চৌধুরী সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বনহুরকে জড়িয়ে ধরেন বুকে। তারপর আনন্দভরা কণ্ঠে বলেন–আপনাকে কি বলে যে আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো ভেবে পাচ্ছিনে। আপনি আমার মান-ইজ্জত রক্ষা করেছেন, আপনার কাছে আমি চিরঋণী।

পিতা-পুত্রের অপূর্ব মিলন। বনহুরের চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। কেউ না জানলেও সে জানে চৌধুরী সাহেবই তার পিতা। মনে মনে পিতাকে হাজার সালাম জানায় বনহুর।

চৌধুরী সাহেবও হৃদয়ে একটা আলোড়ন অনুভব করেন, বনহুরকে কিছুতেই বুক থেকে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে না তার।

মামুজান আর জামান সাহেবের মিলনে মনিরার চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, খুশির আবেগে বেরিয়ে যায় সে।

এবার চৌধুরী সাহেব বনহুরকে পাশের সোফায় বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসে পড়েন।

বনহুরের অপূর্ব সৌন্দর্য সকলকে মুগ্ধ করে ফেলে। মনিরা বয়ের হাতে চায়ের সরঞ্জাম দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে। চৌধুরী সাহেব কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন বনহুরকে, কিন্তু মনিরাই সকলের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল।

বনহুর সকলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে আসন গ্রহণ করলো।

মনিরা হেসে বলেন–মামুজান, উনি কিন্তু মস্ত বড়লোক।

বনহুর লজ্জিতকণ্ঠে বলেন–মিছেমিছে বাড়িয়ে বলছেন মিস মনিরা।

না মামুজান, আমি এতটুকু বাড়িয়ে বলিনি।

হাসিগল্পের মধ্য দিয়ে চা-নাস্তা চলে।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলেন শঙ্কর রাওমিঃ মনিরুজ্জামান, আমি আপনাকে একটু বিরক্ত করবো। কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবো।

স্বচ্ছন্দে করুন।

শঙ্কর রাও একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলেন–আচ্ছা মিঃ জামান, আপনি মিস মনিরাকে উদ্ধারের জন্য যখননজের গাড়ি থেকে দস্যুদলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, তখন তাদের দলে কত, জন ছিল বলে আপনার মনে হয়?

বনহুর ভূকুঞ্চিত করে একটু চিন্তা করলো, তারপর বলেন-—পাঁচ ছ'জন হবে।

ওরা কি সকলেই আপনাকে আক্রমণ করেছিল?

না, আমাকে দেখামাত্র সবাই সরে পড়ে। শুধু একজন, দলের সর্দার হবে হয়তো, সে আমাকে আক্রমণ করেছিল।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন–মিঃ জামান, আপনার কি মনে হয়, সে লোকটাই দস্যু বনহুর?

বনহুর একটা চিন্তার ভান করে বলে আমি তো আর দস্যু বনহুরকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করিনি, তবে অনুমানে এবং তার ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে মনে হলো বনহুর ছাড়া আর কেউ সে নয়। ইস, কি শক্তিই না তার শরীরে!

চৌধুরী সাহেব হেসে বলেন আপনার কাছে হার মানাতে সে বাধ্য হলো। পরাজিত হলো আপনার নিকট।

আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মিঃ জামান, দস্যু বনহুরকে পরাজিত করে মিস মনিরাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। কথাটা বলে বনহুরের পিঠ চাপড়ে দেন মিঃ হারুন। একটু থেমে পুনরায় বলেন–আশা করি দস্যু বনহুরের গ্রেপ্তারে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, প্রয়োজন মত আমাকে পাবেন।

মিঃ শঙ্কর রাও বলেন–হ্যাঁ মিঃ জামান, আপনি যদি দ্য বনহুরকে গ্রেপ্তারে আমাদের সাহায্য করেন, তবে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

মনিরা তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিল বনহুরের মুখের দিকে। বনহুর সকলের অলক্ষ্যে একবার তাকালো মনিরার মুখে। দৃষ্টি বিনিময় হলো। দু'জনের অন্তর যেন দু'জনকে দেখতে পেল। অভূতপূর্ব আকর্ষণ অনুভব করলো মনে তারা।

বনহুর মৃদু হেসে উঠে দাঁড়ালো–আজ তাহলে চলি।

চৌধুরী সাহেবও উঠে দাঁড়ালেন। তিনি যেন হৃদয়ে একটা ব্যথা অনুভব করলেন। শান্ত মিষ্টি গলায় বলেন–আবার কবে আসবেন কথা দিন?

ঠিক বলতে না পারলেও, আসবো। আর একবার তাকালো বনহুর মনিরার দিকে। মনিরা দৃষ্টির মাধ্যমে ওকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

এরপর হতে প্রায়ই আসে বনহুর।

চৌধুরী সাহেব, মরিয়ম বেগম সবাই বনহুরকে ভালবেসে ফেলেছেন। বনহুর এলে তারা যেন মনে শান্তি অনুভব করেন, মনিরার তো আনন্দ ধরে না। যেদিন বনহুর আসার কথা থাকে, সেদিন মনিরা নিজেকে মনের মত করে সাজায়, সকাল থেকে গুন গুন করে গান গায়।

চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগম বুঝতে পারেন ভাগ্নীর মনোভাব। তারা উভয়ে উভয়ের মুখে তাকিয়ে হাসেন, অজ্ঞাত এক বাসনা উঁকি দিয়ে যায় তাদের মনের কোণে।

মুরাদ সেদিন রাগ করে চলে যাবার পর থেকে চৌধুরী সাহেব ভিতরে ভিতরে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছিল, বনহুরের আবির্ভাব আবার তার হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ এনে দেয়। চৌধুরী সাহেব ধীরে ধীরে ভুলে যান মুরাদকে।

একদিন বিকেলে বনহুরের সঙ্গে মনিরা বেড়াতে বেরুলো। সে লেকের ধারে গিয়ে গাড়ি থেকে নামলো তারা। পাশাপাশি এগিয়ে চললো মনিরা আর বনহুর। কি নিয়ে যেন দু'জন বেশ হাসছিল।

মুরাদ দূর থেকে মনিরা আর বনহুরকে লক্ষ্য করলো। হিংসায় জ্বলে উঠলো তার অন্তরটা, কটমট করে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে।

বনহুর বলেন–মিস মনিরা, চেয়ে দেখুন ঐ অস্তগামী সূর্যের দিকে।

হেসে বলেন মনিরা—অপূর্ব!

ঠিক আপনার রক্তিম. গণ্ডের মত–তাই না?

যান!

মিস মনিরা, সত্যি আপনার মত মেয়েকে আমার বড় ভালো লাগে চোখে লজ্জা, মনে ম্রতা, মিষ্টিমধুর কণ্ঠস্বর—অপরূপ!

মনিরার মন তখন চলে গেছে পেছনের একটি দিনে। মুরাদ আর সে পাশাপাশি বসে আছে এমনি এক সন্ধ্যায়। মুরাদ বলছে, মনিরা তুমি বড্ড লাজুক, একদম সেকেলে ধরনের কি বিশ্রী, কি কুৎসিত ইঙ্গিতপূর্ণ কণ্ঠস্বর মুরাদের।

কি ভাবছেন মিস মনিরা?

মিস নয়, শুধু মনিরা বলুন।

তুমি যদি খুশি হও তাহলে তাই হবে। এবার বলো কি ভাবছো?

বনহুর মনিরাকে তুমি বলে সম্বোধন করে। মনিরাও বনহুরকে তুমি বলে সম্বোধন করে। কারণ ওরা দুজন দুজনের মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছে। দুজন দুজনকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছে।

নাই বা শুনলে সে কথা!

যদি না বলার মত হয়, তাহলে আমি শুনতে চাইনে মনিরা।

ঠিক সে মুহূর্তে মুরাদ মনিরার পেছনে এসে দাঁড়ালো, কঠিন কণ্ঠে বলেন–মিস মনিরা, কে এই যুবক?

মনিরা উঠে দাঁড়ালো, সেও কঠিন কণ্ঠে বলেন–আপনি সে কথা জিজ্ঞাসা করার কে?

তোমার আব্বা একদিন আমার সঙ্গে তোমাকে বিয়ে দেবেন কথা দিয়েছিল একথা এরই মধ্যে ভুলে গেলে? সেই অধিকারে–

খবরদার, আর কথা বলবেন না, চলে যান এখান থেকে।

ওঃ আজ দেখছি বড় সাহস বেড়েছে? চলো, তোমার আব্বার কাছে নিয়ে এর জবাব দেব–মনিরার হাত ধরতে যায় মুরাদ।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দেয় মুরাদের নাকে। মুরাদ পড়ে যায়, নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। ধূলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের পিঠে নাকের রক্ত মুছে, তারপর বনহুর আর মনিরার দিকে কটমট করে তাকিয়ে চলে যায়।

হেসে ওঠে মনিরা, বনহুরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে তার মন।

বনহুর বসতে যায়। মনিরা বলে ওখানে বসে আর কাজ নেই, চলো এবার ফেরা যাক।

কেন, ভয় হচ্ছে?

না, তুমি পাশে থাকলে আমার কোন ভয় নেই। তবু চলো এখানে বসতে মন আর চাইছে না।

চলো তাহলে।

•

সন্ধ্যা ঘনিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। মনিরা সাজগোজ করে ড্রইং রুমে বসে বসে বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে আর বারবার তাকাচ্ছে দেয়াল ঘড়িটার দিকে।

আজ রাত সাড়ে আটটায় এক বান্ধবীর বাড়িতে তার দাওয়াত আছে। মনিরা বনহুরকে বলে দিয়েছে। অবশ্য অবশ্য সে যেন গাড়ি নিয়ে আসে, তার গাড়িতেই যাবে মনিরা। নইলে সন্ধ্যার পর বাইরে বেরুবার সাহস নেই তার। চৌধুরী সাহেবও বারণ করে দিয়েছেন।

মনিরা উদ্বিগ্নভাবে পায়চারী শুরু করে, হাতঘড়ির দিকে তাকায়–আটটা বেজে গেছে।

এমন সময় গাড়ি-বারান্দায় মোটর থামার শব্দ হয়। পরক্ষণেই কক্ষে প্রবেশ করে বনহুর, হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলে বড় দেরী হয়ে গেছে, না?

মনিরা টেবিল থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে উঠিয়ে নিয়ে বলে–চলো।

অমনি মরিয়ম বেগম দু'জনের পাশে এসে দাঁড়ান। বনহুরকে লক্ষ্য করে বলেন–দেখ বাবা, তোমার ওপর ভরসা করেই ওকে বাইরে পাঠাচ্ছি। দস্যু বনহুরের ভয়ে আমার তো কণ্ঠনালী শুকিয়ে গেছে, আবার না সে মনির ওপর হামলা করে বসে।

মরিয়ম বেগমের ব্যথাকাতর কণ্ঠস্বর বনহুরের হৃদয়ে আঘাত করলো। তার মা, তার গর্ভধারিণী জননী আজ তারই ভয়ে ভীত। আজ তার নিকটে পুত্র পরিচয় দেবার কোন অধিকার নেই। বনহুরের চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। তার অবাধ্য কণ্ঠ দিয়ে হঠাৎ একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো–মা।

মরিয়ম বেগম বিস্ময়ভরা চোখে তাকালেন বনহুরের মুখে। এই মা ডাক তাঁর প্রাণে এক অপূর্ব শিহরণ জাগালো। মাতৃহৃদয় আকুলি বাকুলি করে উঠলো। তিনি আর চুপ থাকতে পারলেন না। জবাব দিল বল বাবা?

বনহুর ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। হেসে বলেন–দস্যু বনহুর আপনার কোন অন্যায় করবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

যাও বাবা, ওদিকে মনিরার সময় হয়ে এলো।

চলো মনিরা।

বনহুর আর মনিরা পাশাপাশি ড্রাইভ আসনে ওঠে বসলো। জনমুখর রাজপথ ধরে গাড়ি ছুটে চলেছে।

মনিরার শাড়ির আঁচলখানা বারবার বনহুরের গায়ে উড়ে উড়ে পড়ছিল। একটা সুমিষ্ট গন্ধ, বনহুরের প্রাণে দোলা লাগে।

বনহুর মৃদু হেসে বলে–মনিরা!

বলো?

এই নির্জন গাড়ির মধ্যে যদি মিঃ জামান না হয়ে দস্যু বনহুর থাকতো তোমার পাশে?

মনিরা দক্ষিণ হাতে বনহুরের মুখ চেপে ধরে ও নাম তুমি মুখে এনো, ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

মনিরা!

বলো?

দস্যু বনহুর কি মানুষ নয়?

মনিরা বনহুরের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে–ওসব আলোচনা না-ই বা করলে।

মনিরা, ধর বনহুর তোমাকে খুব ভালবেসে ফেলেছে, তার প্রতিদানে তাকে তুমি ভালবাসতে পারো না?

ছিঃ এসব কি বলছো? যে মানুষ নামের কলঙ্ক, তাকে নিয়ে তুমি ঠাট্টা করছো

মনিরা! অস্কুট ধ্বনি করে ওঠে বনহুর।

মনিরা চমকে উঠে বলে–কি হলো?

কিছু না। ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে ফেলে এসে গেছি।

বনহুর আর মনিরা কক্ষ থেকে চলে যাবার পর মরিয়ম বেগম সোফায় বসতে যাবেন, হঠাৎ সোফার পাশে একখানা নীল রঙের কাগজ পড়ে আছে। দেখতে পান।

কাগজখানা হাতে উঠিয়ে নিয়েই চমকে ওঠেন। তাতে লেখা রয়েছে–

আজ রাতে আমি আসবো
–দস্যু বনহুর

মরিয়ম বেগমের কম্পিত হাত থেকে কাগজখানা পড়ে যায়। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যান তিনি।

কিছুক্ষণের মধ্যে চৌধুরী সাহেব এসে পড়েন। স্ত্রীকে বিবর্ণ মুখে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করেন–অমন গম্ভীর হয়ে বসে আছ কেন?

মরিয়ম বেগম আংগুল দিয়ে কাগজখানা দেখিয়ে দেন।

চৌধুরী সাহেব কাগজখানা হাতে উঠিয়ে নিয়ে দৃষ্টি বুলাতেই থ হয়ে গেছেন, ঢোক গিলে বলেন–তাহলে উপায়?

মরিয়ম বেগম বলেন–এক্ষুণি পুলিশে খবর দাও।

ঠিক বলেছ। চৌধুরীসাহেব কালবিলম্ব না করে পুলিশ অফিসে ফোন করলেন। এইমাত্র দস্যু বনহুরের চিঠি পেয়েছি আমরা তো ভীষণ ভয় পাচ্ছি, মনিরাকে নিয়ে আমাদের যত ভাবনা। মিঃ হারুন, আপনিই এখন আমাদের ভরসা।

মনিরাকে নিয়ে বনহুর যখন ফিরে এলো, তখন চৌধুরীবাড়ি পুলিশে ভরে গেছে। মিঃ হারুন উদ্বিগ্নভাবে পায়চারী করছেন আর বলছেন–চৌধুরী সাহেব, এই ঘটনার পরও মনিরাকে সন্ধ্যার পর বাইরে পাঠানো আপনার উচিত হয়নি।

চৌধুরী সাহেব স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দেন ইন্সপেক্টার সাহেব, মনিরার সঙ্গে জামান আছে, সে সঙ্গে থাকলে ইনশাআল্লাহ-আমাদের আশঙ্কা করার কিছু নেই।

এসব আলোচনা চলছে, ঠিক সে সময় বনহুর আর মনিরা হাস্যোজ্জ্বল মুখে কক্ষে প্রবেশ করলো।

চৌধুরী সাহেব কলকণ্ঠে বলে ওঠেন–ঐ যে মনি এসে গেছে? দেখুন ইন্সপেক্টার সাহেব, আমি বললাম না আমাদের জামান থাকতে ওর কোন চিন্তা নেই।

একথা মিথ্যে নয় চৌধুরী সাহেব। জামান সাহেব সত্যই একজন বীর পুরুষ। কথাটা বলেন মিঃ হারুন।

মনিরা ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করে মামুজান, হঠাৎ ইনারা? আমি কিছু বুঝতে পারছিনে?

চৌধুরী সাহেব ভয়ার্তকণ্ঠে বলেন–ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটে গেছে।

বনহুর আশ্চর্য হবার ভান করে বলে–ভয়ঙ্কর ঘটনা! বলছেন কি? হঠাৎ কি ঘটলো?..

এই দেখ! চৌধুরী সাহেব নীল রঙের কাগজখানা পকেট থেকে বের করে বনহুরের হাতে দেন।

বনহুরের মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। কাগজখানা চৌধুরী সাহেবের হাতে দিয়ে বলে ভয় পাবার কিছু নেই।

–তার মানে? বিস্ময়ভরা গলায় বলে ওঠেন মিঃ হারুন। দস্যু বনহুরের চিঠি, অথচ আপনি বলছেন ভয় পাবার কিছু নেই।

ওটা বনহুরের একটা খেয়াল, বিশেষ করে পুলিশ মহলকে সে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে

আপনি দস্যু বনহুর সম্বন্ধে তেমন কিছু জানেন না, তাই ও কথা বলতে পারলেন। দস্যু বনহুর যে কত ভয়ঙ্কর তা শুধুমাত্র একদিনের লড়াইয়ে অনুভব করতে পারেননি সেদিন কোন বেকায়দায় পড়ে আপনার হাতে–

সে কাবু হয়েছে, কি বলেন? কথাটা বলে হাসে বনহুর।

চৌধুরী সাহেব বলে ওঠেন—সে যাই হইক বাবা, আজ আমি তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দেব না, থাকতেই হবে আমাদের এখানে।

তা কি করে হয় বলুন, বাসায় একটা জরুরী কাজ আছে।

তা রাতের বেলা এমন আর কি কাজ। থেকেই যান মিঃ জামান। কথাটা বিনয়ের সঙ্গে বলেন মিঃ হারুন।

মনিরার মুখের দিকে তাকায় বনহুর। মনিরার মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, করুণ দৃষ্টির মাধ্যমে বনহুরকে সে থাকার অনুরোধ জানায়।

অগ্যতা বনহুর থাকবে বলে কথা দেয়।

চৌধুরী সাহেব কতকটা আশ্বস্ত হন। মিঃ হারুনের মুখেও হাসি ফুটে ওঠে, যাক তবু একজন শক্তিশালী সাহসী ব্যক্তি আজ তাদের সঙ্গী হলো–যদি দস্যু বনহুর এসেই পড়ে, কৌশলে তাকে বন্দী করার সুযোগ হলেও হয়ে যেতে পারে।

.

গভীর রাত।

সে হোটেল, হোটেলের সম্মুখে একটি গাড়ি এসে থেমে ছিল।

অমনি একটা থামের আড়ালে লুকিয়ে ছিল দুটি ছায়ামূর্তি।

গাড়ি থেকে নামলো সে কাবুলীওয়ালা। অন্ধকারে চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলো, তারপর দ্রুত হোটেলে প্রবেশ করলো।

ছায়ামূর্তি দুটি অতি গোপনে কাবুলীওয়ালাকে অনুসরণ করলো, হোটেলের বাইরে অন্ধকারে লুকিয়ে রইলো পুলিশ ফোর্স। ছায়ামূর্তি দুটি অন্য কেউ নয়, একজন মিঃ শঙ্কর রাও, অন্যজন গোপালবাবু। তারা অতি সাবধানে এগিয়ে চলেন।

কিছুদূর এগুতেই শুনতে পেলেন তাঁরা একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর। মিঃ শঙ্কর রাও কান পেতে চেষ্টা করলেন, কোন এক গোপন কক্ষ থেকে আওয়াজ ভেসে আসছে–একটা লোকের সঙ্গে তোমরা এতগুলো লোক পারলে না, তোমরা কাপুরুষ। যত টাকা লাগে লাগবে, মেয়েটাকে আমার চাই। নইলে মনে রেখ, তোমাদের প্রত্যেককে আমি গুলি করে হত্যা করবো।

একটা ভারী কর্কশ কণ্ঠস্বর–হুজুর, সবাই পালিয়ে গেলেও আমি পালাইনি, শেষ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেছি–

পুনরায় পূর্বের কণ্ঠ–আমি কোন কৈফিয়ত শুনতে চাইনে। এবার যদি তোমরা বিফল হও, আমি কাউকে ক্ষমা করবো না।

নির্জন নিস্তব্ধ হোটেলের ভিতরে জেগে উঠলো ভারী বুটের শব্দ। কেউ যেন এগিয়ে আসছে।

জমকালো রিভলবারটা দক্ষিণ হাতে চেপে ধরে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে দাঁড়ালেন মিঃ শঙ্কর রাও।

গোপাল বাবু তার কানে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলেন–দস্যু বনহুর এদিকেই আসছে।

হ্যাঁ, তুমি রিভলবার ঠিক রেখে সাবধানে দাঁড়াও।

অন্ধকারে লক্ষ্য করলেন শঙ্কর রাও, হোটেল থেকে বেরিয়ে আসছে সে কাবুলীওয়ালা। অমনি এক লাফে মিঃ শঙ্কর রাও কাবুলীওয়ালার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রিভলবার বাকিয়ে ধরলেন, খবরদার, নড়বে না, নড়লেই মৃত্যু।

হঠাৎ এ বিপদের জন্য ঘাবড়ে গেল কাবুলীওয়ালা।

গোপালবাবু ততক্ষণে বাঁশিতে ফুঁ দিয়েছেন।

মুহূর্তে হোটেলকক্ষ পুলিশ ফোর্সে ভরে উঠলো।

ধীরে ধীরে হাত তুলে দাঁড়ালো কাবুলীওয়ালা।

একজন পুলিশ অফিসার তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

মিঃ শঙ্কর রাও অন্যান্য পুলিশকে ইঙ্গিত করলেন হোটেলের ভিতরে প্রবেশ করে দস্যুর অনুচরগণকে বন্দী করতে কিন্তু হোটেলে কোথাও কাউকে পাওয়া গেল না, সবাই যেন হাওয়ায় মিশে গেছে।

মিঃ শঙ্কর রাও এবং গোপাল বাবু পুলিশ ফোর্স নিয়ে বীরদর্পে ফিরে চলেন। তাদের মনে আনন্দ ধরে না। দস্যু বনহুরকে বন্দী করতে পেরেছেন, এটাই সবচেয়ে বড় আনন্দের কথা।

কাবুলীওয়ালাকে হাজতে বন্দী করে কড়া পাহারায় রেখে মিঃ শঙ্কর রাও যখন বাসায় ফিরলেন, তখন আশ্চর্য হয়ে গেল, পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন তার জন্য অপেক্ষা করছেন।

মিঃ শঙ্কর রাওকে দেখামাত্র মিঃ হারুনু বলে ওঠেন—আপনি এসে গেছেন ভালই হলো। এক্ষুণি আপনাকে চৌধুরী বাড়ি যেতে হবে।

কেন?

দস্যু বনহুর চিঠি দিয়েছে, সে নাকি আজ রাতে হানা দেবে।

বলেন কি, দস্যু বনহুর।

হ্যাঁ।

কিন্তু তাকে আমি এইমাত্র হাজতে বন্দী করে রেখে এলাম।

সে কি রকম।

আপনাকে পুলিশ অফিসে না পেয়ে মিঃ আহমদের নিকট পারমিশন, নিয়ে পুলিশফোর্স সঙ্গে করে সে হোটেলে হানা দিয়েছিলাম। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি। গর্বিতভাবে বলেন মিঃ শঙ্কর রাও।

মিঃ হারুন বিস্ময়ভরাকণ্ঠে বলেন–দস্যু বনহুরকে এত সহজেই গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছেন, বড় আশ্চর্যের কথা! চলুন, প্রথমে তাকে

একবার স্বচক্ষে দেখে আসি। উঠে পড়েন ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন।

চলুন।

দেখুন আপনি এইমাত্র ক্লান্ত হয়ে ফিরলেন, পুনরায় কষ্ট করে–না না, এতে আমার কিছু মাত্র কষ্ট হবে না।

গাড়িতে উঠে বসেন মিঃ হারুন এবং শঙ্কর রাও।

পুলিশ অফিসে পৌঁছতেই শশব্যস্তে এগিয়ে এলেন সাবইন্সপেক্টার মিঃ কায়সার-স্যার, চৌধুরী বাড়ি থেকে আপনার নিকট ফোন এসেছে। এইমাত্র নাকি দস্যু বনহুরের আর একখানা চিঠি পাওয়া গেছে।

একসঙ্গে বলে উঠেন মিঃ হারুন এবং শঙ্কর রাও–দস্যু বনহুরের চিঠি!

ইয়েস স্যার!

মিঃ শঙ্কর রাও বলে ওঠেন–চলুন দেখবেন, আমি দস্যু বনহুরকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছি কিনা।

চলুন।

আরও কয়েকজন অফিসারসহ মিঃ হারুন এবং মিঃ শঙ্কর রাও হাজত কক্ষে প্রবেশ করলেন। মিঃ হারুন ও মিঃ শঙ্কর রাও এগিয়ে যান কাবুলীওয়ালাবেশী বন্দীর দিকে।

মিঃ হারুন সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ তাকালেন.বন্দীর মুখে, তারপর হেসে বলেন–দস্যু বনহুর এ নয়, মিঃ রাও।

তার মানে?

মানে এই দেখুন। একটানে কাবুলীওয়ালার দাড়ি খুলে ফেলেন মিঃ হারুন

সকলে বিস্ময়ে চমকে ওঠেন। মিঃ শঙ্কর রাও অবাক হয়ে বলেন–একি, এ যে খানবাহাদূর সাহেবের ছেলে মিঃ মুরাদ!

মিঃ হারুন বলে ওঠেন–শিগগির চলুন, বনহুর হয়তো এতক্ষণে চৌধুরীবাড়িতে হানা দিয়েছে।

আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে মিঃ হারুন, মিঃ শঙ্কর রাও এবং গোপাল বাবু ছুটলেন চৌধুরীবাড়ির উদ্দেশ্যে। যদিও সেখানে পুলিশ পাহারা রাখা হয়েছে, তবুও তারা নিশ্চিন্ত নন।

কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেল তারা চৌধুরীবাড়িতে। কিন্তু পৌঁছতেই চৌধুরী সাহেব হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন–ইন্সপেক্টার সাহেব, এত কড়া পাহারার মধ্যেও দস্যু বনহুর এসেছিল।

বলেন কি!

হ্যাঁ, আপনি এদিকে পাহারার ব্যবস্থা করে চলে যাবার পর আমি বড় ক্লান্তি অনুভব করলাম। তাই একটু বিশ্রামের জন্য নিজের কক্ষে গেলাম, দরজা বন্ধ করে যেমনি বিছানায় শুতে যাব, অমনি আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো এক ছায়ামূর্তি! কি ভয়ংকর তার চেহারা, রিভলবার উদ্যত করে বলেন সে ভয় নেই, আমি আপনাকে হত্যা করবো না, কিন্তু আমার একটা কথা আপনাকে রাখতে হবে–একটু থামলেন চৌধুরী সাহেব।

কক্ষের সকলে স্তব্ধ নিশ্বাসে শুনছেন তার কথাগুলো। মিঃ হারুন একবার কক্ষের চারিদিকে তাকিয়ে নিলেন।

চৌধুরী সাহেবের অনতিদূরেই দাঁড়িয়ে আছে মনিরা, তার ওপাশেই আর একটা সোফায় বসে আছে বনহুর। মিঃ হারুন কক্ষে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিতেই বনহুরের দৃষ্টি বিনিময় হলো।

চৌধুরী সাহেব বলে চলেন আমি বললাম, তুমিই দস্যু বনহুর? সে জবাব দিল, হ্যাঁ, আমার কথা না রাখলে মৃত্যু আপনার অনিবার্য। আমি ভয়ে কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, বলো তুমি কি বলতে চাও? সে বলেন–সাবধান, মনিরার বিনা অনুমতিতে কখনও তাকে বিয়ে দিতে যাবেন না যেন। কথা শেষ করেই সুইচ টিপে ঘর অন্ধকার করে ফেললো। আমি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলাম। সবাই যখন ছুটে এলো, আলো জ্বেলে দেখি কোথায় বনহুর, কেউ নেই!

মিঃ হারুন গম্ভীরকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন–হুঁ।

মিঃ শঙ্কর রাও বলে ওঠেন–আপনার ভাগ্নির বিয়েতে মতামত সম্বন্ধে দস্যু বনহুরের কি স্বার্থ থাকতে পারে?

চৌধুরী সাহেব বলেন–নিশ্চয়ই বনহুরের দৃষ্টি আমার মনিরার উপর পড়েছে।

সে কথা মিথ্যে নয়, চৌধুরী সাহেব। এ না হলে সে এখানে আসতে যাবে কেন? সত্যি আমি বড় দুঃখিত, নিজে থেকেও তাকে গ্রেপ্তার করতে পারলাম না। কথাগুলো বলেন দস্যু বনহুর।

না, না, এতে দুঃখ করার কিছু নেই বাবা! তুমিই বা এ অবস্থায় কি করবে। চৌধুরী সাহেব বনহুরকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন।

মিঃ হারুন হঠাৎ গম্ভীরকণ্ঠে বলে ওঠেন চৌধুরী সাহেব, বনহুরকে আজ আমি গ্রেপ্তার করবোই।

সকলেই বিস্ময়ভরা নয়নে তাকালেন মিঃ হারুনের মুখে।

মিঃ হারুন তেমনিভাবেই বলেন সে এ কক্ষেই বিদ্যমান। একসংগে বলে ওঠেন– বলেন কি!

মনিরা ভয়ার্ত চোখে তাকালো কক্ষের চারিদিকে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো বনহুরের পাশে। সবচেয়ে নিরাপদ স্থান যেন ওর ওটা।

মিঃ হারুন ঠিক সে মুহূর্তে রিভলবার বের করে উদ্যত করে ধরলেন বনহুরের দিকে এবং পুলিশদেরকে বলেন–ঐ ভদ্র যুবককে গ্রেপ্তার কর।

মনিরা স্তব্ধ নিঃশ্বাসে তাকালো বনহুরের মুখে। বনহুরও একবার তাকিয়ে নিল মনিরার মুখের দিকে। তারপর চোখের পলক মাত্র; আচমকা এক ঝটকায় মিঃ হারুনের হাত থেকে রিভলবার কেড়ে নিয়ে লাফিয়ে ছিল মুক্ত জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে।

পুলিশ ফোর্স একসঙ্গে গুলি ছুঁড়লো—গুড়ুম গুড়ুম। কতকগুলো পুলিশ। ছুটলো অন্ধকারে।

মনিরার মনে তখন ঝড়ের তাণ্ডব বইতে শুরু করেছে। কম্পিত প্রাণে সে আল্লাহকে স্মরণ করলো–হে আল্লাহ, ওকে তুমি বাঁচিয়ে নাও। ওকে বাঁচিয়ে নাও!

চৌধুরী সাহেব মেরে গেছেন। তাঁর শুষ্ক কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এলো–এ কি করে সম্ভব হয়? মনে মনে একটা গভীর ব্যথা অনুভব করেন। চোখ দুটো কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসে।

মিঃ হারুন হাবা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি হতভম্ব হয়ে ছিল। এর জন্য তিনি মোটেও প্রস্তুত ছিল না। এত দ্রুত তার হাত থেকে বনহুর রিভলবার ছিনিয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল যে, কিসে কি হলো মিঃ হারুন বুঝতেই পারলেন না। চেহারা তার বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। দস্যু বনহুরকে এত নিকটে পেয়েও হারালেন!

মিঃ শংকর রাও হেসে বলেন–ইন্সপেক্টার সাহেব, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করা যত সহজ মনে করা যায়, তত সহজ নয়।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন–কিন্তু আমি দেখে নেবো দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে পারি কিনা! কথাটা বলে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান মিঃ হারুন। অন্যান্য পুলিশ অফিসার এবং পুলিশগণ তাকে অনুসরণ করে।

.

গোটারাত মনিরার অদ্রিায় কাটলো। পরদিন ভোরে চায়ের টেবিলে বসে কন্যা সমতুল্যা ভাগনীর চেহারা লক্ষ্য করে চৌধুরী সাহেব বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে ছিল। তিনি জানেন, মনিরা জামানকে কত ভালবাসতো। চৌধুরী সাহেব নিজেও কম ভালবাসেন কি! অমন চেহারা; অমন ব্যবহার, কে না তাকে ভালবেসে পারে! কিন্তু সে যে সে ডাকাত শুধু। ডাকাত নয়, দুর্দান্ত দস্যু বনহুর যার ভয়ে আজ গোটা দেশবাসী কম্পমান। না না, তাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেন না চৌধুরী সাহেব। যতই সে ভাল হউক, যতই সে মহৎ হউক তবু সে দস্যু। শাস্তি তার পাওয়া উচিত।

চৌধুরী সাহেব মনিরার মনকে প্রফুল্ল করার জন্য হেসে বলেন–মনি, চল মা সকাল বেলাটা কোথাও থেকে ঘুরে আসি। আজ ক’দিন থেকে তোমার মামীমাও বেড়াতে যাব বলছেন।

মনিরা চায়ের খালি কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে গম্ভীর কণ্ঠে বলেনমামুজান, আজ আমার যে এক বান্ধবীর বাড়ি যাবার কথা আছে। হাতঘড়ির দিকে তাকায় মনিরা, তারপর উঠে দাঁড়ায়।

চৌধুরী সাহেব বুঝতে পারলেন, মনিরা নিশ্চয়ই সে দস্যু বনহুরের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। একদিন কথায় কথায় তিনি মনিরার নিকটে শুনেছিল শহরের শেষ

প্রান্তে জামানের বাড়ি। রাস্তার নাম এবং নম্বরটাও তার স্পষ্ট মনে আছে। মনে মনে হাসলেন চৌধুরী সাহেব। এমন একজন দস্যুকে গ্রেপ্তার করিয়ে দিতে পারলে শুধু তার সুনাম হবে না, এতে কৃতিত্ব আছে অনেক।

মনিরা কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতেই চৌধুরী সাহেব স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলেন– জানো মরিয়ম, মনি এখন কোথায় গেল?

মরিয়ম বেগম বলেন—মনি তো বলেই গেল তার কোন বান্ধবীর বাড়ি যাবে সে।

না গো না, মনি গেল সে দটার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

তুমি জানলে, অথচ বাধা দিলে না?

না, আমি বাধা দেব না; বরং তার সাক্ষাতে আমি দস্যু বনহুরকে পুলিশের হাতে তুলে দেব!

এসব তুমি কি বলছো?

হ্যাঁ মরিয়ম, মনিরা ছদ্মবেশী দ্রযুবক দস্যু বনহুরকে ভালবেসে ফেলেছে। শুধু ভালবেসেছে নয়, তাকে সে গোটা অন্তর দিয়ে কামনা করে আসছে।

দেখ শুধু কি মনিরাই তাকে ভালবেসেছিল। কি জানি, আমার গোটা মনটাও যেন সে অধিকার করে বসেছিল। সত্যি সে যে দস্যু, একথা আমি এখনও ভাবতে পারিনে। আমার মনটা কেমন যেন ব্যথায় গুমড়ে কেঁদে উঠছে। বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে মরিয়ম বেগমের কণ্ঠ।

চৌধুরী সাহেবের হৃদয়ে ব্যথার আঁচ লাগে। তিনি গম্ভীর গলায় বলেন–কি যাদু জানে সে, কে জানে। কেন যে ওকে এত ভালো লাগতো আমি নিজেও বুঝি না। যাক শুনো মরিয়ম, আমি এক্ষুণি পুলিশ অফিসে যাব।

কেন? আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন মরিয়ম বেগম।

দস্যুকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারিনে, যতই মহৎ, যতই উদার হউক সে, যতই গুণ তার থাক, তবু সে দস্যু। আমার কর্তব্য তাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়া।

কি হবে তাকে পুলিশে দিয়ে! তাছাড়া তোমার তো এতে কোন স্বার্থ নেই? আমি জানি সে যত বড় দস্যু হউক, আমাদের কোন ক্ষতিই সে করবে না কোনদিন।

আমাদের ক্ষতি সে নাও করতে পারে। তবু চোর-ডাকাত এদের কোন বিশ্বাস নেই। বিশেষ করে দেশবাসীকে ঐ দস্যুর হাত থেকে আমাকে

বাঁচাতেই হবে। উঠে দাঁড়ালেন চৌধুরী সাহেব।

মরিয়ম বেগম বলেন–কোথায় চললে?

ঐ তো বললাম পুলিশ অফিসে। মিঃ হারুন এবং পুলিশ ফোর্স নিয়ে এক্ষুণি আমি জামানের বাড়ি যাব।

কিন্তু—

মনিরা সেখানে আছে, এই তো?

হ্যাঁ।

সে কথা আমি সব বলে নেব হারুন সাহেবকে। মনিরাকে পাঠিয়ে আমি যেন তাকে গ্রেপ্তারের সুযোগ করে নিয়েছি।

ওগো, আমিও যাব তোমার সঙ্গে। মনিরাকে আমি নিজে গিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো।

তবে তৈরি হয়ে নাও। এক্ষুণি বেরুবো, আমার মনে হয় সে এখনও বাড়িতে আছে। কারণ সে মনিরার জন্য অপেক্ষা করবেই।

.

মনিরা কক্ষে প্রবেশ করতেই বনহুর উঠে দাঁড়ালো। মনিরা গম্ভীর দৃষ্টি নিয়ে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। বনহুর এগিয়ে এলো মনিরার পাশে। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরবে কাটলো।

বনহুরই প্রথমে কথা বলেন আমি জানি তুমি আসবে, তাই আমি এতক্ষণ তোমার প্রতীক্ষায় আছি।

মনিরা নীরব।

বনহুর ওর চিবুক উঁচু করে ধরলো–মনিরা কি ভাবছো? খুব ঘৃণা হচ্ছে বুঝি?

এতক্ষণে মনিরা কথা বলেন–আমি তোমাকে ঘৃণা করি না, ঘৃণা করি বনহুরকে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এ আমি ভাবতেও পারি না জামান, তুমি দস্যু বনহুর।

মনিরা, মনিরা–রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বনহুর মনিরাকে টেনে নিল কাছে।

মনিরা বনহুরের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সরে দাঁড়ালো তুমি আমাকে স্পর্শ করো না।

মনিরা!

হ্যাঁ, তুমি অপবিত্র ঘৃণিত একটা মানুষ–

মনিরা, তুমি বিশ্বাস করো আমি অপবিত্র ঘৃণিত নই। আমি দস্যু নই। দস্যুতা আমার পেশা নয়। মনিরা তুমি আমাকে ঘৃণা করো না। পুনরায় বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় কাছে।

না না, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও–তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই, আমি চললাম।

না, তোমাকে আমি যেতে দেব না। মনিরাকে দক্ষিণ হাতে শক্ত করে ধরলো বনহুর। আরেক হাতে এক ঝটকায় নিজের জামার নিচে গলা থেকে সে হারছড়া টেনে বের করে মেলে ধরলো মনিরার সামনে চিনতে পার এই ছবি দুটি কাদের?

বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলো মনিরা–এ ছবি তোমার গলায় এলো কি করে? এ যে আমার আর মনিরের ছবি।

বনহুর তখন মনিরাকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন–তোমাদের সে হতভাগ্য মনির আর কেউ নয়–দস্যু বনহুর।

মনিরা আর্তনাদ করে উঠলো–জামান, তুমিই মনির? কেন–কেন তুমি এসব করতে গেলে?

বনহুর মনিরাকে নিবিড়ভাবে বুকে চেপে ধরলো, তারপর বলেন–এই আমি তোমাকে স্পর্শ করে বলছি মনিরা, আর আমি দস্যুতা করবো না।

ঠিক সে মুহূর্তে মিঃ হারুনসহ চৌধুরী সাহেব কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁদের পেছনে পুলিশ ফোর্স।

সঙ্গে সঙ্গে মনিরাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো বনহুর। বুঝতে পারলো সে, তার পিতাই আজ তাকে পুলিশের হাতে সপে দেয়ার জন্য আয়োজন করেছেন। পালালে সে এক্ষুণি পালাতে পারে। তার পায়ের তলাতে আছে এক চোরা সুড়ঙ্গ। এখনই সে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এ যে তার পিতাকে অপমান করা হবে।

মনিরার চোখেমুখেও বিস্ময়, হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

মিঃ হারুন এগিয়ে গেল বনহুরের দিকে। বনহুর হাত দু'খানা বাড়িয়ে দিল।

মিঃ হারুন নিজ হাতে বনহুরের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

মনিরা আর্তনাদ করে চৌধুরী সাহেবের জামার আস্তিন চেপে বলেনমামুজান, এ তুমি কি করলে? এই দেখো–মালাছড়া চৌধুরী সাহেবের হাতে দিন মনিরা।

এমন সময় চৌধুরী সাহেবের গাড়ি থেকে নেমে এলেন মরিয়ম বেগম। কারণ মনিরার আর্তচিৎকার তার কানে পৌঁছে ছিল, ভাগ্নীর কোন অমঙ্গল আশঙ্কা করেই তিনি ছুটে এলেন।

চৌধুরী সাহেব মালাছড়া হাতে নিয়েই চিনতে পারলেন। এ মালা যে তার অতি পরিচিত। তিনি কিছুক্ষণ শুদ্ধ হয়ে মালার লকেটের ছবি দুটির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—এ মালা তুই কোথায় পেলি, মনিরা।

মনিরা আংগুল দিয়ে বনহুরকে দেখিয়ে বলেন–ওর গলায়।

অবাক হয়ে তাকান চৌধুরী সাহেব বনহুরের দিকে।

মনিরা বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলে–মামুজান, ঐ তোমাদের সন্তান মনির।

চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগম স্থির নয়নে দেখতে লাগলেন বনহুরকে। তাদের চোখের সামনে বনহুরের মুখ মিশে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠলো একটা শিশু মুখ।

মরিয়ম বেগম ছুটে গিয়ে বনহুরকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে বাবা মনির। আমার মনির–

চৌধুরী সাহেবের গণ্ড বেয়ে ঝর ঝর করে তখন ঝরে পড়ছে অশ্রুধারা। মনকে তিনি কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারছেন না।

মরিয়ম বেগম উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেংগে ছিল, স্বামীকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন– ওগো, কি করলে তুমি? হারানো রত্ন ফিরে পেয়ে আবার তুমি হারালে। না না, আমি মনিরকে কিছুতেই দূরে নিয়ে যেতে দেব না। দেব

–মনির আমার মনির–পুত্রের বুকে মাথা ঠুকে কাঁদতে লাগলেন মরিয়ম বেগম।

মিঃ হারুন কঠিন কণ্ঠে বলেন—বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে।

বনহুরের শান্ত ধীরস্থির গলায় বলেন–চলুন, ইন্সপেক্টার সাহেব।

সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরী সাহেব পুত্রের হাত চেপে ধরে কেঁদে উঠলেন–বাবা মনির।

বনহুর হেসে বলেন–আব্বা, আপনার কর্তব্য আপনি পালন করেছেন।

একবার মা ও মনিরার দিকে তাকায় বনহুর, উভয়ের চোখেই পানি, বনহুরের চোখ দুটোও অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো।

মনিরা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো–মনির, আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকবে!

০০২. দস্যু বনহুরের নতুন রূপ

দস্যু বনহুরের নতুন রূপ – ২

০১.

গাঢ় অন্ধকারে গোটা পৃথিবী আচ্ছন্ন। আকাশে দু'একটি তারকা ক্ষুদে বিড়ালের চোখের মত মিটমিট করে জ্বলছে। বাতাস স্তব্ধ হয়ে গেছে। গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত নড়ছে না। চারদিকে একটা গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। অন্ধকারে বিরাট বিরাট গাছ এক একটা দৈত্যের মতই মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে দূর থেকে ভেসে আসছে কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ। এছাড়া কোন শব্দই নেই যেন দুনিয়ায়।

অন্ধকারের বুকে গা এলিয়ে দিয়ে শহরটাও যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। শহরের বিশিষ্ট স্থানে বিরাট আকাশচুম্বী প্রাচীরে ঘেরা হাঙ্গেরী কারাগার।

সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত এই কারাগারের একটি কক্ষে বন্দী দস্যু বনহুর। সশস্ত্র পুলিশ রাইফেল হাতে অবিরত সজাগ পাহারা দিচ্ছে। নিস্তব্ধ কারাগার কক্ষে শুধু জেগে উঠেছে সজাগ প্রহরীর ভারী বুটের শব্দ—খট খট খট।

০২.

গভীর রাত।

কারাগারের বড় ঘড়িটা ঢং ঢং শব্দে রাত দুটো ঘোষণা করলো। মেঝেতে পাতা শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো দস্যু বনহুর, নিজ মনে একটু হাসলো সে। তারপর দ্রুতপদে কারাগার কক্ষের পেছন দিকে এগিয়ে গেল। কাপড়ের ভেতর থেকে বের করলো একটা সিলক কর্ড। কর্ডখানা ছুড়ে মারলো দেয়ালের গায়ে প্রায় দশ

বারো হাত উচুতে ভেন্টিলেটার লক্ষ্য করে। একবার, দু'বার, তিনবার, আটকে গেল কর্ডখানা ভেন্টিলেটারের সঙ্গে। জহুর আর বিলম্ব না করে কর্ড বেয়ে দ্রুত উপরে উঠতে লাগলো মসৃণ দেয়ালে কিছুতেই পা আটকাচ্ছিল না, অতি কষ্টে উঠতে লাগলো। কারাকক্ষ অন্ধকার, তাই পাহারাদারগণ টেরও পেল না। বনহুর অতিকষ্টে একেবারে ভেন্টিলেটারের পাশে পৌঁছে গেল।

বনহুরের সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠেছে। বার বার হাতের পিঠে ললাটের ঘাম মুছে নিচ্ছিলো সে। কর্ডদাঁতে চেপে ধরে ভেন্টিলেটারের শিক হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বনহুর, তারপর দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে শিকে চাপ দেয়। অদ্ভুত শক্তি বনহুরের শরীরে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেন্টিলেটারের শিক বাঁকিয়ে ফেলে সে। একজন বের হতে পারবে, এতটুক ফাঁক করে নিয়ে বনহুর নিঃশ্বাস ফেলে। এবার আর তাকে কে পায়। সে দ্রুত ভেন্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে কক্ষের ও পাশে গিয়ে পৌঁছে। বনহুর কর্ডখানা খুলে পুনরায় কাপড়ের নিচে আন্ডার ওয়্যারের মধ্যে লুকিয়ে ফেললো। এবার সে দেয়াল বেয়ে অতি নিপুণতার সঙ্গে নিচে এলো। সঙ্গে সঙ্গে একজন পাহারাদার দেখে ফেললো তাকে। বনহুরকে লক্ষ্য করে রাইফেল উঁচু করে গুলি ছুড়লো। বনহুর চট করে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে আত্মরক্ষা করলো এবং পরক্ষণেই ছুটে এসে জাপটে ধরলো পাহারারত পুলিশটিকে। বলিষ্ঠ হাতের কঠিন চাপে পাহারাদারটির হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নিয়ে ছুটতে লাগলো সে কারাগারের ফটক অভিমুখে।

রাইফেলের গুলির শব্দে চারদিক থেকে অন্য পাহারাদারগণ শশব্যস্ত ছুটে এলো। মুহূর্তে কারাগারের মধ্যে বন্দী পালানোর সংকেত ধ্বনি বেজে উঠলো।

বনহুরকে লক্ষ্য করে সমস্ত পুলিশ ছুটতে শুরু করলো।

বনহুর কখনও থামের আড়ালে, কখনও বা হামাগুড়ি দিয়ে আত্মগোপন করে ফটকের দিকে এগুতে লাগলো।

ইতোমধ্যে গোটা হাঙ্গেরী কারাগার প্রকম্পিত করে বিপদ সংকেত ধ্বনি হতে লাগলো। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী উদ্যত রাইফেল হাতে এদিক ওদিক ছুটতে লাগলো।

বনহুর অতি সাবধানে এগুচ্ছে ফটকের দিকে। কয়েকজন পুলিশ উদ্যত রাইফেল হাতে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। বনহুর একটা টবের আড়ালে গুটিসুটি

মেরে বসে রইলো। পুলিশের দল সরে যেতেই আবার এগুতে শুরু করলো সে।

অতি অল্প সময়ে ফটকের নিকট পৌঁছে গেল বনহুর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুজন পুলিশ তার সামনে রাইফেল উঁচু করে ধরলো।

পেছনে অসংখ্য পুলিশ ছুটে আসছে। প্রত্যেকের হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র। কালবিলম্ব না করে বনহুর সামনে পুলিশ দু'জনকে লক্ষ্য করে কর্ডটা ছুড়ে মারে। হঠাৎ এমন বিপদের জন্য তৈরি ছিল না পুলিশদয়। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল ওরা। তাদের হাতের রাইফেল ছিটকে পড়লো দূরে! বনহুর দ্রুতহস্তে কর্ডখানা ওদের শরীর থেকে খুলে নিয়ে ছুড়ে মারলো ফটকের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে কউখানা আটকে গেল। বনহুর কোমরের বেটে রিভলভার খানা গুঁজে রেখে দ্রুত কর্ডবেয়ে ফটকের মাথায় উঠে গেল।

ততক্ষণে পুলিশ বাহিনী ফটকের নিকটে পৌঁছে গেছে। কয়েকজন পুলিশ বনহুরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো। কিন্তু তখন বনহুর লাফিয়ে পড়েছে ফটকের ওপাশে।

ফটকের ওপাশে যে দু'জন পুলিশ রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছিলো, তারা বনহুরকে দেখামাত্র রাইফেল উঁচু করে ধরে। একজন গুলি ছুঁড়ে বনহুরের বুক লক্ষ্য করে, বনহুর মুহূর্তে সরে দাঁড়ায়, গুলিটা গিয়ে বিদ্ধ হয় অপর পুলিশের বুকে।

একটা ক্ষীণ আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে পুলিশটা।

অপর পুলিশ পুনরার রাইফেল তুলে গুলি ছুঁড়তে যায়, কিন্তু বনহুর তার পূর্বেই রিভলভারের এক গুলিতে পাহারাদার পুলিশকে তার সঙ্গীর সঙ্গে পরপারে পাঠিয়ে দেয়।

তারপর ছুটতে থাকে সম্মুখের দিকে।

অল্পক্ষণের মধ্যে ফটক খুলে পুলিশ ফোর্স বেরিয়ে এলো, সবাই ছুটতে লাগলো এদিকে সেদিকে। কোন দিকে গেছে বনহুর কেউ জানে না।

হাঙ্গেরী কারাগারে বিপদ সংকেত ঘণ্টা অবিরাম গতিতে বেজে চলেছে।

বনহুর ছুটতে ছুটতে রাস্তার ধারে একটা ডাস্টবিনের আড়ালে লুকিয়ে ছিল।

তার পাশ কেটে চলে গেল একটা পুলিশ ভ্যান। ভ্যানে বিশ-পঁচিশজন পুলিশ রাইফেল উদ্যত করে দাঁড়িয়ে আছে। কারখানা চলে গেলে বনহুর সোজা হয়ে বসলো।

অল্পক্ষণেই সমস্ত শহরে হাঙ্গেরী কারাগারের বিপদ-সংকেত ধ্বনি ছড়িয়ে ছিল। সবাই আন্দাজ করে নিল নিশ্চয়ই দস্যু বনহুর পালিয়েছে।

বনহুর বন্দী হওয়ার গোটা শহরে একটা শান্তি ফিরে এসেছিল। আবার নগরবাসীদের মুখমণ্ডল ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে পড়লো।

বনহুর ডাস্টবিনের আড়ালে লুকিয়ে কোন গাড়ির প্রতীক্ষা করতে লাগলো। ইতোমধ্যে আর একটি পুলিশ ভ্যান সে রাস্তা দিয়ে চলে গেল। বনহুর হামাগুড়ি দিয়ে বসে রইলো। হঠাৎ যদি কোন পুলিশ তাকে দেখে ফেলে, তাহলে আবার তাকে ফিরে যেতে হবে হাঙ্গেরী কারাগারকক্ষে।

বনহুর এদিক-ওদিক লক্ষ্য করে দেখছে। হঠাৎ দেখতে পেল স্টেশনের দিকে থেকে একখানা ঘোড়ার গাড়ি সে পথে এগিয়ে আসছে। হয়তো বা কোন ট্রেনযাত্রী হবে। গাড়ির সামনে বেডিংপত্র রয়েছে।

বনহুর এ সুযোগ নষ্ট করলো না। পথের একপাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়িখানা দ্রুত এগিয়ে আসছে। লাইটপোস্টের ক্ষীণালোকে দেখল কোচোয়ান গাড়ির ওপরে বসে লাগামটা শক্ত করে ধরে আছে। তার দক্ষিণ হাতে চাবুক। মাঝে মাঝে ঘোড়ার পিঠে চাবুকখানা সপাং করে গিয়ে পড়ছে।

গাড়িখানা বনহুরের পাশে আসতেই সে ক্ষিপ্র হস্তে গাড়ির দরজা ধরে পাদানীতে উঠে দাঁড়ায় এবং এক মুহূর্তে বিলম্ব না করে গাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে।

গাড়ির ভেতরে একটি যুবক বসে বসে ঝিমাচ্ছিল। বনহুর তাকে কিছু বুঝার সময় না দিয়ে তার মুখটা শক্ত করে চেপে ধরলো। সে লক্ষ্য করলো যুবকটা হিন্দু, কারণ তার শরীরে ধুতি আর পায়জামা। এতে বনহুরের সুবিধা হলো, ধুতির আঁচল দিয়ে অতি সহজেই যুবকটিকে মজবুত করে বেঁধে ফেললো। পূর্বেই যুবকের পকেট থেকে রুমালখানা বের করে গুঁজে দিয়েছিল সে তার মুখের মধ্যে,

কাজেই যুবক একটু শব্দও করতে পারল না। যুবকের হাত-পা মজবুত করে বেঁধে গাড়ির মেঝেতে ফেলে দেয় বনহুর।

কোচোয়ান একবার চিৎকার করে বলে-বাবু, অত নড়াচড়া করছেন কেন?

বনহুর একটু কেশে জবাব দেয়-বড় ঠাণ্ডা লাগছে, তাই দরজা, জানালার শার্সী লাগিয়ে দিচ্ছি।

কোচোয়ান আর কোন কথা বলে না।

বনহুর অতি সহজেই কাজ সমাধা করে ফেললো। এবার বনহুর দেখতে পেল, গাড়ির মধ্যে একটি সুটকেস রয়েছে। বনহুর যুবকের পকেট থেকে চাবি নিয়ে সুটকেসটা খুলে ফেললো। যুবকের পকেটেই একটা ম্যাচ ছিল, বনহুর ম্যাচ জ্বেলে দেখলো তার মধ্যে যুবকের প্যান্ট-শার্ট-কোট রয়েছে। আরও অনেক কিছু রয়েছে সুটকেসে। বনহুর চটপট প্যান্ট-শাট আর কোট গায়ে পরে নিল। ভাগ্য ভাল বলতে হবে, বনহুরের মতই ছিল যুবকটির শরীরের মাপজোক, তাই কোন অসুবিধা হলো না। কিন্তু এবার বিপদে ছিল সে। প্যান্ট-সার্ট-কোটতো হলো, কিন্তু জুতো যে নেই তার পায়ে। হঠাৎ খেয়াল হলো যুবকের পায়ে নিশ্চয়ই জুতো আছে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে যুবকের পা থেকে জুতো খুলে নিল, মনে মনে খোদার নাম স্মরণ করতে লাগলো, জুতো জোড়া যদি তার পায়ে না হয়, তবে মহা মুশকিল হবে। বরাত ভালো তাই জুতো জোড়াও তার পায়ে মাপমত হয়ে গেল।

আসনে বসে হাফ ছেড়ে বাঁচলো বনহুর। তাদের গাড়ির পাশ কেটে আরও কয়েকখানা পুলিশ ভ্যান চলে গেল। হাসলো বনহুর। গাড়িতে বেডিংপত্র দেখে ফোর্স কোনরূপ সন্দেহ করেনি।

তখনও দূর থেকে ভেসে আসছে হাঙ্গেরী কারাগারের বিপদ সংকেত ধ্বনি।

বনহুরকে নিয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে।

শহরের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে গাড়িখানা একটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলেন এক পৌঢ় ভদ্রলোক। ব্যস্তকণ্ঠে তিনি ডাকাডাকি শুরু করলেন—ওরে মহেন্দ্র! ওরে মাধু। জামাইবাবুর গাড়ি এসেছে। ওরে জামাইবাবুর গাড়ি এসেছে।

বনহুর চমকে উঠলো সর্বনাশ, সে তাহলে জামাই বনে গেল। কিন্তু এখন কোন উপায় নেই, তাকে জামাই সেজেই চালিয়ে নিতে হবে। তাড়াতাড়ি যুবকের গলায় জড়ানো মাফলারটা খুলে নিয়ে বেশ করে জড়িয়ে নিল নিজের গলায়। তারপর একটু কেশে বলেন—অত চেঁচামেচি করবেননা, ঠাণ্ডা লেগে মাথাটা বড় ধরেছে। তারপর কোচোয়ানকে লক্ষ্য করে বলে—এই! তুমি বেডিং পত্রনামিয়ে একটু ভেতরে পৌঁছে দাও।

কোচোয়ান তার আসন থেকে নেমে বেডিংপত্র নামাতে শুরু করে। বনহুর নিজের হাতে সুটকেসটা নামিয়ে নেয়। প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলে ওঠেন—আহ, থাক থাক। ওরে মহেন্দ্র! এদিকে আয় না, জামাই বাবু নিজেই তো জিনিসপত্র নামিয়ে নিচ্ছেন।

মহেন্দ্র নামে যে লোকটি এসে হাজির হল, সে তখন দ্রিার ঘোরে চোখ রগড়াচ্ছে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক বনহুরের হাত থেকে সুটকেসটা নিয়ে মহেন্দ্রের হাতে দিয়ে বলেন–যা, ভেতরে নিয়ে যা, আর শুন, কোচোয়ানকে দেখিয়ে দে বেডিংপত্র কোথায় রাখবে। তারপর বনহুরকে লক্ষ্য করে বলে—এসো বাবা এসো।

বনহুর ভদ্রলোকটিকে অনুসরণ করে।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলেন—আচ্ছা বাবা, গণেশ বলে কাউকে স্টেশনে দেখনি। সে কই?

বনহুর খানিকটা কেশে নিয়ে বলে কই, কাউকেই তো স্টেশনে দেখলাম না।

তবে নিশ্চয়ই বেটা কোথাও শুয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। ভাগ্যিস বাসার ঠিকানাটা তোমাকে ভালভাবে জানিয়ে এসেছিলাম।

হ্যাঁ, সেজন্যই বেশি বেগ পেতে হলো না!

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলে উঠেন-ট্রেনে বুঝি খুব ঠাণ্ডা লেগেছে।

হ্যাঁ।

তাই তো গলাটা যেন কেমন শুনা যাচ্ছে।

বনহুর আঁতকে উঠে বারবার কাশতে শুরু করে। তারপর কাশি থামিয়ে বলে—উঃ গলাটা বড় ব্যথা করছে।

উঠানে পৌঁছতেই কয়েকজন মহিলা ঘিরে ধরলো বনহুরকে, প্রৌঢ় ভদ্রলোক একজন অর্ধবয়সী মহিলাকে দেখিয়ে বলেন—উনি তোমার শাশুড়ী মাতা।

বনহুর থতমত খেয়ে কি করবে ভাবছে, হঠাৎ মনে ছিল হিন্দুরা গুরুজনকে প্রণাম করে। বনহুর নত হয়ে বয়স্ক মহিলার পদধূলি গ্রহণ করলো।

মহিলা বনহুরের মাথায় হাত রেখে প্রাণভরে আশীর্বাদ করতে লাগলেন।

মহিলাগণ কানাকানি শুরু করেছে, শুনতে পেল বনহুর—মাধুরীর বর তো খুব সুন্দর হয়েছে। চমৎকার ছেলে, যেন কার্তিক।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক আনন্দভরা কণ্ঠে বলেন—"আমি আগেই বলেছিলাম, আমার পছন্দ আছে।

বনহুর ভেতরে ভেতরে বিব্রত বোধ করতে লাগলো। সে জীবনে অনেক কঠিন বিপদ হাসিমুখে জয় করেছে, কিন্তু কোনদিন এমন বিপদে পড়েনি। একেবারে জামাই বনে গেছে। যাক তবু এতক্ষণ ঠিকভাবে চালিয়ে নিতে পেরেছে এই যথেষ্ট। কিন্তু এরপর আরও যদি কিছু সমস্যা এসে যায়, তখন তার উপায় কি হবে? এক্ষুণি ইচ্ছা করলে পালাতে পারে সে। শত শত সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে যে অদৃশ্য হতে পারে, তার কাছে সামান্য ক'জন নিরীহ প্রাণী এ কিছু নয়, কিন্তু হঠাৎ এদের কাছে নিজেকে স্বাভাবিক করতে পারে না। কাজেই নিশ্চুপ থেকে যায়।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলে ওঠেন–মাধুরী কই? ঘুমিয়েছে বুঝি। মহিলাদের একজন বলে ওঠেন—জামাইবাবু আসবেন বলে এতক্ষণ সে জেগেই ছিল। এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি ওকে ডাকছি।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলেন—তাই ডাকো বৌমা, ঘুম ভাঙ্গলে দেখবে কে . এসেছে।

মহিলা ডাকতে ডাকতে কক্ষের দিকে চলে যান—মাধুরী দি মাধুরী দি, দেখো গিয়ে কে এসেছে। বনহুর ঢোক গিললো। এইবার তার চরম পরীক্ষা। মাধুরী তবে

ঐ যুবকের স্ত্রী। এবার তার সবকিছু ফাঁস হয়ে যাবে। কিন্তু এতক্ষণেও তাকে এ বাড়ির কেউ চিনতে পারছে না। ব্যাপার কি? আশ্চর্য লাগে বনহুরের কাছে।

প্রৌঢ় দ্রমহিলা বলেন-পথে কোন কষ্ট হয়নি তো বাবা?

না, শুধু ঠাণ্ডা লেগে গলাটা যা বসে গেছে। কথাটা বলেন বনহুর।

ভদ্রলোক ব্যস্ত কণ্ঠে বলেন-—এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়েই কথা বলবে, না ঘরে নিয়ে বসাবে?

শাশুড়ী বলে ওঠেন—দেখ বাবা, আমরা তো তোমাকে দেখিনি। এমন কি এ বাড়ির কেউ তোমাকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেনি। মেয়েটাকে জোর করে নিয়ে গিয়ে দিদি বিয়েটা দিয়ে দিল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলেন-কেন জামাই কি অপছন্দ হয়েছে?

বলো কি জামাই অপছন্দ হবে, এ যে সোনায় সোহাগা। যেমন মাধুরী তেমনি বাবা নিমাই।

এতক্ষণে জামাইয়ের নামটা জানতে পারে বনহু। সে যুবকের নাম তবে নিমাই। হ্যাঁ, তাকে কিছুক্ষণের জন্য নিমাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। আর একটি কথা তাকে অনেকটা হালকা করে এনেছে, এ বাড়ির কেউ জামাইকে আজ পর্যন্ত চোখে দেখেনি। কিন্তু মাধুরী, সে তো নিশ্চয়ই তার স্বামীকে ভাল করে চেনে।

বনহুরকে ভাবতে দেখে বলেন ভদ্রমহিলা কি ভাবছো বাবা, দিদি যা করেছেন খুব ভালো করেছেন। আমি ভাবতেও পারিনি এমন জামাই পাবো।

ভদ্রলোক বলেন—তোমার দিদির পছন্দ তোমার চেয়ে অনেক বেশি। আমার মাধুরীর স্বামী যেন রাজপুত্র। দেখ বাবা, মনে কিছু করো না, মাধুরীকে বিয়ের দিনই নিয়ে না এলে ওর ঠাকুরমার সঙ্গে এ জীবনে আর দেখাই হত না।

বনহুর ব্যথিত-কণ্ঠে বলে ওঠে-ঠাকুরমা তাহলে....

হ্যাঁ বাবা, তিনি মারা গেছেন, কেন তুমি চিঠি পাওনি?

বনহুর একটু চিন্তা করার ভান করে বলে—চিঠি, কই না তো তিনি কি সে দিনই....

হ্যাঁ, মাধুরীকে নিয়ে যখন বাড়ি পৌঁছলাম, তার ঘণ্টাকয়েক পরেই মা মারা যান। মাধুরীও বুঝি তোমাকে একথা লিখে জানায়নি?

না।

তবে তোমাকে সব গোপন করে গেছে দেখছি। হঠাৎ কথাটা জানালে ব্যথা পেতে পারো তাই বুঝি মাধুরী লেখেনি।

বনহুর লক্ষ্য করলো ওপাশের দরজায় একটা সুন্দর মুখ ভেসে উঠে আবার আড়ালে সরে গেল।

মহিলাটি বলে ওঠেন–মাধুরী জেগেছে, যাও বাবা, ও ঘরেই খাবার পাঠিয়ে দেব। সব ঠান্ডা হয়ে গেছে কিনা, একটু গরম করে দিন।

বনহুর বলে ওঠেনা না, রাতে আর কিছু খাব না। বড় অসুস্থ বোধ করছি।

তাহলে একটু গরম দুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

না, কিছু খাবো না। শ্বশুর মহাশয় বলে ওঠেন—সেকি হয় বাবা? রাত্রে উপোস দিতে নেই। তুমি যাও বাবা, ঠাণ্ডায় অসুখ বাড়বে।

বনহুর ইতস্ততঃ করছে বলে একটি যুবতী বনহুরকে লক্ষ্য করে বলেলজ্জা করছে, না? আসুন আপনাকে পৌঁছে দিই।

বনহুর যুবতীর পেছনে চলতে চলতে ভাবে—তাদের জামাইয়ের এই প্রথম শ্বশুরালয়ে পদার্পণ। এ বাড়ির এক শ্বশুর মহাশয় ছাড়া জামাইকে কেউ বুঝি দেখে নি। তবু শ্বশুর মহাশয়ের চোখেও পাওয়ার ওয়ালা চশমা। কিন্তু জামাইবাবুর স্ত্রী সে তো তার স্বামীকে সহজেই চিনে নেবে। তখন পেছন থেকে যুবতীটি বলেন—এবার যান, সোজা ভেতরে চলে যান....

বনহুর থমকে দাঁড়ায়, কেশে নিয়ে বলে—আজ না হয় রাতের মত অন্য ঘরে।

কথা শেষ করতে দেয় না যুবতী রাগ দেখছি আপনার পড়েনি। বিয়ের রাতেই মাধুরী চলে এসেছিল বলে এখনও অভিমান। যান যান, ভেতরে যান।

বনহুর দেখলো বেশি আপত্তি করা ঠিক হবে না। ধীরে পদক্ষেপে মাধুরীর কক্ষে প্রবেশ করে। দেখতে পায় লজ্জায় জড়োসড়ো একটি যুবতী মাথায় ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছে খাটের একপাশে।

বনহুর বিব্রত বোধ করে। একি অদ্ভুত পরীক্ষায় ছিল সে। নিজেকে সংযত করে একটু কেশে নিয়ে বলেন—মাধুরী।

ঘোমটার ফাঁকে লজ্জা ভরা দৃষ্টি তোলে একবার তাকালো মাধুরী তার দিকে।

বনহুর আরও এগিয়ে এসে দাঁড়ালো। তারপর বলেন—ভালো আছেতো মাধুরী?

মাধুরী মৃদু মধুর কণ্ঠে বলেন—আছি।

বনহুরের মত বীরপুরুষও ঘেমে নেয়ে উঠতে লাগলো। এবার কি কথা বলবে সে? একটা বিষয়ে আশ্বস্ত হলো, মাধুরী তাকে এখনও চিনতে পারেনি। নইলে সে এতক্ষণ অমনভাবে নিশুপ থাকতো না।

বনহুর খাটে না বসে একটা সোফায় বসে পড়ে বলেন–হঠাৎ ভয়ানক সর্দি-কাশি হওয়ায় গলাটা কেমন বসে গেছে।

মাধুরী আড়নয়নে একবার বনহুরকে দেখে নিল, তারপর এগিয়ে এসে দাঁড়ালো তার পাশে—ওগো তোমার রাগ পড়েছে?

বনহুর চটপট কি জবাব দেবে ভেবে পায় না। কাশতে শুরু করে, পরে

কাশি থামিয়ে বলে রাগ করে আর কতদিন থাকা যায় বল।

মাধুরী ঘোমটা অনেকটা সরিয়ে ফেলেছে। আরও ঘনিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আনন্দভরা কণ্ঠে বলে—সত্যি আমি ভাবতেই পারিনি এত অল্প সময়ে তুমি এতটা বদলে যাবে। বিয়ের রাতের কথাটা আজও আমার মনে আছে। বাসর ঘরে যাবার পূর্বেই মায়ের চিঠি বাবার হাতে এসে পৌঁছলো-ঠাকুর মার অসুখটা ভয়ানকভাবে

বেড়েছে, দেখা করতে হলে রাতের ট্রেনে আসবে। তুমি তো রেগে অস্থির, বিয়ের রাতে কিছুতেই আমাকে যেতে দেবে না। দেখ দেখি সেদিন যদি বাবার সঙ্গে আমি না আসতাম, ঠাকুরমার সঙ্গে আর জীবনে দেখা হত না।

বনহুর অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। এবার সে বুঝতে পারলো এখানে ঠাকুরমার অসুস্থতার জন্য মাধুরীকে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ঠাকুরমার অসুস্থতার জন্যই বিয়েতে মেয়ের মা ও বাড়ির কেউ যেতে পারেনি। শুধু মেয়ের বাবা মেয়েকে নিয়ে গিয়ে বিয়েটা দিয়ে এসেছেন। এমন কি বিয়ের রাতেই মাধুরীসহ তার পিতাকে চলে আসতে হয়েছিল, মাধুরী ভালো করে স্বামীকে দেখার সুযোগও পায়নি। মনে মনে খুশি হলো বনহুর।

বনহুর মাধুরীর কথায় দুঃখভরা কণ্ঠে বলেন-ঠাকুরমার মৃত্যতে আমিও ভীষণ দুঃখিত, মাধুরী।

সে কথা তোমার চিঠি পড়েই বুঝতে পেরেছিলাম।

মাধুরী অলক্ষ্যে দেয়ালঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নেয় বনহুর। রাত ভোর হবার আর মাত্র ক'ঘণ্টা বাকী। হাই তোলে বনহুর মাধুরী, অনেক রাত হয়েছে। শরীরটাও ভালো লাগছে না, একটু ঘুমাবো।

বেশ তো শুয়ে পড়ো। মাধুরী নিজ হাতে বনহুরের জামার বোতাম খুলে দিতে থাকে। মাধুরীর মাথার ঘোমটা খসে পড়েছে। বনহুর নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলো মাধুরীর মুখের দিকে। মাধুরী সুন্দরী বটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে জামাটা খুলে মাধুরীর হাতে দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে ছিল। ইস, আজ কদিন এমন নরম বিছানায় শোয়নি বনহুর। কারাগারের কঠিন মেঝেতে আজ তিন চারটা দিন কেটেছে। ভাগ্যিস রহমান বুদ্ধি করে কড়টা তার নিকটে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিল। কর্ডটা তার অনেক উপকারে এসেছে। তাছাড়া বনহুরকে আটকে রাখে এ কার সাধ্য।

মাধুরী আলনায় জামাটা রেখে বিছানায় এসে বসে। বনহুর ঘেমে ওঠে ভয়ে নয় সঙ্কোচে, মিথ্যা অভিনয় তাকে করতে হচ্ছে।

মাধুরী বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো।

উভয়ে নীরবে তাকিয়ে রইলো উভয়ের দিকে। মাধুরীর মনে কত আশা-আনন্দ, স্বামী তাকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নেবে কিন্তু একি, এমন তো সে আশা করেনি।

মাধুরী বলে ওঠে——অমন করে কি দেখছো?

বনহুর হেসে বলে—তোমাকে। সত্যি মাধুরী তুমি কত সুন্দর। কথাগুলো বলে নিজেই লজ্জাবোধ করে সে।

মাধুরী যতই ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বনহুর ততই সরে যায়। নিজকে মাধুরীর নিকট থেকে কিছুটা সরিয়ে রাখে সে।

মাধুরী কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে খুব ব্যথা অনুভব করলো। কই, এ পর্যন্ত তার স্বামী তো তাকে কোন সাদর সম্ভাষণ জানালো না। তবে কি এখনও তার মনে অভিমান দানা বেঁধে রয়েছে। মাধুরী বনহুরের বুকে মাথা রাখলো-ওগো এখনও তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারলে না।

বনহুর নিজকে সংযত করে রাখে। হাত দু'খানা দিয়ে নিজের মাথার চুলগুলো এটে ধরে বলে—মাধুরী, আমি বড় অসুস্থ বোধ করছি, তাই....

বুঝেছি ঘুম পাচ্ছে তোমার।

হ্যাঁ মাধুরী।

কিন্তু আমার যে ঘুম পাচ্ছে না। কতদিন তোমার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছি।

আমি তা জানি মাধুরী। কিন্তু আমার মাথাটা এত ধরেছে তোমায় কি বলবো....

বেশ তুমি ঘুমোও; আমি তোমার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

বনহুর পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করলো।

মাধুরী বনহুরের চুলের ফাঁকে আংগুল বুলিয়ে চললো। কক্ষের স্বল্প আলোতে মাধুরী বনহুরের মুখের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলো। সেদিন স্বামীকে এমন করে দেখার সুযোগ ঘটেনি তার। এত কাছে—এত ঘনিষ্ঠ করেও পায়নি। তবে শুভদৃষ্টির সময় দেখেছিল একটু। কই, সেদিন তো তার স্বামীকে এত সুন্দর বলে

মনে হয়নি। অপূর্ব অপরূপ তার স্বামী। আনন্দে মাধুরীর হৃদয় ভরে ওঠে। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে মাধুরী বনহুরের মুখে।

বনহুরের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে। মাধুরী। বনহুরের একটু তন্দ্রামত এসেছিল, সজাগ হয় সে। রাত ভোর হবার আর বেশি বিলম্ব নেই। বনহুর চোখ মেলে তাকালো। মাধুরী তার গায়ের উপর হাত রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বনহুর মাধুরীর হাতখানা ধীরে ধীরে সরিয়ে রেখে উঠে বসলো। তারপর দ্রুতহস্তে পাশের বন্ধ জানালা খুলে ফেললো। এবার ফিরে তাকালো সে মাধুরীর ঘুমন্ত মুখে। তারপর টেবিলের পাশে গিয়ে একখণ্ড কাগজ আর কলম তুলে নিয়ে খচ খচ করে লিখল, “বিপদে পড়ে তোমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। ক্ষমা করো মাধুরী।”
দস্যু বনহুর

কাগজখানা টেবিলে ভাজ করে চাপা দিয়ে রেখে মুক্ত জানালা দিয়ে লাফিয়ে ছিল বনহুর অন্ধকারের অন্তরালে।

০৩.

পুত্রশোকে চৌধুরী মাহমুদ খান আর মরিয়ম বেগম অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। এতদিন তারা জানতেন মনির মরে গেছে। আর সে কোন দিন ফিরে আসবে না। হঠাৎ সে পুত্রকে অভাবনীয় অবস্থায় ফিরে পেলেন চৌধুরী সাহেব আর মরিয়ম বেগম। কিন্তু এমন পাওয়ার চেয়ে না পাওয়াই ছিল তাদের পক্ষে ভালো।

মরিয়ম বেগম তো নাওয়া-খাওয়া ছেড়েই দিয়েছেন, সদাসর্বদা চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে চললেন। যে পুত্র ছিল তার জীবনের নয়নের মণি, যাকে হারিয়ে তিনি নিজেকে সর্বহারা মনে করতেন, সে হৃদয়ের নয়নের মণি, মনিরকে ফিরে পেয়ে আবার হারালেন। শুধু হারালেন নয়, নিজের হাতে তাকে বিসর্জন দিল।

স্ত্রীর অবস্থা দর্শনে চিন্তিত হয়ে ছিল চৌধুরী সাহেব। তিনি নিজেও মনিরের জন্য অত্যন্ত কাতর ছিল। কিন্তু মনের ব্যথা মনে চেপে নিশ্চুপ রয়ে গেল। কোন উপায় নেই ওকে বাঁচাবার। চৌধুরী সাহেব সবচেয়ে বড় দুঃখ পেলেন, তাঁর পুত্র আজ ডাকু। সভ্য সমাজে তার কোন স্থান নেই।

মনিরা যে বনহুরকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল, এ কথা বুঝতে পেরেছিল মামুজান আর মামী মা। বনহুর গ্রেপ্তার হওয়ায় মনিরার হৃদয়েও যে ভীষণ আঘাত লেগেছে জানেন তারা। চৌধুরী সাহেব লক্ষ্য করেছেন সেদিনের পর থেকে মনিরার মুখের হাসি কোথায় যেন অন্তর্ধান হয়ে গেছে। সর্বদা বিষণ্ণ হয়ে থাকে সে।

অহরহ মনিরা নিজের কক্ষে শুয়ে শুয়ে শুধু বনহুরের কথা ভাবে, কিছুতেই সে বনহুরকে ঘৃণার চোখে দেখতে পারে না। নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে মনিরা বনহুরের ছোটবেলার ছবিখানার দিকে। নির্মল দীপ্ত দুটি চোখ কি সুন্দর। আজও ঐ দুটি চোখের চাহনি মনিরার হৃদয়ে গেঁথে আছে। বনহুর বন্দী হয়েছে সত্য কিন্তু একটি মুহূর্তের জন্য মনিরা তাকে বিস্তৃত হতে দেখেনি।

চৌধুরী সাহেব পুত্রশোকে মুহ্যমান। মরিয়ম বেগম শয্যাশায়ী, মনিরার অবস্থাও তাই। গোটা চৌধুরী বাড়ি একটা নিস্তব্ধতা ও বিষাদে ভরে উঠেছে। কোথাও যেন এ বাড়িটার এতটুকু আনন্দ নেই।

চৌধুরী সাহেব সেদিন নিজের কক্ষে শুয়ে শুয়ে পুত্র সম্বন্ধেই চিন্তা করছিল। নৌকাডুবির পর মনির কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল, কেমন করে সে জীবনে বেঁচে আছে,কে তাকে লালন-পালন করলো, লেখাপড়া শিখে মানুষ না হয়ে, কেমন করে হলো সে ডাকু–

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করেন মরিয়ম বেগম। বিষণ্ণ মলিন মুখ মণ্ডল। স্বামীর পাশের সোফায় বসে বলেন–ওগো, বাছাকে উদ্ধারের কোনই কি উপায় নেই?

চৌধুরী সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল–না।

তারপর উভয়েই নীরব, গোটা কক্ষে একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

মরিয়ম বেগম পুনরায় স্বামীকে লক্ষ্য করে বলেন–কিন্তু আমার মন যে কিছুতেই মানছে না।

জানি, কিন্তু কোন্ উপায় নেই।

নাগো ও কথা বলল না। তুমি একবার ইন্সপেক্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা করে

অসম্ভব। একটা ডাকাতের জন্য আমি নিজেকে হেয় করবো?

ডাকাত হলেও সে আমাদের সন্তান।

তুমি কি পাগল হলে মরিয়ম? আমার পুত্র বলে দোষীকে তারা ছেড়ে দেবে না। ন্যায্য বিচারে তার যে দণ্ড হবে, তাই মেনে নিতে হবে।

ওগো, আমি তা সহ্য করতে পারবো না। আমার মনিরের যদি যাবৎ। জীবন কারাদণ্ড হয়....

শুধু কারাদণ্ড নয়, তার ফাঁসিও হতে পারে।

বাপ হয়ে তুমি এ কথা মুখে আনতে পারলে? ওগো, আমার মণিকে তুমি বাঁচিয়ে নাও।

মনিরা কখন আড়ালে এসে দাঁড়িয়ে মামা-মামীমার কথাবার্তা শুনছিল কেউ জানে না। চৌধুরী সাহেবের শেষ কথায় মনিরা দু'হাতে বুক চেপে বসে পড়ে মেঝেতে। বনহুরের ফাসি হতে পারে

আর সহ্য করতে পারে না মনিরা। উঠে ধীরে ধীরে নিজের কক্ষে ফিরে যায়। দেয়াল থেকে বিছানা খানা নিয়ে দু'হাতে বুবে .... .. পিত কান্নায় ভেঙে পড়ে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলো সে–মনির, আবার কেন তুমি আমার জীবন পথে এসে দাঁড়িয়েছিলে?

মনিরার চোখের পানিতে সিক্ত হয়ে উঠে ফটোখানা।

বনহুর বন্দী হয়েছে জানতে পেরে নূরীর ধমনীর রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। কিছুতেই সে বিশ্বাস করতে পারে না দস্যু বনহুরকে কেউ বন্দী করতে পারে। তখনই নূরী পুরুষের ড্রেসে সজ্জিত হয়ে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য অনুচরকে লক্ষ্য করে বলে–আমি বনহুরকে উদ্ধার করতে চাই। তোমরা আমাকে সাহায্য করো।

কিন্তু বনহুরের প্রধান অনুচর রহমান তাকে ক্ষান্ত করে। গম্ভীর কণ্ঠে বলে-নূরী, উপায় থাকলে আমরা এখনও নিশ্চুপ থাকতাম না। হাঙ্গেরী কারাগার—তা অতি ভীষণ জায়গা। হাজার হাজার পুলিশ ফোর্স অবিরত কড়া পাহারা দিচ্ছে। প্রকাশ্যে সেখানে কোন কিছুই করতে পারা যাবে না। আমি গোপনে তাকে

উদ্ধারের চেষ্টা করছি। তাছাড়া নূরী তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই, সর্দারকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না।

নূরীর চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কিন্তু একেবারে আশ্বস্ত হয় না সে, যতক্ষণ বনহুর ফিরে না আসছে ততক্ষণ নিশ্চিন্ত নয় নূরী।

একদিন দু'দিন কুরে পাঁচটা দিন চলে গেছে। যে নূরী একটি দিন বনহুরকে না দেখলে অস্থির হয়ে পড়ে, সে নূরী আজ কদিন বনহুরকে কাছে। পায়নি।

শুধু নূরীই নয়, বনহুরের অন্তর্ধানে তার সমস্ত অনুচরবর্গ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। ঝিমিয়ে পড়েছে গোটা বনভূমি।

সবচেয়ে তাজের অবস্থা দুঃখজনক। বনহুর বন্দী হবার পর তাজ কেমন যেন হয়ে গেছে। ঘাস ছোলা কিছু সে মুখে নেয় না। বনহুর তাজকে নিজ হাতে ঘাস ছোলা খাওয়াতো। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতো। বনহুরের অনুপস্থিতিতে সে অবিরত সম্মুখের পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করত। কথা বলতে পারে না তাজ, মনের অবস্থা সে এমনি করে ব্যক্ত করত।

বনহুরের অনুচরগণ তাজের জন্য চিন্তিত হয়ে ছিল। না খেলে দুর্বল হয়ে পড়বে তাজ। এই অশ্বই হচ্ছে বনহুরের সবচেয়ে প্রিয়।

সেদিন নুরী অনেক চেষ্টায় গলায় পিঠে হাত বুলিয়ে একটু ছোলা আর ঘাস খাইয়েছে তাজকে, কিন্তু এমনি করে আর ক'দিন ওকে বাঁচানো যাবে।

সর্দারের বিনা অনুমতিতে দস্যুগণ কিছুই করতে পারবে না। তাই তারা নীরব হয়েছে।

নূরী ঝরনার ধারে বসে গান গায়। বনে বনে ঘুরে ঘুরে চোখের পানি ফেলে। যেদিকে তাকায় শূন্য বনভূমি খা খা করেছ। বনহুরকে নূরী নিজের প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসে। বনহুর ছাড়া আর কেউ যেন নেই ওর। অবশ্য সে কথা মিথ্যে নয়, এ বনে বনহুরই একমাত্র সঙ্গী—একমাত্র সম্বল।

বনহুরকে কেন্দ্র করে নূরী কত আকাশ-কুসুম গড়ে আর ভাঙে বনহুর তার স্বপ্ন–তার সব।

সেদিন নূরী তার নিজের কক্ষে বিছানায় শুয়ে কাঁদছিল। কই আজও তো বনহুর ফিরে এলো না। রহমান নিশ্চয়ই কোন সুবিধা করে উঠতে পারেনি। বনহুরকে না জানি হাঙ্গেরী কারাগারে কি কঠিন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে! নূরীর চিন্তার অন্ত নেই। বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে নূরী।

ঠিক এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে বনহুর, নূরীকে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে ব্যথিত কণ্ঠে ডাকে—নূরী।

মুহূর্তে নূরী চোখ তুলে তাকায়। আনন্দে উজ্জল হয়ে ওঠে তার। মুখমণ্ডল। ছুটে এসে ঝাপিয়ে পড়ে সে বনহুরের বুকে হুর!

বনহুর নূরীর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বলে-নূরী, খুব কেঁদেছো বুঝি এ কদিন?

হুর, আমার মন বলেছে কেউ তোমাকে আটকে রাখতে পারবে না, তোমাকে বন্দী করে রাখতে কেউ সক্ষম হবে না।

তোমার বিশ্বাস মিথ্যা নয় নূরী। বনহুকে আটকে রাখে কার সাধ্য। সামান্য পুলিশ বাহিনী বন্দী করে রাখবে আমাকে! হঠাৎ অদ্ভুতভাবে হেসে ওঠে বনহুরহাঃ হাঃ হাঃ, হাঙ্গেরী কারগারও বনহুরকে আটকে রাখতে সক্ষম হলো না, নূরী।

নূরী দীপ্ত প্রফুল্ল মুখে বনহুরের দিকে তাকিয়ে থাকে, সে তার মধ্যে দেখতে পায় এক নতুন রূপ।

০৪.

চৌধুরী সাহেব, মরিয়ম বেগম এবং মনিরা চায়ের টেবিলের পাশে এসে বসে, সকলের মুখেই বিষণ্নতার ছাপ।

বাবুর্চি চা-নাস্তা পরিবেশন করছিল, এমন সময় বয় খবরের কাগজ এনে টেবিলে রাখে।

একসংগে চৌধুরী সাহেবের এবং মনিরার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে পত্রিকা খানার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়মাখা আনন্দ ভরা কণ্ঠে উচ্চারণ করেন চৌধুরী সাহেব-হাঙ্গেরী কারাগার হতে দস্যু বনহুরের পলায়ন। শত শত পুলিশ বাহিনী তাকে আটকিয়ে রাখতে অক্ষম।

আনন্দ বিগলিত কণ্ঠে বলে উঠলেন মরিয়ম বেগম-সত্যি আমার মনির কারাগার থেকে পালিয়েছে? সত্যি বলছো?

হ্যাঁ গো, এই দেখ? চৌধুরী সাহেব পত্রিকার উপরের পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে লেখাগুলো দেখিয়ে দেন।

মরিয়ম বেগম ইংরেজি জানতেন না, তিনি স্বামীকে লক্ষ্য করে বলেন— সমস্তটা পড়ে আমায় বুঝিয়ে বল না গো। আমার মনির কারাগার থেকে পালিয়েছে। না জানি বাছা আমার কোথায় আছে কেমন আছে।

মনিরার চোখে মুখে আনন্দ উপচে পড়ছে। মনির কারাগার থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছে। ইস কি আনন্দ–কি শান্তি। নিশ্চয় সে আসবে। যেমন করে হউক সে আসবে তার কাছে। মনিরা আনন্দের আবেগে আর স্থির হয়ে বসতে পারে না, ছুটে বেরিয়ে যায় সে। নিজের ঘরে গিয়ে বনহুরের ছোটবেলার ফটোখানা খুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরে–ওগো তুমি মুক্ত হয়েছ। জানি কেউ তোমাকে আটকে রাখতে পারবে না। কেউ না…

চৌধুরী সাহেব নিজেই সমস্তটা পড়ে নিয়ে স্ত্রীকে মানে করে বুঝিয়ে বলেন। পুত্র-কন্যা যত দোষে দোষীই হউক না কেন, পিতা-মাতার নিকটে তারা স্নেহের পাত্র। কোন পিতামাতাই পুত্র কন্যার অমঙ্গল কামনা করতে পারে না। মনির আজ দস্যু জেনেও চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগম তাকে ঘৃণা করতে পারে না। কারাগার থেকে পালিয়েছে জেনে মনে মনে খুশি হলেন তারা। কিন্তু একেবারে আনন্দ লাভ করতে পারলেন না। কারণ, কারাগার থেকে মনির পালিয়েছে সত্য কিন্তু সে নিরাপদ নয়। অহরহ তাকে পুলিশ বাহিনী খুঁজে ফিরছে। পুলিশ সুপার ঘোষণা করে দিয়েছে, যে দস্যু বনহুরকে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় এনে দিতে পারবে তাকে লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। তাছাড়াও তাকে একটা বীরত্বপূর্ণ উপাধিতে ভূষিত করা হবে।

০৫.

মরিয়ম বেগম বার বার খোদার নিকট বনহুরের মঙ্গল কামনা করতে লাগলেন। চোর হউক, ডাকু হউক সে সন্তান। হে খোদা তুমি আমার মনিকে রক্ষা কর। মরিয়ম বেগমের গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল অশ্রুধারা। চৌধুরী সাহেব

স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলে ওঠেন—যে সন্তান মানুষ নামে কলঙ্ক, তার জন্য ভেবে কি হবে বল। মনে কর মনির বেঁচে নেই।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন মরিয়ম বেগম-বাপ হয়ে তুমি এ কথা বলতে পারলে?

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে বলেন চৌধুরী সাহেব—সবই আমাদের অদৃষ্ট, নইলে অমন ছেলে ক'জনের ভাগ্যে জোটে। পেয়েও আমরা সে রত্নকে পাইনি।

মরিয়ম বেগম বলেন—সত্যি আমার মনিরের মত কই কাউকে তো দেখিনি। ওগো আমি কেন এ শোক বইবার জন্য বেঁচে রইলাম। আমার হৃদয় যে চূর্ণ বিচূর্ণ হচ্ছে। একটিবার ওকে দেখার জন্য মন যে আমার আকুলি বিকুলি করছে।

চৌধুরী সাহেব উঠে পায়চারী শুরু করলেন, হয়তো তার চোখ দুটি ও ঝাপসা হয়ে আসছিল।

গোটা দিনটা মনিরার উদগ্রীবভাবে কাটলো। কতবার আনন্দে অধীর। হয়েছে সে, কতবার চোখের পানিতে বুক ভাসলো। তার মনির আজ মুক্ত। তাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না নিশ্চয়ই সে আসবে। মন বলছে সে আসবে।

কিন্তু সন্ধ্যা গিয়ে রাত এলো। ক্রমে রাত বেড়ে চললো। কই সে তো এলো না। তবে কি মনির আসবে না। হয়তো সে অভিমান করেছে, পিতার ওপর রাগ করেই সে আর এ বাড়িতে আসবে না।

দু'হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো মনিরা।

এমন সময় তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো বনহুর। চারদিক ঘন অন্ধকার। বনহুর সম্মুখস্থ জলের পাইপ বেয়ে দ্রুত উপরের দিকে এগিয়ে চললো।

শরীরে কালো ড্রেস, মুখে কালো রুমাল বাঁধা, মাথায় কালো পাগড়ী, পেছনে মুক্ত জানালা দিয়ে ঘরের মেঝেতে লাফিয়ে ছিল সে।

চমকে মুখ তুলে মনিরা। বনহুরকে সে কোনদিন দস্যুর ড্রেসে দেখেনি। বিস্ময়ভরা গলায় বলে ওঠে-কে তুমি?

বনহুর এগিয়ে এসে নিজের মুখের বাধা পাগড়ী পরে আচল খুলে সঙ্গে সঙ্গে মনিরা আনন্দধ্বনি করে ওঠে-মনির!

উহু মনির নই, দস্যু বনহুর।

না, আমার কাছে তুমি দস্যু নও। তুমি আমার মনির..মনিরা ছুটে গিয়ে বনহুরের কণ্ঠবেষ্টন করে ধরে।

বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে, আবেগভরা গলায় ডাকে–মনিরা।

মনিরা বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে–মনির তুমি আমার।

কিন্তু আমি যে দস্যু?

না, আমি সে কথা মানব না। তুমি যে আমার সব।

বনহুর মনিরাসহ খাটে গিয়ে বসে। পাশাপাশি বসলো ওরা দুজনে। মনিরার হাতের মুঠায় বনহুরের একখানা হাত। ব্যাকুল নয়নে তাকিয়ে আছে মনিরা তার মুখের দিকে। কালো ড্রেসে অপূর্ব সুন্দর লাগছে বনহুরকে। মনিরা তন্ময় হয়ে দেখছে। সে দেখার যেন শেষ নেই।

মনিরার বিস্ময়ভরা চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে বনহুর। তারপর মনিরার চিবুক ধরে উঁচু করে বলে—মনিরা, তুমি কেন আমায় মায়ার বন্ধনে বেঁধে ফেলছ বল তো?

মনিরার গণ্ড বেরিয়ে পড়ে ফোটা ফোটা অশ্রু। স্থির কণ্ঠে বলে সে দস্যু বনহুরকে যদি মায়ার বন্ধনে বাঁধতে পারি, তবে সে হবে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় গৌরব।

বনহুর ওকে আরও নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নেয়, তারপর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলে–মনিরা।

মনিরা নিজেকে বিলিয়ে দেয় বনহুরের বাহুবন্ধনে।

বানহুর শান্তকণ্ঠে বলে–মনিরা, তুমিই একদিন বলেছিলে দস্যু বনহুর মানুষ নয়, সে মানুষ নামে কলঙ্ক। সে কথা তুমি অস্বীকার করতে পার?

মনির, তুমিও সেদিন বলেছিলে মনে পড়ে—দস্যু বলে সে কি মানুষ নয়। তার মধ্যে কি মানুষের হৃদয় নেই।

মনিরা, আমি জানি দস্যু বলে সবাই আমাকে ঘৃণা করলেও তুমি আমাকে ঘৃণা করতে পারবে না।

তুমি জানো না, তোমার আব্বা-আম্মার মনেও আজ কি ব্যথা গুমরে। কেঁদে মরছে। তুমি যে তাদের নয়নের মণি ছিলে, তোমাকে হারিয়ে তাদের প্রাণে যে কত আঘাত লেগেছিল, তা তুমি জানো না। আজও তারা তোমার সে শিশুকালের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছেন। আজও তারা ভুলতে পারেননি তোমাকে। মামীমা প্রায়ই তোমার কথা স্মরণ করে অশ্রু বিসর্জন করেন। মামুজানের প্রাণেও কম ব্যথা নেই। তারপর তোমাকে আবার অভাবনীয়ভাবে ফিরে পেয়ে তখনই নির্মমভাবে হারালেন। মনির, তাদের অবস্থা অবর্ণীয়।

বনহুরের চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে। ব্যথাভরা সুরে বলে—সব জানি মনিরা, সব বুঝি। কিন্তু আমি যে তাঁদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছি। মনিরা আমি বড়ই হতভাগ্য, তাই অমন দেবতুল্য পিতা-মাতা পেয়েও পাইনি।

মনির, আর আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না। তা হয় না মনিরা।’

তুমি আমার গা ছুঁয়ে শপথ করেছিলে আর দস্যুতা করবে না। এরি মধ্যে তুমি ভুলে গেলে সব?

না ভুলে যে কোন উপায় নেই, মনিরা। একটা উম্মত্ত নেশা আমাকে অস্থির করে তুলেছে। আমি নিজের জন্য আর দস্যুতা করবো না। কিন্তু শয়তানের শাস্তি, কৃপণের ধন, অহংকারীর দর্প চূর্ণ আমি করবোই। মনিরা শপথ আমি রক্ষা করতে পারলাম না বলে তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

মনির।

না, আমি দস্যু বনহুর। আমি দস্যু—এক লাফে বনহুর মুক্ত জানালা . দিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

স্তব্ধ মনিরা পাথরের মূর্তির মত থ’মেরে দাঁড়িয়ে রইলো, তার কণ্ঠ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে এলো-মনির।

০৬.

মুরাদের পিতা অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে মুরাদকে জেল থেকে বাঁচিয়ে নিলেন। কিন্তু মুরাদ মুক্ত হয়ে আবার দুর্দান্ত শয়তান হয়ে উঠলো। মনিরাই হলো তার একমাত্র লক্ষ্য। মনিরাকে তার চাই।

তার দলবল যারা একদিন হোটেল থেকে পালিয়েছিল আবার তারা ফিরে এসে যোগ দিল মুরাদের সঙ্গে। এবার তারা অন্য একটি গোপন স্থানে আস্তানা তৈরি করলো। শয়তান নাথুরাম হলো এই দলের নেতা।

সেদিন নাথুরামের আস্তানায় গোপন এক আলোচনা সভা বসেছিল। মুরাদ একটা উচ্চ আসনে বসেছিল। দলপতি নাথুরাম দাঁড়িয়ে আছে তার সম্মুখে আর অন্যান্য অনুচর কেউ বা দাঁড়িয়ে কেউ বা বসে আছে।

গম্ভীর কণ্ঠে বলে মুরাদ—যত টাকা চাও তাই দেব তবু মনিরাকে আমার চাই।

নাথুরাম গোঁফে হাত বুলিয়ে বলে—হুজুর, নাথু থাকতে মনিরাকে পাবেন না, এটা কথা হলো না। আমি ওকে এনে দেবই।

মুরাদের চোখে মুখে ফুটে ওঠে শয়তানের হাসি-তুমিই পারবে নাথু, মনিরাকে তুমিই এনে দিতে পারবে।

হ্যাঁ হুজুর, আমার দলের কেউ কমজোর নয়, আপনাকে খুশি করতে

আমরা কেউ পিছ পা হবো না।

ধন্যবাদ নাথুরাম। মুরাদ কথাটা বলে নাথুর পিঠ চাপড়ে দেয়। নাথুরামের ভয়ঙ্কর মুখে ফুটে ওঠে এক পৈশাচিক হাসি। নাথুর চেহারা দেখলে মানুষ এমনিতেই ভয় পায়। বলিষ্ঠ চেহারা। আকারে বেঁটে, মাথায়। খাটো করে ছাঁটা চুল। চোখ দুটো বিড়ালের চোখের মত ক্ষুদে কুতকতে। বড় বড় দাঁত বেরিয়ে আছে ঠোটের ওপরে। সেকি ভয়ঙ্কর চেহারা দলপতি নাথুরামের।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করলো নাথুরামের প্রধান অনুচর গহর আলী, নাথুরামকে লক্ষ্য করে সালাম করলো।

মুরাদ হেসে বলেন—এত দেরী হলো কেন গহর আলী।

বিরাট একটি ঝাঁকি দিয়ে হেসে উঠলো গহর আলী—সব খবর নিয়ে তবেই ফিরছি হুজুর। চৌধুরী সাহেবের বেটি মনিরা তার বান্ধবীদের নিয়ে আগামী পূর্ণিমার রাতে নৌকা বিহারে যাবে।

মুরাদের চোখ দুটো ধক করে জ্বলে ওঠে, একটা আনন্দ সূচক শব্দ করে ওঠে সে-ঐ রাতের জন্য প্রস্তুত থেক নাথুরাম, ঐ দিন আমি মনিরাকে চাই।

নাথুরাম হাতের মধ্যে হাত রগড়ায়-হুজুর, অগ্রিম কিছু টাকা…।

হ্যাঁ, এই নাও-পকেট থেকে একতোড়া নোট বের করে ছুঁড়ে দেয় মুরাদ নাথুরামের হাতে—এতে পাঁচ হাজার আছে। মনিরাকে পেলে আরও দেব।

সালাম হুজুর, আপনার অনুগত চাকর আমরা। যা বলবেন তাই করবো।

বেশ, তাহলে আমার সব কথা স্মরণ রেখে কাজ করো। নাথুরাম, মনে রেখো সিংহের মুখের আহার কেড়ে নিচ্ছো তোমরা। দস্যু বনহুর ভালবাসে.. মনিরাকে।

নাথুরামের বিদঘুটে মুখে একটা কুৎসিত হাসি ফুটে উঠলো। বলেন সে–দস্যু বনহুর তো দূরের কথা, ওর বাবা এসেও নাথুরামকে হটাতে পারবে। নাথুরাম হাত দিয়ে দু’বাহুতে চপেটাঘাত করে।

সমস্ত দলবল হর্ষধ্বনি করে উঠলো–সর্দার নাথুরাম কি জয়। সর্দার নাথুরাম কি জয়।

মুরাদ এবং অন্য সকলে এবার একটা বিরাট গোলটেবিলের চারিদিকে গিয়ে বসে, তারপর চললো বোতলের পর বোতল।

মুরাদ জড়িত কণ্ঠে বলে ওঠেনাথুরাম, তোমাদের নৌকা তো ঠিক আছে।

হ্যাঁ হুজুর, নৌকা ছিপনৌকা, বজরা সব ঠিক আছে। আমাদের নৌকাটাই যাতে ওরা ভাড়া করে সে চেষ্টা করবো। আপনি কিছু ভাববেন হুজুর।

মুরাদ নাথুরামের পিঠ চাপড়ে দেয়—বহুৎ খোশ খবর। নাথু সত্যি তুমি কাজের লোক। কথার ফাঁকে হেউ হেউ করে ঢেকুর তোলে মুরাদ। তারপর সে কিন্তু আমার

নিকটে ওকে কখন পোঁছাচ্ছ তাই বল?

সে চিন্তা করবেন না হুজুর! আগে সে দিনটা আসুক। আপনার টাকা আর আমাদের মনিরা–কিছু ভাববেন না হুজুর, কিছু ভাববেন না!

কিন্তু কি করে তোমরা তাকে আমার নিকটে পৌঁছাবে একটু শুনাও না, আমার যে বড্ড শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে।

নাথুরাম এপাশে ওপাশে একটু দেখে নিয়ে চাপা গলায় বলে–আপনার বজরাখানা সে তিন মাইল দূরে যে বাকটা আছে সেখানে বাধা থাকবে।

আমরা মাঝি সেজে চৌধুরী কন্যা এবং তার বান্ধবীগণকে নিয়ে ঝিনাইদাঁতে নৌকা ভাসাবো। তারপর আমাদের ছিপ প্রস্তুত থাকবে, সে ছিপ নৌকার মনিরাকে নিয়ে একেবারে আপনার বজরায়…

চমৎকার বুদ্ধি এটেছো নাথুরাম একেবারে বিউটিফুল আইডিয়া——কিন্তু খুব সাবধানে, বুঝেছো?

হ্যাঁ হুজুর আর বলতে হবে না। চলো নাথুরাম।

০৭.

চৌধুরী সাহেব বসে বসে একটা পত্রিকা পড়ছিল। এমন সময় বৃদ্ধ সরকার ফয়েজ সাহেব এসে দাঁড়িয়েছেন। চৌধুরী সাহেব চশমার ফাঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন——নৌকা ঠিক করেছেন সরকার সাহেব?

জ্বি হ্যাঁ, নৌকা ঠিক করে তবেই বাড়ি ফিরছি। নৌকা বেশ বড়সড় আর সুন্দর। ভাড়াটা একটু বেশি নেবে।

তা নিক, নৌকাটা তবে বেশ মন মতই পেয়েছেন? দেখুন ঝড় উঠলে কোন ভয়ের কারণে নেই তো?

না, তবে সবই খোদার হাত।

এমন সময় মনিরা সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বলে-মামু জানের শুধু ঝড়ের ভয়।

হ্যাঁ মা, ঝড় আমার জীবনে এক চরম আঘাত দিয়ে গেছে। আচ্ছা মা মনিরা, কত বেড়ানোর জায়গা থাকতে তোমাদের কিনা নৌকা ভ্রমণের সখ চাপলো? আমার কিন্তু মন চায় না নৌকায় কোথাও যাওয়া।

একবার ভয় পেয়েছেন তাই আপনার মনে এ দুর্বল মামুজান। তাছাড়া আমি তো একা যাচ্ছিনে। আমরা অনেকগুলো মেয়ে যাব।

কিন্তু খুব সাবধানে থেক মা। খোদা না করুক কোন বিপদে না পড়ো।

মনিরা গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়। মনে তার অফুরন্ত আনন্দ। সেদিন বনহুরের নিবিড় আলিঙ্গন তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সমস্ত সত্তা যেন বিলীন হয়ে গেছে বনহুরের আলিঙ্গনের মধ্যে। আজও সে নিভৃতে বসে সেদিনের সুখস্মৃতি স্মরণ করে গভীর আনন্দ উপলব্দি করে। সেদিনের সে মুহূর্ত মনিরা জীবনে ভুলবে না। এত কাছে কোনদিন ওকে পায়নি সে যেমন করে সেদিন মনিরা তাকে পেয়েছিল।

মনিরা বিছানায় শুয়ে ডিমলাইটটা জ্বেলে দিল। হঠাৎ তার পাশের টেবিলে একটা তীরফলক এসে গেঁথে গেল, তীরফলকের সঙ্গে এক টুকরা কাগজ বাধা রয়েছে।

মনিরা তীরফলকটা হাতে তুলে কাগজখানা খুলে নিয়ে মেলে ধরলো চোখের সামনে, সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলো। কাগজের টুকরায় লেখা রয়েছে, "মনিরা, আজ রাতে আসবো আমি-বনহুর।"

একদিন এই নাম শুনলে হৃৎকম্প শুরু হত মনিরার। মুখমণ্ডল বিবর্ণ। হয়ে উঠতো, আর আজ এই নাম কত মধুর কত আনন্দদায়ক খুশিতে আত্মহারা মনিরা কি করবে যেন ভেবে পায় না। বনহুরের ছোটবেলার ছবিখানা নিয়ে বার বার দেখতে লাগলো সে। ফুলের মত শুভ্র একটি মুখ, মনিরা ছবিটা গালে-ঠোটে ঘষতে লাগলো।

ক্রমে রাত বেড়ে আসে। মনিরা উদগ্রীব হৃদয়ে প্রতীক্ষা করে দস্যু বনহুরের। মুক্ত জানালার পাশে গিয়ে বার-বার তাকায় অন্ধকারে। একসময় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে মনিরা, এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ। মনিরা ফিরে তাকিয়ে আনন্দ ধ্বনি করে উঠে-মনির এসেছো? ছুটে গিয়ে বনহুরের জামার

আস্তিন চেপে ধরে—এসেছে। আজি ক’দিন থেকে তোমার জন্য ব্যাকুল চোখে পথ চেয়ে আছি।

কেন? কেন তুমি আমার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করো মনিরা?

কেন তোমার প্রতীক্ষা করি আজও তুমি জানো না?

নিষ্ঠুর!

তার চেয়েও বেশি। দস্যু কোনদিন দয়া-মায়া জানে না মনিরা।

না না, ও কথা বলো না মনির। তুমি যে আমার কাছে সবচেয়ে উদার মহৎ, স্নেহময়-বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদে মনিরা।

বনহুর বিছানায় গিয়ে বসে।

মনিরা ওর পাশে গিয়ে মাথার পাগড়ী খুলে নিয়ে পাশে টেবিলে রাখে, তারপর নিজেও বসে পড়ে পাশে।

বনহুর ওর চিবুক ধরে নাড়া দিয়ে বলে—মনিরা, তুমি না বলেছিলে দস্যু বনহুরের নামে হৃদকম্প হয় আমার। আর আজবনহুরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে মনিরা—আজ তোমার নাম স্মরণে হৃদয় আমার আনন্দে আপুত হয়ে ওঠে। সত্যি মনিরা, তোমার নামে এত মধু....

তাই নাকি?

হ্যাঁ আচ্ছা, মনির আজ তোমাকে একটা জিনিস দেব, বল নেবে?

তোমার দেয়া কোন জিনিসকেই যে আমি অবহেলা করতে পারি না মনিরা।

বনহুরের একখানা হাত তুলে নেয় মনিরা নিজের হাতে। তারপর নিজ আংগুল থেকে সে হীরার আংটি খুলে নিয়ে পরিয়ে দেয় বনহুরের আংগুলে।

বনহুর বলে উঠে—একি করছো মনিরা?

হেসে বলেন মনিরা—একদিন তুমি এই হীরার আংটি হরণ করতে এসেই আমার হৃদয় চুরি করে নিয়েছ। আজ সে আংটি গ্রহণ করে তোমার হৃদয় আমাকে দান কর।

উহুঁ, দস্যু বনহুর হৃদয় দান করতে জানে না সে জানে গ্রহণ করতে। আংটি তুমি খুলে নাও মনিরা।

না।

সেদিন যা নেই নি, আজ তা আমি নিতে পারবো না।

মনির, আমার দান তুমি গ্রহণ করতে পারবে না।

আমি অক্ষম মনিরা।

দস্যু বনহুর জীবনে কোনদিন……

বনহুরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে মনিরা—দয়ার দান গ্রহণ করে, এই তো?

হ্যাঁ, সে কথা মিথ্যে নয়।

মনির-এ আমার দয়ার দান? প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা এসব কিছুই নেই এর মধ্যে? মনিরার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে। গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে দুফোটা অশ্রু।

মনিরার চোখের পানি দস্যু বনহুরকে বিচলিত করে তোলে।

প্যান্টের পকেট থেকে রুমালখানা বের করে মনিরার চোখের পানি মুছিয়ে দেয়।

মনিরা ওর হাতের উপরে হাত রাখে। অপরিসীম এক আনন্দ তার মনে দোলা দিয়ে যায়। ব্যাকুল আঁখি মেলে তাকায় মনিরা দস্যু বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর অশ্রুসিক্ত মুখখানা তুলে ধরে বলে-মনিরা, বেশ আমি এটা গ্রহণ করলাম।

বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে বলে উঠে-মনির।

বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে বলে—মনিরা।

মনিরা এবার বনহুরের আংটিসহ হাতখানা নিয়ে নাড়াচড়া করতে করতে বলে—মনির, সত্যি তুমি অপূর্ব।

উভয়ের নীরবে কেটে চলে কিছুক্ষণ। মনিরা বলে ওঠে একসময়–জানো মনির, পরশু বিকেলে আমরা ঝিনাইদা নদীতে নৌকা ভ্রমণে যাচ্ছি? সঙ্গে থাকবে আমার কয়েকজন বান্ধবী। সত্যি মনির তুমি যদি আমাদের সংগে থাকতে, ইস কত আনন্দ পেতাম।

কিন্তু তোমার সখীরা কি খুশি হত? যদি জানতো দস্যু বনহুর তাদের নৌকায় রয়েছে।

তারা তোমার আসল রূপ জানে না, তাই তোমার নামে তাদের এত আতঙ্ক। সত্যি মনির, একবার তারা যদি তোমায়..

এমন সময় দরজায় মামীমার কণ্ঠ শুনা গেল–মনিরা দরজা খোল দরজা খোল। ঘরে কার সাথে কথা বলছিস?

মনিরা চাপাকণ্ঠে বলে ওঠে-মামীমা টের পেয়েছেন।

বনহুর ঠোটে আংগুল চাপা দিয়ে বলে—চুপ। তারপর উঠে দাঁড়ায় সে। মনিরার হাতের মুঠা থেকে বনহুরের হাতখানা খসে আসে মৃদুস্বরে বলে—চললাম।

তারপর অন্ধকার জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায় দস্যু বনহুর।

মনিরা জানালা বন্ধ করে দিয়ে সরে এসে দরজা খুলে দেয়।

মরিয়ম বেগম কক্ষে প্রবেশ করে ব্যস্তকণ্ঠে বলেন—মনি, এ ঘরে কার কথা শুনলাম?

মনিরা চোখ রগড়ে বললোকই আমি তো এই মাত্র দরজা খুলে দিলাম।

মরিয়ম বেগম বলেন-আমি যে স্পষ্ট শুনলাম, কেউ যেন কথা বলছে?

মনিরা হেসে বলে–তুমি স্বপ্ন দেখছো মামীমা। আমার ঘরে কে আবার কথা বলবে? দুশ্চিন্তায় তোমার মনের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। চলো মামীমা, শোবে চলো।

কি জানি আমি তো জেগেই ছিলাম। হয়তো মনের ভুল সত্যি মা, মনি আমাকে পাগল করে দিয়ে গেছে। কথাগুলো বলতে বলতে বেরিয়ে যান মরিয়ম বেগম।

মনিরা হাফ ছেড়ে বাঁচে। দরজা বন্ধ করে বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে দেয় সে।

০৮.

মাথার নিচে হাত রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বনহুর। পাশে বসে নুরী ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ বনহুরের আংগুলে দৃষ্টি চলে যায় তার। আনন্দধ্বনি করে ওঠে নূরীহুর, ও আংটি তুমি কোথায় পেলে?

হাতখানা সরিয়ে নিয়ে বলেন বনহুর-উহু ওটা আংটি নয়।

তবে কী?

ওটা প্রীতির দান।

প্রীতির দান। কে দিয়েছে? কেন দিয়েছে?

নূরী, সব জানতে চেয়ো না।

আমাকে বলতে তোমার এত আপত্তি কেন হুর। বল ও আংটি তুমি কোথায় পেলে?

হেসে বলে বনহুর রাগ করবে না তো?

রাগ। মোটেই না! বল তুমি ঐ আংটি কার নিকট থেকে কেড়ে নিয়েছ?

কেড়ে নেইনি পরিয়ে দিয়েছে।

মিথ্যা কথা, দস্যু বনহুরের আংগুলে কেউ আংটি পরিয়ে দেবে এত বড় সাহস কার আছে। সত্যি করে বল এ আংটি কোথায় পেলে?

একটি মেয়ে আমাকে উপহার দিয়েছে। ঠাট্টা কর না হুর।

ঠাট্টা নয় নূরী। উঠে বসলো বনহুর। আংগুলের আংটিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে।

নূরীর মুখমণ্ডল পরিবর্তন দেখা দেয়। গম্ভীর গলায় বলে—হুর কে সে। রানী যে তোমার আংগুলো আংটি পরিয়ে দিতে পারে?

বনহুর উঠে দাঁড়ায়—সব কথা বলা যায় না নুরী।

নূরী আর কোন প্রশ্ন করে না। ধীরে ধীরে উঠে নিজের কক্ষের দিকে চলে যায়। অভিমানে ভরে ওঠে তার মন…একথা কি সত্য? বনহুরকে অন্য কোন নারী আংটি পরিয়ে দিতে পারে? না না, সে সবই সইতে পারে কিন্তু নতুন একঠক করে বল, ঘাবড়ে গেলে সইতে পারিনি বনহুরকে অন্য কোন মেয়ে ভালবাসবে, এ সহ্য করতে পারবে না। বনহুর যে তার, ওকে ছাড়া নূরী কাউকে বুঝে না। সে জীবনে এ একটিমাত্র পুরুষকেই চিনে এসেছে। সে হচ্ছে তার জীবনের একমাত্র সাথী। আর ভাবতে পারে না নুরী। বনহুর মিথ্যে কথা বলেছে না-না কোন নারী দস্যু বনহুরকে ভালবাসতে পারে না। সবাই তার নামে আঁতকে ওঠে। হৃদকম্প শুরু হয় তাদের কিন্তু বনহুরকে যদি একবার কোন নারী স্বচক্ষে দেখে সে কিছুতেই ভালো না বেসে পারবে না। ওর মধ্যে এমন একটি আকর্ষণ আছে যার কাছে সবাই পরাজিত হবে। সত্য কি তবে ওকে কোন নারী….না না, তা হতে পারে না। বনহুর তার। তাকে কোন নারী তার কাঝ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না…ছুটে যায় নূরী বনহুরের কক্ষে।

বনহুর নতুন একড্রেসে সজ্জিত হচ্ছিল। নূরী ছুটে গিয়ে চেপে ধরে ওর জামার আস্তিন-বনহুর ঠিক করে বল, তুমি যা বললে তা সত্যি? হেসে ওঠে বনহুর-এরই মধ্যে এত ঘাবড়ে গেলে নূরী?

না না, আমাকে তুমি সত্যি করে বল? হুর, আমি সব সইতে পারি কিন্তু তোমাকে হারাতে পারি না… বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে নূরীর কণ্ঠ ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে অশ্রুধারা।

বনহুর আংগুল দিয়ে নূরীর চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে অয়ধা মন খারাপ কর না নূরী।

বনহুর, বল তুমি যা বললে, সব মিথ্যে?

নূরী, তুমি আমার ওপর বিশ্বাস হারিও না? আমার কাছে তোমার কোন অমর্যাদা হবে না।

বনহুরের বুকে মাথা রেখে বলে নূরী–হুর, তুমি আমার!

বনহুর নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন হয়তো তার মনে আর একটি মুখ ভেসে উঠেছে।

বনহুর নূরীকে লক্ষ্য করে বলেও নূরী, বল তাজকে প্রস্তুত করতে।

নূরী বেরিয়ে যায়।

একটু পরে ফিরে আসে—তাজ তৈরি আছে হুর।

বনহুর নূরীর রক্তিম গণ্ডে আংগুল দিয়ে মৃদু আঘাত করে হেসে বলে–চললাম নূরী।

নূরী শুধু ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানাল।

টানা বারান্দা বেয়ে এগিয়ে যায় বনহুর। তারপর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বিকট আকার ব্যাঘ্র মূর্তির মুখগহ্বরে পা দিয়ে চাপ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে একটা দরজা বেরিয়ে আসে তার সম্মুখে। বনহুর বাইরে বেরিয়ে আসতেই দুজন লোক তাজকে এনে হাজির করে বনহুর একলাফে চড়ে বসে তাজের পিঠে। তাজ উলকাবেগে ছুটতে শুরু করে।

বনের শেষ প্রান্তে গিয়ে তাজের পিঠ থেকে নেমে পড়ে বনহুর। তারপর তাজের পিঠে হাত বুলিয়ে বলে বাড়ি ফিরে যা তাজ।

এবার বনহুর কিছুটা এগিয়ে যায়।

ওপাশে রাস্তার উপরে একটি মোটরকার অপেক্ষা করছে। ড্রাইভার বনহুরকে দেখতে পেয়েই গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরে।

বনহুর ড্রাইভ আসনে উঠে বসতেই ড্রাইভার তার পাশে বসে। বনহুর এবার গাড়িতে স্টার্ট দেয়।

অতি দক্ষতার সঙ্গে গাড়ি চালাচ্ছিল বনহুর। চোখে আজ তার এক নতুন উন্মাদনা।

ঘাটের অদূরে পাশাপাশি কয়েকখানা ছোট বড় নৌকা বাধা রয়েছে। ওদিকের একখানা বড় নৌকা বেশ পরিপাটি করে সাজানো, কয়েকজন মাঝি। বৈঠা হাতে বসে রয়েছে। একজন বলিষ্ঠ মাঝি দাঁড় ধরে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার মাথায় পাগড়ী দিয়ে তার মুখের খানিকটা অংশ ঢাকা। চোখেমুখে একটা শয়তানী ভাব উপচে পড়ছে। কিন্তু লোকটা পাগড়ী দিয়ে নিজের মুখটাকে এমনভাবে আড়াল করে রেখেছে, যাতে কেউ তার মুখ সহজে দেখতে না পায়। অন্যান্য মাঝির মাথাতেও এক একটা গামছা বাঁধা। কারও বা মাথায় একখণ্ড কাপড় জড়ানো, যেমন মাঝিদের হয়।

এই নৌকাখানাই মনিরাদের জন্য ভাড়া করা হয়েছে, দাড়ীর বেশে যে লোকটা পাগড়ীর আড়ালে মুখটা লুকাতে চেষ্টা করছে, তবে সে ব্যক্তি অন্য কেউ নয়—শয়তান নাথুরাম এবং অন্যান্য মাঝির বেশে তারাই অনুচরবর্গ।

অল্পক্ষণেই একদল বান্ধবীসহ মনিরার গাড়ি এসে দাঁড়ালো ঘাটের অদূরে। গাড়ি রেখে নেমে ছিল সবাই। চৌধুরী সাহেব এবং সরকার সাহেব উভয়ে এসেছেন তাদের সঙ্গে। সরকার সাহেব আংগুল দিয়ে বড় নৌকাখানা দেখিয়ে দিয়ে বলেন—চৌধুরী সাহেব, ঐ নৌকাখানা আমি মা মণিদের জন্য ভাড়া করেছি।

চৌধুরী সাহেব নৌকা দেখে খুশি হলেন হেসে বলেন—বেশ, বেশ সুন্দর নৌকাখানা তো! বেশ বড়সড়ও সরকার সাহেব। আপনি কিন্তু ওদের সঙ্গেই থাকবেন।

জি হ্যাঁ আমি মা-মনিদের সঙ্গেই যাচ্ছি। কথাটা বলেন বৃদ্ধ সরকার সাহেব।

মনিরা হাত উঠিয়ে ডাকে—এই মাঝি নৌকা নিয়ে এসো।

মাঝিগণ ব্যস্ত হয়ে নৌকা এগিয়ে আনতে লাগলো। নৌকাখানা খুব বড় হওয়ার একেবারে ঘাটের নিকটে পৌঁছল না, মাঝিরা একটা তক্তা ঘাট আর নৌকায়

পেতে দিল।

মেয়েদের আনন্দ আর ধরে না। সবাই এক এক করে তক্তা খানার ওপর দিয়ে নৌকায় গিয়ে পৌঁছল। মনিরা কিন্তু খুব ভয় হচ্ছিল সে বারবার, তক্তাখানায় পা রেখে পা সরিয়ে নেয়। চৌধুরী সাহেব এবং বৃদ্ধ সরকার সাহেব মনিরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কেমন করে মনিরা নৌকায় যাবে? অন্যান্য মেয়েরা নৌকায় পৌঁছে হাসাহাসি শুরু করলো। মনিরার অবস্থা দেখে এ ওর গায়ে ঢলে পড়তে লাগলো। কেউ বলেন—মনিরা এত ভীতু। কেউ বলেন-আয় আমার হাত ধরে পার হয়ে আয় মনি। কেউ বলেন–মাঝিদের একজন পার করে নাও না।

মনিরা নিরুপায় হয়ে তাকাচ্ছে মামাজানের মুখের দিকে।

চৌধুরী সাহেব বলে উঠেন, ও মাঝি, ওকে হাত ধরে পার করে নাও, দেখ পড়ে না যায়।

একজন মাঝি এগিয়ে আসতেই অন্য একজন মাঝি তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই এগিয়ে এসে মনিরার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

মনিরা সঙ্কুচিতভাবে হাতখানা এগিয়ে দিল ওর দিকে। মাঝি মনিরার হাত চেপে ধরে নির্বিঘ্নে পার করে নিল। কিন্তু মনিরা নিজের হাতে কেমন যেন একটা মৃদু চাপ অনুভব করলো। মনে মনে ভীষণ রাগ হলো মনির। মাঝির হাত থেকে হাতখানা টেনে নিয়ে নৌকায় একপাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

মেয়েরা মুখ টিপে হাসলো। একজন মনিরার কাছে মুখ নিয়ে বলেন, মাঝিটার তোর জন্য বড় দরদ।

যা, যত সব ইয়ে।

সরকার সাহেব নৌকায় উঠে বসতেই নৌকা ছেড়ে দিল মাঝিরা।

চৌধুরী সাহেব ঘাট থেকে হাত তুলে বলেন, বেশি রাত করো না মনিরা।

মনিরাও হাত নেড়ে বলল, বেশি রাত করবো না মামুজান, তুমি বাড়ি যাও।

নৌকায় বসে মেয়েদের সোক আনন্দ। কেউ বা গান গাইতে শুরু করলো, কেউ বা হাসি আর গল্পে মেতে রইল। কেউ বা মাঝিদের হাত থেকে বৈঠা নিয়ে পানি টানতে শুরু করলো।

মনিরা কিন্তু গম্ভীর হয়ে রয়েছে। কারণ মাঝিটার আচরণ এখনও তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কি অসভ্য ঐ মাঝিটা, একটা ছোটলোকের বাচ্চা। কেউ যে ওর হাতে হাত রাখে তাই ভাগ্য। সে কিনা তার হাতে চাপ দিল! ছিঃ বড় লজ্জার কথা, মনিরা সকলের অলক্ষ্যে একবার মাঝিটার দিকে বিষনজরে তাকায়, মাঝিটা যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি বিনিময় হতেই মনিরা রাগে অধর দংশন করলো এবং তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল সে।

হাসলো মাঝিটা। দাঁড়ের ছপ ছপ শব্দের সঙ্গে তার মুখ থেকে একটি শব্দ বেরিয়ে মিলিয়ে গেল শুনা গেল না কিছু।

সাথীরা ধরে ফেললো তাকে একটা গান শুনাতে হবে। মনিরা কিছুতেই গাইবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে গাইতেই হলো।

বান্ধবীদের জেদে তার কোন আপত্তিই টিকলো না। মনিরার গানের সুর আর দাঁড়ের ঝুপঝাপ শব্দ মিলে এক মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি হলো। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, ঢেউয়ের বুকে দোল খেয়ে যেন এগিয়ে চলেছে।

গোটা নৌকায় বিরাজ করছে এক অপরিসীম আনন্দ। বৃদ্ধ সরকার সাহেবও মেয়েদের সঙ্গে আনন্দে মাতোয়ারা। মনিরার গানের সুরের তালে তালে মাথা দোলাচ্ছেন তিনি।

হাসি গল্প আর আনন্দের মধ্যে নৌকাখানা যে অনেক দূরে এসে পড়েছে। সেদিকে খেয়াল নেই কারো।

আকাশে পূর্ণচন্দ্র। সমত ঝিনাইদা নদীটা যেন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে। উঠেছে। যেদিকে তাকানো যায় শুধু আলোর বন্যা।

মনিরা বলে ওঠে-সরকার চাচা এবার নৌকা ফেরাতে বলুন। সরকার সাহেবও বলে উঠলেন—তাইতো, অনেক দূরে এসে পড়েছি আমরা। মাঝি এবার তোমার নৌকা ফেরাও।

মাঝিরা হঠাৎ কেমন যেন ব্যস্ত হয়ে ছিল। নৌকাখানা যেমন চলছিল তেমনি এগুতে লাগলো বরং গতি আরও বেড়ে গেছে। মনিরা বলে ওঠে, মাঝি নৌকা ফেরাও।

কিন্তু কই তারা যেমন দাঁড় টানছিল, তেমনি নির্বিকারভাবে কাজ করে চলেছে। নৌকা ফেরাবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

অদূরে দেখা গেল ঝিনাইদার বাঁক। সবাই লক্ষ্য করলো বাকের মুখে একখানা বজরা বাধা রয়েছে। বজরায় কোন আলো নেই।

জ্যোস্নার আলোতে বজরাখানাকে একটি ভাসমান কুটিরের মত মনে হলো।

এমন সময় নৌকার পেছনে শুনা গেল চাপা একটি কণ্ঠস্বর সব মনে, আছে তো?

অপর একটি চাপাক—আছে হুজুর।

পূর্বের কণ্ঠ মেয়েটিকে ঠিকভাবে চিনে রেখেছিস?

হ্যাঁ, হুজর....।

দাঁড়ের শব্দে কথার আওয়াজগুলো মেয়েদের বা সরকার সাহেবের কানে যায় না।

হঠাৎ দেখা যায় বজরার দিক থেকে একখানা ছিপনৌকা তর তর করে এদিকে এগিয়ে আসছে।

মাঝিদের ভাবসাব লক্ষ্য করে মেয়েরা আশঙ্কিত হয়ে পড়ে। বৃদ্ধ সরকার সাহেব বারবার বলতে থাকে মাঝি, নৌকা ফেরাও মাঝি নৌকা ফেরাও–

কিন্তু মাঝিরা সে কথা কানেও নেয় না।

মেয়েরা ভয়ার্তস্বরে এটা সো বলারলি শুরু করলো। কেউ বা কেঁদেই ফেললো।

সরকার বলেন-মাঝি, তোমরা জানো না এ নৌকায় কার ভাগনী আছে? শিগগির নৌকা ফেরাও।

ঠিক সে মুহূর্তে দাড়ী-মাঝি সরকার সাহেবের বুকের কাছে রিভলভার চেপে ধরে গর্জে ওঠে——জানি এবং তার জন্যই আমরা নৌকা বেয়ে এতদূর এসেছি। যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তবে সবাই চুপ করে থাক। চৌধুরী সাহেবের ভাগনী মনিরাকে আমাদের চাই।

ভীষণভাবে শিউরে উঠলো মনিরা। এবার সে বুঝতে পারলো মাঝিদের মনোভাব। কিন্তু মুখে ভয়ের ভাব না এনে বলেন—খুবতো আস্পর্ধা তোমাদের দেখছি। মনিরাকে নেওয়া যত সহজ মনে করছে তত সহজ নয়। শিগগির নৌকা ফেরাও, নচেৎ আমরা সবাই মিলে চিৎকার করবো!

শয়তান নাথুরাম হেসে ওঠে হাঃ হাঃ হাঃ চিৎকার করবে? এই নির্জন নদীবক্ষে কে শুনবে তোমাদের কণ্ঠস্বর?

অন্য মেয়েরা সবাই পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে গেছে। কারও মুখে কথা নেই। মনে-প্রাণে সবাই খোদাকে স্মরণ করতে থাকে। ভয়ে সকলের মুখ বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।

সরকার সাহেব বৃদ্ধ, তবু হার মানলেন না, চিৎকার করে বলেন–শয়তান, তোমাদের চক্রান্ত আগে বুঝতে পারলে তোমাদেরকে পুলিশে ধরিয়ে দিতাম।

হুঙ্কার ছাড়ে নাথুরাম—তা যখন পারনি তখন বুড়ো বয়সে পৈতি জানটা নষ্ট কর না। সুবোধ বালকের মত নিশ্চপ বসে থাক।

নিরস্ত্র সরকার সাহেব শুধু চিৎকার করে শাসাতে লাগলেন, তাছাড়া আর কিইবা করবেন তিনি! এতগুলো দস্যুর সঙ্গে পেরে ওঠা তার পক্ষে মুশকিল।

মেয়েদের মধ্যে একটা হুলস্থুল শুরু হয়েছে। কেউ কাঁদছে, কেউ-বা চিল্কার করছে। কেউ বা বলছে—এটা দস্যু বনহুরের নৌকা। সে মনিরাকে

চুরি করার জন্য এই ফন্দি এটেছে।

মেয়েরা তো বনহুরের নামে কাপতে শুরু করলো! সেকি ভীষণ অবস্থা।

ছিপ নৌকাখানা একেবারে নিকটে পৌঁছে গেছে।

দু'জন বলিষ্ঠ লোক মনিরাকে জাপটে ধরলো। বাধা দিতে গেল সরকার সাহেব, সঙ্গে সঙ্গে একটা বলিষ্ঠ লোক তার নাকে ঘুষি বসিয়ে দিল। সরকার সাহেব ঘুরপাক খেয়ে পড়ে গেল নৌকায়।

লোক দু'জন মনিরাকে শূন্যে উঠিয়ে নিল, তারপর লাফিয়ে ছিল ছিপ নৌকাখানায়। সঙ্গে সঙ্গে অন্য মাঝিগণও ছিপ নৌকায় লাফিয়ে পড়তে লাগলো।

ওদিকে মনিরার বান্ধবীগণ ভীষণ আর্তনাদ শুরু করে দিয়েছে। বাঁচাও! বাঁচাও! দস্যু বনহুর আমাদের সর্বনাশ করলো, আমাদের মেরে ফেললো। বাঁচাও বাঁচাও.....

মনিরাকে ছিপ নৌকায় উঠিয়ে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চললো দস্যুগণ বজরাখানার দিকে। মনিরাও তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করছে—বাঁচাও বাঁচাও...

মাঝি-বেশি শয়তানের অনুচরের দল ছিপ নৌকায় দাঁড় টেনে চলেছে। ওদিকে মনিরার বান্ধবীও আহত সরকার সাহেবকে নিয়ে বড় নৌকাখানা আপন মনে এদিকে ভেসে চললো।

ছিপ নৌকাখানা প্রায় বজরার নিকটবর্তী হয়েছে, এমন সময় সে মাঝি। যে মনিরাকে তক্তা পার করে নিতে গিয়ে তার হাতে মৃদু চাপ দিয়েছিল, সে হাতের বৈঠা নিয়ে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে। অন্য মাঝিদের ছিপ নৌকাখানা ভীষণ একটা ঘুরপাক খেয়ে গেল।

আচমকা এই বিপদের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না শয়তান নাথুরাম, সে রিভলভার উদ্যত করে গর্জে উঠলো কে তুই?

মনিরা জ্যোস্নার আলোতে লক্ষ্য করলো, এ সে মাঝি কিছু পূর্বেও যে মাঝিকে সে মনে মনে অভিসম্পাত করছিল। এক্ষণে মনিরার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে, কে এ মাঝি যার প্রাণে এত দয়া? নিশ্চয়ই তাকে বাঁচানোর জন্যেই মাঝিটির এত প্রচেষ্টা।

নাথুরাম মাঝিটার বক্ষ লক্ষ্য করে রিভলভার উদ্যত করে ধরতেই মাঝিটা চট করে সরে দাঁড়ালো, নাথুরামের রিভলভার নিস্তব্ধ নদীবক্ষে গর্জে উঠলো—গুড়ম।

মাঝিটা নাথুরামকে পুনরায় রিভলভার উদ্যত করতে না দিয়ে ভীষণভবে আক্রমণ করলো। নাথুরাম টাল সামলাতে না পেরে ছিপ নৌকাখানার মধ্যে পড়ে গেল। মাঝি তার হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল নদীবক্ষে।

ততক্ষণে অন্য শয়তানগুলো আক্রমণ করে মাঝিটাকে। চলে ভীষণ ধস্তাধস্তি।

ছোট্ট ছিপ নৌকাখানার উপরে সেকি তুমুল অবস্থা। ভয়ে মনিরার অবস্থা মরিয়া হয়ে উঠলো। এভাবে নৌকা ভ্রমণের জন্য নিজকে ধিক্কার দিতে লাগলো!

সামান্য একটি ছিপ নৌকা এভাবে কতক্ষণ টিকতে পারে। বিশাল নদীবক্ষে ছিপ নৌকাখানা মোচার খোলার মত দুলতে লাগলো। মনিরা ভয়কম্পিত বক্ষে দেখছে এই বুঝি ছিপ নৌকাখানা ডুবে যায়। মনে প্রাণে সে মাঝিটার কামনা করছে। কি আশ্চর্য ওর সঙ্গে এতগুলো শয়তান পেরে উঠছে না। মাঝিটা এক একটা প্রচণ্ড ঘুষিতে নাথুরামের অনুচরগণকে নদীবক্ষে নিক্ষেপ করতে লাগলো। কিন্তু নাথুরাম হটার বান্দা নয়, সে প্রাণপণে মাঝিটাকে কাবু করার চেষ্টা করতে লাগলো।

হঠাৎ ছিপ নৌকাখানা একপাশে কাৎ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেল নদীবক্ষে।

কোথায় গেল মনিরা কোথায় বা নাথুরাম আর শয়তান মাঝিদের দল। . যে যেদিকে পারলে সাঁতার কেটে প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করলো।

মনিরা তলিয়ে যাচ্ছে। সে সাঁতার কাটতে পারে না। বাঁচার কোন উপায় নেই তার। ঢক ঢক করে কিছুটা পানি খেয়ে ফেললো সে। এই ছিল তার অদৃষ্টে। হায় কেন সে আজ নৌকা ভ্রমণে বেরিয়েছিল। মৃত্যকালে একবার মনে ছিল মনিরের কথা। আর ওর মুখখানা দেখতে পেল না মনিরা। তবু বাঁচার জন্য মনিরা হাত-পা ছুঁড়ে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো।

হঠাৎ মনিরা অনুভব করলো কেউ যেন তাকে ধরে ফেলেছে। মনিরা তখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। একটা একটা খড়-কুটোও তখন তার কাছে অতি বড় সম্পদ। সে কিছু না ভেবে আঁকড়ে ধরলো শত্রু কিংবা মিত্র ভাবার সময় তখন তার নেই।

মনিরা যখন চোখ মেলে তাকালো তখন একটা উজ্জ্বল আলো তার সামনে ছড়িয়ে ছিল। উঠে বসতে গেল অমনি একটা বলিষ্ঠ বাহ তাকে শুইয়ে দিল।

মনিরা চমকে ফিরে তাকালো সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ আপত কণ্ঠে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো-মনির।

হাসলো বনহুর, কোন জবাব দিল না।

মনিরা আনন্দের আবেগে বনহুরের গলা জড়িয়ে ধরলো। খুশিতে আত্মহারা হয়ে বলে—তুমি! এ যে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। মনির, কি করে আমি তোমার পাশে এলাম। বল, বল মনির?

হেসে বলেন বনহুর—সে মাঝি তোমাকে আমার নিকটে পৌঁছে দিয়েছে, যে নাবিককে তুমি মনে মনে অভিসম্পাত করেছিলে।

মনিরার চোখে একরাশ বিস্ময় ঝরে পড়ে, অবাক হয়ে বলে–মনির তুমি কি করে জানলে আমি সে মাঝিকে গালমন্দ দিয়েছিলাম সে মাঝিই বলেছে।

মনিরা আরও অবাক হয়ে বলে–সে কি করে আমার মনের কথা বলবে? জান মনির, সত্যি আমি তাকে অসভ্য বলে মনে মনে গালমন্দ দিয়েছিলাম। কিন্তু সে না হলে হায় কি যে হত। শয়তান দস্যু দল আমাকে হত্যা করতো।

গম্ভীর কণ্ঠে বলে বনহুর হত্যা করতো না একথা সত্য তোমাকে তারা . হরণ করে এক শয়তানের হাতে সমর্পণ করতো–

উঃ কি সর্বনেশে কথা! মনির, সে মাঝি তোমার কে?

কি তার পরিচয়?

সে আমার বন্ধু।

বন্ধু? মনির আমার হয়ে তুমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে দিও। বেচারা আমাকে কত কষ্ট করে বাঁচিয়েছে।

নাহলে তুমি এখন শয়তান মুরাদের হাতে গিয়ে...

অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠে মনিরা–মুরাদ।

হ্যাঁ, সে মুরাদ তোমাকে হস্তগত করার জন্য অবিরত ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। শুধু তাই নয়, হাজার হাজার টাকা সে পানির মত খরচ করেছে।

দাঁতে দাঁত পিষে বলে মনিরা—পাষণ্ড শয়তান....মনির, তোমার মাঝি বন্ধু কত মহৎ।

হ্যাঁ মনিরা, গরীব বলে কখনও কাউকে তুচ্ছজ্ঞান করা উচিত নয়, বা অবহেলা করা ঠিক নয়। তাই বলে সবাইকে বিশ্বাস করাও ঠিক নয়।

মনিরা বনহুরের জামার বোতাম নিয়ে নড়াচড়া করতে করতে বলে–আমি কি জানতাম ওটা ডাকাতের নৌকা। ভাগ্যিস মাঝিটা ছিল, সত্যি তার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। এক্ষণি তাকে যদি পেতাম...

কি করতে?

হাত ধরে মাফ চেয়ে নিতাম।

বনহুর মনিরার হাতের কাছে হাতখানা বাড়িয়ে দেয়—সে মাঝি তোমার সামনে উপস্থিত মনিরা নাও মাফ চেয়ে নাও।

মনিরার চোখে বিস্ময়, মুখে ফুটে ওঠে স্মিত হাসির রেখা, বলে ওঠে সে—তাই বল। হ্যাঁ, এবার বুঝেছি সব। তাই তো বলি, কোন সে মাঝি যার এত বীরত্ব।

কই মাফ চেয়ে নিলে না আমার কাছে।

মনিরা বনহুরের বুকে মাথা রেখে চিবুকে মৃদু টোকা দিয়ে বলে–তুমিই এবার আমার নিকটে মাফ চেয়ে নাও। কারণ, একটি যুবতীর হাতে চাপ দেওয়া কম দোষণীয় নয়।

বনহুর আর মনিরা মিলে হাসতে থাকে। বনহুর বলেন—মনিরা, এখানে বেশিক্ষণ থাকা তোমার পক্ষে ঠিক নয়। বল এবার তোমাকে কিভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়?

মনিরা চারদিকে তাকিয়ে বলে—এখন আমি কোথায় মনির?

বনহুর সোজা হয়ে বসে বলে—তুমি এখন আমার গুপ্তকক্ষে বন্দী রয়েছ।

কি বললে এটা তোমার গুপ্তকক্ষ?

হ্যাঁ, গভীর মাটির তলায় রয়েছ এখন তুমি।

এ তুমি কি বলছ!

কেন, ভয় হচ্ছে নাকি?

না।

জান মনিরা, এখানে যদি তোমাকে চিরদিন আটকে রাখি কেউ তোমার সন্ধান পাবে না। এখানে শুধু তুমি আর আমি। মনির, তোমার জন্য আমি সব ত্যাগ করতে পারবো।

বনহুর অন্যমনস্ক হয়ে যায়, কি যেন চিন্তা করতে থাকে।

মনিরা বলে—কি ভাবছো!

জবাব দেয় বনহুর—ভাবছি, তোমার মামাজান-মামীমার কথা। তারা এতক্ষণে হয়তো কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছেন।

কি বললে, আমার মামুজান আর মামীমা? তোমার কেউ নন তারা? বলেন, আব্বা আর আম্মা।

সত্য মনিরা, আব্বা আর আম্মা খুব বুঝি ভাবছেন তোমার জন্য। একদিন ঐ ঝিনাইদার বুকে হারিয়েছিল তাঁর প্রিয় পুত্র মনিরকে। আর আজ সে ঝিনাইদা হরণ করলো তাদের একমাত্র কন্যা সমতুল্যা ভাগ্নী মনিরাকে

না, আর বিলম্ব করা উচিৎ হবে না মনিরা, চলো তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

মনিরাও উঠতে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বসে ছিল সে।

বনহুর পুনরায় পাশে বসে বলল—এখনও অসুস্থ বোধ করছো মনিরা?

হ্যাঁ, মাথাটা এখনও ঝিম ঝিম করছে।

তবে চুপ করে কিছুক্ষণ শুয়ে থাক। আমি এক্ষুণি আসছি।

কোথায় যাবে মনির?

বিশেষ একটা দরকার আছে।

যাও! মনিরা, বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে।

বনহুর বেরিয়ে যায়।

বনহুর বেরিয়ে যেতেই মনিরা উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে ঘুরেফিরে দেখতে লাগলো সব। যে কক্ষে সে শুয়েছিল সেটা একটা মাঝারি রকমের ঘর। কক্ষের দেয়াল কঠিন পাথর দিয়ে তৈরি। কোন আড়ম্বর নেই সে। কক্ষে। মেঝের এক পাশে পাথর দিয়ে তৈরি একটা খাট। খাটে দুগ্ধ ফেননিভ কোমল বিছানা, যে বিছানায় সে এতক্ষণ শুয়েছিল। মনিরা বুঝতে পারল ঐ বিছানা দস্যু বনহুরের। কক্ষের একপাশে একটা পাথরের টেবিল। ‘ টেবিলে ছোটবড় কয়েকখানা রিভলবার। ওপাশের দেয়ালে ঠেস দেওয়া রয়েছে বড় বড় ভারী গোছের দুটো রাইফেল। আর একটা টেবিলে কতকগুলো সুতীক্ষ্ণধার হোরা, অবশ্য সেগুলো সব খাপের মধ্যে আটকানো। মনিরা ধীরে ধীরে সে অস্ত্রগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে নিল। এগুলো বনহুরের ব্যবহার্য অস্ত্র। সবগুলোতে যেন তার হাতের স্পর্শ লেগে রয়েছে।

মনিরা এগুতে লাগলো, দেখতে পেল সামনে একটি দরজা তার ওপাশেই একটা সিড়ির মত আরও নিচে নেমে গেছে। মনিরা এক পা দু’পা করে এগুতে লাগলো। সিড়ির মুখে গিয়ে অবাক হলো সে, নিচে ঠিক তার পায়ের তলায় একটা হলঘরের মত প্রকাণ্ড একটা ঘর। ঘরের মধ্যে উজ্জল আলো জ্বলছে। মনিরা অবাক হয়ে দেখলো বনহুর একটি উচ্চ আসনে বসে আছে। তার সামনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো বলিষ্ঠ লোক, প্রত্যেকের হাতেই এক একটা রাইফেল। মাথায় পাগড়ী কানে বালা, হাতে বালা, গায়ে ফতুয়ার মত আটসাট জামা।

মনিরা স্তব্ধ হয়ে দেখছে লোকগুলো বনহুরের কোন আদেশের প্রতীক্ষা করছে।

কি যেন বলেন বনহুর স্পষ্ট বুঝা গেল না, ভীষণকায় লোকগুলো কুর্নিশ জানিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তারপর সারিবদ্ধভাবে অন্ধকার অদৃশ্য হয়ে গেল।

লোকগুলোর চেহারা দেখে মনিরার কণ্ঠনালী শুকিয়ে গিয়েছিল। ঠিক যেন একদল রাক্ষসের মধ্যে বনহুর একটি দেবমূর্তি। আশ্চর্য হলো মনিরা, এত ভয়ঙ্কর লোকগুলো বনহুরকে সিংহের মত ভয় করে।

মনিরা এই কথা ভাবছে হঠাৎ শুনতে পেল সিঁড়িতে ভারী বুটের শব্দ।

সম্বিৎ ফিরে এলো মনিরার, সে দ্রুত নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে ছিল।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করে মনিরার পাশে গিয়ে বসলো। মনিরা নির্বাক নয়নে তাকিয়ে রইলো বনহুরের মুখের দিকে এই সে দস্যু বনহুর যার ভয়ে গোটা দেশ প্রকম্পমান। যার নাম স্মরণ করে সবাই আতঙ্কে শিউরে ওঠে। পুলিশমহল যাকে গ্রেপ্তারের জন্য লাখ টাকা ঘোষণা করেছে সেই দস্যু বনহুর তার পাশে। তার অতি প্রিয়জন।

বনহুর হেসে বলল অমন করে কি দেখছো মনিরা?

তোমার আসল রূপ।

কেমন দেখছো?

অনেক সুন্দর-মনির, সত্যি তুমি আমাকে ভালবাস?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন মনিরা?

বল আমার মন শুনতে চাচ্ছে।

বাসি। মনিরা... অস্ফুট শব্দ করে বনহুরের বুকে মাথা রাখে মনিরা।

চলো মনিরা, এবার তোমাকে রেখে আসি।

যদি না যাই তোমার খুব অসুবিধা হবে, না।

আমার নয়, তোমার হবে।

কেন? কি করে আমার অসুবিধা হবে?

মনিরা, তুমি শিশু নও। তোমার নিরুদ্দেশ লোকনিন্দার কারণ হবে। আব্বা আম্মা তোমার জন্য লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না। বল তো তখন তাদের কত কষ্ট হবে?

মনিরা উঠে দাঁড়ায়, তারপর বনহুরের হাত ধরে বলে–চলো।

চলতে চলতে কথা হয় দুজনের মধ্যে। মনিরা বলে—তুমি না আমার গা ছুঁয়ে শপথ করেছিলে আর দস্যুতা করবে না। পারলাম না আমার কথা রাখতে মনিরা। শয়তান নাথুরাম ভয়ঙ্কর শয়তানী শুরু করেছে।

নাথুরাম—সে আবার কে?

মাঝির ছদ্মবেশে যে তোমাকে হরণ করতে যাচ্ছিলো।

শয়তান নাথুরাম!

হ্যাঁ, সে শুধু শয়তান নয় মনিরা, সে নরপিশাচ। দেখে নিতে চাই শয়তান নাথুরামের কত বাহাদুরি! আজই খবর পেলাম জম্বুরা পর্বতের এক গুহায় তার গোপন আস্তানা রয়েছে। সেখানে নাথুরামের একটি কালি মন্দিরও আছে। মন্দিরে প্রতি অমাবস্যায় একটি কুমারী কন্যাকে বলি দেওয়া হয়।

মনিরা আর্তনাদ করে ওঠে—উঃ কি ভীষণ কাণ্ড!

শুধু তাই নয় মনিরা, সে আরও অনেক কিছু দুষ্কর্মের সঙ্গে লিপ্ত আছে। আমি ওকে দেখে নেব।

বনহুরের মনোভাব আবছা অন্ধকারে দেখতে পেল না মনিরা। কিন্তু অনুভব করলো সে মনিরার হাতের মধ্যে বনহুরের বলিষ্ট হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠেছে।

তারপর কিছুদূর নীরবে এগুলো তারা।

এবার এক সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করলো মনিরা আর বনহুর। বেশ অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ। বনহুর মনিরাকে এঁটে ধরলো-মনিরা, সাবধানে আমার হাত ধরে চলবে। পা ফসকে গেলেই মৃত্যু।

মনিরা বনহুরের হাত এটে ধরে চলতে লাগলো।

চলতে চলতে হেসে বলল বনহুর-মাঝি বেচারা তোমার হাতে মৃদু চাপ দিয়েছিল বলে সে তোমার অসংখ্য অভিসম্পাত কুড়িয়েছে, আর এখন…

যাও ঠাট্টা রাখ। মনিরা বনহুরের হাতে হাত রেখে পায়ের দিকে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে বনহুরকে জাপটে ধরলো সে। সুড়ঙ্গ পথের আবছা অন্ধকারে দেখতে পেল, সরু একটা পথ, তার নিচেই হাত দেড়েক দূরে গভীর খাদ। শিউরে উঠলো মনিরা। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল—আমি কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছি না মনির, আমাকে তুমি নিয়ে চলো।

বনহুর হেসে বলেন—বেশ, তুমি চোখ বন্ধ করো, ওয়ান, টু, থ্রীবনহুর মনিরাকে ছোট বালিকার মত দু'হাতের উপর উঠিয়ে নিল। এবার দ্রুত চলতে লাগলো সে। মনিরা দুহাতে নিজের চোখ ঢেকে চুপ করে রইলো।

সুড়ঙ্গের বাইরে এসে মনিরাকে নামিয়ে দিয়ে বলল বনহুর, চোখ যেন খুলে না, পড়ে যাবে।

মনিরা বুঝতে পারলো, এখন সে বেশ প্রশস্ত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। চোখ মেলে আনন্দসূচক শব্দ করে উঠলো-ইস, কি সুন্দর আলো-বাতাস।

একটা মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে বনহুর আর মনিরা। একি, দিন যে। তবে যে ওখানে অত আলো জ্বলছিল! বুঝতে পারলো মনিরা ওটা মটির নিচে তাই আলোর ব্যবস্থা।

মনিরা সামনে তাকাতে দেখতে পেল অদূরে একটি জমকালো অস্ত্র নিয়ে। দটি লোক দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর লোক দুটিকে ইংগিত করতেই অশ্ব নিয়ে এগিয়ে এলো। বনহুর এবার মনিরাকে অশ্বে উঠিয়ে নিয়ে নিজেও চড়ে বসলো। হেসে বল-এর নাম কি জান?

না।

এর নাম তাজ।

বহুদিন নিশীথ রাতে অশ্বখুরধ্বনি কর্ণগোচর হয়েছে। আজ স্বচক্ষে দেখলাম এবং তার পৃষ্ঠে আরোহণ করার সৌভাগ্য লাভ করলাম। সত্যি আজ আমি গর্বিত।

তাজ এবার উল্কা বেগে ছুটতে শুরু করলো। বনহুর মনিরাকে বা হাতে এঁটে ধরে দক্ষিণ হাতে লাগাম চেপে ধরলো।

তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো বনহুর। তারপর মনিরাকে নামিয়ে বলেন— এবার কিছুটা হাঁটতে হবে, পারবে?

পারবো।

কিন্তু আমি আর যাচ্ছিনে তোমার সঙ্গে ঐ যে গাড়িখানা পথের ওপরে দেখছো ওটা আমার গাড়ি। ড্রাইভার তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেবে!

মনিরা।

বল?

আবার কখন তোমার দেখা পাব?

যখন তোমার মন আমাকে ডাকবে, দেখবে ঠিক আমি তোমার পাশে পৌঁছে গেছি। আচ্ছা এবার যাও, আল্লাহ হাফেজ।

মনিরা এগুতে লাগলো, আর বারবার ফিরে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। বনহুর তাজের লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

মনিরা গাড়িখানায় পাশে পৌঁছতেই ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরলো। মনিরা আর একবার ঘুরে বনহুর আর তাজের দিকে ফিরে তাকিয়ে গাড়িতে চড়ে বসলো।

গাড়ি বারান্দায় পৌঁছতেই মনিরা নেমে ছুটে গেল অন্দর বাড়িতে। দেখতে পেল তার সমস্ত বান্ধবী, যারা নৌকায় ছিল সবাই চৌধুরী সাহেব আর মরিয়ম বেগমকে গত রাতের ঘটনাটা বুঝাতে চেষ্টা করেছে। বৃদ্ধ সরকার সাহেবের মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা, গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। সকলের মুখমণ্ডল বিষণ্ণ, মলিন।

চৌধুরী সাহেব আর মরিয়ম বেগমের চোখে অশ্রু, তারা অবিরত কাঁদছেন।

মনিরাকে দেখতে পেয়েই বান্ধবীরা আনন্দধ্বনি করে উঠলো। চৌধুরী সাহেব চোখের পানি মুছে এগিয়ে আসেন কোথায় গিয়েছিলে মা, কি করে ফিরে এলি? ডাকাতরা নাকি তোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল?

মেয়েরা একসঙ্গে বলে ওঠে—দস্যু বনহুর ছাড়া কেউ নয়। তারই ঐ কাজ, কিন্তু কি করে ফিরে এলি ভাই?

চৌধুরী সাহেব বলেন—একটু সুস্থ হউক, সব শুনছি।

মনিরাকে পেয়ে মরিয়ম বেগম আনন্দে অধীর হলেন। তাড়াতাড়ি গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন—ভাল ছিলে তো, মা?

হ্যাঁ মামীমা। ভাগ্যিস এক ভদ্রলোক আমাকে ডাকাতের নৌকা থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছিল, তাই রক্ষা। খুব ভদ্র মহৎ ব্যক্তি তিনি। খোদর অপরিসীম দয়ায় আর তার কৃপায় এ যাত্রা পরিত্রাণ পেয়েছি।

সব শুনে আশ্বস্ত হলেন চৌধুরী সাহেব। বান্ধবীরা মনিরাকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠলো। মরিয়ম বেগম বলেন—তোমরা বসো, আমি চানাস্তার আয়োজন করি।

চৌধুরী সাহেব উঠে দাঁড়ালেন কাল থেকে কি যে দুশ্চিন্তায় ছিলাম, যাই পুলিশ অফিসে খবরটা জানিয়ে আসি। মিঃ হারুন তার দলবল নিয়ে হয়রান পেরেশান হচ্ছেন। তারপর সরকার সাহেবকে লক্ষ্য করে বলেন, চলুন, ওদিক হয়ে ডাক্তারখানায় যাব। আপনার আরও একটি ইনজেকশন লাগবে!

সরকার সাহেবও উঠে দাঁড়ান—চলুন।

সবাই বেরিয়ে যান। বান্ধবীরা একজন বলে—ভদ্রলোক কেমন দেখতে রে মনিরা?

হেসে বলে মনিরা খুব সুন্দর। অপূর্ব।

অন্য একটি মেয়ে বলে-বয়স খুব বেশি?

না, খুব কম। তবে তিরিশের কাছাকাছি।

আর একজন বান্ধবী টিপনি কাটে—খুব বড়লোক বুঝি?

মনিরা স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দেয় রাজাধিরাজ?

প্রথম বান্ধবী চাপাকণ্ঠে বলে–সে কি বিবাহিত?

না।

একসঙ্গে সবাই হর্ষধ্বনি করে ওঠে—মারহাবা! আমাদের নৌকাভ্রমণ সার্থক হয়েছে তাহলে!

একজন বলেন-মনিরার ভাগ্য বলতে হবে।

অন্যজন বলে–শুধু ভাগ্য নয়—সৌভাগ্য।

আর একজন বলে–ভদ্রলোক নিশ্চয়ই তার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারেন।

হ্যাঁ, পারে।

আমাদের হিংসে হচ্ছে কিন্তু।

আচ্ছা তোমাদের ভাগ দেব কিছুটা করে।

তখন আর দেখাবিনে, লুকিয়ে রাখবি সবার কাছ থেকে।

না, তোদের দেখার কথা দিলাম।

এমন সময় মরিয়ম বেগম চা-নাস্তা ট্রে-সহ কক্ষে প্রবেশ করেন।

মনিরা উঠে গিয়ে মামীমার হাত থেকে চায়ের ট্রে নিয়ে নিজেই তৈরি করতে বসে।

•

সে দিন বনহুর মাধুরীর ঘরে রাত কাটিয়ে গেছে কথাটা যখন সবাই জানতে পারলো তখন মাধুরীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। ভোরে যখন অদ্ভুতভাবে

জামাইবাবু স্বয়ং এসে উপস্থিত হল তখন তো আরও ঘোরর ব্যাপার। জামাই বাবু রাতের ঘটনা সব বর্ণনা করে শুনাল কিন্তু নিজের স্ত্রীর কক্ষে দস্যু বনহুর রাত্রিবাস করছিল এ যে যার-পর-নাই কেলেঙ্কারি কথা। অমন স্ত্রীকে জামাই নিমাই বাবু গ্রহণ করতে অসম্মত হলো।

মাধুরী অনেক করে বলেন–স্বামীর পা ছুঁয়ে শপথ করলো, দস্যু হলেও সে অতি মহৎ জন মাধুরীকে সে স্পর্শ করেনি। কিন্তু মাধুরীর কথাটা জামাই নিমাই বাবু বিশ্বাস করলো না।

শ্বশুর শাশুড়ীর কান্নাকাটি, স্ত্রী মাধুরীর চোখের জল নিমাইকে ধরে রাখতে পারলো না। সে বাগ করে চলে গেল।

মাধুরীর জীবনে নেমে এলো এক চরম পরিণতি। চোখের পানি হলো তার সম্বল। একি হলো তার বিয়ের পর স্বামীকে না চিনতেই তাকে হারাল মাধুরী। যত রাগ গিয়ে ছিল দস্যু বনহুরের ওপর, কিন্তু তার তো কোন অপরাধ নেই, দুস্য হলেও মাধুরী তার হৃদয়ের যে পরিচয় পেয়েছে সে অতি মহান-অতি মহৎ। স্বর্গের দেবতার চেয়েও সে পবিত্র!

মাধুরী নিজের অজ্ঞাতে বনহুরের স্মৃতিকে মনের মধ্যে গেঁথে নিয়েছে। তার সৌম্যসুন্দর মূর্তি হৃদয় আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে সে। শত চেষ্টাতেও মাধুরী ভুলতে পারছে না দস্যু বনহুরের কথা। মানুষ কত হৃদয়বান হলে তবেই তার স্বভাব এমন দেবসমতুল্যা হতে পারে, সদাসর্বদা তাই ভাবে মাধুরী। মনের অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করে তার স্মৃতিকে। ঐ একটি রাতের পরিচয় মাধুরীর জীবনে এনে দেয় বিরাট একটা পরিবর্তন। বনহুরের সুন্দর দীপ্ত মুখখানা মাধুরী কিছুতেই ভুলতে পারলো না।

মাধুরী ছিল মনিরার সহপাঠিনী। এককালে মনিরার সঙ্গে একই কলেজে পড়তো। মাধুরী ছিল হিন্দু, মনিরা মুসলমান, কিন্তু উভয়ের মধ্যে ছিল গভীর একটা যোগাযোগ। মনিরা মাধুরীকে খুব ভালবাসত। হঠাৎ মাধুরীর বাবা দূরে শহরের অপর প্রান্তে একটি বাড়ি করে সেখানে চলে যান। সে জন্য ছাড়াছাড়ি হয় উভয়ের মধ্যে।

সেদিন মনিরা শহরের ঐ দিকে কোন প্রয়োজনবশতঃ গিয়েছিল হঠাৎ তার মনে পড়ে মাধুরীর কথা, একবার দেখা করে গেলে মন্দ হয় না। মাধুরীর বিয়ে হয়ে

গেছে খবরটা মাধুরীর একটা চিঠিতেই জানতে পেরেছিল। বাড়ির ঠিকানাটাও মাধুরী পাঠিয়েছিল তাকে।

মাধুরীর বাড়ি খুঁজে বের করতে বেশি বিলম্ব হয় না মনিরার! গাড়ি রেখে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে ডাকে-মাধুরী-মাধুরী!

অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর, মাধুরী ঘরে শুয়ে শুয়ে কি ভাবছিল, শুনতে পেরে ছুটে আসে। জড়িয়ে ধরে উভয়ে উভয়কে। মনিরা মাধুরীর সাদাসিধে পোশাক দেখে হেসে বলে–কিরে মাধুরী বিয়ে করলি, কিন্তু এমন কেন?

মনিরার কথায় মাধুরীর মুখমণ্ডল বিষণ্ণ মলিন হয়ে ওঠে, কি যেন ভাবে। তারপর বলে—মনি, ঘরে চল্ সব বলছি।

মনিরাকে সঙ্গে করে নিয়ে বাসায় মাধুরী।

মনিরা হেসে বলে—এরই মধ্যে যে একেবারে বুড়ী বনে গেছিস মাধু, ব্যাপার কি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে মাধুরী—ভাই, বিয়ে হয়েছে সত্য, কিন্তু ও বিয়ে আমার বিয়ে নয়।

তার মানে?

মানে, স্বামী বলে কিছু জানি না।

হেঁয়ালি রেখে সোজা কথা বল।

তবে শুন্ আমার জীবনে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে, যদি ধৈর্য ধরে শুনিস তবে বলি।

বল আমি শুনতে চাই। মনিরা ভালো হয়ে বসলো।

মাধুরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বলে-হঠাৎ আমার বাবা মামীমার নিকট থেকে একদিন একটা চিঠি পেলেন। তাতে লিখেছেন, আপনার কন্যা মাধুরীর জন্য একটি সুপাত্র পেয়েছি, যদি এক সপ্তাহের মধ্যে আসতে পার, তবে বিয়ে হবে কারণ পাত্রের মা ছেলের বিয়ে দিয়েই চলে যাব তীর্থে।

এ দিকে ঠিক সে সময় আমার দিদিমার ভীষণ অসুখ। জানিস তো দিদিমাই ছিল আমাদের সবচেয়ে প্রিয়জন। দিদিমার অসুখের জন্য এ বিয়েতে কেউ মত দিল না, কিন্তু বাবার ইচ্ছা তিনি এখানেই আমাকে সঁপে দেব। এত ভালো ছেলে নাকি আর পাওয়া যাবে না। কাজেই বাবা শুধু আমাকে নিয়ে রামনগর চললেন।! মা কিংবা আমাদের বাড়ির কেউ যেতে পারলেন না। দিদিমার অবস্থা খারাপ কখন কি হয়।

তারপর সেখানে পৌঁছে দুদিন কেটে গেল বিয়ের আয়োজন করতে। বাবা আমাকে নিয়ে মাসীমার ওখানেই উঠেছিল। তিনদিন পর বিয়ে হলো, কিন্তু বাসর শয্যার পূর্বেই একটা টেলিগ্রাম এসে হাজির-দিদিমার মৃতপ্রায় অবস্থা, যদি দেখার ইচ্ছে থাকে চলে এসো। বিয়ে তো হয়েই গেছে কাজেই বাবা চলে আসতে চাইলেন। আমিও কেঁদেকেটে আকুল হলাম দিদিমাকে একটিবার শেষ দেখা দেখবো।

স্বামী রাগ করলেন তবু আমি বাবার সঙ্গে চলে এলাম। তারপর দিদিমা চলে গেল, শ্রাদ্ধ হলো, বাবা অনেক করে আমার স্বামীকে লিখলেন, কিন্তু তিনি এলেন না। রাগ তার পড়েনি। তারপর পনেরো দিন যেতে না যেতেই স্বামীর চিঠি পেলাম, আমি অমুক দিন রাতের ট্রেনে তোমাকে নিতে আসছি।

চিঠি পেয়ে বাবা মা এবং আমিও অত্যন্ত খুশি হলাম। যাক রাগ তাহলে পড়েছে।

যেদিন উনি আসবেন ঐদিন আমার আনন্দ আর ধরে না। আমাদের পুরোন ভৃত্যটিকে পাঠালাম স্টেশনে ওকে এগিয়ে আনতে।

আসলেন উনি, রাত তখন তিনটে হবে। বাবা-মা তাকে আদর অভ্যর্থনা জানিয়ে গ্রহণ করলেন।

তারপর স্বামীর সঙ্গে আমার প্রথম রাত্রি।

মনিরা অবাক হয়ে শুনছে, ভাবছে এ আবার বলার মত কি! তবু হেসে বলেন- খুব খুশি লাগছিল বুঝি তোর?

হ্যাঁ সে, দিনের আনন্দ আমি কোনদিন ভুলব না মনিরা। স্বামী ঘরে এল, সে আমি প্রথম তাকে ভাল করে দেখার সুযোগ পেলাম। বিয়ের দিন লজ্জায় তাকে

এমন করে দেখতে পারিনি। আমি কল্পনাও করতে পারিনি আমার স্বামী এত সুন্দর। ভুলে গেলাম লজ্জা শরম স্বামীকে সাদর-সম্ভাষণ জানালাম। কিন্তু কি আশ্চর্য সে তাতে এতটুকু সাড়া দিল না।

সেকি।

হ্যাঁ, শুধু নির্নিমেষ নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে দেখলো।

তারপর? সে জানালো আমি বড় অসুস্থ ঘুমাবো! আমি তার ঘুমে বাধা দিলাম না। কখন যে রাত ভোর হয়ে গেছে চেয়ে দেখি পাশে সে নেই। তারপর যখন তার আসল পরিচয় পেলাম জানতে পারলাম সে আমার স্বামী নয়।

স্তব্ধকণ্ঠে অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠে মনিরা—কি বল, সে তোর স্বামী নয়!

না।

তারপর?

আর তার দেখা পাইনি। ভোর হলো, আমার স্বামী স্বয়ং এসে পৌঁছলেন। যখন তিনি জানতে পারলেন অন্য এক পুরুষ আমার কক্ষে রাত কাটিয়ে গেছে, তখন তিনি আর কিছুতেই আমাকে গ্রহণ করতে পারলেন না। আমি তার পা ছুয়ে শপথ করেছি, সে আমাকে স্পর্শ করে নি, তবু—

এসব কি বলছিস মাধু! সব আমার কাছে আশ্চর্য লাগছে।

হ্যাঁ, সব আশ্চর্য। আজ তোকে ছুঁয়েও আমি শপথ করলাম।

এবার বুঝেছি তোর স্বামী তোকে অবিশ্বাস করেছেন।

হ্যাঁ।

এ তার ভারী অন্যায়। জেনে যদি কোন ভুল হয়, তার কি ক্ষমা নেই? আম আজ উঠি ভাই।

মাধুরী বলে ওঠে গল্প করতে করতে সময় কাটলো। চা, খাবি নে?

আজ নয়, আর একদিন আসব।

.

ক্ষিপ্তের মত পায়চারী করতে করতে বলে মুরাদ নাথুরাম, তোমার মত বীর পুরুষকে যে কাবু করতে পারে সে কে হতে পারে।

নাথুরাম মাথা চুলকায়–জুর, আমি তাকে কোনদিন না দেখলেও বুঝতে পেরেছি সে দস্যু বনহুর ছাড়া কেউ নয়।

তোমাদের এতগুলো লোককে দস্যু বনহুর পরাজিত করে চলে গেল অথচ তোমরা কিছু করতে পারলে না?

আমরা এজন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। দু বনহুর কখন যে আমাদের একজন মাঝিকে সরিয়ে তারই ছদ্মবেশে আমাদের নৌকায় উঠে। পড়েছিল, আমরা কেউ এতটুকু টের পাইনি।

ওকেই তো বলে বাহাদুরের বাহাদুরি। এবার বল মেয়েটা কোথায় গেল? ডুবে মরেনি তো?

না হুজুর, দস্যু বনহুর তাকে মরতে দেয়নি। সে সুস্থ শরীরে মামা মামীর পাশে ফিরে এসেছে।

কথাটা কানে যেতেই মুরাদের চোখ দুটো ধক করে জ্বলে উঠলো। আনন্দসূচক শব্দ ওঠে মুরাদ-মনিরা বেঁচে আছে।

হ্যাঁ হুজুর, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি যেমন করে হউক তাকে আপনার হাতে পৌঁছে দেবই। নইলে আমার নাম নাথুরাম সিং নয়। কিন্তু হুজুর আরও কিছু- হাতে হাত কচলায় নাথুরাম।

মুরাদ গভীর কণ্ঠে বলে—পাবে, আরও পাবে। পাঁচ হাজার, দশ হাজার, পনের হাজার যা চাও তাই দেব, তবু ওকে চাই।

আচ্ছা হুজুর।

আর একটি কথা, তোমরা জেনে রাখ নাথু, যতদিন দস্যু বনহুরকে তোমরা নিঃশেষ করতে না পেরেছো, ততদিন তোমাদের কোন বাহাদুরি নেই। তাছাড়া তোমরা নিশ্চিন্ত নও। আমিও নই। কারণ, আমি জানি দস্যু বনহুর ভালবাসে মনিরাকে এবং সে কারণেই ওকে হত্যা করতে হবে। যতদিন দস্যু বনহুর জীবিত থাকবে ততদিন আমি মনিরাকে একান্তভাবে পাব না।

ঠিক বলেছেন, বনহুরকে হত্যা না করতে পারলে আমাদের কিছুই করা সম্ভব নয়। হুজুর আজ আর বিলম্ব করতে পারি না। এক্ষুণি আমরা আস্তানায় রওনা দেব, অনুচরগণ সেখানে অপেক্ষা করছে।

নতুন কোন খবর পেয়েছ বুঝি?

হ্যাঁ হুজুর, মনসাপুরের জমিদার কন্যা সুভাষিণী আজ পালকী যোগে দোল পূর্ণিমায় মেলা হতে মনসাপুরে ফিরছে। মেয়েটি অতি সুন্দরী।

মুরাদের চোখ দুটো ক্ষুধিত শার্দুলের মত জ্বলে ওঠে—তাই নাকি।

হ্যাঁ হুজুর।

তাহলে তো আর একটি নতুন শিকারের সন্ধান পেয়েছ। সাবাস নাথুরাম! সত্যি তুমি কাজের লোক।

•

পুলিশ অফিস।

ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন পেছনে হাত রেখে চিন্তিতভাবে দাঁড়িয়েছিল। অদূরে কয়েকজন পুলিশ অফিসার বসে আছেন। সকলের মুখেই গভীর চিন্তার ছাপ।

দস্যু বনহুর হাঙ্গেরী কারাগার থেকে পালিয়ে যাবার পর পুলিশ মহলে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। হাজার হাজার পুলিশ পরিবেষ্টিত এ হাঙ্গেরী কারাগার। এ কারাগার থেকে কোন দস্যু আজ পর্যন্ত পালাতে পারেনি। পাষাণ প্রাচীরে ঘেরা, লৌহ ইস্পাতে গড়া এই হাঙ্গেরী কারাগার। ছোটখাটো চোর ডাকুর জন্য এ কারাগার নয়। যে ডাকাত বা দস্যু অত্যন্ত দুর্দান্ত তাদের জন্যই এ কারাগার। শেষ

পর্যন্ত সে কারাগার থেকেও পালাল দস্যু বনহুর। পুলিশমহলে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ সুপার পর্যন্ত ঘাবড়ে গেছেন। এতকাল তিনি বহু দস দেখে এসেছেন, কিন্তু দস্যু বনহুরের মত দস্যু তিনি দেখেন নি। কারাগারের ভেন্টিলেটরের শিক বাঁকিয়ে পালানো কম কথা নয়–এ যে অদ্ভুত কাণ্ড।

পুলিশ মহল ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পড়েছে। শহরে বন্দরে, পথেঘাটে সকলের মুখেই এক কথা দস্যু বনহুর হাঙ্গেরী কারাগার হতে পালিয়েছে।

ইন্সপেকটার হারুন বলে ওঠেন, দেখুন আপনারা এ দস্যু বনহুরকে যাই মনে করুন, সে ভদ্রঘরের সন্তান। মিঃ চৌধুরীর মত মহৎ ব্যক্তির সন্তান সে, কিন্তু পরিবেশ তাকে এতখানি জঘন্য করে তুলেছে।

পুলিশ অফিসার মিঃ হোসেন বলেন একথা সত্য, শুনেছি দস্যু বনহুর নাকি অপূর্ব সুন্দর দেখতে।

জবাব দেন মিঃ হারুন শুধু অপূর্ব সুন্দর নয় মিঃ হোসেন, অপূর্ব সুন্দর . এমন চেহারার লোক এমন হতে পারে কল্পনার অতীত।

আর একজন অফিসার বলেন, দস্যু হবে দস্যুর মত ভয়ঙ্কর, কিন্তু তা না হয়ে হয়েছে সুন্দর। আমি শুনেছি দস্যু বনহুরের ব্যবহারও নাকি অত্যন্ত ভদ্র।

সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ মিঃ কাওসার, তার ব্যবহার যদি দেখতেন কিছুতেই আপনি তাকে দস্যু বলে মেনে নিতে পারতেন না। কথাটা বলে আসন গ্রহণ করেন মিঃ হারুন। তারপর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বলেন—হাজার সুন্দর হউক, হাজার ভদ্র হউক, তবু সে দস্যু-ডাকাত। আইনের চোখে সে অপরাধী।

শুধু অপরাধী নয়, সে পলাতক আসামী। কথাটা বলতে বলতে কক্ষে প্রবেশ করেন প্রখ্যাত ডিটেকটিভ মিঃ শঙ্কর রাও।

মিঃ হারুন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসান। তারপর বলেন—মিঃ রাও, কি করা যায় বলুন তো? সমস্ত শহরে-বন্দরে সব জায়গায় পুলিশ মোতায়েন করেছি। যাকে সন্দেহ হবে তাকেই এরেস্ট করে হাজতে ভরবে।

শঙ্কর রাও হেসে বলেন—শেষ পর্যন্ত দস্যু বনহুরকে ধরতে গিয়ে কত যে ভদ্রলোক হাজতে বাস করবে, তার ঠিক নেই।

অগত্যা এ ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছি মিঃ রাও। আপনার মত অভিজ্ঞ ডিটেকটিভও দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারে সক্ষম হলো না। কিন্তু মিঃ রাও, আবার আপনাকে নতুন করে বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য অবতীর্ণ হতে হবে।

ইয়েস, আমি এ ব্যাপারে সব সময় প্রস্তুত আছি।

থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ রাও। আপনাকে আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করবে।

এমন সময় একজন পুলিশ সাব-ইন্সপেকটার একখানা টেলিগ্রাম এনে মিঃ হারুনের হাতে দেয়—স্যার টেলিগ্রাম।

মিঃ হারুন টেলিগ্রামখানা হাতে নিয়ে পড়ে দেখলেন। তারপর বলেন—আগামীকাল কমিশনার সাহেব স্বয়ং হাঙ্গেরী কারাগার দর্শনে আসছেন।

বলে ওঠেন মিঃ কাওসার, এবার তাহলে পুলিশ মহলকে নাচিয়ে ছাড়বে।

মিঃ নাসের বলে ওঠেন—দস্যু বনহুর শেষ পর্যন্ত কমিশনার সাহেবকেও ঘাবড়ে তুললো।

মিঃ খালেক এতক্ষণ নিচুপ হয়ে শুনছিল। তিনি বলেন, হাঙ্গেরী কারাগার থেকে দস পালানো সরকার বাহাদুরের চরম অপমানের কথা।

আরও কিছুক্ষণ আলোচনার পর সবাই বিভিন্ন কাজে উঠে পড়েন, সমস্ত থানায় এবং পুলিশ অফিসে ফোন করে কথাটা জানিয়ে দিল। কারণ সবারই প্রস্তুত থাকতে হবে, তিনি যেন তাদের দোষ-ক্রুটি ধরতে না পারেন।

.

মনসাপুরের পথ।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঝাপসা হয়ে এসেছে। পাল্কী বেহারাগণ দ্রুত পা চালিয়ে চলেছে। তাদের কণ্ঠের হুম্ হুম্ শব্দে নিস্তব্ধ প্রান্তর মুখরিত হয়ে উঠেছে। আজকাল দিন সময় ভালো নয়, রাহাজানি, চুরি-ডাকাতি প্রায়ই লেগে আছে।

পাকীটির সঙ্গে কয়েকজন বন্দুকধারী পাহারাদার চলেছে। পাকীটিতে রয়েছে মনসাপুরের জমিদার কন্যা, সঙ্গে একজন দাসীও আছে।

নির্জন পথ।

এতদ্রুত পা চালিয়েও পাল্কী বেহারাগণ সন্ধ্যার পূর্বে মনসাপুরে পৌঁছতে সক্ষম হলো না। পথিমধ্যেই নেমে এলো গভীর অন্ধকার। সুভাষিণী চিন্তিত কণ্ঠে বেহারাগণকে জিজ্ঞেস করলো—আর কত পথ আছে বেহারা?

একজন বেহারা বলে ওঠে—এখনও আরও দুক্রোশ যেতে হবে দিদিমণি?

তোমরা একটু জোরে পা চালাও। আমার কেমন ভয় লাগছে! একজন পাহারাদার বলে ওঠেকুছ ভয় নেহি দিদিমণি। হাম লোক আপকো সাথ হয়।

আর কিছুক্ষণ চলার পর পথটা একটা বনের পাশ দিয়ে চলেছে, সে পথ দিয়ে এগিয়ে চলল তারা। কিন্তু বেশি দূর এগুতে সক্ষম হলো না। হঠাৎ একদল মুখোশপরা লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করলো। মার মার কাট কাট শব্দে স্তব্ধ বনভূমি মুখরিত হয়ে উঠলো।

বেহারাগণ ভয়ে পাল্কী ছেড়ে যে যেদিকে পারলো ছুটে পালাল।

বন্দুকধারী পাহারাদারগণ প্রাণপণ চেষ্টায় দস্যুদলের সঙ্গে লড়তে লাগলো, কিন্তু চারজন পাহারাদার কতক্ষণ টিকতে পারে! দস্যুদল তিনজন পাহারাদারকে হত্যা করে ফেললো। একজন বন বাদাড় ভেঙে ছুটতে লাগলো মনসাপুর অভিমুখে।

এ দস্যুদল অন্য কেই নয়, শয়তান নাথুরামের দল। এবার নাথুরাম পাল্কীর পাশে এসে দাঁড়ালো। ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে সুভাষিণীর মুখমণ্ডল। বৃদ্ধা দাসী হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করেছে।

নাথুরাম পা দিয়ে বৃদ্ধাকে সরিয়ে সুভাষিণীর হাত চেপে ধরলো। একটানে বের করে আনলো তাকে। মশালের আলোতে সুভাষিণীর দেহের অলঙ্কার ঝকমক করে উঠলো।

নাথুরাম বিকট শব্দে হেসে উঠলোহাঃ হাঃ হাঃ একেবারে স্বর্গজয়। একগাদা অলঙ্কারের সঙ্গে অপসরী লাভ! হাঃ হাঃ হাঃ নাথুরামের হাসির শব্দে রাতের অন্ধকার খান খান হয়ে ভেঙ্গে ছিল। একজন অনুচরকে লক্ষ্য করে বলেন সে—খাদু সিং একে কাঁধে উঠিয়ে নাও।

খাদু সিং তার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে যেমনি সুভাষিণীকে ধরতে গেল, অমনি বৃদ্ধা দাসী সুভাষিণীকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠলো–না না, একে দেব না, একে নিতে দেব না।

বৃদ্ধাকে টেনে ফেলে দেয় খাদু সিং। কিন্তু বৃদ্ধা তাতে ক্ষান্ত হয় না, সুভাষিণীকে হারিয়ে মনিবের নিকটে কি জবাব দিবে সে, পুনরায় উঠে জড়িয়ে ধরে সুভাষিণীর দেহটা কিছুতেই আমি সুভাষিণীকে নিতে দেব না....।

এবার নাথুরাম বৃদ্ধাকে জোরপূর্বক ছাড়িয়ে মাটিতে ফেলে দেয়, তারপর বর্শার এক আঘাতে গেঁথে ফেলে ওকে।

বৃদ্ধার কণ্ঠ চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়ে পুনরায় আদেশ করে—এবার ওকে ওঠাও।

কিন্তু সুভাষিণীও কম মেয়ে নয়। সে খাদুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করলো। কিছুতেই সে বশ্যতা স্বীকার করবে না।

হঠাৎ এমন সময় একটা খট খট শব্দ ভেসে আসতে লাগলো। নাথুরাম উবু হয়ে মাটিতে কান লাগিয়ে শুনতে লাগলো। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলেন-খাদু, রংলাল, জগাই। তাড়াতাড়ি কর, মনে হচ্ছে কেউ ঘোড়ায় চড়ে এদিকে আসছে। তাড়াতাড়ি যুবতীকে কাঁধে উঠিয়ে নাও।

সুভাষিণীকে এবার তিন-চার জন ধরলো। সুভাষিণী কিল-চড় লাথি দিয়ে বাধা দিতে লাগলো, কিন্তু সে নারী; কতক্ষণ নিজেকে রক্ষা করতে পারে। হাঁপিয়ে পড়েছে।

জগাই জোর করে এবার সুভাষিণীকে কাঁধে উঠিয়ে নিল।

ঠিক সে মুহূর্তে একটা কালো অশ্ব ছুটে আসছে বলে মনে হলো তাদের। ওরা কতক পালাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু তার পূর্বেই অশ্বারোহী এসে ছিল সেখানে।

মাত্র কয়েক মিনিট, অশ্বটা দু'পা উঠিয়ে নিজেকে সংযত করে নিল। অশ্বারোহী ততক্ষণে অশ্ব থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছে। মাথায় কালো পাগড়ী মুখে কালো রুমাল বাঁধা। শরীরে কালো ড্রেস, এক একটা প্রচণ্ড ঘুষিতে এক একজন শয়তানকে ধরশায়ী করে চললো সে।

জগাই তাড়াতাড়ি সুভাষিণীকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে ছোরা বের করলো। খাদুও বর্শা উঁচিয়ে আক্রমণ করলো অশ্বারোহীকে।

অশ্বারোহী সকলকে বীরত্বের সঙ্গে পরাজিত করে চললো।

নাথুরাম একটু দূরে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য লক্ষ্য করছিল, এবার সে অশ্বারোহীর বুক লক্ষ্য করে রিভলভার উচুঁ করে গুলি ছোড়ে। অশ্বারোহী মুহূর্তে সরে দাঁড়ায়। নাথুরামের গুলি গিয়ে বিদ্ধ হয় অদূরস্থ বৃনে। এবার অশ্বারোহী নাথুরামকে দ্বিতীয়বার গুলি করার সুযোগ না দিয়ে আত্রণ করে। অল্পক্ষণেই নাথুরামকে পরাজিত করে তার হাত থেকে মিতভার কেড়ে নেয় অশ্বারোহী।

নাথুরামকে পরাজিত হতে দেখে তার দলবল কে কোনদিকে পালালো ঠিক নেই। নিরস্ত্র নাথুরাম এবার উঠে দ্রুত অন্ধকারে অদৃশ্য হলো।

অশ্বারোহী এগিয়ে এসে সুভাষিণীর সামনে দাঁড়ালো।

সুভাষিণী এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখছিল আর থর থর করে কাঁপছিল। না জানি এ আবার কোন্ দস্যু? অশ্বারোহী এগিয়ে আসতেই সুভাষিণী ভয়কম্পিত কণ্ঠে বলেন—কে আপনি, আমাকে এভাবে রক্ষা করলেন।

অশ্বারোহী বলেন—আমি যেই হই, আপনার মঙ্গলাকাংখী। ঠিক সময় পৌঁছতে পেরেছিলাম বলে আপনাকে বাঁচাতে সক্ষম হলাম। আসুন এবার আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দি।

সুভাষিণী। অন্ধকারে নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকালো অশ্বারোহীর মুখের দিকে। এ আবার কোন শয়তানি করবে না তো? বিশ্বাস কি? এই নির্জন স্তব্ধ বনভূমিতে সে একা যুবতী মেয়ে। অজ্ঞাত এক পুরুষের সঙ্গে কোথায় যাবে। তবু তার ড্রেস স্বাভাবিক নয়, মুখেই বা কালো রুমাল বাঁধা কেন, সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগলো সুভাষিণী। এই বিপদ মুহূর্তে একমাত্র বৃদ্ধা দাসী তার সম্বল ছিল, তাকেও

হত্যা করেছে শয়তান ডাকাতের দল। সুভাষিণীর চোখ দিয়ে জল পর্যন্ত বের হচ্ছে না, কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে সে।

অশ্বারোহী হেসে বলল—ভয় পাবার কিছু নেই আমি মানুষ। তবু সুভাষিণী তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ভাবছে, মানুষ সবাই, কিন্তু তাদের কত বিচিত্র রূপ।

অশ্বারোহী এবার বুঝতে পারলো সুভাষিণীর মনোভাব। সে তার সঙ্গে যেতে নারাজ। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সে তার মুখে।

নাথুরামের অনুচরগণের হাতে ছিল জ্বলন্ত মশাল। পালাবার সময় তারা হাতের মশালগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। অশ্বারোহী উবু হয়ে একটা জ্বলন্ত মশাল হাতে উঠিয়ে নিয়ে পুনরায় সুভাষিণীর সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। তারপর নিজের মুখের রুমালটা এক টানে খুলে মশালটা উঁচু করে ধরলো।

যুবক জানে তার চেহারায় এমন একটা আকর্ষণীয় বস্তু আছে যার কাছে সবাই নতি স্বীকার করতে বাধ্য।

মশালের উজ্জ্বল আলোতে সুভাষিণী অশ্বারোহীকে দেখলো, কিন্তু কিছুতেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারছিল না সে। একি কোন্ দেবকুমার। এত সুন্দর সুপুরুষ সে তো কোনদিন দেখেনি।

এবার বিশ্বাস হচ্ছে। হেসে বলেন অশ্বারোহী।

সুভাষিণী ধীরে শান্তকণ্ঠে বলেন–চলুন।

আসুন, ঘোড়ায় উঠতে হবে। অশ্বারোহী এগিয়ে চলে তার অশ্বের দিকে।

সুভাষিণী তাকে অনুসরণ করে।

অশ্বের পাশে এসে দাঁড়ালো উভয়ে। অশ্বারোহীর হস্তে তখনও জ্বলন্ত মশাল। সুভাষিণী নির্বাক আখি মেলে তখনও তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে।

অশ্বারোহী বলেন—আসুন, আপনাকে উঠিয়ে দি।

অশ্বারোহী সুভাষিণীকে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে দিয়ে নিজেও চড়ে বসে। সুভাষিণীর মনে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কে এই যুবক? কি এর পরিচয়? স্বর্গের দেবতা ছাড়া এত সুন্দর মানুষ হয়? সুভাষিণী মনে প্রাণে ওকে কৃতজ্ঞতা জানায়। যার শক্তির কাছে এতগুলো দস্যু পর্যন্ত পরাজিত হলো।

অন্ধকার ভেদ করে অশ্ব ছুটে চলেছে। অশ্বপৃষ্ঠে অশ্বারোহী কালো পোশাকধারী আর সুভাষিণী। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা মনসাপুর জমিদার বাড়ি পৌঁছে গেল। কৃষ্ণপক্ষের চাদ তখন পূর্ব আকাশে ভেসে উঠেছে।

জমিদার বাড়ির অদূরে একটা ঝোপের আড়ালে অ রেখে নেমে দাঁড়ালো অশ্বারোহী। তারপর সুভাষিণীকে অশ থেকে নামিয়ে নিল সে। অশ্বারোহী বলেন- এবার আপনি বাড়ি যেতে পারবেন নিশ্চয়ই?

সুভাষিণী নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়েছিল অশ্বারোহীর মুখের দিকে। চাদের আলোতে ওকে শষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভুলে গেল সুভাষিণী জবাব দিতে।

অশ্বারোহী হেসে নিজের রুমালখানা বেঁধে নেয়। তারপরে বলে ঐ আপনার বাড়ি দেখা যাচ্ছে, যান।

সুভাষিণী এবার জবাব দেয় আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

ততক্ষণে অশ্বারোহী অশ্ব চড়ে বসেছে।

সুভাষিণী বলে ওঠে—একটি কথা, আপনার পরিচয়?

অশ্বারোহী প্যান্টের পকেট থেকে একটি কাগজের টুকরা বের করে সুভাষিণীর হাতে দিয়ে বলে—এতেই পাবেন আমার পরিচয়।

কিন্তু আবার কবে আপনার দেখা পাব?

ঈশ্বর না করুন আবার যদি এমন বিপদে পড়েন তখন... অথ ছুটতে শুরু করেছে, শেষের কথার অংশগুলো আর শুনা যায় না!

অশ্বারোহী অদৃশ্য হতেই সুভাষিণী বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করে। বাড়ির নিকটবর্তী হতেই দেখতে পায় তার পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন মিলে জোট

পাকিয়ে হল শুরু করছে।

মা কাঁদছেন, আরও অনেকে কাঁদছেন। কিছুসংখ্যক লোক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। সুভাষিণী বুঝতে পারে দকবল থেকে পালিয়ে এসে পাহারাদার তার পিতার নিকটে খবরটা জানিয়েছে, তাই এসব আয়োজন চলছে।

সুভাষিণীকে সুস্থ দেহে অক্ষত অবস্থায় অলঙ্কারপূর্ণ শরীরে ফিরে আসতে দেখে সবাই অবাক হলো। মা ছুটে এসে কন্যাকে জড়িয়ে ধরলেন। পিতা ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—মা, কি করে ফিরে এলি? কি করে ডাকাতের হাত থেকে রেহাই পেলি?

সুভাষিণী বলেন—সব বলছি, তোমরা ভিতরে এসো।

কন্যার সঙ্গে সবাই অন্দরবাড়িতে গিয়ে বসলো!

সুভাষিণী সব বলেন, কিন্তু কে যুবক এ এখনও জানে না। সকলের অজ্ঞাতে আলোর সামনে মেলে ধরলো কাগজের টুকরাখানা যার মধ্যে আছে তার অজ্ঞাতবন্ধুর পরিচয়। অতি সাবধানে খুলেন কাগজের টুকরাখানা। না জানি কোন রাজার ছেলে কিনা; কিংবা কোন দেবকুমার হবে সে কাগজে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভয়ার্ত কণ্ঠে অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠে সুভাষিণী-দস্যু বনহুর।

কতক্ষণ যে সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো খেয়াল নেই ওর। যে দস্যু বনহুরের নামে গোটা দেশবাসীর আতঙ্কের সীমা নেই, যে দস্যুর নামে লোকের হৃদকম্প হয়, এ সে দস্যু বনহুর! সুভাষিণী একবার নয়, শত শত বার ঐ কাগজের টুকরাখানা ছিল।

.

তাজের পদশব্দ চিনতো নূরী। ভোরের দিকে তন্দ্রা এসেছে, হঠাৎ অতি পরিচিত অশ্ব-পদশব্দ। নূরীর তন্দ্রা ছুটে গেল, দ্রুতপদে বাইরে বেরিয়ে এলো সে।

বনহুর অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়াল, নূরী ছুটে এসে ওর হাত ধরলো–সত্যি হুর, আজ আমি তোমার জন্য খুব চিন্তিত ছিলাম। মেয়েটিকে রক্ষা করতে পেরেছ?

বনহুর চলতে চলতে জবাব দেয়—খোদার অশেষ কৃপায় পেরেছি।

তাহলে রহমান তোমাকে একেবারে সঠিক খবরই দিয়েছিল, কি বল?

হ্যাঁ নূরী, খবরটা ঠিক সময়ে পেয়েছিলাম বলেই মেয়েটিকে রক্ষা করতে পারলাম। কিন্তু নূরী, ঐ শয়তান অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছে।

হেসে বলে নূরী—তোমার কাছে শয়তানি কতক্ষণ টিকবে? দাও না যমালয়ে বিদায় করে।

হ্যাঁ নূরী, অচিরেই ওর সঙ্গে আমার একটা বুঝা-পড়া হবে। নাথুরামকে আমি উচিত শিক্ষা দিয়ে দেব।

নাথুরাম যে একজন দুর্দান্ত শয়তান জানে নূরী। মনে মনে শিউরে ওঠে সে। অজানা এক আশঙ্কায় দুলে ওঠে তার হৃদয়।

উড়য়ে নীরবে এতে থাকে।

বনহুর বিশ্রামাগারে প্রবেশ করে। নূরী ওর দেহ থেকে দস্যুর কালো ড্রেস খুলে নেয়। শয্যায় গিয়ে বসে বনহুর। হঠাৎ নূরীর দৃষ্টি চলে যায় বনহুরের ললাটে। কপালের একপাশে কিছুটা অংশ কেটে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। আঁতকে ওঠে নূরী, একি হুর, তোমার ললাট কেটে গেছে। ইস... নূরী যত্নসহকারে হাত দিয়ে দেখতে লাগলো।

বনহুর হেসে বলেন—ও এমন কিছু নয় নূরী। সেরে যাবে।

নূরী রাগত কণ্ঠে বলেন—তোমার ও কিছু নয়। ইস কতটা কেটে গেছে। তাড়াতাড়ি ঔষধ এনে লাগিয়ে দেয় বনহুরের ললাটে তারপর অতি যত্নে বেধে দিতে থাকে কাপড় দিয়ে।

বনহুর নূরীর চিবুক ধরে উঁচু করে বলেনূরী, আমার জন্য তোমার কত দরদ। কিন্তু আমি তো তোমার জন্য এতটুকু ভাববার সময় পাইনে।

এজন্য আমি দুঃখিত নই, হুর। আমি জানি তুমি আমাকে কত ভালবাস!

বনহুর নূরীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে বলে, এ বিশ্বাস যেন তোমার চিরদিন অটুট থাকে।

নূরী ধীরে ধীরে বনহুরের চুলের ফাঁকে আঙ্গুল চালাতে চালাতে বলে–হুর, মনে পড়ে সে ছোটবেলার কথা, তুমি আর আমি যখন এক সঙ্গে বনে বনে ঘুরে বেড়াতুম তুমি তীর ধনু দিয়ে পাখি শিকার করতে, আর আমি ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে আনতাম। তুমি খুশি হয়ে বলতে নূরী, কোনদিন তোকে ছাড়া কাউকে ভালবাসব না। মনে পড়ে সে কথা।

বনহুরের চোখের সামনে ছোটবেলার দৃশ্যগুলো ভেসে উঠে একের পর এক ছায়াছবির মত।

একদিনের দৃশ্য আজও বনহুরের মনে স্পষ্ট আঁকা আছে।

বনহুর আর নূরী ঝরনার পানিতে সাতার কাটছিল, হঠাৎ বেশি পানিতে পড়ে যায় নূরী। স্রোতের টানে বেসে যায় সে অনেকটা দূরে। বনহুর ভুলে যায় গোটা দুনিয়া, নূরী যে তার যথাসর্বস্ব নূরীকে হারালে তার চলবে না। নূরী ছাড়া বাঁচবে না বনহুর। নিজের জীবনের মায়া বিসর্জন দিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিল বনহুর স্রোতের বুকে। অনেক কষ্টে নূরীকে সেদিন বাঁচাতে পেরেছিল সে। নূরীকে সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পেরে তার সেদিন কি আনন্দ! সব কথা আজ মনে পড়তে লাগলো বনহুরের।

বনহুর নূরীর হাতখানা তার নিজের মুঠোয় চেপে ধরে বলে নূরী।

নুরী বনহুরের চুলে হাত বুলাচ্ছিল, জবাব দেয়বল। সত্যি তুমি কত সুন্দর!

হুর! অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠে নূরী।

নূরী। আবেগভরা কণ্ঠ বনহুরের।

.

সেদিন নৌকা ভ্রমণে মনিরার উপর হামলার কথাটা পুলিশ মহলে সাড়া জাগিয়েছিল, তাদের একমাত্র সন্দেহ এ কাজ দস্যু বনহুরের ছাড়া আর কারও নয়। কারণ বনহুর যে মনিরাকে ভালবাসে, এ কথা সবাই জেনে নিয়েছে। পুলিশ ইনসপেকটার মিঃ হারুন এবং মিঃ রাও বসে এ বিষয় নিয়েই আলোচনা করছিলেন শঙ্কর রাও বলে উঠেন–ইন্সপেকটার, আপনার কি মনে হয় দস্যু বনহুরই মনিরার ওপর হামলা করেছিল?

হ্যাঁ, সে ছাড়া অন্য কেউ নয়। কারণ, মনিরাকে দস্যু বনহুর ভালবাসে, এ কথা একেবারে সত্য। পূর্বেও এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

শঙ্কর রাও বলে ওঠেন—তাহলে দস্যু বনহুরই তাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল?

হ্যাঁ এবং সুস্থ অবস্থায় নিরাপদে তাকে পিতামাতার নিকটে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।

পিতা-মাতা নয়, মামা-মামী।

সরি, হ্যাঁ মামা-মামীর পাশে ফিরে এসেছে মনিরা এবং দস্যু বনহুর ছাড়া অন্য কোন বদমাইশ তাকে এভাবে সসম্মানে ফেরত পাঠাত না নিশ্চয়ই। এতেই বুঝা যায় এ দস্যু বনহুরের কাজ।

এ সম্বন্ধে কি মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা করেছিল?

করেছিলাম, কিন্তু সন্তোষজনক কিছু জানতে পারিনি।

রাও গম্ভীর কণ্ঠে বলেন-ইনসপেকটার, সত্যিই যদি দস্যু বনহুর মনিরাকে ভালবেসে থাকে তবে তাকে গ্রেফতারের একটা সুযোগ করে নিতে পিরবো।

সেবার তাকে গ্রেফতারের সময় সো আমরা বিশেষভাবে জেনে নিয়েছি মিঃ রাও। আপনি সে পথ ধরেই এগুতে চেষ্টা করুন।

ঠিকই বলেছেন ইন্সপেকটার সাহেব, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে হলে ঐভাবেই এগুতে হবে এবং আমি আশা করি কৃতকার্য হবো।

থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ রাও, আপনি এবার সফল হবেন বলে আমার মনে হচ্ছে।

শঙ্কর রাও এবার কিছুক্ষণ গালে হাত রেখে ভাবলেন। তারপর বলেন ইন্সপেকটার, একটা প্রশ্ন আমার মনকে নাড়া দিচ্ছে।

বলুন?

মনিরাও দস্যু বনহুরকে ভালবাসে, এ কথা আপনি জানেন?

আপনি কি বলতে চান দস্যু বনহুরের কোনই প্রয়োজন ছিল না মনিরাকে হানা দিয়ে চুরি করা, কারণ মনিরা স্বেচ্ছায় তার পাশে যেত।

সে কথা মিথ্যে নয়, ইন্সপেকটার সাহেব।

না, আপনি এবং আমি যা মনে করছি তা নাও হতে পারে। এক সময় হয়ত মনিরা তাকে ভালবাসতো, কিন্তু যখন তার আসল রূপ ধরা পড়েছে, যখন মনিরা জানতে পারল যাকে সে ভালবাসে সে স্বাভাবিক মানুষ নয়, সে দস্যু; তখন হয়তো তার মন ভেঙ্গে গিয়ে থাকতে পারে। ঘৃণা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

শঙ্কর রাও বলেন—তাহলে একটা কাজ করুন মিঃ হারুন, এতে আমার কিছুটা উপকার হবে, মানে কাজের সহায়তা হবে।

বলুন?

মিস মনিরাসহ তার মামা চৌধুরী সাহেবকে একবার এখানে আসতে বলুন। আমি তাদের মুখে এ ব্যাপারে কয়েকটা কথা শুনতে চাই।

বেশ, আমি এক্ষুণি ফোন করছি।

ধন্যবাদ।

মিঃ হারুন উঠে গিয়ে রিসিভারটা হাতে উঠিয়ে নিলেন—

হ্যালো?

ওপাশ থেকে ভেসে এলো চৌধুরী সাহেবের কণ্ঠকে কথা বলছেন?

স্পিকিং মিঃ হারুন। হ্যাঁ, আমি পুলিশ অফিস থেকে বলছি। শুনুন মিঃ চৌধুরী, আপনি আপনার ভাগনী মিস মনিরাসহ দয়া করে যদি একটিবার আসেন! হা পুলিশ অফিসে…।

চৌধুরী সাহেব বলেন নিশ্চয়ই আমি আসছি ইন্সপেক্টর। আপনি দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন। আমি মা মনিরার কাছে জেনে নেই সে এখন আমার সঙ্গে আপনার ওখানে যেতে পারবে কিনা। কারণ, ওর এক বান্ধবীর ওখানে যাবার

কথা আছে। রিসিভারের মুখে হাত রেখে ডাকেন চৌধুরী সাহেব-মনিরা, মা মনিরা, একটিবার এদিকে শুনো তো?

পাশের কক্ষ থেকে ভেসে আসে মনিরার কণ্ঠ—আসছি মামুজান।

অল্পক্ষণেই মনিরা এসে হাজির হয়-মামুজান আমায় ডাকছো?

হ্যাঁ মা, ইন্সপেক্টর মিঃ হারুন বলছেন এক্ষুণি তোমাকে সঙ্গে করে যেতে। তারা পুলিশ অফিসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

ঠিক সে মুহূর্তে একটি দাড়িওয়ালা লোক কক্ষে প্রবেশ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়, চৌধুরী সাহেবের কথাগুলো কান পেতে শুনলো সে।

মনিরা মামুর কথায় জবাব দেয়—বেশ ভালই হলো, সেখান থেকে ফেরার পথে মাধুরীর বাড়ি হয়ে আসবো।

যাও মা, চট করে তৈরি হয়ে নাও তবে।

মনিরা বেরিয়ে যায়।

চৌধুরী সাহেব রিসিভারে মুখ রাখেন-হ্যালো, হ্যাঁ মনিরা যাবে। নিশ্চয় আসছি। থ্যাঙ্ক ইউ।

দাড়িওয়ালা লোকটি কক্ষে প্রবেশ না করে পিছু হটে বেরিয়ে গেল।

মনিরা চলে গেল নিজের কক্ষে।

অল্পক্ষণেই তৈরি হয়ে মনিরা মামুজানের পাশে এসে দাঁড়ায়। চৌধুরী সাহেব মনিরাকে লক্ষ্য করে বলেন—মা মনিরা, তোমার হয়ে গেছে। দেখছি।

হ্যাঁ মামুজান, চলো।

গাড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন চৌধুরী সাহেব এবং মনিরা ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরে।

চৌধুরী সাহেব আর মনিরা গাড়িতে উঠে বসে। ড্রাইভার ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে স্টার্ট দেয়।

পুলিশ অফিসে পৌঁছতেই মিঃ হারুন নিজে এসে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে নামিয়ে নিলেন।

মিঃ হারুন হাত বাড়ালেন—হ্যালো চৌধুরী সাহেব, বিশেষ কয়েকটি কথার জন্য আপনাকে ডেকেছি। আসুন মিস্ মনিরা।

ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরলল, চৌধুরী সাহেব আর মনিরা নেমে

অফিস রুমে প্রবেশ করলো।

অফিসরুমে প্রবেশ করতেই শঙ্কর রাও উঠে দাঁড়িয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানালেন।

পাশাপাশি কয়েকখানা চেয়ারে বসলেন তাঁরা।

মিঃ হারুন মনিরাকে জিজ্ঞেস করলেন মিস মনিরা, আপনাকে একটু কষ্ট দেব। কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই?

বেশ করুন, এতে আমার কষ্ট কি! হেসে বলেন মনিরা।

মিঃ হারুন মনিরার দিকে একটু ঝুকে বসলেন, তারপর বলেন—মিস মনিরা, আপনাকে যে প্রশ্ন করা হবে আশা করি তার সঠিক জবাব পাব। আচ্ছা বলুন তো যেদিন আপনি আপনার বান্ধবীগণসহ নৌকা-ভ্রমণে যান, সেদিন মাঝিদের মধ্যে কোন সন্দেহজনক ভাব লক্ষ্য করেছিলেন কি?

না। কাউকে সন্দেহ হয় নি বা সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করিনি।

হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় যারা আপনার ওপর হামলা করেছিল তারা দস্যু বনহুরের দল?

মনিরা বলে ওঠে—এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি, দস্যু বনহুর আমার ওপর হামলা করেনি।

শঙ্কর রাও বলে ওঠেন–আমি প্রথমেই অনুমান করেছিলাম, এ কাজ দস্যু বনহুরের নয়। নিশ্চয়ই এ অন্য একটি দল।

মিঃ হারুন গভীরভাবে কিছু চিন্তা করেন, তারপর বলেন—আচ্ছা মিস মনিরা আপনাকে যে মাঝি দস্যুদল থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছিল, তাকে আপনি চিনতে পেরেছিলেন কি?

না, তাকে আমি কোনদিন দেখিনি। কিন্তু সে ব্যক্তি অত্যন্ত মহৎ এবং তার দয়াতেই আমি দস্যুর হাত থেকে মুক্তি পেতে সক্ষম হয়েছি। মনিরা বনহুরের নাম গোপন করে বলল।

মিস মনিরা, সে লোকটি যদি সত্যই মহৎঞ্জন হবে, তাহলে সে কখনও দস্যুদলে যোগ দিত না।

চৌধুরী সাহেব বলেন—অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে অভাবের তাড়নায় মানুষ অনেক জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়।

হ্যাঁ, সে কথা অবশ্য মিথ্যা নয়। বলেন মিঃ রাও।

আরও কিছুক্ষণ মনিরাকে নানা প্রশ্ন করওে সন্তোষজনক কিছু জানতে পারেন না তারা।

মিঃ হারুন এবার চৌধুরী সাহেবকে বলেন—চৌধুরী সাহেব, আপনাকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, দস্যু বনহুর আপনার পুত্র জেনেও আমরা তাকে রেহাই দিতে পারছিনে।

চৌধুরী সাহেবের মনে যত ব্যথাই থাক গোপনে চেপে বলেন তিনি সে দোষী, কাজেই আইনের চোখে সে অপরাধী। আমার পুত্র হলেও সে ক্ষমার পাত্র নয়।

থ্যাঙ্ক ইউ চৌধুরী সাহেব, এটাই হচ্ছে সত্য কথা। অপরাধী যতই মেহের পাত্র হউক, তাকে ক্ষমা করা চলে না। বলেন শঙ্কর রাও।

মিঃ হারুন বলেন, এবার আসল কথা বলি চৌধুরী সাহেব।

বলুন?

দস্যু বনহু হাঙ্গেরী কারাগার হতে পালিয়েছে এ কথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন?

হ্যাঁ জানি।

যদিও আপনি তার পিতা, তবু আপনার কর্তব্য তাকে ধরিয়ে দেওয়া।

একটা ঢোক গিলে বলেন চৌধুরী সাহেব-হ্যাঁ।

এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপনার সাহায্য পাব।

চৌধুরী সাহেব একটু থেমে বলেন–হ্যাঁ পাবেন।

এমন সময় ড্রাইভার একখানা কাগজ এনে মনিরার হাতে দেয়আপামণি আপনার যে কোন বান্ধবীর বাড়ি যাবার কথা ছিল সে এই চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়েছে।

মনিরা কাগজখানা হাতে নিয়ে ভাজ খুলে মেলে ধরলো চোখের সামনে। মুহূর্তে মনিরার চোখ দুটো উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে ওঠে। কাগজে লেখা আছে–"মনিরা, আমি তোমার জন্য লেকের ধারে অপেক্ষা করছি"–বনহুর।

মনিরা কাগজখানা ভাজ করে বলে ওঠে-মামুজান, আমার বান্ধবী এক্ষুণি আমাকে যেতে বলেছে, না গেলেই নয়। উঠে দাঁড়ায় মনিরা।

চৌধুরী সাহেবও বলে ওঠেন—আমিও তাহলে চলি ইন্সপেকটার সাহেব।

মিঃ হারুন বলেন—আপনার সঙ্গে আরও কিছু আলাপ আছে চৌধুরী সাহেব। মিস মনিরা, আপনি যেতে পারেন। আপনার মামুজানকে আমাদের অফিসের গাড়ি পৌঁছে দেবে।

চৌধুরী সাহেব ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলেন-ড্রাইভার, মনিরাকে সাবধানে নিয়ে যেও এবং হুশিয়ার থেক।

ড্রাইভার দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলেন—বহুৎ আচ্ছা হুজুর।

মনিরা প্রফুল্ল চিত্তে গাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরে।

মনিরা উঠে বসে বলে–লেকের ধারে চল।

বহুৎ আচ্ছা আপামণি। কথাটা বলে গাড়িতে স্টার্ট দেয় ড্রাইভার। গাড়ি উকাবেগে ছুটতে শুরু করে।

একি! গাড়ি যে লেকের পথে না গিয়ে অন্য পথে মোড় ফিরল। মনিরা শিউরে উঠলো, তীব্রকণ্ঠে বলেন—ড্রাইভার, কোথায় যাচ্ছ।

ড্রাইভার আসন থেকে বলে ওঠে—আপামণি, ও পথ বহুৎ খারাপ আছে। ইধার বাঁকা পথে যেতে হবে।

মনিরা চুপ করে রইলো, ড্রাইভার তাদের নতুন লোক নয়, তাকে অবিশ্বাসের কিছু নেই। কারণ সে জন্মাবধি এই শিখ ড্রাইভারকে দেখে আসছে। ওর কোলে কাঁধেই মানুষ হয়েছে মনিরা।

কিন্তু একি! লেকের ধারে না গিয়ে একেবারে নির্জন নদীতীরে এসে গাড়ি থেমে ছিল। ড্রাইভার আসন থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো-আসুন আপামণি!

মনিরা রাগে গজ গজ করে বলে-ড্রাইভার, এ তুমি কোথায় নিয়ে এলে? এটাই বুঝি লেকের ধার?

হঠাৎ ড্রাইভার হেসে ওঠে–হাঃ হাঃ হাঃ মনিরা এখনও তুমি আমাকে চিনতে পারনি?

কে! কে তুমি?

নেমে এসো বলছি।

না, আমি কিছুতেই নামবো না। নিশ্চয়ই তুমি সে শয়তান, নৌকায় তুমি আমাকে চুরি করে…

হ্যাঁ আমিই সে, যাকে তুমি-ড্রাইভার মনিরার হাত ধরে ফেলে।

মনিরা তীব্রকণ্ঠে বলে—যাকে আমি ঘৃণা করি। শয়তান! এখনও তুমি আমার পিছু লেগে রয়েছ?

হ্যাঁ, কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি। নেমে এসো। যদি তোমার মঙ্গল চাও তবে নেমে এসো।

নির্জন নদী তীর একটি প্রাণী ও নেই আশেপাশে। মনিরার প্রাণ কেঁপে ওঠে। বার বার কত বার বনহুর তাকে বাঁচিয়ে নিয়েছে, এবার আর তার রক্ষা নেই। তবু দৃঢ় কঠিন কণ্ঠে বলে সে—শয়তান আমি গাড়ি থেকে নামবো না।

ড্রাইভার মনিরার হাত চেপে ধরে–তোমাকে নামতে হবে। বলেই মনিরার হাত ধরে টেনে গাড়ি থেকে নামিয়ে ফেলে।

মনিরার চোখেমুখে অসহায়ের চাহনি। আজ আর তার রক্ষা নেই। কেন সে ঐ চিঠিখানা বিশ্বাস করলো? কেন সে ড্রাইভারকে বিশ্বাস করলো? কেন তার সঙ্গে একা এলো?

ড্রাইভারের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো সে। কিন্তু ড্রাইভারের বলিষ্ঠ হাতের মুঠো থেকে নিজের হাতখানা মুক্ত করে নিতে পারলো না।

ড্রাইভার মনিরাকে নিবিড়ভাবে টেনে নিল কাছে।

মনিরা সে মুহূর্তে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিল ড্রাইভারের গালে। সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারের গাল থেকে তার নকল দাড়ি আর গোঁফ খসে ছিল। মনিরা বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—মনির তুমি!

ড্রাইভারের ছদ্মবেশী দস্যু বনহুর হেসে বলেন—হ্যাঁ আমি। এই বুঝি তোমার সাবধানে চলাফেরা, না?

মনির, আমি ভাবতেও পারিনি শিখ ড্রাইভারের বেশে তুমি! সত্যি তোমার চিঠি পেয়ে আমি সব ভুলে গিয়েছিলাম।

কিন্তু যেখানেই যাও, সাবধানে যেও! আমার নামে অন্য কোন দুষ্ট লোকও তো চিঠি লিখতে পারতো।

সত্যি আমি বড় ঘাবড়ে গিয়েছিলাম বুকটা এখনও টিপ টিপ করছে।

এখন?

সব ভয় আমার দূর হয়ে গেছে।

চলো নদীর ধারে গিয়ে বসি। বনহুর কথাটা বলে এগুতে থাকে। মনিরা চলে তার পাশে পাশে।

নদীর কিনারে গিয়ে বসে ওরা।

মনিরা বনহুরের হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে বলে—আজ কতদিন আসনি কেন বল তো?

কত কাজ আমার।

মনির, এখনও তুমি মানুষ হলে না। পুলিশমহলে তোমাকে গ্রেপ্তার করতে সাড়া পরে গেছে, তোমাকে জীবিত কি বা মৃত এনে দিতে পারলে লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

জানি মনিরা, সব জানি। কিন্তু আমি তো সব সময় সকলের সামনেই বিচরণ করে বেড়াচ্ছি, ওরা কেন আমাকে গ্রেপ্তারে সক্ষম হয় না?

মনির, ও কথা বল না। খোদা তোমাকে রক্ষা করুন। মনির, হাঙ্গেরী কারাগার তোমাকে আটকে রাখতে পরেনি, আর কেউ তোমাকে আটকে রাখতে পারবেও না।

মনিরা!

সত্যি তুমি কত বড়! কত সুন্দর কত মহৎ....

অবশ্য তোমার কাছে। আচ্ছা মনিরা, তোমার যে বান্ধবীর বাড়ি যাবার কথা ছিল?

হ্যাঁ, মাধুরীর ওখানে, কিন্তু যাব না।

মাধুরী!

হ্যাঁ, মাধুরী, আমার এক পুরানো বান্ধবী। বড় অসহায় বেচারী…

কেন, কি হয়েছে তার? প্রশ্ন করে বনহুর।

সে এক অদ্ভুত ঘটনা। থাক, তোমার শুনে কাজ নেই।

মনিরা বলতে হবে, তোমার বান্ধবী যখন সে, তখন আমার বান্ধবী নিশ্চয়ই।

তবে শুন।

বল।

মাধুরীর বিয়ে হয়েছে কিন্তু ওর স্বামীকে সে একদিনের জন্যও পায়নি।

তার মানে?

বলছি শুন—তারপর মাধুরীর মুখে শুনা গল্পটা মনিরা সম্পূর্ণ খুলে বলে বনহুরের নিকটে।

স্তব্ধ নিঃশ্বাসে শুনে যায় বনহুর। মনের মধ্যে তখন তার প্রচণ্ড ঝড় বেয়ে চলেছে। মাধুরী, যার সঙ্গে তার একটি রাতের পরিচয়।

মনিরা বলে চলেছে—সত্যি মনি, মাধুরীর জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে…

বনহুরের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছে মাধুরীর ব্যথাভরা করুণ মুখখানা।

বনহুরকে চিন্তিত দেখে বলে মনিরা-কি ভাবছো মনির হঠাৎ তোমার কি হলো বলতো?

বনহুর গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় জবাব দেয়-উঁ।

কি ভাবছো?

ভাবছি তোমার সে বান্ধবীর কথা।

হ্যাঁ, ওর জন্য সত্যি বড় দুঃখ হয়। জান মনির, মাধুরী বলেছে, যে লোকটি ওর স্বামীর পরিচয় দিয়ে ওর কক্ষে রাত যাপন করে গেছে সে নাকি দেবতার চেয়েও মহৎ!

তাই নাকি?

হ্যাঁ দেখতেও সে নাকি অপূর্ব, মাধুরী বলে জীবনে সে ওকে ভুলতে পারবে না কোনদিন। যতক্ষণ সে তার কথা বলেছিল কেমন যেন অভিভূতের মত বলে চলেছিল—সে সত্যি। মাধুরী ওকে ভালবেসে ফেলেছে…

বনহুর বলে ওঠে-থাক মনিরা ও সব কথা, এবার চলল ফেরা যাক, কেমন?

কিন্তু আমার যে ফিরতে ইচ্ছে করছে না মনির!

হেসে বলে বনহুরবসলে ক্ষতি ছিল না মনিরা কিন্তু তোমাদের মোটর গ্যারেজের মধ্যে তোমাদের শিখ ড্রাইভার বেচারা ধুকে মরছে। মনিরা গালে হাত দিয়ে বলে ওঠে—ওমা তাই নাকি! হ্যাঁ তার হাত-পা-মুখ বেঁধে রেখে এসেছি।

সর্বনাশ!

তা নাহলে এই দিনের আলোয় তোমাকে পেতাম কি করে?

মনিরা উঠে দাঁড়িয়ে বলে—এত বুদ্ধি তোমার! চললা তবে।

চলো।

বনহুর আর মনিরা গাড়ির দিকে এগোয়।

মাধুরীর স্বামী নিমাই বাবুর কক্ষ।

নিজের ঘরে শুয়ে একটা বই পড়ছিল সে, রাত একটা দেড়টা হবে। নিমাইয়ের মনে নানা দুশ্চিন্তার ঝড় বইছে। চোখে ঘুম নেই, তাই একটা বই নিয়ে তাতে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করছিল।

বাইরে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছিলো। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়াও বইছে। গোটা বিশ্ব অন্ধকার। আজ নিমাইয়ের মনে মাধুরীর কথাই জাগছিল। এমন দিনে

স্ত্রীকে কাছে পেতে কার না মন চায়। কিন্তু নিমাই ওকে গ্রহণ করতে পারে না। একটা সন্দেহের দোলা তার সমস্ত অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বই রেখে আলোটা কমিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো নিমাই, জানালাটা বন্ধ করে শোবে, ঠিক সে মুহূর্তে জানালা দিয়ে লাফিয়ে ছিল একটি কালো মূর্তি। হাতে তার উদ্যত রিভলভার নিমাই যেমনি চিৎকার করতে যাবে, অমনি কালো মূর্তি রিভলভার চেপে ধরলো ওর বুকে—খবরদার!

নিমাই ঢোক গিলে বলে—কে তুমি!

ছায়ামূর্তি চাপাকণ্ঠে গর্জে ওঠে-দস্যু বনহুর!

ভয়ার্তকণ্ঠে অস্ফুট শব্দ করলো নিমাই দস্যু বনহুর?

হ্যাঁ।

তুমি–তুমিই আমার স্ত্রীর কক্ষে....

হ্যাঁ আমিই, কিন্তু নিমাই বাবু আপনার স্ত্রী মাধুরীর কি অপরাধ?

নিমাই ভয়কম্পিত কণ্ঠে বলে ওঠে—তুমিই তো তার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছ শয়তান!

বনহুর দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধরলো নিমাইয়ের গলা—শয়তান আমি নই তুমি, মিথ্যা সন্দেহে নিজের স্ত্রীকে যে ত্যাগ করতে পারে, সে শয়তানের বড়। শয়তান!

নিমাই যন্ত্রণায় আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে——উঃ ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমার গলা! নিমাইয়ের চোখ দুটো বেরিয়ে আসে। মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে।

বনহুর বলে—আগে বল তোমার স্ত্রীকে আর অবিশ্বাস করবে না? গলা ছেড়ে দেয় বনহুর।

নিমাই গলায় হাতবুলিয়ে বলে—কেমন করে তাকে আমি বিশ্বাস করবো?

দস্যু বনহুর কোনদিন মিথ্যা বলে না। তোমার স্ত্রী অতি পবিত্র, নির্মল। তাকে তুমি বিশ্বাস করতে পার।

নিমাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বনহুরের রুমাল বাধা মুখের দিকে।

বনহুর নিজের মুখের আবরণ উন্মোচন করে ফেলে।

নিমাই কল্পনাও করতে পারেনি দস্যু বনহুরের চেহারা এত সুন্দর হবে, মুহূর্তে ওর মন থেকে ভয়ভীতি দূর হয়ে যায়। বনহুরের স্বর্গীয় দ্বীপ্তিময় দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে আর অবিশ্বাস করতে পারে না। তাকিয়ে থাকে নির্বাক নয়নে।

হেসে বলে বনহুর—আমার কথা বিশ্বাস করতে পারলে।

অস্ফুট কণ্ঠে বলেন নিমাই—হ্যাঁ।

সত্যি?

হ্যাঁ।

তবে কালই তুমি মাধুরীর হাতে ধরে ক্ষমা চেয়ে ওকে নিয়ে এসো। যদি এর অন্যথা হয় তবে মনে রেখ-হাতের রিভলভারটা উদ্যত করে ধরে–এর একটা গুলি তোমাকে হজম করতে হবে।

ভয়ার্ত চোখে নিমাই একবার বনহুরের মুখে আর একবার তার হাতে রিভলভারটার দিকে তাকায়।

বনহুর তাকে ভাবার সময় না দিয়ে এক লাফে মুক্ত জানালা দিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

•

সুভাষিণী সেদিনের পর থেকে কেমন যেন ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে। তার মুখের হাসি কোথায় যে মিলিয়ে গিয়েছে তার ঠিক নেই। সখীরা তাকে এমন বিষণ্ণ ভাবাপন্ন হয়ে পড়তে দেখে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে। পিতামাতাও উদগ্রীব হয়ে পড়েছেন, তাদের একমাত্র কন্যার হলো কি? বড় বড় ডাক্তার দেখানো হচ্ছে, কিন্তু কোন ডাক্তারই রোগ খুঁজে পাচ্ছে না। সুভাষিণীর মুখে তবু হাসি নেই। ঠিকভাবে নাওয়া খাওয়া নেই। সখীদের নিয়ে হাসি গল্প নেই, সদা সর্বদা কি যেন ভাবে সে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয়—কিছু হয় নি আমার।

একদিন সখীরা ধরে বসলো-সুভাষিণী, আজ তোকে বলতেই হবে, সে দিনের পর থেকে তোর কি হয়েছে? ডাক্তার বলেছে অসুখ নেই। নিজেও বলিস কিছু হয়নি, তবে তোর হলো কি?

সুভাষিণী কারো কাছেই বলতে পারে না তার মনের কথা। সে একজন দস্যুকে ভালবেসে ফেলেছে তবু সে স্বজাতি নয় মুসলমান কিন্তু তার পক্ষে ওকে ভুলাও অসম্ভব। কেন—কেন তার।

মনে ওর প্রতিচ্ছবি এমন করে গেঁথে গেছে? সে তো সভ্য সমাজের কোন লোক নয়। সে একজন দস্যু।

সুভাষিণীকে নীরব থাকতে দেখে সখীদের একজন বলে ওঠে—কি ভাবছিস সুভা?

ভাবছি তোরা আমার মাথাটা খাবি। সত্যি তুই আমাদের প্রশ্নের জবাব দিবি না?

না।

বেশ, আজ থেকে আমরা তোকে বিরক্ত করব না। কিন্তু মনে রাখিস সুভা, তুই না বললেও আমরা বুঝতে পেরেছি, একটা কিছু তোর হয়েছে।

সেটুকুই জেনে রাখ তোরা, তাহলেই হলো।

একদিন সুভাষিণী বাগানে বসে ভাবছে এমন সময় তার বড় দাদার বৌ চন্দ্রা দেবী এসে বসলো তার পাশে।

সুভাষিণী ফিরে তাকিয়ে আবার সোজা হয়ে বসলো কোন কথা বলেন।। পূর্বে যে বৌদিকে দেখে তার খুশির অন্ত থাকে না আজ আর সঙ্গে কথাই বলে না সুভাষিণী। চন্দ্রা ঘনিষ্ঠ হয়ে বলেন, তারপর সুভাষিণীর একখানা হাত মুঠায় চেপে ধরে বলেন–সুভা, আজ তোকে একটা কথা আমাকে বলতে হবে। বল বলবি?

স্থিরকণ্ঠে বলে সুভাষিণী বলার মত হলে, নিশ্চয়ই বলবো।

আচ্ছা সুভা, তুই যে বলেছিলি কে যেন তোকে ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে ঘোড়ায় চাপিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল?

হ্যাঁ সে এক ভদ্রলোক।

সুভা, এবার আমি বুঝতে পেরেছি, সে দিন ঐ ভদ্রলোক তোকে বাঁচিয়ে নিয়েছে সত্যি, কিন্তু তোর হৃদয় চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেছে।

যাও, ঠাট্টা করো না বৌদি।

ঠাট্টা নয় সুভা, এতদিন ঘরে সদা সর্বদা তোর বিষয় নিয়ে ভেবে দেখেছি ঠিক, এই রকম কিছু একটা হয়েছে। দেখ সুভা আমি তোর বৌদি। লক্ষ্মী বোনটি আমার কাছে কোন কথা লুকোতে নেই।

জানি, কিন্তু বলে কোন লাভ হবে না বৌদি।

হবে, আমাকে বললে অনেক উপকার হবে তোর।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে সুভাষিণী—তুমি যদি প্রতিজ্ঞা করো এ কথা কার কাছে বলবে না, তবে বলতে পারি।

বল, বলবো না।

বৌদি, তুমি যা অনুমান করেছো। তাই সত্য। যে সেদিন আমাকে ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করেছিল, সে আমার গোটা মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাকে ছাড়া আমি কিছু ভাবতে পারছিনে বৌদি।

সুভাষিণী, এ কথা আমি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু তার কোন পরিচয় জানা নেই—কে সে? কি তার নাম? সুভা, অজ্ঞাত একজনকে হঠাৎ এভাবে ভালবেসে, তুই ভুল করেছিস।

বৌদি, তার পরিচয় আমি পেয়েছি।

সত্যি?

হ্যাঁ।

কে সে?

বৌদি, তুমি শুনলে চমকে উঠবে, ভয়ে শিউরে উঠবে। আমাকে রক্ষাকারী সে লোকটি স্বাভাবিক লোক নয়।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, দস্যু বনহুর।

বিস্ময়ভরা ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে ওঠে। চন্দ্রা-দস্যু বনহুর!

বৌদি, প্রথমেই বলেছি, এ কথা তুমি কাউকে বলবে না।

সুভা, একি বলছিস তুই।

বৌদি, আমি গোটা অন্তর দিয়ে ওকে ভালবেসে ফেলেছি।

সুভা, একটা দস্যু, একটা কুৎসিত জঘন্য ব্যক্তিকে…

না, না, বৌদি, তুমি তাকে জানো না বৌদি, তুমি তাকে জান না। বৌদি! একটি বার যদি তুমি তাকে দেখতে। দস্যু বনহুর সে মানুষ নয়দেবতা!

এসব কি বলছিস সুভাষিণী?

তোমাকে কি বলবো, বৌদি। আমি কিছুতেই তাকে ভুলতে পারছিনে। সুভাষিণী চন্দ্রার হাত চেপে ধরে—বৌদি, বলো কি করবো আমি?

চন্দ্রার মুখমণ্ডল গম্ভীর থমথমে হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভাবে। তারপর বলে—সুভা, যাকে কোনদিন আর দেখার সুযোগ পর্যন্ত পাবি না, তাকে ভালবেসে নিজেকে বিসর্জন দিসনে।

সুভাষিণী চন্দ্রার কোলে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে বৌদি! বৌদি। চন্দ্র সস্নেহে সুভাষিণীর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

.

হাঙ্গেরী কারাগার পরিদর্শন করার পর পুলিশ সুপার মিঃ আহমদ স্বয়ং দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে অবতীর্ণ হয়েছেন। ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন অন্য কয়েকজন

অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসারসহ গোপনে মিঃ চৌধুরীর বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছেন। সবাই আড়ালে থেকে লক্ষ্য করছেন। তারা গোপনে সন্ধান নিয়ে জানতে পেয়েছেন, দস্যু বনহুর হঠাৎ কোন কোন দিন চৌধুরী বাড়িতে আগমন করে এবং মনিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

বেশ কয়েক রাত এভাবে তারা গোপনে পাহারা চালিয়ে চলেছে। ক্রমে হতাশ হয়ে পড়ছেন মিঃ আহমদ। দস্যু বনহুরের দেখা পাওয়াতে দূরের কথা, একটি প্রাণীও দেখতে পাননি তারা রাতের অন্ধকারে।

আজ অমাবস্যা। গোটা পৃথিবী অন্ধকার। এই রাতের প্রতীক্ষায় আছে মনিরা। প্রতি অমাবস্যা রাতেই বনহুর আসতো তার কাছে। আজও আসবে সে।

ওদিকে গুলিভরা রাইফেল আর রিভলভার নিয়ে প্রতীক্ষা করছে পুলিশ বাহিনী। মিঃ আহমদের চোখ দুটো অন্ধকারে আগুনের ভাটার মত জ্বলছে। আর জ্বলছে তার হাতের রিভলভারটি।

গভীর রাত। মনিরা বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে। আজ আসবে মনিরা। বার বার ওর ছবিখানা নিয়ে দেখছে সে। ফুলের একটি মালা সুন্দর করে গেঁথে রেখেছে, এই মালাখানা পরিয়ে দিয়ে ওকে সাদর সম্ভাষণ জানাবে মনিরা।

এমন সময় দূরে শুনা যায় অশ্বপদশব্দ।

মনিরার হৃদয়ে দোলা লাগে। মালাটা হাতে তুলে নিয়ে প্রতীক্ষা করে সে। বুকের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব আনন্দের অনুভূতি নাড়া দিয়ে চলেছে।

মিঃ আহমদের দলবলের কানেও গিয়ে পৌঁছলো এই অশ্বপদ শব্দ। প্রত্যেকেই রিভলভার আর রাইফেল উদ্যত করে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

অশ্বপদশব্দ ক্রমে স্পষ্ট শুনা যাচ্ছে।

ওদিকে মনিরার হাতে ফুলের মালা—

আর এদিকে পুলিশ বাহিনীর হাতে উদ্যত রিভলভার…

হাস্যোজ্জ্বল দীপ্ত মুখে তাজের পিঠে এগিয়ে আসছে দস্যু বনহুর।

০০৩. সৈনিক বেশে দস্যু বনহুর

সৈনিক বেশে দস্যু বনহুর – রোমেনা আফাজ

নিস্তব্ধ রাত্রির সূচিভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে শোনা যাচ্ছে অশ্ব-পদধ্বনি খট খট খটু….তাজের পিঠে এগিয়ে আসছে দস্যু বনহুর। সর্বাঙ্গে কালো পোশাক, মাথায় কালো পাগড়ি, কোমরের বেল্টে গুলীভরা রিভলবার।

চৌধুরী বাড়ির অদূরে এসে বনহুর তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো। তাজের পিঠে মৃদু আঘাত করে বললো–ঠিক এইখানে দাঁড়িয়ে থাকবি, বুঝলি?

তাজ হয়তো বনহুরের কথা বুঝতে পারলো, মৃদু শব্দ করে উঠলো সে–চিঁ হিঁ।

বনহুর অন্ধকারে সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে। বার বার তাকাচ্ছে সে চৌধুরী বাড়ির দোতলার একটি সুউচ্চ কক্ষের দিকে। মুক্ত জানালা দিয়ে কিছুটা বৈদ্যুতিক আলো বেরিয়ে এসে পড়েছে নিচের বাগানের মধ্যে। এই কক্ষটি মনিরার। যতই নিকটবর্তী হচ্ছে সে ততই মনের মধ্যে এক আনন্দের দ্যুতি খেলে যাচ্ছে-মনিরা হয়তো তার জন্য পথ চেয়ে বসে আছে।

এদিকে পুলিশ সুপার মিঃ আহম্মদ গুলীভরা উদ্যত রিভলবার হস্তে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করছেন দস্যু বনহুরের।

অদূরে একটি পাইন গাছের আড়ালে লুকিয়ে রিভলবার উদ্যত করে আছেন মিঃ হারুন। অন্যান্য পুলিশ কেউ বা বন্দুক, কেউ বা রাইফেল বাকিয়ে ঝোঁপের মধ্যে উবু হয়ে প্রতীক্ষা করছে। আজ দস্যু বনহুরকে জীবিত কিংবা মৃত পাকড়াও করা চাই-ই চাই।

বনহুর একেবারে নিকটে পৌঁছে যায়। হঠাৎ তার পায়ে একটি লতা জড়িয়ে পড়ে। পড়তে পড়তে বেঁচে যায় বনহুর। কিন্তু সে সোজা হয়ে দাঁড়াবার পূর্বেই একটি গুলী সঁ করে চলে যায় তার পাশ কেটে। মুহূর্তে বনহুর বুঝতে পারে বিপদ তার সম্মুখীন। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে উবু হয়ে শুয়ে পড়ে সে। পর মুহূর্তেই তার মাথার উপর দিয়ে সাঁ সাঁ করে আরও কয়েকটা গুলী চলে গেল। নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে জেগে উঠলো রিভলবার আর রাইফেলের গুলীর আওয়াজ গুড় ম-গুড় ম গুড় ম.....

বনহুর হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগলো। এখানে থাকা আর এক দণ্ড তার পক্ষে উচিত নয়। কখনও বুক দিয়ে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলো সে। তখনও তার মাথার উপর দিয়ে গুলী ছুটে চলেছে।

নিজের কক্ষে চমকে উঠলো মনিরা। হাত থেকে খসে পড়লো ফুলের মালা। নিশ্চয়ই মনিরের আগমন পুলিশ বাহিনী জানতে পেরেছে। তারা ভীষণভাবে আক্রমণ করেছে তাকে। মনিরার হৃদপিণ্ড ধক ধক করে কাঁপতে শুরু করলো। হায়। একি হলো! এতোক্ষণ হয়তো মনিরের দেহটা ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে সেখানের মাটি....আর ভাবতে পারে না মনিরা। একবার ছুটে যায় জানালার পাশে, একবার এসে দাঁড়ায় মেঝের মাঝখানে। ভেবে পায় না কি। করবে সে।

গুলীর শব্দে চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগমের নিদ্রা ছুটে যায়। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে চৌধুরী সাহেব রেলিং-এর পাশে এসে দাঁড়ান। মরিয়ম বেগম ছুটেন মনিরার কক্ষের দিকে।

মনিরা তখন দরজা খুলে মামুজানের কক্ষের দিকে ছুটতে শুরু করেছে। মরিয়ম বেগমকে দেখতে পেয়ে মনিরা তাঁকে জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠে-মামীমা, মামীমা, একি হলো! একি হলো!

মরিয়ম বেগম সান্ত্বনার স্বরে বলেন–ভয় নেই মা, গুলী এখানে আসবে না।

তারপর মনিরাকে সঙ্গে করে চৌধুরী সাহেবের কক্ষে গিয়ে দাঁড়ান মরিয়ম বেগম; স্বামীকে লক্ষ্য করে বলেন–ওগো, কি হয়েছে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে।

বিস্ময়াহত চৌধুরী সাহেবও অস্ফুট কণ্ঠে বলেন–আমিও তো কিছু বুঝতে পারছিনে।

মনিরার চোখে মুখে এক উৎকণ্ঠার ছাপ ফুটে উঠেছে। কি করবে, না বললেও নয়। নিশ্চয়ই পুলিশ বাহিনী তার মনিরের উপর হামলা চালিয়েছে। চঞ্চল কণ্ঠে বলে উঠে মনিরা-মামুজান, নিশ্চয়ই এ পুলিশের রাইফেলের শব্দ। পুলিশ আমাদের বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছে।

চৌধুরী সাহেব অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করেন–পুলিশ!

হ্যাঁ হ্যাঁ, মামুজান যাও, ওদের ক্ষান্ত করো। ওদের ক্ষান্ত করো তুমি...

সেকি মা, পুলিশ কেন এভাবে আমাদের বাড়ি ঘেরাও করে গুলী ছুঁড়বে?

মামুজান যাও, বারণ করো; বারণ করো তুমি....নইলে...নইলে সর্বনাশ হবে, সর্বনাশ হবে মামুজান....।

মরিয়ম বেগম বাড়ির অদূরে যেখানে গুলীর শব্দ হচ্ছিলো সেদিকে তাকিয়ে বলেন–মনিরা, আমাদের ব্যস্ত হবার কিছু নেই। গুলী আমাদের বাড়ির দিকে ছুঁড়ছে বলে মনে হচ্ছে না; দেখছিস নাগুলীর শব্দ ক্রমান্বয়ে ঐদিকে সরে যাচ্ছে।

মনিরা স্তব্ধ চোখে তাকিয়ে রইলো অন্ধকারময় অদূরস্থ পাইন গাছগুলির দিকে। মনের মধ্যে ঝড় বইতে শুরু করেছে। কায়মনে খোদাকে স্মরণ করতে লাগলো, হে দয়াময়! ওকে তুমি রক্ষা করো, ওকে তুমি বাঁচিয়ে নাও প্রভু!

মাত্র কয়েক মিনিট, হঠাৎ মনিরার কানে এসে পৌঁছলো অশ্ব-পদশব্দ খট খট খট....তবে কি মনির এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছে! এ যে তারই অশ্বের পদশব্দ। মুহূর্তে মনিরার মুখমণ্ডল প্রসন্ন হয়ে উঠে। নিজ মনেই অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠে-বেঁচে গেছে, নিশ্চয়ই সে বেঁচে গেছে....

মরিয়ম বেগম আশ্চর্য কণ্ঠে বলে উঠে-সেকি মনিরা, কে বেঁচে গেছে রে?

ঐ যে ও-ও বেঁচে গেছে; শুনছো না মামীমা ওর ঘোড়ার খুরের শব্দ?

তাইতো শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু ওটা কার ঘোড়ার খুরের শব্দ মনিরা? মরিয়ম বেগম কান পেতে শুনতে লাগলেন।

চৌধুরী সাহেব বলেন–তাই তো, একটা ঘোড়া দ্রুত ঐদিকে চলে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ মামাজান, সে বেঁচে গেছে।

কে, কার কথা বলছো, মা মনিরা? চৌধুরী সাহেব প্রশ্ন করেন।

না না কেউ না, কেউ না মামুজান, কেউ না....মনিরা ছুটে চলে যায় নিজের ঘরের দিকে।

কক্ষে প্রবেশ করে খোদার কাছে দু'হাত তুলে শুকরিয়া আদায় করে-হে খোদা, তুমি পাক পরওয়ার দেগার, আমার মনিরকে তুমি নিশ্চয়ই বাঁচিয়ে নিয়েছো। তোমার কাছে হাজার হাজার শুকরিয়া। মালাখানা হাতে তুলে নিয়ে বনহুরের ছবির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর পরিয়ে দেয় সে ছবির গলায়। নির্বাক নয়নে তাকিয়ে থাকে সে ছবিখানার দিকে।

মিঃ আহম্মদের রিভলবারের গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি, তিনি দেখতে পেলেন, অন্ধকারে কেউ যেন ভূতলে পড়ে গেল। পুশিল বাহিনী মুহর্তমধ্যে ঘিরে ফেললো জায়গাটা, কিন্তু কোথায় কে! মিঃ আহম্মদ স্বয়ং ছুটে গেলেন যেখানে অন্ধকারে কাউকে পড়ে যেতে দেখেছিলেন। টর্চের আলো বিক্ষিপ্তভাবে ছুটাছুটি করতে লাগলো। মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন টর্চের আলো ফেলে ঝোঁপ ঝাড়, বাগানের আশেপাশে দেখতে লাগলেন। সবাই সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে খুঁজে চলেছে দস্যু বনহুরকে।

মিঃ আহম্মদ বলেন–ইন্সপেক্টর, আমার গুলী দস্যুটাকে ঘায়েল করেছে। নিশ্চয়ই সে মারা পড়েছে কিংবা মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে।

পুলিশ বাহিনী তখনও অনুসন্ধান করে চলেছে। তাদের টর্চের আলো বিক্ষিপ্তভাবে ছুটোছুটি করছে। হঠাৎ একজন পুলিশ তীব্র চিৎকার করে উঠে-হুজুর রক্ত, হুজুর রক্ত...

সবাই দ্রুত এগিয়ে গেলেন সেখানে। একটা পাইন ঝাড়ের পাশে খানিকটা জায়গা রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে। মিঃ হোসেন আনন্দধ্বনি করে উঠেন-স্যার, দস্যু নিহত হয়েছে, দস্যু নিহত হয়েছে।

মিঃ হারুন জায়গাটা ভালোভাবে লক্ষ্য করে বলেন–না, সে নিহত হয়নি, সে আহত হয়েছে।

স্যার, আপনার গুলি যে দস্যুটাকে ঘায়েল করেছে, এ সুনিশ্চয়।

সে বেঁচে আছে, আমার গুলী খেয়েও সে বেঁচে আছে। নিহত হয়নি! নিশ্চয়ই তাহলে সে আহত অবস্থায় নিকটেই কোথাও লুকিয়ে আছে। এই মুহূর্তে তোমরা সমস্ত ঝোঁপঝাড়, বাগান তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখ। আহত অবস্থায় সে পালাতে পারেনি।

মিঃ আহম্মদ যখন তার সঙ্গীদের কথাগুলো বলছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর তার বাম হস্ত চেপে ধরে তাজের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। দক্ষিণ হস্তের আংগুলের ফাঁকে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে তাজা রক্ত। মিঃ আহম্মদের গুলীটা বনহুরের বাম হস্তের মাংস ভেদ করে চলে গেছে।

তাজ মনিবের অবস্থা হয়তো অনুভব করলো। নিঃশব্দে তাজ সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বনহুর। অন্ধকারে অতিকষ্টে উঠে বসলো তাজের পিঠে। সঙ্গে সঙ্গে উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো তাজ।

আচমকা অশ্ব-পদশব্দে চমকে উঠেন মিঃ আহম্মদ ও তার দলবল। মিঃ হারুন চিৎকার করে উঠেন-স্যার, দস্যু বনহুরের অশ্ব-পদশব্দ। সঙ্গে সঙ্গে তার রিভলবার গর্জন করে উঠে-গুড়ুম গুড়ুম......

মিঃ আহম্মদ রাগে-ক্ষোভে অধর দংশন করেন। সমস্ত পুলিশ বাহিনীকে লক্ষ্য করে হুঙ্কার ছাড়েন-গ্রেপ্তার করো, গ্রেপ্তার করো। গুলী চালাও, গুলী চালাও....

একসঙ্গে অসংখ্য রাইফেল গর্জে উঠে।

কিন্তু তাজের খুরের শব্দ তখন অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। মনিবের বিপদ বুঝতে পেরে তাজ উলকাবেগে ছুটতে শুরু করেছে।

পুলিশ বাহিনীর রাইফেলের গুলী আর তাজের নিকটে পৌঁছতে সক্ষম হলো না।

ধীরে ধীরে তাজের পদশব্দ অন্ধকারে মিলে গেল।

মিঃ আহম্মদ ক্ষিপ্তের ন্যায় হয়ে উঠলেন। দস্যু বনহুরের কাছে এ যেন তার চরম অপমান। হাঙ্গেরিয়া কারাগার থেকে পালিয়ে রক্ষা পেয়েছে। ভেবেছিলেন এবার তিনি দস্যু বনহুরকে জীবিত কিংবা মৃত পাকড়াও করবেনই। কিন্তু সব বিফলে গেল। এত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো।

তিনি অফিসে ফিরে এ বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করতে লাগলেন।

মিঃ হারুন পুলিশ সুপারের অবস্থা দর্শনে মনে মনে হাসলেন। প্রকাশ্যে বললেন- স্যার, আপনি এতো উত্তেজিত হচ্ছেন কেন, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে না পারলেও তাকে আপনি ঘায়েল করেছেন। যে দস্যুকে হাঙ্গোরিয়া কারাগার আটকে রাখতে পারেনি বা সক্ষম হয়নি, সেই দস্যু আজ আপনার হস্তে আহত- এটাও কম নয়।

মিঃ হারুনের কথায় সুপার কতকটা যেন আশ্বস্ত হন। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বলেন– ইন্সপেক্টর, এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি, আমার রিভলবারের গুলী দস্যুটাকে মারাত্মকভাবে আহত করেছে।

দ্বিতীয় ইন্সপেক্টর মিঃ হোসেন বলেন–স্যার, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, তার জখমটা সাংঘাতিক হয়েছে। নইলে অতো রক্তপাত হতো না।

মিঃ আহম্মদ যেন খুশি হলেন। দস্যুকে যদিও তিনি গ্রেপ্তার করতে পারেননি, তবু কিছুটা সান্ত্বনা পেলেন দস্যু ঘায়েল হয়েছে বলে।

তিনি আরও কিছুক্ষণ এ বিষয় নিয়ে তাঁর দলবলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। তারপর বিদায় গ্রহণ করলেন।

কিন্তু বাসায় ফিরেও মিঃ আহম্মদ স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। অহরহ একটা চিন্তা তাঁকে অক্টোপাশের মত ঘিরে রেখেছিল। তিনি ভেবেছিলেন দস্যু বনহুর সবাইকে হার মানাতে পারে, হাঙ্গেরিয়া কারাগার থেকে পালাতে পারে, কিন্তু তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে না। বাকি রাতটুকু তাঁর ছটফট করে কাটলো। ভোর হবার

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিসে ফোন করলেন। মিঃ হারুন এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার কেবলমাত্র বিশ্রামের জন্য বাড়ি যাবেন ভাবছেন, এমন সময় মিঃ হারুন এবং হোসেনের ডাক এলো। মিঃ আহম্মদ এক্ষুণি তাঁদের আহ্বান জানিয়েছেন।

মিঃ হারুন এবং হোসেন অগত্যা বিশ্রামের আশা ত্যাগ করে মিঃ আহম্মদের বাসভবনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। মিঃ হারুন ও মিঃ হোসেন সুপারের বাসভবনে পৌঁছে আশ্চর্য হলেন। মিঃ আহম্মদের শরীরে তখনও গত সন্ধ্যার ড্রেস দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলেন মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন। ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারি করছেন মিঃ আহম্মদ।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন সেলুট করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। মিঃ আহম্মদ গম্ভীর কণ্ঠে বলেন–ইন্সপেক্টর, এক্ষুণি মিঃ চৌধুরীর বাড়ির সম্মুখে যে স্থানে দস্যুটার রক্ত দেখা গিয়েছিল ঐখানে যেতে চাই। নিশ্চয়ই কোন ক্লু পাওয়া যেতে পারে। আপনারা প্রস্তুত আছেন?

ইয়েস স্যার, আমরা প্রস্তুত।

তবে চলুন আর বিলম্ব নয়, আমি নিজে ঐ জায়গাটা দিনের আলোয় দেখতে চাই। কথাটা বলে টেবিল থেকে হ্যাটটা তুলে মাথায় পরে নেন মিঃ আহম্মদ।

.

বনহুরের রক্তে তাজের দেহটা ভিজে চুপসে উঠেছে। এক হস্তে তাজের লাগাম চেপে ধরে উবু হয়ে আছে বনহুর। তাজ প্রাণপণে ছুটে চলেছে।

প্রান্তরের বুক চিরে, গহন বনের ভিতর দিয়ে ছুটছে তাজ। নিস্তব্ধ ধরণীর বুকে তাজের খুরের আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলছে খট খট খট.....

বনহুরকে নিয়ে তাজ আস্তানায় পৌঁছে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দুজন অনুচর মশাল হস্তে এগিয়ে এল তাজের পাশে। তাজের পিঠে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে স্তব্ধ হয়ে গেল। একজন তীব্র চিৎকার করে উঠলো।

নূরীও এতোক্ষণ বনহুরের প্রতীক্ষায় ছিল, তাজের খুরের শব্দে বেরিয়ে এলো সে। ছুটে গেলো তাজের পাশে, কিন্তু নিকটে পৌঁছেই আর্তনাদ করে উঠলো-উঃ! এ তোমার কি হয়েছে, হুর?

ততক্ষণে বনহুর অনুচরদ্বয়ের সাহায্যে নিচে নেমে দাঁড়িয়েছে। নূরী তাড়াতাড়ি বনহুরের হাতের নিচে নিজের কাঁধটা এগিয়ে দিয়ে ধরে ফেলে-হুর, একি হলো?

মৃদু হেসে বলে বনহুর-সামান্য ঘায়েল হয়েছে মাত্র– সেরে যাবে।

সামান্য! রক্তে চুপসে গেছে তাজের দেহ, আর তুমি বলছো সামান্য ঘায়েল হয়েছে মাত্র? নূরীর সাহায্যে বনহুর নিজের বিশ্রামকক্ষে পৌঁছল।

বনহুরকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে পাশে বসলো নূরী। নিজের ওড়না দিয়ে বেশ করে ওর হাতখানা বেঁধে দিল। নূরী যখন বনহুরের হাতে পট্টি বাঁধছিল তখন তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। বনহুরের কষ্টটা যেন নূরীর হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দিচ্ছিলো। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে–হুর, এবার বল কে তোমার এ অবস্থা করেছে?

শুনে কি হবে নূরী?

রহমানের সাহায্যে এবং তোমার সমস্ত অনুচর নিয়ে আমি তাকে উচিত শাস্তি দেব। আমি তার সর্বনাশ করবো। তোমাকে ঘায়েল করেছে যে, আমি তাকে হত্যা করবো।

সাবাস নূরী!

বলো, বলো! হুর, কে তোমার এ অবস্থা করেছে, বলো?

নূরী, তোমার দীপ্ত কণ্ঠ আমার ক্ষত অনেকটা আরোগ্য করে দিয়েছে। সত্য তুমি বীরাঙ্গনা। কিন্তু এ গুলী আমাকে কে করেছে ঠিক আমিই জানিনে। নইলে দস্যু বনহুর তাকে ক্ষমা করতো না। এখনও আমার দক্ষিণ হস্ত সম্পূর্ণ সুস্থ।

তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?

মোটেই না নূরী, সামান্য কেটেছে মাত্র।

এ আঘাত তুমি সামান্য বলতে পার না বনহুর। এখনও যেভাবে রক্তপাত হচ্ছে, তাতে বিপদ ঘটতে পারে।

নূরী, জানি আমার শরীর থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, কিন্তু এতেও আমি দুর্বল হব না।

বল কি হুর, ডাক্তার নিয়ে আসি। খোদা না করুন তোমার কিছু হয়ে যায়। ডাক্তার! কথাটা উচ্চারণ করে হাসে বনহুর।

হ্যাঁ ডাক্তার। ডাক্তার না ডাকলে তোমার রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না। দেখছো না ওড়নাখানা সম্পূর্ণ রাঙা হয়ে উঠেছে। আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করা ঠিক নয় হুর।

বনহুর পিছু ডাকে-কোথায় যাচ্ছো নূরী, শোন।

নূরী ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে।

নূরী রহমানের নিকট গিয়ে বললো–রহমান, বনহুরের শরীর থেকে প্রচুর রক্তপাত ঘটেছে। এখনও রক্ত পড়ছে। শিগৃগীর কোন ডাক্তারের ব্যবস্থা কর।

ডাক্তার! সর্দার কি এখনই ডাক্তার ডাকতে বললো নূরী?

না, সে বলেনি, কিন্তু ডাক্তার ডাকা ছাড়া কোন উপায় নেই। যাও রহমান, আর বিলম্ব কর, হুরকে বাঁচাতেই হবে।

কিন্তু.....

আর কিন্তু নয়। তুমি দুটো অশ্ব নিয়ে এসো, আমিও যাব তোমার সঙ্গে। ডাক্তারকে কিভাবে আনতে হবে আমিই আনব।

বেশ। রহমান হাতে তালি দেয়-সঙ্গে সঙ্গে দুজন দস্যু এসে দাঁড়ায় সেখানে। রহমান বলে–দুটো অশ্ব তৈরি করে নিয়ে এসো।

দস্যু দুটি চলে যায়।

নূরী বলে–আমিও তৈরি হয়ে আসছি।

নূরী নিজের কক্ষে প্রবেশ করে, পূর্বের ড্রেসে সজ্জিত হয়। মাথায় পাগড়ি, নাকের নিচে সরু এক ফালি গোঁফ। প্যান্ট এবং আঁটসাট একটি কোট। প্যান্টের পকেটে একটি কালো রুমাল ও একটি রিভলবার লুকিয়ে নেয় সে। তারপর

আয়নার সম্মুখে দাঁড়ায়, ঠিক তখন তাকে একটি একুশ বছরের যুবকের মত লাগছিল।

এবার নূরী বনহুরের কক্ষে প্রবেশ করলো।

বনহুর তখন বিছানায় চীৎ হয়ে শুয়ে কিছু ভাবছিল। পদশব্দে চোখ মেলে তাকায়। হঠাৎ কক্ষে অপরিচিত এক যুবককে দেখে প্রথমে আশ্চর্য হয়, পর মুহূর্তেই মৃদু হাসে।

নূরী গম্ভীরভাবে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় বনহুরের সম্মুখে। কোন কথা বলে না সে।

বনহুর কিন্তু নূরীকে চিনে ফেলেছে, তবু মনোভাব গোপন করে বলে–যুবক, তোমার নাম?

নূরী তবু নিশ্চুপ।

বনহুর দক্ষিণ হস্তে নূরীর হাত ধরে টেনে নেয় কাছে।

নূরীর হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব শিহরণ বয়ে যায়। আজ পর্যন্ত বনহুর নূরীকে কোনদিন এভাবে আকর্ষণ করেনি। আনন্দ আপ্লুত নূরীর দু'চোখ ছাপিয়ে পানি আসে।

বনহুর স্নেহ-বিজড়িত কণ্ঠে বলে–এ ড্রেসে কোথায় যাচ্ছো নূরী?

ডাক্তার ডাকতে।

কিন্তু ডাক্তার এখানে এসে ফিরে যেতে পারবে?

ভয় নেই, তোমার আস্তানার সন্ধান সে জানতে পারবে না। ছেড়ে দাও হুর, দেরী হয়ে গেল।

বনহুর ওকে ছেড়ে দেয়। দ্রুত বেরিয়ে যায় নূরী। বাইরে গিয়ে দেখতে পায় রহমান দুটো অশ্ব নিয়ে অপেক্ষা করছে।

নূরী রহমানকে লক্ষ্য করে বলে–রহমান, খুব দ্রুত কাজ করতে হবে। রাত ভোর হবার পূর্বেই ডাক্তার যেন তার নিজ বাড়ি ফিরে যেতে পারে।

আচ্ছা, তাই হবে।

দুটি অশ্বে দুজন চড়ে বসে। অন্ধকারে অশ্ব দুটি ছুটতে শুরু করে।

পথিমধ্যে রহমান ভেবে নেয় কোন ডাক্তারকে হলে তাদের ভালো হয়। তাই বিলম্ব হয় না। শহরের বিশিষ্ট ডাক্তার জয়ন্ত সেনের নিকটে যাওয়াই ঠিক করলো।

বনের শেষ প্রান্তে তাদের মোটর গাড়ি প্রতীক্ষা করছিল। ঘোড়া দুটি গোপন স্থানে বেঁধে রেখে গাড়িতে উঠে বসে ওরা দুজন।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের গাড়ি ডাক্তার সেনের গাড়ি বারান্দায় গিয়ে পৌঁছল। রহমানই ড্রাইভ করছিল, রহমানের শরীরেও ছিল ড্রাইভারের ড্রেস। রহমান গাড়ি থেকে নেমে দরজার পাশে গিয়ে কলিং বেলে হাত রাখলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে সম্মুখে এসে দাঁড়াল একটি লোক। হয়তো বাড়ির চাকর-বাকর হবে। লোকটা জিজ্ঞাসা করলো–আপনারা কাকে চান?

নূরী ব্যস্তকণ্ঠে বললো–ডাক্তার বাবুকে ডেকে দাও। একটু তাড়াতাড়ি, বুঝলে?

কিন্তু তিনি তো রাতে কোন রোগী দেখেন না। লোকটি বললো।

ডাক্তার বাবুকে ডেকে দাও, তিনি যা করেন–করবেন।

কি বলবো? আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?

কিছু বলতে হবে না; শুধু বলবে, একটি যুবক আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

এবার লোকটা একবার যুবকের মুখে আর একবার তার গাড়িখানার দিকে তাকিয়ে চলে যায়।

অল্পক্ষণেই পুনরায় লোকটি ফিরে এসে বলে–আসুন, ভিতরে এসে বসুন।

নূরী লোকটার পিছু পিছু হলঘরে গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর করুণ কণ্ঠে বলে–দেখ, একটু তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডেকে দাও।

এই যে এলেন বলে–আপনি বসুন। তারপর নিজ মনেই বলে চলে লোকটা-এই রাত দুপুরে রোগী। বাপরে বাপ, রাতেও একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দেবে না বাবা।

ততক্ষণে কক্ষে প্রবেশ করেন ডাক্তার সেন। মধ্যবয়স্ক গম্ভীর প্রকৃতির লোকটি। স্লিপিং গাউনের বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে এসেছেন তিনি। নূরীকে দেখে বলেন–যুবক, তুমি কি জানো না

আমি রাতে রোগী দেখি না?

জানি, কিন্তু এক্সিডেন্ট হয়েছে....

এক্সিডেন্ট! যুবক, তুমি তো দিব্যি দাঁড়িয়ে আছ– তোমার কি হয়েছে?

ডাক্তারবাবু, আমার নয়-আমার বড় ভাই এক্সিডেন্ট হয়েছে। না গেলেই নয়, দয়া করে একটিবার চলুন-চলুন ডাক্তার বাবু...নূরীর গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

কি বললে, তোমার এক্সিডেন্ট নয়? তোমার ভাই-এর-আমি যাব এই রাতদুপুরে বাইরে রোগী দেখতে!

নূরী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে ডাক্তার বাবু, না গেলেই নয়। নইলে ওকে বাঁচানো যাবে না। ডাক্তার বাবু চলুন, দয়া করে চলুন। ডাক্তার বাবু...

অসম্ভব। রাতে আমি কোথাও যাই না।

আপনার পায়ে পড়ি ডাক্তার বাবু, চলুন...নূরী কাঁদতে থাকে। ডাক্তারের মনে হয়তো মায়ার উদ্রেক হয়। দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলেন–এখন রাত চারটে; আর ঘণ্টা দুই কিংবা তিন পরে গেলে চলবে না?

না, ডাক্তার বাবু না, আপনি দয়া করে এক্ষুণি চলুন। আপনার পায়ে পড়ি ডাক্তার বাবু।

ডাক্তার সেন দেখলেন না গেলেই নয়, যুবকটি নাছোড়বান্দা হয়ে ধরেছে। এবার বলেন তিনি-রাতে কোথাও রোগী দেখি না বা কলে যাই না। ফি কিন্তু ডবল দিতে হবে।

তাই দেব, তাই দেব ডাক্তার বাবু, কত চান আপনি?

দু'শো টাকা দিতে হবে।

বেশ, তাই পাবেন।

ডাক্তার সেন বলেন, রোগীর শরীর থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে?

হ্যাঁ ডাক্তার বাবু, রোগীর শরীর থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে।

তাহলে তো রক্তের প্রয়োজন?

রক্ত-সে চিন্তা করবেন না ডাক্তার বাবু, আমি-আমিই দেব রক্ত।

কিন্তু রোগীকে এখানে আনতে পারলে সব বিষয়ে সুবিধা হতো।

না না, সে রকম কোন উপায়ই নেই। রোগী অত্যন্ত কঠিন। যা-যা প্রয়োজন নিয়ে চলুন। ডাক্তার বাবু, আমার গাড়িতেই আপনাকে পৌঁছে দেব।

বেশ, তাই হবে। কিন্তু অনেক কিছু নিতে হচ্ছে।

তাই নিন, কোন অসুবিধা হবে না।

ডাক্তার সেন তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং ঔষধাদি নিয়ে নূরীর গাড়িতে চড়ে বসলেন।

ডাক্তার সেনকে নিয়ে নূরীর গাড়ি ডবল স্পীডে ছুটে চলেছে। রহমান গাড়ি চালাচ্ছে।

ডাক্তার সেন বললেন-কত দূর হবে?

নূরী জবাব দিল-একটু দূরেই হবে ডাক্তার বাবু। আপনি নিশ্চিন্ত হউন, কোন ভয় নেই।

ডাক্তার সেন একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে ভালোভাবে ঠেস দিয়ে বসেন।

গাড়ি তখন আঁকাবাঁকা পথ ধরে ছুটে চলেছে।

নূরী ধীরে ধীরে প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে রিভলবার খানা বের করে নেয়। তারপর হঠাৎ অতর্কিতভাবে চেপে ধরলো ডাক্তার সেনের পাঁজরে-ডাক্তার বাবু, ভয় নেই, কিন্তু এবার আপনার চোখে রুমাল বাধতে হবে।

ডাক্তার সেনের হাত থেকে অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা খসে পড়লো। দুহাত তুলে ধরলো উপরের দিকে। ভয়াতুর চোখে তাকালেন নূরীর মুখের দিকে, ঢোক গিলে বলেন–যুবক, তোমার মতলব?

নূরী স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললো…আমি আপনার কোন ক্ষতি করবো না। শুধু চোখে রুমাল বাঁধতে হবে।

তার মানে?

মানে, আমি আপনাকে যেখানে নিয়ে যাব সে স্থানটি অতি গোপনীয়। কাজেই আপনাকে চোখে রুমাল বাঁধতে হবে। এতে আপত্তি করলে বিপদে পড়বেন। এতে আপনার কোন অমঙ্গল হবে না।

ডাক্তার সেনের ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠে। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলেন তিনি-বেশ, তাই হবে।

নূরী একটি কালো পুরু রুমাল বের করে ডাক্তার সেনের চোখে মজবুত করে বাঁধলো। তারপর বললো–আপনি চুপ করে থাকুন, যা করতে হয় আমরাই করবো। তারপর রোগীর নিকটে পৌঁছে আপনার কাজ।

বনের পাশে এসে গাড়ি থামলো। রহমান গুপ্তস্থান হতে অশ্ব দুটি নিয়ে এলো। তারপর একটিতে ডাক্তার এবং ঔষধের বাক্স ও রহমান চেপে বসলো। অন্যটিতে নূরী।

ডাক্তারকে নিয়ে একেবারে বনহুরের কক্ষে প্রবেশ করলো নূরী। তারপর ওর চোখের রুমাল খুলে দিয়ে বললো–ডাক্তার বাবু, এই যে রোগী।

প্রায় অর্ধঘণ্টা কালো কাপড়ে চোখ বাঁধা থাকায় কেমন যেন ধা ধা মেরে গিয়েছিলেন ডাক্তার সেন। প্রথমে চোখ দুটো একটু রগড়ে নিলেন, তারপর

তাকালেন সম্মুখে। দেখতে পেলেন সম্মুখে শয্যায় শায়িত এক যুবক। বনহুরের অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর তাকালেন কক্ষের চারিদিকে। এ কোথায় এসেছেন কিছুই বুঝতে পারলেন না।

নূরী বলে উঠে-ডাক্তার বাবু, এবার দয়া করে ওকে দেখুন।

বনহুর একবার নূরী আর একবার রহমানের মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তারকে লক্ষ্য করে বললো–বসুন।

ডাক্তার সেন এবার বনহুরের বিছানার পাশে বসলেন। বনহুরকে পরীক্ষা করে বলেন–এটা গুলীর আঘাত বলে মনে হচ্ছে?

বনহুর জবাব দিল–হ্যাঁ, রিভলবারের গুলী লেগেছিল। তবে গুলীটা ভেতরে নেই, বেরিয়ে গেছে।

হ্যাঁ, সেরকমই দেখছি; কিন্তু যেভাবে ক্ষত হয়েছে, প্রচুর রক্তের প্রয়োজন।

রক্ত?

হাঁ, প্রচুর রক্ত লাগবে।

কিন্তু রক্ত কোথায় পাওয়া যাবে? একটু চিন্তিত কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করে বনহুর।

নূরী বলে উঠে-কেন, আমার শরীরে এখনও প্রচুর রক্ত জমা আছে। ডাক্তার বাবু, আপনি আমার রক্ত তুলে নিয়ে ওকে বাঁচান।

তা হয় না। ডাক্তার বাবু, আপনি রক্ত ছাড়া যতটুকু পারেন করুন। রক্ত আমার লাগবে না। গম্ভীর কণ্ঠে বলে বনহুর।

ডাক্তার সেন বলে উঠেন-তা হয় না, রক্ত লাগবেই।

নূরী পুনরায় বলে–আমার রক্ত না নিলে আমি এক্ষুণি নিজকে বিসর্জন দেব।

ডাক্তার সেন বলেন–বেশ, তাই হোক। এই যুবকের রক্তেই আমি আপনাকে…।

এবার শুরু হলো চিকিৎসা।

নূরীকে পাশের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ওর শরীর থেকে রক্ত নিয়ে বনহুরের শরীরে দেওয়া হলো।

ডাক্তার সেন মনোযোগ সহকারে কাজ করে চললেন।

হাতখানায় সুন্দর করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন। আর রক্তপাত হচ্ছে না।

কিন্তু ডাক্তার সেনের কাজ যখন শেষ হলো তখন রাত আর বেশি নেই। বনহুরের ইংগিতে রহমান একটা থলে এনে ডাক্তার সেনের হাতে দিলেন।

বনহুর বললো–ওটাতে আপনার পারিশ্রমিক আছে; নিয়ে যান।

ডাক্তার সেন থলে হাতে নিয়ে একটু অবাক হলেন। কারণ তাকে দু'শ টাকা বন্দোবস্ত করে নিয়ে আসা হয়েছে। দু'খানা একশত করে টাকার নোট দিলেই চলত। এখানে গুণে দেখাটাও ভদ্রতা হবে না। কাজেই থলেটা পকেটে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

রহমান হঠাৎ তার চোখের সম্মুখে কালো রুমালখানা ধরে বললো–আসুন এটা বেঁধে দি।

ডাক্তার সেন দেখলেন, না বেঁধে যখন কোন উপায় নেই তখন নীরবই রইলেন।

রহমান ডাক্তারের চোখ বেঁধে হাত ধরলো-আসুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ডাক্তার সেন চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে বলেন–আপনার নামটা তো বললেন না?

বনহুর হেসে বললো–ঐ থলের মধ্যেই আমার পরিচয়। তারপর রহমানকে লক্ষ্য করে বললো–ডাক্তার সেনের যেন কোন অসুবিধা না হয় লক্ষ্য রেখ রহমান।

আচ্ছা রাখবো।

রহমানের হাত ধরে চলতে চলতে ডাক্তার সেনের মনে নানা কথার উদ্ভব হচ্ছে। নিশ্চয়ই এটা কোন গোপন স্থান হবে। নইলে তার চোখ এমন করে বাঁধবে কেন। যাক গে যে স্থানই হোক তার এতো মাথা ঘামিয়ে লাভ কি! টাকা দু’শ পেলেই হলো। তাছাড়া রোগীর ব্যবহার চমৎকার! কথাবার্তাগুলোও তেমনি মনোমুগ্ধকর। কিন্তু কে এই যুবক-যার চেহারা এতো সুন্দর, যার ব্যবহার এতো মহৎ, যার হৃদয় এতো উন্নত!

ডাক্তার সেনকে নিয়ে রহমান অশ্বযোগে একেবারে ট্যাক্সির নিকটে পৌঁছল, তারপর ট্যাক্সিতে বসিয়ে প্রায় পনেরো মিনিট ডবল স্পীডে চলার পর ডাক্তার সেনের চোখের রুমাল খুলে দিলো রহমান। তখন পূর্ব আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে।

অল্পক্ষণেই গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি পৌঁছে গেল।

ডাক্তার গাড়ি থেকে নেমে চট করে গাড়ির নাম্বার লিখে নিলেন। কিন্তু একি! এযে তারই গাড়ির নাম্বার। গাড়ির দিকে ভালো করে তাকালেন-তাই তো, এ যে তারই গাড়ি! কিন্তু ডাইভার কই! ডাক্তার সেন চিৎকার করে দারোয়ানকে ডাকতে লাগলেন-গুরু সিং, গুরু সিং…

ততক্ষণে রহমান গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে যায়।

ইতোমধ্যে দারোয়ান এসে সেলুট ঠুকে দাঁড়ালেন–হুজুর, হামকো বোলাতে; হ্যায়!

বেটা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলি, না? দ্যাখ তো আমার গাড়ি গ্যারেজে আছে?

হুজুর, গাড়ি তো আভি ড্রাইভার আপকে লে আনে গেয়া।

বল কি!

হ্যাঁ হুজুর।

ড্রাইভার! কোথায় ড্রাইভার? রজত, রজত….রজত ড্রাইভারের নাম।

মনিবের ডাকে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়ে আসে রজত-স্যার, আমাকে ডাকছেন?

হ্যাঁ, তোমাকে ডাকবো না তো আর কেউ রজত আছে?

বলুন স্যার?

গাড়ি নিয়ে আমাকে আনতে গিয়েছিলে?

সেকি স্যার, আমি তো নাক ডেকে ঘুমোচ্ছি, আপনাকে কখন আনতে গেলুম!

দারোয়ান গুরু সিং বলে উঠে-হাময়ারা চোখ আন্ধা হুয়া নেহি। তুমি গাড়ি লে-কর গিয়া নেহি?

রজত ক্ষেপে উঠে-নেহি নেহি; আমি ঘুমিয়েছিলুম স্যার, কোথাও যাইনি। সেই সন্ধ্যায় আপনাকে রোগীর গাড়ি থেকে নিয়ে এসেছি। তারপর রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়েছি। রাতে একটিবার ঘুম পর্যন্ত ভাংগেনি স্যার।

তাহলে তুমি গাড়ি নিয়ে যাওনি?

না স্যার, আমি যাইনি।

যাও দেখো তো আমার গাড়ি গ্যারেজে আছে কিনা?

কেন থাকবে না স্যার, আমি শোবার পূর্বে গাড়ি গ্যারেজে বন্ধ করে তবেই তো শুয়েছি।

বললুম যাও।

রজত বেরিয়ে যায়। একটু পরে ফিরে এসে বলে–স্যার গাড়ি তো গ্যারেজে নেই।

ডাক্তার সেন আপন মনেই বলে উঠেন-একি অদ্ভুত কাণ্ড। সব যে দেখছি ভূতুড়ে ব্যাপার!

রজত আর্তকণ্ঠে বলে উঠে-কি বলেন স্যার, সব ভূতুড়ে ব্যাপার? এ্যা, এসব স্বপ্ন দেখছি না তো?

দারোয়ান গুরু সিং বাংলা ভালো বলতে পারে না সত্য, কিন্তু বাংলা বুঝে সে সব। ভূতের নাম শুনে আঁতকে উঠে। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠে-হুজুর, কাহা ভূত?

ডাক্তার সেন রাগতভাবে বলেন–ভূত নেহি, ভূত নেহি, তুম লোগ ভূত…

হাম লোগ ভূত। হাম লোগ তো বহুৎ আচ্ছা আদমী। হুজুর, হাম লোগ ভূত নেহি-আদম।

ডাক্তার সেন কারো কথা কানে না নিয়ে ল্যাবরেটরীতে প্রবেশ করেন।

তখন পূর্ব আকাশে সূর্যোদয় হয়েছে।

দারোয়ান এবং ড্রাইভার কোন কিছু বুঝতে না পেরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নেয়।

ডাক্তার সেন কক্ষে প্রবেশ করে কোটের পকেট থেকে টাকার থলেটা বের করে খুলে ফেলেন, সত্যই ওতে টাকা আছে, না অন্য কিছু। থলে খুলে বিস্ময়ে হতবাক হন, কোথায় দু'শ টাকা-এক শ' করে প্রায় পঞ্চাশখানা নোট তাড়া করে বাঁধা রয়েছে। ডাক্তার সেনের চোখ দুটো উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠেছে। থলেটা আর একবার হাতড়ে দেখলেন– একি! ছোট্ট এক টুকরা কাগজ ভাঁজ করা রয়েছে। কাগজের টুকরাখানা মেলে ধরেন চোখের সামনে। কাগজে লেখা রয়েছে–

ডাক্তার সেন, আপনার পারিশ্রমিক
বাবদ পাঁচ হাজার টাকা রইল। গাড়ি
ঠিক সময় ফেরত পাবেন।
–দস্যু বনহুর

ডাক্তার সেন অস্ফুট শব্দ করে উঠেন-দস্যু বনহুর। তার হস্তস্থিত থলেটা খসে পড়ে ভূতলে। তিনি চিৎকার করে ডাকেন-দারোয়ান, দারোয়ান-পুলিশ-পুলিশ…..

ছুটে আসে দারোয়ান গুরু সিং, ছুটে আসে ড্রাইভার, আরও অনেকে। সবাই একবাক্যে বলে–কি হলো স্যার? কি হলো?

ডাক্তার সেনের দু'চোখ তখন কপালে উঠেছে। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলেন–দস্যু বনহুর-দস্যু বনহুর...

সবাই পিছু ফিরে ছুটতে শুরু করে, কেউ বা বলে–ওরে বাবা-দস্যু বনহুর!

এক মুহূর্তে গোটা বাড়িতে হুলস্থুল পড়ে যায়। যে যে দিকে পারে ছুটছে আর চলছে-দস্যু বনহুর! দস্যু বনহুর!

কার গায়ে কে পড়ছে ঠিক নেই। উঠছে আর পড়ছে, আর বলছে-দস্যু বনহুর....দস্যু বনহুর....

ডাক্তার সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মিঃ হেমন্ত সেনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে ধড়ফড় সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলো আর চিৎকার করে বলতে লাগলো-ব্যাপার কি? কি হয়েছে?

এমন সময় ডাক্তার সেনের স্ত্রী ছুটে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলেন–বাবা কি হবে! ল্যাবরেটরীতে দস্যু বনহুর এসেছে, দস্যু বনহুর এসেছে!

বলো কি মা, দস্যু বনহুর!

হ্যাঁ বাবা, এখন উপায়?

মা, তুমি ঘাবড়িও না, আমি এক্ষুণি পুলিশ অফিসে ফোন করছি। হেমন্ত পুনরায় সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়; নিজের কক্ষে ফিরে গিয়ে রিসিভারটা হাতে উঠিয়ে নেয়-হ্যালো, পুলিশ অফিস?

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন তখন পুলিশ সুপার মিঃ আহম্মদের ওখানে ছিলেন।

ডিটেকটিভ মিঃ শঙ্কর রাও তখন কোন কাজে পুলিশ অফিসে এসেছিলেন, তিনিই ফোন ধরলেন-হ্যালো!

ওপাশ থেকে ভেসে এলো মিঃ হেমন্ত সেনের কম্পিত কণ্ঠস্বর-আপনি কি ইন্সপেক্টর মিঃ হারুন কথা বলছেন?

না, তিনি বাইরে গেছেন, আমি শঙ্কর রাও কথা বলছি।

হেমন্তর গলা-আমাদের ল্যাবরেটরীতে দস্যু বনহুর হানা দিয়েছে।

শঙ্কর রাও আশ্চর্য কণ্ঠে বলে উঠেন-দস্যু বনহুর আপনাদের ল্যাবরেটরীতে.... দাঁড়ান আমি এক্ষুণি মিঃ হারুনকে ফোন করছি।

একটু শীঘ্র করুন...

পুলিশ সুপার মিঃ আহম্মদ এবং মিঃ হারুন ও মিঃ হোসেন চৌধুরী বাড়ি যাবার জন্য কেবলমাত্র দরজার দিকে পা বাড়িয়েছেন অমনি ফোনটা পিছনে বেজে উঠে-ক্রিং....ক্রিং....ক্রিং....

মিঃ আহম্মদ থমকে দাঁড়িয়ে রিসিভারটা হাতে উঠিয়ে নেন। রিসিভারে কান লাগিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তীব্র কণ্ঠে চিৎকার করে উঠেন-কি বললে, দস্যু বনহুর! ডাক্তার সেনের বাড়িতে দস্যু বনহুর..... আচ্ছা আমরা এক্ষুণি আসছি। রিসিভার রেখে বলে উঠেন-ইন্সপেক্টর, দেখেছেন দস্য বনহুরের সাহস! সে প্রকাশ্যে দিনের আলোতে ডক্টর সেনের ল্যাবরেটরীতে হানা দিয়েছে।

মিঃ হারুন বললেন-হানা সে দেয়নি। আমি পূর্বেই বলেছিলাম দস্যু বনহুর সাংঘাতিকভাবে ঘায়েল হয়েছে। এবার দেখুন সে চিকিৎসার জন্য লোকালয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে।

মিঃ আহম্মদ হুঙ্কার ছাড়েন-আর এক মুহূর্ত বিলম্ব নয়। চৌধুরীর ওখানে আর গিয়ে কাজ নেই। ইন্সপেক্টর, আপনি কিছু সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ-ফোর্স নিয়ে এক্ষুণি ডক্টর সেনের ল্যাবরেটরীতে গিয়ে হাজির হন। আমি মিঃ হোসেনকে নিয়ে অন্য পথে চললুম। মিঃ আহম্মদ আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে গাড়ি নিয়ে ছুটলেন।

অর্ধঘণ্টার মধ্যেই সশস্ত্র পুলিশ ফোর্স নিয়ে মিঃ হারুন উপস্থিত হলেন। অন্য পথে এসে হাজির হলেন পুলিশ সুপার স্বয়ং এবং মিঃ হোসেন। মুহূর্তে ডাক্তার সেনের বাড়ি এবং ল্যাবরেটরী পুলিশ বাহিনী ঘেরাও করে ফেলল।

পুলিশ সুপার এবং মিঃ হারুন গুলীভরা রিভলভার হস্তে ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় ল্যাবরেটরীতে প্রবেশ করলেন। মিঃ আহম্মদ বললেন-কোথায় দস্যু বনহুর?

ডাক্তার সেন তো অবাক! তিনি হতভম্বের মত উঠে দাঁড়ালেন। সমস্ত বাড়ি এবং ল্যাবরেটরীর চারিদিকে পুলিশ বাহিনী দেখে থ' মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মিঃ হারুন গম্ভীর কণ্ঠে গর্জে উঠলেন-দস্যু বনহুর কই?

ডাক্তার সেন উভয়ের উদ্যত রিভলবারের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে বলেন– কে বললো এখানে দস্যু বনহুর আছে?

শঙ্কর রাও-ও এসেছিলেন মিঃ হারুনের সঙ্গে, তিনি বলেন–আপনার পুত্র মিঃ হেমন্ত সেন পুলিশ অফিসে ফোন করেছিলেন।

কিন্তু....কিন্তু এখানে তো দস্যু বনহুর আসেনি ইন্সপেক্টর।

মিঃ আহম্মদ বজ্রকঠিন স্বরে বলেন–সেকি!

স্যার, আপনারা বসুন, আমি সব বলছি।

আমরা বসতে আসিনি ডাক্তার সেন, বলুন কোথায় দস্যু বনহুর? রাগত কণ্ঠে কথাটা বলেন মিঃ আহম্মদ।

অবশ্য তার রাগ হবার কারণও আছে। তাঁর মত উচ্চপদস্থ অফিসার কোনদিন কোন দস্যুর পিছনে ধাওয়া করেছেন কিনা সন্দেহ। শুধু দস্যু বনহুর তাকে এভাবে ঘাবড়ে তুলেছে। ঐ শয়তানটাকে ধরার জন্য আজ তিনি নিজে নেমে পড়েছেন।

মিঃ আহম্মদের চোখ দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। ডাক্তার সেন ভড়কে গেলেন, কণ্ঠে মিনতি মেখে বলেন–বসুন, আমি সব খুলে বলছি।

মিঃ হারুন, মিঃ আহম্মদকে লক্ষ্য করে বলেন–স্যার, ব্যাপারটা রহস্যজনক মনে হচ্ছে।

মিঃ আহম্মদ আসন গ্রহণ করলেন। ডাক্তার সেনও আর একটি চেয়ারে বসে রুমালে মুখ মুছতে লাগলেন।

মিঃ হারুন, মিঃ হোসেন এবং অন্যান্য সকলে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ডাক্তার সেন রাতের ঘটনা বিস্তারিত সব বলে গেলেন এবং দস্যু বনহুরের দেওয়া পাঁচ হাজার টাকা এবং সেই ছোট্ট কাগজের টুকরাখানা বের করে দেখালেন।

সব শুনে এবং দেখে বিস্ময়ে থ' বনে গেলেন সবাই। মিঃ আহম্মদ বলেন–ডক্টর সেন, আপনি কোন ক্রমেই সেই পথ চিনে নিতে পারেন নি?

না, একে অন্ধকার রাত, তদুপরি আমার চোখ কালো কাপড়ে মজবুত করে বাঁধা ছিল। সে বাড়ি যে শহরের কোন প্রান্তে বা কোন স্থানে, আমি কিছুই বলতে পারবো না। গাড়ি থেকে নামিয়ে ওরা আমাকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সে এক অদ্ভুত বাড়ি। বিরাট রাজপ্রাসাদের মত বাড়িটা। অমন সুন্দর বাড়ি আমি কোনদিন দেখিনি।

মিঃ আহম্মদ বলেন–ডক্টর সেন, দস্যু বনহুরের চিঠিতে জানতে পেরেছি, সে আপনার গাড়ি ফেরত দিতে আসবে।

শঙ্কর রাও বলে উঠেন-স্যার, সে তো নিজে আসবে না।

হ্যাঁ, সে নিজে আসবে না; আর আসবেই বা কেমন করে; সে তো আহত। নিশ্চয়ই তার কোন অনুচর আসবে।

শঙ্কর রাও পুনরায় বললেন-কৌশলে সেই অনুচরটিকে যদি বন্দী করা যায় তাহলে ওর মুখেই দস্যু বনহুরের আস্তানার খবর বের করে নেওয়া যাবে।

এমন সময় বাইরে মোটরের হর্ণ শোনা যায়।

অল্পক্ষণেই কক্ষে প্রবেশ করেন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর মিঃ মাকসুদ। লম্বা সেলুট ঠুকে বললেন-স্যার, আপনি আমাকে ডেকেছেন?

মিঃ হারুন বললেন-না তো, আপনাকে ডাকা হয়নি!

তবে যে ডাক্তার সেনের ড্রাইভার তার গাড়ি নিয়ে আমাকে আনতে গিয়েছিল?

ডাক্তার সেন বিস্ময়ভরা চোখে নিজের পাশে তাকিয়ে বলেন–এই তো আমার ড্রাইভার রজত।

মিঃ আহম্মদ উঠে দাঁড়ান-দেখুন ইন্সপেক্টর, শীঘ্র গাড়ির ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করে ফেলুন। নিশ্চয়ই ড্রাইভারের ছদ্মবেশে দস্যু বনহুরের অনুচর।

সবাই ছুটলেন গাড়ির পাশে।

কিন্তু গাড়ির নিকটে পৌঁছে সবাই হতবাক, গাড়িতে কোন ড্রাইভার বা কোন লোক নেই।

কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ বাইরে তখনও গুলীভরা রাইফেল হস্তে দণ্ডায়মান ছিল। মিঃ হারুন তাদের জিজ্ঞাসা করলেন-এ গাড়ির ড্রাইভার কোথায় গেল দেখেছো তোমরা?

ওদের একজন বললো–হ্যাঁ হুজুর আভি থা, লেকেন ওধার গেয়া...পেসাব-ওসাব করনে কে লিয়ে....

কিন্তু কোথায় কে-সব জায়গা তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো-কোথায় দস্যু বনহুরের অনুচর!

ডাক্তার সেন সকলের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন।

মিঃ হারুন জিজ্ঞাসা করলেন-এটাই আপনার গাড়ি?

ডাক্তার সেন স্থির স্বাভাবিক গলায় বললেন– হ্যাঁ, এটাই আমার গাড়ি।

সকলের মুখেই হতাশার ছায়া ফুটে উঠে।

দস্যু বনহুরের নিকটে এ একটি দারুণ পরাজয়।

মিঃ আহম্মদ নিজের গাড়িতে উঠে বসলেন।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন তাঁদের নিজ নিজ গাড়িতে ফিরে চললেন। সকলের মুখই গম্ভীর থমথমে, আষাঢ়ে মেঘের মতই অন্ধকার।

এতোক্ষণে ডাক্তার সেনের মুখে হাসি ফুটলো। এক রাতেই পাঁচ হাজার টাকা আর গাড়িখানাও ফেরত পেলেন-এ কম কথা নয়!

অবসন্ন দেহে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলো নূরী, খেয়াল নেই। চোখ মেলে তাকিয়ে আশ্চর্য হলো-বনহুরের বিছানা শূন্য; বিছানায় বনহুর নেই। নূরী চিন্তিত হলো, অসুস্থ অবস্থায় কোথায় গেল সে।

নূরী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। মন্থর গতিতে বেরিয়ে এলো বাইরে। মুক্ত আকাশের তলায় এসে দাঁড়ালো। হঠাৎ দেখতে পেলো বনহুর একটি পাথরখণ্ডে বসে রহমানের সঙ্গে কি সব আলোচনা করছে।

নূরী তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। রহমানের সঙ্গে বনহুরের কথাবার্তা শেষ হয়ে গিয়েছিল, ফিরে তাকালো বনহুর নূরীর মুখের দিকে।

নূরী ব্যথা-কাতর মুখে বললো–হুর, একটি দিনও কি তোমার বিছানায় শুয়ে থাকতে নেই?

চলো। বনহুর উঠে দাঁড়ায়।

নূরী বনহুরের হাত ধরে বললো–চলো।

তারপর ওকে সঙ্গে করে ফিরে এলো বনহুরের বিশ্রামাগারে। ওকে যত্ন করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বললো নূরী-এবার বলো তো, ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও কেন তুমি শয্যা ত্যাগ করেছিলে?

বনহুর নূরীর কথায় মৃদু হাসলো, তারপর বললো–নূরী তুমি বুঝবে না; আমার শুয়ে থাকলে চলবে কেন। তুমি তো ডাক্তার এনেই ক্ষান্ত-তারপর ওদিকের অবস্থা একবার ভেবে দেখেছ? ডাক্তার তো বাসায় ফিরে একেবারে মহা হুলস্থুল বাঁধিয়ে দিলেন। পুলিশে পুলিশে তাঁর গোটা বাড়ি ছেয়ে গেছে। পুলিশ মনে করেছে-দস্যু বনহুর বুঝি তার বাড়ি গিয়ে বসে আছে।

এতো খবর কি করে পেলে বনহুর?

রহমান ডাক্তারকে রাখতে গিয়ে সেই ভোর থেকে ওখানেই ছিল। এতোক্ষণে ডাক্তারের গাড়ি ফেরত দিয়ে তবে এলো।

বাপরে বাপ। রহমান তোমারই তো সহকারী।

তারপর গোটা দুটো দিন কেটে গেল। নূরী বনহুরকে কিছুতেই বিছানা থেকে উঠতে দিল না। সদা-সর্বদা বনহুরের পাশে বসে ওর সেবাযত্ন করত নূরী। নিজ হস্তে বনহুরের ক্ষত পরিষ্কার করে দিত। নিজ হস্তে দুধের বাটি তুলে ধরত ওর মুখে। ঔষধ খাওয়াত, মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াত।

একদিন হঠাৎ বনহুরের ঘুম ভেংগে গেল, তাকিয়ে দেখতে পেল–তার শিয়রে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে নূরী। নূরীর একখানা হাত তখনও বনহুরের মাথায় রয়েছে। নূরী বনহুরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে ঠিক নেই।

বনহুর ওর হাতখানা ধীরে ধীরে সরিয়ে রেখে উঠে বসলো। নূরীর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে তার ঠোঁটের কাছে একটু খানি হাসির রেখা ফুটে উঠে। করুণায় ভরে উঠলো বনহুরের মন। নূরীর গায়ে হাত রেখে ডাকলো–নূরী।

চমকে সোজা হয়ে বসলো নূরী–ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

নূরী!

বল?

এভাবে তুমি নিজকে কষ্ট দিচ্ছো কেন?

মৃদু হাসি নূরীর–কে বললো আমার কষ্ট হচ্ছে? হুর, তোমার সেবা করাই যে আমার জীবনের ব্রত!

বনহুর প্রদীপের ক্ষীণালোকে নূরীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সত্যিই নূরী তাকে কত ভালবাসে, কিন্তু তার এ ভালবাসার প্রতিদানে কি দিয়েছে সে নূরীকে! বনহুরের চোখ দুটো আর্দ্র হয়ে উঠে। দৃষ্টি নত করে নেয় বনহুর।

নূরী স্বাভাবিক গলায় বলে–হুর, কি হলো তোমার?

কিছু না নূরী।

একটা কিছু হয়েছে যা তুমি আমার কাছে গোপন করে যাচ্ছো?

বনহুর নিশ্চুপ।

নূরী বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে–হুর, আজও আমি তোমাকে চিনতে পারলুম না। কোথায় যেন কি হয়েছে তোমার!

একটি কথা তোমাকে বলবো যা তোমাকে ভীষণ আঘাত দেবে।

তোমার জন্য আমি সব আঘাত হাসিমুখে গ্রহণ করবো। তুমি বল?

আজ নয়, আর একদিন শুনো।

না, আজই তোমাকে বলতে হবে হুর–বল, বল তুমি?

নূরী, তুমি যা চাও, জীবনে হয়তো আমার কাছে তা পাবে না।

হুর!

হ্যাঁ নূরী, তোমার এ পবিত্র ভালবাসার বিনিময়ে আমি তোমায় কিছু দিতে পারিনি।

প্রতিদান তো আমি চাই না হুর, তোমাকে পেয়েছি এই আমার যথেষ্ট।

বনহুর নূরীর দীপ্ত উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়। আর কিছু বলার মত খুঁজে পায় না বা সাহস হয় না তার। নূরীর অপরিসীম ভালবাসাকে বনহুর প্রত্যাখ্যান করে চলেছে। তবু নূরীর মনে নেই এতোটুকু বিরক্তির আভাস বা সন্দেহের ছোঁয়াচ। বনহুর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল।

.

সেই রাত্রি ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে যখন জানতে পারলো মনিরা পুলিশ সুপার আহম্মদ এবং ইন্সপেক্টর সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিয়ে আজ রাতে দস্যু বনহুরকে আক্রমণ করেছিল এবং সে আহত অবস্থায় পালিয়ে গেছে। আরও শুনলো মনিরা, তাদের বাগানের পাশে দস্যু বনহুরের রক্ত তখনও জমাট বেধে রয়েছে।

মনিরার অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। তার মাথায় কে যেন বজ্রাঘাত করল।

চৌধুরী সাহেব যদিও অতি কষ্টে নিজকে সংযত করে রাখলেন, তবু তাঁর মনেও দারুণ ব্যথা অনুভব করলেন। মরিয়ম বেগম তো গোপনে অশ্রুবিসর্জন করে চললেন। নামাজের কক্ষে প্রবেশ করে কোরআন শরীফ খুলে বসলেন। চোর ডাকু দস্যু যাই হোক, তবু সে তাদের সন্তান। মায়ের প্রাণ আকুল হয়ে উঠল। খোদার দরগায় মোনাজাত করতে লাগলেন হে খোদা, আমার মনিরকে তুমি মঙ্গলমত রেখ!

মনিরা চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে চলল। না জানি ওর কোথায় গুলী লেগেছে? না জানি কেমন আছে। সে বেঁচে আছে কিনা, তাই বা কে জানে! অস্থির হৃদয় নিয়ে ছটফট করতে লাগলো। সে। বনহুরের এ দুর্ঘটনার জন্য সে–ই যেন দায়ী। কেন সে ওকে আসতে অনুরোধ জানিয়েছিল। তার সঙ্গে দেখা করবে বলেই তো আসছিল বনহুর। বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদে মনিরা। সে কান্নার যেন শেষ নেই। নিরুপায় মনিরা বনহুরের কোন সন্ধান জানে না–কোথায় থাকে সে। শহরের পূর্বের বাড়িখানা এখন আর বনহুরের নেই। পুলিশ সে বাড়িখানা দখল করে নিয়েছিল, এখন অবশ্য তার মামু চৌধুরী সাহেবের হেফাজতেই রয়েছে। তবে শহরের অন্য কোথাও যে বনহুরের কোন গোপন বাড়ি আছে, জানে মনিরা। কিন্তু কোথায় তা জানে না সে। বনহুরের এখনও দুটো নতুন মোটর গাড়ি রয়েছে। সে গাড়িগুলো শহরের সেই গোপন বাড়িখানাতেই থাকে। মনিরা অনেকদিন এ বাড়িখানার ঠিকানা চেয়েও জানতে পারেনি বনহুরের কাছে। নইলে সে এতোক্ষণ সেই বাড়িখানাতে গিয়ে হাজির হত।

একদিন দু'দিন করে যখন প্রায় সপ্তাহ কেটে গেল, তখন মনিরার অবস্থা মর্মান্তিক হয়ে পড়লো। নাওয়া খাওয়া নেই। পাগলিনীর মত হয়ে পড়লো মনিরা। চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগম চিন্তিত হলেন। যদিও তাঁদের মনেও দারুণ অশান্তি ছিলো, তবু মনিরার জন্য আরও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

মনিরা দিন দিন অসুস্থ হয়ে পড়লো। ওর মনে সদা ভয়–আর সে বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই আসতো কিংবা কোনো সংকেত জানিয়ে দিত–আমি ভাল আছি।

ক্রমে হতাশ হয়ে পড়লো মনিরা। সেই দিনের ফুলের মালাটা ছবির গলায় শুকিয়ে গেছে। ছবির দিকে তাকিয়ে মনিরার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

মনিরা ভাবে–শিশুকালে তার জীবন থেকে যে হারিয়ে গিয়েছিল, আবার কেনই বা সে ফিরে এসেছিল তাকে কি শুধু কাঁদাবার জন্যই এসেছিল ও!

এ কথা মিথ্যে নয়, যে নারী বনহুরকে ভালবেসেছে তাকেই কাঁদতে হয়েছে। কেউ ওকে ধরে রাখতে পারেনি কোন দিন। বনহুরকে কেউ মায়ার বন্ধনে বেঁধে রাখতে সক্ষম হয়নি। শুধু মনিরাই নয়, দস্যু বনহুরকে ভালবেসে অনেককেই কাঁদতে হয়েছে। কিন্তু বনহুরের মনে আজও কেউ রেখাপাত করতে পারেনি একমাত্র মনিরা ছাড়া।

তবু মনিরাকেও মাঝে মাঝে বিস্মৃত হয়ে যায় বনহুর। ভুলে যায় সে গোটা দুনিয়াকে, নিজের মধ্যে যখন চাড়া দিয়ে উঠে তার উন্মত্ত দস্যুভাব।

মনিরা যতই বনহুরের কথা চিন্তা করে চলে ততই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। জ্বর দেখা দেয় ওর শরীরে।

মরিয়ম বেগম স্বামীকে ডাক্তার ডাকতে বলেন। চৌধুরী সাহেব তাঁর বাল্যবন্ধু ডাক্তার সেনকে কল করলেন।

ডাক্তার সেন এলেন এবং মনিরাকে পরীক্ষা করে বললেন, অসুখ এর শরীরে নয়, মনে। কাজেই এর জ্বরটা স্বাভাবিক নয়। তবু আমি ঔষধপত্র দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি প্রেসক্রিপশন করে উঠতে যান ডাক্তার সেন।

চৌধুরী সাহেব ডাক্তার সেনের তাড়াহুড়ো দেখে বলেন, এতো ব্যস্ত হচ্ছো কেন জয়ন্ত? অনেকদিন পর এসেছ, তবু স্বেচ্ছায় নয়, ডেকে এনেছি; অথচ চা না খেয়ে যেতে চাও?

না ভাই, আজ আমি বিলম্ব করতে পারছিনে, দেখছো তো সন্ধ্যা হয়ে এলো। আর একদিন সকাল সকাল আসবো।

হেসে বললেন চৌধুরী সাহেব, রাতকে এতো ভয় কেন ডাক্তার?

ডাক্তার সেন ভয়াতুর কণ্ঠে বলে উঠলেন–রাতকে আমি খুব ভয় করি।

তার মানে?

সেদিন যা এক বিভ্রাটে পড়েছিলুম।

কি হয়েছিল?

সাংঘাতিক এক কাণ্ড! শোন তবে বলছি–কিছুদিন আগে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে। রাতে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়েছি, হঠাৎ তিনটে কিংবা সাড়ে তিনটে হবে একটি যুবক গাড়ি নিয়ে হাজির। সাংঘাতিক এক্সিডেন্ট; এক্ষুণি যেতে হবে। জানোই তো, আমি রাতে কোথাও যাইনে। তবু যুবক নাছোড় বান্দা। বাধ্য হয়েই গেলুম। তারপর কি জানো, সে এক বিস্ময়কর ঘটনা।

চৌধুরী সাহেব বললেন–তোমার কাহিনীটা দেখছি বেশ রস পদ ধরনের। যাক চা খেতে খেতেই শোনা যাবে। চলো হল ঘরে যাই। তারপর বৃদ্ধ চাকর নকিবকে ডাকতে শুরু করেন তিনি–নকিব, নকিব.....

একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে নকিব এসে দাঁড়ালো।

চৌধুরী সাহেব ওর দিকে তাকিয়ে প্রথম আশ্চর্য কণ্ঠে বললেন–সেকি, এই গরমের দিনে কম্বল কেন গায়ে দিয়েছিস?

কাঁপা গলায় বললো নকিব–জ্বর হয়েছে।

তবে তুই এলি কেন?

আপনি যে ডাকলেন!

শোন, বাবুর্চিকে বল হলঘরে দুকাপ চা আর নাস্তা পাঠিয়ে দিতে। আর শোন এই ঔষধটা দেখছিস-এটা এক্ষুণি মনিরাকে এক দাগ খাইয়ে দে।

আচ্ছা।

চৌধুরী সাহেব আর ডাক্তার সেন মনিরার কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান।

বৃদ্ধ নকিব এবার টেবিল থেকে ঔষধের শিশি আর ছোট্ট গেলাসটা হাতে তুলে নিয়ে মনিরার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

মনিরা খেঁকিয়ে উঠে–ভাগ হতভাগা, ঔষধ আমি খাব না।

নকিব দাঁড়ি নেড়ে বললো–খেতেই হবে তোমাকে।

আবার কথা বলছিস...

নকিব তবু গেলাসে ঔষধ ঢাললো।

মনিরা ওর হাত থেকে ঔষধ নিয়ে ঢেলে ফেললো পাশের ফুলদানিতে; তারপর বললো– আমি বলছি আমার কোন অসুখ হয়নি, তবু ঔষধ খেতে হবে।

নকিব এক নজরে তাকিয়ে ছিল মনিরার মুখের দিকে।

মনিরা বলে উঠে–অমন হা করে আমার মুখে কি দেখছিস শুনি?

তোমায় দেখছি আপামনি...

বের হয়ে যা বলছি ...

যাচ্ছি যাচ্ছি আপামনি, কিন্তু ...

আর কিন্তু নয়, শীগগির বের হয়ে যা।

নকিব বেরিয়ে যায়, যাবার আগে আর একবার মনিরার দিকে ফিরে তাকায়।

নকিব বেরিয়ে যেতেই, মনিরা শয্যা ত্যাগ করে চুপি চুপি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসে, তারপর সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়াল দরজার আড়ালে।

ডাক্তার সেন বলছেন–গাড়িখানা আমাকে নিয়ে শহরের এক গলিপথে গিয়ে পড়লো। ঠিক সেই মুহূর্তে পিঠে একটা ঠান্ডা কিছু অনুভব করলুম; ফিরে দেখি, যুবকটা আমার পিঠে রিভলবার চেপে ধরেছে।

চৌধুরী সাহেব ভয়ার্ত কণ্ঠে প্রতিধ্বনি করে উঠেন বল কি?

এমন সময় নকিব চায়ের ট্রে হস্তে মনিরার পিছনে এসে দাঁড়ায়-দরজা ছাড়ুন আপামনি, চা নাস্তা নিয়ে যাব।

চমকে সরে দাঁড়ায় মনিরা, ঠোঁটের উপর আংগুল চাপা দিয়ে বলে–চুপ! খবরদার, আমার কথা বলবিনে।

না গো না, বলবো না। কিন্তু এখানে লুকিয়ে কি শুনছো?

সে তুই বুঝবিনে, তুই যা।

নকিব একবার আড়নয়নে মনিরার দিকে তাকিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে।

ডাক্তার সেন বলে চলেছেন–আমি বিবর্ণ হয়ে গেলাম। তখন আমার মনের অবস্থা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। ধীরে ধীরে হাত তুলে বসলাম। যুবক এবার আমার চোখে একটা কালো রুমাল দিয়ে পট্টি বেঁধে দিল। আরও কিছুক্ষণ গাড়ি চলার পর আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নেওয়া হল। আমি ভয়ানক ঘাবড়ে গেছি দেখে যুবক আমাকে অভয় দিচ্ছিলো, ভয় নেই, আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করলেন চৌধুরী সাহেব–তারপর?

তারপর আমাকে একটি ঘোড়ায় চাপিয়ে নেওয়া হলো। যখন আমার চোখের বাঁধন খুলে দেওয়া হলো তখন দেখলুম, সুন্দর সজ্জিত একটি কক্ষমধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। বাড়িটা যে কোথায়, শহরের কোন প্রান্তে, কিছুতেই বুঝতে পারলুম না। সম্মুখে তাকিয়ে আরও আশ্চর্য হলুম–আমার সামনে শয্যায় শুয়ে এক যুবক। অদ্ভুত সুন্দর তার চেহারা। আমি তাকে ইতোপূর্বে কোথাও দেখেছি বলে মনে হলো না....

নকিব চায়ের ট্রে হাতে দাঁড়িয়েছিল এতোক্ষণ এক পাশে। চৌধুরী সাহেব বলে উঠলেন– হা করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন। চা নাস্তা এনেছিস?

হ্যাঁ! রাখব?

রাখবি নাতো কি দাঁড়িয়ে থাকবি?

নকিব চায়ের কাপ আর নাস্তার প্লেট টেবিলে সাজিয়ে রাখছিল। চৌধুরী সাহেব বলে উঠলেন–কম্বলটা খুলবিনে আজ?

নকিব বলে উঠলো–বড্ড শীত করছে।

তবে ডাক্তারকে হাতটা দেখানা। ঔষধ পাঠিয়ে দেবে।

না, না ওসব জ্বর-ঔষধ লাগবে না সাহেব। একটু তেঁতুল গোলা পানি খেলেই সেরে যাবে।

যা তবে এখান থেকে।

বেরিয়ে যায় নকিব।

চৌধুরী সাহেব নিজে একটি কাপ হাত উঠিয়ে নিয়ে বললেন– নাও আরম্ভ কর। খেতে খেতেই গল্প শোনা যাবে।

ডাক্তার সেনও চায়ের কাপ তুলে নেন।

চৌধুরী সাহেব বলে উঠলেন–সেকি, ওগুলো খাবে না?

ভাই, বিকেলে পেট পুরে নাস্তা করেছি। চা টুকু খাব।

আচ্ছা, তাই খাও।

ডাক্তার সেন চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন—

হ্যাঁ, কি বলছিলুম যেন?

চৌধুরী সাহেব বললেন–ইতোপূর্বে তাকে কোথাও দেখনি বলে তোমার মনে হলো….

হ্যাঁ, তাকে কোথাও দেখিনি। যে তরুণ আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল সে বললো– এই যে রোগী-আপনি দেখুন। আমি দেখলুম, যুবকের বাম হস্তে আঘাত লেগেছে এবং আঘাতটা স্বাভাবিক নয়–গুলীর আঘাত।

চৌধুরী সাহেব ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছেন; তিনি ডাক্তার সেনের কথায় বেশ বুঝতে পারলেন, যার কথা ডাক্তার সেন বলে চলেছেন, সে–ই তার পুত্র মনির

এবং পুলিশের গুলীতে সে ই আহত হয়েছে। তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন– তারপর কেমন দেখলে তাকে?

দেখলুম প্রচুর রক্তপাত হয়েছে তার শরীর থেকে …

মনিরা নিজের অজ্ঞাতে কখন যে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করেছে সে নিজেই জানে না, ব্যাকুল কণ্ঠে। জিজ্ঞাসা করে থামলেন কেন ডাক্তার সাহেব বলুন–বলুন…

চৌধুরী সাহেব বিস্ময়ভরা চোখে তাকান ভগিনীর মুখে– তুমি আবার এখানে এলে কেন মা?

ডাক্তার সেনও চশমার ফাঁকে অবাক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, মেয়েটি অসুস্থ শরীর নিয়ে কখন আবার এলো। তবু তিনি বলে চললেন.. আঘাতটা তার সাংঘাতিক হয়েছিল। কেউ তাকে গুলীবিদ্ধ করে হত্যা করতে চেয়েছিল….

মনিরা ব্যাকুল আগ্রহে বলে উঠে– তারপর ডাক্তার সাহেব? তারপর? সে ভালো আছে তো?

ডাক্তার সেন বলতে বলতে থেমে পড়লেন। তিনি বিস্ময়ভরা গলায় বলেন চৌধুরী। সাহেব, আপনার ভগিনীকে বড় উত্তেজিত মনে হচ্ছে, ব্যাপার কি?

পরে তোমাকে সব বলবো। তুমি বলে যাও জয়ন্ত তাকে কেমন দেখলে?

ডাক্তার সেন চৌধুরী সাহেবের কণ্ঠের উদ্বিগ্নতায় মনে মনে আশ্চর্য হলেন। তবুও তিনি বলতে শুরু করলেন–রোগী পরীক্ষা করে দেখলুম তার জন্য প্রচুর রক্তের প্রয়োজন। যে তরুণ আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল সেই রক্ত দিল। প্রচুর রক্ত সে দিল–আশ্চর্য, তরুণটি এতোটুকু ঘাবড়ালো না। তারপর আমি সুন্দর করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলুম।

চৌধুরী সাহেব বলে উঠলেন–সে তো আরোগ্য লাভ করবে?

এবার ডাক্তার সেনের মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠে, বলেন তিনি–চৌধুরী তুমি তার আসল পরিচয় জানো না, তাই অতো আগ্রহান্বিত হচ্ছে। আগে যদি জানতুম কে সে, তাহলে–তাহলে আমার কাছে যে মারাত্মক ইনজেকশান ছিল তারই একটি এম্পল–বাস, তাহলেই একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যেতো…

হঠাৎ মনিরা আর্তকণ্ঠে একটা শব্দ করে উঠে–উঃ।

ঢোক গিলে বলেন চৌধুরী সাহেব–কেন, কেন তুমি তাকে হত্যা করবে ডাক্তার। সে তোমার কাছে কি অপরাধ করেছিল?

জানো না চৌধুরী কে কে সে, যাকে অহরহ পুলিশ বাহিনী অনুসন্ধান করে চলেছে। যে দস্যুর ভয়ে আজ গোটা দেশবাসী প্রকম্পমান, যে দস্যু হাঙ্গেরিয়া কারাগার থেকে পালিয়েছে– ঐ যুবক সেই দস্যু বনহুর।

চৌধুরী সাহেব এটা পূর্বেই অনুমান করেছিলেন। তিনি ডাক্তার সেনের কথায় এতোটুকু চমকান না। স্থির কণ্ঠে বললেন–ডাক্তার বিনা দোষে একটি সুন্দর জীবন নষ্ট করতে তোমার হাত কাঁপতো না।

হেসে উঠেন ডাক্তার সেন–যে দস্যুকে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় পুলিশের নিকটে পৌঁছাতে পারলে লাখ টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে, তাকে হত্যা করতে হাত কাঁপবে–কি যে বল?

ডাক্তার, লাখ টাকা লাখ টাকা আমি তোমায় দেব, তুমি আমাকে ঐরকম একটি সন্তান এনে দিতে পার? এক লাখ দু'লাখ যা চাও তাই দেব, তবু পারবে–পারবে অমনি একটি জীবন আমাকে এনে দিতে?

চৌধুরী তুমি দস্যু বনহুরকে চেনো না, তাই ওসব বলছো।

ডাক্তার ওকে আমি যেমন চিনি তেমনি আর কেউ চেনে না। দস্যু বনহুর আমার সন্তান....

চৌধুরী! ডাক্তার সেনের দু'চোখ কপালে উঠে।

চৌধুরী সাহেব বলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ ডাক্তার, তোমার কাছে আমার যে সন্তানের গল্প করেছিলুম, ঐ আমার হারিয়ে যাওয়া রত্ন।

সত্যি বলছো?

হ্যাঁ, সত্যি বলছি।

ডাক্তার সেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন চৌধুরী সাহেবের মুখের দিকে।

নকিব তখন টেবিল থেকে চায়ের কাপগুলো উঠিয়ে নিচ্ছিলো।

ডাক্তার সেন চৌধুরী বাড়ি থেকে বিদায় গ্রহণ করে বাসায় না ফিরে সোজা চললেন পুলিশ অফিসে। দস্যু বনহুর চৌধুরী পুত্র–এতোবড় একটা কথা তিনি কিছুতেই হজম করতে পারছিলেন না! বাল্যবন্ধু হয়েও ডাক্তার সেন চললেন তাঁর ক্ষতিসাধন উদ্দেশ্যে। ভাবলেন, এই কথাটা পুলিশকে জানিয়ে কিছুটা বাহাদুরী নেবেন।

ডাক্তার সেনকে হন্তদন্ত হয়ে পুলিশ অফিসে প্রবেশ করতে দেখে এগিয়ে আসেন মিঃ হারুন ব্যাপার কি ডাক্তার সেন?

ডাক্তার সেন চাপা কণ্ঠে বলেন–একটা গোপন কথা আছে।

কি কথা, দস্যু বনহুর আবার আপনার ল্যাবরেটরীতে এসে ছিল নাকি?

এমন সময় ডাক্তার সেনের ড্রাইভার এসে বলে–স্যার আপনার সিগারেট কেসটা...

ডাক্তার সেন পকেট হাতড়ে বলেন– তাইতো দাও।

ড্রাইভার বেরিয়ে যায়। যাবার সময় তার মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠে।

ডাক্তার সেন সিগারেট কেসটা পকেটে রেখে বলেন–দস্যু বনহুর আমার ল্যাবরেটরীতে আসেনি। কিন্তু তার চেয়েও অত্যধিক বিস্ময়কর ঘটনা।

বলেন কি? দস্যু বনহুরের আবির্ভাবের চেয়েও বিষ্ময়কর ঘটনা?

হ্যাঁ। চলুন কোন গোপন স্থানে গিয়ে বসি। কথাটা যাতে কেউ শুনতে না পায়।

উঠে দাঁড়ান মিঃ হারুন–চলুন।

মিঃ হারুন ও ডাক্তার সেন পাশের কক্ষে গিয়ে মুখোমুখি বসলেন। ডাক্তার সেন কক্ষের চারিদিকে তাকিয়ে বললেন–দেখবেন কথাটা আমি বলছি-এ কথা যেন কেউ জানতে না পারে বা প্রকাশ না পায়।

না না, তা পাবে না, আপনি নিঃসন্দেহে বলতে পারেন।

কারণ সে আমার বাল্যবন্ধু। হাজার হলেও আমি প্রকাশ্যে তার অন্যায় করতে পারিনে। সে তাহলে মনে ভীষণ ব্যথা পাবে।

আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন ডক্টর সেন। আপনার বিষয়ে কোন কথাই প্রকাশ পাবে না।

সত্যি ইন্সপেক্টর আমি ভাবতেও পারিনি এটা সম্ভব। এ যে একেবারে কল্পনাতীত।

বলুন না কি বলতে চান? এবার মিঃ হারুনের কন্ঠে বিরক্তির ছাপ।

চৌধুরী সাহেবকে চেনেন তো?

হ্যাঁ, তাঁকে না চেনে এমন জন আছে বলুন?

চৌধুরী সাহেব আমার বাল্যবন্ধু ....

একথা আপনি পূর্বেই বলেছেন।

আমি তাকে অত্যন্ত ভালবাসি এবং সমীহ করি তাই..

দেখুন যা বলতে এসেছেন তাই বলুন ডক্টর সেন। সময় আমাদের অতি অল্প কিনা!

হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলবো কিন্তু দেখবেন আমিই যে কথাটা বলেছি একথা যেন চৌধুরী সাহেব জানতে না পারে।

পারবে না, পারবে না বলুন।

দস্যু বনহুর চৌধুরী সাহেবের সন্তান। কথাটা বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন মিঃ হারুনের মুখের দিকে।

কিন্তু মিঃ হারুনের মুখোভাবে এতোটুকু পরিবর্তন দেখা গেল না। কারণ একথা নতুন নয়। পুলিশ মহলে সবাই একথা জানেন। দস্যু বনহুর যে চৌধুরী সাহেবের একমাত্র হারিয়ে যাওয়া সন্তান মনির–একথা আজ নতুন শোনেন নি। কাজেই

তিনি মৃদু হেসে বললেন–ডক্টর সেন, আপনি যে এতো কষ্ট করে এই কথা জানাতে এসেছেন এজন্য আমি দুঃখিত। কারণ একথা আমরা পূর্ব হতেই জানি।

বিস্ময়ভরা গলায় বলে উঠেন ডাক্তার সেন–জানেন! দস্যু বনহুর চৌধুরী পুত্র–এ কথা আপনারা জানেন?

হ্যাঁ ডক্টর সেন শহরবাসিগণ না জানলেও পুলিশ মহল একথা জানে।

আপনারা জেনেও চৌধুরীকে কিছু বলছেন না কেন?

পুত্রের অপরাধে পিতা অপরাধী নয় ডাক্তার সেন। আপনার পুত্র যদি খুনী হয় তার জন্য আপনাকে আমরা ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাতে পারিনে। উপরন্তু সে এখন তার বাড়ির লোক নয়। আপনি আসতে পারেন।

ডাক্তার সেনের মুখমণ্ডল মলিন বিষণ্ন হয়ে পড়লো। মনে মনে লজ্জিতও হলেন তিনি। ভেবেছিলেন, মস্ত একটা বাহাদুরী পাবেন কিন্তু উল্টো ফল ফললো। উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার সেন... আচ্ছা, চলি তা হলে।

আচ্ছা আসুন। মিঃ হারুনও উঠে দাঁড়ালেন–গুড নাইট।

ডাক্তার সেন চলতে চলতে বলেন–গুড নাইট।

ডাক্তার সেন গাড়ির নিকটে পৌঁছতেই ড্রাইভার গাড়ির দরজা খুলে ধরে। ডাক্তার সেন পিছন আসনে উঠে বসে বলেন–আমার ল্যাবরেটরীতে চললো।

আচ্ছা। ড্রাইভার তার আসনে উঠে বসে ষ্টার্ট দেয়।

গাড়ি ছুটে চলেছে। ডাক্তার সেনের মনে একটা গভীর চিন্তাধারা বয়ে যাচ্ছিলো। তিনি অন্যমনস্কভাবে গাড়িতে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন।

হঠাৎ ব্রেক কষার শব্দে সম্বিত ফিরে পান ডাক্তার সেন। একি! এ যে এক অন্ধকার গলিপথ।

ডাক্তার সেন বলেন–ড্রাইভার এ কোথায় এসে পড়েছ?

ততক্ষণে ড্রাইভার নেমে এসেছে গাড়ির পাশে। অন্ধকারে চক চক করছে তার হস্তে কালোমত একটা কি যেন। যদিও জিনিসটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না, তবু ডাক্তার সেন বুঝতে পারলেন সেটা কি। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠে তার মুখমণ্ডল। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলেন–ড্রাইভার, তোমার মতলব?

চাপা কণ্ঠে বলে উঠে ড্রাইভার–নেমে আসুন।

ডাক্তার সেন চমকে উঠলেন, এ তো তাঁর ড্রাইভারের গলার আওয়াজ নয়, তবে কে–কে এ লোক তাঁর ড্রাইভারের বেশে তাঁর সঙ্গে ছলনা করছে! রাগত কণ্ঠে বললেন–কে তুমি?

অন্ধকারে একটা হাসির শব্দ শোনা যায়–আমি কে, জানতে চান?

হ্যাঁ, বল কে তুমি?

যার কথা এই মাত্র পুলিশ অফিসে বলে এলেন–আপনার বন্ধু-সন্তান।

দস্যু বনহুর?

হ্যাঁ ডাক্তার সেন, সেদিন আপনি যে ভুল করেছেন তার জন্যই প্রস্তুত হয়ে এসেছি, যদি আমার পরিচয় সেদিন জানতেন তবে একটি ইনজেকশান– তা হলেই বাস আমাকে আপনি ঠান্ডা করে দিতেন না?

এসব তুমি কি করে জানলে?

আপনার পাশেই তখন ছিলুম আমি, যখন আপনি চৌধুরী সাহেবের নিকট কথাবার্তা বলছিলেন–

বল কি? কই কোথাও তো তোমাকে দেখলুম না?

নকিব! নকিবকে দেখেছিলেন?

তুমি–তুমিই নকিবের বেশে…

হ্যাঁ ডাক্তার সেন। যাক যা বলার জন্য এখানে এসেছি, বলছি শুনুন।

ঢোক গিলে বলেন ডাক্তার সেন–বল?

আমার হাতের ক্ষত, এখনও সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়নি, এখন কি করতে হবে দেখবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, কোনো রকম চালাকি করতে গেলে মরবেন। চলুন আপনার ল্যাবরেটরীতে।

গাড়ি যখন ডাক্তার সেনের ল্যাবরেটরীর সম্মুখে গিয়ে পৌঁছল, তখন রাত প্রায় একটা বেজে গেছে। কারণ, রাত বাড়াবার জন্যই বনহুর রাস্তার অলিগলি ঘুরেফিরে বিলম্ব করে তবেই এসেছে।

ল্যাবরেটরীতে প্রবেশ করে ডাক্তার সেন তাঁর ঔষধের বাক্স খুললেন। তারপর বনহুরকে একটা সোফায় বসতে বলে চারিদিকে তাকালেন, মনোভাব–হঠাৎ যদি এই সময় কেউ এসে পড়তো তাহলে বনহুরকে হাতেনাতে ধরে লাখ টাকা পুরস্কার পেতেন।

বনহুর ডাক্তার সেনের মনোভাব বুঝতে পেরে হেসে বলে ডাক্তার সেন, আপনি ডাক্তার, আপনার কর্তব্য রোগীর চিকিৎসা করে তাকে আরোগ্য করে তোলা। আপনি তার জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবেন। কিন্তু কোন রকম চালাকি করতে গেলে...

না না, আমি দেখছি। ডাক্তার সেন বনহুরের হাতখানা তুলে নিয়ে পট্টি খুলতে থাকেন। ক্ষত পরীক্ষা করে বলেন– এই তো সেরে গেছে, আর সামান্য ক'দিন– তাহলেই সম্পূর্ণ সেরে যাবে। মনোভাব গোপন করে ঔষধ লাগিয়ে পুনরায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দেন।

বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে একশত টাকার দু'খানা নোট বের করে টেবিলে রাখে, তারপর রিভলবার উদ্যত করে পিছু হটে বেরিয়ে যায়।

ডাক্তার সেন হতভম্বের মত তাকিয়ে থাকেন। দস্যু বনহুর দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

.

সুভাষিনীকে নিয়ে বড় দুশ্চিন্তায় পড়লো চন্দ্রাদেবী। বাড়ির আর কেউ না জানুক চন্দ্রাদেবী জানে-সুভাষিনীর কি হয়েছে। আজ কতদিন হলো সুভাষিনী

ধ্যানস্থার মত স্তব্ধ হয়ে গেছে।

সুভাষিনীর পিতা মনসাপুরের জমিদার বাবু কন্যার জন্য ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। মা জ্যোতির্ময়ী দেবীর অবস্থাও তাই। সমস্ত মনসাপুরে জমিদার কন্যার এই অদ্ভুত অসুস্থতার কথা ছড়িয়ে পড়লো। সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লো। ডাক্তার বৈদ্য সুভাষিনীর কিছুই করতে পারলো না।

একদিন চন্দ্রাদেবী শাশুড়ির নিকটে গিয়ে বললো–মা, সুভার জন্য এতো চিন্তা ভাবনা করে কোন ফল হবে না। ওর অসুখ শরীরের নয়–মনের। কন্যার যদি মঙ্গল চান তবে ওর বিয়ের ব্যবস্থা করুন।

জ্যোতির্ময়ী দেবী পুত্রবধুর কথাটা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলেন–এ কথা মিথ্যে নয়। ডাক্তার বৈদ্য সবাই বলেছেন মেয়ের কোন রোগ নেই, অথচ দিন দিন সে এমন হয়ে যাচ্ছে কেন। এবার তিনি যেন অন্ধকারে আলোর সন্ধান পেলেন। হ্যাঁ, বিয়ে দিলে হয়তো ওর মনের অবস্থা ভালো হবে। স্বামীকে কথাটা তিনি জানালেন।

জমিদার বজ্রবিহারী রায় কথাটা ফেলতে পারলেন না। এতোদিন তিনি এ বিষয়ে চিন্তাই করেননি। পিতা মাতা মনে করতেন তাঁদের কন্যা এখনও বালিকা রয়েছে। অবশ্য এ ধারণার কারণ ছিল অনেক। একে একমাত্র কন্যা, তারপর সুভাষিনী ছিল খুব আদুরে এবং চঞ্চলা– পিতামাতার কাছে সে ছোট্ট বালিকার মতই আব্দার করত। যাক, এবার বজ্রবিহারী রায় সুপাত্রের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করলেন।

জমিদার কন্যা, উপরন্তু অপরূপ রূপবতী সুভাষিনীর জন্য সুপাত্রের অভাব হলো না। মাধবগঞ্জের জমিদার বিনোদ সেনের পুত্র মধু সেনের সঙ্গে সুভাষিনীর বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল।

সেদিন দ্বিপ্রহরে চন্দ্রাদেবী নিজের ঘরে কোন কাজে ব্যস্ত ছিল, এমন সময় সুভাষিনী তার কক্ষে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিল।

হেসে বললো চন্দ্রাদেবী–সুভা, ওকি হচ্ছে? আমাকে এভাবে ঘরে আটকাবার মানে কি?

সুভাষিনী গম্ভীর বিষণ্ন কণ্ঠে বললো–বৌদি, এসব তোমরা কি করছো?

তার মানে?

–ন্যাকামি কর না। আমি জানি, এসব তোমারই চক্রান্ত।

সুভা বস তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে। হাত ধরে সুভাষিনীকে পালঙ্কে বসিয়ে নিজেও বসে পড়ে চন্দ্রাদেবী তার পাশে। আচ্ছা সুভা, যাকে কোনদিন পাবিনে তার জন্য জীবন উৎসর্গ করে দিবি?

এ প্রশ্ন কি তুমি আজ নতুন করছো বৌদি? তোমাকে আমি বলেছি, আমার গোটা অন্তর জুড়ে ঐ একটি মাত্র প্রতিচ্ছবি আঁকা হয়ে রয়েছে যা কোনদিন মুছবার নয়।

সুভা, খামখেয়ালিপনার একটা সীমা আছে। বিয়ে তোকে করতেই হবে। তখন দেখবি সব ধীরে ধীরে ভুলে যাবি। তাছাড়া তুই যা তা ঘরের মেয়ে নস্–সামান্য একজন দস্যুকে ভালবাসা তোর শোভা পায় না।

বৌদি।

সুভা, বিয়ে তোকে করতেই হবে। বিনোদ সেনের পুত্র মধু সেনকে আমি নিজের চোখে দেখেছি। চমৎকার চেহারা, স্বভাব চরিত্র ভালো...

চন্দ্রাদেবীর কথাগুলো সুভাষিণীর কানে পৌঁছাচ্ছিল না। সে নিশ্চুপ বসে রইল; দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো অশ্রুধারা।

যতই বিয়ের দিন এগিয়ে আসতে লাগলো, ততই সুভাষিণী মরিয়া হয়ে উঠলো। বনহুরের মুখখানা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে লাগলো তার হৃদয়পটে। সুভাষিণী এ বিয়ে কিছুতেই করবে না–যেমন করে হোক, বিয়ে তাকে বন্ধ করতে হবে। কিন্তু কি করে বন্ধ করবে সে।

বাড়ির সবাই একমত। একমাত্র বৌদি ছিল তার ভরসা সেও এখন তার বিপক্ষে। কি করে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

সুভাষিণী জানে যাকে নাকি ধ্যান করা যায়, একদিন না একদিন তার দর্শনলাভ ঘটে। সুভাষিণী কিছু চায় না, শুধু আর একটি দিন তার দেখা পাবে,

এই আশায় বুক বেঁধে প্রতীক্ষা করছে সে। সুভাষিণী বলেছিল, আবার কবে আপনার দেখা পাব? জবাবে বলেছিল বনহুর ঈশ্বর

করুন আবার যদি এমনি কোন বিপদে পড়েন তখন ..মুহূর্তে সুভাষিণীর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠে। বিপদই তাকে বেছে নিতে হবে। পালাবে সুভাষিণী। যেদিকে তার দুচোখ যায় পালাবে সে। তাহলে এ বিয়ে থেকে ও পরিত্রাণ পাবে। ...

সুভাষিণী বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে। দুর্ভেদ্য অন্ধকার গোটা পৃথিবীটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আকাশে মেঘ জমাট বেঁধে রয়েছে–এই বুঝি আকাশটা ভেংগে বৃষ্টি নামবে।

সুভাষিণী বেরিয়ে পড়লো। কোনদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। দ্রুত এগিয়ে চললো সে। ভোর হবার পূর্বেই পিতার জমিদারী ছেড়ে পালাতে হবে, নইলে তার রেহাই নেই।

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো অবিরাম বৃষ্টি। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটাগুলো সুভাষিণীর শরীরে সঁচের মত বিধতে লাগলো। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সুভাষিণী দু'হাতে বুক চেপে ধরে ছুটতে লাগলো।

জমিদারের আদুরে কন্যা সুভাষিণী কোনদিন এতোটুকু দুঃখ সহ্য করেনি। এই রাতদুপুরে দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে সব দুঃখ ভুলে ছুটে চলেছে সে। কতদূর এসেছে কোন দিকে চলেছে, কোথায় চলেছে, কিছুই জানে না সুভাষিণী। বার বার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে সে। আবার উঠছে, আবার ছুটছে; ভাবছে কই সে যে বলেছিল, বিপদমুহূর্তে আবার তুমি আমার দেখা পাবে। কই-কই সে, কোথায় তার দেখা পাব।

কতদূর যে এসে পড়েছে সুভাষিণী নিজেই জানে না। বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশ পরিষ্কার। হয়ে এসেছে। সুভাষিণী ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে একটা গাছের তলায় বসে পড়ে। অতি পরিশ্রমে বৃষ্টি আর ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে দেহটা তার অবশ হয়ে এসেছিল, অল্পক্ষণেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললো সুভাষিণী।

যখন জ্ঞান ফিরলো চোখ মেলে দেখলো সে একটি বেডে শুয়ে আছে। পাশে দাঁড়িয়ে একটি নারী ও একটি পুরুষ কি সব কথাবার্তা বলছে। তাকে চোখ

মেলতে দেখে মেয়েটা বলে উঠল– ডক্টর ওর জ্ঞান ফিরে এসেছে।

এবার সুভাষিণী বুঝতে পারে–সে যেখানে এখন শুয়ে রয়েছে, সেটা একটা হসপিটাল। মেয়েটার শরীরে নার্সের ড্রেস আর ভদ্রলোকটি ডাক্তার, এ কথা সে একটু পূর্বেই নার্সের মুখের কথায় জানতে পেরেছে।

সুভাষিণী খুশি হতে পারলো না। সে তো বাঁচতে চায়নি চেয়েছিল মরতে, কিন্তু এখানে সে এলো কি করে!

ততক্ষণ ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করেছেন। পরীক্ষা শেষ করে বলেন– আর কোন ভয় নেই। আপনি ওকে গরম দুধ খেতে দিন।

নার্স গেলাসে খানিকটা গরম দুধ এনে সুভাষিণীকে খেতে দিল।

সুভাষিণী মুখ ফিরিয়ে নিলো না, আমি খাব না।

নার্স আশ্চর্য কণ্ঠে বললো–কেন খাবেন না?

না, আমি কিছু খাবো না।

নার্স হেসে বলে–ও বুঝতে পেরেছি। স্বামীর উপর অভিমান হয়েছে।

স্বামী!

হ্যাঁ, আপনার স্বামীই তো এখানে রেখে গেছেন আপনাকে।

সুভাষিণী অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে নার্সের মুখের দিকে।

নার্স বলে–আপনি দুধটুকু খেয়ে ফেলুন, কোন চিন্তা করবেন না। আপনার স্বামী এলে যাবেন।

এবার সুভাষিণী দুধটুকু এক নিঃশ্বাসে খেয়ে হাতের পিঠে মুখ মুছে বলে–আমি আপনার কথা বুঝতে পারছিনে।

সব বুঝতে পারবেন। আপনার স্বামী একটা চিঠি দিয়ে গেছেন আপনাকে দেবার জন্য। আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে চিঠিটা দেব।

সুভাষিণী ব্যাকুল কণ্ঠে বলে–আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছি। কই চিঠি দিন।

এখন নয়, পরে পাবেন।

না, না এখনই দিন।

কিন্তু এখন তো দেওয়া চলবে না।

দিন আমার অনুরোধ, আপনি দিন...

বুঝেছি স্বামীর চিঠি কিনা....দাঁড়ান এনে দিচ্ছি।

নার্স চলে যায়। একটু পরে একটা গভীর সবুজ রং-এর মুখ আঁটা খাম এনে সুভাষিণীর হাতে দেয়।

দুরু দুরু বক্ষে সুভাষিণী খামখানার মুখ ছিঁড়ে চিঠিটা বের করে মেলে ধরলো চোখের সামনে। মাত্র দু'লাইনে লেখা সুভাষিনী এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললো–

তোমাকে এভাবে দেখবো ভাবতে পারিনি। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যেও।

–দস্যু বনহুর।

সুভাষিণীর চোখ দুটো দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বার বার পড়ছে সে চিঠির দু'ছত্র লেখা। তার ডাকে এসেছিল সে। সাড়া দিয়েছিল..

নার্স বিস্ময় বিমুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে। হেসে বললো– আপনার স্বামীর সঙ্গে রাগারাগি হয়েছে বুঝি?

সুভাষিণী নার্সের প্রশ্নে তাকালো তার মুখে। তারপর আনমনা হয়ে যায়।

নার্স হেসে বলে–সত্যি আপনার স্বামী-ভাগ্য। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমন তার ব্যবহার।

অবিবাহিত নার্সের মনে হয়তো জানার বাসনা জাগে। জিজ্ঞাসা করে–চিঠিতে কি লিখেছেন উনি?

সুভাষিণী কাগজখানা ভাঁজ করে রেখে বলে–লিখেছেন, আসতে বিলম্ব হলে আমি যেন ঘাবড়ে না যাই।

অমন রাজপুত্রের মত স্বামী, একদণ্ড না দেখলে ঘাবড়াবার যে কথাই...

সুভাষিণী একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে–হুঁ।

.

বনহুর এসে পৌঁছতেই নূরী তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল–হুর, তুমি না বলেছিলে রাতেই ফিরে আসবে?

সে এক অদ্ভুত কাণ্ড নূরী! চলো বলছি।

কি এমন কাণ্ড হল? তোমার কাছে তো দিন-রাত অদ্ভুত কাণ্ডের সীমা নেই।

ঝর্ণার ধারে গিয়ে পাশাপাশি বসে নূরী আর বনহুর। নূরী হেসে বলে–এবার বলো তোমার অদ্ভুত কাণ্ডের কথা।

গত রাতে আমি কোথায় গিয়েছিলুম জান?

জানি, তুমি সেই শয়তান ডাকুর সন্ধানে জম্বুর বনে গিয়েছিলে।

হ্যাঁ, আমি নাথুরামের আড্ডার সন্ধানে জম্বুর বনে গিয়েছিলুম, কিন্তু গত রাতে সেখানে আড্ডা বসেনি। হয়তো শহরের কোন গোপন স্থানে সমবেত হয়েছে ওরা। ফিরে আসছিলুম, পথিমধ্যে বৃষ্টি শুরু হলো। পথ সঙ্কীর্ণ করার অভিপ্রায়ে জম্বুর বনের ভিতর দিয়ে তাজকে চালনা করছিলুম। বন পেরিয়ে মনসা গ্রামের পাশ কাটিয়ে আসছিলুম–তখন বৃষ্টি প্রায় ধরে এসেছে; মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে গ্রামের ভিতর দিয়ে আসা ঠিক হবে না, তাজের খুরের শব্দে গ্রামবাসীর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটতে পারে, তাই মনসাপুরের ওপাশে নাড়ুন্দি বনের ভিতর দিয়ে এগুতে লাগলুম। কিছুদূর এগিয়েছি হঠাৎ বিদ্যুতের আলোতে দৃষ্টি গিয়ে পড়লো একটা গাছের নিচে। কি যেন পড়ে রয়েছে। এগিয়ে গেলুম গাছটার দিকে। পুনরায় বিদ্যুৎ চমকালো, আশ্চর্য হলুম-বিদ্যুতের আলোতে দেখলুম একটি নারীমূর্তি পড়ে রয়েছে ভূতলে।

তারপর?

তারপর যখন তার আরও নিকটে পৌঁছলুম তখন আরও আশ্চর্য হলুম।

কেন?

মেয়েটি আমার পরিচিত।

তার মানে?

মানে, মনসাপুরের জমিদার কন্যা সুভাষিণী ...

সেই যুবতী, যাকে তুমি একদিন ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করে তাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলে?

হ্যাঁ।

তারপর কি করলে?

দেখলুম, সুভাষিণী সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছে।

তুমি বুঝি বসে রইলে তার পাশে?

না, তাকে তাজের পিঠে উঠিয়ে নিলুম।

সত্যি?

তা নয়তো কি মিথ্যে? তারপর বন থেকে বেরিয়ে এলুম। ততক্ষণে ভোর হয়ে এসেছে। একটা ট্যাক্সি ডেকে তাকে হসপিটালে ভর্তি করে দিয়ে এসেছি।

এই বুঝি তোমার অদ্ভুত কাণ্ড?

কেন অদ্ভুত নয়? রাত দুপুরে বনের মধ্যে একটি যুবতী মেয়ে...

আর রক্ষাকর্তা হিসেবে হঠাৎ তোমার আবির্ভাব ...

কি জানি নূরী, সবই যেন কেমন বিস্ময়কর ব্যাপার!

বনহুর আর নূরী কথাবার্তা বলছিল, এমন সময় রহমান আসে সেখানে–সর্দার।

বনহুর রহমানকে দেখে বলে–এসেছো; চলো।

নূরী প্রশ্ন করে–আবার কোথায় চললে হুর?

পরে জানতে পারবে। এসো রহমান।

বনহুর আর রহমান চলে যায়।

বনহুরের দরবার কক্ষ।

সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট দস্যু বনহুর। তার প্রধান সহচর রহমান পাশে দাঁড়িয়ে, এবং অন্যান্য অনুচর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে–তোমরা সবাই জান আজ আমাদের দেশ এক মহাসঙ্কটময় অবস্থায় উপনীত হয়েছে। প্রতিবেশী রাজ্য আমাদের রাজ্যের উপর জঘন্য হামলা চালিয়েছে।

জানি সর্দার।

যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। আজ আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য জান-প্রাণ দিয়ে দেশকে রক্ষা করা। শত্রুর কবল থেকে আমাদের মাতৃভূমিকে বাঁচিয়ে নেওয়া। আমরা জীবন পণ সমপর্ণ করে দেশকে রক্ষা করবো।

হ্যাঁ সর্দার।

আমরা সব কিছু ত্যাগ করতে পারি, মাতৃভূমি রক্ষার্থে আমরা শরীরের শেষ রক্তবিন্দুও বিসর্জন দিতে পারি। বিশেষ করে আমাদের মুসলমান ভাইরা আজ মাতৃভূমি রক্ষার্থে আমরণ প্রচেষ্টা চালিয়ে চলেছে। মাতৃভূমি রক্ষার দায়িত্ব শুধু সৈনিকদের নয়, প্রত্যেকটা নাগরিকের কর্তব্য আমাদের দেহের শেষ শক্তি দিয়ে শত্রুকে হটিয়ে দেওয়া।

সর্দার, আমরা সবাই প্রস্তুত।

তোমাদের বেশি করে বলতে হবে না; এই দেশের সন্তান তোমরাও। তোমাদের এখন কি কর্তব্য নিজেরাই জান। আমি এই মুহূর্তে তোমাদের ছুটি দিলুম। তোমরা সবাই ইচ্ছামত মাতৃভূমি রক্ষার্থে আত্মনিয়োগ করতে পারো।

সর্দার!

হ্যাঁ, যত টাকা তোমাদের প্রয়োজন হয়, রহমানের নিকট চেয়ে নিও। এখন আর দস্যুতা নয়, দেশরক্ষার জন্য এখন তোমরা সকলেই ভাই ভাই। তোমাদের কারো দ্বারা কোন নাগরিকের শান্তি ভঙ্গ হবে না–এটাই আমি চাই।

সর্দার, আপনার আদেশ শিরোধার্য।

বনহুর কখন উঠে দাঁড়িয়েছিল, এবার দক্ষিণ পা খানা তার আসনের উপর তুলে দাঁড়ায়– এখন আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য আছে, দায়িত্ব আছে-তোমরা যে যতটুকু পারবে, দেশের জন্য উৎসর্গ করবে। আল্লাহ আমাদের সহায়।

সমস্ত অনুচরবৃন্দ সমস্বরে চিৎকার করে উঠে–মারহাবা!

নূরী আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল, আরও ভালোভাবে কান পাতে।

এবার বনহুর আসন থেকে দক্ষিণ পা নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় তারপর বলে–তোমরা যেতে পার। আল্লাহ হাফেজ।

সমস্ত দস্যুগণ বেরিয়ে যায়।

রহমান দাঁড়িয়ে থাকে বনহুরের পাশে। কিছু যেন বলতে চায় সে।

বনহুর বলে–রহমান, আমরা কবে যাচ্ছি?

সর্দার, একটা কথা?

বল?

সর্দার আমরা সবাই যাচ্ছি, তাই বলছিলুম আপনি ...

থামলে কেন বল?

আপনার না গেলে হয় না?

কেন?

কদিন আগে আপনার শরীর থেকে প্রচুর রক্তপাত ঘটেছে, তাই বলছিলুম ....

রহমান, তোমার হিত-উপদেশ শুনতে চাইনে। আমি দুর্বল নই।

সর্দার, আপনার কয়েক দিন বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল।

রহমান, তুমি না দস্যু বনহুরের সহচর? তোমার মুখে ও কথা শোভা পায় না। বনহুর বিশ্রাম বলে কিছু জানে না।

লজ্জিত কণ্ঠে বলে রহমান–মাফ করুন সর্দার।

রহমান, কালই আমি যেতে চাই।

কয়েক দিন পরে গেলে চলে না সর্দার?

হাসালে রহমান, যুদ্ধকালে কখনও সময়কাল বিচার চলে না। এখন প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।–রহমান?

সর্দার!

এ কথা নূরী যেন না জানে।

আচ্ছা।

বনহুর বেরিয়ে আসে দরবার কক্ষ থেকে।

নূরী আড়ালে দাঁড়িয়ে সবই শুনেছিল, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রহর গুণছিল সে। বনহুর যুদ্ধে যাবে, হয়তো আর ফিরে নাও আসতে পারে। কিন্তু তা হয় না। নূরীও যাবে তার সঙ্গে যদি মরতে হয় দু'জন এক সঙ্গে মরবে। কিন্তু সে যে নারী, তাকে কি সঙ্গে নেবে বনহুর? যতই এই নিয়ে ভাবছে ততই নূরীর বুকের মধ্যে একটা ক্রন্দন জমাট বেঁধে উঠছে। এ গহন বনে তার একমাত্র সাথী এবং সম্বল ঐ বনহুর। দুনিয়ায় সে ওকে ছাড়া কিছু বুঝে না। বনহুরই যে তার সর্বস্ব।

নূরী দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে নীরবে চোখের পানি ফেলছিল। এমন সময় বনহুর এসে তার পাশে বসলো। একটা কাঠি দিয়ে নূরীর মাথায় টোকা মেরে ডাকল–নূরী।

নূরী নিশ্চুপ।

বনহুর ওর মাথায় হাত রাখলো–নূরী।

নূরী এবার মুখ তুলে বললো–এতোবড় নিষ্ঠুর তুমি।

হেসে বললো বনহুর–এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

নূরী রাগতকণ্ঠে বলে উঠে–শুধু নিষ্ঠুর নও তুমি; তুমি পাথরের চেয়েও কঠিন।

তার চেয়েও শক্ত ....

বনহুর, আমি সব শুনেছি।

তাহলে তো বলার আর কিছু নেই।

পাষণ্ড! তোমার হৃদয় বলে কোন কিছু নেই।

হৃদয়.... হাঃ হাঃ হাঃ, দস্যুর আবার হৃদয় আছে নাকি?

বনহুর, আমি তোমাকে কিছুতেই যুদ্ধে যেতে দেব না।

বনহুর মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে পড়ে–তাই বল। দরবার কক্ষের কথাগুলো তুমি তাহলে সব শুনে নিয়েছ?

নূরীর রুদ্ধ কান্না এততক্ষণে যেন পথ পায়, দু'হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠে সে।

বনহুর অবাক হয়ে ভাবে, একি মহাসঙ্কট। তবু সান্ত্বনার কণ্ঠে বলে–নূরী তুমি কি মাতৃভূমির সন্তান নও? তুমি কি চাও না দেশের মঙ্গল?

তুমি যেও না। এ গহন বনে তুমি ছাড়া আর যে আমার কেউ নেই...

নূরী, যার কেউ নেই তার আল্লাহ আছেন। দেশ আজ মহা সঙ্কটময় মুহূর্তে উপনীত হয়েছে। এ সময় কারও উচিত নয় নিশ্চুপ হয়ে থাকা। যার যতটুকু সামর্থ্য দিয়ে দেশকে রক্ষা করা সকলের কর্তব্য।

তাহলে আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

তা হয় না নূরী। তোমরা নারী, একেবারে সমর প্রাঙ্গণে যাওয়া তোমাদের চলে না। তুমি যদি মাতৃভূমি রক্ষার্থে এগিয়ে আসতে চাও, অনেক পথ আছে। রহমান এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করবে।

.

হঠাৎ যুদ্ধের দামামা বেজে উঠায় সমস্ত দেশ এক মহা সমস্যার সম্মুখীন হল। চারিদিকে শুধু মাতৃভূমি রক্ষার আকুল আহ্বান। যুবক বৃদ্ধ, নারী পুরুষ সবাই দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করে চলেছে, আমরা শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দেব, তবু মাতৃভূমির এক কণা মাটি অন্য দেশকে দেব না। রণ প্রাঙ্গণে ধ্বনিত হল হাজার হাজার সৈনিকের কলকণ্ঠে লা-ইলাহা ইল্লালাহ শব্দ। তার সঙ্গে গর্জে উঠলো আগ্নেয় অস্ত্রগুলি। সীমান্তের আকাশ ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মরতে লাগলো দু'পক্ষের শত শত লোক। আহতদের আর্তনাদ আর কামানের শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো বসুন্ধরা।

মাতৃভূমির এ আকুল আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারলো না বনহুর। মন তার অস্থির হয়ে উঠলো। এ দেশেরই সন্তান সে। জন্মভূমির এ বিপদাপন্ন অবস্থা তাকে চঞ্চল করে তুলল।

যুদ্ধে যাবার পূর্বে মনে পড়লো মনিরার কথা। অনেক দিন তার সঙ্গে দেখা করেনি; অবশ্য এর কারণ ছিল অনেক। একে সে আহত অবস্থায় বেশ অনেকদিন শয্যাশায়ী ছিল, তারপর নানা ঝামেলায় যাওয়া হয়ে উঠেনি। পুলিশ সুপার মিঃ আহম্মদ এরপর থেকে চৌধুরী বাড়ির চারিপাশে গোপনে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছিলেন–এটাও একটা কারণ। তবু যে বনহুর মনিরাকে না দেখে এসেছে, তা নয়। মাঝে আরও একদিন ফকিরের বেশে এসেছিলো সে–তখন মনিরা বেশ অসুস্থ ছিলো।

.

সেদিন গভীর রাতে একটা শব্দে ঘুম ভেংগে গেল মনিরার। চোখ মেলে চাইতেই আশ্চর্য হল, মুক্ত জানালার পাশে মেঝেতে দাঁড়িয়ে বনহুর। মুহূর্তে উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠলো মরি মুখমণ্ডল। ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর বুকে–মনির! মনির

তুমি এসেছো? তারপর উদগ্রীব নয়নে বনহুরের শরীরের দিকে লক্ষ্য করে বলে–কোথায়, কোথায় তুমি আঘাত পেয়েছিলে মনির?

বনহুর জামার হাতা গুটিয়ে দেখায়–ভাগ্যিস গুলীটা আমার হাতের মাংস ভেদ করে চলে গিয়েছিল। তাই আবার তোমার পাশে আসতে পেরেছি।

মনিরা বনহুরের শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতটায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে–মনির, এ জন্য আমিই দায়ী। আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করেছেন, এ আমারই সৌভাগ্য। তোমাকে ফিরে পাব, এ আমি ভাবতে পারিনি। চেয়ে দেখ.. বনহুরের ছোটবেলার ছবিখানার দিকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বলে মনিরা–সেদিন তোমার জন্য যে মালাখানা গেঁথে রেখেছিলুম, আজ সে মালা শুকিয়ে গেছে।

বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নেয়; তারপর স্থির কণ্ঠে বলে–মনিরা!

বল?

তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

বিদায়! সে আবার কি?

মাতৃভূমির ডাক এসেছে।

তার মানে?

আমি যুদ্ধে যাচ্ছি।

সেকি!

মনিরা, আমি দস্যু ডাকু, তাই বলে কি আমি এদেশের সন্তান নই? আমার জন্ম কি এদেশের মাটিতে হয়নি? আজ আমাদের মাতৃভূমির সঙ্কটময় অবস্থা। আর আমি তাঁর একজন সন্তান হয়ে নিশ্চুপ বসে থেকে দেখব?

মনির।

বনহুর ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে–জানি তুমি ব্যথা পাবে। কিন্তু আমি আশা করি না মনিরা, তুমি আমার চলার পথে বাধার সৃষ্টি করবে।

মনিরা বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলে উঠে–তুমি আমার কণ্ঠরোধ করে দিলে! কেন, কেন তবে এসেছিলে আমার কাছে বিদায় নিতে? না এলেই আমি তো জানতাম না কিছু।

মনিরা!

না, না তুমি কেন আমার মনে নতুন করে আগুন জ্বালাতে এলে! কেন তুমি আমাকে নিশ্চিন্তে থাকতে দিলে না! ছোট বেলায় যখন আমি কিছু বুঝতাম না, ভালবাসা কি জিনিস জানতাম না, তখন তুমি আমার জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছিলে। ভুলে গিয়েছিলুম তোমার কথা। আবার ধূমকেতুর মত কেন এসেছিলে তবে....

মনিরা, তুমি শিক্ষিতা, তুমি জ্ঞানবতী নারী। আজ এ সময় ওসব কথা স্মরণ করা তোমার। পক্ষে উচিত নয়। দেশের ডাকে তোমার প্রাণ কি আকুল হয়ে উঠেনি? তুমি কি চাও না তোমার মাতৃভূমির মান ইজ্জত রক্ষা হউক? আমাদের দেশের প্রতিটি যুবকের কর্তব্য সমর প্রাঙ্গণে গিয়ে। শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করা। মাতৃভূমি রক্ষার্থে জীবন সমর্পণ করা। আজ ঘরে বসে থাকার সময় নয়। যার যতটুকু সামর্থ্য আছে, তাই দিয়ে দেশকে রক্ষা করা আজ সকলের ধর্ম। মনিরা এ ব্যাপারে তুমিও এগিয়ে আসতে পার।

সত্যি?

হ্যাঁ, জানো না আজ সীমান্তে আমাদের অগণিত সৈনিক ভাইরা প্রাণপণে যুদ্ধ চালিয়ে চলেছে। তাদের এ চলার পথে এখন বহু জিনিসের প্রয়োজন। টাকা পয়সা, অলঙ্কার রক্ত– যে যা পার, তাই দিয়ে সাহায্য করতে হবে। আমাদের সৈনিক ভাইদের বাহুবল মজবুত করতে হবে।

আমার সমস্ত অলঙ্কার আমি তোমায় দেব।

আমাকে নয় মনিরা সমর তহবিলে দান কর।

আমি রক্ত দেব মনির।

বেশ দিও। ব্লাড ব্যাঙ্ক আছে, সেখানে তুমি রক্ত দিতে পার।

মনির সত্যি তুমি যুদ্ধে যাবে?

হ্যাঁ।

অভিজ্ঞতা আছে তোমার?

বনহুর মনিরার প্রশ্নে হাসলো, একটু থেমে বললো– দস্যু বনহুরের অজানা কিছুই নেই, মনিরা।

কথার ফাঁকে বনহুর মনিরা খাটের পাশে এসে বসেছিল। বনহুর ওর চিবুক ধরে উঁচু করে তোলে–তুমি আমার জীবনের এখনও কিছু জান না, মনিরা। তোমার মনির কামান চালাতেও জানে।

হ্যাঁ, সত্যি! মনিরা শোন, আজ তোমাকে কয়েকটি কথা বলবো যা আজও কেউ জানে না।

মনিরা বনহুরের পাশে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বলে–বল?

চৌধুরী সাহেবের কক্ষ থেকে ভেসে আসে দেয়ালঘড়ির সময় সংকেতধ্বনি ঢং ঢং ঢং-রাত তিনটে বাজলো।

মুনিরা একাগ্রচিত্তে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর বলে চলে–আমি যখন সতের বছরের যুবক তখন আমার সমস্ত অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা শেষ হয়ে গেছে। লেখাপড়া স্কুলে ও কলেজে শেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি, তবে ছোটবেলায় বাপু আমাকে নিজেই লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। বাপুর কথা একদিন তোমাকে সব বলেছি। তিনি ছিলেন শিক্ষিত। বাংলা, ইংরেজি, ফারসি সব জানতেন বাপু। আমাকেও তিনি এসব ভাষা লিখতে পড়তে এবং বলতে শিখিয়েছিলেন। সতের বছর বয়সে যখন আমি সবদিকে শিক্ষা লাভ করলাম, তখন বাপু আমাকে প্রথম একদিন সঙ্গে করে শহরে নিয়ে গেলেন। শহরে মোটগাড়ি দেখে খুব ইচ্ছা হল মোটর চালনা শিখবো। বাপু আমার বাসনা জানতে পেরে খুশি হলেন। তিনি আমার জন্য শহরে বাড়ি তৈরি করলেন; গাড়িও কিনে দিলেন–একটি নয় দু'টি। আশা আমার পূর্ণ হলো, ড্রাইভিংও শিখলুম। তবু মনের কোথায় যেন খুঁতখুঁত করতে লাগলো, আরও যেন অনেক কিছু শেখার বাকি আছে। নিজ মনেই ভাবতাম আর কি শেখার আছে। যে-কোন অস্ত্র বিদ্যাই

আমার জানা আছে। অশ্বচালনা থেকে মোটর চালনা সব শিখেছি। আর তবে কি বাকি? হঠাৎ মনে পড়লো, এরোপ্লেন চালনা শিখতে পারলে আমার কোন সাধই অপূর্ণ হবে না। বাপুকে একদিন মনের কথা জানালাম।

মনিরা অবাক হয়ে শুনছে বনহুরের কথাগুলো। দু'চোখে তার বিস্ময় উজ্জ্বল দীপ্তি। অস্ফুট কণ্ঠে বললো সে–তারপর?

বাপু কথাটা শুনে গম্ভীর হলেন, কিছুক্ষণ ভেবে বলেন–প্লেন চালনা সকলের পক্ষেই সম্ভব নয়, বনহুর।

আমি বললুম–কেন?

বাপু বলেন–তুমি বুঝবে না।

আমার তখন জেদ চেপে গেছে, কেন বুঝব না। প্লেন–সেকি মানুষ চালায় না? আমিও মানুষ, নিশ্চয়ই পারবো।

বাপু হয়তো আমার মনের কথা জানতে পারলেন। তিনি আমাকে মত দিলেন। তারপর প্লেন চালনাও শিখলাম।

মনিরা বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠে-মনির, তুমি প্লেন চালাতে পার?

পারি।

সত্যি তুমি কি! কি বলে যে তোমাকে অভিনন্দন জানাব।

মনিরা তুমি হাসিমুখে বিদায় দাও, সেটাই হবে তোমার সত্যিকারের অভিনন্দন।

মনির, যাও তুমি জন্মভূমিকে রক্ষা করে ফিরে এসো।

বনহুর উঠে দাঁড়াল।

স্তব্ধ নির্বাক চোখে তাকিয়ে রইলো মনিরা।

.

সৈনিক ফরহাদের বীরত্বে সমস্ত সামরিক বাহিনী আজ গর্বিত। তার অপরিসীম সাহসিকতায় সবাই মুগ্ধ। ফরহাদের রণকৌশলে শত্রুপক্ষের বিপুল সৈন্য আজ পরাভূত হতে বসেছে। সেনাপতি নাসের আলী তাকে বিপুল উৎসাহ দান করে চলেছেন।

যুদ্ধ চলছে।

শত্রুপক্ষের অসংখ্য সৈন্য বিপুল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ভীষণভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে। প্রতিহত করে চলেছে মিত্র পক্ষের সৈন্যগণ।

ফরহাদ প্রাণপণে যুদ্ধ করছে। কখনও রাইফেল হস্তে, কখনও মেশিনগান নিয়ে, কখনও বা কামানের পাশে দাঁড়িয়ে শত্রুপক্ষকে সে পরাহত করে চলেছে। তার অব্যর্থ গুলীর আঘাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে শত্রুপক্ষের সৈন্যদল।

সেনাপতি নাসের আলী ফরহাদের বীরত্ব এবং রণকৌশলে মুগ্ধ হয়ে তাকে তার সৈন্যবাহিনীর ক্যাপ্টেন করে দিলেন। দক্ষ ক্যাপ্টেনের মত সৈন্য চালনা করতে লাগলো সে।

সেদিন অতর্কিতভাবে তাদের ঘাটির উপর শত্রুপক্ষ হামলা করল। এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সেনাপতি নাসের আলী। তিনি হতভম্বের মত কি করবেন ভাবছেন, কিন্তু তার পূর্বেই তিনি দেখতে পেলেন তাদের কামানগুলো এক সঙ্গে গর্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল আর মেশিনগানের শব্দও তার সঙ্গে কানে ভেসে এলো আর ভেসে এলো 'আল্লাহু আকবর ধ্বনি।

সেকি ভীষণ যুদ্ধ!

দুদিন থেকে অবিরাম গুলীবর্ষণ হচ্ছে। সেনাপতি নাসের আলী আশ্বস্ত হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তাদের সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত ছিল। তিনি একজন হাবিলদারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন– ফরহাদ কোথায়?

হাবিলদার ব্যস্ততার মধ্যেও সুউচ্চ কণ্ঠে জবাব দিলেন–ফরহাদ সাহেব স্বয়ং কামান চালাচ্ছেন। শত্রুপক্ষ তাঁর কামানের গোলার আঘাতে পিছু হঠতে শুরু করেছে।

সেনাপতি নাসেরের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠলো। তিনি আদেশ দিলেন– যাও, তাকে তোমরা সবাই মিলে সাহায্য কর।

ফরহাদ অবিরাম গুলীবর্ষণ করে চলেছে। তার গোলার আঘাতে শত্রুপক্ষ অল্পক্ষণেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। এবার তারা রণেভঙ্গ দিয়ে পালাতে বাধ্য হলো! ফরহাদ তবু ক্ষান্ত হলো না, তার সৈন্যবাহিনীকে আদেশ দিল ওদের পিছু ধাওয়া করতে। নিজেও রাইফেল হস্তে অগ্রসর হল।

শত্রুপক্ষের মেজর জেনারেল মিঃ মুঙ্গেরী নিহত হল। আর নিহত হলো তাদের অসংখ্য সৈন্য। অজস্র অস্ত্রশস্ত্রও হস্তগত করলো ফরহাদ।

শত্রুপক্ষ বার বার পরাজিত হয়েও ক্ষান্ত হলো না। তারা গোপনে সন্ধান নিয়ে জানতে পারলো, ক্যাপ্টেন ফরহাদের রণ-নৈপুণ্যে আজ তারা এভাবে পরাজিত হয়ে চলেছে। কিভাবে ক্যাপ্টেন ফরহাদকে নিহত কিংবা বন্দী করা যায়, এ নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলেন শত্রুপক্ষের সামরিক অফিসারগণ।

বার বার অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ফরহাদের সৈন্য বাহিনীকে পরাজিত করার চেষ্টা করতে লাগলো ওরা। কিন্তু কোনক্রমে পেরে উঠলো না ফরহাদের সঙ্গে।

ফরহাদ যেন পূর্ব হতে সব জানতো এবং বুঝতে পারত, কোন দিক দিয়ে আজ শত্রুপক্ষ তাদের ঘাটির উপর হামলা চালাবে সে ভাবে প্রস্তুত থাকত সে।

একদিন শত্রুপক্ষ কৌশলে ফরহাদের সৈন্যবাহিনীকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে ফেলল, উদ্দেশ্য ক্যাপ্টেন ফরহাদকে বন্দী কিংবা নিহত করা। অবিরাম গোলা গুলী চালিয়ে ফরহাদের সৈন্যবাহিনীকে কাবু করার চেষ্টা করতে লাগলো তারা।

ফরহাদের সহকারী সৈনিক জব্বার খাঁও আজ ফরহাদের পাশে থেকে তাকে সাহায্য করে চলেছে। সেকি ভীষণ লড়াই! ছোট ছোট টিলার আড়ালে লুকিয়ে গুলী চালাচ্ছে ফরহাদের সৈন্যবাহিনী।

শত্রুপক্ষ একেবারে নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে। আজ তারা মরিয়া হয়ে লড়ছে। ফরহাদের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করতেই হবে। ছলে বলে–কৌশলে ফরহাদকে নিহত অথবা বন্দী করতেই হবে।

কিন্তু ফরহাদ নিপুণতার সঙ্গে সৈন্য চালনা করে চলল। জব্বার খাঁ এবং ফরহাদের রাইফেল পুনঃ পুনঃ গর্জন করে চলেছে। তারা ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হয়ে শত্রুপক্ষের বেষ্টনী পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে লাগলো।

মাথার উপরে প্রচণ্ড সূর্যের তাপ। পায়ের নিচে উত্তপ্ত বালুকা রাশি, ফরহাদের সুন্দর মুখমণ্ডল রক্তাভ হয়ে উঠেছে। পরিধেয় বস্ত্র ঘামে ভিজে চুপসে গেছে। কোনদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। শত্রুসৈন্যকে সে একের পর এক নিহত করে চলেছে। অব্যর্থ তার লক্ষ্য। কখনও হামগুড়ি দিয়ে কখনও উঁচু হয়ে এগুতে লাগলো ফরহাদ ও তার সৈন্যবাহিনী।

বুদ্ধিমান ফরহাদ অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে শত্রুপক্ষের সৈন্য বাহিনীকে একত্রিত করে ঘিরে ফেলল। কতক পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো কতক আত্মসমর্পণ করল ফরহাদের কাছে।

এতোবড় একটা পরাজয়ের কালিমা মুখে মেখে শত্রুপক্ষ আরও ক্ষেপে উঠল। নতুনভাবে আক্রমণ চালাবার জন্য পুনরায় প্রস্তুত হতে লাগল তারা।

সাফল্যের বিজয়মাল্য গলায় পরে ফরহাদ যখন ফিরে গেল ঘাটিতে তখন সেনাপতি নাসের আলী, মেজর জেনারেল হাশেম খান এবং অন্যান্য সামরিক সেনানায়ক ফরহাদের সঙ্গে বুকে বুক মিলালেন। এতোবড় একটা বিজয় তাঁরা যেন আজ আশাই করতে পারেন নি।

আজ প্রায় এক সপ্তাহ কাল অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে এসেছে ফরহাদ। তাই দু'দিনের জন্য তাকে বিশ্রামের নির্দেশ দেওয়া হল।

ওদিকে জব্বার খাঁ কোথায় যে ডুব মেরেছে, আর তাকে খুঁজে পাচ্ছে না ফরহাদ। তবে কি সে নিহত হয়েছে? নিজের তাবুতে শুয়ে ভাবছে এসব কথা। এমন সময় জব্বার খাঁ তার তাবুতে এসে হাজির। সেলুট ঠুকে সোজা হয়ে দাঁড়ালো স্যার আমি এসেছি।

ফরহাদ ওকে দেখেই উঠে বললো কি খবর জব্বার খাঁ? কোথায় ডুব মেরেছিলে?

জব্বার কণ্ঠস্বর নিচু করে নিয়ে বললো—স্যার শত্রু পক্ষের আহত সৈন্যদের স্তূপের মধ্যে ডুব মেরে একেবারে ওদের শিবিরে গিয়ে পৌঁছেছিলুম।

ফরহাদ এক লাফে উঠে দাঁড়ায় তারপর?

তারপর গোপনে ওদের পেটের খবর জেনে এসেছি। স্যার, আমাদের আর এক মুহূর্ত বিশ্রামের সময় নেই এবার জঙ্গী বোমারু বিমান নিয়ে আক্রমণ চালাবে। আজ শেষ রাতের দিকেই আক্রমণটা চালাবে জানতে পেরেছি।

ফরহাদের বিশ্রাম শেষ হয়ে গেল। নতুন এক উন্মাদনায় চোখ দুটো তার জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠল। কালবিলম্ব না করে নিজের সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিল ফরহাদ।

ঘাটির আশেপাশে কামান আর মেশিনগান বসিয়ে যে যার জায়গায় প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। প্রত্যেকেই রাইফেল হস্তে গোপন স্থানে লুকিয়ে রইল।

ফরহাদ আজ নতুন রূপ ধারণ করেছে। চোখ দিয়ে তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। ললাটে গভীর চিন্তারেখা ফুটে উঠেছে। জব্বার খাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল ফিস ফিস করে কি সব অলোচনা হলো দু'জনার মধ্যে।

জব্বার খাঁর মুখমণ্ডল বিষণ্ন হলো। দু'চোখ তার অশ্রু ছলছল হয়ে উঠলো।

ফরহাদ জব্বার খাঁর পিঠ চাপড়ে কি যেন বলল। তারপর বেরিয়ে গেল। ঘাটির গোপনকক্ষে বসে ওয়্যারলেসে সেনাপতি নাসেরের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ হল তার।

অল্পক্ষণের মধ্যেই জঙ্গী বোমারু বিমানগুলোও তৈরি হয়ে নিল। একটি বোমারু বিমানের ড্রাইভ আসনে গিয়ে বসলো ফরহাদ। শরীরে তার জঙ্গী বোমারু বিমানের পাইলটের ড্রেস।

ফরহাদের সৈন্যবাহিনী প্রতিমুহূর্তে শত্রুপক্ষের বিমান আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে লাগলো। প্রাণ দিয়ে তারা লড়াই করবে। শত্রুপক্ষকে ধ্বংস করার জন্য তারা প্রতিমুহূর্তে প্রস্তুত আছে। মেজর মাসুদ আর জব্বার খাঁ আজ গোলন্দাজ সৈন্য পরিচালনা করবেন।

গভীর অন্ধকারে গোটা বিশ্ব অন্ধকার। ঘাটির আশেপাশে পরিখার মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে রাইফেলধারী সৈন্যবাহিনী। শত্রুপক্ষের আক্রমণের

জন্য তৈরি হয়ে আছে তারা। কামানের পাশে, মেশিনগানের ধারে, যে যার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত। মৃত্যুকে তারা যেন উপহাস করে চলেছে।

হঠাৎ নিস্তব্ধ ধরণী প্রকম্পিত করে বেজে উঠলো বিপদ সংকেত ধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বিমানের শব্দ।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। মিত্রপক্ষের জঙ্গী বিমানগুলো উল্কা বেগে আকাশপথে উড়ে উঠল। একসঙ্গে জঙ্গী বিমান গুলো ধাওয়া করলো শত্রুপক্ষের জঙ্গী বোমারু বিমানগুলোকে।

মিত্রপক্ষের বিমানের চেয়ে তিনগুণ বেশি ছিল শত্রুপক্ষের বোমারু বিমান। তুমুল আকাশযুদ্ধ শুরু হল। দক্ষ পাইলটের মত কাজ করে চলল ফরহাদ।

বিমান ধ্বংসী কামান আর মেশিনগানের শব্দে আকাশ বাতাস কম্পিত হয়ে উঠল। কামানের গোলার আঘাতে শত্রুপক্ষের কয়েকটি বিমানে আগুন ধরে গেল। ঘূর্ণীয়মান অগ্নিকুণ্ডের মত আকাশের বুকে জ্বলে উঠল; পরক্ষণেই বিধ্বস্ত হয়ে ভূপাতিত হল।

ফরহাদ প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়ে শত্রুপক্ষের বিমানগুলো ধ্বংস করে চলল।

প্রায় ঘণ্টা দুই আকাশযুদ্ধ চলার পর শত্রু জঙ্গী বিমানগুলো পরাজয় বরণ করে পিছন দিকে ফিরে চলল। বেশ কয়েকখানা ধ্বংস হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই।

মিত্রপক্ষের দু'খানা বিমানও নষ্ট হল।

যখন জানতে পারলো জব্বার খাঁ রণভূমিতে দাঁড়িয়ে আঁতঙ্কে মন তার দুলে উঠলো। ফরহাদের বিমানখানা তো বিধ্বস্ত হয়ে যায় নি?

কিন্তু খোদার অশেষ কৃপা। শত্রু বিমানগুলোকে পরাজিত করে সাফল্যের জয়টিকা ললাটে পরে ফিরে এলো ফরহাদ তার জঙ্গী বোমারু বিমান নিয়ে। শুধু শত্রুপক্ষকে পরাজিত করেই ক্ষান্ত হয় নি ফরহাদ। শত্রুপক্ষের একটি ঘাটিও তারা বিধ্বস্ত করে দিয়ে এসেছে।

ফরহাদের প্লেনখানা ফিরে আসতেই সেনাপতি নাসের আলী, মেজর জেনারেল হাশেম খান এবং আরও অন্যান্য সেনানায়ক ফরহাদকে অভিনন্দন জানালেন।

সেনাপতি নাসের আনন্দে আত্মহারা হয়ে ফরহাদের সঙ্গে বুকে বুক মিলালেন।

প্রেসিডেন্ট ফরহাদকে খেতাব দান করলেন। সেদিন সবচেয়ে বেশি খুশি হলো জব্বার খাঁ। নিভৃতে হাতে হাত মিলালো তার সঙ্গে।

.

দেশ যখন মহাসঙ্কটময় অবস্থায় উপনীত হয়েছে, যুদ্ধ নিয়ে সবাই দিশেহারা এমন সময় মুরাদ নাথুরামের সাহায্য যথেচ্ছাচারণে প্রবৃত্ত হল-কোথাও লুটতরাজ, কোথাও বা নারী হরণ কোথাও বা খুনখারাবি। পুলিশ মহল এই যুদ্ধ ব্যাপারে ব্যস্ত-ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, তারপর রোজই এখানে সেখানে রাহাজানি, লুটতরাজ, নারী হরণের সংবাদ লেগেই আছে। পুলিশ মহলের দৃঢ় বিশ্বাস-এসব বনহুরের কাজ। পুলিশ সুপারের গুলী খেয়ে সে ক্ষেপে উঠেছে।

চারদিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেও কিছু হচ্ছে না। শয়তান নাথুরাম আর মুরাদ ঠিকভাবে কাজ করে চলেছে। এতে করেও মুরাদের শান্তি নেই। মনিরার উপর তার কু দৃষ্টি রয়েছে। কেমন করে তাকে পাবে এ চিন্তায় অস্থির সে

একদিন গভীর রাতে মনিরার দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। মনিরা তখনও ঘুমোতে পারেনি। বার বার বনহুরের বিদায়ক্ষণের কথাগুলো স্মরণ হচ্ছিল। নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছিল সে।

হঠাৎ দরজায় মৃদু শব্দ। মনিরার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠল। নিশ্চয়ই সে এসেছে। বলেছিল বনহুর, সুযোগ পেলেই এসে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাব। মনিরা মুহূর্ত বিলম্ব না করে দরজা খুলে দিল। সে ভাবতেও পারেনি, তার জন্য অন্য কোন বিপদ প্রতীক্ষা করতে পারে।

মনিরা দরজা খুলতেই কক্ষে প্রবেশ করলো ভীষণ আকার দুটি লোক। লোক দুটি মনিরাকে একটি টু শব্দ করতে না দিয়েই মুখে রুমাল চাপা দিল। শুধুমাত্র একটু মিষ্টি গন্ধ, তারপর আর কিছু মনে নেই মনিরার।

মনিবার সংজ্ঞাহীন দেহটা একটা কালো কাপড়ে ঢেকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে নিচে নেমে এলো লোক দুটি। সদর দরজার পাশে দারওয়ান ঠেস দিয়ে আছে, তার বুকে বিদ্ধ হয়ে রয়েছে একখানা সূতীক্ষ্ণধার ছোরা। তাজা রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার সাদা ধবধবে পোশাকটা।’

গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে একখানা কালো রং-এর মোটর গাড়ি অন্ধকারে মিশে রয়েছে যেন।

লোক দুটি মনিরাকে নিয়ে গাড়িখানায় উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছুটতে শুরু করল। জনহীন রাজপথ বেয়ে ছোট্ট কালো রং এর গাড়িখানা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। আকাশে অসংখ্য তারার মালা। গোটা শহরটা যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে দু'একটি মোটর এদিক থেকে ওদিকে চলে যাচ্ছে।

বড় রাস্তা ছেড়ে একটি নির্জন অন্ধকার গলিপথে প্রবেশ করলো গাড়িখানা। আঁকাবাঁকা পথে ঘন্টাখানেক চলার পর একটি পুরানো বাড়ির সম্মুখে গাড়িখানা থেমে পড়লো।

লোক দু'টি এবার মনিরার জ্ঞানহীন দেহটা নামিয়ে নিয়ে সেই পুরানো বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করলো। কয়েকটি ভাঙা চুরো ঘর এবং বারান্দা পেরিয়ে একটি সিঁড়ি আছে; সেই সিঁড়ি বেয়ে চললো তারা। তারপর উপরে বড় বড় কয়েকখানা অর্ধ ভগ্ন ঘর। ওদিকে একটি মস্তবড় ঘরের মধ্যে নীলাভ ধরনের আলো জ্বলছে। মেঝেতে দামী কার্পেট বিছানো। মাঝখানে একটি টেবিলের পাশাপাশি কয়েকখানা চেয়ার। আর তেমন কোন আসবাবপত্র নেই সে কক্ষে। টেবিলে কয়েকটা মদের বোতল আর কাঁচের গেলাস বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো। কমধ্যে একটি চেয়ারে বসে রয়েছে। মুরাদ। মদের নেশায় চোখ দুটো ওর ঢুলু ঢুলু।

মনিরাকে নিয়ে লোক দুটি যখন মুরাদের সম্মুখে রাখলো তখন মনিরার সংজ্ঞা ফিরে আসছে। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো মনিরা। সব যেন কেমন এলোমেলো ঝাপসা লাগছে। কিছুক্ষণ হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রইল সে।

মুরাদ ইঙ্গিত করলো লোক দুটিকে বেরিয়ে যেতে।

লোক দুটি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

মুরাদ টলতে টলতে এগিয়ে এলো মনিরার পাশে। মনিরার মাথার চুলে হাত রেখে মৃদু টান দিল।

মনিরা মুখ তুলে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে ভূত দেখার মতই চমকে উঠল। চিৎকার করে বললো–মুরাদ!

অট্টহাসি হেসে উঠলো মুরাদ–হ্যাঁ, আমি-আমি তোমার ভাবী স্বামী....

মনিরা তখন কম্পিত পদে উঠে দাঁড়িয়েছে। মুরাদ ওকে ধরতে যায়।

মনিরার তখন মাথাটা ঝিমঝিম করছে। চট করে সরে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যায়।

মুরাদ তার দিকে এগুতেই পুনরায় উঠে দাঁড়ায় মনিরা।

নিঃশ্বাস দ্রুত বইছে। দাঁতে অধর দংশন করে বলে–শয়তান, তুমি আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছ?

হেসে উঠে মুরাদ–এখনও বুঝতে পারনি? তোমার জন্যই আমার এ সংগ্রাম। হাজার হাজার টাকা আমি পানির মত খরচ করে চলেছি...

মনিরার চোখ দিয়ে তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। ললাটে ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

মুরাদ বলে চলেছে–কিন্তু তোমাকে পাইনি। দস্যু বনহুর সব সাধ, সব আশা বিনষ্ট করে দিয়েছে... হাঃ হাঃ হাঃ, আজ কোথায় তোমার সেই প্রিয়তম...

মনিরা চোখে সর্ষে ফুল দেখে–এখন তার উপায়! এ পাপিষ্ঠের হাত থেকে কি করে সে পরিত্রাণ পাবে? নিরুপায়ের মত কক্ষের চারদিকে তাকায়। কণ্ঠনালী তার শুকিয়ে আসছে। বার বার জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দুখানা ভিজিয়ে নেয় মনিরা।

মুরাদ এগিয়ে আসছে, চোখে লালসাপূর্ণ লোলুপ দৃষ্টি। মুখে কুৎসিত হাসি, দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসছে সে–মনিরা তোমাকে নিয়ে আমি আকাশ কুসুম গল্প রচনা করেছিলুম। সে আকাশ কুসুম স্বপ্ন আমার ধূলোয় মিশে যেতে বসেছে। আজ আমি তোমাকে পেয়েছি...না না, আর আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়ছি না। দস্যু বনহুরও আজ তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না... মনিরাকে ধরতে যায় মুরাদ।

মনিরা ক্ষিপ্তের ন্যায় একখানা চেয়ার তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারে মুরাদের শরীর লক্ষ্য করে।

মুরাদ হাত দিয়ে অতি সহজেই চেয়ারখানা ধরে ফেলে হেসে উঠে–হাঃ হাঃ হাঃ তুমি আমাকে কাবু করবে। এসো, এসো বলছি আমার বাহুবন্ধনে...

মনিরা একটা মদের বোতল তুলে ছুঁড়ে মারে।

মুরাদ মুহূর্তে সরে দাঁড়ায়। বোতলটা ওপাশের দেয়ালে লেগে সশব্দে ভেঙে যায়।

হঠাৎ মনিরার চোখে পড়ে-টেবিলের এক পাশে একটি ছোরা পড়ে রয়েছে। কালবিলম্ব না করে টেবিল থেকে ছোরাখানা হাতে তুলে নেয় মনিরা।

ঠিক সেই মুহূর্তে মুরাদ জড়িয়ে ধরে মনিরাকে। মনিরা সঙ্গে সঙ্গে হস্তস্থিত ছোরাখানা বসিয়ে দেয় মুরাদের বুকে।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে ভূতলে পড়ে যায় মুরাদ। ভাগ্যিস ছোরাখানা মুরাদের বক্ষ ভেদ করে যায় নি। বাম পার্শ্বের কিছুটা মাংস ভেদ করে গেঁথে গিয়েছিল ছোরা খানা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করে একজন লোক। মনিরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটাকে। দেখামাত্র চিনতে ভুল হয় না তার সেই নৌকার মাঝি ছিল লোকটা। বনহুরের মুখে শুনেছিল লোকটা নাকি শয়তান ডাকু নাথুরাম। ভয়ে শিউরে উঠে মনিরা না জানি তার অদৃষ্টে আজ কি আছে!

লোকটা হাতে তালি দিল। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন ভীষণ আকার লোক কক্ষে প্রবেশ করল। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল মুরাদকে নিয়ে।

মনিরা দেখলো দরজা মুক্ত যেমনি সে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে অমনি একজন ধরে ফেলল তাকে। লোকটার বলিষ্ঠ হাতের চাপে মনিরার হাতখানা যেন পিষে যাচ্ছিল। লোকটা বলল সর্দার একে কি করব?

কর্কশ কঠিন কণ্ঠে বলে উঠে শয়তান নাথুরাম–সেই অন্ধকার ঘরটায় বন্দী করে রাখ। দেখিস যেন না পালায়।

লোকটা মনিরাকে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

পিছনে শোনা যায় মুরাদের আর্তকণ্ঠ–উঃ আঃ.

.

ভোরে মনিরার কক্ষে প্রবেশ করে মরিয়ম বেগম আশ্চর্য হন। মনিরা এতো সকাল সকাল তো কোনদিন উঠে না।

তাছাড়া গেলোই বা কোথায়। মরিয়ম বেগম ভাবলেন সে হয়তো বাথরুমে গেছে। তাই তখনকার মত ফিরে গেলেন মরিয়ম বেগম। স্বামীকে অজুর পানি দিয়ে নিজেও নামায পড়ে পুনরায় ফিরে এলেন মনিরার কক্ষে। কিন্তু একি এখনও মনিরা ঘরে আসেনি! মরিয়ম বেগমের মনটা কেমন যেন করে উঠলো। তিনি কক্ষের চারদিকে তাকালেন। কক্ষের জিনিসপত্র ঠিক আছে-এমনকি মনিরার বিছানাটাও এলোমেলো নয়। জানালাগুলোও খিল আটা মনিরা স্বইচ্ছায় দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েছে। মরিয়ম বেগম চিন্তিতভাবে ছুটলেন চৌধুরী সাহেবের কক্ষে ওগো শুনছো ঘরে মনিরা নেই।

চৌধুরী সাহেব নামাযান্তে তসবী তেলাওয়াত করছিলেন, আশ্চর্য কণ্ঠে বলেন সেকি কথা?

হ্যাঁ, আমি বাড়ির সব জায়গা খুঁজে দেখলুম, কোথাও সে নেই।

বাইরে কোথাও যায়নি তো?

না, এতো ভোরে সে কোনদিন ঘুম থেকেই উঠে না, আর আজ সে কাউকে কিছু না বলে বাইরে যাবে। ওগো, একি কাণ্ড?

আচ্ছা দাঁড়াও ড্রাইভারকে ডাকি। দেখি বাইরে গেছে কিনা।

এমন সময় বয় ছুটে আসে হাউ মাউ করে কাঁদছে সে ভয়াতুর কণ্ঠে বলে–স্যার খুন খুন…

ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠেন চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগম–খুন কে খুন হয়েছে?

বয় কাঁপতে কাঁপতে বলে–দারওয়ান-দারওয়ান খুন হয়েছে!

চৌধুরী সাহেব বলে উঠে–কি বলছিস তুই?

হা স্যার, সব সত্যি বলছি। দেখবেন আসুন, দরজার পাশে দারওয়ান মৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

মিঃ চৌধুরী এবং মরিয়ম বেগম ছুটলেন সিঁড়ি বেয়ে নিচে।

সদর দরজার নিকটে পৌঁছে স্তম্ভিত হতবাক হলেন। বহু দিনের পুরানো দারওয়ান মংলু মিয়ার রক্তাক্ত দেহটা ভূতলে লুটিয়ে আছে। চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগমের দু'চোখ ছাপিয়ে পানি এলো; রুমালে চোখ মুছলেন চৌধুরী সাহেব।

অল্পক্ষণেই লোকজনে বাড়ি ভরে গেল।

মনিরার অন্তর্ধান ব্যাপারের সঙ্গে এ খুন রহস্য নিশ্চয়ই জড়িত আছে। চৌধুরী সাহেব পুলিশ অফিসে ফোন করলেন। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত এবং ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মনিরার নিরুদ্দেশ তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। কারণ, এটা চৌধুরী বাড়ির ইজ্জৎ নিয়ে ব্যাপার!

কিছুক্ষণের মধ্যেই মিঃ হারুন কয়েকজন পুলিশসহ চৌধুরী বাড়িতে হাজির হলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে মিঃ হারুন মৃদু হাসলেন; ভাবলেন, এ দস্যু বনহুরের কাজ ছাড়া আর কারো নয়। তিনি প্রকাশ্যে বলেন–চৌধুরী সাহেব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কারণ, মনিরা এখন আপনার পুত্রের পাশেই রয়েছে।

মুহূর্তে চৌধুরী সাহেবের মুখমণ্ডল রাঙা হয়ে উঠে, তিনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে বলেন–আপনি কি বলতে চান মনির দারওয়ানকে খুন করে মনিরাকে নিয়ে পালিয়েছে?

হ্যাঁ মিঃ চৌধুরী, এ কথা নির্ঘাত সত্য। আপনার পুত্র ছাড়া এ কাজ কেউ করতে পারে না।

মিথ্যা সন্দেহ করছেন ইন্সপেক্টর সাহেব। আমার মনির কখনও নরহত্যা করতে পারে না। তাছাড়া মনিরাকে নিয়ে তার পালাবার কোন প্রয়োজনই নেই।

মিঃ হারুন বলেন–চৌধুরী সাহেব, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আপনার ভাগনী মনিরা আপনার পুত্রকে ভালবাসে।

সেই কারণেই দারওয়ানকে খুন করার কোন দরকার ছিল না তার।

মিঃ হারুন এবং চৌধুরী সাহেব কথাবার্তা বলছেন, এমন সময় ডিটেকটিভ মিঃ শঙ্কর রাও এসে হাজির হলেন। তিনি পুলিশ অফিসে এসে ঘটনাটা জানতে পেরে থাকতে পারেন নি, সোজা চলে এসেছেন চৌধুরী বাড়িতে।

তিনিও ঘটনাটা বিস্তারিত শুনলেন। মিঃ রাও বলেন–চলুন, মনিরার কক্ষটি একবার পরীক্ষা করে দেখব।

চৌধুরী সাহেব বলেন…কক্ষের একটি জিনিসপত্র এলোমেলো হয় নি বা কোন কিছুর চিহ্ন নেই,..

উঠে দাঁড়ান মিঃ রাও-চলুন, তবু একবার দেখা দরকার।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে চললেন মিঃ হারুন, মিঃ রাও এবং চৌধুরী সাহেব।

উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ রাও উপরে উঠবার সিঁড়ি কি এই একটি?

জবাব দিলেন চৌধুরী সাহেব হাঁ, এই একটি সিঁড়িই রয়েছে।

তাহলে এই সিঁড়ি দিয়েই নেমে গেছে মনিরা এবং যে তাকে নিয়ে গেছে সে।

হ্যাঁ, তাই হবে। নীরস কণ্ঠস্বর চৌধুরী সাহেবের।

মিঃ রাও সকলের অলক্ষ্যে সিঁড়ির প্রত্যেকটা ধাপে লক্ষ্য রেখে এগুচ্ছিলেন। হঠাৎ তার নজরে পড়ে যায় সিঁড়ির এক পাশে একটি লেডিস স্যান্ডেল কাৎ হয়ে পড়ে আছে। মিঃ রাও স্যান্ডেলখানা হাতে উঠিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন–এটা কার?

চৌধুরী সাহেব জুতোখানা লক্ষ্য করে বলেন–মনিরার। কিন্তু একখানা জুতো এখানে এল কি করে?

তাইতো?

কথার ফাঁকে তারা উপরে এসে পৌঁছে গেছেন। তখনও মনিরার স্যান্ডেলখানা মিঃ রাও-এর হাতে ধরা রয়েছে।

মিঃ রাও স্যান্ডেলখানা বারান্দার একপাশে রেখে বলেন–মনিরা স্বইচ্ছায় কারো সঙ্গে যায় নি। তাকে কেউ বা কারা জোরপূর্বক ধরে নিয়ে গেছে।

মিঃ হারুন বলে উঠেন–দস্যু বনহুর ছাড়া তাহলে এ কাজ কে করতে পারে?

গোটা কক্ষটা তারা সুন্দরভাবে পরীক্ষা করে দেখলেন। কক্ষের একটি জিনিসও স্থানচ্যুত হয়। নি। দরজা মনিরা যে স্বহস্তে খুলেছে তার প্রমাণ রয়েছে। কারণ, দরজার খিল ভাঙ্গেনি বা কোনরকম আগলা হয় নি।

ক্রমেই ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠছে।

দস্যু বনহুরকে মনিরা ভালবাসে–এ কথা সবাই জানে।

মনিরাকে চুরি করে নিয়ে যাবার তার কোন প্রয়োজন হবে না, মনিরা ইচ্ছা করেই যেতে পারতো। দারওয়ানকে খুন করবার কোন দরকারই নেই তাদের। তাছাড়া সিঁড়ির ধাপে মনিরার একটি স্যান্ডেলই বা পড়ে থাকবে কেন?

আরও একটি প্রমাণ তারা পেলেন। বারান্দার মেঝেতে লক্ষ্য করে দেখল, কয়েকটি পায়ের ছাপ বেশ স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। আরও দেখলেন তারা, পায়ের ছাপগুলো খালি পা এবং থেবড়ো থেবড়ো পাগুলো।

মিঃ হারুন পায়ের ছাপগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্য করে বললেন–দস্যু বনহুর যেখানেই হানা দিয়েছে, আমরা লক্ষ্য করেছি, কখনও তার খালি পা ছিল না।

মিঃ রাও বলেন–এ নিশ্চয়ই অন্য কোন শয়তানের কাজ। দস্যু বনহুর মনিরাকে নিয়ে যায় নি-এ সত্য।

চৌধুরী সাহেব মাথায় হাত দিয়ে একটি সোফায় বসে পড়লেন-তাহলে উপায়?

.

বার বার যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে শত্রুপক্ষ পিছু হটে গেল। পুনরায় আক্রমণের চেষ্টা তাদের মন থেকে কর্পূরের মত উবে গেল। ফরহাদের পরিচালনায় বিমানবাহিনী শত্রুপক্ষকে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে জয়ী হল মিত্রপক্ষ। পরাজয়ের কালিমা মুখে মেখে হটে পড়ল শত্রুপক্ষ। সেনাপতি নাসের আলীর আনন্দ আর ধরে না! শুধু তিনিই নন, সমস্ত সামরিক অফিসারদের মুখমণ্ডল জয়ের উল্লাসে দীপ্ত হয়ে উঠলো। সবাই একবাক্যে ক্যাপ্টেন ফরহাদের রণকৌশলের প্রশংসা করতে লাগলেন।

কিন্তু এক আশ্চর্য ব্যাপার-সবাই যখন ক্যাপ্টেন ফরহাদের গুণগান করেছেন, তখন দেখা গেল ফরহাদ আর তাদের মধ্যে নেই! আর নেই জব্বার খা।

এ ব্যাপার নিয়ে দেশময় একটা হুলস্থুল পড়ে গেল। সেনাপতি নাসের এবং মেজর জেনারেল হাশেম খান ও অন্যান্য সামরিক অফিসার গভীর চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

পত্রিকায় পত্রিকায় যখন ক্যাপ্টেন ফরহাদের জয়গান প্রচারিত হচ্ছে, এমন দিনে শোনা গেল ফরহাদের নিরুদ্দেশের কথা।

কথাটা জানতে পেরে দেশবাসী গভীর শোকাভিভূত হয়ে পড়ল। সকলের মুখমণ্ডল বিষণ্ন মলিন হলো। নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষ তাঁকে গোপনে চুরি করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে।

দেশবাসী যখন ক্যাপ্টেন ফরহাদের নিরুদ্দেশ ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত, এমন দিনে মেজর। জেনারেল একখানা চিঠি পেলেন। চিঠিখানা পড়ে তিনি স্তম্ভিত-হতবাক হয়ে পড়লেন। চিঠিতে লেখা রয়েছে মাত্র একটি কথা–

মাতৃভূমি রক্ষার্থে আমাদের প্রচেষ্টা
সার্থক হয়েছে। এজন্য আমরা
ধন্য। আপনাদের অভিনন্দন আমি সানন্দে গ্রহণ করেছি।

-দস্যু বনহুর

চিঠির কথা অল্পক্ষণের মধ্যেই ফোনে সমস্ত সামরিক অফিসে পৌঁছে গেল। পৌঁছল পুলিশ অফিসে প্রত্যেকটা অফিসারের কানে। সবাই নির্বাক, বিস্ময়ে স্তম্ভিত-এ যে কল্পনার অতীত”! যে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য অহঃরহ পুলিশ বাহিনী উন্মাদের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুলিশ সুপার যাকে জীবিত কিংবা মৃত এনে দেবার জন্য লাখ টাকা ঘোষণা করেছেন, সেই দস্যু বনহুর আজ সকলের অভিনন্দন গ্রহণের পাত্র।

কথাটা পত্রিকায় বিরাট আকারে প্রকাশ পেল।

লোকের মুখে মুখে, পথে-ঘাটে-মাঠে সর্বত্র দস্যু বনহুরের জয়-জয়কার!

নূরী গহন বনে বসে শুনলো সব। আনন্দে স্ফীত হয়ে উঠলো তার বুক। তার বনহুর আজ জয়ের টিকা ললাটে পরে ফিরে এসেছে। কি বলে যে সে অভিনন্দন জানাবে খুঁজে পেল না। আনন্দোচ্ছাসে গুণ গুণ করে গান গাইতে লাগলো সে। ইচ্ছে হল, হাওয়ায় ডানা মেলে ভেসে বেড়াবে-কিন্তু সে যে মানুষ! বনে বনে ঘুরে অনেক ফুল সগ্রহ করলো, ঝর্ণার পাশে বসে সুন্দর করে মালা গাঁথলো। তারপর পা টিপে টিপে প্রবেশ করলো বনহুরের বিশ্রামকক্ষে। অতি সন্তর্পণে বনহুরের বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

বনহুর বিছানায় অর্ধশায়িত অবস্থায় শুয়ে শুয়ে কি যেন ভাবছিল। শরীর ক্লান্ত, তাই কোথাও বের হয় নি সে। নূরী ঠিক তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর চট করে মালাখানা পরিয়ে দিল সে তার গলায়।

বনহুর মৃদু হেসে বললো–খুব যে খুশি দেখছি, ব্যাপার কি নূরী?

নূরী হেসে বললো–হুর, আজ কি বলে তোমাকে……

থাক, ঐ ঢের হয়েছে। বস।

নূরী বনহুরের বিছানার একপাশে বসে পড়ে বলল–হুর, আজ তোমার জয়গানে দেশবাসী পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে।

কে বলল এসব কথা তোমাকে?

কেন, রহমান–রহমান সব পত্রিকাগুলো আমাকে এনে দিয়েছে।

তুমি পত্রিকা পড়তে শিখেছ?

বাঃ তোমার বুঝি মনে নেই? তুমিই তো আমাকে লেখা আর পড়া শিখিয়েছ?

এতোবড় যে পণ্ডিত হয়েছ তা জানতাম না।

পত্রিকা পড়তে পারলেই বুঝি পণ্ডিত হয়? অভিমান-ভরা কণ্ঠস্বর নূরীর।

বনহুর ওর চিবুক উঁচু করে ধরে ছিঃ, সামান্যতেই অমন রাগ করতে নেই। নূরী, ধরো আর যদি ফিরে না আসতুম?

নূরী বনহুরের মুখে হাতচাপা দেয়।

বনহুর কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় রহমান দরজার ওপাশে এসে দাঁড়ায়– সর্দার!

বনহুর গলা থেকে মালাটা খুলে পাশের টেবিলে রেখে বিছানায় সোজা হয়ে বসে বলে– এসো।

রহমান এসে দাঁড়াতেই নূরী হেসে বলে–রহমান নয়, জব্বার খাঁ।

সবাই হাসলো।

রহমান বলল–সর্দার, একটি কথা আছে।

বনহুর বিছানা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে বলল–চলো।

বাইরে আকাশের নিচে এসে দাঁড়ালো বনহুর আর রহমান। বনহুর জিজ্ঞাসা করলো–কি কথা রহমান?

সর্দার সেই মেয়েটি…থেমে যায় রহমান।

বনহুর ভ্রু কুচকে তাকায় রহমানের মুখের দিকে-কোন মেয়েটি? কি ব্যাপার?

সর্দার, সেই যে মনসাপুরের জমিদার-কন্যা সুভাষিণীর কথা বলছি।

কেন, হসপিটাল থেকে সে বাড়ি ফিরে যায় নি?

গিয়েছে–কিন্তু…

থামলে কেন, বল?

মেয়েটি নাকি পাগল হয়ে গেছে?

বল কি? মেয়েটি পাগল হয়ে গেছে? কিন্তু কেন?

রহমান একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলে–সুভাষিণী এমন একজনকে ভালবাসছে, যাকে–যাকে সে কোনদিন পাবে না।

সকলের অজ্ঞাতে নূরী একটি গাছের আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছিল। গোপনে সে রহমান আর বনহুরের কথাবার্তা সব শুনছিল। সুভাষিণীর নাম তার পরিচিত। গোপনে তার বিষয়ে আলোচনা শুনেই চমকে উঠছিল সে। এখন কিছুটা ঘেমে উঠে। না জানি কাকে ভালবেসেছে। আশঙ্কা জাগে মনে–তার হুরকে নয়তো। আরো ভালোভাবে কান পাতে নূরী।

বনহুরের কণ্ঠস্বর শোনা যায়–এটাই তোমার গোপন কথা?

হাঁ সর্দার। মেয়েটির যা অবস্থা, তাতে সে বেশিদিন বাঁচবে বলে মনে হয় না। যদি সে....পুনরায় থেমে যায় রহমান।

বনহুর গম্ভীর গলায় বলে–থামলে কেন?

মাথা চুলকে বলে রহমান–মানে তার ভালোবাসার পাত্রটিকে যদি না পায়, তাহলে....

বাঁচবে না–এ তো বলতে চাচ্ছো?

হ্যাঁ সর্দার।

কে সে যুবক যাকে ভালবাসে? সুভাষিণীর মত সুন্দরী গুণবতী যুবতাঁকে যে উপেক্ষা করতে পারে? বল, আমি তাকে উচিত সাজা দেব।

রহমান নীরব।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

সর্দার, আপনি যদি একবার তার সঙ্গে দেখা করতেন, তাহলে হয়তো কাকে সে ভালবাসে, জানতে পারতেন।

সে এখন কোথায়?

মনসাপুরে। পিতামাতার কাছে।

বেশ, আমি তার সঙ্গে দেখা করব–তুমি তার আয়োজন কর। আমি জানতে চাই কাকে সে ভালবাসে।

তাকে এনে দিতে পারবেন সর্দার?

দস্যু বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই রহমান। ছলে-বলে–কৌশলে তাকে রাজি করাব। যত টাকা চায় তাই দেব। তবু যদি স্বীকার না হয়, বন্দী করে নিয়ে আসব। সামান্য ভালবাসার জন্য একটি সুন্দর ফুলের মত জীবন বিনষ্ট হতে পারে না।

মারহাবা সর্দার। তারপর রহমান চলে যায় সেখান হতে।

বনহুর ধীর মন্থর গতিতে ফিরে আসে নিজের কক্ষে।

ইতোমধ্যে নূরী এসে নিজ জায়গায় বসে পড়েছিল।

বনহুর এসে পুনরায় বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে।

নূরী গম্ভীর মুখে বসেছিল, বলে–হুর, আজও তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারলে না!

কেন?

ঐ যে গোপনে কি সব আলোচনা কর?

সব কথা তোমার শোনা উচিত নয় নূরী।

কেন, আমি কি সব বুঝি না?

ওসব চুরি-ডাকাতির ব্যাপার কি শুনবে....

মিথ্যে কথা! রহমান কোন মেয়ে সম্বন্ধে তোমাকে কি সব বলছিল না?ওঃ সেই কথা? হ্যাঁ, ঐ যে মনসাপুরের জমিদার-কন্যা সুভাষিণীর সম্বন্ধে বলল রহমান। মেয়েটি নাকি পাগল হয়ে গেছে।

আমি সব শুনেছি।

দেখ, মেয়েটিকে বাঁচাতে হলে আমাকে একবার সেখানে যেতে হবে। জানতে হবে কাকে সে ভালবাসে। যেমন করে হোক, তার ভালবাসার পাত্রটিকে এনে দিতে হবে.....

সব কাজেই তোমার মাথাব্যথা। আমি বুঝতে পারি না এসব।

সে জন্যই তো বলেছিলুম সব কথা তুমি জানতে চেও না নূরী।

নূরী আর কোন কথা না বাড়িয়ে তখনকার মত চলে যায় সেখান হতে।

বনহুর এবার পাশ ফিরে শোয়, কিন্তু মনে তখন একটি অতি পরিচিত মুখ ভেসে উঠছে। যুদ্ধ থেকে ফিরে কয়েক দিন বেশ অসুস্থ বোধ করেছিল সে। মনিরা নিশ্চয়ই অভিমান করে বসে আছে। যেমন ভাবা অমনি বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল! ইস কতদিন মনিরাকে দেখেনি! চটপট তৈরি হয়ে নিল বনহুর। আজ সে দস্যু বনহুরের বেশে নয়, সৈনিকের বেশে সজ্জিত হয়ে তাজের পাশে এসে দাঁড়াল।

তাজ মনিবকে পাশে পেয়ে সম্মুখের পা দিয়ে মাটিতে মৃদু আঘাত করতে লাগল।

বনহুর তাজের পিঠ চাপড়ে আদর করল, তারপর উঠে বসল তার পিঠে।

তাজ এবার উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করল।

.

তাজের পিঠে বনহুর ছুটে চলেছে। মনে তার রঙিন স্বপ্নের নেশা। কতদিন পর মনিরাকে পাশে পাবে সে। বিদায় দিনে মনিরার অশ্রুসজল মুখখানা ভাসতে লাগলো তার চোখের সম্মুখে।

ঐ দেখা যাচ্ছে চৌধুরী বাড়ির বিরাট প্রাচীর। অন্ধকারের আড়ালে বিরাট প্রাসাদের এক অংশ দেখা যাচ্ছে। আকাশে অসংখ্যা তারকারাজি। নীল শাড়ির বুকে যেন জরীর বুটিগুলো ঝিকমিক করছে। অন্ধকার নির্জন পথ।

বনহুরের অশ্ব নিঃশব্দে চৌধুরী বাড়ির পিছন প্রাচীরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বনহুর কালবিলম্ব না করে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে প্রাচীরের উপরে উঠে বসল। হঠাৎ মনটা যেন কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। মনিরার কক্ষ অন্ধকার। জানালা দিয়ে কোনো আলোর ছটা আজ তাকে অভিনন্দন জানাল না। প্রাচীর টপকে ভিতরে প্রবেশ করলো বনহুর। তারপর দ্রুত পাইপ বেয়ে উঠে গেল উপরে। কিন্তু একি! মনিরার কক্ষের প্রত্যেকটা জানালা বন্ধ-তবে কি মনিরা এ কক্ষে থাকে না!

বনহুর রেলিং বেয়ে বেলকুনিতে গিয়ে পৌঁছে। মনিরার দরজার পাশে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়-দরজায় তালা লাগানো। মুহূর্তে বনহুরের মুখমণ্ডল অন্ধকার হয়ে পড়ল। সেকি, মনিরা তবে গেল কোথায়! নিশ্চয়ই তাহলে মামীমার কক্ষে শুয়েছে। বনহুর পাশের কক্ষের দরজার নিকট দাঁড়িয়ে ভাবলো, তবে কি সে ফিরে যাবে? তা হয় না, মনিরাকে না দেখে ফিরে যেতে পারে না। সে। কিন্তু কি উপায়ে কক্ষে প্রবেশ করবে সে। দস্যু বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই। রেলিং বেয়ে কক্ষের পিছনের জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ওপাশের আর একটি কক্ষ থেকে ভেসে আসছে চৌধুরী সাহেবের নাসিকাধ্বনি। বনহুর কতকটা আশ্বস্ত হল। এ কক্ষে তাহলে তার মা আর মনিরা শুয়েছে। কতদিন পর মায়ের কথা স্মরণ হতে দু'চোখে পানি এলো। আজ মা-কেও দেখবে সে।

.

কক্ষে ডিমলাইট জ্বলছে। বনহুর অল্প চেষ্টাতেই জানালার শার্সী খুলে কক্ষে প্রবেশ করল। ধীরে অতি সন্তর্পণে এগুতে লাগলো কিন্তু একি! বিছানায় শুধু একটি মহিলাই শুয়ে রয়েছেন। মনিরা কই? তবে কি মনিরা অন্য কোন কক্ষে শুয়েছে? ফিরে যাবার পূর্বে মায়ের মুখখানা দেখার। প্রবল বাসনা জাগল তার মনে। প্যান্টের পকেট থেকে ম্যাচটা বের করে একটা কাঠি জ্বালাল। বনহুর। এগিয়ে ধরলো মায়ের মুখের পানে।

হঠাৎ মরিয়ম বেগমের ঘুম ভেঙ্গে গেল, চোখ মেলেই চিৎকার করতে গেলেন তিনি, অমনি বনহুর তার মুখে হাতচাপা দিয়ে বলল–মা!

মরিয়ম বেগম ততক্ষণে বিছানায় উঠে বসেছেন। চোখ রগড়ে বলেন–কে-কে তুই?

বনহুর নিশ্চপ, সোজা হয়ে দাঁড়াল সে।

মরিয়ম বেগম শয্যা থেকে নেমে দাঁড়ালেন, হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে বনহুরকে দেখে দু'পা পিছিয়ে গেলেন। বনহুরের শরীরে সম্পূর্ণ সৈনিকের ড্রেস দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

বনহুর বুঝতে পারল, তার মা তাকে চিনতে পারেন নি। আর চিনবেনই বা কি করে। বনহুর মাথার ক্যাপটা খুলে আলোর সম্মুখে এগিয়ে দাঁড়াল। তারপর ধীরস্থির শান্ত কণ্ঠে বলল–মা, আমি তোমার সন্তান।

মরিয়ম বেগম নিষ্পলক আঁখি মেলে তাকালেন' বনহুরের উজ্জ্বল-দীপ্ত মুখের দিকে। কই, একে তো মনে পড়ছে না-তার মনির এটা! ফুলের মত সুন্দর একটি মুখ ভেসে উঠলো চোখের সামনে। হঠাৎ মনে পড়ল মনিরের ললাটের এক পাশে কাটা একটি দাগ ছিল। ছোটবেলায় বড় দুষ্ট ছিল মনির-গাছ থেকে পড়ে কপালটা বেশ কেটে গিয়েছিল। মরিয়ম বেগম বনহুরের ললাটে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মরিয়ম বেগমের অস্ফুট কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এলো-বাবা মনির।

বনহুর মায়ের বুকে মুখ গুঁজে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ডেকে উঠল,মা, আমার মা!

কতদিন পর পুত্রকে ফিরে পেয়েছেন মরিয়ম বেগম। আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন তিনি, কচি শিশুর মত বনহুরের মুখে-মাথায়-পিঠে হাত বুলাতে থাকেন। চোখ দিয়ে তার ঝরে পড়তে থাকে আনন্দ-অশ্রু। তিনি যেন হারানো রত্ন খুঁজে পেয়েছেন। খুশিতে আত্মহারা হয়ে ডাকতে থাকেন–ওগো, শুনছো, দেখে যাও, দেখে যাও কে এসেছে.....

বনহুর মায়ের মুখে হাতচাপা দিয়ে বলে–মা, চুপ করো। চুপ করো।

ওরে তোর আব্বাকে ডাকছি......

না, আজ নয় মা, আজ নয়। আব্বাকে তুমি আজ ডেকো না। মা, একটি কথার জবাব দাও?

বল, ওরে বল?

মা, মনিরা কই? ওকে তো দেখছিনে

মুহূর্তে মরিয়ম বেগমের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে পড়লো। শুষ্ক কণ্ঠে বলেন–আজ প্রায় দু'সপ্তাহ হল মনিরাকে কে বা কারা চুরি করে নিয়ে গেছে বাবা।

বনহুরের চোখ দুটো ধক করে জ্বলে উঠে-আর তোমরা চুপ করে বসে আছো!

না রে না। পুলিশকে জানানো হয়েছে। জোর খোঁজা-খুঁজি চলছে। তোর আব্বা তো পাগলের মত হয়ে গেছেন। কি হবে বাবা, মনিরাই যে আমাদের চৌধুরী বংশের ইজ্জৎ।

মা, তুমি যতটুকু জান খোলসা বল-কবে, কিভাবে, কোথা থেকে সে চুরি হয়ে গেছে? বনহুরের কণ্ঠে একরাশ চঞ্চলতা ঝরে পড়ল।

মরিয়ম বেগম সংক্ষেপে সব বললেন।

স্তব্দ নিঃশ্বাসে শুনলো বনহুর। দু'চোখে তার আগুন ঝরে পড়তে লাগল। নিঃশ্বাস দ্রুত বইছে। বার বার দক্ষিণ হস্তখানা প্যান্টের পকেটে রিভলভারের বাটে গিয়ে ঠেকছে। অধর দংশন করতে লাগলো বনহুর। সমস্ত মুখমণ্ডল তার কঠিন হয়ে উঠেছে।

মরিয়ম বেগম পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলেন।

বনহুর আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে মায়ের পায়ে সালাম করে উঠে দাঁড়াল।

মরিয়ম বেগমের চোখ দিয়ে তখন অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তিনি প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন।

বনহুর ক্যাপটা মাথায় দিয়ে একবার ফিরে তাকালো মায়ের মুখে।

মরিয়ম বেগম কিছু বলতে গেলেন, কিন্তু ততক্ষণে মুক্ত জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেছে বনহুর।

মরিয়ম বেগম ছুটে গেলেন জানালার পাশে। অস্ফুট কণ্ঠে ডাকলেন–মনির!

মনির ততক্ষণে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

বনহুর যখন তাজের পিঠে চেপে বসলো, তখন দমকা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আকাশে তারকারাজিগুলো মেঘের অন্তরালে লুকিয়ে পড়েছে। অন্ধকারে তাজের কালো দেহটা মিশে গেছে। যেন।

কিছু পূর্বেই বনহুরের মনে ছিল অফুরন্ত আনন্দ, আশা-বাসনা-মনিরার সঙ্গে সাক্ষাতের এক উদ্যম প্রেরণা। সব যেন এক নিমিষে অন্তর্ধান হয়ে গেছে। ক্রুদ্ধ সিংহের মত হিংস্র হয়ে উঠল বনহুর। কে সে পিশাচ যে তার মনিরাকে হরণ করতে পারে! এ মুহূর্তে বনহুর তাকে পেলে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেলবে।

বনহুরের অশ্ব যখন আস্তানায় গিয়ে পৌঁছল তখন পূর্ব আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে। বনহুর পৌঁছতেই দু'জন বলিষ্ঠ লোক তাজকে ধরে ফেলল। বনহুর সোজা দরবার-কক্ষে প্রবেশ করল। ক্ষিপ্তের ন্যায় চিৎকার করে ডাকলো-রহমান! রহমান!

রহমান দ্রুত কক্ষে প্রবেশ করে সেলুট করে দাঁড়াল-সর্দার।

এ মুহূর্তে আমার সমস্ত অনুচরগণকে ডেকে বলে দাও-শহরে-গ্রামে, ঘাটে-মাঠে, গহন বনে সমস্ত জায়গায় তাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে। যে যে-কোন ছদ্মবেশে যাবে। সাধু-সন্ন্যাসী, ভিখারী, অন্ধ, নাপিত, ধোপা-যে যা পারে। চৌধুরী সাহেবের মনে মনিরা চুরি হয়ে গেছে, কে বা কারা তাকে হরণ করেছে, কেউ জানে না। পুলিশ জোর তদন্ত চালিয়েও মেয়েটির কোন সন্ধান করতে পারছে না। আমি চাই তোমরা কৃতকার্য হবে। যাও, এক্ষুণি চলে যাও।

রহমান মাথা চুলকে বলে–চৌধুরী কন্যার জন্য…মানে….

আমার এতো মাথাব্যথা কেন, এইতো বলতে চাচ্ছো?

তিনি বুঝি কন্যার জন্য বড় রকমের পুরস্কার ঘোষণা করেছেন? কথাটা বলে রহমান।

না, তিনি করেন নি, আমি করলুম। যে চৌধুরী কন্যার সন্ধান সর্বপ্রথম এনে দিতে পারবে সে আমার সবচেয়ে প্রিয় হবে এবং আমি তাকে লাখ টাকা পুরস্কার দেব।

রহমান বেরিয়ে যায়।

বনহুর ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারি করতে থাকে। গোটা রাত অনিদ্রায় চোখ দুটো লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। মাথার চুলগুলো এলোমেলো; ললাটে গভীর চিন্তারেখা ফুটে উঠেছে।

এমন সময় নূরী কক্ষে প্রবেশ করলো। রহমান তাকে কথাটা বলেছে। নূরীর মনেও ঝড় বইতে শুরু করেছে। চৌধুরী-কন্যার জন্য তার এত দরদ কেন! লাখ টাকা পুরস্কার দেবে বনহুর কেন, কেন এতো উম্মত্ত হয়ে উঠেছে সে। বীর পদক্ষেপে বনহুরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল নূরী। বনহুরের চেহারা দেখে হঠাৎ কিছু বলতে সাহস হলো না তার। তবু একটু কেশে বলল নূরী– হুর, হঠাৎ তোমার কি হয়েছে, অমন করছো কেন?

বনহুরের কানে নূরীর কণ্ঠ পৌঁছলো কিনা কে জানে। বনহুর দ্রুত সেখান থেকে চলে গেল নিজের কক্ষে। ক্ষিপ্র-হস্তে শরীর থেকে পোশাক বদলাতে লাগল। বনহুরের চোখে-মুখে এক উম্মত্ত ভাব ফুটে উঠেছে। শিকারীর ড্রেসে সজ্জিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো সে। পিঠের সঙ্গে রাইফেল বাঁধা। কোমরের বেল্টে গুলীভরা রিভলভার।

নূরী এসে সম্মুখে দাঁড়ালো-কোথায় যাচ্ছো হুর?

শিকারে।

হঠাৎ আজ এই অসময়ে শিকারের খেয়াল হল কেন?

অনেক দিন শিকারে যাইনি তাই।

কিন্তু না খেয়েই যাবে? গোটা রাত বাইরে কাটিয়ে এই তো সবে ফিরলে–চলো, কিছু মুখে দিয়ে যাও।

না, ক্ষুধা আমার পায় নি নূরী।

তা হবে না, তোমাকে কিছু না খেয়ে এই সকাল বেলা বেরুতেই দেব না।

নূরী!

নূরীর মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হয় বনহুরের, বলে সে–চলো।

বনহুর আর নূরী খাওয়ার কক্ষে এসে বসলো।

বাবুর্চি টেবিলে চা-নাস্তা সাজিয়ে রাখল। নূরী খাবার এগিয়ে দিল বনহুরের সম্মুখে। বনহুর অন্যমনস্কভাবে খাবার মুখে তুলে দিতে লাগল। একটু খেয়েই উঠে পড়ল সে।

নূরী ব্যথিত কণ্ঠে বলল–একি, কিছুই যে খেলে না হুর?

এই তো অনেক খেয়েছি–টেবিলে ঠেস দেওয়া রাইফেলটা হাতে উঠিয়ে নেয় বনহুর।

নূরী ব্যাকুল আঁখি মেলে তাকায় বনহুরের মুখের দিকে, শত শত প্রশ্ন তার মনকে অস্থির। করে তুলছে, কিন্তু বনহুরকে কিছুই জিজ্ঞাসা করার মত অবকাশ হয় না তার।

বনহুর নূরীর স্থির মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠে–আল্লাহ হাফেজ।

বনহুর বেরিয়ে যায়।

নূরী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

০০৪. নথুরামের কবলে মনিরা

নথুরামের কবলে মনিরা – রোমেনা আফাজ

আজ কদিন হয় মনিরা এই অন্ধকার কক্ষে বন্দী হয়ে রয়েছে। এ কদিনের মধ্যে দু'দিন মাত্র খেয়েছে সে। আর বাকি দিনগুলো পানি ছাড়া কিছু মুখে দেয়নি। চোখ বসে গেছে। চুল এলোমেলো বিক্ষিপ্ত। ক'দিন গোসলেরও নাম করেনি সে। অবশ্য তাকে এসবের জন্য সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

মনিরাকে এই অন্ধকার কক্ষে বন্দী করে রাখার পর প্রায়ই আসতো নাথুরাম আর তার সঙ্গী জগাই। জগাইও নাথুরামের চেয়ে কুৎসিত কম নয়। হৃদয়টাও তেমনি জঘন্য শয়তানিতে ভরা। কঠিন পাথরের মত মন। যেমন নাথুরাম তেমনি তার সঙ্গী।

এদের দেখলেই মনিরা মুখ ফিরিয়ে নিতো। ঘৃণায় কুঞ্চিত হত তার নাসিকা। ওরা কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলে মনিরা জবাব দিতো না। খাবার নিয়ে এলে খেত না সে। নাথুরাম কুৎসিত ইংগিতপূর্ণ তামাশা করতে ছাড়ত না। মনিরা নিশূপে শুনে যেত, কারণ সে জানে কোন কথা বলে লাভ হবে না। বরং এতে তার বিপদ আরও বাড়বে। তাই নীরবে সহ্য করে যেতো। কিন্তু এ ক'দিনের মধ্যে মনিরার চোখের পানি একটিবার শুকিয়েছে কিনা সন্দেহ।

নাথুরাম কুৎসিত ইংগিতপূর্ণ হাসি-তামাশা করা ছাড়া মনিরার সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করতে সাহসী হত না, কারণ তারা জানতো মনিরা মুরাদের ভাবী বধূ।

মনিরাকে মুরাদের হাতে পৌঁছানোর জন্য মোটা বখশিস পেয়েছে তারা, ভবিষ্যতে আরও পাবে। নাথুরাম তার সঙ্গী জগাইকে নিষেধ করে দিয়েছে কেউ যেন মনিরার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার না করে।

মনিরা দাঁতে দাঁত পিষতো। কিন্তু কি উপায় আছে। সে দুর্বল অসহায় নারী।

মনিরা যখন বেশ কদিন না খেয়ে কাটিয়ে দিল তখন এক বুড়ীকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো নাথু। মনিরাকে সর্বক্ষণ দেখা-শোনা আর নাওয়া-খাওয়া করানোর ভার দিল তার উপর। খুব সাবধানে কড়া পাহারায় রাখার নির্দেশ দিল নাথুরাম।

মনিরা তবু মনে কিছুটা সাহস পেল। যা হউক বৃদ্ধা হলেও সে নারী। নাথুরাম আর জগাইয়ের হাত থেকে আপাতত রক্ষা পেল সে তাহলে।

নাথুরাম আর জগাই বারবার বৃদ্ধাকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় একটা চাবি বুড়ীর হাতে দিয়ে বলল নাথুরাম-সতী, এই নাও চাবি, তুমি যখনই বাইরে যাবে, দরজায় তালা মেরে যাবে, দেখ মেয়েটা যেন না পালায়।

বৃদ্ধা জবাব দিল-কি যে বলো! আমার নাম সতী, আমার নিকট থেকে মেয়ে পালাবে, অমন জীবন রাখব না।

নাথুরাম হেসে বেরিয়ে গেল, জগাই তাকে অনুসরণ করলো।

এতক্ষণে মনিরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো বৃদ্ধার দিকে। ঠিক বৃদ্ধা নয় বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দাঁতও পড়েছে অনেকগুলো। দু'চারটে যা আছে তাও নড়ছে। কথা বলার সময় বেশ বুঝা গেল সেটা।

বৃদ্ধার চুল পাকলে কি হবে। দাঁত নড়লেও কিছু আসে যায় না, তার সাজ-সজ্জা ছিল খুব। বিনুনী করে খোঁপা বাঁধা, কপালে সিঁদুরের টিপ, গালে কুমকুম, ঠোঁটে পানের রংঙের সঙ্গে লাল রং মেশানো রয়েছে। বৃদ্ধার গায়ের রং তামাটে। নাকটা বোঁচা, কেমন যেন বিদঘুঁটে চেহারা। ওকে দেখে মনিরার গা রি রি করে উঠল। যা চেহারা তার নাম আবার সতী। তবু এই নির্জন : সহায়-সম্বলহীন কক্ষে ওকেই মনিরা সাথী করে নিল।

মনিরাকে সতী তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হেসে বললো–কিগো, অমন করে তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখছ?

মনিরা নিশ্চুপ থাকা ঠিক মনে করলো না, সেও বেশ স্বচ্ছকণ্ঠে বলল–একটু পানি দেবে আমাকে?

বুড়ী হেসে বলল–পানি খাবে তাই আবার এত কথা। দাঁড়াও এনে দিচ্ছি।

বুড়ী লণ্ঠন হাত বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যাবার সময় দরজার তালা লাগাতে ভুলল না সে।

মনিরা বুঝল বুড়ী খুব চালাক। একটু পর এক গেলাস পানি হাতে কক্ষে প্রবেশ করলো সতী। বাঁ হাতে লণ্ঠন, দক্ষিণ হাতে পানির গেলাস।

মনিরা ভাবলো-বুড়ীকে কাবু করে পালানো খুব সহজ, কিন্তু কক্ষের বাইরে বলিষ্ঠ দু'জন পাহারাদার বন্দুক হাতে সতর্কভাবে পাহারা দিচ্ছে, তাদের চোখে ধুলা দিয়ে পালানো সম্ভব হবে না। তাছাড়া কক্ষটা কোথায়, শহরে না গহন বনে, মাটির নিচে না উপরে-তাও জানে না সে।

বুড়ীর হাতে থেকে পানির গেলাসটা নিয়ে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে বলে মনিরা-আচ্ছা, তোমাকে আমি কি বলে ডাকবো?

সতী দিদি বলে ডেকো-এ নামেই সবাই আমাকে ডাকে।

এরপর থেকে সতী বুড়ীই মনিরার খোঁজখবর নিতো। খাবার সময় হলে খাবার নিয়ে আসতো। মাঝে মাঝে চুল আঁচড়ে বেঁধে দিতো। কিন্তু বুড়ী যাওয়ার সময় লণ্ঠনটা নিয়ে যেত। তখন মনিরা অন্ধকারে প্রহর গুণতো। কক্ষে অন্য কোন আলোর ব্যবস্থা না থাকায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো সে। অসুবিধা হত অনেক। তবু নীরবে প্রতীক্ষা করতে সতীর। দরজার দিকে হা করে তাকিয়ে থাকতো। এমনিভাবে আর কতদিন কাটবে!

একদিন বুড়ীর হাত পা ধরে কেঁদেছিল মনিরা, তাকে একটু বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছিল সে। কিন্তু বুড়ী বড় শক্ত। পাষাণ তার হৃদয়। হেসে বলেছিল-সাহেব ভাল হলে কত বাইরে যাবে, যেও। কত হাওয়া খাবে, খেও। তুমিই তো তাকে জখম করেছ।

মনিরা তবু শেষ চেষ্টা করে বলেছিল, তোমাকে অনেক টাকা দেব সতী দিদি।

বুড়ী জবাব দিয়েছিল-আমার তো টাকার কোন অভাব নেই। সাহেব আমাকে হাজার হাজার টাকা দিয়েছে। শুধু তুমি কেন, তোমার মত কত যুবতীকে আমি বাগে রেখেছি। তারা এখন সবাই আমার হাতের মুঠোয়। শিউরে উঠেছিল মনিরা,

কিছুক্ষণ স্তব্ধ চোখে লণ্ঠনের আলোতে তাকিয়ে তাকিয়ে বুড়ীকে দেখেছিল। ভাবছিল, এর হাত থেকে বুঝি আর রক্ষা নেই।

বুড়ি যাবার সময় আলো নিয়ে চলে যায় কেন, একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল মনিরা তাকে। বুড়ি হেসে বলেছিল-আমি বোকা মেয়ে নই। তোমার মত অমন কত যুবতাঁকে আমি বশে রেখেছি। কারও ঘরে লণ্ঠন রাখিনি।

কেন রাখনি।

কেন রাখিনি জান? তোমরা যদি শাড়িতে আগুন ধরিয়ে পুড়ে মর।

বুড়ীর বুদ্ধির জোর দেখে মনিরা এত দুঃখেও হেসেছিলো। তার নিজের এতটুকু বুদ্ধিও নেই, তাহলে সেদিন সে নিজ হাতে দরজা খুলে বেরিয়ে আসতো না। হায়, কি সর্বনাশ সেদিন মনিরা করে বসেছে। এতদিনে হয়তো মনির ফিরে এসেছে। হয়তো তার সন্ধান নিতে এসে নিরাশ হৃদয় নিয়ে ফিরে গেছে। তার মামুজান আর মামীমার অবস্থা যে কি দাঁড়িয়েছে কে জানে। হয়তো পুলিশ মহল তার সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু এখন সে কোথায় রয়েছে নিজেই জানে না। যে ঘরে। সে বন্দী সে ঘর খানা কোথায়-মাটির বুকে না মাটির নিচে? আজ বুড়ী এলে যেমন করে থোক এ কথা জেনে নেবে মনিরা। অসহ্য অন্ধকার-মনিরা হাঁপিয়ে উঠেছে। আলো, আলো-একটু আলো তার প্রয়োজন।

মনিরার চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন করে অন্ধকারে আলোকরশ্মি ভেসে এলো। কখন যে দরজা খুলে লণ্ঠন হাতে বুড়ী এসে দাঁড়িয়েছে, খেয়াল করেনি সে।

মনিরা বুড়ীকে দেখে উঠে দাঁড়ালো, সঙ্গে সঙ্গে ভূত দেখার মত চমকে উঠলো সে–বুড়ীর পেছনে যমদূতের মত দাঁড়িয়ে আছে মুরাদ। গায়ে জামার পরিবর্তে একটি চাদর জড়ানো।

মনিরাকে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়াতে দেখে বলল মুরাদ-ভয় নেই, ভূত নই মনিরা। তোমার ছোরার আঘাতে আমার মৃত্যু ঘটেনি।

দাঁতে দাঁত পিষে বলে মনিরা-তা আমি জানি।

জান! আমার মৃত্যু ঘটেনি, জেনে খুশি হয়েছিলে প্রিয়ে?

মনিরা কোন জবাব দিল না।

মুরাদ বুড়ীকে বেরিয়ে যেতে ইংগিত করলো।

বুড়ী মেঝের একপাশে লণ্ঠন নামিয়ে রেখে বেরিয়ে যায়।

মনিরা প্রমাদ গণে। এতক্ষণ তবু কতকটা সে আশ্বস্ত ছিল, বুড়ী বেরিয়ে যেতেই কণ্ঠতালু তার শুকিয়ে ওঠে। বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয় মুখমণ্ডল। হিংস্র জন্তুর কবলে যেমন মেষশাবকের অবস্থা হয়, তেমনি অবস্থা হয় মনিরার। এই নির্জন কক্ষে আজ তাকে রক্ষা করার মত কেউ নেই। মনিরা অসহায়ের মত পিছু হটতে লাগল।

মুরাদের মুখে কুৎসিত হাসি ফুটে উঠেছে, দু'চোখে লালসাপূর্ণ চাহনি। গম্ভীর কণ্ঠে বলল–মনিরা, তুমি যে আঘাত আমাকে দিয়েছ, তা আমি নীরবে সহ্য করেছি, অন্য কোন নারী হলে আমি তাকে হত্যা করতাম।

মনিরা তীব্রকণ্ঠে বলল–তাই কর, তুমি আমাকে হত্যা কর শয়তান। এ বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো।

মুরাদ অদ্ভুত একটা শব্দ করলো–তাই নাকি? কিন্তু তোমাকে হত্যা করে আমি বাঁচবো কেমন। করে! এসো লক্ষীটি আমার। মনিরা, জান তোমাকে আমি কত ভালবাসি! আমার গোটা হৃদয় জুড়ে তুমি আর তুমি। তোমাকে পাবার দুর্বিসহ জ্বালা আমার গোটা অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমার শরীরে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছ তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষত হয়েছে আমার মনে। তোমাকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব।

মনিরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছে মুরাদের কথাগুলো। বারবার জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দু'খানা চেটে নিচ্ছিল। চোখের দৃষ্টি অসহায়ের মত ছুটে যাচ্ছিলো দরজার দিকে। এই মুহূর্তে কেউ কি তাকে বাঁচাতে পারে না। বুড়ীটা এলেও একটু সাহস হত তার। মনে-প্রাণে খোদাকে স্মরণ করে মনিরা।

লণ্ঠনের আবছা আলোতে মুরাদকে একটা ভয়ঙ্কর জীব বলে মনে হয় মনিরার। ক'দিনের। অনাহারে শরীর দুর্বল। কণ্ঠতালু শুকিয়ে আসছে। চোখদুটিও বারবার ঝাপসা হয়ে আসছে। বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। এবার আর তার রক্ষা নেই। পাপিষ্ঠ মুরাদ আজ তাকে পাকড়াও করবেই। কিন্তু তা কিছুতেই হতে পারে না। যেমন করে হোক নিজকে ওর কবল থেকে বাঁচাতেই

হবে। মনিরা মনে মনে এক বুদ্ধি আঁটলো হঠাৎ দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে বলে উঠলো-উঃ একি হল! চোখে এমন অন্ধকার দেখছি কেন, মা-মাগো-মনিরার দেহটা টলছে।

মুরাদ হঠাৎ ভড়কে যায়। অধীর কণ্ঠে বলে ওঠে–কি হল মনিরা, কি হল তোমার? যেমনি মুরাদ ওকে ধরতে যাবে অমনি মেঝেতে পড়ে গেল মনিরা।

মুরাদ তাড়াতাড়ি ওর মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাকল-সতী-সতী—

সতী বুড়ী হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করলো–আমায় ডাকছেন বাবু?

হ্যাঁ, দেখো সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। শিগগির পানি নিয়ে এসো।

বুড়ী সতী দেবী ছুটলো পানি আনতে।

মনিরা তবু নিশ্চিন্ত নয়। মুরাদের কোলে মাথা রেখে মনটা তার ভয়ে শিউরে উঠছে, তবু নীরবে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল।

সতী অল্পক্ষণের মধ্যেই এক ঘটি পানি নিয়ে হাজির হল–এই নিন পানি।

মুরাদ পানি নিয়ে মনিরার চোখেমুখে ঝাঁপটা দিতে শুরু করল আর বার বার ডাকতে লাগলো-মনিরা, মনিরা.....

মনিরা কিন্তু কিছুতেই চোখ মেললো না, যদিও পানির ঝাঁপটা তার অসহ্য লাগছিল তবু নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে রইল।

মুরাদ তখন মনিরার জ্ঞান ফিরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, ঠিক তক্ষুণি কারও অশ্বপদ শব্দ শোনা গেল। মুরাদ বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করলো–কে এলো সতী?

সতী জবাব দেবার পূর্বেই শোনা গেল একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর-হুজুর আমি।

ওঃ নাথুরাম, এতদিন কোথায় ডুব মেরেছিলে নাথু?

হুজুর, আমার অনেক কাজ। অনেক দিকে আমাকে সন্ধান রাখতে হয়। কিন্তু ওর কি হয়েছে হুজুর?

হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। নাথু, অনেকক্ষণ পানির ছিটা দিচ্ছি, তবু জ্ঞান ফিরছে না, কি করা যায় বলতো?

দেখি আমি। মনিরার পাশে বসে নাথুরাম।

মনিরার অন্তর কেঁপে ওঠে। আর কতক্ষণ নিজকে এভাবে বাঁচিয়ে রাখবে, পানির ঝাঁপটা খেয়ে খেয়ে ঠান্ডা ধরে এলো। নাকের মধ্যে পানি প্রবেশ করছে। চুল ভিজে চুপষে গেছে। কাপড়ের অবস্থাও তাই। তবে সে নিশ্চুপ পড়ে আছে।

নাথুরাম মনিরাকে পরীক্ষা করে বলল–কোন চিন্তা নেই হুজুর,জ্ঞান ফিরে আসবে।

মুরাদ আবার ডাকল-মনিরা-মনিরা, চোখ মেলে দেখ।

মনিরা চোখ মেলল না, যেমন ছিল তেমনি পড়ে রইল।

নাথুরাম বলল–হুজুর, আমি বেশিক্ষণ বিলম্ব করতে পারছি না। আজ বেটা ঘুঘুটাকে ফাঁদ থেকে বের করে আমাদের জম্বুর বনের গুহায় নিয়ে যাব।

মুরাদ প্রশ্ন করল-কার কথা বলছ, ডিটেকটিভ শঙ্কর রাওয়ের কথা বলছো?

হ্যাঁ, তাকে আর এখানে-মানে এই শহরের বাড়িতে রাখা ঠিক নয়। লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত, কোনক্রমে যদি বেরুতে পারে, তাহলে আর আমাদের রক্ষা থাকবে না।

মনিরা নিশ্চুপ সবই শুনে যাচ্ছিলো। সে এখন তাহলে শহরের কোনো গোপন বাড়িতে বন্দী রয়েছে। মিঃ রাও তিনিও তাহলে বন্দী এবং এই বাড়িতেই কোন কক্ষে তাঁকে আটক করে রাখা হয়েছে। মনিরার মনে একটু সাহস হয়। সে তাহলে শহরের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু জম্বুর বন তা আবার কোথায়! মিঃ রাওকে তাহলে জম্বুর বনে নিয়ে যাওয়া হবে। মনিরার কানে আবার আসে মুরাদের কণ্ঠস্বর....নাথু, মনিরাকেও এখানে রাখা ঠিক হবে না, কারণ এখনও আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য হইনি, আমি ঠিকভাবে মনিরাকে দেখাশুনা করতে পারছি না। আরও কিছুদিন আমি মনিরাকে কোথাও গোপন করে রাখতে চাই।

সেজন্য কোন চিন্তা নেই হুজুর। নাথুরামের অসাধ্য কিছুই নেই। ওকে জম্বুর বনের পাতালপুরীর কক্ষে নিয়ে রাখব।

মুরাদের ব্যথাহত কণ্ঠস্বর-কিন্তু আমি?

সেজন্য ভাববেন না হুজুর। আপনার ঘা শুকিয়ে গেলে আপনিও যাবেন সেখানে, কোন অসুবিধাই হবে না আপনার। সুন্দর ঘর, পরিষ্কার বিছানাপত্র সব পাবেন আমার সেই পাতালপুরীর কক্ষে।

মুরাদ নাথুরামের কথায় খুশি হয়, আনন্দভরা গলায় বলে–সত্যি নাথুরাম তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব! যাবার সময় পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে যেও আমার কাছ থেকে।

মনিরার নাকে পানি প্রবেশ করায় বড় হাঁচি পাচ্ছিল, আর নিজকে সংযত রাখতে পারল না সে, হঠাৎ হচ্চো করে হেঁচে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে নাথুরাম আর মুরাদের কথা থেমে গেল। নাথুরাম বলল–হুজুর, এবার ওর জ্ঞান ফিরে আসবে, আর কোন চিন্তা নেই। তাহলে একে কবে সরাচ্ছি হুজুর?

মুরাদের চাপা কণ্ঠ–চুপ! জ্ঞান ফিরে এসেছে, সব জেনে ফেলবে।

হেসে বলল নাথুরাম-ভয় পাবার কিছু নেই হুজুর, নাথুরামের সেই পাতালপুরীর গোপন কক্ষ কেউ খুঁজে পাবে না একমাত্র যম ছাড়া।

মুরাদের হাসির শব্দ-ঠিক বলেছ। যেখানে মানুষ প্রবেশ করতে সক্ষম নয়, সেখানে যম কিন্তু অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে।

হঠাৎ বলে উঠল বুড়ী সতী দেবী-আপনারা যাই বলুন, দস্যু বনহুর কিন্তু যমের চেয়েও ভয়ঙ্কর। সাবধানের মার নেই।

মনিরা বুড়ীর মুখে বনহুরের নাম শুনে কেমন যেন মুগ্ধ হল। খুশি হল সে। ঠিকই বলেছে বুড়ী। বনহুরের নামে যে মধু মেশানো ছিল, সেই মধু মনিরাকে চাঙ্গা করে তোলে। ভাবে সে ভয় কি, তার মনির রয়েছে। নিশ্চয়ই সে চুপ করে বসে

নেই। যেমন করে হোক তাকে খুঁজে বের করবেই। খোদার ওপর অগাধ বিশ্বাস মনিরার, তাই ইজ্জত রক্ষা করবেনই তিনি।

মনিরা নিশ্চুপ পড়ে থেকেও বুঝতে পারল, নাথুরামের কানে কি যেন গোপনে বলল মুরাদ। নাথুরাম উঠে দাঁড়াল, তারপর বেরিয়ে গেল।

মুরাদ এবার সতাঁকে লক্ষ্য করে বলল–এর ভিজে কাপড় পাল্টে দাও। বেশ করে চুলগুলো আঁচড়ে দেবে। ভালমত জ্ঞান ফিরলে খাবার এনে দিও, বুঝেছ?

আপনার অত বুঝাতে হবে না বাবু, আমি সব ঠিক করে নেব।

মুরাদ মনিরার মাথা কোল থেকে নামিয়ে রাখল, তারপর পিঠের আর হাঁটুর নিচে হাতে দিয়ে তুলে পাশের খাটে শুইয়ে দিল। মনিরা স্তব্দ নিঃশ্বাসে চুপ করে রইল।

মুরাদ ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আর একবার বুড়ীকে তার কাজ বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো মনিরা। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিল। যাক উপস্থিত বিপদ থেকে তবু রক্ষা পেল। কিন্তু এর চেয়ে আরও কঠিন বিপদ এগিয়ে আসছে তার জন্য। এত সহজেই তার নেতিয়ে পড়াও ঠিক হবে না-আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে বাঁচতে।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল মনিরা, একটু পানি দাও।

বুড়ী তাড়াতাড়ি পাশের একটি কলস থেকে গেলাসে পানি ঢেলে মনিরার মুখে তুলে ধরে বলল–খাও।

মনিরা আস্তে আস্তে উঠে বসল, তারপর এক নিঃশ্বাসে পানিটুকু খেয়ে খালি গেলাসটা ফিরিয়ে দিল বুড়ীর হাতে।

বুড়ী সতী হেসে বলল–এইতো ভালো হয়ে গেছ। এতক্ষণ বেচারা মুরাদ সাহেব কত কি করলেন। এখন ভালো বোধ করছ তো?

হাঁ, কিন্তু মাথাটা বোঁ বোঁ করছে, চোখে অন্ধকার দেখছি।

আজ কদিনের মধ্যে মুখে কিছু দিয়েছ, অমন হবে না? দাঁড়াও তোমার জন্য খাবার আনতে বলি।

বেশ, বল।

বুড়ী দরজার কাছে গিয়ে শিস দিল। সেকি কাণ্ড, মনিরা অবাক হলো। বুড়ীর দাঁত নেই তবু শিস দেবার ঢং দেখে রাগও হল, হাসিও পেল তার।

অমনি একজন দারোয়ান গোছের লোক এসে বুড়ীকে সালাম করে দাঁড়ালো। বুড়ী বললো–এই, শিগগির কিছু খাবার নিয়ে এসো, মেম সাহেব খাবেন।

লোকটা বুড়ীর কাঁধের উপর দিয়ে একবার মনিরার দিকে তাকিয়ে চলে গেল।

বুড়ী এসে বসল মনিরার পাশে।

মনিরা বলল–সতী দিদি, তুমি এদের ঝি, তাই না?

ছিঃ ছিঃ কি যে বল, আমি–আমি হলাম কিনা-ঐ তো সেদিন বলেছি তোমাকে।

হাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম, তুমি এদের সতী দিদি। আচ্ছা লক্ষী দিদি, এই বনটা শহর ছেড়ে কতদূর?

হেসে উঠলো বুড়ী সতী দেবী, বলল–কে বলে এটা বন? এটা বাড়ি, চোখে দেখতে পাওনা?

বাড়ি তো দেখছি, কিন্তু কোথায়-শহরে না বনে?

শহরে গো শহরে। কিন্তু মুরাদ সাহেব তোমাকে আজ অন্য জায়গায় চালান করবে।

কেন?

সে সব আমি কি জানি?

সতী দিদি, বল না কোথায় চালান করবে?

বললাম তো আমি জানি না।

এমন সময় দরজা খুলে যায়, সেই দারোয়ান গোছের লোকটা থালায় খাবার নিয়ে হাজির হয়। খাবার রেখে চলে যায় সে।

মনিরা কাপড়খানা পাল্টে কিছু খাবার মুখে তুলে দেয়। অনেক দিন পর আজ ভাল করে চুল বাঁধে সে। বুড়ী আজ খুব খুশি। মনিরা চুল বাঁধতে বাঁধতে বলে– আচ্ছা সতী দিদি, ওকে কেমন করে চিনলে?

কাকে লো?

ঐ যে তাকে?

তোমার সেই দস্যুটা?

হ্যাঁ।

ও বাবা, তাকে চিনব না, এ শহরের কে না চেনে তাকে?

তুমি তাকে দেখেছ কোনোদিন?

দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে সতী-ও কথা বল না। দস্যু বনহুরকে দেখতে চাই না বাবা!

কেন?

সে নাকি যমের মত দেখতে।

খুব ভয়ঙ্কর, না?

তা তুমিই ভালো জানে, সে তোমাকে ভালবাসে।

কে বলল এ কথা তোমাকে সতী দিদি?

নাথু বলেছে।

কি বলেছে সতী দিদি, বল না?

ও! ঐসব আবার শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে বুঝি?

খুব!

বলেছিল সে, দস্যু তোমাকে নাকি পিয়ার করে, ভাল বাসে, আমি যেন তোমার ওপর খুব কড়া নজর রাখি। আচ্ছা মেয়ে, তোমার কি আর কাজ ছিল না, একটা কুৎসিত লোককে ভালবাসতে গিয়েছিলে?

কে বলল আমি তাকে ভালবাসি?

জানি, সব বলেছে নাথু আমাকে। তুমি দস্যু বনহুরকে অনেক ভালবাস। আচ্ছা, আমাদের মুরাদ সাহেবকে ভালবাসতে পার না।

আনমনা হয়ে যায় মনিরা। বনহুরের সুন্দর মুখখানা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে তার চোখের সামনে।

বুড়ী হেসে বলে–ওকে মনে পড়েছে বুঝি? ছিঃ দেখতে অমন বিদঘুঁটে লোককে আবার মনে পড়ে? ওর চেয়ে মুরাদ সাহেব কত সুন্দর-যেন যুবরাজ। ওগো, তোমার সেই কুৎসিত লোকটা কেমন দেখতে?

আমার বনহুর?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

তোমার নাথুর চেয়ে খারাপ দেখতে।

গালে হাত দেয় বুড়ী–সে কি গো, এমন তোমার চেহারা আর তুমি কিনা... ছিঃ ছিঃ ছিঃ, তার চেয়ে মুরাদ সাহেবকে স্বামী করে নাও, কোন বালাই থাকবে না।

তাই করে নেব সতী দিদি, তাই করে নেব।

সত্যি!

হ্যাঁ। কিন্তু আমি যা বলব তাই করবে? কতদিন একটু আলো-বাতাসের মুখ দেখি না। তুমি আমাকে বাইরে নিয়ে যাবে?

বাইরে! সর্বনাশ, ঐ কাজটা আমার দ্বারা হবে না। বুঝেছি পালাবে তুমি!

ছিঃ ছিঃ ছিঃ, পালাব আমি-ক খনও না। তোমাদের মুরাদ সাহেবের মত সুন্দর-সুপুরুষ লোক থাকতে আমি যাব বনহুরের মত একটি কুৎসিত লোকের কাছে? আরে থু! সত্যি দিদি, তুমি কত সুন্দর।

নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে গর্বের হাসি হাসে বুড়ী, বলে– বয়সকালে যা রূপ ছিল, কী বলব তোমাকে।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। না হলে কি আর নাথুরামের মত মানুষ তোমাকে নিয়ে ভুলেছে?

তা সত্যি, ওর জন্যই তো স্বামীর ঘর ছেড়েছি। জোয়ানকালে ওর কি কম রূপ ছিল!

তা দেখতেই পাচ্ছি। সুপুরুষ বটে–সত্যি দিদি, তোমার চোখের তারিফ না করে পারি না। কিন্তু দিদি, তুমি আমাকে একটু বাইরে নিয়ে চল না।

মনিরার কথা শেষ হয় না, কক্ষে প্রবেশ করে নাথুরাম আর অন্য এক লোক। নাথু দাঁত বের করে কর্কশ কন্ঠে বলে ওঠে-তা আর হচ্ছে না সুন্দরী, বাইরের আলো বাতাস দেখার ভাগ্য হবে যেদিন তুমি মুরাদ সাহেবের গলায় মালা দেবে।

মনিরার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ হয়ে ওঠে। তবু গলায় জোর দিয়ে বলে–শয়তান! ভেবেছ তুমি বাঁচবে। কিন্তু মনে রেখ, তুমিও মরবে।

অট্টহাসি হেসে ওঠে নাথুরাম–আমাকে সতী পাওনি যে, ভয় দেখিয়ে কাবু করবে। এমন কোন বীরপুরুষ নেই যে আমাকে মারতে পারে। তোমার বনহুরকে আমি পুতুল নাচ নাচাতে পারি, জান সুন্দরী?

মনিরা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নাথুরাম তার পূর্বেই সঙ্গীটিকে ইংগিত করলো।

সতী অবশ্য মনিরার ওপর কিছুটা সদয় হয়ে এসেছিল, হয়তো বাইরে যাবার সুযোগ পেত সে ওর সহায়তায়, কিন্তু সব নস্যাৎ হয়ে গেল। পালাবার একটা ক্ষীণ আশা এতক্ষণ যা মনিরার মনের কোণে উঁকি দিচ্ছিল, সমূলে তা মুছে গেল। পাথরের মূর্তির মত স্থির দাঁড়িয়ে রইলো মনিরা।

নাথুর ইংগিতে তার সঙ্গীটা ভয়ঙ্কর চোখদুটি মেলে একবার মনিরার দিকে তাকাল, তারপর কোমরের ভেতর হতে একটা ময়লা রুমাল বের করে এগিয়ে গেল মনিরার পাশে।

ভয়ে মনিরার হৃদকম্প শুরু হলো, শিউরে উঠলো সে। নিশ্চয়ই ঐ ময়লা রুমালখানায় ঔষুধ মাখানো রয়েছে। এখান থেকে তাকে সরানোর পূর্বে অজ্ঞান করা হবে, বুঝতে পারে মনিরা। কিন্তু কি উপায় আছে-বাঁচার কোনো পথ নেই। সে নারী-দুর্বল, অসহায়। লোকটার সঙ্গে পেরে ওঠা তার পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া নাথুরামের ভয়ঙ্কর কঠিন বলিষ্ঠ বাহু দুটির দিকে তাকিয়ে মনিরা স্তব্দ হয়ে যায়।

নাথুরাম পুনরায় ইঙ্গিত করল, লোকটা মনিরার নাকের ওপর রুমালখানা চেপে ধরলো।

মনিরা দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজিকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলো কিন্তু পারল না সে। ধীরে ধীরে অবশ হয়ে এলো তার দেহটা। তারপর ওর আর কিছু মনে রইল না।

.

বনহুরের আদেশে রহমান তার সমস্ত অনুচরকে ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দিল। চৌধুরী মাহমুদ খান সাহেবের কন্যা মনিরাকে খুঁজে বের করতেই হবে। যে তাকে খুঁজে বের। করতে সক্ষম হবে, সে সর্দারের অত্যন্ত প্রিয় হবে এবং তাকে লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

বনহুরের অনুচরগণ কথাটা শুনে খুশিতে আত্মহারা হল। তেমনি অবাকও হলো তারা। চৌধুরী মাহমুদ খানের কন্যার জন্য আমাদের সর্দারের এত চিন্তা কেন? কথাটা তাদের মনে অনেক রকম প্রশ্ন জাগাল, কিন্তু কেউ সমাধান খুঁজে পেল না।

নূরীও কথাটা শুনে অবাক হলো। ধনবান চৌধুরী মাহমুদ খানের নাম সে অনেক শুনেছে। বনহুরের আংগুলে এখন চৌধুরী কন্যা মনিরার হাতের আংটি শোভা পাচ্ছে। বনহুর নূরীকে না। দিয়েছে এমন কিছুই নেই, কিন্তু ঐ আংটিটি আজও বনহুর তাকে দিল না। আংটি সম্বন্ধে নূরীও সে জন্য আর কোন কথা বলেনি, যদিও একদিন এই আংটি সম্বন্ধে তার অনেক কৌতূহল ছিল। আজ আবার সেই আংটির কথা স্মরণ হলো তার। তবে কি এর পেছনে কোন রহস্য আছে? নূরী। লক্ষ্য করেছে-বনহুর মাঝে মাঝে নির্জনে বসে এই আংটির দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে। তার পদশব্দে চমকে উঠতো, সজাগ হয়ে ফিরে তাকাত নূরীর দিকে।

নূরী কিছু জিজ্ঞাসা করলে হেসে বলতো কিছু না। ।

এর বেশি কোন দিন কিছু জানতে পারেনি নূরী। আজ সেই চৌধুরী কন্যার জন্য বনহুরের এত মাথাব্যথা কেন?

বনহুর শিকারীর ড্রেসে সেই যে বেরিয়ে গেছে এখন সন্ধ্যা হয়ে এলো, তবু ফিরে এলো না। নূরী অস্থিরচিত্তে এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছে–কখন ফিরে আসবে বনহুর।

ক্রমে রাত বেড়ে আসছেনূরী দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় উন্মাদিনীর ন্যায় হয়ে পড়ে। সবচেয়ে তার আপনজন বনহুর–তার ধ্যান-জ্ঞান স্বপ্ন-সাধনা সব। বনহুরকে নূরী নিজের জীবন অপেক্ষা বেশি ভালবাসে।

.

এক সময় নূরী রহমানের খোঁজে বনহুরের গোপন দরবার কক্ষের দিকে এগুলো হয়তো রহমান সেখানেই রয়েছে। কিন্তু নূরী আশ্চর্য হলো-দরবারকক্ষের আশে পাশে আজ কেউ নেই। শুধু দু'জন রাইফেলধারী দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। তাদের কোন প্রশ্ন করা নিরর্থক, কারণ তারা এসবের কিছুই জানে না। নূরী বিমর্ষ মনে ফিরে এলো নিজের কক্ষে। কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে তার মন টিকলো না। আবার ছুটে গেল সে বনহুরের কক্ষে। ওর শূন্য বিছানায় বসে চোখের পানি ফেলল। বনহুরের রিভলবার খান বুকে চেপে ধরে ওর স্পর্শ অনুভব করতে চাইল।

এমন সময় নূরীর কানে তাজের খুড়ের শব্দ এসে পৌঁছলো নিশ্চয়ই বনহুর ফিরে এসেছে। সে দ্রুত ছুটলো বাইরে।

ক্রমে অশ্বপদশব্দ নিকটবর্তী হচ্ছে। নূরী উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল বনহুরের।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তাজের পিঠে বনহুর এসে পৌঁছল। সঙ্গে সঙ্গে নূরী হাত বাড়িয়ে তাজের লাগাম চেপে ধরল। বনহুর ততক্ষণে নেমে দাঁড়িয়েছে।

বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে নূরী চট করে কিছু বলতে পারল না। আজ তার কেমন যেন এক উন্মত্ত চেহারা। নূরীর সঙ্গে কোন কথা না বলেই বনহুর এগুলো দরবারকক্ষের দিকে। নূরী তাকে নীরবে অনুসরণ করল।

দরবারকক্ষের দরজায় পৌঁছে মেঝের এক স্থানে পা দিয়ে চাপ দিল বনহুর সঙ্গে সঙ্গে দু'টি লোক ছুটে এলো–সর্দার! কুর্ণিশ করে দাঁড়াল তারা।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করলো–রহমান ফিরে এসেছে?

লোক দুটির একজন জবাব দিল–না সর্দার, তারা কেউ এখনও ফিরে আসেনি।

এলেই তাকে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে বলবে–যাও। বনহুর কথাটা বলে বিশ্রামকক্ষের দিকে এগুলো।

নূরী নিশ্চুপ তাকিয়ে দেখছে।

বনহুর যখন বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করলো তখন নূরী তার পাশে যাবে কিনা ভাবছে। মনকে সে কিছুতেই ধরে রাখতে পারছে না। আবার ভয়ও হচ্ছে-হঠাৎ যদি বনহুর তাকে কিছু বলে বসে। নূরী তবু কক্ষে প্রবেশ করলো।

বনহুর কক্ষে পায়চারী করছে।

নূরী একপাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো–হুর, আজ তোমার কি হয়েছে?

বনহুর পায়চারী বন্ধ করে ফিরে তাকালো নূরীর দিকে, তারপর শয্যায় গিয়ে বসলো।

নূরীঃ গিয়ে বসল তার পাশে। এমনি কতদিন বনহুর নানা কারণে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে– নূরী দিয়েছে সান্ত্বনা, মিষ্টি হাসিতে তার মনের দুশ্চিন্তা দূর করার চেষ্টা করেছে সে। আজও হেসে নূরী বলে–হুর, কি হয়েছে তোমার, বল না?

বনহুর স্থির দৃষ্টি মেলে তাকাল নূরীর দিকে, তারপর বলল–আমার একটি জিনিস হারিয়ে গেছে।

জিনিস হারিয়ে গেছে?

ঠিক হারিয়ে নয়, চুরি গেছে।

চুরি গেছে! কি এমন মূল্যবান জিনিস যার জন্য তুমি এত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছ হুর?

সে তুমি বুঝবে না নূরী।

হুর, তোমার মনের ব্যথা আমি সব বুঝি। এই সামান্য কথা আমি বুঝি না। কি এমন জিনিস হারিয়েছে, যার জন্য তুমি লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছো?

কে বললো আমি লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছি?

নূরী কোন জবাব দিল না, কারণ সে সব শুনেছে। বনহুর যে চৌধুরী কন্যার জন্য আজ উন্মাদের মত হয়ে পড়েছে, এ কথা বনহুর তাকে না বললেও অনুমানে বুঝতে পেরেছে নূরী। মনের মধ্যে তার একটা জ্বালা ধরে গেছে। সে ভাবতেও পারে না তার হুর আর কোন নারীকে ভালবাসতে পারে।

একটা ঢোক গিলে জবাব দেয় নূরী, সত্য কোনদিন গোপন থাকে না হুর, চৌধুরী কন্যার জন্য তোমার এত দরদ কেন বলতো?

বনহুর স্তব্ধ চোখে তাকাল নূরীর দিকে। নিঃশ্বাস যেন দ্রুত বইছে ওর। দু'চোখে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে।

নূরী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠে–তুমি কিছু না বললেও আমি সব শুনেছি, সব জানি। চৌধুরীকন্যার জন্যই আজ তুমি উন্মাদ। তোমার সেই মূল্যবান হারিয়ে যাওয়া জিনিসটি অন্য কিছু নয় সেই যুবতী।

বনহুর নিশ্চুপ শুনে যাচ্ছে নূরীর কথাগুলো।

নূরী আজ আর থামতে চায় না, ক্ষিপ্তের ন্যায় বলে চলে, হুর তুমি না দস্যু? দস্যু হয়ে একটা যুবতীর প্রেমে...।

চিৎকার করে ওঠে বনহুর–নূরী।

তুমি আমাকে ক্ষান্ত করতে পারবে না হুর। আমার গলা ছিঁড়ে ফেললেও আমার কণ্ঠ স্তব্ধ হবে না। না না, আমি তোমাকে কিছুতেই অন্য কোন নারীকে ভালবাসতে দেব না..নূরী বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে-কিছুতেই না। আমি সব সহ্য করতে পারবো হুর, কিন্তু তোমাকে হারানোর ব্যথা সহ্য করতে পারব না। আমি তোমাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসি।

বনহুর গম্ভীর মুখে তাকিয়ে রইলো পাশের দেয়ালে। নূরী তার বুকে মুখ লুকিয়ে উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠল–হুর, তুমিই যে আমার জীবনের সব।

এমন সময় বাইরে পদশব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই ভেসে এলো রহমানের কণ্ঠস্বর–সর্দার।

নূরী তাড়াতাড়ি চোখের পানি মুছে সরে দাঁড়াল।

বনহুর আজ রহমানকে তার কক্ষে প্রবেশ করার আদেশ না দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল, নূরীর কানে পৌঁছল বনহুরের কণ্ঠস্বর–চলো।

রহমান আর বনহুরের পদশব্দ মিলিয়ে যেতেই নূরী বেরিয়ে এলো, অন্ধকারে তাকিয়ে দেখলো-দু'টি ছায়ামূর্তি ওদিকে বেরিয়ে যাচ্ছে। নূরী বঝুতে পারলো, বনহুর তার সামনে এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করতে চায় না। তাই সরে যাচ্ছে দূরে। কিন্তু নূরীও কম মেয়ে নয়–যেমন করে হউক সেও শুনবে, রহমান কি খবর এনেছে।

অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলল নূরী, অন্ধকারে একটা থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

বনহুর আর রহমান দরবার কক্ষের দিকে না গিয়ে সামনে একটা গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াল।

নূরীও হামাগুড়ি দিয়ে ঝোঁপের আড়ালে এসে লুকিয়ে পড়ল।

বনহুর গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলো–রহমান, তুমি নিজেও বেরিয়েছিলে?

হ্যাঁ সর্দার।

কোন সন্ধান পেলে না?

না, আজ সারাটা দিন গোটা শহর চষে বেড়িয়েছি।

শহরময় চষে বেড়ালেই তাকে পাওয়া যাবে না রহমান। এমন কোন গোপন স্থানে তাকে আটকে রাখা হয়েছে, যেখানে কেউ তার সন্ধান পাবে না।

সর্দার, আমি ঝাড়ুদারের বেশে অনেক অন্দরবাড়িতেও প্রবেশ করি। গিয়েছি হোটেলে, ক্লাবে দোকানে কিন্তু কোন আভাসই পেলাম না।

তোমার সঙ্গীরা সবাই ফিরে এসেছে?

অনেকে এসেছে-অনেকে আসেনি। কেউ কোন সন্ধান বলতে পারছে না। ওদের ডাকব?

না, আমার কাছে ডেকে কোন লাভ নেই। হ্যাঁ, আমিও তাকে অনেক খুঁজলাম-তুমি গিয়েছিলে ঝাড়ুদারের বেশে আর আমি গিয়েছিলাম শিকারীর বেশে।

সে আমি দেখতেই পাচ্ছি সর্দার।

তুমি ঘুরেছ অন্দরবাড়ি, হোটেলে, ক্লাবে আর দোকানে।

আমি ঘুরেছি বন থেকে বনান্তরে। গহন বনের অন্তরালে পর্বতের প্রত্যেকটা গুহায়। তবু তার সন্ধান পেলাম না।

সর্দার, আপনি বড় ক্লান্ত।

শুধু আমি নই রহমান, তাজের পরিশ্রম আমার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে। ওর সেবার জন্য করিমকে বলে দাও।

নূরী আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। চৌধুরীকন্যার জন্য বনহুরের ব্যাকুলতা তার হৃদয়কে খান খান করে দেয়। নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে সে।

বনহুর বলে–রহমান, অল্পক্ষণের মধ্যে আবার বেরুবো, তুমি আমার গাড়ি বড় রাস্তায় তৈরি রাখতে বল।

আবার এক্ষুণি বের হবেন?

হ্যাঁ। যতক্ষণ তার সন্ধান খুঁজে না পাব, ততক্ষণ আমার বিশ্রাম নেই।

নূরী এবার বুঝতে পারে বনহুর হঠাৎ আজ এমন শিকারীর বেশে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে কোথায় গিয়েছিল? সব পরিস্কার হয়ে যায় আজ তার কাছে।

বনহুর কক্ষে ফিরে আসে। এবার সে সুন্দর, এক সাহেবের বেশে সজ্জিত হয়। গায়ে দামী সুট, মাথায় ইংলিশ ক্যাপ, হাতে দামী সিগারেট।

নূরী আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। এই ড্রেসে বনহুরকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। এখন কেউ তাকে দেখলে বুঝতে পারবে না সে বাঙালি। ঠিক সাহেবের মতই মনে হলো তার চেহারা।

নূরী কিন্তু নিশ্চুপ রইল না। সে বনহুরের ড্রাইভারের বেশে সেজে আয়নার সামনে এসে। দাঁড়ালো। নিজকে নিজেই চিনতে পারে না নূরী। সত্যি আজ তার ছদ্মবেশ স্বার্থক হয়েছে।

বনহুর কক্ষ ত্যাগ করার পূর্বেই নূরী রহমানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

রহমান আশ্চর্যকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো– মকসুদ, তুমি এখনো গাড়িতে যাওনি? সর্দারের আদেশ পালন করনি তুমি?

নূরী চাপাকণ্ঠে বললো–রহমান, আমি নূরী।

সে কি, তুমি।

হ্যাঁ, আমি আজ হুরের গাড়ি ড্রাইভ করে নিয়ে যাব।

এত রাত-বিরাতে গাড়ি চালাতে পারবে, তুমি?

পারবো। তুমি তো জানোই, আমি খুব ভাল মোটর ড্রাইভিং শিখেছি।

কিন্তু সর্দার যদি জানতে পারে?

সে ভয় তোমার নেই। তুমি শুধু আমাকে গাড়িতে নিয়ে পৌঁছে দাও।

নূরী, এটা কি ঠিক হবে?

যা হয় হবে, তুমি একটা অশ্ব আমার জন্য দাও।

রহমান একজন অনুচরকে ডেকে বললো একটা অশ্ব সেখানে নিয়ে আসতে।

নূরী যখন গাড়িতে পৌঁছল তখন ড্রাইভার আশ্চর্য হলো, বললো–কে তুমি?

রহমান নূরীকে পৌঁছে দেবার জন্য গিয়েছিল-সে–ই সব কথা খুলে বললো, তারপর ড্রাইভারকে সরিয়ে নিল।

নূরী ড্রাইভার আসনে চেপে বসতেই তাজের পিঠে বনহুর এসে পৌঁছল।

বনহুরকে দেখতে পেয়েই রহমান আসল ড্রাইভারকে একটা ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ার জন্য ইংগিত করল। ড্রাইভার রহমানের কথামত আত্মগোপন করল।

রহমান তাজের লাগাম চেপে ধরে বললো–সর্দার, তাজকে কি আবার পাঠাবো?

না, তাজ আজ বিশ্রাম করবে।

ততক্ষণে ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে।

বনহুর ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলল–নাইট ক্লাবে চলো।

নূরী একদিন বনহুরের সঙ্গে নাইট ক্লাব দেখার জন্য এসেছিল অবশ্য ভেতরে প্রবেশ করেনি। আজ সেদিনের আসরে স্বার্থকতা উপলব্ধি করে। ভাগ্যিস সেদিন এসেছিল সে। তার নাইট ক্লাবের পথটা চিনতে কষ্ট হয় না।

বনহুর পেছন আসনে বসে সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চলেছে। বনহুরের পরিত্যাক্ত ধুম্রকুন্ডগুলো ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে ড্রাইভারের চোখে মুখে এসে ঝাঁপটা দিচ্ছিলো। ড্রাইভার নিপ গাড়ি চালিয়ে চলেছে।

রাত তখন দশটা বেজে গেছে। শীতের রাত-শহরের পথঘাট প্রায় জনশূন্য হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে দু'একটা গাড়ি তাদের গাড়ির পাশ কেটে চলে যাচ্ছে। ড্রাইভার সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালাচ্ছে। সে তো আর দক্ষ ড্রাইভার নয়। তবু গাড়ি চালনায় কোন ভুল হচ্ছে না তার।

গাড়িখানা এক সময় নাইট ক্লাবে এসে থেমে পড়লো।

বনহুর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো।

ড্রাইভার তার পূর্বেই ড্রাইভ আসন থেমে নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরেছিল। বনহুর নেমে যেতেই সে গাড়ির দরজা বন্ধ করে গাড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। এমন স্থানে দাঁড়াল সে, যেখান থেকে ক্লাবের গোটা অংশ নজরে পড়ে।

ক্লাবের ভেতর থেকে তখন একটা ইংলিশ গানের সুর ভেসে আসছে। আর ভেসে আসছে। হাসি আর বোতলের ঠন ঠন শব্দ।

বনহুর ক্লাবে প্রবেশ করতেই তাদের গাড়ির পাশে আর এক খানা গাড়ি এসে থেমে পড়ল। গাড়ি থেকে নামলেন দুজন ভদ্রলোক যদিও তাঁদের শরীরে স্বাভাবিক সট কিন্তু আসলে তাঁরা পুলিশের লোক-একজন মিঃ হারুন, অন্যজন মিঃ হোসেন। তাঁরাও ক্লাবে প্রবেশ করলেন।

নূরী ড্রাইভারের বেশে সব লক্ষ্য করছে। শুধু বনহুরই তার লক্ষ্য নয়, সেও অনুসন্ধান করে দেখছে চৌধুরী কন্যার খোঁজ সে পায় কিনা।

মিঃ হারুন আর মিঃ হোসেনের গতিবিধি নূরীর কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হয়। সে গোপনে ওদের দু'জনকে অনুসরণ করে। ক্লাবের একপাশে দাঁড়িয়ে সব দেখতে লাগলো নূরী। ক্লাবের মধ্যে কোনদিন সে প্রবেশ করেনি-অবাক হয়ে সব দেখছে। ক্লাবে এদের দেখে নূরীর চোখে ধাঁধা লেগে যায়। এখানে নারী পুরুষ কোন ভেদাভেদ নেই। গায়ে পড়ে ঢলাঢলি হাসাহাসি করছে। কি সব খাচ্ছে। কোথাও বা জুয়ার আড্ডা বসেছে। ওদিকে কতকগুলো মেয়ে পুরুষ এক সঙ্গে

নাচছে। নূরীর মনে পড়লো, বনহুর তাকে একদিন বলেছিল ক্লাবে মেয়ে পুরুষ মিলে বলড্যান্স হয় বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে দেখে নূরী সব।

কিন্তু হুর কোথায়, তাকে তো দেখা যাচ্ছে না।

যে লোক দুটির অনুসরণ করে নূরী ক্লাবে প্রবেশ করেছে, তারা ওদিকের একটা টেবিলের পাশে দু'খানা চেয়ারে বসেছেন। চার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছেন তাঁরা।

বয় দুটো প্লেটে করে কি রেখে গেল। খেতে খেতে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন ওরা।

নূরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে বনহুরের অনুসন্ধান করছে। হঠাৎ তার নজর পড়লো ওদিকের একটা পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এলো বনহুর। তার পাশে একটি যুবতী। বনহুরের সঙ্গে কিছু আলাপ করছে। সে। বনহুর এগুতেই যুবতী ওর দক্ষিণ হাত ধরে বসিয়ে দিল খালি একটা চেয়ারে। তারপর টেবিলস্থ বোতল থেকে খানিকটা তরল পদার্থ ঢেলে বনহুরের দিকে এগিয়ে ধরলো।

শিউরে উঠলো নূরী। বাঁকা চোখে একবার তাকাল-সত্যই কি হুর এ তরল পদার্থ গলধঃকরণ করবে।

বনহুর যুবতীর হাত থেকে কাঁচপাত্রটা নিল। নূরীর হৃদয়ে প্রচণ্ড একটা হাতুড়ির ঘা পড়লো। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সে তাকিয়ে আছে। বনহুর দস্যু-ডাকু কিন্তু মাতাল নয়। আজ থেকে সে মাতাল হবে? চৌধুরী কন্যাকে ভুলবার জন্য সে মদ খাবে অসম্ভব।

বনহুর কাঁচপাত্রটা মুখের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। এইবার সে ঠোঁটে চেপে ধরবে-হঠাৎ নূরী দেখল তার হাত থেকে পাত্রটা মাটিতে পড়ে সশব্দে ভেঙে গেল।

নূরীর মুখমণ্ডল উজ্জল দীপ্ত হলো। খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাল সে।

সেই মুহূর্তে যুবতী নাচতে শুরু করল বনহুরের সামনে নাচছে সে। বনহুরের দৃষ্টি চক্রাকারে ক্লাবের প্রতিটি লোকের মুখে ঘুরপাক খেয়ে ফিরছে।

হঠাৎ বনহুরকে উত্তেজিত মনে হলো যুবতী তখনও নেচে চলেছে। বনহুরের দৃষ্টি ও পাশে কয়েকটি লোকের ওপর সীমাবদ্ধ যারা এতক্ষণ গোল টেবিলটা জুড়ে জুয়ার আড্ডা দিচ্ছিল।

নূরীও তাকালো লোকগুলোর দিকে।

দেখতে পেল-কয়েকজন ভীষণ চেহারার লোক একটা যুবককে পাকড়াও করেছে। একজন বলিষ্ঠ লোক যুবকের জামার কলার চেপে ধরেছে।

মারামারি বাঁধবার পূর্বলক্ষণ।

এক মুহূর্ত বিলম্ব হলো না, ভীষণ ধস্তাধস্তি শুরু হলো, সারা কক্ষে একটা হট্টগোল ছড়িয়ে পড়ল।

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে বনহুর। দ্রুত পদক্ষেপে এগুলো সে ঐখানে। যুবতী বনহুরের সামনে গিয়ে পথ আগলে বাধা দিল, কিন্তু বনহুর তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল। কোন। রকম দ্বিধা না করে একজনের নাকের ওপর প্রচণ্ড ঘুষি লাগাল।

গুন্ডাগোছের লোকগুলো এবার যুবকটাকে ছেড়ে আক্রমণ করল বনহুরকে। সবাই মিলে। একসঙ্গে বনহুরের সঙ্গে লড়াই লেগে পড়ল।

নূরীর মুখ বিষণ্ন হলো। হঠাৎ এমন অবস্থার জন্য সে ভীষণ ঘাবড়ে গেল। বনহুরের অমঙ্গল আশঙ্কায় আশংকিত হলো সে।

ততক্ষণে তুমুল যুদ্ধ বেঁধে গেছে কিন্তু বনহুরের সঙ্গে পেরে ওঠা সহজ ব্যাপার নয়। ওরা অন্ততপক্ষে সাত আটজনের বেশি হবে–আর বনহুর একা কিন্তু অল্পক্ষণে বনহুর সকলকে। পরাজিত করে ফেলল। কে কোনদিকে পালাবে পথ খুঁজছে এমন সময় মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন রিভলবার হাতে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। মিঃ হারুন বজ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, খবরদার, নড়েছ কি মরেছ।

গুণ্ডালোকগুলো হাত তুলে দাঁড়াল।

মিঃ হারুন বাঁশি বাজালেন, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন পুলিশ ক্লাবে প্রবেশ করে গুন্ডা লোকগুলোর হাতে হাতকড়া পড়িয়ে দিল।

এবার মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন নিজেদের পরিচয় দিয়ে বনহুরের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। তাঁরা বারবার ধন্যবাদ জানালেন তাকে।

অবশ্য পরিচয় দেবার পূর্বেই মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেনকে চিনতে পেরেছিল বনহুর। সেও হেসে তাদের অভিনন্দন জানালো। মিঃ হারুন বলেন–আপনার পরিচয়?

বনহুর কিছুমাত্র না ভেবে চট করে জবাব দিল-আমি বিদেশী ব্যবসায়ী। আমার নাম মিঃ। প্রিন্স।

মিঃ হারুন খুশি হয়ে বলেন–আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মিঃ প্রিন্স। নামের সঙ্গে আপনার চেহারার মিল রয়েছে। আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় অনেক খুশি হয়েছি।

মিঃ হোসেনও আনন্দ প্রকাশ করলেন।

ততক্ষণে গুণ্ডা লোকগুলোকে পুলিশ পাকড়াও করে পুলিশ ভ্যানে উঠিয়ে নিয়েছে।

মিঃ হোসেন বলেন–মিঃ হারুন, আমার সন্দেহ হয়, এরা নিশ্চয়ই দস্যু বনহুরের অনুচর।

মিঃ হোসেন বললেন–এ রকম সন্দেহের কারণ?

দেখলেন না লোকগুলোর চেহারা ঠিক ডাকাতের মত?

বনহুর শুনে নীরবে হাসলো।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন বেরিয়ে যেতেই বনহুর যুবকটার পাশে এসে দাঁড়ালো গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো সে–আপনার পরিচয়।

যুবকটার চেহারায় বেশ আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে। উজ্জ্বল দীপ্ত মুখমণ্ডল। বয়স বনহুরের। চেয়ে কম হবে। পরনে ধুতি আর পাঞ্জাবী। সে হিন্দু তা বেশ বুঝা যাচ্ছে। বনহুরের দিকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো সে আমার নাম মধু সেন। আমার পিতা মাধবগঞ্জের জমিদার বিনোদ সেন।

বনহুর হাসলো, তারপর কঠিন কণ্ঠে বললো–আপনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির সন্তান, আপনি এসেছেন ক্লাবে, ছিঃ। আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি– খবরদার আর কোনদিন এ। পথ মাড়াবেন না, বুঝেছেন।

বুঝেছি, সত্যি আপনি না থাকলে আজ...

যান-বেরিয়ে যান ক্লাব থেকে। কোন কথাই আমি শুনতে চাইনা। আপনাদের মত লোকের। কৃতজ্ঞতাকেও আমি ঘৃণা করি।

যুবক মধু সেন নতমস্তকে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল।

বনহুর এবার এগুলো নিজের গাড়ির দিকে।

ড্রাইভার পূর্বেই ড্রাইভ আসনে বসেছিল।

বনহুর গাড়িতে চড়ে বসতেই স্টার্ট দেয়। বনহুর বলে লেকের ধারে চলো।

ড্রাইভার অস্বস্তি বোধ করে। এত রাতে আবার লেকের ধারে কেন? ক্লাবে আসার সখ মিটলো-এবার লেকের ধারে। ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল।

গাড়ি ছুটে চলেছে। রাত এখন দুটোর কম হবে না। শির শিরে হিমেল হাওয়ায় ড্রাইভারের শরীরে কাঁপন লাগে, রাগ হয় বনহুরের ওপর-লেকের ধারে কি করতে যাবে সে?

গাড়িখানা সাঁকোর উপর উঠতেই সহসা তাদের পাশ কেটে বেরিয়ে গেল আর একখানা গাড়ি। বনহুর হঠাৎ ঝুঁকে গাড়ি খানাকে লক্ষ্য করলো। তারপর ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বললো ড্রাইভার যে গাড়িটা আমাদের গাড়িকে পেছনে ফেলে চলে গেলো, ওটাকে ফলো কর।

নূরী গাড়ি চালাতে জানে, তা বলে খুব দক্ষ ড্রাইভারের মত চালাতে জানে না। বিপদে পড়ল নূরী। তবু সে যতদূর সম্ভব স্পীডে গাড়ি চালাতে শুরু করল।

বনহুর কি যেন ভাবলো তারপর সে ড্রাইভারের পাশে বসে হ্যাণ্ডেল চেপে ধরল। অন্য কোনদিকে খেয়াল করার সময় নেই বনহুরের। সামনের গাড়িখানাকে ফলো

করতেই হবে। কারণ। গাড়িখানার গতিবিধি তার কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হল।

ড্রাইভার সরে বসল।

বনহুর ডবল স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছে। উল্কাবেগে ছুটছে গাড়িখানা।

সম্মুখস্থ গাড়িখানা তখন বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। বনহুর নাছোড়বান্দা-ঐ গাড়িকে সে ধরবেই।

পথটা বেশ নির্জন এবং চওড়া। তাছাড়া পথের দু'পাশে লাইটপোষ্ট থাকায় গাড়ি চালাতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না।

নূরীর মনে কিন্তু খুব ভয় হচ্ছে, না জানি হঠাৎ কোন এক্সিডেন্ট হয়ে বসে। পথের দু'ধারে বাড়িগুলো সাঁসাঁ করে সরে যাচ্ছে। হিমঝরা শীতের রাত-তাই কোন বাড়ির দরজা জানালা খোলা নেই। বাড়িগুলোও যেন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ঘুম পাড়ছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রথম গাড়িখানা বুঝতে পারলো পেছনে গাড়ি তাকে অনুসরণ করছে।

বনহুর অতি কৌশলে নিজের গাড়িখানাকে সামনের গাড়ির সামনে এনে অবরোধ করে। ফেলল।

সামনের গাড়িখানা উপায়ান্তর না দেখে ব্রেক করে থামিয়ে ফেলল।

বনহুর ড্রাইভ আসন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল।

ততক্ষণে প্রথম গাড়ির চালকও গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়েছে।

বনহুরকে সে–ই প্রথম আক্রমণ করল। বনহুর প্রচন্ড এক ঘুষিতে লোকটাকে ধরাশায়ী করল।

বনহুর তক্ষণি বুঝতে পারলো–যাকে সে এই মুহূর্তে ধরাশায়ী করেছে সে নাথুরাম ছাড়া কেউ নয়। বনহুর একবার যাকে দেখতো তাকে ভুলতো না কোনদিন। নাথুরামকে তো সে কয়েকবার কাবু করেছে। তাই আজও অন্ধকারে

অনুমান করে নেয়। বনহুরের রাগ আরও বেড়ে যায় শয়তান নাথুরামই তার মনিরাকে আর একবার নদীপথে নিখোঁজ করতে চেয়েছিল।

বনহুর ঝাঁপিয়ে পড়লো নাথুরামের ওপর। দু'হাতে ওর টুটি টিপে ধরল।

কিন্তু নাথুরামকে কাবু করা অত সহজ ব্যাপার নয়। সেও মরিয়া হয়ে বনহুরের গলা চেপে ধরল। আবার শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ।

নূরী কোনদিন এমনভাবে বনহুরকে তার সামনে যুদ্ধে লিপ্ত হতে দেখেনি। আজ ক্লাবে গুণ্ডাদের সঙ্গে লড়াই করতে দেখে নূরী স্তম্ভিত হতবাক হয়েছিল। সাত আটজন বলিষ্ঠ লোকের সঙ্গে একা বনহুর-শেষ পর্যন্ত জয়ী হলো সে। এক্ষণে বনহুর নাথুরামের সঙ্গে লড়াইয়ে জয়ী হবে, এ-তো জানেই সে। তবুও সে ভীত হয়ে পড়ছিল। বনহুরের কোন ক্ষতি হয় এই আশংকায় মনে প্রাণে খোদাকে স্মরণ করছিল সে। নূরী তখন গাড়ির পেছন আসনে বসেছিল।

নাথুরাম আর পেরে উঠছিল না, বনহুরের প্রচন্ড ঘুষিতে তার নাক দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়ছিলো। সে তবু মরিয়া হয়ে লড়াই করছিল আর পালাবার পথ খুঁজছিল। শয়তান নাথুরাম হঠাৎ একমুঠো ধুলো তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো বনহুরের চোখ লক্ষ্য করে।

আচমকা চোখে ধুলোবালি এসে পড়ায় একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো বনহুর সঙ্গে সঙ্গে চোখ রগড়ে তাকাল। ততক্ষণে নাথুরাম বনহুরের দৃষ্টির আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে। বনহুর অন্ধকারে তীক্ষ্ম দৃষ্টি মেলে লক্ষ্য করতে লাগল, শুধু অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ল না।

এবার এগিয়ে গেল বনহুর নাথুরামের গাড়ির দিকে। আশা আকাঙ্খায় মনটা তার দুলে উঠলো। হয়তো ঐ গাড়ির মধ্যে মনিরা থাকতে পারে। গাড়ির মধ্যে উঁকি দিয়ে আশ্চর্য হলো বনহুর। একটা লোক হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায় গাড়ির মেঝেতে পড়ে রয়েছে। বনহুর বিলম্ব না করে গাড়ির দরজা খুলে গাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলো। যদিও লোকটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। তবুও অনুমানে বুঝে নিলো নিশ্চয়ই কোন ভদ্রলোককে শয়তান নাথুরাম বন্দী করে নিয়ে চলেছে।

বনহুর তাড়াতাড়ি তাঁর হাত পা মুখের বাঁধন খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকটি উঠে বসলেন, তিনি আনন্দসূচক কণ্ঠে বললেন– কে আপনি? আমাকে বাঁচালেন।

বনহুর ভদ্রলোকটির গলার আওয়াজ শুনে চমকে উঠলো এ যে প্রখ্যাত ডিটেকটিভ মিঃ। শঙ্কর রাওয়ের গলা। সে পকেট থেকে ছোট্ট টর্চলাইটটা জ্বেলে দেখলো তার অনুমান মিথ্যা নয়। শংকর রাওয়ের একি অবস্থা-চোখ বসে গেছে, চুল এলোমেলো, কোট প্যান্ট টাই মলিন-নোংরা।

বনহুর মুখের দিকে তাকিয়ে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন মিঃ রাও-কে আপনি? আমাকে রক্ষা করলেন? এই জঘন্য অবস্থা থেকে বাঁচালেন?

বনহুর জবাব দিল–আমি একজন ব্যবসায়ী। আমার নাম মিঃ প্রিন্স।

মিঃ রাও বনহুরের দক্ষিণ হাতখানা দু'হাত চেপে ধরলেন আপনি আমার জীবন রক্ষা করলেন, আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো মিঃ প্রিন্স আপনি ....

থাক, ওসব পরে হবে। এখনও আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ নন। আসুন আমার গাড়িতে আপনাকে পৌঁছে দিই।

শংকর রাওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে ড্রাইভ আসনে বসে বনহুর তারপর ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলে– ড্রাইভার, তুমি সামনের আসনে এসে বসো।

নূরী এতক্ষণ নির্বাক পুতুলের মত স্তব্ধ হয়ে বসে বসে দেখছিল। বনহুরের প্রতি একটা অভিমান জমেছিল তার মনে, এক্ষণে তা কোথায় উড়ে গেছে। ড্রাইভারের সঙ্গে বনহুর তো কোনদিন এভাবে কথা বলে না। মনে মনে একটু আশ্চর্য হয় নূরী। পেছন আসন থেকে সামনের আসনে এসে বসে সে।

মিঃ শংকর রাওকে নিয়ে বনহুর যখন গাড়িতে স্টার্ট দিল, তখন নাথুরাম মাথা তুলে একবার তাকালো। গাড়িখানা দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলে শরীরের ধুলো ঝেরে উঠে দাঁড়ালো নাথু। তখনো নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে তার। দাঁতে দাঁত পিষে গাড়িখানার দিকে চেয়ে রইলো সে।

বনহুর গাড়ি চালাতে চালাতে বললো–মিঃ রাও, আপনি কোথায় যাবেন? অফিসে না বাসায়?

মিঃ শংকর রাও অচেনা অজানা মিঃ প্রিন্সের মুখে তার নাম শুনে আশ্চর্য হলেন। বিস্ময়ভরা। কণ্ঠে বলেন–বাসায় যাব। ক্ষুধায় আমার অবস্থা শোচনীয়।

আজ এক সপ্তাহের মধ্যে পানি ছাড়া। আর কিছু আমার ভাগ্যে জোটেনি। কিন্তু একটা কথা মিঃ প্রিন্স, আপনি আমাকে চিনলেন কি করে?

হেসে বললো বনহুর–আপনি একজন প্রখ্যাত ডিটেকটিভ, আপনাকে চিনতে কারও ভুল। হয় না। আচ্ছা মিঃ রাও, আপনার উধাও ব্যাপারটা সংক্ষেপে যদি বলতেন

ঘটনাটা সত্যি অতি বিস্ময়কর। আমি দস্যু বনহুরের চক্রজালে জড়িয়ে পড়ছিলাম।

দস্যু বনহুর!!

হ্যাঁ, মিঃ প্রিন্স, শয়তান দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করতে গিয়ে আপনি নিজেই পাকড়াও। হয়ে পড়েছিলেন বুঝি?

কথার ফাঁকে গাড়িখানা এসে পৌঁছে গেল মিঃ রাওয়ের বাসার গেটে।

শংকর রাও গাড়ি থেকে নেমে আনন্দভরা কণ্ঠে বলেন– আসুন মিঃ প্রিন্স, কি বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো।

থাকা আজ আর নামবো না, সময় পেলে আবার দেখা হবে।

শংকর রাও বলে ওঠেন–আপনার ঠিকানা যদি দয়া করে শুনাতেন, তাহলে মিঃ হারুনকে নিয়ে

ও! বেশ এই নিন। পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে বনহুর মিঃ শংকর রাওয়ের হাতে দেয়। তারপর গাড়িতে স্টার্ট দেয় সে।

গাড়ি স্পীডে ছুটে চলেছে।

পাশে বসে আছে ড্রাইভারবেশী নূরী। ওর মনে নানারকম প্রশ্নের উদ্ভব হচ্ছে। আজ সে বনহুরের সঙ্গে এসে স্বচক্ষে যা দেখল এবং অনুভব করল, তা অতি বিস্ময়কর। নূরী এসব কল্পনাও করতে পারেনি। বনহুর যে শুধু সেই চৌধুরী কন্যাকে নিয়েই উন্মত্ত রয়েছে তা নয়। বাইরের সমগ্র জগৎ জুড়ে তার কাজ।

অনাবিল এক আনন্দে আপুত হয় নূরীর হৃদয়। বনহুরকে সে যতখানি গণ্ডির মধ্যে কল্পনা করেছে তার চেয়ে সে অনেক, অনেক বেশি।

নীরবে গাড়ি চালাচ্ছিল বনহুর। রাত প্রায় শেষের পথে। শীতের কনকনে হাওয়া শার্সীর ফাঁকে প্রবেশ করছিল না সত্য কিন্তু তবু একটা জমাট ঠান্ডা নূরীকে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। জনশূন্য পথ। পথের দু'ধারে লাইটপোষ্টের আলোগুলো নীরব প্রহরীর মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লাইটপোষ্টের আলোগুলো কেমন ঝাপসা কুয়াশাচ্ছন্ন।

গাড়ির মধ্যে শুধু দুটি প্রাণী–বনহুর আর নূরী।

নূরী এতক্ষণ কোন কথা না বলায় হাঁপিয়ে পড়েছিল। গাড়িতে চাপার পর থেকে সেই মুখ। বন্ধ হয়েছে, এখনও সে নিশ্চুপ।

হঠাৎ বনহুর বলে ওঠে–তোমার সখ দেখে আমি সত্যি আশ্চর্য হলাম।

নূরী চমকে উঠলো, বনহুর কি তাকে চিনতে পেরেছে। নিশ্চয়ই তাই হবে। একবার আড় নয়নে বনহুরকে দেখার চেষ্টা করল সে। বনহুর এবার মৃদু হাসলো– নূরী, তুমি আজ এসে ভালই করেছ। তুমি পাশে থাকায় আমি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি।

নূরী স্তকণ্ঠে অস্ফুটধ্বনি করে উঠে–হুর।

গাড়িতে যখন প্রথম স্টার্ট দিলে তখনই আমি তোমাকে চিনে নিয়েছি।

কেন তবে তুমি আমায় নামিয়ে দিলে না?

তোমার মনের দ্বন্দ্ব দূর হয়েছে তো?

হুর, আমি তোমাকে কোনদিন অবিশ্বাস করিনি।

আজ কেন তবে তুমি আমাকে অনুসরণ করেছিলে?

নূরী বনহুরের হাতের ওপর হাত রেখে–তুমি আমাকে ক্ষমা করো হুর, না জেনে আমি তোমাকে ভুল বুঝেছি।

নূরী!

বল?

জানি তুমি আমায় ভালবাস। কিন্তু তার বিনিময়ে আমি তোমাকে,

না না হুর, আর তুমি কিছু বল না। আমি সহ্য করতে পারবো না হুর। নূরী বনহুরের কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

নূরীর হৃদয়ের ব্যথা বনহুরের মনে যে আঘাত করে না তা নয়। দস্যু হলেও সে মানুষ। তার চোখ দুটোও ঝাপসা হয়ে আসে।

গাড়ি ততক্ষণে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেছে।

বনহুর নেমে দাঁড়িয়ে গাড়ির দরজা খুলে ধরে বলে–এসো।

নূরী নেমে দাঁড়ায় বনহুরের পাশে।

গতরাতে অফিস থেকে ফিরতে মিঃ হারুনের রাত প্রায় চারটে বেজে গিয়েছিল। ক্লাবের সে গুণ্ডাগুলোকে হাজতে রেখে অফিসের খাতাপত্র ঠিক করে তবেই তিনি ফিরেছিলেন। ভোরের দিকে ঘুমটা একটু জেঁকে এসেছে–এমন সময় পাশের টেবিলে ফোনটা বেজে উঠলো।

মিসেস হারুন একটু সকাল সকাল উঠেছেন। তিনি স্বামীকে না জাগিয়ে নিজেই ফোন ধরলেন হ্যালো কে মিঃ হোসেন? পুলিশ অফিস থেকে বলছেন? ব্যাপার কি? না উনি এখনও ওঠেন নি। আপনিও তো খুব রাত করে বাড়ি ফিরেছেন, আবার এত সাত সকালে অফিসে? কি বলেন–মিঃ রাও ফিরে এসেছেন। সবুর করেন, উনাকে ডেকে দিচ্ছি কি আশ্চর্য। রিসিভারের মুখে হাত রেখে ডাকলেন ওগো শুনছো, শোন শোন মিঃ রাও নাকি ফিরে এসেছেন।

এ্যাঁ এত চেঁচাচ্ছো কেন? পাশ ফিরে শুয়ে কথাটা বলেন মিঃ হারুন। মিসেস হারুন পুনরায় বলেন–ওঠো, ওঠো, শোন মিঃ রাও ফিরে এসেছেন।

কি বললে, মিঃ রাও ফিরে এসেছেন? এক লাফে শয্যা ত্যাগ করে স্ত্রীর হাত থেকে রিসিভার কেড়ে নিয়ে কানে ধরলেন– হ্যালো .... কি বলেন মিঃ রাও ফিরে

এসেছেন। আচ্ছা আমি এখনি আসছি।

রিসিভার রেখে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ হারুন–ওগো, আমার জামা কাপড়গুলো এগিয়ে দাও তো।

সে কি, হাত মুখ ধোবে না? নাস্তা করবে না?

রেখে দাও তোমার হাতমুখ ধোয়া আর নাস্তা খাওয়া। কি আশ্চর্য যাকে আজ ক'দিন পুলিশ অহরহ খুঁজে বেড়াচ্ছে যার তল্লাশে সমস্ত পুলিশ বিভাগ আহার নিদ্রা বিশ্রাম ত্যাগ করেছে। এমনকি পুলিশ সুপার পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন–সে শংকর রাওয়ের আবির্ভাব-একি কম কথা?

জামাকাপড় পরে মিঃ হারুন যখন পুলিশ অফিসে পৌঁছলেন তখন সকাল সাতটা বেজে গেছে। অফিসে তোক ধরছে না। মিঃ হারুনকে দেখে সবাই পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালো।

মিঃ হারুন কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন একটা চেয়ারের উস্কুখুস্কচুল, কোটরাগত চোখ-উত্তেজিতভাবে বসে আছেন মিঃ রাও। তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন কয়েকজন পুলিশ অফিসার।

মিঃ হোসেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। মিঃ হারুনকে দেখে মিঃ হোসেন বলেন–গুড মর্নিং মিঃ হারুন। আজ আমাদের সুপ্রভাত।

মিঃ হারুন মিঃ হোসেনের সাথে হ্যান্ডশেক করে মিঃ রাওয়ের সামনে এসে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। তারপর শংকর রাওয়ের আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বলেন– স্ত্রীর ঔষুধ আনতে গিয়ে কোথায় উধাও হয়েছিলেন মিঃ রাও?

শংকর রাও কিছু বলার পূর্বেই বলে ওঠেন মিঃ হোসেন–উনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। আমি উনার মুখে যা শুনলাম বলছি।

বলুন?

মিঃ রাওয়ের কাছে শোনা সমস্ত ঘটনা মিঃ হোসেন ইন্সপেক্টার মিঃ হারুনের কাছে বলেন। আরও বলেন–মিঃ রাও ভেবেছিলেন তিনি দস্যু বনহুরের অনুচরের

হাতে বন্দী হয়েছিলেন। কিন্তু তা নয়। মিঃ রাওয়ের উধাওয়ের ব্যাপারে দস্যু বনহুর নেই বা ছিল না বরং তাকে উদ্ধার করেছে দস্যু বনহুর।

মিঃ হারুন–দস্যু বনহুর আমাকে রক্ষা করেছে। আমি তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। সেই মুহূর্তে সে যদি আমাকে উদ্ধার না করতো, তাহলে আমার বাঁচার কোনা আশা ছিল না।

শংকর রাও কথাগুলো বলতে বেশ হাঁপিয়ে পড়ছিলেন। তিনি পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে, মিঃ হারুনের হাতে দিলেন–দস্যু বনহুর চলে যাওয়ার সময় এই কাগজখানা আমাকে দিয়ে গেছে।

মিঃ হারুন কাগজখানা তুলে ধরলেন চোখের সামনে, তাতে লেখা রয়েছে মাত্র দুটি শব্দ–দস্যু বনহুর।

মিঃ হারুন জিজ্ঞাসা করলেন–আপনি তার পরিচয় জানতে চাননি?

চেয়েছিলাম, সে নিজের নাম মিঃ প্রিন্স বলেছিল। সত্যি মিঃ হারুন দস্যু বনহুরকে যুবরাজের মতই দেখাচ্ছিল।

হ্যাঁ, সে প্রিন্সের মতই দেখতে। কথাটা বলেন মিঃ হারুন। তারপর একটু ভেবে বলেন– তাহলে যে দস্যু বা ডাকু আপনাকে উধাও করেছিল সে বনহুরের দলের নয়?

না মিঃ হারুন, আমি এ কদিনে বেশ উপলব্দি করেছি যারা আমাকে পাকড়াও করেছিল তারা শুধু দস্যুই নয়, নারী হরণকারী দলও আমার মনে হয়, চৌধুরী কন্যাও তাদের হাতে বন্দী রয়েছে।

অনুমানে কিছু বলা যায় না, মিঃ রাও। চৌধুরী কন্যাকে কেউ পাকড়াও করে নিয়ে গেছে, না সে নিজেই গেছে তার সঠিক সন্ধান এখনও হয়নি।

মিঃ রাও বলেন– আমি যেসব প্রমাণ পেয়েছিলাম তাতে নিঃসন্দেহে বলতে পারি মিস মনিরাকে জোরপূর্বক নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাছাড়া তাদের বাড়ির পুরোন দারোয়ান খুন হওয়ার। পেছনে রয়েছে একমাত্র ঐ কারণ।

মিঃ রাও এমনও তো হতে পারে-বনহুর নিজে না এসে লোক দিয়ে কার্য সিদ্ধি করেছে এবং দারোয়ানকে খুন করিয়েছে। যাক সে সব কথা-এখন আপনি পূর্ণমাত্রায় বিশ্রাম গ্রহণ করুন। সুস্থ হলে কাজের কথা হবে।

শংকর রাও বলেন–বিশ্রাম নেবার সময় কই আমার মিঃ হারুন, আমি এই অবস্থাতেই কাজে নামতে চাই।

এই অসুস্থ শরীরে?

হ্যাঁ, মিঃ হারুন আমার সুস্থ হওয়া পর্যন্ত ওরা সেখানে অপেক্ষা করবে না।

সেই শয়তানের কথা বলছেন।

হাঁ, যারা আমাকে এই এক সপ্তাহ তিলে তিলে শুকিয়ে মেরেছে। মিঃ হারুন আমি আর এক। মুহূর্ত বিলম্ব করতে চাই না। আপনারা আমাকে সাহায্য করলে আমি ওদের আস্তানা খুঁজে বের করতে পারবো।

আনন্দভরা কণ্ঠে বলেন মিঃ হারুন–আমরা আপনাকে সানন্দে সাহায্য করবো, কারণ এটা আমাদেরও ডিউটি।

তাহলে এক্ষুণি পুলিশ ফোর্সকে তৈরি হতে বলুন, আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারব। কিন্তু মিঃ হারুন, আপনার সঙ্গে গোপনে একটা কথা আছে।

বেশ চলুন।

পাশের কক্ষে গিয়ে দাঁড়ালেন ওরা দুজন মুখোমুখি। মিঃ রাও বললেন–শয়তানদের পাকড়াও করার পর আমি ডক্টর জয়ন্ত সেনকে গ্রেপ্তার করতে চাই। কারণ, তিনি তাদের সঙ্গে জড়িত আছেন।

মিঃ হারুন বলেন– আমিও অনেক দিন থেকে ঐ রকম সন্দেহ করে আসছি কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে কিছু করতে পারিনি।

আমি হাতেনাতে প্রমাণ পেয়েছি মিঃ হারুন, শুনুন তবে।

বেশ বলুন।

রাও স্ত্রীর ঔষুধ আনবার সময় যে ঘটনা ঘটেছিল এবং যে কারণে ডক্টর সেনকে সন্দেহ করে তিনি তার পেছনে ধাওয়া করেছিলেন– সব খুলে বলেন।

মিঃ হারুন বলেন– ডক্টর সেন শুধু সেই বদমাইশদের সঙ্গেই জড়িত নেই, সে দস্যু বনহুরের সঙ্গেও জড়িত রয়েছে, নইলে এত ডাক্তার থাকতে দস্যু বনহুর আসে তার কাছে।

এসব আলোচনা পরে হবে মিঃ হারুন, আপনি তৈরি হয়ে নিন।

আমি তৈরি হয়েই এসেছি মিঃ রাও চলুন কোথায় যেতে হবে।

তারপর মিঃ হারুন মিঃ হোসেনকে ডেকে পুলিশ ফোর্স নিয়ে দুটি মোটর ভ্যানকে তৈরি হতে বলেন।

কিন্তু যখন শংকর রাও এবং পুলিশ ফোর্স সেই পুরানো বাড়িটায় গিয়ে পৌঁছলেন, তখন সে বাড়ি শূন্য হয়ে গেছে। সারাটা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু পাওয়া গেলনা। তবে এটা বুঝা গেল–সকাল হবার পূর্বেও এ বাড়িখানাতে মানুষ ছিল।

প্রত্যেকটা কক্ষে নিপুণভাবে অনুসন্ধান চালালেন মিঃ হারুন। শংকর রাও একটা ছোট্ট কক্ষে প্রবেশ করে বলেন–আজ এক সপ্তাহ আমাকে এই কক্ষে আটক করে রাখা হয়েছিল।

বাড়িটা একেবারে শহরের শেষ প্রান্তে। বাইরে থেকে বাড়িটাকে ঠিক পোড়াবাড়ি বলেই মনে হয়।

বাড়িটাতে যখন নিখুঁতভাবে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে তখন হঠাৎ একটা কক্ষের মেঝেতে একটু ফাঁক দেখা গেল। মিঃ হারুন তখনই পুলিশকে সেখানে শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়তে আদেশ করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা সিঁড়ি বেরিয়ে পড়লো সেখানে।

একটা পাথরের ঢাকনা দিয়ে সিঁড়ির মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। মিঃ রাওয়ের চোখে আনন্দের দ্যুতি খেলে গেলো। তিনি ভাবলেন, নিশ্চয়ই সেই পাতালীপুরীর কক্ষে কোন গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে।

মিঃ রাও ও অন্যান্যরা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে চললেন। আশ্চর্য, মাটির তলায় একটা কক্ষ। সিঁড়িটা অবশ্য কক্ষের বাইরে একটা বারান্দাগোছের জায়গায় গিয়ে শেষ হয়েছে। তারপর কক্ষের দরজা।

মিঃ রাও এবং মিঃ হারুন টর্চ জ্বেলে সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন। কক্ষটা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

মিঃ হারুন খুব ভালভাবে লক্ষ্য করে বলেন–মিঃ রাও এ কক্ষেও কাউকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু সে নারী না পুরুষ?

মিঃ রাও তখন টর্চের আলো জ্বেলে খুব ভালো করে দেখছিলেন, হঠাৎ বলে ওঠেন –মিঃ হারুন দেখুন তো এটা কি? ততক্ষণে তিনি জিনিসটা হাতে উঠিয়ে নিয়েছেন। টর্চের আলোতেই দেখলেন একগোছা চুল।

মিঃ হারুন চুলগোছা হাতে নিয়ে বলেন– এ কক্ষে কোন নারী থাকতো। এই দেখুন সে চুল আঁচড়ে খসে পড়া চুলগুলো কুণ্ডলি পাকিয়ে ফেলে দিয়েছে।

তাঁদের অনুমান সত্য। এই কক্ষেই শয়তান নাথুরাম মনিরাকে বন্দী করে রেখেছিলা চুলগোছা তারই মাথার।

এর বেশি আর কিছু পেলেন না মিঃ হারুন এবং মিঃ রাও। শেষ পর্যন্ত বিফল মনোরথ হয়ে তাঁরা ফিরে চললেন। রাগে দুঃখে অধর দংশন করতে লাগলেন শংকর রাও।

পাষাণ প্রাচীরে ঘেরা জম্বুর বনের একটি গুপ্তগুহায় বন্দী করে রাখা হয়েছে মনিরাকে। সেখানে পিপীলিকাও প্রবেশে সক্ষম নয়। শয়তান নাথুরাম কৌশলে এ গুপ্ত গুহ সৃষ্টি করেছিল। গহন বনের অভ্যন্তরে কঠিন পাথরের তৈরি এই জম্ভুর পর্বত।

মনিরা এই নির্জন পর্বতের গুপ্ত গুহায় অবিরত অশ্রু বিসর্জন করে চলেছে। তার মন থেকে মুছে গেছে আশার স্বপ্ন, ধূলিসাৎ হয়ে গেছে সমস্ত বাসনা। আর কোনদিন সে লোকালয়ে ফিরে যেতে পারবে, তা কল্পনাও করতে পারে না।

আজ প্রায় দু'সপ্তাহ হতে চললো তাকে চুরি করে এনেছে তারা। সেই রাতের কথা মনে হলে আজও শিউরে ওঠে মনিরা। নিশীথ রাতে নিদ্রাহীন মনিরা

অস্থিরচিত্তে কক্ষে পায়চারী করছিল–বনহুরের চিন্তায় সে আচ্ছন্ন ছিল–এমন সময় দরজায় মৃদু টোকা পড়লো দরজা খুলে বেরিয়ে আসে সে দুজন বলিষ্ঠ লোক তার নাকের ওপর একখানা রুমাল চেপে ধরে–তারপর এই নির্মম পরিণতি। যদিও আজ পর্যন্ত মুরাদ তাকে স্পর্শ করতে পারেনি, নাথুরাম এবং তার অনুচরগণও মনিরার দেহে হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হয়নি, তবু সে যদি এখন কোনক্রমে মামা মামীর পাশে ফিরে যেতে পারে তাহলে কি তাঁরা আগের মত স্বচ্ছমনে গ্রহণ করবেন? তাকে তাঁরা স্নেহ করেন, মমতা করেন, ভালবাসেন হয়তো তাঁদের মনে বাধবে না, কিন্তু সমাজ–সমাজ কি তাকে আশ্রয় দেবে? কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক, তাতে কিছু আসে যায় না। মনির–তার মনির যদি তাকে বিশ্বাস না করে? হঠাৎ মনিরার চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গুহায় মুখ ধীরে ধীরে এক পাশে সরে যায়, গুহায় প্রবেশ করে মুরাদ।

মনিরার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। হৃদকম্প শুরু হয় তার। বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে মুখমণ্ডল। সামনে আজরাইলকে দেখলেও বুঝি এতখানি ভয় পেতো না মনিরা।

মুরাদের চোখমুখ আজ তার কাছে অতি ভয়ংকর মনে হয়। চোখ দুটো রক্ত জবার মত লাল টকটকে। টলতে টলতে প্রবেশ করলো সে। মনিরাকে দেখতে পেয়ে জড়িতকণ্ঠে সাদর সম্ভাষণ জানাল মুরাদ–গুড নাইট মিস মনিরা!

মনিরা কোন জবাব দিল না, সঙ্কুচিতভাবে গুহার এক কোণায় গিয়ে দাঁড়াল।

মুরাদ হেসে বলল–এখনও তোমার লজ্জা গেল না প্রিয়ে? মনিরা এখানে তো তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না?

এমন সময় নাথুরাম একটুকরা কাগজ ও কলম নিয়ে গুহায় প্রবেশ করলো– হুজুর, এই নিন।

মুরাদ ফিরে তাকালো নাথুরামের দিকে, তারপর বলল–এসো।

মনিরা জড়োসড়ো হয়ে আছে। অন্তরের ভয়ার্ত ভাব তার মুখে সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। মনিরা রাগে ক্ষোভে ভয়ে কেমন যেন হয়ে পড়েছে।

মুরাদ এবার এগিয়ে যায় তার দিকে–এসো, এই নাও কলম, ও যা বলবে লিখে দাও চট চট। তারপর নাথুরামকে লক্ষ্য করে বলে–বল নাথু?

নাথুরাম কর্কশকণ্ঠে বলল–কি আর এমন লিখতে হবে। কথার ফাঁকে পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে এগিয়ে দেয় মুরাদের দিকে–শুধু এই কথাগুলো লিখলেই চলবে।

মুরাদ নাথুরামের হাত থেকে সেই কাগজের টুকরাখানা নিয়ে চোখের সামনে তুলে ধরলো। পড়া শেষ করে হেসে বললো তোমার বুদ্ধি শিয়ালের চেয়েও বেশি নাথু।

সাধে কি আর আপনার মত লোক আমাকে টাকা দেয় হুজুর।

দিন চট করে ওটা লিখে দিন আমাকে। এখনই পাঠাতে হবে। ভোর হবার আগেই যেন ওটা পুলিশ অফিসে গিয়ে পৌঁছে।

তুমি যা ভেবেছিলে তাই হলো। ঘুঘুটাকে ফাঁদ থেকে বের করাই ভুল হয়েছিল। তাই সে বেঁচে গেল।

নাথুরামের চোখ দুটো ধক করে জ্বলে ওঠে। দাঁতে দাঁত পিষে বলে–ঘুঘুটার কোন দোষ নেই হুজুর। ওকে আমি যেভাবে পিছমোড়া করে বেঁধে গাড়ির পেছনে মেঝেতে শুইয়ে রেখেছিলাম কোন ব্যাটাই ধরতে পারতো না। যদি ঐ পাজিটা আমার গাড়িখানাকে ফলো না করত।

সে কে তাকে তুমি চিনতে পেরেছিলে নাথুরাম?

তাকে চিনতে না পারলেও অনুমানে বুঝতে পেরেছি সে দস্যু বনহুর ছাড়া আর কেউ নয়।

আমারও তাই মনে হয় নাথু, নাহলে তোমার মত বলবান বীর পুরুষকে কাবু করতে পারে, এমন লোক আছে?

মনিরার হৃদয়ে এক অনাবিল শান্তির প্রলেপ ছোঁয়া দিয়ে যায়। মনির তাহলে মিঃ রাওকে উদ্ধার করে নিতে পেরেছে। সে তাহলে নীরব নেই। তাকেই খুঁজে ফিরছে সে। হয়তো তার কথা স্মরণ করে চোখের পানি ফেলছে। মনির ভাবছে মনিরার কথা–এ যে মনিরার কত বড় সৌভাগ্য মনির–তার মনির না জানি এখন কোথায় কি করছে। মনিরা নিজের জন্য দুঃখ করে না। যত ভাবনা ওর জন্য। তাকে খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ কোন বিপদে না পড়ে। খোদা, তুমি ওকে বাঁচিয়ে নিও।

নাথুরামের কথায় মনিরার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে। নাথুরাম বলছে–মিস মনিরা দাও ওটা লিখে দাও।

মুরাদ কাগজ দু'খানা আর কলমটা মনিরার হাতে গুঁজে দিল।–এ কথাগুলো ঐ সাদা কাগজখানায় লিখে দাও।

মনিরা কাগজখানায় দৃষ্টি বুলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়–না আমি কিছুতেই একথা লিখবো না।

মুহূর্তে মুরাদ গর্জে ওঠে–কি বললে, তুমি লিখবে না?

না!

দাঁতে দাঁত পিষে বলে মুরাদ–তোমাকে লিখতে হবে।

কখনো না।

মুরাদ এবার নাথুরামের দিকে তাকালো নাথুরাম, আমি আদেশ দিলাম, তুমি যেমন করে পারো ওর কাছ থেকে লিখিয়ে নাও।

হুজুর, আপনি একটু বাইরে যান।

বেশ, আমি যাচ্ছি। মুরাদ গুহায় দরজার দিকে পা বাড়ায়।

মনিরার বুক থর থর করে কেঁপে ওঠে। শিউরে ওঠে তার শরীর। মুরাদের চেয়েও মনিরা নাথুরামকে বেশি ভয় করে। মুরাদ বেরিয়ে গেলে নাথুরাম কি করে বসবে ভাবতে পারে না মনিরা।

দুহাতে মাথার চুল টানতে থাকে মনিরা। নাথুরাম তার ভয়ংকর বলিষ্ঠ বাহু দুটি মেলে এগিয়ে যায় তার দিকে লিখবে না তুমি? বেশ! নাথুরাম এগুতে থাকে, মনিরা নাথুরামের কদাকার ভয়ংকর মুখখানার দিকে তাকিয়ে ভীতভাবে কাগজ দু'খানা হাতে তুলে নেয়।

কলমটা ছিটকে দূরে পড়ে গিয়েছিল, ওঠা মনিরার হাতে তুলে দেয় নাথুরাম লক্ষ্মী মেয়ের মত চট করে লিখে ফেলো।

মনিরা কাগজ নিয়ে লিখতে বসে। লেখা শেষ করে উঠে দাঁড়ায়।

নাথুরাম ডাকে–হুজুর, এবার ভেতরে আসুন।

মুরাদ হাসতে হাসতে গুহায় প্রবেশ করে–হয়েছে?

হ্যাঁ, এই দেখুন। মনিরার লিখিত কাগজখানা নাথুরাম মুরাদের কাছে দেয়।

মুরাদ কাগজখানা পড়ে বলে–চমৎকার! নাথু, তোমার বুদ্ধির তারিফ না করে পারি না।

নাথুরাম মুরাদের হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে বলে– এবার আপনি নিশ্চিন্ত হুজুর। এই চিঠি পেলে পুলিশ আর মনিরার সন্ধান নিয়ে উঠে পড়ে লাগবে না। ওর মামা মামী নিশ্চিন্তে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। আমি তাহলে....

মুরাদ জড়িতকণ্ঠে হাই তুলে বলে–এসো।

মনিরা ক্ষিপ্তের ন্যায় বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে মুরাদের দিকে। সে যদি মুনি ঋষি হতো তাহলে তার দৃষ্টিশক্তি দিয়ে ভস্ম করে দিত মুরাদকে।

মুরাদ মনিরার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে। মনিরার দৃষ্টি তার শরীরে যেন তীর ফলকের মত গিয়ে বিধছে। গাটা যেন শির শির করে ওঠে তার। মনিরার একি মূর্তি? মুরাদ কেমন যেন। ভড়কে যায়। মদের নেশা ছুটে যায়। মনিরার নিঃশ্বাস যেন তার সমস্ত দেহে আগুন ধরিয়ে দেয়।

মুরাদ যেন আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে পারে না। অসহ্য লাগছে ওকে। কি হলো– হঠাৎ এমন বিশ্রী লাগছে কেন? আর স্থির থাকতে পারে না মুরাদ, ধীরে ধীরে সরে পড়ে।

মুরাদ বেরিয়ে যেতেই বিরাট পাথরের দরজাখানা গুহার মুখ বন্ধ করে ফেলে। হঠাৎ মুরাদের ভয় বা ভীতির কোন কারণ ছিল না, আসলে আজ তার মদের মাত্রা খুব বেশি হয়েছিল।

মুরাদ চলে যেতেই মনিরা লুটিয়ে পড়লো মেঝেতে। কাঁদতে লাগলো ছোট্ট বালিকার মত। মাথার চুল টেনে ছিঁড়ল। ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করলো তবু তার কান্নার বিরাম নেই।

কেঁদে কেঁদে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো মনিরা। স্বপ্ন দেখছে সে, মনিরা কাঁদছে– কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে। আর কত কাঁদবে সে! হঠাৎ গুহার দরজা খুলে যায়। মনিরা চমকে উঠে বসলো। একি! গুহার দরজায় মনির দাঁড়িয়ে। তার চোখে মুখে ব্যাকুলতার ছাপ। মলিন বিষণ্ন মুখমণ্ডল–ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক। তাকে দেখতে পেয়ে ওর চোখ দুটো খুশিতে দীপ্ত হয়ে ওঠে। অস্ফুট কন্ঠে ডেকে ওঠে সে–মনিরা তুমি এখানে। আর আমি তোমাকে গোটা পৃথিবী খুঁজে বেড়াচ্ছি। মনিরাও ওকে দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লো। উচ্ছলকন্ঠে বলল–মনির তুমি এসেছো। ছুটে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে ওর বুকে। হঠাৎ মাটি আঁকড়ে চিৎকার করে ওঠে– মনির– মনির! ঘুম ভেঙে যায় মনিরার–তাকিয়ে দেখে কেউ নেই–কিছু নেই-শূন্য গুহার মেঝেতে সে একা শুয়ে আছে।

.

হতাশ হয়ে শয্যায় শুয়ে পড়লো বনহুর। আজ কতদিন তার এতটুকু বিশ্রাম হয় নি। অহরহ। মনিরার সন্ধানে সে উল্কার মত ছুটে বেড়িয়েছে। আহার ন্দ্রিা একেবারে পরিহার করেছে সে। নূরী জোর করে চারটি খাইয়ে দেয়, তাই সে বেঁচে আছে।

শুধু বনহুরই নয়, তার অনুচরগণও এতদিনে বিশ্রাম নেবার সুযোগ পায় নি। কেউ হোটেলের বয়ের কাজ নিয়েছে, কেউ বা ধোপা, কেউ নাপিত যে যেভাবে পারে মনিরার অনুসন্ধান করে চলছে।

যদিও সকলের মনে ঐ একটি প্রশ্ন, চৌধুরীকন্যার জন্য দস্যু বনহুরের এত মাথাব্যথা কেন, তবু কেউ প্রকাশ্যে কিছু বলতে বা জিজ্ঞাসা করতে সাহসী হয় না। একদিকে ভয় অন্যদিকে লাখ টাকা পুরস্কারের লোভ দস্যু বনহুরের অনুচরগণকে উন্মত্ত করে তুলেছে। সবাই আপ্রাণ চেষ্টায় চৌধুরীকন্যাকে খুঁজে চলেছে।

এমন দিনে বনহুরের কয়েকজন অনুচর একটি যুবতাঁকে কোন লম্পট গুণ্ডাদলের কবল থেকে উদ্ধার করে এনে হাজির করলো তাদের আস্তানায়।

অনুচর ক’জনের আনন্দ আর ধরে না। সর্দার আজ খুশি হয়ে তাদের আশাতিরিক্ত পুরষ্কার দেবেন।

কথাটা প্রথম নূরীর কানে যায়। মনিরাকে পাওয়া গেছে জেনে সেই প্রথম ছুটে আসে বনহুরকে কিছু না জানিয়ে। কারণ মনিরার জন্য দস্যু বনহুরের মত লোক আজ কতদিন হলো উন্মাদের মত হয়ে পড়েছে। যদিও বনহুর মনিরার সম্বন্ধে নূরীর নিকট কিছু বলেনি তবু নূরী বেশ বুঝতে পারে বনহুর সেই মনিরার জন্য কত চিন্তিত।

নূরী বনহুরের মনিরাকে আগে দেখে নেবে।

নূরী ছুটে গেল আস্তানার বাইরে যেখানে বনহুরের অনুচরগণ মেয়েটিকে এনে জটলা পাকাচ্ছে।

নূরী আসতেই সবাই সরে দাঁড়ালো।

নূরী এগিয়ে গেল মেয়েটির পাশে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে মেয়েটিকে দেখতে লাগলো। যুবতীর বয়স সতের কি আঠারো হবে। ছিপছিপে মাঝারি গড়ন। গায়ের রং শ্যামলা চেহারা বিশ্রী। নাকটা চ্যাপ্টা। নূরী ওকে দেখে হাসলো এই যার রূপের ছিরি, তাকেই কিনা খুঁজে মরছে হাজার হাজার লোক। নূরী জিজ্ঞাসা করলো এই, তোমার নাম?

মেয়েটা নূরীকে দেখে একটু আশ্বস্ত হয়েছিল। নইলে এই লোকগুলোর কার্যকলাপ তার কাছে মোটেই ভাল লাগছিল না। নূরীকে কথা বলতে দেখে খুশি হল, বলল–আমার নাম মনি।

নূরী ওর নাম শুনে ভাবলো, এই বুঝি সেই চৌধুরীকন্যা মনিরা, ওকে বুঝি সবাই মনি বলে ডাকে। নূরীর মায়া হলো ভাবলো অযথা বনহুরকে সে সন্দেহ করে চলেছে। এমন চেহারার কোন। মেয়েকে কোন পুরুষ ভালবাসতে পারে? বনহুর লোকের কষ্ট ব্যথা সহ্য করতে পারে না,তাই বুঝি। এমন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

নূরী মেয়েটার খাওয়া এবং বিশ্রামের আয়োজন করে চলে গেল বনহুরের কাছে।

বনহুর তখন বিছানায় চিৎ হয়ে আকাশ পাতাল কত কি ভাবছে এমন সময় নূরী গিয়ে বসলো তার সামনে। আজ নূরীর মুখ হাস্যোজ্জ্বল। আজ ক'দিন নূরী বনহুরের সামনে আসে, পাশে বসে কথা বলে কিন্তু ঠিক আগের মত স্বচ্ছমনে কথা বলতে পারে না। তেমনি করে আগের মত হাসতে পারে না। বনহুর তার পাশে রয়েছে তবু মনে হয় অনেক দূরে-নূরীর ধরাছোঁয়ার বাইরে।

আজ নূরীর মন থেকে একটা কালো মেঘ যেন কেটে গেছে। মনিরা সম্বন্ধে তার যে একটা ধারণা ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে। হেসে বলল নূরীহুর, তোমার মনিকে পাওয়া গেছে।

মনি? মনিরাকে পাওয়া গেছে!

হ্যাঁ, তাকে আমাদের আস্তানাতেই আনা হয়েছে। এখন সে বিশ্রাম কক্ষে বিশ্রাম করছে।

বনহুর নূরীর কথায় অত্যন্ত বিস্মিত হলো–দু'হাতে নূরীকে এঁটে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো–সত্যি? সত্যি বলছ নূরী?

হ্যাঁ হ্যাঁ যাও, ওকে দেখে এসো।

বনহুর লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর ছুটলো আস্তানার দিকে।

বনহুরকে দেখেই কয়েকজন অনুচর আনন্দ ভরা কণ্ঠে বললো সর্দার চৌধুরীকন্যাকে আমরা উদ্ধার করে এনেছি।

বনহুর বলে ওঠে–কোথায় সে?

মেয়েদের বিশ্রামাগারে বিশ্রাম করছে।

বনহুর আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে বিশ্রামাগারের খোঁজা পাহারাদারকে ডেকে বললো– যাকে এইমাত্র উদ্ধার করে আনা হয়েছে, তাকে পাঠিয়ে দাও।

খোঁজা পাহারাদার চলে গেল।

বনহুর বাইরে পায়চারী শুরু করলো। অন্য কোন ব্যাপারে হলে দরবারকক্ষে বসে তাকে। সেখানে ডেকে পাঠাতো সে। কিন্তু এ যে মনিরা–তার হৃদয়ের রাণী।

পদশব্দে ফিরে তাকালো বনহুর খোঁজা পাহারাদারের পেছনে ঘোমটা টানা একটা নারী।

বনহুরের চোখে মুখে একরাশ বিস্ময় ফুটে উঠল। সে দ্রুত হস্তে একটানে যুবতীর ঘোমটা সরিয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখমণ্ডল গম্ভীর বিষণ্ন হলো। এই কি তার মনিরা। রাগে ক্ষোভে অধর দংশন করতে লাগলো। মেয়েটি বনহুরকে দেখে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বনহুর দক্ষিণ হাতে নিজের মাথার চুল টেনে ধরলো তারপর ডাকালো রহমান, রহমান।

অনুচরদের মধ্য থেকে একজন বললো–রহমান ভাই এখনও ফেরেনি সর্দার।

বনহুর তাকেই ডাকলো–মংলু।

জ্বী সর্দার।

একে জিজ্ঞাসা করো–কোথায় এর বাপ মা, আত্মীয় স্বজন পৌঁছে দিয়ে এসে সেখানে। কোন অসুবিধা যেন না হয় ওর।

আচ্ছা সর্দার।

বনহুর ততক্ষণে নিজের কক্ষের দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে।

নূরী মেয়েটাকে পূর্বেই দেখেছে। একটা অবজ্ঞা ভাব ফুটে উঠেছে তার মনে। কতকটা আশ্বস্ত হয়েছে। তার হুরকে নিয়ে আর কোন চিন্তার কারণ নেই। কাজেই সে আর বনহুরকে অনুসরণ না করে সেই কক্ষেই বসে ছিল।

বনহুরকে অল্পক্ষণের মধ্যেই গম্ভীর মুখে ফিরে আসতে দেখে নূরী হেসে বলে–মনিকে পেয়েছ?

বনহুর ধপ করে শয্যায় বসে পড়ে বলে–হ্যাঁ।

কোথায় সে?

পাঠিয়ে দিয়েছি।

তার বাপ মার কাছে বুঝি?

হ্যাঁ।

কই, তোমার মনিরাকে পেয়েও তোমার মুখে হাসি ফুটলো না আশ্চর্য। এসো ঝর্ণার ধারে যাই। নূরী বনহুরের দক্ষিণ হাত ধরে টেনে তোলে।

ঝর্ণার ধারে গিয়ে পাশাপাশি বসে ওরা।

নূরী বলে–দেখ হুর, কত সুন্দর স্বচ্ছ জলধারা। আমার মনে হচ্ছে, অনেকগুলো মেয়ে যেন একসঙ্গে হাসছে।

না, কাঁদছে। কথাটা গম্ভীর ভাবাপন্ন কণ্ঠে বলে বনহুর।

ছিঃ তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ। এসো, আমার কোলে মাথা রেখে শোও। দেখ হুর কি সুন্দর নীল আকাশ। ঐ যেন শুভ্র বলাকাগুলো ডানা মেলে উড়ে চলেছে তোমার কি মনে হয় না আমরাও অমনি করে ডানা মেলে উড়ে যাই?

উঁহু জানতো আমি দস্যু।

হলেই বা।

দস্যুর মনে কি কাব্যের রঙ লাগে? ওসব তোমাদের চোখে ভাল লাগে।

নূরী বনহুরের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে, তারপর গুণ গুণ করে গান ধরে।

বনহুর নীরবে তাকিয়ে থাকে পশ্চিম আকাশে অস্তাচলগামী সূর্যের ক্ষীণ রশ্মির দিকে– ভাবে, তার মনিরার জীবন সূর্যও বুঝি এমনি করে নিঃশেষ হয়ে আসছে।

মনিরার কথা মনে পড়তেই বনহুর সোজা হয়ে বসে। এখন তার বসে থাকার সময় নয়। চঞ্চল হয়ে ওঠে বনহুর।

নূরী উঠে বসে দু'হাতে বনহুরের গলা বেষ্টন করে বলে–ভাল লাগছে না তোমার?

বনহুর কোন জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

নূরী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। অভিমানে ভরে ওঠে তার মন, বনহুর ততক্ষণে সামনের দিকে পা বাড়িয়েছে।

নিজের কক্ষে প্রবেশ করে পায়চারি করতে থাকে বনহুর। এমন সময় রহমান দরজার পাশে এসে দাঁড়ায়–সর্দার, আমি এসেছি।

ভেতরে এসো। গম্ভীর গলায় বলে বনহুর।

রহমান ছিন্নভিন্ন মলিন বসন পরিহিত অবস্থায় ভেতরে প্রবেশ করে–সর্দার।

বল?

আজ আমি ভিখারীর বেশে বেরিয়েছিলাম।

কোন সন্ধান পেয়েছ?

পেয়েছি, কিন্তু তাতে কোনো উপকার হবে কিনা জানি না।

বনহুর খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে প্রশ্ন ভরা ব্যাকুল আঁখি মেলে তাকায় রহমানের মুখের দিকে।

রহমান বলে–সর্দার আমি আজ ভিখারীর বেশে পুলিশ অফিসের পিছনে গিয়ে বসেছিলাম। আমাকে কেউ দেখতে পায়নি। অফিসের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। আমি যা শুনতে পেলাম, তার সারাংশ হচ্ছে এই–একটা পোড়াবাড়ির সন্ধান নাকি তারা পেয়েছিল। সে বাড়ির একটা গোপন কক্ষে চৌধুরী কন্যাকে আটক করে রাখা হয়েছিল। এখন সেখানে-মানে সেই বাড়ি শূন্য পড়ে রয়েছে, সেখানে কাউকে তারা পায়নি।

এটুকু শুধু শুনেছিলে?

হ্যাঁ সর্দার, পুলিশ অফিসের বাইরে থেকে শুধু ভাঙা ভাঙাভাবে এইটুকু আমার কানে এসেছিল।

বেশ, তুমি এখন যাও, বিশ্রাম করাগে।

রহমান বেরিয়ে যায়।

বনহুর মুক্ত জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছু চিন্তা করে। হঠাৎ তার মুখোভাব বেশ স্বচ্ছ হয়ে আসে। আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে ড্রেসিংরুমে। প্রবেশ করে।

জম্বুর বনের পথে ছোট্ট পাহাড়টির পাদমূলে একটি টিলার পাশে জটাজুটধারী ভস্মমাখা বাঘের চামড়া পরিহিত একজন সন্ন্যাসীর আর্বিভাব হয়েছে। চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত। ললাটে চন্দনের তিলক। দক্ষিণ হাতে আশা। মুখে চাপদাড়ি। বিড়বিড় করে মন্ত্র জপ করছে।

সে অঞ্চলের সকলেই সন্ন্যাসীর আবির্ভাবে মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়েছে। নিশ্চয়ই এ সন্ন্যাসী মহাদেব শিবশঙ্করের কোন ভক্ত বা শিষ্য। কারণ সন্ন্যাসীর চেহারা অতীব প্রশান্তিময় পবিত্রময় প্রশান্ত ললাট উন্নত নাসিকা বিশাল বক্ষ উজ্জ্বল দীপ্ত মুখমণ্ডল। সবাই এই দেবসমতুল্য সন্ন্যাসীর।– সেবায় আত্মনিয়োগ করলো। কেউ বা ফলমূল নিয়ে হাজির হলো তার সামনে, কেউ বা ফুল নিয়ে গেল তার পূজার জন্য।

নানা জন নানা মনোবাসনা নিয়ে সন্ন্যাসীর চরণযুগল আঁকড়ে ধরলো। কেউ সন্তান আশায়, কেউ বা মামলা মোকদ্দমার জন্য, কেউ ভালবাসা কামনায়। সন্ন্যাসীর সামনে ভক্তের দল জটলা পাকাতে লাগল।

কথাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই শুনল এই সন্ন্যাসীর কথা।

একদিন মুরাদের কানেও পৌঁছল সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা। এ কথাও সে জানতে পারল সন্ন্যাসী বাবাজীর আশীর্বাদে সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

মুরাদ চিন্তা করলো–আজও সে মনিরাকে বশীভূত করতে পারল না। তার সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হতে চলেছে। মনিরাকে জোরপূর্বক সে আটকে রাখতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ মনিরা তাকে মনেপ্রাণে ভাল না বাসছে, ততক্ষণ তার এ আটকে রাখায় কোন সাফল্য নেই।

একদিন রাতের অন্ধকারে আত্মগোপন করে মুরাদ সন্ন্যাসী বাবাজীর নিকটে গেল। তখন সন্ন্যাসী একা ছিলেন। কোনো লোকজন ছিল না তার পাশে। এদিক-সেদিক তাকিয়ে মুরাদ লুটিয়ে পড়ল সন্ন্যাসীর পায়ে। ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলল–

বাবাজী বাবাজী, আমার প্রতি সদয় হোন, আমার প্রতি সদয় হোন। আমি বড় দুঃখী.....

বারবার অনুনয় বিনয় করায় ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালেন সন্ন্যাসী বাবাজী। শান্ত সুমিষ্ট গম্ভীর কণ্ঠে বলেন–বৎস, আমি জানি তুমি কি চাও। কিন্তু যা চাও, তা পাবার নয়! সন্ন্যাসী বাবাজী নীরব হলেন।

মুরাদ অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে বলে ওঠে–বাবাজী, তাহলে উপায়? বলুন, বলুন, আমি কি করে তার মন পাব?

সন্ন্যাসী আবার নিশ্চুপ।

গভীর রাতের অন্ধকারে মাটির প্রদীপের ক্ষীণালোক সন্ন্যাসী বাবাজীকে পাথরের মূর্তির মত স্থির মনে হচ্ছে। আশে পাশে ঝোঁপঝাড়ের মধ্য থেকে ভেসে আসছে ঝিঁঝি পোকার আওয়াজ।

মৃদুমন্দ বাতাসে গাছের পাতাগুলো টুপটাপ করে খসে পড়ছে। দূর থেকে ভেসে আসছে। শেয়ালের ডাক। মেঘশূন্য স্বচ্ছ আকাশ। অসংখ্য তারা জ্বলছে সেখানে। সন্ন্যাসী চোখ মেলে আকাশের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন–মেয়েটার নাম উচ্চারণ কর। নিঃশ্বাস বন্ধ করে নাম উচ্চারণ করবে। একবার, দু'বার, তিনবার। খবরদার! ততক্ষণ নিঃশ্বাস নেবে না।

মুরাদ নিঃশ্বাস বন্ধ করে তিনবার উচ্চারণ করলো–মনিরা...... মনিরা–মনিরা.....

ব্যাস! আবার চোখ বন্ধ করলেন সন্ন্যাসী বাবাজী। কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়ালেন। তারপর গম্ভীর গলায় বলেন–বৎস! কন্যার নামের সঙ্গে তোমার নামের মিল রয়েছে। মুরাদ আর মনিরা।

সন্ন্যাসীর মুখে নিজ নাম শুনে অত্যধিক বিস্মিত হলো মুরাদ। সে তো তাঁকে নিজের নাম বলেনি। ভক্তিতে নুয়ে পড়লো মুরাদ।

সন্ন্যাসী আবার জিজ্ঞাসা করলেন–তুমি তাকে স্পর্শ করেছ?

না, সে মেয়ে নয় যেন কালনাগিনী। তার নিকটে গেলে আমি তার চোখের দিকে চাইতে পারি না। মনে হয় ওর নিঃশ্বাসে আগুন ঝরছে। সে আগুনে আমি জ্বলেপুড়ে ছাই হবার জোগাড় হই।

বেশ।

মুরাদ অভিমানভরা কণ্ঠে বলে–এটা বেশ! আমি তাকে ভালবাসি আর সে আমাকে বিষচোখে দেখে-এটা বেশ?

বৎস! ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। তাকে তুমি পাবে। অতি নিজের করে পাবে, কিন্তু সে যাকে ভালবাসে তাকে ওর মন থেকে মুছে ফেলতে হবে।

এ কথা আমিও ভেবেছি, কিন্তু তার কোন উপায় নেই। বাবাজী, মনিরা যাকে ভালবাসে সে দস্যু বনহুর।

হ্যাঁ, আমি গণনায় তারই নাম খুঁজে পেয়েছি।

বাবাজী, ঐ দস্যু বনহুরকে নিপাত করা যায় না? ওকে নিহত করতে পারলে মনিরা আমার হবে।

হাঁ, সে কথা আমিও ভাবছি। কিন্তু বনহুরকে নিপাত করতে হলে চাই সাধনা। তাহলে তুমি অসীম শক্তি লাভ করবে।

কি সাধনা করতে হবে বাবাজী?

সব পরে বলব। তুমি কিছু ভেবো না। আজ যাও, আবার কাল গভীর রাতে এমন সময় এখানে আসবে। মনিরাকে সঙ্গে এনো, ওর বস্ত্রাঞ্চলের ওপর বসে তোমাকে ধ্যান-সাধনা করতে হবে।

বাবাজী, আমি আপনাকে অজস্র অর্থ দেবো।

সন্ন্যাসী কোনদিন অর্থলোভী হয় না। যাও আর বিলম্ব করো না, আমার ধ্যানের ব্যাঘাত হচ্ছে।

মুরাদ সন্ন্যাসী বাবাজীর চরণধূলি মাথায় নিয়ে ধীরে ধীরে চলে যায়।

পরদিন আবার আসে মুরাদ।

গোটা পৃথিবী সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে। আকাশ আজ স্বচ্ছ নয়। সন্ধ্যার পর থেকে ঝুপঝাঁপ বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, দমকা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। শীতের রাত-তদুপরি দুর্যোগময় মুহূর্ত। নিমেল হাওয়া মানুষের হাড়ে হাড়ে কাঁপন লাগায়। জন প্রাণী শূন্য পথ বেয়ে মুরাদ এসে দাঁড়াল সন্ন্যাসী বাবাজীর সামনে। বিনীত কণ্ঠে ডাকলো–বাবাজী।

সন্ন্যাসী বাবাজীর শরীর সিক্ত হয়ে উঠছে। জটা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা পানি। বিদ্যুতের আলোতে সন্ন্যাসীকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। সংসারত্যাগী মানুষ, তার আবার শীত-তাপ কিছু আছে। চোখ বন্ধ করে কি যেন মন্ত্র জপ করছেন। মুরাদের কণ্ঠস্বরে চোখ মেলে তাকালেন সন্ন্যাসী বাবাজী। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলেন–সঙ্গিনী কই?

মুরাদ হাতজোড় করে কম্পিত গলায় বলল–বাবাজী, তাকে আনতে পারলাম না। পাহাড় নড়বে তবু সে নড়বে না। জোরপূর্বক আনা যায় বাবাজী, আপনি যদি বলেন, তাকে লোক দিয়ে পাকড়াও করে আনতে পারি।

দরকার নেই।

তাহলে আমার সাধনা হবে না!

হবে বৎস, তোমার দুঃখ আমার হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। তুমি যাকে চাও সে তোমাকে চায় না-বড় দুঃখ।

তাহলে কি করব?

আমি যাব সেখানে।

আনন্দে অস্ফুটধ্বনি করে ওঠে মুরাদ–বাবাজী!

হ্যাঁ, আমি যাবো। কিন্তু জানো বৎস, আমি লোকের সামনে যাই না।

আমি আপনাকে অতি গোপনে সেখানে নিয়ে যাব। বাবাজী, কি বলে যে আমি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো।

দরকার নেই।

চলুন তাহলে বাবাজী?

চলো।

এক হাতে আশা, আর এক হাতে রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী বাবাজী।

আগে চলল মুরাদ, পেছনে চললেন সন্ন্যাসী বাবাজী।

গহন বনের মাঝ দিয়ে পাহাড় আর টিলার পাশ কেটে এগিয়ে চলেছে মুরাদ আর সন্ন্যাসী বাবাজী। বৃষ্টি থেমে এসেছে, কিন্তু মেঘের ডাক আর বিদ্যুতের চমকানী এখনও থেমে যায়নি।

মুরাদের হাতে ছিল একটা টর্চ, তারই আলোতে পথ দেখে এগুচ্ছিল তারা। প্রায় ঘণ্টা দুই চলার পর জম্বুর পর্বতের পাদমূলে গিয়ে পৌঁছল মুরাদ আর সন্ন্যাসী বাবাজী।

ঝোঁপঝাড় আর জঙ্গলে ঘেরা জম্বুর পর্বতের গা ঘেঁষে কিছুটা এগুলো। এই পথটুকু চলতে তাদের কষ্ট হচ্ছিল। আরও কিছুটা এগুনোর পর মুরাদ একস্থানে দাঁড়িয়ে একবার, দু'বার, তিনবার শিস্ দিল, সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ হলো। দেখা গেল পর্বতের পাদমূল ধীরে ধীরে একপাশে সরে যাচ্ছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে সুন্দর একটা সুড়ঙ্গপথ বেরিয়ে এলো. দু'জন মশালধারী ভীষণাকার লোক সুড়ঙ্গমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

মুরাদকে দেখে তারা সরে দাঁড়ালো, সন্ন্যাসী বাবাজীকে নিয়ে মুরাদ অতি সন্তর্পণে গুহার মধ্যে প্রবেশ করল। একটি নয়, দুটি নয়-প্রায় সাতটি গুহার মুখ পেরিয়ে মুরাদ সন্ন্যাসী বাবাজীকে নিয়ে একটি পাথরখণ্ডের নিকট দাঁড়ালো। তারপর পাশে একটি যন্ত্রে হাত রাখতেই পাথর হুড়হুড় শব্দে একপাশে সরে গেল।

সন্ন্যাসী বাবাজী আর মুরাদ সেই গুহায় প্রবেশ করলো। গুহার মধ্যে এককোণে একটি মশাল জ্বলছিল। এক পাশে একটি দড়ির খাট। খাটে শুয়ে ছিল এক যুবতী।

মুরাদ আর সন্ন্যাসী বাবাজীর পদশব্দে মুখ তুলে তাকালো যুবতী। মুরাদের সঙ্গে জটাজুটধারী সন্ন্যাসী দেখে সে চমকে উঠলো। ভয়ে পাংশু হয়ে উঠলো তার মুখমণ্ডল। আলুথালু। বেশে উঠে দাঁড়াল।

মুরাদ সন্ন্যাসী বাবাজীকে লক্ষ্য করে বললো–এই সেই মনিরা।

সন্ন্যাসী বাবাজী অস্ফুটস্বরে বলেন–হু।

মুরাদ ভক্তিভরে মাথা নত করে বললো–বাবাজী, সব আমি আপনাকে বলেছি, আর.....

থাক, আর বলতে হবে না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মনিরার দিকে তাকালেন সন্ন্যাসী বাবাজী। তারপর বলেন "তুমি বাইরে যাও, তোমায় যখন ডাকবো তখন ভেতরে এসো-সাধনা শুরু হবে।

মুরাদ খুশিমনে বেরিয়ে গেল।

সন্ন্যাসী মনিরার দিকে এগুলেন। মশালের আলোতে নিপুণ দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলেন। তারপর বলেন–এসো, তোমার মাথায় ফুঁ দিই।

না। দৃঢ় কণ্ঠস্বর মনিরার।

যুবতী, তোমাকে সে চায়–কেন ওকে তুমি পায়ে ঠেলছো?

রুদ্ধকণ্ঠে বলে মনিরা–ওকে আমি চাই না। প্রাণ যদি যায় তবুও না!

কিন্তু আমি এমন মন্ত্র পাঠ করে তোমায় ফুঁ দেবো তখন দেখবে সে–ই তোমার প্রিয়জন হয়ে দাঁড়াবে।

মনিরা আকুলভাবে কেঁদে উঠলো-না না সন্ন্যাসী, আপনি আমার সর্বনাশ করবেন না। তার চেয়ে আমাকে হত্যা করুন।

তা হয় না। সে আমাকে অনেক অনুনয় বিনয় করে তবেই এখানে এনেছে। আমি তাকে ফাঁকি দিতে পারি না।

আপনি সংসারত্যাগী মহাপুরুষ, আপনি একজন মহান ব্যক্তি, একটি নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার সর্বনাশ করতে পারবেন? আপনার হৃদয় কি এতটুকু কাঁপবে না?

যুবতী, আমি সকলেরই মঙ্গলাকাঙ্খী। তুমি কি চাও-বলতে পার?

মনিরা যেন অন্ধকারে আলোর সন্ধান পায়। ব্যাকুলকণ্ঠে বলে–আপনি আমাকে বাঁচান.....

সন্ন্যাসী গম্ভীরকণ্ঠে বলেন–বুঝেছি, তুমি একজনকে ভালবাস।

হ্যাঁ বাসি।

কে সে?

না না, তা বলতে পারি না।

পারতে হবে। আমি তাহলে তোমাকে তার নিকট পৌঁছে দেব।

সত্যি?

হ্যাঁ, বল তার নাম কি? অবশ্য তুমি না বললেও আমি যোগবলে জানতে পেরেছি। যাকে তুমি ভালবাস-সে দস্যু বনহুর।

মনিরা অস্কুটধ্বনি করে ওঠে-সন্ন্যাসী, আপনি সবই জানেন। আমাকে এই লম্পট শয়তানের হাত থেকে বাঁচান-বাঁচান-আকুলভাবে কেঁদে ওঠে মনিরা।

সন্ন্যাসী মনিরার মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনার সুরে বলেন–ক্ষান্ত হও। যদি আমাকে বিশ্বাস করো তবে তোমাকে তোমার প্রিয়ের নিকট পৌঁছে দিতে পারি!

সত্যি?

হ্যাঁ, তুমি মুরাদের সঙ্গে আমার আস্তানায় যেও, আমি তোমাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেব। আর যা বলি সেইমত কাজ করো-মুরাদের হাতে হাত রাখতে বললে রাখবে, তোমার আঁচল বিছিয়ে ওকে বসতে দেবে।

আচ্ছা।

মনে থাকবে সব কথা?

থাকবে।

সন্ন্যাসী এবার হাতে তালি দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করলো মুরাদ–বাবাজী আমাকে ডাকছেন?

হ্যাঁ বৎস, সময় সংকীর্ণ। আমাকে শীঘ্র যেতে হবে। তার পূর্বে আমি তোমার সাধনা শেষ করতে চাই। দেখো বৎস, ওকে আমি মন্ত্রে বশীভূত করে ফেলেছি। হাত পাতো–

মুরাদ দক্ষিণ হাত প্রসারিত করলো।

মনিরাকে ইঙ্গিত করলো সন্ন্যাসী তার হাতের ওপর হাত রাখতে।

মনিরা ধীরপদে এগিয়ে এসে মুরাদের হাতের ওপর দক্ষিণ হাতখানা রাখলো।

সন্ন্যাসী বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন।

মুরাদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। এত অল্প সময়ে মনিরা এতখানি বশীভূত হয়েছে–বড় আনন্দের কথা!

এবার সন্ন্যাসী মনিরাকে আঁচল পেতে বসতে বলে। মনিরা আঁচল পেতে বসলো। মুরাদকে বললো–বৎস, ওর আঁচলে বসো।

মুরাদ গুরুদেবের আদেশ পালন করলো।

কিছুক্ষণ স্ন্যাসী মন্ত্র পাঠ করার পর বলে উঠলেন–আজ সাধনা শেষ হলো না, কিছু বাকি রইলো। তুমি কাল মনিরাকে নিয়ে আমার আস্তানায় এসো, বাকিটুকু শেষ করবো। সাবধান, সাধনা শেষ হবার পূর্বে যেন মনিরাকে স্পর্শ করো না, তাহলে সব পণ্ড হয়ে যাবে–আজ সময় সংকীর্ণ-আমি চললাম।

বাবাজী, আমি আপনাকে পৌঁছে দেব?

দরকার হবে না।

মুরাদ সন্ন্যাসী বাবাজীকে গুপ্ত গুহার বাইরে পৌঁছে দেয়। বিদায়কালে বার দুই সন্ন্যাসীর চরণধূলি গ্রহণ করে সে।

মনিরার নিখোঁজের পর চৌধুরী সাহেব এবং তার স্ত্রী মরিয়ম বেগমের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে। অবিরত কাদা কাটি করে চলেছেন তাঁরা। চৌধুরী সাহেব একে ভাগনী মনিরার জন্য গভীরভাবে শোকাভিভূত হয়ে পড়েছেন, তদুপরি স্ত্রীর জন্য তিনি বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

সেদিন দ্বিপ্রহরে চৌধুরী সাহেব স্ত্রীর শিয়রে বসে তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন, এমন সময় বয় এসে জানালো-স্যার, ইন্সপেক্টর সাহেব এসেছেন, আপনার সঙ্গে জরুরি দরকার আছে।

চমকে উঠলেন চৌধুরী সাহেব, হঠাৎ এ সময়ে–কোন সন্ধান পেয়েছে কি তারা?

মরিয়ম বেগমও উদ্বিগ্ন হলেন, বলেন–”ওগো, দেরী করো না-যাও, দেখো কি সংবাদ তাঁরা এনেছেন।

যাচ্ছি।

চৌধুরী সাহেব ড্রইংরুমে প্রবেশ করতেই দেখতে পেলেন মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন বসে আছেন। উভয়ের মুখমণ্ডলেই বেশ চঞ্চলতা ফুটে উঠেছে। চৌধুরী সাহেবকে দেখেই সালাম জানালেন। তারপর মিঃ হারুন বলেন–চৌধুরী সাহেব, অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি। আপনার ভাগনী মিস মনিরার একটি চিঠি আমাদের হস্তগত হয়েছে।

মনিরা চিঠি লিখেছে-কই-কই সে চিঠি? ব্যস্তভাবে চৌধুরী সাহেব এগিয়ে গেলেন মিঃ হারুনের দিকে।

বসুন আমি দেখাচ্ছি। পকেট থেকে একটি ভাঁজকরা কাগজ বের করে বলেন–এই নিন।

চৌধুরী সাহেব সোফায় বসে কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরেন। ধীরে ধীরে তার মুখমণ্ডল স্বাভাবিক হয়ে এলো!

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন এতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চৌধুরী সাহেবের মুখমণ্ডল লক্ষ্য করছিলেন। এবার মিঃ হারুন জিজ্ঞাসা করলেন-চৌধুরী সাহেব, এই চিঠিখানা তাহলে সত্যিই আপনার ভাগনী মিস মনিরার হতের লেখা?

হাঁ ইন্সপেক্টার।

তাহলে আপনার ভাগনী মিস মনিরা স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করেছে, সে এখন আপনার পুত্র দস্যু বনহুরের পাশে সুখে দিন কাটাচ্ছে।

চিঠিতে আপনি এখনও আপনার ভাগনীর অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকতে চান?

চৌধুরী সাহেব এ কথার কোন জবাব দিতে পারেন না, নিশ্চুপ থাকেন।

মিঃ হোসেন বলেন–একথা জানার পরও যদি আপনি ভাগনীর নিখোঁজ ব্যাপারে চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন, তবে এতে আপনার কলঙ্ক বাড়বে।

হ্যাঁ চৌধুরী সাহেব এখন আপনার শান্ত থাকাই উচিত। কারণ যে নারী স্বেচ্ছায় কোন পুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে যায় বা গৃহ ত্যাগ করে, তাকে খোঁজ করা বাতুলতা মাত্র! তাছাড়া বনহুর আপনারই পুত্র। এ কথাও আপনি একদিন আমাদের নিকট বলেছেন যে, আপনার সন্তানকে মনিরা ভালবাসে। বলেন মিঃ হারুন?

চৌধুরী সাহেব আনমনে বলেন–হ্যাঁ ইন্সপেক্টর সাহেব, মনিরা কি ভালবাসে।

তাহলে তো আপনার আর ব্যস্ত হবার কারণ নেই?

না।

মিঃ হারুন উঠে দাঁড়াল–চলি তাহলে চৌধুরী সাহেব?

চৌধুরী সাহেব নিরুত্তর, তিনি যেন পাথরের মূর্তির মতই স্তব্ধ হয়ে গেছেন।

মিঃ হারুন এবং হোসেন ড্রইংরুমে থেকে বেরিয়ে যান।

চৌধুরী সাহেব কলের পুতুলের মত ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। সিঁড়ির মুখেই উদ্বিগ্নভাবে দাঁড়িয়ে আছেন মরিয়ম বেগম।

স্বামীকে নিঃশব্দে এগিয়ে আসতে দেখে বলেন–কি সংবাদ, কেন এসেছিলেন ওরা?

চৌধুরী সাহেব কোন কথা না বলে হাতের চিঠিখানা মরিয়ম বেগমের হাতে দিলেন-পড়।

কার চিঠি?

মনিরার।

মনিরার চিঠি!

হ্যাঁ, পড়ে দেখ।

তুমিই পড়না, আমার চোখ কেমন যেন ঝাপসা হয়ে এসেছে। স্ত্রীর হাত থেকে আবার চিঠিখানা নিয়ে পড়তে শুরু করেন চৌধুরী সাহেব

"মামুজান, তোমরা আমার জন্য মনে হয় খুব চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েছ। কিন্তু আমার জন্য তোমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি মনিরের সঙ্গে চলে এসেছি এবং এখন তার পাশে রয়েছি। "

— তোমাদের মনিরা

মরিয়ম বেগমের মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, খুশিভরা কণ্ঠে বলেন–মনিরাকে তাহলে কেউ ধরে নিয়ে যায়নি? খোদা তুমি আমাকে বাঁচালে।

রাগতঃকণ্ঠে বললেন চৌধুরী সাহেব-মান-ইজ্জতের মাথা খেয়ে সে আমাদের উদ্ধার করেছে-না? ছিঃ ছিঃ ছিঃ, সব গেল, আমার কিছু আর বাকি রইলো না!

ওগো, কেন তুমি রাগ করছ? ওরা দুজন দুজনকে ভালবাসে–এ আমাদের সৌভাগ্য।

কলঙ্কটা কোথায় যাবে?

কলঙ্ক! কি যে বল, কিসের কলঙ্ক? মনিরার বিয়ে মনিরের সঙ্গেই হবে, এতে আবার কলঙ্ক কিসে?

তাই বলে এভাবে-না না, আমার সব গেল–মান-সম্মান-ইজ্জত সব গেল!

শান্ত হও। চলো,ঘরে চলো। স্বামীর হাত ধরে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করেন মরিয়ম বেগম।

.

পুলিশ অফিস।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন ও অন্যান্য পুলিশ অফিসার বসে আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল। শংকর রাওও সেখানে উপস্থিত রয়েছেন।

মনিরার ব্যাপার নিয়েই আলাপ চলছিল।

মিঃ হারুন বলেন–দেখলেন তো মিঃ রাও, আপনি বলেছিলেন মনিরাকে জোরপূর্বক চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিন্তু আসলে সে নিজেই বাড়ি থেকে চলে গেছে, তার প্রিয়জনের সঙ্গেই গেছে এবং এখন তার সঙ্গেই আছে।

শংকর রাও বিজ্ঞের মত মাথা দোলালেন-না, এটা আমি বিশ্বাস করি না মিঃ হারুন, কারণ আমি সেদিন চৌধুরী সাহেবের বাড়ির বেলকনিতে বেশ কয়েকটা পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছিলাম। তা ছাড়া মিস মনিরার স্যান্ডেল সিঁড়িতে পাওয়া গেছে।

আপনি কি তাহলে মিস মনিরার চিঠি অস্বীকার করেন?

হ্যাঁ করি। এমনওতো হতে পারে চিঠিখানা মিস মনিরার হাতের লেখার অনুকরণে লেখা হয়েছে!

অসম্ভব, কারণ তার মামা চৌধুরী সাহেব ভাগনীর হাতের লেখা বেশ চেনেন।

দেখুন মিঃ হারুন, মিস মনিরা যে স্বেচ্ছায় যায়নি তার আরও একটি জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ-চৌধুরী সাহেবের বাড়ির পুরানো দারোয়ানের খুন। দস্যু বনহুরের সঙ্গেই যদি সে স্বেচ্ছায় যাবে, তাহলে একটা নিরীহ লোককে কেন খুন করা হবে?

এই সামান্য ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারছেন না মিঃ রাও? যখন তারা চৌধুরী বাড়ি থেকে পালাচ্ছিল তখন হয়তো সেই দারোয়ান বাধা দিতে গিয়েছিল। দস্যুর

আবার দয়ামায়া!

এমন সময় একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক কক্ষে প্রবেশ করেন। চোখেমুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ। ভারী পাওয়ারের চশমাটা ভালো করে চোখের ওপর তুলে দিয়ে বলেন–ইন্সপেক্টর মিঃ হারুন কে?

মিঃ হারুন লোকটার আচমকা প্রবেশে মনে মনে রেগে গিয়েছিলেন, গম্ভীর কণ্ঠে বলেন– কি চান?

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলেন–আপনি বুঝি মিঃ হারুন?

হ্যাঁ, বলুন কি দরকার?

দেখুন, আমি মাধবগঞ্জের একজন ডাক্তার। আমার নাম নওশের আলী। গত রাতে আমাকে একজন লোক রোগী দেখার নাম করে ডেকে নিয়ে যায়। আমিও টাকার লোভে কিছু না ভেবে রোগী দেখতে যাই।

বসুন, বসে বলুন।

বৃদ্ধা বসে পড়ে বলতে শুরু করেন, আমাকে ওরা একটা ট্যাক্সিতে নিয়ে যায়। তারপর পায়ে হেঁটে-সে কি ভয়ংকর বন। বনের মধ্যে দিয়ে আমাকে নিয়ে ওরা যখন গন্তব্যস্থানে পৌঁছাল, তখন ভয়ে আমার কণ্ঠ শুকিয়ে এসেছে। এতক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পারলাম, তবু নিশ্চুপ রইলাম, কারণ কিছু বলতে গিয়ে শেষে জীবনটা হারাব নাকি?

আগ্রহভরা কণ্ঠে বলেন মিঃ হারুন-তারপর?

তারপর একটা পর্বতের পাদমূলে আমাকে নিয়ে ওরা হাজির করল। সেই পর্বতের নিকটে দাঁড়িয়ে একটা লোক তিনবার শিস দিল, সঙ্গে সঙ্গে পর্বতের গায়ের একটা বিরাট পাথর এক পাশে সরে গেল।

কক্ষের সবাই উদ্বিগ্নচিত্তে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কথা শুনছেন। সকলেরই চোখেমুখে বিস্ময়। মিঃ রাও বলেন–বলুন, তারপর কি হলো?

দেখলাম পাথরটা সরে গিয়ে তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো এক সুড়ঙ্গপথ।

সেই পথের ভেতরে প্রবেশ করলেন বুঝি?

হ্যাঁ, তবে ভেতরে প্রবেশ করে স্তম্ভিত হলাম। তাদের কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম-তারা স্বাভাবিক লোক নয়। এই যে দেশময় রাহাজানি আর লুটতরাজ চলছে, নারীহরণ চলছে, এর পেছনে রয়েছে সেই লোকগুলো। আসল কথা, তারা ডাকাতের দল এবং ওটা তাদের আস্তানা।

আশ্চর্য! অস্ফুটধ্বনি করে ওঠেন মিঃ হারুন।

ভদ্রলোক আবার বলেন–আমি তাদের কথাবার্তায় আরও বুঝতে পেরেছি-সেই পর্বতটার নাম জম্বুর পর্বত এবং ঐ জায়গাটা পর্বতের দক্ষিণ কোণে। ইন্সপেক্টর সাহেব, আপনার কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনি পুলিশ ফোর্স নিয়ে সেখানে যান। তারপর পকেট হাতড়ে একটি কাগজ বের করে এগিয়ে দেন এই নিন, আমি সেই পর্বতের গুপ্ত দরজার ছবি তৈয়ার করে এসেছি, এতে পথ-ঘাটের ছবি সুন্দর করে আঁকা রয়েছে।

মিঃ হোসেন বলে ওঠেন-কি রোগী দেখলেন তা তো বললেন না?

হাঁ বলছি, একটু থেমে বলেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক-রোগীর কোন অসুখ নয়, শরীরে ভীষণ বেদনা আর জখম। হয়তো কোথাও মারধোর খেয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি ঔষুধপত্র দিয়ে বিদায় হলাম। ওরাই আবার আমাকে রেখে গেল। কিন্তু বাড়িতে নয়-একটা নির্জন পথের ধারে আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলো ওরা। এই তো ভোরবেলার কথা। আমি বাড়িতে গিয়েই ওষুধের বাক্সটা রেখে ছুটে এসেছি। ইন্সপেক্টর, আপনি ওদের পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন। আপনি পুলিশ ফোর্স পাঠাবার ব্যবস্থা করুন সেখানে, নইলে পালাবে ওরা।

মিঃ হারুন বলেন–আপনাকেও যেতে হবে পথ দেখিয়ে দেবার জন্য!

আমি-আমি যে বুড়ো মানুষ।

তবে বলতে এলেন কেন? জানেন এটা পুলিশ অফিস–

আমি এতটুকুও মিথ্যা বলিনি। কিন্তু রাত শেষ প্রহরে যাবেন, তার পূর্বে নয়।

আপনি যেতে পারবেন না?

আমার শরীর ভাল নয়, এইটুকু পথ এসেই হাঁপিয়ে পড়েছি।

শংকর রাও বলেন–মিঃ হারুন, ইনি যা বলছেন তা সত্য। আপনি এর কথামতই কাজ করুন, কারণ আমার মনে হয় সেই দুষ্ট শয়তানের দল পালিয়ে জম্বুর পর্বতে আশ্রয় নিয়েছে।

মিঃ হোসেন মিঃ শংকর রাওয়ের কথায় যোগ দেন–হ্যাঁ,আমারও সেই রকমই মনে হয়।

ভদ্রলোক তার পুরা নাম ঠিকানা দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন।

ভদ্রলোক চলে যেতেই শংকর রাও বলেন–মিঃ হারুন, আপনি কি মনে করছেন?

হ্যাঁ, একবার যেতেই হবে সেখানে। লোকটার কথা বোধ হয় মিথ্যা নয়। তারপর ঐ ভদ্রলোকের দেয়া ম্যাপখানা মেলে ধরলেন টেবিলে।

মিঃ হারুন, মিঃ রাও এবং মিঃ হোসেনের মধ্যে ম্যাপ নিয়ে অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা চলল, তারপর উঠে পড়লেন সকলে।

সন্ধ্যার পূর্বেই পুলিশ-ফোর্স নিয়ে তৈরি হয়ে নিলেন মিঃ হারুন। পুলিশদেরকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অতি গোপনে জন্ধুর পর্বতের দিকে রওনা দিতে নির্দেশ দিলেন। বহু দূরের পথ এই জম্বুর পর্বত। বহু বন, ঝোঁপঝাড়, ছোট ছোট পাহাড় টিলা পার হয়ে তবেই তারা পৌঁছবে সেই পর্বতে।

মিঃ হারুন আর মিঃ হোসেনের সঙ্গে শংকর রাও-ও চললেন। মিঃ হারুন টর্চলাইট ধরে পথ চিনে নিচ্ছিলেন। ম্যাপখানা এত সুন্দরভাবে আঁকা হয়েছিল যে, পথ চিনে নিতে এতটুকু কষ্ট হচ্ছিল না তাদের।

জম্বুর পর্বতের পাদমূলে পৌঁছে রেডিয়াম হাতঘড়ির দিকে তাকালেন মিঃ হারুন। রাত তখন। তিনটে, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাঁরা এই পথ ধরে এসেছেন।

টর্চের আলো ফেলে আর একবার ম্যাপ দেখে নিলেন মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন। খুশিতে তারা আত্মহারা হলেন-ঠিক জায়গায় পৌঁছতে তাঁরা সক্ষম হয়েছেন! ম্যাপ ধরে আরও কিছুটা দক্ষিণে এগুলেন, কিন্তু কই, এখানে তো কোন

সুড়ঙ্গ বা পথের চিহ্ন নেই। শুধু পাথর আর পাথরে পর্বতের গা ঢাকা রয়েছে। স্থানে স্থানে ছোট ছোট আগাছা আর ঝোঁপঝাড়। আর রয়েছে অশ্বথ বৃক্ষ ও নাম না জানা কত বড় বড় গাছ।

মিঃ হারুন পর্বতের পাশে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালেন-হা, তাঁর পুলিশ ফোর্স এসে পৌঁছে গেছে। এক-একজন এক একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে।

মিঃ হোসেন এবং শংকর রাও গুলীভরা রিভলবার হাতে মিঃ হারুনের পেছনে একটা ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে রইলেন।

মিঃ হারুন মুখের মধ্যে দুটি আংগুল দিয়ে খুব জোরে শিস দিলেন-একবার দু'বার তিন বার। হঠাৎ একটা হুড় হুড় শব্দ কানে এলো তাদের। মিঃ হারুন আশ্চর্য হয়ে দেখলেন-তাঁর সামনে পর্বতের গা থেকে একটি বিরাট পাথর একদিকে সরে যাচ্ছে। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার মুখমণ্ডল। তিনি স্পষ্ট দেখলেন-পর্বতের গায়ে একটি সুড়ঙ্গপথ বেরিয়ে এসেছে।

মিঃ হারুন সুড়ঙ্গপথে গিয়ে দাঁড়ালেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঁশিতে ফুঁ দিলেন। অমনি পুলিশ ফোর্স এবং মিঃ হোসেন ও শংকর রাও সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করলেন।

মিঃ হারুন এবং পুলিশ ফোর্স ভেতরে প্রবেশ করতেই দু'জন মশালধারী মশাল দূরে নিক্ষেপ করে ছুটে পালাল।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন মশাল দু'টি কুড়িয়ে নিয়ে রিভলবার উদ্যত করে দ্রুতগতিতে এগুলেন, পেছনের পুলিশ ফোর্স ছড়িয়ে পড়ল সুড়ঙ্গের ভেতরে।

অল্পক্ষণের মধ্যে দশজন ডাকাতকে তাঁরা পাকড়াও করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু নাথুরামকে। তারা ধরতে পারলেন না। নাথুরাম একটি গুপ্তগর্তে আত্মগোপন করে রইলো।

তখন মুরাদ মনিরাকে নিয়ে সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছে। তাই মিঃ হারুনের হাত থেকে এ যাত্রা পরিত্রাণ পেল সে।

মিঃ হারুন ডাকাতের দলকে পাকড়াও করে নিয়ে চললেন। পূর্ব আকাশ; তখন ফর্সা হয়ে আসছে!

সবাই চলে যাবার পর নাথুরাম তার গুপ্ত গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো, দাঁতে দ্রুত পিষে বলল–একটি আগেও যদি জানতাম তাহলে সমস্ত পর্বতটাকে উড়িয়ে পুলিশ বাহিনীর অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে ফেলতাম। তার কর্কশ কণ্ঠের প্রতিধ্বনি গুপ্ত গুহার দেয়ালে আঘাত খেয়ে ছড়িয়ে পড়ে গোটা সুড়ঙ্গপথে।

মুরাদ আর মনিরা তখন জম্বুর বনের মধ্য দিয়ে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে।

সন্ন্যাসী বাবাজীর সামনে অগ্নিকুণ্ড দপ দপ করে জ্বলছে। পাশেই ধূমায়িত গাঁজার কলকেটা ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে। সন্ন্যাসী দু'চোখ মুদিত অবস্থায় বিড়বিড় করে মন্ত্র পাঠ করছেন।

সময় অতিবাহিত প্রায়, এতক্ষণেও এলো না ভক্ত মুরাদ তার প্রিয়া মনিরাকে নিয়ে।

এমন সময় পদশব্দ শোনা যায়। একটু পরই মুরাদের উপস্থিতি জানতে পারেন সন্ন্যাসী বাবাজী! গম্ভীর স্থিরকণ্ঠে বলেন–মুরাদ, বড় বিলম্ব হয়ে গেছে, শিগগির প্রস্তুত হয়ে নাও।

মুরাদের দু'চোখে আনন্দের দ্যুতি খেলে যায়। সত্যিই বাবাজীর অপূর্ব ধ্যানবল। তাকে না দেখেই তার নাম উচ্চারণ করেছেন। করজোরে বলে মুরাদ–বাবাজী, আদেশ করুন কি করতে হবে?

তুমি সোজা হয়ে দাঁড়াও, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

মুরাদ স্থির হয়ে দাঁড়ায়।

মনিরা একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

সন্ন্যাসী বাবাজী আসন ত্যাগ করেন, এগিয়ে আসেন মুরাদের দিকে...হঠাৎ প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দেন তার নাকের ওপর।

অমনি চিৎ হয়ে পড়ে যায় মুরাদ। এমন একটা অবস্থার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে যায় সে। তারপর বুঝতে পারে সন্ন্যাসী বাবাজী তার হিতাকাঙ্খী নয়।

মুরাদ উঠে দাঁড়াবার পূর্বেই সন্ন্যাসী পুনরায় মুরাদকে আক্রমণ করেন এবং ঘুষির পর ঘুষি লাগিয়ে ওকে আধমরা করে ফেলেন।

মুরাদের নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। ঠোঁট কেটেও রক্ত ঝরছে। মুরাদও রুখে দাঁড়াতে যায়। কিন্তু তার পূর্বেই সন্ন্যাসী হাতে তালি দেন। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন পুলিশ বেরিয়ে আসে পাশের ঝোঁপ-ঝাপের মধ্য থেকে। সন্ন্যাসীর ইংগিতে তারা মুরাদের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দেয়।

মুরাদের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। মৃতের মুখের ন্যায় রক্তশূন্য হয়ে পড়ে তার মুখমণ্ডল। নিজেকে ধিক্কার দেয় সে। নিজে তো বন্দী হলোই, তার এত আরাধনার ধন মনিরাকেও হারালো। রাগে ক্ষোভে নিজের মাংস নিজেই চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে হচ্ছে তার।

মুরাদকে নিয়ে পুলিশরা চলে যায়।

সন্ন্যাসী মনিরার সামনে এসে দাঁড়াল-তুমি এখন কি চাও?

মনিরা এতক্ষণ অপলক নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। মনে তার শত শত প্রশ্ন একসঙ্গে দোলা দিচ্ছিল। সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই পুলিশের লোক। সে কি ভুল করেছে? এর কাছে সব কথা খুলে বলা ঠিক হয়নি। দস্যু বনহুরকে সে ভালবাসে একথাও বলেছে সে তার কাছে। কি সর্বনাশ সে করেছে! মনে মনে ভয় পেয়ে যায় মনিরা। কোন জবাব না দিয়ে নিশ্চুপ পঁড়িয়ে থাকে।

সন্ন্যাসী মনিরার মনোভাব বুঝতে পেরে হেসে বলেন–তুমি কোথায় যেতে চাও? মামা মামীর কাছে-না দস্যু বনহুরের পাশে।

মনিরা মৃদুকম্পিত সুরে বলে–মামা-মামীর কাছে।

বেশ, এসো আমার সঙ্গে।

সন্ন্যাসী আগে আগে চলেন, মনিরা চলে পেছনে পেছনে। কিছুদূর এগুনোর পর একটি পাল্কী দেখতে পায় মনিরা।

সন্ন্যাসী মনিরাকে পাল্কীতে উঠে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

মনিরা পাল্কীতে বসে কতকটা আশ্বস্ত হলো। যা হউক সন্ন্যাসী যেই হউক সে তাকে তার মামা-মামীর কাছে পৌঁছে দেবে।

কিন্তু একি! এ যে গহন বনের ভেতর দিয়ে এরা তাকে নিয়ে চলেছে।

মনিরা উঁকি দিয়ে চারদিকে দেখলো।

দু'জন লোক মশাল হাতে আগে আগে চলেছে। মশালের আলোতে লক্ষ্য করলো মনিরা সন্ন্যাসী তো নেই। সে তবে গেল কোথায়!

ভোর হবার পূর্বে একটা পোড়োবাড়ীর সামনে এসে পাল্কী থেমে পড়লো। দু'জন মশালধারী মনিরাকে লক্ষ্য করে বলল–নেমে আসুন।

মনিরা ইতস্ততঃ করতে লাগল।

মশালধারী দু'জনের একজন বলে ওঠে-ভয় নেই, আসুন।

মনিরার হৃদয় কেঁপে উঠল, সে আবার এক নতুন বিপদের সম্মুখীন হলো নাকি। পোড়াবাড়ির দিকে তাকিয়ে কণ্ঠনালী শুকিয়ে উঠলো তার। কিন্তু নিরুপায় সে। কি আর করবে, অগত্যা মশালধারী লোক দুটিকে অনুসরণ করল সে।

অনেকগুলো ভাঙ্গা ঘর আর প্রাচীর পেরিয়ে একটি গুপ্ত দরজার নিকটে পৌঁছল তারা। মশালধারী দু'জন এবার দাঁড়িয়ে পড়ল। একজন বলল–ভেতরে যান।

মনিরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও পা বাড়ালো। না জানি এ আবার কোন বিপদে পড়লো সে। সন্ন্যাসী-সেও কি তার সাথে চাতুরি করল। হৃদয়টা অজানা এক আশঙ্কায় কেঁপে উঠল।

কক্ষে প্রবেশ করে আশ্চর্য হলো মনিরা। সুন্দর পরিচ্ছন্ন একটি কক্ষ। এই পোড়াবাড়ির মধ্যে এমন পরিষ্কার সাজানো গোছানো ঘর থাকতে পারে, ভাবতে পারে না মনিরা। অবাক হয়ে চারদিকে তাকায় সে। মেঝেতে দামী কার্পেট বিছানো। দেয়ালে সুন্দর কয়েকখানা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। একপাশে একটি মূল্যবান খাট, খাটে দুগ্ধফেননিভ শয্যা পাতা রয়েছে, কয়েকখানা। দামী সোফা

সাজানো। মনিরা অবাক হয়ে দেখছে, এই গহন বনের ভেতর একটা পোড়াবাড়ির মধ্যে এত সুন্দর একটি কক্ষ!

হঠাৎ মনিরার নজরে পড়লো, এক পাশে একটা ছোট্ট টেবিল। টেবিলে স্তূপাকার ফলমূল। নাশপাতি, বেদানা, কমলালেবু, আংগুর আরও অনেক রকম ফল সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে।

এসব দেখেও মনিরা খুশি হতে পারলো না। না জানি তার জন্য আবার কোন বিপদ এগিয়ে আসছে। তার জন্য এত ব্যবস্থার দরকার কি? সন্ন্যাসীর যদি মতিগতি ভালই হত, তাহলে তাকে তার মামা-মামীর নিকটে পৌঁছে না দিয়ে এখানে আনবার কারণ কি? নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয় মনিরা–তার অদৃষ্টে এত ছিল! চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করে মনিরার। কিন্তু কেঁদে কি হবে! এতদিন কেঁদে কেঁদে চোখের পানি তার যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

এক সময় ভোরের আলো ফুটে উঠল।

গাছে গাছে জেগে উঠল পাখির কলরব। মৃদুমন্দ বাতাস অজানা ফুলের সুরভি নিয়ে ছুটে এলো মুক্ত জানালাপথে। মনিরা দুগ্ধফেনিভ শয্যায় গা এগিয়ে দিল। চোখের পানি তার শুকিয়ে গেছে। ব্যথা সয়ে সয়ে হৃদয়টাও হয়ে উঠেছে পাথরের মত শক্ত।

কত দিন এমন সুন্দর বিছানায় শোয়নি সে। গোটা রাতের অনিদ্রায় দু'চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। মনিরা কখন যে ঘুমিয়ে পড়লো নিজেই জানে না।

মিঃ হারুন ডাকাতের দলকে গ্রেপ্তার করে খুশিতে মেতে উঠেছেন! তার জীবনে এটা এক চরম সাফল্য। মিঃ হোসেন এবং শংকর রাও-ও আনন্দে আত্মহারা। পুলিশ সুপার মিঃ আহম্মদ এই ভয়ংকর ডাকাতের দল গ্রেপ্তার হওয়ায় তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। নিজে এসে তিনি দেখলেন, জবানবন্দিও নিলেন।

ডাকাতের দলের লোকগুলোর ভয়ংকর চেহারা দেখে এবং তাদের জবানবন্দি শুনে মিঃ আহম্মদ লোকগুলোকে হাঙ্গেরী কারাগারে আটকে রাখতে বললেন। বিচারের সময় আবার তাদের বের করে আনা হবে।

মিঃ আহম্মদের কথামতই কাজ হলো।

ডাকাতের দলকে হাঙ্গেরী কারাগারে প্রেরণ করার পর পরই কয়েকজন পুলিশ মুরাদকে পাকড়াও করে হাজির হলো–হুজুর, এই লোকটাও ছিল ডাকাতদের দলে।

মিঃ হারুন এবং শংকর রাও অবাক হয়ে দেখলেন, এ যে খান বাহাদুর হামিদুল হকের লন্ডন ফেরত পুত্র মুরাদ!

মুরাদের শরীরে অনেকগুলো আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেলেন তারা। একটা চোখের ওপরে কালো জখম হয়ে রয়েছে। ঠোঁট কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়েছিল, এখনও তা সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়নি। চোয়ালের নিচেও একটা জখম রয়েছে।

এমন সময় গতদিনের সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন ও অন্যান্য পুলিশ অফিসার প্রৌঢ় ডাক্তারকে দেখে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। মিঃ হারুন উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন–আসুন, আসুন!

প্রৌঢ় ডাক্তার আসন গ্রহণ করে বললেন–এবার আমার কথা কাজে এসেছে তো?

হ্যাঁ ডাক্তার সাহেব, আপনার কথামত কাজ করে আমরা আজ এক ভয়ংকর ডাকাতদলকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু আর একটা সমস্যার সামনে পড়েছি এই যুবককে নিয়ে।

ডাক্তার তার মোটা পাওয়ারের চশমা নাকের ওপর থেকে চোখের ওপর তুলে দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালেন। অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বলেন–এই সেই লোক, যাকে আমি সেই দিন চিকিৎসা করেছিলাম। আংগুল দিয়ে ওর জখমগুলো দেখিয়ে দিয়ে বলেন–এই দেখছেন সেই জখমগুলো।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের ওপর পুলিশ অফিসারগণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল। এখন মুরাদ সেই ডাকাতদলের একজন বলে প্রমাণিত হওয়ায় তাকেও তারা হাজতে প্রেরণ করলেন।

মুরাদ হাজতে যাবার পূর্বে একবার কটমট করে তাকালো। বৃদ্ধকে মিথ্যা বলতে শুনে আশ্চর্য হলো সে। বৃদ্ধকে সে কোনদিন দেখেছে বলেও মনে পড়লো না।

অথচ সে বলছে তাকে চিকিৎসা করেছে। জানে প্রতিবাদ জানিয়ে কোন ফল হবে না, তাই নীরব রইল সে।

মুরাদকে হাজতে পাঠানোর পর মিঃ হারুন বলেন–চলুন ডাক্তার সাহেব, পুলিশ সুপারের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেই। সত্যিই আপনি একজন মহৎ ব্যক্তি।

চলুন, উঠে দাঁড়ালেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।

মিঃ হারুন মিঃ আহম্মদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে ঘটনাটা বিস্তারিত বলেন।

সব শুনে এবং প্রৌঢ় ভদ্রলোকটার অসীম বুদ্ধি বল দেখে মিঃ আহম্মদ মুগ্ধ হলেন। তিনি। হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলেন–আপনাকে আমরা পুরস্কৃত করব।

হেসে বলেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক-পুরস্কার আমি চাই না। আপনি সেই অর্থ দুষ্ট দমনে ব্যয়। করবেন। আচ্ছা, আজকের মত চলি। পুলিশ সুপারের সাথে হ্যান্ডশেক করে বিদায় নিলেন তিনি।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক পুলিশ অফিস থেকে বিদায় গ্রহণ করার পর মিঃ হারুন এবং অন্যান্য পুলিশ। অফিসার নিজ নিজ কাজে মনোযোগ দিলেন।

এমন সময় বয় একটা চিঠি এনে মিঃ হারুনের হাতে দিয়ে বলল–যে বৃদ্ধ ভদ্রলোক এইমাত্র পুলিশ অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন, তিনি এই চিঠিখানা আপনাকে দিতে বলে গেলেন।

মিঃ হারুন একটু অবাক হলেন, এইতো তাঁর সঙ্গে সামনা সামনি সমস্ত কথাবার্তা হলো, আবার চিঠিতে কি লিখলেন।

শংকর রাও বলেন–হয়তো কোনো গোপন কথা ওতে লিখে গেছেন।

মিঃ হারুন দ্রুতহস্তে খামখানা ছিঁড়ে চিঠিখানা বের করে নিলেন-একি! একখণ্ড চিরকুট। তাতে লেখা রয়েছে, “আপনাদের কাজে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। অশেষ ধন্যবাদ।”

–দস্যু বনহুর।

মিঃ হারুনকে হতবাক হয়ে যেতে দেখে মিঃ হোসেন কাগজের টুকরাখানা হাতে নিয়ে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন-গ্রেপ্তার করো! গ্রেপ্তার করো! দস্যু বনহুর! দস্যু বনহুর।

সমস্ত পুলিশ রাইফেল হাতে ছুটলো, কিন্তু কোথায় দস্যু বনহুর।

পুলিশ সুপার মিঃ আহমদ রাগে-ক্ষোভে অধর দংশন করলেন। পূর্বে যদি এতটুকু জানতে পারতেন, তাহলে আজ তারা দস্যু বনহুরকে কিছুতেই পালাতে দিতেন না। মিঃ হারুন এবং অন্যান্য অফিসারের অবস্থাও তাই।

শংকর রাও শুধু হেসে বলেন–কেন এত ব্যস্ত হচ্ছেন? দস্যু বনহুর তো আর কোন দোষ করেনি?

মিঃ হারুন রাগত কণ্ঠে বলেন–দোষীকে নতুন করে দোষ করতে হয় না মিঃ রাও। দোষী সব সময়ই অপরাধী। সুযোগ পেলে সে ছোবল মারবেই।

অনেক খোঁজাখুজি করেও দস্যু বনহুরকে আর পাওয়া গেল না।

মিঃ হোসেন এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মিঃ হারুন নিজেও বেরিয়ে পড়লেন, যাকে সন্দেহ হলো তাকেই পাকড়াও করলেন।

মিঃ আহমদ কড়া হুকুম দিলেন–দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করা চাই-ই।

মিঃ আহমদ দস্যু বনহুরের ওপর চটে রয়েছেন, কারণ সে তাঁকে কিছুদিন আগে ভয়ানক নাকানি চুবানি খাইয়ে ছেড়েছে। তাই দস্যু বনহুর যত ভাল কাজই করুক তবু সে তার চক্ষুশূল তাছাড়া সে অপরাধী–দস্যু।

পুলিশমহলে দস্যু বনহুরকে নিয়ে আবার একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল।

এদিকে দস্যু বনহুরের খোঁজে পুলিশ যখন হন্তদন্ত হয়ে ছুটাছুটি করছে তখন বনহুর নিজের আস্তানায় একটা আসনে অর্ধশায়িত অবস্থান ঠেস দিয়ে বসে আছে। পায়ের কাছে একটি নিচু আসনে বসে রয়েছে রহমান।

বনহুর আর রহমানের মধ্যে মনসাপুরের জমিদার ব্রজবিহারী রায়ের কন্যা সুভাষিণীর অসুস্থতা নিয়ে আলোচনা চলছিল। কিছুদিন পূর্বেও রহমান বনহুরের

নিকটে সুভাষিণীর অসুখের

কথা বলেছিল। বনহুর মনিরার নিখোঁজ ব্যাপার নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, যার জন্য অন্য কিছু ভাববার সময় হয় নি তার।

আজ কিন্তু বনহুর সুস্থির থাকতে পারে না। রহমানের কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনে।

তারপর উঠে দাঁড়ায় কিছুক্ষণ পায়চারী করে। ললাটে ফুটে ওঠে তার গভীর চিন্তারেখা।

রহমান বলে ওঠে–সর্দার, মেয়েটা যাকে ভালবাসে তাকে পাওয়া অসম্ভব।

থমকে দাঁড়িয়ে কুঞ্চিত করে বলে বনহুর–অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। আমি তো পূর্বেই বলেছি, যত অর্থ চায় দেব। নাহলে জোরপূর্বক তাকে পাকড়াও করে আনব।

বনহুরের কথায় রহমান কোন জবাব দেয় না, শুধু তার মুখে এক রহস্যময় হাসি ফুটে মিলিয়ে যায়। বনহুর তা লক্ষ্য করে না।

বনহুর পুনরায় পায়চারী শুরু করে।

.

মনসাপুরের জমিদার ব্রজবিহারী রায় কাঁচারী কক্ষে বসে ধূমপান করছিলেন। ললাটে তাঁর। গম্ভীর চিন্তারেখা। তাঁর একমাত্র কন্যার অসুস্থতার জন্য আজ সমস্ত মনসাপুরে একটা অশান্তির কালো ছায়া বিরাজ করছে। কত ডাক্তার কবিরাজ এলো, সবাই বিফল হয়ে ফিরে গেছে। কেউ সুভাষিণীকে আরোগ্য করতে সক্ষম হলো না।

ব্রজবিহারী রায়ের মনে শান্তি নেই। কন্যার অসুস্থতার জন্য তিনিও একরকম আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। স্ত্রী জ্যোতির্ময়ী দেবীর অবস্থাও তাই। সুভাষিণীর জন্য তাঁরা অবিরত অশ্রু বিসর্জন করে চলেছেন।

আজ দুদিন হলো সুভাষিণীর অবস্থা আরও খারাপ। ব্রজবিহারী রায় কাঁচারী কক্ষে বসে কন্যা সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন, এমন সময় দারোয়ান এসে জানাল–বাবু, একজন ডাক্তার এসেছেন, দিদিমণিকে চিকিৎসা করতে চান।

ব্রজবিহারী বাবু প্রথমে কথাটা কানেই নিলেন না। কারণ তার কন্যার অসুস্থতার কথা শুনা পর্যন্ত মোটা টাকার লোভে কত ডাক্তারই এলেন আর গেলেন তার ঠিক নেই। তবু তাচ্ছিল্য করে বলেন–নিয়ে এসো।

একটু পরে ডাক্তারসহ দারোয়ান কক্ষে প্রবেশ করলো। ব্রজবিহারী বাবু দারোয়ানকে বেরিয়ে যেতে ইঙ্গিত করলেন। দারোয়ান কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে যেতেই ব্রজবিহারী বাবু সূতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালেন ডাক্তারের দিকে।

ডাক্তারের উজ্জ্বল দীপ্ত চেহারা ব্রজবিহারী বাবুর মনে শ্রদ্ধার রেখা টানল। বিশেষ করে প্রৌঢ় ডাক্তারের গভীর নীল চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে তাকে উপেক্ষা করতে পারলেন না রায়বাবু।

উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানিয়ে নিজের পাশে বসালেন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন–আমার কন্যা সম্বন্ধে আপনি সব শুনেছেন?

আমি শুধু শুনেছি আপনার কন্যা অসুস্থ, তাকে আরোগ্য করার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসার প্রয়োজন।

ওঃ আপনি তাহলে আমার কন্যার সম্বন্ধে না জেনেই এসেছেন?

হ্যাঁ, আমি আপনার কন্যার রোগ সম্বন্ধে কিছু জানি না। যদি দয়া করে তার অসুখ সম্বন্ধে আমাকে বলেন তাহলে আমার পক্ষে সুবিধা হবে।

তবে শুনুন।

বলুন?

ব্রজবিহারী বাবু কতটা আনমনা হয়ে পড়লেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলেন–ডাক্তার আমার ঐ একটা মাত্র মেয়ে। আজ সে মরণের পথে এগিয়ে চলেছে। যেমন করে হউক ওকে বাঁচাতেই হবে ডাক্তার। আপনি যত টাকা চান কন্যার জীবনের বিনিময়ে আমি আপনাকে তাই দেব।

তার অসুখ সম্বন্ধে জানতে চাইছি রায়বাবু।

বলছি, একটা ঢোক গিলেন ব্রজবিহারী রায়, চোখ দুটো তার ছলছল হয়ে ওঠে। ধীরকণ্ঠে বলেন–আজ প্রায় বছর হয়ে এলো আমার কন্যা পুষ্পগঞ্জে তার মাতুলালয়ে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে আসতে তার রাত হয়ে যায়। পাল্কী করেই ফিরছিল সে। তার সঙ্গে ছিল কয়েকজন বন্দুকধারী পাহারাদার আর একজন ঝি। পথে দস্যুর কবলে পড়ে পাহারাদারগণ নিহত হয়। ঝিটাও মারা পড়ে কিন্তু ভগবানের অশেষ কৃপায় আমার কন্যাকে একজন পথিক রক্ষা করেন।

তারপর?

তারপর সুভাকে সেই ভদ্রলোকই বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেন। কি জানি ডাক্তার, তারপর থেকে আমি লক্ষ্য করেছি–আমার সুভা যেন কেমন হয়ে গেছে। তার মুখে হাসি নেই, সময়মত নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। সব সময় কেমন যেন আনমনা ভাব। অনেক চিকিৎসা করলাম কিন্তু মেয়ের আমার কোন পরিবর্তন হয় না। আমার পুত্রবধূর পরামর্শে বিয়ে দেব ঠিক করলাম কিন্তু কি হল জানেন?

বলুন?

যেদিন বিয়ে তার আগের রাতে সুভা পালাল।

ডাক্তার স্তব্ধ নিঃশ্বাসে শুনে যাচ্ছেন। ব্রজবিহারী রায়ের কথাগুলো তিনি মনে মনে গভীরভাবে তলিয়ে দেখছেন, ব্যথিত পিতার অন্তরের ব্যথা ডাক্তারের হৃদয়ে আঘাত করতে লাগলো বলেন–বলুন তারপর?

কদিন তার কোন সন্ধান পেলাম না। ওর মা তো ভীষণ কান্নাকাটি শুরু করলো। হঠাৎ একদিন তাকে পেলাম। কে এক জন ভদ্রলোক তাকে অজ্ঞান অবস্থায় হসপিটালে ভর্তি করে দিয়ে ছিলেন। খবর পেয়ে তাকে নিয়ে এলাম বাড়িতে কিন্তু আসার পর সে আর কারও সঙ্গে কথা বলে না। জোর করে দুটি খাওয়াতে হয়, জোর করে স্নান করাতে হয়। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে কি যেন বলে বুঝা যায় না।

ডাক্তার সোজা হয়ে বসলেন, আগ্রহভরা কন্ঠে বলেন–এখনও সে ঐ রকম অবস্থায় আছে?

হ্যাঁ, ডাক্তার, এখনও ঠিক ঐ অবস্থায় রয়েছে। চলুন তাকে দেখবেন।

ব্রজবিহারী রায় উঠে অন্দরবাড়ির দিকে এগুলেন। ডাক্তার তাঁকে অনুসরণ করলেন। কিন্তু মনে তার এক গভীর চিন্তা জোট পাকাচ্ছিল। এসব কথা মানে কি? জমিদার বাবু যা বলছেন তা যেন অত্যন্ত জটিল রহস্যজনক।

ডাক্তার জমিদার ব্রজবিহারী রায়ের সঙ্গে সুভাষিণীর কক্ষে প্রবেশ করলেন।

আঁচলে মুখ ঢেকে বিছানায় চুপ করে শুয়ে আছে একটি মহিলা। ডাক্তার বুঝতে পারলেন মহিলাটি অন্য কেউ নয়–জমিদার কন্যা সুভাষিণী।

ব্রজবিহারী রায় এবং ডাক্তার সুভাষিণীর বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। পদশব্দে মুখের আঁচল সরালো না সুভাষিণী। যেমন শুয়ে ছিল তেমনি রইল। ডাক্তার একটু কেশে শব্দ করলেন মনে করলেন রোগী এবার নিশ্চয়ই মুখের অবারণ উন্মোচন করবে কিন্তু কই, যেমনকার তেমনি রইল সুভাষিণী।

রায়বাবু বলেন–জোর করে তার মুখের কাপড় সরাতে হয় নইলে ও নিজে কখনও সরায় না।

ডাক্তার বলেন–ডেকে দেখুন একবার।

রায়বাবু কন্যার গায়ে হাত রেখে ডাকলেন–সুভা, সুভা! মা এই দেখ কে এসেছেন।

এতটুকু নড়লো না সুভাষিণী।

জমিদার বাবু কন্যার মুখের আবরণ উন্মোচন করে ফেললেন।

চমকে উঠলেন ডাক্তার। মুখের আবরণ উন্মোচিত হওয়ায় ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল সুভাষিণী। কেমন উদাস করুন চাহনি।

ডাক্তার বিস্ময়াবিষ্টের মত তাকিয়ে রইলেন।

ব্রজবিহারী বাবু কন্যার অবস্থা দর্শনে মুখ ফিরিয়ে নিলেন পিতৃহৃদয় ব্যথায় খান খান হয়ে যেতে লাগল। একমাত্র কন্যা এ অবস্থায় রায়বাবু অস্থির হয়ে পড়েছেন। ডাক্তারকে লক্ষ্য করে। বলেন–ডাক্তার বাবু সুভা সেরে উঠবে তো?

ডাক্তার গভীরভাবে যেন কি চিন্তা করছিলেন। রায়বাবুর কথায় সম্বিৎ ফিরে পান, বলেন– উঃ কি বলেন?

বললাম আমার সুভা সুস্থ হবে তো?

হবে রায়বাবু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আপনাকে কথা দিলাম আপনার কন্যা সুভাকে সুস্থ করবই।

ডাক্তার! অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠেন ব্রজবিহারী রায়।

হ্যাঁ রায়বাবু, আমাকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।

ডাক্তার আপনি যা চাইবেন তাই আপনাকে দেব। আমার কন্যাকে সুস্থ করে তুলুন।

সুভাষিণী তখন আবার মুখের আবরণ টেনে দিয়েছিল।

ডাক্তার নিস্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করলেন, তারপর বলেন–আপনার মেয়ের কাছে সব সময় কে বেশি থাকেন বলতে পারেন?

আমার বৌমা থাকে ওর পাশে।

একবার যদি তাঁকে ডাকতেন আমি কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

বেশ ডাকছি। রায়বাবু কিঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন–বৌমা, বৌমা, একবার এদিকে এসো তো মা।

অল্পক্ষণেই দরজার ওপাশে চুড়ির মৃদু শব্দ হলো। পর মুহূর্তেই কক্ষে প্রবেশ করেন এক বধূ। পরনে লাল চওড়া পেড়ে শাড়ি। ললাটে সিঁদুরের ফোঁটা। স্থিরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন আমাকে ডাকছেন?

হ্যাঁ মা। ইনি ডাক্তার সুভাকে দেখতে এসেছেন। তোমাকে ইনি কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করবেন। তারপর ডাক্তারকে লক্ষ্য করে বলেন–আমার পুত্রবধূ চন্দ্রাদেবী। আপনি এর কাছে যা জানতে চান জানতে পারেন।

চন্দ্রাদেবী নতদৃষ্টি তুলে তাকাল ডাক্তারের মুখের দিকে। ডাক্তার ব্রজবিহারী রায়কে লক্ষ্য। করে বলেন– আপনি দয়া করে একটু বাইরে যেতে পারেন কি? আমি উনাকে....

বেশ বেশ, আমি বাইরে যাচ্ছি। ব্রজবিহারী বাবু বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

ডাক্তার এবার তাকালেন চন্দ্রাদেবীর মুখের দিকে। তারপর গম্ভীর মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন–আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করব, তার ওপর নির্ভর করছে সুভাষিণী দেবীর চিকিৎসা। আশা করি আপনি সঠিক জবাব দেবেন।

নিশ্চয়ই দেব।

সুভাষিণী দেবীর নিকটে বেশি সময় আপনিই থাকেন, তাই না?

হ্যাঁ।

এর অবস্থা কদিন হলো এরকম হয়েছে?

একদিন এক ডাকাতের হাতে পড়ে...

ওসব কাহিনী আমি রায়বাবুর মুখে শুনেছি। এবার জানতে চাই, আপনার কি মনে হয় এর সম্বন্ধে?

কিছু ভাবতে থাকে চন্দ্রাদেবী। কারণ সে জানে, যে ভদ্রলোক তাকে সেদিন ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করেছিল সে স্বাভাবিক লোক নয়–দস্যু। একথা জেনেও এতদিন সে সকলের নিকটে গোপন করে এসেছে। কিন্তু আজ ডাক্তারের সামনে আর গোপন রাখতে পারলো না। আসল কথা না বললে হয়তো এর পরিণতি খারাপ হতে পারে। কি জানি কেন অন্যান্য ডাক্তারের চেয়ে এই ডাক্তারের প্রতি বিশ্বাস জন্মালো চন্দ্রাদেবীর। তাছাড়া কোন উপায় তো নেই। সুভাষিণীকে বাঁচাতে হলে কথাটা আর গোপন রাখা চলে না।

ডাক্তার চন্দ্রাদেবীকে নিপ দেখে জকুঞ্চিত করে বলেন–কি ভাবছেন? দেখুন, আমার নিকটে কিছু গোপন করতে চাইলে ভুল করবেন।

না না, আমি কিছু গোপন করব না–সব বলছি।

বসুন, একটা চেয়ার দেখিয়ে বলেন ডাক্তার–বসুন, এইখানে বসে বলুন।

ডাক্তার নিজেও বসেন একটা চেয়ারে। ওপাশে তাকিয়ে দেখলেন তিনি সুভাষিণী পূর্বের ন্যায় চোখে মুখে কাপড় ঢাকা দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে আছে। এবার প্রশ্ন ভরা দৃষ্টি মেলে তাকালেন চন্দ্রাদেবীর মুখের দিকে, একি! চন্দ্রাদেবীর ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম চক চক করছে তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন বেশ ঘাবড়ে গেছে। হেসে বলেন ডাক্তার–আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন, ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই।

বলছি, দেখুন ডাক্তার বাবু, আমার মনে হয় সুভা তাকে ভালবেসে ফেলেছে।

স্বচ্ছ হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলেন ডাক্তার–কাকে?

একটা ঢোক গিলে বলে চন্দ্রাদেবী–যিনি সেদিন সুভাকে ডাকাতের হাত থেকে বাঁচিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন।

মুহূর্তে ডাক্তারের হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে গেল। চমকে উঠলেন ডাক্তার। স্থিরকণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন কাকে ভালবেসে ফেলেছে সুভাষিণী?

ঐ যে বললাম, সেদিন যে ভদ্রলোক ওকে ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন তাকে।

এ কথা আপনি কেমন করে জানলেন?

আমাকে সুভা বলেছিল।

চন্দ্রাদেবী, সুভাষিণী আপনাকে যা বলেছে খুলে বলুন দেখি?

বলতে পারি কিন্তু …

কিন্তু নয়–বলুন, কিছু গোপন করবেন না।

চন্দ্রাদেবী একবার দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে নিল। তারপর গলার স্বর খাটো করে নিয়ে বলতে শুরু করলো–ডাক্তার বাবু সুভা বলেছে যাকে সে ভালবাসে সে স্বাভাবিক লোক নয়। সে নাকি থেমে যায় চন্দ্রাদেবী।

ডাক্তার ব্যাকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন–বলুন বলুন?

সে নাকি দস্যু বনহুর।

ডাক্তারের দৃষ্টি ধীরে ধীরে নত হয়ে যায়।

চন্দ্রাদেবী বলে কি, এও কি সম্ভব। অস্ফুট কন্ঠে বলে ওঠেন ডাক্তার-না না, এ হতে পারে না–দস্যু বনহুরকে ভালবাসা অসম্ভব।

চন্দ্রাদেবী ডাক্তারের কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে–বিস্ময়ভরা নয়নে তাকায় তার দিকে তারপর বলে সে–ডাক্তার বাবু আমিও ওকে একথা বারবার বলেছি যা সম্ভব নয়, তা চিন্তা করাও উচিত নয়। কিন্তু কিছুতেই সুভা তাকে ভুলতে পারছে না। ওর গোটা অন্তর জুড়ে ঐ একটি ছবি আঁকা রয়েছে–সে ঐ বনহুর। জেগেও সে তাকে স্বপ্নে দেখে। অস্ফুট স্বরে তারই নাম উচ্চারণ করে। ডাক্তার বাবু, আমি এতদিন সকলের কাছে কথাটা গোপন রেখেছিলাম কিন্তু আজ আপনার কাছে না বলে পারলাম না। আপনি যদি দয়া করে কিছু করতে পারেন।

অন্যমনস্কভাবে ডাক্তার বলেন–হুঁ।

চন্দ্রাদেবী তখন বলে চলে–ডাক্তার বাবু সুভার মনের যে অবস্থা, তাতে মনে হয় ও আর বাঁচবে না।

ডাক্তার এবার দৃষ্টি তুলে ধরেন চন্দ্রাদেবীর মুখের দিকে। গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করেন। তিনি। তারপর উঠে দাঁড়ান। আচ্ছা, আজকের মত তাহলে চলি।

ততক্ষণে ব্রজবিহারী রায় কক্ষে প্রবেশ করেন সব শুনেছেন তো?

শুনেছি।

আমার কন্যা আরোগ্য লাভ করবে তো?

পরে জানাব। ডাক্তার দরজার দিকে পা বাড়ান।

ব্রজবিহারী রায় পেছন থেকে পুনরায় বলে ওঠেন–শুনুন ডাক্তার বাবু সুভাকে কেমন দেখলেন বললেন না তো।

থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালেন ডাক্তার। তারপর ইতস্তত করে বলেন–পরে জানতে পারবেন।

আজ কিছুই বলবেন না?

না।

আবার কবে আসবেন? ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন ব্রজবিহারী রায়।

ডাক্তার আবার ফিরে এলেন চন্দ্রাদেবী আর ব্রজবিহারী রায়ের পাশে। স্থিরকণ্ঠে বললেন– সময় হলেই আবার আসব।

ব্রজবিহারী রায় পকেট থেকে একশ টাকার একখানা নোট বের করে বাড়িয়ে ধরলেন– এই নিন আপনার ফিস।

ডাক্তার হেসে বলেন–আজ কিছুই লাগবে না। আপনার কন্যাকে সুস্থ করতে পারলে দেবেন। কথাটা শেষ করে বেরিয়ে যান ডাক্তার।

ব্রজবিহারী রায় আশ্চর্য কণ্ঠে বলেন–অদ্ভুত লোক! ফিস পর্যন্ত নিল না।

চন্দ্রাদেবীও ডাক্তারের ব্যবহারে কম অবাক হয়নি। অন্যান্য ডাক্তারের চেয়ে এ ডাক্তার যেন আলাদা। ওর দৃষ্টির কাছে চন্দ্রাদেবী নিজকে সঙ্কোচিত মনে করছিল। কেন যেন একটা কথাও তার কাছে গোপন করতে পারল না। কথাটা বলা ঠিক হলো কিনা বুঝতে পারে না চন্দ্রাদেবী। শ্বশুরের কথায় কোন জবাব দিতে পারলো না সে।

.

মনিরা গভীরভাবে চিন্তা করে সন্ন্যাসী তাকে এভাবে এখানে আটকে রেখেছে কেন? এতে কি লাভ তার? এখানে তাকে আটকে রাখার উদ্দেশ্য কি?

মনিরা এখানে আসার পর এতটুকু অসুবিধা হয়নি তার। সে কিছু না চাইতেই হাতের কাছে সব পেয়েছে। এমনকি মনিরা বীণা বাজাতে পারত–একটা বীণাও সাজানো রয়েছে সেই কক্ষে। মনিরার মনে যখন অসহ্য ব্যথা জেগে উঠত তখন সে বীণা নিয়ে বসত।

প্রায়ই নিশীথ রাতে সে বীণায় ঝংকার তুলত। এক করুণ সুরে গোটা পোড়াবাড়ি আচ্ছন্ন হয়ে যেত গহন বনের পাতায় পাতায় ঝড়ে পড়া শিশির বিন্দুর টুপটাপ শব্দের সঙ্গে বীণার সুর মিশে এক অপরূপ মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি হত।

নিঃসঙ্গ জীবন মনিরার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠল। নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। যদিও এখানে তাকে কেউ বিরক্ত করতে আসত না। মুরাদের লালসাপূর্ণদৃষ্টি থেকে সে রক্ষা পেয়েছে, নাথুরামের কঠোর নির্যাতন থেকে অব্যাহতি পেয়েছে, তবু একটা ভয় ভীতি আর আশংকা মনিরার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এখনও সে বন্দিনী। মামা মামীমার এবং আত্মীয় স্বজনের নিকটে এখনও সে অজ্ঞাত রয়েছে। কেউ তার সন্ধান জানে না।

মনিরা ভাবে, সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই কোন পুলিশের লোক। নইলে সেদিন পুলিশ আসবে কোথা থেকে। শয়তান মুরাদকে গ্রেপ্তারই বা করে নিয়ে যাবে কেন। কিন্তু সে যদি পুলিশের লোকই হবে তবে তাকে মামা মামীর নিকটে পৌঁছে না দিয়ে এখানে আটক রাখার মানে কি! নিশ্চয়ই সে কোন অভিপ্রায়ে তাকে এই পোড়াবাড়ির মধ্যে এনে রেখেছে।

মনিরা অসহ্য বেদনায় দগ্ধিভূত হতে থাকে।

একদিন নিশীথ রাতে জানালার পাশে বসে করুণ সুরে বীণা বাজাচ্ছিল মনিরা। নিজের সুরে নিজেই তন্ময় হয়ে গিয়েছিল।

কখন যে তার পেছনে সন্ন্যাসী বাবাজী এসে দাঁড়িয়েছেন, খেয়াল নেই মনিরার। আনমনে সে বীণার তারে হাত বুলিয়ে চলেছে হঠাৎ একটা হাতের স্পর্শে মনিরার ঝংকার স্তব্ধ হয়ে যায়। চমকে ফিরে তাকায় মনিরা। তাঁর কাঁধে হাত রেখে সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সন্ন্যাসীর মুখে হাসির রেখা।

মনিরা দ্রুত উঠে দাঁড়ায়। তারপর কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে সন্ন্যাসীর দিকে। সে দৃষ্টিবাণ যেন সন্ন্যাসী বাবাজীর হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু কি আশ্চর্য। মনিরার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বাণে সন্ন্যাসী এতটুকু বিচলিত হন না বরং তিনি আরও এগিয়ে আসেন মনিরার দিকে। হেসে বলেন বৎস ভয় পেয়েছ। এসো, আমার হাতের ওপর হাত রেখ।

না।

কেন?

মনিরা কোন জবাব দেয় না।

সন্ন্যাসী বলেন–তোমার বীণার সুর আমাকে টেনে এনেছে। আমার ধ্যান ভঙ্গ করে দিয়েছে। তোমার ঐ বীণার ঝংকার।

মনিরার দু'চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বের হয়। পিছু হটতে থাকে সে। মনে মনে নিজকে ধিক্কার দেয়–কেন সে বীণা বাজাতে গিয়েছিল? কেন সে সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ করল? সন্ন্যাসী তখন তার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

মনিরা শিউরে ওঠে।

কিন্তু সন্ন্যাসী তখন এত কাছে এসে পড়েছেন যে, মনিরা আর নড়তে পারে না। চট করে মনিরার দক্ষিণ হাতখানা বলিষ্ঠ হাতের মুঠায় চেপে ধরেন সন্ন্যাসী। তারপর মৃদু হেসে বলেন– এখন?

মনিরা চিৎকার করে ওঠে–ছেড়ে দিন। ছেড়ে দিন আমার হাত।

সন্ন্যাসী হেসে বলেন–না, কিছুতেই না।

মনিরা রাগে অধর দংশন করে বলে–শয়তান। সন্ন্যাসী সেজে আমার সর্বনাশ করতে এসেছ? মনিরা দু'হাতে সন্ন্যাসীর জটাজুট টেনে ধরে।

সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীর মাথা থেকে জটাজুট আর মুখ থেকে দাঁড়ি গোঁফ খসে পড়ে।

মনিরা অস্ফুটধ্বনি করে ওঠে–তুমি!

০০৫. দুর্ধর্ষ দস্যু বনহুর

দুর্ধর্ষ দস্যু বনহুর – রোমেনা আফাজ

স্মিত হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলে ওঠে বনহুর–হ্যাঁ, আমি সন্ন্যাসী বাবাজী। মনিরা, তোমাকে নাথুরামের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যই আমার এ বেশ।

মনিরার হৃদয়ে অনাবিল এক আনন্দস্রোত বয়ে চলে। ঘন মেঘের অন্তরাল থেকে শশীকলা যেমন পূর্ণ বিকাশ লাভ করে তেমনি মনিরার অশ্রুসিক্ত মলিন বিষণ্ন মুখে স্বর্গীয় এক হাসির আভা ফুটে ওঠে। বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে টেনে নেয় বুকে। আবেগ ভরা মধুর কণ্ঠে ডাকে–মনিরা!

মনিরা বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে বলে– যাও তুমি ভারী দুষ্ট। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, না?

তুমি ভয় পাইয়ে দিলে পাব না?

মনির, আজ আমার কি যে আনন্দ, তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।

দস্যু বনহুর আর মনিরা খাটের উপর গিয়ে পাশাপাশি বসে। কতদিন মনিরা বনহুরকে তার পাশে পায় নি। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে সে তার মুখের দিকে।

বনহুর হেসে বলে– অমন করে কি দেখছ মনিরা।

তোমাকে। কতদিন তোমাকে দেখিনি মনির। যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে এলে– একটিবার দেখাও করলে না আমার সঙ্গে।

উল্টো বলল মনিরা। দেখা করতে গিয়ে দেখা পাইনি। আম্মার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি আমাকে চিনতেই পারেন নি। আমি পরিচয় দিয়েছিলাম–আমি তোমার সন্তান।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মনিরার মুখমণ্ডল দীপ্তকণ্ঠে বলে সত্যি?

হ্যাঁ।

কি আনন্দ মনির। আমার দেখা না পেলেও তুমি তোমার জননীর সাক্ষাৎ লাভে সক্ষম হয়েছ। তোমার জীবন সার্থক হয়েছে মনির।

হ্যাঁ মনিরা, আম্মাকে আমি সেদিন যেমন করে দেখেছিলাম আর কোনদিন বুঝি অমন করে দেখতে পাব না। কিন্তু জান মনিরা, তোমার জন্য আজ আমার আব্বা আম্মা কি অসহ্য ব্যথা পোহাচ্ছেন?

জানি। কিন্তু মনিরা, লোকসমাজে আজ আমি হেয় হয়ে গেছি–বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে মনিরার কণ্ঠ।

বনহুর মনিরার পিঠে হাত বুলিয়ে বলে– আমি সন্ধান নিয়ে জেনেছি, সবাই জানে, তুমি আমার সঙ্গে চলে এসেছ। পুলিশমহল তাই তোমার সন্ধান করা ছেড়ে দিয়েছে।

হ্যাঁ, এ কথা আমিও মামা-মামীমার কাছে লিখেছিলাম।

তার মানে?

মনির, তুমি এখনও আমার অনেক কিছু জান না। সত্যি তুমি কত মহৎ! কত উন্নত! আমার সম্বন্ধে তোমার মনে এতটুকু সন্দেহের ছোঁয়া লাগেনি। কই, তুমিতো আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে না?

তোমাকে জিজ্ঞেস করার পূর্বেই আমি তোমার সম্বন্ধে সব অবগত হয়েছি। মনিরা, তোমার পবিত্র ভালবাসাই যে তার সাক্ষ্য।

অস্ফুট শব্দ করে বনহুরের বুকে মাথা রাখে মনিরা– মনির! বনহুর ধীরে ধীরে মনিরার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, মনিরা, চলো, এবার তোমাকে আব্বা আম্মার

নিকটে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মুখ তুলে মনিরা, দু'চোখে মুক্তাবিন্দুর মত অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

বনহুর মনিরার চিবুক উঁচু করে ধরে বলে–কেন চোখের পানি ফেলছ। হাসো, হাসো মনিরা, তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ আমি দেখতে চাই। হাসো লক্ষ্মীটি।

মনিরার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। বনহুর ওকে নিবিড় করে টেনে নেয় কাছে– বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বলে–লক্ষ্মীটি আমার।

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করে নূরী। দু'চোখে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে ওর। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলে–হুর।

বনহুর নূরীকে দেখেই চমকে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনিরাকে ছেড়ে দিয়ে স্বচ্ছকণ্ঠে বলে– নূরী এসো, এর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেই।

নূরী স্থির চোখে তাকিয়ে আছে মনিরার দিকে।

মনিরাও নূরীকে দেখে কম আশ্চর্য হয় নি। সে একবার বনহুর আর এক বার নূরীর মুখের দিকে তাকায়। মনে তার অনেক প্রশ্ন একসঙ্গে ধাক্কা মারে। কে এই যুবতী। বনহুরের সঙ্গে কি এর সম্বন্ধ!

বনহুর নূরী আর মনিরার মাঝখানে দাঁড়ায়, তারপর হেসে বলে–নূরী, এই সেই মনিরা যার সন্ধানে আমি এবং আমার সমস্ত অনুচর ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

তীব্রকণ্ঠে বলে ওঠে নূরী–ব্যস্ত নয়, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলে।

তা তুমি যাই বল–শোনো মনিরা, এ হচ্ছে আমার ছোট বোন নূরী।

মিথ্যে কথা, আমি বোন নই।

অবাক হয়ে চোখ মেলে তাকায় মনিরা বনহুর আর নূরীর মুখের দিকে।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে–তাহলে তুমি কে?

আমি তোমার আজন্ম সঙ্গিনী-সাথী। তুমি এ কথা অস্বীকার করতে পারবে না হুর। শিশুকাল থেকে তোমাকে আমি দেখে আসছি। সব সময় তুমি আমার পাশে পাশে ছিলে।

তুমি যাই মনে কর নূরী, আমি তোমাকে বোনের মতই মনে করে এসেছি। বনহুর মনিরার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো মনিরার মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে পড়েছে।

নূরী আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না। দ্রুত বেরিয়ে যায় সেখান থেকে। কক্ষে নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। কিছুক্ষণ বনহুর আর মনিরা কোন কথাই বলতে পারে না।

নিস্তব্ধতা ভাঙে মনিরা, বলে– কি ভাবছ? আমি তোমাকে কোনদিন অবিশ্বাস করতে পারব না।

বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় বুকে–মনিরা।

হ্যাঁ, আমি তোমাকে অনেক বিশ্বাস করি। মনিরার কণ্ঠ স্বচ্ছ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

এখন বনহুর আর মনিরার যে পোড়ড়াবাড়িতে বসে কথাবার্তা হচ্ছিল, সে জায়গাটা বনহুরের আস্তানা ছেড়ে দূরে কান্দাইয়া গ্রামে।

একদিন এই কান্দাইয়া বিরাট একটা গ্রাম ছিল। বহু লোকের বাস ছিল এখানে। আজ কান্দাইয়া গ্রাম এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। প্রচণ্ড এক ভূমিকম্পে গ্রামটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এখন সেখানে গহন বন। ভূমিকম্পের পর যে কয়েকজন লোক জীবিত ছিল, তারাও বাড়ি-ঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার পর গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলো শহরে।

বহুকাল লোকজনের বসবাস না থাকায় কান্দাইয়া গ্রামের নাম কালান্তরে মানব সমাজ থেকে মুছে গিয়েছিল। কিন্তু প্রাচীন কোন কোন বৃদ্ধের মুখে এখনও এ গ্রামের নাম শোনা যায়। দস্যু বনহুর এই গ্রামের একটি পোড়োবাড়িতেই মনিরার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

অবশ্য এই পোড়োবাড়িতে মনিরা একা থাকত না। বনহুরের কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর মনিরার রক্ষার্থে কড়া পাহারায় থাকত। এই তো মাত্র কয়েকদিন মাঝে

মাঝে বনহুরও গোপনে মনিরার সন্ধান নিয়ে যেত। মনিরাকে এখানে আটকে রাখার অবশ্য কারণ ছিল। বনহুর শয়তান। নাথুরাম এবং মুরাদকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। মনিরাকে তার মামা-মামীমার নিকট পৌঁছে দেবার পূর্বেই নূরী এই পোড়োবাড়ির সন্ধান জানতে পারে।

বনহুরের এক অনুচর গোপনে নূরীকে সংবাদ দেয়, তাদের সর্দার একটি যুবতাঁকে কান্দাইয়া বনের একটি পোডড়াবাড়িতে আটকে রেখেছে। যুবতী অন্য কেউ নয়– চৌধুরী কন্যা মনিরা।

কথাটা শোনার পর থেকে নূরীর মনে এতটুকু শান্তি ছিল না। নূরী যদিও হিংসাপরায়ণ নারী নয়, তবু তার মনে একটা দাহ শুরু হলো। মনিরাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে পড়ল সে। নূরী সেই অনুচরটির সহায়তায় কান্দাইয়া বনে এসে পৌঁছল।

বনহুরের বাহুবন্ধনে মনিরা যখন ধরা পড়েছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে নূরী কক্ষে প্রবেশ করে এই দৃশ্য দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে নূরীর স্বপ্নসৌধ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। হৃদয়ে যে প্রচণ্ড আঘাত লাগে সেটা সহ্য করতে পারে না নূরী। পোডড়াবাড়ি থেকে বেরিয়ে উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটতে থাকে।

কিছুটা এগুতেই বনহুরের সেই অনুচর জাফর অশ্ব নিয়ে নূরীর সম্মুখে পথরোধ করে দাঁড়ায়। বলে সে এভাবে ছুটলে কতক্ষণে বাড়ি পৌঁছবে? তার চেয়ে অশ্ব নিয়ে বাড়ি যাও।

নূরী কোনদিকে না তাকিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসে।

জাফর জিজ্ঞাসা করে–কোথায় যাচ্ছো নূরী?

নূরী ততক্ষণে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। জাফরের কণ্ঠস্বর তার কানে পৌঁছল কিনা সন্দেহ।

নূরীর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে অশ্ব নিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। সামনে কোন বাধাই তাকে ক্ষান্ত করতে সক্ষম হচ্ছে না।

ঝোঁপঝাড়, লতাপাতা ডিঙিয়ে, গহন বনের মধ্য দিয়ে উল্কা বেগে ছুটে চলেছে নূরীর অশ্ব। বনহুরকে নূরী প্রাণ অপেক্ষা বেশি ভালবাসে। শুধু ভালবাসে না, ওকে

সে মনে প্রাণে স্বামী বলে গ্রহণ করে নিয়েছে। নূরী দস্যু কন্যা–বনহুর দস্যু। বনহুর বীর পুরুষ, নূরী বীরঙ্গনা। নূরী সুন্দরী, বনহুর সুপুরুষ–দুয়ের মধ্যে সোনায় সোহাগায় মিল রয়েছে। অথচ বনহুর নূরী থেকে অনেক দূরে। বনহুরকে সে পাশে পেয়েছে বটে, কিন্তু কোথায় যেন অনেক তফাৎ রয়েছে তাদের মধ্যে।

বনহুর নূরীকে উপেক্ষা করলেও নূরী কোনদিন তাকে অবহেলা করতে পারেনি। বনহুরের উপেক্ষা তার হৃদয়ে আঘাত হেনেছে সত্য, কিন্তু রাগ বা অভিমান কিছুই করেনি সে।

বনহুরের কর্মক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সব ভুলে গেছে নূরী। হাসিভরা মুখে সে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছে, কিন্তু আজ নূরী বনহুরকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না। রাগে অভিমানে ক্ষত-বিক্ষত হয় তার হৃদয়। বনহুর যে অন্য কোন নারীকে কোনদিন ভালবাসতে পারে, এ যেন তার কল্পনার বাইরে।

নূরীর অশ্ব উল্কাবেগে ছুটে চলেছে। বন-প্রান্তর ছাড়িয়ে শহরের পথের ওপর এসে পড়ে নূরী।

পথ দিয়ে নূরী যখন অশ্ব চালিয়ে চলেছিল, তখন পথের দু'ধারে জনগণ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছিল। অন্যান্য যানবাহন বাধ্য হচ্ছিল নূরীকে পথ ছেড়ে দিতে। কে এ যুবতী– কোথায় চলেছে– কি এর উদ্দেশ্য, কেউ জানে না।

শেষ পর্যন্ত নূরীর অশ্ব একেবারে পুলিশ অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। নূরী অশ্ব থেকে নেমে দ্রুত প্রবেশ করল।

মিঃ হারুন তখন কি একটা কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন। মিঃ হোসেন নূরীকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হলেন। কারণ, নূরীর বেশ স্বাভাবিক মেয়েদের মত নয়। তার পরনে ঘাগড়া, গায়ে কামিজ। একটা ওড়না মাথার উপর দিয়ে গলায় জড়ানো। লম্বা দুটো বিনুনী ঘাড়ের দু'পাশে ঝুলে রয়েছে। কতকটা ইরানী মেয়েদের মত তার শরীরের পোশাক।

মিঃ হোসেনকে দেখে নূরী প্রথমে থমকে দাঁড়ায়। ভয়ও পায় সে। হঠাৎ কি বলবে ভেবে পায় না। নূরী পুলিশের লোককে তেমন করে দেখেনি কোনদিন। তা ছাড়া পুলিশের ড্রেস নূরীর চক্ষুশূল। অবশ্য এর কারণ আছে। সে দস্যুকন্যা পুলিশকে তাই সে স্বচ্ছমনে গ্রহণ করতে পারে না।

মিঃ হোসেন জিজ্ঞাসা করেন– কে তুমি? কি চাও?

মিঃ হোসেনের কথায় চোখ তুলে তাকান মিঃ হারুন। নূরীকে দেখে তিনিও অবাক হন। প্রশ্নভরা চোখে তাকান তিনি নূরীর দিকে।

নূরী একটা ঢোক গিলে বলে–ইন্সপেক্টার সাহেব, আমার সঙ্গে আসুন–শীঘ্র আসুন, আমি দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারে আপনাদের সাহায্য করব।

অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠেন মিঃ হোসেন এবং মিঃ হারুন–দস্যু বনহুর।

হ্যাঁ। স্তব্ধ কণ্ঠে বলে নূরী।

পুলিশ অফিসের সমস্ত লোক থ হয়ে যায়। সকলেরই চোখে মুখে একটা আতঙ্কভাব ফুটে ওঠে।

এগিয়ে আসেন মিঃ হারুন–তুমি কে যুবতী? তোমার পরিচয়?

নূরী ইতস্তত করে বলে আমাকে দস্যু বনহুর ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আমি পালিয়ে এসেছি। আপনারা আর বিলম্ব করবেন না। তাড়াতাড়ি চলুন, সেখানে আর একটি মেয়েকেও উদ্ধার করতে পারবেন।

মিঃ হারুন মিঃ হোসেনকে নির্দেশ দিলেন অতি শীঘ্র পুলিশ ফোর্স নিয়ে তৈরি হতে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মিঃ হারুন তাঁর দলবল এবং পুলিশ ফোর্স নিয়ে কান্দাইয়া বনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেনের মধ্যে কয়েকটা কথাবার্তা হলো। মিঃ হোসেন বললেন সেখানে যে যুবতী রয়েছে, সেই যে চৌধুরীকন্যা মিস মনিরা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মিঃ হারুন বললেন– আজ যদি আমরা ঠিকভাবে সেখানে পৌঁছতে সক্ষম হই, তাহলে এক ঢিলে দু'পাখি মারা হবে। দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করা হবে এবং চৌধুরী সাহেবের ভাগনী মিস মনিরাকে উদ্ধার করাও হবে।

নূরী নিজের অশ্ব চেপে পুলিশগণকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। যদিও তার হৃদয়ে ঝড় বইছে তবু সে এতটুকু বিচলিত হলো না।

মিঃ হারুন দলবল নিয়ে অতি সাবধানে চলতে লাগলেন। দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করা সহজ কথা নয়। কৌশলে তাকে বন্দী করতে হবে।

এক সময় তারা কান্দাইয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

গহন বন। ঘন অন্ধকারে চারদিক আচ্ছন্ন। হিংস্র জন্তুর কবল থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে অতি সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে চলল পুলিশ ফোর্স।

.

মনিরা বীণা বাজিয়ে চলেছে। তার বীণার অপূর্ব ঝঙ্কারে গোটা বনভূমি মোহিত হয়ে উঠেছে। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে বনহুর মনিরার মুখের দিকে। অর্ধ শায়িত অবস্থায় শুয়ে আছে বনহুর।

মনিরার বীণার সুর তার হৃদয়ে এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে। সে এক স্বপ্নময় রাজ্যে চলে গিয়েছে। সেখানে শুধু সে আর মনিরা।

মনিরাকে তার মামা-মামীর নিকট পৌঁছে দেবার পূর্বে বনহুর একবার ওর হাতে বীণা বাজানো শুনতে চেয়েছিল। মনিরা ওর এ অনুরোধ অবহেলা করতে পারেনি।

মনিরা আজ তার অন্তরের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে বীণার ঝঙ্কার তুলেছিল। মনের গোপন কথা সে ব্যক্ত করছিল বীণার সুরে সুরে।

বনহুরের গভীর নীল দুটি নয়নে মায়াময় চাহনি। নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল মনিরাকে।

হঠাৎ কক্ষে প্রবেশ করে নূরী, পেছনে উদ্যত রিভলভার হাতে মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন। আরও প্রবেশ করে অসংখ্য সশস্ত্র পুলিশ। সকলেরই হাতে উদ্যত রাইফেল।

বনহুর দ্রুত সোজা হয়ে বসে।

সঙ্গে সঙ্গে মনিরার হাতে বীণার সুর থেমে যায়।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন বনহুরের দুই পাশে গিয়ে দাঁড়ান, রিভলভার উদ্যত করে বলেন– হ্যান্ডস আপ।

ততক্ষণে পুলিশ বাহিনী রাইফেল উদ্যত করে দস্যু বনহুরকে ঘিরে ধরেছে।

বনহুর একবার তাকাল নূরীর মুখের দিকে। তারপর তাকাল মিঃ হারুন আর মিঃ হোসেনের দিকে।

মনিরার মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। সে তাকিয়ে দেখল বনহুরের মুখে এতটুকু পরিবর্তন হয় নি। পূর্বের ন্যায় হাস্যোজ্জ্বল দীপ্ত তার মুখোভাব। এতটুকু বিচলিত হয় নি সে।

আচমকা এ অবস্থার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না বনহুর। নইলে পুলিশ ফোর্সের সাধ্য কি তাকে গ্রেফতার করে? নিরস্ত্র বনহুর– কিন্তু সে অসহায় নয়।

মিঃ হারুনের ইংগিতে মিঃ হোসেন বনহুরের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন।

বনহুরের হাতে যখন মিঃ হোসেন হাতকড়া পরিয়ে দিচ্ছিলেন তখন নূরী দু'হাতে চোখ ঢেকে। ফেলে। হৃদয়টা যেন ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছিল, ওর আংগুলের ফাঁক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। গড়িয়ে পড়ছিল, সকলের অজ্ঞাতে। পেছন থেকে ছুটে বেরিয়ে যায় সে।

চারদিকে ঘিরে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী উদ্যত রাইফেল হাতে বনহুরকে নিয়ে কক্ষ ত্যাগ করে।

মিঃ হারুন মনিরার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন চলুন আপনার মামা মামীর নিকটে পৌঁছে দিই।

মনিরার চোখে-মুখে হতভম্ব ভাব ফুটে উঠেছিল। এতক্ষণ সে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে সব দেখছিল। মিঃ হারুনের কথায় চমক ভাঙে। একবার নূরীর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে মিঃ। হারুনকে অনুসরণ করে।

সবাই কক্ষ ত্যাগ করতেই আড়ালে দাঁড়িয়ে নূরী উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে। ভাবে, একি করল। রাগের বশে একি করল সে, দু'হাতে মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে থাকে সে।

নূরী কৌশলে বনহুরের পাহারাদারগণকে সরিয়ে ফেলেছিল। নইলে তারা এত সহজে পুলিশকে পোড়ড়াবাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতে দিত না।

বনহুরকে নিয়ে পুলিশবাহিনী এক সময় পোড়ড়াবাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুরের পাহারাদারগণ উপস্থিত হলো সেখানে। সংখ্যায় তারা অতিঅল্প– তবু আক্রমণ করল পুলিশবাহিনীকে।

দু'দিক থেকে চলল গুলী বিনিময়।

অসংখ্য পুলিশফোর্সের সাথে মাত্র কয়েকজন দস্যুর পেরে ওঠা অসম্ভব। বনহুরের অনুচর কয়েকজন অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিহত হলো। একজন আত্মগোপন করে ছুটলো বনহুরের আস্তানার দিকে রহমানকে খবরটা জানাতে।

দস্যগণের গুলীতেও কয়েকজন পুলিশ নিহত হলো এবং মিঃ হোসেনের দক্ষিণ হাতখানা গুরুতর আহত হলো।

এবার পুলিশ ফোর্স বনহুরকে নিয়ে বন পেরিয়ে একটা ফাঁকা স্থানে এসে পৌঁছল। সেখানেই অপেক্ষা করছিল পুলিশ ভ্যানগুলো।

পাঁচখানা গাড়ি সেখানে প্রস্তুত ছিল।

সম্মুখে এবং পেছনে দু'খানা করে পুলিশ ভ্যান। প্রত্যেকটা গাড়িতে দশজন করে পুলিশ দাঁড়িয়ে রইলো উদ্যত রাইফেল হাতে।

মাঝখানের গাড়িতে মিঃ হারুন, মিঃ হোসেন, মনিরা এবং দস্যু বনহুর রয়েছে।

মিঃ হোসেনের দক্ষিণ হাতে গুলী বিদ্ধ হওয়ায় তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলেন। সামনের আসনে অতি কষ্টে বসে রইলেন, প্রায় সংজ্ঞাহীনের মতই হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

পেছনের আসনে দস্যু বনহুর–হাতে তার হাতকড়া, পাশেই উদ্যত রিভলভার হাতে মিঃ হারুন।

পাঁচখানা গাড়ি একসঙ্গে সারিবদ্ধভাবে পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে। যেন বিশ্ব বিজয় করে তারা ফিরে চলেছে।

মিঃ হারুনের মনে অফুরন্ত আনন্দ। যে দস্যুকে গ্রেফতার করার জন্য অহরহ পুলিশবাহিনী উম্মাদের ন্যায় ছুটাছুটি করছে পুলিশ সুপার নিজে যাকে গ্রেফতারের জন্য কাজে নেমে পড়েছিলেন সেই দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করে নিয়ে চলেছেন তিনি! দুনিয়া জয়ের আনন্দ আজ তার মনে।

.

জনহীন পথ।

দু'ধারে শাল আর সেগুন গাছের সারি। পথের পাশে মাঝে মাঝে ঘন বনও রয়েছে। প্রায় মাইল দশেক চলার পর তারা শহরে গিয়ে পৌঁছবে।

এই দশ মাইলের মধ্যে কোন লোকালয়ের চিহ্ন নেই।

মাঝে মাঝে দু'একটা পথ বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে গেছে এদিকে সেদিকে। হয়ত দূর-দূরান্তে কোন গ্রামের দিকে।

দস্যু বনহুর নিশ্চুপ বসে রয়েছে। হাতে তার হাতকড়া পরানো, মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়েছে ললাটের চারপাশে। নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রয়েছে সে গাড়ির বাইরের দিকে। কে বলবে সে দস্যু, অতি ভদ্রজনের মত নিশ্চুপ বসে আছে!

মনিরা মিঃ হারুনের পাশে জড়োসড়ো হয়ে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। মুখোভাব তার স্বচ্ছ নয়। মনের দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে তার মুখে।

গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে মনিরা।

হঠাৎ বনহুরের কণ্ঠস্বরে মনিরার চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়। ফিরে তাকায় সে।

বনহুর দাঁতে দাঁত পিষে গম্ভীর কণ্ঠে বলে–খবরদার! একটু নড়লে কিংবা চিৎকার করলে মরবেন।

মনিরা দেখল, বনহুর হাতকড়া পরা হাতেই মিঃ হারুনের পাজরে রিভলভার চেপে ধরেছে। কখন যে অতর্কিতভাবে সে মিঃ হারুনের হাত থেকে রিভলভারখানা কেড়ে নিয়েছিল কেউ টের পায় নি। সে আরও দেখল, মিঃ হারুনের চোখেমুখে উকণ্ঠতার ছাপ ফুটে উঠেছে। তিনি না পারছেন নড়তে, না পারছেন চিৎকার করতে। দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

বনহুরের কণ্ঠস্বরে ড্রাইভারও ফিরে তাকিয়ে দেখে নিল। মুহূর্তে তার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করল। দস্যু বনহুরের হাতে রিভলভার, এ কম কথা নয়। ভয়কম্পিত হাতে গাড়ি চালাতে লাগল সে। তার মুখ দিয়েও চিৎকার বের হলো না। হঠাৎ যদি দস্যু তার কণ্ঠ চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়। কাজেই সে নিশ্চুপ গাড়ি চালিয়ে চলল।

বনহুর পূর্বের ন্যায় কঠিন চাপা কণ্ঠে ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলল– ড্রাইভার সামনে বাম দিকে যে পথটা গেছে সেই পথে গাড়ি নাও– নইলে মৃত্যু।

মনিরা তাকালো সম্মুখে। ঐ তো একটু সামনেই আর একটা পথ বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে চলে গেছে বামদিকে। সরু পথটার দু'ধারে ঘন বন।

মনিরা নিঃশ্বাস ফেলতে না ফেলতে দেখল, তাদের গাড়ির আগের দু'খানা গাড়ি সোজা চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের গাড়ি থেমে পড়লো সরু রাস্তায়। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড– পেছনের গাড়ি দু'খানা ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। বনহুরের গাড়িখানা তখন সাঁ সাঁ করে ঢালু রাস্তায় নেমে যাচ্ছে।

বনহুর তখনও রিভলভার মিঃ হারুনের বুকে চেপে ধরে আছে। পেছনের গাড়ি দু'খানা থেমে হুইসেল দিতেই সামনের গাড়ি দু'টিও থেমে পড়ে এবং অতি দ্রুত বনহুরের গাড়িখানাকে অনুসরণ করে। এক সঙ্গে চারটি পুলিশ ভ্যান ছুটলো। সামনের গাড়িটাকে লক্ষ্য করে কেউ গুলী ছুঁড়তে সাহসী হলো না। কারণ, গাড়িতে রয়েছে দু'জন পুলিশ ইন্সপেক্টর এবং চৌধুরী সাহেবের ভাগনী মিস মনিরা।

সামনের গাড়িখানা তখন অনেক দূরে এগিয়ে গেছে।

মিঃ হারুন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে রাগে-ক্ষোভে অধর দংশন করছেন। মিঃ হোসেনের অবস্থা শোচনীয়। দক্ষিণ হাতখানা গুলীর আঘাতে ঝুলে পড়েছে। অনেক রক্তপাত হয়েছে– তিনি কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। ক্রমে যেন তার জ্ঞান লোপ পাচ্ছে।

ড্রাইভারের হৃদকম্পন শুরু হয়েছে। সে কোনরকমে গাড়ির গতি ঠিক রেখে গাড়ি চালাচ্ছে। কোন মুহূর্তে বনহুরের গুলী তার পৃষ্ঠদেশ ভেদ করে বেরিয়ে যাবে তার ঠিক নেই।

মনিরার অবস্থা অবর্ণনীয়। কোন্ সময়ে যে গাড়িখানা উটে যাবে। এখন পথের একধারে গভীর খাদ, আরেক ধারে গহন বন। নিজের জন্য চিন্তা করে না মনিরা– ভয় বনহুরের জন্য।

কিন্তু বনহুরের তখন কিছু ভাববার সময় নেই। দস্যু মনোবৃত্তি জেগে উঠেছে তার অন্তরে।

হঠাৎ গাড়িখানা আচমকা থেমে যায়।

মনিরা তাকিয়ে দেখে মিঃ হারুনের পাশে বনহুর নেই। পাশের জঙ্গলের কিছুটা শুধু নড়ে ওঠে একবার।

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ হারুনের কণ্ঠ তার কানে এসে পৌঁছে–দস্যু বনহুর পালিয়েছে। দস্যু বনহুর পালিয়েছে।

পেছনে অসংখ্য রাইফেল একসঙ্গে গর্জে ওঠে।

মনিরা তাকিয়ে দেখল, পেছনে চারখানা পুলিশ ভ্যান সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সবগুলো ভ্যান থেকে পুলিশবাহিনী রাইফেল উদ্যত করে তীরবেগে ছুটে আসছে।

মনিরার হৃদপিণ্ড ধক ধক্ করে ওঠে। দুর্ভাবনায় বিবর্ণ হয়ে ওঠে তার মুখমণ্ডল। না জানি বনহুরকে ওরা আবার ধরে ফেলবে কিংবা হত্যা করে ফেলবে।

পুলিশবাহিনীকে লক্ষ্য করে মিঃ হারুন আদেশ দিলেন গোটা বন তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে। দস্যু বনহুরকে জীবিত কিংবা মৃত পাকড়াও করে নিয়ে যেতেই হবে। নিজেও মিঃ হোসেনের রিভলবার নিয়ে নেমে পড়লেন।

কিন্তু কোথায় বনহুর। খুঁজে হয়রান-পেরেশান হয়ে পড়লেন মিঃ হারুন এবং তাঁর দলবল।

এদিকে বেশি দেরী করাও চলে না, কারণ মিঃ হোসেনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। শীঘ্র তার চিকিৎসার প্রয়োজন।

কাজেই বিলম্ব করা আর মোটেই উচিত নয়।

.

মনিরাকে নিয়ে মিঃ হারুন যখন চৌধুরী বাড়ি পৌঁছলেন, তখন রাত প্রায় বারোটা বেজে গেছে। দু'জন পুলিশসহ মনিরাকে নিয়ে তিনি হাজির হলেন।

ওদিকে মিঃ হোসেনের চিকিৎসার জন্য তাকে পুলিশ হসপিটালে পাঠিয়ে দিলেন। পুলিশদের ক্যাপ্টেনকে বলে দিলেন তার চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা যেন তিনি করেন।

চৌধুরী সাহেব সবেমাত্র শয্যা গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বয় ছুটে আসে– স্যার, আপামণি এসেছেন। আর তার সঙ্গে এসেছেন ইন্সপেক্টার সাহেব।

কথাটা কানে যেতেই চৌধুরী সাহেব কেমন স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

মরিয়ম বেগমের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠল। তিনি চঞ্চল কণ্ঠে বললেন– কোথায় সে? ওগো, যাও না– মা– মণি এসেছে।

শুনেছি কিন্তু–

না, না, কিন্তু নয়, যাও; দেখ একবার। ওরে বাবলু যা, ওকে আমার কাছে ডেকে আন।

বাবুল ছুটলো নিচে।

মরিয়ম বেগম স্বামীর হাত ধরে টেনে তুলে দিলেন– যাও তুমি।

চৌধুরী সাহেব অগ্যতা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন। মনিরা এবং মিঃ হারুন হলঘরের মেঝের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। চৌধুরী সাহেবকে দেখে মিঃ হারুন বললেন– গুড নাইট চৌধুরী সাহেব। এই নিন আপনার ভাগ্নী মিস মনিরা।

চৌধুরী সাহেব ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালেন মনিরার দিকে, কোন কথা বললেন না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে মিঃ হারুনকে লক্ষ্য করে বললেন–বসুন।

মিঃ হারুন বললেন– না চৌধুরী সাহেব, আজ আর বসব না। আপনার গুণধর পুত্র আমাদের সবাইকে নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছেড়েছে–কথা শেষ না করেই দ্রুত বেরিয়ে যান তিনি।

চৌধুরী সাহেব আর দাঁড়ান না। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে যান।

কখন যে মরিয়ম বেগম সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, স্বামীর সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে যায়। তারপর নিচে নেমে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেন মনিরাকে-মা! কোথায় গিয়েছিলি তুই?

মনিরা মামীকে আঁকড়ে ধরে আকুলভাবে কেঁদে ওঠে। এতদিনের রুদ্ধ কান্না বাঁধ-ভাঙা। জোয়ারের পানির মত বেরিয়ে আসে।

মরিয়ম বেগম কন্যা-সমতুল্য মনিরার চোখের পানি সহ্য করতে পারেন না। তিনিও নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেন। তারপর মনিরাকে নিয়ে উঠে আসেন উপরে।

নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মরিয়ম বেগম– আমাদের না বলে অমন করে কেন চলে গিয়েছিলি মা? তোর মামা-মামীর কথা একটুও ভাবিসনি? কেঁদে কেঁদে আমরা অন্ধ হয়ে গিয়েছি?

মনিরা অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে, মামীমা! আমার কোন দোষ নেই।

তা জানি, সব জানি। ঐ হতভাগ্য নিজেও মরেছে, তোরও সর্বনাশ করেছে। ওর কোন মঙ্গল। হবে না।

না, না, তুমি ওকে অভিসম্পাদ কর না মামীমা। তুমি ওকে অভিসম্পাত কর না। ওর কোন অপরাধ নেই। তোমার মনির অতি মহান!

মনিরা।

হ্যাঁ মামীমা, আমাকে সে নিয়ে যায়নি, বা আমি নিজেও তার সাথে যাইনি।

তবে? তবে যে তোর চিঠি।

ও চিঠি আমার নয় মামীমা।

কি বললি, ও চিঠি তোর নয়?

আমার হাতের লেখা, কিন্তু আমার কথা নয়।

এ তুই কি বলছিস মনিরা?

হ্যাঁ মামীমা, ও চিঠি আমাকে দিয়ে জোর করে লেখানো হয়েছে।

কে–ঐ পাঁজি মনিরটা বুঝি?

না। সে অন্য এক শয়তান।

কে? সে কে মনিরা?

যারা আমাকে সেদিন জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তার নাম শয়তান মুরাদ– তোমাদের সেই জামাতা।

খান বাহাদুরের ছেলে মুরাদ?

হ্যাঁ।

তাই তো বলি এতবড় সর্বনাশ আমার মনির করবে! দাঁড়া–এক্ষুণি তোর মামাকে সব বলি।

না, না, মামীমা এসব তুমি আর কারও কাছে বল না, এতে আমার কলঙ্ক বাড়বে। সবাই জানে আমি তোমাদের সন্তান দস্যু বনহুরের সঙ্গে গিয়েছি। তাই জানুক– সে কলঙ্ক হবে আমার। অঙ্গের ভূষণ।

মনির এ কথা যদি জানতে পারে তোকে অন্য একজন চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল?

সে সব জানে। তোমাদের কোন ভয় নেই মামীমা। সেই তো আমাকে শয়তানের হাত থেকে উদ্ধার করেছে।

সত্যি!

সব সত্যি। মামীমা, আমায় কিছু খেতে দাও। তারপর তোমার বিছানায় শুয়ে সব বলছি।

মরিয়ম বেগম তাড়াতাড়ি ঘরে যা ছিল এনে মনিরাকে খেতে দিলেন।

মনিরা খেতে খেতে বলল–কতদিন তোমার হাতের রান্না খাইনি।

খাওয়া শেষ করে মামীমার পাশে শুয়ে সমস্ত কথা এক এক বলে গেল মনিরা।

.

পুলিশ ভ্যানগুলো দৃষ্টির অন্তরালে চলে যেতেই একটা ঝোঁপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে বনহুর। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে –হাঃ হাঃ হাঃ–

সে হাসির প্রতিধ্বনি নিস্তব্ধ বনভূমি প্রকম্পিত করে তোলে। গাছের পাতাগুলো যেন থর থর করে কেঁপে ওঠে। পাখিগুলো উড়ে উঠে আকাশে।

বনহুরের হাতে তখনও হাতকড়া পরানো। দক্ষিণ হাতে মিঃ হারুনের সেই রিভলবারখানা ধরা রয়েছে। শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় হিংস্র জন্তু যেমন ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করে, তেমনি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে দস্যু বনহুর!

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসছে।

বনহুর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকায় চারদিকে। এখন যে কোন উপায়ে প্রথম তাকে হাত দু'খানা মুক্ত করতে হবে। কিন্তু কি করা যায়?

মাথা নিচু করে ভাবছে, এমন সময় তার কানে ভেসে আসে অশ্ব পদশব্দ। চমকে ফিরে তাকায় বনহুর। দেখতে পায়, যে পথের ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে সেই পথ বেয়ে একজন অশ্বারোহী দ্রুত এগিয়ে আসছে।

বনহুর চট করে একটা ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। নিপুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। অশ্বারোহী ক্রমান্বয়ে পথ বেয়ে এগিয়ে আসছে, বড় রাস্তার দিকেই যাবে সে।

অশ্বারোহী নিকটবর্তী হতেই বনহুর সন্ধ্যার ঝাপসা অন্ধকারে দেখল, অশ্বারোহীর পিঠে একটা বন্দুক বাঁধা রয়েছে। লোকটার শরীরে শিকারীর ড্রেস। কয়েকটা পাখিও ঝুলছে অশ্বের সম্মুখ ভাগে। বিভীষিকাময় রাত্রির আগমন আশঙ্কায় অশ্বারোহী দ্রুত অশ্ব চালনা করছিল।

বনহুরের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠে। যে কোন উপায়ে এই অশ্বারোহীকে রুখতে হবে।

শিকারী অতি নিকটে পৌঁছে গেছে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে বনহুর। অশ্বারোহী তার সম্মুখে আসতেই বনহুর রিভলভার উঁচু করে ধরে চিৎকার করে ওঠে– থামো।

সম্মুখে ভূত দেখার মত চমকে উঠে অশ্বারোহী। ভয়ে থর থর করে কেঁপে ওঠে তার হৃৎপিণ্ড। বিবর্ণ হয়ে ওঠে ওর মুখমণ্ডল। অশ্বের লাগাম টেনে ধরে অশ্ব থামিয়ে ফেলে।

বনহুর রিভলভার উদ্যত করে গম্ভীর কণ্ঠে বলে–ভয় নেই, আমি তোমাকে হত্যা করব না।

শিকারীর চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সে বনহুরের হাতে হাতকড়া লাগানো দেখেই বুঝতে পারে–এ লোকটি নিশ্চয়ই কোন পলাতক আসামী।

কিন্তু বনহুর শিকারীকে বন্দুকে হাত দিতে দেয় না। বলে ওঠে– খবরদার! ওটাতে হাত দিয়েছ কি মরেছ?

অগত্যা শিকারী ফ্যাকাশে মুখে বলে ওঠে–তুমি কি চাও? আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই।

টাকা পয়সা আমি চাই না–চাই তোমার অশ্ব।

অশ্ব!

হ্যাঁ। কিন্তু একেবারে চাই না–আবার তুমি ফেরত পাবে। বিষণ্ন কণ্ঠে বলে ওঠে শিকারী–তাহলে আমার ব্যবস্থা কি হবে?

তুমি যদি ভদ্রলোকের মত ব্যবহার কর, তাহলে কথা শেষ না করেই বনহুর দ্রুত পাশের একটা টিলার মত উঁচু জায়গায় উঠে লাফিয়ে পড়ল অশ্বের পিঠে শিকারীর পেছনে। রিভলভার। শিকারীর পিঠে চেপে ধরে চালাও।

অশ্ব আবার ছুটতে শুরু করে।

সরু রাস্তা ছেড়ে বড় রাস্তা ধরে চলতে শুরু করলো তারা।

সম্মুখে ভয়বিহ্বল শিকারী পেছনে দুর্ধর্ষ, দস্যু বনহুর।

প্রায় ঘণ্টা কয়েক চলার পর একটি পল্লীর নিকটে এসে পৌঁছল ওরা। এবার বনহুর শিকারীর পিঠ থেকে বন্দুকখানা খুলে নিয়ে সামনের জলাশয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করল। তারপর ওকে অশ্ব থেকে নামিয়ে দিয়ে বলল– আগামীকাল তুমি এই স্থানে অপেক্ষা করবে, আমি তোমার অশ্ব ফেরত দেব। কিন্তু মনে রেখ, কোনরকম চালাকি করতে গেলে মরবে। আমি ক্ষমা করব না।

শিকারী স্তব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল–তুমি কে?

বনহুর একটু হেসে জবাব দিল– দস্যু বনহুর।

শিকারী চমকে দু'পা পিছিয়ে গেল, তার কণ্ঠ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বের হলো–দস্যু বনহুর!

বনহুর ততক্ষণে অশ্ব ছুটিয়ে চলেছে।

শিকারীর দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময়। স্তম্ভিত হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সে।

বনহুর দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই শিকারী ভদ্রলোক ছুটল লোকালয়ের উদ্দেশ্যে। যে দস্যু বনহুরের ভয়ে আজ দেশময় ত্রাহি ত্রাহি ভাব, সেই সেই দস্যু বনহুর আজ তাকে স্পর্শ করে গেল এমনকি একই অশ্বে এতদূর এসেছে তারা দুজনে।

শিকারী যখন লোকালয়ে পৌঁছে দস্যু বনহুর সম্বন্ধে সমস্ত কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলছে, তখন দস্যু বনহুর এক কর্মকারের বাড়ির দরজায় গিয়ে নেমে দাঁড়াল।

গভীর রাত। সবাই ঘুমে অচেতন।

কর্মকার সারাদিনে ক্লান্তির পর ছেঁড়া কাঁথার নিচে গা মুড়ি দিয়ে সুখন্দ্রিা উপভোগ করছে।

এমন সময় বনহুর তার পাশে এসে দাঁড়াল। রিভলভারের ডগা দিয়ে মুখের কথা সরিয়ে দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে কর্মকারের সুখনিদ্রা ছুটে গেল, চোখ মেলে তাকিয়ে অপরিচিত এক ব্যক্তিকে তার কক্ষে দেখে ত্বরিতগতিতে বিছানায় ওঠে বসল।

কর্মকার কিছু বলার পূর্বেই বনহুর রিভলভার উঁচু করে ধরল।

কর্মকার হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে কিছু বুঝতে না পেরে হা করে তাকিয়ে রইল। ভাবল, স্বপ্ন দেখছে না তো– দু'হাতে চোখ রগড়ে ভাল করে তাকাল।

বনহুর বলে উঠল-ওঠো।

কর্মকার চিত্রার্পিতের ন্যায় উঠে দাঁড়াল। বারবার তাকাতে লাগল বনহুরের হাতের রিভলভারখানার দিকে।

বনহুর চাপাকণ্ঠে বলল–এই যে– আমার এ দুটো খুলে দাও।

কর্মকার এতক্ষণে বনহুরের হাতের হাতকড়ার দিকে নজর করেনি। লণ্ঠনের স্বল্পালোকে তাকিয়ে শিউরে উঠল। ভাবলো নিশ্চয়ই এ ভাল লোক নয়, কোন

কয়েদী, পালিয়ে এসেছে তার কাছে।

কর্মকারের দু'চোখ গোলাকার হয়ে ওঠে। সে জানে পলাতক কয়েদী ধরে দিলে পুরস্কার পাওয়া যায়। হয়তো কোন চোর কিংবা ডাকু হবে। মোটা পুরস্কার পাবে সে। তার মুখটা হাসিমাখা করে বলল, কে তুমি বাবা?

বনহুর কর্মকারের মুখোভাব দেখে তার মনের ভাব বুঝেছিল, হেসে বলল–আমি একজন পলাতক আসামী। দেখো ভাই, আমার হাতের এ দুটো খুলে দাও। আর একটু থাকার জায়গা যদি দিতে।

তা আর বলতে হবে না। আমরা হিন্দু, অতিথি আমাদের কাছে দেবতার সমান।

বেশ, তাহলে আমার হাতের এ দুটো খুলে দাও।

বনহুর কর্মকারের বুকের কাছ থেকে রিভলভারখানা সরিয়ে নিয়েছিল। কর্মকার বনহুরকে নিয়ে তার কারখানার মধ্যে প্রবেশ করল কিছুক্ষণ পরিশ্রম কারার পর বনহুরের হাত দুখানা মুক্ত হয়ে আসে।

হাত দু'খানাতে হাত বুলিয়ে বলে বনহুর–এর জন্য তুমি পুরস্কার পাবে। এবার আমার শোবার জায়গা করে দাও দেখি।

কর্মকারের আনন্দ আর ধরে না। মনে মনে বলে হাতকড়া খুলে দিয়েছি বলেই তোমাকে ছাড়ছিনে বাছাধন। কিন্তু প্রকাশ্যে বলে–এসো বাবা এসো, এই যে আমার বিছানায় শোও, আমি ভিতরে গিয়ে শুই।

আচ্ছা! বনহুর কর্মকারের তেলচিটে বিছানায় শুয়ে কাঁথাটা টেনে দিল চোখেমুখে। তারপর কাঁথার নিচে বারবার হাই তুলে বলল–তুমি যাও, বড় ঘুম পাচ্ছে আমার।

কর্মকার বেরিয়ে যাবার পূর্বে আর একবার বলে–তুমি বাবা নিশ্চিন্তে ঘুমোও। কাল ভোরে ডেকে দেব।

বনহুর কাথার নিচে থেকে বলে–আচ্ছা।

কর্মকার বেরিয়ে দরজা টেনে বন্ধ করে দিল। বনহুর শুনতে পেল শিকলটাও আটকে দিল সে।

দরজা বন্ধ হবার সংগে সংগে কাঁথা সরিয়ে দরজার পাশে এসে কান পেতে শুনতে লাগল বনহুর।

ওপাশ থেকে ভেসে আসছে কর্মকারের চাপা কণ্ঠস্বর-ওগো, ওঠো-ওঠো!

মেয়েলী কণ্ঠ– বলি এত রাতে কি হলো তোমার?

শোনো, একটা কয়েদী পালিয়ে এসেছে।

তাতে আমার কি?

তোমার কি, শোনোই না! ওকে ধরিয়ে দিতে পারলে কি পাব জান?

কি পাবে?

গভর্ণমেন্ট আমাকে মোটা পুরস্কার দেবে। অনেক টাকা– বুঝেছ?

বুঝেছি। কিন্তু কয়েদী কোথায়?

ঐ যে আমার ঘরে ঘুমাচ্ছে। আমার নরম বিছানায়, গরম কাথার নিচে ঐ শোনো নাক ডাকছে। দেখো, তুমি চুপ করে এই দরজার পাশে থাক। আমি চট করে থানায় খবরটা দিয়ে আসি।

সে কি গো! খবরটা দিয়ে আসবে, না পুলিশ নিয়ে আসবে?

হ্যাঁ, পুলিশকে একেবারে সংগে করে নিয়ে আসব। তুমি এখান থেকে নড়ো না, বুঝেছ?

হ্যাঁ গো বুঝেছি। যাও, চট করে এসো কিন্তু। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। আরে রেখে দাও তোমার ঘুম, দেখো দরজা যেন আবার খুলে দিও না।

না গো না, দেব না–দেব না।

চটি জুতা পায়ে বেরিয়ে যাবার শব্দ শোনা যায়।

বনহুর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে হাসে।

একটা কাগজে নিজের নাম লিখল বনহুর। তারপর বিছানার ওপর রেখে পেছনের জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। জানালার সরু শিকগুলোতে হাত দিয়ে মৃদু হাসলো সে। মাত্র কয়েক মিনিট-বনহুর জানালা দিয়ে ঘরের পেছনে বেরিয়ে এলো। অদূরে অশ্বটা ঘাস চিবুচ্ছিল। বনহুর বিলম্ব না করে অশ্বে চেপে বসল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই অঞ্চলের থানার ছোট দারোগা মিঃ হাকিম আর কয়েকজন পুলিশ কর্মকারের সংগে এসে হাজির হলেন।

কর্মকার এসে দেখে তার বৌ দরজার পাশে আঁচল বিছিয়ে দিব্যি আরামে ঘুমাচ্ছে।

দারোগা সাহেবকে বলল কর্মকার-হুজুর এই ঘরে কয়েদীকে আটকে রেখেছি। আমার কাছ থেকে পালাবে এমন বেটা আছে নাকি? দাঁড়ান, দরজা খুলে দিই। কর্মকার নিজ হাতে দরজা খুলে ফেলল।

দারোগা, জমাদার এবং পুলিশ একসংগে কক্ষে প্রবেশ করেন। কিন্তু একি, কোথায় কয়েদী! শূন্য বিছানা পড়ে রয়েছে।

ছোট দারোগা মিঃ হাকিম ধমক দিলেন–কোথায় কয়েদী? পাঁজি কোথাকার। জানিস মিথ্যে বলার শাস্তি কি?

কর্মকার কাঁপতে কাঁপতে বলল– হুজুর মিথ্যে বলিনি। আমরা হিন্দু, এই যেন কান ধরে বলি...........

কর্মকারের কথা শেষ হয় না। একজন পুলিশ উবু হয়ে বিছানা থেকে কাগজখণ্ড তুলে নিয়ে লণ্ঠনের সম্মুখে ধরে চিৎকার করে উঠলেন– দস্যু বনহুর!

মিঃ হাকিম অবাক বিস্ময়ে বলে ওঠেন–কোথায় দস্যু বনহুর?

এই দেখুন স্যার। জমাদার সাহেব কাগজের টুকরাখানা এগিয়ে দেন মিঃ হাকিমের দিকে।

কাগজখানা নিয়ে পড়ে দেখলেন তিনি, তারপর একটা শব্দ করলেন-আশ্চর্য, দস্যু বনহুর এসেছিল এখানে।

কর্মকার তখন কাঁপতে শুরু করেছে। দস্যু বনহুরের হাতের হাতকড়া সে নিজ হাতে খুলে দিয়েছে, এও কি সত্য?

তাকে আবার বন্দীও করে রেখে গিয়েছিল সে। কি সর্বনাশটাই না করেছি। নিশ্চয়ই দস্যু বনহুর তাকে ক্ষমা করবে না। হয়তো তাকে হত্যাও করতে পারে। কর্মকার কেঁদেই ফেলল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে ভিড় জমে গেল।

মুখে মুখে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল, কর্মকার জয়নাথ দস্যু বনহুরকে আটকে রেখেছিল–এ কম কথা নয়।

ওদিকে শিকারী গ্রামের কয়েকজন লোককে সংগে করে শহরে গিয়ে পৌঁছল। সোজা গেল সে পুলিশ অফিসে।

সমস্ত ঘটনা খুলে বলল ইন্সপেক্টার মিঃ হারুনের কাছে। আগামী রাতে সেই স্থানে তার অশ্বটি ফেরত দিতে আসবে দস্যু বনহুর–এ কথাও বলতে ভুলল না।

ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন সব শুনে বুঝতে পারলেন, কাল তারা যখন দস্যু বনহুরকে খুঁজে না পেয়ে চলে এসেছিলেন, ঠিক তার পরপরই ঐ শিকারী ভদ্রলোক অশ্ব ছুটিয়ে সেই পথে আসছিল এবং তারপর এসব ঘটনা সেখানে ঘটছে।

গোপনে মিঃ হারুন দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের নতুন ফন্দি আঁটলেন।

যে স্থানে অশ্বটি ফেরত দেবার কথা আছে সেই জায়গায় এক গোপন স্থানে কিছুসংখ্যক পুলিশ লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করলেন, শিকারীও অশ্ব ফেরত নেয়ার জন্য সেখানে অপেক্ষা করবে।

পুলিশমহল যখন দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের জন্য ব্যস্ত, ঠিক সেই মুহূর্তে কর্মকারসহ মিঃ হাকিম এসে হাজির হলেন পুলিশ অফিসে।

গত রাতের ঘটনা বিস্তারিত খুলে বললেন– কর্মকারের মুখেও সব শুনলেন মিঃ হারুন। দস্যু বনহুর স্বয়ং কর্মকারের নিকট পৌঁছে হাতের হাতকড়া কেটে নিয়েছে কম কথা নয়। রাগে অধর দংশন করলেন তিনি।

বনহুরের সেই পালিয়ে আসা অনুচরটির মুখে বনহুরের গ্রেফতারের সংবাদ পেয়ে রহমান। বোমার মত ফেটে পড়ল; এত বড় কথা–তাদের সর্দারকে পুলিশ পাকড়াও করে নিয়ে গেছে? ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারি করতে লাগল রহমান।

তৎক্ষণাৎ সমস্ত অনুচরকে প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিল– যেমন করে হউক পুলিশদের হাত থেকে সর্দারকে মুক্ত করে আনতেই হবে, কিন্তু সেই আহত অনুচরটি রহমানের নিকটে পায়ে হেঁটে পৌঁছতে অনেক বিলম্ব করে ফেলেছিল। একে তার পায়ে চোট লেগেছিল, তদুপরি কান্দাইয়ার বন থেকে বনহুরের আস্তানা অনেকটা পথ। কাজেই বিলম্ব হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

রহমান যখন তার সমস্ত অনুচরগণকে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত করে অশ্বে আরোহণ করবে ঠিক সেই মুহূর্তে গহন বনের নিস্তব্ধতা ভেদ করে জেগে উঠলো একটা ক্ষীণ অশ্ব-পদ শব্দ।

রহমান তাড়াতাড়ি মাটিতে কান লাগিয়ে শুনল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল– একটা শব্দ। শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে, কেউ যেন ঘোড়ায় চড়ে এদিকে ছুটে আসছে। হয়তো শত্রুপক্ষের লোকও হতে পারে। তোমরা সবাই রাইফেল হাতে প্রস্তুত থাক। শত্রুর আগমনের সংগে সংগেই গুলী ছুঁড়বে।

রহমান এবং বনহুরের সমস্ত অনুচর গুলীভরা উদ্যত রাইফেল হাতে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ক্রমান্বয়ে অশ্ব-পদ শব্দ নিকটবর্তী হচ্ছে।

কাছে–আরও কাছে এগিয়ে এলো শব্দটা। রহমান রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে। অন্ধকারে তাকিয়ে আছে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। হাতে তার উদ্যত রাইফেল।

শেষ রাত্রির জমাট অন্ধকার তখন গোটা বনভূমি আচ্ছন্ন করে রেখেছে। রহমান তার প্রধান অনুচরকে মশাল জ্বালাবার নির্দেশ দিল।

মশাল জ্বালাতেই গাঢ় অন্ধকার বনভূমি কিছুটা আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মশালের আলোতে চকচক করে উঠল দস্যুদের হাতের রাইফেলগুলো।

যমদূতের মত এক একজন দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকের শরীরে জমকালো পোশাক। চোখ দিয়ে যেন সবার আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। তাদের সর্দার আজ বন্দী। হিংস্র বাঘের মত হয়ে উঠেছে এক একজন। রহমানের তো কথাই নেই।

সবাই যখন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে, ঠিক সেই মুহূর্তে অশ্বারোহী এগিয়ে এলো।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অনুচর এবং রহমান আনন্দ ধ্বনি করে উঠল–সর্দার!

বনহুর অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়াল।

রহমান খুশিতে আত্মহারা হয়ে ছুটে গেল বনহুরের পাশে। বনহুরের দক্ষিণ হাতখানা নিয়ে চুম্বন করে বললো– জানি সর্দার, আপনাকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না।

বনহুর বললো– রহমান, আমার অনুচরগণের মধ্যে এমন কেউ আছে যার পেটে কথা হজম হয় না। কে সে লোক –আমি তাকে দেখতে চাই।

রহমান বনহুরের কণ্ঠস্বরে শিউরে উঠল। প্রথমে তাকাল সে বনহুরের মুখের দিকে, তারপর দণ্ডায়মান সকল অনুচরের মুখের দিকে।

বনহুর গর্জে উঠল–কে সে, যে সামান্য একটা কথা চেপে রাখতে পারে না। এবার বনহুর তার অনুচরদের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। প্রত্যেকে মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগল।

রহমান নিজে মশাল ধরল প্রত্যেকের মুখের কাছে। হঠাৎ বনহুর বলে ওঠে– শয়তান। সঙ্গে সঙ্গে জাফরের চুল ধরে টেনে বের করে আনে।

সবাই অবাক হয়।

বনহুর কিন্তু জাফরের মুখোভাব লক্ষ্য করেই টের পেয়ে গিয়েছিল। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে ওঠে। জাফরের মুখমণ্ডল।

হাতজোড় করে বলে–সর্দার, আমিই বলেছিলাম নূরীর কাছে এবারের মত মাফ করে দেন। মাফ করে দেন সর্দার। মাফ করে..

জাফরের কথা শেষ হয় না। বনহুরের রিভলভারের গুলী তার বক্ষ ভেদ করে চলে যায়।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে জাফর। কিছুক্ষণ ছটফট করে নীরব হয়ে যায় দেহটা।

বনহুর কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে– নিয়ে যাও। শিয়াল-কুকুরের মুখে ফেলে দাও। বনহুর এবার আস্তানার ভিতরে প্রবেশ করে।

পাহারারত দস্যুগণ দু'ধারে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। বনবহুর এগিয়ে যায় নিজের কক্ষের দিকে।

বিশ্রামাগারে প্রবেশ করে ধপ করে বিছানায় বসে পড়ে। হাতের রিভলভারখানা ছুঁড়ে ফেলে দেয় টেবিলের ওপর। ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে। আর মনের অস্থিরতা ফুটে ওঠে মুখমণ্ডলে।

বিশ্রামাগারের উজ্জল আলোতে বনহুরকে আজ অদ্ভুত লাগছিল। কখনও পায়চারি করে, কখনও বিছানায় গিয়ে বসে, কখনও মুক্ত জানালার নিকটে গিয়ে দাঁড়ায়।

ক্রমে পূর্বাকাশ ফর্সা হয়ে আসে। বনহুরের মনের অস্থিরতা এতটুকু কমে না।

নূরী কিন্তু আড়ালে থেকে সব দেখছিলো। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যে ভুল সে করেছিল, তার জন্য কেঁদে কেঁদে দু'চোখ লাল করে ফেলেছিল। বনহুরকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবার পর থেকে নূরী এক বিন্দু পানি পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। মনের মধ্যে তার একটা অনুশোচনার অনল দাউ দাউ করে জ্বলছিল। বনহুর তাকে অবহেলা করতে পারে। পায়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতে পারে, অন্য কোন মেয়েকে ভালবাসতে পারে, তবু নূরী কিছুতেই বনহুরকে ত্যাগ করতে পারে না। বনহুরের স্মৃতি সে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না।

কান্দাইয়ার বন থেকে ফিরে আসার পর সেই যে নূরী শয্যা নিয়েছিল, একটিবারও ওঠেনি বা কিছু খায় নি। দাসী এসে কয়েকবার খাবার জন্য অনুরোধ

করছে, কিন্তু নূরী মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল বিছানায়। কেঁদে কেঁদে শেষ পর্যন্ত চোখের পানিও শুকিয়ে গিয়েছিল।

গোটা রাত কখনও নূরী কেঁদেছে, কখনও স্তব্ধ হয়ে মৃতের ন্যায় বিছানায় পড়ে রয়েছে।

হঠাৎ দাসী এসে যখন জানাল বনহুর ফিরে এসেছে তখন কি যে আনন্দ হয়েছিল নূরীর মনে, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ছুটে এসেছিল সে বনহুরের পাশে, কিন্তু সম্মুখে আসতে পারেনি। সে–সাহস পায় নি।

আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে দেখছিল সে বনহুরকে। খোদার নিকট হাজার হাজার শুকরিয়া আদায় করছিল।

কিন্তু গোটা রাত শেষ হয়ে এলো, বনহুর অস্থিরভাবে কক্ষে পায়চারি করছে, মুখমণ্ডলে তার গভীর উদ্বিগ্নতা ফুটে উঠেছে। নূরী তখন আর স্থির থাকতে পারল না, এক সময় ছুটে গিয়ে। বনহুরের পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল।

বনহুর কঠিন পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর এক ঝটকায় পা সরিয়ে নিল।

নূরী পুনরায় দু'হাতে বনহুরের পা চেপে ধরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল– হুর, আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

বনহুর এবারও কোন কথা বললো না।

নূরীর অশ্রু বনহুরের পা দু'খানার উপর মুক্তাবিন্দুর মত ঝরে পড়তে লাগল।

বনহুর আর দাঁড়াল না, নূরীর হাতের মধ্যে থেকে পা দু'খানাকে টেনে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল কক্ষ থেকে।

নূরী লুটিয়ে পড়ে মেঝেতে।

পূর্বদিনের সেই স্থানে একটা বৃক্ষের নিচে দাঁড়িয়ে আছে শিকারী ভদ্রলোক। আজ এখানে দস্যু বনহুর তাকে অশ্ব ফেরত দেবার কথা আছে।

মিঃ হারুন দলবল নিয়ে একটি গোপন স্থানে প্রতীক্ষা করছেন। বনহুরকে আজ তারা গ্রেফতার করবেই।

মিঃ হারুনের সঙ্গে রয়েছেন মিঃ হাকিম এবং আরও দু'জন পুলিশ অফিসার। সকলেই উন্মুখ হৃদয় নিয়ে তাকিয়ে আছে এ বৃক্ষের নিচে শিকারী ভদ্রলোকের দিকে।

ক্রমে রাত বেড়ে আসে।

শীতের কনকনে হাওয়া অফিসারদের শরীরে কম্পন ধরায়। প্রত্যেকের শরীরেই ওভারকোট। পায়ে গরম মোজা। হাতে পশমী গ্লাস। তবুও ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন তাঁরা। আজ সন্ধ্যা থেকে আকাশের অবস্থাও ভাল নয়। কিছুক্ষণ আগে সামান্য একটু বৃষ্টিও হয়ে গেছে। হিমেল হাওয়া বইছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে বিজলী চমকাচ্ছে।

এখানে পুলিশ ইন্সপেক্টর মিঃ হারুন যখন দলবল নিয়ে দস্যু বনহুরের জন্য প্রতীক্ষা করছেন, ঠিক সেই সময়ে মিঃ শঙ্কর রাও-এর দরজায় এক ভদ্রলোক কড়া নাড়লেন।

এত রাতে হঠাৎ কে তাকে বিরক্ত করতে এলো! একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এলেন তিনি। দরজা খুলে বললেন– কাকে চান?

ভদ্রলোক ব্যস্ত সমস্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন–আপনিই কি মিঃ রাও? হ্যাঁ আমিই।

দেখুন, এক্ষুণি আপনাকে ইন্সপেক্টর মিঃ হারুন যেতে বলেছেন। তিনি ফুলবাড়ি গ্রামের প্রবেশ পথে যে বড় আমগাছটি রয়েছে, সেখানে অপেক্ষা করছেন। এই যে চিঠিখানা তিনি আপনাকে দিয়েছেন।

মিঃ শঙ্কর রাও কাগজখানা খুলে পড়লেন, তাতে লেখা রয়েছে– মিঃ রাও, শীঘ্র চলে আসুন, আমি ফুলবাড়ি গ্রামের প্রবেশ পথের ধারে দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করার জন্য অপেক্ষা করছি। আপনার জন্য একটি অশ্ব পাঠালাম, দেরী করবেন না যেন, চলে আসুন।

ইতি–
হারুন

শঙ্কর রাও লোকটার মুখে তাকালেন, জিজ্ঞাসা করলেন–আপনার নাম কি?

আমি গোয়েন্দা বিভাগের লোক, আমার নাম মিঃ নৌশাদ আলী।

ও, আপনি মিঃ নৌশাদ আলী? এতক্ষণ আপনাকে চিনতে পারিনি, মাফ করবেন। আসুন, ভিতরে বসবেন, চলুন।

না, এখন নয়। আপনি তাড়াতাড়ি চলে আসুন।

আচ্ছা, আসছি। শঙ্কর রাও অন্দর বাড়িতে প্রবেশ করেন। একটু পরে গরম জামাকাপড় পরে বেরিয়ে এলেন– চলুন মিঃ নৌশাদ আলী।

চলুন।

শঙ্কর রাওকে একটি অশ্ব দেখিয়ে বললেন নৌশাদ আলী-এই অশ্বে আপনি চলে যান।

আর আপনি?

আমি একটু ফুলবাড়ি থানা হয়ে আসছি। কথাটা শেষ করে অন্য একটি অশ্বে চেপে বসেন নৌশাদ আলী।

এসব রাস্তাঘাট শঙ্কর রাও এর অতি পরিচিত। তিনি ইতোপূর্বে আরও কয়েকবার ফুলবাড়ি গ্রামে গিয়েছিলেন। আজ রাত দুপুরেও পথ চিনতে ভুল হয় না তার।

ঘণ্টা দেড়েক চলার পর ফুলবাড়ি গ্রামের নিকটে পৌঁছতে সক্ষম হলেন। তিনি ভালভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকাতে লাগলেন।

যদিও আকাশ এখন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে, তবু মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। বিদ্যুতের আলোতে তিনি দেখতে পেলেন ফুলবাড়ি গ্রামের পথে একটি আমগাছের তলায় একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে।

মিঃ রাও অশ্বের গতি বাড়িয়ে দিলেন।

ওদিকে মিঃ হারুন তাঁর দলবল নিয়ে সতর্ক হয়ে দাঁড়ালেন। অশ্ব-পদশব্দ ক্রমান্বয়ে আমগাছতলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগলেন মিঃ হারুন হ্যাঁ, সত্যিই একজন লোক অশ্বপৃষ্ঠে চেপে গাছটার নিচে পৌঁছে গেছে।

কালবিলম্ব না করে মিঃ হারুন হুইসেলে ফুঁ দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে পুলিশ-ফোর্স আম গাছতলায় হাজির হলো। উদ্যত রাইফেল হাতে ঘেরাও করে ফেলল অশ্বারোহীকে।

মিঃ হারুন রিভলভার উদ্যত করে ধরে বললেন– খবরদার, নড়লেই গুলী ছুঁড়বো।

একি কাণ্ড! শঙ্কর রাও হকচকিয়ে গেলেন। তবু হাত তুলতে বাধ্য হলেন।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন– গ্রেফতার কর।

মিঃ শঙ্কর রাও তখন অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ব্যস্তকণ্ঠে বলে ওঠেন– আমি– আমি শঙ্কর রাও।

ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। মিঃ হারুন এবং তার দলবল বিস্ময়ে থ' মেরে যায়– এ যে মিঃ শঙ্কর রাও। প্রথমে কারও মুখে কথা সরে না, একটু পরে মিঃ হারুন বলে ওঠেন– আপনি কেন?

শঙ্কর রাও কেমন যেন হাবা বনে গিয়েছিলেন, ঢোক গিলে বললেন– আপনি আমাকে ডেকে পাঠাননি?

আমি! না তো। কে বলল এ কথা আপনাকে?

কেন, মিঃ নৌশাদ আলী গিয়েছিলেন। আপনার চিঠিও নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

মিঃ হারুন গম্ভীর হয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে পারেন দস্যু বনহুরেরই এই কাণ্ড।

শিকারী ভদ্রলোক এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে এসব দেখছিল। যা হোক, তার অশ্বটা যে ফেরত পেয়েছে এই যথেষ্ট।

মিঃ হারুন যেন বেকুব বনে যান। এমন অপদস্থ তিনি আর কোনদিন হন নি। দস্যু বনহুরের ওপর তাঁর রাগ চরমে ওঠে।

অধর দংশন করেন তিনি।

এমন সময় একটা হাসির শব্দ ভেসে আসে হাঃ হাঃ হাঃ। অদ্ভুত সে হাসির শব্দ। পুলিশবাহিনী এবং অফিসারগণ অবাক হয়ে যায়। মিঃ হারুন পুলিশ ফোর্সকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়তে নির্দেশ দেন। নিজেও ছুটে যান যেদিক থেকে হাসির শব্দটা এসেছিল, সেই দিকে।

বারবার মিঃ হারুনের রিভলভার গর্জে উঠতে লাগল– গুডুম গুডুম–

কিন্তু অনেক সন্ধান করেও দস্যু বনহুরের পাত্তা মিলল না। এক সময় ব্যর্থ হয়ে ফিরে চললেন মিঃ হারুন তাঁর দলবল নিয়ে।

শিকারী তার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে নিজ বাড়ির দিকে রওনা দিল। তার অতি আদরের অশ্বটিকে ফেরত পেয়ে খুশিতে ভুলে গেলো সব। ভুলে গেছে দস্যু বনহুরের গতকালের কথাগুলো।

অশ্ব নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে সে।

ফুলবাড়ি গ্রাম ছাড়িয়ে একটি প্রান্তর, তারপরই শহরের বড় রাস্তা পড়বে। শিকারী প্রান্তরের মাঝখানে এসে পৌঁছল। হঠাৎ তার সম্মুখে পথরোধ করে দাঁড়ালো এক অশ্বারোহী।

মুহূর্তে শিকারীর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠলো। কম্পিত গলায় জিজ্ঞাসা করল- কে? সম্মুখস্থ অশ্বারোহী চাপাকণ্ঠে গর্জে উঠলো– দস্যু বনহুর।

শিউরে উঠল শিকারী। কানের কাছে প্রতিধ্বনি হলো গতকালের দস্যু বনহুরের কথাগুলো কোন চালাকি করতে গেলে মরবে। আমি তোমায় ক্ষমা করব না। কণ্ঠনালী শুকিয়ে উঠলো ওর। ভীতকণ্ঠে বলে ওঠে– আপনি ...... আপনি.......

হ্যাঁ। এবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে নাও। জান– দস্যু বনহুর কোনদিন অবিশ্বাসীকে ক্ষমা করে না।

বনহুরের কঠিন কণ্ঠস্বরে শিকারীর অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। দু'চোখে সর্ষে ফুল ভেসে ওঠে। কিছু বলতে যায় সে, কিন্তু তার পূর্বেই বনহুরের রিভলভার গর্জে ওঠে।

তীব্র একটা আর্তনাদ করে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে যায় শিকারী।

বনহুর একবার মাত্র ফিরে তাকায়, তারপর অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

.

আসুন, আসুন, ডাক্তার বাবু। জমিদার ব্রজবিহারী রায় ডাক্তারকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন।

ডাক্তার হেসে জিজ্ঞাসা করলেন–আজ আপনার কন্যা কেমন আছে রায় বাবু?

আগের চেয়ে সুভা এখন কিছুটা ভাল। চলুন, ওকে দেখবেন চলুন।

চলুন। ডাক্তার ব্রজবিহারী রায়কে অনুসরণ করলেন।

ব্রজবিহারী রায়ের মনে এখন অনেকটা শান্তি ফিরে এসেছে। এই ডাক্তারের প্রচেষ্টাতেই সুভাষিণী আজ আরোগ্যের পথে। কাজেই ডাক্তারকে তিনি অত্যন্ত বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা করেন। তাছাড়া এ ডাক্তার সম্বন্ধে রায়বাবু গভীরভাবে ভেবে দেখেছেন, অন্যান্য ডাক্তারের চেয়ে ইনি কেমন যেন স্বতন্ত্র। টাকার লোভী যে ইনি নন, তাও বুঝতে পেরেছিলেন। এতদিন যত ডাক্তারই এসেছেন সুভাষিণীর চিকিৎসার জন্য প্রথমেই তারা টাকার প্রশ্ন তুলেছেন। সবাই যেন টাকার জন্য। তাঁর কন্যার চিকিৎসা করতে এসেছেন। শুধু একটি মাত্র ডাক্তার, যিনি এখনও টাকার কোন প্রশ্ন তোলেননি।

ডাক্তার প্রথম দিন দেখে যাবার পর কয়েক দিন আর আসেন নি। ব্রজবিহারী রায় ভেবেছেন, এ ডাক্তারও চলে গেলেন–আর আসবেন না। কিন্তু হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত হলেন। সুভাকে দেখলেন, ঔষধপত্র দিলেন। তারপর মাঝে মাঝে ডাক্তার আসেন। সুভাষিণীকে দেখেন, ঔষধপত্র দিয়ে যান।

সুভাষিণীর দিকে তাকিয়ে ব্রজবিহারী রায় অনেকটা সান্ত্বনা খুঁজে পান। সুভাষিণীর মা জ্যোতির্ময়ী দেবীর মনে কিঞ্চিৎ আনন্দ ফিরে এসেছে। যদিও

সুভাষিণী এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেনি, তবু আগের চেয়ে এখন কিছু ভাল। খাবার দিলে খায়। স্নানের সময় আপন মনে মাথায় জল ঢালে। কাপড় পরে, চুল আঁচড়ে দিলে চুপ করে থাকে। কিন্তু এখনও সে কারও সঙ্গে কথা বলে না। এমন কি বৌদি চন্দ্রাদেবীর সঙ্গেও না।

ডাক্তার এলে সুভাষিণীর মধ্যে যেন একটু পরিবর্তন দেখা যায়। চোখ দুটো ওর উজ্জ্বল দীপ্তময় হয়ে ওঠে। স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে সে ডাক্তারের গভীর দু'টি নীল চোখের দিকে।

ডাক্তারকে নিয়ে ব্রজবিহারী রায় কন্যার কক্ষে প্রবেশ করলেন।

চন্দ্রাদেবী তখন সুভাষিণীর চুল বেঁধে দিচ্ছিল। শ্বশুরের সঙ্গে ডাক্তারকে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে মাথার কাপড় টেনে উঠে দাঁড়াল চন্দ্রাদেবী। সুভাষিণীর চুল বাঁধা তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সুভাষিণী নতমুখে যেমন বসেছিল–তেমনি রইলো। চোখ তুলে চাইলো না সে।

ব্রজবিহারী রায় কন্যাকে সম্বোধন করে বলেন–মা সুভা, দেখ ডাক্তার বাবু এসেছেন।

সুভাষিণী ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকাল।

ডাক্তার তাকিয়ে আছেন তার দিকে। তিনি এবার সুভার পাশের আসনে বসে বললেন–দেখি। আপনার হাতখানা।

সুভাষিণী হাতখানা ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে দিলো।

ডাক্তার হেসে বললেন–আগের চেয়ে অনেক ভাল মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ ডাক্তার বাবু, এর জন্য আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

একটু থেমে পুনরায় বললেন ব্রজবিহারী রায়–কিন্তু আমি বড়ই দুঃখিত যে, আজও আপনি একটি পয়সাও গ্রহণ করলেন না।

সেজন্য দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই রায় বাবু। আপনার কন্যা সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেনি এখনও।

ব্রজবিহারী রায় পুত্রবধূকে লক্ষ্য করে বললেন– বৌমা, ডাক্তার বাবুর জন্য একটু জলখাবার তৈরি করে নিয়ে এসো।

চন্দ্রাদেবী হেসে বলল–আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

চন্দ্রাদেবী বেরিয়ে গেল। ব্রজবিহারী রায় পুত্রবধূর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে বললেন–সত্যি ডাক্তারবাবু, কি বলব, বৌমা না থাকলে সুভা-মাকে আমরা কেউ খাওয়াতে পারতাম না। এমন কি ওর মায়ের হাতেও সে খায় না। এখন সুভা আমার স্নান করে। খাবার নিজ হাতে তুলে খায়। আপন মনে বলে চলেছেন রায়বাবু।

সুভাষিণী কিন্তু তখনও তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে ডাক্তারের চোখের দিকে, ডাক্তারও স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে সুভাষিণীর দিকে। ডাক্তারের দৃষ্টির মধ্যে সে যেন খুঁজে পেয়েছে তার না পাওয়ার বস্তুটির সন্ধান।

উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়েছিল। চন্দ্রাদেবী কখন যে সকলের অলক্ষ্যে কক্ষে প্রবেশ করে একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল তা কেউ খেয়াল করেনি। একটু কেশে বলে ওঠে চন্দ্রাদেবী– এই যে জলখাবার এনেছি।

চন্দ্রাদেবীর কণ্ঠস্বরে সম্বিৎ ফিরে আসে ডাক্তারের। তিনি তাকান চন্দ্রাদেবীর দিকে।

ব্রজবিহারী রায় তখনও বলে চলেছেন–বৌমার গুণ আর কত বলব ডাক্তার বাবু। এমন মেয়ে আর হয় না। এই দেখুন, এতগুলো জলখাবার কত অল্প সময়ে তৈরি করে আনল।

চন্দ্রাদেবীর মনে কিন্তু তখন একটা চিন্তাস্রোত বয়ে চলেছে। শুধু আজ নয়, আরও কয়েক দিন সে লক্ষ্য করেছে–সুভা আর ডাক্তার নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে উভয়ে উভয়ের দিকে।

আজ চন্দ্রাদেবীর মনে প্রশ্নটা ধাক্কা মারে। সে শুধু বুদ্ধিমতী নারী নয়– শিক্ষিতাও। ভাবে, এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন একটা কিছু রয়েছে। তাছাড়া সবাই ডাক্তারকে স্বচ্ছমনে গ্রহণ করলেও চন্দ্রাদেবী কোনদিন এই ডাক্তারটিকে স্বচ্ছমনে গ্রহণ করতে পারেনি। কেন যেন ডাক্তারের সামনে। দাঁড়িয়ে কথা বলতেও সঙ্কোচিত হয়ে পড়ত সে। ডাক্তারের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে

পারতো। না চন্দ্রাদেবী। দৃষ্টি নত করে নিতে বাধ্য হত কিন্তু কেন যে কথা বলতে পারত না সে নিজেই জানে না।

সেদিন ডাক্তার সুভাষিণীর জন্য নতুন ঔষধপত্র দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন।

ব্রজবিহারী রায় অন্যান্য দিনের মতো আজও ডাক্তারকে বিদায় দেবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

চন্দ্রাদেবী বলে ওঠেন– বাবা, আপনি সুভার পাশে বসুন, আমার একটু কাজ আছে।

অগত্যা ডাক্তার বাবুকে সেখান থেকেই বিদায় দিয়ে কন্যার পাশে গিয়ে বসলেন ব্রজবিহারী রায়।

জমিদার বাড়ি– অনেকগুলো গেট পেরিয়ে তবেই হলঘরের দরজায় পৌঁছান যায়। তারপর বাইরে বের হবার পথ। ডাক্তার পরপর কয়েকটা গেট পেরিয়ে হলঘরের বারান্দায় পৌঁছলেন। তারপর যেমনি তিনি বড় গেটের দিকে পা বাড়াবেন অমনি একটা থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল চন্দ্রাদেবী, পেছন থেকে ডাকল–ডাক্তার বাবু।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন ডাক্তার। বিস্ময়ভরা চোখে তাকালেন। ততক্ষণ চন্দ্রাদেবী তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এর পূর্বে এত কাছে কোনদিন সে আসেনি।

ডাক্তার কিছু জিজ্ঞাসা করার পূবেই বলে ওঠে চন্দ্রাদেবী–ডাক্তার বাবু, আপনি কে?

ডাক্তারের মুখে একটি হাসির রেখা ফুটে ওঠে, বলে–সন্দেহ হচ্ছে?

হ্যাঁ। আপনি ডাক্তার নন।

কেন, আপনার ননদিনী কি আরোগ্য লাভ করছে না?

তা জানি না, কিন্তু আপনি যে ডাক্তার নন, এ আমি জানি। বলুন আপনি কে?

ডাক্তার কিছু ভেবে বললেন–চন্দ্রাদেবী, সত্যিই আমি ডাক্তার নই। কিন্তু....

কিন্তু নয়, আপনি আমার নিকট লুকাতে চেষ্টা করবেন না, আপনার আসল পরিচয় আমি জানতে পেরেছি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, আপনি-আপনি—

বলুন, বলুন?

আপনি দস্যু বনহুর।

ধন্যবাদ। আপনি যে আমাকে চিনতে পেরেছেন সেজন্য আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য হই নি।

জানেন, আমি এখনি আপনাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতে পারি।

সে জন্য আমার চিন্তার কোন কারণ নেই। বরং আপনার ননদের চিকিৎসার হাত থেকে উদ্ধার পেতাম। চন্দ্রাদেবী, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটি গোপনীয় কথা আছে! যদি মনে কিছু না করেন…

চন্দ্রাদেবী গম্ভীর কণ্ঠে বলে–দস্যু বলে আমি আপনাকে ভয় করি না। যদি বলার মত কথা হয় বলতে পারেন।

নিজ মনেই হাসে বনহুর। যে দস্যুর নাম স্মরণে শহরবাসীর হৃদকম্প শুরু হয়–সেই দস্যুর সামনে দাঁড়িয়ে একটি নারী এতবড় কথা বলতে পারে না। চন্দ্রাদেবীর সাহসের পরিচয় পেয়ে খুশি হলো সে, চারদিকে তাকিয়ে চাপা কণ্ঠে বলল–দেখুন,. সুভাষিণীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করতে হলে আপনার সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন।

বলুন আমি কি করতে পারি?

মাধবগঞ্জের জমিদারপুত্র মধুসেনের সঙ্গে সুভাষিণীর বিয়ে হবে, এ ব্যাপারে আপনি আমাকে সহায়তা করবেন।

স্তব্ধকণ্ঠে বলে ওঠে চন্দ্রাদেবী-সুভা যে আপনাকে ভালবাসে।

সে কথায় কান না দিয়ে বলে ওঠে ডাক্তারবেশী দস্যু বনহুর–চন্দ্রাদেবী, সুভা যে ডাক্তারকে অনেকখানি ভালবেসে ফেলেছে এটা হয়তো আপনি লক্ষ্য করেছেন।

হ্যাঁ করেছি। কিন্তু সে ডাক্তারকে ভালবাসেনি, ভালবেসেছে তার দুটি চোখকে।

চন্দ্রাদেবী!

হ্যাঁ, দ্য হলেও আপনি মানুষ। সবাই আপনাকে না বুঝলেও আমি জানি আপনার হৃদয়। অতি মহৎ। আপনি আমার ছোট বোনের মত আদরের সুভাকে বাঁচান, বাঁচান

উদ্বিগ্ন হবেন না চন্দ্রাদেবী। আমি যা বলব সেভাবে আপনাকে কাজ করতে হবে।

বলুন কি করতে হবে?

তেমন কোন কঠিন কাজ নয় চন্দ্রাদেবী। আমি এরপর মধুসেনকে সঙ্গে আনবো।

মধুসেন–সুভার-ভাবী স্বামী মধুসেন?

হ্যাঁ, তাকেই আমি ডাক্তার বেশে আনব। চন্দ্রাদেবী, আপনি ডাক্তার আর সুভাষিণীর দৈনন্দিন নিবিড় প্রেমে সাধ্যমত সাহায্য করবেন।

কিন্তু.....

না, আর কিন্তু নয়। মনে রাখবেন চন্দ্রাদেবী, একথা আপনি ছাড়া আর কেউ যেন জানতে পারে। যখন দেখবেন উভয়ের মধ্যে একটা গভীর বন্ধনের সৃষ্টি গড়ে উঠেছে তখন ডাক্তারের মুখোশ উন্মোচিত করে ফেলবেন–বাস, তারপর আপনাকে কিছু করতে হবে না।

এ কি করে সম্ভব হবে?

অসম্ভব কিছুই নয় চন্দ্রাদেবী। আচ্ছা, আজ তাহলে চলি?

চন্দ্রাদেবী কিছু বলতে গেল, কিন্তু তার পূর্বে বনহুর বাইরে বেরিয়ে গেছে।

সুভাষিণীর কক্ষে ফিরে আসে চন্দ্রাদেবী। দেখতে পায় রায়বাবু বসে বসে ঝিমুচ্ছেন। পুত্রবধূর আগমনে তিনি উঠে দাঁড়ান–আমার এখন তাহলে ছুটি?

হ্যাঁ বাবা, আপনি যান! আমি বসছি।

ব্রজবিহারী রায় বেরিয়ে যান।

চন্দ্রাদেবী সুভাষিণীর পাশে বসে। তখনও তার মনে চিন্তার রেখাজাল জট পাকাচ্ছিল। দস্যু বনহুর স্বয়ং তাদের বাড়িতে আসে যায় অথচ তারা কেউ জানে না সে কথা। নিভৃতে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠে চন্দ্রাদেবী। এ দাড়ি গোফের অন্তরালে না জানি কেমন একখানা মুখ লুকানো আছে–যে মুখখানার জন্য আজ সুভার এই অবস্থা। চন্দ্রাদেবীর মনে দস্যু বনহুরের আসল রূপ দেখার বাসনা জাগে।

.

মিঃ হারুন অফিসে প্রবেশ করতেই সাব-ইন্সপেক্টর মিঃ জাহেদ বলেন–স্যার, কালকের সেই শিকারী খুন হয়েছে।

বলেন কি! আঁতকে ওঠেন মিঃ হারুন।

হ্যাঁ স্যার, আমি নিজে গিয়েছিলাম, পরীক্ষা করে দেখে এলাম। কালকেই সেই শিকারী ভদ্রলোককে কে বা কারা গুলী করে হত্যা করেছে।

ইস! নিশ্চয় এ দস্যু বনহুরের কাজ।

হ্যাঁ স্যার, আমারও তাই মনে হয়।

লাশ কি মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন?

স্যার, আপনাকে জিজ্ঞেস না করে আমি কিছুই করিনি। বেশ করেছেন। আমি লাশটা একবার পরীক্ষা করে দেখব। তাহলে আমি গাড়ি বের করতে বলি স্যার?

না, আমার গাড়িতেই যাব। আপনিও চলুন মিঃ জাহেদ।

মিঃ হারুনের গাড়ি বাইরেই অপেক্ষা করছিল। মিঃ হারুন মিঃ জাহেদ এবং দু'জন পুলিশকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছে মিঃ হারুন দেখলেন, শিকারীর রক্তাক্ত দেহ একটা প্রান্তরের মাঝখানে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। খানিকটা জায়গা রক্তে জমাট বেঁধে আছে।

হঠাৎ মিঃ হারুনের নজরে পড়ল, লাশটার পাশে একটি কাগজের টুকরো পড়ে আছে। মিঃ হারুন কাগজের টুকরোখানা হাতে উঠিয়ে নিয়ে পড়লেন, "বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি এমনি করেই হয়।"–দস্যু বনহুর

মিঃ হারুন রাগে আগুনের মত জ্বলে উঠলেন, বজ্রকঠিন স্বরে বললেন-দিন দিন দস্যু বনহুরের ঔদ্ধত্য চরম সীমায় পৌঁছে যাচ্ছে। অচিরে তাকে পাকড়াও করতে না পারলে দেশে শান্তি ফিরে আসবে না।

লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে অফিসে ফিরে এলেন মিঃ হারুন এবং তার সঙ্গিগণ। এবার মিঃ হারুন পুলিশ সুপার মিঃ আহমদের সঙ্গে পরামর্শের জন্য রওয়ানা দিলেন।

মিঃ আহমদের সঙ্গে মিঃ হারুনের অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা চলল। শঙ্কর রায়কেও ডাকা হলো সেখানে। তিনিও এ ব্যাপারে কাজে নেমে পড়বেন কথা দিলেন।

আবার পুলিশমহলে সাড়া পড়ে গেলো।

এবার বিদেশ থেকে একজন সুদক্ষ পুলিশ অফিসার এলেন দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করতে। ইতোপূর্বে তিনি কয়েকজন ভয়ংকর দস্যকে গ্রেফতার করে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। পুলিশ অফিসারটির নাম মিঃ জাফরী। যেমনি দুঃসাহসী তেমনি দুর্দান্ত। তার মত জোয়ান এবং বলিষ্ঠ পুলিশ অফিসার কমই নজরে পড়ে।

দস্যু ভোলানাথকে গ্রেফতার করতে গিয়ে মিঃ জাফরীর চোয়ালে ভয়ংকর একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। ক্ষত শুকিয়ে গেছে কিন্তু এখনও সেখানে একটা গভীর দাগ কাটা রয়েছে। সে দাগটা মিঃ জাফরীর চেহারাকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে।

মিঃ জাফরী এসে পৌঁছতেই সমস্ত পুলিশ অফিসার তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। এমনি কি পুলিশ সুপার মিঃ আহমদ পর্যন্ত মিঃ জাফরীকে স্বাগত জানাতে এলেন।

শহরের বিশিষ্ট ডাক বাংলোয় মিঃ জাফরীর থাকার ব্যবস্থা করা হল। মিঃ জাফরীর সঙ্গে একদল পুলিশ ফোর্সও এসেছিল। তারা বাংলোর পেছনে তাবু ফেলল।

ডাক বাংলোতেই মিঃ আহমদের সঙ্গে জাফরীর বৈঠক বসল। সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সমস্ত পুলিশ অফিসার এবং শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। মিঃ শঙ্কর রাও তার বাল্যবন্ধু ক্যাপ্টেন মিঃ আলমকে নিয়ে এসেছিলেন। সম্প্রতি মিঃ আলম লন্ডন থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি এখন সুদক্ষ গোয়েন্দা।

এ বৈঠকে দস্যু বনহুর সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হল।

শহরের বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের মধ্যে ধনী ব্যবসায়ী জনাব হারেস উদ্দিনও ছিলেন। ভদ্রলোক ছিলেন ঐশ্বর্যশালী, ধনবান। কিন্তু তার মন ছিল নিতান্ত ছোট। টাকা পয়সাকে তিনি নিজ সন্তানের চেয়েও বেশি দরদ করতেন। কাজেই দস্যু বনহুরকে তার ভয় ছিল বেশি।

দস্যু বনহুর সম্বন্ধে তিনি মিঃ জাফরীকে আরও ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। বনহুরকে নিয়ে নানা রকমের কুৎসা গড়ে শোনালেন। এমন কি চৌধুরী সাহেবের কন্যা মনিরাকে দস্যু বনহুর চুরি করে নিয়ে গোপনে লুকিয়ে রেখেছিল এ কথাও জানালেন।

মিঃ জাফরী অবশ্য জনাব হারেসের কথায় খুশি হতে পারছিলেন না। কারণ দস্যু বনহুর। সম্বন্ধে তার যা জানার প্রয়োজন তিনি পুলিশ ডায়েরী থেকেই জেনে নিয়েছেন এবং আরও নেবেন।

জনাব হারেস তবু থামলেন না। তিনি দাঁতে দাঁত পিষে জানালেন দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করতে আমিও আপনাদের সহায়তা করব। ছলে-বলে–কৌশলে-যে প্রকারেই হোক তাকে বন্দী করা প্রয়োজন।

জনাব হারেসউদ্দিনের পাশেই বসেছিলেন মিঃ আলম। এতক্ষণ তিনি নীরবে সব শুনে যাচ্ছিলেন। এবার হেসে বললেন–দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের জন্য আপনার উৎসাহ সত্যি প্রশংসনীয়। আপনার সহায়তা পেলে মিঃ জাফরী নিশ্চয়ই খুশি হবেন।

মিঃ আলমের কথায় মিঃ জাফরী তাকালেন তাঁর দিকে। মিঃ আলমের শরীরে সাহেবী পোশাক পরিচ্ছদ। মাথায় আমেরিকান ক্যাপ। সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা। চোখমুখ উজ্জ্বল দীপ্তময়! কণ্ঠস্বর গম্ভীর শান্ত সুমিষ্ট। মিঃ জাফরী আলমের কথায় খুশি হলেন।

সেদিন বৈঠকে আর বেশিদূর এগোয় না। সবাই বিদায় গ্রহণ করেন।

শুধু থেকে যান মিঃ আহমদ, মিঃ হারুন, শঙ্কর রাও এবং মিঃ আলম। তাঁরা এবার ডাকবাংলোর ভিতরে একটি সুসজ্জিত গোপন কক্ষে গিয়ে বসলেন। সকলের সম্মুখে তো গোপন আলোচনা চলে না, এবার শুরু হল তাদের মধ্যে দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের গোপন পরামর্শ।

ইতোমধ্যে শঙ্কর রাও মিঃ আলমের সঙ্গে মিঃ আহমদ, মিঃ হারুন এবং মিঃ জাফরীর পরিচয়। করিয়ে দিয়েছিলেন।

মিঃ আলমের ব্যবহারে এবং তার বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তায় যথেষ্ট খুশি হলেন মিঃ জাফরী। দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারে মিঃ আলমের মত একজনকে পাশে পেলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করবেন। জানালেন।

মৃদু হেসে মিঃ আলম জানালেন-যতদূর সম্ভব তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন।

এক সময় সবাই বিদায় গ্রহণ করলেন।

বনহুরের মোটর এসে থামলো নাইট ক্লাবের সম্মুখে। বনহুরের শরীরে দামী স্যুট। গাড়ি থেকে নেমে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো সে– তারপর এগুলো ক্লাবের দরজার দিকে।

ক্লাবে প্রবেশ করতেই একটা যুবতী তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাল-হ্যালো মিঃ প্রিন্স!

বনহুর হাস্যোজ্জ্বলমুখে যুবতাঁকে অভ্যর্থনা জানাল-হ্যালো মিস ডালিয়া, ভালো তো?

ডালিয়া বনহুরের দক্ষিণ হাতখানা দু'হাতে চেপে ধরল-খুব ভাল।

আর তুমি।

ভাল না।

কেন?

রাজ্য নিয়ে যে তোলপাড় শুরু হয়েছে!

তাই বুঝি আর তোমার সাক্ষাত পাওয়া যায় না।

হ্যাঁ ডালিয়া।

বনহুর যুবতীর কথায় জবাব দিতে দিতে তাকায় ক্লাবের ভিতরের চারদিকে। এগুতে থাকে সে। ডালিয়া চলে তার সঙ্গে।

এক কোণে গিয়ে বসে বনহুর।

ডালিয়াও বসে তার পাশের চেয়ারে।

বয় এসে সম্মুখে দাঁড়াতেই বনহুর বলে–শুধু দু'কাপ কফি।

কেন, আর কিছু খাবে না?

না।

আজ তোমাকে বড় ভাবাপন্ন লাগছে প্রিন্স।

বনহুর পুনরায় আর একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে একরাশ ধোয়া ছুঁড়ে দেয় সম্মুখে।

ধুম্রকুণ্ডলি হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলে ডালিয়া–কই, কথা বলছ না যে?

বনহুরের দৃষ্টি তখন ক্লাব কক্ষের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এমন সময় ওপাশের ভেলভেটের ভারী পর্দা ঠেলে বেরিয়ে আসে একটি যুবক আর একটা যুবতী। কি যেন কথা নিয়ে হাসাহাসি করছিল দুজনে।

মুহূর্তে বনহুরের চোখ দুটো ধ্রুবতারার মত জ্বলজ্বল করে জ্বলে ওঠে। হস্তস্থিত সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে নিক্ষেপ করে উঠে দাঁড়াল।

ডালিয়া হেসে বলে–কি হল, উঠে পড়লে যে?

বনহুর ডালিয়ার কথায় কোন জবাব না দিয়ে এগুতে থাকে। সম্মুখস্থ যুবক-যুবতী তখন ক্লাবের দরজার দিকে এগিয়ে গেছে।

ক্লাবের গেটে এসে যুবতী দাঁড়িয়ে পড়ে। যুবক যুবতীর হাতে হাত রেখে বিদায় গ্রহণ করে।

ক্লাবের সম্মুখে থেমে থাকা একটি গাড়িতে উঠে বসে স্টার্ট দেয় যুবক। যুবতী হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানায়। তারপর ফিরে যায় ক্লাব কক্ষের ভেতরে।

বনহুর কালবিলম্ব না করে নিজের গাড়িতে চেপে বসে। সম্মুখের গাড়িখানা তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে।

বনহুর নিজের গাড়ি নিয়ে সম্মুখের গাড়িখানাকে ধাওয়া করে। এ পথ সে পথ দিয়ে আগের গাড়িখান এগিয়ে চলেছে। বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে গাড়ি চালাচ্ছে বনহুর।

একটা সরু গলির মধ্যে সম্মুখস্থ গাড়িখানা প্রবেশ করতেই বনহুর নিজের গাড়িখানাও সেই গলি পথে নিয়ে গেল এবং স্পীড বাড়িয়ে দিল।

একে সরু গলি তদুপরি পথের দু'ধারে ড্রেন, কাজেই সম্মুখস্থ গাড়িখানার গতি অনেক কমে এসেছিল।

বনহুর অতি অল্প সময়ে সম্মুখস্থ গাড়ির নিকটে পৌঁছে যায়। একেবারে নির্জন রাস্তার দু'পাশে বাড়িগুলো ঝিমিয়ে পড়েছে।

বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে শব্দহীন রিভলবারখানা বের করে সম্মুখের গাড়ির চাকা লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে সামনের গাড়িখানা থেমে যায়।

বনহুর রিভলভার হাতে নেমে পড়ে। এক লাফে সম্মুখের গাড়িখানার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। . মাথার ক্যাপটা সামনে আরও কিছুটা টেনে নিয়ে গম্ভীর গলায় বলে ওঠে–শিগগির নেমে এসো।

যুবক ভীত দৃষ্টি নিয়ে তাকায় বনহুরের দিকে। কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে- তুমি কে?

আমি যেই হই–যদি বাঁচতে চাও–নেমে এসো।

অগত্যা যুবক গাড়ির দরজা খুলে নেমে আসে।

বনহুর যুবকের বুকে রিভলভার চেপে ধরে বলে–পেছনের গাড়িতে উঠে বস।

জনহীন গলিপথে রিভলভারের মুখে দাঁড়িয়ে কোন শব্দ উচ্চারণ করতে সক্ষম হয় না। নিঃশব্দে পিছনের গাড়িতে উঠে বসল।

বনহুর ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে ষ্টার্ট দেয়। পেছনে চালিয়ে গাড়িখানা বড় রাস্তায় বের করে আনে। বড় রাস্তাও তখন জনশূন্য হয়ে পড়েছে।

বনহুর যুবককে নিয়ে অতি দ্রুত গাড়িখানাকে অন্য একটা নির্জন পথে চালনা করে। কিছুক্ষণ চলার পর একটা বাড়ির সামনে এসে বনহুর গাড়ি রাখে। নিজে নেমে দরজা খুলে ধরল।

যন্ত্রচালিতের ন্যায় নেমে পড়ে যুবক। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে তার মুখমণ্ডল। নীরবে বনহুরকে অনুসরণ করে সে।

প্রকাণ্ড বাড়ি, কিন্তু কোথাও আলো নেই।

বনহুর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে শিষ দিল। সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। বনহুর দরজায় পা রাখতেই একটা নীলাভ আলো পথটাকে উজ্জ্বল করে তুলল।

বনহুর যুবকটিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলো। লোকটি দরজা বন্ধ করে কোথায় অদৃশ্য হলো যুবক বুঝতেই পারল না, বরং মনে মনে আরও ভীত হল সে।

যুবক যে একেবারে দুর্বল তা নয়। সে এত সহজেই গোবেচারার মত এখানে চলে আসত না, কিন্তু ঐ রিভলভারখানাকে তার যত ভয়। আজকাল প্রায়ই হত্যা চলছে। পথে-ঘাটে-মাঠে শুধু হত্যাকাণ্ড। সেদিনের শিকারী হত্যা কাহিনীও সে কাগজে পড়েছে। ভয়ে শিউরে উঠেছিল– সেও তো রাত বিরাত বাইরে থেকে ফেরে। হঠাৎ যদি তার অবস্থাও কোনোদিন তেমন হয়। তার চিন্তা আজ সত্যে পরিণত হতে চলেছে। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে তাই সে কোন কথা বলতে সাহসী হয়নি ভেবেছে, দেখা যাক অদৃষ্টে কি আছে।

বনহুর এগিয়ে চলেছে।

বনহুর একটা বড় ধরনের কক্ষে প্রবেশ করল।

যুবকটা বনহুরের পেছনে পেছনে ঐ কক্ষে ঢুকল।

কক্ষটি আবছা অন্ধকার। জিরো পাওয়ারের একটি বাল্ব জ্বলছে। বাল্বের ওপর পুরু ধরনের একটি আবরণ রয়েছে। যাতে আলো বাইরে না যায়, সে জন্যে এই আবরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা বুঝতে পারে যুবক।

যুবক এতক্ষণে ভাল করে তাকিয়ে দেখল। এবার কিছুটা সাহস হল তার, জিজ্ঞাসা করল– তুমি কে? আমার কাছে কি চাও?

বনহুর পায়চারী করছিল, থমকে দাঁড়িয়ে বলে–আমি দস্যু বনহুর।

যুবক চমকে ওঠে।

বনহুর হেসে বলে–আমি তোমাকে হত্যা করতে আনি নি।

তবে কি টাকা চাও?

না।

তবে কি চাও আমার কাছে?

আমি চাই তোমার জীবন।

জীবন!

হ্যাঁ।

এই তো বললে তুমি আমাকে হত্যা করবে না।

দস্যু বনহুর কোন দিন বিনা কারণে কাউকে হত্যা করে না মধুসেন।

দস্যুর মুখে তার নিজের নাম শুনে আশ্চর্য হয় মধুসেন।

বনহুর বুঝতে পারে, হেসে বলে–শুধু তোমার কেন, তোমার ভাবী স্ত্রী সুভাষিণীর নামও আমার অজানা নেই। এসো, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।

বনহুর এবার দেয়ালের গায়ে লাগান একটা সুইচ টিপল, সঙ্গে সঙ্গে একটা দরজা বেরিয়ে এলো সেখানে। বনহুর বলল–চল। নিজেও প্রবেশ করল ঐ দরজা দিয়ে ভেতরে।

এবার মধুসেন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হল– কক্ষটি উজ্জ্বল আলোতে আলোকিত। সেই কক্ষের তীব্র আলোতে মধুসেন স্পষ্ট দেখতে পেল বনহুরকে। চমকে উঠল, এ সেই লোক, যে তাকে একদিন ক্লাবকক্ষে গুণ্ডাদের কবল থেকে বাঁচিয়েছিল। দস্যু বনহুর তাহলে শুধু দুর্দান্তই নয়– মহৎও বটে। মধুসেনের ভয় আরও কমে আসে। নিশ্চয়ই দস্যু বনহুর তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এখানে আনেনি। মধুসেন অবাক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে বনহুরকে। যাকে সে কোনদিন। দেখবে বলে আশা করেনি, সেই দুর্ধর্ষ দস্যু বনহুর আজ তার সামনে দাঁড়িয়ে।

দস্যু বনহুর মাথার ক্যাপটা খুলে টেবিলে রাখল।

মধুসেন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। এত সুন্দর দস্যু বনহুর, কল্পনাও করতে পারেনি মধুসেন।

বনহুর ভ্রুকুঞ্চিত করে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল– সুভাষিণীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে কোন অমত আছে?

মধুসেন বিস্ময়ভরা নয়ন তুলে তাকাল। স্থিরকণ্ঠে বললো না। তাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে আমার কোন অমত নেই।

বেশ।

কিন্তু সুভাষিণী আমাকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে যদি রাজী না হয়? তাছাড়া সে তো এ বিয়েতে–

সে চিন্তা তোমাকে করতে হবে না মধুসেন। তোমাকে যা বলব– সেভাবেই কাজ করবে।

আগ্রহভরা গলায় বলে ওঠে মধুসেন–সুভাষিণীকে আমি স্ত্রীরূপে পাব।

চেষ্টা করলেই পাবে, আমি যা বলি শোনো। বনহুর এবার মধুসেনকে একটা চেয়ারে বসিয়ে নিজেও বসে পড়ে তার পাশের চেয়ারে।

কি করতে হবে তা বেশ করে বুঝিয়ে দেয় সে মধুসেনকে। বনহুর মধুসেনকে নিয়ে যখন গাড়িতে চেপে বসে, তখন দিনের আলোয় চারদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গোটা রাত সে মধুসেনকে খুব করে শিখিয়ে তৈরি করে নিয়েছে। মধুসেনের শরীরে ডাক্তারের ড্রেস। বনহুর নিপুণ হাতে তাকে ডাক্তারের পোশাকে সাজিয়ে দিয়েছে।

এখন কেউ দেখলে বুঝতে পারবে না সে পূর্বের ঐ ডাক্তার নয়। পার্থক্যের মধ্যে শুধু ডাক্তারের চোখে আজ গগলস রয়েছে।

প্রতিদিনের মত ব্রজবিহারী রায় আজও ডাক্তারকে অভ্যর্থনা জানালেন।

ডাক্তার স্বচ্ছ স্বাভাবিকভাবে ব্রজবিহারীর অভ্যর্থনা গ্রহণ করে বললেন– সুভাষিণী কেমন আছে রায়বাবু?

আগের চেয়ে এখন অনেকটা ভালই বলে মনে হচ্ছে ডাক্তার বাবু। কিন্তু আপনার গলার স্বর যেন একটু কেমন শোনাচ্ছে।

একটু কেশে বললেন ডাক্তার–গতরাতে ভীষণ ঠাণ্ডা লেগে গলাটা বসে গেছে। চোখ দুটোও কেমন টন টন করছে–

ও, তাই বুঝি গগলস্ পরেছেন?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, আপনি এবার সুভার কক্ষে যান। বৌমা সেখানে আছে।

এবার ডাক্তার বিপদে পড়লেন। এই যা সেরেছে। সুভাষিণীর কক্ষ তো তার জানা নেই। একটু ভেবে বললেন– রায়বাবু, আপনিও চলুন।

আচ্ছা চলুন। সত্যি ডাক্তার বাবু, এখনও আপনার সঙ্কোচ কাটল না? ধরতে গেলে এটা তো আপনার নিজের বাড়ির মত হয়ে গেছে।

ডাক্তার এ কথায় শুধু হাসলেন।

সুভাষিণীয় কক্ষে প্রবেশ করে ডাক্তার থমকে দাঁড়ালেন। রায় বাবু বলে ওঠেন– থামলেন কেন? আসুন।

সুভাষিণীর পাশে বসে ছিল চন্দ্রাদেবী। শ্বশুরের কণ্ঠস্বরে ফিরে তাকায়। প্রথমে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে একটু চমকে ওঠে। হঠাৎ আজ তার চোখে গগল্স্ কেন? পরক্ষণেই মনে পড়ে দস্যু বনহুরের কথাগুলো–চন্দ্রাদেবী এরপর আমি আর আসব না। আসবে আপনাদের ভাবী জামাতা মধুসেন। আপনি ওদের দু'জনের মধ্যে একটা নিবিড় প্রেমের আবেষ্টনী গড়ে তুলতে সহায়তা করবেন–

চন্দ্রাদেবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল ডাক্তারের মুখের দিকে। চিনবার কোন উপায় নেই। কিন্তু চন্দ্রাদেবীর মনের মধ্যে একটা কাঁটার আঘাত যেন খচ খচ্ করে উঠল। এতদিন যার সান্নিধ্যে সুভাষিণী আরোগ্যের পথে এগিয়ে চলেছে এ সে নয়। তার স্থানে আজ অন্য একজন।

চন্দ্রাদেবীকে ভাবাপন্ন দেখে বলে ওঠেন ব্রজবিহারী রায়–বৌমা ডাক্তার বাবুকে বসতে দাও।

আসুন ডাক্তার বাবু। তারপর ব্রজবিহারী রায়কে লক্ষ্য করে বলে চন্দ্রাদেবী– বাবা, আপনি যান, আমি ডাক্তার বাবুকে সব বলছি।

বেশ মা, বেশ। যাই দেখি সরকার আমার জন্য অপেক্ষা করছে, তাকে একবার শহরে পাঠাব। ব্রজবিহারী রায় বেরিয়ে যান।

চন্দ্রাদেবী জানে, এ নতুন লোক। কাজেই সে তাকে সাহায্য করে।

একটু হেসে বলে– আসুন ডাক্তার বাবু।

ডাক্তার এগিয়ে যান।

চন্দ্রাদেবী তাকে সুভাষিণীর পাশের চেয়ারে বসতে ইংগিত করে বলে– সুভাকে দেখুন ডাক্তার বাবু। গত কদিনের চেয়ে এখন সে অনেক ভাল। তারপর সুভাষিণীকে লক্ষ্য করে বলে.. সুভা, দেখো ডাক্তার বাবু এসেছেন।

ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকাল সুভাষিণী।

ডাক্তার তাকাল সুভাষিণীর দিকে। আজ চন্দ্রাদেবী সুভাষিণীকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছিল। ডাক্তার অপলক নয়নে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখের অন্তরালে ডাক্তারের চোখ দুটোই ছিলো তার সম্বল। আজ সেই চোখ দুটো ঢাকা পড়েছে কালো চশমার আড়ালে। সুভাষিণীর মুখমণ্ডল বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।

চন্দ্রাদেবী বলে– ডাক্তারবাবু, আপনি বসুন, আমি আপনার জন্য একটু জলখাবার তৈরি করে নিয়ে আসি। কথা শেষ করেই বেরিয়ে যায় সে।

বেশ কিছুক্ষণ ডাক্তার থ'মেরে বসে থাকেন।

সুভাষিণী তাকিয়ে আছে তখনও ডাক্তারের কালো চশমায় ঢাকা চোখ দুটোর দিকে।

হঠাৎ ডাক্তার সুভাষিণীর দক্ষিণ হাতখানা মুঠোয় চেপে ধরে বলে ওঠে– সুভা, অমন করে কি দেখছো!

সুভাষিণীর ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে। কি বলতে গিয়ে থেমে যায় সে।

ডাক্তার পুনরায় বলে– বল, বল সুভা!

তোমার কালো চশমা খুলে ফেল ডাক্তার। স্তব্ধ কণ্ঠে কথাটা বলে ওঠে সুভাষিণী।

চোখ দুটো বড় জ্বালা করছে। তুমি কি চাও আমার দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যাক।

না।

সুভা! আবেদন মাখা কণ্ঠস্বর ডাক্তারের।

এরপর হতে ডাক্তার রোজ আসে।

চন্দ্রাদেবীও ডাক্তারকে সুভাষিণীর পাশে বসিয়ে কোন না কোন কাজের ছুতো ধরে বেরিয়ে যায়।

সুভাষিণী এখন বেশ কথা বলে, আগের চেয়ে এখন সে অনেক ভাল। নিজেই স্নান করে, খায়, চুল বাঁধে।

ডাক্তার এলেই সুভাষিণী যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে। আজকাল নিজেই ডাক্তারের জলখাবার এনে দেয়। কোন কোন দিন ডাক্তারের সঙ্গে বাগানে বেড়ায়।

ব্রজবিহারী রায় এ ব্যাপারে কিছুই বলেন না। কারণ ডাক্তারের জন্য আজ তিনি প্রাণাধিক কন্যা সুভাকে ফিরে পেয়েছেন।

বেশ কিছুদিন চলে গেছে।

একদিন সুভাষিণী ডাক্তারের সঙ্গে বাগানে একটা হাস্নাহেনার ঝাড়ের পাশে বসে গল্প করছিল। হঠাৎ সুভাষিণী বলে বসে আজ কিন্তু তোমার চোখের চশমা খুলতে হবে।

আশ্চর্য কণ্ঠে বলে ওঠে ডাক্তার– কেন?

এখনও কি তোমার চোখ সারেনি ডাক্তার?

না।

আমি জানি–তুমি ডাক্তার নও।

তুমি তুমি–খুলে ফেল তোমার চোখের ঐ কালো চশমা। খুলে ফেলো তোমার দাড়ি গোঁফ। সুভাষিণী একটানে ডাক্তারের চোখের চশমা খুলে নেয়।

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুখ থেকে দাড়ি গোঁফ খুলে ফেলে। সুভাষিণী বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে ওঠে–কে-কে আপনি? আমি–আমি দস্যু বনহুর।

নিপুণ দৃষ্টি মেলে তাকায় সুভাষিণী তার মুখের দিকে, তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে—না– আপনি সে নন। বলুন বলুন আপনি কে?

বিশ্বাস হচ্ছে না? তা না হবারই কথা। কারণ তোমার সঙ্গে আমার দেখা এক অন্ধকারময় রাতে। ডাকাতের হাত থেকে তোমায় বাঁচিয়ে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিলাম– তারপর আর এক রাতে তোমায় এক গাছের নিচে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পেয়ে তোমাকে নিয়ে গিয়ে এক হাসপিটালে ভর্তি করে দিলাম– মনে পড়ে এসব কথা তোমার?

সুভাষিণী স্তব্ধ হয়ে শুনে যায় ওর কথাগুলো। তাইতো, এসব কথা দস্যু বনহুর ছাড়া আর তো কেউ জানে না। তন্ময় হয়ে তাকায় সে ওর মুখের দিকে, ধীরে ধীরে সমস্ত পুরানো স্মৃতি তলিয়ে যায় কোন অতলে। নতুন করে এই মুখখানাই এঁকে যায় সুভাষিণীর মানসপটে।

সুভাষিণী ধীরে ধীরে মাথা রাখে মধুসেনের বুকে।

মধুসেন ওকে নিবিড়ভাবে টেনে নেয় কাছে।

এমন সময় চন্দ্রাদেবী একটু কেশে সেখানে উপস্থিত হয়।

চন্দ্রাদেবীর আগমনে চমকে সরে দাঁড়ায় সুভাষিণী। লজ্জিতও হয় সে।

এরপর একদিন চন্দ্রাদেবী শ্বশুর মহাশয়ের নিকটে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। যাকে তারা। এতদিন ডাক্তার জানত তিনি আসলে ডাক্তার নন। যাদবগঞ্জের জমিদার পুত্র-মধুসেন। দস্যু বনহুর সম্বন্ধে সমস্ত কথা চন্দ্রাদেবী চেপে গেল এমন কি নিজ স্বামীর কাছেও সে বলল এ কথা।

এরপর এক শুভলগ্নে মধুসেনের সঙ্গে সুভাষিণীর বিয়ে হল। বিয়ের পূর্বেই জেনেছিল সুভাষিণী যার সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে সে দস্যু বনহুর নয়– তার ভাবী স্বামী মধুসেন। তখন দস্যু বনহুরকে প্রায় ভুলে গেছে সে।

বিয়ের দিন।

অগ্নিকুণ্ড সাক্ষী রেখে মধুসেনের পাশে বসে সুভাষিণী যখন বিয়ের মন্ত্র পাঠ করছিল। তখন অন্যান্য আত্মীয়ের মধ্যে আশীর্বাদের সুযোগ নিয়ে আর একজন এসে দাঁড়াল। সকলের অলক্ষ্যে সুভাষিণীর হাতে একটি ছোট বাক্স দিয়ে সরে পড়ল সে।

বিয়ের পর চন্দ্রাদেবী সুভাষিণীকে নববধুর বেশে সাজিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছিল। গয়না পরাতে গিয়ে হঠাৎ সে দেখতে পেল গয়নার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর এবং মূল্যবান একটি নেকলেস রয়েছে। সবাই নেকলেসখানা দেখে বিস্মিত হল। এত মূল্যের নেকলেস কে দিয়েছে? কিন্তু কেউ বলতে পারে না।

বিদায়কালে চন্দ্রাদেবী সুভাষিণীকে গাড়িতে উঠিয়ে দিতে গিয়ে কোচওয়ানের মুখে নজর পড়তেই চমকে উঠল। কোচওয়ানের চোখ দুটো তার যেন পরিচিত বলে মনে হল। হঠাৎ একখানা মুখ ভেসে উঠল চন্দ্রাদেবীর মানসপটে। এ যে সেই ডাক্তারের চোখ। গভীর নীল দুটি চোখে অদ্ভুত চাহনি। চন্দ্রা আজও ভুলতে পারেনি সেই দৃষ্টিকে। এবার চন্দ্রাদেবী বুঝতে পারে সেই মূল্যবান নেকলেসখানা কে উপহার দিয়েছে। আবার সে ফিরে তাকাল পাগড়ি আর গালপাট্টায় ঢাকা কোচওয়ানের মুখে। কিন্তু ততক্ষণে কোচওয়ান গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।

সুভাষিণীর শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে বজরায় চড়ে।

ঘাটে এসে গাড়ি পৌঁছল। মধুসেন ও সুভাষিণী উঠলো গিয়ে বজরায়।

বজরা ছেড়ে দিল।

.

বজরার ছাদে তাকিয়ায় ঠেশ দিয়ে শুয়ে আছে মধুসেন, পাশে বসে সুভাষিণী। সুভাষিণীর দক্ষিণ হাতখানা মধুসেনের হাতের মুঠোয় ধরা রয়েছে।

আজ দোল পুর্ণিমা।

জ্যোস্নার আলোতে চারদিক ঝলমল করছে। মৃদুমন্দ বাতাসে বজরাখানা হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে।

মাঝিদের ঝুপ ঝুপ বৈঠার শব্দ আর নদীর জল উচ্ছ্বাসের কল কল ধ্বনি মধুময় পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে।

মধুসেন তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে স্ত্রীর মুখের দিকে। দোল পূর্ণিমার উজ্জ্বল আলোতে সুভাষিণীকে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল তার গলার মনিমুক্তা খচিত নেকলেসখানা। মধুসেন হেসে বলল সুভা যেমন সুন্দর তুমি, তেমনি সুন্দর তোমার ঐ মালাখানা। একেবারে অপূর্ব।

সুভাষিণী স্বামীর কথায় কোন জবাব না দিয়ে মৃদু হাসে।

মধুসেন নেকলেসের লকেটখানা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ লকেটের ঢাকনা খুলে গেল। একি এর মধ্যে কাগজের টুকরা কেন। মধুসেন তাড়াতাড়ি জ্যোস্নার আলোতে কাগজের টুকরাটা মেলে ধরল। মাত্র দুটি শব্দ লেখা রয়েছে তাতে– দস্যু বনহুর। মধুসেনের কণ্ঠ দিয়ে নামটা উচ্চারিত হল।

সুভাষিণী চমকে উঠল, সেও অস্ফুটধ্বনি করে উঠল–দস্যু বনহুর?

হ্যাঁ, এতক্ষণে বুঝতে পারছি এ নেকলেসখানা তারই উপহার। মধুসেন কথাটা বলে তাকাল সুভাষিণীর মুখের দিকে।

সুভাষিণী তখন পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে গেছে।

মধুসেনের মুখমণ্ডল তখন উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠেছে। বনহুরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে তার মন। এ বিয়ের পেছনে হিতৈষী বন্ধুর মত দস্যু বনহুর তাকে সাহায্য করেছে। বনহুরের এ উপকার সে জীবনে কখনও ভুলবে না।

মধুসেন সুভাষিণীকে ভাবাপন্ন হতে দেখে বলে ওঠে–কি ভাবছো সুভা?

সুভাষিণীর বুক চিরে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস–বলে, সে কিছু না।

মধুসেন ওকে টেনে নেয় কাছে।

বজরা এখন নারন্দী বনের পাশ কেটে সোনাইদী নদী বেয়ে এগুচ্ছে। রাত গম্ভীর হয়ে এসেছে। ভোর রাতে বজরা গিয়ে পৌঁছবে যাদবগঞ্জে। মধুসেনের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। সুভাষিণী।

মাঝিরা আপন মনে বৈঠা চালিয়ে চলেছে। হাতগুলো তাদের শিথিল হয়ে আসে। ঝিমুতে ঝিমুতে বৈঠা মারছিল ওরা।

দোল পূর্ণিমার চাঁদখানা কখন যে ঢাকা পড়েছে মেঘের আড়ালে মধুসেন বা সুভাষিণী কেউ জানে না।

হঠাৎ একটা হই হই চিৎকারে ঘুম থেকে জেগে উঠে স্বামীকে আঁকড়ে ধরল সুভাষিণী। বজরার মধ্যে যেন তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়েছে। মশালের আলোতে দিবালোকের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে নদীবক্ষ। অস্ত্রের ঝনঝন আর রাইফেলের গর্জন সুভাষিণীর কানে ধাঁ ধাঁ লাগিয়ে দিল। ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে তাকাল সে চারদিকে।

মাঝিদের আর্ত চিৎকার ভেসে এলো তার কানে–বাবু ডাকাত পড়েছে–বাবু ডাকাত পড়েছে– মেরে ফেলল–মেরে ফেলল তার পরপরই নদীবক্ষে ঝুপ ঝুপ শব্দ। মাঝিরা লাফিয়ে পড়েছে নদীর পানিতে।

মধুসেন অসহায়ের মত তাকাল স্ত্রীর ভয়ার্ত মুখের দিকে। ততক্ষণে কয়েকজন মুখোশ পরা ডাকাত মধুসেনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মধুসেন কিছু বলার পূর্বেই একজন ডাকাত তার মাথায় লাঠি দিয়ে প্রচন্ড আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে মধুসেন জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল বজরার ছাদে। সুভাষিণী আর্তনাদ করে দু'হাতে মুখ ঢাকল। অমনি কে একজন ডাকাত তার গলা থেকে মূল্যবান নেকলেসখানা একটানে খুলে নিল।

সুভাষিণী দেখতে পেল তাদের বজরার পাশে কয়েকটা ছিপ নৌকা এবার ডাকাতের দল তার বিয়ের যৌতুকের জিনিসপত্র নিয়ে বজরা থেকে লাফিয়ে পড়তে লাগল ঐ ছিপ নৌকাগুলোর ওপর।

মাত্র কিছু সময়, তারপর সব নিস্তব্ধ। শুধু এবার শোনা যেতে লাগল বজরার মধ্য হতে বরযাত্রীদের কাতর আর্তনাদ বাবা গো মেরে ফেলল গো-ডাকাত! ডাকাত!

দস্যু বনহুর দরবারকক্ষের একটি সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট। তার সামনে দণ্ডায়মান তার কয়েকজন অনুচর। সকলেরই হাতে সূতীক্ষ্ম বর্শা। কার হাতে রাইফেল।

বনহুরের সামনে স্তূপাকার মালপত্র। এইমাত্র তারা ঐসব জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে এসেছে। জিনিসগুলো অতি মূল্যবান।

বনহুর মালপত্রগুলো পরীক্ষা করে গম্ভীর কণ্ঠে বলল–এ যে দেখছি সব নতুন ঝকঝকে। কোন বিয়ের যৌতুকের জিনিসপত্র বলে মনে হচ্ছে।

একজন বলল হ্যাঁ সর্দার তাই। আমরা একটা বিয়ের বরযাত্রীর বজরায় হানা দিয়ে এসব লুট করে এনেছি।

অন্য একজন দস্যু একছড়া নেকলেস বের করে বনহুরের হাতে দিল– সর্দার, এটা নতুন বৌ এর গলা থেকে কেড়ে নিয়েছি।

নেকলেসটা হাতে নিয়েই চমকে ওঠে বনহুর, অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠে– একি!

দস্যুটা মনে করে মূল্যবান নেকলেসখানা দেখে সর্দার বিস্মিত হয়েছে। সে বুক ফুলিয়ে গর্ভ ভরে বলে– সর্দার, বৌটার স্বামীকে লাঠির এক আঘাতে অজ্ঞান করে দিয়েছি।

গর্জে ওঠে বনহুর কি বললে?

হ্যাঁ সর্দার, নইলে নেকলেসখানা পাওয়া মুশকিল হত। খুব দামী ওটা।

তা আমি জানি। রহমত! রহমত! চিৎকার করে ওঠে বনহুর।

একজন দস্যু বলল– সর্দার, রহমত আমাদের দলে ছিল না। তাকে তো আপনি যাদবপুরে পাঠিয়েছেন। যাদবপুরের অন্ধ রাজা মোহন্ত সেনকে সাহায্য করতে। তিনি নাকি খুবই বিপদগ্রস্ত এবং ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়েছেন। তাই আপনার আদেশে সে যাদবপুর গেছে।

ও, রহমত তাহলে সেখানেই গেছে। কিন্তু তোমরা কার হুকুমে বজরা লুট করলে?

দলপতিগোছের অনুচরটি বলে ওঠে– আপনিই তো বলে দিয়েছেন সর্দার– যেখানে যা। পাবে লুট করে আনবে।

তাই বলে– কথা শেষ করতে পারে না বনহুর। দ্রুত পায়চারি করতে থাকে।

সর্দারকে গভীর চিন্তাযুক্তভাবে পায়চারী করতে দেখে ভীত হয় তার অনুচরগণ। না জানি তাদের কাজের মধ্যে কি দোষ খুঁজে পেয়েছে তাদের সর্দার।

হঠাৎ পায়চারী বন্ধ করে বলে ওঠে বনহুর– যাও তোমরা।

সর্দার এসব জিনিসপত্র কি গুদামে রাখব?

না?

কি করব?

সাগরের জলে ফেলে দাও। যাও।

দস্যুগণ বিস্মিত হল, কিন্তু সর্দারের কথায় কোনো প্রশ্ন করার সাহস হলো না ওদের। এক একজন এক একটা মাল উঠিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বনহুর দলপতিগোছের লোকটাকে ডাকল–এই শোন।

সর্দার!

তোমার নাম কি?

অবাক হলো অনুচরটা তাদের সর্দার আজ এমন হলো কেন। তার নামটাও ভুলে গেছে। মুখ কাঁচুমাচু করে বলল আমার নাম কাসেম।

এ নেকলেস কে এনেছে?

সর্দার আমি।

নেকলেসখানা ছুঁড়ে দিল বনহুর কাসেমের দিকে– এটা যার গলা থেকে কেড়ে নিয়েছ তাকে। ফেরত দিয়ে এসো।

ফেরত দেব!

হ্যাঁ—যাও বিলম্ব কর না।

আচ্ছা সর্দার। নতমুখে কাসেম বেরিয়ে গেল দরবারকক্ষ থেকে। মনে তার নানা প্রশ্ন জাগতে লাগল। এমন তো কোনদিন হয় না। লুটের মাল তো কোনদিনও ফেরত দেয়নি সর্দার। বিলিয়ে দিয়েছে গরিব-দুঃখীর মধ্যে। আজ এক আশ্চর্য ব্যাপার। কোথায় আবার খুঁজে পাব সেই নতুন। বৌকে। ফেরত না দিলে মৃত্যু অনিবার্য। সর্দারের নিকট অপরাধীর ক্ষমা বলে কোনো জিনিস নেই। কাসেমের মুখ চূর্ণ হয়ে গেল।

সে নেকলেসখানা এনে ভেবেছিল সর্দার আজ খুব খুশি হবে। হয়তো তাকে মোটা বখশিস দেবে, কিন্তু হল বিপরীত। এখন যার নেকলেস তাকেই খুঁজে বের করে সেটা ফেরত দিতে হবে।

.

দেশময় সাড়া পড়ে গেল– দস্যু বনহুর মাধবপুরের জমিদার ব্রজবিহারী রায়ের কন্যা সুভাষিণীর বজরায় হানা দিয়ে তার সমস্ত যৌতুকের জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে গেছে।

ব্রজবিহারী রায় স্বয়ং পুলিশ অফিসে গিয়ে ডায়রী করলেন, জামাতা মধুসেনকে আহত অবস্থায় এনে ভর্তি করে দিলেন শহরের হসপিটালে। বিয়ের রাতে এতবড় একটা অমঙ্গলে মুষড়ে পড়লেন রায়বাবু।

সুভাষিণীও কেমন যেন হতভম্ব হয়ে পড়ল। তার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না যে দস্যু বনহুর এভাবে তাদের বজরায় হানা দিতে পারে।

এক সময় কথাটা মনিরার কানেও পৌঁছল। জমিদার ব্রজবিহারী রায়ের কন্যার কণ্ঠ থেকে। মূল্যবান নেকলেস ছিঁড়ে নিয়েছে দস্যু বনহুর, তাও শুনল সে।

মনিরার মনটা হঠাৎ রাগে অভিমানে ভরে উঠল। কদিন আগেই শুনেছে, দস্যু বনহুর একজন নিরপরাধ শিকারী ভদ্রলোককে গুলী করে হত্যা করেছে। এখানে রাহাজানি, সেখানে লুটতরাজ, ওখানে নরহত্যা এসব নিয়ে যেন মেতে উঠেছে দস্যু বনহুর। '

আজ প্রায় এক মাস হতে চলেছে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে মামা মামীর নিকটে পৌঁছে দিয়েছে। কই সে তো একটি দিনের জন্যও তার সন্ধান নিতে এলো না। দস্যুর মন তো এমনি নিঠুরই হয়। ওকে একটিবার দেখার জন্য মনিরা ছটফট করে চলেছে। প্রতিদিন রাতে মুক্ত। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করে মনিরা ঐ বুঝি এলো সে।

যখন পা ধরে আসে তখন বিছানায় এসে পা এলিয়ে দেয়। তন্দ্রায় ঘোরে সামান্য একটা শব্দ। হলেও চমকে উঠে মনিরা। ছুটে আসে জানালার পাশে কিন্তু কোথায় সে। নিশীথ রাতের দমকা হাওয়া তার বন্ধ জানালায় আঘাত করেছিল। বিষণ্ন মনে আবার ফিরে এসে লুটিয়ে পড়ে বিছানায়। চোখের পানিতে বালিশ সিক্ত হয়ে ওঠে। বুক চিরে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস। ভাবে মনিরা, চিরদিন বুঝি এমনি করে ওর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে হবে তাকে। তারপর এক সময় কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে সে নিজেই জানে না।

এবার আসার পর মনিরা লক্ষ্য করেছে তার মামুজান বেশ গম্ভীর হয়ে পড়েছেন। আগের মত তাকে পাশে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করেন না। খাবার টেবিলে তাকে না দেখলে উদগ্রীব নয়নে বারবার দরজার দিকে তাকিয়ে দেখেন না। যতক্ষণ মনিরা টেবিলে না এসেছে ততক্ষণ চৌধুরী সাহেব খাবার মুখে দেন নি। আজ মনিরার জন্য অপেক্ষা করেন না। এখন খাবার টেবিলে ওকে না দেখলেও মরিয়ম বেগমকে কোন প্রশ্ন করেন না। আপন মনে খেয়ে বেরিয়ে যান।

মনিরার ওপর স্বামীর এই উদাসীনতা লক্ষ্য করে মরিয়ম বেগম অন্তরে ভীষণ আঘাত পেতেন। একটা গভীর বেদনা তাকে নিষ্পেষিত করে চলত। মাতা-পিতাহারা অসহায় মেয়েটি যে আজ পর্যন্ত তাঁদের মুখ চেয়েই বেঁচে আছে, আজ যদি তারাই ওর প্রতি বিরূপ হন, তা হলে সে বাঁচবে কি করে।

মনিরার ওপর চৌধুরী সাহেবের এই বিদ্রূপ মনোভাব শুধু মরিয়ম বেগমকে ব্যথিত করেনি, মনিরাও ভীষণ দমে গেছে। মরমে যেন মরে গেছে সে। সেদিন যখন মিঃ হারুনের সঙ্গে এ বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো মনিরা–মামুজানের

অন্ধকার মুখমণ্ডল দেখে মুহূর্তে তার সমস্ত হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মনিরা মামুজানের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখার সাহস করেনি। কোন দিন হঠাৎ সামনে পড়ে গেলে লজ্জায় সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেছে সে।

কিন্তু মনিরার তো কোন দোষ নেই। নিষ্পাপ ফুলের মত এখনও সে পবিত্র।

চৌধুরী সাহেব মনিরাকে যতই দূরে সরিয়ে দিচ্ছিলেন, মরিয়ম বেগম ততই ওকে গভীর স্নেহের আবেষ্টনীতে জড়িয়ে নিচ্ছিলেন এতটুকু মুখ ভার দেখলে মরিয়ম বেগম অস্থির হয়ে পড়তেন–কি হয়েছে মা? শরীর ভাল আছে তো? মাথা ধরেছে বুঝি? এমনি নানা প্রশ্নে মনিরাকে অতিষ্ঠ করে তুলতেন তিনি।

মনিরা জ্ঞানী, বুদ্ধিমতী– সব বুঝতো সে। মামীমা তার অপরিসীম স্নেহ ভালবাসা দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখতে চান, বাইরের কোন ঝড়-ঝঞ্ঝা মনিরার মনকে যেন বিষাক্ত করে তুলতে না পারে অবিরত সে চেষ্টাই করতেন মরিয়ম বেগম।

মামীমার প্রাণঢালা স্নেহ-ভালবাসা মনিরার অতৃপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনার প্রলেপ দিলেও মামুজানের উপেক্ষা তাকে মর্মাহত করে তুলত। আড়ালে বসে চোখের পানি ফেলত সে।

নিজের অদৃষ্টকে নিজেই ধিক্কার দিত মনিরা। না হলে এত ছোট বেলায় মা-বাবাকে হারাবে কেন? আজ সে বিশাল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী। একদিকে তার মাতা-পিতার অগাধ ধন-সম্পদ অন্যদিকে মামা-মামীর অফুরন্ত ঐশ্বর্য– এত থেকেও আজ সে চির দুঃখিনী হতভাগিনী।

যদি তার অদৃষ্ট মন্দই না হবে, তাহলে মনিরই বা হঠাৎ নদীর পানিতে হারিয়ে যাবে কেন? হারিয়েই যদি গেল তবে আবার সে তার জীবন পথে স্বাভাবিকভাবে ফিরে না এসে অস্বাভাবিকভাবে ফিরে এলো কেন?

বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে মনিরা। অথৈ সাগরে যেন কোন সম্বল পায় না সে আঁকড়ে ধরার। যত রাগ, যত অভিমান হয় মনিরের ওপর। কেন, ইচ্ছে করলে সে কি সৎপথে আসতে পারে না? তাহলেই তো মনিরার কোন দুঃখ

বেদনাই থাকে না। হঠাৎ মনিরার চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়। কেউ যেন তার পিঠে হাত রেখেছে বলে মনে হল তার।

ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকাল মনিরা। তার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছে। তার মনির এসেছে তার পাশে।

মনিরা কিন্তু নিজেকে ধরে রাখতে পারে না, দু'হাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে।

বনহুর মনিরার মাথায় হাত রেখে বলে– মনিরা, একি কাঁদছ কেন?

না না, তুমি যাও। তুমি যাও।

মনিরা, কি হল তোমার?

কিছু না।

অনেকদিন পরে এলাম তোমার হাসিভরা মুখ দেখব কিন্তু ..

তুমিই আমার জীবনটা দুর্বিসহ করে তুলেছ। তুমি আমায় হাসতে দিলে না মনির।

জানো, আজ আমার হৃদয়ে কি অসহ্য ব্যথা গুমরে কেঁদে মরছে? শুধু তোমার জন্য আজ আমি মনে এতটুকু শান্তি পাচ্ছি না। কিসের অভাব তোমার– তবু কেন তুমি এসব করছ? কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে মনিরার।

তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না মনিরা।

তা পারবে কেন, তুমি যে দস্যু–ডাকু ..

এ তো পুরনো কথা।

আচ্ছা, চিরদিন কি তুমি এসব করবে? চুরি-ডাকাতি লুটতরাজ ছাড়া আর কি কোন কাজ নেই তোমার?

হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে বনহুর।

মনিরা, তাড়াতাড়ি দক্ষিণ হাতখানা দিয়ে বনহুরের মুখে চাপা দেয়– থাম।

মনিরা অভাবের তাড়নায় আমি এসব করি না। এসব আমার নেশা।

নরহত্যা তোমার নেশা?

দস্যু বনহুর কোনদিন বিনা কারণে নরহত্যা করে না।

একটা নির্দোষ বেচারী শিকারী ভদ্রলোককে তুমি হত্যা করনি?

মাধবপুরের জমিদারের কন্যার কণ্ঠ থেকে তুমি হার ছিঁড়ে নাওনি?

আমি নেইনি, নিয়েছে আমার অনুচরগণ।

সে তোমার আদেশেই। ছিঃ ছিঃ ছিঃ একটা সামান্য হারের জন্য তুমি…

মনিরা– সে হার তাকে ফেরতে পাঠানো হয়েছে।

নিলেই বা কেন আবার ফেরতই বা পাঠালে কেন?

সব কথা তুমি নাইবা শুনলে।

শুনতে আমি চাই না। শুধু বল, তুমি আর ওসব করবে না। বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে মনিরা।

বনহুর পূর্বের ন্যায় হেসে ওঠে– হাঃ হাঃ হাঃ!

মনিরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বনহুরের মুখের দিকে। তারপর হঠাৎ লুটিয়ে পড়ে তার বুকে– আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না মনিরা, আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না..

বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে টেনে নেয় কাছে, তারপর বলে– মনিরা, নারী হৃদয় বড়ই কোমল। শুধু কোমল নয়, দুর্বলও। তাই তুমি সামান্য কিছু হলেই সহ্য করতে পার না।

কি বললে, তোমার কাজ সামান্য! রাহাজানি, লুটতরাজ, নরহত্যা—এসব– সামান্য?

নয়তো কি? দস্যু বনহুরের কাছে এসব অতি নগণ্য। জানো মনিরা, এই মুহূর্তে আমি নিজের বুকে গুলী চালাতে পারি!

তুমি সবই পার– পাষন্ড, তুমি সব পার। কিন্তু সে ব্যথা যে আমার কাছে কত দুর্বিষহ তা জানো না। প্রতি মুহূর্তে তোমার অমঙ্গল চিন্তায় আমি যে কত অস্থির থাকি, তুমি তা জানো না।

মনিরা, এই হতভাগার জন্য কেন তুমি চিন্তা কর। কেন তুমি ভাব?

নিষ্ঠুর! সত্যই তোমার হৃদয় পাষাণে গড়া। জানো না তুমি তোমার মনিরার কতখানি। কণ্ঠরোধ হয়ে আসে মনিরার।

বনহুর অবেগমধুর কণ্ঠে ডাকে– মনিরা!

বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে বলে মনিরা আর কত দিন আমাকে এমনি করে কাঁদাবে তুমি? তুমি তো ঐ সব নিয়ে মেতে থাক, আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকি বল?

আম্মা-আব্বার সেবা-যত্নের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিও, শান্তি পাবে।

তা জানি কিন্তু তোমাকে না পেলে আমার সব অন্ধকার।

তুমি নিতান্ত বালিকার মত কথা বললে মনিরা। দস্যু বনহুরকে তুমি মায়ার বাঁধনে বাঁধতে চাও। কিন্তু তা কোন দিনই হবার নয় মনিরা।

অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠে মনিরা–কি বললে? আমার সমস্ত আকাশ কুসুম ধূলিসাৎ করে দিলে। মুছে দিলে আমার হৃদয়ের সমস্ত বাসনা। ছুটে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল মনিরা মেঝের কার্পেটে, উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

বনহুর কিছুক্ষণ পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারপর মনিরার পাশে এসে বসল, পিঠে হাত রেখে ডাকল– মনিরা! আবার ডাকল সে– মনিরা, তুমি যা চাও তাই পাবে। ওঠো মনিরা–

মনিরা ধীরে ধীরে কার্পেট থেকে উঠে বলল– সত্যি দেবে?

কি চাও তুমি?

তোমাকে।

আমি তো তোমারই।

মনির!

হাঁ মনিরা।

মনিরা বনহুরের চোখ দুটির দিকে স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকাল। এমন করে কোনদিন ওর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারেনি।

দূর থেকে ভেসে আসছে মোরগের কণ্ঠস্বর। ভোর হবার আর বেশি দেরী নেই।

বনহুরকে বিদায় দিয়ে মনিরা শয্যায় গা এলিয়ে দিল। একটা অনাবিল আনন্দ মনিরার হৃদয়ের সমস্ত ব্যথাকে মুছে নিয়ে গেছে। মনির আর কারও নয়– শুধু তার।

.

সেদিনের পর থেকে নূরীর মনের শান্তি চিরতরে লোপ পেয়ে গিয়েছিল। লজ্জায়-অভিমানে নূরী আজ পর্যন্ত বনহুরের সম্মুখে আসেনি। অসহ্য একটা দাহ তার অন্তরে তুষের আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বলছিল। বনহুরকে নূরী শুধু ভালবাসতো তা নয়, তার জীবনের সাথী হিসাবে ওকে সে গ্রহণ করেছিল। গোটা পৃথিবী চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাক, তবু নূরী ওকে ভুলবে না– ভুলতে পারে না।

নূরী যদিও এতদিন বনহুরের সামনে আসেনি, তবুও সে একটি দিনও ওকে না দেখে থাকতে পারেনি। প্রতিদিন সে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে একটি বারের জন্য বনহুরকে দেখে যেত। যতক্ষণ বনহুর বাইরে থেকে ফিরে না আসত ততক্ষণ নূরী ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করত ওর।

বনহুর ফিরে এলে তাকে একটি বারের জন্য দেখে এসে তবেই সে শয্যা গ্রহণ করতো।

একদিন বনহুর সকালে বেরিয়ে গেল, আর ফিরে এলো না। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হল তবু তার দেখা নেই। নূরী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল না জানি কোন বিপদে পড়েছে সে! ব্যস্ত হয়ে বারবার অনুচরদের জিজ্ঞাসা করতে লাগল কোথায় গেছে বনহুর। আর কে গেছে তার সঙ্গে। এতক্ষণ ফিরে এলো না কেন? নানা প্রশ্নে অতিষ্ঠ করে তুলল নূরী সবাইকে।

অনুচরগণ নূরীর ব্যাকুলতা লক্ষ্য করে হাসল, একজন বলল– সর্দার কচি বাচ্চা নয়– হারিয়ে যাবে না।

নূরী রাগের বশে তাকে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল। তারপর গট গট করে চলে গেল নিজের কক্ষে।

দস্যু বনহুরের অনুচর সে। একটা নারীর হাতের চড় খেয়ে নিশ্চুপ থাকবে। রাগে অধর দংশন করলো। অনুচরটির নাম হাংলু। জাতিতে সে ছিল পাঠান। যেমন রাগী, তেমন দুঃসাহসী।

নূরীর চড় খেয়ে রাগ তার চরমে উঠল। নূরীর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে দাঁত পিষল সে।

নূরী কিন্তু নিজের কক্ষে গিয়েও শান্তি পাচ্ছিল না। বনহুরের জন্য মনটা তার ছটফট করতে লাগল।

ক্রমে রাত বেড়ে এলো। এক সময় বিছানার কোলে আশ্রয় নিল নূরী। নিজের অজ্ঞাতেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল সারাটা দিনের অবসাদ আর ক্লান্তি তাকে টেনে নিয়ে গেল বিস্মৃতির পথে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলো নূরী– জ্যোস্না প্লাবিত রাত। বনানী ঢাকা ঝরণার পাশে তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে বনহুর। নূরী ধীরে ধীরে বনহুরের চুলে আংগুল বুলিয়ে দিচ্ছে। মৃদুমন্দ বাতাস অজানা ফুলের সুরভি নিয়ে তাদের জানাচ্ছে সাদর সম্ভাষণ। ফুটফুটে জ্যোস্নার আলোতে বনহুরকে অপূর্ব সুন্দর লাগছিল গভীর নীল দুটি চোখে মায়াময় চাহনি। বনহুর নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। নূরী হেসে বলে– হুর, অমন করে কি দেখছ?

বনহুর দু'হাতে নূরীর গলা বেষ্টন করে বলে তোমাকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশে ঘনিয়ে আসে একরাশ কালো মেঘ। মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে পূর্ণিমার চাঁদ। সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের মুখখানা নূরীর দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায়। নূরীর কোলে বনহুর শুয়ে আসে তবু সে তাকে আর দেখতে পাচ্ছে না– নূরীর হাত দিয়ে বনহুরের মুখখানা অনুভব করার চেষ্টা করে।

হঠাৎ শুরু হয় ঝড়, বৃষ্টি, তুফান। আকাশে মেঘের গর্জন, বজ্রপাতের কড়কড় ধ্বনি। নূরী আর বনহুর, সেই তুফানের মধ্যে কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নূরী ব্যাকুল আগ্রহে ডাকে–হুর– হুর কোথায় তুমি। হুর-তুমি কোথায় ঝড়ের মধ্যে দু'হাত প্রসারিত করে খুঁজতে থাকে সে বনহুরকে।

গাছের ডাল ভাঙছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। অবিরাম ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। নূরী আকুলভাবে খুঁজে চলেছে বনহুরকে। কখনও গাছের গুঁড়িতে আঘাত খেয়ে ছিটকে পড়েছে। কখনও হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। প্রাণফাটা চিৎকার করে শুধু ডাকছে– হুরহুর, কোথায় তুমি কোথায় তুমি হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি থেমে গেল। আবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে এলো। স্বচ্ছ আকাশের বুকে হেসে উঠল পূর্ণিমার চাঁদ। নূরী উন্মাদিনীর ন্যায় বনহুরের সন্ধানে চারদিকে তাকাল। একি, ঐ তো তার প্রাণাধিক।

স্বচ্ছ নীল আকাশে ঠিক চাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আর একজন তারই মত সুন্দরী যুবতী– এলোমেলো চুল, অশ্রুসিক্ত নয়ন, দু'হাত মেলে বনহুরকে ডাকছে।

বনহুর নূরীর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে সেই যুবতীর দিকে। দূরে, আরও দূরে সরে যাচ্ছে বনহুর।

নূরী চিৎকার করে ওঠে– হুর ফিরে এসো। ফিরে এসো– অমনি নূরীর ঘুম ভেঙে যায়। একি স্বপ্ন দেখেছিল সে। গোটা শরীর ঘামিয়ে উঠেছে। গলাটা কেমন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। চোখের পানিতে বালিশটা ভিজে চুপসে উঠেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসে নূরী। স্তব্ধ হয়ে ভাবে স্বপ্নের কথা। টনটন করে ওঠে বুকের ভেতরটা। সত্যি কি তবে হুর এমনি করে তার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। না না, তা হতে পারে না। নূরীর জীবনের একমাত্র সম্বলই হুর। ওকে ছাড়া নূরী বাঁচতে পারে না। কিন্তু কাল সে তো ফিরে আসেনি। এখনও ফিরে এসেছে কিনা কে জানে?

নূরী শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। পা টিপে টিপে এগুলো বনহুরের কক্ষের দিকে।

কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল নূরী, কক্ষে আলো জ্বলছে। অনেকটা আশ্বস্ত হল– যাক, তাহলে হুর ফিরে এসেছে। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল, এখন নিশ্চিন্ত মনে গিয়ে ঘুমোবে। কিন্তু ওকে একটিবার না দেখে ফিরে যেতে পারল না নূরী। মনটা বড় অস্থির হলো, দরজা ঠেলে উঁকি দিল ভেতরে।

আলোটা দপ দপ করে জ্বলছে।

একি, বিছানায় অর্ধ শায়িত অবস্থায় বনহুর শুয়ে আছে। এত রাতেও ঘুমায়নি সে। নূরী ধীরে ধীরে মুখটা ফিরিয়ে নিল। হঠাৎ দরজায় মৃদু আঘাতের শব্দ হলো। নূরী চমকে উঠল– এবার সে ধরা পড়ে গেছে। নিশ্চয়ই হুর ছুটে আসবে। ছিঃ ছিঃ! কি ভাববে হুর। কিন্তু কই হুরতো ছুটে এলো না। তবে কি সে শুনতে পায়নি। তা কেমন করে হয়, শব্দটা বেশ জোরেই হয়েছে। নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে হুর, নইলে সে এমন নিশ্চুপ থাকতে পারে না।

নূরী এবার অতি সন্তর্পণে কক্ষে প্রবেশ করল। লঘু পদক্ষেপে এগিয়ে এলো বনহুরের বিছানার পাশে। কালো পাগড়ীটা শুধু খুলে রেখেছে টেবিলে আর রিভলভারখানা। অন্যান্য ড্রেস

এখনও বনহুরের শরীরে পরা রয়েছে এমন কি জুতো জোড়াও রয়েছে তার পায়ে।

নূরী অনেকক্ষণ স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল বনহুরের নিদ্রিত মুখমণ্ডলের দিকে। বালিশের উপরে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে সে, দক্ষিণ হাতখানা বুকের উপর। বাম হাতখানা একপাশে। পা দু'খানা অর্ধঝুলিত অবস্থায় রয়েছে।

নূরী ভুলে গেল, বনহুরের কাছ থেকে সে এখন দূরে সরে রয়েছে। ভুলে গেল রাগ অভিমান। অতি ধীরে ধীরে বনহুরের পা থেকে জুতো জোড়া খুলে রাখল তারপর সন্তর্পণে পা দু'খানা রাখল খাটের ওপরে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর নিদ্রা ছুটে গেলো, চমকে উঠে বসল। উজ্জ্বল আলোতে দেখল নূরী দাঁড়িয়ে আছে তার খাটের পাশে। বনহুর নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল সব।

নূরী, এবার ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

বনহুর ডাকল– নূরী।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নূরী। কিন্তু ফিরে তাকাবার সাহস পেল না সে।

বনহুর ডাকল– শোন নূরী।

নূরী ধীর পদক্ষেপে বনহুরের খাটের পাশে এসে দাঁড়াল। দৃষ্টি নত রয়েছে ওর।

বনহুর শান্তকণ্ঠে বলল– বসো।

নূরী তবুও বসল না, যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি রইল!

বনহুর নূরীর দক্ষিণ হাতখানা মুঠায় চেপে ডাকল– নূরী!

এতক্ষণে নূরী চোখ তুলে একবার বনহুরের দিকে তাকাল, পুনরায় দৃষ্টি নত করতে যাচ্ছিল সে বনহুর ওর চিবুক ধরে মুখটা উঁচু করে ধরে উঁ হুঁ আমার দিকে তাকাও। বল, কেন তুমি এখানে এসেছিলে?

নূরী নীরব।

বনহুর ওকে টেনে বসিয়ে দেয় নিজের পাশে, তারপর হেসে বলে– পাগলী, আমার ওপর রাগ করে খুব কষ্ট পেয়েছ, না?

নূরী এবারও নিশ্চুপ।

বনহুর নূরীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে কই, আগের মত আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিলে না?

নূরী আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না– হঠাৎ দু'হাতের মধ্যে মুখ রেখে উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে ওঠে।

বনহুর আশ্চর্য কণ্ঠে বলে–একি, আবার কেন কাঁদছ?

না না, তুমি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কর না হুর, জিজ্ঞাসা কর না।

তোমরা নারীজাতি, শুধু কাঁদতেই জানো, শুধু কান্না আর কান্না, এ ছাড়া আর কিছুই নেই তোমাদের?

হুর, তোমাকে ভালবেসে কান্না ছাড়া আর যে কোন পথ নেই।

নূরী, আমার কি জন্ম শুধু তোমাদের কাঁদাবার জন্য? যেদিকে তাকাই শুধু চোখের পানি আর চোখের পানি! শিশুকালে– বাবাকে কাঁদিয়েছি। তাই বুঝি আমার জীবনে এ একটি চরম অভিশাপ। যে দিকে তাকাই শুধু কান্নাই দেখতে পাই। কান্না ছাড়া কেউ যেন হাসতে জানে না।

হুর, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। সে দিন তোমার কাছে যে অপরাধ আমি করেছি, জানি তার ক্ষমা নেই, তবু বল তুমি আমাকে...

অনেক হয়েছে! নূরী, দস্যু কোনদিন রাগ-অভিমান জানে না, যা যখন ঘটে তখনই তার শেষ হয়। তোমার কোন দোষ নেই।

হুর! নূরী বনহুরের বুকে মাথা রাখল। একটা অন্ধকার কালো মেঘ ধীরে ধীরে নূরীর মন থেকে সরে গেল। কতদিন নূরী এমনি করে বনহুরের বুকে মাথা রাখতে পারেনি। একটা অনাবিল আনন্দ তার সমস্ত হৃদয়ে একটা শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে গেল।

নূরী যখন বনহুরের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো, তখন অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তি সরে দাঁড়াল।

নূরী এগিয়ে চলেছে তার ঘরের দিকে। কিছু পূর্বে যে ব্যথার আগুন তার মনে দাউ দাউ করে জ্বলছিল, এখন তা আর নেই। ধুয়ে-মুছে সব পরিস্কার হয়ে গেছে। বনহুরের একটা কথায় সব ভুলে গেল নূরী।

নূরী এগিয়ে যাচ্ছে। পেছনে তার এগিয়ে চলেছে একটা ছায়ামূর্তি। যেমনি নূরী নিজের কক্ষে প্রবেশ করতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন থেকে নূরীকে ধরে ফেলল একটা বলিষ্ঠ লোক। নূরী চিৎকার করার পূর্বেই লোকটা তার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে কাঁধে উঠিয়ে নিল, তারপর অন্ধকারে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

বনহুর বিছানায় শুয়ে হঠাৎ শুনতে পেল তাদের আস্তানা থেকে একটা অশ্ব-পদশব্দ যেন দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে। এ অসময়ে কে তাদের আস্তানা থেকে

কোথায় চলে যাচ্ছে? ব্যাপারটা তার কাছে। স্বচ্ছ মনে হল না। বনহুর বিছানায় সোজা হয়ে বসল, কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলো।

এমন সময় একজন অনুচর হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকল সর্দার, সর্দার……

বনহুর তড়িৎ গতিতে বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে দাঁড়াল তারপর টেবিল থেকে রিভলভারখানা তুলে নিয়ে দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল– কে, মহসীন?

সর্দার, হাংলু নূরীকে নিয়ে ভেগেছে… ঐ শুনা যাচ্ছে তার ঘোড়ার খুরের শব্দ।

তোমরা দেখেছ, বাধা দাওনি?

সর্দার, আমরা দু'জনে পাহারায় ছিলাম, বাধা দিতে গেলে একজনকে হাংলু হত্যা করছে …

বনহুর আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না, ছুটে বেরিয়ে যায় সে অশ্বালয়ের দিকে। গেটের পাশেই দেখতে পায় তার নিহত অনুচরটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে। একখানা ছোরা আমূল বসিয়ে দেওয়া হয়েছে তার বুকে।

বনহুরের এসব দেখার সময় নেই। একবার মাত্র তাকিয়ে দেখে নিয়ে অশ্বালয়ে প্রবেশ করে। অতি দ্রুত তাজকে নিয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর চেপে বসে তাজের পিঠে।

হাংলুর অশ্ব পদশব্দ ততক্ষণে অনেক দূরে সরে গেছে।

বনহুর তাজের পিঠে উকাবেগে ছুটল। চোখ দুটি দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। নুরীকে নিয়ে হাংলু পালিয়েছে, এতবড় সাহস তার! বনহুর দাঁতে অধর চেপে অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করে। এইবুঝি সে প্রথম তাজের পিঠে কষাঘাত করল।

তাজ বুঝতে পারে তার মুনিব আজ প্রকৃতিস্থ নয়। কাজেই নিজের গতি আরও বাড়িয়ে দেয়, সে।

রাত্রির নিচ্ছিদ্র অন্ধকার ভেদ করে তাজ ছুটে চলেছে। পূর্বের অশ্ব-পদশব্দ অতি ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

বনহুর বারবার তাজের পেটে পা দিয়ে আঘাত করতে লাগল। জোরে, আরও জোরে ছুটতে লাগল তাজ।

.

হাংলু নূরীকে এঁটে ধরেছিল।

নূরী যতই হাংলুর হাত থেকে নিজকে বাঁচিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল ততই হাংলুর বলিষ্ঠ হাতখানা তার দেহে সাঁড়াশীর মত বসে যাচ্ছিল। প্রাণফাটা চিৎকার করে মাঝে মাঝে ডাকছিল– হুর–হুর–

নূরীর চিৎকারে গহন বনের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ছিল। বনের পশু-পক্ষী পর্যন্ত সচকিত হয়ে উঠেছিল। নূরীকে নিয়ে হাংলু একটা প্রান্তরে এসে পড়ে।

চারদিক ধু ধু মাঠ। কোথাও আগাছা বা ঝোঁপঝাড়ের চিহ্ন নেই। নূরীকে চেপে ধরে হাংলু অশ্ব চালনা করছে। সরীসৃপের যত সরু একটা রাস্তা আঁকাবাঁকা হয়ে চলে গেছে দূরে। সে সরু পথ ধরে হাংলু অশ্ব চালাচ্ছিল।

বনহুরের অশ্ব কিছুক্ষণের মধ্যেই হাংলুর অশ্বের নিকটবর্তী হল। যদিও বনভুমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, প্রান্তরের মধ্যে এসে অন্ধকারটা বেশ অনেকখানি হালকা হয়ে এসেছে। বনহুর দেখতে পেল, অন্ধকারের প্রান্তরের বুক চিরে একটা অশ্ব দ্রুত সামনে এগোচ্ছে।

বনহুর বুঝতে পারল, এটাই বাংলুর অশ্ব এবং অশ্বপৃষ্ঠে হাংলুর কঠিন বাহু বন্ধনের মধ্যে রয়েছে নূরী। নইলে বনহুরের রিভলভার এতক্ষণে গর্জন করে উঠত।

বনহুরের অশ্ব-পদশব্দও হাংলুর কানে পৌঁছে ছিল। একবার মাত্র পেছনে তাকিয়ে দেখেছিল সে। তারপর প্রাণপণে অশ্ব চালনা করতে লাগল। মরিয়া হয়ে ছুটেছে সে।

বনহুরের অশ্বও উল্কাবেগে ছুটে আসছে তার দিকে। সেকি অদ্ভুত গতি তাজের।

হাংলু প্রাণ ভয়ে অশ্বচালনা করছে। বনহুর তাকে ক্ষমা করবে না। নূরীকে চুরি করার অপরাধে তাকে গুলী করে হত্যা করবে।

বনহুর হিংস্র জন্তুর ন্যায় ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটছে। এই মুহূর্তে হাংলুকে সে কুকুরের মত গুলী করে হত্যা করবে।

তীর বেগে ছুটে আসছে বনহুর। নিঃশ্বাস তার দ্রুত বইছে। মাংসপেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠছে। নিকটে অতি নিকটে এসে পড়েছে বনহুর।

বনহুর তাজকে নিয়ে হাংলুর অশ্বের পাশে পৌঁছে গেল, এক ঝট্‌কায় হাংলুকে টেনে মাটিতে ফেলে দিল।

হাংলু পড়ে যেতেই নূরী বনহুরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বনহুর নূরীকে নিবিড় করে কাছে টেনে নিল। তারপর দাঁতে দাঁত পিষে তাকাল হাংলুর দিকে।

বাংলুর মুখমণ্ডল তখন বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল সে। এতক্ষণ হাংলুর মধ্যে যে একটা হিংস্র ভাব জেগেছিল মুহূর্তে তা অদৃশ্য হল। কণ্ঠতালু শুকিয়ে এলো। হাতজোড় করে দাঁড়াল সে।

বনহুর নূরীকে সরিয়ে দিয়ে কঠিন পদক্ষেপে এগিয়ে গেল। হাংলুর দিকে– শয়তান!

ভয়কম্পিত কণ্ঠে বলে ওঠে হাংলু– মাফ করুন সর্দার।

দাঁতে দাঁত পিষলো বনহুর। তারপর রিভলভার উঁচু করে ধরল, পরমুহূর্তেই বনহুরের রিভলভার গর্জন করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে হাংলুর রক্তাক্ত দেহ গড়িয়ে পড়ল প্রান্তরের মধ্যে।

নূরী ছুটে এসে বনহুরের হাত চেপে ধরল–একি করলে হুর।

বনহুর কোন জবাব না দিয়ে বলল–চলো নূরী।

নূরীকে নিজের অশ্বপিঠে চাপিয়ে নিজেও উঠে বসল। ফিরে চলল এবার তারা আস্তানার দিকে।

পেছনে প্রান্তরের মধ্যে পড়ে রইল হাংলুর মৃতদেহ। পাশে দাঁড়িয়ে হাংলুর অশ্ব।

প্রান্তর ছাড়িয়ে এবার বনহুর আর নূরী তাজের পিঠে গহন বনের মধ্যে প্রবেশ করল।

নূরীর মনে আজ অফুরন্ত আনন্দ!

হুর যদি তাকে ভালই না বাসবে, তবে তার জন্য এত উদ্বিগ্ন হবে কেন? তাকে বাঁচানোর জন্য বনহুরের সেকি প্রাণঢালা প্রচেষ্টা।

নূরী নিজেকে বিলিয়ে দিল বনহুরের মধ্যে।

.

শহরের বিশিষ্ট নাগরিক বণিক ভগবৎ সিং তার রাজ প্রাসাদ সমতুল্য বাড়িতে আজ একটা পার্টি দিচ্ছে। সম্প্রতি তিনি বাণিজ্যস্থল থেকে দেশে ফিরেছেন। শহরের গণ্যমান্য সকলকেই ভগবৎ সিং পার্টিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তার কাছে হিন্দু-মুসলমান কোন ভেদাভেদ নেই। সবাই এ পার্টিতে যোগ দেবে।

ভগবৎ সিং পুলিশ অফিসারগণকেও এ পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেছেন? মিঃ হারুন, মিঃ হোসেন, এমন কি মিঃ জাফরীও আসবেন এ পার্টিতে। মিঃ শঙ্কর রাও এবং মিঃ আলমকেও দাওয়াত করেছেন তিনি।

খানবাহাদুর হামিদ খান, রায় বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন, ডাক্তার জয়ন্ত সেন, এমন কি চৌধুরী সাহেব পর্যন্ত বাদ পড়েন নি। সন্ধ্যা আটটার পর পার্টি শুরু হবে।

ভগবৎ সিং বিকেলে আর একবার পুলিশ অফিসে গিয়ে মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেনকে নিয়ে মিঃ জাফরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি নিশ্চয়ই যাবেন বলে কথা দিলেন তাকে।

সন্ধ্যার পর থেকেই আমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণের আগমন শুরু হল। বিরাট হলঘরটার মধ্যে বসবার আয়োজন করা হয়েছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ভদ্রমণ্ডলীতে হলঘর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। নানারকম হাসি-গল্পতে ভরে উঠল চারদিক। এখনও পুলিশ অফিসারগণ আসেন নি।

মিঃ চৌধুরী এসেছেন– খান বাহাদুর, রায় বাহাদুর কেউ বাদ যায়নি, সবাই এসে উপস্থিত হয়েছেন। এমন সময় মিঃ জাফরী অন্যান্য অফিসারের সঙ্গে ভগবৎ সিং অভ্যর্থনা জানিয়ে তাদের বসালেন।

কয়েকজন বিশিষ্ট মহিলা অতিথিও এসেছেন এ পার্টিতে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই টেবিলে খাবার দেওয়া হল। নানারকম খাদ্য-সম্ভারে ভরে উঠল খাবার টেবিল। মিঃ জাফরী আজ ভগবৎ সিং-এর অতিথি, এটা কম কথা নয়।

খাওয়ার পর্ব প্রায় শেষ হবার পথে, এমন সময় চৌধুরী সাহেব অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন মেঝেতে।

মুহূর্তে কক্ষে আলোড়ন শুরু হল। ভগবৎ সিং ছুটে এলেন ওপাশ থেকে। তিনি অতিথিগণের খাওয়া দাওয়ার তদারক করছিলেন। চৌধুরী সাহেব মেঝেতে পড়ে যেতেই মিঃ ভগবৎ সিং চৌধুরী সাহেবের মাথাটা তুলে নিলেন কোলে।

মিঃ জাফরী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসারও এসে দাঁড়ালেন চৌধুরী সাহেবের চারপাশে।

ডাক্তার জয়ন্ত সেন চৌধুরী সাহেবের পাশেই বসে খাচ্ছিলেন। তিনি হাতখানা তাড়াহুড়ো করে পরিষ্কার করে নিয়ে চৌধুরী সাহেবের পাশে বসে পড়লেন। চৌধুরী সাহেবের হাতখানা হাতে তুলে নিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করতে লাগলেন।

মিঃ আলম একবার ডাক্তার জয়ন্ত সেনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন। চৌধুরী সাহেবের মুখ দিয়ে তখন ফেনাযুক্ত লালা গড়িয়ে পড়ছে।

মিঃ হারুন ঝুঁকে পড়ে বললেন– একি হল? হঠাৎ চৌধুরী সাহেবের হল কি!

ভগবৎ সিং তো হায় হায় করতে শুরু করলেন। তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে ডাক্তার জয়ন্ত সেনকে লক্ষ্য করে বলেন– ডাক্তার বাবু, দেখুন। আপনি একটু ভাল করে দেখুন ভদ্রলোকের হল কি!

মিঃ আলমের মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে পড়েছে, কঠিন কণ্ঠে বলেন– চৌধুরী সাহেবকে বিষ পান করানো হয়েছে।

অদ্ভুদ শব্দ করে উঠলেন মিঃ হারুন– বিষ!

মিঃ হোসেন বললেন– দেখছেন না চৌধুরী সাহেবের মুখ দিয়ে কেমন ফেনাযুক্ত লালা গড়িয়ে পড়ছে। বিষ ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু এ বিষ তার খাবারে কেমন করে এলো। কথাটা বলেন মিঃ শঙ্কর রাও।

মিঃ জাফরী কটমট করে তাকালেন ভগবৎ সিং-এর দিকে। তারপর গর্জন করে উঠলেন সিং বাহাদুর, আপনার বাড়িতে খাবার খেতে এসে চৌধুরী সাহেবের এ অবস্থা। কাজেই এজন্য আমি আপনাকে দোষী সাবাস্ত করছি।

ডাক্তার জয়ন্ত সেন বললেন– না না, উনার কোন দোষ নেই। চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে একই খাবার আমরা কয়েকজন মিলে এক টেবিলে খাচ্ছিলাম। খাবারে বিষ মেশানো থাকলে আমাদের কয়েকজনের অবস্থা এতক্ষণ চৌধুরী সাহেবের মতই হত।

তাহলে চৌধুরী সাহেবের খাবারে বিষ এলো কোথা থেকে।

পুনরায় মিঃ জাফরী হুঙ্কার ছাড়লেন।

সমস্ত হলঘরে একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। কার মুখে কথা সরছে না। হতভম্বের মত তাকাচ্ছেন পুলিশ অফিসারদের মুখের দিকে।

শেষ পর্যন্ত সবাই একবাক্যে বললেন ভগবৎ সিং চৌধুরী সাহেবকে বিষ প্রয়োগের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। তিনি এসবের কিছুই জানেন না।

এদিকে কয়েকজন ভদ্রলোক ডাক্তার ডাকতে ছুটলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ডাক্তার এসে উপস্থিত হলেন। চৌধুরী তখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।

ডাক্তারগণ প্রাণপণে চৌধুরী সাহেবকে আরোগ্য করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু সকল আশা বিফল হল। ডাক্তারদের প্রাণপণ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় ভরে উঠল। চৌধুরী সাহেব মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

সবাই যখন চৌধুরী সাহেবের লাশ ঘিরে ধরে নানারকম আলোচনা করছেন, তখন সকলের অলক্ষ্যে মিঃ আলম বেরিয়ে গেলেন কক্ষ থেকে।

খবর পেয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে চৌধুরী বাড়ি থেকে ছুটে এলেন সরকার সাহেব এবং মরিয়ম বেগম। মনিরাও এলো তাদের সঙ্গে।

কিছুক্ষণ পূর্বে যে কক্ষে একটা আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল, এক্ষণে সে কক্ষে কান্নার রোল উঠল। মরিয়ম বেগম স্বামীর বুকে আছাড় খেয়ে পড়লেন।

মনিরা তো মামুজানের মুখে-বুকে হাত বুলিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলো। পিতামাতাকে হারানোর পর এই মামা-মামীই ছিল তার সম্বল। মামাকে হারিয়ে মনিরা আজ চারদিকে অন্ধকার দেখতে লাগল।

বৃদ্ধ সরকার সাহেব এ দৃশ্য সহ্য করতে পারছিলেন না।

তিনি চৌধুরী সাহেবের শিহরে দাঁড়িয়ে রুমালে চোখ ঢেকে ছোট্ট বালকের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

সরকার সাহেব আজ ত্রিশ বছর পর্যন্ত চৌধুরী বাড়িতে হিসাব নিকাশের কাজ করে আসছেন। চৌধুরী সাহেবের অত্যন্ত বিশ্বাসী লোক তিনি। সরকার সাহেবই চৌধুরীবাড়ির সর্বক্ষণ দেখাশোনা করতেন। এমনকি বাজারের হিসাবটাও ছিল সরকার সাহেবের হাতে। চৌধুরী সাহেব ভুলেও কোনদিন সরকার সাহেবের নিকট হতে কোনো হিসাব-নিকাশ নিতেন না। তার উপরেই সংসারের সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন চৌধুরী সাহেব।

সরকার সাহেবও চৌধুরী সাহেবকে নিজ বড় ভাইয়ের মতই মনে করতেন। চৌধুরী সাহেবের অজ্ঞাতে তিনি কোনদিন একটা পয়সাও নিজের জন্য ব্যয় করতেন না।

এসব কারণেই উভয়ের মধ্যে ছিল একটা নিগুঢ় ভ্রাতৃসম্বন্ধ। চৌধুরী সাহেবের মৃত্যু সরকার সাহেবের অস্থিপাঁজর যেন চূর্ণ করে দিয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত মিঃ জাফরী লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন এবং যতক্ষণ আসল দোষী ধরা না পড়ে ততক্ষণ ভগবৎ সিং এর উপর কড়া নজর রাখার নির্দেশ দিলেন।

.

শোকাতুরা মরিয়ম বেগম এবং মনিরা অসহায়ের মত আকুল হয়ে কাঁদছেন। আজ তারা বড়ই নিরুপায়? একমাত্র তাদের সম্বল ছিলেন চৌধুরী সাহেব। তিনিই আজ চলে গেছেন–শুধু গেছেন নয়, চিরতরে বিদায় নিয়ে গেছেন। আর কোনদিন ফিরে আসবেন না।

মরিয়ম বেগম আর মনিরা চৌধুরী সাহেবের শোকে এতই কাতর হয়ে পড়েন যে, সরকার সাহেব এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সান্ত্বনা দিয়েও তাদের দুজনকে এতটুকুও শান্ত পর্যন্ত করতে পারলেন না।

দূর-দূরান্ত থেকে বহু লোকজন এলেন চৌধুরী সাহেবের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে। সবাই চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুশোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। কারও চোখ শুষ্ক রইল না। চৌধুরী সাহেবের এ আকস্মিক মৃত্যুতে গোটা শহরে একটা শোকের ছায়া পড়ল লোকের মুখে মুখে কাগজে কাগজে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল কথাটা।

চৌধুরী সাহেবের লাশ যখন জানাযার জন্য বাড়ির সম্মুখস্থ বাগানে রাখা হলো, তখন অসংখ্য লোকের মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে আর একজন এসে দাঁড়াল গোলাপঝাড়ের পাশে চৌধুরী সাহেবের শিয়রে! নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে চলেছিল সে।

জানাযা শেষ হয়ে যায়। কখন যে চৌধুরী সাহেবের লাশ নিয়ে চলে গেছে খেয়ালও নেই ওর। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পায়, কঠিন পাথরের মত শক্ত হয়ে ওঠে তার মুখমন্ডল! দাঁতে অধর দংশন করে সে। দক্ষিণ হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ হয়– চৌধুরী সাহেবের হত্যাকারীকে খুঁজে বের করে এর উপযুক্ত সাজা সে নিজ হাতে দেবে।

যেমন সকলের অলক্ষ্যে একপাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সে, তেমনি সকলের অজ্ঞাতে বাগান থেকে বেরিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য হল। শুধু একটা তৃপ্ত নিঃশ্বাস ঘুরপাক খেয়ে ঘুরতে লাগল বাগানটার মধ্যে।

গভীর রাত।

জনমুখর নগরী সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে। যানবাহন চলাচল একরকম প্রায় থেমে এসেছে। মাঝে মধ্যে দু'একটা মোটরকার এদিক থেকে সেদিকে ছুটে চলে যাচ্ছে।

রাস্তার দু'পাশে গাড়িগুলো নিঝুম পুরীর মত ঝিমিয়ে পড়েছে। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। দু'একজন ক্কচিৎ পথ চলছে।

এমন সময় একটি শব্দবিহীন মোটরকার এসে থামল চৌধুরী বাড়ির গেটে।

পাহারাদার বারান্দায় বসে বসে ঝিমুচ্ছিল। গাড়ির শব্দ পেয়ে পাহারাদার সজাগ হয়ে উঠল, ছুটে এলো সে। এতরাতে গাড়ি এলো কোথা হতে।

দারোয়ান কিছু জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই গাড়ির চালক একটি কার্ড বের করে দারোয়ানের হাতে দিয়ে বলল–বিবি সাহেবকে ডেকে দাও।

তিনি এখন ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ঘুমাননি, তুমি যাও।

দারোয়ান বলল– তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাছাড়া তিনি এত রাতে কারও সঙ্গে দেখা করেন। দারোয়ান জোর গলায় কথাটা বলে উঠে।

যাবে না তুমি?

না।

তবে গেট খুলে দাও।

হুকুম নেই। গেট আমি খুলব না।

বেশ। চালক ফিরে যাবার জন্য পা বাড়ায় গাড়ির দিকে। দারোয়ানও ফিরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়ায় অমনি চালক পেছন থেকে ওকে জাপটে ধরে, তারপর মুখের মধ্যে একটা রুমাল খুঁজে দিয়ে টেনে তুলে ফেলে গাড়ির মধ্যে।

দারোয়ানের হাতে ছিল গুলীভরা বন্দুক, তবু সে একটু নড়তে পারল না বা টু শব্দ করতে সক্ষম হলো না। চালক ওকে একটা দড়ি দিয়ে মজবুত করে বেঁধে

গাড়ির মেঝেতে শুইয়ে রাখল, তারপর দারোয়ানের পকেট থেকে গেটের চাবি নিয়ে গেট খুলে ফেলল।

গাড়ি-বারান্দায়, গাড়ি রেখে চালক নেমে পড়লো। নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো উপরে। পাহারাদার এবং চাকর-বাকর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

শোকাতুরা মরিয়ম বেগম কেঁদে কেঁদে এখন মৃতের ন্যায় অসাড় হয়ে পড়েছেন। শিয়রে বসে। মনিরা তখনও জেগে নীরবে চোখের পানি ফেলেছে। কতদিনের কত কথা আর কত স্মৃতি মনে উদয় হচ্ছে। পিতৃসমতুল্য চৌধুরী সাহেবের মৃত্যু তাঁর সমস্ত হৃদয়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। সংসারে আপনজন বলতে তার ঐ মামুজান আর মামীমা ছাড়া আর কেউ নেই।

যতই মনিরা চৌধুরী সাহেবের কথা স্মরণ করছে, ততই ব্যথায় মুষড়ে পড়ছে। দু'চোখে পানি আজ বাঁধভাঙা স্রোতের মত হু হু করে নেমে আসছে। অথৈ সাগরে ভেসে চলেছে ওরা। মনিরা মামীমার চুলে হাত বুলিয়ে নীরবে কাঁদছিল।

হঠাৎ কাঁধে একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করতেই চমকে মুখ তুলল মনিরা। এতো দুঃখ আর ব্যথার মধ্যেও চোখ দুটো তার উজ্জল দীপ্ত হয়ে উঠল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল– এসেছ। এতোক্ষণে এসেছ তুমি...বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো মনিরার কণ্ঠ।

দস্যু বনহুররের চোখে আজ অশ্রু। একটু পূর্বে বনহুরই শব্দবিহীন গাড়ি নিয়ে চৌধুরী বাড়িতে প্রবেশ করেছিল।

মনিরার কথায় কোন জবাব দিতে পারে না, বনহুর। শুধু ঠোঁট দুখানা একটু কেঁপে উঠে।

মনিরা ডাকে–মামীমা উঠো, দেখ কে এসেছে!

মরিয়ম বেগম তন্দ্রাচ্ছন্নভাব মুহূর্তে ছুটে যায়। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকান তিনি।

মনিরকে এখন চিনতে তাঁর দেরী হয় না। কারণ, ইতোপূর্বে মাতা-পুত্রের মিলন ঘটেছিল।

মরিয়ম বেগম পুত্রের বুকে মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠেন। উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন– ওরে আজ তুই এলি? তোর আব্বা যে আর এ দুনিয়ায় নেই। কাকে দেখতে এলি তুই! ওরে কাকে দেখতে এলি......

অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠে বনহুর–আম্মা!

মনির, তোর আব্বার তুই যে ছিলি নয়নের মনি। হৃদয়ের ধন...

আম্মা আমি পারলাম না তার একটু সেবা করতে, আমার জন্য তিনি জীবনে শুধু অশান্তিই ভোগ করে গেলেন। আমি তাঁর কিছু করতে পারলাম না আম্মা, আব্বার আত্মা আমাকে অভিসম্পাত করবে চিরদিন, আমি সে অভিসম্পাত আগুনে জ্বলেপুড়ে মরবো.......

না না, তোকে তিনি অভিসম্পাত করতে পারবেন না। তিনি যে তোকে বড় ভালবাসতেন! ওরে, তিনি যে তোকে বড় ভালবাসতেন!

আম্মা!

আমার! বাবা মনির–

ঠিক সেই মুহূর্তে সিঁড়িতে দ্রুত জুতোর শব্দ শুনা যায়।

বনহুর হঠাৎ চমকে উঠে।

মনিরাও সচকিত হয়ে বলে উঠে–এভোরাতে কারা এলো?

দরজার পাশে গিয়ে সিঁড়ির দিকে উঁকি দেয়, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে বলে– মনির, পুলিশ।

মরিয়ম বেগম হতভম্বের মত বলেন–পুলিশ!

বনহুর একবার মা আর মনিরার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পিছনের জানালা পথে পাইপ বেয়ে নেমে যায় নিচে।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করেন মিঃ হারুন ও রায়, সঙ্গে মিঃ জাফরী। পিছনে কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ।

মিঃ হারুন বিনীত কণ্ঠে বলে উঠেন– মাফ করবেন, যদিও আপনারা আজ অত্যন্ত শোকাতুরা তবু আপনাদের বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি। এখানে আপনার পুত্র দস্যু বনহুর এসেছে। বলুন সে কোথায়?

জবাব দেয় মনিরা–এসেছিল, কিন্তু এখন নেই।

মিস্ মনিরা অযথা মিথ্যা বলে…

না, আমি মিথ্যা বলিনি। … আপনার আমাদের সমস্ত বাড়ি় খুঁজে দেখতে পারেন।

মিঃ জাফরী পুলিশদের লক্ষ্য করে বলেন–তোমরা খুঁজে দেখো। তারপর মরিয়ম বেগমকে লক্ষ্য করে বলেন–দেখুন মিসেস চৌধুরী, আপনি আজ শোকাতুরা, আপনাকে বিরক্ত করা আমাদের মোটেই উচিত নয়। কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে বিরক্ত করতে হচ্ছে। আপনার স্বামী এবং আপনি অতি মহান এবং মহঞ্জন, এ কথা আমি শুনেছি, কিন্তু আপনাদের পুত্র দস্যু বনহুর অতি জঘন্য….।

না, সে জঘন্য নয়, ফুলের মত নিষ্পাপ। মরিয়ম বেগম দ্বীপ্ত কণ্ঠে কথাটা বলেন?

মিঃ জাফরী হেসে উঠেন– মায়ের কাছে সন্তান ফুলের মতোই নিষ্পাপ হয়। মিসেস্ চৌধুরী–দস্যু বনহুর শুধু ডাকু নয়, সে নর হত্যাকারী।

না না, আমার মনির নরহত্যা করতে পারে না, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। না না, কিছুতেই না–

অসম্ভব! ইন্সপেক্টার সাহেব, আপনি দস্যু বনহুরের নাম শুনেছেন। তার কার্যকলাপ সম্বন্ধে পুলিশের ডায়েরী থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু দস্যু বনহুরের অপর দিকটা কি তা হয়ত এখনও আপনার জানা হয় নি। কিন্তু সে হতে পারে–নরহত্যাও সে করতে পারে, কিন্তু তাই বলে সে এতোখানি হীন নয় যে, তার পিতাকে হত্যা করে তার ঐশ্বর্য হস্তগত করবে।

মিস্ মনিরা আপনি জানেন–চোর ডাকু কোনদিন সৎ বা মহৎ হতে পারে না। অর্থের লোভে তারা সব পারে।

না, সে লোভী নয়। পিতার ঐশ্বর্য তো দূরের কথা, সে কারও ঐশ্বর্য চায় না।

হেসে উঠেন মিঃ হারুন–তাহলে সে দস্যুবৃত্তি করে কেন?

সেটা তার নেশা পেশা নয়। অর্থের লোভে বনহুর কোন নরহত্যা করে না।

কিন্তু তার ভাল দিকটা একবারও ভেবে দেখবেন না? ইন্সপেক্টর সাহেব, আপনি এরি মধ্যে ভুলে গেছেন দেশবাসীর প্রতি তার কত বড় আত্মত্যাগ! কিছুদিন পূর্বে বিদেশীর কবলে দেশ যখন মুহুর্মুহ আশঙ্কায় আশঙ্কিত, তখন দস্যু বনহুর কি আপনাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো না?

ছিলো! এ দেশ রক্ষা না হলে তারও যে বিপদ ছিলো এ– ও ঠিক।

না, তার বিপদ এখনও যেমন, ঠিক তখনও তেমন থাকত। শুধু মাতৃভূমির আকুল আহ্বানে সে সাড়া না দিয়ে পারেনি। ছুটে গিয়েছিল সে রণাঙ্গনে প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়ে, সে দেশ আর দেশবাসীকে করেছিল রক্ষা। আজ প্রতিটি দেশবাসীর কর্তব্য দস্যু বনহুরের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা।

মিঃ জাফরী গর্জন করে উঠেন–মিঃ হারুন, একেও এরেস্ট করা দরকার। কেন এতোদিন, আপনারা একে মুক্ত করে রেখেছেন?

মিঃ হারুন মুখ কাঁচুমাচু করে বলেন– উত্তেজনার বশে এসব বলছে স্যার। আসলে এদের কোন দোষ নেই। চৌধুরী সাহেব অতি মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। ওনার স্ত্রী মিসেস চৌধুরীও তেমনি অতি ভদ্র এবং নম্র। এ মেয়েটি অবশ্য একটু উগ্র স্বভাব, কিন্তু আসলে কিছু নয়। আমাদের অন্যভাবে এসব অনুসন্ধান নিতে হবে..।

ওদিকে পুলিশগণ সমস্ত কক্ষ তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফিরে এলোনা স্যার, কোথাও কেউ। নেই।

মিঃ হারুন নিজেও একবার খুঁজে দেখলেন, কিন্তু তাদের সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হল।

মিঃ জাফরী কিন্তু মনে মনে ভয়ঙ্কর রেগে গেলেন, গর্জন করে বললেন– অযথা আপনি না জেনে এভাবে এলেন কেন?

স্যার, দস্যু বনহুর যে এখানে এসেছিল এ কথা সত্য। কারণ গেটের বাইরে যে গাড়িখানা আমরা দেখলাম, সেটাই দস্যু বনহুরের গাড়ি এবং বন্দী দারোয়ান যা বলল তাতেও ঐ রকমই। বুঝা যায়।

মিঃ জাফরী এবং মিঃ হারুন ও পুলিশগণ মিলে যখন ফিরে চললেন, তখন ভোরের আলোতে পূর্ব আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে।

.

পুলিশ অফিসে পাশাপাশি বসে আলাপ করছিলেন মিঃ জাফরী, মিঃ হারুন এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার।

মিঃ হারুন বলেন–স্যার, দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের পূর্বে আমাদের কর্তব্য চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্য উদঘাটন করা।

হ্যাঁ, আমার ইচ্ছাও তাই। আপনি এ ব্যাপারে জোর তদন্ত শুরু করুন। কেসটা অত্যন্ত জটিল এবং ঘোরালো বলে মনে হচ্ছে।

ইয়েস স্যার, চৌধুরী সাহেবের হত্যার পিছনে একটা গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে।

সে রহস্যই উদঘাটন করতে হবে। কথাটা বলতে বলতে কক্ষে প্রবেশ করেন ভগবৎ সিং।

মিঃ হারুন ভগবৎ সিংকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। যতক্ষণ না আসল খুনী ধরা পড়ছে ততক্ষণ তো কারো উপরে অসৎ ব্যবহার করা চলে না।

হ্যাণ্ডশেক করার জন্য মিঃ জাফরীর দিকে হাত বাড়ালেন ভগবৎ সিং।

মিঃ জাফরী হাত তুলে একটু আদাব জানালেন মাত্র।

ভগবৎ সিং আসন গ্রহণ করে বলেন–দেখুন ইনসপেক্টর সাহেব, কাল থেকে আমার মনে এতটুকু শান্তি নেই। কারণ, চৌধুরী সাহেব আমার বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেছেন। একটু থেমে পুনরায় বলেন–যতক্ষণ না এ হত্যারহস্য প্রকাশ না পাবে ততক্ষণ আমার এ অশান্তি যাবে না।

মিঃ হারুনই জবাব দেন–আমরা হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা নিচ্ছি।

মাথা চুলকে বলেন ভগবৎ সিং–ভয় হয় আমার ঘাড়ে না আবার কোন দোষ চেপে বসে।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সিং বাহাদুর। আমরা নির্দোষীর ঘাড়ে কোন সময় দোষ চাপাবো না। মিঃ হারুন মৃদু হেসে কথাটা বলেন।

মিঃ জাফরী গভীর কণ্ঠে বলে উঠেন–আপনার বাড়িতে যখন হত্যাকাণ্ডটা ঘটেছে, তখন। আপনাকে একটু কষ্ট ভোগ করতে হবে বৈকি। তাছাড়া যতক্ষণ আসল হত্যাকারী আবিস্কার না হয়েছে ততক্ষণ আপনি সম্পূর্ণ নির্দোষ হতে পারছেন না।

তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু সত্যিকার বলছি ইন্সপেক্টর সাহেব, আমি এ হত্যার ব্যাপারে একেবারে কিছুই জানি না।

মিঃ হারুন বলে উঠলেন–না না, আপনি তেমন লোক নন। আপনার মহৎ ব্যবহারে আমরা অত্যন্ত খুশি হয়েছি।

হেঁ হেঁ, আপনারাই তো আমার আপন জন। আমার ঘরের খবর পর্যন্ত আপনারা জানেন।

মিঃ হারুন মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললেন– স্যার, এনার কথা একেবারে সত্য। ইনি আজীবন অবিবাহিত। বাড়িতে কোন স্ত্রীলোক নেই। তাছাড়া ইনি বাইরের লোকজনের সঙ্গে মেশেনও কম। দু'চারজন চাকর-বাকর ছাড়া....

এসব আমি এখন শুনতে চাইনি মিঃ হারুন। আচ্ছা সিং বাহাদুর আপনি এখন আসুন। গম্ভীর গলায় বলেন মিঃ জাফরী।

মিঃ হারুন একটু বিব্রত বোধ করলেন, কিন্তু তাঁর উপরওয়ালার কথায় তো কোনো প্রতিবাদ করতে পারেন না। কাজেই নীরব রইলেন।

ভগবৎ সিং উঠে দাঁড়ালেন–আমি তাহলে চলি। নমস্কার। বেরিয়ে যান ভগবৎ সিং।

ভগবৎ সিং বেরিয়ে যেতে মিঃ জাফরী বলেন–দেখুন মিঃ হারুন, আপনি তাকে যতখানি মহৎ এবং ভদ্র বলে মনে করছেন, ঠিক ততখানি নাও হতে পারে। একটু থেমে পুনরায় বলেন– ভগবৎ সিং এর উপর কড়া নজর রাখবেন। লোকটার ব্যবহার যদিও মন্দ নয়, তবু আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়। হয়তো আমার এ সন্দেহ মনের এক ভ্রম, তাও হতে পারে। যাক, এবার শুনুন, এখন আমরা কিভাবে কাজে নামবো এ নিয়ে একটু আলোচনা হওয়া দরকার।

ইয়েস স্যার। কিন্তু আমাদের এ আলোচনার সময় মিঃ রায় এবং মিঃ আলমের সেখানে উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই। সন্ধ্যার পূর্বে আমরা অফিস-রুমে আলোচনা বৈঠকে বসব। আপনি মিঃ শঙ্কর রাও এবং আলমকে জানিয়ে দিন।

আচ্ছা স্যার, দিচ্ছি!

তখনকার মত মিঃ জাফরী উঠে পড়েন।

মিঃ হারুন এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন।

মিঃ হারুন এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট পুলিশ অফিসার মিঃ জাফরীকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেন।

ডাকবাংলায় মিঃ জাফরীর অফিস রুম।

চৌধুরী সাহেবের হত্যা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চলছিল। মিঃ জাফরী, মিঃ হারুন এবং আরও দু'জন পুলিশ অফিসার উপস্থিত ছিলেন সেখানে। আরও ছিলেন মিঃ শঙ্কর রাও এবং মিঃ আলম।

আলোচনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এ কেসের দায়িত্বভার মিঃ জাফরী নিজে গ্রহণ করেছেন। সঙ্গে থাকবেন মিঃ হারুনও আরও দু'জন পুলিশ অফিসার। আর রয়েছেন মিঃ রাও এবং মিঃ আলম, এরা চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশকে সহায়তা করবেন।

মিঃ আলম অবশ্য পুলিশ ডিটেকটি নন। তিনি সখের গোয়েন্দা। সখ করে তিনি এসেছেন এ কাজে। ধনবান জাকারিয়া সাহেবের একমাত্র সন্তান তিনি।

শহরে বিরাট বাড়ি-গাড়ি সব আছে তাঁর। কাজেই এসব ব্যাপারে তার কোনই অসুবিধা হবে না।

সবাই যখন এই হত্যারহস্য নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলেন মিঃ আলম একপাশে নিশ্চপ বসে বসে তাদের আলোচনা শুনে যাচ্ছিলেন। সকলের মুখোভার প্রসন্ন হলেও মিঃ আলমের মুখমণ্ডল বেশ গম্ভীর এবং ভাবাপন্ন। চৌধুরী সাহেবের হত্যা-ব্যাপার নিয়েই তিনি গম্ভীরভাবে চিন্তা করছিলেন।

সেদিনের মত আলোচনা শেষ হয়।

বিদায় গ্রহণ করেন মিঃ আলম এবং শঙ্কর রাও।

মিঃ হারুন এবং পুলিশ অফিসার দু'জনও সেদিনের মত মিঃ জাফরীর নিকটে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্য নিয়ে জোর তদন্ত শুরু হল। মিঃ জাফরী এবং মিঃ হারুন প্রকাশ্য অনুসন্ধান করে চালালেন। মিঃ শঙ্কর রাও আর মিঃ আলম গোপনে অনুসন্ধান করে চললেন।

সেদিন পার্টিতে চৌধুরী সাহেবের টেবিলে বসে কে কে খাচ্ছিলেন, এটা নিয়েও গভীরভাবে আলোচনা চলল। সেদিন তার টেবিলে ছিলেন মিঃ জাফরী, মিঃ হারুন, মিঃ শঙ্কর রাও, খান। বাহাদুর হালিম সাহেব, ডাঃ জয়ন্ত সেন এবং মিঃ আলম।

মিঃ জাফরীর ধারণা এ ক'জনার মধ্যে যে কোন একজন চৌধুরী সাহেবের খাবারে বিষ প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু কে সে ব্যক্তি এবং কি তার উদ্দেশ্য?

এ প্রশ্নের উত্তর কেউ খুঁজে পেল না।

পুলিশ মহলে যখন চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্য নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে তখন একদিন…

গভীর রাত!

ডাক্তার জয়ন্ত সেন নিজের কক্ষে শুয়ে ছটফট করছেন। মনে যেন এতটুকু শান্তি পাচ্ছেন না! একবার উঠছেন একবার বসছেন আবার দরজা খুলে ছাদে গিয়ে পায়চারি করছেন।

অন্ধকার রাত। খোলা ছাদে রেলিং-এর পাশে গিয়ে দাঁড়ান জয়ন্ত সেন। হঠাৎ পিঠে একটা ঠাণ্ডা শক্ত জিনিসের স্পর্শ অনুভব করলেন।

চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখতেই ডাক্তার সেনের মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয়ে এলো।

দেখলেন অন্ধকারে একটি ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার পিছনে–হাতে রিভলভার।

ছায়ামূর্তি চাপা কণ্ঠে গর্জে উঠল– চিৎকার কর না।

তুমি কে?

আমি যমদূত।

কি চাও তুমি আমার কাছে?

তোমার জীবন।

এ্যাঁ, কি বলছ? টাকা নেবে? যত টাকা চাও দেব।

ছায়ামূর্তি কঠিন কণ্ঠে গর্জে উঠে যম কোন দিন টাকার লোভী নয়। শয়তান, অনেক দিন পূর্বেই আমি তোমাকে খতম করতে পারতাম, কিন্তু করিনি– এটা তোমার বরাৎ। আজ আর তুমি আমার হাতে রক্ষা পাবে না।

কেন, কি করেছি আমি তোমার?

একজন মহৎ ব্যক্তিকে তুমি হত্যা করেছ।

না না আমি কাউকে হত্যা করিনি…

ছায়ামূর্তি জয়ন্ত সেনের গলায় চেপে ধরেন– তুমি চৌধুরী সাহেবের খাবারে বিষ দাওনি?

আমি– আমি নাতো। এসব তুমি কি বলছ?

ন্যাকামি করো না। শীঘ্র বল কোন সময় তুমি তার খাবারে বিষ দিয়েছিলে? সাবধান, মিথ্যা বল না।

ডাক্তার জয়ন্ত সেনের চোখ ছানাবড়া হয়। মুখমণ্ডল বিব্রর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠে। একবার ছায়ামূর্তির দক্ষিণ হস্তস্থিত রিভলভারের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে বলেন–আমার কোন দোষ নেই, ঐ-ঐ ভগবৎ সিং বিষ দেবার জন্য অনুরোধ করেছিল আমাকে।

তাই তুমি একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করলে? উঃ, এত বড় পাষণ্ড তুমি! পরক্ষণেই ছায়ামূর্তি ডাক্তার জয়ন্ত সেনকে ভূতলশায়ী করে টুটি টিপে ধরল।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। ডাক্তার সেনের কণ্ঠ দিয়ে একরকম গড় গড় শব্দ বেরিয়ে এলো। চোখ দুটো ভিমের মত গোলাকার হয়ে উঠল। জিভটা ঝুলে পড়ল এক পাশে। শরীরটা বার দুই ঝাঁকুনি দিয়ে নীরব হয়ে গেল।

ছায়ামূর্তি পাশে রাখা রিভলভারখানা হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে গেল নিচে।

হঠাৎ জয়ন্ত সেনের দারোয়ান ছায়ামূর্তিকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে উঠল– চোর, চোর! কিন্তু ছায়ামূর্তি তখন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়েছে।

.

রাত শেষ প্রহর।

গোটা রাত অনিদ্রার পর ভগবৎ সিং কেবলমাত্র চাদরটা চোখেমুখে টেনে নিয়ে সুখনিদ্রার আয়োজন করছিলেন। এমন সময় জানালার শার্সী খুলে কমধ্যে লাফিয়ে পড়ল পূর্বের সেই ছায়ামূর্তি।

ভগবৎ সিং বদ্ধ কক্ষে অকস্মাৎ শব্দ পেয়ে চাদর সরিয়ে বিছানায় উঠে বসেন। ততক্ষণে ছায়ামূর্তি তাঁর নিকটে পৌঁছে গেছে।

ভগবৎ সিং চিৎকার করবার পূর্বেই একটি সূতীক্ষ ধার ছোরা বের করে তার বুকে চেপে ধরে ছায়ামূর্তি, তারপর চাপা গর্জন করে উঠে– খবরদার! চেঁচাবে না।

ভগবৎ সিং একবার বক্ষসংলগ্ন ছোরাখানার ডগায় তাকিয়ে তাকান ছায়ামূর্তির মুখে। কঠিন ইস্পাতের মত শক্ত হয়ে উঠে তার মুখটা। বাম পাশের ঠোঁটখানা উপরের দাঁত দিয়ে চেপে ধরে বলেন– কে তুমি?

আজরাইল। তোমার জান নিতে এসেছি।

আমার জান নেবে তুমি? কেন, আমি তোমার কি অন্যায় করেছি?

যা করছে, অতি জঘন্য।

ভগবৎ সিং কোনোদিন কারো অন্যায় করেনি বা করে না।

বিড়াল তপসী সেজে সকলের চোখে ধুলো দিলেও আমার চোখে ধুলো দিতে পারনি। শয়তান। কেউ না চিনলেও আমি তোমায় চিনেছি। এবার আর তোমার নিস্তার নেই। তোমার জান আমি কবচ করে ছাড়বো।

কে– কে তুমি?,

এই মুহূর্তে আমি কে টের পাবে। চৌধুরী সাহেবকে হত্যার পরিণতি কি এখনই বুঝতে পারবে শয়তান।

চৌধুরী হত্যার পরিণতি… না না, চৌধুরী হত্যা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।

তুমি তাকে হত্যা করিয়েছ।

এ কথা তুমি কেমন করে জানলে?

সেদিনের পার্টিতে আমিও ছিলাম।

তুমি– তুমি ছিলে সেদিন আমার পার্টিতে….. কে তুমি?

ভগবৎ সিং– এর কথা শেষ হয় না, ছায়ামূর্তির হস্তস্থিত সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরাখানা সমূলে বিদ্ধ হয় ভগবৎ সিং এর বুকে।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে বিছানার উপরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন ভগবৎ সিং। দুগ্ধফেননিভ শুভ্র বিছানা মুহূর্তে লাল হয়ে উঠল।

ছায়ামূর্তি একটানে ভগবৎ সিং-এর বুক থেকে ছোরাখানা তুলে নিয়ে জানালাপথে অদৃশ্য হল।

ঠিক সেইক্ষণে ভগবৎ সিং-এর এক কর্মচারী ছুটে আসে সেখানে। সে দেখতে পায় একটি ছায়ামূর্তি অন্ধকারে মিশে গেল। বিছানায় তাকিয়ে চক্ষুস্থির, একটা তীব্র আর্তনাদ করে উঠল সে খুন—খুন–

পরদিন ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশমহলে সাড়া পড়ে গেলো গোটা শহরময় ছড়িয়ে পড়ল। কথাটা। এক রাতে জোড়া খুন। ডাক্তার জয়ন্ত সেনের অদ্ভুত মৃত্যু এবং বণিক ভগবৎ সিং এর রহস্যময় হত্যা– কিন্তু এ খুন করল কে?

০০৬. ছায়ামূর্তি

ছায়ামূর্তি – দস্যু বনহুর – রোমেনা আফাজ

পরদিন ভোর হবার সংগে সংগে পুলিশমহলে সাড়া পড়ে গেল। একরাতে জোড়া খুন। ডাক্তার জয়ন্ত সেনের অদ্ভুত মৃত্যু এবং বণিক ভগবৎ সিংয়ের রহস্যময় হত্যা গোটা শহরে একটা চঞ্চলতা দেখা দিল। আগের দিনই চৌধুরী সাহেবের অকস্মাৎ মৃত্যু শহরবাসীকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। করে তুলেছিল। পর পর দু'দিনে তিনটি খুন সবাইকে ভাবিয়ে তুলল।

মিঃ জাফরী নিজে গেলেন এই খুনের তদন্তে। সংগে মিঃ হারুন, মিঃ শঙ্কর রাও এবং মিঃ আলম রয়েছেন। আর রয়েছেন কয়েকজন পুলিশ।

ডাক্তার সেনের বাড়িতে পৌঁছতেই তাঁর পুত্র হেমন্ত সেন উদভ্রান্তের মত ছুটে এলেন, মিঃ হারুনকে তিনি চিনতেন, তাঁর হাত ধরে একেবারে কেঁদে পড়লেন আমার বাবার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করে উপযুক্ত শাস্তি দিন ইন্সপেক্টার সাহেব! শাস্তি দিন।

মিঃ হারুন সান্ত্বনার স্বরে বললেন আপনি শান্ত হোন মিঃ সেন, আপনার পিতার হত্যাকারীকে আমরা খুঁজে বের করবোই এবং তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে–

মিঃ জাফরী লাশ তদন্ত করে আশ্চর্য হলেন। খোলা ছাদে তাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি অবাক হলেন–গভীর রাতে ডাক্তার জয়ন্ত সেন ছাদে কেন এসেছিলেন? তাকে জোর করে এখানে আনা হয়েছিল না তিনি নিজেই এসেছিলেন?

ডাক্তার জয়ন্ত সেনের শোবার ঘর পরীক্ষা করে দেখলেন, ঘরের একটা জিনিসও এদিক-সেদিক হয় নি। এমনকি বিছানাটাও এলোমেলো হয় নি।

ডাক্তার জয়ন্ত সেনের হত্যাকারী যে শুধু তাঁকে হত্যা করতেই এসেছিল এটা সত্য। কেননা টাকা-পয়সা বা কোনো জিনিসপত্র চুরি যায় নি।

অনেকক্ষণ পরীক্ষা করেও পুলিশ অফিসারগণ এ হত্যারহস্যের কোনো কিনারায় পৌঁছতে সক্ষম হলেন না।

মিঃ জাফরী পরীক্ষাকার্য শেষ করে ডাক্তার জয়ন্ত সেনের হলঘরে গিয়ে বসলেন। তিনি হেমন্ত সেনকে লক্ষ্য করে বললেন–আমি আপনাদের বাড়ির সবাইকে কয়েকটা প্রশ্ন করব।

হেমন্ত সেন উত্তর দিলেন– করুন।

হেমন্ত সেনের বাড়িতে তেমন বেশি লোকজন ছিল না। ডাক্তার জয়ন্ত সেনের স্ত্রী অনেকদিন আগে মারা গেছেন। একমাত্র পুত্র হেমন্ত সেন, তার স্ত্রী নমিতা দেবী আর শিশু পুত্র কুন্তল। ড্রাইভার রজত এবং দারোয়ান গুরু সিং মোটামুটি এই নিয়ে ডাক্তার সেনের সংসার। আর ছিলেন ডাক্তার জয়ন্ত সেনের কম্পাউন্ডার নিমাই বাবু।

সবাইকে হলঘরে ডাকলেন হেমন্ত সেন।

মিঃ জাফরী নিজে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। প্রথমে তিনি হেমন্ত সেনকেই প্রশ্ন করলেন– আপনার বাবার হত্যা ব্যাপারে আপনি কতটুকু জানেন হেমন্তবাবু?

কিছুই না। আমার বাবার হত্যা ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।

কাল রাতে আপনার বাবা কখন শোবার ঘরে গিয়েছিলেন, বলতে পারেন নিশ্চয়ই?

স্যার। কারণ আমি কাল অনেক রাতে বাসায় ফিরেছি। কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?

আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে। আমি সেখান থেকে যখন ফিরে আসি তখন বাড়ির সবাই শুয়ে পড়েছিল কিন্তু আমি তখনও বাবার ঘরে আলো দেখেছি। আমার মনে হল বাবা, তখনও ঘুমোননি।

আপনি এরপর কতক্ষণ জেগেছিলেন?

বেশি সময় জাগতে পারিনি। কারণ আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফিরে সারা দিনের ক্লান্তিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ি।

রাতে কোন শব্দ পাননি? কোনোরকম গোঙানি বা আর্তচিৎকার?

না। তবে আমাদের দারোয়ান গুরু সিং ছাদের সিঁড়ি বেয়ে একটা ছায়ামূর্তিকে নেমে যেতে দেখেছে।

আচ্ছা, আপনার স্ত্রীকে আমি এবার প্রশ্ন করব।

বেশ, করুন।

আড়ালেই দাঁড়িয়েছিল নমিতা দেবী, এগিয়ে এলো।

মিঃ জাফরী তাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন– আপনার শ্বশুর ডাক্তার জয়ন্ত সেনের হত্যা সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন?

না। তার হত্যা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। তবে এটুকু জানি, আমার শ্বশুর গত দু'দিন গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তাকে সব সময় খুব উদ্বিগ্ন মনে হত। নমিতা দেবী স্বচ্ছ স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা কয়টি বলে গেল।

পুলিশ অফিসাররা নিশ্চুপ সব শুনে যাচ্ছিলেন। একপাশে মিঃ শঙ্কর রাও এবং মিঃ আলম বসে রয়েছেন।

নমিতা দেবীর কথায় মিঃ আলমের মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠল। চোখ দুটোও কেমন যেন ধক করে জ্বলে ওঠে নিভে গেল।

আর কেউ মিঃ আলমের মুখোভাব লক্ষ্য না করলেও মিঃ জাফরী লক্ষ্য করলেন। তিনি মিঃ আলমকে লক্ষ্য করে বললেন– মিঃ আলম, আপনার কি মনে হয়, ডাক্তার জয়ন্ত সেন তাঁর নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছিলেন?

না ইন্সপেক্টর সাহেব, ডক্টর সেন তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুই টের পাননি। তিনি এমন কোন কাজ করে বসেছিলেন– যে কাজের জন্য তিনি শুধু উদ্বিগ্ন না, অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলেন। মিঃ আলম গম্ভীর শান্তকণ্ঠে কথাগুলো বললেন।

মিঃ হারুন বললেন– মিঃ আলমের চিন্তাধারা নির্ঘাৎ সত্যি। নমিতা দেবীর কথায় সেরকমই মনে হয়।

মিঃ জাফরী ড্রাইভার রজত এবং কম্পাউন্ডার নিমাই বাবুকে প্রশ্ন করে তেমন কোনো সন্তোষজনক জবাব পেলেন না। দারোয়ান গুরু সিং এলো এবার মিঃ জাফরীর সম্মুখে। লম্বা সালাম ঠুকে দাঁড়াল এক পাশে।

মিঃ জাফরী জিজ্ঞাসা করলেন– তোমার নাম গুরু সিং?

হ্যাঁ হুজুর, আমার নাম গুরু সিং। আমিই তো দেখেছি হুজুর।

কি দেখেছ? প্রশ্ন করলেন মিঃ জাফরী।

সেই ছায়ামূর্তি হুজুর। ছা

য়ামূর্তি?

হ্যাঁ হুজুর, যে ডাক্তারবাবুকে গলা টিপে হত্যা করেছে।

ধমকে ওঠেন মিঃ হারুন–তুমি কি করে জানলে সেই ছায়ামূর্তি ডাক্তার বাবুকে হত্যা করেছে?

সেই ছায়ামূর্তি ছাড়া কেউ ডাক্তারবাবুকে হত্যা করেনি হুজুর, একথা আমি ঠাকুর দেবতার দিব্য করে বলতে পারি।

মিঃ জাফরী বললেন– তুমি তখন কোথায় ছিলে?

হুজুর গেটের পাশের খুপড়িতে। গভীর রাতে হঠাৎ পায়ের শব্দে তাকিয়ে দেখি দোতলার সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে একটা জমকালো ছায়ামূর্তি নেমে আসছে। আমি চিৎকার করে উঠি চোর চোর কিন্তু হুজুর আশ্চর্য! ছায়ামূর্তি কোথায় যেন হাওয়ায় মিশে গেল। আমার চিৎকারে। কারও ঘুম ভাঙলো না। আমি তখন কাউকে না ডেকে নিজেই উপরে উঠে গেলাম। ঘুরেফিরে। দেখলাম সব দরজা বন্ধ রয়েছে। এমন কি ডাক্তারবাবুর ঘরের দরজাও বন্ধ। তখন নিশ্চিন্ত মনে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম নিচে। তারপর একটু শুয়ে পড়েছি। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি হুজুর, ভোরে চাকর ছোকরাটার ধাক্কায় ঘুম ভাঙলো, শুনলাম সে

ভয়ার্ত গলায় বলছে, গুরু সিং, গুরু সিং, ডাক্তারবাবু খুন হয়েছেন, ডাক্তারবাবু খুন হয়েছেন। আমি চোখ রগড়াতে রগড়াতে ছুটলাম উপরে। তারপর গিয়ে দেখি ডাক্তারবাবু ছাদে পড়ে আছেন। তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সবাই কান্না কাটি শুরু করেছে।

যাক, আর তোমাকে বলতে হবে না। ডাক্তারবাবু হত্যা সম্বন্ধে এ বাড়ির সকলের চাইতে তুমিই বেশি জান দেখছি। তারপর মিঃ হারুনকে লক্ষ্য করে মিঃ জাফরী বললেন– একেও থানায় নিয়ে চলুন। কয়েক ঘা খেলেই দোষ আছে কিনা বেরিয়ে পড়বে। এ নিশ্চয়ই ডাক্তার সেনের হত্যা সম্বন্ধে জ্ঞাত আছে।

হেমন্ত সেনের কথাও শুনলেন না মিঃ জাফরী, দারোয়ান গুরু সিংয়ের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দেয়া হল।

এবার মিঃ জাফরী দলবলসহ চললেন বণিক ভগবৎ সিংয়ের বাড়িতে। ভগবৎ সিংয়ের। বাড়িতে পৌঁছে অবাক হলেন মিঃ জাফরী। এত বড় বাড়িতে মাত্র ক'জন লোক। একজন মহিলা। দাসী, একজন চাকর। এছাড়া একজন বয়স্ক লোক, তিনি নাকি ভগবৎ সিংয়ের আত্মীয় হন।

ভগবৎ সিং খুন হয়েছেন তাঁর শোবার ঘরে। বিছানায় অর্ধশায়িত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন ভগবৎ সিং। জমাট রক্তে বিছানার কিছুটা অংশ কালো হয়ে উঠেছে। কতগুলো মাছি বন বন করে উড়ছিল সেখানে। একখানা সূতীক্ষধার ছোরা অমূল বিদ্ধ হয়ে আছে ভগবৎ সিংয়ের বুকে।

গতকালই যে ভদ্রলোক তাদের সঙ্গে এত মহৎ ব্যবহার করেছেন–আর আজ তার এ অবস্থা। পুলিশ অফিসার হলেও হৃদয় তো একটা ব্যথায় ছোঁয়া লাগল সকলের মনে।

মিঃ জাফরী নিজ হাতে ভগবৎ সিংয়ের বুক থেকে ছোরাখানা টেনে তুলে নিলেন। তারপর স্তব্ধকণ্ঠে বললেন– অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড। হত্যার হিড়িক পড়ে গেছে যেন।

মিঃ হারুন বলেন– এ তিনটা হত্যাকাণ্ডই অত্যন্ত রহস্যময়। মিঃ চৌধুরীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা, ডাক্তার জয়ন্ত সেনকে গলা টিপে মেরে ফেলা– আর ভগবৎ সিংকে ছোরাবিদ্ধ করা।

মিঃ শঙ্কর রাও গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন। তিনি বললেন এবার– এ তিন ব্যক্তির হত্যাকারী এক। যদিও বিভিন্ন রূপে এই হত্যাকাণ্ডগুলো সংঘটিত হয়েছে।

মিঃ আলম একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বলেন এ তিন ব্যক্তির হত্যাকারী এক নাও হতে পারে, কিন্তু এ তিন ব্যক্তির হত্যারহস্যের যোগসূত্র এক বলে মনে হচ্ছে।

মিঃ জাফরী তাকালেন মিঃ আলমের মুখের দিকে, শুধু একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে– হু!

মিঃ জাফরী লাশ পরীক্ষা করা শেষ করে ডাকলেন ভগবৎ সিংয়ের বাড়ির তিন ব্যক্তিকে। প্রথমে তিনি ভগবৎ সিংয়ের আত্মীয় ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলেন।

ভদ্রলোক ভগবৎ সিংয়ের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারলেন না।

দাসীও জানাল কিছু জানে না এ ব্যাপারে সে।

কিন্তু চাকর রঘু বলল–সাহেব, আমি কাল রাতে যখন ঘুমিয়েছিলাম হঠাৎ একটা আর্তনাদে আমার ঘুম ভেঙে গেল, আমার মনে হল মালিকের ঘর থেকেই শব্দটা আসছে। আমি একটুও দেরী না করে ছুটলাম মালিকের ঘরের দিকে। কিন্তু ঘরের দরজায় পৌঁছে দেখলাম দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আমি ছুটে গেলাম ওদিকের জানালার ধারে ভাবলাম, ঐদিক দিয়ে মালিকের ঘরের মধ্যে কেউ ঢুকলে দেখতে পাব কিন্তু সাহেব, কি দেখলাম–এখনও ভাবলে আমার গা শিউরে ওঠে, আমি যেমনি জানালার পাশে এসে ভিতরে উঁকি দিতে যাব, অমনি ঘরের ভিতর থেকে একটা জমকালো ছায়ামূর্তি বেরিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তুই কি করলি? প্রশ্ন করলেন মিঃ হারুন।

আমি কি করব, থ' মেরে দাঁড়িয়ে রইলাম। বুকের মধ্যে ধ ধ করতে লাগল। কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর হুশ হল। তখন ঘরের ভিতরে কোন শব্দ হচ্ছে না, আমি জানালা দিয়ে ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করলাম। ঘরে আলো জ্বলছিল। সাহেব, যা দেখলাম– কি আর বলব মালিক বিছানার উপরে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন, রক্তে ভেসে যাচ্ছে গোটা বিছানাটা। আমি দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেললাম, তারপর চিৎকার করে ছুটে গেলাম ওনার ঘরে–রঘু আঙ্গুল দিয়ে ভগবৎ সিংয়ের

আত্মীয় ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে দিল। তারপর আবার বলতে শুরু করল গিয়ে দেখি উনি ঘরে নেই–

ঘরে নেই। অস্ফুট শব্দ করে ওঠেন মিঃ জাফরী। একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালেন ভদ্রলোকটার দিকে ওর কথা সত্য? আপনি তখন ঘরে ছিলেন না?

ভদ্রলোকের দাড়িগোঁফ ঢাকা মুখমণ্ডল মুহূর্তের জন্য বিবর্ণ হয় কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন তিনি বড় গরম লাগছিল তাই একটু খোলা ছাদে গিয়েছিলাম—

খোলা ছাদে গিয়েছিলেন, অথচ একটু আগে বললেন, আপনি নাকি এ হত্যা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। গম্ভীর কণ্ঠস্বর মিঃ জাফরীর।

এখনও বলছি আমি এ হত্যা সম্বন্ধে কিছুই জানি না, কারণ নিচের কোন শব্দই উপরে পৌঁছে।

তাহলে কখন আপনি নিচে নেমে আসেন এবং ভগবৎ সিংয়ের মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেন? প্রশ্ন করলেন মিঃ জাফরী।

ভদ্রলোক ঢোক গিলে বললেন আমি নিজের ঘরে এসে যখন বিছানায় শুতে যাব, সেই সময় রঘুর চিৎকার আমার কানে যায়।

তার পূর্বে আপনি রঘুর চিৎকার শুনতে পাননি?

না, অবশ্য তার আর একটা কারণ ছিল।

বলুন?

রঘু আমাকে ঘরে না দেখে বাইরের লোকজনকে ডাকতে গিয়েছিল। পথের দু'চারজন লোককে নিয়ে রঘু এসে আবার চিৎকার করতে শুরু করে দিল তখন আমি শুনতে পাই।

গম্ভীর কন্ঠে শব্দ করলেন– মিঃ জাফরী। আশ্চর্য বটে, টের পেলেন না।

সত্যি বলছি এমন একটা কিছু ঘটবে আমি ধারণা করতে পারিনি।

আপনার নামটা যেন কি বলেছিলেন? আমি ভুলে গেছি। জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ জাফরী।

কক্ষে একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। শুধু মিঃ জাফরী প্রশ্ন করে চলেছেন।

ভদ্রলোক বললেন–আমার নাম জয় সিং।

এবার মিঃ জাফরী দাসীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন–তুমিও তো কিছুই জান না। কিন্তু তুমি ঠিক ভগবৎ সিংয়ের পাশের ঘরেই ঘুমিয়েছিলে, তাইনা?

তা ছিলাম। বুড়ো মানুষ সারাটা দিন খেটেখুটে শুয়েছি, অমনি ঘুমিয়ে পড়েছি। তাই হুজুর, আমি মালিকের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারিনি। মালিক বড় ভাল লোক ছিলেন হুজুর। তিনি আমার মা বাপ। কাঁদতে শুরু করে দাসী। একবার তাকায় জয় সিংয়ের মুখের দিকে।

হঠাৎ শঙ্কর রাও বললেন-–একে যেন আমি কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। গলার স্বরটাও যেন শুনেছি।

বুড়ী কাঁদতে কাঁদতে বলে– তা দেখবেন হুজুর, আমি সব সময় লোকের বাড়িতে কাজ করি–

মিঃ আলম এবার কথা বললেন– মিঃ রাও, আপনি ভাল করে স্মরণ করে দেখুন ওকে কোথায় দেখেছিলেন?

ঠিক মনে পড়ছে না।

গভীরভাবে চিন্তা করুন।

মিঃ রাও বুড়ীর মুখের দিকে তাকালেন, বুড়ী মুখটা ঘুরিয়ে দাঁড়াল।

মিঃ আলম কঠিন কণ্ঠে বললেন– এই দিকে মুখ করে দাঁড়াও।

তারপর মিঃ জাফরকে লক্ষ্য করে বললেন– স্যার, একে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

মিঃ জাফরী বলেন স্বচ্ছন্দে করুন মিঃ আলম।

মিঃ আলম এবার বুড়ীকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন–তোমার নাম কি?

আমার নাম, আমার নাম তো তেমন কিছুই নেই। সবাই আমাকে 'মাসী' বলে ডাকে।

তা ডাকুক, তোমার নাম শুনতে চাচ্ছি?

নাম…এবার বুড়ী তাকালো জয় সিংয়ের মুখে, উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হল। বুড়ী আবার ঢোক গিলে বলল– আমাকে ছোটবেলায় সবাই সই' বলে ডাকত।

গর্জে উঠলেন মিঃ আলম–মিথ্যে কথা! তোমার সঠিক নাম শুনতে চাই।

মিঃ জাফরী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার মিঃ আলমের বজ্র কঠিন কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলেন। তারা সবাই তাকালেন মিঃ আলমের মুখের দিকে।

মিঃ আলমের সুন্দর মুখমণ্ডল রাগে রক্তাভ হয়ে উঠেছে। উজ্জ্বল দীপ্ত চোখ দুটিতে যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দাঁতে দাঁত পিষে বললেন– জান মিথ্যার শাস্তি কি? এ মুহূর্তে আমি তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব।

বুড়ীর মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। অসহায় দৃষ্টি নিয়ে একবার তাকাচ্ছে সে জয়সিংয়ের দিকে, আর একবার তাকাচ্ছে মিঃ আলমের চোখ দুটোর দিকে। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দু'খানা বারবার চেটে নিচ্ছে।

বুড়ীর মুখ দেখেই মনে হচ্ছে, ওর মনের মধ্যে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়েছে। মিঃ আলমের মুখোভাব লক্ষ্য করে বুড়ী শিউরে ওঠে কম্পিত কণ্ঠে বলে আমার নাম সতী দেবী …

হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। তুমি–তুমিই সেই সতী দেবী, যাকে দস্যু নাথুরামের ওখানে দেখেছিলাম। সেই সতী দেবী তুমি– এখানে কেন– এখানে কেন তুমি? শঙ্কর রাও এবার বুড়ীর ওপর রেগে ফেটে পড়লেন।

কক্ষের সবাই আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছেন। মিঃ জাফরীর দু'চোখেও বিস্ময়।

মিঃ হারুনের মুখোভাব কঠিন হয়ে উঠেছে।

মিঃ আলমের মুখমণ্ডল পূর্বের চেয়ে অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। তিনি মিঃ রাওকে লক্ষ্য করে বললেন– এই স্মরণশক্তি নিয়ে আপনি গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছেন।

মিঃ আলম যদিও তার বন্ধুলোক তবুও তার কথায় লজ্জিত হলেন মিঃ রাও।

মিঃ আলম মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললেন– স্যার, আমি জয়সিংকে অ্যারেস্ট করার জন্য। অনুরোধ করছি।

মিঃ জাফরী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– আমারও সেই মত।

মিঃ হারুন পুলিশকে ইঙ্গিত করলেন জয় সিংয়ের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিতে।

সতী দেবীর হাতেও হাতকড়া লাগিয়ে দেয়া হল।

জয় সিং প্রায় কেঁদেই ফেললেন–আমাকে বিনা অপরাধে এভাবে অপমানিত করছেন কেন?

মিঃ আলম বললেন, তার জবাব পাবেন বিচারের পরে। এবার তিনি মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললেন– স্যার,লাশ মর্গে পাঠানোর পূর্বে একজন ক্যামেরাম্যানের আবশ্যক। ভগবৎ সিংয়ের ছবি রাখা দরকার।

মিঃ জাফরী অবাক হলেও মনোভাব প্রকাশ না করে ক্যামেরাম্যানকে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন।

মৃত ভগবৎ সিংয়ের ফটো নেয়া হল। পর পর দুটো।

মিঃ আলম এবার মৃতের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, বললেন আপনারা সবাই ভগবৎ সিংয়ের যে রূপ দেখতে পাচ্ছেন সেটা তার আসল চেহারা নয়।

কক্ষের সবাই অবাক হলেন। মিঃ জাফরী বললেন– কি বলছেন মিঃ আলম।

হ্যাঁ দেখুন। মিঃ আলম মৃত ভগবৎ সিংয়ের মুখ থেকে গোঁফ জোড়া খুলে নিলেন। কপালের ওপরের কিছুটা চুল টেনে তুলে ফেললেন।

মিঃ হারুন তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন এ যে ডাকু নাথুরাম। সর্বনাশ, আমরা এতদিনেও একে চিনতে পারিনি।

মিঃ জাফরী বললেন– এই সেই নাথুরাম? দস্যু নাথুরাম।

হ্যাঁ স্যার। আমাদের ডায়েরীতে এর নাম এবং ফটো আছে। বড় শয়তান– দুর্দান্ত ডাকু। কথাটা বললেন মিঃ হারুন।

শঙ্কর রাও যেন খুশি হলেন না। তিনি রাগে গস গস করে বললেন– বেটা আমাকে যা ভুগিয়েছিল। বেঁচে থাকলে আমি ওকে ফাঁসি দিয়ে, তবে ছাড়তাম।

মিঃ হারুন মিঃ আলমকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ প্রকাশ করে বললেন– আপনাকে ধন্যবাদ মিঃ আলম। ভগবৎ সিংয়ের আসল পরিচয় উদঘাটিত না হলে একটা জটিল রহস্য। অন্ধকারের আড়ালে চাপা পড়ে যেত। ডাকু নাথুরামের ছদ্মবেশে এবং তার এই ভয়ঙ্কর পরিণতি আমরা কেউ জানতে সক্ষম হতাম না।

মিঃ জাফরীও মিঃ আলমের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন। কিন্তু তার মুখমণ্ডল খুব প্রসন্ন বলে মনে হল না। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– এই হত্যা রহস্য আরও রহস্যময় হয়ে উঠল। জানি না এর সমাপ্তি কোথায়।

লাশ মর্গে পাঠানোর পূর্বে নাথুরামের আরও দুখানা ফটো নেয়া হল।

মিঃ জাফরী দলবলসহ জয় সিং এবং সতী দেবীকে হাতকড়া পরিয়ে পুলিশ অফিসে নিয়ে চললেন।

চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্য আরও জটিল হয়ে উঠল।

বালিশে মুখ গুঁজে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছিল বনহুর। আজ কদিন থেকে একেবারে নীরব হয়ে পড়েছে সে। নিজ অনুচরদের সঙ্গে পর্যন্ত তেমন করে আর কথা বলে না।

হঠাৎ দস্যু বনহুরের হল কি?

অনুচরদের মধ্যে এ নিয়ে বেশ আলোচনা শুরু হল। কিন্তু প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলার সাহস পেল না।

নূরীও কম বিস্মিত হয় নি, বনহুরকে সে এই প্রথম নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতে দেখল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে নিজের বিশ্রামকক্ষে নিশ্চুপ শুয়েছিল বনহুর। নূরী ধীর পদক্ষেপে তার পাশে গিয়ে বসল। বনহুরের চুলের ফাঁকে আংগুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল–হুর, কি হয়েছে তোমার?

নূরীর কোমল স্পর্শে বনহুর মুখ তুলে তাকাল। দু'চোখে তার অশ্রুর বন্যা। নূরী নিজের আঁচল দিয়ে বনহুরের চোখের পানি মুছে দিয়ে বলল হুর আমার কাছে কিছুই অজানা নেই। বলো, কি হল তোমার?

নূরী, কি বলব, আজ আমার মত দুঃখী কেউ নেই।

কি হয়েছে বল?

ছোটবেলায় আম্মা-আব্বার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম, কিন্তু তাদের অপরিসীম আশীর্বাদ থেকে কোনোদিন বঞ্চিত হইনি। আজ তাও হারিয়েছি। আমার ....আমার আব্বা আর বেঁচে নেই।

তোমার আব্বা! বিস্মিত কণ্ঠস্বর নূরীর।

হ্যাঁ, আমার আব্বা। নূরী তোমার কাছে আমি বড় অপরাধী।

ছিঃ ও কথা বল না হুর। আমিই যে তোমার কাছে চির অপরাধী। কত মহৎ তুমি, তাই তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ...

শোনো নূরী, আমার আব্বা-আম্মা উভয়েই বেঁচে ছিলেন এতদিন।

বেঁচে ছিলেন?

হ্যাঁ নূরী।

কেন তবে যাওনি তুমি তাদের কাছে?

আমি তাদের অপরাধী সন্তান। আমি তাঁদের বংশের কলংক অভিশাপ। তাই সন্তান হয়েও পুত্রের দাবী নিয়ে কোনদিন তাঁদের সম্মুখে দাঁড়াবার সাহস পাইনি,

পিতার মৃত্যুকালে বুক ফেটে গেছে, কিন্তু আব্বা বলে ডাকবার সুযোগ পাইনি; নূরী, আমি যে তাঁদের অভিশপ্ত সন্তান। ছোট্ট। বালকের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে বনহুর।

নূরীও কেঁদে ফেলে, বনহুরের চোখের পানি নূরীর হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানে। বনহুরকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে তার।

নূরী ধীরে ধীরে বনহুরের চুলে হাত বুলিয়ে দেয়।

এমন সময় বাইরে পদশব্দ শোনা যায়। নূরী উঠে দাঁড়িয়ে বলে–কে?

আমি মহসীন। দরজার বাইরে থেকে কথাটা ভেসে আসে।

নূরী বনহুরকে লক্ষ্য করে বলে হুর, মহসীন তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। ওঠো।

বনহুর উঠে বসে। নূরী নিজের আঁচল দিয়ে বনহুরের চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বলে– মহসীন তোমায় ডাকছে।

গম্ভীর কণ্ঠে বলে বনহুর– আসতে বল। নিজের চোখমুখ হাতের তালুতে ঘষে স্বাভাবিক করে নেয় সে।

মহসীন কুর্ণিশ করে দাঁড়ায়।

বনহুর বলল– কাসেমের সন্ধান পেয়েছ?

সর্দার। যারা ওর সন্ধানে গিয়েছিল, সবাই ফিরে এসেছে। সর্দার, আমার মনে হয় ও নেকলেসটার লোভ সামলাতে পারেনি। ফেরত দিতে গিয়ে আত্মসাৎ করে পালিয়েছে।

আমি তো জানি এত সাহস ওর হবে না।

সর্দার, তাহলে সে রয়েছে কোথায়?

ধরা পড়ে যায়নি তো?

না সর্দার। আমরা গোপনে সব জায়গায় সন্ধান নিয়ে দেখেছি।

এমন সময় রহমতের গলার আওয়াজ পাওয়া যায়– সর্দার, কাসেম এসেছে।

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল দরজার দিকে, বলল–নিয়ে এসো।

রহমতের পেছনে নতমুখে কাসেম এসে দাঁড়াল।

বনহুর নূরীকে বলল– নূরী, তুমি যাও, বিশ্রাম করোগে।

নূরী চলে গেল।

বনহুর অগ্নিদৃষ্টি মেলে তাকাল কাসেমের দিকে। কে মনে করবে এই সেই বনহুর, যে একটু পূর্বেই পিতৃশোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। বনহুরের দু'চোখে আগুন ঠিকরে বের হয়। গম্ভীর কণ্ঠে গর্জে ওঠে–কাসেম!

সর্দার!

খবর কি তোমার?

সর্দার ...

কোথায় গুম হয়েছিলে?

সর্দার, আমি নেকলেসখানা...

বল থামলে কেন?

সর্দার নেকলেস আমি ফেরত দিতে পারিনি।

তার মানে?

আমি তাকে খুঁজে পাইনি সর্দার।

খুঁজে পাওনি! তাই আত্মগোপন করে থাকতে চেয়েছিলে?

মাফ করবেন, আমি আপনার সামনে আসার সাহস পাইনি।

আজ তবে কেমন করে সাহস হল?

রহমত বলে ওঠে– সর্দার, আমি নারন্দি থেকে ফিরে আসার সময় কান্দাইয়ের বনের নিকটে ওকে দেখতে পাই। ও আমাকে দেখে চোরের মত পালাতে যাচ্ছিল। আমি ওকে ধরে আনি।

বনহুর হুঙ্কার ছাড়ে– এ কথা সত্যি?

পালাচ্ছিলাম সত্য, কিন্তু কিছু আমি চুরি করিনি।

নেকলেসখানা কি করেছ?

আমার কাছেই আছে। এই যে সর্দার। ফতুয়ারা পকেট থেকে নেকলেস ছড়া বের করে বনহুরের সম্মুখে মেলে ধরে–আমি তাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান পেরেশান হয়ে গেছি–তাই নেকলেসটা আমার কাছেই রয়েছে।

বনহুর কিছু বলার পূর্বে মহসীন বলে ওঠে– সর্দার, কাসেম যা বলছে সত্য নয়। এখন ধরা পড়ে সাধু সেজেছে।

গর্জে ওঠে বনহুর–চুপ কর মহসীন। কাসেম যা বলছে মিথ্যা নয়।

সর্দার! আনন্দধ্বনি করে ওঠে কাসেম। দু'চোখে তার কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ে। এতদিন যার ভয়ে সে বন হতে বনান্তরে, শহরে, গ্রামে লুকিয়ে লুকিয়ে ফিরেছে– তিনি স্বয়ং তার পক্ষে। আনন্দ উপচে পড়ল কাসেমের মুখমণ্ডলে।

বনহুর কাসেমের হাত থেকে নেকলেস ছড়া হাতে উঠিয়ে নিয়ে বলল যাও কাজে যোগ দাও।

কাসেম এবং মহসীন বেরিয়ে গেল।

বনহুর রহমতকে লক্ষ্য করে বললো– রহমত, সেই অন্ধ রাজার খবর কি?

খবর ভাল। তাঁকে তাঁর ছোট ভাই বন্দী করবার ফন্দি এঁটেছিলো, আমি তা নষ্ট করে দিয়েছি।

কিভাবে এ কাজ করলে তুমি?

আমি তাঁর সেই দলিল চুরি করে এনেছি। কাজেই আদালতে বিনা বিচারে অন্ধ রাজা মোহন্ত সেন খালাস পেয়ে গেছেন।

একথা তুমি তো জানাওনি রহমত?

সর্দার, কদিন আপনার সাক্ষাৎ কামনায় ঘুরেছি, কিন্তু সাক্ষাৎ পাইনি।

দলিলখানা তোমার কাছে আছে?

আছে সর্দার!

ওটা আমাকে দিয়ে যাও। সময়ে প্রয়োজন হতে পারে।

জামার ভেতর থেকে একটা লম্বা ধরনের কাগজ বের করে বনহুরের হাতে দেয় রহমত।

বনহুর একটু দৃষ্টি বুলিয়ে পুনরায় ভাঁজ করে রাখতে রাখতে বলে– বেচারা মোহন্ত তাহলে উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন–

আপনারই দয়ায় সর্দার।

না, রহমত, এটা তোমার সৌজন্যতায়।

আপনি হুকুম না করলে আমি কি যেতে পারতাম সর্দার? কিন্তু এখনও অন্ধ রাজা মোহন্ত সেন নিরাপদ নয়।

তা জানি। কিন্তু উপস্থিত আমি একটা মহাসংকটময় অবস্থায় উপনীত হয়েছি রহমত– যা একটু অবসর পেলেই আমি মোহন্ত সেনের ছোটভাই রাজা যতীন্দ্র সেনকে দেখে নেব। আচ্ছা, এখন যাও রহমত।

রহমত দরজার দিকে পা বাড়াতেই পিছু ডাকে বনহুর শোনো, এই নেকলেস ছড়া তুমি.... না না থাক, আমিই পৌঁছে দেব। যাও।

রহমত বেরিয়ে যায়।

বনহুর নেকলেস ছড়া প্যান্টের পকেটে রেখে উঠে দাঁড়ায়।

.

সাদা চুনকাম করা বিরাট দোতলা বাড়ি। যদিও বহুদিন বাড়িখানায় নতুন রঙের ছোঁয়া লাগেনি তবু দূর থেকে বাড়িখানাকে ধোপার ধোয়া কাপড়ের মতই সাদা ধবধবে লাগে।

মাঝে মাঝে চুন-বালি-খসে পড়েছে, কোথাও বা শেওলা ধরে কালচে রং হয়েছে, কিন্তু জ্যোস্নাভরা রাতে এসব কিছুই নজরে পড়ে না। বাড়ির সম্মুখে রেলিং ঘেরা চওড়া বারান্দা। বারান্দার নিচেই লাল কাঁকর বিছানো সরুপথ।

বাড়িখানা কোন শহরে নয়, গ্রামে।

বাড়ির মালিক বিনয় সেন, মধু সেনের বাবা।

গভীর রাত।

সমস্ত বাড়িখানা নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে।

আকাশে অসংখ্য তারার মেলা। তারই মাঝে মোড়শী চাঁদ হাসছে। বাড়ির পেছনে আমবাগান। জ্যোস্নার আলো তাই বাড়ির পেছনটাকে আলোকিত করতে সক্ষম হয় নি।

অন্ধকারে আত্মগোপন করে বনহুর এসে দাঁড়াল প্রাচীরের পাশে। অতি সন্তর্পণে উঠে দাঁড়াল প্রাচীরের ওপর।

নিঝুমপুরীর মত বাড়িখানা ঝিমিয়ে পড়েছে।

বনহুর দোতলার পাইপ বেয়ে উঠে গেল। সম্মুখের কক্ষটার মধ্যে নীল আলো জ্বলছে। জানালার শার্সী খুলে উঁকি দিল। এটা বিনয় সেনের কক্ষ বুঝতে পারল সে। কারণ বিছানায় একজন মাত্র বয়স্ক লোক ঘুমিয়ে রয়েছেন।

বনহুর এগুলো সামনের দিকে।

পাশাপাশি দু'খানা কক্ষ পেরিয়ে ওপাশের কক্ষটায় মৃদু আলোকরশ্মি দেখতে পেল সে।

বনহুর কাঁচের শার্সীর ফাঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। ডিমলাইটের ক্ষীণালোকে দেখতে পেল একটা খাটের উপর দুগ্ধফেননিভ শুভ্র বিছানায় পাশাপাশি ঘুমিয়ে আছে সুভাষিণী আর মধু সেন। সুভাষিণীর দক্ষিণ হাতখানা মধুসেনের বুকের উপর।

বনহুর কালবিলম্ব না করে কৌশলে কক্ষে প্রবেশ করল। লঘু পদক্ষেপে এগিয়ে গেল সে খাটের পাশে। প্যান্টের পকেট থেকে নেকলেস ছড়া বের করল।

কক্ষের স্বল্পালোকে নেকলেসের মতিগুলো ঝকমক করে উঠল নেকলেস ছড়া অতি সন্তর্পণে সুভাষিণীর শিয়রে রেখে ওপাশের জানালা দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে।

পেছনের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আমবাগানে প্রবেশ করতেই নারীকণ্ঠে কে যেন বলে উঠল– দাঁড়াও!

থমকে দাঁড়াল বনহুর। কালো পাগড়ীর ঝোলানো অংশটা ভাল করে খুঁজে দিল কানের একপাশে। মুখের অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে গেল। ফিরে তাকিয়ে চমকে উঠলো বনহুর। আমগাছের পাতার ফাঁকে জ্যোস্নার কিঞ্চিৎ আলো এসে পড়েছে, পেছনের সেই নারীর মুখমণ্ডলে। বনহুর অবাক হয়ে দেখলো, অদূরে দাঁড়িয়ে সুভাষিণী। হাতে সেই নেকলেস ছড়া।

বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়াল।

সুভাষিণী এগিয়ে এলো বনহুরের পাশে। আমবাগানের আবছা অন্ধকারে নিপুণ দৃষ্টি মেলে তাকাল সে বনহুরের মুখের দিকে। শুধুমাত্র চোখ দুটো ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। আরও সরে দাঁড়াল সুভাষিণী, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলল আজ তোমায় ধরেছি। তুমি না দস্যু, অমন করে চোরের মত পালাচ্ছিলে কেন?

বনহুর নিশ্চুপ।

সুভাষিণী হেসে বলল– কি, জবাব দিচ্ছে না যে? তোমার সব চালাকি ফাঁস হয়ে গেছে দস্যু। নিয়ে যাও, তোমার এ নেকলেস নিয়ে যাও। বনহুরের দিকে ছুঁড়ে মারে সুভাষিণী নেকলেস ছড়া।

সুভাষিণীর ছুঁড়ে মারা নেকলেস ছড়া বনহুরের গায়ের ওপর গিয়ে পড়ে। বনহুর চট করে ধরে ফেলে নেকলেসখানা।

সুভাষিণী দেখল আমবাগানের ঝাপসা আলোতে বনহুরের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। কিছুক্ষণ নির্বাক দৃষ্টিতে সুভাষিণীর দিকে তাকিয়ে নেকলেস ছড়া ছুঁড়ে ফেলে দিল আমবাগানস্থ পুকুরের জলে।

ঝুপ করে একটা শব্দ হল।

সুভাষিণী হতবাক, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকাল পুকুরের দিকে। জ্যোস্নার আলোতে সে দেখতে পেল, পুকুরের জলে যেখানে নেকলেস ছড়া ডুবে গিয়েছিল সেখানে কয়েকটা বুদবুদ ভেসে উঠেছে। ফিরে তাকাতেই বিস্মিত হল সে। তার আশেপাশে কেউ নেই। যেখানে দস্যু বনহুর দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে খানিকটা জ্যোস্নার আলো ছড়িয়ে রয়েছে মাটির বুকে।

বিষণ্ন মনে সুভাষিণী ফিরে এলো নিজের ঘরে।

স্বামীর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইল কতক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে। তারপর স্বামীর চুলে হাত বুলিয়ে ডাকল– ওঠো, কত ঘুমাচ্ছ?

চোখ মেলে তাকালো মধু সেন, তারপর, সুভাষিণীকে টেনে নিলো কাছে। আবেগভরা কণ্ঠে বলল– তোমার ঘুম ভেঙে গেছে সুভা?

হ্যাঁ গো হা। স্বামীর বুকে মাথা রেখে বলল সুভাষিণী।

.

খান বাহাদুর ব্যস্তসমস্ত হয়ে পুলিশ অফিসে প্রবেশ করলেন। চোখে মুখে তার উদ্বিগ্নতা। ললাটে গভীর চিন্তারেখা, বিষণ্ন মুখমণ্ডল।

পুলিশ অফিসে প্রবেশ করতেই মিঃ হারুন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন, বললেন....ব্যাপার কি খান বাহাদুর সাহেব?

খান বাহাদুর সাহেব বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন–কি আর বলবো ইন্সপেক্টার, আমার একমাত্র পুত্র নিয়ে কি যে মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করছি!

বসুন। মিঃ হারুন নিজেও আসন গ্রহণ করলেন।

খান বাহাদুর সাহেব আসন গ্রহণ করার পর মিঃ হারুন জিজ্ঞাসা করলেন– আপনার পুত্র মুরাদ তো এখন জামিনে আছে?

হ্যাঁ ইন্সপেক্টর, ওকে আমি জামিনে খালাস করে নিয়েছিলাম–কি করবো বলুন, একমাত্র সন্তান....কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে তিনি বললেন–গতকাল থেকে আবার সে কোথায় উধাও হয়েছে।

মুহূর্তে মিঃ হারুনের চোখ দুটো রাঙা হয়ে ওঠে। তিনি প্রায় চিৎকার করে ওঠেন–এ কি বলছেন খান বাহাদুর সাহেব? জানেন সে অপরাধী?

কি করবো বলুন, আমি যে পাগল হবার জোগাড় হয়েছি।

মিঃ হারুন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–জামিনের অপরাধী যদি পলাতক হয়, সেজন্য আইনে। জামিনদার অপরাধী–এ কথা আপনার হয়তো অজানা নেই?

সে কথা আমি জানি ইন্সপেক্টর। কিন্তু কি করবো বলুন। আমি যে দিশেহারা হয়ে পড়েছি। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন– খান বাহাদুর সাহেব-একমাত্র পুত্রকে আমি মানুষের মত মানুষ করতে চেয়েছিলাম। অনেক আশা-ভরসা ছিল ওর ওপর আমার, কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেল, উচ্চশিক্ষিত করার জন্য ওকে আমি বিলেত পাঠালাম। টাকা-পয়সা ঐশ্বর্য যা যখন চেয়েছে তাই আমি ওকে দিয়েছি। কোনো অভাব আমি ওকে বুঝতে দেইনি। তবু....

সেই কারণেই আপনার পুত্র অধঃপতনে গেছে। বেশি আদর দিয়ে ছেলেটার মাথা আপনি খেয়ে ফেলেছেন খান বাহাদুর সাহেব।

হয়তো তাই। মা-মরা সন্তান বলে কোনদিন ওকে আমি আঘাত করিনি, করতে পারিনি। সেটাই হয়েছে আমার জীবনের চরম ভুল।

দেখুন খান বাহাদুর সাহেব, এখন আফসোস করে কোন ফল হবে না। আপনার পুত্রকে খুঁজে বের করুন।

আমি এ দু'দিনে বহু জায়গায় সন্ধান নিয়েছি, কিন্তু কোথাও পেলাম না। এখন আপনাদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কোন উপায় দেখছি না। ইন্সপেক্টার, আপনি

দয়া করে

আপনার অনুরোধ জানাতে হবে না খান বাহাদুর সাহেব। এক্ষুণি আপনার পুত্র মুরাদের নামে আমরা ওয়ারেন্ট বের করছি।

খান বাহাদুর সাহেব প্রস্থান করার পর মিঃ হারুন সাব ইন্সপেক্টার জাহেদ আলী সাহেবকে ডেকে সমস্ত বুঝিয়ে বললেন। খান বাহাদুর সাহেবের ছেলের নামে ওয়ারেন্ট বের করার আদেশ দিলেন।

গোটা শহরে সি. আই. ডি. অফিসাররা মুরাদের খোঁজে ছড়িয়ে পড়লেন।

মিঃ আলম কিন্তু এ ব্যাপারে কিছুমাত্র মন্তব্য প্রকাশ করলেন না। তিনি ব্যাপারটা শোনার পর নিশ্চুপ রইলেন।

একদিন পুলিশ অফিসে মিঃ হারুন, মিঃ জাফরী এবং মিঃ আলম বসে মুরাদের অন্তর্ধান ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চলছিল। মিঃ হোসেনও আজ অফিসে উপস্থিত হয়েছেন। তার দক্ষিণ হাতের ক্ষত শুকিয়ে গেছে। তিনি এখন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছেন।

মিঃ হোসেন বলে ওঠেন–আমার মনে হয় সেই ছায়ামূর্তি অন্য কেউ নয়-ঐ শয়তান মুরাদ…এই তিনটা হত্যাও সে–ই করেছে।

আমারও এখন সেরকমই মনে হচ্ছে। গম্ভীর গলায় বললেন মিঃ হারুন।

মিঃ জাফরী বলে ওঠেন-মুরাদই যে ছায়ামূর্তি এবং সে–ই যে এই তিনটি খুন সংঘটিত করেছে তার কোন প্রমাণ এখনও আমরা পাইনি।

মিঃ হারুন বললেন-স্যার, আপনি মুরাদ সম্বন্ধে তেমন বেশি কিছু জানেন না। এতবড় বদমাইশ বুঝি আর হয় না। ধনকুবের খান বাহাদুর সাহেবের একমাত্র সন্তান মুরাদ যেন শয়তানের প্রতীক।

মিঃ জাফরী বললেন আমি এই মুরাদ সম্বন্ধে পুলিশের ডায়েরী থেকে কিছু জানতে পেরেছি, আরও জানা দরকার।

হ্যাঁ স্যার, এই দুষ্ট শয়তান নাথুরামের সহায়তায় একেবারে শয়তানির চরম সীমায় পৌঁছে। গিয়েছিল। এমন কি দস্যু বনহুরকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল সে। চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজ, নারী হরণ-দেশবাসীকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বললেন মিঃ হারুন।

মিঃ হোসেন বলেন–এবার সে হত্যাকাণ্ডও শুরু করেছে।

মিঃ জাফরী মিঃ আলমকে লক্ষ্য করে বলেন–আপনি নিশ্চুপ রইলেন কেন? কিছু মন্তব্য করুন। আপনার কি মনে হয় এই হত্যারহস্যের সঙ্গে পলাতক মুরাদ জড়িত?

একথা সোজাসুজি বলা মুস্কিল স্যার। তবে মুরাদকে যতক্ষণ পাওয়া না যাচ্ছে, ততক্ষণ তার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। মিঃ আলম কথাটা বলে থামলেন।

এমন সময় ডাক্তার জয়ন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন পুলিশ অফিসে প্রবেশ করে ব্যস্তকণ্ঠে জানালেন–স্যার, আজ আবার সেই ছায়ামূর্তি আমাদের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিল এবং আবার বাবার সহকর্মী নিমাই বাবুকে....

অস্ফুট শব্দ করেন মিঃ হারুন-খুন করেছে?

না। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বসুন। বসে সমস্ত ঘটনা খুলে বলুন–বললেন মিঃ হারুন।

মিঃ জাফরীর মুখমণ্ডল অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি হেমন্ত সেনের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালেন।

হেমন্ত সেনের মুখমণ্ডলে ক্লান্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। তিনি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন–গভীর রাতে হঠাৎ একটা আর্তচিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি দ্রুত কক্ষের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার নজরে পড়ল একটা জমকালো ছায়ামূর্তি সদর দরজা দিয়ে দ্রুত অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সন্ধান নিয়ে দেখলাম কোন ঘরে কিছু হয় নি। শুধু নিমাই বাবুর কক্ষে তিনি নেই দেখতে পেলাম। অনেক খোঁজাখুজি করেও বাড়ির কোথাও তার সন্ধান পেলাম না। কক্ষে শূন্য বিছানা পড়ে রয়েছে।

হুঁ ব্যাপারটা দেখছি ক্রমান্বয়ে জটিল রহস্যজালে জড়িয়ে পড়েছে। গম্ভীর গলায় উচ্চারণ করলেন মিঃ জাফরী।

মিঃ হারুন এবং মিঃ আলম নিশ্চুপ শুনে যাচ্ছিলেন, মিঃ আলম বলে ওঠেন–এই রহস্যজাল কৌশলে গুটিয়ে আনতে হবে।

মিঃ জাফরী মৃদু হেসে বললেন–সেই জালের মধ্যে যে জড়িয়ে পড়বে সেই। হচ্ছে ছায়ামূর্তি।

হেমন্ত সেন নিমাইবাবুর নিখোঁজ ব্যাপার নিয়ে পুলিশ অফিসে ডায়েরী করে বিদায় হলেন।

সেদিন মিঃ জাফরী আর বেশিক্ষণ অফিসে বিলম্ব না করে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি আজ অন্য কোথাও গেলেন না। ড্রাইভারকে বাংলো অভিমুখে গাড়ি চালাবার নির্দেশ দিলেন।

মিঃ জাফরীর গাড়ি যখন ডাকবাংলার গেটের মধ্যে প্রবেশ করল ঠিক সেই মুহূর্তে একটা কালো রঙের গাড়ি গেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে মিঃ জাফরীর গাড়ির পাশ কেটে চলে গেল।

মিঃ জাফরী লক্ষ্য করলেন, গাড়ির হ্যাঁণ্ডেল চেপে ধরে বসে আছে একটা জমকালো ছায়ামূর্তি।

মাত্র এক মুহূর্ত, ছায়ামূর্তিসহ গাড়িখানা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। মিঃ জাফরী ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলল–ড্রাইভার, ঐ গাড়িখানা অনুসরণ কর।

ড্রাইভার গাড়িখানা বাংলোর গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে পুনরায় বের করে আনল এবং অতি দ্রুত গাড়ি চালাতে শুরু করল।

কিন্তু ততক্ষণে সম্মুখস্থ গাড়িখানা বহুদূর এগিয়ে গেছে।

মিঃ জাফরী দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাবার জন্য আদেশ দিলেন। গাড়ি উল্কাবেগে ছুটল। বড় রাস্তা ছেড়ে গলিপথে ছুটতে লাগল এবার মিঃ জাফরীর গাড়িখানা। হঠাৎ দেখা গেল পথের একপাশে সেই ছোট্ট কালো রঙের গাড়িখানা দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় গাড়ির চালক ঝুঁকে পড়ে কি দেখছে।

মিঃ জাফরী ড্রাইভারকে গাড়ি রাখতে বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার আদেশ পালন করল।

গাড়ি থেমে পড়তেই মিঃ জাফরী প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভার বের করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন। হ্যাঁ, এই সেই গাড়ি, যে গাড়িতে একটু পূর্বে তিনি ছায়ামূর্তিকে দেখেছিলেন।

মিঃ জাফরীর চোখ দুটো ভাটার মত জ্বলে উঠলো। তিনি দ্রুত ছুটে এসে ঝুঁকে পড়া লোকটার পিঠে রিভলভার চেপে ধরে গর্জে উঠলেন-খবরদার!

গাড়ির চালক মুখ তুলল। একি! বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন মিঃ জাফরী–মিঃ শঙ্কর রাও!

মিঃ শঙ্কর রাও হেসে বলেন–হঠাৎ এভাবে আপনি, আমাকে....

আপনিই এখন আমার ডাকবাংলোর দিক থেকে আসছেন না?

আসছি নয়, যাচ্ছি স্যার। গোপনে আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

মিঃ জাফরী হতবুদ্ধির মত রিভলভারখানা ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, তারপর গম্ভীর গলায় বললেন-এ গাড়িখানা আপনার?

মিঃ শঙ্কর রাও বললেন–না স্যার, এ গাড়ি আমার এক আত্নীয়ের। আমার গাড়িখানা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এই গাড়ি চেয়ে নিয়ে এসেছি। দেখুন তো, এটাও হঠাৎ বিগড়ে বসেছে।

হুঁ। মিঃ জাফরী একটা শব্দ করলেন। তাঁর মুখমণ্ডল বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। তিনি বললেন-আসুন আমার গাড়িতে। ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলেন–তুমি দেখো ওটার কি নষ্ট হয়েছে।

মিঃ শঙ্কর রাও মিঃ জাফরীর গাড়িতে চেপে বসলেন।

মিঃ জাফরী নিজেই ড্রাইভ করে চললেন।

বাংলোয় ফিরে মিঃ জাফরী অবাক হলেন।

মিঃ জাফরীর কক্ষে বাংলোর দারোয়ানকে বন্দী অবস্থায় পাওয়া গেল। হাত-পা মজবুত করে বাঁধা। মুখে একটা রুমাল গোঁজা। হাতের বন্দুকখানা তার হাতের সঙ্গেই দড়ি দিয়ে জড়ানো। মিঃ জাফরী প্রবেশ করেই এ দৃশ্য দেখতে পেলেন।

শঙ্কর রাও ব্যস্তসমস্ত হয়ে দারোয়ানের হাত-পা'র বাঁধন খুলে দিতে শুরু করলেন।

মিঃ জাফরী হুঙ্কার ছাড়লেন–বয়, বয়..

কোন সাড়া নেই। গোটা বাংলো যেন নিঝুমপুরী হয়ে রয়েছে।

ততক্ষণে শঙ্কর রাও দারোয়ানের হাত-পার বাঁধন খুলে দিয়েছেন। মুখের রুমালখানা বের করে ফেলেছেন তিনি।

দারোয়ান মুক্তি পেয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে– হুজুর, এক ভয়ঙ্কর ছায়ামূর্তি!

ছায়ামূর্তি? অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন মিঃ জাফরী।

দারোয়ান কাঁপতে কাঁপতে বলল– সারা শরীরে তার কালো আলখেল্লা। শুধু চোখ দুটো দেখা যাচ্ছিল হুজুর। একেবারে ভূতের মত কালো দু'খানা হাত।

শঙ্কর রাওয়ের মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি অবাক হয়ে রইলেন–একি কাণ্ড স্যার?

মিঃ জাফরী গভীরভাবে কিছু ভাবছিলেন? মিঃ শঙ্কর রাওয়ের কথায় কান দিলেন না। দারোয়ানকে লক্ষ্য করে বললেন–র সব ওরা কোথায় গেলো?

ছায়ামূর্তি সবাইকে পাকের ঘরে বন্ধ করে রেখেছে হুজুর।

এসব তুমি চেয়ে চেয়ে দেখছিলে শুধু?

না হুজুর। আমাকেও ঐ পাকের ঘরে আটকে ফেলেছিল, পরে কি মনে করে আবার টেনে। এই ঘরে এনে রেখে গেল।

দেখুন স্যার, ঘরের জিনিসপত্র তো ঠিক আছে? কথাটা বললেন শঙ্কর রাও।

মিঃ জাফরী কিছু বলার পূর্বেই বলে উঠল দারোয়ান– হুজুর, ছায়ামূর্তি ঘরের কোন জিনিসেই হাত দেয়নি, শুধু ঐ যে টেবিলে কাগজখানা দেখছেন ওটা সে রেখে গেছে।

বল কি, ছায়ামূর্তি চিঠি রেখে গেছে! মিঃ জাফরী এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে কাগজখানা তুলে নিলেন হাতে। লাইটের উজ্জ্বল আলোতে মেলে ধরে পড়লেন– 'হত্যাকারীকে হত্যা করেছি। তুমি ফিরে যাও জাফরী।

শঙ্কর রাও বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন– আশ্চর্য স্যার।

শুধু আশ্চর্য নয় মিঃ রাও, অত্যন্ত বিস্ময়কর। ছায়ামূর্তির এই দুই ছত্র লেখার মধ্যে গভীর রহস্য লুকানো রয়েছে। ছায়ামূর্তি আমাকে ফিরে যাবার জন্যে নির্দেশ দিয়েছে ... হঠাৎ মিঃ জাফরী অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলেন– হাঃ হাঃ হাঃ, ছায়ামূর্তির চেয়ে জাফরী কোন অংশে বুদ্ধিহীন নয়। চলুন মিঃ শঙ্কর রাও, আপনার কথাটা এবার শোনা যাক।

চলুন স্যার।

মিঃ জাফরী বাংলোর বসবার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

.

অতো কেঁদে আর কি হবে বিবি সাহেবা! এটা দুনিয়ার খেলা, জীবন মৃত্যু এ যে মানুষের সাথী! জন্মালে একদিন মরতে হবেই? সরকার সাহেব মরিয়ম বেগমকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন।

মরিয়ম বেগম অশ্রু বিসর্জন করতে করতে বলেন সরকার সাহেব, আমি যে সাগরের পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছি। কোন কূল কিনারা পাচ্ছি না। এই দুর্দিনে ভাগ্যিস আপনি ছিলেন, তাই একটু সান্ত্বনা।

বিবি সাহেবা, আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ আপনাদের চিন্তার কোন কারণ নেই।

কিন্তু চিন্তা না করে কোন উপায় নেই সরকার সাহেব। চিন্তা না করলেও কোথা থেকে একরাশ চিন্তা এসে মাথার মধ্যে সব এলোমেলো করে দেয়। জানি জন্ম-

মৃত্যুকে মানুষ কোন দিন পরিহার করতে পারবে না। চৌধুরী সাহেবের যদি স্বাভাবিক মৃত্যু হত তাহলে আমি এত শোকাভিভূত হতাম না। কিন্তু তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়– কে তাকে হত্যা করল, কেন তাকে হত্যা করা হল, কি তার অপরাধ ছিল?– এসব প্রশ্ন আমাকে পাগল করে তুলেছে সরকার সাহেব। একটু থেমে পুনরায় বললেন মরিয়ম বেগম– মা মনিরার অবস্থাও তো স্বচক্ষে দেখছেন। ওর মামুজানের মৃত্যুর পর মেয়েটা কেমন হয়ে গেছে। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, সব সময় উদ্ভ্রান্তের। মত বিছানায় পড়ে থেকে শুধু চোখের পানি ফেলে। মা আমার দিন দিন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। ওর চোখের পানি আমার আরও অস্থির করে তুলেছে। কি করে আমি চিন্তামুক্ত হই বলুন?

বিবি সাহেবা, পুলিশমহল চৌধুরী সাহেবের হত্যাকাণ্ডের গোপন রহস্য উদঘাটনের জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। মিঃ জাফরী সদা-সর্বদা এই হত্যাকাণ্ড ব্যাপারে ছুটাছুটি করছেন। নিশ্চয়ই এ রহস্য ভেদ হবেই এবং হত্যাকারীর কঠিন সাজাও হবে।

কিন্তু আমি আর কি তাঁকে ফিরে পাবো সরকার সাহেব!

কেউ তা পায় না বিবি সাহেবা। মৃত্যুর গভীর ঘুম থেকে কেউ আর জেগে ওঠে না।

তবে?

শুধু সান্ত্বনা হবে দোষীর উচিত সাজা হয়েছে।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে নকিব–আম্মা, ইন্সপেক্টার সাহেব এসেছেন, আপনার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করতে চান। সঙ্গে এক সাহেব লোক আছেন।

দেখুন তো সরকার সাহেব?

সরকার সাহেব বেরিয়ে যান, একটু পরে ফিরে এসে বলেন–বিবি সাহেবা, ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন এসেছেন–একজন ভদ্রলোকও আছেন তাঁর সঙ্গে।

মরিয়ম বেগম বললেন– উনাদেরকে ভিতর বাড়ির বৈঠকখানায় এনে বসান সরকার সাহেব, আমি আসছি।

সরকার সাহেব পুনরায় বেরিয়ে যান। তিনি মিঃ হারুন এবং তাঁর সঙ্গীকে হলঘরে বসিয়ে অন্দরবাড়িতে খবর দিতে গিয়েছিলেন, এবার তিনি ভদ্রমহোদ্বয়কে ভিতরবাড়ির বৈঠকখানায় নিয়ে বসালেন।

একটু পর মরিয়ম বেগম বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে সালাম জানালেন মিঃ হারুন এবং তার সঙ্গের ভদ্রলোক। ভদ্রলোক অন্য কেউ নয়, মিঃ আলম।

মিঃ হারুন প্রথমে মিঃ আলমের সঙ্গে মরিয়ম বেগমের পরিচয় করিয়ে দিলেন। উনি ডিটেকটিভ শঙ্কর রাওয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু মিঃ আলম। ইনি একজন গোয়েন্দা। তবে মাইনে করা নয়–সখের গোয়েন্দা। মিসেস চৌধুরী, ইনি চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্য উদঘাটনে আমাদের সহায়তা করে চলেছেন।

মরিয়ম বেগম বলে ওঠেন–আমি উনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।

মিসেস চৌধুরী, উনি আপনার নিকটে যা জানতে চাইবেন, বিনা দ্বিধায় বলে যাবেন। কিছু যেন লুকাবেন না। এমনকি আপনার পুত্র সম্বন্ধেও কিছু গোপন করবেন না।

মরিয়ম বেগম মাথা দুলিয়ে বললেন– আচ্ছা।

মামীমার সঙ্গে যখন মিঃ হারুন এবং মিঃ আলমের কথাবার্তা হচ্ছিল তখন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে মনিরা সব লক্ষ্য করছিল ও শুনে যাচ্ছিল।

মিঃ আলম চৌধুরী সাহেবের জীবনী সম্বন্ধে মরিয়ম বেগমকে তখন প্রশ্ন করছিলেন– মিসেস চৌধুরী, আপনার স্বামীর কি কোন শত্রু ছিল বলে আপনার ধারণা হয়?

না, আমার স্বামীর কোন শত্রু ছিল না। তিনি অতি মহৎ লোক ছিলেন। ইন্সপেক্টার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেই তার সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

মহৎ ব্যক্তিরও শত্রু থাকে মিসেস চৌধুরী। বললেন মিঃ হারুন।

মিঃ আলম বলে ওঠেন– আমি চৌধুরী সাহেবের মহত্ব, উদারতা এবং চরিত্র সম্পর্কে পুলিশ অফিস থেকে জানতে পেরেছি। তবু আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। .

করুন।

দেখুন আপনি আমার কাছে কিছুই গোপন করবেন না।

না, কিছু গোপন করব না। জিজ্ঞাসা করুন।

আপনার পুত্র সম্বন্ধে আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। তাকে আপনারা ক'বছর আগে হারিয়েছিলেন?

ঠিক আমার স্মরণ নেই, তবে বছর চৌদ্দ-পনেরো এমনি হবে।

সে হারিয়ে যাবার পর আপনি একটা মেয়েকে কন্যা বলে গ্রহণ করেছেন।

হ্যাঁ, সে আমার ননদের মেয়ে, নিজের মেয়ের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

চৌধুরী সাহেবের অবর্তমানে সেই কি আপনাদের এই বিষয়-আশয়ের একমাত্র অধিকারিণী?

হ্যাঁ, সে ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই।

কেন, আপনার পুত্র মনিরকে আপনি অস্বীকার করেন?

করি না। কিন্তু সে তো আর নেই।

চৌধুরী সাহেবের হত্যা ব্যাপারে আপনার ভাগ্নীর কোন ষড়যন্ত্র থাকতে পারে তো–

চুপ করুন! পৃথিবী পাল্টে গেলেও ওসব আমি বিশ্বাস করব না, করতে পারি না। ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর মরিয়ম বেগমের।

মনিরা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত পিষতে লাগল, এত বড় একটা মিথ্যা সন্দেহ কেউ করতে পারে এ যেন তার ধারণার বাইরে। রাগে-ক্ষোভে অধর

দংশন করতে লাগল সে।

মরিয়ম বেগম বলে চলেছেন, মনিরা ওর মামার মৃত্যুর পর আহার-ন্দ্রিা ত্যাগ করেছে। ফুলের মত সুন্দর মুখখানা ওর শুকিয়ে গেছে। কি যে বলেন আপনারা, ও কথা আমি কখনো বিশ্বাস করব না। তাছাড়া মনিরা আমার ঘরের মেয়ে।

মিসেস চৌধুরী, আমি আপনার ভাগ্নী মিস মনিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব।

মিঃ হারুন বললেন– মিঃ আলম, আপনি মিস মনিরার সঙ্গে পরিচিত হলেই বুঝতে পারবেন, সে তেমন ধরনের মেয়েই নয়।

মরিয়ম বেগম সরকার সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন– সরকার সাহেব, মনিরাকে ডাকুন।

মরিয়ম বেগমের কথা শেষ হতে না হতেই কক্ষে প্রবেশ করে মনিরা, চোখ মুখের ভাব উগ্র; তীব্রকণ্ঠে বলল– আমাকে ডাকছ?

হ্যাঁ মা, ইনি গোয়েন্দা বিভাগের লোক, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

মিঃ আলমের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল।

বললেন– বসুন মিস মনিরা।

বলুন কি বলবেন? মনিরা না বসেই রাগত কণ্ঠে কথাটা বলে।

আবার একটু হাসলেন মিঃ আলম।

মিঃ হারুন বললেন– মিস মনিরা, উনি যা জিজ্ঞাসা করেন তার উত্তর দিন।

নিশ্চয়ই দেব।

মিঃ আলম বললেন–আপনি অযথা ক্ষুণ্ণ হচ্ছেন মিস মনিরা। জানেন আপনার মামার হত্যা ব্যাপারে আমরা আপনাকে সন্দেহ করছি?

মিথ্যা আপনাদের সন্দেহ। মামুজানের হত্যা ব্যাপারে আপনাদেরই যে চক্রান্ত নেই তাই বা কে জানে! আমি শুনেছি, আমার মামুজান সেদিন যে পার্টিতে যোগ দিয়ে জীবন হারিয়েছেন, ঐ পার্টিতে আপনারাও উপস্থিত ছিলেন।

অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলেন মিঃ আলম।

মিঃ হারুনও মিঃ আলমের হাসিতে যোগ দিলেন, তারপর হাসি থামিয়ে বললেন–দেখলেন মিঃ আলম, মিস মনিরা এখন আমাদেরকেই তার মামুজানের হত্যাকারী বলে সন্দেহ করে নিয়েছেন।

এবার গম্ভীর হয়ে পড়লেন মিঃ আলম মিস মনিরার সন্দেহ অহেতুক নয় মিঃ হারুন। চৌধুরী সাহেবের হত্যাকারী কে এখনও তা কেউ জানে না। কাজেই আপনি, আমি, মিস মনিরা কিংবা তার দস্যুপুত্র বনহুরও হতে পারে।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠেন মরিয়ম বেগম–না না, আমার মনির কখনও এ কাজ করতে পারে না।

তবে কাকে আপনার সন্দেহ হয় মিসেস চৌধুরী? প্রশ্ন করলেন মিঃ হারুন।

মরিয়ম বেগম জবাব দিলেন– কেমন করে বলব! আমার স্বামী যে ফেরেস্তার মত মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর যে কোন শত্রু ছিলো না, তা-ই আমি জানি।

মিঃ আলম এবার মনিরাকে লক্ষ্য করে বলেন– মিস মনিরা, আপনিও জানেন আপনার মামুর কোন শত্রু ছিল না বা নেই। তবে কে তাঁকে হত্যা করল, আর কেনই বা করল?

আমিও সেই প্রশ্ন আপনাকে করছি। কারণ আমার মামুর হত্যাকালে আমি সেখানে ছিলাম না, বরং আপনারা সেখানে ছিলেন এবং তার মৃত্যুকালেও উপস্থিত ছিলেন।

তাহলে উনার পুত্র বনহুরের চক্রান্তে?

না, তাও নয়। সে দস্যু হতে পারে, সে ডাকু হতে পারে, কিন্তু পিতৃহত্যাকারী নয়। তীব্র কণ্ঠে কথাগুলো উচ্চারণ করে মনিরা।

মিস মনিরা, আপনি ভুল করছেন। দস্যু-ডাকুদের আবার ধর্ম জ্ঞান আছে নাকি! আমার মনে হয় দস্যু বনহুরই তার পিতাকে হত্যা করেছে। পূর্বের ন্যায় স্থির কণ্ঠে বললেন– মিঃ আলম।

অসম্ভব! মনিরা যেন চিৎকার করে ওঠে। একটু থেমে পুনরায় বলে–পিতাকে হত্যা করতে যাবে সে কোন্ লাভে?

পিতাকে হত্যা করলে তার দুটি উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে মিস মনিরা, এটাও কম নয়। একটা হচ্ছে প্রচুর ঐশ্বর্য, অন্যটা হয়তো আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

ঐশ্বর্যের লালসা দস্যু বনহুরের নেই, এটা আমি জানি। দীপ্তকণ্ঠে বলে উঠে মনিরা।

মিঃ আলম মনিরার কথায় অট্টহাসি হেসে ওঠেন হাঃ হাঃ হাঃ। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন–তাহলে সে দস্যুবৃত্তি করে কেন?

দস্যুতা তার নেশা–পেশা নয়।

মিস মনিরা, আপনি তাকে ভালবাসেন এ কথা আমরা জানি।

সবাই জানে। আপনিও জানবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কিন্তু একজন দস্যুকে ভালবাসা অপরাধ, এটাও আপনি হয়ত জানেন?

ভালবাসা অপরাধ নয়। আমি আর আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে চাই না। আপনারা এখন যেতে পারেন। মনিরা যেমন দ্রুত কক্ষে প্রবেশ করছিলো তেমনি দ্রুত বেরিয়ে যায়।

মিঃ আলম উঠে দাঁড়ান –চলুন মিঃ হারুন, আমার যা প্রশ্ন করার ছিল করা হয়েছে।

মরিয়ম বেগমও উঠে দাঁড়ান–দেখুন, ওর কথায় আপনারা যেন কিছু মনে করবেন না।

না, না, আমরা এতে কিছু মনে করিনি। এসব আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। কথাটা বলে মিঃ আলম দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

মিঃ হারুন তাকে অনুসরণ করলেন।

মরিয়ম বেগম চিন্তিত কণ্ঠে বললেন–সরকার সাহেব, মনিরার ব্যবহারে ওরা রাগ করেন নি তো?

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বিবি সাহেবা। মা মনি কোন অন্যায় বলেন নি। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।

কি জানি কখন কি ঘটে বসে–ভয় হয়।

.

দেখ মা, তখন পুলিশের লোককে অমন করে বলা ঠিক হয় নি। শান্তকণ্ঠে মনিরার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন মরিয়ম বেগম।

মনিরা বিছানায় শুয়ে একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। মুখমণ্ডল বিষণ্ন। চোখ দুটি লাল। একটু পূর্বে হয়ত কেঁদেছে সে। মামীমার কথায় বইখানা পাশে রেখে বিছানায় উঠে বসল, কোন কথা বলল না।

মরিয়ম বেগম স্নেহভরা গলায় পুনরায় বললেন–আমাদের দেখার এক খোদা ছাড়া কেউ নেই। এ অবস্থায় পুলিশের লোকরা যদি ক্ষেপে যায় তাহলে আর যে কোন উপায় থাকবে না মা।

মামীমা, এই না বললে খোদা ছাড়া কেউ নেই। তবে কেন মিছেমিছি ভয় পাচ্ছো? সত্যি কথা বলব তাতে ভয় কি? পুলিশের লোক হলো বলেই তাদের আমি তোষামোদ করে চলতে পারব না। মামীমা, যে পুলিশের লোক অযথা একজনের নামে মিথ্যা অপবাদ দিতে পারে, তাদের আমি সমীহ করে চলব, এমন মনোবৃত্তিও আমার হবে না। অদৃষ্টে যা আছে হবেই মামীমা, কেন তুমি এত করে ভাবছ? দুনিয়ায় যাদের কেউ নেই তাদের কি দিন যায় না?

আজ যদি আমার মনির থাকত– বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে মরিয়ম বেগমের কণ্ঠ।

কে বলে তোমার মনির নেই? দরজার ওপাশ থেকে ভেসে আসে একটা গম্ভীর শান্ত কণ্ঠস্বর।

চমকে ফিরে তাকায় মনিরা, ফিরে তাকান মরিয়ম বেগম। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে উভয়ের মুখমণ্ডল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বনহুর।

মনিরা ত্বরিত বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এত ব্যথা বেদনার মধ্যেও তার মুখমণ্ডল এক স্বর্গীয় আভায় দীপ্ত হয়ে উঠল। ঠোঁট দুখানা একটু নড়ে উঠে থেমে গেল।

মরিয়ম বেগম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠেন– মনির, বাবা তুই এসেছিস? ওরে মনির– দুই হাত প্রসারিত করে দেন মরিয়ম বেগম পুত্রের দিকে– ওরে আয়!

বনহুরের মুখমণ্ডলে খেলে যায় এক অভূতপূর্ব আনন্দের দ্যুতি। ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে অস্ফুট কণ্ঠে ডেকে ওঠে– মা!

ওরে আমার পাগল ছেলে! ওরে আমার মনির, কোথায় লুকিয়ে থাকিস্ বাবা তুই?

এই তো মা আমি তোমাদের পাশে।

আর আমি তোকে যেতে দেব না। কিছুতেই তোকে ছেড়ে দেব না মনির।

মাতা পুত্রের এই অপূর্ব মিলন মনিরার হৃদয়ে এক আনন্দের উৎস বয়ে আনে। নিষ্পলক নয়নে সে তাকিয়ে তাকিয়ে উপভোগ করে এই পবিত্র মধুময় দৃশ্য।

মরিয়ম বেগম বনহুরকে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বললেন–আমাদের দেখার কেউ যে নেই বাবা।

কেন, আমি রয়েছি তো। যখন তুমি আমায় ডাকবে, দেখবে আমি তোমাদের পাশে রয়েছি।

বাবা মনির!

হ্যাঁ মা, আমি কি তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারি?

জানিস্ বাবা, আজ পুলিশ এসেছিল। কি রকম সব কথাবার্তা তাদের। আমার বড় ভয় করে।

কোন ভয় নেই মা। যতক্ষণ তোমার মনির বেঁচে আছে, ততক্ষণ তোমাদের কোন ভয় নেই। যত ঝড়-ঝঞ্ঝা আসুক সব আমি বুক পেতে নেব। একটু থেমে বলে বনহুর-বাবার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী মা।

মনির!

হ্যাঁ মা, আমি খেয়াল না দেবার জন্যই তিনি আজ মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি তাঁর হত্যাকারীকে চরম শাস্তি … কি বলতে গিয়ে থেমে যায় বনহুর।

মরিয়ম বেগম এবং মনিরা বনহুরের মুখোভাব লক্ষ্য করে শিউরে ওঠে। চোখ দুটো ওর আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠে। দাঁতে দাঁত পিষে সে। দ্রুত নিঃশ্বাসের দরুন প্রশস্ত বক্ষ বারবার ওঠানামা করে। দক্ষিণ হাত মুষ্টিবদ্ধ হয় তার।

মরিয়ম বেগম জীবনে পুত্রের এ রূপ দেখেন নি। তিনি হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। কোন কথা বলার সাহস হয় না তার।

কিছুক্ষণ কেটে যায়, প্রকৃতিস্থ হয় বনহুর।

মরিয়ম বেগম বলেন–বাবা, আজ বিশটি বছর তোর মুখে আমি খাবার তুলে দেইনি। আজ আমি তোকে খাওয়াব।

এত রাতে কি খাওয়াবে মা?

ওরে, ছোটবেলায় তুই দুধের পায়েস খেতে বড় ভালবাসতিস। আজ পনের বছর ধরে আমি দুধের পায়েস তৈরি করে তোর কথা ভাবি, প্রতিদিন আমি সাজিয়ে রাখি আমার ছোট আলমারীতে। পরদিন বিলিয়ে দেই গরিব বাচ্চাদের মুখে।

আজও বুঝি রেখেছ?

হ্যাঁরে হ্যাঁ। তুই বোস আমি আসছি।

মনিরা বলে ওঠে–তুমি বস মামীমা, আমি আনছি।

মা, তুই পারবি না, আমি আনছি। বেরিয়ে যান মরিয়ম বেগম।

মা বেরিয়ে যেতেই বনহুর উঠে দাঁড়াল, ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল, সে মনিরার পাশে, শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে ডাকল– মনিরা!

বল।

কথা বলছ না যে?

মাতা-পুত্রের অপূর্ব মিলনে আমি যে মুগ্ধ হয়ে গেছি। স্বর্গীয় দীপ্তিময় এক জ্যোতির অনুভূতিতে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মনিরা! অস্ফুট শব্দ করে বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় কাছে। গভীর আবেগে বুকে চেপে ধরে বলে–আর তোমাকে পেয়ে হয়েছে আমার জীবন পরিপূর্ণ।

ছিঃ ছেড়ে দাও! মামীমা এসে পড়বেন।

আসতে দাও। মনিরা, কতদিন তোমায় এমন করে পাশে পাইনি। মনিরা, আমার মনিরা!

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করেন মরিয়ম বেগম, বাঁ হাতে তাঁর পায়েসের বাটি, দক্ষিণ হাতে পানির গ্লাস।

বনহুর মনিরাকে ছেড়ে দিয়ে সরে আসে মায়ের পাশে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হা করে –কই দাও।

মরিয়ম বেগম পানির গ্লাস টেবিলে রেখে ছোট্ট চামচখানা দিয়ে বাটি থেকে পায়েস নিয়ে মুখে তুলে দেন।

বনহুর মায়ের চেয়ে অনেক লম্বা তাই সে মাথা নিচু করে মায়ের হাতে পায়েস খেতে থাকে। তারপর খাওয়া শেষ করে টেবিল থেকে পানির গ্লাস নিয়ে এক নিঃশ্বাসে শেষ করে বলে– আঃ কতদিন পর আজ আমি খেয়ে তৃপ্তি পেলাম। এমনি করে তোমার হাতে কতদিন খাইনি!

তোকে এমনি করে না খাওয়াতে পেরে আমিও কি শান্তিতে আছিরে! অহরহ আমার মনে তুষের আগুন জ্বলছে! ওরে, তোকে আমি ছেড়ে দেব না।

মা, তুমি আমাকে গ্রহণ করলেও সভ্যসমাজ আমাকে গ্রহণ করবে না। আমি যে অপরাধী

না না, তা হয় না, আমি তোকে যেতে দেব না মনির, যেতে দেব না–মরিয়ম বেগম পুত্রের জামার আস্তিন চেপে ধরেন।

বনহুর মাকে সান্ত্বনা দেয়– তুমি তো জানো মা, তোমার পুত্রকে পাকড়াও করার জন্য পুলিশ অহরহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমার পুত্রকে গ্রেফতার করতে পারলে লাখ টাকা পুরস্কার পাবে। এমন অবস্থায় তুমি আমাকে রাখতে পারবে?

ধীর ধীরে বনহুরের জামার আস্তিন ছেড়ে দেন মরিয়ম বেগম, দু'গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন তিনি। তবে কাকে নিয়ে আমি বেঁচে থাকব বাবা?

মনিরাকে দেখিয়ে বলে বনহুর– ওকে নিয়ে। ঐ তো তোমার সব। কিন্তু ওকে কি আমি চিরদিন ধরে রাখতে পারব? জানিস তো, মনিরা এখন বড় হয়ে গেছে।

মায়ের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বনহুর। তার মা কি বলতে চান? মনিরা বড় হয়ে গেছে– একথা বলার পেছনে একটা ইংগিত রয়েছে, বুঝতে বাকি থাকে না বনহুরের। কিন্তু– না না, তা হয় না– সে যে দস্যু, মনিরা নিষ্পাপ পবিত্র, তার সঙ্গে মনিরার জীবন জড়ানো যায় না।

বনহুর একবার মায়ের মুখের দিকে আর একবার তাকায় মনিরার মুখের দিকে। অসম্ভব, মনিরার জীবনটা সে নষ্ট করতে পারে না। একটা দস্যুকে বিয়ে করে সে কিছুতেই সুখী হতে পারবে না। বনহুর নিজের চুলের মধ্যে আংগুল চালনা করতে লাগল। কেমন অস্থির একটা ভাব ফুটে উঠল তার মধ্যে। হঠাৎ বলে উঠল–মা চললাম।

মনির! অস্ফুট কণ্ঠে ডেকে ওঠেন মরিয়ম বেগম।

ততক্ষণে বনহুর পেছনের জানালা খুলে বেরিয়ে গেছে।

মনিরা নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কোন কথা বের হল না তার মুখ থেকে।

.

মিঃ জাফরীর ডাকবাংলোয় ছায়ামূর্তির আবির্ভাব নিয়ে পুলিশমহলে বেশ উদ্বিগ্নতা দেখা দিল। মিঃ জাফরী রাতেই পুলিশ অফিসে ফোন করেছিলেন। মিঃ হারুন, মিঃ হোসেন এবং আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসার তখনই ডাকবাংলোয় গিয়ে হাজির হলেন। মিঃ আলমও গিয়েছিলেন মিঃ হারুনের সঙ্গে।

অনেক অনুসন্ধানের পর এবং দারোয়ান ও বয়ের জবানবন্দী নিয়েও ছায়ামূর্তি সম্বন্ধে এতটুকু সূত্র আবিষ্কারে সক্ষম হলেন না কেউ।

মিঃ শঙ্কর রাও যে আলোচনার জন্য বাংলো অভিমুখে আসছিলেন সে কথা সেদিনের মত স্থগিত রইল। ছায়ামূর্তি নিয়েই আলাপ চলতে লাগল।

মিঃ জাফরী কিন্তু কথার ফাঁকে বারবার শঙ্কর রাওয়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। একটা সন্দেহের ঘন ছায়া তাঁর গোটা মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তিনি যেন ঐ কালো রঙের গাড়িখানাকেই একটু পূর্বে তার বাংলোর গেটের ভেতর থেকে অতি দ্রুত বেরিয়ে যেতে দেখেছিলেন। তবে কি শঙ্কর রাওয়ের মধ্যে কোন গোপন রহস্য লুকানো আছে? মিঃ চৌধুরীর মৃত্যুর দিনও শঙ্কর রাও তাঁর পাশে বসে খাচ্ছিলেন। চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুক্ষণে মিঃ রাওয়ের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল লক্ষ্য করেছিলেন মিঃ জাফরী। ডাক্তার জয়ন্ত সেনের সম্বন্ধেও মিঃ রাওয়ের মনোভাব খুব স্বচ্ছ ছিল না। প্রায়ই মিঃ রাও জয়ন্ত সেন সম্বন্ধে নানারকম সন্দেহজনক কথাবার্তা বলতেন। ভগবৎ সিং বৈশি দস্যু নাথুরামের সম্বন্ধে অবশ্য মিঃ শঙ্কর রাও কোনরকম মন্তব্য করেন নি, তবু তার সঙ্গেও যে তার কোন ভালো ভাব ছিল তাও নয়। মিঃ জাফরী গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন ছায়ামূর্তি কে হতে পারে এবং পর পর কেনই বা সে এই তিন তিনটে খুন করল?

অনেক সন্ধান করেও ছায়ামূর্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না কেউ। সবার বিদায় গ্রহণ। করার পরও মিঃ জাফরী চিন্তামুক্ত হলেন না, রাত্রে চারটা খেয়ে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু নিদ্রাদেবী কিছুতেই তাঁর কাছে আসতে চাইলেন না।

সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চললেন মিঃ জাফরী।

শহরের শেষ প্রান্তে নির্জন স্থানে এই বাংলোখানা। বাংলোর সম্মুখের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখলে দেখা যায় শহরের বড় বড় দালানকোঠা আর ইমারত। ছবির মত সুন্দর একটা শহর। আর পেছন বারান্দায় ফিরে দাঁড়ালে

নজরে পড়ে বিস্তৃত প্রান্তর। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝোঁপঝাড় আর আগাছায় ভরা টিলা।

মিঃ জাফরীর মাথায় চিন্তার জাল জট পাকাচ্ছিল। পাশের টেবিলে রাখা এ্যাসট্রেটা অর্ধদগ্ধ সিগারেটে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি ভাবছিলেন, এলেন দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের জন্য। দস্যু

বনহুরকে পাকড়াও করে তিনি পুলিশমহলে স্বনামধন্য হবেন, কিন্তু তিনি জড়িয়ে পড়লেন ছায়ামূর্তির বেড়াজালে।

মিঃ জাফরীর সিগারেটের ধুয়া কক্ষটার মধ্যে একটা ধুমকুণ্ডলির সৃষ্টি করছিল। সামনের দরজা বন্ধ থাকলেও পেছনের জানালা মুক্ত করে দিয়েছিলেন মিঃ জাফরী। কারণ বন্ধ হওয়ায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল তাঁর।

মিঃ জাফরী গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছেন, এমন সময় ঠিক তার শিয়রে খট করে একটা শব্দ হল। কক্ষে ডিমলাইট জ্বলছিল, স্বল্পালোকে ফিরে তাকালেন মিঃ জাফরী। সঙ্গে সঙ্গে শিয়রে রাখা রিভলভারে হাত দিতে গেলেন, কিন্তু তার পূর্বেই চাপা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো তার কানে রিভলবারে হাত দেবার চেষ্টা করবেন না।

ধীরে ধীরে হাত সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসলেন মিঃ জাফরী। ডিমলাইটের স্বল্পালোকে দেখলেন একটা জমকালো ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে তার শিয়রের কাছে। হাতে তার উদ্যত রিভলভার। আবছা অন্ধকারে ছায়ামূর্তির হাতের রিভলভারখানা চক্ করে উঠল। ছায়ামূর্তির সমস্ত শরীর জমকালো আলখেল্লায় ঢাকা।

মিঃ জাফরী ভয় পাবার লোক নন, তিনি গর্জে উঠলেন– কে তুমি?

পূর্বের ন্যায় চাপা কণ্ঠস্বর– আমার নাম ছায়ামূর্তি।

কি তোমার উদ্দেশ্য? জানো আমি তোমায় গ্রেফতারের জন্য অহরহ প্রচেষ্টা চালাচ্ছি?

জানি। কিন্তু ছায়ামূর্তিকে গ্রেপ্তার করা যত সহজ মনে করেছ ঠিক তত নয়। এখনও বলছি, ফিরে যাও জাফরী।

না, আমি এই খুনের রহস্য ভেদ না করে ফিরে যাব না। কে তুমি আমাকে জানতে হবে।

হাঃ হাঃ হাঃ, ছায়ামূর্তির আসল রূপ তুমি দেখবে? কিন্তু তুমি আমার আসল চেহারা দেখলে শিউরে উঠবে। ওপরের খোলসের চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর আমার ভেতরের চেহারা।

যত ভয়ঙ্করই হউক না কেন, ভয় পাই না আমি। জাফরী কোনদিন ভয়ঙ্কর দেখে ভয় পায়। না। কথার ফাঁকে মিঃ জাফরী পুনরায় তার রিভলভারে হাত দিতে যান।

কিন্তু তার পূর্বেই ছায়ামূর্তি মিঃ জাফরীর রিভলভারখানা হাতে তুলে নিয়েছে। এবার বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ছায়ামূর্তি গর্জে ওঠে– আলেয়ার পেছনে ছুটাছুটি না করে সত্যের সন্ধান কর। তাহলেই সব জানতে পারবে।

মিঃ জাফরী কিছু বলার পূর্বেই ছায়ামূর্তি খোলা জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়লো বাইরে।

মিঃ জাফরী চিৎকার করে ডাকলেন– দারোয়ান, দারোয়ান– সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার তুলে নিলেন হাতে–হ্যালো! হ্যালো পুলিশ অফিস? আমি মিঃ জাফরী, ডাকবাংলো থেকে বলছি। আপনি মিঃ হারেস?– এই মাত্র আমার কক্ষে ছায়ামূর্তি এসেছিল– মিঃ হারুন অফিসে নেই?ওপাশ থেকে ভেসে আসে মিঃ হারেসের ভীত কণ্ঠস্বর–আমি ইন্সপেক্টার সাহেবকে ফোন করছি। তাকে সঙ্গে করে কি ডাকবাংলোয় আসব?

আসতে আর হবে না। ছায়ামূর্তি ভেগেছে।

কি করবো তাহলে স্যার?

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, আপনি তাঁকে ফোন করে দিন। এক্ষুণি এখানে আসতে বলুন তাকে, আপনিও কয়েকজন পুলিশ নিয়ে চলে আসুন।

মিঃ হারুন সংবাদটা শোনামাত্র উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন– মিঃ জাফরীর কক্ষে ছায়ামূর্তি!

তৎক্ষণাৎ পুলিশ ফোর্সসহ মিঃ জাফরীর বাংলোয় ছুটলেন মিঃ হারুন।

বাংলোর চারপাশে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়েও ছায়ামূর্তির কোন খোঁজ বা চিহ্ন পাওয়া গেল না।

গোটা রাত অনিদ্রায় কাটালেন মিঃ জাফরী। সঙ্গে মিঃ হারুন ও তাঁর দলবলসহ জেগে রইলেন।

মিঃ জাফরী একসময় মিঃ হারুনকে লক্ষ্য করে বললেন– দেখুন মিঃ হারুন, এই ছায়ামূর্তি রহস্যটা ক্রমেই চক্রজাল বিস্তার করছে। আপনি গোপনে সমস্ত শহরের আনাচে কানাচে সি. আই. ডি. পুলিশ নিযুক্ত করে দিন।

স্যার, আপনার কথামত সি. আই. ডি. পুলিশ শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু তারা আজও এই ছায়ামূর্তি সম্বন্ধে কোন রকম রিপোর্ট পেশ করতে সক্ষম হন নি।

আশ্চর্য সাহস এই ছায়ামূর্তির–আপনার কক্ষে যে নিঃসঙ্কোচে প্রবেশ করতে পারে। তাছাড়া বাংলোর চারপাশে কড়া পাহারা থাকা সত্ত্বেও সে কেমন করেই বা প্রবেশ করল! কথাগুলো বললেন মিঃ জাহেদ।

প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। ঠিক এমন সময় হঠাৎ পুলিশ অফিস থেকে বড় দারোগা মিঃ জসীম ফোন করলেন।

টেবিলের ফোনটা ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠতেই মিঃ হারুন হাই তুলে উঠে দাঁড়ালেন, রিসিভার তুলে নিলেন হাতে– হ্যালো, স্পিকিং মিঃ হারুন। কি বলেন, ছায়ামূর্তি পুলিশ অফিসে ...

কক্ষে সকলেই বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন মিঃ হারুনের দিকে। মিঃ জাফরী অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন– পুলিশ অফিসে ছায়ামূর্তি..... ছায়ামূর্তি পুলিশ অফিসে গিয়েছিল। এই নিন স্যার রিসিভারখানা মিঃ জাফরীর হাতে দেন মিঃ হারুন।

মিঃ জাফরী ফোনে মুখ রেখে গুরু গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠেন–কি বলছেন আপনি! ছায়ামূর্তি পুলিশ অফিসে প্রবেশ করেছিল?

ওপাশ থেকে ভেসে আসে মিঃ জসীমের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর-হাঁ স্যার। আমি ও আর দু'জন পুলিশ ছিলাম, কিন্তু ছায়ামূর্তির দু'হাতে দুটো রিভলভার ছিল।

সে কি করেছে? পুলিশ অফিসে তার কি প্রয়োজন ছিল?

সে ডায়েরীখানা নিয়ে কি যেন সব দেখল। দু'খানা ছবিও সে নিয়ে গেছে।

ছবি! কিসের ছবি? কার ছবি? মিঃ জাফরী গর্জে ওঠেন।

মিঃ জসীমের ব্যস্ত কণ্ঠস্বর– স্যার, দাগীর ছবি। দুটো দাগী বদমাইশের ছবি নিয়ে গেছে ছায়ামূর্তি।

বলেন কি!

হ্যাঁ স্যার, অদ্ভুত কাণ্ড।

মিঃ জাফরী হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেন–এখন ভোর সাড়ে চারটা। আমরা এক্ষুণি পুলিশ অফিসে আসছি।

আসুন স্যার। অফিসে আমরা সবাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি।

মিঃ জাফরী রিসিভার রেখে উঠে পড়েন। মিঃ হারুনকে লক্ষ্য করে বলেন– এক্ষুণি পুলিশ অফিসে যেতে হবে।

অন্য সবাই মিঃ জাফরীর সঙ্গে উঠে পড়লেন।

.

পুলিশ অফিসে পৌঁছে মিঃ জাফরী এবং অন্যান্য অফিসার বিস্মিত ও হতবাক হলেন। ছায়ামূর্তি পুলিশ অফিসের সমস্ত খাতাপত্র তচনচ করে ডায়েরীর পাতা খুঁজে বের করেছে এবং দুটো ছবি নিয়ে গেছে।

ছায়ামূর্তির এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে সবাই অবাক হলেন। অফিসের ডায়েরী খাতায় সে কিসের সন্ধান করেছে? দাগীদের দু'খানা ফটোই বা সে কি করবে, ভেবে কেউ সঠিক জবাব খুঁজে পেলেন না।

ছায়ামূর্তিকে নিয়ে গভীর আলোচনা শুরু হল। সন্ধান নিয়ে দেখা গেল, যে দু'খানা ফটো অফিস থেকে হারিয়েছে তার একটা দস্যু নাথুরামের এবং অন্যটা শয়তান মুরাদের।

ব্যাপার ক্রমেই জটিল হচ্ছে।

মিঃ জাফরী গভীর চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লেন।

ইতোমধ্যে মিঃ শঙ্কর রাও এবং মিঃ আলম এসে পুলিশ অফিসে হাজির হয়েছেন। মিঃ আলমের চোখে মুখেও উৎকণ্ঠার ছাপ। পুলিশ অফিসে হানা দেয়া। এ কম কথা নয়! ছায়ামূর্তির দুঃসাহস ক্রমে বেড়েই চলেছে।

মিঃ জাফরী বহুক্ষণ নিশ্চুপ চিন্তা করার পর বললেন– ছায়ামূর্তি যেই হউক সে শিক্ষিত।

আপনার অনুমান সত্য স্যার। ছায়ামূর্তির আচার ব্যবহারে তাকে অত্যন্ত চতুর এবং বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়। মিঃ আলম বললেন।

মিঃ জাফরী কুঞ্চিত করে বললেন– শুধু চতুর আর বুদ্ধিমানই সে নয় মিঃ আলম– অত্যন্ত ধূর্ত।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন– এই ছায়ামূর্তি মুরাদ ছাড়া অন্য কেউ নয়। সে একদিকে যেমন শিক্ষিত তেমনি বুদ্ধিমান। বিলাতে কত বছর কাটিয়ে এসেছে। শিয়ালের মত ধূর্ত সে।

হ্যাঁ স্যার, সেই যদি না হবে তবে নাথুরাম এবং মুরাদের ফটো সে নিয়ে যাবে কেন! মিঃ জাহেদ বললেন।

ছায়ামূর্তি নিয়ে যখন গভীর আলোচনা চলছিল ঠিক সেই সময় কক্ষে প্রবেশ করলেন মুরাদের পিতা খান বাহাদুর সাহেব। কক্ষস্থ সবাই হঠাৎ এই ভোরবেলায় খান বাহাদুর সাহেবকে হন্তদন্ত হয়ে অফিসে প্রবেশ করতে দেখে আশ্চর্য হলেন।

আজ তাকে ছন্নছাড়ার মত লাগছিল। তেলবিহীন উস্কখুস্ক সাদা চুলগুলো এলোমেলো, ঘঘালাটে চোখে বেদনার সুস্পস্ট ছাপ, মুখমণ্ডল বিষণ্ন উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠিত ভাব।

কক্ষস্থ সবাই একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলেন।

মিঃ হারুন জিজ্ঞাসা করলেন– ব্যাপার কি খান বাহাদুর সাহেব?

হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন খান বাহাদুর সাহেব–একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

দুর্ঘটনা! আপনার না আপনার পুত্রের? জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ হারুন।

আমার! আমার ইন্সপেক্টর, আমার। পুত্রের আমি কোন ধার ধারি না। সে মরলেও আমার ক্ষতি নেই, বাঁচলেও আমার লাভ নেই।

তবে আপনার কি দুর্ঘটনা ঘটল?

কি বলব ইন্সপেক্টার সাহেব, কি বলব– ধপ করে পাশের একটা চেয়ারে বসে পড়েন খান বাহাদুর সাহেব, তারপর ঘোলাটে চোখে একবার কক্ষের সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন– যে ছায়ামূর্তি নিয়ে আপনারা উতলা হয়ে পড়েছেন, সেই ছায়ামূর্তি আজ আমার ওপর হামলা চালিয়েছিল।

কক্ষে যেন বাজ পড়ে।

মিঃ জাফরী বিস্ময়ভরা গলায় বলে ওঠেন ছায়ামূর্তি।

হা জনাব। আজ কদিন আমার মনের অবস্থা ভালো নেই, একমাত্র সন্তানের জ্বালায় আমি তো পাগল হয়ে গেছি।

এখনও হন নি। আরও হবেন। গম্ভীর স্থিরকণ্ঠে বলেন মিঃ আলম।

সত্যি, আমার ওকে নিয়ে কি যে যন্ত্রণা! ওর চিন্তায় ঘুম নেই চোখে। সারাটা রাত অনিদ্রায় কাটে। আজও তেমনি গোটা রাত দুশ্চিন্তায় ছটফট করেছি। ভোর পাঁচটা কিংবা সাড়ে পাঁচটা হবে, আমি শয্যা ত্যাগ করে বাইরে বেরুতে যাব, এমন সময় হঠাৎ আমার সম্মুখে একটা জমকালো ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল।

কক্ষস্থ সবাই ‘থ’ মেরে শুনছেন।

খান বাহাদুর সাহেবের চোখেমুখে ভীতি ভাব ফুটে উঠেছে। তিনি বলে চলেছেন– আমি ছায়ামূর্তি দেখে চিৎকার করতে যাব অমনি তার হাতের

রিভলভারে নজর পড়তেই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল আমার। ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম– তুমি কে? অদ্ভুত মূর্তিটা জবাব দিল, আমি ছায়ামূর্তি। হঠাৎ খান বাহাদুর সাহেব কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে উঠলেন– ইন্সপেক্টার সাহেব, ছায়ামূর্তি আমার সর্বস্ব নিয়ে গেছে।

আচ্ছা, ঘটনাটা আগে বিস্তারিত বলুন! বললেন মিঃ জাফরী।

সে আমার কাছে এক লাখ টাকা চেয়ে বসল। না হলে আমাকে সে হত্যা করবে বলে ভয়। দেখাল।

তারপর?

আমি কি করি বলুন? জীবনের ভয় কার না আছে? বারবার দরজার দিকে তাকাতে লাগলাম, ভাবলাম–বয়টা এতক্ষণও আসে না কেন? কারণ, আমার একটা বয় আছে, সে খুব সকালে উঠে আমাকে মুখহাত ধোয়ার পানি দিত এবং চা তৈরি করে দিত। আশ্চর্য ইন্সপেক্টার সাহেব, ছায়ামূর্তিটা যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারল। সে চাপাকণ্ঠে বলল– ওরা এখন কেউ আসবে না খান বাহাদুর সাহেব।

শেষ পর্যন্ত কি করলেন আপনি? এবার প্রশ্ন করলেন মিঃ হারুন।

কি করবো, লাখ টাকা দিয়ে ছায়ামূর্তিকে বিদায় করলাম। কিন্তু আমি কি করব ইন্সপেক্টার, আমার সর্বস্ব সে নিয়ে গেছে.....

মিঃ হারুন বলে ওঠেন– ঘাবড়াবেন না খান বাহাদুর সাহেব, এটাও আপনার গুণধর পুত্র মুরাদের কারসাজি।

মিঃ হারুনের দিকে তাকান খান বাহাদুর সাহেব– তার মানে?

মানে ছায়ামূর্তির বেশে আপনার পুত্রই আপনার লাখ টাকা হস্তগত করেছে।

না না, সে গলা মুরাদের নয়।

আপনি বুঝতে পারছেন না খান বাহাদুর সাহেব, একটা যন্ত্র আছে সেটা মুখে পরলে তার। কণ্ঠস্বর কেউ চিনতে পারবে না বা পারে না।

আপনারা বলতে চান সেই ছায়ামূর্তি আমার ছেলে মুরাদ?

অসম্ভব নয় খান বাহাদুর সাহেব। আপনার পুত্রের নিরুদ্দেশের পেছনে বিরাট একটা রহস্য আছে। সেই রহস্যকে কেন্দ্র করেই এই তিনটে খুন সংঘটিত হয়েছে। কথাগুলো বলে থামলেন মিঃ হারুন।

মিঃ জাফরী এতক্ষণ গম্ভীরভাবে সব শুনে যাচ্ছিলেন। এবার তিনি সোফায় ভাল হয়ে বসে বললেন-মিঃ হারুন, ছায়ামূর্তি যে খান বাহাদুর সাহেবের পুত্র মুরাদই এটা আপনি সঠিক করে বলতে পারেন না। কারণ ছায়ামূর্তির পেছনে একটা চক্রজাল বিস্তার করে রয়েছে। কে ছায়ামূর্তি– কেউ জানে না।

খান বাহাদুর সাহেব মিঃ জাফরীর কথায় সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হল। হাজার দোষে দোষী হউক তবু সে পুত্র। পিতামাতার নিকটে পুত্র-কন্যা যতই অপরাধী হউক না কেন, তবু তারা ক্ষমার পাত্র। খান বাহাদুর সাহেব কতকটা যেন আশ্বস্ত হয়েছেন বলে মনে হল। কিছুক্ষণের জন্য তিনি ভুলে গেলেন লাখ টাকার কথা।

কিন্তু পরক্ষণেই যখন তাঁর টাকার কথা মনে হলো তখনই তিনি হা হুতাশ করে উঠলেন আমার লাখ টাকার কি হবে ইন্সপেক্টার সাহেব? আর কি ও টাকা পাব না?

দুরাশা খান বাহাদুর সাহেব, যে টাকা হারিয়ে যায় তা ফেরত পাওয়া দুরাশা মাত্র– মিঃ আলম শান্তকণ্ঠে বললেন।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন– সে কথা সত্য। হারিয়ে যাওয়া কিংবা চুরি যাওয়া জিনিস কদাচিৎ ফেরত পাওয়া যায়।

মিঃ জাফরী গম্ভীর কণ্ঠে বলেন ওঠেন– খান বাহাদুর সাহেবের লাখ টাকা আর ফেরত আসবে না এটা সত্য। কারণ, ছায়ামূর্তি অতি বুদ্ধিমান। তারপর খান বাহাদুর সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন– আপনার কেসটা ডায়েরী করে যান, আমরা আপনার টাকা উদ্ধার ব্যাপারে চেষ্টা করে দেখব।

খান বাহাদুর সাহেব কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালেন মিঃ জাফরীর মুখের দিকে।

মিঃ হারুন নিজে খান বাহাদুর সাহেবের কেসটা ডায়েরী করে নিলেন।

রৌদ্রদগ্ধ নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে নিজের ঘরে বসে বই পড়ছিল মনিরা। মরিয়ম বেগম আজ বাড়ি নেই, কোন এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেছেন। বহুদিন তিনি বাড়ির বাইরে যান নি। বিশেষ করে চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুর পর মরিয়ম বেগম একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, নিজের ঘর ছেড়ে তিনি একরকম বেরই হন না। মনিরাই তাকে অনেক বলে কয়ে পাঠিয়েছে। যাও মামীমা, খালাম্মাদের বাড়ি থেকে আজ একটু বেড়িয়ে এসো– বলেছিল মনিরা।

মরিয়ম বেগম ম্লান হেসে বলেছিলেন– ওসব আর ভাল লাগে না মা। যেখানেই যাই না কেন, শূন্য শূন্য মনে হয়। সে যে আমার সব নিয়ে গেছে।

মনিরা সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল-মামীমা, এভাবে নিজকে নিঃশেষ করে আর কি হবে! তিনি বেহেস্তের মানুষ, বেহেস্তে চলে গেছেন। ডাক এলে তুমি আমি সবাই যাব।

মনিরা মামীমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল বটে কিন্তু তার হৃদয়েও মামুজানের বিরহ-বেদনা তুষের আগুনের মতই ধিকি ধিকি জ্বলছিল। মনের সমস্ত বেদনাকে চাপা দিয়ে আজকাল মনিরা নিজেকে প্রসন্ন রাখার চেষ্টা করত, বিশেষ করে মামীমার জন্য তাকে একটু শক্ত হতে হয়েছে। মনিরা প্রথম দিকে নিজেকে প্রকৃতিস্থ রাখতে পারেনি। সব সময় সে নির্জনে বসে বসে কাঁদত। মামুজানই ছিল তাদের ভরসা।

কিন্তু মনিরা জ্ঞানবতী-শিক্ষিতা। সে দেখলো তার চোখের পানি শোকাতুরা মরিয়ম বেগমকে আরও শোকবিহ্বল করে তুলছে। কাজেই নিজেকে সংযত করে নিয়ে মামীমাকে প্রসন্ন রাখার চেষ্টা করতো।

আজ তাই মনিরা একরকম জিদ করেই মামীমাকে তার এক দূর-সম্পর্কীয় বোনের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। তবু কিছুক্ষণের জন্য এই বদ্ধ হাওয়া থেকে মুক্তি পাবেন। নানারকম কথাবার্তায় মনে আসবে পরিবর্তন।

মামীমাকে পাঠিয়ে মনিরা নিজের ঘরে বসে একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। ভাবছিল কত কথা। ছোট বেলায় পিতাকে হারানোর কথা, যদিও তার মনে নেই, কিন্তু বড় হয়ে যখন শুনেছিল তার আব্বা নেই, তখন একটা নিদারুণ ব্যথা তার শিশু অন্তরকে নিষ্পেষিত করে দিয়েছিল। তারপর মাকে হারানোর

পালা। সেদিনের কথা মনে পড়লে আজও মনিরার হৃদয়ে হাতুড়ির ঘা পড়ে। সেদিন মনিরা নিজের জীবনকে একটা অপেয় জীবন বলে মনে করেছিল। তার মত অভাগী মেয়ে বুঝি আর এ জগতে নেই।

কিন্তু মামা-মামীমার অপরিসীম স্নেহ আর ভালোবাসার আবেষ্টনী মনিরার অন্তরের আঘাতকে সান্ত্বনার প্রলেপে একদিন ভরে তুলেছিল। হারানো পিতামাতার বঞ্চিত স্নেহনীড়, খুঁজে পেয়েছিল সে মামা আর মামীমার মধ্যে। তারপর মনিরা যখন তার স্নেহময় পিতা আর স্নেহময়ী মায়ের কথা কতকটা ভুলে এসেছে, এমনি সময় তার মাথায় বজ্রাঘাত হল, তার একমাত্র ভরসা মামুজান। চিরতরে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

অন্ধকারের অতলে যেন তলিয়ে গেলো মনিরা। বহুদিনের হারানো শোকে জেগে উঠল নতুন করে। সে ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু পরে নিজকে সামলে নিল। মামীমার করুণ ব্যথাভরা মুখের দিকে তাকিয়ে সব দুঃখ চেপে গেল মনিরা নিজের মনে।

মামীমার মনকে স্বচ্ছ-স্বাভাবিক করার জন্য চেষ্টা করতে লাগল মনিরা। কারণ, এখন তার একমাত্র সম্বল ঐ বৃদ্ধা। সে ভাবল, হঠাৎ যদি তার মামীমার কিছু হয়ে যায় তখন কি হবে। তাকে আগলাবার এ দুনিয়ায় আর যে কেউ নেই।

মনির সে এখন অনেক দূরে। লোকসমাজ থেকে বহু দূরে। তাঁর ধরাছোঁয়ার বাইরে। আলেয়ার আলোর মত তাকে দেখা যায় কিন্তু স্পর্শ করা যায় না। মনিরের কথা ভাবছে মনিরা, এমন সময় গাড়ি বারান্দায় মোটর থামার শব্দ শোনা গেল। এ সময়ে কে এলো? মনিরা একটু সজাগ হয়।

কক্ষে প্রবেশ করে বাবলু– আপামনি, সেদিনের নতুন সাহেব এসেছেন। ঐ যে সাহেব আপনার সঙ্গে তর্ক করেছিলেন।

বলে দে কেউ বাড়ি নেই। সোজা হয়ে বসে বলল মনিরা।

বাবলু বেরিয়ে গেল।

মনিরা আবার বালিশে ঠেশ দিয়ে বসে বইখানা মেলে ধরল চোখের সামনে। কিন্তু বইয়ের পাতায় মন দিতে পারল না। হঠাৎ অসময়ে গোয়েন্দা মিঃ আলমের আগমন যেন তার সমস্ত চিন্তাধারাকে তচনচ করে দিয়ে গেল।

বাবলু ফিরে এলো–আপামনি, উনি আপনার সঙ্গেই সাক্ষাৎ করতে চান।

মনিরার দু’চোখে ক্রুদ্ধভাব ফুটে উঠল, তীব্রকণ্ঠে বলল– বললি না, কেউ নেই?

বলেছি, কিন্তু উনি বললেন– তোমার আপামনিও কি নেই? আমি বললাম তিনি আছেন, বই পড়ছেন। উনি তখন বললেন– আপনার সঙ্গেই....

ভাগ হতভাগা, আমি কারও সঙ্গে দেখা করব না।

কি বলব?

বলগে আপামনি দেখা করতে পারবেন না।

আচ্ছা, তাই বলছি। বেরিয়ে যায় বাবলু।

একটু পরেই ফিরে আসে–আপামনি, উনি বলছেন খুব জরুরি কথা আছে, আপনার সঙ্গে দেখা না করলেই নয়।

মনিরা বিপদে পড়ল। অবশ্য মনিরার পক্ষে এ দেখা করা ব্যাপার তেমন কিছু নয়। কিন্তু আজ মনিরার মন ভাল ছিল না, তাছাড়া বাড়িতে আজ কেউ নেই, সরকার সাহেবও একটু আগে কোন কাজে গেছেন, নকিবটা রয়েছে, সেও রান্নাঘরে। যাক, ওসব চিন্তা করে লাভ নেই। ভয় কি, তিনি তো আর এমন কোন লোক নন, একজন ভদ্রসন্তান। নিশ্চয়ই তার সঙ্গে কোন অসৎ ব্যবহার করবেন না। উঠে দাঁড়াল মনিরা– যা বলগে আমি আসছি। এই শোন ভেতরে বৈঠকখানায় বসাবি, বুঝলি?

বুঝেছি আপামনি। চলে যায় বাবলু।

ভেতর বৈঠকখানায় প্রবেশ করতেই মিঃ আলম মাথার ক্যাপটা খুলে মনিরাকে অভিবাদন জানালেন।

মনিরা শান্তকণ্ঠে বলল–বসুন।

একটু হেসে বলেন মিঃ আলম– অসময়ে বিরক্ত করলাম বলে.....

না না, সময় আর অসময়ের কি আছে? যে অবস্থায় পড়েছি তাতে,

হাঁ, একটু বিরক্ত হতে হবে বৈকি। মনিরাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে ওঠেন– মিঃ আলম।

মিঃ আলম আসন গ্রহণ করার পরও মনিরা আসন গ্রহণ করে না। সে একপাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে ধরে মিঃ আলমের মুখে।

মিঃ আলমও একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে একরাশ ধোয়া সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন–মিস মনিরা, আমি আজ একটা জরুরি কথা জানতে এসেছি।

বেশ বলুন।

বসুন না, এমন করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

বলুন কি জানতে চাচ্ছেন?

বসতে সঙ্কোচ করছেন– আমি গোয়েন্দা বিভাগের লোক বলে আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না বুঝি?

না না বসছি। মনিরা মুখে সঙ্কোচ না করলেও মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। এই নির্জন দ্বিপ্রহরে একলা একজন যুবকের পাশে, তবু বাবলুটা রয়েছে বলে ভরসা হয় মনিরার। অবশ্য এ দুর্বলতার কারণ আছে। মনিরা এখন যে অবস্থায় উপনীত হয়েছে সে অবস্থায় সবাই এমনি হবে।

চারদিকে তার বিপদের বেড়াজাল। একদিন মনিরা সবাইকে নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস করত, কিন্তু আজ সে কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। সবাই যেন আজ তাদের শত্রু, কেউ যেন তাদের মঙ্গল। চায় না।

মিঃ আলম বললেন– কি ভাবছেন মিস মনিরা?

কই কিছু না। আপনি যা জিজ্ঞাসা করতে চান, করতে পারেন।

দেখুন মিস মুনিরা, সবাই আপনাদের সম্বন্ধে যাই বলুক আমি তা বিশ্বাস করি না, মানুষের ধারণা এক কিন্তু ঘটনা অন্যরকম হয়। আমি পুলিশের রিপোর্টে জানতে পেরেছি আপনি দস্যু বনহুরকে ভালবাসেন এবং সেই কারণে দস্যু বনহুরও এখানে আসে–মানে আপনাদের এই বাড়িতে তার আগমন হয়।

এ কথাই কি আপনি জানতে এসেছেন?

না মিস মনিরা, আমি জানতে চাই, চারদিকে অন্ধের মত হাতড়ানোর চেয়ে আমরা অতি সহজেই চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্য ভেদ করতে পারব, যদি আপনি সঠিক জবাব দেন।

হ্যাঁ, তাকে আমি ভালবাসি।

আপনার মত উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে একটা নগণ্য দস্যুকে ভালবাসতে পারে, আশ্চর্য!

না, সে নগণ্য নয়। দস্যু সে হতে পারে কিন্তু হৃদয় তার অনেক বড়। আমার-আপনার মনের চেয়ে অনেক উঁচু তার মন।

ও, আপনি দেখছি তার প্রেমে একেবারে মুগ্ধ, অভিভূত!

মনিরা নীরব।

বাবলু একপাশে দাঁড়িয়েছিল, কারণ মনিরা তাকে কক্ষে থাকার জন্য ইংগিত করেছিল।

মিঃ আলম বাবলুকে লক্ষ্য করে বললেন-এক গেলাস পানি নিয়ে এসো।

বাবলু বেরিয়ে গেল।

মনিরার বুকটা হঠাৎ যেন ধক্ করে উঠল। বাবলু বেরিয়ে যাওয়ায় কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে।

মিঃ আলম একটু ঝুঁকে মনিরার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন-মিস মনিরা, আপনি সত্য কথা বললে আমি আপনাকে বাঁচিয়ে নিতে চেষ্টা করবো।

এ আপনি কি বলছেন, বুঝতে পারছি না?

আপনি নিশ্চয়ই জানেন চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্য। চৌধুরী সাহেবের হত্যার পেছনে দস্যু বনহুরের অদৃশ্য ইংগিত রয়েছে, এ কথা আপনি জানেন।

আপনার অনুমান মিথ্যা। আপনি যেতে পারেন, আমি আর এক মুহূর্ত এখানে বিলম্ব করব না। উঠে পড়ে মনিরা।

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ আলম মনিরার হাত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে-বসুন, আরও কথা আছে।

মনিরার হাত স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে মনিরা ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গিনীর ন্যায় ফোস্ করে ওঠে হাত ছাড়ুন।

মিঃ আলম হাত ছেড়ে দেন, তারপর হেসে বলেন–মিস মনিরা, আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না। হঠাৎ ভুল হয়ে গেছে।

তীব্রকণ্ঠে বলে মনিরা-ভুল! ছিঃ আপনার মত…

হ্যাঁ, সত্যি আমি বড় অসভ্য।

মনিরা ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকাল মিঃ আলমের মুখের দিকে। কিন্তু কি আশ্চর্য, সে মুখে নেই এতটুকু পরিবর্তন!

মনিরার পা থেকে মাথা পর্যন্ত রাগে রি-রি করে উঠল। কোন কথা না বলে পুনরায় ধপ করে সোফায় বসে পড়ল সে।

কিন্তু তখন মিঃ আলম উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, মুখে তাঁর মৃদু হাসির রেখা, টেবিল থেকে ক্যাপটা তুলে নিয়ে মাথায় দিয়ে বলেন– মিস মনিরা, আমার যা জানার ছিল জানা হয়ে গেছে।

অসময়ে বিরক্ত করলাম, ক্ষমা করবেন। আসি তবে…বেরিয়ে যান মিঃ আলম।

মনিরার দু'চোখে তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছিল। রাগে-ক্ষোভে গজ গজ করছিল। মিঃ আলমের কথার কোন উত্তর দিল না সে।

গাড়ি-বারান্দা থেকে মোটর স্টার্টের শব্দ শোনা গেল। এমন সময় বাবলু ট্রে হাতে কক্ষে প্রবেশ করল। এক গ্লাস পানি আর প্লেটভরা নাস্তা। কক্ষের চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বলল– আপামনি, উনি কোথায়?

মনিরা কঠিন কণ্ঠে ধমক দিল–ভাগ হতভাগা!

বাবলু মনে করল, তার পানি আনতে দেরী হয়েছে, তাই রেগে গেছেন আপামনি। মুখটা কাঁচুমাচু করে বলল–আপনি তো একদিন বলেছেন, কেউ পানি চাইলে যেন শুধু পানি এনে না দিই। তাই আমি……।

মনিরা আর কথা না বলে উঠে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে যায়। বাবলু হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে মনিরার চলে যাওয়া পথের দিকে।

.

মনিরা কক্ষে ফিরে এসেও স্বাভাবিক হতে পারে না। বারবার সে নিজের দক্ষিণ হাতখানা দুমড়ে-মুচড়ে, ঝেড়ে-মুছে ফেলে। এখনও তার হাতে যেন মিঃ আলমের হাতের ছোঁয়া লেগে রয়েছে। ছিঃ ছিঃ এরাই দুনিয়ার সভ্য মানুষ। একটা মেয়েকে একলা নিঃসঙ্গ পেয়ে তাকে এভাবে অপদস্থ করতে পারে! এত সাহস তার হাতে হাত রাখে! অধর দংশন করে মনিরা।

এমন সময় মরিয়ম বেগম ফিরে আসেন বোনের বাড়ি থেকে।

সরকার সাহেবও এসে পড়েন।

মনিরার রাগ যেন আরও বেড়ে যায়। এতক্ষণ কেউ আসতে পারেনি? এমন কি সরকার সাহেব থাকলেও মনিরা কিছুতেই যেত না মিঃ আলমের সঙ্গে দেখা করতে।

মরিয়ম বেগম মনিরার কক্ষে প্রবেশ করে ডাকলেন–মা মনি– মনিরা এগিয়ে এলো–কি বলছ মামীমা?

শুনলাম মিঃ আলম এসেছিল?

হ্যাঁ, এসেছিলেন।

কি বললেন তোকে?

জানি না!

সেকি, তিনি কেন এসেছিলেন, কি জিজ্ঞাসা করলেন বলবি না?

নতুন কোন কথা নয়, সেদিন তিনি যা প্রশ্ন করেছিলেন আজও তাই করছিলেন। আমাকে ফুসলিয়ে তিনি জানতে এসেছিলেন মামুজানের হত্যারহস্য আমি জানি কিনা।

মরিয়ম বেগম আজ একটু ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে রাগত কণ্ঠে বললেন– ভদ্রলোকের সন্দেহের সীমা নেই দেখছি। এবার ঐরকম কোন প্রশ্ন করলে সোজা বলে দিবি- আমি কোন জবাব দেবো না।

মনিরা বলে উঠে–এরপরও আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব– কখনো না। মামীমা, আজ তার যা আচরণ পেয়েছি, তা বলতে লজ্জা হয়। সে আমার হাত ধরে বসিয়ে দিতে যায়–এত সাহস তার!

মনিরার কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে।

মরিয়ম বেগম মনিরাকে কাছে টেনে নিয়ে সান্ত্বনার সুরে বললেন-কি করবি মা, সবই আমাদের অদৃষ্ট। আজ তোর মামুজান বেঁচে থাকলে কেউ আমাদের সঙ্গে কথা বলতে সাহসী হত না। আর আজ…মনিরা, মা আমার, কি বলব, আজ সবাই আমাদের অবহেলা করে, হেয় মনে করে…. মরিয়ম বেগম আঁচলে অশ্রু মুছেন। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বলেন তিনি–মনি, একটা কথা বলব তোকে?

প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে তাকায় মনিরা মামীমার মুখের দিকে।

আয় মা, আমার ঘরে আয়।

মনিরা মামীমাকে অনুসরণ করে। না জানি কি বলতে চান তিনি। মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন একসঙ্গে আলোড়ন জাগায়। মামীমাই এখন তার একমাত্র অভিভাবক। তিনি যা বলবেন তাই করতে হবে। যা বলবেন তাই শুনতে হবে।

মামীমার কক্ষে প্রবেশ করে মুখোমুখি বসল দু'জন। মরিয়ম বেগম ভাগনীর কপালের এলোমেলো চুলগুলো সযত্নে সরিয়ে দিয়ে বললেন– মনি এখন তুমি অনেক বড় হয়েছে। শিক্ষিত মেয়ে তুমি। তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না আমার, এখন তোমার বিয়ের বয়স হয়েছে।

মনিরার মনটা হঠাৎ যেন ধক্ করে উঠল। কি বলতে চান মামীমা।

মরিয়ম বেগম একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন–যা ভেবেছিলাম তা হবার নয়। বড় আশা ছিল, তোকে কাছে ধরে রাখবো! কিন্তু হল না– মনির আমার সব আশা-ভরসা নষ্ট করে দিয়েছে।

মনিরার বুকের মধ্যে তোলপাড় শুরু হল। সরল সহজ মামীমাকে আজ এত ভূমিকা করতে দেখে বুঝতে কিছু বাকি থাকে না মনিরার।

মরিয়ম বেগম বলে চলেন-খালেদার ছেলেটা এবার ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে মস্তবড় চাকরি পেয়েছে। দেখতে শুনতে খুব সুন্দর। আমারই বোনের ছেলে তো-আমার মনিরের মতই তার চেহারা।

মনিরার মুখমণ্ডল মুহূর্তে কালো হয়ে উঠল। জলভরা আকাশের মত ছলছল করে উঠল তার চোখ দুটো। অসহায়ার মত তাকাল সে মামীমার মুখের দিকে।

মনিরার হৃদয়ের ব্যথা বুঝতে পারেন মরিয়ম বেগম। তাঁর নিজের মনেও কি কম দুঃখ! কোনদিন যে মনিরাকে দূরে সরাবেন, এ কথা মরিয়ম বেগম ভাবতেই পারেন নি। তার মন আকুল হয়ে কেঁদে ওঠে। মনিরাকে যে পরের ঘরে পাঠাতে হবে, এ যেন তার কল্পনার বাইরে।

মনিরা সম্বন্ধে মরিয়ম বেগম যে চিন্তা করেন নি তা নয়। অনেকদিন নিরালায় বসে ভেবেছেন, মনিরা এখন ছোট নেই। তার বয়সে মরিয়ম বেগমের কোলে মনির এসে পড়েছিল। কাজেই এখন আর নিশ্চুপ থাকার সময় নয়। মনিরা সম্বন্ধে একটা কিছু ব্যবস্থা না করলেই চলবে না।

একমাত্র সন্তান মনির–কিন্তু সে আজ লোকসমাজের বাইরে। তার সঙ্গে মনিরার বিয়ে হওয়া অসম্ভব। নিজে যে দুঃখ, যে বেদনা অহরহ ভোগ করেছেন, সে জ্বালা আর একটা অবলা সরলা মেয়ের ঘাড়ে চাপাতে পারেন না তিনি।

তাই আজ মনস্থির করে ফেলেছেন মনিরার বিয়ে দেবেন অন্য একটা ছেলের সঙ্গে। বোন খালেদার ছেলেকে দেখে আজ তার হৃদয়ে সেই বাসনাটা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। উপযুক্ত ছেলে কাওসার-মনিরার সঙ্গে সুন্দর মানাবে। যেমন চেহারা তেমনি তার ব্যবহার।

মরিয়ম বেগম কাওসারকে ছোটবেলায় দেখেছিলেন–ফুটফুটে সুন্দর চেহারা। মনির আর কাওসারকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে বলেছিলেন মরিয়ম বেগম–দেখ

খালেদা, এদের দু’জনকে দেখলে ঠিক যেন যমজ ভাই বলে মনে হয়।

হেসে বলেছিল খালেদা-তোমার ছেলে আর আমার ছেলে যে এক হবে এতে আর আশ্চর্য কি আছে। কাওসার তো তোমারই ছেলে আপা!

সেই কাওসার আজ উচ্চশিক্ষা লাভ করে মানুষের মত মানুষ হয়েছে, আর তার মনির আজ কি হয়েছে?-লোকসমাজে তার কোন স্থান নেই!

মনিরা নিশ্চুপ। পাথরের মূর্তির মতই স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে।

মরিয়ম বেগম গভীর স্নেহে টেনে নিলেন ওকে কাছে-মা, জানি তুই ঐ হতভাগাকে ভালবাসিস। কিন্তু… সে আমার সন্তান হলে কি হবে, ওর হাতে আমি তোকে তুলে দিতে পারব না। না না, কিছুতেই তা সম্ভব নয়। মনিরা বল্ আমার কথা রাখবি। আমি খালেদাকে কথা দিয়ে এসেছি, কাওসারের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব….

মামীমা! আর্তস্বরে বলে ওঠে মনিরা।

হ্যাঁ, আমি তোকে পরের হাতে সঁপে দিতে পারব তবু তোর ফুলের মত জীবনটাকে বিনষ্ট করতে পারব না।

মামীমা, তুমি জানো না….

সব জানি মনিরা সব জানি। কিন্তু কোন উপায় নেই। মনিরকে তোর ভুলতে হবে।

মামীমা!

আমি পাষাণের চেয়েও কঠিন হবো। যত আঘাতই আসুক না কেন, সব আমি সহ্য করব। হঠাৎ মরিয়ম বেগম চিৎকার করে ডাকেন– সরকার সাহেব, সরকার সাহেব!

হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করেন সরকার সাহেব-আমায় ডাকছেন বিবি সাহেবা?

হ্যাঁ। শুনুন সরকার সাহেব, আমি মনিরার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি। আমার চাচাতো বোন। খালেদার ছেলে কাওসারের সঙ্গে। আপনি বিয়ের সব আয়োজন করুন।

আচ্ছা বিবি সাহেবা। কবে থেকে বিয়ের আয়োজন শুরু করব?

কাল। কাল থেকেই আপনি কাজ শুরু করুন। বাড়িঘর সমস্ত হোয়াইট ওয়াশ করিয়ে নিন। দরজা জানালা সব নতুন রঙ করাবেন। পুরানো পর্দা সরিয়ে নতুন পর্দার ব্যবস্থা করুন! চৌধুরী সাহেব মরে গেছেন বলে আমিও মরিনি। আমি বেঁচে থাকতে আমার মেয়ে মনিরা চোখের পানি ফেলবে–এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। ওকে যদি আমি সুখী করতে না পারি তাহলে আমি মরেও শান্তি পাব না।

ওর মা মৃত্যুকালে ওকে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে গেছে-মনিরাকে সুখী করো ভাবী। রওশন আরার সেই মৃত্যুকালের শেষ কথা আমি কোন দিন ভুলব না। নিজের সুখ-সুবিধার জন্য ওকে আমি সাগরে ভাসাতে পারি না।

সরকার সাহেব মাথা দোলালেন–আপনি ঠিক বলেছেন বিবি সাহেবা, এখন মা মনির বিয়ে দেওয়া একান্ত দরকার। পাড়া-প্রতিবেশীরা এ নিয়ে অনেক কথাই বলে, তাদের মুখে যেন কালি পড়ে।

পাড়া-প্রতিবেশীদের কথাবার্তা শুনে শুনে কান আমার ঝালাপালা হয়ে গেছে। মেয়ে বড় হয়েছে আমার হয়েছে তাতে অন্যের কি? চৌধুরী সাহেব বেঁচে থাকতে যারা টু’ শব্দটি করতে সাহসী হয়নি, আজ তারা আমাদের সম্বন্ধে যা-তা বলতে শুরু করেছে। যাক, এবার আমি সকলের কথার শেষ করব; মনিরার বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব।

মরিয়ম বেগম মুখে যতই বলুন না কেন, শেষ পর্যন্ত তিনি মনিরাকে খালেদার ছেলে কাওসারের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারলেন না। মনকে যতই কঠিন করবেন ভেবেছিলেন সব ভেসে গেলো–অদৃশ্য মায়ার বন্ধন মরিয়ম বেগমের সমস্ত অন্তর আচ্ছন্ন করে ফেলল।

তিনি সব ছাড়তে পারেন কিন্তু মনিরাকে ত্যাগ করতে পারেন না।

পরদিন ভোরে নামান্তে সরকার সাহেবকে ডেকে বললেন-মনিরার বিয়ে আমি দেব না–সরকার সাহেব। অযথা ঘরদোর নতুন করে সাজাবার আমার কোন দরকার নেই।

সরকার সাহেব সব বুঝতে পেয়ে মৃদু হাসলেন, তারপর চলে গেলেন নিজের কাজে।

.

বনহুরের মাথায় পাগড়ীটা পরিয়ে দিয়ে হেসে বলল নূরী–জানি তুমি ছায়ামূর্তির সন্ধানে চলেছ।

হ্যাঁ নূরী, পুলিশমহল যে ছায়ামূর্তির সন্ধানে ঘাবড়ে উঠেছে–আমি তাকে খুঁজে বের করতে চাই।

সত্যি হুর, বড় আশ্চর্য! কে এই ছায়ামূর্তি? ছায়ামূর্তি যে অত্যন্ত চালাক এবং ধূর্ত, এতে কোন সন্দেহ নেই।

সে কারণেই তো আজও পুলিশ তাকে গ্রেফতারে সক্ষম হয় নি।

তুমি কোথায় পাবে তার সন্ধান?

দস্যু বনহুরের চোখে ধুলো দিতে পারে এমন ছায়ামূর্তি আছে? নূরী, ছায়ামূর্তি যেই হোক, আমি তাকে পাকড়াও করবোই। কিন্তু সাবধান, ছায়ামূর্তি যেন এখানে এসে হাজির না হয়।

হেসে বলে নূরী-হুর, তোমার আস্তানায় আসবে ছায়ামূর্তি? এত সাহস হবে তার? সিংহের গহ্বরে শৃগালের প্রবেশ–

আচ্ছা, আমি চললাম। খোদা হাফেজ! বনহুর নূরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যায়।

বনহুর চলে যেতে নূরী ফিরে দাঁড়ায়, বনহুরের পরিত্যক্ত শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে দু'চোখ বন্ধ করে। মনের কোণে ভেসে ওঠে বনহুরের সুন্দর মুখখানা। কানের কাছে ভাসে তার কণ্ঠস্বর।

নূরী উঠে বনহুরের ছোরাখানা তুলে নেয় হাতে, বুকে চেপে ধরে অনুভব করে তার স্পর্শ।

হঠাৎ পেছনে একটা শব্দ হয়! চমকে ফিরে তাকায় নূরী। মুহূর্তে তার চোখ দুটো ছানাবড়া হয়।

নূরী দেখতে পায়, একটা অদ্ভুত কালো আলখেল্লায় সমস্ত শরীর ঢাকা ছায়ামূর্তি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

নূরী হতবাকের মত তাকিয়ে থাকে।

ছায়ামুর্তি এগিয়ে আসে।

নূরী চিৎকার করে ওঠে–কে তুমি?

ছায়ামূর্তি! চাপা অস্ফুট কণ্ঠে বলে ছায়ামূর্তি।

ছায়ামূর্তি তুমি! কি চাও এখানে?

আমি জান নিতে এসেছি।

জান?

হ্যাঁ, তোমার নয়-দস্যু বনহুরের।

নূরী দু'পা সরে দাঁড়ায়, সাহস সঞ্চয় করে বলে–শয়তান, জানো তুমি কোথায় এসেছ?

দস্যু বনহুরের বিশ্রামকক্ষে।

এখানে তুমি কেমন করে প্রবেশ করলে?

ছায়ামূর্তির প্রবেশ সর্বক্ষণ সর্বস্থানে অতি সহজ.... একটু থেমে বলে ছায়ামূর্তি- এতক্ষণ তোমার আর দস্যু বনহুরের মধ্যে যে কথাবার্তা হলো সব আমি শুনেছি!

শয়তান! তবে কার ভয়ে লুকিয়েছিলে। তখন এখানে প্রবেশ করতে পারলে না? দস্যু বনহুর তোমায় উচিত সাজা দিয়ে তবেই ছাড়ত! এসেছ একটা নারীর কাছে বাহুবল দেখাতে? নূরী দ্রুত পদক্ষেপে দরজার সম্মুখে গিয়ে হাতের ছোরাখানা বাড়িয়ে ধরে-খবরদার, এক-পা এগুলে আমি তোমাকে হত্যা করব।

ছায়ামূর্তি চাপাস্বরে হেসে ওঠে– হাঃ হাঃ হাঃ ছায়ামূর্তিকে তুমি হত্যা করবে? এসো তবে-ছায়ামূর্তি এগুতে থাকে নূরীর দিকে।

ক্রুদ্ধ নাগিনীর ন্যায় ফোঁস ফোঁস করছিল নূরী। রুখে দাঁড়ায়-শয়তান! সঙ্গে সঙ্গে ছোরাখানা বসিয়ে দিতে যায় সে ছায়ামূর্তির বুকে।

মুহূর্তে ছায়ামূর্তি নূরীর হাতখানা বলিষ্ঠ হাতের মুঠায় চেপে ধরে। অতি সহজেই নূরীর হাত থেকে ছোরাখানা খসে পড়ে মেঝেতে।

এবার হাত ছেড়ে দেয় ছায়ামূর্তি, তারপর আবার সে হেসে ওঠে অট্টহাসি।

নূরী ‘থ’ মেরে দাঁড়িয়ে থাকে।

ছায়ামূর্তি হাসি থামিয়ে বলে–বনহুরের জীবন যদি বাঁচাতে চাও, তবে তাকে আমার অন্বেষণ থেকে ক্ষান্ত কর। নচেৎ আবার আসব .....কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

নূরী ছুটে গিয়ে বিপদ সংকেত ঘণ্টাধ্বনি করে।

মুহূর্তে সমস্ত দস্যু এসে জড়ো হয় নূরীর চারপাশে।

নূরী সকলকে লক্ষ্য করে বলে–ছায়ামূর্তি! এই মুহূর্তে এখানে ছায়ামূর্তি এসেছিল– যাও, তোমরা শিগগির তার অনুসন্ধান কর। যাও।

সমস্ত অনুচরের চোখেমুখে বিস্ময় ঝরে পড়ল-আশ্চর্য! তাদের এত সাবধানতা সত্ত্বেও কি করে এখানে ছায়ামূর্তি প্রবেশ করলো! সবাই ছুটলো চারদিকে। আস্তানা তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

.

ভোরের দিকে তাজের পদশব্দে নূরীর ঘুম ভেঙে গেল।

গোটারাত নূরীর নিদ্রা হয় নি, এই অল্পক্ষণ সে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাজের শব্দ তার অতি পরিচিত। তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করে ছুটে গেল সে বনহুরের কক্ষে।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করেই নূরীকে উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হল, হেসে বলল–এখনও ঘুমোওনি নূরী?

নূরী তার কথার কোন জবাব না দিয়ে বলে–হুর, জানো কি ঘটেছে? তুমি যা বলেছিলে তাই?

কি বলেছিলাম?

ছায়ামূর্তি! সেই ছায়ামূর্তি এসেছিল.....

ছায়ামূর্তি এসেছিল, বল কি নূরী!

হ্যাঁ, কি ভয়ঙ্কর তার চেহারা। তেমনি অসুরের মত শক্তি তার দেহে।

তার চেহারাও দেখেছ। তার শক্তিও পরীক্ষা করা হয়ে গেছে দেখছি।

সব, বলছি হুর, শোনো। সে তোমার জীবন নিতে এসেছিল!

আমার জীবন?

হ্যাঁ, তোমার জীবন। তুমি যদি ছায়ামূর্তির অনুসন্ধানে ক্ষান্ত না হও, তবে—

আমার জীবন নেবে সে–এই তো?

আমি ওকে হত্যা করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু সে আমার হাত মুঠায় চেপে ধরে....

ছোরাখানা কেড়ে নিয়েছে–এই তো?

তুমি ঠাট্টা করছ হুর! আমার ভয় হচ্ছে, শয়তানটা তোমার না কিছু করে বসে।

ভয় নেই নূরী, ছায়ামূর্তির সাধ্য কি তোমার হুরের গায়ে হাত দেয়।

সত্যি তুমি কত শক্তিশালী! হুর, তোমার দিকে চাইলে আমি গোটা দুনিয়াটাকে ভুলে যাই। তোমার মত পুরুষ বুঝি দুনিয়াতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

নূরী, তুমি আমাকে অত্যন্ত ভালবাস, তাই তুমি এ কথা বলতে পারলে।

হুর! অস্ফুট শব্দ করে বনহুরের বুকে মাথা রাখে নূরী, তারপর আবেগভরা কণ্ঠে বলে ওঠে–আজ তুমি এ কথা স্বীকার করলে! আমার ভালবাসার আঁচ এতদিনে অনুভব করলে তুমি। হুর, আজ যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না।

নূরী! বনহুর নূরীর মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দেয়।

গভীর আবেগে নূরী বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে চোখ বন্ধ করে। এমনি করে সে যদি চিরদিন হুরের বুকে মাথা রেখে কাটিয়ে দিতে পারত! পৃথিবীর আর কোন সুখ সে চায় না-শুধু চায় এইটুকু।

মানুষ যা চায় তা সবসময় পায় না। তাই নূরীরও এই সুখ, এই অনাবিল আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না।

হঠাৎ বনভূমি প্রকম্পিত করে বেজে ওঠে বিপদ সঙ্কেতধ্বনি।

বনহুর তাড়াতাড়ি নূরীকে সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। নিজের অজ্ঞাতে তার দক্ষিণ হাতখানা বেল্টে ঝুলান রিভলভারের গায়ে গিয়ে ঠেকে। সচকিত হয়ে ওঠে বনহুর।

নূরী উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলে–নিশ্চয়ই আবার সেই ছায়ামূর্তির আবির্ভাব হয়েছে।

তক্ষুণি রহমত হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করে–সর্দার, পুলিশ?

বনহুর মুহূর্তে ফিরে দাঁড়াল-পুলিশ?

হ্যাঁ সর্দার। পুলিশ ফোর্স অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এগিয়ে আসছে।

রহমত?

সর্দার?

পুলিশ আমার আস্তানার সন্ধান কি করে পেল?

সর্দার, এ প্রশ্ন আমার মনেও জাগছে!

কিন্তু এখন ওসব আর ভাববার সময় নেই, আমার অনুচরদেরকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে বল। একটা পুলিশও যেন ফিরে না যায়। আর শোনো, আমার ভূগর্ভ সুড়ঙ্গমুখ খুলে রাখ, প্রয়োজন হলে...

যাও।

রহমত দ্রুত বেরিয়ে যায়।

নূরী শঙ্কিত কণ্ঠে বলে ওঠে–হুর, এখন উপায়?

নূরী, শিগগির তুমি ভূগর্ভ সুড়ঙ্গপথে নিচে নেমে যাও। আর এক মুহূর্ত এখানে বিলম্ব করো না।

হুর, তোমাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই যাব না।

নূরী যাও। বনহুর চিৎকার করে ওঠে!

ওদিকে গুড়ুম গুড়ুম করে রাইফেল গর্জে ওঠার শব্দ হচ্ছে।

নূরী বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে–তুমিও চলো হুর, নইলে আমি যাব না।

নূরী!

বনহুরের কঠিন কণ্ঠস্বরে নূরীর হৃদয় কেঁপে ওঠে, দু'চোখে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। একবার বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায় সে।

বনহুর উদ্যত রিভলভার হাতে বেরিয়ে আসে কক্ষ থেকে।

শুরু হয় পুলিশ আর দস্যুদলে ভীষণ যুদ্ধ!

বনহুর নিজেও লড়াই করে চলল। হত্যার উল্লাসে তার চোখের তারা দুটি নেচে উঠল। মুহূর্তে মুহূর্তে গর্জে উঠতে লাগল বনহুরের রিভলভার।

অসংখ্য পুলিশ নিহত হল। অসংখ্য দস্যু নিহত হলো।

লালে লাল হয়ে উঠলো বনভূমি।

পূর্বাকাশ আলো করে সূর্যদেব উঁকি দিয়েছে। যুদ্ধ তখন থেমে এসেছে, পুলিশ ফোর্স দিনের আলোয় দেখল–কিছু সংখ্যক মৃতদেহ ছাড়া আর একটা প্রাণীও নেই সেখানে।

সমস্ত বন তন্নতন্ন করে খোঁজা হল।

আস্তানার ঘর-দোর ভেংগেচুরে আগুন ধরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হল। কিন্তু দস্যু বনহুরের সন্ধান মিলল না।

এবার পুলিশ ফোর্স ফিরে চলল।

এত প্রচেষ্টা সব তাঁদের ব্যর্থ হয়েছে। মিঃ জাফরী এবং মিঃ হারুন স্বয়ং পরিচালনা করেছিলেন পুলিশবাহিনীকে। এমন কি তারা বিপুল পুলিশবাহিনীসহ দস্যু বনহুরের আস্তানা অবধি হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু যার জন্য তাদের এত পরিশ্রম তাকে পাকড়াও করতে পারলেন না।

মিঃ জাফরী সিংহের ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন। রাগে-দুঃখে অধর দংশন করছেন। দস্যু বনহুরের আস্তানার সন্ধান পেয়ে তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হলেন না। এতবড় পরাজয় আর। কোনদিন তাঁর হয় নি।

দস্যু বনহুরের আস্তানার সন্ধান মিঃ জাফরী তাঁর বিশ্বস্ত সহকারীর নিকট পেয়েছিলেন। মিঃ জাফরীর সহকারী মিঃ মুঙ্গেরী এখানে আসার পর হঠাৎ অন্তর্ধান হয়ে গিয়েছিলেন, মিঃ মুঙ্গেরীর অন্তর্ধানে মিঃ জাফরী মনে মনে রাগান্বিত ছিলেন; কিন্তু তিনি মনোভাব গোপন রেখে প্রতীক্ষা করছিলেন, হতে পারে তিনি কোন গোপন রহস্য উদঘাটনে অদৃশ্য হয়েছেন। মিঃ জাফরী যখন মিঃ চৌধুরী, ডক্টর জয়ন্ত সেন এবং ভগবৎ সিংয়ের হত্যারহস্য নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন, এমন দিনে হঠাৎ এক গভীর রাতে মিঃ মুঙ্গেরী সশরীরে উপস্থিত হলেন।

মিঃ জাফরী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–ব্যাপার কি? হঠাৎ গা ঢাকা দেবার কারণ?

মিঃ মুঙ্গেরী একগাল হেসে বললেন-আপনি তো স্যার হত্যার হস্য নিয়ে মেতে আছেন, কিন্তু ওদিকে বনহুরকে পাকড়াওয়ের কি করলেন?

ওঃ তুমি বুঝি তাহলে দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করতে মনোনিবেশ করেছ?

হ্যাঁ স্যার, শুধু মনোনিবেশ করিনি, একেবারে..... একটু থেমে গলার স্বর খাটো করে নিয়ে বলেছিলেন মিঃ মুঙ্গেরী-একেবারে দস্যু বনহুরের আস্তানার সন্ধান এনেছি।

মিঃ জাফরীর দু'চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল, আগ্রহভরা কণ্ঠে বললেন-সত্যি বলছ মুঙ্গেরী?

ইয়েস স্যার! আপনি তো জানেন, মুঙ্গেরী যে কাজে মনোনিবেশ করে সে কাজ যতক্ষণ না সমাধা হয় ততক্ষণ তার স্বস্তি নেই।

হ্যাঁ, তাহলে তো অত্যন্ত সুখবর এনেছ মুঙ্গেরী। দস্যু বনহুর গ্রেফতার হলে তোমার সুনাম দেশবাসীর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে। সরকার বাহাদুর মোটা পুরস্কারও দিবেন।

মিঃ মুঙ্গেরী মিঃ জাফরীর কথায় কান না দিয়ে বলেছিলেন–স্যার, আর বিলম্ব নয়, আজই আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিয়ে রাতের অন্ধকারে আমরা দস্যু বনহুরের আস্তানায় হানা দেব। কথা বলতে মুঙ্গেরীর মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে ওঠে। বলিষ্ঠ বাহু দু'টি মুষ্টিবদ্ধ হয়।

মিঃ জাফরী মুঙ্গেরীর মুখোভাব লক্ষ্য করে সন্তুষ্ট হন। তিনি জানেন মুঙ্গেরী বৃথা কোন কথা বলে না। মুঙ্গেরীর ওপর তার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল।

মিঃ জাফরীর সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ তার গোপন আলাপ-আলোচনা হলো।

মুঙ্গেরীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। মিঃ জাফরী পুলিশ বাহিনী নিয়ে রাতের অন্ধকারে দস্য বনহুরের আস্তানায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ঠিকভাবেই কাজ করে গিয়েছেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দস্যু বনহুরের বহু অনুচর নিহত হয়েছে। এত

দস্যু নিহত করেও মিঃ জাফর এবং মুঙ্গেরীর মনে শান্তি নেই। যতক্ষণ দস্যু বনহুরকে তারা গ্রেফতার করতে সক্ষম না হয়েছেন ততক্ষণ তারা নিশ্চিত নন।

শেষ পর্যন্ত বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে চললেন পুলিশ অফিসারগণ ও সশস্ত্র পুলিশবাহিনী।

.

পুলিশ বাহিনী যখন ফিরে চলেছে, তখন বনহুর তার ভূগর্ভস্থ দরবার কক্ষে ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারী করে চলেছে। সামনে দণ্ডায়মান রহমত আর কয়েকজন অনুচর। কয়েকজন আহত অনুচরকে দরবারকক্ষে একটা কম্বলের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে।

নূরী বনহুরের একপাশে দণ্ডায়মান, তার পাশেই তার সহচরীগণ, সকলেরই মুখমণ্ডল গম্ভীর, বিষণ্ন।

আহত অনুচরগণ করুণ আর্তনাদ করছে। কয়েকজন সুস্থ দস্যু তাদের সেবাযত্ন করছে। কেউ বা ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগিয়ে দিচ্ছে, কেউ বা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে।

কক্ষে সবাই নীরব।

শুধু দস্যু বনহুরের বুটের আওয়াজ আর আহত দস্যুগণের করুণ আর্তনাদ ছাড়া কারও মুখে কোন কথা নেই।

হঠাৎ বলে ওঠে রহমত-সর্দার, পুলিশ কি করে আমাদের আস্তানার সন্ধান পেলো বুঝতে পারছিনে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বনহুর, ফিরে তাকিয়ে বলে–এ প্রশ্ন আমার মনেও জাগছে রহমত।

সর্দার আমি শুনেছি পুলিশ ইন্সপেক্টার জাফরী নাকি অত্যন্ত ধূর্ত।

সে শুধু ধূর্ত নয়, শিয়ালের মত চতুর। এবার আমি বুঝতে পেরেছি কে তাকে আমার আস্তানার সন্ধান দিয়েছে।

নূরী এবার বলে–নিশ্চয়ই সেই ছায়ামূর্তি।

হ্যাঁ সর্দার, আমাদেরও তাই মনে হয়-কোন গুপ্তচর ছায়ামূর্তির বেশে আমাদের আস্তানার সন্ধান নিয়ে গেছে।

বনহুর নীরবে কিছু চিন্তা করছিল, এমন সময় একজন অনুচর যন্ত্রণার আর্তনাদ করে উঠলো-সর্দার.... সর্দার....

বনহুর ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে গেলো আহত অনুচরটার পাশে। হাঁটু গেড়ে বসলো, ওর বুকে হাত বুলিয়ে বললো–তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?

হ্যাঁ সর্দার, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। সর্দার, আমি আর সহ্য করতে পারছি না......

বনহুরের পাষাণ হৃদয়ও বিচলিত হলো, তার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দুফোঁটা অশ্রু। বনহুর নিজ হাতে ওর ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগিয়ে দিতে লাগল।

বনহুরের অনুচরদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক নিহত আর আহত হয়েছিল। বনহুরের আস্তানার ক্ষতি হওয়ায় যতটুকু ব্যথিত সে না হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি দুঃখ পেয়েছিল তার বিশ্বস্ত অনুচরগণের মৃত্যুতে।

বনহুর অত্যন্ত ভালবাসতো তার এই অনুচরগণকে। নিজের জীবনকে সে তুচ্ছ করে দিত, তবু তাদের প্রতি কোন অন্যায় আচরণ সহ্য করতে পারতো না।

কিন্তু বনহুর তার অনুচরদের বিশ্বাসঘাতকতা বরদাস্ত করতে পারত না। যার মধ্যে সে অবিশ্বাসের ছায়া দেখতে পেত তাকে সে কুকুরের মত গুলী করে হত্যা করত।

আজ বনহুর আর নূরী তাদের ভূগর্ভস্থ গোপন কক্ষে নিজ হাতে অনুচরগণের সেবাযত্ন করে চলল।

.

মনিরা কি যেন কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলো, এমন সময় মরিয়ম বেগম এসে বললেন–মনিরা, একবার আমার ঘরে এসো।

মামীমার কণ্ঠস্বরে মনিরা মুখ তুলে তাকায়, গম্ভীর থমথমে কণ্ঠস্বর মামীমার। হঠাৎ কি হয়েছে তাঁর! অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে মনিরা তার মুখের দিকে, তারপর বলে–আসছি মামীমা।

মরিয়ম বেগম বেরিয়ে যান।

মনিরা বেশ চিন্তিত হয়, এমনভাবে তো তার মামীমা কোনদিন কথা বলেন না। তাড়াহুড়া করে হাতের কাজ শেষ করে মামীমার ঘরে যায় মনিরা। মনিরা কক্ষে প্রবেশ করেই ধুমকে দাঁড়াল। দেখতে পায়, মামীমা গম্ভীর বিষণ্ন মনে খাটের একপাশে বসে আছেন। চোখ দুটো তার অশ্রু ছলছল বলে মনে হলো মনিরার।

মামীমার মুখোভাব লক্ষ্য করে তার মনটাও কেমন যেন বিষণ্ন হলো। এগিয়ে গিয়ে বলল– কি বলছিলে মামীমা?

মরিয়ম বেগম কোন কথা না বলে একখানা চিঠি এগিয়ে দেন মনিরার দিকে-পড়ে দেখো।

মনিরা চিঠি হাতে নিয়ে মেলে ধরে চোখের সামনে। তার বড় চাচা আসগর আলী সাহেব লিখেছেন। হঠাৎ তার চিঠি দেবার কারণ কি? এতদিন তো তার বড় চাচা আসগর আলী মনিরার কোন খোঁজ-খবর নেননি? মনিরা তাড়াতাড়ি চিঠিখানা পড়তে শুরু করে, আসগর আলী সাহেব লিখেছেন

-মা মনিরা, অনেক দিন তোমার খোঁজ-খবর নিতে পারিনি, সেজন্য আমি দুঃখিত। অবশ্য আমি তোমার সংবাদ সব সময় রেখেছি। মামা মামীর নিকটে কুশলেই আছ জেনে কতকটা। নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু আজ আমি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। কারণ এখন তোমার মামুজান নেই, তোমার সমস্ত দায়িত্বভার যিনি গ্রহণ করেছিলেন তিনি আজ পরপারে। মামীমা মেয়ে মানুষ, নিজেই এখন অভিভাবকহীন-অসহায়। তুমি আগের মত আর ছোট নেই, তাই তোমাকে নিয়ে আমি বেশ ভাবনায় আছি। তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মেয়ে–আমার নিজের মেয়েও যা, তুমিও তাই-তোমার ভাল-মন্দ সব আমাকেই দেখতে হবে, কাজেই আমি এখন তোমাকে আমাদের এখানে নিয়ে আসতে চাই। আমার বিশ্বাস, এতে তুমি অমত করবে না। তোমার মামীমাও নিশ্চয়ই রাজি হবেন। ইতি–

তোমার শুভাকাক্ষী–
বড় চাচা

চিঠিখানা পড়া শেষ করে মনিরা স্তব্ধ হয়ে গেল। এবার বুঝতে পারল, কেন তার মামীমার মুখোব এমন হয়েছে, কেন তিনি কোনো কথা বলতে পারছেন না। মনিরা পরপর দু'বার চিঠিখানা পড়লো, তারপর চিঠিখানা ভাঁজ করে হাতের মুঠায় চেপে ধরল।

মরিয়ম বেগম বলে উঠলেন-সত্যিই তুই আমাকে ছেড়ে যাবি মনি?

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে মনিরা–তুমি এ কথা ভাবতে পারলে মামীমা? মনিরা মরিয়ম বেগমের পাশে গিয়ে বসল। তারপর ছোট্ট বালিকার মত মামীমার হাত নিয়ে নাড়াচড়া করতে করতে বলল–মামীমা, তুমি বিশ্বাস করো, কোনদিন আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাবো না।

মনিরা, তুই ছেড়ে যাবি না বলছিস কিন্তু জানিস না মা তোর বড় চাচা আসগর আলী সাহেবকে, তিনি যা বলবেন যা ভাববেন–তা করবেনই।

আমি তাঁকে চিনি না, জানি না, তিনি যদি আমার হিতাকাঙ্ক্ষীই হবেন। তাহলে এতদিনে নিশ্চয়ই এসে আমাকে দেখেশুনে যেতেন।

কি করবি মা, আমাদের চেয়ে তার ওপর তাঁদের দাবী অনেক বেশি। তিনি যদি তোকে জোর করে নিয়ে যান তবে আমরা তোকে ধরে রাখতে পারব?

কেন পারবে না মামীমা, কেন পারবে না। আমি কি তোমাদের মেয়ে নই?

মাতৃকূলের কাছে পিতৃকূলের দাবি অনেক বেশি। তোর উপর আমার যে কোন দাবী নেই মা। মরিয়ম বেগমের কণ্ঠ চাপা কান্নায় রুদ্ধ হয়ে যায়।

মনিরার মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে ওঠে। তীব্রকণ্ঠে বলে মনিরা–আমি তাদের দাবি স্বীকার করি না। যারা এতদিন ভুলেও আমার ছায়া মাড়ায় নি, আজ তারা এসেছে পিতৃকূলের দাবি নিয়ে। না না, কিছুতেই আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না-যেতে পারি না।

মনিরা, পিতৃকুলের দাবিকে অস্বীকার করলেও একদিন আসগর আলী সাহেব সশরীরে চৌধুরী বাড়িতে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে এসেছে তার দু'জন আরদালী আর একজন আত্মীয় ভদ্রলোক। আসগর আলী সাহেব বজরায় এসেছেন- উদ্দেশ্য মনিরাকে তিনি নিয়ে যাবেন। কিন্তু মনিরা আসগর আলী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতেই এলো না। নিজের ঘরে চুপ করে শুয়ে রইল।

মরিয়ম বেগম কিন্তু মনের দুঃখ প্রকাশ না করে নিজের সাধ্যমত আদর যত্ন করতে লাগলেন। মরিয়ম বেগমের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হলেন আসগর আলী সাহেব। কিন্তু তিনি এতক্ষণও মনিরাকে না দেখতে পেয়ে চঞ্চল হলেন। মরিয়ম বেগমকে জিজ্ঞেস করলেন–ভাবী, মনি কোথায়? ওকে তো দেখছি না?

মরিয়ম বেগম বললেন-শরীরটা খারাপ, তাই শুয়ে আছে।

গম্ভীর হয়ে পড়লেন আসগর আলী সাহেব, বললেন-শরীর খারাপ আজই হলো, না আগে থেকেই ছিল?

আমতা আমতা করে বললেন মরিয়ম বেগম-হঠাৎ আজ কদিন ওর শরীরটা…

খারাপ যাচ্ছে, এই তো? মনে হয় আমার চিঠি পাবার পর থেকে। কিন্তু মনে রাখবেন ভাবী, ওকে আমি নিয়ে যাবই। আমার ছোট ভাইয়ের মেয়ে, আপনার চেয়ে ওর ওপর আমার দায়িত্ব অনেক বেশি।

তা জানি। কিন্তু….

কিন্তু নয়, এখন মনিরা আগের মত কচি খুকী নেই। বয়স হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে।

তা ঠিক।

আপনিই বলুন তাকে এখন এভাবে যেখানে সেখানে ফেলে রাখা যায়?

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠেন মরিয়ম বেগম–যেখানে সেখানে….এ আপনি কি বলছেন?

যা বলছি সত্য কথা। এতদিন মনিরা নাবালিকা বলে তাকে আপন বানিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন, এমন কি তার বাবার বিশাল ঐশ্বর্য ভোগ করে আসছেন–

এসব আপনি বলছেন আলী সাহেব, মনিরার ঐশ্বর্য আমরা ভোগ করে আসছি?

তা নয় তো কি? মনিরার বিশাল ধন-সম্পদ এখন কাদের হাতের মুঠায়? চৌধুরী সাহেব নিজেই আত্মসাৎ করে নেন নি?

না। তিনি পরের ঐশ্বর্যের কাঙ্গাল ছিলেন না।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন আসগর আলী সাহেব–একথা আর কেউ বিশ্বাস করলেও আমি বিশ্বাস করি না। মনিরাকে এবং তার মাকে এখানে নিয়ে আসার পেছনে কি ঐ একটিমাত্র কারণ নেই–আমার ছোট ভাইয়ের ধন-সম্পদ? চৌধুরী সাহেব সরলতার ভান করে মনিরা আর তার মায়ের সব লুটে নেন নি আপনি বলতে চান?

মরিয়ম বেগম স্তব্ধ হয়ে যান, কোন কথাই তিনি আর বলতে পারছেন না। কে যেন তার কণ্ঠনালী টিপে ধরেছে। পাথরের মূর্তির মত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকেন।

আসগর আলী সাহেব বলেই চলেছেন-মনিরার বাবা বেঁচে থাকলে পারতেন এসব করতে?

ঠিক সেই মুহূর্তে দমকা হাওয়ার মত কক্ষে প্রবেশ করে মনিরা–বড় চাচা বলে আমি আপনাকে ক্ষমা করবো না। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি সব শুনেছি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ লজ্জা করে না আপনার এসব বলতে?

মনিরাকে হঠাৎ এভাবে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে প্রথমে আশ্চর্য, পরে রাগান্বিত হন আসগর আলী সাহেব। গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন।

মনিরা বলে চলে-আমার মামুজান আপনার মত লোভী ছিলেন না। আমার ঐশ্বর্যের চেয়ে তার হৃদয় অনেক বড় ছিল। সেখানে ধন-সম্পদের মত তুচ্ছ জিনিসের কোন দাম ছিল না। আমি জানি, মামুজান আমার ঐশ্বর্যের এতটুকু নষ্ট করেন নি। বরং এতদিন আপনার নিকটে থাকলে....

বিনষ্ট হত, তাই বলতে চাও?

হ্যাঁ, আমাকেও হয়তো পথে দাঁড়াতে হত।

মনিরা!

বড় চাচা, আমি জানতাম না আপনার মন এত নিচু, এত ছোট।

মরিয়ম বেগম বলে ওঠেন–মনিরা, সাবধানে কথা বল, উনি তোমার গুরুজন।

উনি নিজের সম্মান বাঁচিয়ে চলতে না পারলে আমি কি করতে পারি? উনি যে আমার বড়। চাচা, ভাবতেও ঘৃণা বোধ করছি। আমার শরীরে ওদের রক্ত প্রবাহিত, একথাই আমি ভাবতে পারি না। অনেক দিন আমি উনাকে দেখিনি, উনাকে আমার তেমন করে মনেও পড়ে না। এতদিন একটিবার খোঁজ-খবর নিয়েও জানেন নি যে, আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি-আজ এসেছেন বড় চাচার দাবি নিয়ে! এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলল মনিরা।

আসগর আলী সাহেবের দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। তিনি চিৎকার করে উঠলেন-সমস্ত শেখানো কথা। ভাবী, এসব মনিরাকে আপনি....

এই তো একটু আগেই আপনি মামীমার কাছে বললেন মনিরা এখন আগের মত কচি খুকী নেই। সত্যিই আমি আগের মত সেই ক্ষুদ্র বালিকা নই, নিজের ভালমন্দ বুঝবার মত জ্ঞান আমার আছে। আপনি আমার গুরুজন হতে পারেন কিন্তু অভিভাবক নন।

মনিরা, তুমি যতই আমাকে অস্বীকার কর কিন্তু আমি তোমার বাবার বড় ভাই।

তা জানি।

আমি এসেছি তোমাকে নেবার জন্য।

কেন?

বয়স তোমার কম হয় নি। তুমি আমাদের বংশের মেয়ে। তোমার কলঙ্ক আমাদের মুখে চুনকালি মাখাবে।

আমি তেমন কিছু করিনি যা আপনাদের মুখে চুনকালি দিতে পারে।

করনি? তোমার মামার ছেলে দস্যু বনহুরকে তুমি স্বামী বলে গ্রহণ করতে চাও নি?

চেয়েছি। এতে আপনাদের মুখে চুন কালি পড়ার কথা নয়।

না, একটা দস্যুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না।

আমার বিয়ে যেখানে খুশি হউক বা না হউক তাতে আপনার কিছু আসে যায় না।

মানে?

মানে আপনাকে বুঝিয়ে বলতে চাই না।

তুমি ঐ দস্যু-চোর-ডাকু লম্পটকে....

হ্যাঁ, আমি তাকেই স্বামী বলে গ্রহণ করব। একটি কথা আপনি ভুল বুঝছেন–সে দস্যু বটে–কিন্তু চোর বা লম্পট নয়।

আবার হেসে ওঠেন আসগর আলী সাহেব, ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি, তারপর বললেন-যার কুৎসা সারা দেশময়, লোকের মুখে মুখে যার বদনাম

বদনাম নয় বড় চাচা-সুনাম! দস্যু বনহুরের জন্য আজ দেশবাসী পরাধীনতার পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি পেয়েছে। দেশের জন্য সে যতখানি ত্যাগ স্বীকার করেছে, কেউ ততখানি পেরেছে?

ওসব জানতে চাই না মনিরা। আমি বলছি, কিছুতেই একটা দস্যুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না। তুমি নিজে যেতে না চাইলে আমি তোমাকে জোর করে নিয়ে যেতে বাধ্য হব।

.

শেষ পর্যন্ত মরিয়ম বেগম মনিরাকে ধরে রাখতে পারলেন না, মনিরার কোন আপত্তি চলল না, আসগর আলী সাহেব জোরপূর্বক নিয়ে গেলেন মনিরাকে।

সরকার সাহেব বাধা দিতে এসেছিলেন, তাঁকে অপমানিত করে সরিয়ে দেয়া হল।

নকীব পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল, তাকে লাঠির আঘাতে আহত করা হলো। চৌধুরী বাড়িতে একটা শোকের ছায়া ঘনিয়ে এলো।

মরিয়ম বেগম কেঁদে কেটে আকুল হলেন। আজ চৌধুরী সাহেব বেঁচে থাকলে আসগর আলী সাহেব এভাবে মনিরাকে নিয়ে যেতে পারতেন? কখনও না, এমন কি মনিরাকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব পর্যন্ত তুলতে পারতেন না।

মরিয়ম বেগম চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে চললেন। এই বিরাট বাড়িখানায় আজ তিনি একা। কেউ নেই তাঁকে এতটুকু সান্ত্বনা দেবার।

বৃদ্ধ সরকার সাহেব তবু যতটুকু পারেন বুঝাতে চেষ্টা করেন, বাড়ির দাস-দাসী সবাই তাকে সান্তনা দেবার চেষ্টা করে কিন্তু যতই তাকে সবাই বুঝতে চায় ততই তিনি কেঁদে আকুল হন। মনিরাই যে ছিল তাঁর একমাত্র ভরসা। ওর মুখের দিকে তাকিয়েই তিনি আজও বেঁচে আছেন।

সেই মনিরা আজ নেই।

যেদিকে তাকান মরিয়ম বেগম সেদিকেই অন্ধকার দেখেন। ভাবেন মনিরা যদি তার নিজের সন্তান হতো তাহলে কি পারত কেউ তাকে এভাবে জোর করে নিয়ে যেতে? কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি দাবি রয়েছে ওদের। আসগর আলী যে তাঁর পিতার বড় ভাই…নানা কথা ভেবে সান্ত্বনা খোঁজেন মরিয়ম বেগম নিজের মনে।

.

বজরার এক কোণে নিশ্চুপ বসেছিল মনিরা। দৃষ্টি তার নদীর পানিতে সীমাবদ্ধ। কত কি আকাশ পাতাল ভেবে চলেছে সে, এতকাল মামা-মামীমার নিকট কাটিয়ে আজ সে কোথায় চলেছে। যেখানে নেই এতটুকু স্নেহ-মায়া মমতা দেখানোর কেউ নেই কেউ তার পরিচিত। যদিও আসগর আলী সাহেব তার বড় চাচা হন তবু তাদের কাউকে মনিরা তেমন করে জানে না। অনেক ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে চলে এসেছে মনিরা শহরে। তারপর অবশ্য দু'বার গিয়েছিল দেশের বাড়িতে কিন্তু সামান্য দু'একদিনের জন্য।

আদতে বড় চাচা আর বড় চাচীর ব্যবহার তাকে সন্তুষ্ট করেনি। তাদের পুত্রকন্যাগুলোও কেমন যেন ঈর্ষার চোখে দেখত তাকে। মনিরা ওদের সঙ্গে কোনদিন মন খুলে কথা বলতে পারেনি। মিশতে গিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে ফিরে এসেছে।

তারপর তো বহুদিন আর দেশের বাড়িতেই যায় নি মনিরা। মা বেঁচে থাকতে তিনি মাঝে মাঝে গিয়ে বিষয় আশয় দেখাশুনা করে আসতেন। মায়ের মৃত্যুর পর মামুজানই বছরে একবার যেতেন, মনিরার বিষয় আশয় যাতে নষ্ট হয়ে না যায়। মামুজানের মৃত্যুর পর এখন মামীমা আর সরকার সাহেব মনিরার সব দেখাশোনা করছিলেন। নিশ্চিন্তই ছিল মনিরা, হঠাৎ কোথা থেকে বড় চাচার আবির্ভাব হল, কি মতলবে যে তিনি ওকে নিয়ে চলেছেন তিনিই জানেন।

মনিরাকে ভাবাপন্ন বসে থাকতে দেখে বললেন আসগর আলী সাহেব–মনি কি ভাবছ?

মনিরা কোনো কথা বললো না।

আসগর আলী সাহেব তার বিশাল বপু নিয়ে মনিরার পাশে এসে বসলেন, তারপর গলার স্বর কোমল করে নিয়ে বললেন–মনিরা, আমি তোমার ভালোর জন্যই নিয়ে যাচ্ছি, কারণ তুমি আমার ছোট ভাইয়ের একমাত্র সন্তান-বংশধর, কাজেই আমার কর্তব্য তোমার মঙ্গল সাধন করা। দেখ মনিরা, তোমার মামীমা তোমাকে যতই ভালবাসুক কিন্তু তার সঙ্গে তোমার রক্তের কোন। সংশ্রব নেই। মুখে যতই দরদ দেখাক তার পেছনে রয়েছে স্বার্থ। তোমার বিশাল ঐশ্বর্যের মোহ তাকে–

মনিরা চিৎকার করে তাকে থামিয়ে দিল-চুপ করুন বড় চাচা, আমি ওসব শুনতে চাই না।

তা চাইবে কেন। কিন্তু মনে রেখ, আমি তোমাকে তোমার ইচ্ছামত যা তা করতে দেব না।

মনিরা একবার ফিরে তাকাল আসগর আলী সাহেবের মুখের দিকে, কোন কথা বলল না।

আসগর আলী সাহেব বলে চললেন–আজ তুমি আমার ওপর রাগ করে মন খারাপ করছ, কিন্তু যখন দেখবে আমি তোমার ভালোই করছি, তখন তোমার এ ভুল ভেঙে যাবে।

মনিরাকে নিয়ে আসগর আলী সাহেবের বজরা যখন ঘাটে ভিড়ল তখন বাড়ির যত মহিলা এসে জড়ো হয়েছে সেখানে। চাচীমা সবার আগে এলেন–কই, মা মনিরা কই!

বজরার সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রেখে বললেন আসগর আলী সাহেব–ভেব না, তাকে এনেছি। তারপর বজরার মধ্যে প্রবেশ করে বললেন–মনি, উঠে এসো, বাড়িতে পৌঁছে গেছি।

মনিরা পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে রইল।

অগত্যা চাচীমা বজরায় উঠে এলেন–মা মনিরা। মনিরা কোথায় তুমি? ভিতরে প্রবেশ করে বলে ওঠেন-এই যে এখানে চুপটি করে বসে আছ। ওঠো মা–ওঠো, দেখ কোথায় এসেছ!

মনিরা পুতুলের মত উঠে দাঁড়াল, অনুসরণ করল চাচীমাকে।

চাচীমা বললেন–খুব সাবধানে নেমো, দেখো পা পিছলে পড়ে যেও না যেন। দাও, হাতটা আমার হাতে দাও।

মনিরা চাচীমার হাতে হাত না রেখেই নেমে পড়ল বজরা থেকে! কিন্তু একি, অন্দরবাড়িতে প্রবেশ করতেই মনিরার মনটা চড়াৎ করে উঠল। ব্যাপার কি, উঠানে শামীয়ানা টাঙানো। ঘর দোর কাগজের ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। একপাশে একটা মঞ্চের মত উঁচু জায়গা লাল কাপড় দিয়ে ঢাকা। চারপাশে নানারকম ফুলঝাড়।

মনিরা আশ্চর্য হয়ে দেখতে দেখতে এগুচ্ছে। চাচীমা আগে আগে চলেছেন, আর পেছনে অগণিত ছেলেমেয়ে আর যুবতী ও বৃদ্ধা। সবাই যেন অবাক হয়ে মনিরাকে দেখছে।

একটা বড় ঘরের মধ্যে মনিরাকে নিয়ে বসানো হল।

চাচীমা মেয়েদের লক্ষ্য করে বললেন–তোমরা সব ওদিকে সেরে নাও, আমি মনিরাকে কাপড়-চোপড় ছাড়িয়ে গোসল করিয়ে নি।

মেয়েরা সবাই মৃদু হেসে বেরিয়ে গেল।

চাচীমা দরদভরা গলায় বললেন–আহা, মার আমার মুখখানা শুকিয়ে গেছে। সেই সাত সকালে বজরায় চেপেছে। চলো মা, চলো, গোসল করে চারটা খাবে চল।

আমার ক্ষিদে নেই, গোসল করতে হবে না। গম্ভীর কণ্ঠে বলল মনিরা।

অবাক কণ্ঠে বললেন চাচীমা–সে কি বাছা, গোসল করবে না, ক্ষিদেও নেই–এ তুমি কি বলছ?

মনিরা কোনো কথা বলল না।

চাচীমা আবার বললেন–চলো মা, লক্ষীটি, চলো। বিয়ের সময় হয়ে এলো বলে…..

চমকে ওঠে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে মনিরা–বিয়ে! কার বিয়ে?

সেকি মা, তোমার বড় চাচা তোমাকে কিছু বলেন নি? ও, তুমি লজ্জা পাবে তাই বুঝি উনি বলেন নি। শোনো মা–শহীদের সঙ্গে তোমার বিয়ে।

শহীদ! কে শহীদ?

ওমা, সেকি, শহীদকে চেন না? আমাদের ছেলে শহীদ। ঐ যে তোমার সঙ্গে খেলা করত। অবশ্য তোমার চেয়ে বছর সাত-আট বড় হবে আমার শহীদ। কিন্তু শরীরটা যা ওর রোগাটে, তাই। এতটুকু হয়ে আছে। দেখলে মনে হয় এখনও বিশ বছর হয় নি। দাড়িগোঁফের নামগন্ধ নেই– বাছার আমার মেয়েদের মত সুন্দর ফুটফুটে মুখ। ঐ তো ওকে মেয়েরা সব গোসল করাচ্ছে

এমন সময় শোনা যায় একটা মহিলার কণ্ঠস্বর-বড় আম্মা, এসো, শহীদ ভাই কথা শুনছে না, শুধু শুধু পানি মাথায় ঢালছে। শিগগির এসো–

চাচীমা হেসে বললেন–দেখ, এখনও তার ছেলেমি যায় নি। যাই দেখি। বেরিয়ে যান চাচীমা।

মনিরা জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে। একটা বাচ্চা ছেলেকে দেখতে পেয়ে হাতের ইশারায় ডাকে–এই শোনো।

বাচ্চা ছেলেটা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর এগিয়ে আসে কি বলছ?

তোমার নাম কি?

ছেলেটা জবাব দেয়–আমার নাম মামুন।

খুব সুন্দর নাম তো তোমার। এই শোনো, এ বাড়িতে কার বিয়ে জান?

বা রে জানি না? আমার মেজো ভাইয়ার বিয়ে?

মেজো ভাইয়া?

হ্যাঁ, শহীদ ভাইয়ার বিয়ে তোমার সাথে, তুমি যে আমাদের ভাবী হবে—

মামুনের কথায় রাগ হয় মনিরার, ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় সে তার গালে।

আচমকা চড় খেয়ে মামুন ভ্যা করে কেঁদে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে চাচীমা, আরও কয়েকজন মহিলা কি হল কি হল করে।

চাচীমা বললেন কি হয়েছে রে মামুন?

আংগুল দিয়ে মনিরাকে দেখিয়ে বলে– ভাবী মেরেছে।

অমনি মনিরা কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে– খবরদার, আবার যদি ভাবী বলবি।

গালে হাত রাখেন চাচীমা ওমা সেকি গো! এই তো একটু পরে কলেমা পড়ে শহীদের বৌ। হবে। ভাবী নয় তো কি?

চাচীমা, এসব কি বলছেন আপনারা? বিয়ে আমি এখন করব না।

অবাক কণ্ঠে বললেন চাচীমা করব না বললেই হলো। তোমার বড় চাচা তোমাকে তাহলে এমনি এমনি নিয়ে এলেন?

তা তিনি যা মনে করেই আনুন না কেন, বিয়ে আমি করব না।

করতে হবে। কথাটা বলতে বলতে কক্ষে প্রবেশ করেন বড় চাচা। দু'চোখে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। কঠিন কণ্ঠে বলেন– তোমার কোন আপত্তি শুনব না মনিরা।

মনিরা তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয়– আপনি যতই বলুন, বিয়ে আমি করব না। মামুজানকে আপনি লোভী স্বার্থপর বলে অপবাদ দিচ্ছিলেন, এখন বুঝতে পারছি কেন আপনি আমাকে জোর করে নিয়ে এলেন আমাকে হাতের মুঠায় এনে আমার সমস্ত বিষয় আশয় আত্মসাৎ করতে চান। আপনার পাগল ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে আমাকে জীবন্ত হত্যা করতে চান। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার এ কুমতলব সিদ্ধ হবার নয়। প্রাণ গেলেও আমি শহীদকে স্বামী বলে মেনে নিতে পারব না।

তা আয়োজন আমার পণ্ড করে দিতে চাও? মনে রেখ মনিরা, দুনিয়া পাল্টে যেতে পারে তবু। তোমাকে আমি পুত্রবধু করবোই। আমার ছোট ভাইয়ের ধন-সম্পদ আমি কারও হাতে তুলে দিতে পারি না–বেরিয়ে যান আসগর আলী সাহেব।

গোটা দিন কেটে গেল মনিরা দানাপানি মুখে দিল না। সন্ধ্যার পর বিয়ে হবে, কিন্তু মনিরা বেঁকে বসলো, বলল–দুটো দিন সময় দিন বড় চাচা, তারপর আপনি যা বলবেন শুনব।

অগত্যা আসগর আলী সাহেব মনিরার কথায় রাজি হলেন, সেদিনের মত বিয়ে স্থগিত রইল।

.

বনহুর তার পাতালপুরীর গোপন আস্তানায় গা ঢাকা দিয়ে রইল বটে, কিন্তু রাতের অন্ধকারে তাজকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। পুরোদমে চলল তার দস্যুবৃত্তি।

এর টাকা-পয়সা ওর, অলঙ্কার আর ধনরত্ন লুটে নিয়ে স্তূপাকার করতে লাগল সে তার। পাতালপুরীর রত্নাগারে। দস্যু বনহুর যেন প্রলয় কাণ্ড শুরু করেছে।

পুলিশমহলে আবার সাড়া পড়ল।

দেশবাসীর মনে আতঙ্কের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে। কেউ নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাতে পারছে না। সবাই দস্যু বনহুরের ভয়ে আড়ষ্ট।

মিঃ জাফরী, মিঃ হারুন দস্যু বনহুরের আস্তানা ধ্বংস করে মনে মনে খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তারা দেখলেন দস্যু বনহুরের আস্তানা ধ্বংস এবং তার কিছু সংখ্যক অনুচরকে নিহত করে। কোনই লাভ হয় নি বরং দস্যু বনহুরকে ক্ষেপানো হয়েছে তখন একটু ঘাবড়ে গেলেন।

মিঃ মুঙ্গেরী অনেক কষ্টে এই আস্তানার সন্ধান লাভ করেছিলেন। এই আস্তানার সন্ধান করতে গিয়ে কতদিন তার না খেয়ে কেটেছে। কতদিন তাঁকে অনিদ্রায় কাটাতে হয়েছে। গহন বনে লুকিয়ে লুকিয়ে চলাফেরা করতে অনেক বিপদে পড়তে হয়েছে, এমনকি প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়ে তবেই মিঃ মুঙ্গেরী দস্যু বনহুরের আস্তানার খোঁজ পেয়েছিলেন। কিন্তু তার সকল প্রচেষ্টা। ব্যর্থ হয়েছে। দস্যু বনহুরের আস্তানা ধ্বংস হলেও তার যে কোন ক্ষতি হয় নি বেশ বুঝা যায়।

একদিকে দস্যু বনহুর, অন্যদিকে ছায়ামূর্তি।

চৌধুরী সাহেবের হত্য রিহস্যের সঙ্গে আরও দুটি হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে, কোনোটারই সমাধান আজও হলো না। মিঃ জাফরী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

সেদিনের বৈঠকে মিঃ হারুন বললেন–আপনারা যতই বলুন–ছায়ামূর্তি যে খান বাহাদুর সাহেবের পলাতক ছেলে মুরাদ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মিঃ হোসেন বললেন– একথা নির্ঘাত সত্য। সেই মুরাদই এই তিনটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে।

মিঃ জাফরী বলে ওঠেন– আপনাদের অনুমান সত্যও হতে পারে। পুলিশ রিপোর্টে মুরাদ সম্বন্ধে যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে আমারও ঐ রকম সন্দেহ হয়।

শঙ্কর রাও বললেন– স্যার, চৌধুরী সাহেবকে হত্যা করার পেছনে মুরাদের যে হাত ছিল এটা সত্য কিন্তু শয়তান নাথুরাম আর ডক্টর জয়ন্ত সেনকে কেন সে হত্যা করবে? আমি সন্ধান নিয়ে জেনেছি, তাছাড়া আমিও জানি নাথুরাম ছিল মুরাদের দক্ষিণ হাত।

কাজেই তাকে মুরাদ হত্যা করতে পারে না–তাই না মিঃ রাও? কথাটা বলতে বলতে কক্ষে প্রবেশ করেন মিঃ আলম।

মিঃ রাও বললেন গভীরভাবে চিন্তা করলে তাই মনে হয়।

মিঃ হারুন বললেন– হঠাৎ কর্পূরের মত কোথায় উবে গিয়েছিলেন মিঃ আলম?

মিঃ আলম আসন গ্রহণ করে বললেন– ছায়ামূর্তির সন্ধানে।

মিঃ জাফরী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– নিশ্চয়ই কোন নতুন খবর আছে মিঃ আলম?

একেবারে নেই বললে মিথ্যে বলা হবে। কেচো খুঁড়তে সাপের সন্ধান পেয়েছি।

কক্ষস্থ সবাই উৎসুক দৃষ্টিতে আলম সাহেবের মুখের দিকে তাকালেন। মিঃ জাফরী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ললাটে গভীর চিন্তারেখা ফুটে উঠেছে।

মিঃ আলম বললেন–আমি মনিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। ইচ্ছা ছিল তার কাছে চৌধুরী হত্যার সন্ধান পাই কিনা। অবশ্য তাকে আমি কোনোরূপ সন্দেহ করিনি। কিন্তু তার সঙ্গে গভীরভাবে আলাপ করে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে আমার মনে একটা ধারণা জন্মেছে। নিশ্চয়ই মনিরা তার মামুজানের হত্যা রহস্যের সঙ্গে জড়িত আছে।

মিঃ জাফরী বললেন– মনিরা তার মামুজানের হত্যা রহস্যের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে, আপনার এরকম সন্দেহের কারণ?

সেই তো বললাম কেঁচো খুঁড়তে সাপের সন্ধান পেয়েছি-সব কথা আপনাকে বলব স্যার, তবে এখানে নয় একেবারে নির্জনে।

মিঃ আলমের কথা শেষ হতে না হতে কক্ষে প্রবেশ করেন মিঃ শঙ্কর রাওয়ের সহকারী গোপাল বাবু। মুখোভাবে বেশ চাঞ্চল্য ফুঠে উঠেছে। কক্ষস্থ সবাইকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন– আমি ছায়ামূর্তির সন্ধান পেয়েছি।

সকলেই একসঙ্গে তাকালেন গোপালবাবুর মুখের দিকে।

গোপালবাবু বললেন–স্যার, কাল গভীর রাতে আমি যখন শঙ্করবাবুর নিকট থেকে বাসায় ফিরছিলাম তখন হঠাৎ আমার সম্মুখে মানে আমার হাত কয়েক দূরে ছায়ামূর্তির আবির্ভাব হয়েছিল।

মিঃ হারুন বললেন–ছায়ামূর্তি আপনার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল, বলেন কি গোপালবাবু। ইচ্ছা করলে আপনি তাকে পাকড়াও করতে পারতেন।

এত যদি সহজ হয়ত মিঃ হারুন তাহলে বলতে বলতে থেমে গেলেন মিঃ আলম তারপর একবার মিঃ জাফরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন “স্যার, তাহলে বিফল হতেন না।

মিঃ আলমের কথায় মিঃ জাফরীর মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ রক্তাভ হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখোভাব পরিবর্তন করে নিয়ে বললেন– ছায়ামূর্তি অত্যন্ত চতুর বুদ্ধিমান ...

না হলে কি এতগুলো পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে তাদের সম্মুখে ঘুরে বেড়ায়। আমিও কি কম নাজেহাল হয়েছি এই ছায়ামূর্তির সন্ধানে। কথাগুলো বললেন মিঃ আলম।

মিঃ শঙ্কর রাও বলে ওঠেন– গোপাল, তুমি যখন আমার বাসা থেকে বিদায় নিয়ে গেলে তখন রাত কত ছিল?

গোপাল বাবু মাথা চুলকে বললেন– রাত তখন চারটে।

মিঃ জাফরী বললেন–এত রাতে বন্ধুর কাছ হতে কেন বিদায় হলেন? আর দু’ঘণ্টা কাটানোর মত কি জায়গা ছিল না?

গোপাল বাবু তাকালেন শঙ্কর রাওয়ের মুখের দিকে। তারপর বললেন– শংকর আমাকে বাসায় যাবার জন্য অনুরোধ করেছিল।

মিঃ জাফরী গম্ভীর মুখে তাকালেন মিঃ শঙ্কর রাওয়ের মুখে। তারপর বললেন– তাকে কেন আপনি চলে যেতে বললেন।

স্যার, আমার সে কথা গোপনীয়, আমি বলতে পারব না। শঙ্কর রাও সচ্ছভাবে বললেন।

এবার মিঃ জাফরী বললেন–গোপাল বাবু ছায়ামূর্তিকে আপনি কোথায় দেখেছিলেন মনে আছে?

হ্যাঁ মনে আছে। আমার গাড়ি নিয়েই আমি যাচ্ছিলাম। বেশি রাত হবে বলে ড্রাইভারকে ছেড়ে দিয়ে নিজেই গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম শঙ্করের ওখানে। একথা সেকথার মধ্যে কখন যে রাত চারটে বেজে গিয়েছিল আমরা কেউ টের পাইনি। দেয়ালঘড়ির ঢং ঢং শব্দে হুঁশ হয়েছিল। শঙ্কর বলল–যা শিগগির বাড়ি যা। আমি বললাম–থেকে গেলে হয় না? কথার ফাঁকে আর একবার মিঃ শঙ্কর রাওয়ের মুখের দিকে তাকান গোপাল বাব, তারপর বলেন, আমারও ভাল লাগল না। তাই বাড়ি চলে গেলাম। আমার বাড়ি যেতে হলে চৌধুরীবাড়ির পেছন পথ বেয়ে যেতে হয়; সেই পথে আমি ছায়ামূর্তিকে দেখেছি চৌধুরীবাড়ির কবরস্থানের দিকে তাকে অদৃশ্য হতে দেখেছি।

মিঃ জাফরী একটা শব্দ করলেন– হুঁ।

সেদিন আরও কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর সবাই উঠে পড়লেন।

.

মনিরার শূন্যকক্ষে প্রবেশ করে দাঁড়াল দস্যু বনহুর। চারদিকে তাকিয়ে দেখলো। আজ বেশ কিছুদিন এখানে আসতে পারেনি সে, নানা ঝঞ্ঝাটে ছিল। আজ হঠাৎ তার মনটা কেন যেন অস্থির হয়ে পড়েছিল। দস্যুতা করতে গিয়ে সেই বেশেই এসে হাজির হলো মনিরার কক্ষে। কিন্তু একি! মনিরা কোথায়? মনটা বিষণ্ন হয়ে গেল তার।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বারান্দায়, অমনি তাকে দেখে ফেলল নকিব, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো চোর চোর চোর—

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে ছুটে এলো বাড়ির চাকর বাকর আর বৃদ্ধ সরকার সাহেব। কারও হাতে লাঠি, কারও হাতে সুড়কি, কারও হাতে চাকু, কিন্তু ততক্ষণে বনহুর উধাও হয়েছে।

সকলের সঙ্গে মরিয়ম বেগমও এসে উপস্থিত হলেন সেখানে, সরকার সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন– কোথায় চোর?

সরকার সাহেবের হয়ে ব্যস্তসমস্ত কণ্ঠে বলে ওঠে নকিব আম্মা, হেঁইয়া কালো ভূতের মত। চেহারা কোথায় যেন হাওয়ায় মিশে গেল ঐ যে আপামনির ঘরের বারান্দায় দেখেছি

সরকার সাহেব এবং অন্যান্যে মিলে গোটা বাড়িটা তন্ন তন্ন করে খুঁজল কিন্তু কোথায়ও কাউকে দেখতে পেলেন না।

এবার সবাই যার যার ঘরে ফিরে গেল।

মরিয়ম বেগম নিজের ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করলেন, যেমনি তিনি বিছানার দিকে এগুতে যাবেন, অমনি আলমারীর পেছন থেকে বেরিয়ে এলো দস্যু বনহুর।

মরিয়ম বেগম চিৎকার করতে যাবেন, অমনি বনহুর মুখের কালো আবরণ সরিয়ে ফেলল।

মরিয়ম বেগম অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন– মনির।

হ্যাঁ মা, আমিই সেই চোর যাকে এতক্ষণ তোমরা খুঁজে খুঁজে হয়রান পেরেশান হচ্ছিলে। মনিরা কই মা?

মনিরা? তাকে তো তার বড় চাচা দেশের বাড়িতে নিয়ে গেছে।

কেন?

মনিরা তাদের বংশের মেয়ে, কাজেই মনিরার ওপর আমাদের কোন অধিকার নেই। এতদিন ওকে নাকি আমরা ওর ঐশ্বর্যের লোভে মানুষ করেছি। তোর আব্বা

নাকি মনিরার সব ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিয়েছেন। আরও কত কি যে বলে গেল তোকে বুঝিয়ে বলতে পারব না বাবা–সে অনেক কথা।

বনহুরের চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলে ওঠে। অধর দংশন করে বলে–সে বলে গেল আর তুমি নীরবে শুনে গেলে?

তাছাড়া তো কোন উপায় ছিল না বাবা!

বনহুর কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর বলল–এতদিন যে বড় চাচার কোন খোঁজ-খবর ছিল না, আজ সে হঠাৎ গভীর দরদ দেখিয়ে নিয়ে যাবার কারণ কি?

মনিরাকে নিয়ে যাবার সময় তারা জোর করে নিয়ে গেছে। মা কি আমার যেতে চায়?

সব বুঝতে পেরেছি। নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে যাবার কোন উদ্দেশ্য আছে। মা আজই আমি চললাম।

কোথায়?

মনিরাকে আনতে।

সেখানে তুই যাবি বাবা? শুনেছি আসগর আলী সাহেবের বাড়িতে বন্দুকধারী পাহারাদার পাহারা দেয়।

মায়ের কথায় হাসল বনহুর, তারপর বলল–তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা, আমি মনিরাকে তোমার নিকটে এনে দেব। কথা শেষ করে পেছন জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায় বনহুর। মরিয়ম বেগম নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত থ'মেরে দাঁড়িয়ে থাকেন।

বাগানবাড়ির পেছনে ভেসে ওঠে অশ্বপদ শব্দ খট খট খট…

.

তাজের পিঠে উল্কাবেগে ছুটে চলেছে বনহুর।

কোনদিকে তার খেয়াল নেই। গভীর রাতের অন্ধকারে বনহুরের জমকালো পোশাক মিশে একাকার হয়ে গেছে।

বনহুর যখন তাজের পিঠে বন প্রান্তর মাঠ পেরিয়ে ছুটে চলেছে তখন আসগর আলী সাহেবের বাড়িতে মহা ধুমধাম শুরু হয়েছে। আজ ভোর রাতে মনিরার বিয়ে আসগর আলী সাহেবের ছেলে শহীদের সঙ্গে।

অনেকগুলো মেয়ে মনিরাকে সাজানো নিয়ে ব্যস্ত।

আসগর আলী সাহেব নানারকমের মূল্যবান অলঙ্কার গড়ে দিয়েছেন মনিরার জন্য। মূল্যবান শাড়ি ব্লাউজ আরও অন্যান্য সামগ্রী। উদ্দেশ্য মনিরাকে খুশি করা।

ওদিকে শহীদকে সাজানো নিয়ে ব্যস্ত যুবকের দল।

শহীদ বার বার হাই তুলছে আর বলছে–কখন বিয়ে হবে? আমার কিন্তু বড় ঘুম পাচ্ছে।

মা পাশেই ছিলেন আদরভরা গলায় বলেন এই তো শুভলগ্ন হল বলে। বিয়ে থা, সময়ক্ষণ দেখে তবে হতে হয়। কথাগুলো বলে কনের ঘরে এলেন তিনি কি গো, তোমাদের হয়েছে তো?

এমন সময় আসগর আলী সাহেব এলেন সেখানে–এখনও তোমাদের হয় নি? বিয়ের সময় তো হয়ে এলো– ভোর পাঁচটায় বিয়ে; এখন রাত চারটা। সব ঠিক করে নাও, মুন্সী সাহেব বাইরে বিয়ে পড়িয়ে অন্দরবাড়িতে আসবেন।

হলঘরের সম্মুখে বিরাট শামিয়ানার তলায় হাজার হাজার লোক বসে গেছে, বরকে নিয়ে বসানো হলো তাদের মাঝখানে।

বাইরে বরকে প্রথমে বিয়ের কলেমা পড়ানো হবে। মুন্সী সাহেব তার কেতাব খুলে বসলেন।

মেয়েরা সবাই মনিরাকে ছেড়ে বিয়ে দেখতে ছুটল, কেউ দরজার ফাঁকে, কেউ প্রাচীরের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল।

মনিরা একা বসে আছে। বিয়ের সাজে তাকে সাজানো হয়েছে। সমস্ত শরীরে মূল্যবান শাড়ি আর গয়না। ললাটে চন্দনের টিপ। মনিরা ভাবছে– কিছুতেই এ বিয়ে হতে পারে না– যেমন করে হউক, তাকে বিয়ে বন্ধ করতে হবে। এ বাড়িতে আসার পরদিনই বিয়ের আয়োজন করেছিল ওরা। মনিরা নানা কৌশলে বন্ধ

করেছিল কিন্তু আজ আর তার কোনো আপত্তি টিকছে না। এখন কি উপায়? কিন্তু এ বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না, জীবন গেলেও না– বিষ খাবে সে।

হঠাৎ মনিরার চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়, একটা শব্দে ফিরে তাকায় সে। মুহূর্তে মনিরার মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে, অস্ফুট কণ্ঠে বলে সে– মনির, তুমি এসেছ?

বনহুর ঠোঁটের ওপর আংগুলচাপা দিয়ে মনিরাকে চুপ হতে বলে।

মনিরা ততক্ষণে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বনহুরের বুকে, তারপর ব্যস্তকণ্ঠে বলে–শিগগির নিয়ে চল। আমাকে বাঁচাও মনির।

বনহুর এখানে পৌঁছেই বাড়ির আয়োজন দেখে অনুমানে সব বুঝে নিয়েছিল। নিশ্চয়ই তার সন্দেহ সত্যে পরিণত হতে চলেছে। মনিরার বিয়ে দিয়ে তাকে হাতের মুঠোয় ভরতে চলেছেন। আসগর আলী সাহেব।

বনহুর অদূরে একটা ঘন ঝোঁপের আড়ালে তাজকে রেখে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এই কক্ষে প্রবেশ করেছে। এই পথটুকু যে কেমন করে সে এসেছে সেই জানে।

প্রায় আধঘন্টা বনহুর সুযোগের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। যেমনি মেয়েরা ওদিকে বিয়ে পড়ানো দেখতে গেছে, অমনি সে আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

আর বিলম্ব না করে বনহুর মনিরাকে নিয়ে পেছন জানালার শিক বাঁকিয়ে সেই পথে বেরিয়ে পড়ল।

এবার আর তাদের কে পায়!

বনহুর মনিরাকে নিয়ে তাজের পাশে এসে দাঁড়াল।

আসগর আলী সাহেবের বাড়িতে তখন করুণ সুরে সানাই বেজে চলেছে।

বনহুর নববধূর সাজে সজ্জিত মনিরাকে তুলে নিল অশ্বপৃষ্ঠে। বাঁ হাতে মনিরাকে চেপে ধরে দক্ষিণ হাতে তাজের লাগাম টেনে ধরল।

বন-প্রান্তর পেরিয়ে উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো তাজ।

মনিরার মনে অফুরন্ত আনন্দ। দক্ষিণ হাতে বনহুরের কন্ঠ বেষ্টন করে বলল– চিরদিন এমনি করে যদি তোমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারতাম!

বনহুর আবেগভরা কণ্ঠে বলে–তাই রয়েছ তুমি! মনিরা, কখনো তুমি আমার বুকের মধ্য থেকে দূরে সরে যাবে না।

এই তো আর একটু হলেই কোথায় থাকত তোমার মনিরা?

হয়ত তোমার চাচার ছেলের বৌ হতে, এই তো।

না। তার পূর্বে আমি এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আয়োজন করে নিয়েছিলাম…

মনিরা! বনহুর অশ্বপৃষ্ঠে বসেই মনিরাকে আরও নিবিড়ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরল।

মনিরা বুঝল, এখন তার কিছু বলা উচিত হবে না। হঠাৎ কোন বিপদ ঘটে যেতে পারে। তাই নিশ্চুপ রইল।

মনিরাকে নিয়ে বনহুর যখন চৌধুরীবাড়ি পৌঁছল তখন রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। যদিও পাখিরা এখনও বাসা ছেড়ে বেরিয়ে যায়নি, তবু কলরব শুরু করেছে। নতুন দিনের মধুর পরশে মন তাদের খুশিতে ভরে উঠেছে। সুমিষ্ট স্বরে গান গাইছে ওরা।

বনহুর মনিরাকে সঙ্গে করে মায়ের সম্মুখে হাজির হল– মা, এই নাও তোমার মনিরাকে।

নিদ্রাহীন কোটরাগত চোখ দুটি তুলে তাকালেন মরিয়ম বেগম। মনিরাকে দেখে উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলে উঠলেন– এনেছিস বাবা, আমার হারানো রত্ন তুই ফিরিয়ে এনেছিস? কিন্তু আমার মায়ের এ বেশ কেন?

ভয় নেই মা, তুমি যা ভাবছ তা হয় নি। আর একটু বিলম্ব হলে হয়ত–

হায় হায়, একি সর্বনাশটাই না হত। মনি যে একটা মতলব এটে তবেই মনিরাকে নিয়ে গেছেন আসগর আলী সাহেব তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। বাবা মনির,

শোন, একটা কথা শোন্, সরে আয় আমার পাশে।

বনহুর মায়ের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়– বল মা?

ওরে, তোকে আর আমি ছেড়ে দেব না। আজ মনিরার এই বিয়ের সাজ আমি বৃথা নষ্ট হতে দেব না।

মা!

হ্যাঁ, মনিরাকে তোর বিয়ে করতে হবে।

হ্যা!

মনির, আজ তোর কোনো আপত্তিই আমি শুনব না। মনিরাকে তোর বিয়ে করতেই হবে, নইলে আমি আজই আত্মহত্যা করব।

এ তুমি কি বলছো মা? বনহুর একবার মায়ের মুখে আর একবার মনিরার মুখের দিকে তাকায়।

মনিরার দু'চোখে অশ্রু ছলছল করছে। নিষ্পলক নয়নে এতক্ষণ বনহুরের দিকে তাকিয়ে ছিলো মনিরা, বনহুরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই দৃষ্টি নত করে নেয় সে।

বনহুর মায়ের দিকে তাকাল–তারপর স্তকণ্ঠে বলল– মনিরার সুন্দর জীবনটা তুমি নষ্ট কর না মা।

আমি জানি মনি তোকে ভালোবাসে, তোর সঙ্গে বিয়ে হলে সে অসুখী হবে না।

আমি যে মানুষ নামের কলঙ্ক। লোকসমাজে আমার যে কোন স্থান নেই। ভুল কর না মা, তুমি ভুল করো না–বনহুর মায়ের বিছানায় বসে পড়ে দু'হাতে নিজের মাথার চুল টানতে লাগল। অধর দংশন করতে লাগল সে।

মনিরা পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা কথাও তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না।

মরিয়ম বেগম পুত্রের পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ান, পিঠে হাত রেখে বলেন– যত কথাই বলিস না কেন মনির আমার কথা তোকে রাখতেই হবে। বিয়ে তোকে করতেই হবে– করতেই হবে। নইলে আমি মাথা ঠুকে মরব– মরিয়ম বেগম ছুটে গিয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকতে শুরু করলেন।

বনহুর আর স্থির থাকতে পারল না, দ্রুত এগিয়ে গিয়ে মাকে ধরে ফেলল চমকে উঠলো বনহুর, মায়ের ললাট কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল সে একি করলে মা!

না না, ছেড়ে দে আমায়; আমি আর বাঁচতে চাই না। মনিরাকে যদি অন্যের হাতে তুলে দিতে হয় তবে আমার মৃত্যুই ভাল…

মা!

মনির, ওকে তুই বিয়ে কর।

বনহুর মাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে তাকাল মনিরার দিকে। মনিরার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা। নীরব ভাষায় যেন বলছে–ওগো, তুমি সদয় হও। ওগো, তুমি সদয় হও! একটিবার ফিরে তাকাও দুনিয়ার দিকে…

বনহুর মনিরার দিকে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে তাকিয়ে বলে ওঠে–তোমার কথাই সত্য হউক মা, মনিরাকে আমি বিয়ে করব।

এতক্ষণে মরিয়ম বেগমের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তিনি আঁচলে ললাটের রক্ত মুছে ফেলে বললেন– আমাকে বাঁচালি বাবা। দাঁড়া, তুই যেন আবার পালিয়ে যাসনে–মরিয়ম বেগম বেরিয়ে যান।

সরকার সাহেব তাঁর নিজের কামরায় ঘুমিয়েছিলেন। মরিয়ম বেগম কক্ষে প্রবেশ করে ডাকেন সরকার সাহেব, উঠুন তো?

ধড়মড় করে উঠে বসেন সরকার সাহেব, চোখ মেলে তাকিয়ে অবাক হন। হঠাৎ রাতের বেলায় বেগম সাহেবা, কারণ কি? ঢোক গিলে বললেন– আপনি!

মরিয়ম বেগম বললেন আমার সঙ্গে আসুন দেখি।

কি হয়েছে বেগম সাহেবা?

আসুন, পরে বলছি।

মরিয়ম বেগম এগিয়ে চলেন, তাঁকে অনুসরণ করেন বৃদ্ধ সরকার সাহেব।

মরিয়ম বেগম নিজের কক্ষে প্রবেশ করে, ডাকেন– আসুন সরকার সাহেব।

বনহুরের চোখে-মুখে বিস্ময়, মা তার কি করতে কি করে বসলেন। সরকার সাহেবকে আবার কেন ডাকলেন ভেবে পায় না সে।

ততক্ষণে সরকার সাহেব কক্ষে প্রবেশ করে বনহুরকে দেখতে পেয়ে চমকে ওঠেন। এ কে? বনহুরের শরীরে কালো ড্রেস, মাথায় পাগড়ী, কোমরের বেল্টে রিভলভার সরকার সাহেব ঘাবড়ে গেলেন। তিনি তো কোনদিন বনহুরকে দেখেন নি তাই ঘাবড়ানোটা স্বাভাবিক। তারপর মনিরাকে দেখতে পেয়ে যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হলেন। কিছু বুঝতে না পেরে তাকালেন মরিয়ম বেগমের মুখের দিকে।

মরিয়ম বেগম হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললেন– সরকার সাহেব, একে চিনতে পারেন নি? পারবেনই বা কি করে! ভাল করে একবার ওর দিকে চেয়ে দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা।

সরকার সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন– কই না, ওকে তো আমি কোনদিন দেখিনি।

এবার মরিয়ম বেগম বললেন আমার মনিরকে আপনার মনে আছে সরকার সাহেব?

তা থাকবে না? মনির– সে যে আমাদের সকলের নয়নের মনি ছিল বেগম সাহেবা।

সেই নয়নের মনি, আমার প্রাণের প্রাণ মনির আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে।

অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠেন সরকার সাহেব– মনির!

হ্যাঁ, আমার মনির।

বৃদ্ধ সরকার সাহেবের চোখেমুখে আনন্দের দ্যুতি খেলে যায়। দু'হাত বাড়িয়ে বনহুরকে বুকে, টেনে নেন। বনহুর নীরবে সরকার সাহেবের কাঁধে মাথা রাখে।

সরকার সাহেবের সেকি আনন্দ! উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন– কোথায় ছিলে বাবা তুমি এতদিন? তা ছাড়া মা মনিরাই বা–

মরিয়ম বেগম বললেন– সব পরে বলবো আপনাকে সরকার সাহেব। আজ খুব তাড়াতাড়ি একটা কাজ করতে হবে।

বলুন বেগম সাহেবা?

মনিরাকে ওর বড় চাচা তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছিলেন মনির সেই বিয়ের মঞ্চ থেকে মাকে আমার নিয়ে এসেছে। আমি চাই মনিরের সঙ্গে এক্ষুণি মনিরার বিয়েটা শেষ করতে।

এক্ষুণি!

হ্যাঁ আর এক মুহূর্তও বিলম্ব নয় সরকার সাহেব। রাত ভোর হবার আর দেরী নেই, তার পূর্বেই আমি ওদের বিয়ে দিতে চাই। আমি জানি আপনি আরও অনেক জায়গায় বিয়ে পড়িয়েছেন, নিশ্চয়ই আপনার ভুল হবে না।

তা হবে না কিন্তু এত তাড়াহুড়া করে–

আর কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না সরকার সাহেব। দেখছেন না মনিরার শরীরে বিয়ের পোশাক–

সরকার সাহেব ওজু বানিয়ে কেতাব নিয়ে আসলেন। মনিরা আর দস্যু বনহুরকে পাশাপাশি বসিয়ে বিয়ের কলেমা পাঠ করলেন।

মরিয়ম বেগম নীরবে আশীর্বাদ করে চললেন।

ওদিকে ভোরের আজানধ্বনি ভেসে এলো–আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর।

দস্যু বনহুরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল মনিরার।

পাখিরা তখন নীড় ছেড়ে মুক্ত আকাশে ডানা মেলেছে।

বনহুর মনিরার হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বলল– মনিরা এ তুমি কি করলে?

সবচেয়ে যা আমার মঙ্গলময় তাই করলাম।

সুখী হবে কি?

মনিরা স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে বলল–আমার মত সুখী কে!

বনহুর আর মনিরাকে একা রেখে, বেরিয়ে গিয়েছিলেন মরিয়ম বেগম আর সরকার সাহেব। বিয়ের পর ওদের দুজনের কাছে দু'জনের যা বলবার থাকে বলে নিক ওরা।

এবার বনহুর বিদায় চাইল মনিরার কাছে–আসি তবে?

এসো। ছোট্ট একটা শব্দ বেরিয়ে এলো মনিরার মুখ থেকে।

স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে সরে দাঁড়াল মনিরা।

বনহুর একবার মনিরার মুখের দিকে তাকিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

.

মরিয়ম বেগম সরকার সাহেবকে গোপনে সব খুলে বললেন বারবার অনুরোধ করলেন– দেখুন সরকার সাহেব, এ কথা যেন কোনদিন কাউকে বলবেন না। শুধু সাক্ষী রইল আল্লাহ আর আপনি ও আমি। ।

সরকার সাহেব বললেন– আমি কোনদিন কারও কাছে এ কথা প্রকাশ করব না।

এখানে যখন মরিয়ম বেগম আর সরকার সাহেব কথাবার্তা বলছিলেন, তখন আসগর আলী সাহেবের বাড়িতে ভীষণ কাণ্ড-পাত্রী উধাও হয়েছে।

গোটা পাড়া তন্নতন্ন করে খোঁজা হল–কিন্তু কোথাও মনিরাকে পাওয়া গেল না।

আসগর আলী সাহেব তো রাগে ফেটে পড়তে লাগলেন। তার এতবড় আয়োজন সব পণ্ড হয়ে গেল। তাছাড়া মনিরা গেল কোথায়–এই চিন্তাই তাঁকে

অস্থির করে তুলল। বাড়ির সকলকে ধমকানো শুরু করলেন কেন তাকে একা রেখে যাওয়া হয়েছিল।

কিন্তু যে চলে গেছে তাকে কি আর এত সহজে পাওয়া যায়! আসগর আলী সাহেব মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। আসগর আলী সাহেবের স্ত্রী মনিরার বড় চাচীর অবস্থাও তাই। অনেক আশা করেই তিনি আজ মনিরার সঙ্গে পুত্রের বিয়ে দিতে চলেছিলেন।

আসগর আলী সাহেব আর তাঁর স্ত্রীর যত রাগ গিয়ে পড়ল মনিরার মামীমা মরিয়ম বেগমের ওপর। নিশ্চয়ই তারই কোন চক্রান্তে মনিরা পালিয়েছে। কিন্তু মনিরা যেখানেই থাক তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। তার বিয়েও হবে শহীদের সঙ্গে। মনিরা তাদেরই মেয়ে, কোনো অধিকার নেই তার ওপর চৌধুরীবাড়ির কারও।

শহীদ তো হাউমাউ করে কাঁদা শুরু করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে বিলাপের মত বলছে– আমার বৌ কোথায় পালিয়েছে? আমার বৌ কে নিয়ে গেছে? আমি তার মাথা আস্ত রাখব না। এমনি নানারকম আবোল তাবোল বলতে শুরু করেছে শহীদ।

আসগর আলী সাহেবের স্ত্রী পুত্রকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন– কাঁদিস না বাপু, মনিরা তোরই বৌ, কে তাকে নিতে পারে। কালই আমি তোর আব্বাকে চৌধুরীবাড়ি পাঠাব, কাঁদিস না বাপ।

আসগর আলী সাহেব তখনই লোক পাঠালেন চৌধুরীবাড়িতে–যা দেখে আয় মনিরা সেখানে গেছে কিনা।

কেউ কেউ বলল মেয়ে মানুষ রাতারাতি যাবে কি করে? হয়তো পাড়ার কোথাও লুকিয়ে আছে। কিংবা কোথাও পানিতে ডুবে আত্মহত্যা করেনি তো?

আঁতকে উঠলেন আসগর আলী সাহেব, বললেন– হতেও পারে!

গ্রামের সমস্ত খাল-বিল-পুকুর খুঁজে দেখতে শুরু করলেন। জাল ফেলে দেখলেন কিন্তু কোথাও মনিরাকে পাওয়া গেল না। জীবিত কিংবা মৃত যে কোন অবস্থায় ওকে পেতেন তাতেই খুশি হতেন আসগর আলী সাহেব। তার মনের বাসনা মনিরার সমস্ত বিষয় আসয় আত্মসাৎ করা।

.

চৌধুরীবাড়ির পেছনে কবরস্থান। ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন জায়গাটা। আম কাঁঠালের সারি একপাশে জামরুল আর জলপাই গাছ। পাশেই একটা চাপাফুলের গাছ, তারই তালায় চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন চৌধুরী সাহেব।

কিছুক্ষণ পূর্বে এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশে ঘন মেঘের চাপ জমাট বেঁধে রয়েছে। মাঝে মাঝে পাতায় জমে থাকা বৃষ্টির পানি ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ছে শুকনো পাতার ওপর। তারই মৃদু শব্দের মধ্যে শুনা যাচ্ছে ঝি ঝি পোকার অবিশ্রান্ত আওয়াজ।

বৃষ্টি ধরে গেছে অনেকক্ষণ তবু আকাশে ঘন কালো মেঘের ফাঁকে বিদ্যুতের চমকানি। যেন অশ্বারোহীর হাতের চাবুকের মত এখনও ছুটে বেড়াচ্ছে–

রাত গভীর। গোটা শহর ঝিমিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে দূর থেকে অজানিত ভ্রমণকারী মোটরের হর্ণ শোনা যাচ্ছে।

এমন সময় চৌধুরীবাড়ির পেছনে কবরস্থানের পথ বেয়ে এগিয়ে এলো ছায়ামূর্তি। ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছে। বিদ্যুতের আলোতে বড় অদ্ভুত লাগছে তাকে।

আম-কাঁঠালের ছায়া এসে থমকে দাঁড়ালো ছায়ামূর্তি। আবার বৃষ্টি নামলো। খুব বেশি নয় টুপ টুপ ঝরছে কোনো শোকাতুরা জননীর অশ্রুবিন্দুর মত।

ছায়ামূর্তি আরও কয়েক পা এগুলো। ঠিক চৌধুরী সাহেবের কবরের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। কাপড়ের ভেতর থেকে বের করলো একটা ধারালো অস্ত্র। এবার চৌধুরী সাহেবের কবরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ছায়ামূর্তি। তারপর দ্রুত মাটি সরাতে শুরু করল।

ঠিক সেই মুহূর্তে কয়েকজন পুলিশসহ মিঃ জাফরী ছায়ামূর্তির সম্মুখে আচমকা এসে দাঁড়ালেন, রিভলভার উদ্যত করে গর্জে উঠলেন– কে তুমি?

ছায়ামূর্তি ধারালো অস্ত্র হাতে উঠে দাঁড়াল।

জমকালো আলখেল্লায় তার সমস্ত শরীর আচ্ছাদিত।

মিঃ জাফরী এবং পুলিশ বাহিনীর হাতে উদ্যত রিভলভার। মিঃ হারুন টর্চের আলো ফেললেন ছায়ামূর্তির মুখে।

টর্চের তীব্র আলোতে আলখেল্লার মধ্যে দুটি চোখ শুধু জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠল।

মিঃ জাফরী ছায়ামূর্তির হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিতে আদেশ দিলেন।

মিঃ হারুন স্বয়ং ছায়ামূর্তির হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন।

ততক্ষণে পুলিশ ফোর্স তাকে ঘিরে ধরেছে।

.

ছায়ামূর্তিকে বন্দী অবস্থায় পুলিশ অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো। সকল অফিসার একত্রিত হয়ে ছায়ামূর্তিকে ঘিরে দাঁড়ালেন। প্রত্যেকের হাতেই গুলীভরা রিভলভার। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী দাঁড়িয়ে রয়েছে একপাশে। মিঃ শঙ্কর রাও এবং মিঃ গোপাল উপস্থিত রয়েছেন সেখানে। সকলেরই চোখেমুখে উত্তেজনার ছাপ– কে এই ছায়ামূর্তি?

মিঃ জাফরী স্বয়ং এগিয়ে এলেন ছায়ামূর্তির পাশে। কালো আলখেল্লায় ঢাকা চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে বললেন–কে তুমি ছায়ামূর্তি–জবাব দাও?

সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তি তার মুখের আবরণ উন্মোচন করে ফেলল।

কক্ষে একটা বাজ পড়লেও এভাবে সবাই চমকে উঠতো না, সবাই বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন। অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন মিঃ শঙ্কর রাও –মিঃ আলম! আপনি ছায়ামূর্তি।

মিঃ জাফরীর মুখমণ্ডল সবচেয়ে বেশি গম্ভীর হয়ে উঠেছে, তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন– প্রথম থেকেই আমি এই রকম একটা সন্দেহ করেছিলাম।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন– মিঃ আলম, আপনিই তাহলে খুনী।

খুনী যে আমি নই, এ কথা বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন কি? করবেন না নিশ্চয়ই। নিজে খুনী সেজেই আমি আসল খুনীর সন্ধান করছিলাম এবং সফলতা

লাভ করেছি।

কক্ষে আবার একটা চঞ্চলতা দেখা দিল। মিঃ জাফরীর মুখমণ্ডল অনেকটা প্রসন্ন হয়ে এসেছে। মিঃ আলমের হাত হাতকড়া লাগানোর জন্য একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন তিনি। কিন্তু চট করে হাতকড়া খুলে দেবার অনুমতিও দিতে পারছিলেন না। সবাই নিজ নিজ রিভলভার সংযত করে খাপের মধ্যে পুরে রেখেছিলেন। পুলিশরা ও অফিসারগণকে অস্ত্রসংবরণ করতে দেখে তারাও নিজ নিজ রাইফেল নামিয়ে নেয়। মিঃ জাফরী নিজ হাতে মিঃ আলমের হাতের হাতকড়া খুলে দেন।

কক্ষস্থ সবাই ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে তাকালেন। তাঁরা জানতে চান কে এই খুনী যে একসঙ্গে তিন তিনটা খুন করতে পারে।

মিঃ আলম বলে চললেন– প্রথমত, চৌধুরী সাহেবের হত্যাকারী এবং ডক্টর জয়ন্ত সেন ও ভগবৎসিংবেশি নাথুরামের হত্যাকারী এক নয়। দ্বিতীয়ত, চৌধুরী সাহেবের হত্যাকারী ডক্টর জয়ন্ত সেন। তৃতীয়ত, চৌধুরী সাহেবকে হত্যা করতে জয়ন্ত সেনকে বাধ্য করেছিলো ভগবৎসিংবেশি নাথুরাম এবং এদের সবাইকে পরিচালিত করেছিল খান বাহাদুর সাহেবের ছেলে মুরাদ।

মিঃ জাফরী কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠেন–তাহলে ডক্টর জয়ন্ত সেন আর নাথুরামকে মুরাদই হত্যা করেছে বলে মনে করেন?

মিঃ আলম একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন না, মুরাদ হত্যাকারী নয়, তবে তার নির্দেশেই এসব ঘটেছে এবং তার উদ্দেশ্য ছিলো চৌধুরী সাহেবকে পরপারে পাঠিয়ে তার একমাত্র ভাগিনী মিস মনিরাকে হস্তগত করা; কিন্তু সে আশা তার সফল হয় নি। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে!

মিঃ হারুন বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করে ওঠেন– কি বললেন মুরাদকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

হ্যাঁ মিঃ হারুন আপনি স্বয়ং তাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তার মানে।

মানে ভগবৎসিংবেশি নাথুরামের বাড়িতে তার আত্মীয়ের বেশে জয়সিংকে গ্রেফতারের কথা আপনার স্মরণ আছে ইন্সপেক্টার?

হ্যাঁ, জয়সিং নামে এক ব্যক্তিকে আমরা সেদিন গ্রেফতার করেছিলাম। এখনও সে জেলে আটক রয়েছে।

সেই জয়সিং খান বাহাদুর সাহেবের একমাত্র সন্তান মুরাদ।

মিঃ জাফরী বলে ওঠেন–মুরাদ তাহলে বন্দী হয়েছে, যাক তাহলে একটা দিক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু আপনি রাতদুপুরে চৌধুরী সাহেবের কবরে ধারালো অস্ত্র নিয়ে কেন মাটি সরাচ্ছিলেন জানতে পারি কি?

আমি চৌধুরী সাহেবের কবর থেকে তাঁর একখানা হাড় সংগ্রহের চেষ্টা করছিলাম–কারণ আমি পরীক্ষা করে জানতে চাই তাকে কি ধরনের বিষ খাওয়ানো হয়েছিল। হাড় সংগ্রহ করতে। আমাকে কবরস্থানে গোপনে যেতে হয়েছিল।

এতক্ষণে কক্ষস্থ সকলের মুখমণ্ডল প্রসন্ন হলো।

হঠাৎ জাফরী এবার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করে বসলেন– মিঃ আলম, এবার বলুন ডক্টর জয়ন্ত সেন আর নাথুরামের হত্যাকারী কে?

হঠাৎ মিঃ আলম হো! হো! করে হেসে উঠলেন, তার সুন্দর মুখমণ্ডল দীপ্ত হলো, পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে পড়লেন তিনি। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললেন– পিতার হত্যাকারীকে পুত্র হত্যা করেছে। ডক্টর জয়ন্ত সেন ও শয়তান নাথুরামকে হত্যা করেছে দস্যু বনহুর।

সকলেই একসঙ্গে অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠেন– দস্যু বনহুর!

হ্যাঁ আসল হত্যাকারী দস্যু বনহুর।

মিঃ জাফরী মিঃ আলমের সাথে হ্যাণ্ডশেক করলেন, বললেন–সত্যি, আপনার সূতীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রশংসা না করে পারছি না। মিঃ আলম, আপনি যে এত সুন্দরভাবে এই হত্যারহস্য উদঘাটন করেছেন তার জন্য আপনাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কক্ষস্থ অন্যান্য অফিসার মিঃ আলমের সাথে হ্যাণ্ডশেক করলেন।

মিঃ আলম কিন্তু তার ছায়ামূর্তির ড্রেস পূর্বেই খুলে ফেলেছিলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবার আমি বিদায় গ্রহণ করছি। গুড নাইট।

কেউ কোনো কথা উচ্চারণ করার পূর্বেই মিঃ আলম কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিঃ হারুনের দৃষ্টি মিঃ আলমের পরিত্যক্ত ছায়ামূর্তির আলখেল্লাটার উপরে গিয়ে পড়ল। তিনি হেসে বললেন– মিঃ আলমের ওটার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাই ফেলে গেলেন।

মিঃ শঙ্কর রাও উঠে গিয়ে আলখেল্লাটা হাতে উঠিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলেন।

সবাই অবাক হয়ে দেখছেন, হঠাৎ মিঃ জাফরী বলে ওঠেন– ওটা কি? একখণ্ড কাগজ যেন পিন দিয়ে আটকানো রয়েছে আলখেল্লার গায়ে।

তাইতো! মিঃ শঙ্কর রাও কাগজের টুকরাখানা আলখেল্লা থেকে খুলে নিলেনই সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারার ভাব বদলে গেল, বিস্মিতকণ্ঠে বললেন একি! দস্যু বনহুরই মিঃ আলম ও ছায়ামূর্তি।

কি বলছেন! মিঃ জাফরী তাড়াতাড়ি শঙ্কর রাওয়ের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে পড়ে দেখলেন, তাতে লেখা রয়েছে—'দস্যু বনহুর'।

মিঃ জাফরী 'থ' মেরে গেলেন। তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

আর সবাই নির্বাক, নিশ্চুপ, হতভম্ব। সহসা মিঃ হারুন চিৎকার করে বললেন– পাকড়াও করো, মিঃ আলমকে পাকড়াও করো– গ্রেফতার করো ....

সমস্ত পুলিশ উদ্যত রাইফেল হাতে ছুটল।

কিন্তু মিঃ আলমবেশি দস্যু বনহুর তখন কোথায় অদৃশ্য হয়েছে কে জানে।

০০৭. মনিরা ও দস্যু বনহুর

মনিরা ও দস্যু বনহুর – রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর মনিরার ঘোমটায় ঢাকা মুখখানা তুলে ধরে। বড় চাচার বাড়ির শাড়ি-অলঙ্কার এখনও তার দেহে শোভা পাচ্ছে। নববধুর বেশে মনিরাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে।

দস্যু বনহুরের শরীরে জমকালো দস্যু-ড্রেস? নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে বনহুর মনিরার চন্দন-আঁকা মুখখানার দিকে।

মনিরা লজ্জাবনত দৃষ্টি তুলে তাকায় বনহুরের মুখে। চার চক্ষুর মিলন হয়। মনিরা দৃষ্টি নত করে নেয়। আজ তার আনন্দের সীমা নেই! যাকে এতদিন কাছে পাবার জন্য সদা-সর্বদা উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতীক্ষা করে এসেছে, যাকে সে শয়নে-স্বপনে কামনা করে এসেছে, তাকে আজ অতি কাছে অতি আপনজন হিসেবে পেয়েছে। মনিরার কাছে সব যেন স্বপ্ন বলে মনে হয়।

বনহুর মনিরাকে বাহুবন্ধনে আবব্ধ করে বলে–কি ভাবছো মনিরা?

মনিরা বনহুরের বুকে মাথা রেখে বলে ভাবছি, আমি স্বপ্ন দেখছি না তো।

উঁহু স্বপ্ন নয়– সত্য।

এত সুখ আমার সইবে তো!

মনিরা!

মনির, জানো না, তুমি আমার কত সাধনার, কত কামনার। ভয় হয় আবার যদি তোমাকেই হারাই।

হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে বনহুর– অদ্ভুত সে হাসি!

মনিরা বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে তন্ময় হয়ে, যত দেখে ততই যেন ওকে দেখার সাধ হয়, এত সুন্দর বুঝি মানুষ হয় না।

বনহুর হাসি থামিয়ে বলে–কি দেখছ?

আমার জীবনের আরাধ্য দেবতাকে।

মনিরা—

বল?

এ তুমি কি করলে মনিরা! নিজের জীবনটা কেন তুমি নষ্ট করলে?

নষ্ট! কি বলছ তুমি?

দস্যু বলে সবাই যাকে ঘৃণা করে, পুলিশমহল যাকে গ্রেফতার করার জন্য অহরহ ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেশবাসী যার নামে আতঙ্কগ্রস্ত তাকে তুমি স্বামী বলে গ্রহণ করলে!

এ আমার পরম ভাগ্য। দস্যু বনহুরকে সবাই যেমন ঘৃণা করে তেমনি করে শ্রদ্ধা। পুলিশমহল অহরহ খুঁজে ফিরলেও জানে তারা দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করা কত কঠিন। দেশবাসী দস্যু বনহুরের নামে আতঙ্কগ্রস্ত, হলেও তাকে দেখার একটু খানি লোভ সকলের মনে ফুলের সুবাসের মতই জেগে রয়েছে। তুমি যে সবার কত কামনার সে তুমি বুঝবে না।

বনহুর মনিরার আবেগভরা কণ্ঠে মুগ্ধ হয়। মাথার পাগড়ীটা খুলে পাশের টেবিলে রাখে।

মনিরা বনহুরের জামার বোতাম খুলে দেয়।

বনহুর মনিরার শয্যায় শুয়ে পড়ে।

মনিরা বনহুরের পা থেকে জুতো জোড়া খুলে রাখে।

বনহুর এবার মনিরাকে টেনে নেয় কাছে–এসো।

মনিরা স্বামীর বুকে মাথা রাখে।

ভোরের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। পাখির কলরবে মুখর হয়ে উঠেছে ধরণী। অজানা ফুলের সুরভি মুক্ত জানালাপথে সাদর সম্ভাষণ জানায় মনিরা ও বনহুরকে।

কুয়াশার ফাঁকে পাইনগাছগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মৃদুমন্দ বাতাস শিহরণ জাগায় তার পাতায় পাতায়। হিমশীতল রাতের শিশির বিন্দুগুলো দুর্বাশিরে মুক্তার মত চিকমিক করে ওঠে।

দূরের কোনো মসজিদ থেকে ভেসে আসে মোয়াজ্জেমের কণ্ঠের ধ্বনি। অতি সুন্দর মোলায়েম সে সুর। চৌধুরীবাড়ির কন্দরে কন্দরে সেই সুরের আবেশ এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনি জাগে.... আল্লাহু আকবার।

মনিরা আবেগ মধুর কণ্ঠে বলে–ভোর হয়ে গেছে!

বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়, পাগড়ীটা মাথায় দিয়ে বলে তাজ আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে।

মনিরা বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে–আবার কবে দেখা পাব তোমার?

যখন তুমি আমাকে স্মরণ করবে তখনই।

সত্যি?

হ্যাঁ মনিরা।

যাও।

বনহুর মনিরার চিবুক উঁচু করে ধরে বলে– খোদা হাফেজ।

মনিরা অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করে– খোদা হাফেজ।

বেরিয়ে যায় দস্যু বনহুর।

মনিরা ছুটে গিয়ে মুক্ত জানালায় ঝুঁকে পড়ে দেখে।

বনহুর তখন তাজের পিঠে চেপে বসেছে।

মনিরা অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকে।

বনহুর তাজের পিঠে বসে ফিরে তাকায় মনিরার কক্ষের মুক্ত জানালার দিকে।

মনিরা হাত নাড়ে।

বনহুরের অশ্ব সামনের দু'পা উঁচু করে আনন্দসূচক শব্দ করে ওঠে, তারপর ছুটতে শুরু করে।

মনিরা ফিরে আসে শয্যার পাশে। অভূতপূর্ব একটা আনন্দ তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে। ফেলেছে। আজ সে নিজকে ধন্য মনে করে। দুনিয়ার কেউ না জানুক, সে জানে দস্যু বনহুর তার স্বামী!

মনিরা বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে! বনহুরের কথাগুলো তার কানের কাছে ভেসে উঠে। একটু পূর্বে বনহুরের বলিষ্ঠ হাতের ছোঁয়া এখনও যেন তার দেহে লেগে রয়েছে। দোলা জাগায় তার মনে। ভাবে সে, তার মত ভাগ্যবতী নারী আর কে আছে!

.

দস্যু বনহুর দক্ষিণ হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে তার নিজস্ব পাতালপুরীর আস্তানার একটি কক্ষে প্রবেশ করল। উজ্জ্বল দীপ্ত তার মুখমণ্ডল। শরীরে জমকালো ড্রেস, মাথায় কালো পাগড়ি।

যে কক্ষে দস্যু বনহুর এই মুহূর্তে প্রবেশ করলো, সেটা তাঁর পাতালপুরীর গোপন কক্ষ। এ কক্ষে বনহুর তার বন্দীদের আটক করে রাখে। দস্যু বনহুর এবং তার বিশ্বস্ত দু'একজন অনুচর। ছাড়া আর কেউ এ কক্ষে প্রবেশ করতে পারে না।

বনহুর জ্বলন্ত মশাল হাতে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। ওদিকে একটা চোরা-কুঠরী রয়েছে। বনহুর মশাল নিয়ে সেই চোরা-কুঠরীর সামনে এসে দাঁড়ায়। দেয়ালের একটা জায়গায় চাপ দিতেই চোরা-কুঠরীর দরজা খুলে যায়। একটা নীলাভ আলো ছিটকে পড়ে দরজার বাইরে। বনহুর প্রবেশ করে এবার সেই কুঠরীতে।

সুন্দরভাবে সজ্জিত সেই চোরা-কুঠরীর একপাশে একটি খাট পাতা রয়েছে। দুগ্ধফেননিভ বিছানায় শায়িত এক ভদ্রলোক।

দস্যু বনহুর সেই খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, গম্ভীর শান্ত গলায় ডাকলো– মিঃ আলম, এবার আপনার ছুটি।

বিছানায় উঠে বসলেন মিঃ আলম, তাকালেন দস্যু বনহুরের দিকে। গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন, একে যেন কোথাও দেখেছেন ইতোপূর্বে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল সেই প্রথম দিনের কথা, যেদিন তিনি এ শহরে প্রথম এসে পৌঁছেছিলেন, আশ্চর্য হয়েছিলেন এরোড্রামে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে কেউ আসেনি। এমনকি বন্ধু মিঃ শঙ্কর রাও পর্যন্ত আসেন নি। ব্যাপারটা তাঁর অত্যন্ত বিস্ময়কর লেগেছিল। তিনি আসার পূর্বে টেলিগ্রাফ করে জানিয়ে দিয়েছিলেন, অথচ এরোড্রামে তাঁকে সম্ভাষণ জানাতে একজন পুলিশ অফিসারও আসেন নি। ব্যাপার কি মিঃ আলম। যখন এরোড্রামে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাচ্ছেন, এমন সময় এক যুবক এগিয়ে এসে হাস্যোজ্জ্বল। মুখে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজের পরিচয় দিয়েছিল–আমি কিঙ্কর রাও, আপনার বন্ধু শঙ্কর রাওয়ের ছোট ভাই। মিঃ আলম তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলেছিলেন– আপনি কিঙ্কর রাও? আপনার বড় ভাই এলেন না কেন? জবাব দিয়েছিল এই যুবক–দাদার অসুখ, তাই আমাকে পাঠিয়েছেন। আসুন–আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি।

মিঃ আলম বিনা দ্বিধায় যুবকের গাড়িতে উঠে বসেছিলেন সেদিন। অনেক দিন পর বন্ধু শঙ্কর রাওয়ের সঙ্গে মিলিত হবার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন মিঃ আলম। তিনি গাড়িতে বসে নতুন শহরের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে চলেছিলেন। কখন যে গাড়ি শহরের পথ ছেড়ে নির্জন পথে চলতে শুরু করেছিল খেয়াল ছিল না তার। হঠাৎ বলে উঠেছিলেন মিঃ আলম– শঙ্কর বুঝি শহরের বাইরে থাকে? ড্রাইভ আসন থেকে জবাব দিয়েছিল এই যুবক–হ্যাঁ দাদা অসুস্থ হওয়ায় তাকে শহরের বাইরে থাকতে হয়।

তারপর বেশ মনে আছে মিঃ আলমের, একটি সুমিষ্ট গন্ধ তাঁর নাকে প্রবেশ করায় কেমন যেন ঝিম ঝিম করেছিল মাথাটা, ধীরে ধীরে চোখ দুটো মুদে এসেছিল তার। তারপর আর কিছু মনে ছিল না, জ্ঞান হবার পর দেখেছিলেন সুন্দর নরম একটি বিছানায় তিনি শুয়ে আছেন, কতক্ষণ শুয়ে শুয়ে ভেবেছিলেন তিনি-এ কোথায় শুয়ে আছেন, কিছুই বুঝতে পারছেন না। প্রায় গোটা দিনটাই তার মনে পড়েনি কিছু। পরদিন ঘুম থেকে জেগে উঠে বসতেই সব কথা স্মরণ হয়েছিল। বুঝতে পেরেছিলেন, এখন তিনি বন্দী। কিন্তু কেন তাকে এভাবে আটক করা হয়েছে? যে তাকে। এরোড্রাম থেকে শঙ্কর রাওয়ের ভাইয়ের পরিচয় দিয়ে নিজে ড্রাইভ করে নিয়ে এসেছে, সে–ই যে তাকে এভাবে আটক করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কে সেই যুবক, কি তার উদ্দেশ্য, কেন তাকে এভাবে আটকে রেখেছে, ভেবে পাননি মিঃ আলম। যুবক যেই হউক, সে যে উদ্দেশ্যেই তাঁকে বন্দী করে রাখুক, তার ওপর কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি। যে কক্ষে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে সে কক্ষটি অতি সুন্দর। মূল্যবান আসবাবপত্রে সজ্জিত। কক্ষটা খুব বড় নয়। কক্ষের দেয়াল ফিকে সবুজ। কোন জানালা না থাকলেও কক্ষে আলো বা বাতাসের কোন অভাব নেই। যদিও প্রাকৃতিক আলো বা বাতাসের প্রবেশ সেখানে অসাধ্য তবুও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে এসবের। একপাশে বইয়ের সেলফ, তাতে নানা ভাষায় লিখিত নানা ধরনের মূল্যবান বই। টেবিলে নানারকম ফলমূল সাজানো। এমন কি গরম দুধও ছিল সেখানে, কিন্তু এই একটি বছরের মধ্যে তিনি মানুষের মুখ দেখতে পান নি। ঠিক সময়মতো টেবিলে খাবার, ফলমূল এবং দুধ যে কোথা থেকে আসত তিনি বুঝতে পারতেন না। ভেবে ভেবে অবাক হতেন। আজ এই যুবককে দেখে যেমন বিস্ময়, তেমনি হতবাক হন মিঃ আলম।

দস্যু বনহুর হেসে বলে– আপনি মুক্ত মিঃ আলম, আমার কাজ শেষ হয়েছে।

মিঃ আলম রুদ্ধকণ্ঠে বললেন– কে আপনি?

আমি শঙ্কর রাওয়ের ছোট ভাই কিঙ্কর রাও নই– আমি দস্যু বনহুর।

অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠেন মিঃ আলম– দস্যু বনহুর।

হ্যাঁ।

দস্যু বনহুর লক্ষ্য করল– মুহূর্তে মিঃ আলমের মুখমণ্ডল বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। চোখ। দুটোতে ফুটে উঠলো একটা ভয়ার্ত ভাব। দস্যু বনহুরের আপাদমস্তক লক্ষ্য করে ঢোক গিললেন তিনি।

দস্যু বনহুর মৃদু হেসে বলল দস্যু হলেও আমি মানুষ আমারও হৃদয় আছে। আপনি নির্দোষ, দস্যু বনহুর কোনদিন নির্দোষকে নির্যাতন করে না। মিঃ আলম আপনাকে এতদিন আটক করে রাখার জন্য আমি খুবই দুঃখিত।

মিঃ আলম অবাক হয়ে ভাবেন, অবাক হয়ে দেখেন, একি তিনি স্বপ্ন দেখছেন। যে দস্যু বনহুরের ভয়ে দেশবাসীর মনে গভীর আতঙ্ক, যে দস্যু বনহুরের ভয়ে মানুষ স্বাভাবিকভাবে পথ চলতে পারে না ধনীদের চোখের ঘুম যে দস্যু বনহুর কেড়ে নিয়েছে এই সেই দস্যু বনহুর।

মিঃ আলম নির্বাক চোখে তাকিয়ে থাকতেন বনহুরের মুখের দিকে। তিনি সুদূর লণ্ডনে বসে দস্যু বনহুরের নাম শুনে এসেছেন। যে দস্যু বনহুরকে নিয়ে দেশময় সাড়া পড়ে গেছে, এই সেই দস্যু! মিঃ আলম নিজেও সুপুরুষ, কিন্তু বনহুরের মত সুন্দর চেহারা এর পূর্বে দেখেছেন বলে মনে হয় না তার।

মিঃ আলমকে তার দিকে অবাক নয়নে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলে দস্যু বনহুর কি দেখছেন? উঠুন।

মিঃ আলম উঠে দাঁড়ান।

দস্যু বনহুর বলল– আপনি তৈরি হয়ে নিন। বনহুর এবার দেয়ালের একটা জায়গায় মৃদু চাপ দেয়, সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালে একটা ছোট্ট দরজা বেরিয়ে আসে। বনহুর দরজার দিকে দেখিয়ে বলে– যান, ওর ভেতর গিয়ে আপনি ড্রেস পাল্টে নিন। শেভ করার সরঞ্জামও আছে, কোন অসুবিধা হবে না।

মিঃ আলম কোন কথা না বলে সেই ছোট্ট, দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। অবাক হলেন সেই কক্ষে প্রবেশ করে। অতি সুন্দর একটি কক্ষ। কক্ষে নানারকম পোশাক-পরিচ্ছদ স্তরে। স্তরে সাজানো। একদিকে প্রসাধনের যাবতীয় আসবাবপত্র রাখা হয়েছে। একধারে মস্তবড় আয়না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজকে দেখেন মিঃ আলম। মুখে তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চুলগুলো রুক্ষ, শরীরে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অবশ্য এর কারণ আছে। মিঃ আলম। এখানে

বন্দী হবার পর তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোনরকম অসুবিধা হয় নি। পুষ্টিকর খাদ্য তাঁর স্বাস্থ্যকে পূর্বের ন্যায় সুস্থ-সবল রেখেছে।

মিঃ আলম যখন সেই ছোট্ট দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর শরীরে মূল্যবান নতুন ড্রেস। ক্লিন শেভ-ছিমছাম। কিন্তু কি আশ্চর্য! আলম সাহেব চারদিকে তাকালেন, এটা তো পূর্বের। সেই কক্ষ নয়! কক্ষটা দিনের আলোয় ঝলমল করছে। সামনের মুক্ত জানালা দিয়ে বাইরটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঐ তো নীল আকাশের কিছুটা অংশ তাঁর নজরে পড়ছে। মিঃ আলম হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, এ কি করে সম্ভব হলো? তবে কি এসব যাদু। কিন্তু দস্যু বনহুর কই? কেউতো নেই সেখানে! হঠাৎ কক্ষে প্রবেশ করে একটা লোক শরীরে তার ড্রাইভারের ড্রেস। লম্বা সেলাম ঠুকে বলে–স্যার, আসুন গাড়ি অপেক্ষা করছে।

মিঃ আলম তাকালেন ড্রাইভারের দিকে, সম্পূর্ণ নতুন লোক।

মিঃ আলম ড্রাইভারকে অনুসরণ করলেন।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই আনন্দে আপ্লুত হলেন, একটি বছর পর তিনি মুক্ত বাতাসের সন্ধান পেলেন, স্বচ্ছ আলো আর মুক্ত হাওয়া তার মনে এক অপূর্ব অনুভূতি বয়ে আনলো। তিনি গাড়িতে উঠে বসলেন।

গাড়িতে বসে ভাবতে লাগলেন এ কি করে সম্ভব! এতদিন যে কক্ষে তিনি বন্দী অবস্থায় ছিলেন, সে কক্ষ পৃথিবীর বুকে নয়, কোনো পাতালপুরীর গোপন কক্ষ ছিল সেটা। কিন্তু ড্রেসিং রুম থেকে বের হবার পর কি করে সে কক্ষ উধাও হলো ভেবে পান না।

হঠাৎ তার মনে পড়লো, তিনি যখন ড্রেস পাল্টে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালেন তখন তার পায়ের নিচে মেঝেটা যেন একটু নড়ে উঠেছিল। তিনি মনে করেছিলেন ও কিছু নয়। হয়তো তাঁর মাথার মধ্যে কোনোরকম একটু এলোমেলো হয়ে গেছে, অনেকদিন তেমন নড়াচড়া নেই কিনা। এখন বুঝতে পারলেন মিঃ আলম, মেঝেটা তাঁকে নিয়ে কোথাও সরে এসেছে। জায়গাটা ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলেন এবং স্মরণ করে রাখার চেষ্টা করলেন।

মিঃ আলম এখানে নতুন, তাই জায়গাটা তার পরিচিত নয়। যেখানে তিনি গাড়িতে উঠলেন সেটা শহরের কোন জায়গা বুঝতে পারলেন না।

.

মিঃ শঙ্কর রাও সবেমাত্র শয্যা ত্যাগ করে মেঝেতে নেমে পঁড়িয়েছেন অমনি ফোনটা বেজে উঠলো ক্রিং ক্রিং করে।

মিঃ রাও রিসিভারটা হাতে উঠিয়ে নেন–হ্যালো, স্পিকিং মিঃ রাও– কে মিঃ হারুন বলছেন? কি বললেন–মিঃ আলম–আমার বন্ধু আলম– অফিসে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন? কি বলছেন আপনি! আবার কোন্ নতুন আমদানি এটা? আচ্ছা, আমি এক্ষুণি আসছি। দেখবেন পালায় না যেন!

মিঃ শঙ্কর রাও তাড়াতাড়ি কোনোরকমে নাস্তা শেষ করে গাড়ি নিয়ে ছুটলেন।

পুলিশ অফিসে পৌঁছে দেখলেন মিঃ হারুন এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার উদ্বিগ্নভাবে তার জন্য অপেক্ষা করছেন। অদূরে একটা চেয়ারে বসে এক ভদ্রলোক।

মিঃ হারুন তাকে লক্ষ্য করে বললেন– ওকে চিনলেন মিঃ রাও?

মিঃ শঙ্কর রাও এগিয়ে এসে তীক্ষ্মদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলেন ভদ্রলোককে, তারপর হঠাৎ অস্ফুট ধ্বনি করে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে–আপনি! এতদিন কোথায় ছিলেন মিঃ আলম?

মিঃ হারুন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন– মিঃ রাও, এবার সঠিক বন্ধুকে পেয়েছেন তো?

হ্যাঁ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মিঃ হোসেন বলে উঠেন– কি আশ্চর্য, সেই মিঃ আলম আর এই মিঃ আলমে হুবহু মিল রয়েছে।

মিঃ শঙ্কর রাও বললেন–সেই কারণেই আমারও ভুল হয়ে গিয়েছিল, যে ভুলের জন্য আমি দস্যু বনহুরকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিলাম।

মিঃ আলম, মিঃ রাও এর বাহুবন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত করে নিয়ে শান্ত গলায় বললেন– দস্যু বনহুরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা কোন কলঙ্কের বা লজ্জার কথা নয়,

বরং তাকে বন্ধুরূপে পাওয়া পরম ভাগ্য।

পুলিশ অফিসের সকলে অবাক হয়ে তাকান মিঃ আলমের মুখের দিকে। মিঃ শঙ্কর রাও বললেন– আপনি দেখছি দস্যু বনহুরের খুব ভক্ত হয়ে গেছেন। যাক বলুন, আসল ব্যাপারটা কি?

মিঃ আলম বললেন– আপনি বসুন, আমি সমস্ত ঘটনাটা বলছি।

মিঃ শঙ্কর রাও আসন গ্রহণ করেন।

মিঃ আলম এবার ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা বলে যান। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে সকলে শুনছেন তার কথাগুলো। এতদিন সত্যিকারের মিঃ আলম দস্যু বনহুরের পাতালপুরী আস্তানার গোপন কক্ষে বন্দী ছিলেন জেনে পুলিশ অফিসারগণ হতবাক হয়ে যান। এতক্ষণে তাদের মনের সন্দেহ দূর হল।

মিঃ আলম বললেন–দস্যু বনহুরের যে পরিচয় আমি পেয়েছি তা সত্যি প্রশংসনীয়। আমি আশ্চর্য হয়েছি, আজ একটা বছর সে আমাকে তার গোপন কক্ষে বন্দী করে রেখেছিল বটে, কিন্তু আমাকে সে এতটুকু কষ্ট দেয় নি। আমার যখন যা প্রয়োজন তা পেয়েছি। এমন কি বাইরের। খবরাখবর যাতে জানতে পারি সেজন্য দৈনিক পত্রিকায় ব্যবস্থাও ছিল সেখানে।

হেসে বললেন মিঃ হারুন–দস্যু বনহুর দেখছি আপনাকে জামাই আদরে রেখেছিলো?

হ্যাঁ, তার চেয়েও বেশি।

হেসে বলেন শঙ্কর রাও কিন্তু দস্যু বনহুর আপনার সঙ্গে যতই সৎ এবং মহৎ ব্যবহার করুক তাকে আমরা গ্রেফতার করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত।

হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে আমরা পুলিশবাহিনী সম্পূর্ণ একমত– বললেন মিঃ হারুন।

.

মিঃ আলমকে দস্যু বনহুর বন্দী করে রেখেছিল–কথাটা মিঃ জাফরীর কানে যেতে তিনি সিংহের ন্যায় গর্জে উঠলেন। দু’চোখে তার আগুন ঠিকরে বের হলো,

তিনি পুলিশবাহিনীর ওপর কড়া হুকুম দিলেন–যে কোনোভাবেই হউক দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করতেই হবে। একজন সুদক্ষ গোয়েন্দাকে সে এভাবে আটক করে রেখে গোয়েন্দা বিভাগকে অপদস্ত করেছে।

মিঃ জাফরীর কঠিন আদেশে আবার পুলিশমহলে সাড়া পড়ে গেল। এবার পুলিশবাহিনী দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের জন্য উঠে পড়ে লাগলো।

পথে-ঘাটে-মাঠে সর্বত্র পুলিশ গোপনে অনুসন্ধান চালালো। গোয়েন্দা বিভাগের লোক ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে পুলিশ অফিসারগণ ছুটাছুটি শুরু করলেন।

মিঃ জাফরী ভেবেছিলেন দস্যু বনহুরের আস্তানা বিনষ্ট করে দিয়ে তার বিশেষ ক্ষতি করেছেন। আর সে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। এবার সে এদেশ ত্যাগ করে চলে যাবে। কিন্তু তাঁর ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো।

মিঃ জাফরী সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে গহন বনে যেখানে দস্যু বনহুরের আস্তানা ছিল সেই জায়গায় অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন।

মিঃ জাফরীর দলবলের হাতে অনেক বন্য পশু নিহত হলো। অনেক আহত হয়ে আত্মগোপন করলো বনের মধ্যে। গোটা বন চষে ফিরলো পুলিশবাহিনী। এমন কি তারা রাতেও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দস্যু বনহুরের সন্ধান করতে লাগলো।

পুলিশবাহিনীর মশালের আলোতে গোটা বনভূমি আলোকিত হয়ে উঠলো। বন্য জীবজন্তু সব ছুটে পালাতে লাগলো এদিকে ওদিকে। গাছের পাখি সব নীড় ছেড়ে আকাশে উড়ে উঠলো। সে এক মহা হুলস্থুল কাণ্ড।

দস্যু বনহুর তার পাতালপুরীর গোপন আস্তানায় একটা কক্ষে পায়চারী করছে।

এমন সময় রহমান এসে দাঁড়ালো।

বনহুর পায়চারী বন্ধ করে তাকায় রহমানের মুখের দিকে, গম্ভীর কণ্ঠে বলে সে কি খবর রহমান?

সর্দার, ওরা এখনও বনে বনে অনুসন্ধান চালিয়ে চলেছে।

হঠাৎ অদ্ভুতভাবে হেসে ওঠে দস্যু বনহুর–হাঃ হাঃ হাঃ...হাঃ হাঃ হাঃ তারপর হাসি থামিয়ে বলে পুলিশবাহিনী দস্যু বনহুরের সন্ধানে আজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে– কিন্তু জানে না তারা, দস্যু বনহুরকে খুঁজে বের করা তাদের অসাধ্য। রহমান, আমার অসুস্থ অনুচরগণ কি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে?

তিনজন ছাড়া আর সবাই সম্পূর্ণ সুস্থ সর্দার।

যাও, সবাইকে আসতে বল।

রহমান বেরিয়ে যায়।

দস্যু বনহুর সামনের টেবিল থেকে রিভলভারখানা হাতে তুলে নিয়ে ফিরে দাঁড়াইতেই দেখতে পায় নূরী দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বনহুর প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকায় তার মুখের দিকে।

এগিয়ে আসে নূরী, মুখমণ্ডল তার বিষণ্ন মলিন। বনহুরের সামনে এসে দাঁড়ায়, কিন্তু মুখ। তুলে চাইতে পারে না।

বনহুর নূরীর মুখখানা তুলে ধরে মৃদু হেসে বলে–কি হয়েছে নূরী?

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে যায় নূরী, তারপর বলে–কিছু না।

বনহুর আরও ঘনিষ্ঠহয়ে দাঁড়ায়– নূরী, তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ।

এবার মুখ তুলে তাকায় নূরী, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে– আমি নই– তুমি হুর, তুমি একি হলে!

নূরী!

হ্যাঁ, আজ কতদিন হলো আমি লক্ষ্য করছি, তুমি সব সময় আমাকে যেন এড়িয়ে চলতে চাও। জানি না কি হয়েছে তোমার।

বনহুর আনমনা হয়ে যায়, নূরীকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কি যেন গভীরভাবে চিন্তা করে, তারপর বলে– নূরী, একটা কথা তোমাকে বলবো?

নূরী বনহুরের চোখে চোখ রেখে বুঝতে চেষ্টা করে কি বলতে চায় সে। ভয় হয়, এমন কোনো কথা তাকে শুনতে না হয় যা তার জীবনটাকে এলোমেলো করে দেয়। ব্যথাভরা গলায় বলে নূরী–হুর, যে কথা আমি সহ্য করতে পারবো না, তেমন কথা তুমি যেন আমাকে বল না! বল না হুর! আমি তোমার বিরহ সইতে পারবো না।

নূরী, না বলে যে উপায় নেই।

আজ নয় হুর, পরে বল–থাক।

নূরী।

না,আমি কোনো কথাই শুনতে চাই না...........ছুটে চলে যায় নূরী।

বনহুর নূরীর চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নূরীকে বনহুর ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে, একসঙ্গে খেলা করেছে ওরা দুজন। বনে বনে ঘুরে বেড়ানো, তীর-ধনুক নিয়ে বন্য পশু শিকার করা, নদীতে সাঁতার কাটা, গাছের আড়ালে লুকোচুরি খেলা, ঘোড়ার চড়া সব একসঙ্গে করেছে ওরা। সব সময় বনহুর নূরীকে তার ছায়ার মতই পাশে পাশে দেখেছে– আজ সেই নূরী কি করে দূরে সরে যাবে,কি করে নূরী তাকে ভুলবে–

হঠাৎ বনহুরের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে, রহমান এসে দাঁড়ায় তার সামনে– সর্দার, সমস্ত অনুচর দরবারকক্ষে এসে গেছে।

সম্বিৎ ফিরে পায় বনহুর– চলো।

বেরিয়ে যায় বনহুর। তাকে অনুসরণ করে রহমান।

দরবারকক্ষ।

বনহুর তার সুউচ্চ আসনে পা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। অন্যান্য অনুচর দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই প্রতীক্ষা করছে সর্দারের আদেশের।

বনহুর তার অনুচরগণের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলে ওঠে তোমরা জানো, পুলিশবাহিনী আমার সন্ধানে ছুটাছুটি করছে। কিন্তু তারা কোনদিনই দস্যু

বনহুরের সন্ধান পাবে na। আমার পাতালপুরীর এই আস্তানা কেউ কোনরকমে খুঁজে পাবে না। আমি আমার কাজ এখান। থেকেই চালাবো। রহমান আজ তোমরা প্রস্তুত থেক আমি চাঁদপুরের জমিদারবাড়িতে হানা দেব।

রহমান বিনীত কণ্ঠে বলে–সর্দার চারদিকে পুলিশ তন্নতন্ন করে সন্ধান চালাচ্ছে, এই অবস্থায় ..

গর্জে ওঠে দস্যু বনহুর–সাধ্য কি পুলিশ দস্যু বনহুরের কাজে বাধা দেয়। রহমান, জানো না চাঁদপুরের জমিদার কত ভয়ঙ্কর, কত পাষণ্ড! প্রজাদের ওপর সে যে অনাচার চালিয়েছে তা অতি জঘন্য। আজ পর পর তিন বছর চাঁদপুরের মাটিতে ফসল জন্মেনি। সেখানে লোকজন না খেয়ে অনাহারে শুকিয়ে মরছে। এমন কি ক্ষুধার জ্বালায় তারা আত্মহত্যা করছে। কিন্তু নির্মম জমিদারের কোনদিকে লক্ষ্য নেই। সে প্রজাদের গায়ের রক্ত চুষে নিংড়ে খাজনা আদায় করে নিচ্ছে।

রহমান বলে ওঠে–সর্দার, শুধু তাই নয়, যারা কর দিতে না পারছে, চাঁদপুরের জমিদার সুলতান হোসেন তাদের স্ত্রী ও যুবতী কন্যাকে কেড়ে নিয়ে আসছে। কত লোক ভয়ে মাতাল জমিদারের হাতে স্ত্রী-কন্যাকে সমর্পণ করে দায়মুক্ত হচ্ছে।

এ কথা এতদিন আমাকে জানাওনি কেন রহমান। বনহুরের দু'চোখে যেন সহসা ধক করে জ্বলে ওঠে। দাঁতে দাঁত পিষে বলে– সুলতান হোসেনের এই জঘন্য আচরণ সহ্য করা যায় না। তাকে উচিত শাস্তি দেব রহমান, কোন বাধাই আমি মানতে রাজি নই। যাও, তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও।

বনহুর দরবারকক্ষ থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

রহমান অনুচরগণকে বললো– তোমরা সব সময় তৈরি থেক, সর্দারের হুকুম হলেই ছুটতে হবে।

আমরা সবাই প্রস্তুত।

রহমান ও দলবল দরবারকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে।

অন্যান্য অনুচর চলে যেতেই সামনে এসে দাঁড়ায় নূরী, রহমানকে লক্ষ্য করে বলে– রহমান, হুর আবার কোথায় যাবার জন্য তোমাদের তৈরি হবার নির্দেশ

দিল?

চাদুপুর।

সেখানে কেন?

তার যা কাজ, সেই কাজের জন্য।

পুলিশবাহিনী হুরের সন্ধানে গোটা দেশ চষে ফিরছে, এমনকি..

আজ তো নতুন নয় নূরী। সর্দারকে তুমি ভালভাবেই জানো। কোন বাধাই তাকে ক্ষান্ত করতে পারবে না।

জানি, তবু তাকে যেমন করে হউক রুখতে হবেই।

সশস্ত্র পুলিশবাহিনী, তাদের হাতের উদ্যত রাইফেল কোনোটাই সর্দারকে রুখতে সক্ষম হবে না নূরী।

আমি তাকে রুখবো, কিছুতেই আমি এসময় তাকে চাঁদপুর যেতে দেব না।

বেশ, চেষ্টা করে দেখ যদি সক্ষম হও। কিন্তু মনে রেখ নূরী, চাঁদপুরের লোকজন আজ যে অবস্থায় রয়েছে তাতে সর্দারকে কিছুতেই তুমি ধরে রাখতে পারবে না।

আচ্ছা, আমি দেখবো। নূরী চলে গেল সেখান থেকে।

রহমান হাসলো। তার হাসির মধ্যে ফুটে উঠলো একটা ব্যথার আভাস। মনে মনে বলল সে–নূরী, যার জন্য তুমি উদগ্রীব, সে কি তোমার জন্য এতটুকু ভাবে–কেন তুমি আলেয়ার আলোর পেছনে ছুটছে।

.

বিয়ের আসর থেকে মনিরা নিখোঁজ হওয়ায় মনিরার বড় চাচা আসগর আলী সাহেব বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তার সমস্ত আশা ভরসা পণ্ড হয়ে গেল। এত ধন-সম্পদ হাতে পেয়েও পেলেন না। মনিরাকে কোনোরকমে পুত্রবধূ করে নিতে পারলেই তার মনোবাসনা পূর্ণ হত। ছোট ভাইয়ের বিপুল ঐশ্বর্য তার হাতে চলে আসতো।

ক্ষোভে-দুঃখে মরিয়া হয়ে উঠলেন আসগর আলী। তাঁর বুঝার কিছুই বাকি রইলো না, নিশ্চয়ই সেই দস্যু বদমাইশটা মনিরাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। তাঁর সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড করে দিয়েছে। অধর দংশন করতে লাগলেন আসগর আলী। যত রাগ হলো মনিরার মামীমার উপর। এত সাহস দস্যুটার যে, মনিরাকে বিয়ের আসর থেকে চুরি করে নিয়ে গেল!

আসগর আলী শহরে গিয়ে থানায় ডায়েরী করলেন। দস্যু বনহুর তার ভাতিজীকে চুরি করে নিয়ে গেছে এবং এই চুরির ব্যাপারে চৌধুরী গৃহিণী মরিয়মের গোপন ইংগিত রয়েছে। মনিরা তার ভাতিজী, কাজেই মনিরার ওপর তার মামা-মামীমার চেয়ে তার অধিকার অনেক বেশি।

পুলিশমহল তো আগে থেকেই দস্যু বনহুর এবং চৌধুরী পরিবারের উপর ভীষণ খ্যাপা ছিলেন, আসগর আলীর কেস তারা অত্যন্ত আগ্রহে গ্রহণ করলেন।

দু'দিন পর আসগর আলী পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুনকে নিয়ে হাজির হলেন চৌধুরী বাড়িতে।

বেলা তখন গড়িয়ে এসেছে।

সরকার সাহেব বাইরে যাওয়ার জন্য গাড়ি-বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় আসগর আলী ও ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন হাজির হলেন সেখানে।

সরকার সাহেব অবাক চোখে তাকালেন ইন্সপেক্টার মিঃ হারুনের মুখের দিকে। যদিও তিনি আসগর আলীকে তার সঙ্গে দেখে অনুমানে সব বুঝে নিয়েছিলেন, তবু না বুঝার ভান করে বললেন-ইন্সপেক্টার সাহেব যে! ব্যাপার কি?

মিঃ হারুন কোন কথা বলার পূর্বে বলে ওঠেন আসগর আলী-ব্যাপার একটু পরেই জানতে পারবেন। এখন বলুন আমার ভাতিজী মনিরা কোথায়?

মিঃ হারুন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন-চৌধুরী সাহেবের ছেলে দস্যু বনহুর তাকে চুরি করে এখানে এনেছে।

একটু হাসার চেষ্টা করে বললেন সরকার সাহেব-একথা আপনারা কোথায় শুনলেন? গত পরশু মনিরাকে আসগর আলী সাহেব জোরপূর্বক নিয়ে গেছেন,

তারপর আর তার কোনো খোঁজখবর আমরা জানি না। যদিও সরকার সাহেবের মিথ্যা বলতে বাধছিল তবু না বলে উপায় ছিল না।

আসগর আলী বললেন-নিশ্চয়ই মনিরা এখানে আছে। ইন্সপেক্টার, আপনি তল্লাশি নিন।

বৃদ্ধ সরকার সাহেব প্রমাদ গুণলেন, এখন উপায়! মনিরা এখন নিজের ঘরে বসে আছে। এখনই তিনি ধরা পড়ে যাবেন ইন্সপেক্টার মিঃ হারুনের কাছে।

এখানে যখন সরকার সাহেব, আসগর আলী ও মিঃ হারুনের মধ্যে কথা হচ্ছিল তখন মরিয়ম বেগম হলঘর থেকে সব শুনতে পান। তিনি মুহূর্ত বিলম্ব না করে মনিরার কক্ষে প্রবেশ করে সব খুলে বললেন। একটুও দেরী হলে আবার তাকে তার বড় চাচা ধরে নিয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মামীমার কথায় চমকে উঠলো মনিরা, আতঙ্কে শিউরে উঠলো সে। তাহলে উপায়! পুলিশ ইন্সপেক্টারের চেয়ে বড় চাচাকে বেশি ভয়। কোন বাধাই আজ তাকে রুখতে পারবে না। বড় চাচা তাকে পুলিশের সাহায্যে ধরে নিয়ে যাবেন। বেশিক্ষণ চিন্তা করার সময় তার নেই। মামীমার হাত চেপে ধরে বলে ওঠে মনিরা– মামীমা, তুমি কিছুতেই বলবে না যে, আমি এসেছি।

মিথ্যা কথা আমি বলতে পারবো?

পারতেই হবে, একজনের ভালো করতে গিয়ে মিথ্যা বলতে দোষ নেই। যদি আমাকে পুত্রবধূ বলে গ্রহণ করে থাক তবে আমাকে বাঁচাতেই হবে, বলবে আমি এখানে আসিনি। তোমরা কেউ জানো না আমার সন্ধান, কথা শেষ করে দ্রুত বেরিয়ে যায় মনিরা।

মরিয়ম বেগম ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন।

একটু পরেই সিঁড়িতে ভারী জুতোর শব্দ হয়! মরিয়ম বেগম নিজকে কঠিন করে নেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে সরকার সাহেব, আসগর আলী ও পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন এসে দাঁড়ান তার সামনে!

আসগর আলীর দু'চোখে যেন আগুন ঝরে পড়েছে। গম্ভীর কঠিন কণ্ঠে বললেন– মনিরা কোথায়?

মরিয়ম বেগম দৃঢ়কণ্ঠে বললেন– জানি না।

মিঃ হারুন বললেন– মনিরাকে আপনার ছেলে দস্যু বনহুর ওর চাচার বাড়ি থেকে চুরি করে এনেছে। কোথায় সে বলুন।

বললাম তো জানি না।

মিঃ হারুন বললেন– আপনার বাড়ি খুঁজে দেখতে চাই।

দেখুন। গম্ভীর গলায় বললেন মরিয়ম বেগম।

সরকার সাহেব ঢোক গিললেন।

আসগর আলী সাহেব, মিঃ হারুন ও কয়েকজন পুলিশ গোটা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খোঁজা শুরু করলেন।

ওদিকে মনিরা ততক্ষণে ঝি দুখিনার কাপড় পরে নিয়ে কলতলায় এটো থালা বাসন পরিষ্কার করতে বসে গেছে। দুখিনা কল থেকে পানি তুলছে।

দুখিনার বেশে মনিরাকে চিনার কোন উপায় ছিল না! ছাই-কালি দিয়ে তার হাত দু'খানা অপরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। চুলগুলো এলোমেলো, পরনে অপরিষ্কার অল্পদামী কাপড়।

আসগর আলী, মিঃ হারুন ও পুলিশরা মনিরাকে খুঁজে ফিরতে লাগলো। না, কোথাও মনিরা নেই।

মিঃ হারুন নিজে মনিরার পাশে দাঁড়িয়ে সবাইকে লক্ষ্য করলেন।

ভয়ে শিউরে উঠলো মনিরা। মনে মনে খোদার নাম স্মরণ করতে লাগলো। খোদার মহিমা অপার! কেউ দুখিনার বেশে মনিরাকে চিনতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে আসগর আলী ও পুলিশের দল বিদায় নিল।

আসগর আলী মনে মনে ভাবলেন, বনহুর মনিরাকে চুরি করে কোন গহন বনে লুকিয়ে পড়েছে। বিদায়কালে আবার আসব বলে মরিয়ম বেগমকে জানিয়ে গেলেন আসগর আলী।

আসগর আলী দলবল নিলে চলে যেতেই মরিয়ম বেগম মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, মনিরা তাহলে গোল কোথায়। দিনের আলোতে কোথায়ই বা লুকালো সে। মনিরার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন তিনি।

সরকার সাহেবও ব্যস্ত হয়ে এ বাড়ি ও-বাড়ি সন্ধান নিতে শুরু করলেন।

মনিরা নিজেদের বাড়ির মধ্যেই দিব্যি আরামে সকলের চোখের সামনে রয়েছে, এটা কেউ জানতে পারেনি।

গোটা দিন চলে গেল।

মরিয়ম বেগমের মনে অশান্তির কালো ছায়া ঘনিয়ে এলো। সরকার সাহেব ও বাড়ির সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

মনিরা দুখিনার ছদ্মবেশে থেকে মামীমার ব্যস্ততা লক্ষ্য করলো কিন্তু চট করে নিজেকে প্রকাশ করলো না। ভয় হলো, আবার যদি তার শয়তান বড় চাচা এসে হানা দেয়। তার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। কাজেই আত্মগোপন করে মনিরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

একমাত্র দুখিনা জানতো আর জানতো নকীব। মনিরা ঝি-এর বেশে রান্নাঘরের মধ্যে নিজেকে গোপন রাখলেও এদের দুজনের সাহায্য তার নিতান্ত প্রয়োজন ছিল।

মনিরা ইচ্ছা করেই সরকার সাহেব ও মামীমাকে নিজের গোপনতা জানালো না। হঠাৎ যদি তারা স্নেহ বশীভূত হয়ে তাকে আদর করে বসেন, বা স্নেহ দেখান তাহলেই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে পড়তে পারে। বড় চাচা এলে তখন নিজকে গোপন রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। অন্ততঃপক্ষে দুটো দিন তাকে কষ্ট করতেই হবে।

এদিকে মরিয়ম বেগম ও সরকার সাহেব মনিরার জন্য অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। মরিয়ম বেগম কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন।

.

চাঁদপুর জমিদার বাড়ি।

কাঁচারী ঘরে বসে তামাক টানছে জমিদার সুলতান হোসেন। বয়স তার পঞ্চাশের কাছাকাছি। মাথার চুলে পাক ধরলেও স্বাস্থ্যের কোন অবনতি ঘটেনি এখনও। বলিষ্ঠ চেহারা, উজ্জ্বল গৌর গায়ের রঙ। চেহারায় সুস্পষ্ট আভিজাত্যের ছাপ। প্রথম দর্শনেই তাকে জমিদার বলে চিনতে ভুল হয় না কারও।

সুলতান হোসেন তাকিয়ায় ঠেক দিয়ে বসেছিল, সামনে এক বৃদ্ধ চাষী দাঁড়িয়ে। মলিন জীর্ণ তালিকাযুক্ত লুঙ্গি আর একটা ছেঁড়া জামা তার শরীরে। কাঁধে মলিন ছেঁড়া গামছা। হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে সে। একপাশে দণ্ডায়মান দারোয়ান। সুপক্ক তেল-চকচকে লাঠি তার হাতের মুঠায় ধরা রয়েছে।

জমিদারের কয়েকজন পরিষদ বসে রয়েছে একপাশে।

সুলতান হোসেন গর্জন করে ওঠে–বেটা খাজনা দিতে পারো না, এবার সব নিলাম করে নেব।

বৃদ্ধ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল– ঐ সামান্য ভিটেটুকু কেড়ে নিলে আমায় পথে দাঁড়াতে হবে, হুজুর আপনি গরিবের মা– বাপ, আমাকে দয়া করুন হুজুর! আমার মেয়েটাকে আপনি পথে বের করবেন না.........

কোন কথা আমি শুনবো না। আর দুদিন সময় দিলাম– যাও, যাও এখান থেকে। সুলতান হোসেন গম্ভীর কণ্ঠে গর্জে উঠলো।

বৃদ্ধ কিছু বলতে যাচ্ছিলো, দারোয়ান গলাধাক্কা দিয়ে তাকে বের করে নিয়ে যায়।

সুলতান হোসেন তার একটা অনুচরের দিকে তাকিয়ে কিছু ইংগিত করে।

পরিষদের দল থেকে একজন অনুচর উঠে বেরিয়ে যায়।

দারোয়ান তখন বৃদ্ধের পিঠে লাঠির গুঁতো দিয়ে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

সুলতান হোসেনের অনুচরটা দারোয়ানের কাঁধে হাত রেখে ফিস্ ফিস্ করে কিছু বলল।

দারোয়ান একটু হেসে বৃদ্ধকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালো।

অনুচরটা এবার বৃদ্ধ চাষীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে চাপা কণ্ঠে বললো–বেটা, ঘরে জোয়ান মেয়ে থাকতে এত ভুগছিস কেন, এক পয়সা লাগবে না যদি……

বৃদ্ধের চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠলো। গরিব সে হতে পারে কিন্তু পশু নয়। এটুকু বুঝার মত বুদ্ধি তার আছে, মেয়েকে সে কিছুতেই লম্পট জমিদারের হাতে তুলে দিয়ে দায়মুক্ত হতে পারে না। কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে সে– ভিটে নিলাম হয়ে যাক, পথে পথে ঘুরে বেড়াব সেও ভালো, তবু তোমাদের দয়া আমি চাই না।

বৃদ্ধের কথায় রাগে, অপমানে সুলতান হোসনের অনুচরটা গর্জে উঠলো – আচ্ছা, দেখা যাবে।

সব কথা এসে বলল সে সুলতান হোসেনের কাছে।

সুলতান হোসেন হাসলো।

ঐদিন রাত্রে বৃদ্ধ চাষী যখন ঘুমে, তখন তাকে মজবুত করে হাত-পা– মুখ বেঁধে তার মেয়েটাকে তুলে নিয়ে আসা হলো।

কে কোথায় তার মেয়েকে নিয়ে গেল, পাড়া প্রতিবেশীরা কেউ জানলো না।

পরদিন বৃদ্ধ জমিদারের দরবারে হাজির হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো বললো– হুজুর, কাল রাতে আমার মেয়েকে কারা চুরি করে নিয়ে গেছে। আপনি আমার মা-বাপ, আমাকে বাঁচান, বাঁচান হুজুর। আমার ঐ একটি মাত্র মেয়েটাকে খুঁজে বের করে দিন হুজুর।

কর্কশ কণ্ঠে গর্জে ওঠে সুলতান হোসেন এখান থেকে বেরিয়ে যা হতভাগা। নেকামি করার জায়গা পাওনি। কে না কে তোর মেয়েকে চুরি করে নিয়ে গেছে ঠিক নেই, আমি কোথায় খুঁজতে যাব? দরোয়ানকে ইংগিত করলো ওকে বের করে দিতে।

দারোয়ান গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় চাষীকে।

বৃদ্ধ চাষী হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায়। কপালে করাঘাত করে বিলাপ করতে থাকে।

সুলতান হোসেন এমনি করে দিনের পর দিন চালায় প্রজাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার। কারও মেয়ে, কারও বউ ছিনিয়ে নিয়ে আসে সে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

নির্মম জমিদারের হাত থেকে রেহাই পেয়ে কেউ বা ফিরে যায় পিতামাতা কাউকে আশ্রয় দেয়, কাউকে দেয় না। তখন সে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, ভিক্ষে করে জীবন বাঁচায়, সমাজে তার কোন স্থান হয় না। আর কেউ বা কলঙ্কিত মুখ নিয়ে আর ফিরে যায় না। পুকুরের পানিতে কিংবা বিষ খেয়ে আত্মবিসর্জন দিয়ে স্বামী, পিতা-মাতাকে রেহাই দিয়ে চলে যায়।

এমনি করে সুলতান হোসেন তার কুকর্ম সমাধা করে চলে।

.

সেদিন বাগানবাড়ির একটা কক্ষে সুলতান হোসেন তার নতুন আমদানি করা একটা যুবতাঁকে নিয়ে আমোদ-প্রমোদে মেতে উঠেছিল। যুবতী তারই একজন গরিব প্রজা গৃহলক্ষ্মী স্ত্রী।

কিছু টাকার বিনিময়ে সুলতান হোসেন যুবতী বধুটাকে তার স্বামীর নিকট হতে ছিনিয়ে নিয়েছিল।

স্ত্রীকে দুষ্ট জমিদারের হাতে তুলে দিয়ে তার স্বামী পথের ধারে মাথা ঠুকে কাঁদছিল। স্ত্রী ছাড়া বেচারার এ দুনিয়ায় কেউ ছিল না, বড় ভালবাসতো সে স্ত্রীকে। সেই স্ত্রীকে আজ কত কষ্টে, কত যন্ত্রণায় পড়ে জমিদারের হাতে এনে দিয়েছে কে তার দুঃখ বুঝবে।

রাত বেড়ে আসে।

ঝিমিয়ে পড়ে বসুন্ধরা।

সুলতান হোসেনের বাগানবাড়িতে তখন একটা যুবতীর ওপর চলেছে অকথ্য নির্যাতন। কিছুতেই সুলতান হোসেন মেয়েটাকে বাগে আনতে পারছে না।

জমিদার সুলতান হোসেন যখন যুবতীটাকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করছে, ঠিক তখন দস্যু বনহুর দলবল নিয়ে তীরবেগে ছুটে আসছে। প্রতিটি দস্যুর হাতে উদ্যত রাইফেল, শরীরে কালো। ড্রেস। গালে গালপাট্টা বাধা। সকলের আগে রয়েছে দস্যু বনহুর, তার হাতে রিভলবার।

গাঢ় অন্ধকারে বাগানবাড়ির নিকটে এসে ছড়িয়ে পড়লো বনহুরের অনুচরগণ। সবাই প্রস্তুত। হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো–দস্যু বনহুর যখন আদেশ করবে তখন সবাই একসঙ্গে আক্রমণ চালাবে।

দস্যু বনহুর তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো। দেয়াল টপকে বাগানবাড়িতে প্রবেশ করে গোপনে এগিয়ে চললো সামনের দিকে।

গাঢ় অন্ধকারে দস্যু বনহুরের কালো পোশাক মিশে গেল। অনেকগুলো পাহারাদার বাগানবাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে সতর্কভাবে পাহারা দিচ্ছিল। একটা শিকারী কুকুর ছেড়ে রাখা হয়েছে, যেন কোন বিপদের আশংকা থাকে।

নিশ্চিন্ত মনে শয়তান জমিদার তার কুকর্ম সিদ্ধ করে চলেছে। এমন করেই সে দিনের পর দিন তার মনোবাসনা চরিতার্থ করে চলে। বিশ্বস্ত অনুচর আর দুর্দান্ত এলসেসিয়ান কুকুর থাকতে কোন ভয় নেই তার।

অবশ্য এত সাবধানতার প্রয়োজন পূর্বে তার ছিল না। সে জানতো, তার চেয়ে শক্তিশালী এ দুনিয়ায় আর বুঝি কেউ নেই। প্রজারা সবাই তাকে ভয় করে। তার বিরুদ্ধে টু শব্দ করবে, এমন। কেউ নেই। কাজেই সে যা খুশি তাই করে যেত।

কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে। প্রজারা তার এই জঘন্য আচরণ নীরবে সহ্য করে গেলেও ভেতরে ভেতরে ক্ষেপে উঠেছিল। একদিন সবাই জোট পাকিয়ে আক্রমণ করেছিল জমিদারের বাগানবাড়ি।

শেষ পর্যন্ত জমিদারের পাহারাদার আর অনুচরদের হাতে জীবন দিয়েছিল তারা। নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছিল তাদের। যে দু'একজন জীবন নিয়ে পালিয়েছিল তাদেরও পরে ধরে এনে হত্যা করেছিল শয়তান সুলতান হোসেন।

তারপর থেকেই জমিদার তার বাড়ি এবং বাগানবাড়িতে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছিল। একটা দুর্বলতা যে সুলতান হোসেনের মনে ছিল না তা নয়, ভয় ছিল, হঠাৎ যদি আবার কোন হামলা হয়ে বসে। অবশ্য এমন একটা ভয় সমস্ত দুষ্ট লোকের মনেই লুকিয়ে থাকে। তারা প্রকাশ্যে যত আস্ফালনই করুক না কেন, একটা গোপন ভয় তাদের মনে সর্বদা দানা বেঁধে থাকে।

সুলতান হোসেন তাই এত পাহারার ব্যবস্থা করেও একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। মানুষকে তার বিশ্বাস হত না, তাই সে একটা ভয়ঙ্কর কুকুরের আমদানি করেছিল। কুকুরটা যেমন ছিল ভয়ঙ্কর তেমনি ছিল শক্তিশালী। গোটা দিন তাকে আটক করে রাখা হত অন্ধকার এক ঘরে। তাজা কাঁচা মাংস খেতে দেওয়া হত। আর রাতে ছেড়ে দেয়া হত বাগানবাড়ির মধ্যে। কোন লোক দেখলে যাতে তাকে খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলে হত্যা করে, এটাই ছিল শয়তান জমিদারের উদ্দেশ্য।

দস্যু বনহুরও এই কুকুরের কবল থেকে রক্ষা পেল না। লোকচক্ষু তাকে দেখতে না পারলেও পশুর চক্ষু তাকে ধরে ফেললো, গর্জন করে এগিয়ে এলো তীরবেগে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে কোমরের বেল্ট থেকে ছোরাখানা খুলে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

অন্ধকারে হুংকার ছেড়ে এগিয়ে আসছে কুকুরটা। আগুনের ভাটার মত জ্বলছে ওর চোখ দুটো। ঠিক যেন দুটো টর্চলাইট একসঙ্গে আসছে।

বনহুর প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

কুকুরটা ঠিক সেই মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর ছোরাটা বসিয়ে দিল কুকুরটার বুকে। অমনি ভীষণ একটা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো কুকুরটা।

একটা ঘড় ঘড় শব্দ বের হলো কুকুরটার গলা থেকে, তারপর সব নিস্তব্ধ।

শয়তান সুলতান হোসেন তখন উন্মত্তের ন্যায় যুবতীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে।

পাহারদারগণ লাঠি-শরকি নিয়ে ছুটে এলো।

বনহুর ইংগিতসূচক শব্দ করতেই তার অনুচরগণ আক্রমণ করলো পাহারাদারগণকে।

দস্যু বনহুর বাগানবাড়ির যে কক্ষে সুলতান হোসেন যুবতীর উপর নির্যাতন চালিয়ে চলেছিল, সেই কক্ষের কাঁচের শার্সী ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করলো।

মুহূর্তে যুবতাঁকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সুলতান হোসেন। দস্যু বনহুরের অদ্ভুত কালো ড্রেস দেখেই তার দু চোখ ছানাবড়া হল। এত পাহারার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কি করে এই লোকটা তার বাগানবাড়িতে প্রবেশ করলো। মনে মনে ভীত হলেও নিজেকে সামলে নিয়ে গম্ভীর। কণ্ঠে বলল সুলতান হোসেনকে তুমি?

দস্যু বনহুর তার বুকের কাছে রিভলবার চেপে ধরে বলল– শয়তানের দমনকারী।

বনহুরের মুখের অর্ধেকটা ঢাকা থাকায় শুধু তার চোখ দুটো আর ভ্রূ দেখা যাচ্ছিল।

সুলতান হোসেন বনহুরের চোখের দিকে তাকালো। চোখ দুটো যেন আগুনের ভাটার মত জ্বলছে। তা দেখে সে ভয়ে দু'পা পিছিয়ে যায়, ঢোক গিলে বলে এখানে তুমি কি করে এলে?

যেমন করে আজরাইল আসে।

হিংস্র জন্তুর কবল থেকে ছাড়া পেয়ে হরিণ-শিশু যেমন কাঁপতে থাকে, তেমনি থরথর করে কাঁপছিল যুবতী। চুলগুলো এলোমেলো, পরিধেয় বসন শিথিল হয়ে খসে পড়েছে মেঝেতে। সে এক করুণ মর্মান্তিক দৃশ্য।

যুবতী একবার শয়তান সুলতান হোসেন আর একবার বনহুরের মুখে তাকাচ্ছিল। বিবর্ণ ফ্যাকাশে তার মুখমণ্ডল।

বনহুর দাঁতে দাঁত পিষে বললো–আজ তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

সুলতান হোসেনের মুখ দিয়ে একটা ভয়ার্ত অস্ফুট শব্দ বের হল। হাতজোড় করে বলল– তুমি যা চাও তাই দেব, আমাকে প্রাণে মেরো না।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো দস্যু বনহুর– হাঃ হাঃ হাঃ প্রাণের মায়া বড় মায়া, তাই না? শয়তান, আমি সব শুনেছি, সব জেনেছি। তোমার হাতে কত প্রাণ অকালে বিনষ্ট হয়েছে। তার। হিসেব তুমি না রাখলেও আমি রেখেছি। পাষণ্ড, জমিদার হয়ে প্রজাদের ওপর তুমি যা অকথ্য অত্যাচার করেছ তা অতি জঘন্য। কতজনকে তুমি মিথ্যা দেনার দায়ে ফকির করেছ কত জনকে উন্মাদ করে তার সমস্ত কিছু আত্মসাৎ করেছ, কত অসহায় পিতার বুক থেকে কন্যা কেড়ে নিয়ে তাকে … না না, আর নয়…।

কে–কে তুমি? এসব জানলে কি করে—

পাপ কোনদিন গোপন থাকে না শয়তান।

কে তুমি?

আমি যেই হই তোমার প্রাণ নিতে এসেছি। আমার হাত থেকে তোমার রেহাই নেই। শয়তান– বনহুরের রিভলবার গর্জে ওঠে।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে সুলতান হোসেন। কিছুক্ষণ ছটফট করে নীরব হয়ে যায় তার দেহটা।

দস্যু বনহুর এবার ফিরে তাকায় যুবতীর দিকে। মুখের আবরণ খুলে বাম হাতে তার আঁচলখানা তুলে দেয় গায়ে।

যুবতী দু'হাতে আঁচলখানা শরীরে জড়িয়ে নিয়ে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কণ্ঠে বলে– কে আপনি, আমাকে এভাবে রক্ষা করলেন।

মৃদু হাসি ফুটে ওঠে দস্যু বনহুরের মুখে, বলে সে–আমি যেই হই, তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

কিন্তু আমাকে কি আর গ্রহণ করবে?

কে?

আমার স্বামী।

নিশ্চয়ই করবে, চলো।

বনহুরের সঙ্গে যুবতী বের হয়ে আসে কক্ষ থেকে।

তখন পাহারাদারগণ দস্যু বনহুরের অনুচরদের কাছে পরাজিত হয়ে কেউ পালিয়েছে, কেউ নিহত হয়েছে। পথ একেবারে মুক্ত। দস্যু বনহুর যুবতীটাকে নিয়ে তার স্বামীর বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালো। দেখলো একটা যুবক পড়ে রয়েছে দরজার পাশে।

যুবতীটি আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো যুবকের বুকে।

.

দস্যু বনহুর হাঁটু গেড়ে বসে যুবকের হাতখানা তুলে নিল হাতে, হিমশীতল হয়ে গেছে। যুবকের দেহটা। আত্মহত্যা করে স্ত্রীর বিরহ বেদনা থেকে মুক্তি পেয়েছে যুবকটা।

যুবতী বিলাপ করে ওঠে– ওগো, তুমি আমাকে একা ফেলে কোথায় গেলে। কে আমাকে দেখবে বল, কে আমাকে আশ্রয় দেবে!

সেই করুণ দৃশ্য দেখে বনহুরের দমনেও আঘাত লাগলো। যুবতীর করুণ কান্না তার চোখে পানি এনে দিল। বলল সে বোন, তুমি কেঁদো না, আমি তোমায় দেখবো।

কৃতজ্ঞতাভরা চোখে তাকালো যুবতী বনহুরের সুন্দর দীপ্ত মুখখানার দিকে। যদিও অন্ধকার তবু ঝাপসা দেখতে পেল যে, ঐ চোখ দুটি অশ্রু ছলছল হয়ে উঠেছে।

দস্যু বনহুর পকেট থেকে একতোড়া নোট বের করে যুবতীর হাতে গুঁজে দিল, তারপর বলল– দরকার হলে আরও পাবে।

যুবতী টাকার তোড়া হাতে অশ্রুভরা চোখে তাকালো দস্যু বনহুরের মুখে, বলল– কে আপনি,তা তো বললেন না?

দস্যু বনহুর শান্তকণ্ঠে বলল– আমি দস্যু বনহুর।

শিউরে উঠলো যুবতী। হাত থেকে নোটের তোড়াটা পড়ে গেল। অস্ফুট ভীতকণ্ঠেবলল– দস্যু বনহুর।

বনহুর নোটের তোড়াটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে যুবতীর দিকে বাড়িয়ে ধরলো– ভয় নেই, দস্য হলেও সে তোমার কোন ক্ষতি করবে না। তুমি আমার বোন। আসি, খোদা হাফেজ! অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায় দস্যু বনহুর।

একতোড়া নোট হাতে স্তব্ধ হয়ে মৃত স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকে যুবতী।

দূরে শোনা যায় অশ্ব পদশব্দ।

সম্বিৎ ফিরে পায় যুবতী। তাড়াতাড়ি নোটের তোড়াটা কাপড়ের নিচে লুকিয়ে আঁচলে অশ্রু মুছে।

.

শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় দস্যু বনহুর। সম্মুখে একটা রেকাবিতে আংগুর ফল সাজানো রয়েছে। আরও নানারকম ফলমূল রয়েছে আর একটা রেকাবিতে। বনহুর গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করছে।

এমন সময় রহমান সেখানে এসে এক পাশে দাঁড়ায়।

একটু কেশে বলে রহমান সর্দার, চাঁদপুরে শান্তি ফিরে এসেছে।

উঃ! কি বললে রহমান? সম্বিৎ ফিরে পায় বনহুর।

চাঁদপুরে শান্তি ফিরে এসেছে। এখন সেখানে লোকজন নিশ্চিন্ত মনে বসবাস করতে পারছে। আবার চাষীগণের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে, মাঠে মাঠে গান গেয়ে তারা ফসল বুনছে। স্ত্রী-কন্যা পুত্র নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাচ্ছে। চাঁদপুরের জমিদার সুলতান হোসেনের পুত্র মাসুম এখন চাঁদপুরের জমিদার হয়েছে।

ছেলেটা কেমন রহমান?

শুনলাম খুব ভাল।

হা সর্দার।

নতুন জমিদারের সঙ্গে মোলাকাত করতে হয় তাহলে। আচ্ছা রহমান, সেই মেয়েটার খবর কি জান?

জানি সর্দার। সে এখন তার স্বামীর ভিটিতেই সুখে বসবাস করছে। আপনার দয়ায় তার কোন অভাব নেই।

হুঁ, এটাই তো দুনিয়ার রীতি। রহমান, আমি চাঁদপুরে একবার যাব।

মাথা চুলকায় রহমান, বলে সে কিন্তু সেখানে এখন পুলিশ যেভাবে ঘোরাফেরা করছে.. চাঁদপুরের জমিদার নিহত হবার পর গোয়েন্দা বিভাগ খুব সজাগভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে চলেছে। এখন সেখানে যাওয়া কি ঠিক হবে সর্দার?

সে জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না রহমান, আমি একাই যাব।

আমি সে কথা বলছি না সর্দার।

তা জানি, তুমি আমার জন্যই ভাবছ কিন্তু রহমান, তুমি তোমাদের সর্দারের জন্য সব সময় নিশ্চিন্ত থেক।

বনহুর রেকাবি থেকে এক ঝোপা আংগুর তুলে নিয়ে মুখের কাছে ধরলো।

রহমান বেরিয়ে গেল সেখান থেকে।

বনহুর আংগুর খেতে খেতে হাসতে লাগলো।

এমন সময় নূরী এসে বসলো তার পাশে। অভিমানের সুরে বলল– হুর, কেন হাসছো?

বনহুর আংগুরের ঝোপা থেকে একটা আংগুর ছিঁড়ে নিয়ে নূরীর মুখের কাছে তুলে ধরে– খাও।

না, আগে বল কেন তুমি হাসলে?

সব কথাই কি তোমার জানা উচিত নূরী?

হুর, আজও আমি তোমার মনের সন্ধান পেলাম না, এ দুঃখ আমার মরলেও যাবে না।

নূরী, এত অবুঝ তুমি।

আমি নই তুমি। একটা নারীর ব্যথা তুমি বুঝ না। নারীর অশ্রু তুমি এত ভালবাস?

হয়তো তাই।

আমি জানি, যে তোমাকে ভালবেসেছে সে–ই কেঁদেছে। জীবনভর কেঁদেছে। কত পাষণ্ড তুমি!

সে কি আমার অপরাধ?

হুর, তুমি কাউকেই কি ধরা দেবে না?

বড্ড ছেলেমানুষ তুমি, দস্যু বনহুরকে যে ভালবাসবে সেই ভুল করবে। দস্যু সে তো মানুষ নামে কলঙ্ক।

না না, তোমাকে আমি কোনদিন ছোট মনে করতে পারবো না। কে বলে, তুমি মানুষ নামে কলঙ্ক– তুমি ফেরেশতা।

বনহুর নূরীর অশ্রুসিক্ত মুখখানা তুলে ধরে। নিজের রুমালে নূরীর চোখ দুটো মুছে দিয়ে বলে–একটা কথা তোমাকে বলবো।

নূরী বনহুরের মুখে হাতচাপা দিলে বলল–না, কোন কথা আমি শুনবো না।

তবে থাক।

আমি চাই শুধু তোমাকে। আর কিছুই চাই না।

আমাকে তুমি মাফ কর নূরী।

না না, আমি তোমার কোন কথা শুনবো না। দুনিয়া ভেসে যাক, আমি কোনদিকে তাকাবো, শুধু তুমি আমার হবে।

বনহুর শয্যা ত্যাগ করে পায়চারী শুরু করে। মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে আসে। ললাটে ফুটে ওঠে গভীর চিন্তারেখা।

নূরী বনহুরের মুখোভাব লক্ষ্য করে ব্যথায় মুষড়ে পড়ে। বুঝতে পারে, বনহুরের মনে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়েছে। আজ নতুন নয়, নূরী আরও বহুদিন বনহুরের এমনি ভাব লক্ষ্য করেছে। যখনই সে বনহুরকে নিবিড় করে পেতে চেয়েছে তখনই যে আনমনা হয়ে পড়েছে, নয় তো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার কাছ থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে তখন নূরী।

আজ নূরী চলে যায় না, স্থিরকণ্ঠে বলে–হুর, আমি জানি, তুমি আমাকে গ্রহণ করতে রাজি নও; কিন্তু মনে রেখ, আমিও তোমায় ছাড়ছি না, আমাকে তোমার বিয়ে করতে হবে....

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বনহুর, বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে ওঠে– বিয়ে!

হ্যাঁ, চমকে উঠলে কেন? ওকি। তোমার মুখ অমন কালো হয়ে উঠলো কেন? বিয়ে তো পবিত্র বাঁধন।

বনহুরের চোখের সামনে ভেসে উঠলো আর একখানা মুখ। চন্দনের তিলক আঁকা নববধুর বেশে সামনে এসে দাঁড়ালো যেন মনিরা, নূরীর রূপ মুছে গিয়ে মনিরার রূপ ধরা দিল বনহুরের চোখে।

বনহুর নির্বাক নয়নে তাকিয়ে রইলো নূরীর দিকে। বিয়ে–এই শব্দটাই সেদিন সে মায়ের মুখে শুনেছে। বিয়ে! দস্যুর আবার বিয়ে। নিছক একটা মিথ্যা অভিনয় হেসেছিল সেদিন বনহুর। আজ আবার নূরীর মুখে সেই 'বিয়ে' শব্দটা বনহুরকে কেমন যেন আচ্ছন্ন করে ফেললো। নূরীর রূপ মুছে গিয়ে মনিরা ভেসে উঠলো তাঁর চোখে।

বনহুর দেখলো, করুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে মনিরা। দু' চোখে তার অশ্রু, ব্যথার ছোঁয়া ফুটে উঠেছে চেহারায়। বনহুর আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলো না। দু'হাত প্রসারিত করে। দিল নূরীর দিকে।

নূরী চোখে অশ্রু মুখে হাসি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের বুকে।

বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে বুকে টেনে নিল।

নূরী ভুলে গেল সমস্ত ব্যথা বেদনা। বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে বলল– হুর, আমি জানি তুমি আমায় কত ভালবাস।

এমন সময়ে দরজার বাইরে পদশব্দ শোনা যায়।

পরক্ষণেই ভেসে আসে একটা কণ্ঠস্বর–সর্দার।

বনহুর নূরীকে মুক্ত করে দিয়ে নিজের শয্যায় গিয়ে বসে।

নূরী বেরিয়ে যায় কক্ষ থেকে।

বনহুর বলে–এসো মাহবুব।

মাহবুব কক্ষে প্রবেশ করে। কুর্ণিশ জানিয়ে বলে সে– সর্দার, একটা দুঃসংবাদ।

দুঃসংবাদ?

হ্যাঁ সর্দার।

মাহবুব একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে– সর্দার, রাজা মোহন্ত সেনকে তার ছোট ভাই। বন্দী করেছে।

এটাই কি তোমার দুঃসংবাদ? এ খবর আমি পেয়েছি।

সর্দার। আজ রাতে তাকে হত্যা করা হবে।

একথা তুমি কেমন করে জানলে?

আমাদের গুপ্তচর সন্ধান জেনে এসেছে।

ডাকো তাকে।

বেরিয়ে যাচ্ছিলো মাহবুব, বনহুর ডেকে বললো– রহমানকেও ডেকো, কথা আছে।

আচ্ছা সর্দার।

বেরিয়ে যায় মাহবুব।

বনহুরের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ে সে। রাজা মোহন্ত সেনকে বনহুর বহুদিন থেকেই জানে, এমন মহৎ ব্যক্তি কমই আছে– ধনী গরিব, দীন-দুঃখী তাঁর কাছে সমান। তিনি মুক্তহস্তে গরিবদের দান করেন। তার অর্থে বহু অনাথ আশ্রম, অনেক দাঁতব্য চিকিৎসালয় তৈরি হয়েছে। এখনও তার অর্থে বহু দীন-দুঃখী শান্তিতে কাল কাটাচ্ছে। এমন লোকের অমঙ্গল আশংকা দস্যু বনহুরের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। দস্যু বনহুর মহত্বের বন্ধু,শয়তানের আজরাইল। যেমন পাষণ্ড, তেমনি কোমল প্রাণ সে। মোহন্ত সেনের বিপদে তার মন চঞ্চল হয়ে উঠলো!

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করলো রহমান, মাহবুব আর সেই গুপ্তচরটা যে মোহন্ত সেনের খবরটা এনেছে। গুপ্তচরটার শরীরে দারোয়ানের ড্রেস এখনো রয়েছে।

সর্দারকে কুর্ণিশ জানিয়ে দাঁড়ালো সবাই।

বনহুর গুপ্তচরটাকে লক্ষ্য করে বললো– ভুলু সিং, মাহবুবের নিকটে যা শুনলাম সব সত্য।

হ্যাঁ সর্দার, সব সত্য।

আজ রাতে মোহন্ত সেনকে হত্যা করা হবে, এটাও সত্য?

হ্যাঁ, সত্য। আপনার কথামত আমি কাজ করেছি। সব সময় আমি রাজা যতীন্দ্র সেনের কাছে ছিলাম। মোহন্ত সেনকে বন্দী করেও সে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। তাঁকে হত্যা করে তার রাজ্য আত্মসাৎ করে নেবার অভিসন্ধি এটেছে। তাছাড়া মোহন্ত সেনের কন্যা বাসবীকে একজন দুবৃত্ত মাতালের হাতে তুলে দিয়ে দায়মুক্ত হবার জোগাড় করেছে।

গম্ভীর কণ্ঠে একটা শব্দ করলো বনহুর–হুঁ!

ভুলু সিং তখনও বলে চলেছে–সর্দার, আজ রাতেই মোহন্ত সেনকে হত্যা করা হবে, সে কথাও আমি নিজ কানে শুনেছি।

বনহুর রহমানকে লক্ষ্য করে বলে, রহমান তাজকে প্রস্তুত রেখ। তোমরাও প্রস্তুত থেক। মোহন্ত সেনকে উদ্ধার আর যতীন্দ্র সেনের যথাসর্বস্ব লুট–হাঃ হাঃ হাঃ। দাঁতে দাঁত পিষে বলে সে– দস্যু বনহুর রাজাকে ফকির, ফকিরকে রাজা বানাতে পারে। খোদার নাম স্মরণ করে তোমরা তৈরি হয়ে নাও। যাও রহমান।

.

গভীর রাত।

যতীন্দ্র সেন শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। কক্ষে পায়চারী করে সে, নির্জন কক্ষে তার নিজের পদশব্দে চমকে ওঠে বারবার, থমকে দাঁড়িয়ে পেছনে তাকায় নাঃ কই, কেউ নেই তো। গোটা মুখমণ্ডল তার ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠেছে। দুচোখে হিংস্র শার্দুলের অগ্নিক্ষুধা। ভাই হয়ে ভাইয়ের বুকের রক্ত শুষে নেবার জন্য উন্মত্ত সে। তার গোপন অনুচরগণ এতক্ষণে হয়তো পাহাড়পুর দুর্গে পৌঁছে গেছে। হয়তো বা মোহন্ত সেনের বুকে ছোরা বসিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলেছে। আজ হতে সে একাই এ রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি। আর কেউ তাকে কোন কাজে বাধা দেবে না। এবার তার বৃদ্ধা বৌদি আর ভাতিজী বাসবী–ওদের সরাতে আর কতক্ষণ।

পাশের ঘরে মোহন্ত সেনের নিদ্রাহীন স্ত্রী মায়াদেবী আর বাসবী ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আজ প্রায় এক মাস হয়ে চললো মোহন্ত সেনকে ফুসলিয়ে মিথ্যা কথা বলে রাজ্যের বাইরে নিয়ে গিয়েছিল যতীন্দ্র সেন। তারপর যতীন্দ্র সেন একাই ফিরে এসেছিল, বৌদি আর বাসবীকে বলেছিল, দাদা তার এক বন্ধুর বাড়িতে থেকে গেলেন। কয়েক দিন পর আসবেন।

কিন্তু দিনের পর দিন যেতে লাগলো। সপ্তাহ গিয়ে মাস হলো তবু ফিরে এলেন না মোহন্ত সেন। যে লোকটার পাশে মায়ারাণী কিংবা বাসবী এক মুহূর্ত না থাকলে নয়, সেই অসহায় অন্ধলোক কি করে এতদিন বাইরে কাটাচ্ছেন। মায়ারাণী আর বাসবী ভেবে অস্থির হয়ে পড়েছেন। আজকাল যতীন্দ্র সেন বেশ দুর্ব্যবহার শুরু করেছে তাদের সঙ্গে।

মায়ারাণী আর বাসবী যতীন্দ্র সেনের কথাবার্তা ও আচরণে অত্যন্ত আশঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। কেমন যেন হেঁয়ালিপূর্ণ কথা বলে যতীন্দ্র সেন। সন্দেহের ছোঁয়া লাগে মায়ারাণী আর বাসবীর মনে। ভাবে নিশ্চয়ই মোহন্ত সেনের কোন অমঙ্গল

ঘটেছে। মায়ারাণী আর বাসবী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। সব সময় কাঁদেন ওরা দু’জন। মায়ারাণী কাঁদেন সান্ত্বনা দেয় বাসবী কেঁদোনা মা। তুমিই তো বলো, অসহায়ের সহায় একমাত্র ঈশ্বর। ঈশ্বর আমার বাবাকে রক্ষা করবেন।

মাতা-কন্যা যখন পাশের ঘরে কান্নাকাটি করছেন, ঠিক সেই সময় যতীন্দ্র সেন ঐ কক্ষে প্রবেশ করে।

চমকে ওঠেন মায়ারাণী আর বাসবী।

যতীন্দ্র সেন কর্কশ কঠিন স্বরে দাঁতে দাঁত পিষে বলে–এখনও তোমরা জেগে আছ?

মায়ারাণী যতীন্দ্র সেনের পা দু’খানা চেপে ধরেন ঠাকুরপো, বলো বলো ঠাকুরপো, তোমার দাদা কোথায়? তুমি তাকে কোথায় রেখেছ?

ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি হেসে বলে যতীন্দ্র সেন–অপেক্ষা কর, একটু পরই জানতে পারবে।

মায়ারাণী যতীন্দ্র সেনের কথায় আতঙ্কে শিউরে ওঠেন। বলেন তিনি–তুমি না বলেছিলে, তোমার দাদা তার এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গেছেন?

যা মনে কর তাই।

না, তোমার কথায় আমার ভয় হচ্ছে যতীন্দ্র। তাঁর কোনো বিপদ ঘটেনি তো? মায়ারাণী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠেন।

বাসবী এতক্ষণ নিশ্চুপ সব শুনে যাচ্ছিল। সে উচ্চশিক্ষিত জ্ঞানবতী মেয়ে। বুঝতে পারে, তার অন্ধ পিতাকে এই শয়তান কোনো ভয়ঙ্কর অবস্থায় ফেলেছে। আর কোনোদিন তার পিতাকে ফিরে পাবে কিনা, কে জানে! বাসবী নিজকে কঠিন করে নিয়ে বলে–মাগো, তুমি কেন এত বিচলিত হচ্ছে। ন্যায় কোনদিন ধ্বংস হতে পারে না–আর অন্যায় কোনদিন জয়ী হতে পারে না।

ঠিক বলেছিস মা, ঠিক বলেছিস–

মোহন্ত সেনের কণ্ঠস্বরে একসংগে কক্ষের সবাই চমকে ওঠে। ফিরে তাকায় সকলে। কক্ষের উজ্জল আলোতে তারা দেখতে পায় দরজায় দাঁড়িয়ে মোহন্ত সেন, তার পেছনে উদ্যত রিভলভার হাতে একটা জমকালো মূর্তি।

আনন্দে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান মায়ারাণী ও বাসবী, এ কি তারা স্বপ্ন দেখছেন না সত্য ভেবে পান না।

যতীন্দ্র সেনের দু'চোখে ভয় ও বিস্ময়। মোহন্ত সেনকে জীবিত এবং তার পেছনে জমকালো মূর্তিকে লক্ষ্য করে হকচকিয়ে যায় সে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে–এ কি করে সম্ভব। হলো? তার গুপ্ত অনুচর রাঘব আর নন্দীর হাত থেকে কি করে রেহাই পেয়েছে মোহন্ত সেন? সে বুঝতে পারে, জমকালো মূর্তি যেই হউক সে–ই যে মোহন্ত সেনকে উদ্ধার করে এনেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবার পালাবার পথ খুঁজে যতীন্দ্র সেন। কিন্তু জমকালো মূর্তির হাতের উদ্যত রিভলবার লক্ষ্য করে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

অন্ধ রাজা মোহন্ত সেন দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসেন– মা বাসবী, তোরা কোথায়? কোথায় তোরা?

বাসবী পিতার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই যে বাবা। এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? বাসবী ভয়ার্ত দৃষ্টিতে একবার তাকালো দরজার মুখে দণ্ডায়মান জমকালো মূর্তিটার দিকে।

মায়ারাণীও এবার ভয়ার্তভাবে তাকালেন জমকালো মূর্তির দিকে। কম্পিত কণ্ঠে বললেন– ঐ শয়তানটাই বুঝি তোমাকে আটক করে রেখেছিল।

না না মায়া, ও শয়তান নয়, শয়তান নয়–দেবতা। আমাকে ও-ই রক্ষা করেছে, সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। আমার চোখ নেই, তাই ওকে দেখতে পাচ্ছিনে, বলতো ও কেমন দেখতে? ওকে একটিবার দেখতে আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে।

কারও মুখে কথা নেই, মোহন্ত সেন বলেই চলেন, জানো মায়া কে আমাকে পাহাড়পুর দুর্গে বন্দী করে রেখেছিল, জানো তোমরা? আজ কে আমাকে হত্যা করতে নিয়েছিল তাও জানো না। আমারই ছোট ভাই যতীন্দ্র। যতীন্দ্রই আমাকে হত্যার জন্য লোক নিযুক্ত করেছিল, কিন্তু ভগবান আমার সহায়, তাই বেঁচে গেছি।

যতীন্দ্র সেনের মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বারবার দরজায় দণ্ডায়মান মূর্তির। হাতের রিভলভারের দিকে তাকাচ্ছে, যম দূতের মতোই মনে হচ্ছে তার কাছে মূর্তিটাকে।

মায়ারাণী যতীন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন– ঠাকুরপো, এসব সত্যি?

ঢোক গিলে বলে যতীন্দ্র সেন– না না, তুমি ওসব বিশ্বাস করো না। সব মিথ্যা ...

কি বললে? ছায়ামূর্তি গর্জে উঠলো। চমকে উঠলেন মায়ারাণী, বাসবী ও যতীন্দ্র। কি গম্ভীর ব্যক্তিত্বপূর্ণ গলা।

মোহন্ত সেন বলে ওঠেন–এবারের মত ওকে ক্ষমা করে দাও বন্ধু।

ক্ষমা! যম কখনও ক্ষমা করে না।

যতীন্দ্র সেন এবার ছায়ামূর্তিকে লক্ষ্য করে বলে ওঠে-কে আপনি? কি দোষে আমাকে....

তোমার দোষের পুনরাবৃত্তি করতে আমি রাজি নই। বড় ভাইকে হত্যার দায়ে আমি তোমাকে হত্যা করব। জমকালো মূর্তি এগিয়ে এলো যতীন্দ্র সেনের দিকে।

দাদাকে আমি তো হত্যা করতে চাইনি?

আবার মিথ্যা কথা। শয়তান, এক্ষুণি আমি তোমার মিথ্যা বলার শাস্তি দিচ্ছি— গর্জে ওঠে জমকালো মূর্তির রিভলভার।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় যতীন্দ্র সেন।

মোহন্ত সেন বেদনার্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন–একি করলে বন্ধু। একি করলে...

বাসবী স্থির নয়নে তাকালো ছায়ামূর্তির মুখের দিকে। একরাশ বিস্ময় ঝরে পড়লো তার দৃষ্টিতে, কোন কথা বের হলো না তার কণ্ঠ দিয়ে।

জমকালো মূর্তি শুধু একটা কথা উচ্চারণ করলো–শয়তানের সাজা দিয়েছি। তারপর বেরিয়ে গেল সে।

রিভলভারের গুলীর শব্দে লোকজন ছুটে এলো, সবাই যতীন্দ্র সেনের রক্তাক্ত মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে হায় হায় করতে লাগলো। সবাই মোহন্ত সেনকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্যও হলো। একবাক্যে বলল সবাই– যতীন্দ্র সেনকে অন্ধ রাজা মোহন্ত সেনই হত্যা করেছেন।

পুলিশসহ দারোগা এলেন। লাশ এবং সমস্ত কক্ষ তল্লাশি করে দেখতে লাগলেন।

পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর মিঃ হোসেন কক্ষ তল্লাশি করার সময় হঠাৎ তার নজরে পড়ে গেলো যতীন্দ্র সেনের লাশের পাশে রক্তের মধ্যে পড়ে রয়েছে একখানা ভাঁজকরা কাগজ।

মিঃ হোসেন কাগজখানা তুলে নিয়ে পড়ে দেখলেন– একি, এ যে দস্যু বনহুরের চিঠি!

সবাই দেখলো কাগজখানায় লেখা রয়েছে,

'পাপের প্রায়শ্চিত্ত' –দস্যু বনহুর

এতক্ষণে সকলের কাছে ব্যাপারটা খোলসা হয়ে গেল। অন্ধ রাজা মোহন্ত সেনকে প্রজাগণ শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস করতো। যতীন্দ্র সেনের নিহত হওয়ার ব্যাপার নিয়ে সকলের মনেই যে একটা বিস্ময়কর প্রশ্নের উদয় হয়েছিল, সেটা এক্ষণে সমূলে দূরীভূত হল।

একবাক্যে বললো সবাই আমাদের রাজা কোনদিন এমন কাজ করতে পারেন না।

দস্যু বনহুরেরই এ কাজ। প্রজাগণ মুখে কিছু না বললেও মনে মনে জানে, যতীন্দ্র সেন অত্যন্ত দুষ্ট এবং কুচক্রী ছিল। দস্যু বনহুর তাকে হত্যা করে ভালোই করেছে।

মিঃ হোসেন যতীন্দ্র সেনের বাড়ি তল্লাশি করে আরও দেখলেন যতীন্দ্র সেনের লোহার সিন্দুক শূন্য পড়ে আছে। টাকা-পয়সা-অলঙ্কার সব উধাও হয়েছে। এও যে দস্যু বনহুরের কাজ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মিঃ হোসেন লাশ চালান দিয়ে নিজেও রওয়ানা হলেন। পুলিশ মহলে একেই দস্যু বনহুর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার ওপর পর পর দুটি খুন– চাঁদপুরের জমিদার হত্যা আর যতীন্দ্র সেনের নিহত হওয়ার ব্যাপার নিয়ে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো!

এত পাহারা, এত সাবধানতা সত্ত্বেও দস্যু বনহুর তার কাজ যথাযথ সমাধা করে চলেছে। পুলিশবাহিনী কোন সমাধানই করতে সক্ষম হচ্ছে না।

মিঃ জাফরী এবং পুলিশমহল দস্যু বনহুরের জন্য ভীষণ আশঙ্কিত হয়ে পড়লেন।

পর পর দুইটি হত্যার ব্যাপারে জোর তদন্ত শুরু হল।

.

দস্যু বনহুর যতীন্দ্র সেনের সিন্দুক থেকে লুণ্ঠিত টাকা-পয়সা-অলঙ্কার নিয়ে এসে দীনহীন, গরিব-দুঃখীদের বিলিয়ে দিতে লাগলো। যাদের খাবার নেই তাদের অন্নের সংস্থান করলো। যাদের পরিধেয় বস্ত্র নেই, তাদের বস্ত্র দিল। দস্যু বনহুর উন্মত্ত নেশায় মেতে উঠলো। ধনীদের ধনরত্ন কেড়ে নিয়ে বিলিয়ে দিতে লাগলো অনাথদের মধ্যে।

ধনীরা যেমন দস্যু বনহুরের ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠতে লাগলো, তেমনি দুঃখীগণ দস্যু বনহুরের নামে হৃদয়ে অনাবিল এক আনন্দ উপভোগ করতে লাগলো।

দস্যু বনহুর মেতে রইল তার খেয়াল নিয়ে। লুণ্ঠিত দ্রব্য দীন-দুঃখীদের বিলিয়ে যা বেচে যেত, সব ছুঁড়ে ফেলে দিত সে নদীর জলে।

ওদিকে চৌধুরীবাড়িতে মনিরা ঝি-এর বেশে দু'দিনের বেশি আত্মগোপন করে থাকতে পারলো না। ধরা পড়ে গেলো সে মামীমার কাছে। অতি সাবধানে নিজকে বাঁচিয়ে চলাফেরা করতে লাগলো মনিরা। বড় চাচার আশঙ্কায় সদাসর্বদা চিন্তিত থাকত। কিন্তু তার নিজের চেয়েও বেশি উদ্বিগ্ন থাকতো মনিরা দস্যু বনহুরের জন্য। পত্রিকায় দস্যু বনহুর সম্বন্ধে সবকিছুই জানতে পেরেছিল সে। বনহুর যে দিনের পর দিন নরহত্যা লুটতরাজ নিয়ে মেতে রয়েছে,এ খবর সে পত্রিকা মারফতেই পেল।

দুঃখ-ব্যথায় মুষড়ে পড়লো মনিরা। সেদিনের পর থেকে প্রতিদিন প্রতীক্ষা করছিল, সে দস্যু বনহুরের– এবার নিশ্চয়ই সে সংযত হবে, সভ্য হবে সে কিন্তু মনিরার সমস্ত আশা বাসনা ধুলিসাৎ হয়ে গেল। দস্যু বনহুরের সাক্ষাৎলাভ তার ভাগ্যে জুটলো না।

সমস্ত রাত মনিরা বিছানায় শুয়ে ছটফট করে। অসহ্য একটা ব্যথা তার মনকে নিষ্পেষিত করে। চোখের পানিতে বালিশ সিক্ত হয়।

একটু শব্দ হলেই চমকে উঠে ছুটে যায় জানালার পাশে, ঐ বুঝি এলো সে।

কিন্তু সব আশা বিফল হয়, শূন্য অন্ধকারে তাকিয়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

রাত ভোর হয়ে আসে, শয্যায় লুটিয়ে পড়ে মনিরা। এতদিন ওকে ভালবাসতো– সে ভালবাসা ছিল প্রাণহীন। এখন বনহুর তার স্বামী তার সর্বস্ব।

হাহাকার করে ওঠে মনিরার হৃদয়। দিন যায়, আবার রাত আসে। রাত শেষ হয়, আবার দিন আসে। মনিরা বনহুরের প্রতীক্ষায় কেঁদে কেঁদে সারা হয়।

মরিয়ম বেগম সব বুঝেন। তিনি মনিরার হৃদয়ের ব্যথা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেন– কিন্তু কি করবেন, কোনরূপ সান্ত্বনাই তিনি দিতে পারেন না মনিরাকে। স্ত্রীর স্বামীই যে সব। স্বামী ছাড়া নারী জীবন ব্যর্থ। এ কথা তার নারী মনে সদা-সর্বদা জাগরিত রয়েছে।

মনিরার চোখের পানি মরিয়ম বেগমের মনের শান্তি কেড়ে নিল। পুত্রের চিন্তায় তিনি যতটুকু বিচলিত না হয়েছেন তার চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হলেন মনিরার জন্য।

তিনি ভেবেছিলেন, মনিরার বিয়ে হলে তিনি নিশ্চিন্ত হবেন। হয়তো তাঁর মনির ভাল হবে, দস্যুতা ছেড়ে দেবে। কিন্তু সব আশা-আকাঙ্খা তাঁর সমূলে মুছে গেল বরং আর একটা চিন্তা তাঁকে অস্থির করে তুললো। এ তিনি কি করলেন। কেন তিনি না ভেবেচিন্তে মনিরের হাতে মনিরাকে সঁপে দিলেন। অন্য কোন সুপাত্রের কাছে মনিরার বিয়ে দিলে সুখী হত, সে সব সময় স্বামীকে পাশে পেত-এর চেয়ে আনন্দ আর কি আছে।

একদিন মনিরাকে কাছে নিয়ে বললেন মরিয়ম বেগম–মা মনিরা, একি হলো। একি করলাম আমি। ভাল ভেবে তোকে আমি ওর হাতে তুলে দিলাম, কে জানতো সে তোকে ভুলে যাবে আমি ওকে অভিশাপ দেবো...

না না, ও কথা তুমি মুখে এনো না মামীমা। আমি সব ব্যথা সইতে পারবো কিন্তু ওর অমঙ্গল সইতে পারবো না। সইতে পারবো না মামীমা।

রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠেন মরিয়ম বেগম– নরাধম তোকে এমনি করে কাঁদাবে?

এ কাঁদায় তবু আনন্দ আছে মামীমা। আমি যদি সত্যিই তার স্ত্রী হয়ে থাকি, নিশ্চয়ই সে একদিন না একদিন আসবে।

মনিরার এত আশা, এত স্বপ্ন সফল হলো না। বনহুর নিজকে নিয়েই মেতে রয়েছে, কোন কথা ভাবার সময় নেই। পুলিশ বাহিনীর শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে নিজের কাজ সমাধা করে চললো সে।

মনিরা ঘরে বসে পত্রিকা পড়ে জানতে পারল সব।

একদিন রাতে মনিরা মামীমার কক্ষে গিয়ে হাজির হলো, বললো সে– মামীমা, আমাকে অনুমতি দাও। ওকে একবার দেখে আসি।

অবাক কণ্ঠে বললেন মরিয়ম বেগম–পাগলী মেয়ে–এও কি সম্ভব। যার সন্ধানে শত শত পুলিশবাহিনী অহরহ সন্ধান চালিয়েও কোন হদিস পাচ্ছে না, আর তুই তাকে খুঁজে বের করতে পারবি?

পারবো, আমি পারবো তাকে খুঁজে বের করতে। তুমি শুধু অনুমতি দাও মামীমা।

তবে সরকার সাহেবকে নিয়ে যা।

না, আমি একাই যাব।

সেকি মা!

ভয় করো না। তোমার পুত্রবধু যদি হয়ে থাকি তবে কেউ আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

দীন-দুঃখী গরিবদের মধ্যে মনিরাও এসে দাঁড়ালো। শরীরে তার ছিন্ন বসন। চুলগুলো রুক্ষ, গায়ে-পায়ে ময়লা জমে রয়েছে। তাকে দেখলে কেউ চিনতেই পারবে না এই সেই মনিরা।

আজ কতদিন হলো মনিরা গৃহত্যাগ করে দস্যু বনহুরের সন্ধানে বেরিয়েছে। পথে-ঘাটে, মাঠে শহরে-গ্রামে কত জায়গাই না খুঁজেছে সে বনহুরকে। রাতের পর রাত ধনীদের বাড়ির আশে পাশে ধর্ণা দিয়েছে,যদি সে দস্যুতা করতে আসে। গরিব-ধনী-দুঃখীদের মধ্যেও দিন কাটিয়েছে। যদি সে দান করতে আসে। আশায় আশায় পথে পথে ফিরছে মনিরা একটিবার তার দেখা যদি পায়। কিন্তু সব আশা, সব বাসনা মুছে গেল, দেখা পেল না তার জীবন সাথীর।

সেদিন হঠাৎ শুনলো পাশের গ্রামে একটা ভোজসভা হবে। সেখানে শুধু গরিবদের খাওয়ানো হবে। খাওয়া শেষে সেখানকার জমিদারপুত্র গরিবদের মধ্যে টাকা-পয়সা দান করবেন।

আজ দু'দিন অনাহারে অনিদ্রায় মনিরা একেবারে ভেঙে পড়ার মত হয়েছে? পয়সা-কড়ি যা সংগে এনেছিল সব শেষ হয়ে গেছে। কজেই মনিরার দু'দিন সম্পূর্ণ অনাহারে কাটছে। দুঃখ সইবার মত ক্ষমতা তার আছে, কিন্তু এত কষ্ট কোনদিন সে পায় নি। অনাহার কাকে বলে জানে না মনিরা। চাইবার অভ্যাস তার কোন কালেই নেই। ছোটবেলা হতেই সে রাজকন্যার মত সুখে। স্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ হয়েছে। হঠাৎ এই অবস্থার জন্য মোটেই সে প্রস্তুত ছিল না। ভেবেছিল মনিরা, ওকে খুঁজে বের করা তার পক্ষে কঠিন হবে না এবং বেশিদিনও লাগবে না। কিন্তু সব আশা তার। বিফল হয়েছে।

আজ কদিন ঘুরে ঘুরে মনিরা হতাশায় ভেঙে পড়লো। আর যখন তার চলার মত শক্তি নেই তখন জানতে পারলো, পাশের গ্রামে একটা ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। ক্ষুধায় এত কাতর হয়ে পড়েছিল যে কিছু ভাববার সময় তার নেই। দীন-দুঃখীদের মধ্যে সেও গিয়ে দাঁড়ালো ভোজসভায়।

সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছে সবাই। কেউ ভাঙা থালা, কেউ বাটি, কেউ কলার পাতা হাতে নিয়ে প্রতীক্ষা করছে খাবারের।

মনিরার থালা নেই, কলার পাতাও সে সংগ্রহ করতে পারেনি। লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে ঘোমটায় মুখ ঢেকে হাত পেতে দাঁড়ায় সে।

ওদিক থেকে দু'জন লোক খাবার দিয়ে যাচ্ছে। সবাই সারিবদ্ধভাবে খাবার নিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে একজন তাদের হাতে কিছু কিছু পয়সা তুলে দিচ্ছে।

মনিরার শুধু হাতে খাবার দিতে গিয়ে বলে ওঠে একজন–কিগো, কিসে খাবার নেবে –হাতে দেব?

মনিরা নিশ্চুপ। হাতে খাবার কি করে নেবে। তাই হাত গুটিয়ে নেয়।

লোক দুটি মনিরাকে লক্ষ্য করে বলে ওদিকে যাও, পয়সা পাবে।

মনিরা রিক্তহস্তে অন্যদের সংগে এগিয়ে গেল।

সবাইকে পয়সা দেওয়া হচ্ছে।

মনিরাও হাত পাতলো।

সঙ্গে সঙ্গে কে একজন বললো–এ মেয়েটি খাবার পায় নি, একে খেতে দাও।

মনিরা চোখ তুলে তাকালো, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় খুব কাতর হয়ে পড়েছিল মনিরা কাজেই সে অমত করতে পারলো না।

একটা লোক মনিরাকে লক্ষ্য করে বলল–এদিকে এসো, খাবার দিচ্ছি।

মনিরা কোনরূপ দ্বিধা না করে লোকটাকে অনুসরণ করলো।

যে কক্ষে মনিরা লোকটার সঙ্গে প্রবেশ করলো সেটা একটা মাঝারি রকমের খাবার ঘর। টেবিলে নানা রকমের খাদ্যদ্রব্য থরে থরে সাজানো। মনিরা কতদিন এমন খাবার খায়নি।

লোকটার ইংগিতে মনিরা একটা টেবিলের পাশে এসে বসলো। খানসামা গোছের লোক একটা প্লেটে অনেক রকম খাবার এনে মনিরার সম্মুখে রাখলো।

লোকটা মনিরাকে বললো–খাও।

মনিরা যদিও মনে মনে অবাক না হয়ে পারলো না, তবু ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছিল বলে গোগ্রাসে খেতে শুরু করলো।

খাওয়া শেষ করে মনিরা উঠে দাঁড়ালো। তাকালো কক্ষের চারদিকে। এতক্ষণে সে যেন অনেকটা সুস্থ বোধ করছে। কিন্তু একি! মনিরা চমকে উঠলো-দরজা বন্ধ কেন? আর ঐ লোকটা গেল কোথায়?

মনিরা এতক্ষণ খাবার খেয়ালে ছিল, কোনদিকে লক্ষ্য করে নি। ঘরে কাউকে না দেখে ভীত হয়ে পড়লো। হঠাৎ এমন করে এখানে আসা তার ঠিক হয় নি। এবার বুঝতে পারলে নিশ্চয়ই কোন দুষ্টলোক তাকে কায়দায় আটক করেছে। এখন উপায়?

মনিরা অস্থিরচিত্তে জোরে জোরে কক্ষের দরজায় আঘাত করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পূর্বের সুস্বাদু খাবারগুলো এখন তার কাছে বিষাক্ত বলে মনে হতে লাগলো।

অনেক চেষ্টা করেও মনিরা দরজা খুলতে সক্ষম হলো না। হতাশ মনে সে চুল ছিঁড়ে। হাতের মাংস কামড়ে রক্ত বের করে ফেললো।

হঠাৎ পেছনে পদশব্দ শুনতে পেয়ে চমকে ফিরে তাকালো।

সেই লোকটা দাঁড়িয়ে দেখতে পেল মনিরা, যে লোকটা তাকে প্রথম খাবার দিতে বলেছিল।

মনিরা রাগত কণ্ঠে বলে ওঠে– আমাকে তোমরা আটক করেছে কেন? আমি ভিখারী মেয়ে, আমাকে ছেড়ে দাও।

লোকটা মৃদু হাসলো, বললো–তোমাকে আর যেন ভিক্ষে না করতে হয় তার ব্যবস্থা করবেন আমাদের মনিব।

কেন আমি তার দয়া নেব?

আমাদের মনিবের তোমার ওপর খুব দরদ।

মনিরা ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠলো। নিশ্চয়ই কোন কুমতলব এঁটেছে এরা। বললো তোমার মনিবের দরদ চাই না। আমাকে ছেড়ে দাও, আমি চলে যাই।

এসো আমার সঙ্গে। লোকটা বললো।

মনিরা মনে মনে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। এমন যে একটা বিপদে পড়ে যাবে ভাবতে পারেনি সে। তবু এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বিপদ আরও বাড়ানোর চেয়ে লোকটার সাথে যাওয়া ভাল মনে করলো।

সে লোকটার সঙ্গে এগুলো।

কয়েকটা কক্ষের মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকটা দরজা পেরিয়ে মনিরাকে সঙ্গে করে লোকটা এখন সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করলো।

মূল্যবান আসবাবপত্রের কক্ষটা সুন্দর করে সাজানো। লোকটা বললো– তুমি এখানে অপেক্ষা করো। আমার মনিব এক্ষুণি আসবেন।

মনিরা অস্থিরকণ্ঠে বললো– না না, আমি তোমার মনিবের সঙ্গে দেখা করতে চাই না, আমি তোমার মনিবের সঙ্গে দেখা করতে চাই না, আমাকে যেতে দাও–

মনিরার কথা শেষ হয় না, একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পায় সে চমকে ওঠে মনিরা, তার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। চোখ তুলে তাকাতেই দু’চোখ তার ছানাবড়া হয়। একটা অর্ধবয়স্ক লোক, শরীরে তার মূল্যবান রাজ-রাজার পোশাক, মাথার চুলে পাক ধরেছে, দুটো গোঁফ ঝুলে আছে নাকের দু’পাশে, গলায় মূল্যবান মুক্তার হার। মুখে মৃদু হাসি। মনিরার দিকে এগুচ্ছে সে। ভয়ে মনিরা পিছু হটে। ফিরে তাকায় মনিরা পূর্বের সেই লোকটা উধাও হয়েছে। বুক ধক্ ধ করতে শুরু করে।

লোকটা এগিয়ে আসছে তার দিকে।

মনিরা নিরুপায়ের মত তাকায় কক্ষের চারদিকে। এতটুকু ভরসা সে পায় না নিজকে রক্ষা করার। মনে মনে খোদাকে স্মরণ করে সে।

হঠাৎ তার নজরে পড়ে, ওদিকে দেয়ালে একটা সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা টাঙানো রয়েছে। মনিরার মনে কিঞ্চিৎ ভরসা হয়। কোনরকমে ঐ ছোরাখানার নিকটে

পৌঁছতে পারলে সে একবার দেখে নিত। হয় ওর প্রাণ নেবে, নয় নিজের জীবন বিসর্জন দেবে মনিরা। কেউ জানবে না কোথায় হারিয়ে গেছে সে।

লোকটা যতই এগুচ্ছে মনিরা ততই পিছু হটছে, একটু একটু করে সরে যাচ্ছে সে ওদিকে দেয়ালের দিকে।

লোকটা মনিরাকে ধরতে গেলে। অমনি মনিরা পিছু হটতে গিয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

লোকটা এবার ধরে ফেলল মনিরাকে, আকর্ষণ করলো নিজের দিকে।

মনিরা খুব জোরে লোকটার হাত কামড়ে দিল।

অসহ্য যন্ত্রণায় লোকটা অস্ফুট শব্দ করে উঠলো। ছেড়ে দিল ওকে।

মনিরা তৎক্ষণাৎ মরিয়া হয়ে ছুটে গিয়ে দেয়াল থেকে ছোরাখানা তুলে নিল, তারপর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বললো– এবার এসো তুমি আমার কাছে। তোমার রক্ত আমি শুষে নেব এটা দিয়ে।

লোকটার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। কোন কথা বললো না সে। তার হাত থেকে তখন ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। মনিরার দাঁতের আঘাতে লোকটার হাতে বেশ ক্ষত হয়ে গিয়েছিল।

লোকটা মনিরার দিকে না এগিয়ে বললো– এখনকার মত আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। যুবতী। আবার আসবো।

মনিরা দাঁতে দাঁত পিষে বললো– এই ছুরি তখন তোমার জবাব দেবে।

বেশ, তাই হবে। লোকটা বেরিয়ে যায় কক্ষ থেকে।

মনিরা ছুটে আসে দরজার পাশে, ততক্ষণে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

মনিরা কি করবে ভেবে পায় না। আত্মহত্যা করবে কি? হাতের সূতীক্ষ্ণধার ছোরাখানার দিকে তাকায় মনিরা। এখনই লোকটাকে ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে পারে সে। লৌহশিকলেও তখন তাকে কেউ আটকাতে সক্ষম হবে না, বন্ধ ঘরে শুধু পড়ে থাকবে তার প্রাণহীন দেহটা।

অনেকক্ষণ ধরে ভাবলো মনিরা। নিজেকে রক্ষা করার মত কোন পথই সে খুঁজে পেল না। মৃত্যু ছাড়া এখন তার রক্ষা নেই।

হঠাৎ দরজা খুলে গেল।

মনিরা সচকিতভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, এখনও তার হাতে রয়েছে সেই ছোরাখানা।

সেই রাজাধিরাজ আবার এসেছে। কক্ষের বৈদ্যুতিক আলোতে লোকটার পোশাক ঝকমক করছে।

মনিরার দু'চোখে আগুন ঝরে পড়তে লাগলো। এই তার শেষ মুহূর্ত– হয় লোকটাকে হত্যা করে মুক্ত হবে, নয় নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে এ জীবনের সমাপ্তি ঘটাবে। প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল মনিরা।

লোকটার মুখে এখনও দুষ্টামির হাসি ফুটে রয়েছে। এবার সে মনিরাকে লক্ষ্য করে বললো মনস্থির করেছ? ভিখারিণী, তোমাকে আমি রাজরাণী করবো।

তোমার মত রাজাকে আমি ঘৃণা করি, অর্থের লোভ দেখিয়ে তুমি এভাবে মেয়েদের সর্বনাশ কর।

কি, এতবড় কথা তুমি বললে আমাকে।

লোকটা এবার খপ করে মনিরাকে ধরে ফেললো। মনিরা নিজকে রক্ষার জন্য ছোরাখানা বসিয়ে দিতে গেল লোকটার বুকে।

লোকটা চট করে তার বলিষ্ঠ মুঠায় মনিরার ছোরাসহ হাতখানা ধরে ফেলল। তারপর অতি সহজে মনিরার কোমল হাতের মুঠা থেকে ছোরাখানা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে।

মনিরা আপ্রাণ চেষ্টায় নিজকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো। লোকটা ততক্ষণে মনিরার নাকের ওপর একটা ঔষধ মেশানো রুমাল চেপে ধরলো।

ধীরে ধীরে মনিরা এলিয়ে পড়লো সেই রাজাধিরাজ লোকটার বলিষ্ঠ বাহুর ওপর।

.

মনিরাকে বিদায় না দিয়ে সেদিন উপায় ছিল না মরিয়ম বেগমের। এমন জেদী মেয়ে, যা সে জেদ ধরবে তা করবেই। তা ছাড়া মনিরের জন্য সে যে রকম অস্থির হয়ে পড়েছিল তাতে মরিয়ম বেগম নিজেও অত্যন্ত ভাবাপন্ন হয়েছিলেন। কাজেই মনিরাকে সেদিন তিনি কতকটা বাধ্য হয়েই বিদায় দিয়েছিলেন।

কিন্তু মনিরা চলে যাবার পরই তিনি মনে মনে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। যুবতী মেয়ে, কোথায় যাবে– কোন না কোন বিপদে পড়বে। কোথায় থাকবে, কোথায় কে তাকে আশ্রয় দেবে? তবে ভরসা ছিল মনিরা অশিক্ষিত মেয়ে নয়– জ্ঞান-বুদ্ধি তার বেশ রয়েছে, নিজেকে বাঁচিয়ে চলার মত ক্ষমতা আছে তার। কিন্তু পরক্ষণেই মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলো– তবু তো মেয়েছেলে!

বেশ কয়েকদিন যখন কেটে গেল মনিরা ফিরে এলো না, তখন মরিয়ম বেগম বিচলিত হয়ে পড়লেন।

ঘটনাটা তিনি গোপনে সরকার সাহেবকে বলেছিলেন। সরকার সাহেব তো মরিয়ম বেগমের মুখে ব্যাপারটা শুনে হতবাক হয়ে পড়েছিলেন। কিছুক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হয়নি।

তারপর বলেছিলেন– এ আপনি কি করেছেন বেগম সাহেবা! একটা মেয়েকে আপনি তার খেয়ালের বশে একা যেতে দিয়েছেন। আপনাদের দু’জনেরই কি মাথা খারাপ হয়েছিল? এর বেশি আর কিছু বলেন নি সরকার সাহেব, তিনি তখনই বেরিয়ে পড়েছিলেন মনিরার সন্ধানে।

দুদিন পর ফিরে এসেছিলেন সরকার সাহেব। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিলেন। কোন কথা তার মুখ দিয়ে বের হয় নি।

মরিয়ম বেগম আশঙ্কিত কণ্ঠে বলেছিলেন– কোন খোঁজ পেলেন না?

হতাশ কণ্ঠে বলেছিলেন সরকার সাহেব কোথায় খুঁজে পাবো! একি গরু-ছাগল যে খুঁজে বের করব? রাগে ক্ষোভে সরকার সাহেব অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। না হলে তিনি এতবড় কথাটা মনিব-গৃহিণীর সামনে বলতে পারতেন না।

মরিয়ম বেগমও আর তাকে প্রশ্ন করতে পারেন নি, নিজের ভুল তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। মনিরাকে অমনভাবে ছেড়ে দিয়ে ভুল করেছেন, বুঝতে পারেন মরিয়ম বেগম।

কাজেই নিশ্চুপ থাকা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। মরিয়ম বেগম মুখে যতই চুপ থাকতে চেষ্টা করুন না কেন, অন্তরে অন্তরে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। চোখে তার ঘুম ছিল না? নাওয়া খাওয়ার কোন ঠিক ছিল না। সব সময় মনিরার জন্য চিন্তা করতেন মরিয়ম বেগম।

সেদিন গভীর রাতে বিছানায় শুয়ে ছটফট করছেন, না জানি মেয়েটা আজ কোথায় কেমন আছে?

ভালো আছে না কোন বিপদে পড়েছে কে জানে? কে তাকে মনিরার সন্ধান এনে দেবে? মনির– সে তো আজ কতদিন হল আসে না। সেই বা কোথায় আছে কে বলবে। মরিয়ম বেগমের মনে নানা রকম চিন্তা হয়।

একমাত্র সন্তান মনির যখন ছয়-সাত বছর বয়সে ছিল তখনই মরিয়ম বেগম বুঝতে পেরেছিলেন আর কোন সন্তান তাদের হবে না। মনিরই তাদের বংশের একমাত্র সম্বল। ওকে নিয়েই মরিয়ম বেগম এবং চৌধুরী সাহেব কত আকাশকুসুম স্বপ্ন রচনা করেছিলেন। কত আশা, কত বাসনা উঁকি দিয়ে যেত সেদিন ঐ দুটি প্রাণে। পুত্রকে মানুষ করবেন, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করবেন, দশ জনের মধ্যে সে যেন একজন হতে পারে, এমনিভাবে গড়ে তুলবেন পুত্রকে। কিন্তু সব আশা তাদের ধুলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র সন্তান, নয়নের মনি, হৃদয়ের ধন মনিরকে তারা নদীবক্ষে বিসর্জন দিয়েছিলেন।

এমন কত চিন্তাই না মরিয়ম বেগমের মনে ভেসে উঠে আবার মুছে যাচ্ছিল। কিছুতেই ঘুমাতে পারছিলেন না তিনি। দেয়ালঘড়িটা টিকটিক করে বেজে চলেছে। রাত তিনটে হবে।

হঠাৎ একটা শব্দে চমকে ওঠেন মরিয়ম বেগম। দরজায় ঠক ঠক করে একটা আওয়াজ শুনতে পান তিনি।

সজাগ হয়ে বিছানায় উঠে বসেন।

আবার সেই শব্দ– ঠক্ ঠক্ ঠক্। পরক্ষণেই একটা অতি পরিচিত মধুর কণ্ঠস্বর– মা, মাগো, দরজা খোল।

মুহূর্তে মরিয়ম বেগমের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠে, এ-যে তার মনিরের কণ্ঠস্বর। এ কণ্ঠস্বর যে তার অন্তরের কানায় কানায় গাঁথা রয়েছে, এ যে তারই কণ্ঠ।

মরিয়ম বেগম ধড়মড় করে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেন। সঙ্গে সঙ্গে আর্তকণ্ঠে বলেন–একি। কি হয়েছে ওর?

তিনি দেখতে পান মনিরের হাতের ওপর ছিন্নলতার মত এলিয়ে রয়েছে মনিরার দেহখানা। বনহুর মনিরার সংজ্ঞাহীন দেহটা নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে তারপর শুইয়ে দেয় বিছানায়।

মরিয়ম বেগম অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। দু'চোখে তার অপরাধীর ছাপ ফুটে উঠেছে। কোন কথা বলবার মত সাহস তিনি পাচ্ছেন না।

বনহুর মনিরার সংজ্ঞাহীন দেহটা বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, ফিরে তাকায় মায়ের মুখের দিকে।

মরিয়ম বেগম কিছু বলতে গিয়ে থেমে যান।

বনহুর বেশ কিছুটা গম্ভীর কণ্ঠে বলে–মা, আমি জানি, মনিরা তোমার অমতে এ কাজ করেছে। কিন্তু এটা মোটেই উচিত হয় নি।

ওর কি হয়েছে বাবা?

কিছু না।

এতদিন তুই আসিনি বলেই তো....

আমি তো এ কথা তোমাকে প্রথমেই বলেছিলাম মা! আমার সঙ্গে বিয়ে হলে মনিরা কোনদিন সুখী হতে পারবে না।

মনির!

মা, তুমি জানো না আমার জীবন কত বেদনাময়। কত সময় আমি নিজেকে খুঁজে পাই না, হারিয়ে যাই কোন অজানার মধ্যে। এ বিয়েতে শুধু মনিরাই নয়, তুমিও কোনদিন সুখী হতে পারবে না।

মনির, এসব তুই কি বলছিস? আগে বল, মনিরার অমন অবস্থা কেন? কি হয়েছে ওর?

তুমি ব্যস্ত হচ্ছো কেন মা, তোমার মনিরা ভালই আছে, এখনই ওর জ্ঞান ফিরে আসবে। কিন্তু এভাবে ওর যাওয়া মোটেই ঠিক হয় নি।

কি জানি বাবা, এতসব আমার কপালে ছিল! আমি কত করে বারণ করেছি তবু শুনলো না, বললো কি জানিস আমি যদি তোমার পুত্রবধু হয়ে থাকি তবে যেখানেই থাকি কেউ আমার ক্ষতি করতে পারবে না। হঠাৎ মনিরার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন মরিয়ম বেগম– ঐ যে মার আমার জ্ঞান ফিরে এসেছে।

বনহুর একপাশে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়েছিল, মনিরাকে চোখ মেলতে দেখে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়।

মরিয়ম বেগম ঝুঁকে পড়েন মনিরার মুখের ওপর– মা মনিরা, এখন কেমন লাগছে মা?

মামীমা, আমি বাড়িতে এলাম কি করে। মনিরা উঠে বসতে যায়।

মরিয়ম বেগম ওকে শুইয়ে দিয়ে বললেন– সব জানতে পারবি, এখন শুয়ে থাক বাছা।

না মামীমা, তুমি বলো, আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে বনহুর– তোমার জীবনের সবই স্বপ্ন মনিরা, খেয়ালের বশে তুমি সব…………

এতক্ষণ মনিরা বনহুরকে লক্ষ্য করেনি, এবার কি যে এক আনন্দ শিহরণ বয়ে যায় তার শিরায় শিরায়। নির্ণিমেষ নয়নে তাকায় মনিরা ওপাশে দাঁড়ানো বনহুরের দিকে।

মরিয়ম বেগম বললেন– মনিরার জন্য একটু দুধ গরম করে আনিগে।

বেরিয়ে যান তিনি। মনিরা শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়, যদিও মাথাটা তার এখনও ঝিমঝিম করছে তবু উঠে গিয়ে বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে বলল, তুমি কোথায় ছিলে এতদিন? বলো জবাব দাও?

আমাকে তুমি ভুলে যাও মনিরা।

মনির! একি বলছো তুমি!

প্রথমেই বলেছিলাম, যা করছে তাতে তুমি সুখী হবে না।

কে বললো আমি সুখী নই?

সুখীই যদি হবে তাহলে এভাবে ঘর ছেড়ে....

তা তো তোমারই জন্য। কিন্তু..... কিন্তু আমি এখানে এলাম কি করে। কোথায় সেই রাজ প্রাসাদ, কোথায় সেই নরপিশাচ যে আমাকে...... ও বুঝেছি, তুমি– তুমিই আমাকে ওর হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছ। এবার আমি সব বুঝতে পারছি। সত্যি মনির এ যে আমি কল্পনাও করতে পারছি না–

মনিরাকে সরিয়ে দিয়ে গম্ভীর গলায় বলে ওঠে বনহুর– যদি বলি তোমাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছি।

মনিরার মুখমণ্ডল মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে ওঠে, বনহুরের জামার আস্তিন থেকে হাতখানা খসে আসে ধীরে ধীরে। দৃষ্টি নত করে নেয় মনিরা। নিজকে একটা নগণ্য কীটের চেয়ে হীন বলে মনে হয় তার। একি শুনলো সে। তবে কি সে ঐ নরপিশাচের হাত থেকে পরিত্রাণ পায় নি। ভয়ে শিউরে উঠলো মনিরার হৃদয়, ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার মুখ, একটা ঝড় বইতে শুরু করলো ওর মনে।

বনহুর মনিরার মুখোভাব লক্ষ্য করে বুঝতে পারলো, তার মনে প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হয়েছে।

বনহুর এগিয়ে এলো মনিরার দিকে, বললো– এমন ভুল আর কোনদিন তুমি করবে না। ধরতে গেল বনহুর মনিরাকে। মনিরা অমনি সরে দাঁড়ালো, তীব্রকণ্ঠে

বলে উঠলো “না না, তুমি আমাকে স্পর্শ করো না। সত্যিই যদি আমার এ দেহ কলুষিত হয়ে থাকে আমাকে যদি কোনো পর পুরুষ স্পর্শ করে থাকে, তবে এ জীবন নিয়ে আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না। তোমার পবিত্র দেহ আমি অপবিত্র করতে চাই না। স্পর্শ করো না–করো না আমাকে.– মনিরা ছুটে যায় মুক্ত জানালার দিকে, লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে সে।

বনহুর মনিরার মনোভাব বুঝতে পেরে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে খপ করে ধরে ফেলে ওকে।

মনিরা বলে ওঠে– না না, ছেড়ে দাও আমাকে..... মনিরা জোর করে বনহুরের হাত ছাড়িয়ে নিতে যায়। অমনি নজরে পড়ে বনহুরের হাতের পিঠে একটা ক্ষত তখনও রক্তের দাগ রয়েছে। চমকে ওঠে মনিরা, এ যে তারই দাঁতের কামড়ানোর চিহ্ন। মনিরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বনহুরের হাতের ক্ষতটার দিকে।

বনহুর বুঝতে পারে, মনিরার মনে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে মনিরা।

বনহুর হেসে বললো– এ তোমারই দেওয়া পুরস্কার।

মনিরা বিস্ময়ভরা চোখে তাকায় বনহুরের উজ্জ্বল দীপ্ত মুখমণ্ডলের দিকে, বলে ওঠে — তবে কি, তবে কি সেই রাজা–

হ্যাঁ মনিরা, সেই মহারাজ আর কেউ নয়– দস্যু বনহুর।

অস্ফুট ধ্বনি করে বনহুরের বুকে মুখ লুকালো মনিরা। অনাবিল একটা আনন্দ তার মনকে সচ্ছ করে দিল। এত আনন্দ বুঝি জীবনে মনিরা কোনোদিন পায় নি। আত্মহারা হয়ে গেল সে। বেশ কিছুক্ষণ লাগলো মনিরার নিজকে সামলে নিতে। তারপর বললো– কেন তুমি আমাকে। এভাবে পরীক্ষা করতে গেলে?

তোমার ভুলের জন্য কিছুটা শাস্তির প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু তুমিও কম শাস্তি পাওনি। দেখো তো ভয়ানক ক্ষতটা হয়েছে। ইস্ কত কষ্ট তুমি পেয়েছো, এসো ঔষধ লাগিয়ে বেঁধে দিই।

মনিরা বনহুরকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে, ঔষধ এনে সুন্দর করে হাতের ক্ষতটা বেঁধে দিতে লাগলো।

এমন সময় মরিয়ম বেগম দুটি গ্লাসে গরম দুধ নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করেন। কক্ষে প্রবেশের আগে একটু কেশে তিনি নিজের উপস্থিতি জানিয়ে দেন বনহুর ও মনিরাকে।

মনিরা বনহুরের হাতের ক্ষত বেঁধে দিয়ে সরে দাঁড়ায়।

মরিয়ম বেগম আতঙ্কভরা কণ্ঠে বলে ওঠেন–ওকি, মনিরের হাতে কি হয়েছে?

বনহুরই জবাব দেয়– গোলাপের কাঁটা ফুটেছিল মা।

সেকি বাবা, গোলাপের কাটা?

হ্যাঁ মা। জানো মা, ঐ গোলাপ তুলতে গেলে কাঁটার আঘাত খেতে হয়। হাত বাড়ায় বনহুর। মায়ের দিকে-দাও।

মরিয়ম বেগম ছেলের হাতে দুধের গ্লাসটা দিয়ে অন্য গ্লোসটা মনিরার দিকে বাড়িয়ে ধরেন নাও মা, খেয়ে নাও।

মনিরা দুধের গ্লাস হাতে নেয়।

মরিয়ম বেগম সেই ফাঁকে বেরিয়ে যান। অনাবিল এক আনন্দে তাঁর মাতৃহৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বনহুর দুধের খালি গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে মনিরাকে টেনে নেয় কাছে। বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে সে– আজ কামড়ে দেখ। উঃ কি সাংঘাতিক মেয়ে তুমি!

নাগিনীর চেয়েও সাংঘাতিক তাই না?

তার চেয়েও ভয়ঙ্কর।

পুলিশের রাইফেলের চেয়েও আমার দাঁত মারাত্মক অস্ত্র। দুধর্ষ দস্যু বনহুরকেও ঘায়েল করতে পারে।

হাসে ওরা দুজন।

মনিরা বলে– কেন তুমি আমাকে এতদিন ভোগালে?

আমার ইচ্ছাকৃত কিছুই নয় মনিরা।

বড় নির্দয় তুমি।

সেকি তুমি আজ নতুন করে আবিষ্কার করলে?

তাই বলে তুমি আমাকে এমনি করে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাঁদাবে? আমি জানি তোমাকে যে-ই ভালবেসেছে সেই কেঁদেছে, তাই বলে তুমি সবাইকে কাঁদাবে?

আমি তো বললাম ইচ্ছাকৃত আমার কিছুই নয়। মনিরা, তুমি বুঝবে না আমি কত নিষ্ঠুর, কত হৃদয়হীন।

সব আমি জানি।

সব জেনেও তুমি আমাকে ভালবাসতে পার? সত্যি বড় আশ্চর্য মেয়ে তুমি।

তার চেয়ে আশ্চর্য তুমি। নরহত্যা আর লুট ছাড়া তোমার কি অন্য কাজ নেই? কেন হত্যা করো, বলো কেন, বলো কেন তুমি হত্যা করো? হত্যার নেশায় তুমি পাগল হয়ে যাও কেন?

বনহুরের মুখমণ্ডল গম্ভীর কঠিন হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললো– অন্যায় আমার কোনদিন সহ্য হয় না মনিরা। অন্যায়কে আমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারি না। শুধু হত্যাই নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমি সব করতে পারি।

মনির।

বল?

তুমি কি কোনদিন শান্ত হবে না?

বোধ হয় না।

চিরদিন তুমি লুট আর হত্যা নিয়েই থাকবে?

যদি থাকতে হয় থাকবো। মনিরা, তুমি কোনদিন আমার কাজে বাধা দিতে এসো না। তাহলে যেটুকু আমাকে পেয়েছে তাও পাবে না।

উহ! এ কথা বলতে তোমার এতটুকু বাঁধলো না। তোমাকে না পাওয়ার ব্যথা যে আমার কাছে মৃত্যুর চেয়েও বেদনার।

মনিরা।

বল?

আর কোনদিন তুমি আমার সন্ধানে যাবে না।

তুমি যদি এসো, কোনোদিন আমি যাবো না।

আসবো, তোমাকে ছেড়ে কি আমি থাকতে পারবো মনিরা?

আচ্ছা বলতো, সেদিন তুমি কি করে আমায় চিনে অমনভাবে আটক করেছিলে?

আমার চোখে শিয়ালের মত ধূর্ত নাথুরাম কোনদিন ধূলো দিতে পারেনি– আর তুমি দেবে? যেদিন তুমি এভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছ, ঐ দিনই আমি সংবাদ পেয়েছি। তুমি একা একা ঘুরে বেড়ালেও আমার লোক সব সময় তোমার পেছনে পেছনে ছায়ার মত ছিল।

এতসব জেনেও তুমি আমাকে এত ভুগিয়েছ?

দেখতে চেয়েছিলাম, কতদূর তুমি সহ্য করতে পারো।

পাষণ্ড কোথাকার।

ইচ্ছা করে তোমাকে ধরা না দিলে কোনদিন তুমি আমার দেখা পেতে না, কাজেই আর কোনদিন তুমি অমন কাজ করবে না।

বেশ, করবো না।

হ্যাঁ, মনে রেখ মনিরা, আমি তোমারই।

মনির। সত্যি আজ আমার কি আনন্দ–মনিরা বনহুরের বুকে মাথা রাখলো।

.

পুলিশ সুপার মিঃ আহমদ হুঙ্কার ছাড়লেন– আমাদের পুলিশমহল কি এতই অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে যে, দস্যু বনহুর তাদের চোখের সামনে লুটতরাজ আর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে যাচ্ছে। আর তার কোনই সুব্যবস্থা হচ্ছে না– এসব কি পুলিশমহলের কলঙ্কের কথা নয়!

পাশাপাশি কয়েকখানা চেয়ারে বসেছিলেন মিঃ জাফরী, মিঃ হোসেন, মিঃ শঙ্কর রাও, মিঃ হারেস, মিঃ হামিদ এবং মিঃ হারুন। সকলের মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাবাপন্ন। একটা অস্বস্তির ছাপ যেন। সকলের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে।

মিঃ জাফরীর ললাটে গভীর চিন্তা রেখা। তাঁর জীবনে এই প্রথম পরাজয়। দস্যু বনহুরকে তিনি হাতের মুঠোয় পেয়েও গ্রেফতার করতে সক্ষম হলো না, এর চেয়ে লজ্জার আর কি হতে পারে!

মিঃ জাফরী বললেন– স্যার, আমি শপথ করছি, এবার আমি দস্যু বনহুরকে যদি পাকড়াও করতে না পারি, তাহলে পদত্যাগ করবো।

কক্ষস্থ সকলে একসঙ্গে তাকালেন মিঃ জাফরীর ভাবগম্ভীর কঠিন চেহারার দিকে। অগ্নিদগ্ধ। ইস্পাতের মত রাঙা হয়ে উঠেছে তার মুখমণ্ডল।

কিছুক্ষণ কক্ষে নিস্তব্ধতা বিরাজ করে।

মিঃ জাফরীর এই শপথ গ্রহণ সকলের মনেই একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে।

পুলিশ সুপার মিঃ আহমদ এবার মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললেন– থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ জাফরী, আপনি নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে কৃতকার্য হবেন বলে আশা করি। তারপর অন্যান্য পুলিশ অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললেন– আপনারা তাঁকে সাহায্য করবেন।

মিঃ হারুন সকলের পক্ষ হয়ে বললেন– নিশ্চয়ই করবো স্যার, আমরা সর্বান্তকরণে তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবো।

এরপর বিদায়ের পালা।

মিঃ জাফরী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার যে যার গাড়িতে গিয়ে বসলেন।

মিঃ জাফরীর গাড়ি বাসার দিকে না গিয়ে শঙ্কর রাওয়ের গাড়ি খানাকে অনুসরণ করলো।

মিঃ রাও বারান্দায় গাড়ি রেখে নেমে দাঁড়াতেই মিঃ জাফরীর গাড়ি প্রবেশ করলো সেখানে।

মিঃ রাও অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন– স্যার আপনি!

জরুরি কথা আছে, আসুন ভেতরে গিয়ে বসি। মিঃ জাফরী গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেন।

মিঃ জাফরী এবং শঙ্কর রাওয়ের মধ্যে বহুক্ষণ গোপনে আলোচনা চললো।

তারপর সেদিনের মত শঙ্কর রাওয়ের বাসা থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন মিঃ জাফরী।

হোটেল রক্সি!

শহরের সেরা হোটেল।

কত লোক আসছে যাচ্ছে, তার কোন হদিস নেই।

হোটেলের একপাশের টেবিলে বসে চা পান করছেন দু'জন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক। চা পানের ফাঁকে ফাঁকে নিম্নস্বরে কিছু আলাপ আলোচনা হচ্ছিল তাঁদের মধ্যে।

মাড়োয়ারীদ্বয় যে বেশ ধনী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

চা পান শেষ করে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলেন মাড়োয়ারীদ্বয়, এবার তারা একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসলেন। বয়স্ক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি ড্রাইভারকে বললেন– ন্যাশনাল ব্যাংকে চলো।

ট্যাক্সি ন্যাশনাল ব্যাংকের উদ্দেশ্যে ছুটতে শুরু করলো।

অল্পক্ষণেই এপথ সেপথ ঘুরে ব্যাংকের সামনে এসে গাড়ি থামালো।

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক দু'জন গাড়ি থেকে নেমে ব্যাঙ্কের ভেতরে প্রবেশ করলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো পূর্বের গাড়িখানার পাশে। একটা যুবক গাড়ি থেকে নেমে সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো, তারপর অগ্রসর হলো ব্যাংকের দিকে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর যুবক ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো। গাড়ি চলতে শুরু করলো।

যুবকের গাড়ি চলে যেতেই, মাড়োয়ারী ভদ্রলোকদ্বয় এটাচ ব্যাগ হাতে গাড়িতে এসে বসলেন।

এটাচ ব্যাগটা তাদের একজনের হাতে আগে থেকেই ছিল, এবার ব্যাগটা বেশ ভারী বলে মনে হচ্ছে।

গাড়িতে মাড়োয়ারী ভদ্রলোকদ্বয় বেশ হেসে হেসে আলাপ করছিলেন।

হঠাৎ মাড়োয়ারীদ্বয়ের একজন নিচে তাকিয়ে দেখতে পান একটা ভাঁজকরা কাগজ পড়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি কাগজখানা হাতে তুলে নিয়ে মেলে ধরেন চোখের সামনে। দ্বিতীয়জনও তাকান সেইদিকে। কাগজখানায় গাঢ় লাল কালিতে লেখা?

যে বিশ হাজার টাকা তোমরা নিয়ে যাচ্ছে তা থেকে আমাকে কমপক্ষে দশ হাজার দিতে হবে। নচেৎ তোমাদের মৃত্যু অনিবার্য। এই গাড়ির মধ্যেই আমার প্রয়োজনীয় টাকা রেখে নেমে যাবে।

তোমাদের অজ্ঞাত
'বন্ধু'

মাড়োয়ারীদ্বয়ের একজন হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন– অজ্ঞাত বন্ধুই বটে!

হ্যাঁ, তা না হলে টাকা চাইবার সাহস কার আছে? কিন্তু আপনি কি মনে করেন টাকা না দিয়েই চলে যাবেন? দ্বিতীয় জন বললেন।

প্রথম মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বললেন– বন্ধু যখন টাকা চাইছে, না দিয়েই বা উপায় কি! কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ড্রাইভারের পিঠে রিভলভার চেপে ধরে চাপাকণ্ঠে বললেন– গলির মধ্যে গাড়ি নিয়ে চলো।

ড্রাইভার চমকে ওঠে। পেছন ফিরে তাকাবার সাহস হয় না তার। সামনেই গলি, সেই গলির মধ্যে গাড়ি নিয়ে যায় ড্রাইভার।

তখনও সে পিঠে হিমশীতল একটা জিনিসের অস্তিত্ব অনুভব করে। এবার সে শুনতে পায় গাড়ি থামাও!

ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে ফেলে ড্রাইভার। মুখখানা তার ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।

গাড়ি থামতেই প্রথম মাড়োয়ারী ভদ্রলোক গাড়িতে পাওয়া চিঠিখানা মেলে ধরেন তার সামনে– এ চিঠি কে রেখেছে?

ড্রাইভার চিঠির লেখাগুলোতে দৃষ্টি বুলিয়ে বলে– হুজুর, আমি এ চিঠি সম্বন্ধে কিছু জানিনা।

গর্জে ওঠেন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক নেকামি করো না, সত্য করে বলো– এ চিঠি গাড়িতে কি করে এলো?

হুজুর, আমি সত্য বলছি, ও চিঠি সম্বন্ধে কিছু জানি না।

এ গাড়ির মালিক কে?

শ্যামলাল বাবু– ঐ যে চৌ-রাস্তায় মদের দোকান আছে যার। আর বলতে হবে না।

দ্বিতীয় মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বললেন– গাড়ির মালিক এ ব্যাপারে আমার মনে হয় কিছুই জানে না।

প্রথম মাড়োয়ারী বললেন– গাড়ি ছাড়ো।

ড্রাইভার বলল– কোথায় যাব?

সেই অজ্ঞাত বন্ধুর খোঁজে। তাকে টাকা না দিয়ে যাই কি করে?

প্রথম মাড়োয়ারীর কথায় দ্বিতীয় মাড়োয়ারী বললেন– ঐ সামান্য একটা চিঠির ভয়ে দশ হাজার টাকা দেবেন?

তাছাড়া উপায় কি?

গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে।

গলি থেকে বেরিয়ে এবার বড় রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করে।

প্রথম মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটার মুখমণ্ডল কঠিন ইস্পাতের মত শক্ত হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ পাশে বিশ হাজার টাকার এটাচ ব্যাগ রেখে সামনে তাকিয়ে বসে আছেন।

ড্রাইভারকে বলে দিলেন– পার্ক রোড ধরে লেকের ধারে গাড়ি নিয়ে চলো।

ড্রাইভার সেইভাবে গাড়ি চালাতে লাগলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি নির্জন লেকের ধারে এসে থেমে পড়লো। ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে পড়লেন মাড়োয়ারী ভদ্রলোকদ্বয়। সেই গাড়িটা সামান্য কিছু অগ্রসর হতেই অন্য একটা ট্যাক্সি ডেকে তাঁরা চেপে বসলেন এবং সামনের গাড়িখানাকে ফলো করতে বললেন।

মাড়োয়ারীদ্বয়ের গাড়ি সামনের খালি গাড়িখানা থেকে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে চলতে লাগলো।

সামনের গাড়িখানা আরোহীর আশায় ধীর ধীরে চলছিল। এক জায়গায় এসে সামনের গাড়িখানা থেমে পড়লো। একটা বয়স্ক ভদ্রলোক উঠে বসলেন গাড়িখানাতে।

মাড়োয়ারীদ্বয়ের একজন ড্রাইভারকে বললেন–ঐ গাড়িখানাকে অনুসরণ করো। খুব হুঁশিয়ার হয়ে গাড়ি চালাবে, দেখো সামনের গাড়িখানা যেন টের না পায়!

ড্রাইভার জবাব দিল– আচ্ছা স্যার।

আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে সামনের গাড়িখানা এগুচ্ছে।

পেছনের গাড়িখানা। সামনের গাড়ি থেকে বেশ দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে।

প্রথম মাড়োয়ারী ভদ্রলোক দ্বিতীয় জনকে বললেন– নিশ্চয়ই আমাদের অজ্ঞাত বন্ধু তার। চাওয়া টাকার অনুসন্ধানে ব্যস্ত আছে।

আমারও তাই মনে হচ্ছে। এবার আমরা কি করতে পারি?

ঐ গাড়ির আরোহীকে আমি ফলো করবো, সে কোথায় যায় এবং কি করে দেখব।

তার পূর্বেই যদি আমাদের জন্য সে মৃত্যুর ব্যবস্থা করে?

মাথা পেতে বরণ করতে হবে।

একি! গাড়িখানা এবার নির্জন পথ ধরে একটা বস্তির দিকে এগুচ্ছে।

প্রথম মাড়োয়ারী বললেন– ড্রাইভার, এবার ঐ গাড়ির পাশ কেটে তোমাকে সামনে যেতে হবে। ঐ যে ওখানে একটা ফাঁকা জায়গা দেখছো, সেখানে তোমাকে গাড়িখানাকে পাশ কেটে উঠতে হবে।

আচ্ছা স্যার। ড্রাইভার এবার গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সামনের গাড়িখানার পাশ কেটে পেছনের গাড়ি এগিয়ে গেল।

ড্রাইভারের নিপুণ দক্ষতায় খুশি হলেন মাড়োয়ারীদ্বয়।

প্রথম মাড়োয়ারী ভদ্রলোক এবার সামনের গাড়িখানার পথ রোধ করে দাঁড়াবার নির্দেশ দিলেন।

সামনের গাড়ির বাঁধা পাওয়ায় পেছনের গাড়ি থেমে পড়তে বাধ্য হলো।

মাড়োয়ারীদ্বয় দ্রুত গাড়ি থেকে নেমে পেছনের গাড়ির আরোহী ভদ্রলোকের সামনে এসে দাঁড়ালেন, দুজন একসঙ্গে রিভলভার তুলে ধরলেন। মাড়োয়ারী ভদ্রলোক চাপাকণ্ঠে বললেন–হ্যান্ডস আপ!

দ্বিতীয় গাড়ির আরোহী মৃদু হাসলো, তারপর বললো– থ্যাঙ্ক ইউ, আপনারা দেখছি খাস মাড়োয়ারী বনে গেছেন।

মাড়োয়ারীদ্বয় মুহূর্তে হাত নামিয়ে সেলুট করলেন। তারপর কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে প্রথমজন বললেন–স্যার, মাফ করবেন, আপনাকে চিনতে পারিনি!

মিঃ জাফরী হাসলেন– এই বুদ্ধি নিয়ে আমরা দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করতে নেমেছি। মিঃ রাও, আপনার সঙ্গীটি.....

ইয়েস স্যার, আমার সহকারী গোপাল বাবু।

আচ্ছা, টাকাগুলো ঠিকভাবে উঠিয়ে নিতে পেরেছেন তো?

হ্যাঁ স্যার, টাকাগুলো ঠিকভাবেই উঠাতে পেরেছি। কিন্তু—

কিন্তু কি?

অনেক কথা আছে স্যার আপনার সঙ্গে।

আপনার গাড়ি ছেড়ে চলে আসুন এ গাড়িতে।

দ্বিতীয় মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের বেশে গোপাল বাবু বলে ওঠেন–ব্যাগটা কিন্তু এখনও গাড়িতেই রয়েছে।

হোয়াট! অবাক করলেন, টাকার ব্যাগ গাড়িতে রেখে নেমে গেছেন আপনারা।

স্যার অতি দ্রুত …

বুঝেছি ….দ্রুত আমাকে পাকড়াও করতে গিয়ে–

ততক্ষণে ড্রাইভার এটাচী হাতে এগিয়ে আসে– হুজুর, আপনারা এটা গাড়িতে ফেলেই..

দাও। মাড়োয়ারীবেশি শঙ্কর রাও ড্রাইভারের হাত থেকে এটাচীখানা নেন। তারপর গোপাল বাবুকে ওর ভাড়া মিটিয়ে দিতে বলেন।

মিঃ জাফরী একজন বয়স্ক ভদ্রলোকের ছদ্মবেশে গাড়িতে বসেছিলেন। এমন নিখুঁত ছদ্মবেশ তিনি ধরেছিলেন, তাঁকে চেনা মুস্কিল ছিল যদি নিজে কথা না বলতেন।

গোপাল বাবু যখন গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছিলেন তখন মিঃ জাফরী নিপুণভাবে লক্ষ্য করছিলেন ড্রাইভারটাকে।

শঙ্কর রাও এটাচী খুলে দেখে নিচ্ছিলেন টাকাগুলো ঠিক আছে কিনা।

না, টাকাগুলো ঠিকই রয়েছে। ড্রাইভারকে সন্দেহ করার কিছু নেই।

ড্রাইভার তার ভাড়া বুঝে নিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিতেই মিঃ জাফরী বাঘের মত হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে পড়লেন এবং রিভলভার উদ্যত করে উঠলেন– ওকে পাকড়াও করুন। পাকড়াও করুন…. সঙ্গে সঙ্গে মিঃ জাফরীর রিভলভার গর্জন করে উঠলো।

কিন্তু কি আশ্চর্য, ততক্ষণে গাড়িখানা যেন হাওয়ায় মিশে গেল, এক নিমিষে উধাও হয়েছে গাড়িটা। শুধু মিঃ জাফরীর রিভলভারের একরাশ ধোয়া ছড়িয়ে রয়েছে সেখানে।

মিঃ জাফরী হঠাৎ গাড়ির ড্রাইভারকে এভাবে আক্রমণ করায় শঙ্কর রাও এবং গোপাল বাবু হকচকিয়ে যান। তাদের টাকার একটি পয়সাও যায়নি, অথচ..

শঙ্কর রাও এবং গোপাল বাবুকে লক্ষ্য করে মিঃ জাফরী ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন– শিগগির ঐ গাড়িখানাকে ফলো করুন।

শঙ্কর রাও এবং গোপাল বাবু সামনে তাকালেন, অসংখ্য গাড়ির ভীড়ে সেই গাড়িখানা অদৃশ্য হয়েছে।

মিঃ জাফরী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

শঙ্কর রাও এবং গোপাল বাবু তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। মিঃ রাও বললেন– স্যার, ও গাড়িখানা কার?

মিঃ জাফরী রুদ্ধকণ্ঠে বললেন– দস্যু বনহুরের!

বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন শঙ্কর রাও এবং গোপাল বাবু–দস্যু বনহুর! বলেন কি স্যার!

মিঃ জাফরী বললেন–যখন এটাচীতে আপনাদের টাকা অক্ষত অবস্থায় আছে জানতে পারলাম তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল, সাধারণ লোক হলে এত সহজে সে এতগুলো টাকার লোভ সামলাতে পারত না। তখন আমি ভালভাবে লক্ষ্য করি। আলম সাহেবের বেশে বনহুরকে বেশ কিছুদিন আমি পাশে পেয়েছিলাম। কজেই তাকে চিনতে আমার বেশি কষ্ট হয় নি। কিন্তু হাতের কাছে পেয়েও পেলাম না–গ্রেফতার করতে পারলাম না। অধর দংশন করেন মিঃ জাফরী। .

কিন্তু তিনি আশ্বস্ত হন, দস্যু বনহুরকে চিনতে তার বেশি বেগ পেতে হয় নি।

মিঃ জাফরী, শঙ্কর রাও এবং গোপাল বাবু তাঁদের নিজস্ব ভাড়াটিয়া গাড়িতে উঠে বসলেন।

.

অন্ধ রাজা মোহন্ত সেন তাঁর বিশ্রামকক্ষে বসে গম্ভীরভাবে চিন্তা করছিলেন। মনে পড়ছিল তার সেদিনের কথা– সেই অজানা বন্ধু যে তাঁকে সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছিল, তার কথা।

সেদিন রাজা মোহন্ত সেন তাঁর অজানা বন্ধুকে এতটুকু ধন্যবাদ জানাবার সময়ও পান নি। সত্যি কত মহৎ, কত হৃদয়বান সেই অজানা লোকটা। এখন যদি একবার তাকে কাছে পেতেন তাহলে বুকে জড়িয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতেন। যা পুরস্কার সে চাইতো তাই দিতেন তিনি ওকে।

মোহন্ত সেন যতই ভাবেন মনটা তার ততই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। একটিবার সেই অজানা বন্ধুর সান্নিধ্য পাবার আশায় চঞ্চল হয়ে ওঠেন তিনি।

মানুষ কথায় বলে যে যা চায়, যা কামনা করে, তাই সে পায়। মোহন্ত সেনের মনের ডাকে সাড়া দেয় তার অজানা বন্ধু, পেছন দরজা দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে রাজা মোহন্ত সেনের পাশে এসে দাঁড়ায়। সেই যে তাকে উদ্ধার করে বাড়ি পৌঁছে দেবার পর আর আসেনি সে। আজ তাকে দেখার জন্য সশরীরে হাজির হলো।

মোহন্ত সেনের কাঁধে হাত রাখতেই চমকে উঠলেন তিনি।

মোহন্ত সেন– কে?

তোমার সেই অজানা বন্ধু।

তুমি– তুমি এসেছো?

হ্যাঁ, এসেছি। কেমন আছ রাজা?

ঈশ্বরের কৃপায় আর তোমার দয়ায় ভাল আছি। বন্ধু, এই মুহূর্তে আমি তোমার কথাই স্মরণ করছিলাম।

তাই তো আমি এসেছি রাজা।

দু'হাত বাড়িয়ে ওকে জড়িয়ে ধরেন রাজা মোহন্ত সেন– তুমি, তুমিই কি…

হ্যাঁ, আমি……. আমিই দস্যু বনহুর।

দস্যু বনহুর! শুনেছি তুমি ধনবানের শত্রু–গরিবের বন্ধু।

শুধু আমি গরিবের বন্ধু নই রাজা, অসহায়ের সাথীও।

তুমি কি পুরস্কার চাও বন্ধু বলো? যা চাবে তাই আমি তোমাকে দেবো। আমার প্রাণরক্ষার বিনিময়ে তুমি যা চাইবে,তাই দেবো।

ভিক্ষুক আমি নই রাজা। প্রতিদানও আমি চাই না।

তবে কি চাও? রাজভাণ্ডারে আমার যত অর্থ আছে নিয়ে যাও। যা খুশি করো, আমি তোমাকে সব দিলাম।

তোমার মধুর ব্যবহার আমার কাছে তোমার রাজভাণ্ডারের সোনাদানা, মনিমুক্তার চেয়ে মূল্যবান। তোমার দয়ায়, তোমার গরিব প্রজাগণ সুখে আছে, তারা শান্তিতে বসবাস করছে– এটাই আমার বড় পাওয়া।

পিতাকে একা একা কথা বলতে শুনে চুপি চুপি উঁকি দেয় বাসবী দেবী। চমকে ওঠে সে, পিতার পাশে কে একজন রাজপুত্রের মত সুন্দর যুবক দাঁড়িয়ে কথা বলছে!

অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে বাসবী দেবী। কে এই যুবক। পিতার কক্ষে কেমন করেই বা এলো? তারা গোটা বাড়ির লোক কেউ জানলো না কোন পথে প্রবেশ করেছে?

যত দেখে বাসবী ততই মুগ্ধ হয়ে যায়। এত সুন্দর সুপুরুষ সে কোনদিন দেখেনি।

দস্যু বনহুরকে পূর্বে একদিন দেখেছে বাসবী, কিন্তু সেদিন কেউ তার চেহারা দেখতে পায়নি, বাসবীও না। আজ বাসবী প্রথম দেখাল তাকে।

দস্যু বনহুর রাজা মোহন্ত সেনের সঙ্গে কথা শেষ করে যে পথে কক্ষে প্রবেশ করেছিল, সেই পেছনে জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

এবার বাসবী পিতার কক্ষে প্রবেশ করে ডাকে– বাবা!

চমকে ওঠেন রাজা মোহন্ত সেন। ভাবেন, বাসবী তো ওকে দেখেনি। আবার একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে না বসে! একটু কেশে বলেন– কে, মা বাসবী?

হ্যাঁ। আচ্ছা বাবা, বলো তো কার সঙ্গে তুমি কথা বলছিলে?

ও কিছু না, ও কিছু না মা।

তুমি যে কথা বললে……

এমনি। বুড়ো মানুষ যা মনে আসে বলে ফেলি।

বাবা, আমি ছোট্ট খুকী নই, সব জানি। বলো কে ঐ যুবক যার সঙ্গে তুমি একটু পূর্বে আলাপ করছিলে?

বুঝেছি, তুই তাহলে লুকিয়ে দেখে ফেলেছিস, তাই না মা?

হ্যাঁ। বল কে সে?

ঐ … ঐ … ওকে তুই দেখেছিস। দেখেছিস মা?

দেখেছি বাবা।

কেমন দেখতে একটু বলতো মা?

খুব–খুব খারাপ দেখতে..

না, তা হতে পারে না। যার মন আকাশের মত উদার, যার হৃদয় সাগরের মত গভীর, যার দয়ার সীমা নেই, সে কখনও দেখতে খারাপ হতে পারে না মা, তুই তাহলে ভুল দেখেছিস।

বলনা কে সে?

আমার সেই অজানা বন্ধু।

মানে যে তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল, সেই দস্যু।

দস্যু নয় মা, দস্যু নয়–দেবতা।

বাসবীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে কিছু পূর্বে দেখা একখানা মুখ–অপূর্ব সুন্দর সে মুখ।

মিঃ জাফরী নিজস্ব অফিস-রুমে ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারী করে চলেছেন। তাঁর সমস্ত শরীর ঘেমে নেয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত পিষে বললেন– এবার দস্যুকে সামনে পেলে গ্রেফতার নয়, হত্যা করবো। হত্যা ছাড়া তাকে বন্দী করা যাবে না।

স্যার, কখন রওয়ানা দেবেন? প্রশ্ন করেন শঙ্কর রাও। এখন রাত কটা বাজে মিঃ রাও?

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললেন শঙ্কর রাও-রাত এখন দুটো।

নৌকা কখন আসবে ঘাটে?

রাত তিনটেয় স্যার। আমাদের সঙ্গে কিছু পুলিশ নিলে হয় না?

না, পুলিশ ফোর্স নিয়ে আমি ঝামেলা বাড়াতে চাইনা। দু'জনই যথেষ্ট। কিন্তু ব্যাপারখানা তো কেউ জানতে পারেন নি?

স্যার, শুধু আপনি আর আমি ছাড়া এ সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না। আর জানে নৌকার মাঝি ফরিদ মিয়া।

তাকে কি করে বিশ্বাস করি?

বিশ্বাস করতে হবে স্যার। ফরিদ মিয়া আমাদেরই একজন। তা ছাড়া সে তো আমাদের সন্ধান দিয়েছে দস্যু বনহুর আগামী অমাবস্যার রাতে মধুমতী চরে বন্যাপীড়িতদের মধ্যে টাকা পয়সা আর অন্ন বিতরণ করবে। এ খবর তো আমরা তার কাছেই পেয়েছি।

মিঃ রাও, মনে রাখবেন, এর একচুল যদি মিথ্যা বা অসত্য হয়, তাহলে......

স্যার, আমি নিজের চেয়ে ফরিদ মিয়াকে বেশি বিশ্বাস করি।

বেশ, চলুন।

এখনও কিছু সময় দেরী আছে স্যার।

রিভলভার, গুলী সব তৈরি আছে?

আছে।

রিভলভার নেবেন দুটো। একটা থাকবে লুকানো, আর একটা প্রকাশ্য। একটা হস্তচ্যুত হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যটা ব্যবহার করবেন। দস্যু বনহুরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বিনা দ্বিধায় গুলী ছুড়বেন। তাকে জীবিত গ্রেফতার করা সম্ভব নয়, তাই তাকে আমরা হত্যা করেই আনতে চাই।

রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে মিঃ জাফরী এবং শঙ্কর রাও নৌকায় এসে উঠলেন।

আকাশে তখন মেঘের ঘনঘটা; বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে– ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ।

বিদ্যুতের আলোতে নৌকাখানা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। নৌকায় কোন আলো নেই।

মিঃ জাফরী এবং শঙ্কর রাও নৌকায় পৌঁছলেন। মাঝি ফরিদ মিয়া অন্ধকারে তাদের অভ্যর্থনা জানালো।

মিঃ জাফরী অন্ধকারেও নিপুণভাবে ফরিদ মিয়াকে দেখে নিলেন। লোকটাকে পরীক্ষা করে দেখে আশ্বস্ত হলেন তিনি। অতি সাদাসিদে লোক বলেই মনে হলো তার। তবু মিঃ জাফরী যতদূর সম্ভব পুলিশী কায়দায় ভয় দেখিয়ে ওকে যাচাই করে নিলেন এবং এ কথাও তিনি শুনে নিলেন সত্যিই দস্যু বনহুর আজ রাতে মধুমতী চলে যাবে কিনা।

ফরিদ মিয়া বললো–হুজুর, আমার নৌকা আজ বিশ বছর এই নদীতে পাড়ি জমাচ্ছে। নদী চরে কোথায় কি হয় তাই যদি না জানলাম–

দস্যু বনহুর যে বন্যাপীড়িতদের মধ্যে সাহায্য দান করবে তা কেমন করে জানলে?

হুজুর, আজ শুধু নয়– আরও কয়েক বছর সে এমনি করে মধুমতী চরে দান করেছে। আমরা তাকে জানি হুজুর। সে আমাদের কোন ক্ষতি করে না–

থাক, অত গল্প করতে হবে না, জোরে চালিয়ে চল। দেখ দাঁড়ের শব্দ যেন না হয়।

হলেই বা ক্ষতি কি হুজুর। ফরিদ মাঝি কাউকে ভয় করে না। দস্যুর বাবা এলেও না– কিন্তু হুজুর, আমার ভয় শুধু ঐ পবন বেটাকে।

কথাটা শুনে মিঃ জাফরীর বলিষ্ঠ প্রাণটাও একটু কেঁপে ওঠে। ছৈ-এর ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে একবার আকাশখানা দেখে নিলেন তিনি। আকাশের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। ঘন কাল মেঘ সমস্ত পৃথিবীটাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। একে অমাবস্যা রাত তার ওপর এই দুর্যোগপূর্ণ আকাশ। মিঃ জাফরী ভাবলেন, ফিরে যাওয়া যাক। ভয় হল, তিনি তো সাঁতার জানেন না। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলেন তার মত একজন সাহসী লোক যদি এই সামান্য কারণে আজ ফিরে যান, তাহলে নিজের কাছে নিজেরই লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। তা ছাড়া শঙ্কর রাও ও মাঝিটাই বা ভাববে কি?

মনকে শক্ত করে নিলেন মিঃ জাফরী, বুকে সাহস সঞ্চয় করে বললেন পবন বেটার সাধ্য কি আমাদের কাজে বাধা দেয়। ফরিদ মিয়া, তোমাকে মোটা বখশিস দেব, তুমি সাবধানে শুধু মধুমতী চরে নৌকা ভিড়িয়ে দেবে। কেউ যেন টের না পায়।

না না হুজুর, আমি ঠিকভাবে পৌঁছে দেব, আপনারা চুপ করে বসে থাকুন।

শঙ্কর রাওয়ের কিন্তু মুখ ভয়ে চুর্ণ হয়ে এসেছে। আকাশের অবস্থা তার মনে একটা অমঙ্গলের বার্তা বয়ে আনছে, কোন কথা তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না। মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ করতে লাগলেন তিনি। ফিরে যাবার কথাও মুখ ফুটে বলতে পারছেন না, মিঃ জাফরী যদি রেগে যান!

নৌকা এখন মাঝ নদীতে এসে পড়েছে।

আকাশ যেন ভেঙে পড়ার জোগাড় হলো। সেকি ভীষণ গর্জন করছে মেঘ- বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে– ঝড় বইছে– আর বুঝি রক্ষা নেই!

এতবড় নৌকাখানার একমাত্র মাঝি শুধু ফরিদ মিয়া। অন্য কোন মাঝিকে বিশ্বাস করতে পারেন নি শঙ্কর রাও, তাই ফরিদ মিয়াকে একাই আজ নৌকা বেয়ে আসতে হয়েছে।

ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফরিদ মিয়া হাঁপিয়ে উঠেছে। আর রক্ষা নেই।

ঝড় ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে।

মিঃ জাফরী এবং শঙ্কর রাওয়ের মন থেকে দস্যু বনহুরকে হত্যার বাসনা মুছে গেছে। নৌকাখানা যদি ডুবে যায় তাহলে তাদের বাঁচার কোন আশাই থাকবে না। কারণ তারা সাঁতার জানেন না। আর একটু আধটু জানলেই বা কি– দুর্যোগপূর্ণ রাত্রির নদীর বুকে প্রচণ্ড ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাঁতার দেওয়া অতি নিপুণ সঁতারুর পক্ষেও সম্ভব নয়!

প্রকাণ্ড ঢেউগুলো আছাড় খেয়ে পড়তে লাগলো মিঃ জাফরী আর শঙ্কর রাওয়ের গায়ে। ভিজে চুপসে গেলেন তাঁরা।

এমন সময় নৌকাখানা কাৎ হয়ে গেল একপাশে।

দুর্যোগপূর্ণ রাতের অন্ধকার ভেদ করে জেগে উঠলো দুটি কণ্ঠ ফরিদ মিয়া, ফরিদ মি–য়া–য়া ..

আর শুনা গেল না কিছু।

ঠিক সেই মুহূর্তে অন্ধকারে ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে আসছিল একটি ছোট্ট মোটরবোট। মোটর বোটখানাতেও মাত্র তিনজন আরোহী।

বিদ্যুতের আলোতে তারা দেখতে পেল তাদের কিছু দূরে একটা নৌকা তলিয়ে গেল।

মোটর-বোটের প্রথম আরোহী বলে উঠলো–রহমান, যেমন করে হোক ঐ নৌকার যাত্রীদের বাঁচাতে হবে।

রহমান অতি কষ্টে মোটর-বোট চালিয়ে যাচ্ছিল বলে ওঠে সে– সর্দার, এ অবস্থায় নিজেদের বাঁচা কঠিন হয়ে পড়েছে, কি করে ওদের বাঁচাবেন…

মোটর-বোটের প্রথম আরোহী অন্য কেউ নয়–দস্যু বনহুর।

রহমানের কথায় বনহুর বলল– তুমি মোটর বোটখানা রক্ষা কর রহমান— মাহবুব আর, তুমি এই রশিখানা আমার কোমরের সঙ্গে বেঁধে মোটর-বোটের সঙ্গে

আটকে নাও। বোটের তলায় যে চাল ডালের বস্তা আছে নদীতে ফেলে দাও– আমি নিজেই রশি পরে নিচ্ছি..

বনহুর ক্ষিপ্রহস্তে নিজের কোমরে রশি বেঁধে নদীবক্ষে লাফিয়ে পড়লো। ততক্ষণে মোটর বোটখানা অনেক চেষ্টায় ডুবন্ত নৌকার কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই একজন লোককে ধরে ফেললো বনহুর, তাকে নিয়ে অতি কষ্টে মোটর বোটখানায় তুলতে সক্ষম হল। দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, হঠাৎ আর একখানা কালো মাথা বিদ্যুতের আলোতে দেখা গেল।

বনহুর অতি কৌশলে সাঁতার কেটে সেই ডুবন্ত লোকটাকেও ধরে ফেলল। খুব মোটা এবং ভারী দেহ লোকটার। বনহুর ওকে নিয়ে মোটর বোটের নিকটে পৌঁছতে খুব পেরেশান হয়ে পড়লো কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুটি লোককে বাঁচাতে সক্ষম হলো তারা।

বিদ্যুতের আলোতে বনহুর লোক দুটিকে লক্ষ্য করে চমকে উঠলো। একজন তার অতি পরিচিত মিঃ জাফরী। অন্যজন নৌকার মাঝি। এত বিপদেও বনহুর হেসে উঠলো।

ঝড় ধীরে ধীরে থেমে আসছে।

বনহুর বোটের মেঝেতে শায়িত সংজ্ঞাহীন লোক দুটির দিকে তাকিয়ে বলল– রহমান, জান এরা কারা?

রহমান এতক্ষণ বোটখানাকে ঝড়ের দাপট থেকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে চলেছিল এতক্ষণে একটু আশ্বস্ত হয়েছে সে। বনহুরের কথায় বললো– তা কেমন করে জানবো সর্দার!

ইনি প্রখ্যাত পুলিশ অফিসার মিঃ জাফরী। অপর জন মাঝি।

সর্দার, তাহলে…

হ্যাঁ, দস্যু বনহুরের সন্ধানেই চলেছিলেন ভদ্রলোক, হঠাৎ তার এই অবস্থা।

সর্দার, মিঃ জাফরী তো আপনার ভীষণ শত্রু।

হ্যাঁ, তিনি আমাকে সবচেয়ে বেশি শক্ত মনে করেন।

তাহলে ওকে বাঁচিয়ে লাভ কি সর্দার? হুকুম করুন আমরা ওকে–

না রহমান, শত্রুর বিপদ-মুহূর্তে শত্রুকে আঘাত করা কাপুরুষতা, চলো, ওকে আমার লঞ্চে নিয়ে চলো।

তবে কি আমরা লঞ্চে ফিরে যাবো?

হ্যাঁ। ঝড় সম্পূর্ণ থেমে গেলে আবার আসা যাবে।

দস্যু বনহুরের মোটর-বোটখানা মিঃ জাফরী এবং সংজ্ঞাহীন মাঝিটিকে নিয়ে বনহুরের লঞ্চের গায়ে এসে ভিড়ল। আকাশ তখন পরিষ্কার হয়ে এসেছে। নদীবক্ষ এখন শান্ত ধীর স্থির।

মিঃ জাফরী এবং মাঝিটিকে যত্ন সহকারে লঞ্চে উঠিয়ে নেয়া হলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞা ফিরে এলো মিঃ জাফরীর, ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। শুভ্র কোমল বিছানায় তাঁকে শোয়ানো হয়েছিল।

মিঃ জাফরী উঠে বসতেই একজন লোক এক গ্লাস গরম দুধ এনে তার হাতে দিল– খেয়ে নিন।

মিঃ জাফরী দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে স্মরণ করতে চেষ্টা করলেন এখন তিনি কোথায়।

অল্পক্ষণের মধ্যে মনে পড়ে গেল তার সব কথা–সেই নৌকা, সেই মাঝি, সেই প্রচণ্ড ঝড়ের কথা– তিনি তো নদীতে ডুবে গিয়েছিলেন– এখানে এলেন কি করে। এরা কারা কেমন করে তাকে উদ্ধার করেছে? মিঃ রাও এবং মাঝিই বা গেল কোথায়?

গরম দুধটুকু খেয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করলেন মিঃ জাফরী। তিনি নিজের শরীরে শুকনো জামাকাপড় দেখলেন বুঝতে পারলেন যারা তাকে উদ্ধার করেছেন তারাই তার দেহ থেকে ভিজে জামাকাপড় খুলে নিয়ে এসব পরিয়ে

দিয়েছে। কৃতজ্ঞতায় মিঃ জাফরীর মন ভরে উঠলো। তিনি এবার লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলেন–কে তাকে রক্ষা করেছেন, তিনি কোথায়?

লোকটা জবাব দিল–আমাদের মনিব স্বয়ং আপনাকে রক্ষা করেছেন–তিনি সময় হলেই দেখা করবেন।

কে তিনি? কি নাম তার?

তিনি একজন হৃদয়বান লোক। মনিবের নাম আমরা উচ্চারণ করি না।

মিঃ জাফরী পুনরায় বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। হঠাৎ মনে পড়লো মিঃ শঙ্কর রাওয়ের কথা। এবার তিনি লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলেন–আমার সঙ্গীটি কোথায়?

আছে,পাশের ক্যাবিনে।

আশ্বস্ত হলেন মিঃ জাফরী। যাক তাহলে মিঃ শঙ্কর রাও-ও বেঁচে গেলেন।

নিশ্চিন্ত মনে চোখ বন্ধ করলেন মিঃ জাফরী। বোটের ঝক ঝক আওয়াজ তার চিন্তাধারাকে ভাসিয়ে নিয়ে চললো। তিনি ভাবতে লাগলেন, কোথায় দস্যু বনহুরকে হত্যা করে তার লাশ নিয়ে। ফিরে যাবেন আর কিনা নিজেই মৃত্যুপথের যাত্রী হয়ে কোনরকমে প্রাণ ফিরে পেয়ে কার না কার লঞ্চের ক্যাবিনে শুয়ে আছেন। কিন্তু তিনি যে প্রাণে বেঁচে আছেন এটাই তার ভাগ্য। কে সে মহান ব্যক্তি যিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে গভীর জলের উন্মত্ত উচ্ছ্বাস থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। মনে মনে বারবার তাকে ধন্যবাদ জানান মিঃ জাফরী।

হঠাৎ পদশব্দে চোখ তুলে তাকান, দেখতে পান পূর্বের সেই লোকটি ক্যাবিনে প্রবেশ করলো। মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললো আমাদের মনিব আসছেন।

আনন্দে কৃতজ্ঞতায় চক্ চক্ করে উঠলো মিঃ জাফরীর চোখ দুটো। উন্মুখ হৃদয় নিয়ে তাকালেন ক্যাবিনের দরজার দিকে। এক্ষুণি তিনি দেখতে পাবেন তার প্রাণরক্ষাকারীকে। কি বলে তাকে ধন্যবাদ জানাবেন ভাবতে লাগলেন মিঃ জাফরী।

ভোরের আলো তখন ক্যাবিনের মেঝেতে এসে পড়েছে।

মিঃ জাফরী তাকিয়ে রইলেন দরজার দিকে।

ক্যাবিনে প্রবেশ করলো দস্যু বনহুর। শরীরে তার সাধারণ পাজামা পাঞ্জাবী, পায়ে পাম্পসু। স্বাভাবিক সচ্ছ মুখমণ্ডল, উজ্জ্বল দীপ্ত চোখ দুটো। মুখে মৃদু হাসির রেখা। মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললো– গুড মর্নিং ইন্সপেক্টার।

অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন মিঃ জাফরী– গুড মর্নিং।

যাকে দেখার জন্য এতক্ষণ উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতীক্ষা করছেন মিঃ জাফরী, এই সেই ব্যক্তি। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন, কোথায় যেন একে দেখেছেন বলে মনে হয় তার। কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত বলে মনে হয়। এতক্ষণ যে একটা বিপুল আগ্রহ নিয়ে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন, সব যেন কর্পূরের মত কোথায় উড়ে গেল! এ যে তার অতি পরিচিত মুখ। একবার নয় অনেকবার বিভিন্ন রূপে তিনি এ মুখ দেখেছেন। পুলিশ বিভাগের সুদক্ষ কর্মচারী মিঃ জাফরী। তাঁর শ্যেনদৃষ্টির কাছে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। মিঃ জাফরী চিনতে পারলেন দস্যু বনহুরকে।

দস্যু বনহুরের মুখে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। হেসে বলে–চিনতে পেরেছেন নিশ্চয়ই?

মিঃ জাফরীর মুখ গম্ভীর হয়ে এসেছে। দস্যু বনহুর তাঁর প্রাণরক্ষাকারী যার রক্তে তিনি মধুমতী চর ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, সেই দস্যু তাকে বাঁচিয়েছে। মুখ ফিরিয়ে নেন মিঃ জাফরী।

বনহুর পূর্বের ন্যায় স্বচ্ছকণ্ঠে বলে জানি আপনি কি ভাবছেন।

মিঃ জাফরী পুনরায় তাকালেন। অদ্ভুত এই দস্যু বনহুর, একবার তাকালে সহজে চোখ ফিরিয়ে নেয়া যায় না। মিঃ জাফরীও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলেন না।

বনহুর বলল– আপনার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে ঐ ঝড়। আমারও। শান্ত কণ্ঠে কথা বলল সে।

মিঃ জাফরী স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন, কোন উত্তর দেন না।

মিঃ জাফরী যতই ভাবছেন ততই আশ্চর্য হচ্ছেন। দস্যু বনহুর তার সবকিছুই জানে। তিনি যে আজ রাতে বনহুরকে হত্যা বা গ্রেফতারের জন্যই যাচ্ছিলেন তাও বুঝতে পেরেছে, অথচ তার প্রতি এতটুকু অসৎ ব্যবহার করেনি বা করছে না সে। মনের মধ্যে একটা কৃতজ্ঞতা ভাব জাগে মিঃ জাফরীর। ইচ্ছা করলে এখনই সে তাকে হত্যা করতে পারে যা খুশি করতে পারে, কিন্তু সে এখন পর্যন্ত কোন অভদ্র ব্যবহার করেনি…

হঠাৎ মিঃ জাফরীর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে, দস্যু বনহুর বলে–কি ভাবছেন ইন্সপেক্টার?

কিছু না।

নিশ্চয়ই কিছু ভাবছিলেন।

ভাবছিলাম, শঙ্কর রাও কেমন আছেন।

শঙ্কর রাও!

হ্যাঁ, তিনি এখন কেমন আছেন?

শঙ্কর রাও ছিলেন নাকি আপনার সঙ্গে?

কেন, তাঁকেও নাকি তুমি উদ্ধার করেছ শুনলাম।

না, আপনার সঙ্গে যাকে নদীবক্ষ থেকে আমি তুলে এনেছি সে মিঃ রাও নয়, একজন মাঝি।

এতক্ষণে বুঝতে পারলেন মিঃ জাফরী, তাঁর সঙ্গে যাকে উদ্ধার করা হয়েছে সে মিঃ শঙ্কর রাও নয়, তার নৌকার মাঝি। একটা ব্যথার ছোঁয়া লাগলো মিঃ জাফরীর মনে– তাহলে মিঃ রাও আর বেঁচে নেই।

দস্যু বনহুর সান্ত্বনার স্বরে বললো–দুঃখ করে কোন লাভ নেই ইন্সপেক্টার। অদৃষ্টে যার যা আছে তা হবেই। আচ্ছা এখন চলি, গুডবাই…

দস্যু বনহুর বেরিয়ে যায় মিঃ জাফরীর ক্যাবিন থেকে।

মিঃ জাফরী ভাবতে থাকেন, এ কি হলো, যাকে গ্রেফতার করতে এসেছিলেন তার হাতেই বন্দী হলেন!

.

মিঃ হারুন অফিসে বসে ডায়েরী লিখছেন। মিঃ হোসেন এবং অন্যান্য অফিসার যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

গত রাতে মিঃ জাফরী এবং শঙ্কর রাও মধুমতী চলে গেছেন। এখনও ফিরে আসেন নি, এ নিয়েই চিন্তা করছিলেন মিঃ হারুন। কথাটা অফিসের আর কেউ জানে না, মিঃ জাফরী শুধু মিঃ হারুনকে ব্যাপারটা গোপনে জানিয়েছিলেন।

মিঃ হারুন নিজেও মিঃ জাফরীর সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মিঃ জাফরী তাতে রাজি হন নি। তিনি বলেছিলেন, একা গিয়ে দেখতে চাই কি করতে পারি। মিঃ রাওকে সঙ্গে নিয়েছিলেন, যদি ছদ্মভাবে কিছু করা যায় তাঁকে দিয়ে করাবেন। যেমন কোন ভিখারী কিংবা কোন চাষীর বেশে ওকে পাঠিয়ে নিজে সুযোগ নেবেন।

গতরাতে যে প্রচণ্ড ঝড় হয়ে গেছে, এ জন্যই চিন্তা হচ্ছিল মিঃ হারুনের। এতক্ষণ ফিরে না আসারই বা কারণ কি? যদিও মিঃ হারুন ডায়েরী লিখছিলেন, কিন্তু তার মনে ঐ এক চিন্তা আলোড়ন জাগাছিল –মিঃ জাফরী ও শঙ্কর রাও কোন বিপদে পড়েননি তো...

হঠাৎ মিঃ হারুনের চিন্তাজাল ছিন্ন করে ফোনটা বেজে ওঠে।

মিঃ হারুন ডায়েরীতে হাত চালাতে চালাতে বাম হাতে রিসিভারখানা তুলে নেন হ্যালো! সঙ্গে সঙ্গে হাতের কলম রেখে সোজা হয়ে দক্ষিণ হাতে রিসিভার চেপে ধরেন কানে– হসপিটালে মিঃ শঙ্কর রাও! নদী থেকে তাঁকে জেলেরা নৌকায় উঠিয়ে এনেছে! জীবিত আছেন তো?

মিঃ হারুন যখন রিসিভারে কথা বলছিলেন, তখন অন্যান্য পুলিশ কর্মচারী স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন।

মিঃ হারুন রিসিভার রেখে উঠে দাঁড়ন, তারপর মিঃ হোসেনকে লক্ষ্য করে বলেন– আপনি এক্ষুণি আমার সঙ্গে চলুন। মিঃ রাও হসপিটালে আছে। তার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন হসপিটালে পৌঁছে অবাক হলেন।

পথে গাড়িতে মিঃ হারুন গত রাতের কথাগুলো মিঃ হোসেনকে বলেছিলেন।

মিঃ শঙ্কর রাওয়ের জ্ঞান ফিরে এলো সন্ধ্যার দিকে।

মিঃ হারুন এবং অন্যান্য সবাই দুঃখে মুষড়ে পড়লেন। মিঃ জাফরী ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পাননি। নিশ্চয়ই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে।

ব্যাপারটা পুলিশ সুপার মিঃ আহমদের কানে পৌঁছল। গোটা পুলিশ বিভাগ শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। মিঃ জাফরীর মত একজন বিশিষ্ট পুলিশ কর্মচারীর অন্তর্ধানে একটা গভীর বেদনার ছায়া ঘনিয়ে এলো পুলিশমহলে।

মিঃ শঙ্কর রাও যখন জানতে পারলেন মিঃ জাফরীকে খুঁজে পাওয়া যায় নি, এমনকি তাঁর। লাশও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তিনি অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন।

মাঝিরা জাল দিয়ে নদীতে অনুসন্ধান করলো, কিন্তু কোথাও তারা খুঁজে পেল না মিঃ জাফরীর লাশ।

এখানে যখন মিঃ জাফরীর মৃত্যুশোকে সকলে মুহ্যমান তখন দস্যু বনহুরের সঙ্গে বসে ডিনার খাচ্ছেন মিঃ জাফরী।

খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালো দস্যু বনহুর, মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললো– চলুন ইন্সপেক্টার, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

লঞ্চ থেকে নেমে একটা বোটে চেপে বসলো বনহুর এবং মিঃ জাফরী। ইতিমধ্যে সেই মাঝিটাকেও মোটরবোটে তুলে নেয়া হয়েছে।

জায়গাটা যে কোথায় বুঝা গেল না। লঞ্চ ছেড়ে মোটর-বোট তীর বেগে এগিয়ে চলল। মিঃ জাফরী অবাক হয়ে দস্যু বনহুরকে দেখছেন।

দস্যু বনহুর স্বয়ং মোটর-বোটখানা চালিয়ে চলেছে। হেসে বলল বনহুর রিভলভার থাকলে হয়তো এতক্ষণ একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতেন, তাই না ইন্সপেক্টার?

মিঃ জাফরী কোন কথা বললেন না।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একটা নৌকা দেখতে পেলেন মিঃ জাফরী। নৌকাখানা নিয়ে একজন মাঝি মাঝনদীতে অপেক্ষা করছে। মনে হচ্ছে এদের জন্যই প্রতীক্ষা করছে সে।

বনহুর নৌকাখানার অদূরে এসে বোটখানা থামিয়ে ফেললো, তারপর নৌকার মাঝিকে ইংগিতে নিকটে আসতে বললো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মোটর-বোটের ধারে এসে নৌকাখানা ভিড়লো।

বনহুর এবার মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললো– এখান থেকে ঘাট বেশি দূরে নয়। মাঝিই আপনাকে নিয়ে যাবে।

মিঃ জাফরী এবং মিঃ জাফরীর সঙ্গী সেই মাঝি মোটর-বোট থেকে নৌকাখানায় চেপে বসলেন। যে মাঝি এতক্ষণ নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছিল সে উঠে এলো মোটর-বোটে।

মিঃ জাফরী নৌকায় চেপে বসলেন। মাঝি বৈঠা হাতে তুলে নিল।

দস্যু বনহুর হাত নেড়ে তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

ক্রমে নৌকাখানা সরে যাচ্ছে।

মোটর বোটখানাও দূর হতে দূরে সরে যাচ্ছে।

মিঃ জাফরী তখনও তাকিয়ে আছেন দস্যু বনহুরের মোটর-বোটখানার দিকে।

ঘাটে পৌঁছতে বেশি সময় লাগলো না তাদের।

কিন্তু যেখানে তখন তারা পৌঁছলেন সেটা তাদের পরিচিত কোন জায়গা নয়। সেখান থেকে ফিরে এলেন শহরে। পুরো একটা দিন কেটে গেল তাদের ট্রেনে।

মিঃ জাফরীকে ফিরে পেয়ে পুলিশমহলে আনন্দের বান বয়ে চলল। সবাই তাঁকে নিয়ে খুশিতে মেতে উঠলেন। নদীতে ডুবেও সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছেন মিঃ জাফরী, এ কম সৌভাগ্যের কথা নয়! কম আশ্চর্যের কথা নয়! কেমন করে তিনি প্রচণ্ড ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পেলেন, এ নিয়ে সকলের মধ্যে একটা প্রশ্নের জাল ছড়িয়ে পড়লো। আসল জবাব কেউ খুঁজে পেলেন না।

মিঃ জাফরী ঘটনাটা কাউকেই খুলে বললেন না। মাঝিটা অবশ্য জানে। কিন্তু কে যে লঞ্চের মালিক, কে তাদের মোটরবোটে করে নৌকায় পৌঁছে দিল, তার আসল পরিচয় সে জানে না। জানার কোন প্রয়োজনও তার ছিল না।

কাজেই মিঃ জাফরীকে কে রক্ষা করেছে, এ কথা সকলের কাছেই গোপন রয়ে গেল।

মিঃ আহমদ নিজে এসে মিঃ জাফরীর সঙ্গে দেখা করে তাকে অভিনন্দন জানালেন।

.

নূরীর চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বলে নাসরিন-সব সময় তুই কেঁদে কেঁদে সারা হলি নূরী। যে তোকে চায় না, কেন তুই তার জন্য এত করিস!

নাসরিন, তুই কি বুঝবি! আমার হৃদয়ের ব্যথা তুই কি বুঝবি!

জানি তুই ওকে নিজের জীবনের চেয়েও ভালবাসি। কিন্তু নূরী, প্রতিদানে সে তোকে কি দিয়েছে? দিয়েছে তোকে ব্যথা আর বেদনা। তার চেয়ে তুই অন্য কাউকে বিয়ে করে নে নূরী।

নূরী বাল্যসখী নাসরিনের কথায় চমকে ওঠে। তাড়াতাড়ি ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে–আর কোনদিন অমন কথা বলিসনে নাসরিন। বিয়ে কোনদিন দু'বার হয় না।

নূরী, এই কথা বলে বলেই জীবন কাটিয়ে দিবি?

হ্যাঁ নাসরিন, তাছাড়া আর যে কোন পথ নেই আমার। হুরই যে আমার ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন….

কি জানি নূরী, আমি জীবনে এমন কোনো পুরুষ দেখিনি যে পুরুষ তোর মত একজন মেয়েকে উপেক্ষা করতে পারে। তোর মত সুন্দরী খুব কমই হয়!

আমার চেয়ে আমার হুর অনেক সুন্দর নাসরিন। ওর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না।

এমন সময় রহমান এসে দাঁড়ায় নূরী আর নাসরিনের পাশে।

নূরী আনন্দভরা কণ্ঠে বলে ওঠে– হুর এসেছে?

হ্যাঁ, এসেছে।

নাসরিনের মুখের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ায় নূরী। আর একবার তাকায় রহমানের মুখে, তারপর ছুটে চলে যায় সেখান থেকে।

রহমান নূরীর গন্তব্যপথের দিকে তাকিয়ে হাসে। নাসরিন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। রহমানকে লক্ষ্য করে বলে– সর্দারকে ভালবেসে নূরী মরবে।

রহমান গম্ভীর কণ্ঠে বলে– তবু সর্দারের নাগাল পাবে না।

সত্যি, পুরুষ জাতটাই বড় নিষ্ঠুর।

রহমান নাসরিনের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো– সব পুরুষই সমান নয় নাসরিন। তুমি তো জানো, নূরীর জন্য আমাদেরই দলের কত পুরুষ পাগল। ওর একটু ভালবাসার জন্য কতজন। আকুল হৃদয় নিয়ে অপেক্ষা করে, কিন্তু সর্দারের ভয়ে কেউ ওকে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না।

অভিমানভরা কণ্ঠে বলে নাসরিন–জানি, তুমিও ওকে ভালবাস রহমান।

সে কথা মিথ্যা নয় নাসরিন, নূরীকে সত্যি আমার ভাল লাগে।

উঃ!

কি হলো নাসরিন?

কিছু না। যাই দেখি জরিনা কোথায় গেল।

নাসরিন চলে যায়।

রহমান মৃদু হাসে, সে জানে নাসরিন তাকে মনে মনে ভালবাসে, কিন্তু প্রকাশ্যে কোনদিন সে জানায় নি তার মনের গোপন কথা।

বনহুরের সামনে এসে দাঁড়ায় নূরী, কোন কথা বলতে পারে না সে।

বনহুর কোমরের বেল্ট থেকে রিভলভারখানা টেবিলে রেখে শয্যায় গিয়ে বসে, তারপর নূরীকে লক্ষ্য করে বলে– কেমন আছো?

নূরী শান্তকণ্ঠে বলে– ভাল।

বস নূরী, একটা নতুন গল্প আছে?

কাউকে গুলীবিদ্ধ করেছো, না গলাটিপে হত্যা করেছ?

দস্যু বলে আমি শুধু হত্যা করি, তাই না?

নাহলে কাউকে মোটা টাকা বখশিস দিয়েছ, কিংবা ধন রত্ন-অলঙ্কার।

ওসব নয় নূরী।

তবে কি?

বস, বলছি।

নূরী বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে যায় বনহুরের হাতে, চমকে ওঠে নূরী-ইস, হাতে কি হয়েছে তোমার? নূরী বনহুরের হাতখানা তুলে নেয় তার হাতে। এ যে কামড়ানোর দাগ! কে তোমায় কামড় দিয়েছে হুর?

নূরী, সে এক ভীষণ কাণ্ড... কোনটা শুনবে, যা বলতে চাইছিলাম সেটা না আমার হাতের এ দাগটা..... বলো?

দুটোই তোমাকে বলতে হবে।

উঁহু, যা শুনবে একটা।

আমি কোনটাই শুনতে চাই না।

বেশ, আমিও বলবো না।

হুর, এখনও তোমার ছেলেমানুষি গেল না। আমার কাছে কথা লুকিয়ে তোমার কি লাভ হয় বলতো?

তবে শুনো, এবার মধুমতী চরে বন্যাপীড়িতদের সাহায্য দিতে গিয়ে সে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। ইন্সপেক্টার মিঃ জাফরী কেমন করে জানতে পেরেছিলেন, মধুমতী চরে বন্যাপীড়িতদের মধ্যে পাওয়া যাবে দস্যু বনহুরকে, তাই গোপনে চলেছিলেন তাকে হয় বন্দী, নয় হত্যা করে পুলিশমহলে সুনাম ছড়াতে–ঘটনাটা বিস্তারিত বলে যায় বনহুর নূরীর কাছে। তার হাতের ক্ষতের কথাটা নূরী যাতে ভুলে যায় এই হলো বনহুরের ঘটনাটা ইনিয়ে বিনিয়ে বলার উদ্দেশ্য।

নূরী অবাক হয়ে সব শুনলো, তারপর বললো– এমন একজন শত্রুকে হাতের মুঠায় পেয়ে। তুমি ছেড়ে দিলে হুর! সে যদি তোমাকে অমন অবস্থায় পেতো তাহলে কি করতো জানো?

হত্যা কিংবা গ্রেফতার।

আর তুমি তাকে জামাই আদরে ডাঙ্গায় পৌঁছে দিলে।

দস্যু হলেও বনহুর মানুষ! সে কোন অসহায়ের প্রতি আঘাত করে না– ঘোর শত্রু হলেও না।

শুধু তুমি আঘাত করো একজনকে! যাকে আঘাত করেও দুঃখ পাও না।

কে সে আমার পরম বন্ধু যাকে আমি আঘাত করে আনন্দ পাই?

সত্যি সে তোমার পরম বন্ধু?

তার চেয়েও বেশি যাকে আমি আঘাত করে আনন্দ পাই।

হুর!

বল?

বল হুর, কেমন করে তোমার হাতে ঐ ক্ষত হলো?

নূরী এত কথার মধ্যেও তার হাতের ক্ষতটার কথা ভুলে যায় নি, বনহুর মনে মনে চমকে উঠলো। হেসে বললো সে– তোমার স্মরণশক্তি দেখছি ভয়ানক।

তুমি মনে করেছিলে আমি বুঝি ভুলে গেছি?

ঠিক তা নয়, কারণ কেমন করে আমার হাতে ক্ষত হলো সেই কথাই আমি ভুলে বসে আছি। দাঁড়াও স্মরণ করে দেখি কি করে এ ক্ষতটা হলো।

মানে কে তোমার হাত কামড়ে দিয়েছিল?

ওঃ হ্যাঁ, কামড়ে দিয়েছিল। হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে-ঐ যে শহরে একটা বাড়ির কুকুর কামড়ে দিয়েছে হঠাৎ...

এটা কুকুরের কামড়ের দাগ? না না, কিছুতেই নয়।

তবে কিসের?

মানুষের দাঁতের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি।

হুঁ-তাহলে তুমি ঠিক ধরেছ নূরী, স্বপ্নঘোরে নিজের হাত নিজেই কামড়ে দিয়েছি।

ঠাট্টা রাখ বলছি।

বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার?

না, সত্যি কথা বল?

মিথ্যা না বলে যে উপায় নেই নূরী।

আর সত্য বললে?

তুমি আবার কামড়ে দেবে।

সব সময় এমন হেঁয়ালিভরা কথা আমার.....

ভাল লাগে না, এই তো?

হ্যাঁ।

একটা মেয়ে আমার হাতে কামড়ে দিয়েছিল।

মিথ্যা কথা!

জানি তুমি বিশ্বাস করবে না।

থাক আমি শুনতে চাই না। চলো হাত-মুখ ধুয়ে খাবে চলো।

সেই ভাল। চলো।

বনহুর আর নূরী কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

গভীর রাতে ঘুম ভেঙে যায় নূরীর। শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। অতি ধীরে লঘু পদক্ষেপে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে, এগিয়ে যায় বনহুরের কক্ষের দিকে। অতি সন্তর্পণে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি দেয় নূরী। দেখতে পায়– বিছানা শূন্য, বনহুর বিছানায় নেই। নূরী তাকায় কক্ষের চারদিকে, ওপাশে দেয়ালে বনহুরের পোশাকগুলো ঠিক জায়গায় ঝুলছে।

তবে সে গেল কোথায়? টেবিলে তার রিভলভার যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে।

নূরীর দু'চোখ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো। বনহুরের শূন্য কক্ষে দাঁড়িয়ে তার শূন্য হৃদয় খাঁ খাঁ করে উঠলো। টেবিল থেকে বনহুরের রিভলভারখানা তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলো নূরী।

.

অতি সন্তর্পণে জানালা খুলে কক্ষে প্রবেশ করলো বনহুর। কক্ষের নীলাভ আলোতে তাকিয়ে দেখলো দুগ্ধফেনিল বিছানায় ঘুমিয়ে আছে মনিরা। এক

থোকা যুঁই ফুলের মত ছড়িয়ে আছে তার দেহখানা। একরাশ ঘন কালো চুল এলোমেলো হয়ে লুটিয়ে পড়েছে তার বুকের উপর।

বনহুর ধীরে ধীরে মনিরার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো। নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে রইলো মনিরার ঘুমন্ত মুখের দিকে।

কক্ষের নীলাভ আলোয় মনিরার মুখখানা অপূর্ব সুন্দর লাগছিল। দস্যু বনহুর নিজকে সংযত রাখতে পারে না, বসে পড়ে মনিরার বিছানায়। ধীরে ধীরে ঝুঁকে আসে বনহুরের মুখখানা মনিরার মুখের ওপর।

একটা উষ্ণ নিঃশ্বাসের ছোঁয়ায় ঘুম ভেঙে যার মনিরার। চোখ মেলে তাকায়, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমজড়িত চোখ দুটো উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে ওঠে। ভাল করে চোখ রগড়ে তাকায় সে– আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে মনিরার মন, দু'হাত প্রসারিত করে জড়িয়ে ধরে বনহুরের গলা, বলে– একি স্বপ্ন– না সত্য?

উঁ হুঁ।

তবে কি?

শুধু তুমি আর আমি। বাস্তব– মনিরা জানেনা, আজ আমি কেমন করে এসেছি?

কেমন করে?

হাওয়ায় ভেসে।

মনির!

বল?

জানো, আজ কত খুশি হয়েছি।

মনিরা ওকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নেয় বনহুর।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় আঘাত হয়– ঠক্ ঠক্ ঠক্–

সঙ্গে সঙ্গে সরকার সাহেবের ভীত কণ্ঠস্বর– পুলিশ–পুলিশ—

বনহুর আর মনিরা তাকায় উভয়ের মুখের দিকে।

দরজায় তখনও আঘাতের পর আঘাত চলেছে।

০০৮. সাগরতলে দস্যু বনহুর

সাগরতলে দস্যু বনহুর – রোমেনা আফাজ

ভারতী নদীর বুক চিরে গভীর অন্ধকার ভেদ করে নীরবে এগিয়ে চলেছে একখানা বজরা। বজরাখানা অন্য কারও নয়, দস্যু বনহুরের। বজরার কক্ষে দস্যু বনহুরের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ মনিরা, হৃদয়ে তার অফুরন্ত আনন্দোচ্ছাস। নিজেকে সে নিঃশেষ করে বিলিয়ে দিয়েছে স্বামীর বুকে।

মনিরার মত সুখী কে!

যে দস্যু বনহুরের ভয়ে দেশবাসীর মনে আতঙ্কের সীমা নেই, পুলিশমহল যার জন্য সদাসর্বদা উদ্বিগ্ন, যে দস্যু বনহুরের দয়ায় শত শত দীন– দুঃখী কৃতজ্ঞ, সেই দস্যু বনহুর তার স্বামী!

মনিরা হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে স্বামীর ভালবাসা উপলব্ধি করে চলেছে। নিজেকে সে ধন্য মনে করছে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মন ব্যথায় গুমড়ে উঠলো, দু'চোখ ভরে উঠল অশ্রুতে, কতক্ষণ সে এ আনন্দ উপভোগ করতে পারবে! স্বামীকে সে কতক্ষণের জন্য কাছে পাবে..

বনহুর মনিরার মুখখানা দক্ষিণ হাতের আংগুল দিয়ে উঁচু করে ধরে-একি মনিরা, তোমার চোখে পানি!

মনিরার ঠোঁট দু'খানা একটু কেঁপে ওঠে, বলতে পারে না কিছু।

বনহুর আরও নিবিড় করে মনিরাকে টেনে নেয় বুকে, বলে– কি হলো মনিরা? হঠাৎ একি পরিবর্তন–

না না, তুমি আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর না।

জানি তুমি দুঃখ পাচ্ছো। মনিরা, দস্যুকে বিয়ে করে কোন নারী সুখী হতে পারে না, এ কথা আমি জানতাম–

মনিরা দক্ষিণ হাতখানা দিয়ে বনহুরের মুখ চেপে ধরে– ছিঃ তুমি আমাকে ভুল বুঝ না। আজ আমার মত সুখী কে? তুমি শুধু দস্যু নও–তুমি দস্যুসম্রাট। তোমার স্ত্রী হওয়া যে কত সৌভাগ্যের কথা সে তুমি বুঝবে না।

তবে তোমার চোখে অশ্রু কেন?

এ আমার আনন্দের অশ্রু। তোমাকে পাওয়া কত আনন্দের কথা! সত্যি, আজ আমার নারী। জন্ম সার্থক হয়েছে।

মনিরা!

হ্যাঁ, কিন্তু জানি না এত সুখ আমার সইবে কিনা। তোমার বুকে মাথা রেখে শেষ পর্যন্ত জীবনের দিনগুলো কাটিয়ে দিতে পারব কিনা কে জানে!

মনিরা, এই আনন্দময় মুহূর্তগুলো তুমি মিছামিছি দুশ্চিন্তায় ম্লান করে দিচ্ছে। ছিঃ, মুছে ফেলো তোমার চোখের পানি। তুমি তো জানো–আমি সবকিছু সইতে পারি, কিন্তু তোমার চোখে অশ্রু সইতে পারি না। ধীরে ধীরে বনহুর ভাবাপন্ন হয়ে যায়, বলে–মনিরা, জন্মাবার পর থেকে আমার জীবনে চলেছে সংঘাতের পর সংঘাত। নির্মম ব্যথা আর দুঃখই আমার জীবনের সাথী। যখন যেদিকে তাকিয়েছি শুধু অশ্রু আর অশ্রু। অস্রোতে আমার জীবনের সব আনন্দ, সব অনুভূতি কোথায় যে ভেসে গেছে, তাই আমি তোমার চোখে অশ্রু দেখলে মুষড়ে পড়ি।

না না, আর আমি কাঁদব না,। এই যে আমি চোখের পানি মুছে ফেললাম।

মনিরা!

বল?

সত্যি তুমি সুখী হয়েছ?

অনেক অনেক সুখী হয়েছি। আর তুমি? মনিরা আগ্রহভরা চোখে তাকালো দস্যু বনহুরের মুখের দিকে।

আমি সুখী হতে পারিনি মনিরা!

উঃ এ কথা তুমি আগে বলনি কেন? মনিরা স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেবার চেষ্টা করলো।

কিন্তু বনহুরের বলিষ্ঠ বাহুকে এতটুকু শিথিল করতে সক্ষম হলো না মনিরা, পুনরায় তার চোখ দুটি অশ্রুতে ভরে উঠলো। অভিমানে রাঙা হয়ে উঠলো তার রক্তিম গণ্ডদ্বয়, বললো– জানতাম তোমাকে কোনদিন তুচ্ছ প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারবো না। নগণ্য নারীর ভালবাসা কিছুতেই তোমার মনে দাগ কাটতে সক্ষম হবে না।

মনিরা, তুমি যা ভাবছো, তা সম্পূর্ণ ভুল। ফুলের মত পবিত্র একটা জীবনকে আমি নষ্ট করে দিলাম এটাই আমার জীবনের চরম অনুতাপ। আমি পাপী, আমি নিষ্ঠুর, নরহত্যাকারী–মনিরা, তোমার মত একটা মেয়েকে আমি এভাবে এত আপন করে পাবো, এ যে আমার স্বপ্নের অতীত। তোমাকে আমি সুখী করতে পারবো না মনিরা, তাই আমার মনে এত ব্যথা–মনে ব্যথা রেখে কেউ কোনদিন সুখী হতে পারে না। মনিরা, তুমি আমাকে ভুল বুঝ না।

মনিরা বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে বলে ওঠে-দুনিয়ায় যদি সত্য কিছু থাকে, সে তুমি। তোমাকে আমি কোনদিন ভুল বুঝতে পারি না।

হ্যাঁ মনিরা, কোনদিন তুমি আমাকে ভুল বুঝ না।

না, ওগো না...দু'বাহু দিয়ে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে মনিরা।

বনহুরের চিবুকটা ধীরে ধীরে নেমে আসে মনিরার মাথার উপর। গভীর আবেগে আরও নিবিড় করে কাছে টেনে নেয় ওকে।

.

ঘুমন্ত মনিরার হাতের মুঠা থেকে নিজের হাতখানা ধীরে ধীরে মুক্ত করে নিয়ে সোজা হয়ে বসলো দস্যু বনহুর। কক্ষের লণ্ঠনের আলোতে একবার তাকালো ওর

মুখের দিকে। তারপর। কক্ষের বাইরে এসে দাঁড়াল। জমাট অন্ধকারে চারদিক আচ্ছন্ন। আকাশে অসংখ্য তারা টিপ টিপ করে জ্বলছে। নিচে সীমাহীন জলরাশি ভারতী নদীর বুকে জোয়ার এসেছে। উচ্ছল জলতরঙ্গের ছল ছল কলকল শব্দ, আর সেই সঙ্গে মাঝিদের দাঁড়ের ঝুপঝাঁপ আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শুনা যাচ্ছে না।

বনহুর তার কালো প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করল। তারপর ডাকলো– কায়েস!

বজরার ছাদে উদ্যত রাইফেল হাতে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল কায়েস, দস্যু বনহুরের ডাকে অনুচ্চকণ্ঠে বলল–সর্দার! সঙ্গে সঙ্গে বজরার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে বনহুরের সামনে। দাঁড়ালো সে।

বনহুর জিজ্ঞেস করল–আমাদের বজরা এখন কোন এলাকায় পৌঁছেছে কায়েস?

আমাদের বজরা এখন সিন্ধি পর্বতের নিকটবর্তী হয়ে চলেছে।

সিন্ধি পর্বত?

হ্যাঁ সর্দার।

খুব ভয়ঙ্কর স্থান এই সিন্ধি পর্বত। এখানে এই পর্বতে এক ধরনের জীব আছে, যারা মানুষের গন্ধে উন্মাদ হয়ে ওঠে। আমাদের অনুচরগণকে খুব সতর্কতার সাথে বজরা চালাবার নির্দেশ দাও।

আচ্ছা সর্দার।

যাও, বজরা সিন্ধি পর্বতের নিকট পৌঁছাবার পূর্বে কথাটা সবাইকে জানিয়ে দাও।

আগেই সবাইকে এ কথা জানানো হয়েছে।

তবু আবার স্মরণ করিয়ে দাও।

কায়েস কুর্ণিশ জানিয়ে চলে যায়।

বনহুর ফিরে তাকাতেই দেখতে পায় তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে মনিরা।

কায়েস চলে যাবার পর মনিরা বনহুরের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল মনিরার। পাশে স্বামীকে না দেখতে পেয়ে উঠে ধীরে ধীরে বজরার বাইরে এসে দেখে বনহুর ও তার একজন অনুচরের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে।

একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল মনিরা। কায়েস চলে যেতেই স্বামীর পেছনে এসে দাঁড়ায় সে।

বনহুর মনিরাকে লক্ষ্য করে হেসে বললো–ঘুম ভেঙে গেল?

হ্যাঁ, একটা দুঃস্বপ্ন দেখলাম।

ও কিছু না, চলো।

মনিরা ও দস্যু বনহুর বজরার কক্ষে প্রবেশ করে শয্যায় এসে বসলো।

বনহুর শয্যায় গা এলিয়ে দিল।

মনিরা বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কভরা কণ্ঠে বললো–ওর সঙ্গে কি যেন বলছিলে?

কিছু না।

সত্যি করে বল, কি বলছিলে তুমি ওকে? সিন্ধি পর্বতে নাকি ভয়ঙ্কর এক ধরনের জীব আছে, মানুষের গন্ধে নাকি তারা উন্মাদ হয়ে ওঠে?

হ্যাঁ মনিরা, সিন্ধি পর্বত অতি ভয়ঙ্কর স্থান। আমরা যতক্ষণ না এই পর্বত অতিক্রম করতে পেরেছি ততক্ষণ মোটেই নিশ্চিন্ত নই।

আমার কিন্তু বড় ভয় করছে। মনিরা বনহুরের পাশে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো।

বনহুর ওকে টেনে নিল আরও কাছে, হেসে বসলো–এত ভীতু তুমি?

আমার মন যেন কেমন করছে। আচ্ছা, এ পথ ছাড়া আর কি কোন পথ ছিল না, যে পথে আমরা নিরাপদে ঝিল শহরে পৌঁছতে পারি?

মনিরা তুমি একেবারে ছেলে মানুষ! জানো না তোমার স্বামী স্বাভাবিক মানুষ নয়। মানুষকুলে জন্ম হলেও লোকসমাজে তার কোন স্থান নেই। পুলিশমহল এত সতর্ক, এত চালাক হয়ে পড়েছে যে, দস্যু বনহুরকে তারা আজ অতি সহজেই খুঁজে নিতে পারে, বিশেষ করে মিঃ জাফরী নিজে এবার লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। যে কোন ব্যক্তি দস্যু বনহুরকে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় তার কাছে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে, সেই তৎক্ষণাৎ ঐ লাখ টাকা পেয়ে যাবে। মনিরা, এতবড় সুযোগ কোন্ হতভাগা হেলায় নষ্ট করবে? তাই প্রতিটি রাস্তায়, দোকানের আশেপাশে, হোটেলে, ক্লাবে, সিনেমা হলে, মাঠে-ঘাটে এমন কি গ্রামে গ্রামে সি, আই, ডি পুলিশ সর্বদা সতর্ক পাহারা দিয়ে চলেছে। তাদের প্রত্যেকের নিকট রয়েছে তোমার স্বামীর একটি ছবি আর গুলীভরা রিভলভার।

সত্যি! এ তুমি কি বলছ?

শিউরে উঠলে কেন মনিরা? এতটুকুতেই ভীত হলে তোমার চলবে না, তুমি যে দস্য পত্নী!

মনিরা বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। একটা দুশ্চিন্তার কালোছায়া তার সমস্ত মুখ ছেয়ে ফেললো। শুষ্ককণ্ঠে বললো–তুমি তাদের কোন অন্যায় করোনি?

আপনজনের কাছে কোনদিন অপরাধ ধরা পড়ে না। ওরা কোন ভুল করেনি মনিরা, সত্যিই আমি দোষী, অপরাধী। নইলে আজ লোকসমাজে কেন আমার স্থান নেই, কেন আমি সবার সামনে প্রকাশ্যে গিয়ে দাঁড়াতে পারি না। কেন আজ সকলের কাছে আত্মগোপন করে, এমন কি নিজের মায়ের কাছে না জানিয়ে তোমাকে চুরি করে নিয়ে আসতে হয়েছে?

কোথায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছ তা তো কখনও আমাকে বললে না?

বলবো সব বলবো, তোমাকে। শুন মনিরা, এখনও তুমি অনেক কথা জানো না। সেদিন। তোমাকে তোমার চাচার বাড়ি থেকে চুরি করে পালিয়ে নিয়ে আসার পর তোমার চাচা পুলিশে ডায়েরী করে দেন এবং তোমাকে যে আমি, মানে দস্যু বনহুর

চুরি করে নিয়ে গেছি, এ কথা তিনি জানাতে ভুলেন না, এবং সেই কারণেই তোমাদের বাড়ি তল্লাশি চলে। তুমি সেদিন ঝি এর ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে না থাকলে ঐ দিন তোমাকে তোমার চাচা জোরপূর্বক নিয়ে যেত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া শহীদের সঙ্গে পুনরায় তোমার বিয়েও দিত, এটা… …

চুপ করো! ও কথা বলতে তোমার বাধছে না?

হেসে বলল বনহুর–যা সত্য ঘটতো তা বলতে আপত্তি কি মনিরা?

কিছুতেই তা ঘটতো না। মনিরা শুধু নারী নয়, সে দস্যু সম্রাটের পত্নী প্রাণাধিকা স্ত্রী, দস্যুসম্রাট কি এত সহজেই তার স্ত্রীকে? ….

মনিরা তুমি যা বলছ তা সত্য। দস্যু বনহুরের স্ত্রীর শরীরে হাত দেয় পৃথিবীতে এমন কেউ নেই! ঠাট্টা করলাম মনিরা। না, ওসব ঠাট্টা আমার মনকে অস্থির করে দেয়।

হ্যাঁ শুনো, তারপর যখন তোমাকে তোমার বড় চাচা এবং পুলিশ চৌধুরীবাড়িতে খুঁজে পেল, তখন অবিরাম সন্ধান চললো, কোথায় গেছে বা আছো তুমি। প্রথমে তো তোমার বড় চাচা ভেবেছিলেন তুমি কোন পুকুরে বা ডোবায় আত্মহত্যা করেছ; তারপর অনুসন্ধান চালিয়ে যখন কোন পুকুরে বা ডোবায় তোমার লাশ তারা খুঁজে পেল না, তখন ঠিক ধরে নিল দস্যু বনহুরেরই এই কাজ। পুলিশমহলও তোমার বড় চাচার সন্দেহে একমত হলো, তোমাকে যদি গত দুদিন পূর্বে এভাবে সরিয়ে না আনতাম, তাহলে বুঝতে পারছ, হয়তো দস্যুসম্রাটও তার প্রিয়তমাকে–এ কথা শেষ না করেই একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো দস্যু বনহুর।

কোথায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছ তা তো বললে না?

বললো মনিরাশুনো, ঝিন্দা শহর এক অপূর্ব শহর। এই শহরের এক প্রান্তে আমি তোমার জন্য সুন্দর একটি বাড়ি কিনেছি। আমার ইচ্ছা সেই বাড়িতে তোমাকে রাখবো। এই শহরে তুমি সম্পূর্ণ অপরিচিতা। এখানে তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে।

কিন্তু মামীমা….

হ্যাঁ, তাকেও নিয়ে আসতে পারতাম, কিন্তু সেটা ঠিক হবে না। আম্মাকে সরিয়ে নিলে তার সোনার সংসার উচ্ছন্নে যাবে। তাঁর স্বামীর চিহ্ন ঐ চৌধুরীবাড়ির কোন অস্তিত্ব থাকবে না। বৃদ্ধ সরকার সাহেব আছেন, নকীব বিশ্বাসী ভৃত্য। তা ছাড়া অনেক আত্মীয়-স্বজন আছেন। মাঝে মাঝে এ হতভাগা সন্তান গিয়েও তার সন্ধান নেবে, কি চিন্তা বল?

তাঁকে বলে আসাটা উচিত ছিল না?

ছিল, কিন্তু সম্ভব ছিল না। তুমি মনে করো না মনিরা, চৌধুরীবাড়িতে কোন গুপ্তচর নেই।

সেখানেও আছে?

আছে এবং থাকবেও। তোমাকে নিয়ে আসার পর পুলিশ জানতে পেরেছে, তুমি এতোদিন চৌধুরীবাড়িতেই আত্মগোপন করে ছিলে এবং অচিরেই পালিয়েছ। আর তুমি যে দস্যু বনহুরের সঙ্গেই গিয়েছ, এ কথাও পুলিশমহল জানতে পেরেছে।

সেই কারণেই বুঝি.......

হ্যাঁ, সেই কারণেই আমি এই নির্জন পথ বেছে নিয়েছি, তোমাকে নিয়ে অতি সহজে পৌঁছতে সক্ষম হবো, ঝিন্দ শহরের আমার সেই বাড়িতে

কি জানি আমার মনে কেমন যেন আতঙ্ক জাগছে।

কিসের আতঙ্ক মনিরা?

বলতে পারবো না।

ছিঃ, মন খারাপ করো না!

ওগো, তোমার জন্য আমি সব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু অজানা অচেনা জায়গায় গিয়ে তোমাকে ছাড়া আমি যে এক মুহূর্তও বাচবো না।

মনিরা, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। তুমি বিশ্বাস করো..

ঠিক সেই মুহূর্তে বজরার ছাদে কায়েসের রাইফেল গর্জে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে কায়েসের কণ্ঠস্বর–সর্দার, একটা বিরাট আকার জানোয়ার এদিকে সাঁতার কেটে আসছে বলে মনে হচ্ছে!

মনিরা দু'হাতে বনহুরের গলা জড়িয়ে ধরলো। ভয়বিহ্বল কণ্ঠে বললো–সর্বনাশ! তুমি যে জীবের কথা বললে সেই জীব না তো?

বনহুর মনিরাকে নিবিড় করে টেনে নিয়ে বললো–সেই রকমই মনে হচ্ছে।

তাহলে উপায়?

মনিরা, তুমি এই ছোরাখানা নিয়ে এখানে অপেক্ষা করো, আমি যাই।

না, কিছুতেই আমি তোমায় যেতে দেব না।

পাগলী, জানো না ঐ জীবগুলো কত ভয়ঙ্কর, কত সাংঘাতিক! এই মুহূর্তে আমাদের সবাইকে মরতে হবে, যদি সে এই বজরায় হানা দেয়। তুমি ভয় পেও না মনিরা, আমি আসছি,

বনহুর উদ্যত রিভলবার হাতে বজরার ভেতরে থেকে দ্রুত বেরিয়ে যায়।

মনিরা বজরার কক্ষে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকে।

বনহুর বজরার বাইরে বেরিয়ে আসতেই কায়েস হাঁপাতে হাঁপাতে তার পাশে এসে দাঁড়ালো–সর্দার, একটা হাতির মত জানোয়ার নদীর মধ্যে সাঁতার কেটে এদিকে এগিয়ে আসছে। ঐদিকে অন্ধকারে ভাল করে তাকিয়ে দেখুন...দেখুন সর্দার!

কায়েস, তুমি গুলী ছুঁড়ে ভুল করেছ। হয়তো জানোয়ারটা নদী পার হয়ে ওপারে চলে যাচ্ছিল, তুমি তাকে শব্দ করে জানিয়ে দিয়েছ, আমরা মানুষের দল এই পথে যাচ্ছি। এত বুদ্ধিহীন তোমরা।

না সর্দার, আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি জানোয়ারটা আমাদের বজরার দিকে এগুচ্ছে।

আমি তো দেখছি, যদিও অন্ধকার তবুও বেশ বুঝা যাচ্ছে, বিরাট দেহ একটা কিছু এদিকে আসছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, অতবড় একটা জীব পানিতে সাঁতার কেটে আসছে অথচ কোন শব্দ হচ্ছে না। কায়েস, আমাদের সব অনুচরকে ডাকো।

সবাই উপস্থিত সর্দার। শুধু মাঝিরা বজরার দাঁড় টেনে চলেছে।

তাদের আরও দ্রুত হাত চালাতে নির্দেশ দাও।

আচ্ছা, আমি বলে আসছি। কায়েস ক্ষিপ্র পদক্ষেপে মাঝিদের দিকে চলে যায়।

বনহুর তার চারপাশে দেখতে পায় তার অনুচরগণ উদ্যত রাইফেল বাগিয়ে অপেক্ষা করছে।

বনহুর ব্যস্তকণ্ঠে বলে ওঠে–তোমরা বিচলিত হবে না। সকলে নিজ নিজ অস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা কর। ঐ যে কালোমত জিনিসটা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, তা অতি ভয়ঙ্কর জীব। যেমন করে হউক তোমরা তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করবে। আমাদের বজরার নিকটে পৌঁছলে কিছুতেই। ওর কবল থেকে রক্ষা পাবার উপায় থাকবে না। যাও তোমরা সবাই বজরার চার পাশে রাইফেল নিয়ে অপেক্ষা কর! আমি বজরার উপরে যাচ্ছি।

কায়েস ততক্ষণে বনহুরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বনহুর কায়েসকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো-কায়েস, আমি বজরার উপরে যাচ্ছি, তুমি বজরার দরজায় দাঁড়িয়ে সাবধানে পাহারা দাও, বুঝেছ?

জ্বী হ্যাঁ, বুঝেছি।

বনহুর ততক্ষণে গুলীভরা রিভলভার নিয়ে বজরার ছাদে উঠে গিয়েছে।

মনিরা বজরার ভেতরে বসে আতঙ্কে শিউরে উঠলো। হায় খোদা, একি হলো! এমন একটা বিপদের কথা সে কল্পনাও করতে পারেনি। নিজের জন্য তার চিন্তা নেই, তার ভয় হচ্ছে স্বামীর জন্য। ওকে তুমি বাঁচিয়ে নাও খোদা! ওকে তুমি রক্ষা কর! কিছুক্ষণ পূর্বে দেখা স্বপ্নটার কথা মনে হতেই বুকটা ধক ধক করে উঠলো। কে বা কারা যেন তার কাছ থেকে তার স্বামীকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে

কিছুতেই মনিরা তাকে ধরে রাখতে পারছে না, সে কি ভীষণ চেহারার লোকগুলো! তাদের সকলের হাতে এক একটা সূতীক্ষ্ণ ধারাল খর্গ। ওকে নিয়ে গিয়ে বলি দেবে, কালী মন্দিরে বলি দেবে–তার স্বামীকে ঠিক সেই সময় মনিরার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তখন থেকেই একটা ভয় তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, না জানি কি বিপদ তাদের জন্য এগিয়ে আসছে, ঠিক হলোও তাই। মনিরা এভাবে বজরার মধ্যে বসে থাকতে পারছে না, ছুটে বেরিয়ে আসতে গেল!

সঙ্গে সঙ্গে কায়েস বলে উঠলো–আপনি এ সময় বাইরে বের হবেন না। বের হবেন না, যান ভেতরে যান

ও কোথায়?

সর্দার বজরার ছাদে!

আমিও যাব সেখানে।

না, আদেশ নেই।

আমি যাব।

না না, কিছুতেই এ সময়—

কায়েসের কথা শেষ হয় না, একটা ভয়ঙ্কর গর্জন নদীবক্ষ প্রকম্পিত করে তোলে–হুম হুম!

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো বজরার ছাদে দস্যু বনহুরের হাতের রিভলভার, পরক্ষণেই তার গলার আওয়াজ শুনতে পেল মনিরা–তোমরা গুলী ছোড়, সবাই গুলী ছোড়ো....

একসঙ্গে গর্জে উঠলো কয়েকটা রাইফেল আর রিভলভার।

একজন অনুচরের কণ্ঠ শোনা গেল সর্দার, জীবটাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

বনহুরের কণ্ঠ–তোমরা নিজ নিজ রাইফেল প্রস্তুত করে দাঁড়াও। এখনই ভেসে উঠবে।

পুনরায় আর একজন অনুচরের কণ্ঠস্বর-ঐ যে, ঐ যে সর্দার–একেবারে আমাদের বজরার নিকটে এসে পড়েছে সর্দার–সর্দার

গুলী চালাও, গুলী চালাও-বনহুরের কণ্ঠস্বর এবং সঙ্গে সঙ্গে তার রিভলভারের গর্জন।

পর পর গুলীর আওয়াজে নদীবক্ষ প্রকম্পিত হতে লাগলো।

সবাই গুলী ছুড়ছে, কিন্তু জীবটা গেল কোথায়! আবার নদীবক্ষে অদৃশ্য হয়েছে।

বজরার মাঝিগণ সবাই দাঁড় ছেড়ে যে যেদিকে পারছে আত্মগোপন করেছে। বজরাখানা অথৈ নদীবক্ষে শুধু দুলছে, আর দুলছে।

হঠাৎ বজরার পেছন থেকে ভেসে এলো একটা করুণ আর্তনাদ-সর্দার বাঁচান....পরমুহূর্তেই ঝপাৎ করে একটা শব্দ।

জীবটা একজন মাঝি কিংবা বনহুরের অনুচরকে টেনে নিয়েছে।

রাতের জমাট অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। নদীবক্ষ থেকেও পুনরায় ভেসে এলো করুণ আর্তকণ্ঠ-বাঁচান, বাঁচান, বাঁচায়া-য়া-য়া-ন।

অন্ধকারেও বনহুরের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো ক্রুদ্ধ সিংহের মত। তারই চোখের সামনে তারই একটা অনুচর এভাবে প্রাণ হারাবে। মুহূর্তের জন্য সে ভুলে গেল সব, রিভলভার হাতে নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লো সে নদীতে।

সঙ্গে সঙ্গে তার অনুচরগণ আর্তনাদ করে উঠলো–একি করলেন সর্দার! একি করলেন—

কায়েস চিৎকার করে উঠলো–সর্দার, সর্দার—

নির্জন নদীর বক্ষে প্রতিধ্বনি জাগলো–সর্দার, সর্দার–

মনিরা এক ধাক্কায় কায়েসকে সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো বজরার বাইরে, সেও আর্তনাদ করে উঠলো-কি হলো? কি হলো-বল তোমাদের সর্দার কোথায়? বল বল?

একজন বলে উঠলো-আমাদের একজনকে ঐ জীবটা ধরে নিয়ে গেছে, তাই সর্দার নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন ওকে বাঁচাতে।

সর্বনাশ! মনিরা এবার তাকালো নদীর জলরাশির দিকে, পরমুহূর্তে সেও ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল নদীতে।

অমনি কায়েস এবং আরো কয়েকজন মনিরাকে ধরে ফেলল মনিরা পাগলিনীর মত চিৎকার করতে লাগলো–ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে ছেড়ে দাও। আমিও যাব ওর কাছে। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও–

কিন্তু মনিরা সামান্য দুর্বল একটা নারী। ওরা দস্যু..বলিষ্ঠ পুরুষের দল, ওদের সঙ্গে সে কি পারে! কিছুতেই সে ওদের বলিষ্ঠ হাতের মুঠা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তার প্রিয় স্বামীর নিকটে পৌঁছতে সক্ষম হলো না।

ওরা তাকে জোর করে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে বজরার কক্ষে রেখে আসল।

বনহুর নদীবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে দ্রুত সাঁতার কেটে এগুলো যেদিক থেকে একটু পূর্বে করুন আর্তনাদটা ভেসে এসেছিল। প্রাণপণ চেষ্টায় এগুতে লাগলো সে। রাতের অন্ধকার না হলে সে দেখে নিত কত বড় ভয়ঙ্কর জীব ওটা। কিন্তু বনহুর কিছুই দেখতে পারে না-শুধু শুনতে পাচ্ছে তার অনুচরের আর্তচিৎকার–সর্দার একি করলেন! একি করলেন! মনিরার করুন কণ্ঠস্বর তার কানে ভেসে আসছে। কিন্তু পরক্ষণেই জলোচ্ছ্বাসের শব্দে সব তলিয়ে যায়!

বনহুর রিভলভার উঁচু করে নিয়ে সঁতরে এগুচ্ছে। সামান্য এগিয়েছে, অমনি একটা লোমশ বাহু তার গলা টিপে ধরলো, কি-কি ভয়ঙ্কর আর কঠিন বাহু দুটো জীবটার। সাঁড়াসির মত টিপে ধরলো বনহুরের গলাটা।

বনহুর মরিয়া হয়ে রিভলভারটা পানির মধ্যেই চেপে ধরলো লোমশ বাহুখানার ওপর, কিন্তু এত জোরে তার গলায় চাপ পড়ছে যে, তার হাতখানা শিথিল হয়ে এলো। তবু অতি কষ্টে রিভলবারখানা ধরে রাখার চেষ্টা করতে লাগলো। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে ওর। বাঁ হাতে সে ঐ লোমশ হাতখানা টেনে ছাড়িয়ে ফেলতে গেল, কিন্তু এতটুকু নড়াতে পারলো না।

বনহুরের মত বলিষ্ঠ পুরুষও অল্পক্ষণের মধ্যে কাহিল হয়ে পড়লো, শেষ পর্যন্ত নিজেকে বাঁচাবার জন্য সে মরিয়া হয়ে উঠলো। অতি কষ্টে রিভলভারখানা উঁচু

করে পানির মধ্যে। লোমশভরা একটা বুক লক্ষ্য করে রিভলভারের ট্রিগার টিপল।

পানির মধ্যে তেমন কোন আওয়াজ না হলেও রিভলভার থেকে গুলী বেরুলো এটা বুঝতে। পারলো বনহুর। কিন্তু কি আশ্চর্য, জীবটা এতটুকু নড়লো না, তার হাতখানা আরও মজবুত হয়ে বসে যাচ্ছে বনহুরের গলায়।

বনহুরের চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে এলো।

দস্যু বনহুরের জ্ঞান ফিরে এলো। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো সে। স্মরণ করতে চেষ্টা করলো এখন সে কোথায়। একি, তার তো মৃত্যু ঘটেছে! সেই যে নদীবক্ষে ভীষণ জীবটার হাতের মুঠায় তার কণ্ঠ নিষ্পেষিত হয়েছে। সে বেঁচে রইলো কিভাবে? চারদিকে ভাল করে তাকালো বনহুর, না সে তো মরেনি। এ যে একটা গহন বন। হঠাৎ ওর দৃষ্টি চলে গেল সামনে, চমকে উঠলো বনহুর। তার অদূরে খণ্ডবিখণ্ড একটা দেহ পড়ে আছে। একটা মানুষের দেহ। বনহুর তাড়াতাড়ি উঠতে গেল, লোকটাকে দেখবে, কিন্তু শরীরে এত ব্যথা সে অনুভব করলো যে, একটুও নড়তে পারলো না। বনহুর নিজের দেহের দিকে তাকালো। দেখলো তার শরীরের অনেক জায়গা ক্ষতবিক্ষত। গলায় হাত দিতেই ব্যথায় টন টন করে উঠলো, ফুলে মোটা হয়ে গেছে গলাটা। ঢোক গিলতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে। সে তাহলে মরেনি, এখনও জীবিত আছে। সেই জীবটা তাকে হত্যা করেনি। কিন্তু ঐ লোকটা কে, যার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করে খাওয়া হয়েছে! নিশ্চয়ই। তারই সেই হতভাগ্য অনুচরটির দেহ!

অতি কষ্টে নিজেকে টেনে টেনে বনহুর ঐ মৃতদেহটার নিকটে পৌঁছতে সক্ষম হলো। মৃতদেহটার দেহ একেবারে ছিন্নভিন্ন খণ্ড-বিখণ্ড, দেখে চিনবার কোনো উপায় নেই। এ তারই অনুচর ছাড়া আর কেউ নয়।

বনহুর আশ্চর্য হলো, এতক্ষণও তার দেহ ঐ লোকটার মত ছিন্নভিন্ন হয় নি কেন? তাবে কি তাকে রেখে দেওয়া হয়েছে পরে ভোজনের জন্য..ঠিক তাই হবে।

কিন্তু ওরা কোথায়–মনিরা আর তার অনুচরগণ। তাদেরকেও কি ঐ নিষ্ঠুর জীবটা হত্যা করেছে? বনহুরের মনের মধ্যে একটা অশান্তি ঘূর্ণি হাওয়ার মত ঘুরপাক খেতে লাগলো। নিজের কথা ভুলে গিয়ে ওদের চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লো দস্যু বনহুর।

কিন্তু বেশিক্ষণ এখানে এভাবে বসে ভাববার সময় তার নেই। তাকে বাঁচতে হবে, যেমন করে হোক বাঁচতে হবে। মরতে হলে এমনভাবে মরা তার চলবে না।

বনহুর অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ালো। মাটিতে দৃষ্টি পড়তেই তার সাহসী অন্তরও শিউরে উঠলো। যেখানে বনহুর তখন দাঁড়িয়ে রয়েছে সে জায়গাটা ভিজা স্যাঁতসেঁতে ধরনের। বনহুর স্পষ্ট দেখলো। ভিজা মাটির বুকে অদ্ভুত ধরনের কয়েকখানা পায়ের ছাপ।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালাতে চেষ্টা করলো। হয়তো এখনই সেই জীবটা এসে পড়বে এবং তার দেহটা অখণ্ড খণ্ড করে খেয়ে ফেলবে। কি ভয়ঙ্কর জীব এটা! কেমন দেখতে, কি ওর নাম কিছুই জানে না সে।

জীবটাকে একবার দিনের আলোয় দেখার ইচ্ছা হলো দস্যু বনহুরের। সে ভাবতে লাগলো কি করে, কোথায় লুকিয়ে ঐ জীবটাকে দেখতে পারে, অথচ নিজেকে বাঁচাতে হবে।

হঠাৎ একটা থপ থপ শব্দ বনহুরের কানে এলো। চমকে উঠলো সে, তাড়াতাড়ি পাশের। একটা পাথরখণ্ডের নিচে গিয়ে লুকালো।

অল্পক্ষণেই তার নজরে পড়লো সামনের গাছগুলোর মাথার উপর দিয়ে একটা ভয়ঙ্কর মুখ। প্রকাণ্ড একটা মাথা, ছেলেদের খেলার বলের মত দুটো চোখ আগুনের ভাটার মত জ্বলছে।

বিরাট বড় বড় কতগুলো দাঁত। দু'হাত দিয়ে গাছপালা সরিয়ে হুমহুম শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসছে।

বিস্ময় নিয়ে বনহুর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। ইস, যদি তার হাতে একটা রিভলভার বা ঐ ধরনের কিছু থাকত! পানিতে গলায় জীবটার হাতের চাপে সে জ্ঞান হারাবার সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে রিভলভার পড়ে গিয়েছিল।

জীবটা ততক্ষণে নিকটে পৌঁছে গেছে।

বনহুর অবাক হয়ে দেখলো গরিলা ধরনের জীব এটা। জীবটা একটা তালগাছের সমান উঁচু হবে, লম্বা লম্বা দুটি লোমশ বাহু। দেহের আকারে মাথাটা বেশ ছোট-ঠিক গরিলার মত, কিন্তু আসলে জীবটা গরিলা নয় বেশ বুঝতে

পারলো বনহুর। একটা আশ্চর্য জিনিস সে লক্ষ্য করলো, জীবটা একটি মাত্র পা! এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। দাঁতগুলো অতি ধারালো, তীক্ষ্ণ। আংগুলের নখগুলোও তেমনি সূতীক্ষ্ণ। পা-খানা একটা তালগাছের গুঁড়ির মত মোটা, পায়ের তলাটা ঠিক যেন কুলোর মত চওড়া।

বনহুর এর বেশি আর লক্ষ্য করার মত সুযোগ পেল না। অতি কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে পাথর খণ্ডটার নিচে লুকিয়ে পড়লো।

জীবটা এগিয়ে এসে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ পূর্বে সে যেখানে শুয়েছিল সেখানে কেউ নেই দেখতে পেয়ে জীবটা ভয়ংকর গর্জন করে আশেপাশের গাছ থেকে ডালপালা ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে ফেলতে লাগলো। একটা পা দিয়ে বারবার লাফিয়ে সেই জায়গাটাকে তোলপাড় করে দিতে লাগলো।

বনহুর মাটি চেপে ধরে পড়ে রইলো। ভূমিকম্পের মত দুলে দুলে উঠছে গোটা বনটা। সে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! বনহুর যেমন আশ্চর্য হচ্ছে তেমন অনুতাপ হচ্ছে তার মনে। এত কাছে পেয়েও এমন একটা জীবকে সে হত্যা করতে পারলো না। বনহুর আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করলো। জীবটা যা কিছু করছে বাঁ হাতে করছে। গাছের মোটা মোটা ডালপালা মড় মড় করে ভেঙে টুকরো টুকরো করছে সে ঐ এক হাতেই। ভাল করে তাকিয়ে দেখলো বনহুর, জীবটার দক্ষিণ হাতের কনুইয়ের নিচে খানিকটা রক্ত জমাট বেঁধে আছে। এবার সে বুঝতে পারলো রাতে তার রিভলভারের গুলী ব্যর্থ হয় নি। জীবটার একটা হাত নষ্ট করে দিয়েছে।

হঠাৎ বনহুর শিউরে উঠলো, যে পাথরটার নিচে সে লুকিয়ে আছে সেই পাথরটা তুলে নেবার চেষ্টা করছে জীবটা। হয়তো ভাবছে, এটা আবার এখানে পড়ে থাকবে কেন, অন্যান্য ডালপালার সঙ্গে ওটাকেও সে দূরে নিক্ষেপ করে মনের রাগ মেটাবে।

এখন উপায়? বনহুরের মুখের সামনে কয়েকটা মোটা মোটা আংগুল নেমে এলো। বলিষ্ঠভাবে এঁটে ধরে পাথরটাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করছে জীবট!

দক্ষিণ হাতখানা ভাল থাকলে হয়তো এতক্ষণে পাথরটাকে সে অনায়াসে টেনে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিত দূরে। সঙ্গে সঙ্গে তার হারানো বস্তুটাও মিলে যেত। মৃত্যু হতো এই মুহূর্তে বনহুরের এটা সুনিশ্চয়। কিন্তু জীবটার দক্ষিণ হাতখানা

অকেজো হয়ে পড়ায় বনহুর এ যাত্রা রক্ষা পেল। ভাগ্যিস সে জীবটার দক্ষিণ হাতখানা নষ্ট করে দিতে পেরেছিল তাই প্রাণে বেঁচে গেল।

জীবটা কিছুক্ষণ পাথরখানা তুলে ফেলার চেষ্টা করে অসমর্থ হওয়ায় আশেপাশের গাছপালা ভেঙে তচনচ করে হুম হুম শব্দ করতে করতে অন্যদিকে চলে গেল। যাবার সময় বনহুরের মৃত অনুচরটির খণ্ড-বিখণ্ড দেহটার উপর পা দিয়ে কয়েকবার লাথি দিল। সে কী ভয়ঙ্কর শব্দ-থপ থপ! সঙ্গে সঙ্গে মাটি কেঁপে উঠতে লাগলো।

জীবটা সোজা যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে চলে গেল।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো বনহুর।

কিন্তু এই গহন বনে কতক্ষণ সে ঐ ভয়ঙ্কর জীবটার হাত থেকে রক্ষা পাবে? হয়তো ঐ রকম আরও অনেকগুলো জীব আছে। যে কোন মুহূর্তে তার মৃত্যু ঘটতে পারে। কিন্তু অতি সহজে সে কাবু হবার বান্দা নয়। মরতে হয় মরবে তাতে আফসোস নেই। কিন্তু ঐ অদ্ভুত জীবের হাতে নয়।

বনহুর পাথরটার নিচে থেকে বেরিয়ে এলো। কি করবে, কোন দিকে যাবে ভাবতে লাগলো। নদীটা কোন দিকে সে তাই লক্ষ্য করতে লাগলো।

অতি সন্তর্পণে নিজেকে ঝোঁপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে এগুতে লাগলো দস্যু বনহুর। হঠাৎ একটা শব্দ তার কানে এলো, অশ্বপদশব্দ বলে মনে হলো। ....

এই গহন বনে, বিশেষ করে সিন্ধি পর্বতের নিকটে অশ্বপদশব্দ–অবাক হলো বনহুর। তাড়াতাড়ি মাটিতে কান লাগিয়ে শুনলো। হ্যাঁ, তার অনুমান মিথ্যা নয়। কতগুলো অশ্ব একসঙ্গে এই দিকেই যেন ছুটে আসছে।

তবে কি কোন মানুষের আগমন হয়েছে?

আশায় আনন্দে বনহুরের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। পরক্ষণেই মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা দোলা দিল তার, পুলিশের দলতো তার সন্ধানে সিন্ধি পর্বতে আগমন করেনি!

তাড়াতাড়ি বনহুর একটা ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো। অশ্বপদশব্দ নিকটবর্তী হচ্ছে। বনহুর উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

অল্পক্ষণেই একদল অশ্বারোহী অতি দ্রুত তার সামনে দিয়ে চলে গেল। বনহুর লক্ষ্য করলো সর্বাগ্রের অশ্বারোহী পুরুষ নয়-নারী। অদ্ভুত তার শরীরের ড্রেস। মাথায় সুন্দর মুকুট, গলায় ঝক ঝক করছে মনিমুক্তার মালা। খোঁপায় জড়ানো কতগুলো ফুলের গুচ্ছ। কিন্তু একি, নারীর কোমরে বেল্টের খাপে তরবারি কেন?

আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করলো বনহুর। সামনের নারী অশ্বারোহীর পেছনে সবগুলো। অশ্বারোহী বলিষ্ঠ জোয়ান পুরুষ। সকলের হাতেই রাইফেল আর বন্দুক।

বনহুরের মনে একটা জানার বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। নিশ্চয়ই এরা সভ্য মানুষ, হয়তো তাকে এরা কোনরকম সাহায্য করতে পারে।

বনহুর যতদূর সম্ভব দ্রুত ঝোঁপঝাড় পেরিয়ে ছুটতে শুরু করলো, কোন্ দিকে গেল ওরা।

বনহুর কিছুদূর এগুতেই দেখলো একপাশে সিন্ধি পর্বতের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। আর একপাশে উজ্জ্বল জলরাশি তীরে আছাড় খেয়ে পড়ছে। এ সে কোথায় এসে পড়েছে? এটা তো সেই নদী, যে নদীবক্ষে কাল রাতে সে আর মনিরা বজরায় বসে ঝিন্দের পথে যাচ্ছিল।

অদূরে তাকাতেই বিস্ময়ে থ'হয়ে পড়লো বনহুর।

ঐ জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে একখানা মোটর বোট ধরনের নৌকা দাঁড়িয়ে আছে। আরও অবাক হলো সে, এত ঢেউয়ের আঘাতেও মোটর বোটখানা এতটুকু নড়ছে না বা দুলছে না।

অশ্বারোহিগণ সেই মোটর বোটখানার অদূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

বনহুর সামনে যাবে কিনা ভাবতে লাগলো। এমন সময় তার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো অশ্বারোহীদের সামনের নারীটির ওপর। নারীটিকে সবাই ঘিরে ধরে অভিবাদন করছে!

বনহুর বুঝতে পারলো উক্ত যুবতী ঐ দলের নেত্রী বা সে ধরনের কিছু হবে। রাণীকে অভিবাদন করে সবাই পেছনে সরে দাঁড়ালো। নারীটি এবার তার অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়ালো, তারপর হাত নাড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অশ্বারোহী বলিষ্ঠ পুরুষ তাদের নিজ নিজ অশ্বপৃষ্ঠে যে পথে এসেছিল সেই পথে ফিরে চললো। একজন তাদের রাণীর অশ্ব লাগাম ধরে নিজের অশ্ব চালনা করতে লাগলো, অল্প সময়ের মধ্যেই সাগরতীর জনশূন্য হয়ে পড়লো। একমাত্র সেই যুবতী ছাড়া আর কেউ নেই।

যুবতী এবার দ্রুত তার মোটরবোটের দিকে এগুলো।

বনহুর দ্রুত যুবতীর কাছে গিয়ে হাজির হলো। ডাকলো-এই শুনো।

যুবতী চমকে উঠলো, অবাক হয়ে তাকালো। এই জনহীন নির্জন স্থানে মানুষ দেখতে পেয়ে বিস্ময়ের সীমা রইলো না তার। সে বনহুরের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে ক্রুদ্ধ সিংহীর ন্যায় গর্জন করে উঠলো-কে তুমি?

যুবতী দস্যু বনহুরকে যখন নিরীক্ষণ করছিলো তখন বনহুরও ওকে সূতীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখে নিচ্ছিল। যুবতী সুন্দরী বটে-সুঠাম দেহ, যৌবনের জোয়ার তার সারা দেহে। চোখ দুটো বুদ্ধিদীপ্ত। যুবতী সাধারণ কোন মেয়ে নয় বুঝতে বাকি থাকে না বনহুরের।

বনহুর যুবতীর দিকে নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে দেখে যুবতী আরও রেগে গেল, কঠিন কণ্ঠে বললো–কে তুমি জবাব দাও?

যুবতীর আচরণে মুগ্ধ হলো দস্যু বনহুর। জীবনে কোন নারী তার সঙ্গে এভাবে কথা বলেনি বা বলতে সাহসী হয় নি। যাকে সে পেয়েছে বা যাকে সে দেখেছে সবাই তাকে চোখের পানি উপহার দিয়েছে।

বনহুরকে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললো যুবতী–কি চাও?

বনহুর বললো–জানতে চাই তুমি কে?

মুহূর্তে যুবতী কোমরের বেল্ট থেকে সূতীক্ষ্ণ ধার তরবারি খুলে নিল-আমি কে জানতে চাও? যদি প্রাণ দিতে চাও তবেই জানতে পারবে আমি কে!

প্রাণ নেবে। হেসে উঠলো দস্যু বনহুর!

যুবতী অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। দস্যু বনহুরের হাসির মধ্যে সে কি দেখতে পেয়েছে, সে নিজেই বুঝি জানে না!

বনহুর হাসি থামিয়ে বললো–এ সিন্ধী পর্বতে মানুষ একা কোনদিন বাঁচতে পারে না। মরতে যখন হবেই তখন না হয় তোমার হাতেই মরলাম। তবু সিন্ধী পর্বতের সেই ভয়ঙ্কর জীবের পেটে যেতে চাই না। হত্যা কর তুমি আমাকে।

যুবতী এবার তার উদ্যত তরবারি নামিয়ে নিল, বললো–তুমি জানো না যুবক আমি কে। জানলে আমার সামনে আসার সাহস তোমার হত না।

বনহুর বললো–নিশ্চয়ই কোন মহারাণী......

না, আমি সিন্ধী দস্যুদের রাণী।

বনহুর মিছামিছি ভয় পাবার ভান করে বললো– সর্বনাশ, তাহলে আমার মৃত্যু অনিবার্য! তুমি আমাকে হত্যা কর রাণী! তোমার হাতে মরতে আমার একটুও কষ্ট হবে না। বনহুর হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো সিন্ধীরাণীর সম্মুখে। মৃদু হেসে বললো– দাও। তোমার তরবারি আমার বুকে বসিয়ে দাও।

সিন্ধীরাণীর দু'চোখে বিস্ময়। একি অদ্ভুত যুবক! বড় মায়া হলো সিন্ধী রাণীর, বললো মরতে তোমার এত সাধ কেন যুবক?

বাঁচবার যার কোন আশা নেই, তার মৃত্যুভয়ে ভীত হবার কোন কারণই থাকতে পারে না।

সিন্ধীরাণী এগিয়ে আসে– তুমি বাঁচতে চাও?

বাঁচবার সখ কার না হয় রাণী?

এখন আমি তোমাকে কিভাবে বাঁচাতে পারি?

তুমি আমাকে মৃত্যুদণ্ড–

না, তা হয় না যুবক, চলো তোমাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।

তোমার সঙ্গে?

হ্যাঁ, রাজি আছ?

জীবনের বিনিময়ে আমি সব কাজেই রাজি আছি।

এসো। যুবতী তরবারিখানা খাপের মধ্যে রেখে এগিয়ে এলো। একটা রুমাল বের করে দস্যু বনহুরের চোখ দুটো বেঁধে দিল। তারপর বললো– ধর, আমার হাত ধর, এসো আমার সঙ্গে।

দস্যু বনহুরের মনে একখানা মুখ আলোড়ন তুলছিল, না জানি তার মনিরা এখন কোথায়, কেমন আছে। নিজেকে বাঁচাতে হলে এই যুবতীর সঙ্গে যাওয়া ছাড়া তার কোন উপায় নেই। তাকে বাঁচতে হবে। মনিরা কোথায়, তাকে বাঁচাতে হবে।

বনহুর হাত বাড়িয়ে যুবতীর হাত ধরলো।

বনহুর অনুভব করলো যুবতীর হাতখানা তার হাতের মুঠায় একটু কেঁপে উঠলো।

মৃদু হাসির আভাস ফুটে উঠলো বনহুরের ঠোঁটের কোণে। একেই বলে নারীজাতি। যারা এতটুকুতেই বিচলিত হয়ে পড়ে। এতটুকুতেই মুষড়ে যায়। একটু পূর্বে যে তাকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হচ্ছিল না, আর এক দণ্ডের মধ্যেই তার মধ্যে এসেছে বিরাট পরিবর্তন। নারীজাতি এমনই হয়, করুণা জাগে মনে।

বনহুরের মুখে হাসি দেখে বলে সিন্ধীরাণী–হাসলে কেন যুবক?

বনহুর নিজের আসনে স্থির হয়ে বসে বলল–নিয়তির খেলা দেখে হাসি পাচ্ছিল।

নিয়তির খেলা, সে কি রকম যুবক?

নিয়তি মানে অদৃষ্ট। একটু পূর্বেই মৃত্যু আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল, এক্ষণে বাঁচার আনন্দ আমাকে অভিভূত করে তুলছে। আচ্ছা, আমাকে তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ রাণী?

সাগরতলে।

সাগরতলে!

হ্যাঁ আমার গোপন আস্তানা সেই অদ্ভূত রাজ্যে। জান যুবক, তোমাকে আমি যেখানে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে কোনদিন কেউ যেতে পারেনি, আমার কোন অনুচরও নয়।

তাহলে আমিবনহুর গলায় ভীতি ভাব এনে বলে?

তোমার কোন ভয় নেই যুবক। আমার সাগর তলের সেই গোপন আস্তানা অতি সুন্দর, সেখানে কোন কষ্ট হবে না।

কিন্তু.... আমি সেখানে বাচবো তো? নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে না?

পাগল! আমি বুঝি মানুষ নই?

কিন্তু এমন করে আমার চোখ বেধে .....

না না, যতক্ষণ না আমি নিজে তোমার চোখের বাঁধন খুলে দিচ্ছি ততক্ষণ তুমি খুলবে না।

আচ্ছা।

বনহুর লক্ষ্য করলো মোটর বোটখানা সাঁ সাঁ করে নিচের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কই, তার শরীরে তো পানির ছোঁয়া লাগছে না। বোটখানা ছাড়ার পূর্বে একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিল বনহুর। এবার বুঝতে পারলো সিন্ধীরাণী কোন যন্ত্রের সাহায্যে মোটর বোটখানার উপরে আচ্ছাদন সৃষ্টি করছে, যার জন্য সাগরের জল তাদের বোটের ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হচ্ছে না।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর বনহুর বুঝতে পারলো মোটর বোটখানা থেমে পড়লো।

এবার দু'খানা কোমল হাত তার চোখের বাঁধন খুলে দিল।

বনহুর অবাক হয়ে দেখলো, সত্যিই অদ্ভুত এক রাজ্যে সে এসে পৌঁছেছে।

সিন্ধীরাণী বলল– যুবক নেমে এসো!

বনহুর নেমে পড়লো। ভাল করে লক্ষ্য করে বুঝতে পারলো, গভীর সাগরতলে অতি কৌশলে এই প্রাসাদ তৈরি করা হয়েছে। যদিও এখানে পৃথিবীর আলো-বাতাসের নামগন্ধ নেই, তবু নিঃশ্বাস নিতে কোন কষ্ট হচ্ছে না বা আলোর কোন অসুবিধা নেই। উজ্জ্বল নীলাভ আলো প্রতিটি কক্ষকে আলোকিত করে রেখেছে।

সিন্ধীরাণী সাগরতলে পৌঁছতেই বনহুর দেখতে পেল কতগুলো যুবতী তাকে অভ্যর্থনা জানালো। সবাই নতমস্তকে ওকে অভিবাদন করলো। যদিও তারা তাদের রাণীর সঙ্গে একটি পুরুষ মানুষকে দেখে আশ্চর্য হচ্ছে তবু কারও কোন প্রশ্ন করার সাহস হচ্ছে না। রাণীর অলক্ষ্যে সবাই একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিল।

সিন্ধীরাণী এবার গম্ভীর কণ্ঠে তার সহচরীগণকে বলল– একে নিয়ে যাও। সাবধানে বন্দী করে রাখো।

একজন সহচরী কুর্ণিশ জানিয়ে বলল– রাণীজী, সাগরতলে পুরুষ মানুষ নিয়ে আসা কি ঠিক হয়েছে?

সে প্রশ্ন তোমাকে করতে হবে না মায়া, তোমাকে যা বললাম তাই কর।

তবু মায়া বলে উঠলো মহারাজ যদি জানতে পারেন?

তিনি জানবার পূর্বেই আমি ওকে হাঙ্গরের মুখে নিক্ষেপ করবো।

এবার সহচরীগণ বেশ খুশি হয়েছে বলে মনে হলো দস্যু বনহুরের।

মায়া দস্যু বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো– এসো আমার সঙ্গে।

বনহুর বিনাবাক্যে মায়াকে অনুসরণ করলো।

মায়ার সঙ্গে বনহুর একটি আবছা অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করলো। সামান্য নীলাভ আলো ঘরটাকে আলোকিত করে রেখেছে। ঘরটা অত্যন্ত ঠাণ্ডা বলে মনে হলো তার। বনহুর সে কক্ষে প্রবেশ করতেই কক্ষের দরজা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেল।

কোথায় মায়া আর কোথায় কে! দস্যু বনহুর বেশ বুঝতে পারলো সে এখন সাগরতলে বন্দী।

হিমশীতল মেঝেতে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ভাবলো, এখন কিভাবে এই বন্দীখানা থেকে সে উদ্ধার পেতে পারে! এমন যে একটা অবস্থা তার জীবনে আসবে কল্পনাও করতে পারেনি দস্যু বনহুর। কিন্তু এত বিপদেও সে একটুও বিচলিত হয় নি। মাঝে মাঝে মনে পড়ছে মনিরার কথা। তার অন্যান্য অনুচর যারা বজরায় ছিল তাদের কথা। এখন ওরা কোথায়, কেমন আছে। জীবিত আছে না ওদের অবস্থাও তার সেই নিহত অনুচরটির মত হয়েছে কে জানে!

বনহুর দেখতে পেল একপাশে একটি গোলপাতার তৈরি চাটাই বিছানো রয়েছে। অগত্যা সে ঐ চাটাইটার ওপর গিয়ে বসলো।

হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে নিশ্চুপ বসে রইলো। জীবনে এই বুঝি দস্যু বনহুর ক্ষণিকের জন্য শান্তভাবে বসতে পারলো। চির-চঞ্চল, চির-উচ্ছল সে। বিশ্রাম বলে জীবনে সে কিছু জানে না।

বনহুর নিশ্চুপ বসে থাকলেও মন তার নিশ্চুপ ছিল না। এখান থেকে কিভাবে উদ্ধার পাবে, কিভাবে পালাতে সক্ষম হবে ভাবতে লাগলো। অবশ্য এখান থেকে পালানোর জন্য তাকে বেশি অসুবিধায় পড়তে হবে না, কারণ এই নারী রাজ্যে সে একমাত্র পুরুষ–দস্যু বনহুর মৃদু হাসলো।

.

মনিরা কিছুতেই ফিরে যাবে না। যে নদীগর্ভে তার স্বামী প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, সেইখানে সেও প্রাণ দেবে। কিন্তু দস্যু বনহুরের অনুচরগণ ও কায়েস তা হতে দিল না। মনিরাকে জোরপূর্বক বজরার কুঠরিতে আটকিয়ে তাকে সিন্ধে নিয়ে যাওয়া হল।

দস্যু বনহুরকে অনুচরগণ প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, কাজেই মনিবপত্নীকেও তারা কম ভালবাসে না। বনহুর মনিরাকে বিয়ে করেছে, এ কথা বনহুরের অন্যান্য অনুচর না জানলেও কয়েকজন বিশিষ্ট অনুচর জানত। বনহুর নিজে এদের কাছে বলেছিল। অবশ্য সে নূরীর কাছে বলতে চেয়েছে, কিন্তু নূরী তার কোন কথা শুনতে রাজি নয়। তাই কথাটা আজও নূরী জানে না।

সর্দার বিয়ে করায় তার অনুচরগণ সবাই খুশি হয়েছে, কিন্তু কেউ কথাটা নূরীকে বলার সাহসী হয় নি।

সিন্ধি শহরে পৌঁছে তার জন্য কেনা বাড়িটা দেখে মনিরার মনটা ব্যথায় গুমড়ে কেঁদে উঠল। তার সুখের জন্য মনির এতও করেছিল! রাজ প্রাসাদের মত বাড়ি-বাড়ির প্রত্যেকটা কক্ষ মূল্যবান আসবাবে সুন্দর করে সাজানো। বাড়ির সম্মুখে সুন্দর বাগান। নানারকম ফুলের সমাবেশ সেই বাগানে। গাড়ি বারান্দায় গাড়ি। দরজায় পাহারাদার, মনিরার যাতে কোন অসুবিধা না হয় সে জন্য সিন্ধিবাসী কয়েকজন দাস-দাসীও সংগ্রহ করে রেখেছে সে।

মনিরা এসব যতই লক্ষ্য করতে লাগল ততই সে ভেঙে পড়ল। নাওয়া খাওয়া সব ছেড়ে দিল। পাগলিনীর মত হয়ে পড়ল সে।

কায়েস মনিরাকে শান্ত, সুস্থ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

বনহুরের কয়েকজন অনুচর ফিরে গেল তাদের নিজস্ব আস্তানায়।

.

নূরী আজ ক’দিন হলো অস্থিরচিত্ত নিয়ে বনহুরের প্রতীক্ষা করছে। কোনদিন তো তার এমন বিলম্ব হয় না। এবার সপ্তাহ হতে চললো বনহুর ও তার কয়েকজন অনুচর উধাও হয়েছে! নূরীর একমাত্র ভরসা বনহুর যদি কোন বিপদে পড়তো বা পুলিশের হাতে বন্দী হত, তাহলে তার। অনুচরগণ ফিরে আসতো এবং সব সংবাদ দিত। কিন্তু আজও কেউ ফিরে এলো না, ব্যাপার কি!

কোথায় গেছে বনহুর, কবে ফিরবে, কেন ফিরছে না– সদাসর্বদা এই ধরনের প্রশ্নে রহমানকে সে অস্থির করে তুললো।

বনহুর অবশ্য রহমানকে সব বলে গেছে। রহমানকে না বলে সে যেতে পারে না, কারণ সেখানে তার বেশ কিছুদিন বিলম্ব হতে পারে।

রহমান নিজে বনহুর আর মনিরাকে সেদিন বজরায় উঠিয়ে দিয়ে এসেছে, কাজেই রহমান মুখে কিছু না বললেও সে নিশ্চিন্ত। তাদের সর্দার এখন কোথায় জানে সে।

বনহুর যাবার সময় রহমানের ওপর কিছু কাজের ভার দিয়ে গেছে এবং কিভাবে সেসব কাজ করতে হবে সব বলে গেছে। রহমান সেই মত কাজ করে চলেছে!

নূরীর বিচলিত ভাব লক্ষ্য করে রহমান দুঃখ পেত। নূরী যে বনহুরকে মনেপ্রাণে ভালবাসে এ কথা জানত রহমান। মুখে সান্ত্বনা দিত, বলতো, নিশ্চয়ই তিনি এসে যাবেন, অনেক দূরে গেছেন তাই ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে, চিন্তা করো না।

রহমানের সান্ত্বনায় নূরীর মন আশ্বস্ত হত না, মনের কোণে একটা দুশ্চিন্তার মেঘ জমাট বেঁধে থাকত।

হঠাৎ এমন দিনে বনহুরের কয়েকজন অনুচর এসে হাজির হলো সিন্ধ শহর থেকে। রহমানকে দুর্ঘটনার কথা খুলে বললো তারা।

রহমান আর্তনাদ করে উঠলো– সর্দার নেই!

অনুচরগণ মাথা নত করলো, সকলের চোখ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। জীবনে তারা কেঁদেছে কিনা কে জানে। কঠিন হৃদয় দস্যুগণ আজ তাদের সর্দারের শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লো।

নূরী শুনতে পেল যারা বনহুরের সঙ্গে গিয়েছিল তারা ফিরে এসেছে ছুটে গেল সে দরবারকক্ষে।

রহমান আর অনুচরগণ সেখানেই ছিল।

নূরী দরবারকক্ষে প্রবেশ করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো, কেমন যেন থমথমে ভাব বিরাজ করছে। সেখানে। নূরী লক্ষ্য করলো, রহমানের চোখে পানি। নূরীর মন আতঙ্কে শিউরে উঠলো। অন্যান্য অনুচর যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সকলের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো সে– একি, সকলের মুখেই একটা বিষাদের কালোছায়া! সকলের চোখেই অশ্রু! তবে কি তার হুরের কোন অমঙ্গল ঘটেছে?

নূরী ক্ষিপ্তের ন্যায় একজন অনুচরের জামার আস্তিন মুঠোয় চেপে ধরে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠলো– হুর কোথায়? হুর কোথায় বল?

অনুচরটি নীরব, কোন কথা বের হলো না তার কণ্ঠ দিয়ে।

নূরী ওর কাধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বার বার প্রশ্ন করতে লাগলো– বল হুর কোথায়? তোমরা অমন চুপ করে আছো কেন?

তবু কারও মুখ দিয়ে শব্দ বের হলো না।

নূরী বুঝতে পারলো, নিশ্চয়ই তার হুরের কোন অমঙ্গল ঘটেছে, নইলে সবাই ওরা নিশ্চুপ। থাকতো না। নূরী এবার রহমানের জামার আস্তিন চেপে ধরল– তুমিও কিছু বলছ না কেন?

আমার হুর কোথায় বল? বল কোথায়?

রহমান এতক্ষণ চুপ থাকলেও মনের মধ্যে তার ঝড়ের তাণ্ডব বয়ে চলেছে, সব সংবাদ গোপন করতে পারে, কিন্তু এ সংবাদ গোপন করা চলে না। রহমান বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো–নূরী, আমরা সর্দারকে হারিয়েছি!

সঙ্গে সঙ্গে নূরী আর্তনাদ করে উঠলো–কি বললে, আমার হুর হারিয়ে গেছে!

অন্য একজন অনুচর বলে উঠলো–হাঁ, আমাদের সর্দারের মৃত্যু ঘটেছে।

নূরী রহমানকে ছেড়ে দিয়ে দ্রুত ছুটে গেল, নিজের খোঁপার মধ্যে লুকানো ধারালো সূতীক্ষ্ণ ছোরাখানা বের করে সঙ্গে সঙ্গে বসিয়ে দিল অনুচরটার বুকে।

কেউ কিছু বুঝবার পূর্বেই এত দ্রুত এই ঘটনা ঘটে গেল যে, রহমান পর্যন্ত নূরীকে আটকাতে পারলো না।

অনুচরটা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো মেঝেতে। কিছুক্ষণ ছটফট করার পর স্থির হয়ে গেল তার দেহটা। রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো দরবার কক্ষের মেঝে!

নূরী এক মুহূর্ত ভূলুণ্ঠিত মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ছুটে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে।

রহমান বলল–একি হলো আমাদের! রহমান ছোট্ট বালকের ন্যায় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

সমস্ত আস্তানায় একটা গভীর বেদনার ছায়া ঘনিয়ে এলো। সর্দারের শোকে সমস্ত অনুচর মুষড়ে পড়লো। নূরী সেই যে বেরিয়ে গেল, আর ঘরে ফিরে এলো

না। বনে বনে কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এলো চুল, এলায়িত বস্ত্রাঞ্চল। দু'চোখে অশ্রু, পাগলিনীর ন্যায় হয়ে পড়লো নূরীর অবস্থা।

নূরী বনে বনে ঘোরে আর ডাকে হুর, হুর! কখনও ঝর্ণার পাশে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদের কোথায় তুমি! কখনও গাছের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় বনহুর তার দিকে তাকিয়ে হাসছে, ছুটে যায় ধরতে, অমনি গাছের গুঁড়িতে মাথা ঠুকে মাথা ফেটে যায়, রক্ত গড়িয়ে পড়ে। নূরী লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

রহমান নীরবে দেখে, সেও চোখের পানি ফেলে। রহমান নূরীকে ছোটবেলা থেকে ভালবাসে, প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, কিন্তু কোনদিন সে তার ভালবাসা নূরীকে জানায় নি। জানে রহমান, নূরী আর একজনকে ভালবাসে, তাই সে কোনদিন নূরীর প্রেমে বাদ সাধতে যায় নি।

আজ নূরীর অবস্থা রহমানের মনে ব্যথার আগুন জ্বেলে দিয়েছে। কি করবে, কি করে নূরীকে সুস্থ করা যায় ভেবে আকুল হয় সে।

একদিকে সর্দারের অভাবে সমস্ত আস্তানার দায়িত্বভার তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। কিভাবে তাদের কাজ চলবে, কিভাবে সবকিছু ঠিক রাখবে, এসব নিয়ে সব সময় তাকে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। সর্দারের অভাবে তাদের দল যাতে নষ্ট হয়ে না যায় সেজন্য রহমানের চেষ্টার ত্রুটি নেই।

এখানে থেকেই রহমান সিন্ধের খোঁজখবর নিতে লাগলো। তাদের সর্দার-পত্নীর যেন কোন অসুবিধা না হয় বা কোন রকম কষ্ট না পায়, সে ব্যাপারেও রহমান সতর্ক রইলো। কায়েস ছাড়াও কয়েকজন বিশিষ্ট অনুচরকে সিন্ধে মনিরার নিকটে রেখে দিল সে।

কিন্তু সবচেয়ে তার বড় চিন্তা এখন নূরীকে নিয়ে। ওকে কি করে বাঁচানো যায়! কি করে ওকে স্বাভাবিক করা যায়। নূরী কারও কথা শোনে না, কারও কাছে সে আসে না–সব সময় হুর হুর বলে চিৎকার করে। একমাত্র রহমান ছাড়া কেউ নূরীর নিকটে যায় না। এমন কি নূরীর সখীগণও তার নিকট যেতে ভরসা পায় না। ভয় পায়, নূরীর খোঁপার সূতীক্ষ্ণ ছুরি আবার যদি কারও বুকে গিয়ে বিদ্ধ হয়!

রহমান গেলে নিশ্চুপ থাকে নূরী। কোনরকম উৎপাত করে না বা ধমক দেয় না। রহমানই অনেক বলে–কয়ে একটু খাওয়ায় ওকে।

সেদিন নূরী একা ঝর্ণার পাশে বসে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছিল। দু'চোখ তার বসে গেছে, চুলে বনের পাতা আটকে রয়েছে। কাপড় ছিঁড়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে।

রহমান ধীরে ধীর নূরীর পাশে গিয়ে বসলো। নূরীর কাঁধে হাত রেখে ডাকলো– নূরী!

নূরী এতটুকু চমকে উঠলো না। সে যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইলো।

রহমান বললো– নূরী, এমনি করে কাঁদলেই কি সে ফিরে আসবে? না তোর ডাকে সাড়া দেবে?

নূরী হঠাৎ ভাল মানুষের মত বলে উঠলো–রহমান, সত্যি সে আর কোন দিন ফিরে আসবে না?

যে চলে যায় সে কি ফিরে আসে পাগলী! কেন তুমি মিছামিছি তার জন্য এত কেঁদেকেটে আকুল হচ্ছো?

রহমান, আমি যে কিছুতেই মনকে সুস্থির করতে পারছি না। আমি যে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না আমার হুর নেই ...... চিৎকার করে ওঠে নূরী না না, সে বেঁচে আছে। আমার মন বলছে সে বেঁচে আছে! রহমান, সে আবার আসবে, আবার আসবে!

হ্যাঁ আসবে, চলো তবে ঘরে চলো নূরী।

না, সে না এলে আমি ঘরে যাব না!

এই বনে বাঘ তোমাকে খেয়ে ফেলবে নূরী!

তাহলে তো আমার খুব আনন্দ হত রহমান, আমার হুরকে হারানোর কষ্ট আমাকে আর সইতে হত না।

এই তো বললে তোমার হুর বেঁচে আছে। আবার তুমি মরতে চাচ্ছো কেন?

কি জানি আমি কিছুই বুঝতে পারছি না রহমান।

চলো নূরী, ঘরে চলো।

না না, তুমি আমাকে ঘরে নিয়ে যেতে চেয়ো না। আমি যাব না– যাব না– নূরী সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

রহমান স্তব্ধ নয়নে তাকিয়ে রইলো। দু’চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

.

বনহুর আজ ক’দিন হলো এই সাগরতলে এসেছে। প্রথম দিন তাকে একটা আবছা অন্ধকার ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল। ঘন্টাকয়েক একটা গোলপাতার বিছানায় বসে বসে কাটাতেও হয়েছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরই তাকে সিন্ধীরাণীর এক সহচরী এসে নিয়ে গিয়েছিল সঙ্গে করে।

বনহুর যখন সহচরীর সঙ্গে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছল তখন হতবাক হয়ে পড়েছিল সাগরতলেও এমন দরবারকক্ষ আছে।

একটা সুউচ্চ সিংহাসনে সিন্ধীরাণী বসে আছে। পেছনে কয়েকজন সূতীক্ষ অস্ত্রধারিণী দাঁড়িয়ে রয়েছে। অস্ত্রধারিণী সিন্ধীরাণীর দু’পাশে দাঁড়িয়ে। সামনেও সারিবদ্ধ কয়েজন নারী। সকলের হাতেই তরবারি জাতীয় অস্ত্র।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করে সিন্ধীরাণীকে অভিবাদন করলো। যতই হোক সে তার প্রাণরক্ষাকারিণী।

সিন্ধীরাণী বনহুরকে লক্ষ্য করে বলল–যুবক, জানো এখানে আমি তোমাকে কেন এনেছি?

শুনেছিলাম আমাকে হাঙ্গরের মুখে নিক্ষেপ করা হবে, সে কারণেই এখানে আনা হয়েছে।

তুমি কি এ ভাবে মৃত্যু কামনা কর, না অন্য উপায়ে?

রাণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার বলার কিছু নেই।

সিন্ধীরাণী বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে। যতই সে ওকে দেখছে। ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বহু পুরুষের সঙ্গে সিন্ধীরাণীর কাজ করতে হয়েছে, কিন্তু সে আজও এমন একটি লোক দেখতে পায় নি যার অদ্ভুত সুন্দর চেহারা তাকে আকৃষ্ট করেছে, যার কণ্ঠস্বর তার কানে অপূর্ব লাগছে, যার প্রতিটি শব্দ তার হৃদয়ে গাঁথা হয়ে যাচ্ছে। যার গভীর নীল দুটি চোখ তার মনে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। সিন্ধীরাণী মোহগ্রস্তের মত তাকিয়ে আছে।

বনহুর সিন্ধীরাণীর দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। তারপর বললো– মরার জন্য আমি প্রস্তুত রাণী।

সিন্ধীরাণী সহচরীগণ এবার রাণীর আদেশের প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

কিন্তু একি, রাণীর মুখে কোন কথা নেই।

মায়া নামের সেই সহচরী সিন্ধীরাণীকে লক্ষ্য করে বললো–রাণী, বিলম্ব অশুভ। মহারাজ জানতে পারলে অঘটন হবে। সাগরতলে পুরুষ মানুষ বেশিক্ষণ রাখা উচিত হবে না। আদেশ . দিন, ওকে কিভাবে হত্যা করা হবে।

সিন্ধীরাণী এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল, চমকে উঠে বললো– মায়া, ওকে নিয়ে যাও, তোমাদের যেভাবে খুশি হত্যা করোগে।

মায়া অন্যান্য সহচরীকে আদেশ দিল– ওকে বেঁধে ফেল।

বনহুরকে বেঁধে ফেলা হলো। কয়েকজন অস্ত্রধারিণী নারী নিয়ে চলল তাকে।

হঠাৎ সিন্ধীরাণী বলে উঠলো– দাঁড়াও!

সবাই দাঁড়ালো।

বনহুর ফিরে তাকালো সিন্ধীরাণীর মুখের দিকে। সে জানতো, সিন্ধীরাণী নিশ্চয়ই পিছু ডাকবে। কারণ সিন্ধীরাণীর মুখোভাবে সে বুঝতে পেরেছিল তার মনের কথা।

সিন্ধীরাণী বলল– ওকে হত্যা না করে বন্দী করে রাখ। আমি নিজ হাতে ওকে হাঙ্গরের মুখে নিক্ষেপ করবো।

মায়া বললো– আচ্ছা।

তারপর বনহুরকে আবার সেই কক্ষে এনে আটক রাখা হলো।

সিন্ধীরাণীর একজন সহচরী কিছু ফলমূল রেখে গেল তার সম্মুখে।

বনহুর ক্ষুধায় কাতর ছিল, খেতে শুরু করলো সে।

ক্লান্তি আর অবসাদে বনহুরের চোখের পাতা বন্ধ হয়ে এলো। হাতের ওপর মাথা রেখে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো।

হঠাৎ একটা কোমল নরম জিনিসের অস্তিত্ব শরীরে অনুভব করলো বনহুর! ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো– কক্ষের স্বল্পালোকে দেখলো সিন্ধীরাণী তার গায়ে একটা চাদর টেনে দিচ্ছে।

বনহুর চোখ বন্ধ করে ফেললো, সে দেখতে চায় সিন্ধীরাণী কি করে! সিন্ধীরাণী তার শরীরে চাদর ঢাকা দিয়ে চলে যাচ্ছিল–অমনি বনহুর বললো–রাণী!

সিন্ধীরাণী ভীষণ চমকে উঠলো, তারপর থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকালো।

বনহুর চাদরটা বুক অবধি সরিয়ে চিৎ হয়ে শুলো। তারপর বললো– অনেক ধন্যবাদ।

সিন্ধীরাণী বনহুরের দিকে এগিয়ে এলো–তুমি কে যুবক? তোমার পরিচয় জানতে পারি কি?

নিশ্চয়ই পার।

বলো–বলো তুমি কে? তুমি যে কোন সাধারণ মানুষ নও, এটা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি।

সে কারণেই বুঝি হত্যাদণ্ডাদেশ অপরের ওপর না দিয়ে নিজের হাতে হত্যা করতে মনস্থ করছে?

তুমি কে বলো বলো, বিলম্ব করো না।

আমি দস্যু বনহুর।

অস্ফুট শব্দ করে উঠলো সিন্ধীরাণী–তুমি দস্যু বনহুর?

হ্যাঁ।

সিন্ধীরাণীর চোখ দুটো আগুনের মত জ্বলে উঠলো। দাঁতে দাঁত পিষে বললো–এত সহজে আমি দস্যু বনহুরকে হাতের মুঠোয় পাব কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি। তুমিই আমার বাবাকে হত্যা করেছ।

তোমার বাবা, কে সে?

আমি সব জানি, তুমিই আমার বাবার হত্যাকারী।

তোমার বাবার পরিচয় কি রাণী?

আমার বাবা দস্যু নাথুরাম।

তুমি নাথুরামের কন্যা?

হ্যাঁ। গোপনে তুমি আমার বাবাকে হত্যা করলেও আমি সব জানি।

ঠিকই বলেছ–আমি তোমার বাবাকে হত্যা করেছি। শুধু তাকেই নয়, তার কয়েকজন সহকারীকেও আমি উচিত সাজা দিয়েছি। তুমিই নাথুরামের কন্যা, কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। কই, তোমার সাথে তো নাথুরামের চেহারার কোনই সাদৃশ্য নেই। তুমি কি তার পালিতা কন্যা?

না, সে আমার বাবা, এই আমি জানি। আমার বাবা আমার সুখের জন্য এই সাগরতলে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে এ আস্তানা তৈরি করে দিয়েছে। আমারই সুখের জন্য সে এখানে একটি অদ্ভুত মোটরবোট তৈরি করে দিয়েছে। যাতে আমার কোন অসুবিধা না থাকে।

তবে যে তোমাদের কে একজন মহারাজ আছে বললে?

হ্যাঁ, আমার বাবার এক বন্ধু। বাবার মৃত্যুর পর আমার দেখাশোনার ভার গ্রহণ করেছে। অবশ্য বেশ কিছুদিন পর সে এসেছে এখানে, সে–ই আমাদের মহারাজ।

তাহলে তুমি নারী হয়ে দস্যুতা করো কেন? মহারাজ পারে না?

মহারাজের হুকুম। সেই আমাকে তাদের সকলের রাণী বানিয়েছে।

হুঁ, তোমাদের মহারাজকে ধন্যবাদ। আচ্ছা, তোমাদের দস্যগণ যে জিনিসপত্র দস্যুতা করে। আনে সে–সব জিনিসপত্র কার কাছে জমা থাকে?

এত কথা তোমাকে বলতে আমি রাজি নই।

মৃত্যুদণ্ডে আমি দণ্ডিত, আজ না হয় কাল আমাকে তোমার হাতে মরতে হবে, আমার কাছে। বলতে তোমার আপত্তি কিসের রাণী?

শোনো, আমার বাবার মৃত্যুর পর আমার বাবার অনুচরগণ গোপনে আমার নিকটে আসে। এবং আমি ওদের সমস্ত ভার বহন করি! অনেকদিন আমাদের কাজ বন্ধ থাকলেও আমি ওদের ঠিক ঠিকভাবে পাওনা মিটিয়ে দেই এবং সে কারণেই ওরা আমাদের দল থেকে কোথাও চলে যায়নি। এরপর আমার বাবার বন্ধু মহারাজ আসে, নিজের হাতে আমাদের সকলের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদের উপস্থিত মহাসঙ্কট থেকে রক্ষা করে। এখন লুণ্ঠিত যত সামগ্রী মহারাজের নিকটেই। জমা থাকছে। ঐদিন তুমি হয়তো দেখেছ আমার সঙ্গে আমার অনুচরগণ খালি হাতে এসেছিল আমাকে পৌঁছে দিতে।

বনহুরের মুখ দিয়ে একটা শব্দ বেরিয়ে এলো দেখেছি। একটু থেমে বললো সে– মহারাজ কোথায় থাকে?

সে খবর কাউকে জানাতে রাজি নই।

আমাকে তো তুমি মৃত্যুদণ্ডই দিচ্ছ, তবু বলতে রাজি নও?

না।

রাণী, আমি তোমার বাবাকে হত্যা করে ভুল করেছি। সেজন্য আমি অনুতপ্ত। তুমি যেভাবে ইচ্ছা আমাকে হত্যা কর, আমি তোমার সে দণ্ড মাথা পেতে নেব।

সিন্ধীরাণী ইতোপূর্বে দস্যু বনহুর সম্বন্ধে সব অবগত ছিল। দস্যু বনহুরের মত অসীম সাহসী বীর পুরুষ কমই আছে। সেই দস্যু আজ তার কাছে নতি স্বীকার

করছে। তবু মহারাজের বাসস্থান সম্বন্ধে বলতে রাজি নয় সে।

কিন্তু বনহুরের মনে ঐ একটি কথা বার বার উঁকি দিতে লাগলো, এখন লুণ্ঠিত যতকিছু মহারাজের নিকটেই জমা থাকছে। কে সে মহারাজ, যে দস্যু নাথুরামের বন্ধুলোক। আর কোথায়ই বা তার বাসস্থান– যেখানে লুণ্ঠিত সব দ্রব্য জমা হচ্ছে? যেমন করে থোক তাকে জানতে হবে কে সে মহারাজ, কোথায় তার আস্তানা।

সিন্ধীরাণীর মুখমণ্ডল অনেকটা প্রসন্ন হয়ে এসেছে! বললো– দেখ, তুমি যদিও আমার বাবাকে হত্যা করেছ, তবু আমি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবো না।

কেন?

আমি তোমাকে .... না না, যাই পরে বলবো, যাই,

বনহুর কিছু বলার পূর্বেই বেরিয়ে গেল সিন্ধীরাণী। সঙ্গে সঙ্গে লৌহ দরজা অতি দ্রুত বন্ধ হয়ে গেল।

বনহুর চাদর জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

আরও দুদিন কেটে গেল সিন্ধীরাণীর খোঁজ নেই।

একজন সহচরী কিছু ফলমূল আর মিষ্টান্ন দিয়ে যেত। পরদিন বনহুর তাকে জিজ্ঞাসা করলো–তোমাদের রাণী কোথায়?

জবাব দিয়েছিল সহচরী-রাণী অসুস্থ।

সেদিন বনহুর বেশ কিছু চিন্তিত হয়েছিল। রাণী সেদিন কি বলতে গিয়ে বলেনি বা বলতে পারলো না। রাতে শুয়ে শুয়েও ঐ কথা মনে পড়ছিল।

হঠাৎ একটা শব্দ হলো, বনহুর না তাকিয়ে চুপচাপ শুয়েই রইলো। কে যেন দরজা খুলে কক্ষে প্রবেশ করলো।

নিকটে এসে দাঁড়ালো।

বনহুর চোখ মেলে তাকালো– একি রাণী তুমি!

হ্যাঁ।

তোমার নাকি অসুখ?

হ্যাঁ।

তবে কেন এলে, অসুখ বাড়বে না?

বাড়তে দাও।

সেকি! বনহুর সোজা হয়ে বসল।

সিন্ধীরাণী বসে পড়লো তার পাশে। একেবারে তার গা ঘেঁষে বসল একবার দরজার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললো– দম্রাট, তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। তুমি আমাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে।

তার মানে?

আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি তোমাকে হত্যা করার জন্য বারবার অনুচরগণকে নির্দেশ দিতে গিয়েছি, কিন্তু পারিনি। কে যেন অদৃশ্য হস্তে আমার গলা টিপে ধরেছে। পিতার হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করে মনে রাগের সৃষ্টি করতে চেয়েছি তাও হয় নি, রাগের পরিবর্তে হৃদয়ে জেগেছে। এক অভূতপূর্ব অনুভূতি, বারবার তোমার মুখখানা আমার মনের মধ্যে উঁকি দিয়েছে, করে তুলেছে আমাকে উদ্ভ্রান্ত।

বনহুর সিন্ধীরাণীর কথায় এতটুকু বিচলিত হয় না বা সিন্ধীরাণীর নিকট হতে সরে বসে না। মৃদু হেসে বলে–সেজন্য আমিই দোষী।

না না, তুমি দোষী নও দস্যুসম্রাট, তুমি দোষী নও।

তোমার অনুগ্রহের কথা চিরদিন আমার স্মরণ থাকবে।

এখানে তোমার বড় খারাপ লাগছে, না?

অতি উত্তম স্থান এই অন্ধকার কারাকক্ষ, মোটেই খারাপ লাগছে না আমার।

এসো আমার সঙ্গে।

কোথায়?

এসো।

বনহুর গোলপাতার চাটাইয়ের শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল, অনুসরণ করলো সিন্ধীরাণীকে।

পথ চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলো সিন্ধীরাণী–তোমাকে দস্যুসম্রাট বললে রাগ করবে না তো?

না, খুব খুশি হব।

বেশ,তাহলে এখন থেকে তোমাকে দস্যুসম্রাট বলেই ডাকবো, কেমন?

ডেকো।

জানো এখন তুমি কোথায়?

জানি, সাগরতলে।

আর এটাও নিশ্চয়ই জানো, এখান থেকে বের হবার বা পালাবার কোন পথ নেই?

তাও জানি, কিন্তু পথ যদি না থাকবে, তবে এলাম কি করে সিন্ধীরাণী?

ও, তুমি ভুল করছ দস্যুসম্রাট। সেদিন তুমি যে যানে চেপে আমার সঙ্গে এসেছিলে, সেটা এক অদ্ভুত মোটরবোট, আমাকে পৌঁছে দিয়েই ওটা চলে গেছে তার নির্দিষ্ট জায়গায়।

দস্যু বনহুর আশ্চর্য কণ্ঠে বলল–সে কি রকম!

হাঁ, মহারাজ মানে আমার বাবার বন্ধু এমন একটা উপায়ে ঐ যন্ত্রচালিত মোটরবোটটা তৈরি করেছে যে, সেটা তারই নির্দেশ মতো কাজ করে। যখন বাইরে

নিয়ে যাবার দরকার হবে তখন সে ঐ যন্ত্রচালিত মোটরবোটখানা পাঠিয়ে দেয়। আমি তখন বাইরে যাই। আমাকে পৌঁছে দেবার পর সেটা চলে যায় নির্দিষ্ট স্থানে।

বনহুরের ললাটে গভীর চিন্তারেখা ফুটে উঠলো, থমকে দাঁড়িয়ে বললো–তাহলে তুমি ইচ্ছামত সাগরতল থেকে বাইরে যেতে পার না?

যাবার কোন প্রয়োজন হয় না।

হ্যাঁ। বনহুর নীরবে আবার চলতে শুরু করল।

সিন্ধীরাণীও আর কোন কথা বলল না।

একটা বেলকুনি ধরনের জায়গায় এসে দাঁড়াল সিন্ধীরাণী। বনহুর এসে দাঁড়ালো তার পাশে। অবাক হয়ে দেখলো বনহুর, যে জায়গায় এসে তারা দাঁড়িয়েছে, সেটা যেন একেবারে সাগরজলের মধ্যে। একটা কাঁচের আবরণের মত জিনিস দিয়ে সাগরজল আটকে রাখা হয়েছে। বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে দেখলো বনহুর সাগরতলে নানারকম উদ্ভিদ আর পানি ও গাছপালা। নানা রকম মাছ আর। কতগুলো অদ্ভুত ধরনের জীব দেখতে পেল সে। রং বেরঙের মাছগুলো কি সুন্দর সাঁতার কেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উঁচুনীচু অনেক টিলাও নজরে পড়লো তার। এমন সুন্দর একটা জগৎ বনহুর কোনদিন দেখেনি।

তন্ময় হয়ে বনহুর তাকিয়ে আছে সাগরতলের অপূর্ব দৃশ্যের দিকে। উঁচুনীচু টিলার ফাঁকে ফাঁকে অদ্ভুত ধরনের মাছগুলো নানা রকম ভাবে সাঁতার কেটে চলেছে।

হঠাৎ বনহুর চমকে উঠলো, সিন্ধীরাণী বনহুরের কাঁধে হাত রেখেছে! সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো সে–এসব তোমার ভাল লাগছে?

হ্যাঁ।

থাকতে পারবে চিরদিন এখানে?

আশ্চর্য দৃষ্টি মেলে তাকালো বনহুর সিন্ধীরাণীর মুখের দিকে। তারপর বললো–তুমি আমাকে চিরদিনের জন্য আটকে রাখতে চাও?

হ্যাঁ, চাই তোমাকে আমি চিরদিনের জন্য এখানে আটকে রাখতে চাই দস্যুসম্রাট।

কিন্তু তোমার এতে অসুবিধা হবে না? তোমার সহচরীদের কথায় জানতে পেরেছি এখানে নাকি পুরুষের আগমন নিষিদ্ধ?

সিন্ধীরাণী নিষ্পলক চোখে বনহুরের মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললো–শুধু নিষিদ্ধ নয়, এই সাগরতলে কোনক্রমে পুরুষের আগমন হতে পারে না, হলে বিপদজনক।

এ আদেশ কি তোমার বাবার ছিল?

না, আমার বাবার বন্ধু মহারাজার এই আদেশ। সে যদি কোনক্রমে জানতে পারে তাহলে ভীষণ বিপদ হবে। শুধু সে তোমাকেই হত্যা করবে না, আমাকেও হত্যা করতে পারে।

আশ্চর্য কণ্ঠে বললে বনহুর তোমাকে হত্যা করতে পারবে–এমন লোক সে! তাকে তোমরা এত সম্মান কর!

এবার সিন্ধীরাণীর চোখে মুখে একটা বিষণ্ন ভাব ফুটে উঠলো, বললো– উপায়হীন আমি! তার কথামতই আমাকে চলাফেরা করতে হয়। তার বিনা অনুমতিতে আমি কিছুই করতে পারি না।

তুমি না সিন্ধী দস্যুদের রাণী?

শুধু নামেই রাণী।

সে কি!

হ্যাঁ, এতটুকু অধিকার আমার নেই, নিজের ইচ্ছামত কোন কাজ করি। জানো, তোমাকে এনেছি এটা যদি কোন রকমে সে জানতে পারে, কিছুতেই সে আমাকে ক্ষমা করবে না।

বনহুর অবাক হয়ে সিন্ধীরাণীর কথা শুনে যাচ্ছিল।

সিন্ধীরাণী পুনরায় বলল–জান, সে আমার পিতার বন্ধু হলেও অতি জঘন্য তার মনোবৃত্তি। সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল, তারপর আবার বলতে শুরু করলো সুযোগ পেলেই সে আমার এই সাগরতলে এসে হাজির হয়, নানা রকম কুৎসিত ইংগিত করে, শুধু আমার হাতের এই আংটির ভয়ে সে আমাকে স্পর্শ করতে পারে না।

বনহুর তাকালো, দেখলো সিন্ধীরাণীর হাতের আংগুলে একটি লাল টকটকে হীরার আংটি রয়েছে।

সিন্ধীরাণী বুঝতে পারলো বনহুরের মনে তার আংটি সম্বন্ধে জানার বাসনা জেগেছে। তাই বলল–এটাই আমাকে আজও তার হাত থেকে রক্ষা করে আসছে। এটা বিষাক্ত হীরকখণ্ড দিয়ে। তৈরি। এটা একবার কেউ মুখে দিলে সে আর বাঁচবে না।

বুঝতে পেরেছি, মহারাজ তাহলে তোমাকে মহারাণী করতে চান?

সিন্ধীরাণী নত করে নিল তার দৃষ্টি।

বনহুর বললো–তুমি তাহলে আমাকে এখানে নিয়ে এসে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে এখনও জীবিত রেখেছ কেন? তোমার মহারাজা যদি জানতে পারে?

সিন্ধীরাণী চোখ দুটো অশ্রু ছলছল হয়ে উঠলো। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো, তোমাকে হত্যা করলে প্রথম সাক্ষাতেই করতাম, কিন্তু তোমাকে আমি হত্যা করতে পারব না।

তুমি তোমার মহারাজের কথা অমান্য করবে?

আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি দস্যুসম্রাট।

বনহুরের ঠোঁটের কোণে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। এই কথাটা বনহুর জীবনে বহু নারীর কণ্ঠে বহুবার শুনেছে। আজ সিন্ধীরাণীর কণ্ঠেও সেই আবেগমাখা শব্দের প্রতিধ্বনি। সিন্ধীরাণীও তাকে ভালবেসে ফেলেছে। একটা করুণার আভাস তার মনে ছোঁয়া দিয়ে গেল, মায়া হলো বনহুরের। আজ পর্যন্ত যে-ই তাকে ভালবেসেছে সে–ই কেঁদেছে। চোখের পানি হয়েছে তার সাথী। হায়, একি তারই অপরাধ।

সিন্ধীরাণীর কোমল মুখখানার দিকে তাকিয়ে বেদনায় ভরে উঠলো বনহুরের মন।

সিন্ধীরাণীর বললো–তোমাকে আমি লুকিয়ে রাখবো। মহারাজ কিছুতেই তোমার সন্ধান। পাবে না।

তোমার সহচরীগণ সবাই আমাকে দেখেছে, তারা যদি বলে দেয়।

না, আমাকে তারা সবাই ভালবাসে, সমীহ করে, আমি বারণ করে দিলে ওরা কেউ বলবে না।

তুমি ওদের অত্যন্ত বিশ্বাস কর?

হ্যাঁ, আমার নিজের বোনের চেয়েও ওরা আমাকে বেশি ভালবাসে, তাই ওদের বিশ্বাস করি।

বনহুর সিন্ধীরাণীর কথার কোন উত্তর না দিয়ে আবার তাকালোলা স্বচ্ছ কাঁচের আবরণী দিয়ে সাগরতলের দৃশ্যগুলোর দিকে।

সিন্ধীরাণী বললো–চলো।

সিন্ধীরাণী এবার এগুলো একটি সরু পথ ধরে। বনহুর ওকে অনুসরণ করলো। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একটা আবছা অন্ধকার স্থানে থমকে দাঁড়ালো সে। বনহুর চারদিকে তাকালো, কিছুই নজরে পড়লো না।

সিন্ধীরাণী বলল, এই যে একটি হাউজের মত দেখছ, এর মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।

বনহুর লক্ষ্য করতেই দেখতে পেল, ঠিক তার একপাশে গভীর নিচু একটি খাদ বা গর্ত। ভাল করে চাইতেই আড়ষ্ট হলো তার চোখ দুটো! বিরাট আকার একটা হাঙ্গর সেই নিচু গভীর গর্তটার মধ্যে ধীরে ধীরে সাঁতার কাটছে। অন্ধকার গর্তটার মধ্যে হাঙ্গরের চোখ দুটো আগুনের মতোই জ্বলছে।

সিন্ধীরাণী বলল–অপরাধীকে আমরা এই হাঙ্গরের মুখে নিক্ষেপ করে শাস্তি দিয়ে থাকি।

বনহুর বলল– অতি উত্তম কাজ।

কিন্তু তোমাকে আমি……

এভাবে হত্যা করবে না, এই তো?

দস্যুসম্রাট, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তোমাকে আমি হত্যা করতে চেয়ে ভুল করেছি। আমি আমার বাবার মুখে তোমার অনেক কথা শুনেছি। যদিও আমার বাবা কোনদিন তোমার সুনাম করেনি, তবু তার কথাবার্তায় আমি তোমার যে পরিচয় পেয়েছি, সেটা থেকে আমার মনে তোমার সম্বন্ধে অনেক উচ্চ একটা ধারণা জন্মেছে। তোমার অপূর্ব বীরত্বের কাহিনী আমার অজানা নেই। তোমাকে আগে কোনদিন না দেখলেও আমি অনেক শ্রদ্ধা করতাম।

তোমাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সিন্ধীরাণী। বনহুরের কথা শেষ হতে না হতেই মায়া হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো সেখানে–রাণীজী, মহারাজ এসেছেন!

মহারাজ! অস্ফুট শব্দ করে উঠলো সিন্ধীরাণী।

মায়া পূর্বের ন্যায় বিচলিত কণ্ঠে বললো–সর্বনাশ হবে রাণীজী, মহারাজ যদি জানতে পারে সাগরতলে পুরুষ মানুষ এসেছে।

সিন্ধীরাণীর মুখমণ্ডল মুহূর্তে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো, মায়ার দক্ষিণ হাতখানা সে মুঠোয়। চেপে ধরে অনুনয়ের সুরে বললো– মায়া, ওর কথা যেন প্রকাশ না পায়। তোর হাতে ধরছি মায়া।

মায়ার চোখ দুটো একবার বনহুরের মুখে সীমাবদ্ধ হল। বুঝতে পারলো তাদের রাণী ওকে ভালবেসে ফেলেছে। কিন্তু সেটা যে কত বড় অপরাধ সিন্ধীরাণীর পক্ষে তাও প্রকাশ পায় মায়ার দৃষ্টিতে।

মায়া বললো–আচ্ছা, আমি সবাইকে বারণ করে দিচ্ছি।

মায়া, তুই ছাড়া ওকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। যা সবাইকে বারণ করে দে গিয়ে—

মায়া চলে গেল।

সিন্ধীরাণী অসহায় দৃষ্টি নিয়ে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। বনহুরের মুখমণ্ডলে কোন পরিবর্তন আসেনি, স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো বনহুর– রাণী, তুমি বিচলিত হচ্ছো কেন? আমি মৃত্যুভয়ে ভীত নই!

কিন্তু আমি তোমাকে মরতে দেব না দস্যুসম্রাট। সিন্ধীরাণী দস্যু বনহুরের বুকে মাথা রেখে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলো। তারপর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললো–চলো, চলো তুমি আমার সঙ্গে। দ্রুত পা চালিয়ে চলো।

সিন্ধীরাণী বনহুরের হাত ধরে নিয়ে চললো।

একটা কক্ষের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো–এসো।

বনহুর সিন্ধীরাণীর সঙ্গে সেই কক্ষে প্রবেশ করলো। অদ্ভুত সে কক্ষ। সিন্ধীরাণী এবার সেই কক্ষের একপাশে দাঁড়িয়ে দেয়ালের একটি স্থানে চাপ দিল, সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোট্ট পথ বেরিয়ে এলো। সিন্ধীরাণী ব্যস্তকণ্ঠে বললো–শিগগির তুমি এই পথে ভেতরে প্রবেশ কর।

বনহুর ভেতরে প্রবেশ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের ছোট্ট পথটা মিশে গেল। যেমন ছিল দেয়াল তেমনি হয়ে পড়লো।

সিন্ধীরাণী প্রিপদে শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। এই কক্ষটিই সিন্ধীরাণীর শয়ন কক্ষ।

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করলো মহারাজ, তার পেছনে মায়া এবং সিন্ধীরাণীর কয়েকজন সহচরী।

মহারাজ কক্ষে প্রবেশ করতেই সিন্ধীরাণী শয্যা ত্যাগ করে কুর্ণিশ জানাল। মহারাজ এগিয়ে এলো রাণীর শয্যার পাশে-কেমন আছ বৎস?

সিন্ধীরাণী বললো–উত্তম।

বেশ বেশ! মহারাজ এবার সহচরীগণের দিকে তাকিয়ে বললো–তোমরা যাও, রাণীজীর সঙ্গে একটি গোপন আলোচনা আছে।

মায়া এবং সহচরীগণ কুর্ণিশ জানিয়ে পেছনে হটে বেরিয়ে গেল।

মহারাজের চোখ দুটো কুৎসিত লালসায় চকচক করে উঠলো।

সিন্ধীরাণীর মুখ ভয়ে বিবর্ণ হলো। সে বুঝতে পারলো নিশ্চয়ই মহারাজ আজ তার ওপর কোন উপদ্রব করে বসবে। ঢোক গিলে বললো–মহারাজ, আমি আপনার কন্যা সমতুল্য।

গর্জে উঠলো মহারাজ-এ কথা তুমি আমাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দাও কেন? কন্যা সমতুল্য হলেও তুমি আমার কন্যা নও!

মহারাজ। সিন্ধীরাণীর কণ্ঠ কম্পিত!

সিন্ধীরাণী আর মহারাজের যখন এপাশে কথাবার্তা হচ্ছিল, তখন দস্যু বনহুর ওপাশে দেয়ালে কান লাগিয়ে তাদের সব কথা শুনতে পাচ্ছিল,. যদিও খুব স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল না; তবু সব কথাই বুঝতে পারছিল সে। বনহুর আরও আশ্চর্য হলো, মহরাজের কণ্ঠস্বর তার যেন বেশ পরিচিত বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু কোথায় শুনেছে স্মরণ করতে পারছে না সে।

মহরাজের কণ্ঠ এবার শোনা যায়–তুমি যাই বলো রাণীজী, আমার হাত থেকে তুমি রেহাই পাবে না। আমি তোমাকে বিয়ে করবো।

অস্ফুট শব্দ করে উঠলো সিন্ধীরাণী-বিয়ে!

হ্যাঁ।

কিন্তু আপনি আমার বাবার বন্ধু জেনেই আমি বিশ্বাস করে আপনার হাতে–

তোমার বাবার বন্ধু বলেই আমি তোমার হিতাকাঙ্খী। তোমায় বিয়ে করে আমি হবো মহারাজ আর তুমি হবে মহারাণী। হাঃ হাঃ হাঃ, অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো মহারাজ।

দস্যু বনহুর দেয়ালের ওপাশ থেকে অধর দংশন করল। দক্ষিণ হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ হলো তার।

সিন্ধীরাণীর কণ্ঠ-আপনি এই কথা জানাতেই কি এসেছেন মহারাজ? এই কি আপনার গোপন আলোচনা?

হ্যাঁ রাণীজী, এটাই আমার গোপন কথা। তুমি যদি রাজি হও, আমি তোমাকে সাগরতল থেকে পৃথিবীর আলোয় নিয়ে যাব! সকলের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দে মিশতে পারবে। মুক্ত হাওয়ায় প্রাণভরে। নিঃশ্বাস নিতে পারবে। যা চাইবে তাই পাবে। বল রাজি?

না না, এ আপনি কি বলছেন! আপনাকে আমি নিজের পিতার চেয়ে কোন অংশে কম মনে করি না।

হাঃ হাঃ হাঃ-আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো মহারাজ। তারপর হাসি থামিয়ে বললো– তোমার পিতা কে জান?

হ্যাঁ জানি, পিতা নয়। তোমাকে সে সিন্ধের রাজবাড়ী থেকে চুরি করে এনেছিল! তোমার বাবা সিন্ধীরাজ সূর্য সেন।

নাথুরাম আমার বাবা নয়! আমি দস্যুকন্যা নই!

না, তুমি রাজকন্যা। কাজেই আমাকে তুমি বিয়ে করতে পারবে। আর আমার যে রূপ দেখছো বা এতদিন দেখে আসছো এটা আমার আসল রূপ নয়। আমি বৃদ্ধ নই–আমি যুবক।

সিন্ধীরাণীর দু'চোখে বিস্ময় ঝরে পড়তে লাগলো।

দেয়ালের ওপাশে দস্যু বনহুরেরও সেই অবস্থা। কে এই শয়তান, এই মুহূর্তে সে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারলে একবার দেখে নিত-কে সে। কিন্তু দেয়ালের এপাশে তো কোন চাবিকাঠি নেই বা এটা খুলে বেরিয়ে আসার কৌশল তার জানা নেই। কাজেই নিশ্চুপ শুনে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

সিন্ধীরাণী এবার বলল–আপনি তাহলে কে?

আমি মহারাজ! কিন্তু আমি তোমার বাবার বন্ধু নই-দস্যু নাথুর মনিব! আমার কথাতেই সে চলাফেরা করত। আমার কথামতই সে তোমাকে এই সাগরতলে বন্দী করে রেখেছে। এই যে সাগরতলে রাজপ্রাসাদ দেখেছ, এটা তোমার পিতা রাজা সূর্যসেনের গুপ্ত প্রাসাদ। তোমার পিতাকে দস্যু নাথুরাম এই সাগরতলে বন্দী করে তার সব ধনরত্ন আত্মসাৎ করে নিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে এই সাগরতলেই হত্যা করা হয়েছে।

তাকে হত্যা করা হয়েছে!

হ্যাঁ, নিচে যে হাঙ্গর দেখেছ, এ হাঙ্গরের মুখে নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

উঃ এত শয়তান আপনারা।

আমরা নই-নাথুরাম তাকে হত্যা করেছে। কৌশলে তোমার পিতার রাজভাণ্ডারের যত অর্থ সব আত্মসাৎ করেছে। তোমাকেও সে হত্যা করত, শুধু আমার জন্য তুমি আজও বেঁচে আছে। বলো-এবার বলো, আমাকে বিয়ে করতে তুমি রাজি আছো?

সিন্ধীরাণী নিশ্চুপ।

মহারাজ এবার একটানে তার দাড়ি খুলে ফেললো। মাথার পরচুলও খুলে রাখলো।

সিন্ধীরাণী অবাক হয়ে দেখলো মহারাজার রূপ একেবারে পালটে গেছে বলিষ্ঠ জোয়ান একটি লোক তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। চোখে মুখে তার কুৎসিত লালসাপূর্ণ ভাব।

শিউরে উঠলো সিন্ধীরাণী।

মহারাজ এবার দু’হাত বাড়িয়ে সিন্ধীরাণীকে ধরতে গেল।

সিন্ধীরাণী ভয়ার্ত কণ্ঠে হাত জুড়ে বললো–আর কটা দিন আমাকে সময় দিন মহারাজ, আমি–আমি আপনার কথায় রাজি হব।

ক্ষুধিত শার্দুলের মত মহারাজ দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে যাচ্ছিল, সিন্ধীরাণীর কথায় ধীরে ধীরে হাত গুটিয়ে নিল। কুৎসিত হাসি হেসে বললো– বেশ, তাই হবে। আজ তোমাকে ছেড়ে দিলাম, কিন্তু এরপর তুমি বিয়ে করতে রাজি না হলেও তোমাকে আমি ছাড়বো না। আমার বহু দিনের বাসনা, তোমাকে আমার চাই।

সিন্ধীরাণী ভীত দৃষ্টি নিয়ে মহারাজের আসল চেহারা দেখতে লাগলো। কি অদ্ভুত পরিবর্তন, একটু পূর্বে যে বৃদ্ধ, এখন সে সম্পূর্ণ একটি জোয়ান পুরুষ!

মহারাজ ততক্ষণে নিজের শুভ্র দাড়ি-গোঁফ আর পরচুলা হাতে উঠিয়ে পরতে শুরু করেছে।

নিজেকে সম্পূর্ণ পূর্বের ন্যায় সাজিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো মহারাজ, তারপর হাতে তালি দিল। সঙ্গে সঙ্গে মায়া কয়েকজন সহচরীসহ কক্ষে প্রবেশ করে অভিবাদন করে দাঁড়ালো।

মহারাজ বললো–আমার গোপন আলোচনা শেষ হয়েছে চলো তোমরা।

মহারাজ একবার তীব্র কটাক্ষে সিন্ধীরাণীর দিকে তাকিয়ে মায়া এবং সহচরীগণসহ বেরিয়ে গেল!

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো সিন্ধীরাণী।

সিন্ধীরাণী দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে দরজার খিল এঁটে দিল, তারপর দেয়ালে চাপ দিতেই পূর্বের সেই ছোট্ট দরজা বেরিয়ে এলো। সিন্ধীরাণী সেই পথে প্রবেশ করে বনহুরের জামার আস্তিন মুঠোয় চেপে ধরলো–দস্যুসম্রাট, আমি দস্যু নাথুরামের কন্যা নই। আমি দস্যু নাথুরামের কন্যা নই–

বনহুর বললো–আমি সব শুনেছি।

সব শুনেছে, সব শুনেছো, তুমি? আমার বাবা সিন্ধীরাজ সূর্যসেন?

হ্যাঁ, সব শুনেছি রাণী, আমি সব শুনেছি,এতটুকু ফাঁক যদি থাকতো, বা এ পার্শ্ব থেকে বেরিয়ে আসার উপায় যদি জানা থাকতো, তবে আমি মহারাজনামী শয়তানকে সমুচিত শাস্তি দিয়ে ছাড়তাম।

সত্যি তুমি পারতে, পারতে ওকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে? তুমি দস্যুসম্রাট, পারবেই না বা কেন। আমাকে তুমি বাঁচাও, ঐ শয়তান মহারাজের হাত থেকে বাঁচাও- বনহুরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো সিন্ধীরাণী।

দস্যু হলেও বনহুর পুরুষ মানুষ তো, একটা নারীর উষ্ণ স্পর্শ ক্ষণিকের জন্য তাকে বিচলিত করে তুলল, নিজেকে অতি সাবধানে সংযত করে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে। ভাবলো, যেমন করে হোক নিজেকে বাঁচাতে হবে, একেও বাঁচাতে হবে। তাছাড়াও মহারাজনামী শয়তানকে তো জানতে হবে এবং তার আসল আস্তানার সন্ধান জেনে নিয়ে সিন্ধীরাজার ধন-রত্ন উদ্ধার করে নিতে হবে এবং সিন্ধীরাজ্যে তার ন্যায্য অধিকারিণী সিন্ধীরাণীকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে

সিন্ধীরাণী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল–কি ভাবছ? পারবে না আমাকে ঐ শয়তান মহারাজের হাত থেকে উদ্ধার করতে?

তোমাকে উদ্ধার না করে আমি এই সাগরতল থেকে বাইরে যাব না সিন্ধীরাণী।

দস্যুসম্রাট! তুমি কত মহান! দস্যুসম্রাট-তুমি-তুমি আমার। তুমি আমার...

চলো আমাকে সেই কারাকক্ষে রেখে এসো রাণী।

না, তোমাকে আমি আর সেই কারাকক্ষে পাঠাবো না।

তবে?

এই চোরা কুঠরীতে থাকবে।

সিন্ধীরাণীর কথায় বনহুর কোন জবাব দিল না।

.

মনিরার নতুন দেশে নতুন জায়গায় এই নিঃসঙ্গ জীবন একেবারে অসহনীয় হয়ে উঠলো। কি আশা করেছিল সে আর কি হলো, আহার-ন্দ্রিা ত্যাগ করে কান্নাকাটি করে চলেছে মনিরা। কায়েস কিছুতেই তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে পারছে না। নানা উপায়ে মনিরার শোকবিহ্বল মনকে সুস্থ করার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু কৃতকার্য হচ্ছে না।

দিন যতই যাচ্ছে ততই আরও ভেঙে পড়ছে মনিরা। কায়েস কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। মনিরাকে নিয়ে দেশে ফিরে যাবে, না এখানেই থাকবে ভেবে পায় না সে। একদিন মনিরার নিকটে বলে বসলো-কায়েস আপনি দেশে ফিরে যাবেন, না এখানেই থাকবেন?

মনিরা দেশেই ফিরে যাবে মনস্থির করলো। যত বিপদই আসুক, তবু নিজ দেশ, নিজ জন্মভূমি মায়ের সমান। কায়েস মনিরার মনোভাব জানিয়ে রহমানের নিকটে একটি পত্র দিল। কিন্তু রহমান এত শীঘ্র মনিরাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য মত দিল না। কারণ রহমান জানে, এখানে এলে চৌধুরীকন্যাকে কিছুতেই রক্ষা করা যাবে না, তাকে পুনরায় তার বড় চাচা আসগর আলী সাহেব পাকড়াও করে নিয়ে যাবেন!

রহমান গোপনে সব সংবাদই রেখেছে। চৌধুরীবাড়িতে এখনও পুলিশের গুপ্তচর মনিরার অনুসন্ধান চালাচ্ছে, এ সংবাদও রহমান পেয়েছে। কাজেই মনিরার এ মুহূর্তে ফিরে আসা মোটেই উচিত হবে না।

রহমানের চিঠি পেয়ে মনিরা যদিও মন খারাপ করলো, তবু দেশে ফিরে যাবার বাসনা উপস্থিত ত্যাগ করলো। একেই বনহুরের অভাবে প্রাণে তার শান্তি নেই, সদাসর্বদা উদাস ভাব। এ অবস্থায় আবার সেই বড় চাচার উদ্রব সহ্য করতে পারবে না। তার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল। এখানে বনহুরের কথা ভেবে সে প্রাণ বিসর্জন দেবে।

ঝিন্দ শহরে এসে মনিরা কোন দিন শহরটা ভাল করে চেয়ে দেখেনি। বনহুরের মুখে শুনেছিল অপূর্ব সুন্দর এই ঝিন্দ শহর। মনিরা, তাই তোমার জন্য আমি ঝিন্দ শহরে বাড়ি কিনেছি। সেখানে তুমি আর আমি নতুন জীবন শুরু করবো, কথাগুলো মনে পড়তেই মনিরা মুষড়ে পড়তো, দু'চোখ ভরে উঠত অশ্রুতে, ঝিন্দ শহর আর তার ভাল লাগতো না।

তবু যত ব্যথা-বেদনা হৃদয়ে চেপে ঝিন্দ শহরে বনহুরের দেওয়া বাড়িখানা আঁকড়ে ধরে পড়ে রইলো মনিরা।

কায়েস তার সব কাজকর্ম বাদ দিয়ে মনিরার নিকট থেকে তার দেখাশোনার ভার গ্রহণ করলো।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ গত হয়ে চললো। মাসের পর মাস হয়ে এলো। মনিরা দিন দিন ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লো। হঠাৎ মাথা ঘোরা, গা বমি বমি, নানা রকম শারীরিক অসুখ দেখা দিল।

প্রবীণ ঝিন্দ দাসী ময়না মনিরাকে নিজের মেয়ের মত স্নেহ করত। এ বাড়িতে আসার পর মনিরা এই দাসীটিকে নিজের করে পেয়েছিল। সব সময় মনিরার পাশে পাশে থাকত এই দাসী। এক দণ্ডের জন্যও মনিরাকে ছেড়ে সে কোথাও যেত না।

মনিরার এই অসুস্থতায় ময়না দাসী বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো, সে কায়েসকে ডাক্তার ডাকার জন্য বললো।

ডাক্তার এলেন, মনিরাকে পরীক্ষা করে গম্ভীর হয়ে পড়লেন। কায়েসকে আড়ালে ডেকে বললেন– তোমাদের বেগম অন্তঃসত্ত্বা।

কায়েসের মুখমণ্ডল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললো ডাক্তার বাবু, সত্যি বলছেন?

ডাক্তার জানেন এ বাড়ির অধিকারিণী যিনি–তিনি বিধবা। কতগুলো দাস-দাসী নিয়ে তিনি বসবাস করেন তাই মনিরাকে পরীক্ষা করে যখন ডাক্তার বুঝতে পারলেন মেয়েটি গর্ভবতী; তখন তার মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে পড়েছিল। তাই গোপনে কায়েসকে ডেকে বলেছিলেন ব্যাপারটা। এক্ষণে কায়েসের খুশিভরা ভাব লক্ষ্য করে ডাক্তার বাবুর মনোভাব প্রসন্ন হয়ে আসে। বললেন– তোমাদের বেগম বিধবা, এ কথাই জানতাম।

আপনি ভুল শুনেছেন।

এরপর ডাক্তার আর কোন কথা বলতে সাহসী হন নি।

ডাক্তার চলে যেতেই কায়েস কথাটা ময়নার কাছে বললো–শোন ময়না, তোমার মা-মনির পেটে বাচ্চা এসেছে।

ময়না শুনে চমকে উঠলো– দু'চোখ কপালে তুলে বললো ওমা সেকি কথা স্বামী নেই তা বাচ্চা পেটে আসবে কি করে! ময়নার মনে একটা অবিশ্বাসের ছোঁয়া দোলা দিয়ে গেল।

কায়েস পুরুষ ছেলে, কি করে কথাটা বুঝিয়ে বলবে ওকে। তাই নিশ্চুপ রইলো।

ময়না যখন মনিরার পাশে গেল, তখন কেমন যেন একটা থমথমে ভাব তার সমস্ত মুখখানাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

কদিন যেতেই মনিরা লক্ষ্য করলো বাড়ির প্রতিটি দাস-দাসী চাকর বাকর সবাই কি যেন কথাবার্তা নিয়ে কানাকানি করছে। সবাই যেন তার দিকে কেমন সন্ধিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে। সহজে কেউ মনিরার পাশে আসতে চায় না। এমন কি ময়না যে একদণ্ড মনিরাকে ছেড়ে থাকতো না সেও কেমন যেন দূরে দূরে সরে থাকে।

মনিরা ক্রমে হাঁপিয়ে পড়লো, একে স্বামীশোকে মুহ্যমান সে। তারপর শারীরিক অবস্থা ভাল নয়। দাস-দাসীদের এই উপেক্ষা ভাব তাকে বেশ অস্থির করে তুললো। একদিন ময়নাকে ডেকে বললো মনিরাময়না, তোদের কি হয়েছে রে? তোরা আজকাল আমার সঙ্গে অমন ব্যবহার করছিস কেন?

ময়না মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর বললো আমরা আর চাকরি করবো না।

চাকরি করবি না, কেন?

তোমার সরকারকে সব বলেছি।

কায়েসকে বলেছ তোমরা আর চাকরি করবে না?

হ্যাঁ মা-মনি, আমরা এ বাড়িতে আর চাকরি করবো না।

মনিরা, তখনই কায়েসকে ডেকে পাঠালো।

কায়েস এলো–আমাকে ডেকেছেন বৌরাণী?

বনহুরের অনুচরগণ মনিরাকে বৌরাণী বলে ডাকতো।

মনিরা লক্ষ্য করলো, কায়েস আসতেই ময়না সরে পড়েছে।

মনিরা এবার কায়েসকে লক্ষ্য করে বললো–কায়েস বাড়ির দাস-দাসীরা নাকি এ বাড়িতে আর চাকরি করবে না?

না, ওরা আর চাকরি করতে চাচ্ছে না। তা যাক না, ঝিন্দ শহরে কি লোকের অভাব আছে? নতুন দাস-দাসী জোগাড় করে নেব।

কিন্তু ওরা চলে যাবে কেন?

মাথা চুলকায় কায়েস– একটা কথা—

কি কথা বলো?

থাক, নাইবা শুনলেন বৌরাণী?

না, বলতেই হবে তোমাকে।

হাতে হাত কচলে বলল কায়েস–ওরা আপনাকে সন্দেহ করছে বৌরাণী।

সন্দেহ! আমাকে?

হ্যাঁ।

কেন?

আপনার পেটে বাচ্চা এসেছে, তাই।

আমার পেটে বাচ্চা।

হ্যাঁ বৌরাণী। তাই ওরা–কথা শেষ না করে মাথা নিচু করে আনন্দের হাসি হাসে কায়েস।

কে বলল তোমাকে এ কথা? রাগত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো মনিরা।

কায়েস পূর্বের ন্যায় মাথা নীচু করে জবাব দিল ডাক্তার বাবু বলেছিলেন।

ডাক্তার বাবু!

হ্যাঁ।

মনিরা ধীরে ধীরে দৃষ্টি নিচু করে নিল। একটা দুঃখ বেদনা আনন্দ ভরা লজ্জা তার মুখমণ্ডল ছেয়ে গেল। কায়েসের দিকে মুখ তুলে চাইতে পারলো না। হাজার হলেও প্রথম মেয়েদের একটা লজ্জার সময়।

কায়েস একটু হেসে চলে যাচ্ছিল, মনিরা পিছু ডাকলো–শোন।

কায়েস থমকে দাঁড়ালো।

মনিরা বললো–কায়েস, তুমিও কি আমাকে কোন রকম সন্দেহ করছ?

কায়েস দু'হাতে কান ধরে জিভ কাটলো–ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

কায়েস!

বৌরাণী!

কি করবো বলো? সবাই যখন আমাকে ভুল বুঝছে তখন আমার কি কর্তব্য বলো? দুদিন পর হোক দু'বছর পর হোক যখন দেশে ফিরে যাব, তখনও লোক সমাজ আমাকে এমনি সন্দেহের চোখে দেখবে। আমি আত্মহত্যা করবো কায়েস আত্মহত্যা করবো।

বৌরাণী, এমন কাজ করবেন না যেন, এমন কাজ করবেন না! ডাক্তারের কথায় আমার কি যে আনন্দ হয়েছে, তা খোদা জানেন। আমি ডাক্তার বাবুকে পাঁচশ টাকা বখশীস দিয়েছি।

কায়েস, সে চলে গেছে, কেন সে তার স্মৃতি রেখে গেল? কেনো সে আমাকে মরতে দিল না।

বৌরাণী মরবো বললেই কি মরা যায়? দুনিয়ার সবাই সন্দেহ করুক, সবাই অবিশ্বাস করুক, কিন্তু সেই দয়াময় জানেন সব, তিনিই আপনার মান ইজ্জত রক্ষা করবেন। চলে যাক আজই দাস-দাসী সব চলে যাক, আমি নিজে সব করবো।

কায়েস!

হ্যাঁ বৌরাণী, আপনি আমার ওপর ভরসা রাখবেন।

.

আর কত দিন তুমি আমায় লুকিয়ে রাখবে সিন্ধীরাণী?

যত দিন শয়তান মহারাজার হাত থেকে পরিত্রাণ না পাব। কেন? তোমার কি কোন কষ্ট হচ্ছে দস্যুসম্রাট?

কষ্ট হচ্ছে না, কিন্তু—

বলো কিন্তু কি?

আমার তো কাজ আছে।

তা আছে, কিন্তু আমি যদি কোনদিন তোমাকে ছেড়ে না দেই?

তাহলে আমি নাচার সিন্ধীরাণী। আচ্ছা, তোমার সে মহারাজ আর আসছে না কেন?

আমিও সেই কথা ভাবছি। তবে না আসাই তোমার পক্ষে মঙ্গল।

কিন্তু—

আবার কিন্তু কি দস্যুসম্রাট?

তাকে যে আমার প্রয়োজন। বনহুর আনমনা হয়ে যায়, কারণ আজ কত নিরুপায় হয়ে তবেই না বনহুর এই সাগরতলে দিন কাটাচ্ছে। এখন মহারাজনামী শয়তান একবার এলে হয়, দেখে নেবে সে তাকে।

কিন্তু সেই যে মহারাজ সিন্ধীরাণীকে শাসিয়ে রেখে গেছে, তারপর আর আসেনি। হয়তো কোন রহস্যপূর্ণ ব্যাপারে আটকা পড়ে গেছে। এবার এলে বনহুরের হাতে তার নিস্তার নেই।

সিন্ধীরাণী বিস্ময়ভরা গলায় বলল ঐ শয়তানকে তোমার প্রয়োজন?

হ্যাঁ।

কেন?

শুনেছি সে না এলে এখান থেকে বের হবার কোন উপায় নেই।

হ্যাঁ, সে কথা সত্য, মহারাজ না এলে বা সে ঐ মোটর বোটখানা না পাঠালে এই সাগরতল থেকে বের হবার কোন উপায় নেই।

সে জন্যই তো তাকে আমার দরকার সিন্ধীরাণী।

কিন্তু আমি তোমায় যেতে দেব না দস্যুসম্রাট। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না —

সিন্ধীরাণী তার সুকোমল বাহু দু'টি দিয়ে দস্যু বনহুরের গলা জড়িয়ে ধরলো– বলো, তুমি আমায় ছেড়ে আর চলে যাবে না।

সিন্ধীরাণীর মায়াময় দুটি চোখে আবেগভরা চাহনি। রক্তাক্ত গণ্ডদ্বয় আরও রাঙা হয়ে উঠেছে। ঠোঁট দু'খানা মৃদু কেঁপে ওঠে। বনহুরের দক্ষিণ হাতখানা মুঠোয় চেপে ধরে বললো, তুমি আমাকে একা ফেলে আর চলে যাবে না?

বনহুরের মুখে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠে মিলিয়ে যায়, গম্ভীর গলায় বলে, দস্যু বনহুরকে তুমি বন্দী করতে চাও?

হ্যাঁ, আমার হৃদয় কারাগারে।

উঁহু, লৌহ কারাগার যাকে আটক রাখতে সক্ষম হয় নি, তাকে তুমি হৃদয় কারাগারে আটকে রাখতে সক্ষম হবে না সিন্ধীরাণী।

ওকথা বলো না দম্রাট। লৌহ কারাগার তোমাকে বন্দী করে রাখতে না পারলেও আমি তোমাকে বন্দী করব। কিছুতেই তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারবে না।

বনহুর সাগরতলে অসহায় এক শিশুর মতই নিরুপায় হয়ে দিন কাটাতে লাগলো। কি করবে। সে, গভীর সাগরতলায় তার কোন শক্তি বা বুদ্ধি কাজে আসছে না। তবু বনহুর সব সময় নানাভাবে উপায় অন্বেষণ করে, কিভাবে এখান

থেকে বের হওয়া যায়। চির-চঞ্চল বনহুর শান্ত সুবোধ বালকের মত কি আর দিন কাটাতে পারে?

মাঝে মাঝে নির্জনে বসে চিন্তা করে, বিমর্ষ হয়ে যায় তার মন, অমনি সিন্ধীরাণী এসে হাজির। হয় তার সামনে। নানারকম হাসি-গল্পে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। কখনও বা স্বচ্ছ বাধের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে দু'জনে সাগরতলের অদ্ভুত মাছ ও জীবের খেলা দেখে। আরও দেখে নানা জাতীয় উদ্ভিদ, ঝিনুক আরও কত কি!

সিন্ধিরাণী মাঝে মাঝে তার সহচরীগণসহ দস্যু বনহুরকে নাচ দেখায়, গান গেয়ে শোনায়। বনহুরের গম্ভীর মুখ দেখেই সিন্ধীরাণীর মন আতঙ্কে শিউরে ওঠে। কেমন করে ওর মুখে হাসি ফোঁটাবে, কেমন করে ওকে খুশি রাখবে, এই চিন্তাই সিন্ধীরাণীকে অস্থির করে তোলে।

এমনি করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যায়। অস্থির হয়ে পড়ে বনহুর।

সিন্ধীরাণীর কিন্তু আনন্দের সীমা নেই। বনহুরকে পেয়ে সাগরতল তার কাছে স্বর্গের চেয়েও বেশি সুন্দর ও সুখময় হয়ে উঠেছে।

একদিন মায়া সিন্ধীরাণীকে নিরালায় ডেকে বললো– রাণীজী, একি আপনার ঠিক হচ্ছে?

সিন্ধীরাণী ভ্রূ কুঁচকে বললো–কোটা?

যাকে আপনি মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছেন সে যে আপনার বন্দী একদিন তাকে আপনি মৃত্যুদণ্ড দিতে চেয়েছিলেন, মনে আছে সে কথা?

আছে। কিন্তু আমি কোনদিন ওকে মৃত্যুদণ্ড দেব না মায়া।

সে আমি জানি। কিন্তু এ কথা মহারাজ যদি জানতে পারেন?

তোরা না বললে সে কিছুতেই জানতে পারবে না।

কিন্তু কত দিন গোপন রাখা সম্ভব হবে রাণীজী? হয়তো একদিন মহারাজ জেনে ফেলবেন।

মায়া তুইতো জানিস আমি ওকে ভালবেসে ফেলেছি। শুধু ভালবাসা নয়, ওকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না।

রাণীজী!

হ্যাঁ মায়া, আমার মন প্রাণ আমি ওকে সঁপে দিয়েছি।

রাণীজী!

এখন তোরাই আমার ভরসা। তোদের হাতেই আমার জীবন। তোরা যদি মহারাজের কাছে কথাটা গোপন রাখতে পারিস তবেই আমি ওকে চিরদিনের জন্য–

এমন সময় বনহুর সেখানে উপস্থিত হয়।

কথা শেষ না করেই থেমে যায় সিন্ধীরাণী।

মায়া নতমস্তকে সেখান থেকে চলে যায়।

বনহুর আড়াল থেকে সিন্ধীরাণীর সব কথাই শুনতে পেয়েছিল, বললো সে– রাণী, তুমি ভুল করছ!

কেন?

কাউকে কোনদিন বিশ্বাস করতে নেই। তুমি চিরদিন আমাকে লুকিয়ে রাখতে পারো না, তা হয় না।

হবে। কেন হবে না?

অসম্ভব।

না, আমি ওসব শুনতে চাই না।

.

ক'দিন হলো এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে মনিরার। শুধু পরিচয় নয় মনিরাকে তিনি মেয়ের মত ভালবাসেন।

সে এক ঘটনা। কায়েসের অনুরোধে একদিন মনিরা ঝিল শহরে একটি সিনেমা হলে ছবি দেখতে গিয়েছিল। ছবি শেষে মনিরা যখন কায়েসের সঙ্গে হল থেকে বেরিয়ে আসছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক মনিরাকে সম্বোধন করে ডাকলেন–একটু শুনবে?

মনিরা থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালো–আমাকে ডাকছেন?

হ্যাঁ।

কায়েস আর মনিরা এগিয়ে গেল।

বৃদ্ধের শরীরে মূল্যবান পোশাক, মুখে একমুখ শুভ্র দাড়ি। মাথায় পাকা চুল, হেসে বললেন– একটু পূর্বে তোমাকে আমি আমার কন্যা বলে ভুল করেছিলাম। তোমার নাম কি মা?

মনিরা একবার কায়েসের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল– আমার নাম মনিরা।

বৃদ্ধের চোখ দুটো আনন্দে চক চক করে উঠলো, হেসে বলল–খুব সুন্দর তোমার নাম। একটু পর রুমালে মুখ মুছলেন বৃদ্ধ।

মনিরা বলল–কি হলো আপনার?

বৃদ্ধ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন– আজ আমার কন্যা জীবিত থাকলে—

আপনার কন্যা বুঝি মারা গেছে?

হ্যাঁ, আজ বছর হয়ে এলো আমার মা মণি আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আবার রুমালে মুখ মুছে বৃদ্ধ।

কয়েকটি লোক, বোধ হয় আত্মীয় হবে বৃদ্ধের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, তারা বলল–চলুন, বৃথা শোক করে লাভ নেই।

ওরে তোরা বুঝবিনে, আমার মনের ব্যথা তোরা বুঝবিনে। দাঁড়া, ওকে আর একবার দেখতে দে।

মনিরা বৃদ্ধের ব্যবহারে মুগ্ধ হলো। বৃদ্ধের ব্যথা সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল, বলল– আপনি কে?

আমি ঝিন্দের হতভাগা এক নাগরিক। এ দুনিয়ার আমার কেউ নেই। একমাত্র কন্যাকে আমি হারিয়েছি। একটু থেমে বললেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক তুমি যদি কিছু না মনে কর,তবে আমি তোমাকে কন্যা বলে মনে করবো।

বৃদ্ধা ভদ্রলোকের কথাবার্তা মনিরার ব্যথা কাতর মনে একটা সান্ত্বনার প্রলেপ এনে দিয়েছে। এ অজানা অচেনা দেশে সে যেন এতদিন পর এক আপনজনের সন্ধান পেল। বলল– নিশ্চয়ই আপনি আমাকে কন্যা বলে মনে করতে পারেন।

অনেক খুশি হলাম তোমার কথা শুনে।

কায়েস বলল– বৌরাণী, রাত বেড়ে যাচ্ছে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলে উঠলেন, হাঁ রাত বেড়ে যাচ্ছে। যাও মা, ঘরে ফিরে যাও,তোমার স্বামী হয়তো রাগ করবেন।

মনিরার চোখদুটো ছল ছল করে উঠলো, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল– আমার অদৃষ্ট মন্দ।

সে কি মা!

হ্যাঁ বাবা আমার স্বামী নেই।

ছিঃ দুঃখ কর না মা। কিন্তু তোমার স্বামী গেছেন কোথায়?

মনিরা বলে উঠলো–তিনি জীবিত নেই।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ঘোলাটে চোখে যেন একটা বিদ্যুৎ চমকে গেল–চট করে কণ্ঠস্বর মোলায়েম করে নিয়ে বললেন–যে গেছে তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই, কোন লাভ নেই।

কায়েস মনে বেশ বিরক্তি বোধ করছিল, বলল– পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলা উচিৎ নয়। বৌরাণী।

বৃদ্ধ লোকটিই বলে উঠলেন– হ্যাঁ, ঠিকই বলছো। আচ্ছা যাও মা। কিন্তু তোমার বাড়ির ঠিকানাটা বললে না তো মা? কোন দিন যদি–

মনিরা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু কায়েস বলে উঠল–ঝিল শহরের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে যে বড় বাড়িটা আছে সেটা।

বেশ বেশ। সময় করে একদিন যাব–

মনিরা বলল–যাবেন, গেলে অনেক খুশি হব। তারপর গাড়িতে গিয়ে বসলো। কায়েস ড্রাইভ আসনে বসে স্টার্ট দিল।

মনিরাদের গাড়ি কিছুদুর এগুতেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক তার একজন অনুচর ইংগিত করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে অনুচরটি পাশেই থেমে থাকা একটা মোটরে উঠে মনিরাদের গাড়ি ফলো করলো।

বৃদ্ধের চোখে মুখে খেলে গেল এক অদ্ভুত হাসির ছটা।

মনিরা গাড়িতে বসে বলল কায়েস, তুমি বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ভুল ঠিকানা বললে কেন?

বৌরাণী আপনি সরল মেয়ে মানুষ ওসব বুঝবেন না।

কয়েকদিন পরের ঘটনা।

একদিন মনিরা বাড়ির সম্মুখস্থ বাগানে বসে আছে। শরীরটা বড় ভাল নয়। মনের সঙ্গে দিন দিন স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছে,তবু নিজেকে খাড়া করে রাখছে মনিরা। আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল তাও পারেনি। একটা কচি মুখ ভেসে উঠেছিল তার চোখের সামনে। স্বামীর দেওয়া উপহার মনিরা নষ্ট করতে পারে না। তাকে বাঁচাতেই হবে।

মনিরা হঠাৎ দেখলো একটি সুন্দর গাড়ি তাদের বাগানের সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নেমে এলো এক বৃদ্ধ মহিলা। শুভ্র কেশ ধারিণী অদ্ভুত এক নারী, ললাটে সিঁদুরের টিপ সিঁথিতে সিঁদুর মুখমণ্ডল প্রতিভাদীপ্ত। উজ্জ্বল হাসির রেখা ফুটে রয়েছে বৃদ্ধার ঠোঁটের ফাঁকে।

প্রথম দৃষ্টিতেই মনিরার বড় ভাল লাগল বৃদ্ধাকে। এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো–কে আপনি?

বৃদ্ধা মনিরার চিবুক ধরে আদর করে বলল–আমাকে চিনতে পারবিনে মা। আমার স্বামী যার সঙ্গে তোমার সিনেমা হলে পরিচয় হয়েছিল তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

ও আপনি সেই মহৎ ব্যক্তির—

মনিরা অভিবাদন জানিয়ে বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাকে অন্তঃপুরে নিয়ে গেল।

অল্পক্ষণেই বৃদ্ধার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেল মনিরা, আপনজনের চেয়েও অনেক আপন বলে মনে হলো ওর কাছে।

কায়েস আজ বাড়ি নেই, মনিরা বৃদ্ধাকে যতদূর সম্ভব আদর আপ্যায়নে তুষ্ট করলো।

বিদায়কালে বলল–বড় আশা করে তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য। একা ফিরে যাচ্ছি অনেক দুঃখ পাবেন তিনি।

মনিরা এই অজানা দেশে এমন একজন আত্মীয় সমতুল্য মহিলাকে পেয়ে খুব খুশি হলো। সেদিন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের আচরণেও সে অত্যন্ত আত্মহারা হয়ে পড়েছিল। মনিরা কিছু ভাবলো তারপর বলল–আপনি অপেক্ষা করুন আমি যাব আপনার সঙ্গে।

বৃদ্ধার চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বলল– বাঁচালে মা, বাঁচালে। উনি অনেক খুশি হবেন।

মনিরা বৃদ্ধার সঙ্গে তার সুন্দর গাড়িখানায় চেপে বসলো।

.

কায়েস রহমানের জরুরি এক খবর পেয়ে দু'দিনের জন্য চলে গিয়েছিল, ফিরে এসে বাড়িতে মনিরাকে না দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো।

দিন গড়িয়ে গেল, রাত হলো। রাত ভোর হলো তবু মনিরা ফিরলো না, কায়েস বুঝতে পারলে তাকে কেউ ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।

কায়েস কি করবে। কোথায় তার সন্ধান করবে ভেবে পেল না পাগলের মত সে গোটা শহর খুঁজে বেড়াতে লাগলো। হঠাৎ মনে পড়লো, সেদিন সিনেমা দেখার দিন এক বৃদ্ধ মনিরার সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করতে এসেছিল। কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল সেদিন, কায়েস– তাই সে বাড়ির সঠিক ঠিকানাও দেয়নি। কিন্তু কে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক, কি তার পরিচয়? কোথায় থাকে তার কিছুই জানা নেই।

কায়েস হন্যে হয়ে অনুসন্ধান করে চললো– নানাভাবে নানা জায়গায় খোঁজ করতে লাগলো। সে মনিরার। একদিন কায়েস এক হোটেলের সামনে দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে দেখতে পেল। ভদ্রলোক হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে চেপে বসলো।

.

কায়েস তাড়াতাড়ি আর একখানা গাড়ি ডেকে উঠে বসলো।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করলো কোথায় যাবেন?

কায়েস ব্যস্ত কণ্ঠে বলল– ঐ যে গাড়িখানা চলে গেল ঐ গাড়িখানাকে অনুসরণ করো।

কায়েসের গাড়ি সামনের গাড়িখানাকে ফলো করে দ্রুত চলতে লাগলো। কায়েস। ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলল তোমাকে বখশীস দেবো তুমি ঐ গাড়িখানা যেখানে যায় সেখানে আমাকে পৌঁছে দেবে।

ড্রাইভার কায়েসের কথা অনুযায়ী কাজ করলো।

ঝিল শহর অনেক বড়। মস্ত বড় বড় বাড়ি, দালান-কোঠা দোকানপাট, শহরের মধ্যে নানা রকমের পার্ক, খেলার মাঠ, লেক, ঘোড়াদৌড়ের মাঠ স্টুডিও সব

রয়েছে। কায়েসের কোনদিকে খেয়াল নেই। সে শুধু সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, গাড়িখানা যেন দৃষ্টির আড়ালে চলে না যায়।

কিছু সময় চলার পর হঠাৎ একটা বিরাট পুরোন অট্টালিকার সামনে এসে আগের গাড়িখানা থেমে পড়লো।

কায়েসের গাড়ি এবার বেশ একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়লো। কায়েস পকেট থেকে দশ টাকার। দুখানা নোট বের করে ড্রাইভারের হাতে দিয়ে বলল যাও!

.

কায়েস লুকিয়ে পড়লো সামনের কয়েকটি ঝাউ গাছের আড়ালে। সে আত্মগোপন করে দেখতে লাগলো–সন্দেহজনক কিছু দেখতে পায় কি না। মনিরার অন্তর্ধান ব্যাপারে এ বৃদ্ধের কোন যোগাযোগ নাও থাকতে পারে। তবু ভাল করে সন্ধান নেয়া ভাল। কায়েস বেশ কিছুক্ষণ আড়ালে থাকার পর বেরিয়ে পড়লো, তারপর সোজা এগিয়ে চলল বৃদ্ধা ভদ্রলোকের হলঘরের দিকে। এমন একটা সুন্দর শহরে দশ বছর আগের পুরোন বাড়ি দেখে কিছুটা অবাক হলো সে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক ততক্ষণে বাড়ির ভেতরে চলে গেছেন।

কায়েস এসে দাঁড়ালো হলঘরের সামনে, অমনি একটি লোক। তার কাছে এসে বলল– আসুন ভেতরে এসে বসুন।

কায়েস আশ্চর্য হলো, তাকে তো কেউ দেখেনি, হঠাৎ এই লোকটা এলোই বা কোথা থেকে, আবার একেবারে সোজা ভেতরে গিয়ে বসার জন্য তাকে বলছে, ব্যাপার কি?

কায়েস অনুসরণ করলো লোকটাকে।

চুন-বালি খসে পড়া মস্তবড় হলঘর। এ বাড়িতে মানুষ বাস করে অথচ তেমন ভাবে মেরামত করা হয় নি কতকাল থেকে।

হলঘরে প্রবেশ করতেই সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক কায়েসকে অভ্যর্থনা জানালো– আসুন হঠাৎ কি মনে করে?

কায়েস প্রথমে হকচকিয়ে গেল, কি বলে কথা শুরু করবে ভাবছে, তখন বৃদ্ধই বললেন– মা মনি বুঝি আপনাকে পাঠিয়ে দিলেন আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে?

কায়েস আমতা আমতা করে বলল– হ্যাঁ, বৌরাণীই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। সেদিন আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।

বৃদ্ধের ঠোঁটের কোনে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল, বলল– আপনার বৌরাণী আপনাকে পাঠাবেন এ আমি জানতাম।

কায়েস ফ্যাকাশে হাসি হাসে, কোন কথা বলতে পারে না।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন– আপনার বৌরাণী নিশ্চয়ই আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন?

চট করে কি জবাব দেবে ভেবে পায় না কায়েস, একটা ঢোক গিলে বলল– হাঁ, তিনি। আপনাকে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

শুনে খুশি হলাম।

বৃদ্ধ এবার কায়েসের জন্য নাস্তার আয়োজন করতে বললেন।

কায়েস বৃদ্ধের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হলো।

অল্পক্ষণেই নানাবিধ খাদ্য সম্ভারে ভরে উঠলো তার সামনের টেবিল।

বৃদ্ধ হেসে বললেন– নিন, শুরু করুন।

.

কায়েসের জ্ঞান ফিরে এলো, উঠে বসতে গেল কিন্তু দু'চোখ তার এমনভাবে মুদে আসছে। কেন? মাথাটা ঝিমঝিম করছে। অনেক কষ্টে সোজা হয়ে বসল কায়েস, তাকালো সামনের দিকে। একি, চারদিকে এমন অন্ধকার কেন? সেকি নিজের ঘরে, নিজের বিছানায় শুয়ে নেই? ধীরে ধীরে কায়েসের মনে পড়লো,সে তো বৃদ্ধ ভদ্রলোকের হলঘরে বসে নাস্তা করছিল। কিন্তু এখানে এলো কি করে। তবে কি তাকেও বন্দী করা হয়েছে? কায়েসের মনে সন্দেহ জাল বিস্তার করলো। এবার ধীরে ধীরে সব পরিষ্কার হয়ে এলো কায়েসের কাছে। এই বৃদ্ধই তাহলে

বৌরাণীকে চুরি করে নিয়ে এসেছে। নিশ্চয়ই কোন দুষ্ট লোক সে। তার সেদিনের সন্দেহ তাহলে সত্যি।

কায়েস রাগে অধর দংশন করতে লাগলো। এখন উপায়, বৌরাণীর সন্ধান করতে এসে নিজেই ফাঁদে পড়ে গেল। নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হলো কায়েস, বৌরাণী নিরুদ্দেশ হবার সংবাদটা যদি রহমানের নিকটে পাঠাতে পারত তবু কতকটা নিশ্চিন্ত হত সে। এখন বৌরাণীও নিখোঁজ, সেও উধাও। সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যায় তার কাছে। ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা করে কায়েসের।

হঠাৎ দরজা খুলে যায়, কায়েস তাকিয়ে দেখতে পায় তার সামনে দাঁড়িয়ে সেই বৃদ্ধ। যদিও কক্ষটা অন্ধকার তবু বুঝতে পারে সে।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বৃদ্ধ।

কায়েস অন্ধকারেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকিয়ে রইল।

বৃদ্ধ হাসি থামিয়ে বলল– মিথ্যাবাদী, বৌরাণী তোমাকে পাঠিয়েছে, না? কোথায় তোমার বৌরাণী?

কায়েস এবার কথা বলল– শয়তান, তুমিই তাহলে বৌরাণীকে...

হ্যাঁ, আমিই তাকে চুরি করে এনেছি।

কেন, কি করেছিল সে তোমার?

সে কথার জবাব আজ পাবে না, পরে সব জানতে পারবে। কিন্তু মনে রেখ, আর কোনদিন এ অন্ধকার কারাকক্ষ থেকে তোমার পরিত্রাণ নেই। বৌরাণীর সন্ধানে এসে নিজেই বন্দী হলে!

কায়েস বৃদ্ধের কথায় ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জে উঠলো, বলল– শয়তান, তোমার সাধ্য কি আমাকে বন্দী করে রাখ। আমি বৌরাণীকে উদ্ধার করবোই।

আবার হেসে উঠলো বৃদ্ধ– হাঃ হাঃ হাঃ তার সন্ধান পেলেতো উদ্ধার করবে!

আমি যদি জীবনে বেঁচে থাকি তবে আমি তাকে খুঁজে বের, করবোই...

সে সুযোগ তুমি আর পাবে না শয়তান। পদাঘাতে কায়েসকে মেঝেতে ফেলে দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে অন্ধকার কারাকক্ষ হতে বেরিয়ে যায়।

কায়েস অতিকষ্টে উঠে বসে।

ততক্ষণে তার চোখের সামনে লৌহ দরজা কড়কড় শব্দে বন্ধ হয়ে যায়।

.

নূরী, ঘরে চলো নূরী, আর কতদিন বনে বনে কেঁদে বেড়াবে? নূরীর কোটরাগত চোখ, এলোমেলো রুক্ষ চুল। ছিন্নভিন্ন পরিধেয় বস্ত্র। জীর্ণ দেহটার দিকে তাকিয়ে রহমান কথাটা বলে।

রহমানের কথায় ফিরে তাকালো নূরী। উদাস কণ্ঠে বলল–আমি আর ঘরে যাব না রহমান। যতদিন না আমার হুর ফিরে আসবে ততদিন আমি যাবো না। তুমি চলে যাও রহমান..

নূরী, যে গেছে আর কি কোনদিন ফিরে আসবে?

খবরদার, ও কথা বলবে না। আমার হুর মরে যায়নি, আমার মন বলছে সে মরে যায়নি। রহমান, দেখ সে আবার ফিরে আসবে। আমার হুর মরতে পারে না, মরতে পারে না। তুমি চলে যাও রহমান, চলে যাও–

নূরী!

না না, তুমি আমাকে ডেকো না রহমান। আমাকে ডেকো না।

রহমানের দু'চোখ ছাপিয়ে পানি আসে। নূরীর অবস্থা তার হৃদয়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। সর্দার নেই,একে সে ব্যথায় অহরহ তার অন্তর গুমড়ে মরছে, তারপর নূরীর এ অবস্থা সমস্ত আস্তানাটা যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। বনে বনে পাখি আর গান গায় না। গাছে গাছে ফুল ফোটে না। আকাশে চাঁদ উঠে, কিন্তু সে চাঁদের আলো যেন বিবর্ণ। ঝর্ণার পানিতে গতি আছে, কিন্তু সেই ছন্দ যেন নেই। একজনের অভাবে বনভূমি যেন সন্তানহারা জননীর মত হয়ে পড়েছে। গভীর রাতে রহমান চমকে উঠে, দূর থেকে ভেসে আসে নূরীর কান্নার করুন সুর। ঘরে

বসে ছটফট করে রহমান। ছুটে যেতে ইচ্ছা করে ওর পাশে, কিন্তু কে যেন পথ রোধ করে ধরে ওর। কে যেন বলে কাঁদতে দে ওকে, প্রাণভরে কাঁদতে দে।

আজকাল রহমান ঝিমিয়ে পড়ায় দস্যুতা একরকম বন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত আস্তানা জুড়ে একটা বিরহ বেদনার করুন থমথমে ভাব বিরাজ করছে।

বেশ কিছুদিন হলো ঝিন্দের সংবাদ সে পায় নি। তাই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে রহমান। প্রভু ভক্ত অনুচর সে, প্রভুর জন্য প্রাণ দিতেও পিছপা নয়। সেই প্রভুর পত্নী আজ ঝিন্দ শহরে। কেমন আছে, তারা, কি করছে তারা কি করছে কায়েস, এসব চিন্তা রহমানের মনে সদা উদয় হয়। কিন্তু ঝিল শহর তাদের দেশ থেকে বহুদূরে। চট করে কোন সংবাদ পাওয়া সম্ভব নয়। রহমান জানে কায়েসের মত বিশ্বাসী এবং মহৎ অনুচর সেখানে আছে, কাজেই তার চিন্তার কোন কারণ নেই। নিশ্চয়ই প্রভু পত্নীর কোন অসুবিধা হবে না।

.

মিঃ জাফরী ও অন্যান্য পুলিশ অফিসার আলাপ-আলোচনা করছিলেন। গম্ভীর মুখে বসে রয়েছেন মিঃ জাফরী।

খানবাহাদুরের ছেলে মুরাদকে জামিনে মুক্তি দেবার পর সে পুলিশের কড়া পাহারার মধ্যে থেকেও উধাও হয়েছে, এ ব্যাপার নিয়েই পুলিশ অফিসারদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল। মুরাদ নিরুদ্দেশ হওয়ায় খানবাহাদুরকে কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে। বৃদ্ধ খানবাহাদুর সাহেব একেবারে ভেঙে পড়েছেন। পুত্রের জন্য তিনি আজ পুলিশের হাতে অপদস্ত হচ্ছেন।

সমস্ত শহর তন্ন তন্ন করে খোঁজা হচ্ছে, কিন্তু কোথাও মুরাদের টিকিটা পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। প্রায় বছর হয়ে এলো মুরাদ উধাও।

শুধু মুরাদের চিন্তাই পুলিশমহলকে ঘাবড়ে তোলেনি, মিঃ জাফরীর লাখ টাকা ঘোষণার পর পুলিশ উঠে পড়ে লেগেছে, নানাভাবে অনুসন্ধান চালিয়েও দস্যু বনহুরের কোন হদিস পায় নি। বিশেষ করে মনিরা তার বিয়ের আসর থেকে চুরি যাবার পর বনহুর যেন হাওয়ায় মিশে গেছে। তার সঙ্গেই যেন নিরুদ্দেশ হয়েছে মুরাদও।

মিঃ জাফরীর আদেশে চৌধুরীবাড়ি ও তার আশেপাশে পুলিশ অহরহ গোপনে পাহারা দিয়ে চলেছে। কিন্তু আজ পর্যন্তও তারা নতুন কোন সংবাদ দিতে পারছে না।

মিঃ জাফরী গম্ভীর মুখে শুনে যাচ্ছিলেন। কথাবার্তা হচ্ছিল মিঃ হারুন, মিঃ কাওছার, মিঃ হোসেন ও মিঃ শঙ্কর রাওয়ের মধ্যে। শঙ্কর রাও হঠাৎ এক সময় বলে উঠলেন–শহরটা যেন একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বলে উঠল মিঃ হোসেন– হ্যাঁ, স্যার বিশেষ করে লাখ টাকা ঘোষণার পর থেকে।

মিঃ কাওসার বললেন– দস্যু হলেও সেত মানুষ। জীবনের ভয় তারও আছে।

মিঃ হোসেন বললেন– কাজেই সরে পড়েছে।

কিন্তু গেল কোথায়? দেশে আছে, না বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে, বুঝা যাচ্ছে না। বললেন শংকর রাও।

মিঃ হারুন বললেন– দেশে থাকলে সে এমন করে লুকিয়ে থাকতে পারতো না, এটা ঠিক।

এতক্ষণে কথা বললেন মিঃ জাফরী–ঠিক বলেছেন মিঃ হারুন। দেশের মাটিতে থাকলে সে নিশ্চয়ই এমন করে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারত না। ঐ যে কথায় বলে, পিপীলিকার পাখা। হলে সে কোন সময় তার বাসায় লুকিয়ে থাকতে পারে না।

মিঃ কাওসার বললেন-ঘঁ, ঠিকই বলেছেন স্যার, সে পুলিশের ভয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে। জানে লাখ টাকা এবার তাকে টেনে বের করবেই, কাজেই পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে বেচারা।

শঙ্কর রাও হেসে বললেন– দেশত্যাগী হয়েছে বনহুর।

অন্য একজন অফিসার বললেন– একা নয় চৌধুরীকন্যা মনিরাকে নিয়ে।

মিঃ হারুন বললেন–শয়তান দস্যু মেয়েটির জীবন বিনষ্ট করে দিল। মেয়েটির বড় চাচা ওকে পুত্রবধু করবেন বলে দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন, সব পণ্ড করে

মেয়েটাকে চুরি করে পালিয়েছে। বদমাইশটা।

মিঃ জাফরী বললেন– চৌধুরী– গিন্নী ভাগনীর জন্য নাকি উদভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

হ্যাঁ স্যার, বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার অবস্থা খুব খারাপ। সব সময় কান্নাকাটি করছেন। কথাগুলো বললেন মিঃ হারুন।

মিঃ জাফরী স্থিরকণ্ঠে বললেন– শুনেছি চৌধুরী সাহেব ও তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত ভালো মানুষ। আর তাঁদেরই সন্তান এই লোকসমাজের কলঙ্ক দস্যু।

অন্য একজন প্রবীণ অফিসার বললেন–স্যার, গোবরেও পুষ্প জন্মে, আবার পুষ্পেও কীট হয়।

ভদ্রলোকের কথা সবাই সমর্থন করলেন।

শঙ্কর রাও এবার বলে উঠলেন এতদিনে শান্তি ফিরে এসেছে যা হোক। চুরি ডাকাতি, রাহাজানি, লুটতরাজ নেই বললেই চলে। এমন না হলে হয়!

মিঃ জাফরী এবার একটু হাসলেন– তারপর বললেন দেশে শান্তি ফিরে এলেও আমার মনে শান্তি ফিরে আসেনি। যতদিন দস্যুটাকে তার উপযুক্ত শাস্তি দিতে না পারব ততদিন আমার চোখে ঘুম আসবে না।

হ্যাঁ স্যার, আপনার মত মানুষকে সে নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছেড়েছে। মিঃ কাওছার দুঃখভরা কণ্ঠে কথাটা বললেন।

শুধু তাকেই নয়, সমস্ত পুলিশমহলকে শয়তান জ্বালিয়ে মেরেছে। ওকে পাকড়াও না করা পর্যন্ত পুলিশমহল নিশ্চিন্ত নয়। আবার কখন আচম্বিতে হামলা চালিয়ে বসে তার ঠিক নেই। কথাটা বললেন– অন্য একজন পুলিশ অফিসার।

মিঃ হোসেন বললেন– যেমন ঘুমন্ত অগ্নেয়গিরি হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শান্ত শহরকে চঞ্চল করে তোলে।

হ্যাঁ, অমনিভাবেই আবার সে হানা দিয়ে বসবে, যখন নগরবাসী নিশ্চিত মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। বললেন মিঃ হারুন। একটু থেমে আবার বললেন

তিনি– আমরাও সে জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকব।

বলে উঠেন মিঃ কাওসার–বসে বসে হাত-পায়ে জড়তা আসছে। পুলিশের লোক আমরা, শান্ত জীবন আমাদের কাম্য নয়।

এমনি নানা ধরনের আলাপ আলোচনার মধ্যে রাত বেড়ে আসছে মিঃ জাফরী উঠে দাঁড়ালেন–চলুন, এবার বাসায় ফেরা যাক।

অফিসের ডিউটি যাদের রয়েছে তারা ছাড়া সবাই উঠে পড়েন। পুলিশ অফিসের ঘড়িতে তখন রাত ন'টা পঁচিশ বেজে গেছে।

.

যাকে নিয়ে তোক সমাজের এত আতঙ্ক, যার জন্য পুলিশমহলে আশঙ্কার সীমা নেই, যার তুলনা হয় আগ্নেয়গিরির সঙ্গে সেই সিংহপুরুষ শান্তশিষ্ট বালকের মত সাগরতলে শান্ত হয়ে রয়েছে। নাওয়া-খাওয়া আর ঘুমানো ছাড়া তার যেন কাজ নেই। গোসলের সময় ফোয়ারার পানিতে গোসল করা, খাবারের সময় নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য সম্ভারে ভরে উঠে বনহুরের সম্মুখস্থ। টেবিল। অবসর সময়ে সাগরতলে স্বচ্ছ কাঁচের আবরণীর পাশে গিয়ে বসে দৃশ্য দেখা। নর্তকীদের নাচ আর গানে সময় কাটানো। ঘুমাবার সময় দুগ্ধফেননি সুকোমল শয্যায় গা এলিয়ে ঘুমানো। এসব এখন দস্যু বনহুরের কাজ।

মাঝে মাঝে বনহুর যখন মন খারাপ করে বসে থাকে বা চিন্তা করে, তখন সিদ্ধীরাণী তাকে নানাভাবে খুশি করার চেষ্টা করে। হাসি খুশিতে মুখর করে তুলতে চায় ওকে।

কিন্তু বনহুর তো সত্যি সত্যিই অবোধ শিশু নয়, সে সব বুঝে উপলব্ধি করে, নিজেকে যতদূর সম্ভব প্রসন্ন রাখার চেষ্টা করে। এমনি করে কতদিন কাটানো যায় বনহুর ক্রমে হাঁপিয়ে পড়ে। চঞ্চল হয়ে ওঠে সে–সাগরতল থেকে উদ্ধারের উপায় খুঁজে।

প্রায় বছর হয়ে আসে।

মহারাজের পাত্তা নেই, সেই যে সিন্ধিরাণীকে শাসিয়ে রেখে চলে গেছে, তারপর আর ফিরে আসেনি সে।

মহারাজ না আসায় সিন্ধিরাণীর আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু বনহুর মহারাজের আগমন আসায় প্রহর গুণে চলে।

একদিন বনহুরের শয্যার পাশে বসে বসে তার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সিন্ধিরাণী। বনহুর চোখ দুটো মুদে নিশ্চুপ হয়ে পড়ে। সিন্ধিরাণী নীলাভ আলোয় বনহুরের সুন্দর মুখমণ্ডলের দিকে নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে। ভাবছে সিন্ধিরাণী ওকে চিরদিন এমনি করে ধরে রাখবে আর কোনদিন ছেড়ে দেবে না। কোন বাধাবিঘ্ন তার কাছ থেকে দস্যু সম্রাটকে কেড়ে নিতে পারবে না–

হঠাৎ সিন্ধিরাণীর চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়। দরজার বাইরে মায়ার ব্যস্তকণ্ঠ শোনা যায়– রাণীজী, রাণীজী, মহারাজ এসেছেন। মহারাজ এসেছেন।

বনহুর বিদ্যুৎ গতিতে উঠে দাঁড়াল।

সিন্ধিরাণী বলল– শিগগির লুকিয়ে পড়, শিগগির। লুকিয়ে পড়—

রাণী, শোনো, এবার আমি চাই তোমার সহায়তা।

বল, কি করব?

তুমি মহারাজকে প্রেমের অভিনয় করে এমন আদর আপ্যায়ন করবে, যেন সে তোমার কক্ষে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে দেয়।

আমি তা পারব না।

আমাকে যদি তুমি ভালবাস রাণী, তবে এই কাজ তোমাকে করতেই হবে, আমি সেই ফাঁকে তার ডুবন্ত মোটরবোটের কোন গোপন অংশে লুকিয়ে পড়ব। এবার নিশ্চয়ই সে তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছে, তুমি আপত্তি না করে তার সঙ্গে চলে আসবে।

আমি এসব পারব না।

যদি মঙ্গল চাও তবে কথা শেষ হয় না বনহুরের দরজায় শোনা যায় ভারী জুতোর শব্দ।

বনহুর চট করে বড় আয়নার পেছনে লুকিয়ে পড়ল।

কক্ষে প্রবেশ করল মহারাজ।

সিন্ধিরাণী তাড়াতাড়ি মুখোভাব স্বাভাবিক করে নিয়ে তাকে অভিবাদন জানালো।

মহারাজ গম্ভীর কণ্ঠে বলল–বেঁচে আছ তাহলে?

আপনি কি ভেবেছিলেন আমি মরে গেছি? বলল সিন্ধীরাণী।

মহারাজ এবার এগিয়ে গেল সিন্ধিরাণীর দিকে, বলল– আশ্চর্য এতদিন একাধারে সাগরতলে বন্দিনী থেকেও তোমার মধ্যে কোন চিন্তার ছাপ পড়েনি দেখছি। বেশ ছিলে তাহলে?

না, আপনার আসার প্রতীক্ষায় দিন গুণছিলাম।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, যেদিন আপনি বলে গেছেন আমাকে আপনি বিয়ে করবেন, সেদিন থেকে আপনার চিন্তাই আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

বনহুর আয়নার পেছন থেকে সিন্ধিরাণী আর মহারাজের সব কথা শুনছিল। সিন্ধিরাণীর বুদ্ধিদীপ্ত কথায় খুশি হচ্ছিল সে। এক্ষুণি ওকে ধরাশায়ী করতে পারে, কিন্তু তা করবে না বনহুর। শয়তানটার আস্তানার সন্ধান তার নেয়া চাই, কাজেই মনের আক্রোশ মনে চেপে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ খোঁজে সে।

সিন্ধীরাণীর কথায় বলল মহারাজ–তোমার কথা শুনে খুশি হলাম রাণী। জীবনে বহু মেয়েকে পেয়েছি, সবাই এক রকম আর, একটি মেয়েকেই জীবনে চেয়েও পাইনি– সে অদ্ভুত মেয়েটি। সাপীনির চেয়েও ভয়ঙ্কর।

সিন্ধীরাণী হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল– মহারাজ, কে সেই মেয়েটি যাকে আপনি চেয়েও কোনদিন পান নি।

তুমি তাকে চিনবে না রাণী। সে অপূর্ব সুন্দরী, অদ্ভুত সে নাম তার মনিরা।

আয়নার পেছনে চমকে উঠলো বনহুর। সঙ্গে সঙ্গে দু’চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। এতক্ষণে বুঝতে পারলো, কে এই শয়তান মহারাজ। এক্ষুণি ওর টুটি ছিঁড়ে

ফেলতে ইচ্ছা হলো বনহুরের, কিন্তু নিজেকে অতি কষ্টে সংযত করে নিল, কারণ এখনও অনেক কিছু বাকি।

সিন্ধীরাণী বলল– মহারাজ,আপনি তাকে ভালবাসতেন?

হ্যাঁ, এখনও বাসি, কিন্তু

মহারাজ, আমি যে আপনাকে ভালবাসি। সিন্ধীরাণী মহারাজের কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরলো তার সুকোমল বাহু দুটি দিয়ে। এমন কৌশলে সিন্ধীরাণী মহারাজের গলা জড়িয়ে ধরলো যেন দরজা ও আয়নাটা তার পেছনে থাকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর আয়নার পেছন থেকে বেরিয়ে দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করে।

হঠাৎ দরজায় একটু শব্দ হয়।

মহারাজ সিন্ধীরাণীর বাহু দুটি নিজ কণ্ঠ থেকে ছাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল– কে কে?

সিন্ধীরাণী হেসে বলল–মহারাজ এই সাগরতলে কার সাধ্য আসে! মায়া এসে ফিরে গেল। সে আমাদের এ অবস্থায় দেখতে পেয়ে লজ্জায়

ও মায়া!

হ্যাঁ, মহারাজ। একটু থেমে বলল সিন্ধীরাণী–এবার আমাদের বিয়ে হওয়াটা একান্ত—

বেশ, তাই হোক। মায়াকে বল বিয়ের আয়োজন করতে।

মহারাজ, আমার ইচ্ছা পৃথিবীর মানুষ আমরা, আমাদের বিয়ে হবে পৃথিবীর মুক্ত আলো বাতাসে। আপনি আমাকে পৃথিবীতে নিয়ে চলুন।

আচ্ছা তাই হবে।

আজই, এখনই যাব আপনার সঙ্গে।

বেশ,তাই হোক।

মহারাজের সঙ্গে সিন্ধীরাণী তাদের ডুবন্ত মোটরবোটে চেপে বসল।

মোটর বোটখানা এবার গভীর সাগরতল থেকে সাঁ সাঁ করে উপরের দিকে উঠতে লাগল।

অদ্ভুত মোটরবোটখানা অল্পক্ষণেই সাগরতীরে এসে পৌঁছে গেল। সিন্ধীরাণী ও মহারাজ উঠে দাঁড়াল।

সিন্ধীরাণী বলল– আমাকে আগে নামিয়ে দিন মহারাজ!

মহারাজের হাত ধরে সিন্ধীরাণী সাগরতীরে নেমে দাঁড়াল। এবার মহারাজ যেমনি মোটরবোট থেকে নামতে যাবে, অমনি পিছন থেকে ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় ভীষণভাবে বনহুর আক্রমণ করল মহারাজকে।

মহারাজ হঠাৎ আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। আচমকা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে মোটরবোটের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে টাল সামলিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর সেও পাল্টা আক্রমণ করল বনহুরকে।

ভীষণ ধস্তাধস্তি শুরু হলো। মহারাজের মুখ থেকে নকল দাড়ি গোঁপ খসে পড়ল। সিন্ধীরাণীর কণ্ঠ শুকিয়ে গেল। এ যে সেই যুবক, মহারাজের ছদ্মবেশে..

বনহুর দাঁতে দাঁত পিষে বলল– সকলের চোখে ধুলো দিয়ে মহারাজ সেজে লোকের সর্বনাশ করতে পার, কিন্তু আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না শয়তান। বনহুর বজ্রমুষ্টিতে মহারাজের কণ্ঠ চেপে ধরলো।

মহারাজের দু'চোখ বেরিয়ে এলো প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে বনহুরের বলিষ্ঠ মুষ্টি থেকে মুক্ত করে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো।

বনহুর বলে উঠলো–তোমাকে আমি এত সহজে হত্যা করবো না। সিন্ধীরাজের রাজভাণ্ডারের ধন-রত্ন তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ জানতে চাই।

মহারাজ বেশি শয়তান বলে উঠলো– দস্যু, তুমি তাহলে সব জেনে নিয়েছ। কট কট করে তাকালো সে সাগরতীরে দণ্ডায়মান সিন্ধীরাণীর দিকে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে সে, সিন্ধীরাণীর চক্রান্তেই আজ সে এ ভাবে বিপদগ্রস্ত হয়েছে। হঠাৎ

মহারাজ তার কোমরের বেল্ট থেকে সূতীক্ষ্ম ধার ছোরাখানা বনহুরের অলক্ষ্যে অতি দ্রুতহস্তে সিন্ধীরাণীর বুক লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলো।

এত দ্রুত সে এ কাজ করলো যেন বনহুর বুঝতেই পারেনি।

সিন্ধীরাণীর বুকে খচ করে বিদ্ধ হলো মহারাজের নিক্ষিপ্ত সূতীক্ষ্মধার ছোরাখানা।

আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো সিন্ধীরাণী।

বনহুর সিন্ধীরাণীর দিকে ফিরে তাকাতেই–এ দৃশ্য লক্ষ্য করে ধৈর্যহারা হয়ে পড়লো। ভুলে গেল সব কথা, মহারাজকে ছেড়ে দিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে মোটরবোট থেকে নেমে গিয়ে সিন্ধীরাণীর ভূলুণ্ঠিত মাথাটা তুলে নিল কোলে, একটানে ছোরাখানা খুলে ফেলল সিন্ধীরাণীর বুক থেকে।

ওদিকে শয়তান মহারাজ তার মোটরবোটখানা নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে।

সিন্ধীরাণীর বুক থেকে তখন ফিনকি দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

বনহুর তাকিয়ে দেখল সাগরতীর শূন্য, মহারাজ মোটরববাটসহ উধাও।

সিন্ধীরাণীর করুণ মর্মস্পর্শী অবস্থা বনহুরের কঠিন হৃদয়েও আঘাত করল। দু'চোখ ছাপিয়ে পানি ঝরে পড়তে লাগল বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকল– সিন্ধীরাণী একি হলো।

সিন্ধীরাণী ব্যথারুণ জড়িত কণ্ঠে বলল কেঁদো না দস্যুসম্রাট। মরেও আমি শান্তি পাবো যে, তোমাকে আমি সাগরতল থেকে মুক্ত করে আনতে পেরেছি, এটাই আমার আনন্দ।

কিন্তু তোমার আমি কিছুই করতে পারলাম না সিন্ধীরাণী। কত আশা ছিল তোমার পিতার শূন্য আসনে তোমাকে প্রতিষ্ঠা করবো। সিন্ধীরাজ্যের রাণী হবে তুমি–কিন্তু সব আশা আমার ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল। কিছুই তোমাকে দিতে পারলাম না–

না–তুমি আমাকে যা– দিয়েছ তাই আমার পক্ষে–যথেষ্ট দস্যুসম্রাট–আর আমার কোন। সাধ নেই–ই–

বনহুরের কোলে সিন্ধীরাণীর মাথাটা ঢলে পড়লো।

বনহুরের গণ্ড বেয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু নীরবে ঝরে পড়লো সিন্ধীরাণীর মৃত্যুবিবর্ণ মুখের ওপর।

সিন্ধীরাণীর মৃতদেহ দু'হাতের ওপর তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো বনহুর। এগিয়ে চললো সাগরের দিকে।

উচ্ছল জলরাশি কলকল করে এগিয়ে আসছে।

বনহুর সিন্ধীরাণীর মৃতদেহটা নিয়ে আলগোছে রেখে দিল সাগরের জলে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ সিন্ধীরাণীর সুকোমল ফুলের মত সুন্দর দেহটা নিমিষে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল, বনহুর অনেক চেষ্টাতেও আর দেখতে পেল না।

.

মনিরা বন্দিনী অবস্থায় এক অন্ধকার কারাকক্ষে দিন কাটাতে লাগল। স্বাস্থ্য তার ভেঙে গেছে। কিছুই ভাল লাগে না। কোন সাধ আহ্লাদ আর তার জীবনে নেই। এই বয়সে যেন তার সবকিছু নিঃশেষ হয়ে গেছে। সেদিন আত্মহত্যা না করে ভুলই করেছিল মনিরা। ভাবে সে, এ বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু তার অনেক ভাল ছিল। যে মেয়ের জীবন অভিশপ্ত তার আবার আশা ভরসা!

যতই নিজের জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করে মনিরা, ততই অদৃষ্টের প্রতি আসে তার বিতৃষ্ণা, ঘৃণা, অবহেলা। কতই বা বয়স হয়েছে তার। জন্মাবার পরই তার স্নেহময় পিতা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। তারপর ছোটবেলায় মায়ের ইচ্ছায় তাদের বিয়ের কথা পাকা হল। বিয়ের বয়স না হতেই তার বালক ভাবী স্বামী হারিয়ে গেল কোন অজানায়। তারপর বিদায় নিলেন স্নেহময়ী মা। মামা-মামী ভালবাসতেন তাদের সেবাই ছিল তার একমাত্র সম্বল, এ সুখও তার সইলো না। পিতা সমতুল্য মামাও তাকে ফেলে চলে গেলেন। চিরবিদায় নিয়ে, এত ব্যথা বেদনা সব মনিরা ভুলে গেল তার হারিয়ে যাওয়া রত্নকে খুঁজে পেয়ে। সব দুঃখ তার লাঘব হলো স্বামীর বুকে মাথা রেখে। কিন্তু সে সুখও তার অদৃষ্টে সইলো না।

মনিরার চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়, অসহ্য একটা ব্যথা তার সমস্ত দেহটাকে কুঁকড়ে আনে। একি হলো– বেদনা শুরু হলো তার পেটে। অতি কষ্টে সহ্য করে রইল, কিন্তু ক্রমেই বেদনা যেন বেড়ে যাচ্ছে। অসহ্য হয়ে মনিরা উঠে দাঁড়াল পায়চারী শুরু করলো। বারবার খোদাকে ডাকতে লাগলো আমাকে মুক্তি দাও খোদা। এই অসহ্য বেদনা থেকে মুক্তি দাও খোদা! ..

ক্রমে ব্যথা বেড়ে চললো। মনিরা মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে শুরু করলো। আজ মনিরার মনে পড়ছে কেন সেদিন বৃদ্ধাকে বিশ্বাস করে বাড়ির বাইরে পা দিয়েছিল? কেন সে এমন ভুল করেছিল? বৃদ্ধা কি তাকে যাদু করেছিল? তাই হবে, না হলে সে কাউকে কিছু না বলে একজন। অপরিচিতার সঙ্গে চলে এলো কি করে! সবাই ঐ শয়তান বৃদ্ধটার চক্রান্ত। কিন্তু কে ঐ বৃদ্ধ যার কণ্ঠস্বর পরিচিত বলে মনে হয়, কিন্তু কোথায় শুনেছিল ঐ কণ্ঠস্বর তা স্মরণ করতে পারছে না মনিরা।

শয়তান তাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে কিছুতেই রেহাই দিত না। তার সর্বনাশ করত, কিন্তু তাকে রক্ষা করেছে তার স্বামীর দেয়া উপহার–তার গর্ভের সন্তান।

শয়তান তাকে সময় দিয়েছে যতদিন না তার সন্তান জন্মলাভ করে ততদিন সে রেহাই পাবে। কিন্তু তার সন্তান জন্মাবার পর কে রক্ষা করবে! কে তাকে শয়তানের কবল থেকে বাঁচিয়ে নেবে?

মনিরা ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল।

এমন সময় সেই বৃদ্ধা কক্ষে প্রবেশ করল, আসলে সে বৃদ্ধা নয়, বয়স্কা এক মহিলা। একটু হেসে বলল– কি হলো, ব্যথা শুরু হয়েছে?

মনিরা তীব্র চিৎকার করে উঠল– বেরিয়ে যাও শয়তানী, বেরিয়ে যাও এখান থেকে

মনিরার কথায় দুষ্টামির হাসি হাসলো বৃদ্ধা–বেশ যাচ্ছি, থাক তুমি একা। দরজার দিকে পা বাড়ালো বৃদ্ধা।

মনিরা এতক্ষণে নিরুপায়, বৃদ্ধা যতই শয়তানি করুক, কিন্তু এই মুহূর্তে মনিরা তাকে যেতে দিতে পারলো না। করুণ কণ্ঠে বলল– যেও না, তুমি যেও না–

বৃদ্ধা মেয়েলোকটি এগিয়ে এলো কি, দরকার পড়বে আমাকে? তোমার পায়ে পড়ি তুমি আমাকে একা ফেলে যেওনা।

.

অন্ধকার কারাকক্ষে ফুলের মত সুন্দর ফুটফুটে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করলো। মনিরার পুত্রসন্তান জন্মেছে।

মনিরা তাকিয়ে দেখলো, ঠিক সেই নাক, সেই মুখ, সেই উজ্জ্বল নীল দুটি চোখ। সব তার মনিরের মত।

মনিরা বুকে তুলে নিল, তার হারিয়ে যাওয়া রত্ন আবার যেন ফিরে পেল সে।

অন্ধকার কারাকক্ষে মনিরা আকাশের চাঁদ পেল হাতে, ভুলে গেল সে যত ব্যথা বেদনা দুঃখ।

বেশ কিছুদিন কেটে গেল। মনিরা তার নবজাত শিশুকে নিয়ে বেশ আনন্দেই দিন কাটাতে লাগল হঠাৎ মনে পড়ল সে শয়তানের কথা, বলেছিল সে যতদিন না তোমার শিশু জন্মগ্রহণ করে ততদিন আমি তোমাকে রেহাই দিলাম কিন্তু তারপর আমার হাত থেকে তোমার উদ্ধার নেই। শিউরে উঠলো মনিরা, দু'হাতে বুকের মধ্যে শিশুকে চেপে ধরল।

কিন্তু অনেকগুলো দিন পেরিয়ে চলল শয়তানের সাক্ষাৎ নেই। মনিরা আতঙ্কভরা মন নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল কখন কোন দণ্ডে সে এসে পড়বে কে জানে!

মনিরা শিশুর নাম রাখলো নূর। তার অন্ধকারময় জীবনে আলোর বন্যা এনেছে এ শিশু। খোদার দান, তাই ওর নাম খোদার নূর হিসেবেই রাখলো সে নূর।

অন্ধকার কারাকক্ষেই নূর শশীকলার মত বেড়ে চলল।

যদিও মনিরা বন্দিনী কিন্তু তার যেন কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। কাজেই মনিরার কোন অসুবিধা হল না।

একদিন মনিরা মরার জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। আজ মনিরা বাঁচতে চায়। মরলে তার চলবে না–নূরকে তার বড় করতে হবে, মানুষ করতে হবে। নূর তার মনিরের স্মৃতিচিহ্ন।

.

বনহুরের অসাধ্য কিছুই নেই।

সিন্ধি পর্বত অতিক্রম করে একদিন বনহুর ঝিন্দ শহরে এসে পৌঁছল। শরীরের বসন ছিন্ন ভিন্ন মলিন। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো চুল, তেলবিহীন রুক্ষ।

ঝিন্দ শহরে পৌঁছে বনহুরের মনে একটা আনন্দের উৎস বয়ে গেল। নিশ্চয়ই তার মনিরা এখন সেই বাড়িতেই রয়েছে। তার অনুচরবর্গ, তার বিশ্বস্ত অনুচর কায়েস সবাই রয়েছে। হঠাৎ তার আগমনে ওরা আশ্চর্য হয়ে যাবে। না জানি মনিরা কেঁদে কেঁদে কেমন জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়েছে। হঠাৎ এভাবে দেখলে তাকে কেউ চিনতে পারবে না।

মনিরার সঙ্গে মিলন আশায় বনহুর চঞ্চল হয়ে উঠল। ক্ষুধা পিপাসায় অত্যন্ত কাতর ছিল সে, তবু ভুলে গেল সবকিছু। আত্মহারা হয়ে ছুটে চলল। কতদিন পর দেখা হবে তার মনিরার সঙ্গে।

কিন্তু নিজের পরিধেয় বস্ত্রের এবং ক্ষুধাকাতর চেহারার দিকে তাকিয়ে ক্ষান্ত হল। হাজার হলেও সেখানে তার অনুচরবর্গ রয়েছে, দাস-দাসী রয়েছে, এ বেশে যাওয়া তার উচিত হবে না।

পকেটে হাত দিল বনহুর, একটি পয়সাও নেই সেখানে। যে লাখ লাখ টাকার মালিক, যার ভাণ্ডারে ধনরত্নের সীমা নেই, সেই দস্যু বনহুর আজ কপর্দকশূন্য রিক্ত।

হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে গেল নিজের আংগুলে। মনিরার দেয়া সেই হীরার আংটি তার আংগুলে চক্ চক্ করছে। কিন্তু এ আংটি হারানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। এ কাজ সে করতে পারে না। তবু একটা উপায় তাকে করতে হবে, এ বেশে কিছুতেই বাড়িতে যাওয়া চলবে না। সে দস্যু সর্দার– তার এ অবস্থা অনুচরদের মনে দারুণ ব্যথা জাগাবে। মনিরাও দুঃখ পাবে অনেক।

বনহুর দস্যু, পয়সা জোগাড় করে নিতে তার কষ্ট হবে না। একটা হোটেলের সম্মুখে এসে দাঁড়াল সে।

এমন সময় একটা গাড়ি এসে থামলো হোটেলের সম্মুখস্থ রাস্তায়। বনহুর একটু সরে দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে নেমে এলো একটা যুবক, ক্যাপ দিয়ে লোকটার মুখের অর্ধেক ঢাকা। যুবকের পেছনে নেমে এলো একটি যুবতী, কোলে তার একটি শিশুসন্তান।

বনহুর চমকে উঠলো, এ যে মনিরা!-না, না, তার চোখে ভ্রম হতে পারে! মনিরার কোলে সন্তান এলো কোথা হতে? ঐ যুবকটাই বা কে? পরক্ষণেই বনহুরের চোখ দুটো ধক ধক করে জ্বলে উঠলো। এ যে তারই মনিরা–ততক্ষণে যুবকটির সঙ্গে মনিরা হোটেলে প্রবেশ করেছে।

তবে কি বহু দিনের ব্যবধানে তার দৃষ্টির বিভ্রান্তি ঘটেছে? না, না, এ মনিরা নয়, অন্য কোন যুবতী হবে। তার মনিরার কোলে সন্তান আসবে কোথা থেকে।

বনহুর কালবিলম্ব না করে সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য একটা গাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। দেখতে পায় ড্রাইভার তার মালিকের ফিরে আসার প্রতিক্ষায় গাড়িতে বসে ঝিমুচ্ছে। বনহুর আচম্বিতে এক ঘুষি বসিয়ে দেয় তার নাকে, তারপর সে চিৎকার করার পূর্বেই তাকে গাড়ি থেকে টেনে পথে ফেলে দিয়ে ড্রাইভ আসনে চেপে বসে। এবার তাকে কে পায়।

ড্রাইভারের আর্তনাদে সঙ্গে সঙ্গে স্থানটি সরগরম হয়ে উঠল। কিন্তু যখন সেখানে লোকজন। জমা হল তখন গাড়ি নিয়ে বনহুর উধাও হয়েছে।

বনহুর যখন তার বড় সখের বাড়িখানায় গিয়ে হাজির হলো তখন রাত অনেক হয়ে এসেছে। গাড়ি রেখে দ্রুত এগিয়ে গেল সদর গেটের দিকে। অমনি একজন বন্দুকধারী পাহারাদার গর্জে উঠল– তুম কোন্ হ্যায়? বনহুর প্রচণ্ড এক ঘুষিতে ওকে ধরাশায়ী করে বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে তারপর প্রবেশ করলো অন্তঃপুরে। জোরে জোরে ডাকলো—মনিরা–মনিরা– মনিরা।

বনহুরের বজ্রকঠিন কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো বনহুরের অনুচরগণ। এ স্বর যে তাদের অতি পরিচিত। যে সেখানে বসেছিল বা ঘুমাচ্ছিল সবাই উঠিপড়ি করে ছুটে এলো। কিন্তু সবাই এসে। থমকে দাঁড়ালো, বনহুরকে চিনতে না পেরে সবাই

মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল দু'একজন ভয়ে কাঁপতে লাগল তাদের সর্দার তো মরে গেছে, এ কি তবে তাদের সর্দারের প্রেতাত্মা।

সবাই যখন মুখ চাওয়া চাওয়ি শুরু করেছে তখন বনহুর গর্জে বলল, বদমাইশদের উপযুক্ত শাস্তির দরকার।

এবার অনুচরগণ থর থর করে কেঁপে উঠল, এ যে তাদের মালিক স্বয়ং। একজন বলল– সর্দার আপনি!

বনহুর হুঙ্কার ছাড়লো– মনিরা কই? চৌধুরীকন্যা মনিরা?

আবার সকলের মুখ চুর্ন হয়ে গেল। সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল।

বনহুর গর্জে ওঠল কোথায় সে?

সবাই কাঁপছে।

একজন জবাব দিল–বৌরাণী কোথায় চলে গেছেন আমরা জানি না।

চলে গেছে! অস্ফুট কন্ঠে বলে উঠল বনহুর।

হ্যাঁ সর্দার, বৌরাণী কাউকে কিছু না বলে কোথায় চলে গেছেন আমরা কেউ জানি না।

বনহুরের মাথায় এক্ষণে আকাশ ভেঙে পড়লেও সে এতখানি মুষড়ে পড়ল না। কে যেন একটা হাতুড়ি দিয়ে তার হৃৎপিণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত করে চলেছে। আর কোন প্রশ্ন করার সাহস হল।

বনহুরের। সে তো কিছু পূর্বে নিজের চোখে দেখে এসেছে, মনিরা অন্য একটা যুবকের সঙ্গে সন্তান কোলে না না, সেকি পাগল হয়ে যাবে। পৃথিবীটা এমন টলছে কেন? দু'হাতে মাথার চুল টেনে ধরে পাশের সোফায় এসে বসল বনহুর।

রাগে-ক্ষোভে অধর দংশন করতে লাগল সে। মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে লাগল। দুনিয়ার যত ঝড়ঝঞ্ঝা বনহুর মাথা পেতে গ্রহণ করতে পারে কিন্তু মনিরার এ অবস্থা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না।

তাদের সর্দারের অবস্থা দেখে অনুচরগণের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

বনহুর ভাবলো কেন সে ফিরে এলো, না আসাই ছিলা তার ভাল। হঠাৎ কায়েসের কথা স্মরণ হল, বলল সে কায়েস বেঁচে আছে? তাকে তো দেখছি না।

একজন অনুচর বলল–হ্যাঁ সর্দার, বেঁচে ছিল—

এখন সে মরে গেছে?

না সর্দার, সেও বৌরাণীকে খুঁজতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি।

কায়েস নেই?

না সর্দার।

রহমান?

সে তো এখানে নেই।

কেন, সে এখানে আসেনি?

এসেছিল সর্দার, আপনার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে এসেছিল। অনেক সন্ধান করেছে আপনার, কোথাও আপনাকে খুঁজে পায়নি। বৌরাণীকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু কেন যেন নিয়ে যায়নি। শুনেছিলাম বৌরাণীর জন্য সেখানে তার বড় চাচা পুলিশকে…

যাক বুঝেছি।

সর্দার, আমরাও বৌরাণীকে অনেক খুঁজেছি কিন্তু—

পাওনি, না?

হ্যাঁ সর্দার।

নরাধম তোমরা!

সর্দার।

তোমাদের বৌরাণী কতদিন আগে চলে গেছে?

আপনার মৃত্যুর কিছুদিন পরই—

আমার মৃত্যু হয়েছে।

আমরা সে রকম অনুমান করে—

দিব্যি আরামে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছিলে তাই না?

এক রকম তাই সর্দার। কোন কাজ কর্ম ছিল না, তাই–

এখনও তাই ঘুমাও। উঠে দাঁড়াল বনহুর। তারপর দ্রুতগতিতে বেরিয়ে এলো অন্তঃপুর থেকে।

অনুচরগণ বহুদিন পরে সর্দারকে পেয়ে খুশিতে উফুল্ল হয়ে উঠেছিল বনহুর বেরিয়ে যেতেই সবাই এক সঙ্গে বলে উঠে– সর্দার। আবার চলে গেলেন, সর্দার–।

বনহুর সোজা চলল সেই হোটেলের দিকে। যতক্ষণ মনিরা ও সেই বদমাইশটাকে উপযুক্ত সাজা দিতে না পারে ততক্ষণ তার মনে শান্তি নেই। অবিশ্বাসিনী মনিরাকে নিজ হাতে গলা টিপে মারবে!

কিন্তু মনিরার কি দোষ? বনহুর মরে গেছে তাই সে চলে গেছে। কার জন্য সে অপেক্ষা করবে, কার প্রতিক্ষায় দিন কাটাবে। বনহুর তো মরে গেছে–

বনহুর অনেক চেষ্টায় ঐ হোটেলে একটা চাকরি নিল। সারাদিন রাতের অর্ধেক পর্যন্ত তাকে কাজ করতে হয়, কোন সময় বিশ্রাম নেই। কাজ করে যায় আর প্রতিক্ষা করে মনিরার ও সেই যুবকটির। কে সেই যুবক, মনিরার সাথে কি তার সম্বন্ধ, জানতে চায় সে।

হোটেলে দুদিন কাটানোর পরই টের পেল বনহুর, এই হোটেলের কোন এক গোপন কক্ষে বাস করে তারা। সঙ্গে তাদের একটা চাকরও রয়েছে। বনহুর সেই চাকরের সঙ্গে ভাব করে নিল। সেদিন চাকরটা খাবার নিয়ে যাচ্ছিল, তাকে কিছু

টাকা বকশিস দেবার লোভ দেখিয়ে বনহুর বলল খাবারের ট্রে আমার হাতে দাও। আমি যাই, তুমি আমার কাজটা করে নিও। তোমাকে দশ টাকা বকশিস দেব।

দশ টাকা কম কথা নয়, শিখ চাকরটা বনহুরের হাতে খাবারের ট্রে দিয়ে হোটেলের কাজে চলে গেল।

বনহুর নিজেকে একেবারে তাদের শিখ চাকরটার মত করে সাজিয়ে নিল। দেখলে যেন তাকে চিনতে না পারে, বা কোন রকম সন্দেহ না করে। ছদ্মবেশের নিপুণ অভিজ্ঞতা ছিল বনহুরের কাজেই কোন অসুবিধা হল না।

এবার খাবারের প্লেটসহ ট্রে হস্তে সেই গোপন কক্ষে প্রবেশ করল। শিখ চাকরের বেশে বনহুর। কক্ষে প্রবেশ করেই থমকে দাঁড়ালো মনিরার মুখে দৃষ্টি পড়তেই কঠিন হয়ে উঠল তার মুখমণ্ডল। দাঁত অধর চেপে ধরে ট্রে হাতে এগুলো।

মনিরার পাশের লোকটার মুখে নজর পড়তেই হিংস্র বাঘের চোখের মত জ্বলে উঠল ওর চোখ দুটো– এ সেই শয়তান!

লোকটি বলল– এসো, অমন হা করে কি দেখছ। আজ কি খাবার এনেছ দেখি?

শিখ চাকরবেশী বনহুর, মনিরা ও লোকটার সম্মুখস্থ টেবিলে খাবারের ট্রে রাখল। সে দেখতে পেল অদূরে একটি শয্যায় শায়িত সুন্দর ফুটফুটে একটি শিশু অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ওর মনের ভেতরে একটা গুমোট আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে নিয়ে ট্রে থেকে খাবারের প্লেটগুলো মনিরা আর লোকটার সম্মুখে সাজিয়ে রাখতে লাগল।

লোকটা এবং মনিরা কেউ তেমনভাবে লক্ষ্য করলে বনহুরের আসল রূপ ধরা পড়ে যেত। কারণ বনহুরের মুখোভাব স্বাভাবিক ছিল না।

একটু পূর্বেই মনিরা আর শয়তান লোকটার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। মনিরা নিজে পরিত্রাণ আশায় এবং তার নূরের রক্ষার্থে নানারকম কৌশল অবলম্বন করে চলেছে। জানে মনিরা, শয়তানের কবল থেকে তার রক্ষা নেই। যতই ওর সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করতে যাবে ততই অমঙ্গলের আশঙ্কা বেশি। এমনকি তার নূরের জীবন পর্যন্ত যেতে পারে। সে কারণেই মনিরা শয়তানের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার দেখিয়ে নিজেকে রক্ষা করে চলেছে, মনিরা কথা দিয়েছে নূর একটু

বড় হলেই দেশে তার মামীর কাছে পাঠিয়ে দেবে এবং নিজে তাকে বিয়ে করবে। এর পূর্বে সে যেন তার উপর কোনরূপ অত্যাচার না করে, এই তার অনুরোধ।

শয়তান মনিরার কথামতই এতদিন প্রতীক্ষা করে এসেছে। এখন সে কিছুতেই মনিরার কথা মানতে রাজি নয়। এ হোটেলেই তাদের বিয়ে হবে, এ জন্য এখানে তাদের আসা।

কিন্তু মনিরা আরও ক'দিন সময় চেয়ে নিয়েছে।

নূর এখনও কচি, আর একটু বড় হোক।

এ নিয়েই শয়তান মনিরার কক্ষে রোজ একবার করে হানা দেয়। এখানে বসেই রাতে খাবার। খায় সে।

মনিরা কি করবে, সেও খায়। কিন্তু দিন দিন সে ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়ছে ভাবছে আর বুঝি নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না সে। সর্বদা খোদাকে স্মরণ করে সে। নানাভাবে নিজেকে শয়তানের হাত থেকে এতদিন বাঁচিয়ে চলেছে, এবার সব হারাবে।

আজ সে বলছে–তার কথায় যদি মনিরা রাজি না হয়, তবে নূরকে সে হত্যা করবে। তার চোখের সম্মুখে হত্যা করবে নূরকে।

মনিরা কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। আকুল মনে খোদাকে ডাকছে– হে খোদা! আমি যদি সতী নারী হই তবে তুমি আমার ইজ্জত রক্ষা কর। আমার নূরকে রক্ষা কর।

মনিরার মনে একটা অভূতপূর্ব সাহস এসেছে, নিশ্চয়ই সে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাবে। একটা ছুরি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। লুকিয়ে রেখেছে কাপড়ের মধ্যে হয় নিজের। জীবন দেবে, না হয় শয়তানের জীবন শেষ করবে সে আজ।

তাই মনিরা হাসিমুখে শয়তানের সঙ্গে খাবার টেবিলে এসে বসেছে।

মনিরার সম্মুখে খাবার এগিয়ে দিচ্ছিল শিখ চাকরবেশী বনহুর। হঠাৎ মনিরার দৃষ্টি তার আংগুলে গিয়ে পড়লো।

ভীষণ চমকে উঠলো মনিরা। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি চলে গেল শিখ চাকরের মুখের দিকে। এ যে সেই চোখ, যে চোখের চাহনি আজও তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মনিরা নিজেকে কিছুতেই সংযত রাখতে পারল না, অস্ফুট আনন্দধ্বনি করে উঠলো–তুমি বেঁচে আছ!

শয়তান কেবলমাত্র মুখে খাবার দিতে যাচ্ছিল হাতখানা মাঝপথে থেমে যায়, ফিরে তাকাতেই বনহুর গর্জন করে আক্রমণ করে ওকে–শয়তান মুরাদ তুমি!

মুরাদ আরষ্ট শব্দ করে উঠলো–দস্যু বনহুর!

বনহুর প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে দেয় ওর নাকে। ছিটকে পড়ে যায় মুরাদ।

মনিরা ছুটে গিয়ে নূরকে বুকে তুলে নিল।

বনহুর দাঁতে দাঁত পিষে বলল–শয়তান, আজ কোথায় পালাবে?

মুরাদ নিরস্ত্র, মুখমণ্ডল ভয়ে বিবর্ণ হয়ে এসেছে, চোখে সে সর্ষে ফুল দেখছে। বনহুর সূতীক্ষ্ণধার ছোরা বের করে ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় এগুলো।

মুরাদও কম ধূর্ত নয়, একটা চেয়ার তুলে নিয়ে মারলো বনহুরকে লক্ষ্য করে।

বনহুর বাঁ হাতে চেয়ারখানা ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে, তারপর কঠিন কণ্ঠে বলল–আজ তোমার পরিত্রাণ নেই। সিন্ধরাণীকে হত্যার প্রায়শ্চিত্ত কর– কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের হাতের ছোরা অমূল বিদ্ধ হলো মুরাদের বুকে।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো মুরাদ।

বিষধর সর্প যেমন মরার পূর্বে একবার তার সতেজ ফণাটা বিস্তার করে খাড়া হবার চেষ্টা করে তেমনি মুরাদ মুখ থুবড়ে পড়েও আবার একটু উঠে বসতে যায়। বনহুরকে লক্ষ্য করে বলে– শুধু সিন্ধীরাণীকেই হত্যা করিনি। তোমার প্রিয়তমা-মনিরারও সর্বনাশ করেছি –ঐ যে–ওর কোলেযে সন্তান দেখছ–সে আমার সন্তা-ন-কথা শেষ হয় না, পুনরায় মুখ থুবড়ে পড়ে। যায়।

মুহূর্তে মনিরার মুখমণ্ডল কাল হয়ে ওঠে।

বনহুর আগুনঝরা দৃষ্টি নিয়ে তাকায় মনিরার মুখের দিকে–অবিশ্বাসের তীব্র চাহনি তার চোখে।

মনিরা ছুটে আসে–তুমি বিশ্বাস কর, ওর কথা সত্য নয়। তুমি বিশ্বাস কর—

বনহুর ছুটে যায় দরজার দিকে।

মনিরা দৌড়ে এসে, এক হাতে নূরকে বুকে চেপে আরেক হাতে স্বামীর পা দুখানা আঁকড়ে ধরে–ওগো তুমি শোনো। শোনো–

বনহুর পদাঘাতে মনিরাকে ফেলে দিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে নূর কেঁদে ওঠে।

মনিরা ওকে বুকে চেপে ধরে উঠে দাঁড়ায়।

কক্ষে তখন অসংখ্য লোক ভরে গেছে।

০০৯. সর্বহারা মনিরা

সর্বহারা মনিরা – ৯

০১.

সর্দার, একি হল আপনার? সারা দিনরাত ধ্যানগ্রস্তের মত এমনি করে বসে বসেই কাটাবেন? এখন রাত দ্বিপ্রহর। চলুন, শোবেন চলুন। রহমান বিনীত কণ্ঠে দস্যু বনহুরকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলল।

বনহুর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল রহমান, এই গভীর রাতে গহন বনে করুণ সুরে কে কাঁদে?

সর্দার, আপনি ফিরে আসার পর কারও সঙ্গে কোন কথা বলেননি, কারও কথা জিজ্ঞাসাও করেননি। আপনার মৃত্যু সংবাদ শোনার পর নূরী পাগল হয়ে গেছে।

বনহুর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে অস্ফুট শব্দ করে উঠল–নূরী পাগল হয়ে গেছে! কই, একথা তো তুমি আমাকে বলনি!

আপনি তো কিছুই জানতে চাননি?

নূরী আমার মৃত্যু সংবাদে পাগল হয়ে গেছে! আর তাকে তোমরা এভাবে ছেড়ে দিয়ে রেখেছ।

সর্দার, তাকে আমরা অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে পারিনি। রাতের পর রাত, দিনের পর দিন সে এমনি করে বনে বনে কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়ায়। সর্দার আশ্চর্য কোন হিংস্র জন্তু তাকে আজও খায়নি। কত বর্ষার পানি,

কত রৌদ্রদগ্ধ দ্বিপ্রহর কেটে গেছে তার মাথার ওপর দিয়ে, তবু সে ফিরে আসেনি!

বলো কি রহমান!

হ্যাঁ সর্দার।

উঠে দাঁড়াল বনহুর–চলল, ওকে ফিরিয়ে আনি রহমান।

চলুন সর্দার।

বনহুর আর রহমান আস্তানা ছেড়ে বনে প্রবেশ করল রহমানের হাতে জ্বলন্ত মশালের উজ্জ্বল আলোতে চারদিকে লক্ষ্য রেখে এগুতে লাগল ওরা দুজন।

কিছু পূর্বে দস্যু বনহুরের কানে করুন একটা কান্নার সুর ভেসে এসেছিল। কোনদিক থেকে শব্দটা এসেছিল ঠিক বুঝতে পারেনি বনহুর, তাই এদিক সেদিক খুঁজতে লাগল রহমান আর সে।

গোটা বনে খোঁজাখুঁজি করে কোথাও নূরীর সন্ধান না পেয়ে বিমর্ষ মনে এগুলো বনহুর ও রহমান। হঠাৎ মশালের আলোতে ঝর্ণার দিকে দৃষ্টি চলে যায় ওদের।

থমকে দাঁড়িয়ে বলে উঠল রহমান সরদার, ঐ যে নূরী!

বনহুর কোন কথা না বলে স্থিরচোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। অদ্ভুত এ দৃশ্য! ঝর্ণার দিকে মুখ করে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত বসে আছে নূরী।

বনহুর পা বাড়াল নূরীর দিকে।

রহমান মশাল হাতে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুর ততক্ষণে নূরীর পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

একটা পাথরখণ্ডে বসেছিল নূরী, বনহুর ওর পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত রাখল।

ধীরে ধীরে ফিরে তাকাল নূরী।

রহমানের হাতের মশালের আলোতে বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল বনহুর নূরীর একি চেহারা হয়েছে! রুক্ষ্ম এলায়িত চুল, কোটরাগত চোখ, শুষ্ক গণ্ডদ্বয়। বনহুর আর নূরী কিছুক্ষণ উভয়ে তাকিয়ে রইল উভয়ের দিকে। বনহুরের চোখে মুখে রাজ্যের ব্যাকুলতা আর নূরীর দৃষ্টি উদাস, ভাষাহীন।। নূরীর এই চেহারা বনহুরের মনে দারুণ আঘাত করল, কিছুক্ষণ কোন কথা তার মুখ দিয়ে বের হল না। চোখ দুটো শুধু অশ্রু ছলছল হয়ে উঠলো। এবার বনহুর অস্ফুট কণ্ঠে ডাকল-নূরী!

নূরী নিশ্চল স্তব্ধ নয়নে তাকিয়ে ছিল, সে বনহুরকে চিনতেই পারেনি। রহমানের মশালের আলোতে তাকিয়ে দেখছিল; বনহুরের ডাকে চমক ভাঙে, ঠোঁট দু'খানা কেঁপে ওঠে একটু বলতে পারে না কিছু।

বনহুর পুনরায় বলে উঠল-নূরী আমায় তুমি চিনতে পারছনা?

এতক্ষণে নূরী কথা বলে–কে তুমি?

নূরীর কণ্ঠ স্বরে খুশি হয় বনহুর, বলে–আমি তোমার হুর!

তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল নূরী–না, না, না, সে বেঁচে নেই, সে বেঁচে নেই। বেঁচে নেই–দু'হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল নূরী।

রহমান বলল–সর্দার, চলে আসুন। আজ হঠাৎ ও আপনাকে চিনতে পারবে না। আসুন সর্দার।

বনহুর কিছুক্ষণ নূরীর দিকে তাকিয়ে থেকে ফিরে দাঁড়াল–চলো রহমান।

আস্তানায় ফিরে এসে বনহুর অন্তরে অসহ্য ব্যথা অনুভব করতে লাগল কিছুতেই সে স্বস্তি পেল না।

গোটা রাত পায়চারী করেই কাটিয়ে দিল বনহুর।

ভোরের আলোতে পৃথিবী ঝলমল করে উঠল। গাছে গাছে পাখির কলরবে মুখর হল। সোনালী সূর্যের আলো এসে পৌঁছল বনহুরের আস্তানার গোপন কক্ষের চোরা শার্সি দিয়ে।

বনহুর কলিংবেলে হাত রাখতেই দু'জন অনুচর কক্ষে প্রবেশ করে কুর্ণিশ জানাল।

বনহুর বলল–রহমানকে ডাক।

বেরিয়ে গেল অনুচরদ্বয়। একটু পরে কক্ষে প্রবেশ করল রহমান, কুর্ণিশ জানিয়ে নতমস্তকে দাঁড়াল—সর্দার!

বনহুর রহমানের সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

রহমান বনহুরের চোখের দিকে দৃষ্টি তুলে ধরতেই চমকে উঠল, আশ্চর্য হয়ে বলল—সর্দার, সারারাত আপনি ঘুমান নি? চোখ দুটো যে আপনার জবাফুলের মত লাল হয়ে গেছে!

বনহুর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কি যেন চিন্তা করল, তারপর বলল–রহমান, নূরীকে আস্তানায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কর।

রহমান বলে উঠল—সর্দার, অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি।

যাও আবার চেষ্টা কর।

বেশ যাচ্ছি। কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে গেল রহমান।

প্রহর কয়েক পর ফিরে এলো রহমান, মুখমণ্ডল বিষণ্ন, মলিন। শরীরে কয়েক স্থানে রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে।

বনহুর বলল–একি! নূরী এলো না।

না, সর্দার। এই দেখুন–আমি ওকে জোর করে নিয়ে আসার চেষ্টা করলে ও আমাকে ঢিল মেরে আর কামড়ে এই অবস্থা করে দিয়েছে।

বনহুর কিছুক্ষণ স্থিরচোখে রহমানের দিকে তাকিয়ে বলল–আচ্ছা যাও, আমি নিজে ওকে ফিরিয়ে আনছি। বনহুর কথা শেষ করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘন বনের ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে চলল বনহুর। মনে তার নানা চিন্তা। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া যেন তার জীবনটাকে একেবারে ওলট পালট করে দিয়ে

গেছে। কি যেন ছিল, কি যেন নেই, কি যেন হারিয়ে গেছে।

অভিশপ্ত জীবন বনহুরের, তাই তার জীবনে এত দুর্যোগের ঘনঘটা।

কিছুদূর এগুতেই দেখতে পেল অদূরে একটা গাছের তলে বসে কি যেন ভাবছে নূরী। হাতে তার এলোমেলো গাঁথা একটি ফুলের মালা। আর সম্মুখে পড়ে রয়েছে কয়েকটা পাথরের ঢিল।

বনহুর বুঝতে পারল, আবার যদি নূরীকে কেউ বিরক্ত করে তাই সে আগে থেকেই প্রস্তুত রয়েছে।

বনহুর কোন রকম শব্দ না করে ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

নূরী ধ্যানগ্রস্তের মত বসেছিল, সম্ভবতঃ ফুলের মালাটাই বসে বসে গাথছিল সে, অর্ধেকটা গাঁথার পর কি বুঝি ভেবে কিছু ফুল ছিড়ে ছড়িয়ে ফেলেছে আশে পাশে।

বনহুর একটা বড় ধরনের ফুল হাতে তুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল নূরীর সম্মুখে নাও।

নূরী চোখ তুলে তাকালো, কিছুক্ষণ স্থির নয়নে চেয়ে থেকে হঠাৎ একটা ঢিল তুলে ছুড়ে মারলো বনহুরের মাথা লক্ষ্য করে।

বনহুর একটুও সরলো না বা নড়লো না। ঢিলটা বনহুরের মাথায় লেগে কিছুটা কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ল।

বনহুর স্থিরভাবে তবু দাঁড়িয়ে আছে। ফুলটা তখনও বনহুরের হাতের ফাঁকে।

নূরী আর একটা ঢিল তুলে পুনরায় যেমনি বনহুরের মাথা লক্ষ্য করে ছুড়তে যাবে অমনি বনহুর প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিল নূরীর গালে। সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত থেকে ঢিলটা কেড়ে নিয়ে ছুড়ে দিল দূরে।

নূরীকে এভাবে আঘাত করে বনহুর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না, ওকে টেনে নিল কাছে। মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ডাকল–নূরী–নূরী–বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো বনহুরের কণ্ঠ।

বনহুরের প্রচণ্ড চড়ে নূরী হতভম্বের মত চেয়ে রইলো ওর দিকে। উঃ বা আঃ কিছুই বলল না কিংবা কান্নায় ভেঙে পড়ল না।

বনহুর ওকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

নূরী এতক্ষণও হাতের মালাটা মুঠোয় আঁকড়ে ধরেছিল। বনহুর ওর সম্মুখে বসে গলাটা বাড়িয়ে দিল দাও।

নুরী স্থির নয়নে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে, মালাটা দেবে কিনা ভাবছে–কিংবা ভাবছে যে তাকে এমনভাবে আঘাত করতে পারে তাকে আবার মালা দেবে। হঠাৎ নূরী মালাটা পরিয়ে দিল বনহুরের গলায়।

বনহুর ওকে নিবিড় করে টেনে নিল কাছে, ডাকল—নূরী!

নূরী কিন্তু অবাক হয়ে বারবার তাকাচ্ছে বনহুরের মুখের দিকে। হয়তো স্মরণ করতে চেষ্টা করছে কখনও কোথাও একে দেখেছে কিনা। বনহুরের। ললাটে গড়িয়ে পড়া রক্তের দিকে তাকিয়ে নূরী হঠাৎ নিজের চোখ দুটো হাত দিয়ে ঢেকে ফেলল, তারপর আংগুলের ফাঁক দিয়ে বনহুরের কপালের রক্ত লক্ষ্য করে শব্দ করল-ইস।

বনহুর বুঝতে পারলো নূরীর একটু একটু জ্ঞান হচ্ছে। আশায় আনন্দে বনহুরের নিরাশ হৃদয় ভরে উঠলো। নূরীর মঙ্গল চিন্তাই এখন তার একমাত্র কামনা। যা ছিল সব হারিয়ে ফেলেছে সে। সিন্ধী নদীতে তার জীবন সঙ্গিনী মনিরাকে বিসর্জন দিয়েছে। বনহুর এখন সর্বদা মনিরার স্মৃতি এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। যতক্ষণ মনিরাকে ভুলে থাকে ততক্ষণ তার মনে কিছুটা শান্তি থাকে। ওর কথা স্মরণ হতেই বিষিয়ে ওঠে অন্তরটাঅসহ্য ব্যথার কাঁটা খোচা দিয়ে চলে তখন ওর হৃদয়ে। তার মনিরা ব্যাভিচারিণী–অসতী–যখনই এই চিন্তা বনহুরকে অস্থির বিচলিত করে তোলে তখনই সে নিজের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চায়। ভুলে থাকতে চায় পুরোন স্মৃতি।

একদিন অবিরত ভেবেছে বনহুর, শুধু একমাত্র মনিরার কথাই সে ভেবেছে সর্বক্ষণ। ভেবে ভেবে কোন কূল-কিনারা পায়নি—একটা অসহ্য যন্ত্রণা তার সমস্ত অন্তরকে দগ্ধীভূত করে দিয়েছে, তাই বনহুর আজ অন্য চিন্তায় মগ্ন থাকতে চায়–নিজকে ভুলিয়ে রাখতে চায়, এমন সময় নূরীর পুনঃ আবির্ভাব বনহুরের জীবনে

আনে অভাবনীয় একটা পরিবর্তন। দস্যু বনহুর একটা নতুন আলোর সন্ধান লাভ করে তার জীবনে। সত্যি নূরী তাকে কত–ভালবাসে বনহুর নূরীর মুখখানা তুলে ধরে বলে—নূরী, আমি মরিনি; আমি মরিনি। চেয়ে দেখ আমি তোমার হুর।

নূরী এবার গভীর মনোযোগ সহকারে তাকাল কতক্ষণ কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বের হল না। হঠাৎ এবার বলে উঠল–তুমি বেঁচে আছ?

হ্যাঁ হ্যাঁ নূরী আমি–আমি তোমার—বলবল তুমি কে? বল–বল–

নূরী হাঁপাতে শুরু করলো—কিছু বলতে চাইল কিন্তু বলতে পারছে না।

বনহুর আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল, বলল—দেখ, ভাল করে চেয়ে দেখো, বল–বল–একবার নাম ধরে ডাকো নূরী।

এবার নূরী অস্ফুট শব্দ করে উঠল—হু! নূরী! আবেগভরে বনহুর টেনে নিল নূরীকে!

এতক্ষণ নূরী চিনতে পেরেছে বনহুরকে। নূরী বনহুরের বুকে মাথা রেখে বলল তুমি বেঁচে আছ! তুমি মরে যাওনি?

না, না নূরী আমি মরে যাইনি।

কিন্তু ওরা যে বলেছিল–

ওরা জানতো না।

বড় শয়তান ওরা। দেখ হুর আমাকে ওরা—

নূরী ওদের আমি ভীষণ শাস্তি দেব। চল ঘরে চল নূরী–বনহুর নূরীর হাত ধরে নিয়ে চলল।

নূরী ব্যথাকরুণ সুরে বলল–আবার তো চলে যাবে না?

নূরী, আর তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

বনহুরের হাত ধরে নূরী আস্তানায় প্রবেশ করল।

০২.

হতবাক স্তম্ভিত মনিরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে ভূলুণ্ঠিত শয়তান মুরাদের রক্তমাখা দেহখানা। কোলে শিশুপুত্র নূর। তখনও মনিরার দৃষ্টি ওদিকের মুক্ত জানালার দিকে, যে পথে একটু পূর্বে তার চির আকাঙ্ক্ষিত প্রাণাধিক স্বামী দস্যু বনহুর অন্তর্ধান হয়েছে।

মুরাদের আর্তচিঙ্কারে কক্ষটি তখন লোকজনে ভরে উঠেছে। সকলের চোখে মুখেই আতঙ্কের ছাপ। কেউ কেউ চিৎকার করে বলছে খুন, খুন, খুন–

অল্পক্ষণেই পুলিশ এসে হাজির হল সেখানে।

হোটেলের সবাই জানত মনিরা মুরাদের স্ত্রী। ঐ রকমই পরিচয় দিয়েছিল মুরাদ হোটেলের মালিকের কাছে এবং আসল নাম পালটে নিজের নাম শাহ হোসেন এবং মনিরার নাম মর্জিনা হোসেন রেখেছিল।

এক্ষণে শাহ হোসেনের মৃত্যুতে হোটেলের মালিক ভয়ে মুষড়ে পড়ল। তার হোটেলে খুন!–এটা হোটেলের বিরাট একটা বদনাম।

হোটেলের মালিক কম্পিত কণ্ঠে বলল–মিসেস হোসেন, কে আপনার স্বামীকে হত্যা করেছে বলতে পারেন? কে এসেছিল এখানে?

কিন্তু কি আশ্চর্য, শাহ হোসেনের স্ত্রীর চোখে এতটুকু পানি নেই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে ব্যাপার কি, হোটেলের সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

পুলিশ পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করে চলল–আপনার স্বামী কিভাবে নিহত হলেন আমরা জানতে চাই। কে তাঁকে হত্যা করল আপনি নিশ্চয়ই তা জানেন? আপনি যদি আপনার স্বামীর হত্যাকারীকে পাকড়াও করে শাস্তি দিতে চান তবে আমাদের নিকটে কোন কথাই গোপন করবেন না।

এত কথার পরও মনিরা নীরব! একটা কথাও তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে। কিন্তু এভাবে নিশ্চুপ থাকাও তার পক্ষে সম্ভব নয়, পুলিশ তাকে অন্যভাবে সন্দেহ করতে পারে। তাই বলল মনিরা–কে ওকে হত্যা করেছে আমি জানি না।

পুলিশ ইন্সপেক্টার রাগত কণ্ঠে বলেন–আপনার সামনে আপনার স্বামীকে হত্যা করা হল অথচ আপনি জানেন না? এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না।

মনিরা আবার বলল–ওকে যে হত্যা করেছে তাকে আমি দেখেছি কিন্তু চিনি না।

সেদিন এর বেশি কিছু প্রশ্ন না করে লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ ইন্সপেক্টার বিদায় গ্রহণ করলেন।

হোটেলের মালিক নিজে মনিরার দায়িত্বভার গ্রহণ করল।

পরদিন পুনরায় পুলিশ এলো, মনিরাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললেন–আচ্ছা লোকটাকে আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন মিসেস হোসেন?

মনিরা বললো–দেখেছি।

ওর চেহারা কেমন ছিল?

মুখে চাপদাড়ি, মাথায় পাগড়ী, গালপাট্টা বাধা, চোখে হিংস্র চাউনি—

এর পূর্বে আপনি কোনদিন তাকে দেখেছিলেন?

না।

আরও কিছুক্ষণ পুলিশ ইন্সপেক্টার মনিরাকে জেরা করার পর বিদায় গ্রহণ করলেন।

মনিরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। মস্ত একটা বিপদ থেকে যেন সে উদ্ধার পেল। মনিরা অত্যন্ত সাবধানে পুলিশ ইন্সপেক্টারের প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছিল, কাজেই তার কথাবার্তা বা আচরণে তাকে কোন রকম সন্দেহ করতে পারেননি পুলিশ ইন্সপেক্টার।

মুরাদের হাত থেকে রক্ষা পেল মনিরা। রক্ষা পেল পুলিশের হাত থেকে। সবচেয়ে বড় শান্তি তার স্বামী বেঁচে আছে। অনাবিল একটা আনন্দস্রোত মনিরার মনকে আপ্লুত করে দিয়েছে। যদিও তার স্বামীর মনে মুরাদের কথাগুলো অবিশ্বাসের আগুন ধরিয়ে দিয়েছে তবু এতটুকু দমে যায়নি সে। একদিন না একদিন, এ ভুল তার স্বামীর ভেঙ্গে যাবে, একদিন ফিরে আসবে সে তার পাশে।

আবার বলিষ্ঠ বাহু দুটি দিয়ে আলিঙ্গন করবে–ঐ দিনটির প্রতীক্ষায় প্রহর গুণবে মনিরা। অনন্তকাল ধরে প্রতীক্ষা করবে সে।

কয়েক দিন পর পুলিশের অনুমতি নিয়ে মনিরা হোটেল থেকে বিদায় গ্রহণ করল। কিন্তু এখন সে যাবে কোথায়? ঝিন্দ শহর তার কাছে নতুন। যদিও এ শহরে তার বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়েছে, তবু দিনগুলো মণিরার স্বাভাবিকভাবে কাটেনি। কিছুদিন কেটেছে বনহুরের কেনা বাড়িতে, কিছুদিন মুরাদের বন্দীশালায় কিছুদিন কেটেছে বিভিন্ন স্থানে। মনিরা শহরের কোন জায়গা বা লোকজন কাউকেই চেনে না বা পরিচয় নেই।

এক রাতে নুরকে বুকে নিয়ে গাড়িতে চেপে বসল মনিরা। ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল–কাঁহা জায়েঙ্গী মাইজী?

মনিরা চট করে কিছু বলতে পারলো না, একটু চিন্তা করে নিল। যা হোক এখন তার স্বামীর দেয়া সেই বাড়িখানাতেই ফিরে যাওয়া উচিত। সেখানে তাদের অনেক অনুচর আছে, দাসদাসী আছে, নিশ্চয়ই কোন অসুবিধা হবে না তার। মনিরা তাদের বাড়ির ঠিকানা বলল।

কিন্তু বাড়িতে পৌঁছে অবাক হল মনিরা অপরিচিত এক পরিবার বাড়িটাতে বাস করছে।

মনিরা এবার কোথায় যাবে, কি করবে ভেবে পায় না। বাড়ির মালিক জানিয়ে দিলেন বাড়িখানা তারা কিনে নিয়েছেন, যারা তাঁর নিকট বাড়ি বিক্রি করেছে তারা চলে গেছে এদেশ ছেড়ে।

মনিরার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। চোখে অন্ধকার দেখছে, এখন সে কোথায় যাবে। ঝিন্দ শহরে তার আপন জন কেউ নেই, কাউকেই সে চেনে না, জানে না।

মনিরা নূরকে বুকে চেপে ধরে পথের বুকে নেমে দাঁড়ালো। দিশেহারা পথিকের মত পথ বেয়ে এগিয়ে চলল সম্মুখ দিকে।

মনিরার অপূর্ব রূপরাশি পথিকদের মনে প্রশ্ন জাগাল। সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল কে এই মেয়েটি কোথায়ই বা চলেছে। কেউ বা শিস দিল, কেউ বা বিদ্রুপ করল। মনিরা কোনদিকে না তাকিয়ে আপন মনে এগিয়ে চলেছে।

এমনি করে কতক্ষণ পথে পথে ঘুরে বেড়াবে সে? সন্ধ্যা আসন্ন প্রায়, তার পূর্বেই একটা কোন নিরাপদ স্থানে তাকে আশ্রয় নিতে হবে। তাছাড়া কচি নূর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, বিশ্রামের প্রয়োজন এখন তার।

মনিরা সামনে একটা বাড়ি দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল। মস্ত বড় গেট গেটের ওপাশেই গাড়ি–বারান্দা।

মনিরা গেটের নিকটে পৌঁছতেই একটা লোক বলল–কি চাও?

মনিরা বলল–রাতের মত থাকার একটু জায়গা চাই। লোকটা একটু ভেবে বলল–আচ্ছা, দাঁড়াও ভেতরে জিজ্ঞাস করে আসি।

একটু পরে ফিরে এলো লোকটা বলল–এসো।

মনিরার পা দুখানা হঠাৎ কেঁপে উঠল, অজানা একটা আশঙ্কায় বুকের ভিতরটা টিপটিপ করে উঠল। না জানি এ কার বাড়ি। বাড়ির মালিক কেমন মানুষ কে জানে। কিন্তু এত ভেবে কি হবে, রাতে পথের বুকে রাত কাটানো তার সম্ভব নয়! আশ্রয় তার চাই, কাজেই ভয় পেলে তো চলবে। না। মনিরা লোকটাকে অনুসরণ করল।

কয়েকখানা কক্ষ পেরিয়ে একটা কক্ষে এসে প্রবেশ করল লোকটা কাল কাপড়ের পর্দা উচু করে ধরে বলল–যাও!

মনিরা নূরকে কোলে করে কক্ষে প্রবেশ করল। কক্ষে প্রবেশ করেই ভয়ে বিস্ময়ে চমকে উঠল। একটা চৌকির ওপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছে এক প্রৌঢ় মেয়েলোক। বিরাট বপু। মাথায় একরাশ চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। মোটা পুরু দুখানা ঠোঁট। ঠোঁটের ফাঁকে তামাকের নল গোজা রয়েছে। চোখ দুটো যেন আগুনের ভাটা, দপ দপ করে জ্বলছে। মেয়েমানুষ নয়, যেন পুরুষের বাবা।

মনিরা ভয়বিহবল দৃষ্টিতে তাকাল মহিলাটির দিকে।

মনিরাকে দেখতে পেয়ে মেয়েলোকটা তার বিপুল বপুখানা নাড়াচাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসল। বাঁ হাতে নলটা একপাশে সরিয়ে বলল–তুমিই রাতের জন্য আশ্রয় চাও?

মনিরা ঢোক গিলে বলল–হ্যাঁ।

গম্ভীর ভারী গলায় বলল মহিলাটি–তোমার কোলে কি ওটা?

নূর তখন মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

মনিরা বলল–আমার ছেলে!

হিংস্র একটা হাসির আভাস ফুটে উঠল–ভীমকার মহিলার ঠোঁটের ফাঁকে।

মনিরা শিউরে উঠল। একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে উঠল তার বুকটা। নিজের জন্য মনিরা এতটা ভীত নয়, কেমন যেন ভয় হল তার নূরের জন্য। মনিরা বুকে আঁকড়ে ধরল কচি নূরকে।

মহিলা মেঘের মত গর্জন করে উঠল–বেশ, ওকে নিয়ে যা, পাশের ঘরে ওর থাকার জায়গা করে দে।

মনিরার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। এখানে কেন এসেছিল সে! এমন আশ্রয়ের চেয়ে ফুটপাতের আশ্রয় তার অনেক ভাল ছিল। এমন ভয় হচ্ছে কেন তা বুঝতে পারে না মনিরা। পালাবার জন্য মন তার অস্থির হয়ে উঠল।

লোকটা এবার মনিরাকে সঙ্গে করে একটা ছোট ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরের দরজায় তালা লাগান।

মনিরার সামনে যেন আর একটা নতুন বিপদের ঘন ছায়া নেমে আসছে। কে যেন অদৃশ্য হাতে গলাটা টিপে ধরছে তার।

লোকটা ততক্ষণে দরজা খুলে ধরেছে–যাও, এ ঘরে রাত কাটাও।

মুনিরা নিরুপায়ের মত নূরকে কোলে করে কক্ষের দরজার পা রাখল। কক্ষে প্রবেশ করে দেখল খুব বড় নয় কক্ষটা। কক্ষের মেঝেতে গালিচা পাতা। একপাশে কয়েকটা বালিশ বিক্ষিপ্ত ছড়ান রয়েছে। মনিরার দৃষ্টি হঠাৎ চলে গেল এক পাশে—একি! চমকে উঠল সে। গালিচার এক ধারে একটা রেকাবির উপর কয়েকটা কাঁচের গ্লাস আর খালি কয়েকটা বোতল পড়ে রয়েছে। মনিরা মুহূর্তে বুঝে নিল ওগুলো কিসের বোতল।

শিউরে উঠল মনিরা, সর্বনাশ, আবার সে কোন্ কু-ব্যক্তির কবলে পড়ল। তার জীবনটাই কি শুধু এমনি বিপদ আর বিপদে ভরা!

কি করবে মনিরা, এ কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করবেনা এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করবে? নিশ্চয়ই তার জন্য এ কক্ষ নিরাপদ স্থান নয়, বুঝতে পারল সে।

হঠাৎ নূর কেঁদে উঠল।

মনিরা নূরকে বুকে আঁকড়ে ধরে দরজার দিকে ফিরে দাঁড়াল। কিন্তু একি! দরজা কখন বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে লোকটা চলে গেছে। মুনিরা ধাক্কা দিতে লাগলো আর বারবার ডাকতে লাগল—এ দরজা খোল, দরজা খোল, আমার ছেলে কাঁদছে। এই, দরজা খোল।

কিন্তু কোন সাড়াশব্দই এল না বা দরজা খোলার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। মনিরা খাঁচায় বন্দী হরিণীর মত ছটফট করতে লাগল। নূর কিছুতেই কান্না বন্ধ করছে না।

অগত্যা মনিরা নূরকে নিয়ে মেঝেতে গালিচার ওপর বসে পড়ল। গোটা দিনটা কেটে গেল নূর কিছু খায়নি, এক্ষণে মায়ের দুধ সে প্রাণভরে পান করতে লাগল।

হাজার চেষ্টা করেও সে বদ্ধ কোঠা থেকে নিজকে বাইরে আনতে সক্ষম হল না মনিরা। নিজের এ ভুলের জন্য অনুতাপ করতে লাগল।

সারা দিনের ক্লান্তি আর অবসাদে মনিরার দেহ অবসন্ন হয়ে এসেছিল! কখন যে নূরকে বুকে নিয়ে গালিচার ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে স্মরণ নেই। হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল সে। কক্ষে ইলেকট্রিক আলো জ্বলছিল। সে চোখ মেলে তাকাল কেউ যেন দেখতে বা জানাতে না পারে সেভাবে তাকিয়ে দেখল।

চোখ মেলে চাইতেই আড়ষ্ট হয়ে গেল মনিরার সমস্ত দেহ। সেই বিরাট বপু মেয়েলোকটি–তার সঙ্গে একটি তেমনি বিরাট শরীর বিশিষ্ট লোক। দু'জনের মধ্যে নীচুস্বরে কথাবার্তা হচ্ছিল। আলোচনা যে তাকে নিয়েই হচ্ছে বুঝতে বাকী রইল না মনিরার। কেঁপে ওঠে তার অন্তরটাহায়, একি বিপদ দিলে খোদা! মনিরা নূরকে বুকের মধ্যে টেনে নিল।

মেয়েলোকটি বলল–দেখলে তো, যেমন কম বয়স, তেমনি রূপের ডালি—কত দেবে বল?

এবার পুরুষটার কণ্ঠ–আট হাজারের বেশি পারব না। কারণ ওকে বাগে আনতে আমার আরও অনেক কাঠ কয়লা পোড়াতে হবে।

মেয়েলোকটি গলার আওয়াজ কাঠ কয়লা পোড়াতে হবে বলেই তো দশ হাজার, নইলে বিশ হাজারের কমে যেত না। বল পারবে—না অন্য খরিদ্দারকে দেখাব?

লোকটা বুঝি মাথা চুলকাচ্ছে, খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে। তার সঙ্গে একটা ঘোৎ ঘোৎ শব্দ, এবার লোকটা বলল–কিছু কম কর বাঈজী দিদি।

কম–চাপাকণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ল মেয়েলোকটি, তারপর বলল–বেরিয়ে যাও, হবে না।

আরে শুনো বাঈজী দিদি, শুনো। চটো কেন? আস্তে কথা বল, জেগে উঠবে ছুড়ী। যাক, তাহলে ঐ দশ হাজার ছাড়া দেবে না?

না, না, না, বরং দু'দিন রেখে আরও বেশি টাকা পাবো। বাচ্চটাকে আগে সরিয়ে ফেলতে দাও–

মেয়েলোকটির কথায় মনিরার হৃদয় কেঁপে উঠল, বলে কি—বাচ্চাটাকে সরিয়ে ফেললে তার দাম আরও বাড়বে! মনিরা কি করবে ভেবে অস্থির হল।

লোকটা বুঝি ভাবছে, দশ হাজারে নিলে ঠকবে নাতো। এবার বুঝি মনস্থির করে ফেলেছে লোকটা, বলল–যাক, দশ হাজার টাকাই পাবে, কিন্তু ছেলেটা তোমাকে রাখতে হবে বাঈজী দিদি।

এর জন্য আবার চিন্তা, এ তো ভাল কথা, বাচ্চাটাকে আর একজনের কাছে দু'পাঁচ হাজারে চালিয়ে নেব—

লোকটা এবার বলল–তাহলে আমি রাজী।

মনিরা এবার আচমকা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল এবং তীব্র কণ্ঠে বলল–না, কিছুতেই তোমরা আমাকে বিক্রি করতে পারবে না। আমি সব কথা পুলিশকে জানিয়ে দেব।

মেয়েলোকটি কটমট করে তাকায় দাঁতে দাঁত পিষে বলল—পুলিশকে জানাবে! পুলিশ কোথায় বাছাধন! পুলিশ কোথায়?

মনিরা নূরকে কোলে আঁকড়ে ধরে বলে উঠল–আমি এসেছি।

তোমাদের এখানে রাতের মত একটু আশ্রয় পাব বলে। আর তোমরা আমাকে বিক্রি করে টাকা নেবে—এত বড় শয়তান তোমরা?

মেয়েলোকটি রাক্ষসীর মতো হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল। দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। দাঁত-মুখ খিচিয়ে বলল–বাঘের গুহায় পা দিয়েছ মেয়ে, আর ফিরে যাবার উপায় নেই। মেয়েলোকটি এবার হাতে তালি দিল।

সঙ্গে সঙ্গে একটি বিকৃত আকার মেয়েলোক কক্ষে প্রবেশ করে এক পাশে দাঁড়াল।

বিশাল বপু মেয়েলোকটি এবার তাকে ইংগিত করল মনিরার কোল থেকে বাচ্চাটাকে কেড়ে নিতে।

দু'হাত প্রসারিত করে বিকৃত আকার নারীটি মনিরার কোল থেকে ঘুমন্ত নূরকে কেড়ে নিতে গেল।

মনিরা অমনি নূরকে বুকে চেপে ধরে চিৎকার করে উঠলো—কিছুতেই তোমরা আমার কাছ থেকে আমার ছেলেকে কেড়ে নিতে পারবে না। যাও, যাও তোমরা–

বিকৃত আকার মেয়েলোকটি তখনও কঙ্কালের মত হাত দু'খানা প্রসারিত করে এগুচ্ছে।

মনিরা পিছিয়ে যাচ্ছে, বুকের মধ্যে তার ঘুমন্ত নূর। সেকি অদ্ভুত দৃশ্য!

মনিরা অসহায়ের মত বাচ্চাটিকে বুকে করে পিছিয়ে যাচ্ছে। আর জীবন্ত কঙ্কালের মত বিকৃত আকার মেয়েলোকটি দু'হাত মেলে তার দিকে এগিয়ে

আসছে।

মনিরা জানে না পেছন দিকে দাঁড়িয়ে বিরাট বপু মহিলাটি। খপ করে মনিরাকে ধরে ফেলল সে, বাঘের থাবায় যেন মেষ শাবক। মনিরার ঘাড় ধরে দাঁড় করিয়ে দিল, তারপর অতি সহজে মনিরার কোল থেকে নূরকে। কেড়ে নিল।

আর্তনাদ করে উঠল নূর।

মনিরার হৃদয় খান খান হয়ে যেতে লাগল, সে নূরের দিকে হাত বাড়ালো।

অমনি ভরঙ্কর চেহারার লোকটা মনিরাকে ধরে ফেলল। লোহার সাঁড়াসির মত ওর হাতখানা মনিরার কোমল হাতের ওপর দাগ কেটে বসে পড়ল, মনিরা শত চেষ্টা করেও নিজের হাতখানা বলিষ্ঠ লোকটার হাতের মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারলো না।

লোকটা দক্ষিণ হাতে মনিরার হাত মুঠায় চেপে ধরে বাঁ হাতে পকেট থেকে একতোড়া নোট বের করে বিরাট বপু বাঈজী দিদির হাতে গুঁজে দিল।

এবার লোকটা হাঁক দিল–ভজুয়া, ভজুয়া–

অমনি কক্ষে প্রবেশ করল একটা জোয়ান বলিষ্ঠ লোক। হাতে তার একটা কাল কাপড় আর একগাছা দড়ি।

লোকটা মনিরাকে বাঁধতে আদেশ করল।

ভজুয়া মনিরাকে বেঁধে ফেলল। সেই লোকটা এবং বাঈজী দিদিও তাকে সাহায্য করল, নইলে মনিরাকে কাবু করা একজন বা দু'জনের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল।

মনিরাকে যখন মজবুত করে বেঁধে ফেলছিল, ঠিক তখন বিকৃত আকার মহিলা নূরকে নিয়ে কক্ষ থেকে চলে গেল।

অসহায় মনিরা হাজার চেষ্টা করেও নিজেকে ঐ কঠিন বাঁধন থেকে মুক্ত করে নিতে সক্ষম হল না।

ঝিন্দ শহরে নেমে এসেছে অন্ধকার ঘনঘটা। রাত গভীর। মনিরাকে নিয়ে একটা এক্কা ঘোড়ার গাড়ি দ্রুত এগুচ্ছে শহরের শেষ প্রান্তের দিকে।

গাড়ির ঝাঁকুনিতে দড়ির বাঁধনে টন টন করে উঠছে মনিরার হাতের গিরা আর পায়ের গিট! অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। মুখে একটা কাপড় গোজা থাকায় নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে মনিরার। তবু নীরবে পড়ে রয়েছে, উপায় নেই নড়ার বা চিক্কার করে কাঁদার। কিন্তু এত দুঃখ-কষ্ট ছাপিয়ে বার বার মনে পড়ছে নূরের কথা। স্বামীর চিহ্নটুকুও বুঝি এবার সে হারিয়ে ফেলল। নূরের কান্নার সুর এখনও বাজছে তার কানের কাছে। না জানি ওকে ওরা কি করবে—হত্যা করে ফেলবে না তো? তাই বা কে জানে?

পাথুরে রাস্তার উপর দিয়ে গাড়িটা বোধ হয়ে যাচ্ছিলা কারণ ভয়ানক ঝাঁকুনি অনুভব করছিল মনিরা নিজের দেহে। আর কতক্ষণ এমনি করে কাটাতে পারবে, সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে। এবার হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়বে মনিরা, ক্রমেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার।

০৩.

আজ প্রায় বছর হয়ে এলো কায়েস এই অন্ধকার কারাকক্ষে বন্দী। প্রথম প্রথম একটু কিছু খাবার সে পাচ্ছিল। হয়তো কোনদিন শুকনো রুটি কিংবা ভাত। এখন কিছুদিন হলো তাও আর পায় না কায়েস। কেউ আর আসে না বা খাবার দিয়ে যায় না তার কারাকক্ষে। একটা মাটির হাঁড়িতে কিছু পানি ছিল সেই পানি খেয়ে কোনরকমে জীবনে বেঁচে রয়েছে। সে পানির মধ্যেও ছোট ছোট এক রকম কীট জন্মে গেছে। পানির রংটাও পাল্টে, সবুজ আকার ধারণ করেছে। তবু চোখ বন্ধ করে তৃপ্তির সঙ্গে সেই পচা দুর্গন্ধযুক্ত পানি পান করে কায়েস।

চেহারা কঙ্কালসার হয়ে গেছে। চোখ দুটো গর্তের মধ্যে বসে গেছে। চোয়াল দুটি উচু হয়ে উঠেছে কেমন বিশ্রীভাবে দাঁতগুলো বেরিয়ে এসেছে। মুখে একমুখ দাড়ি, মাথায় জটাধরা একমাথা চুল। আংগুলের নখগুলো মস্ত বড় বড় হয়ে গেছে। হঠাৎ কেউ কায়েসকে দেখলে মানুষ বলে চিনতেই পারবে না। একটা অদ্ভুত জীবের মত দেখতে হয়েছে সে।–

মানুষের প্রাণ এত শক্ত, এত কঠিন, এত কষ্টেও সে এখনো বেঁচে আছে—মরে যায়নি।

কিন্তু আর কতদিন সে এই নরক-যন্ত্রণা এমনি করে তিলে তিলে ভোগ করবে। কায়েস জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছে। বাঁচার সখ আর তার নেই। এ অবস্থাতেও কিন্তু কায়েসের মনে সদাসর্বদা মনিব-পত্নী মনিরার কথা উদয় হচ্ছিল। না জানি সে এখন কোথায়, কেমন আছে। তার গর্ভে সর্দারের সন্তান—না জানি সে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর তার অবস্থা কেমন আছে। পুত্রসন্তান জন্মেছে না কন্যাসন্তান জন্মেছে কে জানে। বেঁচে আছে না মরে গেছে তাই বা কে জানে! কায়েসের মনে একটা ক্ষীণ আশার আলো মিটমিট প্রদীপের মত জ্বলতে থাকে। তার সর্দারের পত্নী মনিরার গর্ভে কন্যা না জন্মে যদি ছেলে জন্মগ্রহণ করে থাকে তাহলে একদিন আবার তার সর্দারের আসন পূর্ণ হবে–অন্ধকার কারাকক্ষে কায়েসের নিষ্প্রভ চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠল।

কায়েস যে কক্ষে বন্দী ছিল, সে কক্ষে মাত্র একটা দরজা ও হাওয়া প্রবেশের একটি ছোট গর্ত ছিল। গর্তটাও প্রায় ছাদের কাছাকাছি। সে গর্ত দিয়ে সামান্য আলো আসতো কারাকক্ষে। কখনও কখনও সে গর্তে সূর্যের ক্ষীণ আলোর ছটা দেখতে পেত কায়েস। বেশ কিছুদিন এ আলোর রশ্মি দেখতো আবার হয়তো ধীরে ধীরে আলোর ছটা মিশে যেত আর দেখা যেত। কায়েস বুঝতে পারতো.মাস পাল্টে যাচ্ছে তাই প্রকৃতির এই পরিবর্তন।

কিন্তু আর কত দিন এই অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করবে। কেউ তো আর আসে না, কেউ তো আর তার সন্ধান নেয় না। তবে কি শয়তানের দল সব মরে গেছে না চলে গেছে এ দেশ ছেড়ে। তাকে হত্যা না করে জীবিত রেখেই চলে গেছে। তবু কায়েস কারও আগমন প্রতীক্ষায় দিন গোনে।

হঠাৎ একদিন তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। এত দিন তার মাথার উপর গর্তটা যদি আংগুল দিয়েও খুঁড়ে বড় করবার চেষ্টা করত তবু হয়তো সফলতা লাভ করতে পারত। যে কক্ষে কায়েসকে বন্দী করে রাখা হয়েছে সেটা যে মাটি নিচে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কায়েস একটু কষ্ট করলে ছাদটা নাগাল পেতে পারে। যদিও সিমেন্ট করা কিন্তু বহু দিনের পুরনো। চুন, বালু, ইট সব লোনা ধরে খসে খসে পড়ছে। কাজেই রোজ কিছু কিছু ভাঙার চেষ্টা করলেও এতদিন সে ঐ গর্ত দিয়ে বেরিয়ে যাবার মত ফাঁক করে ফেলতে পারত।

কায়েসের মনে একটা বেঁচে থাকার বাসনা উঁকি দিয়ে গেল। এবার সে তার ছাদের গর্তটা ফাঁক করার জন্য চেষ্টা নিল।

দিনরাত অবিরাম কাজ করে চলল কায়েস।

কখন রাত,কখন দিন যদিও বুঝার কোন উপায় ছিল না, তবু ঐ গর্তের সামান্য আলোতে সে বুঝতে পারত এখন রাত বা দিন হয়েছে।

সব সময় আংগুলের নখ দিয়ে লোনাধরা সিমেন্ট আর বালির চাপ খুলে ফেলত। যখন ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ত তখনই ঐ পচা দুর্গন্ধময় পানি পান করত। আবার কাজ শুরু করত। আবার যখন ক্লান্তিতে অবশ হয়ে আসত তার শরীরটা তখন মাথার নিচে হাত রেখে মাটিতে শুয়ে পড়ত। ঘুম ভাঙলে আবার চলত তার কাজ।

০৪.

মনিরার যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন সে চোখ মেলে দেখতে পেল একটা খাটের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে তাকে। সমস্ত শরীর ব্যথায় টনটন করছে। মনিরা স্মরণ করতে চেষ্টা করল এখন সে কোথায়। কিছুক্ষণের মধ্যে সব কথা মনে পড়ল তার। নূরের কথা মনে হতেই উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠল সে। না জানি এখন সে কোথায়! এতটুকু কচি শিশু—দুধ ছাড়া, কিছু সে খায় না। আহা, কেঁদে কেঁদে গলা বুঝি শুকিয়ে গেছে। মনিরা আকুলভাবে কাঁদতে লাগল।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করল একটা লোক। হাতে তার একটা গ্লাস, মনিরার সামনে এসে দাঁড়াল—এই নাও, এতে দুধ আছে, খেয়ে নাও।

মনিরা মুখ ফিরিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সারাদিন কিছু খেল না সে, সর্বক্ষণ কাঁদতে লাগল। বিকেলে হঠাৎ সেই লোকটা এসে হাজির হল তার কক্ষে। যে লোকটা বিরাট বপু মহিলার কাছ থেকে তাকে কিনে নিয়েছিল দশ হাজার টাকা দিয়ে এ সেই লোক।

মনিরা ওর দিকে তাকিয়ে ভয়ে শিউরে উঠল।

লোকটা দাঁত বের করে একটু হাসলো, কি ভংঙ্কর কুৎসিত সে হাসি! এবার মনিরার পাশে এসে পঁড়িয়ে বলল–কেমন আছ প্রিয়া!

মনিরার মাথা থেকে পা পর্যন্ত রি রি করে উঠল। লোকটার কথা তার শরীরে যেন আগুন ধরিয়ে দিল।

লোকটা এবার তার বিছানার একপাশে বসে পড়ল। শিউরে উঠল মনিরা। খাটের এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসল সে। হাত বাড়াল লোকল মনিরার দিকে যাবে কোথায়, তুমি যে এখন আমার!

যেমনি লোকটা মনিরাকে ধরতে গেল–অমনি মনিরা খাট থেকে নেমে সরে দাঁড়াল। বুকটা ধক ধক করতে লাগল তার।

লোকটার দু'চোখে লালসাপূর্ণ চাহনি। দু'হাত মেলে এগুতে লাগলো মনিরার দিকে।

মনিরা নিজেকে বাঁচাবার জন্য ব্যাকুল নয়নে চারদিকে তাকাল। হঠাৎ সৈ হাতের পাশে অনুভব করল শক্ত একটা জিনিস।

মনিরা হাতের মুঠায় তুলে নিল জিনিসটা—একটা পাথরের ক্ষুদে বাঘ সেটা।

লোকটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

মনিরা পিছু হটতে হটতে দেয়ালে গিয়ে ঠেকে পড়ল, আর কোন্ দিকে সরবে। লোকটা এবার ধরে ফেলবে–মনিরা উপায় না দেখে হাতের পাথুরের মূর্তিটা ছুড়ে মারল লোকটার মাথা লক্ষ্য করে।

মনিরার লক্ষ্য ব্যর্থ হল না, লোকটার মাথায় লেগে ছিটকে পড়ল মেঝেতে।।

লোকটা আর্তনাদ করে উঠল। তারপর দু'হাতে মাথা চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে মনিরা দরজা দিয়ে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করল কিন্তু বেশিদূর এগুতে না এগুতেই দুজন লোক মনিরাকে ধরে ফেলল, বলল—পালাচ্ছ। কোথায়? দশ হাজার টাকা তোমার দাম।

টেনে হিচড়ে মনিরাকে আবার সেই ঘরে নিয়ে এল লোক দু'টি।

মনিরা তাকিয়ে দেখল তার হাতে আহত ব্যক্তি এখনও মেঝেতে বসে কাতরাচ্ছে। রক্তেরাঙা হয়ে উঠেছে তার জামা-কাপড়। কয়েকজন গুড়া প্রকৃতির লোক ওর মাথার ঔষধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে।

মনিরা বুঝতে পারল, এটা কোন গুণ্ডাদলের আস্তানা। এখানকার প্রত্যেকটা লোকের চেহারা শয়তানের মত দেখতে। যে লোকটা তাকে কিনে এনেছে এবং তার হাতে আহত হয়েছে, সেই যে এ দলের নেতা বা সর্দার তা বুঝতে বাকী রইল না মনিরার।

লোক দু'জন মনিরাকে পুনরায় সেই কক্ষে এনে পিছমোড়া করে খাটের সঙ্গে বেধে ফেলল।

ততক্ষণে দলপতির মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে। এবার রক্তচক্ষু নিয়ে তাকাল সে মনিরার দিকে, তারপর গর্জন করে বলল–চাবুক লাগাও! শরীরের চামড়া ছিড়ে ফেল।

হুজুর, চাবুক লাগালে মরে যাবে যে! বলল একটা লোক।

দলপতি হুঙ্কার ছাড়ল–মরুক—

অন্য একজন বলল—হুজুর দশ হাজার টাকা—

যেতে দাও!

তার চেয়ে ওকে ফেরত দিয়ে দেয়াই ভাল।

হ্যাঁ, ঠিক কথা বলেছ! তাই করব, এমন রাক্ষসী মেয়ে আমি চাইনা। যাও, ওকে আজই চালান করে দাও।

আচ্ছা হুজুর, তাই করব। করব নয়-কর।

উপস্থিত চাবুকের আঘাত থেকে বেঁচে গেল মনিরা, তার ওপর তাকে আবার সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে যেখানে তার নূর আছে। মনে মনে খুব খুশি হল সে। বুকের মধ্যে নুরের জন্য তোলপাড় শুরু হয়েছে। কিন্তু কখন নিয়ে যাবে? আর কতক্ষণ পরে? মনিরা ছটফট করতে লাগল।

কিন্তু মনিরা যত সহজে পরিত্রাণ পারে ভেবেছিল তত সহজে পেল না। সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে ঐ খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখা হল। কিছু খেতেও দেয়া হল না।

সন্ধ্যার পর যখন গোটা পৃথিবী ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হল তখন মনিরাকে হাত-পা-মুখ বেঁধে একটা ঘোড়ার গাড়িতে তুলে নিল ওরা।

গাড়ি চলতে শুরু করল মনিরা কিছু দেখতে পাচ্ছে না, শুধু অনুভব করছে সে গাড়িটা কোন উচুনীচু পথ ধরে এগুচ্ছে। প্রচণ্ডভাবে গাড়িখানা নড়ছে আর দুলছে।

বেশ কিছু সময় ধরে, গাড়িখানা এমনিভাবে চলার পর এবার মনে হল বেশ সমান পথ ধরে চলতে শুরু করল গাড়িটা। আর কোন রকম ঝাকুনি লাগছে না।

মনিরা গাড়ির মধ্যে থেকেই বুঝতে পারছে, যে পথ বেয়ে এখন। তাদের গাড়ি চলেছে সেটা জনমুখর রাজপথ। নানা রকম যানবাহনের শব্দ তার কানে আসছে। সময়টা রাত। গাড়ির ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে রাস্তার লাইটপোষ্টের আলোও দেখা যাচ্ছে।

বেশ কিছু সময় চলার পর গাড়িখানা থেমে পড়ল। আশায় আনন্দে মনিরার মনের মধ্যে আলোড়ন হচ্ছে। যত দুঃখ-কষ্টই হোক নূরকে সে বুকে ফিরে পাবে, এটাই তার বড় পাওয়া।

গাড়ির দরজা খুলে তাকে বের করে আনা হল। যদিও মনিরার হাতমুখ বাধা ছিল তবু দেখতে পেল এটা সেই বাড়ি যে বাড়িতে একদিন মনিরা রাতের মত আশ্রয়ের আশায় প্রবেশ করেছিল। সেই ভীমকায় মহিলার চেহারা মনে পড়তেই মনিরার বুক কেঁপে উঠল, না জানি আবার তার অদৃষ্টে কি আছে!

মনিরাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়া হল।

সেই কক্ষে, যে কক্ষে মনিরা প্রথম প্রবেশ করে ঐ বিরাট বপুধারিণী নারীটিকে দেখতে পেয়েছিল। মনিরাকে নিয়ে দুটি লোক সেই কক্ষে প্রবেশ করল।

একজন বলল–একে তিনি ফেরত পাঠালেন।

কর্কশ কন্ঠে গর্জে উঠল বিরাট বপুধারিণী–ফেরত পাঠাল, কেন, কি হয়েছে?

মহিলার গর্জনে লোক দুটোর বুক থর থরিয়ে কেঁপে উঠল, অন্যজন। হাতে হাত কচলে বলল—এমন রাক্ষসী মেয়ে নিয়ে আমাদের চলবে না। আমাদের মনিবকে এ আহত করেছে।

দাঁতে দাঁত পিষল বিরাট বপু ধারিণী—কি বললে!

মনিবকে জখম করে দিয়েছে—এই শয়তানী!

তাই নাকি? একটু থেমে বলল মহিলা একটা মেয়েকে বাগে আনতে পারলো না, এমন পুরুষের বাচ্চা তোদের মনিব। আরে ছোঃ, থুক দেই অমন পুরুষের মুখে। তারপর বিছানার তলা থেকে একতাড়া নোট বের করে ছুড়ে দিল সে লোক দুটোর গায়ে—নিয়ে, যা তোদের মনিবকে দিয়ে দিস। হতভাগাগুলো!

লোক দুটো টাকার তাড়াগুলো দ্রুত হস্তে কুড়িয়ে নিল তারা পালাতে পারলে যেন বেঁচে যায়।

লোক দুটি বেরিয়ে যেতেই হুংকার ছাড়ল মহিলাটি–শয়তানী, বড্ড বেপরোয়া হয়েছ! জান কার হাতে পড়েছ তুমি?

মনিরা তাকিয়ে দেখল বিরাট দেহধারিণীর দু'চোখে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। দাঁত কটমটিয়ে তাকাচ্ছে তার দিকে। . মনিরার মন তখন নূরের জন্য ছটফট করছে। মায়ের প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে। আকুলভাবে কেঁদে বলল মনিরা–আমার ছেলে কোথায়? আমার ছেলে?

ছেলে! গর্জন করে উঠল মহিলা ছেলে নেবে?

হ্যাঁ, আমার ছেলে দাও?

হেসে উঠল ভীমকায় মেয়েলোকটি–ছেলেকে আর পাচ্ছো না।

কেন! কোথায় নূর?

সে এখন চলে গেছে–অনেক দূরে, বুঝেছ?

কোথায় তাকে পাঠিয়েছ তোমরা? কি করেছ তাকে?

বিক্রি হয়ে গেছে–তোমার চেয়ে তার মূল্য আমি অনেক বেশি পেয়েছি! তার দক্ষিণ বাজুতে যে কাল জট রয়েছে, সেই জটই তার মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে, বুঝেছ?

মনিরার মনে পড়ল–নূরের দক্ষিণ হাষ্ঠের বাজুর ওপর কাল একটা জট ছিল, নূরের জন্মের পর মনিরা অবাক হয়েছিল প্রথমে, এমন হয়েছে কেন! নেড়েচেড়ে দেখল সে নূরের সাদা ধবধবে ছোট বাজুর ওপর কাল একটা দাগ ঠিক একটা পয়সার মত। তবে কি সেটা, কোন লক্ষণযুক্ত, সন্তান তার? হয়তো কিছু হবে, নইলে আজ এ কথা শুনবে কেন? ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করল মনিরা কোথায়, কার নিকট তোমরা বিক্রি করেছ? তোমাকে আমি অনেক অনেক টাকা দেব, আমার সন্তানকে তোমরা ফিরিয়ে এনে দাও।

টাকা, ভিখারিণী দেবে টাকা! কোথায় পাবি টাকা? কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করল মহিলাটি।

মনিরা তেমনি ব্যাকুল কণ্ঠে বলল–ওর বাবা লাখ লাখ টাকার, মালিক। যত টাকা চাও, তাই পাবে তোমরা। আমার নয়নের মনিকে তোমরা ফিরিয়ে এনে দাও।

আবার মহিলাটি বিকট শব্দে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল। তারপর ব্যঙ্গপূর্ণ কন্ঠে বলল, ওর বাবা লাখ লাখ টাকার মালিক, আর তুমি ওর মা হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে এতটুকু আশ্রয়ের জন্য–হাঃ হাঃ হাঃ! হাসিতে ফেটে পড়ল বিশাল বপুধারিণী। হাসি থামিয়ে বলল আবার—এতক্ষণে হয়তো তোমার সন্তানের রক্তে কাপালিক সন্ন্যাসী তার কালীপূজা শেষ করছে–

শয়তান মেয়ে লোকটার কথা শেষ হয় না, মনিরা তার বাঁধা হাত দুটি দিয়ে চেপে ধরল মেয়েলোকটার গলা–কি বললি! কি বললি পিশাচিনী–

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েলোকটা হাতে তালি দিল, অমনি দু’জন বলিষ্ঠ লোক মনিরাকে সরিয়ে নিল।

মেয়েলোকটা তার বিরাট দেহটা নিয়ে ক্রুদ্ধ সিংহীয় ন্যায় গর্জন করে উঠলো–নিয়ে যাও! ঐ ঘরে আবার বন্ধ করে রাখ। রাক্ষসী দেখছি পুত্রশোকে ক্ষেপে উঠেছে। আমাকেও হত্যা করতে যাচ্ছিল–দাঁতে দাঁত পিষে বলল আবার—

হেমাঙ্গিনীর হাতে পড়েছ। যার হাতে সাতটা জোয়ান পুরুষ ভেড়া বনে যায় তুমি তো একটা পুচকে ছুড়ী! নিয়ে যা, হা করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন?

বলিষ্ঠ জোয়ান লোক দুটি মনিরাকে একরকম শূন্যে ঝুলিয়েই নিয়ে চলল।

০৫.

আবার সেই কক্ষ।

মেঝেতে গালিচা পাতা। কতগুলো তাকিয়া ছড়ানো রয়েছে গালিচার একপাশে। কয়েকটা মদের বোতল এপাশে ওপাশে কাৎ হয়ে পড়ে আছে, কাঁচের কয়েকটা গ্লাসও বিক্ষিপ্ত ছাড়ান। কক্ষে তখনও ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে।

মনিরাকে কক্ষে ঠেলে দিয়ে লোক দুটো দরজায় তালা আটকিয়ে চলে গেল।

মনিরা দু'হাতে দরজায় ঝাঁকুনি দিয়ে খোলার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু একচুলও নড়লো না বা দুললো না শালকাঠের দরজাটা।

মেঝেতে পড়ে মাথা আছড়ে কাঁদতে লাগল সে। হায়, একি হল তার! একি সর্বনাশ হল। সব হারাল মনিরা–স্বামী-পুত্র সব। ছোটবেলায় পিতা-মাতাকে হারিয়েছিল, বড় হয়ে মামাকে হারাল, মামী বেঁচে থেকেও আজ নেই–মেই তার কোন আত্মীয়স্বজন। স্বামী তার স্বাভাবিক মানুষ নয়, তবু ছিল তার পাশে-সেও আজ নেই। একমাত্র নূর ছিল তার সম্বল তাকেও হারিয়েছে। শুধু হারিয়েই যায়নি সে, চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে চলে গেছে। কোন সন্ন্যাসীর হাতে অবোধ শিশু নূর জীবন বিসর্জন দিয়েছে–আর ভাবতে পারে না, মনিরা–বুকটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

দিনরাত মাথা ঠুকে কাঁদলেও আর সে ফিরে আসবে না। আর তার বুকে মুখ লুকিয়ে ফিক্ ফিক করে হাসবে না। আধো আধো কণ্ঠে মা-মা বলে ডাকবে না। মনিরা নিজের চুল নিজেই ছিড়তে লাগল, বুকে আঘাত করে চিৎকার করে ডাকল নূর-নূর, কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া দিল না।

ক্ষুধা-পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিল মনিরা, সব ভুলে গেছে। নূরের মৃত্যু-সংবাদে সব ভুলে গেছে সে।

কখন যে তার সামনে কে খাবার রেখে গেছে দেখতেই পায়নি মনিরা। পিপাসায় কণ্ঠতালু শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মনিরার দৃষ্টি পানির পাত্রে পড়তেই দু'হাত বাড়িয়ে গেলাসটা তুলে নিল এক নিঃশ্বাসে পানি পান করে শূন্য গ্লাসটা রেখে দিল মেঝেতে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করল দু'টি লোক, সঙ্গে আর একটি যুবতী এবং সেই বিশাল দেহধারিণী হেমাঙ্গিনী। মনিরা লোক দুটির একজনকে দেখে চিনতে পারল, যে তাকে প্রথম দিন এ বাড়িতে আশ্রয় দেবার আশা দিয়ে নিয়ে এসে ছিল সে অন্যজুন–নতুন লোক।

মনিরা যুবতীটির দিকে তাকাল, বেশ বুঝতে পারল তাকেও জোরপূর্বক ধরে আনা হয়েছে। মেয়েটার বয়স মনিরার চেয়েও কিছু কম হবে। দেখতে, মনিরার মত এত সুন্দরী নয়, তবে একেবারে মন্দও নয়। মেয়েটার চোখে। মুখে অসহায় ভাব। সে যে কেঁদেছে তার মুখ দেখেই বুঝা গেল। যুবতী, মনিরার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে।

হেমাঙ্গিনী লোক দুটিকে লক্ষ্য করে বলল-একেও এই ঘরে বন্দী করে রাখ। খদ্দের এলে আমার সঙ্গে দাম দর হবে।

যুবতীটিও যে মনিরার মতই একজন সর্বহারা এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, সে তার সমস্ত আত্মীয়-পরিজনের নিকট হতে বিচ্ছিন্ন।

হেমাঙ্গিনী তার অনুচরদ্বয়কে সঙ্গে করে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় আর একবার তীবকটাক্ষে মনিরাকে দেখে নিল। সে কি জ্বালাময় বিষভরা চাউনি। মনিরার হৃৎপিণ্ডের রক্ত যেন জমে এলো।

ওরা চলে যাবার সময় ঘরের দরজায় তালাবদ্ধ করে চলে গেল।

এবার মনিরার আর একজন সঙ্গী জুটলো। যা হোক তবু কথা বলার একজন হল।

যুবতী দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

এগিয়ে গেল মনিরা। আঁচলে নিজের চোখের পানি মুছে ফেলে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বলল-বোন কেঁদো না, আমিও তোমার মত একজন।'

মুখ থেকে হাত সরিয়ে তাকাল যুবতী। এই নরপিশাচদের বাসস্থানে এমন একটা মধুর কণ্ঠস্বর। যুবতী কোন কথা বলতে পারল না, শুধু তাকিয়ে রইলো।

মনিরা বলল-বোন, তুমি কি করে এদের ফাঁদে পড়লে জানতে পারি?

যুবতী আকুলভাবে কেঁদে উঠল, বলল-আমাকে ওরা ফুসলিয়ে নিয়ে এসেছে।

সে কি!

হ্যাঁ, আমার বুড়ো বাপের সঙ্গে আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাবা আর আমি ফেরার পথে গাড়ির জন্য, পথের ধারে অপেক্ষা করছি এমন সময় একটা বুড়োমত লোক এসে বাবাকে, কোথায় যেন ডেকে নিয়ে গেল। একটু পর ফিরে এলো লোকটা, বলল-আমি তোমার বাবার বন্ধু, তোমার বাবা আমাদের বাড়িতে অপেক্ষা করছেন, তুমি আমার সঙ্গে এসো। আমি কোনরকম দ্বিধা না করে ওর সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসলাম, কারণ একটু পূর্বে বাবা ওর সঙ্গেই যখন গেলেন তখন নিশ্চয়ই তিনি ওদের ওখানেই আছেন। কাজেই আমার কোন সন্দেহ হল না।

মনিরা ব্যাকুল আগ্রহে প্রশ্ন করল–তারপর?

তারপর আমাকে এই বাড়িতে নিয়ে এলো, বাবাকে তো দেখছি না। ঐ যে ভংকর মেয়েলোকটা, আমাকে সেই আটকে রাখল। বলতে পার কেন আমাকে ওরা এ ঘরে বন্ধ করে রাখল। আর তুমিই বা কে?

মনিরা ব্যথাকাতর কণ্ঠে বলল–আমিও তোমার মত একটা অসহায় মে, আটকে রেখেছে' আমাকেও তোমার মত-উদ্দেশ্য ওদের খুব খারাপ।

কি করবে ওরা আমদের বন্দী করে রেখে?

কোন দুষ্ট লোকের কাছে বিক্রি করবে।

তাই নাকি!

হ্যাঁ, এরা মেয়ে বিক্রির ব্যবসা করে।

সত্যি?

হ্যাঁ, নইলে তোমাকে এখানে ফুসলিয়ে এনেছে কেন?

তোমাকেও বুঝি ফুসলিয়ে এনেছে এরা?

মনিরা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল-না, আমি নিজেই ভুল করে ফাঁদে পা দিয়েছি।

মনিরা অল্পক্ষণের মধ্যেই যুবতীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিল। এই নির্জন কক্ষে অসহায় অবস্থায় ওকে পেয়ে ভালই হল মনিরার। মনের ব্যথা তবু একটু কমলো, নূরের কথা খুলে বলল—সেই যুবতীর কাছে।

যুবতী নিজের পরিচয় দিল নাম তার সুফিয়া। মনিরা নিজের খাবার সুফিয়াকে খেতে দিল।

সারাটা দিন কেটে গেল, রাত হল।

মনিরা আর সুফিয়া নানারকম দুঃখভরা কথা আলোচনা করল। এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কিনা–এ নিয়ে কথাবার্তা হল দু'জনের মধ্যে। কিন্তু কোন উপায়ই খুঁজে পেল না ওরা।

রাতে দু'জনে পাশাপাশি গালিচায় শুয়ে পড়ল। নানা রকম ভয় ও দুশ্চিন্তা উঁকি দিয়ে যাচ্ছে মনিরার মনে। বারবার মনে হচ্ছে নূরের কথা, আর কোনদিন সে নূরকে দেখতে পাবে না, স্মরণ হতেই আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। চোখের পানিতে গালিচা ভিজে চুপসে উঠল।

সুফিয়া মেয়েটা সারাটা দিনের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল। পাশে মনিরা দ্রিাহীন চোখে চিন্তার জাল বুনে চলেছে। রাত বেড়ে আসছে।

হঠাৎ একটা শব্দে মনিরা চমকে উঠল। না, ও কিছু নয়, দরজাটা ভালভাবে তালা দেয়া আছে কিনা, কেউ বোধ হয় সেটাই পরীক্ষা করে দেখে গেল।

মনিরা আবার শুয়ে পড়ল। বুকের মধ্যে তখন জমাট ব্যথা গুমড়ে কেঁদে মরছে।

০৬.

লক্ষ্মী ছেলেটির মত শান্ত হয়ে পড়েছে যেন দস্যু বনহুর। ঝিন্দ থেকে ফিরে আসার পর সে একটা দিনের জন্যও দরবারকক্ষে প্রবেশ করেনি বা তার অনুচরগণকে ডেকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেনি। কেমন যেন উদাস হয়ে গেছে দস্যু বনহুর, দস্যুতা যেন ভুলেই গেছে সে।

সর্দারের উদাসীনতা তার অনুচরগণের মনে একটা নৈরাশ্য ভাব এনে দিয়েছে। বিশেষ করে রহমান আশঙ্কিত হয়ে পড়েছে। সর্দার যদি এমন হয়ে পড়ে তাহলে দল চলতে পারে না। আর কতদিন রহমান নিজে দল। চালাবে।

দস্যু বনহুরের নীরবতায় কতগুলো শয়তান মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। শহরের বিভিন্ন স্থানে নানা রকম গোপন চোরা কারবার শুরু হয়েছে। নানা রকম গুপ্ত গুণ্ডামি চলছে, যা পুলিশের সুক্ষ্ম দৃষ্টিকেও হার মানিয়েছে। পুলিমহল জানে, আজকাল দেশ শান্ত, নীরব। দস্যু বনহুর নিখোঁজ হওয়ায় দেশে শান্তি বিরাজ করছে।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা ছিল ঠিক তার উল্টো। দস্যু বনহুরের ভয়ে দেশবাসীর প্রাণে জাগে আতঙ্ক, সবাই দুর্ভাবনায় রাত কাটায় সত্য, কিন্তু আসলে কি বনহুর অন্যায়ভাবে কারও ওপর উপদ্রব করে রা করেছে? কোনদিন সে কোন অসহায় অনাথের প্রতি আঘাত হানেনি। কোন মহৎ ব্যক্তির ধনরত্ন লুটে নেয়নি। দস্যু বনহুরের প্রচণ্ড থাবা সব সময়ই টুটি টিপে ধরেছে যত অনাচারী অত্যাচারী আর বদমাইশদের, দেশের যত দুষ্টু কুচক্রী দলের ওপরই সে বারবার হামলা করেছে। দলিত মথিত নিষ্পেষিত করে তবেই ক্ষান্ত হয়েছে দস্যু বনহুর। দেশের দুষ্ট লোকদের দমন করতে গিয়েই সে সকলের কাছে হয়েছে ভয়ঙ্কর, ভয়ের কারণ। পুলিশের কাছেও সে হয়েছে দোষী অপরাধী।

কাজেই দস্যু বনহুর দেশের একজন মহান ব্যক্তি হয়েও সকলের কাছে হয়েছে ভয়াবহ।

সেই ভয়ঙ্কর ভীতিকর লোকটার এহেন নীরবতার শুধু দেশবাসীই নয়, পুলিশমহলও নিশ্চিন্ত আশ্বস্ত ছিল।

কিন্তু সম্প্রতি শহরে বা শহরের আশেপাশে একটা নতুন চঞ্চলতা দেখা দিয়েছে। নারীহরণ ব্যাপারটা যেন আজকাল আরও বেড়ে গেছে। মাঝে মাঝে

এখান সেখান থেকে প্রায়ই মেয়েছেলে চুরি নিয়ে পুলিশ অফিসে ডায়েরী হচ্ছে। পুলিশ এ নিয়ে চূড়ান্ত চেষ্টা করেও এর কোন সমাধান করতে সক্ষম হয়নি।

সেদিন মাহফুজ সাহেবের একমাত্র কন্যা রেবেকা কোন ফাংশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে উধাও হয়েছে, এখন পর্যন্ত পুলিশ তার কোন সন্ধান করতে পারেনি। গোটা শহর তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে কিন্তু কোথাও রেবেকার খোঁজ পাওয়া যায়নি।

ইতোপূর্বে আরও কয়েকটি যুবতী শহরের বুক থেকে নিখোঁজ হয়েছে, তাদেরও কোন পাত্তা পাওয়া যায়নি আজ পর্যন্ত।

পুলিশমহল যদিও কিছুদিন বেশ আরামেই দিন কাটাচ্ছিলেন কিন্তু এই নারীহরণ ব্যাপার নিয়ে আবার তারা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে শহরের বিশিষ্ট জননায়ক মাহফুজ সাহেবের কন্যাচুরির ব্যাপার নিয়ে পুলিশমহলে আবার আলোড়ন দেখা দিল।

দিনের পর দিন এমনিভাবে মেয়ে-চুরি বেড়েই চলেছে। এসব মেয়ে কোথায় যাচ্ছে, কোথায় তাদের চালান করা হচ্ছে এর কোন হাদিস পাওয়া যাচ্ছে না! শুধু নারীহরণই নয়, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে চুরিরও যেন একটা হিড়িক পড়ে গেছে। আজ এর ছেলে, কাল ওর ছেলে, ওর মেয়ে—এমনি। দু'চার দিন পর পর ছেলে-মেয়ে চুরি হয়ে যাচ্ছে অথচ পুলিশ আজও তার কোন সুরাহা করতে পারছে না।

ছেলে-মেয়ে ও নারীহরণ লেগেই আছে অথচ এ ব্যাপারটার পুলিশমহল যেন তেমন গুরুত্বই দেয় না। এ নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবারও কারও সময় নেই যেন। কিন্তু নারীহরণ এবং ছেলে-মেয়ে চুরি যে দেশ ও দশের পক্ষে কত অমঙ্গল এবং ক্ষতিকর তা সত্যি ভাবার বিষয়।

এতদিন ব্যাপারটা গ্রাহ্য না করলেও এবার মাহফুজ সাহেবের কন্যা চুরির যাওয়ায় শহরে তোলপাড় শুরু হল।

অনেকেরই ধারণা, এই নারীহরণ ব্যাপারটা অন্য কারও নয়–দস্যু বনহুরেরই কাজ। সে এখন দস্যুতা ত্যাগ করে নাকি নারীহরণ শুরু করেছে।

কথাটা এক সময় রহমানের কানে এসে পৌঁছল। জনসাধারণের ধারণা এবং পুলিশমহলেরও সন্দেহ এটা দস্যু বনহুর ছাড়া আর কারও কাজ নয়।

দস্যু হলেও রহমান মানুষ, কথাটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল সে। সত্য হলে সে কিছুই মনে করত না কিন্তু এত বড় একটা মিথ্যাকে সে কি করে স্বীকার করবে! তাদের সর্দারের সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে এ কুৎসিত ধারণা রহমানকে ব্যথিত করে তুলল।

সেদিন বনহুর তার বিশ্রামকক্ষে অর্থশায়িত অবস্থায় উদাস মনে কি যেন চিন্তা করছিল। নূরী পাশে এসে বসল, বলল—হুর কি ভাবছ?

বনহুর মৃদু হেসে বলল–কিছু না।

আজকাল বনহুর নূরীর সম্মুখে কোন সময় নিজেকে ভাবাপন্ন বা উদাসীন রাখে না। যতটুকু পারে নিজেকে সংযত রেখে নূরীর সাথে হাসি-খুশিভাবে কথাবার্তা বলে। নূরী সত্যি তাকে কত ভালবাসে, মর্মে মর্মে তা উপলব্ধি করেছে সে। নূরী তাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে। আর মনিরার কথা স্মরণ হতেই তীব্র ঘৃণা তার সমস্ত মনকে বিষিয়ে তোলে। মনিরা তাকে ভালবাসার নামে মিথ্যা ছলনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিল। অবিশ্বাঙ্গিনী মনিরা–একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা বনহুরের হৃদয়কে নিষ্পেষিত করে চলে। বনহুর যতই মনিরার স্মৃতি ভুলে যাবার চেষ্টা করে ততই যেন তার মুখখানা বারবার ভেসে ওঠে মনের আকাশে। তাই বনহুর আজকাল প্রায়ই নূরীকে নিজের পাশে পাশে রাখে, নূরীকে দিয়ে ভুলে যেতে চায় মনিরাকে।

বনহুরের সংস্পর্শে নূরী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। আবার তার ওীবনধারা হয়েছে স্বচ্ছ স্বাভাবিক। হাসি-গানে মুখর হয়ে উঠেছে নূরী।

নূরীর জন্য ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল বনহুর, এখন সে চিন্তা আর নেই। নূরী আবার স্বাভাবিক জীবন লাভ করেছে–এটা তার চরম আনন্দ। তাই বনহুর কোন সময় নূরী মনে ব্যথা পায়—এমন ধরনের কথা বলে না বা সে ধরনের কাজ করে না।

নূরীর আগমনে বনহুর মনের চিন্তা দূরে ঠে ঠলে দিয়ে বলল–নূরী, তুমি আমাকে অনেক ভালবাস, না?

নূরী বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে অভিমানভরা কণ্ঠে বলল–এ কথা তুমি আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা কর কেন?

শুনতে ভাল লাগে নূরী।

কি জানি, এবার ফিরে আসার পর তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ।

কেমন হয়ে গেছি নূরী? মন্দ না ভাল?

অনেক ভাল।

বেশ।

তার মানে।

মানে তোমার ভাল লাগাই যে, আমার ভাল লাগা, আমার আনন্দ নূরী। যাক, চলো একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

নূরীর হাত ধরে বনহুর তার পাতালপুরীর গোপন আস্তানা থেকে সুড়ঙ্গপথে এগুতে থাকে।

হাজার ফিট মাটির তলায় দস্যু বনহুরের গোপন আস্তানা। কান্দাই বনে আস্তানা থাকাকালীন বনহুর এ ভূগর্ভে গোপন আস্তানা তৈরি করেছিল। লাখ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে এ আস্তানা তৈরি করতে!

বনহুরের এ আস্তানা এমন জায়গায় যেখানে কোনদিন পুলিশ বা সাধারণ মানুষ প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। অদ্ভুত কৌশলে তৈরি এ আস্তানাটি।

মিঃ জাফরী, যখন পুলিশ ফোর্স নিয়ে বনহুরকে কান্দাই বনের আস্তানায় হামলা করেছিলেন, তখন বনহুর তার এই পাতালপুরীর গোপন আস্তানায় নিশ্চিন্ত মনে সরে পড়েছিল। মিঃ জাফরী এবং তার দলবল অনেক অনুসন্ধান চালিয়েও বনহুরকে খুঁজে পাননি।

এই সেই আস্তানা।

নূরী আর বনহুর যখন বাইরে এসে পৌঁছল তখন পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। বনের পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে পূর্ণিমার চাঁদ, পূর্ণচন্দ্রের জোছনার আলো বনভূমিতে সোনালী আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। একটা নির্মম স্নিগ্ধ হাওয়া সাদর সম্ভাষণ জানাল নূরী আর বনহুরকে। বনহুরের শরীরে

স্বাভাবিক ড্রেস। সাদা ধবধবে পাজামা আর পাঞ্জাবী। বড় সুন্দর লাগছিল ওকে। পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে বনহুর আর নূরী!

অদূরে পাহাড়িয়া নদী কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে।

বনহুর আর নূরী নদীতীরে এসে দাঁড়াল। নদীর উচ্ছল জলরাশির বুকে জোছনার রূপালী আলোর ছটা নেচে নেচে এগিয়ে চলেছে। কতগুলো পদ্মফুল দোল খাচ্ছে সেই রূপালী আলোর বন্যায়। অপূর্ব দৃশ্য!

বনহুর আর নূরী নদীর তীরে পঁড়িয়ে প্রাকৃতিক অপরূপ দৃশ্য তাকিয়ে দেখতে লাগল। মাথার ওপর, অনন্ত আকাশ। চারপাশে বৃক্ষরাজি। সামনে পাহাড়িয়া নদী।

নূরীর দক্ষিণ হাতখানা বনহুর হাতের মুঠোয় চেপে ধরল, তারপর আবেগভরা কণ্ঠে ডাকল-নূরী!

এমন করে বনহুর কোনদিন তাকে ডাকেনি। নূরীর মনে দোলা লাগল। নূরী ছো্টবেলা থেকে ওকে দেখে এসেছে; কিন্তু আজ যেন নতুন করে দেখতে পাচ্ছে। কি বলতে চায় সে তাকে? নূরী জবাব দেয়-বল?

নূরী, মেয়েরা সব পারে, না?

নূরী হেসে বলল-ভাত রাঁধা থেকে দস্যুবৃত্তি পর্যন্ত সব পারে।

তা বলছি না নূরী।

তবে কি?

নারী ছলনাময়ী—এ কথা সত্যি, না?

কেন, আমি কি তোমার সঙ্গে কোনরকম ছলনা করেছি? অভিমানে নূরীর কণ্ঠ ভরে ওঠে।

বনহুর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল—একমাত্র তুমিই সত্য নূরী। তোমার ভালবাসাই সত্য–

নূরী বনহুরের বুকে মাথা রেখে মধুর কণ্ঠে বলল-এত দিনে তোমার মনের কথা পেলাম হুর! তোমার অন্তরের কথা পেলাম!

বনহুর আর নূরী নদীতীরে কোমল দুর্বাঘাসের ওপর বসল। কতদিন পর আবার তারা এভাবে নদীতীরে বসার সুযোগ লাভ করল। বনহুর নূরীর চিবুক উচু করে ধরে বলল-নূরী, সেই গানটা এবার গাও, যে গানটা তুমি আগে গাইতে।

নূরীর মনে আনন্দের উৎস, বুনহুরকে এত আপন করে সে যেন কোনদিন পায়নি। যতই সে ওকে নিজের করে পেতে চেয়েছে ততই যেন বনহুর সরে গেছে দূরে, আরও দূরে। আজ নূরী গায় গান, অন্তরের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে গায়।

দূরীর গানের সুর শুধু বনহুরের মনেই দোলা জাগায় না, দোলা লাগে ঘন বনের শাখায়, দোলা লাগে জোছনাভরা পাহাড়িয়া নদীর উচ্ছল জলরাশির বুকে। দোলা জাগে প্রকৃতির বুকে।

বনহুর নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে নূরীর মুখের দিকে। নূরী বনহুরের হাতখানা তুলে নেয় নিজের হাতে।

০৭.

জটাজুটধারী দু'জন সন্ন্যাসী দ্রুত পাহাড়িয়া পথ ধরে গহন বনের দিকে এগুচ্ছে। শরীরে তাদের ভস্মমাখা। ললাটে চন্দনের তিলক। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।.দক্ষিণ হাতে লোহার চিমটা। দু'জনের কাঁধেই এক একটা ঝোলা। সামনের সন্ন্যাসীর হাতে ঝোলার মধ্যে মনিরার নয়নের মনি নূর।

নূরকে দুধের সঙ্গে সামান্য ঘুমের ঔষধ খাইয়ে দেয়া হয়েছে। তাই নূর ঝোলার মধ্যে অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

সন্ন্যাসীদ্বয় দ্রুত এগুচ্ছে।

পূর্ণিমা রাতের তৃতীয় প্রহরে তাদের মা কালিকা পূজা। প্রতি পূর্ণিমা রাতেই এই সন্ন্যাসীদ্বয় যেখান থেকে হোক একটি নরশিশু সংগ্রহ করে আনে। গহন বনের মধ্যে বাস করে এক কাপালিক সন্ন্যাসী। তার সামনেই হাজির করে ওরা সেই শিশুকে। কাপালিক ঐ শিশুকে কালীর চরণে সমর্পণ করে সিদ্ধিলাভ করে।

শিশুটিকে কালীদেবীর সামনে বলি দেয়া হয়, তারপর সেই রক্ত এক নিঃশ্বাসে পান করে কাপালিক। তখন তার সাধনা জয়যুক্ত হয়।

প্রতি মাসে যেখান থেকেই হোক একটি নিখুঁত শিশু তাদের চাই। এবং সে শিশুর শরীরে কোন সংকেতপূর্ণ চিহ্ন থাকতে হবে।

এই নর-রক্তপিপাসু কাপালিকের জন্য প্রতি মাসে পূর্ণিমা রাতে কালীপূজার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে এ ধরনের নিখুঁত এবং শরীরে কোনো সংকেত চিহ্নযুক্ত শিশু সংগ্রহ করে আনার জন্যই এই সন্ন্যাসীদ্বয় অহরহ ঘুরে বেড়ায়।

চুরি করে হোক, দস্যুতা করে হোক, অর্থ দিয়ে হোক, শিশু, তাদের চাই!

এবার বহু অনুসন্ধান করেও পূর্ণিমা রাতের কালী পূজার জন্য কোন শিশু সুগ্রহ করতে না পারায় সন্ন্যাসীদ্বয় বিফল মনে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ একটা লোকের কোলে নূরকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিল সন্ন্যাসীদ্বয়। তারপর ওর পিছু লেগেছিল, এবং নূরকে বহু টাকা দিয়ে কিনে নেয় ওরা।

অবিরাম গতিতে পথ চলছিল সন্ন্যাসীদ্বয়।

ঝিন্দ শহর থেকে বসুন্ধরা পর্বত, তারপর ভগগদিয়া নদীতীর, তারপর আরও কত বন-পাহাড়-জঙ্গল অতিক্রম করে সন্ন্যাসীদ্বয় এগিয়ে চলেছে।

মাঝে কয়েকদিন কেটে গেছে।

নূর জেগেছিল, একবার নয়, কয়েক দিনের মধ্যে অনেকবার আবার তাকে ঔষধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে।

অবোধ শিশু নূর জাগলেই কাঁদতে শুরু করে। মায়ের জন্য চারদিকে তাকায়, কথা সে বলতে শেখেনি এখনও। বয়স মাত্র আট-ন’ মাস হবে। শুধু মাকেই চিনেছিল সে।

ঘুমের ওষুধের গুণ নষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গেই জেগে ওঠে নূর। কাঁদতে শুরু করে, তখন নরপিশাচদ্বয় আবার তাকে কিছু দুধ খাইতে দেয়, সঙ্গে থাকে একটু ঘুমের ওষুধ। চতুর শয়তানদ্বয় লক্ষ্য রাখে, যেন শিশুর কোন ক্ষতি না হয় বা মরে না যায়। তাহলে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। কাপালিক বাবাজীর পূজা না

হলে তাদের গর্দান যাবে। কাজেই নূরের যেন কোন ক্ষতি না হয়, সেদিকে ছিল সন্ন্যাসীদ্বয়ের নিপুণ দৃষ্টি।

০৮.

এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশ।

বন, নদী, প্রান্তর, পাহাড়, পর্বত পেরিয়ে সন্ন্যাসীদ্বয় তাদের কাপালিকের আশ্রয়ে পৌঁছতে সক্ষম হল। আজ দোল পূর্ণিমা। নরশিশুর রক্তে কাপালিক তার কালীমায়ের চরণ রাঙা করবে।

সন্ধ্যা থেকে কাপালিকের সাধনা শুরু হয়েছে। সবাই নরবলি দিয়ে থাকে অমাবশ্যা রাতে, আর এই কাপালিক নরবলি দেয় পূর্ণিমা রাতে। তার কালীমায়ের নাকি নির্দেশ রয়েছে।

কাপালিকের যজ্ঞ শুরু হবার মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বে এই সন্ন্যাসীদ্বয় নূরকে নিয়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। বড়ই ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছে সন্ন্যাসীদ্বয়। এ ক'দিন অবিরাম পথ চলেছে তারা।

নূরকে দেখে কাপালিক খুশি হল।

কিছুক্ষণ পূর্বেই কাপালিকের চোখমুখ হতাশায় ভরে উঠেছিল। এবার বুঝি তার যজ্ঞ নষ্ট হয়ে যাবে! সন্ধ্যা আগতপ্রায়, তবু তো কোন শিশু নিয়ে। তার অনুচরদ্বয় ফিরে এলো না। এক্ষণে তার মনমত শিশু পেয়ে আনন্দে। কাপালিকের চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলে ওঠে। তার চেয়েও শুভ নিদর্শন শিশুর হাতে মঙ্গলজট রয়েছে। এবারের নরবলি মা কালী মনপ্রাণে গ্রহণ করবেন!

যজ্ঞ শুরু হয়েছে।

ভস্মমাখা কাপলিকের সামনে প্রকাণ্ড একটা অগ্নিকুণ্ড দপ দপ করে জ্বলছে। বেদীর ওপর জমকালো পাথরের তৈরি কালীমূর্তি। দক্ষিণ হাতে সুতীক্ষ্ণধার খর্গ, বাম হাতে নরমুন্ডু। অন্য দুটি হাতে শঙ্ক আর চক্র রয়েছে। লকলকে রক্তরাঙা একটি জিহ্বা। চোখ দুটি সোনার তৈরি। অগ্নিকুণ্ডের লেলিহান জিহ্বা। উজ্জ্বল আলোয় কালীর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

মাথায় জট, শরীরে বাঘের চামড়াপরা কাপালিক অদ্ভুত শব্দে মন্ত্র পাঠ করে চলেছে। বাঘের চামড়ার ওপর বসা রয়েছে সে।

সামনের বেদীর ওপর অন্য এক সন্ন্যাসী শিশু নূরকে কোলে করে বসে আছে। নূর দু'হাত নেড়ে খেলা করছে। অত্যন্ত নিদ্রার জন্য এখন তার চোখের ঘুম চলে গেছে। এখানে পৌঁছার পরই খুব কেঁদেছিল, সন্ন্যাসীদ্বয় জোর করে বেশ কিছুটা দুধ ওকে খাইয়ে দিয়েছে, তাই চুপচাপ খেলা করছে।

নুরের অপূর্ব সুন্দর নাদুস-নুদুস চেহারা দেখে কাপালিকেরই জিভে পানি এসে যাচ্ছিল। মা কালীর জিভে যে রস আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাপালিক খুশিতে ডগমগ হয়ে মন্ত্রপাঠ করছে।

রাত দ্বিপ্রহর তখন, যজ্ঞশেষে নূরকে কালী দেবীর চরণে বলি দেয়া হবে।

অগ্নিকুন্ডের উজ্জ্বল আলোতে গোটা বনভূমি আলোকিত হয়ে উঠেছে। আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে ধূপের গন্ধে। সে এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তখন সেখানে।

সন্ন্যাসীর কোলে নূর এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছে।

কচি হাতখানা ঝুলে পড়েছে একপাশে। মাথাটা কাৎ হয়ে সন্ন্যাসীর বুকে লেগে রয়েছে। স্বপ্নের ঘোরে নূর ফিক্ কি করে হাসছে। কখনও বা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নূরের কচি মুখখানা পবিত্র ফুলের মত সুন্দর লাগছে।

সন্ন্যাসী বাবাজী মন্ত্রপাঠ করে চলেছে।

০৯.

এ তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছ হুর? রাত কত হল জান, চল এবার ফেরা যাক।

তাজের পিঠে বসে নূরী আর বনহুর ছুটে চলেছে অজানার পথে। নূরী বনহুরের দক্ষিণ হাতের ওপর হাত রেখে কথাটা বলল।

বনহুরের দক্ষিণ হাতে তখন তাজের লাগাম ধরা রয়েছে; বাঁ হাতে নূরীকে ধরে রেখেছে সে।

জোছনাভরা পৃথিবী।

বনহুর আর নূরীর মধ্যে নদীতীরে বসে বসে গল্প হচ্ছিল। বনহুর বলছিলচল নূরী দূরে-অনেক দূরে কোথাও যাই।

নূরী বলেছিল-কোথায় যাবে হুর?

যেদিকে দু'চোখ যায় চল সেইদিকে যাই।

বনহুরের প্রস্তাবে নূরী অমত করতে পারেনি।

তাজের পিঠে বনহুর আর নূরী উঠে বসেছিল। জোছনাভরা রাত। আলোর বন্যায় বসুন্ধরা যেন স্নান করে চলেছে।

বনহুর আর নূরী তাজের পিঠে ছুটে চলেছে! রাত বেড়ে আসছে সেদিক খেয়াল নেই কারও। হঠাৎ বলে উঠল নূরী হুর, এখন রাত গভীর, চল ফেরা যাক।

উঁহু, আজ আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না নূরী।

আমারও না। তবে আর কত দূর যাবে শুনি?

যতদূর মন চায়।

বেশ চল।

আজ মনিবের আনন্দে অশ্ব তাজও যেন আত্মহারা। দিশেহারা ভাবে সেও এগুচ্ছে। কোন বাধাবিঘ্নই আজ তাজের পথ রোধ করতে সক্ষম হচ্ছে না।

প্রান্তর ছাড়িয়ে এবার এক নতুন বনে প্রবেশ করল বনহুরের অশ্ব। নূরী বলল-অজানা অচেনা এক বনে এত রাতে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না হুর।

কেন, ভয় হচ্ছে তোমার?

না, তুমি তো জান, আমার হুর পাশে থাকলে আমি যমকেও ভয় করি না।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর বলে উঠল নূরী, দেখ বনের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যাচ্ছে।

বিস্ময়ভরা চোখে তাকাল নূরী–দূরে, অনেক দূরে গভীর বনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে জ্বলন্ত আগুনের শিখা। নূরী বলল—চল হুর। আর যেয়ে কাজ নেই।

কিন্তু ওখানে অমন আগুন জ্বলছে কেন?

হয়তো কোন শিকারীর দল শিকার করতে এসে বনের মধ্যে রাত হয়ে যাওয়ায় আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে নিজেদের হিংস্র জন্তুর কবল থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে।

তাও হতে পারে কিংবা কোন… যাক, চল দেখে আসি আসল ব্যাপারটা কি!

আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে, যদি শিকারীদল না হয়ে অন্য কোন দস্যুদল হয়?

মোকাবিলা হবে।

তুমি যে নিরস্ত্র?

ততক্ষণে বনহুরের অশ্ব অগ্নিকুন্ড লক্ষ্য করে দ্রুত এগুতে শুরু করেছে।

বনহুর আর নূরী যতই এগুচ্ছে ততই অগ্নিকুণ্ড স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

এবার বনহুর অশ্বের গতি কমিয়ে নিল।

কারণ সে জানতে চায় কিসের আগুন ওটা, কে বা কারা রয়েছে সেখানে? অশ্বপৃষ্ঠ থেকেই এবার লক্ষ্য করল অগ্নিকুণ্ডের পাশে একজন জটাজুটধারী বসে আছে। আর দু’জন দাঁড়িয়ে, কি যেন করছে ওরা।

হঠাৎ নূরী তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল—হুর দেখ, দেখ, একটা ছোট্ট শিশুকে একজন উবু করে ধরে আছে।

চমকে উঠল বনহুর, এতক্ষণ সে তা লক্ষ্যই করেনি। ওপাশে এক সন্ন্যাসী একটি শিশুকে উবু করে ধরে রয়েছে। আর এক জন একটা খর্গ তুলে ধরেছে। হয়তো এক্ষুণি শিশুটাকে হত্যা করা হবে! যে সন্ন্যাসী মন্ত্রপাঠ করছে তার সামনে বেদীর ওপর একটা জমকালো কালিমূর্তি।

বনহুর মুহূর্তে বুঝে নিল ব্যাপারটা, সে নূরীকে লক্ষ্য করে বলল-নূরী, তুমি এখানে থাক। তারপর অশ্ব থেকে নেমে দ্রুত অগ্নিকুণ্ডের নিকটে অগ্রসর হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল খর্গধারী সন্ন্যাসীটার ওপর।

অচমকা আক্রমণে খর্গধারী উবু হয়ে পড়ে মাটিতে। ছিটকে পড়ল ওর হাতের খর্গ।

বনহর খর্গধারীর বুকে চেপে বসল।

সঙ্গে সঙ্গে কাপালিকের মন্ত্র থেমে গেল, চট করে উঠে কুড়িয়ে নিল ভূপা৩৩ খর্গখানা, ঝাপিয়ে পড়লো বনহুরের ওপর।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর লাফিয়ে সরে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে কাপালিকের হাতের সুতীক্ষ্ণধার খর্গ বিদ্ধ হলো ভূপতিত সন্ন্যাসীর মাথায়। দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল সন্ন্যাসীর মাথাটা। রক্তের বন্যা ছুটলো, টু শব্দ করার মত সময় পেল না সে।

প্রথম সন্ন্যাসীর মৃত্যুতে দ্বিতীয় সন্ন্যাসী নূরকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে পালাতে যাচ্ছিল, বনহুর তাকে ধরে ফেলল, তারপর প্রচণ্ড এক ঘুষিতে ধরাশায়ী করল।

কাপালিক তার অনুচরটির রক্তাক্ত দ্বিখণ্ডিত মাথাটার দিকে তাকিয়ে একটু হকচকিয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর বেদীর ওপর উঠে। কালীমূর্তির হাত থেকে ধারালো খর্গটা তুলে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশালদেহী কাপালিকের ওপর।

সে কি ভীষণ ধস্তাধস্তি!

রক্তপিপাসু কাপালিকের শরীরে কি অসীম শক্তি। বনহুর তাকে সহজে কাবু করতে সক্ষম হচ্ছে না। কাপালিকের হাতে পূর্বের খড়গটা রয়েছে। কাপালিক

আঘাত করছে বনহুর, তার খড়গ দ্বারা প্রতিরোধ করে চলেছে। বনহুরের আঘাতও অতি কৌশলে প্রতিরোধ করছে কাপালিক!

ওদিকে নূর মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। মুখটা তার কাপড় দিয়ে বাঁধা কাঁদবার শক্তি নেই।

অপর সন্ন্যাসী এই সুযোগে পুনরায় সরে পড়ার চেষ্টা করতেই নূরী তার খোপা থেকে বিষযুক্ত সুতীক্ষ্ণধার ক্ষুদ্র ছোরাখানা তুলে নিয়ে লোকটাকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারল।

নূরীর লক্ষ্য অব্যর্থ, ক্ষুদ্র ছোরাখানা আমূল বিদ্ধ হল পলাতক সন্ন্যাসীর পিঠে। একটা তীব্র আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল সন্ন্যাসীটি। কিছুক্ষণ যন্ত্রণায় ছটফট করে স্থির হয়ে গেল তার দেহটা।

নূরী নিজেকে রক্ষার জন্য সদাসর্বদা একটি বিষযুক্ত তীক্ষ্ণধার ছোরা রাখে নিজের খোপায় গুঁজে। বিপদে পড়লে সে ওটা ব্যবহার করে। আজ নূরীর বিষযুক্ত ছোরাখানা খুব কাজে লাগল।

যতই শক্তিশালী লোকই হোক না কেন, দস্যু বনহুরের কাছে পরাজয় বরণ না করে উপায় নেই। নররক্তপিপাসু কাপালিক বনহুরের হাত থেকে বেশিক্ষণ নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হল না। বনহুরের হাতের খড়গ তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল।

বিরাট জটাজুটভরা মাথাটা কাপালিকের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ল দূরে। রক্তে রাঙা হয়ে গেল বনভূমি।

অগ্নিকুন্ডটা তখনও দপ দপ করে জ্বলছে।

শক্তিশালী কাপালিকের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে বনহুর অত্যন্ত হাঁপিয়ে পড়েছিল। সাদা পাঞ্জাবীটা ঘামে ভিজে চুপসে উঠেছে। স্থানে স্থানে ছিড়ে ঝুলে পড়েছে। কোথাও বা রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। পাজামার অবস্থাও তাই। বনহুর বাঁ হাতে ললাটের ঘাম মুছে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বনহুরের নিঃশ্বাস তখনও দ্রুত বইছে। চোখ দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে।

নূরী অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে ছুটে এসে বুকে তুলে নিল নূরকে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল বনহুরের পাশে-হুর, শিগগির এর মুখের বাঁধন খুলে দাও।

বনহুর তার হাতের সুতীক্ষ্ণধার খড়গ ছুড়ে ফেলে দিল দূরে। তারপর দ্রুতহস্তে শিশুর মুখের বাঁধন খুলে দিল।

মুখের বাঁধন মুক্ত হওয়ায় চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল শিশু নূর।

অগ্নিকুন্ডের উজ্জ্বল আলোতে বনহুর আর নূরী শিশুর অপরূপ সুন্দর চেহারা দেখে মুগ্ধ হল। নূরী বুকে আঁকড়ে ধরে সস্নেহে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বলল-দেখ, দেখকি সুন্দর শিশুটি।

যদিও বনহুরের শরীর-মন দুই ক্লান্ত তবু নূরের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা অভূতপূর্ব অনুভূতি জাগল তার মনে, বড় মায়া হলো। শিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল-ভাগ্যিস ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলাম নূরী, তাই রক্ষে। নইলে এতক্ষণ এর দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত..যেমন ঐ পাপিষ্ঠ কাপালিক সন্ন্যাসীর মাথা দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। বনহুর তাকাল সন্ন্যাসীদের মৃতদেহের দিকে।

নূরী বলল—এ কারণেই বুঝি তোমার মন আজ এখানে টেনে নিয়ে এসেছিল?

সত্যি নূরী, অদ্ভুত এ ব্যাপার। জানি না একি কাণ্ড, আজ কেন আমার মন আমাকে এভাবে গহন বনের মধ্যে এই স্থানে টেনে আনল!

নূরী শিশুটাকে বুকে চেপে ধরে বললসবই খোদার লীলা!

শিশু নুর তখন নূরীর বুকে মুখ লুকিয়ে শান্ত হয়ে এসেছে। ভাবছে। এতক্ষণে সে তার মাকে ফিরে পেয়েছে।

বনহুর আর নূরী ফিরে চলল।

নূরীর কোলে শিশু।

বনহুর এবার সংযতভাবে অশ্ব চালনা করছে।

পেছনে পড়ে রইলো বটবৃক্ষতলে পাষাণ প্রতিমা কালী দেবীর জমকালো মূর্তি। তার পদতলে তিনটি সন্ন্যাসীর রক্তমাখা দেহ রক্তপিপাসু মা কালী দেবী আজ

শিশুর রক্ত পান না করে করলো তার ভক্তদের রক্তপান!

.

এদিকে নূরকে যখন বলির জন্য প্রস্তুত করে নেয়া হচ্ছিল ঠিক তখন ঝিন্দ শহরের একটি গোপন কক্ষে বন্দিনী মনিরা পিঞ্জিরাবদ্ধ পাখির মত ছটফট করছিল। মায়ের মনে একটা ভীষণ আলোড়ন শুরু হয়েছিল। কেন যেন মনের মধ্যে ভীষণ চঞ্চলতা দেখা দিয়েছিল। বার বার নূরের কচি মুখখানা ভেসে উঠছিল তার মানসপটে। মনিরা কি করবে, কি করে মনকে শান্ত করবে, তাই খোদার কাছে তুলে দোয়া চাইতে বসেছিল, হে দয়াময়, আমার নূরকে তুমি রক্ষা কর। তুমি ছাড়া ওকে দেখার কেউ নেই। হে করুণাময়, তুমি আমার নূরকে বাঁচিয়ে নিও...।

মনিরা যখন সন্তানের মঙ্গল কামনায় খোদার কাছে করুণা ভিক্ষা। করছিল তখন নদীতীরে নূরীর পাশে বসে বনহুরে মন উতলা হয়ে উঠছিল। বসে থাকতে মোটেই ভাল লাগছিল না। তাই নূরীকে নিয়ে তাজের পিঠে বসেছিল। একটা অজানিত টানে ছুটে চলছিল বনহুর কোন অজানার পথে।

গহন বনে কাপালিক সন্ন্যাসীর কোলে বলির জন্য অসহায় নূর। খড়গহস্তে দণ্ডায়মান সন্ন্যাসী। মন্ত্রপাঠরত রক্তপিপাসু কাপালিক। সামনে জমকালো কালীমূর্তি, লকলকে জিহ্বা প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে।

অশ্বপৃষ্ঠে ছুটে আসছে বনহুর আর নূরী।

বদ্ধকক্ষে অশ্রুসিক্ত নয়নে দু'হাত তুলে দোয়া করছিল মনিরা।

সবকিছুর সঙ্গে একটা অদ্ভুত সংযোগ ছিল। অপূর্ব সে যোগাযোগ। কখন যে, মনিরা জায়নামাযের ওপর ঢলে পড়েছে খেয়াল নেই। ঘুম ভাঙতেই সূর্যের আলো তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাল পাশের ক্ষুদ্র জানালাটা দিয়ে। ভোরের সূর্যের এক টুকরা আলো এসে পড়ছিল তার মুখে। মনিরা হৃদয়ে যেন একটা শান্তি অনুভব করল।

মনিরা জায়নামায থেকে উঠে দাঁড়াল। আজ যেন মনটা তার অনেক শান্ত হয়ে এসেছে। ক্ষুদ্র জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। ওখান থেকে আকাশের যতটুকু

দেখা যায় প্রাণভরে তাই দেখতে লাগল। ঐ আকাশের তলায় কোথাও রয়েছে তার নূর।

মনিরা যখন ক্ষুদ্র জানালায় দাঁড়িয়ে নূরের কথা ভাবছে, তখন নূরকে নিয়ে বনহুর আর নূরী মেতে উঠেছে।

শিশু নূরকে কোলে করে বনহুরের শয্যার পাশে এসে দাঁড়াল নূরী, হেসে বলল-দেখ হুর কে এসেছে!

হাই তুলে গা মোড়া দিয়ে চোখ মেলে তাকাল বনহুর–কে?

নূরী হেসে বলল-মনি।

মুহূর্তে বনহুরের মুখমণ্ডল গম্ভীর থমথমে হয়ে পড়ল, মুখ ফিরিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। মুনি তার মনিরাকেও সে মনি বলে ডাকত। একটা। ঘৃণা তার সে নামকে চিরতরে বিষাক্ত করে দিয়েছে। মনিরা ব্যভিচারিণী,, ভ্রষ্টা, অন্যের সন্তান তার পেটে জন্মগ্রহণ করেছে। মনিরা তাই চিরদিনের জন্য মুছে গেছে তার মন থেকে....

নূরী হেসে বলল-কি হলো হুর? অমন গম্ভীর হয়ে পড়লে কেন? এ নামটা তোমার পছন্দ হলো, না বুঝি?

বনহুর এবার মুখ তুলে তাকাল নূরীর দিকে। দিনের আলোয় স্পষ্টভাবে এই প্রথম সে দেখল নূরকে। বড় ভাল লাগল ওকে। হাত বাড়িয়ে নূরের হাতখানা ধরে মৃদু নাড়া দিয়ে বলল-না জানি কার সন্তান, কে ওর বাবামা। নূরী, কেন মায়া বাড়চ্ছে?

সেকি হুর, তুমি একি বলছ! যারাই ওর বাবা-মা তোক আমরা তো; আর চুরি করতে যাইনি বা কেড়েও আনিনি। নিয়তির চক্রে যখন ও আমাদের হাতে এসে পড়েছে তখন বুকে তুলে নেব না? তুমি যাই বলো হুর, মনিকে আমি আর কাউকে দেবো না।

বনহুর এবার রাগত কণ্ঠে বলে উঠলমনিমনি—ঐ নাম ছাড়া আর নাম নেই?

কেন এ নাম তোমার এত অপছন্দ? আমার কিন্তু এ নামটা বড় ভাল লাগছে।

বেশ রাখ! গম্ভীর কণ্ঠে বলল বনহুর।

তাই রাখলাম। বলল নূরী।

.

নূরের নাম বদলে গেল—নাম হলো মনি। নূরীর নয়নের মনি।

মনিকে পেয়ে নূরী আনন্দে আত্মহারা। সদা-সর্বদা ওকে নিয়েই মেতে থাকে সে। নাওয়া, খাওয়া, গোসল করানো, বুকে নিয়ে ঘুম ঘুমপাড়ান যতকিছু সব করে নূরী। মনিকে ছাড়া নূরীর যেন এক মুহূর্ত আর চলে না।

মনিকে পেয়ে বনহুর যে খুশি হয়নি তা নয়। তাদের নীরস জীবনে মনি যেন একটা নতুন আস্বাদ এনে দিয়েছে।

সেদিন নূরী মনিকে নিয়ে আনন্দে মেতে ছিল। কাজল পরিয়ে দুধ খাইয়ে কোলে নিয়ে দোল দিচ্ছিল। এমন সময় বনহুর এসে হাজির হয়। নূরীর কক্ষে। মৃদু হেসে বলল—নূরী, মনিকে পেয়ে তুমি দেখছি আমাকে একেবারে ভুলে গেছ?

নূরী মনির মুখে ছোট্ট একটি চুমু দিয়ে দোলনায় শুইয়ে রেখে এগিয়ে এলো বনহুরের পাশে, দু'হাত বাড়িয়ে বনহুরের গলা জড়িয়ে ধরে বলল–রাগ করেছ হুর? মনিকে পেয়ে তোমাকে আমি ভুলে যাব–কি যে বলো–তবে ওর জন্য সত্যিই বড় মায়া হয়, ওর তো বাবা-মা কেউ নেই এখানে।

নূরীর চিবুকে মৃদু টোকা দিয়ে বলল বনহুর–তাই তুমিই মা বনে গেছ, না?

হ্যাঁ, তাতে দোষ কি, মেয়েরাই তো মা হয়।

হাসে নূরী, হাসে বনহুর। দোলনায় শুয়ে হাসে মনি, দু'হাত মুখের মধ্যে গুঁজে দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে মা, স্মা, স্মা!..

নূরী বনহুরের গলা ছেড়ে দিয়ে ছুটে যায় দোলনার পাশে, দু'হাত বাড়িয়ে তুলে নেয় বুকে, চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয় রাঙা টুকটুকে ঠোঁট দু'খানা।

এমন সময় রহমান এসে দাঁড়ায় সেখানে।

বনহুর বলে–কি খবর রহমান?

কয়েকটা কথা আছে আপনার সঙ্গে।

কথা! বেশ চল। একবার নূরী আর মনির মুখের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যায় বনহুর।

রহমানও একবার অলক্ষ্যে নূরী আর মনিকে দেখে নেয়। নূরীর হাসিখুশিভরা সুস্থ জীবন রহমানের মনে আনন্দ দান করে। নূরীকে রহমান প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তাই ওর মঙ্গলই সে চায়। মনির জন্য নূরীর নির্দেশমত সে শহর থেকে অনেক কিছু এনে দিয়েছে। দোলনা, খেলনা, দুধ খাবার বোতল, চুষনী অনেক কিছু। নূরীর মুখে হাসি দেখলে রহমানের বুক খুশিতে ভরে উঠে। প্রাণে সে শান্তি পায়।

নূরী আর মনিকে দেখে নিয়ে বনহুরের পেছনে পেছনে সেও বেরিয়ে যায়।

.

সর্দার, সবাই জানে, এই নারীহরণ ব্যাপারটা আপনারই কাজ। কিন্তু আমি কথাটা শুনেও এত দিন নিশ্চুপ রয়েছি, আপনার মনের অবস্থা বুঝে বলিনি। এখন আর চুপ থাকতে পারলাম না, কারণ শুধু আপনার বদনামই নয়, এটা দেশ ও দশের এক মস্ত বিপদজনক ব্যাপার।

বনহুর নীরবে রহমানের কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল, এবার একটা শব্দ করল—হুঁ।

রহমান বলে চলেছে-সর্দার, শহরে আজকাল নারীহরণ–আর ছেলেমেয়ে চুরির যে হিড়িক পড়ে গেছে, এসব নারী এবং ছেলেমেয়ে যাচ্ছে কোথায়?

বনহুর সোজা হয়ে বসে বলল—এটা গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয়। রহমান, তুমি আজই আমার অনুচরগণকে শহরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দাও। যেন শিগগিরই এর সন্ধান সংগ্রহ করে আমাকে জানায়।

আমি এখনই এর ব্যবস্থা করছি সর্দার।

হ্যাঁ, তাই কর।

এতদিন শুধু আপনার আদেশের প্রতীক্ষায়ই ছিলাম। আজ থেকেই আমরা কাজে নেমে পড়ব।

আর শোন।

বলুন সর্দার।

অনেক দিন চৌধুরী বাড়ি যাইনি, যাবার সুযোগ হয়নি। আমার মায়ের কাছে যেতে চাই।

খুব ভাল কথা সর্দার, আমি তাজকে প্রস্তুত করব?

হ্যাঁ, আজ রাতেই যাব মায়ের কাছে–বনহুর উঠে দাঁড়াল।

রহমান তার পেছনে দাঁড়িয়ে রইল।

.

বিরাট বাড়িখানায় শুধুমাত্র একাকিনী মরিয়ম বেগম। ঝি-চাকর যদিও অনেক রয়েছে কিন্তু তবু মরিয়ম বেগম নিজেকে সব সময় অসহায় নিঃসঙ্গ মনে করেন। বৃদ্ধ, সরকার সাহেব রয়েছেন বলেই তিনি আজও বেঁচে আছেন। অসুখে ডাক্তার ডাকেন, সেবা-যত্নের জন্য নার্সের ব্যবস্থা করেন। পথ্যা-পথ্যের সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, চিন্তার সময় সান্ত্বনা দেন।

কিন্তু তিনি পুরুষ মানুষ, কতক্ষণ বিবি সাহেবার পাশে পাশে থাকতে পারেন। সংসারের নানা কাজে তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। বিরাট সংসারে কত ঝামেলা সহ্য করে তবেই না চৌধুরী সাহেবের বিষয়-আশয় সবকিছু ঠিক রেখেছেন সরকার সাহেব।

রাজ প্রাসাদের মত বাড়ি, গাড়ি, ঐশ্বর্য, দাস-দাসী কোন কিছুর অভাব নেই মরিয়ম বেগমের, শুধু অভাব সন্তান-সন্ততির। একমাত্র পুত্রকে। হারানোর পর মনিরাকে পেয়ে কতকটা সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু সেই মনিরাকেও যখন হারিয়ে ফেললেন তখন তার আপন বলে কিছুই রইলো না। সংসার অসহনীয় হয়ে উঠলো তাঁর কাছে। কোনরকমে স্বামী-শোক সহ্য করে চলেছিলেন, মনিরাকে বুকে নিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছিলেন—সেই মনিরাও আজ নেই।

শোকবিহ্বলা মরিয়ম বেগম দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছিলেন। একমাত্র সন্তানকে বহুদিন পূর্বে হারানোর পর ভুলেই এসেছিলেন তার কথা, আবার সেই হারানো রত্ন ফিরে পেয়ে হারানোর ব্যথা আরও গভীরভাবে মরিময় বেগমকে বিচলিত করে তুলেছিল। বেশ ছিলেন তিনি। মনির মরে গেছে, আর তো ফিরবে না। কিন্তু সেই মনিরকে আবার কেন পেলেন, আর পেলেনই যদি তবে তাকে স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে না পেয়ে পেলেন অস্বাভাবিকরূপে। যার জন্য সদা ভয় না জানি কখন কোন মুহূর্তে তার জীবন বিনষ্ট হতে পারে। আজ কতদিন তাকে দেখেননি, তার সন্ধান জানেন, মরে গেছে না বেঁচে আছে তাও তিনি জানেন না। মায়ের প্রাণ তো, অহরহ সদা ঐ চিন্তা-তার মনির এখন কোথায়, কেমন আছে।

সারাটা দিন তবু কেটে যায় নানা কাজ আর ঝি-চাকরের সঙ্গে, রাতে আর সময় কাটতে চায় না। বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে চোখের ঘুম কোথায় যে পালিয়ে যায় মরিয়ম বেগম নিজেই বুঝতে পারেন না।

সারাটা রাত ছটফট করে কাটে তার। সারা জীবনের নানা কথা ভেসে ওঠে একটার পর একটা করে মনের আকাশে। কত সুখ-দুঃখে ভরা দিন আর রাতের স্মৃতি—স্বামী-সংসার, পুত্রের কথা–মনিরার কথা।

সেদিন অনেক রাতেও যখন চোখে ঘুম এলো না, তখন মরিয়ম বেগম বালিশটা সরিয়ে রেখে উঠে বসলেন। আজ তাঁর বারবার মনে পড়ছে পুত্রের মুখখানা। মরিয়ম বেগম দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, ইলেকট্রিক লাইটের উজ্জ্বল আলোতে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন তাঁর হৃদয়ের ধন, নয়নের মণি মনিরকে।

চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল ফেঁটা ফোঁটা অশ্রু। বুকের মধ্যে অসহ্য, একটা ব্যথা গুমড়ে উঠল তাঁর। নীরবে, অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন তিনি।

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করল বনহুর। গভীর রাতে মাকে তার ছবির পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়। বুঝতে পারে তার মায়ের মনের ব্যথা। অস্ফুট কণ্ঠে ডেকে উঠল বনহুর-মা!

মরিয়ম বেগম চমকে ফিরে তাকালেন।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর ছুটে এসে কচি শিশুর মত মায়ের বুকে ঝাপিয়ে পড়ল–মা, মাগো!

গভীর আবেগে মরিয়ম বেগম পুত্রকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরলেন। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল, বনহুরের মাথায়। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন মরিয়ম-ওরে নিষ্ঠুর, কোথায় লুকিয়েছিলি এতদিন, একটিবার কি মায়ের কথা স্মরণ হয়নি তোর?

মা, আমি তোমার হতভাগ্য সন্তান। আমি তোমার নরাধম সন্তান। আমাকে তুমি অভিসম্পাত দাও মা। আমাকে তুমি অভিসম্পাত দাও।

এ তুই কি বলছিস? তোকে আমি অভিসম্পাত দেব!

মা, তোমার মত মায়ের সেবা আমি করতে পারি না, একি আমার কম দুঃখ! এর চেয়ে আমার মৃত্যু অনেক ভাল।

মরিয়ম বেগম পুত্রের মুখে হতচাপা দেন-ওকি কথা বলছিস! আর কোন সময় বলবি না! ওরে, আমি তবে কি নিয়ে বেঁচে থাকব। কেঁদে ফেলেন মরিয়ম বেগম।

বনহুর মাকে সঙ্গে করে খাটের ওপর এসে বসে পড়ল, নিজের রুমালে মায়ের চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বলল কেঁদো না মা। তুমি কেঁদ না! তোমার সন্তান চিরদিন তোমার পাশে বেঁচে থাকবে। বললা মা, কেমন ছিলে?

না-মরে বেঁচে আছি বাবা!

ছিঃ ও কথা বলতে নেই মা!

ওরে তুই বুঝবি না আমার হৃদয়ে কি জ্বালা! কই, মনিরার কথা বললি তো? সে কোথায় আছে, কেমন আছে?

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে পড়ল বনহুরের মুখমণ্ডল! কুঞ্চিত করে মুখ ফিরিয়ে নিল।

মরিয়ম বেগম বললেন—কি, অমন চুপ করে রইলি কেন?

তোমার মনিরা মরে গেছে মা।

মরে গেছে। আমার মনিরা বেঁচে নেই? বলিস কি মনির? আকস্মিক শোকে অধীর হয়ে খাট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন মরিয়ম বেগম—মনির! মনির! এ তুই কি বলছিস!

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলল মরে না গেলেও সে মরে যাবার মতই। লোক সমাজে তার স্থান নেই।

সে কি, কি বলছিস বাবা? আমি বুঝতে পারছি না তোর কথা?

মনিরাকে তুমি পুত্রবধু করে ভুল করেছিলে মা।

কেন, কি হয়েছে মুনির?

আজ আর জানতে চেও না মা। তোমার এবার কি প্রয়োজন বল?

আগে বল আমার মা মনিরা কোথায়? কি হয়েছে তার? কেমন আছে সে?

মা, এতটুকু জেনে রাখ, তোমার মনিরা পৃথিবীর বুকে বেঁচে আছে।

তবে তাকে নিয়ে এলি না কেন?

এ প্রশ্ন করলে আমি আর আসব না।

আসবি না! মনিরার কথা জিজ্ঞেস করলে আর আসবি না। বেশ, আমি চুপ রইলাম। বুঝেছি তোদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে।

বনহুরও নিশ্চুপ রইল।

মরিয়ম বেগম বনহুরের মাথায়-পিঠে আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, কতদিন পর পুত্রকে আজ তিনি পাশে পেয়েছেন।

মা-ছেলে অনেক কথা হল অনেক রাত ধরে।

তারপর এক সময় বিদায় গ্রহণ করল বনহুর।

আজ মরিয়ম বেগম হৃদয়ে অনেকটা সান্ত্বনা পেলেন। একটা দুশ্চিন্তা অহরহ মনের মধ্যে গুমড়ে কেঁদে মরছিল, সেটা আর রইলো না! শুধু এখন চিন্তা মনিরার জন্য।

•

বনহুর মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে তাজের পিঠে চেপে বসল। বহুদিন পর শহরের রাস্তায় আবার ধ্বনিত হলো সেই অশ্বপদ শব্দ খট্ খট্ খট্.....

জমকালো পোশাক পরে বনহুর তাজের পিঠে ছুটে চলেছে। দু'একজন নাগরিকের কানে এসে পৌঁছল তাজের খুরের শব্দ। কেউ কেউ দেখে ফেলল

অন্ধকার রাস্তার বুকে জমকালো অশ্বপৃষ্ঠে কালো একমূর্তি।

পরদিন পত্রিকায় বড় বড় হেডিং এ প্রকাশ পেল "দস্যু বনহুরের পুনঃ আবির্ভাব।"

কথাটা অল্পক্ষণেই মধ্যেই গোটা শহরে প্রচার হয়ে গেল। প্রতিটি নাগরিকের ঘরে পৌঁছে গেল সংবাদটা। পুলিশ অফিসে বসে পত্রিকা পড়লেন পুলিশ অফিসারগণ। দোকানে, পথে, ঘাটে, মাঠে আবার সেই কথা বনহুরের পুনরায় আবির্ভাব ঘটেছে। ধনবানদের হৃদয় উঠল কেঁপে। দুষ্ট নাগরিকদের মনে জাগল আশঙ্কা।

নগরবাসী নারীহরণ এবং শিশুচুরি ব্যাপার নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। সকলের মুখেই ঐ কথা, যুবতী মেয়ে হরণ-এটা আর কারও নয়, দস্যু বনহুরের কাজ। এবার দস্যু বনহুরের পুনঃ আবির্ভাবে সন্দেহটা একেবারে বদ্ধমূল হলো। নারীহরণ করেও বনহুরের তৃপ্তি হচ্ছে না, সৈ আবার নাগরিকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে।

বিশিষ্ট ধনবান ব্যক্তি যাদের প্রচুর অর্থ রয়েছে তারা পুলিশের সাহায্য চেয়ে বললেন। যাতে তাদের ধনসম্পদ দস্যু বনহুরের কবল থেকে রক্ষা পায়, এটাই তাদের একমাত্র কামনা।

আজকাল যুবতী নারীরা সন্ধ্যার পর বাড়ি ছেড়ে আর বাইরে তো যায়ই, অন্দরমহলেও সদা আশঙ্কা নিয়ে বাস করে।

পুলিশ অফিসে বসে মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন সেদিনের পত্রিকা দেখছিলেন। দস্যু বনহুরের পুনঃ আবির্ভাব শুধু নগরবাসীর মনে আশঙ্কা সৃষ্টি করেনি, পুলিশমহলেও একটা আলোড়ন, জেগেছে।

মিঃ হারুন বলেন-ব্যপারটা যত সহজই মনে করুন না কেন, আসলে তা নয়। এখনই একবার মিঃ জাফরীর নিকট গিয়ে পরামর্শ করা প্রয়োজন। শহরের মধ্যে যখন দস্যু বনহুরকে সশরীরে দেখা গেছে তখন নিশ্চয়ই সে শুধু শুধু আসেনি, কোন উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছে।

মিঃ হারুনের কথায় বললেন মিঃ হোসেন-মিঃ জাফরীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হওয়া একান্ত দরকার।

তখনই মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

মিঃ জাফরীর ওখানে পৌঁছে দেখলেন শহরের ধনকুবের হাবসী মিয়া বসে আছেন। তার সঙ্গে মিঃ জাফরীর কোন গোপন কথাবার্তা চলছে।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন পৌঁছতেই হাবসী মিয়া একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন।

মিঃ জাফরী হেসে বললেন-আপনি নিঃসন্দেহে কথাবার্তা বলুন, এরা আমাদের পুলিশের লোক।

অবশ্য মিঃ হারুন এবং হোসেনের শরীরে তখন সাধারণ ড্রেস ছিল।

মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেনের সঙ্গে হাবসী মিয়ার পরিচয় করিয়ে দিলেন মিঃ জাফরী।

হাবসী মিয়ার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি কিংবা কিছু বেশিও হতে পারে। জাতিতে তিনি কাফ্রি। তিনি কাঠের ব্যবসা করে এদেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। অনেক টাকা-পয়সা করে ফেলেছেন। আফ্রিকা থেকে তিনি প্রচুর কাঠ নিয়ে আসেন এবং বিভিন্ন দেশে চালান দিয়ে থাকেন।

হাবসী মিয়া আগে থেকেই দস্যু বনহুরের নামে আতঙ্কগ্রস্ত থাকতেন, এক্ষণে দস্যু বনহুরের পুনঃ আবির্ভাবে ভড়কে গেছেন। সর্বদা তাঁর ভয়, না জানি কোন্ সময় দস্যু বনহুর তার ওপর হামলা করে বসবে। তাই গোপনে তিনি মিঃ জাফরীর নিকটে সাহায্য চাইতে এসেছেন।

মিঃ জাফরীর সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা চলার পর বিদায় গ্রহণ করলেন হাবসী মিয়া।

হাবসী মিয়া বিদায় গ্রহণ করার পর মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন মিঃ জাফরীর সামনে জেকে বসলেন।

মিঃ জাফরী বলেনজানি আপনারা কেন.এসেছেন। কিন্তু আপনারা জানেন কি ইনি কে?

মিঃ হারুন বললেন-ইনি কে সে পরিচয় তো আপনিই দিয়েছেন স্যার।

না, এটাই এর আসল পরিচয় নয় মিঃ হারুন।

তবে?

ইনি কে পরে জানতে পারবেন। তবে এঁকে ভালভাবে চিনে রেখেছেন তো?

হ্যাঁ স্যার, রেখেছি।

মিঃ জাফরী বলেন—ইনি কাঠের ব্যবসার নামে এখানে কোন চোরা কারবার শুরু করেছেন এবং এর সঙ্গেই যোগাযোগ রয়েছে দস্যু বনহুরের।

তাই নাকি স্যার? বললেন মিঃ হোসেন।

মিঃ জাফরী একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বললেন–লোকটা নিখুঁত অভিনয় করতে পারে।

মিঃ হারুন বললেন-লোকটা নাকি এদেশে অনেক দিন থেকে ব্যবসা করছে, সে এতদিন পুলিশের সাহায্য কামনা করল না, অথচ আজ....

এটাই তো দস্যু বনহুরের একটা চালাকি!

তাহলে হাবসী মিয়া দস্যু বনহুরের লোক?

এতে কোন সন্দেহ নে। ওর কথাবার্তায় সেই রকমই আমার সন্দেহ হয়েছে। তাহলে ওকে আমাদের এরেস্ট করা উচিত ছিল; বললেন–মিঃ হোসেন।

মিঃ হারুনই মিঃ হোসেনের কথার জবাব দিলেন, বললেন যতক্ষণ উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া যায় ততক্ষণ কাউকে এরেস্ট করা সম্ভব নয় মিঃ হোসেন।

এমন সময় হাবসী মিয়া হঠাৎ কক্ষে প্রবেশ করেন। একসঙ্গে চমকে উঠলেন মিঃ জাফরী, মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন।

মিঃ হাবসী: মাথার ক্যাপটা খুলে পুনরায় অভিবাদন জানিয়ে বললেন-স্যার, আমার সিগারেট কেসটা ফেলে গেছি। :

সবাই একসঙ্গে তাকালেন টেবিলে। দেখতে পেলেন সোনালী রঙের একটা সিগারেট কেস পড়ে রয়েছে।'

হাবসী মিয়া দ্রুত হস্তে সিগারেট কেসটা হাতে দিয়ে পুনরায় বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

মিঃ জাফরীর সঙ্গে মিঃ হারুন এবং মিঃ হোসেন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

.

মনিরার কক্ষে ইতোমধ্যে আর চার-পাঁচজন যুবতী এসেছে। সবাই ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের তাতে সন্দেহ নেই। ইতোমধ্যে সুফিয়া নামের মেয়েটিকে না জানি কোথায় চালান করে দেয়া হয়েছে। সেদিনের কথা, মনিরার মনে এখনও গভীরভাবে দাগ কেটে রয়েছে। হঠাৎ একদিন এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সঙ্গে বিরাট বপুধারিণী মহিলাটি এসে উপস্থিত হলতাদের মধ্যে নিম্নস্বরে কিছু আলোচনা হলো। মনিরার হৃদয়ে তখন ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়েছিল-কে জানে আজ কার ভাগ্যে কি আছে! মাড়োয়ারী লোকটি শেষ পর্যন্ত সুফিয়াকে আংগুল দিয়ে দেখাল।

তারপর সে কি করুণ দৃশ্য!

ঐ মহিলা সুফিয়াকে জোরপূর্বক মাড়োয়ারী লোকটির হাতে তুলে দিল।

সুফিয়া যখন তার সঙ্গে ধস্তধস্তি শুরু করল তখন দু'জন বলিষ্ঠ লোক এসে সুফিয়াকে শক্ত দড়ি দিয়ে মজবুত করে বাঁধলো, ঠিক মনিরাকে যেমন করে একদিন বেঁধেছিল।

সুফিয়ার সে কি কান্না, মনিরার বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু কি করবে সে। নিজেও যে সে অসহায়! ...

সুফিয়াকে বেঁধে নিয়ে যাবার পর মনিরা বুঝতে পারল বেশি টাকা দিতে লোকটা অসমর্থ হওয়ায় সে আজ বেঁচে গেল। কারণ সুফিয়ার দাম তার চেয়ে কম ছিল।

ইতোমধ্যে আরও দু'জন মেয়েকেও চালান দেয়া হয়েছে। মনিরা নিজের ভাগ্যের কথা অহরহ চিন্তা করে। কি দুর্ভাগ্য তার! সে বন্ধ কক্ষে একটি ছোট আসন সংগ্রহ করে নিয়েছে, তাতেই বসে সে সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা এবং গভীর রাতে খোদার কাছে প্রার্থনা করে—হে দয়াময়, তুমি আমাকে বাঁচিয়ে নাও-আমার স্বামী, আমার পুত্র সব তুমি কেড়ে নিয়েছ তাতে দুঃখ নেই। আমাকে সর্বহারা করেছ তাতে আমি মর্মাহত নই, তুমি শুধু আমার ইজ্জত রক্ষা কর।

মনিরা বুদ্ধিমতী হয়েও আজ বুদ্ধিহীন। এখান থেকে পালাবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করেছিল, নানা রকম ফন্দি এঁটেছিল কিন্তু সব ব্যর্থ হয়েছে। এখন তাকে আর সেই পূর্বের কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়নি, অন্য একটা কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মনিরার সেই কক্ষে এখন আরও কয়েকটি মেয়ে বন্দিনী রয়েছে।

মনিরা বুঝতে পেরেছে এই নরপিশাচী মহিলা শুধু বাঈজী নয়, সে-এক নারী ব্যবসায়ীও। জঘন্য এই মহিলার আচরণ। অতি সাংঘাতিক সে! মনিরা লক্ষ্য করেছে, এই নরপিশাচীর নিকটে বহু দেশের লোকের আমদানি হয়। ভদ্র সাধু সেজে সবাই এখানে আসা-যাওয়া করে থাকে। বাইরের লোক কিছুই টের পায় না। এই বিরাট বপুধারিণী মহিলা হেমাঙ্গিনী শুধু নারীব্যবসাই করে না, শিশু-ব্যবসাও করে।

দূর দূর দেশ থেকে তার অনুচরগণ ভদ্রঘরের সন্তানদের চুরি করে এখানে পাঠিয়ে দেয়। এখান থেকে ওদের চালান করা হয় ভিন্ন ভিন্ন। জায়গায় এবং দেশ হতে দেশান্তরে।

মনিরা শিক্ষিতা যুবতী, সব বুঝে সে। কিন্তু কি করবে, কোন উপায় নেই নিজেদের রক্ষা করার।

শয়তানী হেমাঙ্গিনী শৃগালিনীর ন্যায় ধূর্ত, মনিরা একটু বেশি বুদ্ধিমতী তাই তাকে আরও কড়া পাহারায় রেখেছে। কোন সময় যেন সে অন্য কোন যুবতীর সঙ্গে কথা বলতে না পারে সেজন্য কঙ্কাল ধরনের মহিলাটিকে নিয়োজিত

রেখেছে। কঙ্কালিনী মহিলা তার কোটরাগত জ্বলজ্বলে চোখ দিয়ে সব সময় তার দিকে তাকিয়ে থাকে। রাতে ঘুমিয়েও যেন শান্তি নেই মনিরার। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে দেখতে পায় মনিরা সেই কঙ্কালিনী মহিলা কক্ষের এক কোণে বসে পিটপিট করে তাকাচ্ছে। ভাবে মনিরা সর্বনাশ, একি মানুষ না ভূত, কোন সময় ঘুম নেই তার চোখে!

দিনের পর দিন কেটে যায়, বদ্ধকক্ষে কঙ্কালিনীর দৃষ্টির আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার উপক্রম হয় মনিরার।

ইতোমধ্যে আরও কয়েকজন লোক এসেছিল, তাকে দেখে পছন্দ করে দাম দর করেছিল, কিন্তু হেমাঙ্গিনী তার দর চরমে বাড়িয়ে দিয়েছে, কাজেই ইচ্ছা সত্ত্বেও কেউ মনিরাকে ক্রয় করতে সক্ষম হয়নি। মনিরা হাত তুলে খোদার নিকট প্রার্থনা করেছে-দয়াময়, তুমি এমনি করেই আমাকে বাঁচিয়ে নিও।

.

ছাই হয়ে যাব আরও কয়েকজন তার দর চরমে বামনিরা হাত?

এখানে মনিরা যখন খোদার নিকটে প্রার্থনা করে চলেছে, তখন বনহুর আর নূরী তাদের মনিকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠেছে।

নূরী মনিকে নিয়ে দোলনায় বসে দোল খাচ্ছে আর গুন গুন করে গান গাইছে।

এমন সময় বনহুর পেছন থেকে এসে নূরীর চোখ দুটি টিপে ধরল।

নূরী দক্ষিণ হাতখানা দিয়ে বনহুরের হাত স্পর্শ করে বললো—হুর!

বনহুর নূরীর চোখ ছেড়ে দিয়ে এবার মনির গালে মৃদু চাপ দিয়ে বললকার কোলে বসে দোল খাচ্ছ মনি?

মনি শব্দ করল-মা ম্মা-ম্মা.....

বনহুর অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো, তারপর হাসি থামিয়ে বলল—শুনলে নূরী?

নূরী হৃদয়ে আনন্দ উপভোগ করলেও মুখখানা তার লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। মনিকে বনহুরের কোলে তুলে দিয়ে বলল—নাও।

বনহুর হাত দু'খানা পেছনে রেখে মুখ নেড়ে বলল, ওকে আমি নেব না।

নিতেই হবে। নূরী মনিকে জোর করে দিতে গেল বনহুরের কোলে।

বনহুর পিছু হটতে শুরু করল।

কিন্তু নূরী নাছোড়বান্দা—নিতেই হবে আজ মনিকে।

অগত্যা বনহুর মনিকে কোলে নিয়ে আদর করছিল, নূরী তখন অবাক নয়নে তাকিয়েছিল উভয়ের মুখের দিকে—একি, হুর আর মনির মুখের মধ্যে অদ্ভুত মিল রয়েছে–এমন কেন হয়েছে? নূরী এটা অনেক দিন লক্ষ্য করেছে কিন্তু কিছু বলার সাহস হয়নি। এটা বলাও তার উচিত হবে না, কাজেই নিশ্চুপ থাকে নূরী।

বনহুর মনিকে আদর করছিল, এমন সময় রহমান এসে কুর্ণিশ জানিয়ে বলে সর্দার; জরুরী খবর আছে।

বনহুর নূরীর কোলে মনিকে দিয়ে বলল–চল।

বনহুর আর রহমান বেরিয়ে গেল।

নূরী মনিকে নিয়ে দোলনায় শুইয়ে দিল।

•

গোপন আলোচনাকক্ষে প্রবেশ করল বনহুর ও রহমান। বনহুর আসন গ্রহণ করে বলল—কি খবর রহমান?

সর্দার, আমাদের বিশ্বস্ত অনুচর কোরেশী একটা সন্ধান এনেছে। নারী হরণকারী এবং নারী ব্যবসায়ী একজন কুচক্রী নেতাকে সে আবিষ্কার করেছে। কোরেশীকে ডাকব?

হ্যাঁ ডাক।

রহমান কলিংবেলে হাত রাখতেই এক বলিষ্ঠ লোক কক্ষে প্রবেশ করে কুর্নিশ জানাল।

রহমান বলল-সর্দার, এর নামই কোরেশী।

বল তুমি কি সংবাদ সংগ্রহ করে এনছ?

বনহুর প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে তাকাল কোরেশীর দিকে।

কোরেশী ওর হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করে বললসর্দার, একটি কাফ্রি লোক সেই নারীহরণকারী।

বনহুর বললো-সে-ই যে নারীহরণকারী, এ কথা তোমাকে কে বলল?

সর্দার, আপনার নির্দেশ মতই আমরা শহরের বিভিন্ন স্থানে গোপনে ছড়িয়ে রয়েছি। কেউ হোটেলে, কেউ ক্লাবে, কেউ পথে-ঘাটে-মাঠে, এমন কি পুলিশ অফিসেও আমরা রয়েছি।

পুলিশ অফিসে?

হা সর্দার, আমাদের একজন পুলিশ অফিসে ঝাড়ুদারের ছদ্মবেশে কাজ করে।

আর তুমি?

আমি পুলিশ অফিসারের বাংলোয় কাজ করি।

বনহুর সোজা হয়ে বসল—মিঃ জাফরীর ওখানে?

হ্যাঁ, আমি সেখানে বাবুর্চির কাজ করি সর্দার।

বেশ! সেখান থেকে তুমি কি করে নারীহরণকারীর সন্ধান পেলে? প্রশ্ন করল বনহুর।

আজ সেখানে ঐ লোকটা এসেছিল।

কোন লোকটা?

সেই কাফ্রি ভদ্রলোক।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলল-সেই যে নারীহরণকারী এবং নারী ব্যবসায়ী, এ কথা কেমন করে জানলে?

সর্দার, লোকটা চলে যাবার পর পুলিশ অফিসারদের মধ্যে যে আলোচনা হলো আমি লুকিয়ে থেকে সব শুনেছি। ঐ লোকটাই নাকি এ দেশে কাঠের ব্যবসার নামে নারীহরণ ব্যবসা চালাচ্ছে। কিন্তু সর্দার, পুলিশ সন্দেহ করছে ঐ কাফ্রি নাকি আপনার দলের লোক।

বনহুর হেসে বলল তুমিও যেমন সন্দেহ করেছ ঠিক তেমনি মিথ্যা সন্দেহ করে চলেছে পুলিশ অফিসারগণ। কাফ্রি ভদ্রলোক যেমন আমার কোন অনুচর বা দলের লোক নয়, তেমনি সে নারীহরণকারী নাও হতে পারে। তবু তোমরা সেই কাফ্রি ভদ্রলোকে লক্ষ্য রাখবে।

কোরেশী বলল-আচ্ছা সর্দার। কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

বনহুর এবার রহমানের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল-রহমান, তাজকে প্রস্তুত কর।

তাজের পিঠে বনহুর এবং অন্য একটি অশ্বপৃষ্ঠে রহমান। দুজনের শরীরেই সাধারণ সওদাগরী ড্রেস। বনপ্রান্তর ছাড়িয়ে ওরা দু'জন শহরে এসে পৌঁছল। কেউ দেখলে ওদের চিনতে পারবে না এমন নিখুঁত ছদ্মবেশ হয়েছিল ওদের।

শহরে পৌঁছার পূর্বেই তাজ এবং দ্বিতীয় অশ্বটি বনের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে বনহুর আর রহমান একটি ট্যাক্সি ডেকে চেপে বসল।

রহমান ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলল-কাঠের ব্যবসায়ী হাবসী মিয়ার বাড়ি চলো।

হাবসী মিয়াকে শহরের প্রায় সব যানবাহন চালকই জানে, কাজেই ড্রাইভার অতি সহজেই তাদের নিয়ে উপস্থিত হলো তার বাড়িতে।

বাড়ির অনতিদূরে হাবসী মিয়ার বিরাট কাঠের কারখানা। আফ্রিকার বন থেকে হাবসী মিয়া নানা রকমের কাঠ এনে এ দেশে কারবার করে থাকেন।

বাড়ি বলতে তার এমন সুন্দর বাড়ি কিছু নয়। কাঠ-কাঠরা দিয়ে থাকার মত খানিকটা জায়গা করে নিয়েছেন হাবসী মিয়া সেখানেই তিনি বাস করেন তাঁর কয়েকজন কর্মী নিয়ে। তার বেশির ভাগ কর্মী কাফ্রি।

এদেশের কারবার জমিয়ে হাবসী মিয়া বেশ মোটা টাকা করে ফেলেছেন। কোটিপতি বলা চলে। কিন্তু লোকটাকে দেখলে তেমন টাকাওয়ালা বলে মনে হয় না। ঢিলা পাজামা আর পাঞ্জাবী পরেন। মাথায় একটা সাদা টুপি এবং পায়ে কুমীরের চামড়ার জুতা। অদ্ভুত চেহারা এই হাবসী মিয়ার।

টাকা পয়সা ছাড়া হাবসী মিয়া কিছুই বুঝেন না। কোন ফাংশন বা পার্টিতে তাকে কোনদিন দেখা যায়নি। লোকসমাজে কেউ তাঁকে দেখতে পায় না, লোকটা সদা কাজ আর কাজ নিয়েই থাকেন। এমন কি হাবসী মিয়া এত টাকা-পয়সাওয়ালা মানুষ হয়েও একটা চটের বিছানায় দিব্যি আরামে নাক ডাকিয়ে ঘুমান।

কোন লোকের সঙ্গেই তেমন তাঁর পরিচয় নেই। শহরের যার বিশেষ করে কাঠের প্রয়োজন তারই শুধু পরিচয় এই অদ্ভুত ভদ্র লোকটির সঙ্গে।

সওদাগর দু'জনকে দেখতে পেয়ে হাবসী মিয়া সাদর সম্ভাষণ জানালেন। তার বসবার কাঠের ঘরখানায় নিয়ে বসালেন। মোটা পুরু শালকাঠের তক্তা দিয়ে ঘরখানা তৈরি। ঘরের খুঁটিগুলো মোটা গাছের গুড়ি কেটে তৈরি করা হয়েছে। মেঝেতে এবং আশেপাশে বিচ্ছিন্নভাবে এলোমেলো কাঠের টুকরা ছড়ানো।

বনহুর আর রহমান সওদাগরের বেশে হাবসী মিয়ার বৈঠকখানা ঘরে আসন গ্রহণ করল।

হাবসী মিয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন স্যার, আপনাদের কি ধরনের কাঠ বা তক্তার প্রয়োজন?

রহমান বলল–একটা বজরা তৈরির অর্ডার দেব।

হাবসী মিয়া খুশি হলেন–বজরা! আপনারা যে ধরনের বজরার অর্ডার দেবেন আমরা অতি অল্প সময়ে মজবুত করে তৈরি করে দিতে পারব।

এবার বনহুর বলল–আপনার কাছে রুচিমত জিনিস পাব বলেই আমরা অনেক দূরে থেকে এসেছি।

নিশ্চয়ই পাবেন, অবশ্যই পাবেন। আমার কাছে কয়েকটা বজরার ক্যাটালগ আছে, চলুন দেখবেন।

চলুন। বনহুর উঠে দাঁড়াল।

রহমানও বনহুরকে অনুসরণ করল।

হাবসী মিয়া বনহুর এবং রহমানকে তার বজরার ক্যাটালগগুলো দেখালেন।

বনহুর ক্যাটালগে একটা বজরা দেখিয়ে সেই মত একটি বজরা তৈরি করার জন্য অর্ডার দিল।

হাবসী মিয়া খুশিতে আত্মহারা হলেন। যদিও তিনি দৈনিক বহু কাজের এবং কাঠ ও তক্তার অর্ডার পেয়ে থাকেন তবু এমন একটা অর্ডার পাওয়া কম কথা নয়! অনেকগুলো টাকা পেয়ে তার আনন্দের সীমা রইল না।

সওদাগরবেশি বনহুর এবং রহমান এক সময় বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

ঠিক সেই সময় একটা জীপগাড়ি এসে হাবসী মিয়ার কারখানার সামনে থামল।

বনহুর লক্ষ্য করল–দুজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক জিপগাড়ি থেকে নেমে কারখানায় প্রবেশ করলেন। একজনের চোখে কাল চশমা এবং মুখে দাড়ি রয়েছে। অন্যজনের মুখেও একমুখ পাকা দাড়ি আর গোঁফ। বনহুর আর রহমান আরও অক্ষ্য করল, হাবসী মিয়া এদের দু'জনকেও সাদর সম্ভাষণ

জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

বনহুর এবার ড্রাইভারকে গাড়ি ছাড়বার আদেশ দিল।

গাড়ি চলতে শুরু করলে বলল বনহুর রহমান, যে প্রৌঢ় ভদ্রলোক দু'টি এই মুহূর্তে জীপ থেকে নেমে হাবসী মিয়ার কারখানায় প্রবেশ করল তাদের চিনতে পেরেছ?

না সর্দার, ওদের চিনতে পারলাম না।

আমাদের অতি পরিচিত লোক ওরা।

কিন্তু আমি কোথাও ওদের দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না তো?

নিখুঁত ছদ্মবেশ রয়েছে ওঁদের। কিন্তু আমার চোখে ধুলো দেয়া ওদের কাজ না। তাঁদের একজন পুলিশ অফিসার মিঃ হারুন, অন্যজন শঙ্কর রাও, পুলিশ ডিটেকটিভ।

সর্দার, ওরা কেন?

আমরা যে কারণে হাবসী মিয়ার ওখানে গিয়েছিলাম ওরাও ঠিক সে কারণে বুঝেছ?

হাবসী মিয়াকে আপনার কেমন লোক বলে মনে হলো সর্দার?

খুব ভাল লোক।

তাহলে সে এ নারীহরণ ব্যাপারে জড়িত নয়?

না, হাবসী মিয়া সম্পূর্ণ নির্দোষ। নারীহরণ বা ছেলেমেয়ে চুরি এর কোনটাই সে করে না।

সর্দার, তাহলে অতগুলো টাকা—

নষ্ট হলো, এই তো?

হ্যাঁ সর্দার, অযথা বজরার বায়না বাবদ এতগুলো টাকা না দিলেও চলতো না কি?

চলতো কিন্তু এতদূর তলিয়ে তাকে বুঝতে পারতাম না। তাছাড়া বজরার তো প্রয়োজনই রয়েছে একটা নিয়ে নেয়া যাবে।

রহমান কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল–পুলিশের লোকও তাহলে হাবসী মিয়াকে সন্দেহ করেছে?

হ্যাঁ, রহমান তারা শুধু হাবসী মিয়াকে নারীহরণকারী বলেই সন্দেহ করেছে।

কথাগুলো বেশ নীচুস্বরে হচ্ছিল, যাতে ড্রাইভার শুনতে না পায়।

বনহুর আর রহমান যখন গাড়ি ত্যাগ করলো তখন তারা ড্রাইভারকে অনেকগুলো টাকা বখশিস দিল।

ড্রাইভার অবাক কণ্ঠে বলল–স্যার, এত টাকা দিচ্ছেন কেন?

রহমান হেসে বলল–তোমার কাজে সন্তুষ্ট হয়েছিলাম।

ড্রাইভার বলল—আপনারা কে? নিশ্চয়ই কোন মহান ব্যক্তি আপনারা?

এবার বনহুর কথা বলল–ঠিক তার উল্টা-দস্যু বনহুর!

ভয়কম্পিত কণ্ঠে বলল ড্রাইভার–দস্যু বনহুর।

হ্যাঁ, যাও।

ড্রাইভার জানে, দস্যু বনহুর লোকের কাছ থেকে টাকা কেড়ে নেয়, সে আবার টাকা দেয়, এত দয়ালু দস্যু বনহুর।

ড্রাইভার একবার হাতের টাকাগুলো, একবার দস্যু বনহুরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

বনহুর আর রহমান একটু হেসে তাদের গন্তব্যপথে পা বাড়াল।

বনহুর আর রহমান দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য হতেই ড্রাইভার গাড়িতে ষ্টার্ট দিল। একটা আলোড়ন শুরু হয়েছে ড্রাইভারের বুকের মধ্যে। দস্যু বনহুরকে সে স্বচক্ষে দেখেছে, তার গাড়িতেই দস্যু বনহুর চেপেছিল, এর চেয়ে আশ্চর্যের কথা আর কি আছে? কোথায় কাকে বলবে, কার কাছে বললে সে তৃপ্তি পাবে ভাবতে লাগল। মনে পড়ল কিছুদিন পূর্বের সেই সরকারি ঘোষণার কথা-দস্যু বনহুরকে যে মৃত বা জীবিত পাকড়াও করে আনতে পারবে তাকে এক লাখ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।

ড্রাইভারের দু'চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল, তখনই গাড়ি নিয়ে ছুটলো পুলিশ অফিসের দিকে।

সে পুলিশ অফিসে গিয়ে বলল–হুজুর, একটা খবর আছে, দস্যু বনহুরকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি এবং আমার গাড়িতে সে চেপেছিল।

ড্রাইভারের কথা শুনে পুলিশের লোকের সন্দেহ হলো। নিশ্চয়ই এ দস্যু বনহুরের দলের কোন লোক। পুলিশ, ওকে গ্রেফতার করে ফেলল এবং তল্লাশি করে অনেক টাকা উদ্ধার করল ওর জামার পকেট থেকে।

হাজতে বন্দী হয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল ড্রাইভার। হায়, কেন সে ভাল মনে করে পুলিশ অফিসে কথাটা জানাতে গিয়েছিল, শেষে কিনা টাকাগুলোও গেল, হাজতেও আসতে হলো।

এবার ড্রাইভার বুঝতে পারল কেউ উপকার করলে তার অপকারের চেষ্টা করা মহাপাপ। ডুকরে কাঁদতে লাগল সে।

·

দাড়ি-গোঁফভরা মুখ, মাথায় এক রাশ এলোমেলো জটধরা চুল। চোখ দুটো কোটরাগত। দেহ কঙ্কালসার। পৃথিবীর বুকে এসে দাঁড়াল কায়েস। প্রাণভরে নিশ্বাস নিল। কতদিন পর সে দুনিয়ার আলো বাতাস গ্রহণ করল।

টলতে টলতে পথ চলছে।

পাশ কেটে চলে যাচ্ছে কত যানবাহন, কত লোকজন।

কেউ তাকাচ্ছে, কেউ তাকাচ্ছে না। কেউ বা পাগল ভেবে ঢিল ছুড়ে মারছে। শরীরে কাপড় নেই বললেই চলে–এক টুকরা ময়লা ন্যাকড়া নেংটির মত করে পরা রয়েছে। একদিন এই কায়েস যে একজন মস্ত বলিষ্ঠ–পুরুষ ছিল, তার শরীরে ছিল অসীম বল, আজ তাকে দেখলে কেউ তা বিশ্বাসই করবে না।

কায়েস ঝিল শহরের পথ ধরে ধীরে ধীরে এগুতে লাগল। ক্ষুধা পিপাসায় অত্যন্ত কাতর সে, এতটুকু খাদ্য আর পানির নিতান্ত দরকার তার। একটা কলতলায় এসে দাঁড়াল।

কতগুলো নারীপুরুষ কলসী এবং মশকে করে পানি ভরছে। কায়েস কতদিন পরিষ্কার পানি পান করেনি। লোলুপ দৃষ্টিতে পানির দিকে তাকিয়ে রইলো। এক

তরুণী বলল–এই পাগলা, পানি খাবি?

কায়েসের গলা দিয়ে কথা বের হলো না, মাথা দোলাল সে খাবে।

তরুণী একটা মাটির পাত্রে কিছুটা পানি এনে কায়েসের সামনে রাখল, বলল–খা।

কায়েস এক নিঃশ্বাসে পানিটুকু পান করে এটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। এতক্ষণে যেন কায়েস পুনর্জন্ম লাভ করল। আবার পথ চলতে শুরু করল সে।

কায়েস চলছে আর ভাবছে এখন কোথায় যাবে, কি করবে। ঝিন্দ শহরে সে তেমন করে কারও সঙ্গে পরিচিত নয়, আর যা একটু পরিচয় কারও কারও সঙ্গে ছিল তারাও চলে গেছে এত দিনে নিশ্চয়ই। নতুন করে পরিচয় দিলে এ অবস্থায় তাকে কেউ চিনতেই পারবে না। আজ আবার নতুন করে মনে পড়তে লাগল সর্দারের কথা। দু'চোখ ছাপিয়ে পানি এলো। সর্দারকে তারা প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে। মনে পড়লো সর্দারপত্নী মনিরার কথা, তাকে খুঁজতেই তো বেরিয়ে ছিল সে, তারপর এই অবস্থা। তিনি এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কে জানে। তার গর্ভে ছিল সর্দারের সন্তান। একটা অভূতপূর্ব আলোড়ন দোলা দিয়ে গেল কায়েসের মনে। মুহূর্তের জন্য কায়েস ভুলে গেল তার ক্ষুধাকাতর অবস্থার কথা। চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল খুশিতে। নিশ্চয়ই মনিবপত্নীর সন্তান জন্মেছে। তিনি যেখানেই থাকুন, সন্তান প্রসব করেছেন তা ঠিক। কিন্তু মেয়ে না ছেলে জন্মেছে কে জানে। কায়েস নিজ মনেই অস্ফুট শব্দ করে উঠল ওরা যেখানেই থাক আমি খুঁজে বের করবই। আবার চলতে লাগল কায়েস।

পথে পথে ঘুরে ঘুরে দিন কাটতে লাগল কায়েসের। দয়া করে কেউ দু'একটা পয়সা ছুড়ে দেয় তার দিকে, তাই দিয়ে কিছু কিনে খায় সে। ফুটপাথের ধারে রাত কাটে আর, দিনের বেলায় কাটে পথে পথে। এমনিভাবে দিন যায়, সপ্তাহ আসে, সপ্তাহ গিয়ে মাস হয়ে এলো। হতাশায় আর ক্লান্তিতে ভরে উঠল কায়েসের মন। কই, এতদিনেও তো তার মনিবপত্নী মনিরা ও তার সন্তানের সন্ধান পেল না। তবে কি তারা বেঁচে নেই?

যেখানেই কোন যুবতী বা নারী দেখতে কায়েস সেখানে গিয়েই দাঁড়াত মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থাকত লক্ষ্য করত তার সর্দারের পত্নীর মত দেখতে কিনা।

এমনি লুকিয়ে লুকিয়ে যুবতীদের দেখতে গিয়ে বহুদিন কায়েসকে হতে হয়েছে লাঞ্ছিত, অপমানিত, শয়তান-বদমাস নামে অপবাদ নিতে হয়েছে। তাকে। তবু দুঃখ নেই তার এতটুকু, মনের যত ব্যথা কষ্ট মুছে ফেলে সে আবার ছুটে যেত কোন যুবতী বা মহিলা দেখলেই। হয়তো দু'চার ঘা-চড়থাপ্পড় খেতে হতো তাকে।

কায়েস যখন মনিবপত্নী এবং তার সন্তানের সন্ধানে ঝিল শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন সেই মনিবপত্নী এক নারী ব্যবসায়ীর চোরাকক্ষে বন্দিনী অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। আর তার সন্তান দিন দিন শশীকলার মতই বেড়ে উঠছে নূরীর কোলে।

.

আজকাল আবার বনহুর তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। কাজ আর কাজ নিয়ে মেতে উঠেছে। শহরে আবার দেখা দিয়েছে চাঞ্চল্য। শুধু একটি শহর, বা কয়েকটি গ্রামের মধ্যেই বনহুর তার দস্যুবৃত্তি সীমাবদ্ধ রাখল না, সব জায়গায়ই চলল তার অভিযান। আবার সে মেতে উঠল নব উদ্যমে।।

নগরবাসীর মনে আবার ত্রাহি ত্রাহি ভাব জাগল। পুলিশমহল ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। পুলিশদের কড়া পাহারা সত্ত্বেও এখানে সেখানে চললো লুটতরাজ।

শহরের সবচেয়ে বড় ব্যাংকে হানা দিয়ে দস্যু বনহুর এক লাখ টাকা নিয়ে উধাও হল। পরদিনই পুলিশ সুপার মিঃ আহমদের বাড়িতে হানা দিয়ে বহু অলঙ্কার ও নগদ কয়েক হাজার টাকা নিয়ে যায় বনহুর। এবার সে পূর্বের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

মিঃ আহমদের বাড়িতে ডাকাতি হওয়ায়, পুলিশমহল পর্যন্ত ঘাবড়ে যায়। নানাভাবে, নানা কৌশলে দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের জন্য তৎপর হয়

সবাই।

শহরের এবং গ্রামাঞ্চলের বিশিষ্ট লোকজন সবাই নিজেদের রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

দরজায় বন্দুকধারী পাহারাদার। বাড়ির আশেপাশে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেও কেউ নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারছে না। বিছানায় শুয়ে সদা ভয়কম্পিত হৃদয়ে

সময় কাটায়-কবে কখন না জানি দস্যু বনহুর এসে হাজির হবে।

সকলের মনেই দস্যু বনহুরের নামে আতঙ্ক। নারীহরণ, শিশুহরণ, অর্থহরণ সবই নাকি দস্যু বনহুরের কাজ।

বনহুর অজস্র টাকা লুট করে আবার তার ভাণ্ডার পূর্ণ করে তুলল। আবার সে ইচ্ছামত অর্থ ছড়িয়ে দিতে লাগল দীনহীন জনগণের মধ্যে। ইচ্ছমত নষ্টও করতে লাগল সে ঐ সব লুটতরাজের মালামাল।

নূরী অবাক হয়ে বলল, একদিন সে হুর, তুমি আবার এমন ভাবে ক্ষেপে উঠলে কেন? আমার কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল বনহুর কিসের আশঙ্কা নূরী?

সাতবার জয়ী হয়ে একবার যদি পরাজিত হও!

বনহুর নূরীর গালে মৃদু টোকা দিয়ে বলল—তোমার মনে এ দুর্বলতা শোভা পায় না নূরী। তুমি কি চাও, আমি পরাজিত হই?

ছিঃ এ কথা তুমি বলতে পারলে হুর! তোমার পরাজয় আমি কামনা করতে পারি! অভিমানে ভরে উঠল নূরীর মুখ।

বনহুর নূরীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বলল—নূরী, তুমি রাগ কর না, আমি যে তাহলে দিশেহারা হয়ে পড়ব।

কিন্তু তুমি কেন আবার এভাবে নিজেকে মাতিয়ে তুললে হুর? বেশ তো শান্ত হয়ে এসেছিলে?

বনহুর নূরীকে ছেড়ে দিয়ে বলল—নূরী, তুমি কি চাও, আমি নির্জীবের মত নীরব হয়ে পড়ি?

না, তা চাই না, কিন্তু—

হেসে উঠল বনহুর-নূরী, সিংহশাবক কোনদিন চুপ থাকতে পারে না। ক্তের পিপাসা তাকে চুপ থাকতে দেয় না—

তুমি কি উন্মাদ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, নূরী যা বলো তাই।

এত অর্থ তুমি কি করবে হুর?

অর্থ? যে প্রশ্ন তুমি করেছ নূরী তা অতি সত্য। কিন্তু জানতোঅর্থ আমি নিজের জন্য জমা রাখি না। আমার লাখ লাখ অসহায় দীনহীন অভাগা ভাইবোনদের মাঝে বিলিয়ে দেই।

জানি হুর, সব জানি, তবু প্রশ্ন করি।

না নূরী, এ প্রশ্ন তুমি আর আমাকে কর না।

·

কায়েস অনেক সন্ধান করেও যখন মনিরা ও তার সন্তানের কোন খোঁজ পেল না তখন হতাশায় তার মন ভেঙ্গে পড়ল। এভাবে পথে পথে ঘুরে আর তার কোন লাভ হবে না। মনে পড়লো রহমানের কথা, মনে পড়লো অন্যান্য সঙ্গীর কথা। তার কান্দাই বনের আস্তানায় ফিরে যাওয়া উচিত। সেখানে রহমান আছে, আরও দলবল আছে। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে আবার সে ঝিন্দ শহরে আসবে। ঝিন্দে প্রতিটি বাড়ি সে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখবে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তার সর্বাবপত্নী. মনিরাকে? যদি তারা বেঁচে থাকে নিশ্চয়ই একদিন না একদিন খোঁজ বের করবই।

কায়েস এবার ফিরে চলল কান্দাহ আস্তানায়।

পয়সা ছিল না তার, ভিখারীর বেশে একদিন কান্দাই এসে পৌঁছল।

অতি কষ্টে একদিন সে নিজেদের আস্তানায় আসতেও সক্ষম হল। কিন্তু তার চেহারা এমনভাবে বদলে গেছে যে, তাকে দেখে তার অতি আপনজনও চিনতে পারবে না।

কায়েস যখন তাদের আস্তানায় প্রবেশের চেষ্টা করেছিল তখন তাকে বনহুরের কয়েকজন অনুচর পাকড়াও করে ফেলল।

গুপ্তচর ভেবে তাকে ওরা, মজবুত করে বেঁধে নিয়ে এলো বনহুরের দরবারে।

বনহুর তখন সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট। সামনে দণ্ডায়মান তার অনুচরগণ। দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে তারা। নতুন কোন জায়গায় হানা দেবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল দস্যু বনহুর।

রহমান তার দক্ষিণ পাশে দণ্ডায়মান।

প্রত্যেকটা অনুচরের হাতে সুতীক্ষ্ণধার বর্শা, বল্লম ও রাইফেল।

এমন সময় দরবারকক্ষে প্রবেশ করল বনহুরের দু'জন অনুচর। কুর্ণিশ জানিয়ে বলল–সর্দার একজন গুপ্তচর ধরা পড়েছে।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলল—গুপ্তচর?

হ্যাঁ সর্দার। লোকটা আমাদের আস্তানায় প্রবেশের চেষ্টা করছিল।

রহমান বলে উঠল—এত সাহস তার!

বনহুর বলল–গুপ্তচর মৃত্যুভয়ে ভীত হয় না রহমান। প্রাণ দিয়ে ওর সংবাদ সংগ্রহ করে থাকে।

রহমান বলে উঠল, নিশ্চয়ই পুলিশের গুপ্তচর হবে।

বনহুর বলল—নিয়ে এস তাকে।

অনুচরদ্বয় চলে গেল, একটু পরে জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার কায়েসকে পিছমোড়া করে বেঁধে দরবারকক্ষে নিয়ে এলো।

কায়েস দরবারকক্ষে প্রবেশ করতেই বিস্ময়ে অস্ফুটধ্বনি করে উঠলসর্দার! দু'চোখে আনন্দের দ্যুতি খেলে গেল ভুলে গেল তার হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। ছুটে এগিয়ে যেতে গেল সে, অমনি ধপাস করে পড়ে গেল মেঝেতে। কায়েস বুক দিয়ে এগুতে লাগল। তার সর্দার জীবিত রয়েছে, এ যে সে কল্পনাও করতে পারেনি। আনন্দে বুক তার স্ফীত হয়ে উঠছে।

কায়েসের অদ্ভুত আচরণে বনহুর এবং তার অনুচরগণ আশ্চর্য হলো। রহমান বলল একি ব্যাপার সর্দার?

কায়েস তখনও বনহুরের আসনের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে।

বনহুর তার একজন অনুচরকে আদেশ করল ওর হাত পায়ের বাঁধন খুলে দাও।

সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করা হলো।

কায়েস বন্ধনমুক্ত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু তার দৃষ্টি সর্বক্ষণ বনহুরের দিকে রয়েছে। কায়েস যেন হারানো ধন ফিরে পেয়েছে। লম্বা চুল, দাড়ি-গোঁফে ভরা মুখখানা তার খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

রহমান বলল–সর্দার, লোকটাকে পাগল বলে মনে হচ্ছে।

কায়েস ততক্ষণে বনহুরের আসনের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে।

দু'জন অনুচর ওকে ধরে ফেলল–এখানে দাঁড়াও।

কায়েস ক্ষীণকণ্ঠে বলল–না, আমাকে সর্দারের কাছে যেতে দাও। ছেড়ে দাও তোমরা আমাকে যেতে দাও।

বনহুর এবার বলল–আসতে দাও ওকে।

এবার আর কেউ তাকে বাধা দিল না, সে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হলো বনহুরের আসনের সম্মুখে।

রহমানের মুখমণ্ডল রাগে গম্ভীর হয়ে উঠেছে, নিশ্চয়ই লোকটা কোন অভিসন্ধি নিয়ে এসেছে। তাদের সর্দারকে হত্যা করে নিজে মৃত্যুবরণ করতেও ভীত নয়। রহমান নিজেকে সেভাবে প্রস্তুত করে সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

কায়েস বনহুরের নিকটবর্তী হয়ে পুনরায় আনন্দভরা গলায় বলে উঠল–সর্দার, আপনি জীবিত।

বনহুর বলল –কে তুমি?

কায়েস ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল–আমাকে চিনতে পারছেন না সর্দার? আমি–আমি কায়েস–

তুমি কায়েস! সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের মুখমণ্ডল গম্ভীর হলো। মনিরার নিরুদ্দেশের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কায়েসের। তার চক্রান্তেই হয়তো মনিরা বিপথে গিয়েছিল। তাই বনহুর ভুলেও কোনোদিন কায়েসের নাম : মুখে আনেনি। রাগে ক্ষোভে অভিমানে বনহুর দগ্ধীভূত হয়েছে তবু কোনদিন মনিরা বা কায়েসের সন্ধান নেয়নি।

রহমান যদি কোনদিন বলেছে মনিরা বা কায়েসের সম্বন্ধে কোন কথা, তাহলে বনহুর ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছে। কোন অনুচর ভয়ে কোনদিন কায়েসের নাম মুখে আনার সাহস পায়নি, আজ সেই কায়েস স্বয়ং দস্যু বনহুরের সামনে হাজির!

বনহুর গর্জন করে উঠল–বদমাশ কোথা থেকে এলি তুই! জানিস তোর জন্য মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেয়া রয়েছে?

কায়েসের মুখমণ্ডল বিষণ্ন হলো, ব্যথাকাতর কণ্ঠে বলল–সর্দার, আমার অপরাধ?

বনহুর আসন থেকে উঠে দাঁড়াল, তারপর বলল–রহমান, ওকে আমার বিশ্রামকক্ষে হাজির করো। কথা শেষ করে বেরিয়ে গেল বনহুর।

দরবারকক্ষে একবার সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিল। রহমান বলল–একে আমার সঙ্গে নিয়ে এসো।

দু'জন অনুচর পুনরায় কায়েসের হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে চলল।

রহমান বনহুরের কক্ষে প্রবেশ করে দেখল বনহুর ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারী করে চলেছে।

কায়েস এবং দু'জন অনুচরসহ রহমান প্রবেশ করতেই বনহুর থমকে, দাঁড়াল।

রহমান অনুচরদ্বয়কে বেরিয়ে যাবার জন্য ইংগিত করল।

কায়েস এবং রহমান দাঁড়িয়ে রইলো শুধু। কায়েসের চোখে মুখে এখনও আনন্দের ছাপ, যদিও তার হাত দু'খানা পুনরায় কঠিন ভাবে বেঁধে দেয়া হয়েছে।

বনহুর কঠিন কণ্ঠে বলল–জান তোমাকে এখনই হত্যা করা হবে?

আমি কি অপরাধ করেছি মৃত্যুদণ্ডের পূর্বে তা জানতে চাই। তারও পূর্বে আর একটি কথা আমাকে বলুন, আমাদের বৌ-রাণী কোথায়; তার সন্তান কোথায়?

প্রচন্ড আক্রোশে হুঙ্কার ছাড়ে বনহুর–চুপ কর বদমাশ। ও নাম আর। আমার সামনে উচ্চারণ করিস না। পাপিষ্ঠা–রাগে ক্রোধে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে বনহুর। দু'চোখে যেন আগুন ঝরে পড়ে।

রহমান নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো, বনহুরের দিকে তাকাবার সাহস হলো না তার।

কায়েস যখন বলে উঠছিল–বৌরাণী কোথায়, তার সন্তান কোথায়, তখন বিস্ময়ভরা চোখে রহমান তাকিয়ে দেখছিল একবার কায়েসের মুখে, একবার বনহুরের মুখে। বৌরাণী হারিয়ে গেছে, কার সঙ্গে গেছে, কোথায় গেছে এসবের কিছুই জানে না সে। তার আবার সন্তান–এসব কি শুনছে রহমান! এতদিনে রহমান বুঝতে পারলো, তার সর্দারের মনের মধ্যে একটা গভীর বেদনা নীরবে লুকিয়ে আছে, যা আর কেউ জানে না। এবার বুঝতে পারলো সে আর একমাত্র জানে কায়েস। রহমান নিশ্চুপ পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো। মনের মধ্যে নানা রকম প্রশ্ন উঁকি দিয়ে যাচ্ছে–তবে কি তাদের প্রিয় বৌরাণী–ঐ রকম কিছু ঘটেছে যা সর্দার আজও কারও কাছে প্রকাশ করেনি বা করতে পারেনি। এমন কি তাকেও কোনদিন এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেনি।

রহমান পুনরায় তাকাল কায়েসের দিকে।

কায়েস তখনও উফুল্ল মুখে বনহুরের দিকে তাকিয়ে আছে।

বনহুর অধর দংশন করে বলল–শয়তান, বল–মনিরা কি করে ঐ পাপিষ্ঠ মুরাদের হাতে গিয়ে পড়ল।

অবাক হয়ে তাকাল কায়েস, বলল–বৌরাণী তবে নরাধম মুরাদের কবলে পড়েছিল? আপনি ঠিক জানেন সর্দার?

কেন, তুই জানিস না! নেকামি করছিস?

না সর্দার, আমি শপথ করে বলছি বৌরাণী কোথায় গেছে, কে তাকে : হরণ করে নিয়ে গেছে, এসবের কিছু জানি না।

আমার কাছে মিথ্যা কথা! জানিস মিথ্যা কথার শাস্তি কি?

জানি সর্দার আমি যা বলছি তার একটি বর্ণও মিথ্যা নয়। সর্দার, আজ আমার এ অবস্থা কেন? আজ আমি মৃত্যুপথের যাত্রী–শুধু বৌরাণীর জন্যই আজ আমার এ অবস্থা–তার সন্ধানে গিয়েই আমি বন্দী হয়েছিলাম–

বনহুর এতক্ষণে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকাল কায়েসের মুখে, একটা ব্যাকুল আগ্রহফুটে উঠল তার চোখে।

কায়েস বলে চলেছে। বনহুর নিরুদ্দেশ হবার পর থেকে সব কথা একটি পর একটি বলছে–সর্দার, আপনাকে নদীবক্ষে ত্যাগ করে যখন আমরা ফিরে গেলাম তখন বৌরাণীকে কিছুতেই নিয়ে যাওয়া যায় না, আত্মবিসর্জন দেবেন সিন্ধি নদী বক্ষে। অতি কষ্টে নানা উপায়ে তাকে এক রকম বন্দিনী অবস্থায় নিতে হলো। কিন্তু ঝিন্দ শহরে পৌঁছে তাঁর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ল। সর্দার কি বলবো, আপনার শোকে তিনি পাগলিনী প্রায় হয়ে পড়লেন। আহার দ্রিা কিছুই ছিল না তার। অহরহ শুধু নীরবে বসে কাদতেন। এক সময় তিনি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সব সময় মাথাধরা গা বমি বমি করত—কিছু খেলে অমনি বমি করতেন। আমি তার এমন অবস্থা দেখে চিন্তিত হলাম–

বনহুর গভীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে কায়েসের মুখের দিকে। তার দু’চোখে ফুটে উঠেছে রাজ্যের আকুলতা।

রহমানের অবস্থাও তাই, নিশ্চুপ হয়ে শুনছে সে ওর কথা। কায়েস বলে চলেছে–ডাক্তার ডাকলাম, ডাক্তার বৌরাণীকে পরীক্ষা করে বলল–বৌরাণীর গর্ভে সন্তান আছে। সর্দার সেকি আনন্দ। ভুলে গেলাম আপনাকে হারানোর ব্যথা। বৌরাণীর গর্ভে আমাদের সর্দারের সন্তান—এ যে কত খুশির কথা–বলতে বলতে কায়েসের চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বলেই চলেছে কায়েস–এরপর থেকে আমি বৌরাণীকে সব সময় ভালভাবে দেখাশোনা করতে লাগলাম। প্রতীক্ষা করতে লাগলাম সেই নতুন অতিথির যে

আমাদের বৌরাণীর গর্ভে বিরাজ করছে কিন্তু সে আশা আমার সফল হলো না সর্দার–আমি ক'দিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলাম কিন্তু ফিরে এসে দেখি সব শূন্য —বৌরাণী নেই। বাড়ির কেউ তার সন্ধান দিতে পারল না। কিছুদিন পূর্বের একটি ঘটনার জন্য আমার মনে আশংকা হলো। একদিন একটি সিনেমা হলে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বৌরাণীকে দেখে মেয়ে বলে আঁকড়ে ধরল এবং এমন সব কথাবার্তা বলতে লাগল যা আমার মনে সন্দেহ জাগিয়েছিল। সর্দার, বৌরাণীকে আমি জোর করে সিনেমায় নিয়ে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম দিনরাত বসে বসে কাঁদাকাটা করেন বাইরে বেরুলে মনটা একটু ভাল হবে। আমার মনে হয়, সেই বৃদ্ধবেশি কোন শয়তান তাকে নিজের ব্যবহার দ্বারা মুগ্ধ করে–

এতক্ষণে বনহুর কথা বলল–হ্যাঁ সে বৃদ্ধ অন্য কেউ নয়, নরাধম পাষণ্ড শয়তান মুরাদ।

সর্দার, বৌরাণী তবে মুরাদের হাতে বন্দী?

এক সময় ছিল আজ আর নেই। আমি মুরাদকে হত্যা করেছি—

বৌরাণী—বৌরাণী কোথায় তবে সর্দার?

বনহুর দৃষ্টি নত করে নিল, তারপর ব্যথিত কণ্ঠে বলল——জানি না।

কায়েস আর্তনাদ করে উঠল–বৌরাণী এবং তার সন্তান–কারও কথাই আপনি জানেন না সর্দার?

কায়েস, জানি না তারা এখন কোথায়। সর্দার, বৌরাণীর কি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে? ব্যাকুল আগ্রহে প্রশ্ন করল কায়েস।

বনহুর একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল–তাও জানি না।

এবার রহমান বলে উঠল–সে কি সর্দার, বৌরাণীর কি সন্তান ওগ্রহণ করেছে তাও জানেন না? তার সঙ্গে নাকি আপনার সাক্ষাৎ ঘটেছিল?

হ্যাঁ ঘটেছিল, কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। আমি দূর থেকে শুধু তার সন্তানকে দেখেছিলাম।

কায়েস অস্ফুট শব্দ করে উঠলো–নিজের সন্তানকে আপনি দেখেও দেখেননি!

কায়েস, আমি তাকে ভুল বুঝেছিলাম। শয়তান মুরাদ মরার সময় আমার মনে বিষবাণ নিক্ষেপ করে গিয়েছিল, তাই আমি মনিরাকে ভুল বুঝেছিলাম কায়েস, তাকে ভুল বুঝেছিলাম–বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে বনহুরের কণ্ঠ।

রহমান এবং কায়েস বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে। বনহুরের চোখে মুখে একটা অসহ্য বেদনার ছাপ ফুটে উঠল। দক্ষিণ বাহু দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে ফেলল বনহুর।

এতদিনে রহমানের কাছে সর্দারের মনোভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে। কেন সর্দার ফিরে আসার পর এমন মৌন হয়ে পড়েছিল। সব সময় গভীরভাবে কি চিন্তা করত, হঠাৎ আবার কেনই বা এমন ভীষণভাবে ক্ষেপে উঠেছে। পূর্বের চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে সর্দার এখন–সব আজ পরিষ্কার হয়ে যায় রহমানের কাছে। শান্তকণ্ঠে বলল রহমান সর্দার, বৌ রাণী এখন কোথায় আছে বলতে পারেন?

বনহুর চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিল। ব্যথাকরুণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো রহমানের মুখে, বলল–জানি না। তবে যতদূর সম্ভব সে এখনও ঝিল। শহরেই আছে।

কোথায় আছে, কেমন আছে তাও জানেন না? কায়েস প্রায় কেঁদে ফেলল।

রহমান বলল–সর্দার, আর বিলম্ব করা উচিত নয়, আজই আমরা ঝিন্দ শহর অভিমুখে রওয়ানা দেব। না জানি বৌরাণী কোথায় আছেন, কেমন আছেন। বিশেষ করে তিনি মেয়েলোক। কোলে তাঁর কচি সন্তান।

হ্যাঁ রহমান, তাই কর, তাই কর–কিন্তু সে বেঁচে আছে কিনা কে জানে!

.

বনহুর নিজের কক্ষে বসে গভীরভাবে মনিরার কথা চিন্তা করছিল। কি অন্যায় সে করেছে মনিরার ওপর! তাকে পেয়েও হারিয়েছে, একটা মিথ্যা সন্দেহে তার প্রতি কি নির্মম আচরণ করেছে। কি অন্যায়ই না সে করেছে। মনিরা তার এ কঠিন ব্যবহার কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না—অভিমানিনী মনিরা হয়তো আত্মহত্যা করেছে। না না, তা পারবে না–কোলে যে কচি শিশু–তার স্বামীর সন্তান। মিথ্যা

কলঙ্কের ভয়ে এত বড় সত্যকে সে নষ্ট করতে পারে না। কিন্তু ঝিল শহর তার একেবারেই অপরিচিত কেউ তাকে চেনে না, জানে না। সেও কাউকে জানে না, শোনে না; কোন জায়গা চেনে না। এখন ঝিন্দ শহরে কোথায় তাকে খুঁজবে, কোথায় পাবে—

হঠাৎ বনহুরের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়, কক্ষে প্রবেশ করল নূরী, কোলে তার মনি।

নূরী বনহুরকে লক্ষ্য করে বলল—দেখ হুর, মনি কেমন হাসছে।

বনহুর অন্যমনস্কভাবে তাকালো মনির দিকে, তার চোখের সামনে ভেসে উঠল আর একটি কচি মুখ। আনমনা হয়ে গেল বনহুর।

নূরী অভিমানভরা কণ্ঠে বলল–কি হলো আজ আবার তোমার?

কুঞ্চিত করে একটু হাসল বনহুর–কেন?

মনে হচ্ছে কিছু যেন হয়েছে।

তুমি দেখছি গণনা জান।

সত্যি হয়েছে কিনা বল?

হয়েছে, আমাকে আজই ঝিন্দে যেতে হবে।

সিন্ধি নদীর ওপারে?

হ্যাঁ, নূরী, সিন্ধি নদীর ওপারে–যাক, চলো একটু গল্প করা যাক।

মনিকে আজ তুমি আদর করছ না কেন?

মনির গালে মৃদু টোকা দিয়ে বলল বনহুর–এই তো করছি।

আবার বনহুর আর নূরী মেতে উঠল মনিকে নিয়ে।

•

ঝিন্দ শহরে যাবার জন্য নূরী বনহুরকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিল। একজন ভীল সর্দারের বেশে, সজ্জিত হলো বনহুর।

রহমানও বনহুরের মতই ভীলের সাজে সজ্জিত হলো। স্থলপথেই বনহুর এবং রহমান ঝিন্দ রওয়ানা দিল। অবশ্য একখানা বজরা জলপথে চলল তাদের জিনিসপত্র ও অন্যান্য অনুচর নিয়ে।

ভীল সর্দারের বেশে সজ্জিত হয়ে তাজের পাশে গিয়ে দাঁড়াল বনহুর আর রহমান।

নূরী এসে দাঁড়াল তার পাশে, কোলে মনি।

আজ হঠাৎ কেন যেন বনহুরের দৃষ্টি মনির মুখে পড়তেই হৃদয়ে একটা আলোড়ন অনুভব করলো, তাজের পিঠে চাপতে গিয়ে ফিরে এসে মনিকে তুলে নিল কোলে। একটু আদর করে পুনরায় নূরীর কোলে ফিরিয়ে দিয়ে বললো–খোদা হাফেজ!

বনহুর তাজের পিঠে চেপে বসল।

রহমান চেপে বলল তার দুলকির পিঠে।

নূরী নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে রইলো বনহুরের দিকে। বনহুরের অশ্ব তাজ ও রহমানের অশ্ব দুলকি তখন ছুটতে শুরু করেছে।

হঠাৎ মনি শব্দ করে উঠল–বা ব্বা ব্বা—

নূরী চমকে উঠল, মৃদু চাপাকণ্ঠে বলল–কই, তোমার বাব্বা মনি? চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল মনির গাল দুটো।

বনহুর আর রহমানের অশ্ব তখন অদৃশ্য হয়েছে।

গহন বনের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে দস্যু বনহুর আর রহমান। বলিষ্ঠ দুই ভীল সর্দার যেন শিকারের অন্বেষণে চলেছে, তেজোদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল বিশাল বৃক্ষ, বলিষ্ঠ বাহু দেখলেই মনে হয় শক্তিশালী বীর পুরুষ এরা।

ঝিলে পৌঁছে বনহুর আর রহমান ভীল সর্দারের বেশেই ঝি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। ঝিন্দ রাজার জন্য উপঢৌকন স্বরূপ বনহুর আর রহমান দুটো হরিণ শিকার করে নিয়ে গিয়েছিল, তাই দিল।

ঝিন্দ রাজা হরিণ পেয়ে অনেক খুশি হলেন। বনহুর আর রহমানকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। এই বিদেশী ভীল সর্দারদ্বয়ের যেন কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য জয়সিন্ধ তার লোকদের আদেশ দিলেন।

রাজ-অন্তপুরের একটি কক্ষে বনহুর আর রহমানের থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া হলো, কিন্তু বনহুর এতে রাজী হলো না, আপত্তি জানিয়ে বলল–মহারাজ, আমরা ভীল জাতি, আমাদের থাকার জন্য ঘরদোর দরকার হবে না, শুধু আপনার রার্জ্যে থাকার অনুমতি চাই।

বৃদ্ধ মহারাজ কিছুতেই সম্মতি দান করলেন না, তিনি বললেন—হাজার হলেও আপনারা আমার অতিথি, কাজেই আপনাদের থাকা ও খাবার ব্যবস্থা আমারই করা দরকার। বেশ, আমার বাগানবাড়ির একটি কক্ষে আপনাদের থাকার সুব্যবস্থা করা হবে।

শেষ পর্যন্ত বনহুর আর রহমান মহারাজ জয়সিন্ধের কথায় রাজী হয়ে গেল।

ফলে ফুলে ভরা সুসজ্জিত বৃহৎ বাগানবাড়ি।

মহারাজ জয়সিন্ধ বৃদ্ধ অবস্থায় বাগানবাড়িতে না এলেও তার পুত্র মঙ্গলসিন্ধ বাগানবাড়ি সরগরম করে রেখেছিল। কাজেই বাগানবাড়ির জৌলুস পূর্বের চেয়ে এখন আরও জাকালো রয়েছে।

বাগানবাড়ির একটি নিভৃত অংশে বনহুর আর রহমানের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। বাগানবাড়ির অদূরে একটা ছোট অশ্বশালা ছিল, সেখানে তাদের অশ্ব দুটি রাখার ব্যবস্থা হয়েছে।

রাজা স্বয়ং এই ভীল অতিথিদ্বয়কে আশ্রয় দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা তাঁর পুত্র মঙ্গল সিন্ধের কানে গেল। মঙ্গল সিন্ধ তখন বাগানবাড়ির একটি বড় কক্ষে দলবল নিয়ে বাঈজী নাচে মশগুল।

কথাটা কানে যেতেই দু'চোখ তার ধক করে জ্বলে উঠল। এ বাগানবাড়ির একমাত্র অধিকারী এখন সে। তখনই সে দু'জন সঙ্গীকে আদেশ দিল, যাও-সেই ভীল সর্দারদ্বয়কে ডেকে আন আমার কাছে।

বনহুর আর রহমান সবেমাত্র বিশ্রামের আয়োজন করছিল ঠিক সেই মুহূর্তে দু'জন লোক এসে জানাল –তোমাদের দু'জনকে রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধ ডেকেছেন।

রহমান তাকালো বনহুরের দিকে—

বনহুর বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বলল–গিয়ে বল আমরা ক্লান্ত এখন যেতে পারব না।

লোক দু'জন ফিরে গিয়ে কথাটা জানালো মঙ্গলসিন্ধকে।

রাগে গর্জে উঠল কুমার মঙ্গলসিন্ধ–কি বললে, এত সাহস সামান্য ভীল সর্দারের যে, আমার আদেশ অমান্য করে! যাও পুনরায় গিয়ে বল এখনি আমি তাদের চাই।

আবার লোক দুটি ছুটলো।

বনহুর এবার লোক দুটিকে দেখে সোজা হয়ে বসল, বলল –কি খবর বান্দা?

লোক দুটির একজন বলে উঠল–এখনই যেতে হবে। না গেলে চলবে।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলল–তাকেই আসতে বল, যদি তার বিলম্ব সহ্য না হয়।

এবারও ফিরে গেল ওরা।

ভীল সর্দারদ্বয়ের কথা শুনে রেগে আগুন হলো কুমার মঙ্গলসিন্ধ, ক্রুদ্ধ ভাবে উঠে দাঁড়াল চল দেখে নেব কোন রাজা মহারাজা তারা।

কুমার মঙ্গলসিন্ধ হাজির হলো বাগানবাড়ির সেই কক্ষে, যে কক্ষে দস্যু বনহুর আর রহমানকে থাকতে দেয়া হয়েছে। .

মঙ্গলসিন্ধ ও তার সঙ্গীদ্বয় কক্ষে প্রবেশ করতেই রহমান উঠে দাঁড়াল, বনহুর যেমন শুয়েছিল তেমনি রইলো। কোন অভিবাদন বা সম্ভাষণ জানালো না।

মঙ্গলসিন্ধের চোখে-মুখে তখন মদের নেশা, বনহুরের তাচ্ছিল্য ভাব লক্ষ্য করে হুঙ্কার ছাড়ল আমি ডেকেছিলাম কেন যাওনি?

বনহুর হেসে বলল—বিনা কারণে ডাকলে আমি যাই না।

কি বললে ভীল সর্দার, আমি তোমাকে বিনা কারণে ডেকেছি!

তা নয় তো কি?

আমি জানতে চাই কার হুকুমে তোমরা আমার বাগানবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছ?

বনহুর মৃদু হেসে বলল তোমার পিতার কাছে এ প্রশ্ন করলে জবাব পাবে।

এ বাগবাড়ি আমার।

না, তোমার পিতার। তাঁর আদেশেই আমরা বাগানবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি।

তিনি বৃদ্ধ, এখন তাঁর মতিভ্রম ঘটেছে। নইলে সামান্য ভীল সর্দার তার বাগানবাড়িতে স্থান লাভ করে! শোন ভীল সর্দার, যদি তোমরা মঙ্গল চাও,

তবে এক্ষুনি আমার বাগানবাড়ি ত্যাগ কর।

নইলে কি করবে রাজকুমার? বলল বনহুর।

তোমাদের আমি শাস্তি দেব, কঠিন শাস্তি।

অতি উত্তম। এখন বিশ্রাম করতে দাও। যাও, তোমরা। বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলল।

তখনকার মত কুমার মঙ্গলসিন্ধু বিদায় নিতে বাধ্য হল।

চলে যাবার সময় কটমট করে বনহুর আর রহমানের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেরিয়ে গেল।

ওরা চলে যেতেই রহমান বলল—সর্দার, এটা কি ভাল হলো?

তা পরে দেখা যাবে। এখন বিশ্রামের নিতান্ত প্রয়োজন, বিশ্রাম কর। বালিশটা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল বনহুর।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে রহমান খেয়াল নেই তার।

হঠাৎ একটা নারীকণ্ঠের করুণ তীব্র আর্তনাদে ঘুম ভেঙে গেল রহমানের। আজ কয়েক দিনের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ক্লান্তি আর অবসাদে শরীর অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছিল, তাই এমনভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

ঘুম ভাঙতেই বিছানায় সজাগ হয়ে উঠে বসল। কক্ষের একপাশে একটা লণ্ঠন জ্বলছিল তারই আলোতে রহমান দেখলো বিছানায় বনহুর নেই।

রহমানের মনের ভেতর চড়াৎ করে উঠল, তাকে না জানিয়ে এভাবে কোথায় গেছে সর্দার! বিছানা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল, দরজার দিকে তাকাতেই দেখতে পেল দরজা খোলা। ব্যাপার কি, এ অন্ধকার রাতে হঠাৎ সর্দার গেল কোথায়! যদিও বনহুর দস্যু তবু রহমান একটু আশঙ্কিত হলো। নতুন স্থান, নতুন পরিবেশ, রাত দুপুরে তাকে না জানিয়ে কোথায় গেল সর্দার? তারপর নারীকণ্ঠের তীব্র করুণ আর্তনাদ।

রহমান কান পেতে রইলো, না আর কোন শব্দই সে শুনতে পেল না।

ধীরে ধীরে দরজা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

যদিও রহমান এবং বনহুরের শরীরে ভীল সর্দারের ড্রেস ছিল, কিন্তু নিচে ছোট্ট প্যান্ট পরা ছিল, তাতে লুকানো ছিল ছোরা আর পিস্তল। আর ছিল গুলি। প্রকাশ্যে তাদের পিঠে বাঁধা থাকত তীরধনু।

রহমান প্যান্টের পকেট থেকে ক্ষুদ্র রিভালবারখানা নিয়ে অন্ধকারে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এগুলো।

বাগানবাড়ির পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো রহমান, বড় ঘরটার মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই শিউরে উঠল।

কুমার মঙ্গলসিন্ধের সামনে মেঝেতে পড়ে রয়েছে একটি যুবতীর রক্তাক্ত মৃতদেহ।

রহমান তার উদ্যত রিভলবার হাতে খোলা জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন থেকে কে যেন তার কাঁধে হাত রাখল।

অন্ধকারে চমকে ফিরে তাকালো রহমান, অস্ফুট চাপাকণ্ঠে বলল–সর্দার। খুন!

বনহুর ঠোঁটে আংগুল চাপা দিয়ে বলল–চুপ!

০১০. ঝিন্দ শহরে দস্যু বনহুর

ঝিন্দ শহরে দস্যু বনহুর – ১০

০১.

বনহুর আর রহমান নিজেদের কামরায় ফিরে এলো।

যার যার বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করল তারা। রহমান শয্যায় বসে বললসর্দার, যুবতীটাকে হত্যা করা হয়েছে।

হ্যাঁ রহমান, আমার মনে হয় এমনি প্রতি রাতে ওখানে একটা নারী হত্যা হয়ে থাকে।

রহমান অস্ফুট কণ্ঠে বলল–কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

ভাগ্যিস তুমি ভিতরে লাফিয়ে প্রবেশ করনি রহমান।

সর্দার আর একটু হলেই আমি ভিতরে প্রবেশ করে কুমার মঙ্গলসিন্ধকে তার উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে দিতাম।

ভুল করতে রহমান। কারণ এখনও আমরা কোন সিন্ধান্তেই উপনীত হতে সক্ষম হইনি। বিশেষ করে এখনও আমাদের অনেক জানার বাকী রয়েছে।

না জানি বৌরাণী কোথায়।

হ্যাঁ রহমান। একটু থেমে পুনরায় বলে উঠল বনহুর–কি অবস্থায় আছে সে বেঁছে আছে কিনা, তাই বা কে জানে। রহমান যদি তার কিছু হয়ে থাকে সে জন্য দায়ী আমি আমি। আমারই ভুলের জন্য একটি সুন্দরী ফুলের মত জীবন–

রহমান হলে উঠে–সর্দার, আমার মন বলছে, তিনি বেঁচে আছেন, ভালই আছেন–

তোমার কথা যেন সত্য হয় রহমান। বনহুর চাদরটা গায়ে টেনে শুয়ে পড়ল।

রহমানও শয্যা গ্রহণ করল।

কিন্তু কারও চোখে ঘুম নেই—একটু পূর্বে যে দৃশ্য তারা দেখেছে তা অতি জঘন্য–অতি মর্মান্তিক। এ দৃশ্য দেখার পর কারও চোখে ঘুম আসতে পারে না।

মহারাজ জয়সিন্ধের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিল বনহুর-আর রহমান ভেবেছিল সত্যি এ এক মহৎ রাজার দেশে তারা এসেছে। এ রাজ্য থেকে তারা অতি সহজেই তাদের অভিসন্ধি পূরণ করতে সক্ষম হবে।

বনহুর আর রহমানের ঝিন্দ আগমনের উদ্দেশ্যই মনিরাকে এবং তার সন্তানকে খুঁজে বের করা। অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না বনহুরের মনে। মনিরাকে খুঁজে পেলেই তারা ফিরে যাবে নিজ আস্তানায়। সৎ মনোভাব নিয়েই বনহুর আর রহমান ঝিন্দের মহারাজ জয়সিন্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল যাতে তাদের আগমনে ঝিন্দবাসীদের মনে কোন সন্দেহ জাগতে না পারে।

কিন্তু প্রথম রাতেই বনহুর আর রহমান বুঝতে পারল তাদের এ আগমন যত সহজ ও স্বাভাবিক ভেবেছিল তা নয়। বিরাট একটা রহস্যজাল ছড়িয়ে রয়েছে এ রাজ্যের মধ্যে। কৌশলে এ রহস্য জাল তাকে গুটাতে হবে—এর গুপ্ত রহস্য ভেদ করতে হবে।

বনহুরের শরীরের মাংসপেশীগুলো তার চিন্তাধারার সংগে সংগে স্ফীত হয়ে উঠলো। ধমনীর রক্ত হয়ে উঠল উষ্ণ। চোখ দুটো জ্বলে উঠল ধক ধক করে। দাঁতে দাঁত পিষে বলল—নরপিশাচ মঙ্গলসিন্ধ তোমার সঙ্গে আমার বুঝাপড়া হবে।

বনহুর বুঝতে পেরেছে, রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধ শুধু অমানুষ নয়, সে . একজন দুশ্চরিত্র এবং নারী হত্যাকারী।

বাকী রাতটুকু নানা চিন্তায় কাটল বনহুরের।

ভোরে শয্যা ত্যাগ করে বললো বনহুর রহমান, তৈরি হয়ে নাও, বাইরে বের হব।

রহমান বলল–আমি প্রস্তুত সর্দার।

বনহুর আর রহমান ভীল সর্দারের নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণ করে বাগান বাড়ি থেকে বের হলো। রাজপথ ধরে হেঁটে চলল তারা।

মাত্র কিছুদূর এগিয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ট্যাক্সি সাঁ করে চলে গেল তাদের পাশ কেটে। বনহুর দ্রুতহস্তে রহমানকে একটু পাশে ঠেলে দিয়ে নিজেও সরে দাঁড়িয়েছিল, নইলে তক্ষুণি তাদের চাপা দিয়ে চলে যেত গাড়িটা।

গাড়িখানা চলে যেতেই বনহুর হেসে বলল–রহমান, মৃত্যুর প্রথম আলিঙ্গন থেকে প্রথম মুক্তিলাভ।

তাইতো সদার, আর একটু হলেই গাড়িটা আমাদের চাপা দিয়েছিল আর কি–

আবার চলতে শুরু করল ওরা।

বনহুর বলল—ভেবেছিলাম ঝিন্দে এসে নিশ্চিন্তে মনিরার সন্ধান করব কিন্তু তা হলো কই।

রহমান বলে উঠল—কে এই দুশমন, যে প্রথম দিনেই আমাদের পিছু লেগেছে?

অপেক্ষা কর রহমান, শিগগিরই জানতে পারবে।

এখন কোথায় চলছেন স্যার?

কোন একটা ভাল হোটেলে।

হোটেলে কেন, সর্দার, আমরা তো–

হ্যাঁ, মহারাজ জয়সিন্ধের অতিথিরূপে আমরা বেশ আরামেই আছি, কিন্তু আমাদের আর একটা আশ্রয়ের প্রয়োজন, সেখানে আমরা ভীল সর্দার নই; সভ্য নাগরিক। রহমান, একটা কথা–যতক্ষণ আমাদের বজরা সিন্ধি নদী অতিক্রম করে ঝিন্দ শহরে পৌঁছতে সক্ষম না হয়েছে, ততক্ষণ আমাদের কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না।

গোটা দিনটাই বনহুর আর রহমান ভীল সর্দারের বেশে ঝিন্দ শহরের অলিগলি বহু জায়গায় ঘুরে বেড়াল। মাঝে মাঝে কোন হোটেল বা রেস্টুরেন্টে উঠে কিছু কিছু খাওয়া-দাওয়া করে নিল।

সন্ধ্যার পূর্বে বাগানবাড়িতে ফিরে এলো তারা।

বাগানবাড়িতে প্রবেশ করতেই একটা নূপুরধ্বনি তাদের কানে এসে পৌঁছল।

বনহুর বলল চলো রহমান, মঙ্গলসিন্ধের আমোদ কক্ষে যাই, একটু নাচগান দেখে আসি।

হ্যাঁ রহমান, এসো।

বনহুর আর রহমান মঙ্গলসিন্ধের আমোদ কক্ষের দরজায় এসে দাঁড়াল।

কক্ষে তখন পুরদমে নাচগান চলছে।

একদল মাতালের সঙ্গে রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধ তাকিয়ায় ঠেশ দিয়ে বসে, আছে। সামনে কয়েকটা বোতল এবং কাঁচপাত্র।

বনহুর আর রহমানকে দেখতে পেয়ে মঙ্গলসিন্ধ সোজা হয়ে বসল, চোখেমুখে ফুটে উঠল একটা বিদ্রুপভরা হাসির আভাস। মঙ্গলসিন্ধ তার বিশিষ্ট বন্ধু কঙ্কর সিংকে লক্ষ্য করে মৃদু করে কিছু বলল।

কঙ্করসিং উঠে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বনহুর ও রহমানকে অভ্যর্থনা জানাল,– এসো এসো ভীল সর্দার, বস।

বনহুর আর রহমান একবার দৃষ্টি বিনিময় করে নিল। বনহুর এগিয়ে গিয়ে আসন গ্রহণ করল। রহমান তাকে অনুসরণ করল।

একটা নর্তকী তখন নেচে চলেছে।

একপাশে কয়েকজন বাদ্যকর বসে বাজনা বাজাচ্ছিল।

বনহুর আর রহমান বসলো ওপাশে ভিন্ন একটা জায়গায়।

নর্তকীর নাচ-গানে মুগ্ধ হলো বনহুর। সে আপন মনে নর্তকীর নাচ দেখতে লাগল। অপূর্ব, অদ্ভুত সে নাচ।

রহমানের চোখে যুদিও নর্তকীর দিকেই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু তার দৃষ্টিছিল মঙ্গলসিন্ধের মুখে এবং কক্ষের সকলকেই সে দেখছিল।

মঙ্গলসিন্ধের ইঙ্গিতে একজন লোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এটাও লক্ষ্য করল রহমান।

বনহুর আজ তন্ময় হয়ে গেছে ঝিন্দ নর্তকীর নাচ দেখে। নানারকম অঙ্গিভঙ্গি করে নেচে চলছে নর্তকীটি।

একটু পরে লোকটা ফিরে এলো, হাতে তার নতুন একটা মদের বোতল। কিন্তু রহমান সূক্ষভাবে লক্ষ্য করল, বোতলটা নতুন হলেও বোতলের ছিপি সম্পূর্ণ আলগা।

রাজকুমার জয়সিন্ধের ইঙ্গিতে বোতলটা কঙ্করসিংয়ের হাতে দিল লোকটা।

কঙ্কর সিং একটা কাঁচের পাত্র হাতে তুলে নিয়ে বোতল থেকে খানিকটা তরল পদার্থ ঢেলে নর্তকীর দিকে বাড়িয়ে ধরল।

নর্তকী মাচতে নাচতে এগিয়ে এলো কঙ্কর সিংয়ের নিকটে, নাচের ভঙ্গীমায় হাতখানা সে বাড়িয়ে দিল তার দিকে।

কঙ্কর সিং মদের পাত্রটা নর্তকীর হাতে দিয়ে তার কানে মুখ নিয়ে চাপা কণ্ঠে বলল-দক্ষিণ ধারের ভীল সর্দারকে দাও।

নর্তকী মদের পাত্র হাতে নিয়ে ঘূর্ণি হাওয়ার মত ঘুরপাক খেয়ে এগিয়ে চলল। প্রথমে সে রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধের সম্মুখে মদের পাত্রটা এগিয়ে ধরল। মঙ্গলসিন্ধ মদের পাত্র যেমনি হাত বাড়িয়ে নিতে গেল অমনি নর্তকী সুকৌশলে সরে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ভীল সর্দার বেশি বনহুরের সম্মুখে। মদের পাত্রটা এগিয়ে ধরল তার দিকে।

বনহুর অন্যমনস্কভাবে নর্তকীর হাত থেকে মদের পাত্রটা হাতে নিতে গেল।

অমনি রহমান হাত বাড়িয়ে নর্তকীর হাত থেকে মদের পাত্রটা নিয়ে নিল হাতে।

কক্ষে সবাই একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিল।

বনহুর অবাক হয়ে তাকাল রহমানের মুখের দিকে। হঠাৎ তার এ আচরণের জন্য বিস্মিত হলো সে।

রহমান মদের পাত্রটা হাতে নিয়ে নিজের মুখে দিতে গেল, অমনি হাত ফসকে পড়ে গেল মেঝেতে।

কাঁচের টুকরোগুলো খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল চারদিকে।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর উঠে দাঁড়াল।

বনহুর উঠে দাঁড়াতেই রহমানও উঠে পড়ল।

নর্তকী চকিতে একবার রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে নিল। সেও উঠে দাঁড়াল চট করে। তারপর ধনহুরের দক্ষিণ বাহুর উপর মাথা রেখে বলল–তুম হারামা পিয়ার হো।

বনহুরের ঠোঁটের ফাঁকে ফুটে উঠল বাঁকা হাসির রেখা, বলল—তুমবি মেরা পেয়ার।

নর্তকী আর ঘনিষ্ঠভাবে বনহুরকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছিল, বনহুর পূর্বের ন্যায় হেসেই বলল–ফির মোলাকাত হোকি। বনহুর বেরিয়ে গেল, রহমান তাকে অনুসরণ করল।

বনহুর আর রহমান বেরিয়ে যেতেই মঙ্গলসিন্ধ কঙ্কর সিংকে লক্ষ্য করে বললো–দেখেছ?

কঙ্কর সিং ঠোঁট উলটে অবজ্ঞাভরে বলল–দেখেছি।

মঙ্গলসিন্ধ বলল–কি মনে হলো?

অদ্ভুত চিজ বলে মনে হলো কুমার। কিন্তু উদ্দেশ্য মহৎ বলে মনে হলো না।

আমারও সেই রকম সন্দেহ হচ্ছে।

মনে হচ্ছে নয় কুমার, একেবারে বাগানবাড়িতে যাকে তাকে স্থান দেওয়া মোটেই উচিত হয়নি।

এটা আমার বাবার দোষ। বুড়োর ভীমরতি ধরেছে। শুধু তাই নয়, কঙ্কর, বারা আজকাল রাজকোষ থেকে আমার ভাতার পরিমাণও কমিয়ে দিয়েছে।

কি বললে, তোমার প্রাপ্য টাকা থেকে তুমি বঞ্চিত। যাই বল কুমার, তুমি বলেই বুড়ো রাজাকে আজও তোয়াজ করে চলছ। কেন, রাজ্য চালাবার বয়স কি তোমার হয়নি?

কি করব বল, পিতা গুরুজন–কাজেই তিনি বেঁচে থাকা পর্যন্ত আমাকে এসব সহ্য করেই চলতে হবে। তাছাড়া আর একটা নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে।

কি সমস্যা কুমার?

বাগানবাড়িতে আমরা আমোদ-প্রমোদ করি, এ কথা তিনি জানতে পেরে আমার নিকটে কৈফিয়ত তলব করেছিলেন।

কি জবাব দিয়েছ বন্ধু?

আমরা ক'জন বন্ধু-বান্ধব মিলে একটু গান-বাজনা করি, এটাই কি আপনার সহ্য হয় না, তাহলে আমি দেশ ত্যাগী হবো।

কি বললেন মহারাজ?

একমাত্র সন্তান আমি, দেশ ত্যাগী হলে চোখে অন্ধকার দেখবে, কাজেই বুঝতে পারছো……

বেশ, বেশ বন্ধু,

নর্তকী তখন দুটি কাঁচপাত্রে মদ ঢেলে এগিয়ে ধরে কুমার মঙ্গল সিন্ধ আর কঙ্কর সিংয়ের দিকে।

কেঁদে কেঁদে মনিরার চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। সুঙ্গী মেয়েদের অবস্থা তার মনে ভীণ ভয় লাগিয়ে দিয়েছে। কারণ তার কক্ষে একটা একটা করে অনেকগুলো মেয়ে এসে জড়ো হয়েছিল। সকলের কি মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে, সব দেখেছে মনিরা। এখন বাকী সে আর একটি মেয়ে—এ মেয়েটি সবচেয়ে বেশি কুৎসিত বলে তার জন্য গ্রাহক হয়নি, আর মনিরা সবচেয়ে সুন্দরী বলে তাকেও কেউ কিনতে পারেনি। মনিরার। মূল্য অন্যান্য যুবতীর তুলনায় চারগুণ বেশি কাজেই মনিরা রয়েই গেছে।

কিন্তু প্রতিমুহূর্তে সে অপেক্ষা করছে, কোন সময় তার অবস্থাও সঙ্গীনিদের মত হবে। তার সম্মুখেই কত মেয়েকে হাত-পা-মুখ বেধে চালান করা হলো। কতজনকে নানা রকম শাড়ি গয়না অলঙ্কারের লোভ দেখিয়ে। নিয়ে যাওয়া হলো। কতজনকে চাবুক মেরে আঘাতের পর আঘাত করে। পাঠিয়ে দেয়া হলো। মনিরা জানে, কোথায় তাদের পাঠানো হচ্ছে। কোথায় তারা চলে যাচ্ছে। যারা যাচ্ছে তারা আর কোনদিন ফিরে আসবে না আসতে পারে না।

অহরহ চোখের পানি আজ মনিরার সম্বল। আজ মনে পড়ে স্বামীর কথা মনে পড়ে শিশু নূরের কথা। মনে পড়ে স্বামীর স্নেহময় আদর-যত্নের কথা।

প্রাণের মায়া মনিরার পূর্ব থেকেই ছিল না, আজও সে করে না। শুধু চিন্তা ইজ্জতের। প্রদীপের ক্ষীণ আলোর মত একটা আশার স্বপ্ন এখনও মনিরার মনে জেগে রয়েছে। একদিন তার স্বামীর ভুল ভাঙবে বুঝতে পারবে তার মনিরা সত্যি অসতী নয়। এ বিশ্বাস যেন তার অটুট থাকে, এটাই শুধু কামনা করে সে।

তাই মনে-প্রাণে সদা খোদাকে স্মরণ করে—হে দয়াময় খোদা, তুমি আমার ইজ্জত রক্ষা কর। আমাকে তুমি পাপিষ্ঠদের হাতে থেকে বাঁচিয়ে নাও।

একদিন মনিরা গভীর রাতে বসে বসে নামায পড়ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করল বিশাল বপু মহিলাটি।

মনিরাকে নামায পড়তে দেখে রাগে বোমার মত ফেটে পড়ল। তখনই হাতে তালি দিল, সঙ্গে সঙ্গে বেঁটে মত লোক সেই কক্ষে প্রবেশ করল।

লোক দুটি আদেশের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

বিশাল বপুধারিনী হেমাঙ্গিনী বললো—একে নিয়ে চলো।

মনিরা তখন নামায শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছে। অসহায় দৃষ্টি নিয়ে তাকাল হেমাঙ্গিনী আর ঐ জমকালো বেঁটে লোক দু'টির দিকে।

হেমাঙ্গিনী গর্জে উঠল-লিয়ে চল্ বেটারা, হা করে কি দেখছি।

মনিরার দেহে প্রাণ নেই যে, অন্যান্য যুবতীর মর্মবিদারক দৃশ্যগুলো তখন তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। বুঝতে পারল আজ তার পালা, এই বুঝি তার জীবনের শেষ মুহূর্ত।

বেঁটে লোক দুটি মনিরাকে তখন এটে ধরে ফেলেছে। সেকি ভীষণ শক্তি তাদের দেহে। যেন অসুরের বল।

মনিরাকে যখন লোক দুটি জোর করে ধরলো তখন মনিরার সঙ্গিনী সেই কুৎসিত মেয়েটি হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল, ছুটে গিয়ে ওদের দু জনকে ছাড়িয়ে দিতে গেল।

সেই সময় হেমাঙ্গিনী হাতের বেত দিয়ে সপাং করে একটা আঘাত করল মেয়েটার শরীরে।

আর্তনাদ করে উঠল মেয়েটা।

হেমাঙ্গিনী প্রচণ্ড এ ধাক্কায় ফেলে দিল ওকে মেঝেতে।

এবার মনিরাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে চলল বেঁটে লোক দু'টি।

হেমাঙ্গিনী চলল সবার আগে।

কোথা দিয়ে কোথায় যে তাকে নিয়ে এলো মনিরা বুঝতেই পারল না। একটা মস্তবড় সুসজ্জিত কক্ষ। বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। মনিরাকে সেই কক্ষে ঠেলে দিয়ে লোক দুটো চলে গেল সামনে দাঁড়িয়ে হেমাঙ্গিনী।

কক্ষের ভিতরে ঢুকতেই শিউরে উঠল। একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের মাঝখানে, চোখেমুখে তার লালসাপূর্ণ কুৎসিত চাহনি—হেমাঙ্গিনী বলে উঠল–এই সেই মেয়ে দেখুন।

লোকটা মনিরাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল খাসা চেহারা, কিন্তু–

আর কিন্তু নয়, দেখুন যদি পছন্দ হয় তবে ঐ পুরোপুরিই দিতে হবে।

তা টাকার জন্য বাধবে না, যা চাও পাবে।

পছন্দ তাহলে হয়েছে?

চমৎকার চেহারা!

হ্যাঁ, হাজারে এমন একটা পাওয়া মুশকিল—বলল হেমাঙ্গিনী।

লোকটা এগিয়ে গিয়ে হেমাঙ্গিনীর কানে কানে কি যেন বলল, তারপর একতোড়া নোট হেমাঙ্গিনীর হাতে খুঁজে দিল।

হেমাঙ্গিনী একটু হেসে বেরিয়ে গেল।

মনিরার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। হায়; এ মুহূর্তে তাকে কে বাঁচাবে, কে তাকে রক্ষা করবে! মনিরা লোকটার দিকে তাকাল। আর একদিন সে এমনি অবস্থায় পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত খুন করতে বাধ্য হয়েছিল সে; কিন্তু আজ সে কি উপায়ে নিজেকে রক্ষা করবে, কোথায় লুকাবে

লোকটা লালসাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসছে।

মনিরা তাকাল দরজার দিকে, দরজা ভেজানো।

ওদিকের টেবিলে কয়েকটা মদের বোতল সাজানো। আর কয়েকটা কাঁচের গ্লাস।

মনিরা একবার বোতলগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখে নিল।

লোকটা এগিয়ে আসছে তার দিকে। কি ভয়ংকর তার চেহারা! লোকটা নিশ্চয়ই মদ খেয়েছে, পা দু'খানা ওর টলছে।

লোকটা যতই এগিয়ে আসছে, মনিরা ততই ঐ টেবিলটার দিকে এগুচ্ছে, যে টেবিলে সাজানো রয়েছে কয়েকটা মদের বোতল।

হঠাৎ মনিরা ছুটে গিয়ে একটা বোতল তুলে নিল হাতের মুঠায়।

মাতালটা তখনও দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে!

মনিরা বোতলটা ছুড়ে মারল লোকটার মাথা লক্ষ্য করে।

মুহূর্তে একটা বীভৎস কাণ্ড ঘটে গেল। মনিরার নিক্ষিপ্ত বোতলটা লোকটার মাথায় লেগে খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ল।

লোকটার মাথা কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল।

মনিরা দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে গেল।

মাথায় আহত জায়গাটা চেপে ধরে লোকটাও ছুটলো পিছু পিছু।

মনিরা কিছুদূর এগুতেই দেখল সামনে যমদূতের মত দাঁড়িয়ে হেমাঙ্গিনী; খপ করে ধরে ফেলল সে মনিরাকে!

ততক্ষণে মনিরার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে শয়তান মাতালটা। তার সমস্ত শরীর রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে।

হেমাঙ্গিনী ক্রুদ্ধ সিংহীর ন্যায় গর্জন করে উঠল। একবার নয়, দু'বার তার পাওয়া টাকা হাতছাড়া হয়ে গেল। রাগে মনিরার গলাটা দু'হাতে টিপে ধরলো, দাঁতে দাঁত পিষে বলল–তোকে খুন করব!

লোকটা বলে উঠল—আগে আমার টাকা ফেরত দাও, তারপর ওকে যা খুশি কর!

হেমাঙ্গিনী এবারও বাধ্য হলো লোকটার টাকা ফেরত দিতে।

হেমাঙ্গিনী লোকটার টাকা ফেরত দিয়ে পুনরায় মনিরার গলা টিপে ধরলো। নিশ্চয়ই এবার ওকে হত্যা না করে ছাড়বে না। জোরে, খুব জোরে চাপ দিচ্ছে, মনিরার চোখ দুটো কপালে উঠেছে, এবার হয়তো তার জীবন শেষ!

হঠাৎ হেমাঙ্গিনীর চোখের সামনে ভেসে উঠলো গাদা গাদা টাকার বাণ্ডিল। মনিরাকে হত্যা করলে এতগুলো টাকা তার বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হেমাঙ্গিনীর হাত দু'খানা আপনা আপনি শিথিল হয়ে এলো। মনিরাকে ছেড়ে দিল সে।

এরপর থেকে শুরু হলো মনিরার ওপর নির্মম অত্যাচার। প্রতিদিন তাকে একটা থামের সঙ্গে বেঁধে পঁচিশ ঘা বেত মারা হতে লাগল, আর জিজ্ঞাসা করা হতে লাগল, সে ও-রকম কাজ আর করবে কি না। কিন্তু মনিরা পঁচিশ ঘা বেত খেয়েও বলত—সে ও-কাজ করবে।

হেমাঙ্গিনীর কড়া আদেশ, যতদিন মনিরা স্বীকার না করবে বা রাজী না হবে ততদিন এভাবে-বেত্রাঘাত করা হবে।

রোজ মনিরার ওপর এই অকথ্য অত্যাচার চলতে লাগল।

ইতোমধ্যে আরও চারজন যুবতী পাকড়াও করে আনা হয়েছে। পূর্বের শূন্যতা আবার পূর্ণ হয়েছে। সে এক করুণ দৃশ্য! সব মেয়েই কাঁদছে, মাথা কুটে কাঁদছে। সবাই সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে কন্যা-বধু।

আজকাল হেমাঙ্গিনীর ব্যবসা আরও কেঁপে উঠেছে। শুধু নারী ব্যবসাই নয়, শিশু ব্যবসাও সে শুরু করেছে! বিভিন্ন দেশে তার অনুচর ছড়িয়ে রয়েছে। যেখানে যা সুবিধা করতে পারে সে তাই করছে। ছোট ছোট মেয়েকে চালান দেওয়া হয় এ দেশ থেকে সে দেশে।

নারীদেরও সেই অবস্থা!

হেমাঙ্গিনীর সহকারিগণের সংখ্যা এখন অনেক বেশি। ব্যবসা চলছে। পুরাদমে।

০৩.

অশ্বপৃষ্ঠে দস্যু বনহুর আর রহমান ঝিল শহরের শেষ সীমান্তে ভাগিন্দী, নদীর তীরে এসে দাঁড়াল। তাদের বজরা আজ পৌঁছে গেছে। বনহুর আর রহমান নিজেদের বজরায় এসে উপস্থিত হলো।

বনহুর নিজের অনুচরগণের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করল। পথে তাদের কোন অসুবিধা বা কোন বিপদ এসেছিল কিনা তাও জেনে নিল।

না, কোন অসুবিধা বা বিপদের সম্মুখীন হয়নি তার অনুচরগণ। বনহুর আশ্বস্ত হলো।

বনহুর বজরায় প্রবেশ করে নিজের গোপন অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পরীক্ষা করে নিল।

বনহুর আর রহমান যখন বজরা থেকে ফিরে এলো তখনও তাদের শরীরে পূর্বের সেই ভীল সর্দারের ড্রেস। বাগানবাড়িতে প্রবেশ করে নিজের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করল তারা।

বনহুর আর রহমান একই কক্ষে ঘুমাতো।

সেদিন বাইরে থেকে ফিরতেই একজন রাজকর্মচারী বলল–ভীল সর্দার, আপনাদের কুমার মঙ্গলসিন্ধ পৃথক পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা করেছেন।

রহমান অবাক কণ্ঠে বলল—কেন?

রাজকর্মচারী বলল—আপনাদের যাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেই কারণে এরকম সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

রহমান আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, বনহুর বাধা দিয়ে বলল–তোমাদের কুমার বাহাদুরকে আমার ধন্যবাদ জানাবে। তার এই সুব্যবস্থার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

রাজকর্মচারী চলে গেল।

রহমান তাকাল বনহুরের দিকে—সর্দার!

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলল–যাও রহমান, তোমার নিজ বিশ্রাম-কক্ষে যাও।

রহমান কোনদিন তাদের সর্দারের কথার প্রতিবাদ করেনি। আজও সে পারল না, চলে গেল তার নিজের বিশ্রামকক্ষে। যদিও রহমান নিজের কক্ষে গিয়ে শয্যা গ্রহণ করল, কিন্তু মন তার সদা আশঙ্কাগ্রস্ত রইলো। নিশ্চয় এর পেছনে কোন কারণ রয়েছে।

বনহুরও নিজের কক্ষে প্রবেশ করল।

অন্যদিন হলে বনহুর তার ভীল সর্দারের ছদ্মবেশ ত্যাগ করে' শয্যা গ্রহণ কল্পত। আজ সে ঐ বেশে শয্যায় গিয়ে বসল। একটা নতুন কোন কিছুর প্রতীক্ষা করতে লাগল সে।

রাত বেড়ে আসছে।

বনহুর বিছানায় শুয়ে নিশ্চুপ চোখ বন্ধ করে রয়েছে।

পাশের ঘরে রহমানও বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছে, আর মাঝে মাঝে উঠে নিজের জানালা দিয়ে সর্দারের কক্ষে উঁকি দিয়ে দেখে নিচ্ছে।

রহমান যে কক্ষে শুয়েছে সে কক্ষের জানালা দিয়ে বনহুরের কক্ষের কিছুটা অংশ দেখা যায়। বিশেষ করে বনহুরের শয্যার কিছুটা ওর নজরে পড়ে। রহমান আজ সর্দারকে ছদ্মবেশ পরিবর্তন না করেই শয্যা গ্রহণ করতে দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছিল। তারপর বুঝে নিয়েছিল নিশ্চয়ই সর্দার এই বেশেই রাত্রিতে বের হয়। সে কারণে সেও ঘুমাতে পারেনি, সর্দার যদি বাইরে বের হয় তবে রহমানও চুপ করে শুয়ে থাকবে না, এটাই ছিল তার মনোভাব এবং সে কারণেই রহমান বারবার জানালায় উঁকি দিয়ে দেখে নিচ্ছিল কি করছে তার সর্দার।

প্রহরের পর প্রহর গড়িয়ে চলেছে।

রোজই বাগানবাড়ির ওপাশ থেকে ভেসে আসে নর্তকীর পায়ের নূপুরের শব্দের সঙ্গে নানা কণ্ঠের হাস্যধ্বনি আর করতালি। আজ কিন্তু বাগানবাড়ি বেশ নীরব রয়েছে। কুমার মঙ্গলসিন্ধ কোথাও গেছে হয়ত, তাই আজ বাগানবাড়ি এমন নিশ্চুপ।

রহমান কখন একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছে খেয়াল নেই ওর। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তার, একটা মেয়েলি কণ্ঠস্বর ভেসে এলো তার কানে। সর্দারের কক্ষ থেকে শব্দটা ভেসে আসছে। রহমান চট করে শয্যা ত্যাগ করে জানালার শাসীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। চমকে উঠল রহমান, মঙ্গলসিন্ধের আমোদকক্ষের নর্তকী তার সর্দারের পাশে বসে, সর্দারের দক্ষিণ হাতখানা নর্তকীর মুঠায় ধরা রয়েছে। আবেগভরা কণ্ঠে কি যেন বলছে নর্তকী। ওর গলায় আওয়াজ শুনা যাচ্ছে কিন্তু কথাগুলো স্পষ্ট শুনা যাচ্ছে না।

নর্তকী বনহুরের কাঁধে মাথা রাখল।

বনহুর কি যেন বলছে, ঠিক বুঝা না গেলেও এটুকু শুনতে পেল রহমান, তুমহারে লিয়ে মাইভি বহুৎ পেরেশান... এরপর আর কিছুই বোঝা গেল না।

নর্তকী বাহু দু'টি দিয়ে সর্দারের কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরেছে।

রহমান আর দাঁড়াতে পারল না—একটা লজ্জা তাকে সরিয়ে নিল জানালা থেকে।

সর্দারের হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

তবে কি সর্দার ভুলে গেল তার কর্তব্য! একটা নারীর মোহ তাকে অভিভূত করে ফেললো! রহমানের মনে গভীর একটা অভিমান চাড়া দিয়ে উঠল!

নিজের শয্যায় পুনরায় শুয়ে পড়ল। এ কারণেই বুঝি মঙ্গলসিন্ধ সর্দারকে ভিন্ন কামরায় শোবার ব্যবস্থা করেছিল। রহমানের মনে পড়ল, সেদিন রাতে নর্তকী যে মদের পাত্র তার সর্দারের সম্মুখে বাড়িয়ে ধরেছিল তার মধ্যে মেশানো ছিল হয়ত মারাত্মক বিষ। আজও নর্তকী কোন মন্দ অভিসন্ধি নিয়ে তার সর্দারের নিকটে এসেছে, এটা সত্য। রহমান আবার শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল, ধীরে ধীরে দাঁড়াল সেই জানালার পাশে।

একি, সর্দার আর নর্তকী দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

রহমান মুহূর্ত বিলম্ব না করে, দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। বনহুর আর নর্তকীর পেছনে দাঁড়াল, বলল-সর্দার!

চমকে ফিরে দাঁড়াল বনহুর।

নর্তকী আরও বেশি চমকে উঠলো, বাগানবাড়ির অন্ধকারে তাকাল সে রহমানের মুখের দিকে।

বনহুর বুঝতে পারল, রহমান তাকে বাইরে যেতে নিষেধ করছে। একটু হেসে বলল—এক্ষুণ আসছি রহমান, একে একটু পৌঁছে দিয়ে আসি।

সর্দার, আমিই তো রয়েছি। এসো-নর্তকীকে লক্ষ্য করে বলল রহমান।

অগত্যা নর্তকী রহমানের সঙ্গে যেতে বাধ্য হলো।

বনহুর ফিরে এলো নিজের কামরায়।

মঙ্গলসিন্ধ পায়চারী করছে, চোখে তার ক্রুদ্ধ ভাব।

কঙ্কর সিং একপাশে দাঁড়িয়ে, হাতে তার সুতীক্ষ্ণধার ছোরা। ছোরাটা সে হাতের মধ্যে নাড়ছে। বিদ্যুতের আলোতে ঝকঝক উঠছে ছোরাটা।

সামনে নর্তকীটি, নতমস্তকে দাঁড়িয়ে আছে সে।

মঙ্গলসিন্ধ গর্জন করে উঠল—এটুকুই তুমি পারলে না সিমকী। তোমাকে দিয়ে আমার কিছু হবে না।

নর্তকী সিমকী হাত জুড়ে বলল-মেরী কোই কসুর নেহি কুমার বাহাদুর। ও তো মেরী সাথ আতে থে। লেকিন উসকা সাথ যো আদমী হ্যায় ও সব কুছ বরবাদ কিয়া.....

কঙ্কর রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করে বলে উঠলকুমার, আজ সুযোগ নষ্ট হলো, এরপর যেন না হয়।

মঙ্গলসিন্ধ কঙ্কন সিংয়ের দিকে তাকিয়ে বলল-তুমিই তো আমার ভরসা কঙ্কর!

তাহলে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, ভীল সর্দারের তাজা রক্ত আমি নিঃশেষ করে দেব।

মঙ্গলসিন্ধ এবার বলল-হা, ঐ লোক দু'টিই যেন আমার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার নর্তকীকে লক্ষ্য করে বলল সে–তুমি এখন যেতে পার সিমকী।

সিমকী সালাম জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিংয়র মধ্যে শুরু হলো গোপন আলোচনা। ভীল সর্দারদ্বয়কে কি করে তাড়ানো যায়, এ নিয়ে চলল তাদের নানারকম পরামর্শ।

প্রথম থেকেই মঙ্গলসিন্ধের চক্ষুশূল হয়ে এসেছে এই ভীল সর্দারদ্বয়।

এদের চালচলন আর কথাবার্তা মঙ্গলসিন্ধের মনে সৃষ্টি করছে একটা বিষকর জ্বালা। সামান্য ভীল সর্দার হয়ে প্রথম দিনই তার কথা অমান্য করেছে—এ কম অপরাধ নয়! তাছাড়া ভীল সর্দারের অপরূপ সৌন্দর্য রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধের মনে ঈর্ষার সৃষ্টি করছে।

এদের আগমনে মঙ্গলসিন্ধ আর তার বন্ধু কঙ্করসিং মোটেই খুশি হতে পারেনি। বাগানবাড়িতে তারা যা খুশি তাই করে যাচ্ছিল তাদের কাজে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ভীল সর্দার দু'জন, ইচ্ছামত তাদের বাসনা সিদ্ধ হচ্ছে না এখন।

০৪.

সেদিন দ্বিপ্রহরে নদীতীরে কয়েকজন যুবতী আপন মনে, স্নান করছিল। কেউ সাঁতার কাটছিল, কেউ বা গুণ গুণ করে গান গাইছিল। কেউ হাত নেড়ে নদীর পানি নিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছিলো আর একজন যুবতীর গায়ে।

এমন সময় মঙ্গলসিন্ধ ও তার বন্ধু কঙ্কর সিং দু'জন দুটি অশ্বে নদীর তীর গিয়ে দাঁড়াল।

যুবতীগণ নদীবক্ষে আপন মনে সাঁতার কাটলেও তারা দেখতে পেল রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধ এবং কঙ্করসিংকে। তাড়াতাড়ি ওরা নিজেদের কাপড় সংযত করে নিয়ে ঘাটের পাড়ে এসে দাঁড়াল। ভয়-বিহবল আর সঙ্কুচিতভাবে যুবতীগণ এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল।

মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিংয়ের মধ্যে ইংগিতপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। কঙ্কর সিং চট করে অশ্ব থেকে নেমে এগিয়ে গেল যুবতীদের দিকে।

যুবতীরা তখন সবাই এক জায়গায় জটলা পাকিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েছে।

কঙ্কর সিংকে লক্ষ্য করে মঙ্গলসিন্ধ আংগুল দিয়ে একটা সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়ে দিল।

কঙ্কর সিং খপ করে তার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনল মঙ্গলসিন্ধের অশ্বের পাশে।

সঙ্গে সঙ্গে যুবতীরা তীব্র আর্তনাদ করে উঠল। একসঙ্গে সবাই বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার শুরু করল।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর আর রহমান অদূরস্থ একটা পথ ধরে কোথাও যাচ্ছিল। যুবতীদের আর্তনাদ তাদের কানে এসে পৌঁছল।

রহমান বলে উঠলসর্দার, নিশ্চয়ই নদীতীরে যুবতীর দল স্নান করছিল, হয়তো কুমীরে কাউকে নিয়ে গেছে......

বনহুর বলে উঠল-চলো দেখি!

বনহুর আর রহমান,দ্রুত ছুটে গেল নদীতীরে। কিন্তু নদীতীরে পৌঁছে বিস্ময়ে চমকে উঠলো, রহমান আর বনহুরের চোখ দুটো জ্বলে উঠল ধ করে। কঠিন হয়ে উঠলো তার মুখমণ্ডল; দক্ষিণ হাত মুষ্টিবদ্ধ হলো।

মঙ্গলসিন্ধ অশ্বপৃষ্টে বসে একটা যুবতীর দক্ষিণ হাত টেনে ধরেছে আর কঙ্কর সিং যুবতীটিকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে দেবার জন্য চেষ্টা করছে। যুবতীটি প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে ওদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নেবার জন্য ধস্তাধস্তি করছে।

আর অন্যান্য যুবতী আর্তকণ্ঠে চিৎকার করছে—বাঁচাও বাঁচাও......

বনহুর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে ঝাপিয়ে পড়ল কঙ্কর সিংয়ের ওপর। প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিল ওর নাকে। সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কর সিং মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে।

মঙ্গলসিন্ধের দু'চোখ হতে আগুন ঠিকরে বের হতে লাগল। মুখের শিকার নষ্ট হলে যেমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে হিংস্র বাঘ, ঠিক তেমনি হলো তার অবস্থা।

যুবতীটি ছাড়া পেয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল।

কঙ্কর সিং এবার গায়ের ধূলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল, কোন কথা বলার সাহস হলো না তার।

মঙ্গলসিন্ধ রাগে গজগজ করছে, কিন্তু সেও কিছু উচ্চারণ করল না। মঙ্গলসিন্ধ অশ্বপৃষ্ঠে ছিল।

কঙ্কর সিং এবার নিজের অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসল, একবার তীব্র কটাক্ষে বনহুর আর রহমানের দিকে তাকিয়ে মঙ্গলসিন্ধের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল। তারপর দ্রুত চলে গেল সেখান থেকে রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিং।

বনহুর আর রহমান এবার যুবতীটির দিকে তাকাল।

সেই যুবতীটিও তখন নিজের দলের মধ্যে গিয়ে পঁড়িয়েছে। ওরা সবাই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চোখে তাকিয়ে আছে, কেউ কোন কথা বলতে পারল না।

বনহুর আর রহমান নিজেদের গন্তব্যপথে পা বাড়াল।

রাজসভায় মহারাজ জয়সিন্ধ বসে রাজকার্য পরিচালনা করছিলেন–সেখানে উপবিষ্ঠ রাজ-পরিষদগণ! এমন সময় পূর্বদিনের সেই যুবতী এবং তার বৃদ্ধ পিতা রাজসভায় এসে হাজির হলো।

প্রথমে বাধা দিচ্ছিল রাজকর্ম চারিগণ।

রাজা আদেশ দিলেন–আসতে দাও।

যুবতী এবং তার পিতা এসে হাত জুড়ে দাঁড়াল। বৃদ্ধ কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল—মহারাজ, একি অন্যায় অত্যাচার। বিচার করুন মহারাজ, বিচার। করুন.....

মহারাজ চিরদিনই প্রজাদের হিতাকাক্ষী। বৃদ্ধের চোখের পানি তার অন্তরে আঘাত করল, বললেন-কে তোমাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করেছে, বল?

বৃদ্ধ পুনরায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল—মহারাজ, যদি অভয় দেন তবে বলতে পারি।

মহারাজ জয়সিন্ধ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান রাজা, এ কথায় তিনি বৃদ্ধাকে অভয় দিয়ে বললেন—তুমি স্বচ্ছন্দে বল।

বৃদ্ধ হাত জুড়ে বিনীত কণ্ঠে বলল–মহারাজ, আমার কন্যা এবং তার কয়েকজন সঙ্গিনী নদীতে স্নান করছিল। এমন সময় বৃদ্ধ ভয়বিহ্বল চোখে তাকাতে লাগল চারদিকে, এমন সময়—আপনার-থেমে পড়ল বৃদ্ধ।

মহারাজ জয়সিন্ধ বললেন–বল, কি বলতে চাও তুমি?

মহারাজ, আপনার পুত্র ও তার বন্ধু কঙ্কর নদীতীরে পৌঁছে আমার কন্যাকে জোরপূর্বক হরণ করার চেষ্টা করছিল।

ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করে উঠলেন রাজা জয়সিন্ধ—এ কথা সত্য?

এবার যুবতী বলে উঠলহাঁ, মহারাজ এ কথা সত্য। সেই মুহূর্তে দু'জন ভীল সর্দার সেখানে উপস্থিত হয়ে আমাকে তাদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নেয়।

মহারাজ জয়সিন্ধ বলে উঠলেন—কে সেই মহান ভীল সর্দারদ্বয়?

বৃদ্ধ বলে উঠল তারা আপনার অতিথি ভীল সর্দারদ্বয়।

মহারাজার চোখেমুখে একটা কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠল। তার মহান অতিথিদ্বয়ের মহৎ উপকারের জন্য হৃদয়ে গর্ব অনুভব করলেন। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, সেনাপতি গুপ্ত সেনকে লক্ষ্য করে বললেনসেনাপতি, এক্ষণি মঙ্গল ও তার বন্ধু কঙ্করকে ডাকুন, আমি এর বিচার করব। আর শুনুন, বাগানবাড়ি থেকে আমার ভীল অতিথিদ্বয়কে ডেকে আনবেন।

সেনাপতি তখনই বেরিয়ে গেল।

অল্পক্ষণ পরে রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিং সহ সেনাপতি গুপ্তসেন ফিরে এলেন। তাদের পেছনে পেছনে প্রবেশ করল বনহুর আর রহমান।

ভীল সর্দারের বেশে বনহুরকে বড় সুন্দর লাগছিল। মাথায় পালকের মুকুট, বাজু এবং গলায় কাল ফিতার চওড়া তাবিজ বাধা, কানে বালা, হাতেও বালা। পিঠের সঙ্গে তীরধনু বাঁধা রয়েছে।

মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিংয়ের মুখ শুকিয়ে চুন ললো, যখন তারা দেখল- মহারাজার সামনে দণ্ডায়মান নদীতীরের সেই যুবতীটি ও তার পিতা। বুঝতে কিছু বাকী থাকে না তাদের। সকলের অলক্ষ্যে একবার মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিল ওরা দু'জনে।।

মহারাজ জয়সিন্ধ পুত্র এবং তার বন্ধু কঙ্কর সিংয়ের দিকে তাকিয়ে গর্জন করে উঠলেন—এ কথা সত্য? তোমরা এই যুবতীটিকে হরণের চেষ্টা করেছিলে?

মঙ্গলসিন্ধ পিতার কথায় ফিরে তাকাল যুবতীর দিকে, তারপর একটা ঢোক গিলে বলল—ওকে চিনি না।

বনহুর এগিয়ে এলো, গম্ভীর কণ্ঠে বলল-মিথ্যে কথা! কাল নদীতীরে এই যুবতীকে এরা দু'জনে জোর করে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল

মহারাজ। আংগুল দিয়ে মঙ্গল ও কঙ্করকে দেখিয়ে দিল বনহুর।

ক্রুদ্ধভাবে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করল মঙ্গলসন্ধি, কঙ্কর সিংও সকলের অলক্ষ্যে দাঁতে দাঁত পিষল। ওদের যত রাগ গিয়ে পড়ল বনহুরের ওপর।

মহারাজ বলে ওঠেন—নারীহরণের চেষ্টার জন্য আমি তোমাদের দু'জনকে শাস্তি দিচ্ছি। তোমরা দু'জন এই রাজসভায় নাকে কানে খৎ দিয়ে বল, আর অমন কাজ করবে না।!

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলো মঙ্গল ও কঙ্কর রাজসভায় দাঁড়িয়ে নাকে কানে খৎ দিতে।

রাগে-অপমানে মঙ্গলসিন্ধের মুখমণ্ডল কাল হয়ে উঠল, এর চেয়ে তার পিতা যদি তাদের হত্যার আদেশ দিতেন তাতেও দুঃখ ছিল না। প্রকাশ্য রাজসভায় এতগুলো লোকের সামনে এই অপমান মৃঙ্গলসিন্ধ আর কংকর সিংয়ের মনে আগুন জ্বেলে দিল।

মহারাজ জয়সিন্ধ নিজের কণ্ঠ থেকে মহামূল্য হার খুলে পরিয়ে দিলেন ভীল সর্দারবেশী দস্যু বনহুরের কণ্ঠে । তারপর বললেন— আমার রাজ্যে মা-বোনদের প্রতি যারা অন্যায় আচরণ করে তাদের আমি চরম শাস্তি দিয়ে থাকি, আর যারা তাদের মর্যাদা দেয় তাদের আমি করি শ্রদ্ধা।

মহারাজের এই শ্রদ্ধাপূর্ণ উপহার অবহেলা করতে পারল না বনহুর, মহারাজার হাত চুম্বন করে আনন্দ প্রকাশ করলো সে।

এ দৃশ্য রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধের হৃদয়ে কষাঘাত করল। একটা প্রচণ্ড ঈর্ষার আগুন দগ্ধীভূত করে চলল তাকে!

এরপর মঙ্গল এবং কঙ্কর নতমস্তকে রাজসভা ত্যাগ করল।

০৫.

রাজসভা থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো বনহুর আর রহমান। আপন মনে কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলল তারা। বনহুর আর রহমানের পেছনে কিছুটা দূরত্ব রেখে এগিয়ে আসছে যুবতী ও তার বৃদ্ধ পিতা।

রাজবাড়ি ছেড়ে অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছে তারা।

হঠাৎ একটা গুলির শব্দ ও সেই সঙ্গে আর্তনাদ শুনে ফিরে তাকাল বনহুর আর রহমান। একি! পথের বুকে মুখে থুবড়ে পড়ে গেছে যুবতীর পিতা বৃদ্ধ চাষী।

বনহুর আর রহমান দ্রুত এগিয়ে গেল, নিকটে পৌঁছে বিস্ময়ে হতবাক হলো। বৃদ্ধের বুকে একট গুলি এসে বিদ্ধ হয়েছে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে পথের খানিকটা অংশ।

বনহুর বলে ওঠে—মঙ্গলসিন্ধ তার অপমানের প্রতিশোধ নিল।

রহমান বললোসর্দার, একি তাহলে রাজকুমার মঙ্গল সিন্ধের কাজ?

হ্যাঁ রহমান, এটা তারই কাজ।

যুবতী তখন পিতার বুকে আছড়ে পড়ে কাঁদছে।

অল্পক্ষণেই লোকজন জড়ো হয়ে গেল সেখানে। কিন্তু সেই অজ্ঞাত খুনীর সন্ধান কেউ পেল না।

বাগানবাড়ি। মঙ্গলসিন্ধের আমোদকক্ষ।

মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিং পাশাপাশি আসনে উপবিষ্ট। সামনে দু'জন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক দণ্ডায়মান। ভয়ংকর চেহারা, বলিষ্ঠ মাংসপেশী।

লাল টকটকে চোখ দুটো। পরনে টানাডোরা কাটা জামা ও খাকী হাফ প্যান্ট। মাথায় এক আংগুল লম্বা ছাঁটা চুল। দেখলেই মনে হয় শয়তানের সহোদর।

মঙ্গলসিন্ধ বলে উঠল—এ অপমানের প্রতিশোধ আমি চাই। প্রকাশ্য রাজদরবারে আমাকে অপমান! কিছুতেই আমি বরদাশত করতে পারব না।

কঙ্কর সিং বলে ওঠে-সমস্ত দোষ ঐ শয়তান ভীল সর্দারটার। ওর জন্যই তো এ অপমান!

মঙ্গলসিন্ধ বলে উঠল—যেমন করে হোক ঐ ভীল সর্দারের মাথা আমি নেব। নইলে আমার নাম মঙ্গলসিন্ধ নয়।

এবার গুণ্ডালোক দুটিকে দেখিয়ে বলল কঙ্কর-এদের আদেশ করো মঙ্গল, এরাই তোমার কার্য সিদ্ধ করে দেবে, চাই শুধু টাকা!

গুণ্ডাদের মধ্যে বেশি মোটা লোকটা বলে উঠল-হুজুর, শুধু আপনার আদেশের প্রতীক্ষা করছি, হুকুম করুন এখনই ভীল সর্দারের মাথা এনে দিচ্ছি।

মঙ্গলসিন্ধ বলল—কত টাকা নেবে তোমরা?

গুণ্ডাদের হয়ে জবাব দিল কঙ্কর-বেশি না, পাঁচ হাজার দিও।

পাঁচ হাজার, তার চেয়েও বেশি দেব কঙ্কর, তবু ওদের মাথা চাই!

কঙ্কর গুণ্ডাদের দিকে তাকিয়ে একটা ইংগিত করল।

এবার গুণ্ডা লোকটা বলে উঠল—হুজুর, কিছু টাকা অগ্রিম দিতে হবে, গরীব মানুষ আমরা

বেশ এই নাও, এতে এক হাজার টাকা আছে। মঙ্গলসিন্ধ পকেট থেকে একতোড়া নোট বের করে লোকটার হাতে দিল।

লোক দুটি বেরিয়ে গেল এবার।

মঙ্গলসিন্ধ বলল কঙ্কর, বুড়ো বাবা টাকা-পয়সার দিকে এবার কড়া নজর দিয়েছে। সিন্দুকের চাবি এখন তিনি নিজের কাছে রাখেন।

কঙ্কর হেসে উঠল—এই কথা? আচ্ছা তোমাকে একটা বুদ্ধি, ঠাওরে দিচ্ছি।

কঙ্কর মঙ্গলসিন্ধের কানে মুখে নিয়ে ফিস ফিস করে কিছু বলল। মঙ্গলসিন্ধের চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

০৬.

গভীর রাত।

রাজপ্রাসাদের পেছন দিকের সিঁড়ি বেয়ে একটা ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে দোতলার দিকে এগুচ্ছে। মহারাজ জয়সিন্ধের কক্ষের জানালা দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল

ছায়ামূর্তি, এবার মহারাজ জয়সিন্ধের বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে অন্ধকারে তাকালো চারদিকে, তারপর অতি লুঘু হাতে সন্তর্পণে বালিশের তলা থেকে চাবির গোছা তুলে নিল।

এবার ছায়ামুর্তি সিন্দুকের পাশে দাঁড়াল। চাবি দিয়ে খুলে ফেলল সিন্দুকের তালা। তারপর ক্ষিপ্রহস্তে কয়েক তোড়া নোট তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়াল সামনের দিকে।

অমনি ছায়ামূর্তির সামনে একটা জমকালো মূর্তি এসে দাঁড়াল, অন্ধকারেও তার হাতের অস্ত্রটা চকচক্ করে উঠল।

চমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ছায়ামূর্তি, দু'চোখে তার ভয় ও বিস্ময়। অন্ধকার। হলেও চিনতে বাকী রইলো না জমকালো মূর্তির হাতে রয়েছে সুতীক্ষ্ণধার ছোরা।

জমকালো মূর্তি ছোরাখানা ছায়ামূর্তির বুকে চেপে ধরে বাম হাত মেলে

ধরল।

ছায়ামূর্তি যেমন নীরবে টাকার তোড়াগুলো পকেটে রেখেছিল, তেমনি নীরবে বের করে দিল জমকাল মূর্তির হাতে।

জমকালো মূর্তি টাকা নিয়ে নিমেষে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছায়ামূর্তি কিছুক্ষণ থ' মেরে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর দ্রুত পেছনের সিঁড়ি বেয়ে ফিরে চলল।

রাজ প্রাসাদের বাইরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, ছায়ামূর্তি সেই গাড়িতে চেপে বসল।

গাড়ি অদৃশ্য হতেই, সেখানে এসে দাঁড়াল জমকালো মূর্তি। অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল সে–হাঃ হাঃ হা–হাঃ হাঃ হাঃ–

০৭.

ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারী করছে মঙ্গলসিন্ধ।

একপাশে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে কঙ্করসিং। ভ্রুকুঞ্চিত করে বলল কঙ্করসিং কার এত সাহস যে তোমার বুকে ছোরা ধরে টাকাগুলো আত্মসাৎ করে নিল।

মঙ্গলসিন্ধ এবার দাঁড়াল, দাঁত দিয়ে অধর দংশন করে বলল—সে যেই হোক আমি তাকে খুঁজে বের করবই।

এমন সময় মহারাজার বিশ্বস্ত কর্মচারী বঙ্কু রায় এবং নতুন কর্মচারী বিনয় সেন এসে কুর্ণিশ জানাল রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধকে।

মঙ্গলসিন্ধ পিতার কর্মচারীদ্বয়কে এ অসময়ে এখানে দেখে একটু অবাক হবার ভান করে বলল-কি সংবাদ বঙ্কু রায়?

রাজকুমার, খুব দুঃসংবাদ!

দুঃসংবাদ!

হ্যাঁ রাজকুমার, দুঃসংবাদ। আজ রাতে রাজকক্ষ থেকে এক লাখের বেশি টাকা চুরি হয়ে গেছে।

মিছামিছি চমকে ওঠার ভান করে মঙ্গলসিন্ধ একবার বাঁকা চোখে কঙ্কর সিংয়ের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করে নিয়ে বলে উঠল-রাজকক্ষে চুরি! বল কি বঙ্কু রায়?

হ্যাঁ কুমার, মহারাজ যখন নিদ্রা যাচ্ছিলেন তখন তাঁর বালিশের তলা থেকে চাবি নিয়ে এই চুরি হয়েছে।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে উঠল মঙ্গলসিন্ধ—আশ্চর্য! এবার চোখ দুটো ধদ্ধ করে জ্বলে উঠল তার, দাঁতে দাঁত পিষে বলল...... কে এই দুর্দান্ত বদমাইস যে ছোরা দেখিয়ে......

আপনি ভুল করছেন কুমার, ছোরা দেখিয়ে নয়.....

হ্যাঁ হ্যাঁ ভুলে গেছি....তা আমাকে কেন মহারাজ স্মরণ করেছেন বুঝতে পারছি না।

এবার নতুন কর্মচারী বিনয় সেন বলে উঠল—মহারাজ এতগুলো অর্থ হারিয়ে একটু বিব্রত হয়ে পড়েছেন। পুত্রসঙ্গ তার মনে হয়তো কিছুটা সান্তনা যোগাবে।

মঙ্গলসিন্ধ নতুন কর্মচারীটির মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

বঙ্কু রায় বলল কুমার, ইনি রাজবাড়ির নতুন কর্মচারী, নাম বিনয় সেন।

বিনয় সেন বিনীতভাবে পুনরায় কুর্ণিশ জানাল।

মঙ্গলসিন্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিনয় সেনের আপাদমস্তক লক্ষ্য করল। সৌম্য সুন্দর সুপুরুষ যুবক বিনয় সেন! মাথায় কোঁকড়ানো একরাশ চুল। গভীর নীল উজ্জ্বল দুটি চোখ। দীপ্ত সুন্দর মুখমণ্ডল। প্রশস্ত বক্ষ, বলিষ্ঠ দেহ, শরীরে রাজকীয় পোশাক!

মঙ্গলসিন্ধ যখন বিনয় সেনকে লক্ষ্য করছিল তখন সে মৃদু মৃদু হাসছিল, অতি স্বাভাবিক সুন্দর সে হাসি!

মঙ্গলসিন্ধের ভাল লাগল যুবক বিনয় সেনকে। এবার সে বন্ধু রায়কে বলল যাও তোমরা। আমি আসছি!

বিদায় গ্রহণকালে পুনরায় কুর্ণিশ জানাল বন্ধু রায় ও বিনয় সেন।

মঙ্গলসিন্ধ কঙ্কর সিংকে বল-সবতো শুনলে কঙ্কর? পিতা আমাকেই হয়তো সন্দেহ করে বসেছেন। নইলে তার কক্ষে প্রবেশের সাহস কার আছে!

কঙ্কর সিং বলল—মিথ্যা ভয়ে ভীত হচ্ছ মঙ্গল! তুমি সরল ভাব নিয়ে যাও সেখানে, তুমি যেন কিছুই জান না এভাবে কথাবার্তা বলবে।

আমার গলাটা কেঁপে যাবে না তো!

এত দুর্বল মন তোমার! রাজকুমার হয়ে এত ভীতু তুমি! সত্যি টাকাটা তো আর তুমি নাওনি।

কিন্তু.....

আর কিন্তু নয় মঙ্গল, যাও।

মঙ্গলসিন্ধ বেরিয়ে গেল।

মহারাজার বিশ্রামকক্ষ।

সিন্দুক থেকে একসঙ্গে এতগুলো টাকা চুরি কম কথা নয়। তাছাড়া রাজকক্ষ থেকে চুরিমহারাজ জয়সিন্ধ উত্তেজিতভাবে পায়চারী করে চলেছেন।

একপাশে দাঁড়িয়ে রাজার বিশ্বস্ত অনুচরগণ, এমনকি মন্ত্রী সেনাপতি পরিষদ সবাই দণ্ডায়মান। বন্ধু রায় ও বিনয় সেনও রয়েছে সেখানে। মহারাজ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন–আমার কক্ষে প্রবেশ করে এমন লোক কে আছে। রাজ্যে?

সেনাপতি বলে উঠলেন—এত পাহারা সত্ত্বেও চোর স্বচ্ছন্দে এসেছিল এবং কার্যোদ্বার করে সরে পড়েছে।

এমন সময় রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধ রাজকক্ষে প্রবেশ করে পিতাকে কুর্ণিশ জানিয়ে বলল—একি সংবাদ শুনলাম বাবা!

মহারাজ গম্ভীর দৃঢ়কণ্ঠে বললো-মংগল, যা শুনেছ তা যতখানি দুঃখের তার চেয়ে ভয়ঙ্কর, আমার রাজ্যে কে এমন আছে যে আমার কক্ষে প্রবেশে সক্ষম হলো?

এ কথা আমিও ভাবছি।

ভাবছি নয়, তাকে তোমাদের আবিষ্কার করতে হবে। এবং সে কারণেই তোমাকে ডেকেছি।

মঙ্গলসিন্ধু বলে উঠল—বাবা, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য। আমি শপথ করছি কে এই লোক তাকে খুঁজে বের করবোই।

মঙ্গলসিন্ধের কথায় যোগ দিয়ে বলে উঠল বিনয় সেন—কুমার, আমি আপনাকে এ ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করবো।

মঙ্গলসিন্ধ খুশিভরা দৃষ্টিতে তাকালো বিনয় সেনের দিকে। তার সংগে দৃষ্টি বিনিময় হলো।

মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিংয়ের দক্ষিণ হাত হয়ে উঠল বিনয় সেন। সব সময় মঙ্গলসিন্ধের পাশে পাশে থাকে সে।

গোপনে নানা সংবাদ সরবরাহ করে।

বিনয় সেনের সহযোগিতায় মঙ্গলসিন্ধ উপকৃত হলো। কৌশলে বিনয় সেন মহারাজাকে বশীভূত করে আরও অর্থ মঙ্গল সেনের হস্তগত করে নিল। এতে আনন্দের সীমা রইলো না মঙ্গলসিন্ধের।

এখন যত গোপন পরামর্শ হয়, সব সময়ে তাদের দলে থাকে বিনয় সেন।

সেদিন বাগানবাড়ির গোপন কক্ষে আলোচনা হচ্ছিল। মঙ্গলসিন্ধ, কঙ্করসিং আর পূর্বের সেই শয়তান গুঞ্জলোক দু'টি এবং বিনয় সেন।

মঙ্গলসিন্ধ গুণ্ডালোক দু'জনকে লক্ষ্য করে বললআজও তোমরা ঐ ভীল সর্দার দু'জনকে তাড়াতে পারলে না, অকেজো কোথাকার!

গুণ্ডা লোক দুটি হাতজোড় করে বলল কুমার, আমরা চেষ্টার কোন ত্রুটি করি না, কিন্তু আজও তাদের…।

এতগুলো টাকা খেলে তবু কাজ হাসিল করতে পারলে না। অসমর্থ, অক্ষম-আমার টাকা ফেরত দাও।

বিনীত কণ্ঠে গুণ্ডাদের নেতা লোকটা বলল-আর দুটো দিন আমাদের সময় দেন কুমার বাহাদুর!

বেশ দিলাম এরপর আর ক্ষমা করবো না।

কঙ্করসিং মঙ্গলসিন্ধের কথায় যোগ দিয়ে বলে উঠল—একেবারে খতম করে দিতে পারলে মোটা বখশীস মিলবে।

বহুৎ আচ্ছা হুজুর। সালাম জানিয়ে বেরিয়ে গেল গুণ্ডাদ্বয়। বিনয় সেন হেসে বলল কুমার বাহাদুর, ভীল সর্দার দুটিকে যতক্ষণ না তাড়িয়েছেন। ততক্ষণ আপনারা নিশ্চিন্ত নন।

হ্যাঁ বিনয়, তোমার কথা সত্য।

০৯.

সন্ধ্যা থেকে ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তৎসঙ্গে দমকা হাওয়াও বইছে। গোটা পৃথিবীটা যেন কোন এক রাক্ষসের সঙ্গে সঙ্গে মত্ত–হয়ে উঠেছে।

রাজা জয়সিন্ধের বাগানঝড়ি।

বনহুর আর রহমান পাশাপাশি দুটি বিছানায় শুয়ে আছে। বনহুর বারবার তাকাচ্ছে দেয়ালঘড়ির দিকে। রাত দ্বিপ্রহর।

রহমান জিজ্ঞাসা করল —সর্দার, আপনাকে আজ বেশ উত্তেজিত লাগছে নতুন কোন সংবাদ আছে কি?

বনহুর শয্যায় উঠে বসল–আছে। দু'জন গুণ্ডা আমাদের হত্যা করতে আসছে।

সর্দার।

হ্যাঁ রহমান!

ঘাবড়াবার বান্দা রহমান নয়, তবে নিজেদের রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে তো।

বনহুর বাইরে অন্ধকারে তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য করল। তারপর দ্রুতহস্তে নিজের বালিশগুলো বিছানায় চাদর ঢাকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রহমানকেও ইংগিতে সেই রকম কাজ করার জন্য আদেশ দিল।

এবার বনহুর তার নিজের শয্যার নিচে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। রহমানকে আদেশ দিল দরজার আড়ালে দাঁড়াতে।

হঠাৎ দমকা হাওয়ায় জানালা খুলে গেল। রহমান আরও জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল।

মুক্ত জানালা দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলো যমদূতের মত দু'টি লোক। একজনের হাতে সুতীক্ষ্ণ ঝকঝকে ছোরা–অন্য জনের হাতে একটি তেলপাকা বাঁশের লাঠি।

রহমানের শরীর ফুলে উঠল রাগে কিন্তু সর্দারের বিনা আদেশে সে তো কিছুই করতে পারবে না। কাজেই নিশ্চুপ রইলো।

লোক দু'টির একজন গিয়ে দাঁড়াল রহমানের বিছানার পাশে। লোকটা হাতের লাঠি উঠিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। নড়ে উঠলে বা জেগে গেলে লাঠির আঘাতে ধরাশায়ী করবে।

দ্বিতীয় লোকটা সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা বাগিয়ে বনহুরের বিছানার দিকে। এগিয়ে চলল।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে রহমান দাঁড়িয়ে রইলো।

লোকটা পা টিপে টিপে এগুচ্ছে। তার চোখমুখে খুনের একটা হিংস্রভাব ফুটে ওঠেছে।

এবার লোকটা একেবারে বনহুরের শয্যার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিই সেই মুহূর্তে দমকা হাওয়া ভীষণভাবে বইতে শুরু করল। বাইরে গাছপালাগুলো যেন ভেঙ্গে মুচড়ে যাচ্ছে। পাশেই কোথাও বাজ পড়ল।

লোকটা মুহূর্ত বিলম্ব না করে হাতের ছোরাখানা সজোরে বসিয়ে দিল বনহুরের শয্যায় শায়িত লম্বা বালিশে। পর মুহূর্তেই সে তার সঙ্গীকে নিয়ে দুর্যোগময় রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হলো।

বনহুর এবার তার শয্যার নিচে থেকে বেরিয়ে এলো। রহমানও এসে দাঁড়াতোর অদূরে।

বনহুর হেসে উঠল–হাঃ হাঃ হাঃ! ভীল সর্দার আজ নিহত হলো রহমান। তারপর এগিয়ে গিয়ে নিজের শয্যার বালিশ থেকে ছোরাখানা টেনে তুলে নিয়ে ফেলে দিল দূরে।

রহমান বলল–সর্দার, ইচ্ছা করলেই তো ওদের আমরা খতম করে দিতে পারতাম।

পারতাম, কিন্তু তা হবে না। আমি চাই আজ থেকে ভীল সর্দারের মৃত্যু হলো। এবার শোনো রহমান?

বলুন সর্দার….

তুমি এক্ষণি রাজপ্রাসাদে যাও, মহারাজার সংগে সাক্ষাৎ করে জানাও তোমার সংগী খুন হয়েছে। কে বা কারা তাকে খুন করেছে এ কথা তুমি জান না। এরপর তুমি তার কাছে বিদায় চেয়ে নেবে এবং যত শীঘ্র পার বজরায় ফিরে যাবে।

আর আপনি?

আমি রাজপ্রাসাদেই থাকব। যখন সময় পাব বা প্রয়োজন মনে করব, বজরায় গিয়ে তোমাদের সংগে সাক্ষাৎ করব। যাও, এই মুহূর্তে গিয়ে রাজপ্রাসাদে সংবাদ দাও তোমার সংগী খুন হয়েছে।

আচ্ছা সর্দার। কিন্তু……

আর কিন্তু নয়।

আপনি…

আমি এক্ষুণি চলে যাচ্ছি।

কোথায়?

পরে জানতে পারবে।

১০.

দুর্যোগপূর্ণ রাত্রি হলে কি হবে মঙ্গলসিন্ধের বাগানবাড়ির কক্ষে তখন পুরোদমে নাচগান চলছে! কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল। বাগানবাড়ির অদূরে গাছপালা মড়মড় শব্দে ভেঙ্গে পড়ল তবু বাঈজীর চরণের নূপুরধ্বনি থামল না।

মঙ্গলসিন্ধ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আসর জমিয়ে বসেছিল, এমন সময়, কঙ্করসিং এবং বিনয় সেন বৃষ্টিতে ভিজে হাজির হলো। মঙ্গলসিন্ধের দলে যোগ দিয়ে আসর সরগরম করে তুলল। মদ পান আর তালিতে মুখর হয়ে উঠল বাগানবাড়ির রঙমহল।

ওদিকে প্রকৃতি ভীষণভাবে তর্জন গর্জন শুরু করেছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাজ পড়ছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করল ভীল সর্দারের হত্যাকারী গুণ্ডা দু'জন।

মঙ্গলসিন্ধ ইংগিতে গুণ্ডাদ্বয়কে নিকটে আহ্বান জানাল। বলল–খবর কি?

প্রথম গুণ্ডা বলে উঠল-সাবাড় কড়ে দিয়েছি কুমার বাহাদুর!

মঙ্গলসিন্ধ খুশিভরা কন্ঠে বলল—একেবারে খতম?

হ্যাঁ!

কঙ্করসিং বলল–দু'জনকেই করেছ?

প্রথম গুণ্ডা-না, যাকে বলেছিলেন তাকেই হত্যা করেছি।

বিনয় সেন বলে উঠল–শুভ সংবাদ!

মঙ্গলসিন্ধ বলল–ভুল করোনি তো?

প্রথম গুণ্ডা বলে উঠল–না হুজুর, ভুল করিনি। আমরা আগে সব জেনে নিয়েই কাজ করেছি।

বেশ করেছ। পকেট থেকে একগাদা নোট বের করে মঙ্গলসিন্ধু গুণ্ডাদ্বয়ের হাতে গুঁজে দিল।

বিনয় সেনের মুখে ফুটে উঠল একটু বাঁকা হাসির রেখা!

বেরিয়ে গেল গুণ্ডাদ্বয়।

মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্করসিং আনন্দ সূচক শব্দ করে উঠল। মঙ্গলসিন্ধ বলল-পথের কাটা দূর হলো!

কঙ্কর বলে উঠল—সাপ মেরে লেজ জিইয়ে রাখলে মঙ্গল, ওকেও খতম করা উচিত ছিল।

মঙ্গলসিন্ধ বলল–কি দরকার। আসল আপদ দূর হয়েছে, ওটাকে আর কেয়ার করি না।

আবার শুরু হলো বাঈজী নাচ।

মঙ্গলসিন্ধের আনন্দ আর ধরছে না। মদের পাত্র হাতে উঠিয়ে নিয়ে একের পর এক উজার করে চলল।

মঙ্গলসিন্ধের সংগে আনন্দে যোগ দিয়ে কঙ্করসিং মাথা দোলাচ্ছে আর করতালি দিচ্ছে।

বিনয় সেনও তাদের সংগে যোগ দিয়েছে।

বৃষ্টি ধরে এসেছে এখন। তবু আকাশে মেঘের ভীষণ ঘনঘটা রয়েছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, কিন্তু বাজ পড়েছে না। গাছপালী দুলছে কিন্তু মুচড়ে ভেঙ্গে পড়ছে না।

প্রকৃতি অনেকটা শান্ত আকার ধারণ করেছে।

এমন সময় দু'জন ভীমকায় লোক একটা যুবতীকে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল। যুবতীর হাত-পা-মুখ কাপড় দিয়ে মজবুত করে বাঁধা। এতটুকু নড়ার শক্তি নেই যুবতীর।

এলোমেলো চুল, ছিন্নভিন্ন বস্ত্রাঞ্চল। যুবতীটাকে মেঝেতে রেখে লোক দুটো সোজা হয়ে দাঁড়াল।

মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিংয়ের চোখেমুখে তখন মদের নেশা। মঙ্গলসিন্ধের ইংগিতে বাঈজীর নাচ বন্ধ হলো। বাঈজী একবার রাগতভাবে মঙ্গলসিন্ধ এবং কঙ্কর সিংয়ের মুখে তাকিয়ে সরে গেল সেখান থেকে।

মঙ্গলসিন্ধ বলল-এনেছ?

হ্যাঁ হুজুর এনেছি। বড় বদমাইস ছুকরি, আনতে বড় তকলিফ হয়েছে।

মঙ্গলসিন্ধ একটা উৎকট শব্দ করে উঠল। তারপর ইংগিত করল যুবতীর হাত-পা আর মুখের বাঁধন খুলে দিতে।

কক্ষে অন্য যারা ছিল সবাই বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বিনয় সেনও উঠে দাঁড়াল, চলে যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়াতেই মঙ্গলসিন্ধ বলল—আরে, তুমিও যে চললে, এসো এসো....

বিনয় সেন থমকে দাঁড়াল, একবার তাকিয়ে দেখল যুবতীটিকে। নীড়হারা কপোতর মত থরথর করে কাঁপছে সে।

যুবতীর হাত-পা মুখের বাঁধন খুলে দেয়া হলো। যুবতী বন্ধনমুক্ত হতেই সোজা হয়ে বসলো। ভয়বিহবল দৃষ্টি মেলে তাকাল চারদিকে।

কঙ্কর সিং বলে উঠল–একেবারে খাসা মাল?

মঙ্গলসিন্ধের দু'চোখ হতে লালসা ঝরে পড়ছে। যে গুণ্ডদ্বয় মেয়েটাকে নিয়ে এসেছে তাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল–কুমার বাহাদুর, এর চেয়ে শতগুণ সুন্দরী একটা মেয়ে আছে। কিন্তু.....

কিন্তু কি বলে ফেল বাবা? জড়িত কন্ঠে বলল মঙ্গলসিন্ধ।

মেয়েটার মূল্য এগুলোর চেয়ে দশগুণ বেশি।

তাতে কি আসে যায়, হেমাঙ্গিনীকে বললা যত চায় তাই দেব, টাকার জন্য ভাবতে হবে না।

আচ্ছা কুমার বাহাদুর।

বেশ, তাহলে যাও এবার তোমরা।

গুণ্ডা দু'জন বেরিয়ে গেল।

বিনয় সেন হঠাৎ বলে উঠলকুমার বাহাদুর, আমার শরীরটা ভাল বোধ করছি না, আজ বিদায় চাই।

মঙ্গলসিন্ধ টলতে টলতে এগুচ্ছিল যুবতীটার দিকে। বিনয় সেনের কথায় বলে ওঠে-এই খাসা মাল ছেড়ে চলে যাবে? আচ্ছা—যাও তবে।

কঙ্কর সিং তখন ঢেকুর তুলছিল হেউ হেউ করে, এবার বলল—যেতে দাও বন্ধু, সবাইকে চলে যেতে দাও....

বিনয় সেন বেরিয়ে গেল।

দুর্যোগের ঘনঘটা কিছুটা কমে এলেও এখনও প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়নি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ঝড়ের বেগ কমে এলেও দমকা হাওয়া বইছে। বৃষ্টির জলে বাগানবাড়ির পথঘাট একাকার হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তারই আলো বৃষ্টির জলে পড়ে ঝকমক করে উঠছে।

আলখেল্লা গায়ে গুণ্ডা দু'জন এগিয়ে চলছে।

হঠাৎ তাদের সামনে পথরোধ করে দাঁড়াল বিনয় সেন।

চমকে উঠল গুণ্ডা—দাঁড়িয়ে পড়তেই বিদ্যুতের আলোতে চিনতে : পারল তারা বিনয় সেনকে। একজন বলে উঠল–আপনি!

বিনয় সেন একতোড়া নোট বের করে মেলে ধরলো তাদের সম্মুখে, তারপর বলল—আমাকে হেমাঙ্গিনীর নিকটে নিয়ে যেতে হবে। এই নাও তার জন্য প্রথম বখশিস।

প্রথম গুণ্ডা বলল+আপনি কেন কষ্ট করবেন হুজুর, আমরা আপনাদের বান্দা থাকতে–যা বলবেন তাই করব। হাত বাড়িয়ে টাকার তোড়াটা নিল সে, তারপর বলল-ক'টা মেয়ে চান তাই এনে দিতে পারব।

বিনয় সেনের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল–পারবে?

পারব।

বিনয় সেন লোক দু'টিকে সঙ্গে করে বাগানবাড়ির অদূরে আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। এবার বিনয় সেন গুণ্ডা লোক দুটিকে লক্ষ্য করে বলল–দেখ আমি চাই নিজে গিয়ে যে মেয়েটাকে পছন্দ হয় তাকেই যত টাকা লাগে তাই দেব! আর তোমরাও মোটা বখশিস পাবে।

আচ্ছা হুজুর, তাই হবে। কিন্তু কথাটা আগে হেমাঙ্গিনী দেবীকে জানাতে হবে হুজুর, নইলে আমাদের জান থাকবে না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ হুজুর, মেয়েছেলে তো নয় সে, একেবারে মরদের বাবা!

সে আবার কি রকম?

হুজুর, হেমাঙ্গিনী দেবী মেয়েলোকের ব্যবসা করে কিনা, তাই তার ওখানে কোন অপরিচিত লোককে নিয়ে যাওয়া মানা আছে। তবে আপনার জন্য কোন চিন্তা নেই, আপনি তো আর পুলিশের লোক নন।

না না, আমাকে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। আমি সেখানে যাব এবং পছন্দমত মেয়ে বেছে নিয়ে নগদ টাকা গুণে দেব।

আচ্ছা হুজুর, আপনি কিছু ভাববেন না, আমি কয়েকদিনের মধ্যে আপনাকে সেখানে নিয়ে যারার ব্যবস্থা করছি।

টাকার তোড়াটা পকেটে রেখে চলে যাচ্ছিল গুণ্ডা দু'জন, বিনয় সেন পিছু ডাকে-এই শোন!

বলুন হুজর!

আমি যে তোমাদের দিয়ে অনেক নতুন মেয়ের সন্ধান নিচ্ছি একথা কুমার বাহাদুর যেন জানতে না পারে, বুঝেছ?

বুঝেছি হুজুর, বুঝেছি।

হ্যাঁ, আমার মনমত মেয়ে পেলে তোমাদের অনেক টাকা বখশিস দেব।

আচ্ছা হুজুর। কুর্ণিশ জানিয়ে পুনরায় তাদের গন্তব্যপথে পা বাড়াল ওরা।

বিনয় সেনের চোখ দুটো হঠাৎ আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠল, পকেটে হাত দিয়ে রিভলবারটা মুঠোয় ধরলো সে।

বাগানবাড়ির বাঈজী কক্ষ থেকে তখন একটা নারীকণ্ঠের করুণ তীব্র আর্তনাদ ভেসে আসছিল।

বিনয় সেম মুহূর্ত বিলম্ব না করে রিভলবার হাতে ছুটে চলল। দ্রুতগতিতে। অন্ধকার রাতের আবরণে গা ঢাকা দিয়ে বিনয় সেন বাঈজী কক্ষের একটা জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

কক্ষে উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল, সে আলোতে অর্ধমুক্ত জানালা পথে দেখল বিনয় সেন—সেই অসহায় যুবতীটাকে ক্ষুধার্ত শার্দুলের মত আক্রমণ করেছে মংগলসিন্ধ।

যুবতীর এলোমেলো চুল, শাড়ির আঁচল মাটিতে লুটিয়ে, জামার হাতা ছিড়ে কাঁধের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে।

মাতাল মংগলসিন্ধ জাপটে ধরেছে মেয়েটাকে।

মেয়েটা প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে। তীব্রকণ্ঠে চিৎকার করছে সে-বাঁচাও বাঁচাও.....

কিন্তু এই বাগানবাড়ির পাষাণ প্রাচীরে ঘেরা বদ্ধকক্ষে কে তাকে বাঁচাতে আসবে!

সিংহের মুখে হরিণশিশুর মত ছটফট করছে মেয়েটা!

বিনয় সেন দাঁতে অধর দংশন করল, পরমুহূর্তেই তার হাতের রিভলবার গর্জে উঠল।

সংগে সংগে তীব্র আর্তনাদ করে যুবতীটাকে ছেড়ে দিল মংগলসিন্ধ, তারপর ধপ করে বসে পড়ল মেঝেতে।

মংগলসিন্ধের আর্তনাদে পাশের কক্ষ থেকে শশব্যস্তে ছুটে এলো কঙ্করসিং। মেঝেতে বসে থাকা মংগলসিন্ধকে দেখতে পেয়ে টলতে টলতে এগিয়ে গেল তার দিকে, জড়িত কণ্ঠে বলল-কি হল বন্ধু? গুলির শব্দ আর তার সঙ্গে তোমার আর্তনাদ আমাকে বড়ই বিচলিত করেছে বন্ধু। একি, রক্তে যে ভেসে যাচ্ছে! কঙ্কর সিং মঙ্গলসিন্ধের পায়ের কাছে বসে পড়ল।..

ওদিকে যুবতী ছাড়া পেয়ে মুক্ত দরজা দিয়ে দ্রুত ছুটে চলল কিন্তু বাগানবাড়ির বাইরে বের হবার পূর্বে কয়েকজন পাহারাদার যুবতীটাকে ধরে ফেলল।

যুবতী আর্তকণ্ঠে বলল ছেড়ে দাও, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। যুবতী পাহারাদারগণের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল।

পাহারাদারগণ ইতোপূর্বে গুলির শব্দও শুনতে পেয়েছিল এবং পর পরই যুবতীটাকে পালাতে দেখে পাকড়াও করে ফেলেছিল।

যুবতী এবং পাহারাদারগণ যখন ধস্তাধস্তি করে চলেছে ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ছায়ামূর্তি ঝাপিয়ে পড়ল তাদের মাঝখানে। প্রচণ্ড এক একটা ঘুষি লাগাতে শুরু করল ছায়ামূর্তি পাহারাদারগণের নাকে-মুখে পেটে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই পাহারাদারগণ যে-যেদিকে পারল ছুটে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল।

ছায়ামূর্তি শুধু দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে।

অদূরে দাঁড়িয়ে যুবতী হাঁপাচ্ছে। রাত্রির অন্ধকারে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না কে এই অজানা বন্ধু। কে এই মহান ব্যক্তি, এই মহাবিপদ মুহূর্তে বাঁচিয়ে নিল তাকে। ভয়ও হচ্ছে যুবতীর এমন শক্তিমান কে হতে পারে, অতগুলো পাহারাদারকে যে হটিয়ে দিতে পারল!

যুবতী ভাবছে কিন্তু এভাবে কতক্ষণ বাগানবাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকবে তারা। ছায়ামূর্তি এগিয়ে এলো যুবতীর পাশে, বলল-শিগগির পালাতে হবে, নইলে আবার ওরা এসে যেতে পারে!

এতক্ষণে সাহস হলো যুবতীর, ছায়ামূর্তি ভূত-প্রেত বা ঐ ধরনের কিছু নয়—সে মানুষ। তাছাড়া ছায়ামূর্তির কণ্ঠস্বর যুবতীর মনে আশ্বস্তি এনে দিল। বলল যুবতী-আপনি কে? আমাকে এই বিপদের সময় বাঁচিয়ে নিলেন?

ছায়ামূর্তি ব্যস্তকণ্ঠে বললবলব পরে, এখন চল পালাতে হবে এখান থেকে।

যুবতী বলল-চলুন, কোথায় যাব…

ছায়ামূর্তি যুবতীর হাত ধরে একরকম টেনেই নিয়ে চলল বাগানবাড়ির পেছন দিকে। ছুটতে ছুটতে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ছে যুবতী। একটার পর একটা বিপদ চলছে, তদুপরি গোটা দিন খাওয়া হয়নি। বারবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল যুবতী।

ছায়ামূর্তি অন্ধকারে ধরে ধরে নিয়ে চলল যুবতীকে।

ততক্ষণে বাগানবাড়ির মধ্যে বেশ হট্টগোল শুরু হয়েছে। আলো জ্বেলে উঠছে একটার পর একটা।

ছায়ামূর্তির মুখের দিকে তাকাল যুবতী–বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলল–আপনি!

ছায়ামূর্তি মুখের আবরণ ইতোমধ্যে খুলে ফেলেছিল, বলল-হাঁ, আমাকেই তুমি কিছু পূর্বে কুমার বাহাদুরের বাগানবাড়ির কক্ষে দেখেছিলে, আমার নাম বিনয় সেন!

আপনি ওদের লোক হয়ে....

যাক এখানে বেশি দেরী করা উচিত হবে না, শিগির বাগানবাড়ির দেয়াল টপকে ওপারে পৌঁছতে হবে।

যুবতী হতাশ কণ্ঠে বলল-তাহলে উপায়? আমি তো অত উঁচুতে উঠতে পারব না।

আমি তোমাকে সাহায্য করব–এসো-বিনয় সেন হাঁটু গেড়ে বসল-আমার কাঁধে পা রেখে দেয়ালের উপর উঠে পড়।

যুবতী নীরবে দাঁড়িয়ে রইল, একটা ভদ্রলোকের কাঁধে পা রাখা সম্ভব নয় তার পক্ষে।

বিনয় সেন ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠল–ভাববার সময় নেই বোন, তুমি শিগগির আমার কাঁধে পা রেখে প্রাচীরের উঠে বস।

অজানা-অচেনা একটা যুবকের মুখে মধুর এ বোন সম্বোধন যুবতীর হৃদয়ে. সুধা বর্ষণ করল। অন্ধকারেও যুবতী ভাল করে তাকাল বিনয় সেনের দিকে,

তারপর তার কথামত কাজ করল সে।

•

বাগানবাড়ির বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যুবতী। বিনয় সেন জিজ্ঞাসা করল —কোথায় তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে?

যুবতী ব্যথারুণ কণ্ঠে বলল–জানি না।

বিনয় সেন বিষ্ময়ভরা গলায় বলল—সেকি, কোথায় যাবে জান না?

না। এদেশে আপনজন আমার কেউ নেই। ওরা আমাকে কান্দাই শহর থেকে ধরে এনেছে। কান্দাইয়ের পুলিশ সুপার মিঃ আহমদের মেয়ে আমি–

বিনয় সেন অস্ফুট কন্ঠে বলে উঠল–পুলিশ সুপার মিঃ আহমদের মেয়ে তুমি!

হ্যাঁ। আমাকে ওরা চুরি করে এনেছে।

আচ্ছা চল আমার সঙ্গে, চিন্তিত হবার কিছু নেই।

আপনি কুমার বাহাদুরের লোক, আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে আপনি যদি বিপদে পড়েন?

সেজন্য তোমার ভাবার কিছুই নেই সুফিয়া, এস আমার সংগে।

বিনয় সেন আর সুফিয়া হেঁটে এগিয়ে চলল।

রাত ভোর হবার পূর্বেই তাদেরকে শহরের বাইরে পৌঁছতে হবে।

ওদিকে রিনয় সেনের সংগে সুফিয়া যখন পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলেছে, তখন রাজপ্রাসাদের বাইরে মহা হৈ চৈ শুরু হয়ে গেছে। ভীল সর্দারেরবেশে রহমান হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলছে-খুন–খুন–আমার বন্ধু খুন হয়েছে!

পাহারাদারগণ রহমানকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, রাত ভোর হতে দাও, রাজাকে বলে একটা ব্যবস্থা কর।

অগত্য ভীল সর্দারবেশী রহমান সিংহদ্বারের পাশে বসে রইল।

ভোর হল।

রাজা জয়সিন্ধ রাজদরবারে এসে বসলেন।

প্রথমেই দরবারকক্ষে হাজির হলো ভীল সর্দারবেশী রহমান–মহারাজ, সর্বনাশ হয়েছে, আমার বন্ধু খুন হয়েছে আপনার বাগানবাড়িতে। আমরা ঘুমিয়েছিলাম, সেই সময় কে বা কারা তাকে খুন করে পালিয়েছে!

মহারাজ জয়সিন্ধের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করলেন মহারাজ-আমার অতিথি খুন! এত সাহস কার যে আমাকে এমন একটা অভিসম্পাতের মুখে ফেলল। মহারাজ জয়সিন্ধ ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারি করতে লাগলেন। তিনি: অতিথিদের সম্মান বুঝতেন, সকলের আগে অতিথি সেবাই ছিল তার প্রধান ধর্ম।

মহারাজা জয়সিন্ধকে অত্যন্ত উত্তেজিত হতে দেখে ভীল সর্দারবেশী রহমান বলে উঠল–মহারাজ, যা হবার হয়েছে। যে গেছে সে আর ফিরে আসবে না। কাজেই আমি আমার বন্ধুর লাশসহ বিদায় চাই।

মহারাজ জয়সিন্ধ কি আর করবেন–মনের ব্যথা মনে চেপে ভীল–সর্দারকে বিদায় দিলেন।

ভীল সর্দার বিদায় গ্রহণ করতেই একজন রাজকর্মচারী রাজ দরবারে প্রবেশ করে কুর্ণিশ জানাল।

মহারাজার মন তখন বিমর্ষ, ভীল সর্দার বিদায় জানিয়ে বিষণ্ন মনে তার কথা ভাবছেন, রাজকর্মচারীকে জিজ্ঞেস করলেন-কি খবর মোহন্ত?

মোহন্ত বলে উঠলেন মহারাজ, সর্বনাশ হয়েছে; রাজকুমার আহত হয়েছেন!

মহারাজ জয়সিন্ধ অবাক কণ্ঠে বলেন-রাজকুমার আহত হয়েছে।

হ্যাঁ মহারাজ।

জয়সিন্ধ এবার আপন মনেই বলে উঠলেন-ভীল সর্দার নিহত রাজকুমার আহত—এসব কি শুনছি মোহন্ত?

তাই তো দেখছি মহারাজ।

কুমার এখন কোথায়?

তিনি এখন রাজঅন্তঃপুরে।

কি করে সে আহত হল?

মহারাজ, তিনি শিকারে গিয়ে পায়ে আঘাত পেয়েছেন।'

কালই তাকে সন্ধ্যায় আমি দেখেছি, রাতে সে কোথায় শিকারে গিয়েছিল?

মোহন্ত বোবা বনে গেল। তাকে যা শিখিয়ে দিয়েছিল তাই সে বলেছে। হঠাৎ কোন বুদ্ধি তার মাথায় আসছিল না, মহারাজ জয়সিন্ধ ধমক দিলেন-চুপ করে আছ কেন, বল রাতে সে কোথায় গিয়েছিল?

মোহন্ত আমতা আমতা করে জবাব দিল বোধ হয় বাগানবাড়িতে!

হ্যাঁ এবার আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। এবার বুঝতে পেরেছি আমার অতিথি ভীল সর্দারকে বাগানবাড়িতে কে হত্যা করেছে!

না না মহারাজ, কুমার বাহাদুর তাকে হত্যা করেনি। তাকে হত্যা করেনি।

তোমার কোন কথাই শুনতে চাই না, যাও–রাজদরবার থেকে বেরিয়ে যাও। পরক্ষণেই সেনাপতিকে লক্ষ্য করে বললেন রাজা জয়সিন্ধসেনাপতি, এই মুহূর্তে রাজকুমার মঙ্গল সিন্ধকে বন্দী করে কারাগারে আবদ্ধ করুন।

সেনাপতি উঠে বিনীত কণ্ঠে বলেন—মহারাজ, না জেনে কুমার বাহাদুরকে এভাবে

যা বললাম আদেশ পালন করুন। বিচারকালে সব চিন্তা করব।

সেনাপতি রাজাদেশ পালন করার জন্য রাজদরবার ত্যাগ করেন।

কয়েকজন সশস্ত্র, সৈনিকসহ-কুমার মঙ্গলসিন্ধের কক্ষে প্রবেশ করলেন সেনাপতি এবং অসুস্থ কুমারকে শয্যায় শায়িত দেখে বিনীত কণ্ঠে বললেন— কুমার বাহাদুর আপনি বন্দী!

মঙ্গলসিন্ধ পায়ের ব্যথায় কাতর ছিল, সেনাপতিকে সশস্ত্র সৈনিক সহ তার কক্ষে প্রবেশ করতে দেখেই অনুমানে বুঝতে পেরেছিল নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কারণে তারা এ কক্ষে প্রবেশ করেছে। সেনাপতির কণ্ঠে অর বন্দী হবার সংবাদ জানতে পেয়ে বিস্ময়ভরা গলায় বলল আমি বন্দী।

হ্যাঁ কুমার বাহাদুর।

কেন আমি বন্দী জানতে পারি?

রাজার আদেশেই আমি আপনাকে বন্দী করতে এসেছি।

আমার অপরাধ?

অপরাধ বাগানবাড়িতে জল সর্দার নিহত।

ভীল সর্দারের খুনের সঙ্গে আমি জড়িত এ কথা কে বলল তাকে?

শুধু জড়িতই নন আপনিই তাকে হত্যা করেছেন বলে মহারাজ সন্দেহ করছেন।

বুঝেছি!

আপনাকে বন্দী করে কারাগারে নিয়ে যাবার জন্য আদেশ হয়েছে। সেনাপতির ইংগিতে সৈনিকগণ রাজকুমারের হাতে হাত কড়া পরিয়ে দিল।

যদিও রাজকুমারের হাতে হাতকড়া পরাতে সেনাপতির মনে ব্যথা জাগছিল তবু বাধ্য হয়েই'এ কাজ করতে হল।

মঙ্গলসিন্ধ বন্ধী হয়ে আহত সিংহের ন্যায় ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। অজ্ঞাত গুলিটাই তার সবকিছু মাটি করে দিয়েছে।

সেনাপতি মঙ্গলসিন্ধকে রাজ কারাগারে বন্দী করে রাখলেন।

১২.

সুন্দর বজরায় সুসজ্জিত একটা কক্ষে, সুফিয়া বসেছিল। অদূরে দাঁড়িয়ে বিনয় সেন, সুফিয়াকে লক্ষ্য করে বলল শোন, এখানেই আমি থাকি, তুমিও এখানেই থাকবে।

কিন্তু….

কিন্তু কি বোন?

আমার বাবা-মার কাছে কোনদিন আর ফিরে যেতে পারব না?

কেন পারবে না, তুমি নিশ্চিত থাক আমি তোমাকে কান্দাইয়ে পৌঁছে দের বোন।

বিনয় সেনের মধুর কণ্ঠস্বরে সুফিয়ার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ যেন মানুষ নয়-দেবতা!

সুফিয়া বলে—আপনাকে আমি ভাই বলে ডাকব।

বেশ, ডেক!

বসুন ভাইজান আপনি আমার পাশে, সত্যি আপনাকে আমি কি বলে ধন্যবাদ জানাব….

বিনয় সেন সুফিয়ার পাশে বসে পড়লআক, বোন হয়ে বড় ভাইকে ধন্যবাদ জানাতে হবে না।

সুফিয়া আনমনে কিছুক্ষণ বজরার মুক্ত জানালা দিয়ে বাইরে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিনয় সেন বলল–কি ভাবছ সুফিয়া?

ভাবছি অসৎসঙ্গে বাস করেও কি করে আপনি এত মহৎপ্রাণ হতে পেরেছেন!

তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছি বলেই যে আমি মহৎপ্রাণ বা উদার ব্যক্তি, এ কথা ভাবা ভুল সুফিয়া। আমি অসৎসঙ্গে বাস করে অসৎব্যক্তিই বনে গেছি,

কিন্তু....

না না, ওকথা আমি বিশ্বাস করি না। একটা নারীকে একা অসহায় অবস্থায় পেয়েও যে ব্যক্তি তাকে বোনের সম্মান দিতে পারে সে যে কতবড় উন্নত প্রাণ তা আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি।

সুফিয়া, তোমার চিন্তাধারা চিরদিন যেন অক্ষয় থাকে। আচ্ছা সুফিয়া, একটা কথা আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করব, ঠিক জবাব দেবে?

একটা কেন, হাজার কথা জিজ্ঞাসা করুন ভাইজান, আমি তার জবাব দেব।

আমার হাত জন ফিরে এল তখন নিস্তার কিছু স্মরণ নেই।

আচ্ছা, তোমাকে যারা চুরি করে এনেছিল তারা কে বা কারা এ সম্বন্ধে কিছু আমাকে জানাতে পার?

হাঁ পারি। আমিও সেই কথা আপনাকে বলতে চাচ্ছিলাম। শুনুন ভাইজান, একদিন আমি আমার এক বান্ধবীর বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি ফিরে আসছিলাম–পথের মধ্যে হঠাৎ কয়েকজন লোক আমাকে আক্রমণ করে, গাড়ির ড্রাইভারকে আহত করে আমাকে নিয়ে পালায়। তারা আমার হাত-পা মুখ এমনভাবে বেঁধে ফেলেছিল যে, আমি অনেক চেষ্টা করেও নিজকে ওদের কবল থেকে রক্ষা করতে পারলাম না। আমাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে নেয়া হল— তারপর আর কিছু স্মরণ নেই আমার! আবার যখন আমার জ্ঞান ফিরে এল তখন নিজেকে একটা নৌকার মধ্যে দেখলাম। আমার হাত পা মজবুত করে বাঁধা রয়েছে। চোখ মেলতেই দেখলাম কয়েকজন ভীষণ চেহারার লোক নৌকার মুখে বসে আছে, লোকগুলো আমাকে দেখে ফিসফিস করে কি যেন বলাবলি করতে লাগল মি পাশ ফিরলাম, সংগে সংগে বিস্ময়ে হতবাক হলাম-আমার পাশেই আরও কয়েকজন মেয়েকে আমারই মত হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে দেখলাম।

বিনয় সেন তন্ময় হয়ে সুফিয়ার কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল। চোখ দুটো তার জ্বলে উঠল।

সুফিয়া তখনও বলে চলেছেতারপর আমাদের নৌকা একদিন এই শহরে পৌঁছল। ইতোমধ্যে সবগুলো মেয়েরই জ্ঞান ফিরে এসেছিল। সবাই মাথা কুটে

কাদাকাটি করতে লাগল কিন্তু পাষাণহৃদয় লোকগুলোর প্রাণে এতটুকু মায়া হল না। ঘাটে নৌকা পৌঁছানোর পর রাতের অন্ধকারে আমাদের গাড়িতে করে একটা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। তখনও আমাদের হাতগুলো বাঁধা ছিল, পায়ে কোন বাঁধন ছিল না।

বিনয় সেন অস্ফুট কণ্ঠে বলল–তারপর?

তারপর আমাদের সবাইকে সেই বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল। রাতের অন্ধকার হলেও আমরা বুঝতে পারলাম শহরের বাইরে কোন পুরোন বাড়ি সেট।।

এখন দেখলে চিনতে পারবে সে বাড়িটা? প্রশ্ন করল বিনয় সেন।

সুফিয়া বলল-না ভাইজান, চিনতে পারব না। কারণ যে অবস্থায় আমি সেই বাড়িতে প্রবেশ করেছিলাম তা ছিল অতি মর্মান্তিক অবস্থা, আমরা সহজে বাড়িটার ভেতরে প্রবেশ করতে চাচ্ছিলাম না, তাই আমাদের কঠিনভাবে যন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছিল।

তারপর?

তারপর কি বলব ভাইজান; আমাদের কয়েকজনকে যখন অন্দর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল তখন আমাদের অবস্থা অবর্ণনীয়। কিন্তু যেখানে আমাদের হাজির করা হল সে এক ভয়ংকর স্থান। কথাটা বলে হাঁপাতে লাগল সুফিয়া। একটু থেমে পুনরায় বলতে শুরু করল-দেখলাম আমাদের সামনে একটা বিরাটদেহ নারীমূর্তি, যেন রাক্ষসী—চোখ দুটো তার আগুনের ভাটা। অনেকক্ষণ ধরে দেখল তারপর একগাদা নোট গুণে দিল যারা আমাদের সকলকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের একজন সর্দার গোছের লোকের হাতে। লোকগুলো টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল। এবার রাক্ষসী নারীমূর্তি আমাদের নিয়ে যাবার জন্য তার একজন অনুচরকে ইংগিত করল। অদূরে একটা অদ্ভুত বেঁটে মোটা লোক দাঁড়িয়েছিল, সে নাকি সুরে বলল-চল তোমরা!

কি করব আর আমরা, ঐ বেঁটে লোকটাকে অনুসরণ করলাম। এত সহজে আমরা সেখান থেকে যেতাম না! কিন্তু নারীমূর্তির যে রূপ তাই তাড়াতাড়ি সরে পড়ার জন্য পা বাড়ালাম।

বেঁটে লোকটার সঙ্গে এবার যে কক্ষে প্রবেশ করলাম সে অতি মর্মান্তিক স্থান। সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলাম আমাদেরই মত আরও অনেক মেয়েকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। সকলেরই মুখমণ্ডল বিষণ্ন মলিন। চোখ অশ্রু ছলছল। বুঝতে পারলাম ওদেরকেও আমাদের মতই ধরে আনা হয়েছে।

এবার থামল সুফিয়া, কি যেন ভাবল অনেকক্ষণ ধরে, তারপর বললআর কি বলব ভাইজান, এরপর রোজ রাতে লোক আসে আর বেছে বেছে যে মেয়েকে পছন্দ করে তাকে মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে যায়, ঠিক ছাগল-ভেড়ার মত। আমাকে একদিন....

বিনয় সেন বুলে উঠল-থাক, সব বুঝতে পেয়েছি। দাঁতে দাঁত পিষল বিনয় সেন, দক্ষিণ হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ হল; চোখ জ্বলে উঠল ধক্ ধ করে।

সুফিয়া অবাক হয়ে তাকাল তার মুখের দিকে, এক অনাবিল আনন্দে ভরে উঠল তার হৃদয়; নিজের ভাইয়ের পাশে যেন সে বসে রয়েছে।

বিনয় সেন সুফিয়াকে লক্ষ্য করে বলল–সুফিয়া, আমি শপথ করছি, যতদিন আমার বোনদের উদ্ধার করতে না পারব ততদিন আমি নিশ্চিত নই।

আনলৈ অস্ফুটধ্বনি করে উঠল সুফিয়া-ভাইজান। বিনয় সেন সস্নেহে সুফিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

.

দস্যু বনহুরের বজরা।

বজরার একটি কক্ষে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় দস্যু বনহুর। ললাটে তার গভীর চিন্তারেখা, কুটি কুঞ্চিত করে কিছু ভাবছিল সে। কক্ষে একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলছে।

এবার শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল বনহুর, দু'ঠোঁটের ফাঁকে একটা সিগারেট, চেপে ধরে তাতে অগ্নিসংযোগ করল, তারপর পায়চারী শুরু করল বজরার মেঝেতে।...

সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চলল বনহুর সিগারেটের ধোয়ার বজরার ক্যারিন ধূমায়িত হয়ে উঠল।

এমন সময় নদীতীরে অশ্বপদশব্দ শোনা গেল। বনহুর, হাতের সিগারেটটা বজরার মেঝেতে নিক্ষেপ করে জুতোর গোড়ালি দিয়ে পিষে ফেলল, তারপর জানালা দিয়ে তাকাল, নদীতীরে।

সেই মুহূর্তে বজৱার কক্ষে প্রবেশ করল রহমান, কুর্ণিশ জানিয়ে বলল—সর্দার, তাজ এসে গেছে।

চল।

বনহুর আর রহমান বজরা থেকে নেমে নদীতীরে এসে দাঁড়াল। আকাশে অসংখ্য তারার মেলা। নিস্তব্ধ প্রকৃতি। বনহুর তাজের পিঠে বসল, রহমানও তার অশ্বে উঠে বসল, ছুটতে শুরু করল অশ্ব দুটি। ., বালুকাময় নদীর বেয়ে বনহুর আর রহমান অশ্বপৃষ্ঠে এগিয়ে চলেছে।

বনহুরের দেহে স্বাভাবিক নাগরিক ড্রেস।

রহমানের শরীরেও তাই। কাল অশ্বপৃষ্ঠে সাদা পোশাক পরিহিত যুবকদ্বয় নগরের দিকে এগিয়ে চলেছে।

ঝিন্দ শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা হোটেল। নাম তার 'জানবাগ। হোটেলটি দিনের বেলায় আঁকাল না হলেও রাতের বেলা একেবারে গুলজার হয়ে ওঠে। দিনের বেলা জানবাগে কেমন ঝিম ঝিমান ভাব থাকে। আর রাতের বেলা তার উলটো।

গাড়িতে গাড়িতে ভরে ওঠে জানবাগের সম্মুখভাগ। কত রকমের গাড়ি–নতুন পুরো ছোট-বড় হরেক রকমের গাড়ি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। শহরের এবং দেশ-বিদেশের বহু রকমের লোকের হয় আমদানি। সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরা এদিকে খুব কমই আসে। তবু একেবারে য়ে আসে না তা নয়। মাঝে মাঝে দেখা যায় অতি ভদ্রসন্তানও জনবাগে এসে উপস্থিত হয়েছে।

গভীর রাত।

জানবার্গ হোটেল এখও নিশ্চুপ হয়ে পড়েনি। আলোয় আলোময় গোটা হোটেল। হোটেলে ভেতর থেকে তখনও হাসি-গান আর বোতলের টুনটান শব্দ ভেসে আসছে। তার সঙ্গে ভেসে আসছে জড়িত কুণ্ঠস্বর।

জানবাগের সামনে এসে দাঁড়াল দু'জন অশ্বারোহী।

দস্যু বনহুর আর রহমান। অশ্ব থেকে নেমে সোজাঁ তারা হোটেল জানবাগে প্রবেশ করল।

হোটেলে একপাশে তখন তাস পেটাপেটি চলছে, জুয়া খেলছে লোকগুলো। দুটো যুবতী এত রাতেও জুয়াড়ীদের মনে উৎসাহ জুগিয়ে চলেছে। যুবতীদ্বয় সিগারেট থেকে রাশিকৃত ধূম্রনির্গত করে ছড়িয়ে দিচ্ছিল জুয়াড়ীদের মুখে।

হোটেলের ম্যানেজার একটা চেয়ারে বসে বসে ঝিমুচ্ছিল। দু' একটা ভদ্রসন্তান এখনও দু'একটা টেবিলে আঁকড়ে বসে আছে। সামনে বিলেতী মদের খালি বোতল আর গ্লাস। হয়তো নেশার মাত্রা বেশি হওয়ায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও বসে রয়েছে। কেউ কেউ জড়িত কণ্ঠে গান ধরেছে।

অপরিচিত যুবকদ্বয়কে হোটেলে প্রবেশ করতে দেখে একটা বয় ম্যানেজারকে বলল—স্যার, নতুন লোক এসেছে।

ম্যানেজার চোখ মেলে তাকিয়ে হাই তুলল. অরপর.আসন ত্যাগ করে এগিয়ে এলকি চাই?

বনহুর বলল—আমরা বিদেশী, এই হোটেলে কয়েক দিন থাকতে চাই।

বেশ থাকবেন। তারপর বয়কে লক্ষ্য করে বলল ম্যানেজারএঁদের ক্যাবিনে নিয়ে যাও।

বনহুর পুনরায় বলে উঠল—আমাদের সংগে দুটো অশ্ব-আছে।

ওঃ আচ্ছা, তাদের জন্য আমি আমাদের ঘোড়াশালে জায়গা করে দেব।

বনহুর আর রহমান বয়ের সংগে তাদের নির্দিষ্ট ক্যাবিনে চলে গেল।

বনহুর ও রহমান চলে যেতেই ম্যানেজার এগিয়ে গেল। যে দলটা গোল টেবিলের পাশে বসে তাস খেলছিল, ফিস ফিস করে তাদেরকে কিছু বলল।

সংগে সংগে দু'জন উঠে দাঁড়াল, যে কক্ষে বনহুর আর রহমান বিশ্রামের আয়োজন করছিল সেই কক্ষে প্রবেশ করে বলল–চর্লিয়ে সাব থোরা খেলোগে?

বনহুর তাকাল লোক দু'টির দিকে, তারপর বলল-বহুৎ আচ্ছা, তুম যাও মায় আতা হুঁ।

লোক দুটি বেরিয়ে গেল।

রহমান বলল—সর্দার, ওদের হাবভাব সুবিধের মনে হচ্ছে না।

হেসে বলল বনহুর-আমাদের হাবভাবই বা এত সুবিধের কোথায়! চল দেখা যাক কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়।

সর্দার, যে লোক দুটি এখন এসেছিল ওদের একজনকে আমি কোথাও দেখেছি বলে মনে হল।

বনহুর বলল–হ্যাঁ, তাকে কান্দাই শহরে দেখেছ, নাথুরামের ওখানে।

হ্যাঁ সর্দার, এবার মনে পড়েছে, নাথুরামের সহকারী-গোবিন্দনাথ ওর নাম না?

ঠিক চিনতে পেরেছ রহমান। শোন, এই যে দেশব্যাপী নারীহরণ শিশুহরণ চলছে, এ সবের দলপতি ছিল নাথুরাম। নাথুরামের মৃত্যুর পর কান্দাই এবং বিভিন্ন দেশ থেকে নারীহরণ এবং শিশুহরণের হিড়িক কমে যায়নি, নাথুরামের অভাবে তার সহকারী গোবিন্দনাথ এ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

বনহুরের কথায় রহমান বিস্ময়ভরা গলায় বলল-সর্দার, এত খোঁজ আপনি পেলেন কোথায়?

রহমান, অচিরেই আমি আরও এমন খবর তোমাকে দেব, যা শুনে এবং দেখে তুমি শুধু বিস্মিত হবে না, স্তব্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা চল, ওরা হয়তো আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে।

বনহুর আগে আগে চলল, রহমান তাকে অনুসরণ করল।

বনহুর এসে দাঁড়াতেই তাকে আসন করে দিল একটা লোক। বনহুর বসে পড়ল।

রহমান দাঁড়িয়ে রইল একপাশে।

খেলা শুরু হল।

যে দু'টি যুবতী এতক্ষণ অন্যান্য পুরুষকে খেলায় উৎসাহ দিচ্ছিল। তারা এবার সরে এসে বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হায় দাঁড়াল।

বনহুর চেয়ারসমেত আরেকটু সরে বসল।

যুবতী পুনরায় ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল, এবার বনহুরের চেয়ারের হাতলে এসে বসলো যুবতী।

বনহুর তখন খেলায় মেতে উঠল।

অল্পক্ষণেই চূড়ান্তভাবে জিতে গৈল বনহুর। অবশ্য এর পেছেনে ছিল যুবতীদের অদৃশ্য ইংগিত। যদিও যুবতীদ্বয় তাদের দলকে জয়লাভ করার জন্য নিযুক্ত ছিল, কিন্তু আজ যেন তাদের কি হয়ে গেল, বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে তার সর্বনাশ করতে মন তাদের চাইল না।

বনহুর জিতে যেতেই খেলোয়াড়গণের মধ্য থেকে একজন নেতা ধরনের লোক যুবতীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বলল—এবার তোমরা যাও।

যুবতীদ্বয় তাদের কথার চাকর, বিনা অনুমতিতে ওখানে থাকতে পারে না, চলে যাবার সময় ওদের প্রথম মেয়েটা বলল—এটা নাচ দেখাব!

রাজী হয়ে গেল লোকটা, অনেকক্ষণ নীরস খেলার মাধ্যমে হাঁপিয়ে উঠছিল ওরা বলল-আচ্ছা, নাচ দেখাও একটা।

যুবতী সঙ্গে সঙ্গে নাচতে আর গাইতে শুরু করলো।

যুবতী সুন্দরী বটে, নাচটাও তার সুন্দর।

বনহুরকে লোকগুলো পুনরায় খেলার জন্য বললো।

যুবতীটি তখন নাচতে নাচতে গান গাইছে। অপূর্ব সুন্দর গানের সুর। মুগ্ধ হল বনহুর, নির্বাক নয়নে তাকিয়ে রইল তার দিকে। ওদিকে লোকগুলো খেলার জন্য বারবার তাকে পীড়াপীড়ি করছে।

যুবতী নাচের মধ্যে ইংগিতে তাকে পুনরায় খেলার জন্য নিষেধ করতে লাগল।

চতুর লোকগুলো যুবত্নীর ইংগিতভরা নাচ বুঝতে পারল, ধমক দিয়ে নাচ থামিয়ে দিয়ে বলল–যাও।

যুবত্রীদ্বয় চলে গেল।

বনহুরও উঠে দাঁড়াল, দু'হাতে টাকাগুলো তুলে পকেটে রাখলো।

অন্যান্য খেলোয়াড় তাকাল তাদের দলপতির মুখের দিকে। হুকুম পেলেই আক্রমণ করবে। কিন্তু দলপতি কি যেন ভেবে তখন নিশ্চুপ থাকার জন্য ইংগিত করল।

বনহুর টাকাগুলো পকেটে রেখে চলে গেল নিজেদের নির্দিষ্ট কামরায়। রহমানও সর্দারকে অনুসরণ করল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ভোর হয়ে গেল।

সেদিনের মত কোন ঘটনাই ঘটল না হোটেলে।

বনহুর আর রহমান আজ বের হল না শহরে।

বেলা দ্বিপ্রহরের নির্জন ক্যাবিনে বনহুর শুয়ে শুয়ে কিছু ভাবছে। রহমান বাইরে গেছে কোন কারণে।

এমন সময় পূর্বদিনের সেই যুবতী অতি লঘু পদক্ষেপে কক্ষে প্রবেশ করল।

বনহুর ফিরে তাকিয়ে কিছুটা অবাক হল, কিন্তু মনোভাব গোপন করে বলল—এস।

যুবতী চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল–আপনারা ভদ্রলোক হোটেলে থাকবেন না, এখানে সব সময় বিপদ ঘটতে পারে। আজই চলে যান, দোহাই

আপনাদের চলে যান! .

হেসে বলল বনহুর–কেন এত ভয় পাচ্ছ! এ হোটেলে এত ভয়ই বা কিসের!

যুবতী এবার বসে পড়ল, বনহুরের বিছানায়, অতি ঘনিষ্ট হয়ে বসল, তারপর বলল আপনাকে ওরা ভাল নজরে দেখছে না। হোটেলের ম্যানেজার আপনার পেছনে ওদের লেলিয়ে দিয়েছে, ওরা আজ রাতে আপনাকে……

যুবতীর কথা শেষ হল না, একটা তীব্র আর্তনাদ করে উবু হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর ধরে ফেলল যুবতীটাকে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে তার বুকের বাম পাশটা। একটা পিস্তলের গুলি চলে গেছে যুবতীর বক্ষ ভেদ করে।

যুবতী বনহুরের মুখের দিকে তাকাল, যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল, অতি কষ্টে একটা কথা সে উচ্চারণ করল—আজ রাতে–আপনাকে ওরা–খু–আর বলতে পারল না যুবতী, ঢলে পড়ল বনহুরের হাতের ওপর।

বনহুরের দস্যু প্রাণও ব্যথায় গুমরে কেঁদে উঠল। তারই মঙ্গলের জন্য একটা নিরীহ প্রাণ অকালে ঝরে গেল।

বনহুর এবার কালবিলম্ব না করে কম্বলটা দিয়ে যুবতীর রক্তাক্ত মৃতদেহটাকে ঢেকে রেখে উঠে দাঁড়াল। ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করলো রহমান!

রহমানকে দেখে বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়াল।

রহমান বনহুরের মুখোভাব লক্ষ্য করে এবং মেঝেতে কম্বল ঢাকা. কিছু দেখতে পেয়ে বিস্মিত হল, চাপাকণ্ঠে বললসর্দার, এর নিচে কি?

বনহুর বলল-কালকের সেই যুবতীর মৃতদেহ। সর্দার! চমকে উঠল রহমান।

বনহুর তখনও নিশ্চুপ, ব্যথায় মনটা তার টনটন করছিল, কণ্ঠ দিয়ে কথা বের হচ্ছিল না।

রহমান বলল——সর্দার, কে ওকে হত্যা করল?

জানি না।

সে কি সর্দার!

হ্যাঁ রহমান, বেচারী আমাকে সাবধান করে দিচ্ছিল-আজ রাতে আমি খুন হবো–

সর্দার।

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করে হোটেলের ম্যানেজার।

বনহুর তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল বাইরে, ম্যানেজার কিছু বুঝতে পারেনি। তখনকার মত বনহুর নিশ্চিত হল, জিজ্ঞেস করল-হঠাৎ আমার ক্যাবিনে, কি খবর ম্যানেজার সাহেব?

ম্যানেজার একটু আশ্চর্য কণ্ঠে বলল—এদিকে একটা আর্তনাদের শব্দ শোনা গেল, তাই এলাম খবর নিতে।

বনহুর চট করে বলল–না কিছু না! আমার সঙ্গীটার পায়ে চোট পেয়ে কিছুটা কেটে গেছে তাই।

ওঃ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে চলে গেল ম্যানেজার।

ফিরে এল বনহুর, রহমানকে লক্ষ্য করে বলল—শিগগির এই লাশ সরিয়ে ফেলতে হবে।

রহমান বলল-কিন্তু কি করে তা সম্ভব সর্দার। হঠাৎ কেউ যদি আবার এসে যায়!

তার পূর্বেই কাজ শেষ করতে হবে।

কিন্তু এখানে থাকাটা কি এখন ভাল হবে সর্দার?

পরে চিন্তা করা যাবে। এস কাজ করা যাক!

বনহুর আর রহমান যুবতীর লাশটা মজবুত করে কম্বলে জড়িয়ে বাথরুমে নিয়ে রাখল। তারপর পানি দিয়ে ক্যাবিনের মেঝেটা ধুয়ে ফেলল পরিষ্কার করে।

গোটা দিনটা কেটে গেল, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ঝিল শহরের বুকে জ্বলে উঠল অসংখ্য আলোর মেলা। একের পর এক গাড়ি এসে থামতে লাগল জানবাগ হোটেলের সামনে। নানারকমের গাড়ি আর বিচিত্র রকমের মানুষে ভরে উঠল হোটেল জানবাগ।

বনহুরকে রহমান বলল—সর্দার, আজ রাতে এ হোটেল ত্যাগ করতে হবে।

বনহুর বলল–যত সহজ মনে করছ রহমান, তত সহজে এখান থেকে বিদায় নেয়া সম্ভব হবে না।

তাহলে উপায়!

উপায় একটা করতে হবে।

এ খুনের কথা যদি কেউ জেনে ফেলে!

রহমান, তুমি মনে কর এ হত্যার ব্যাপারে হোটেলের কেউ জানে না!

না জানলে খুন হবে কেন, নিশ্চয়ই জানে। তবে এখনও ওরা এ খুন সম্বন্ধে এমন নিশ্চুপ রয়েছে কেন, বুঝতে পারছি না সর্দার।

যুবতীর হত্যারহস্য প্রকাশ পেলে পুলিশের আমদানি হবে এটা এরা চায়। তা ছাড়া নিজেরাই যখন ওকে দুনিয়া থেকে বিদায় দিয়েছে তখন ওদের মাথাব্যাথার কিছু নেই।

তখন ম্যানেজার এসেছিল, সেও তো কিছু বলল না সর্দার।।

সব জেনেই না জানার ভান করল। তুমি কি মনে কর ম্যানেজার যুবতীর হত্যা সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

ঐ রকমই তো মনে হল!

ওটা নিছক অভিনয়। চল, দেখা যাক কি হয়!

বনহুর আর রহমান হোটেল কক্ষে প্রবেশ করতেই নজর পড়ল অদূরে উপবিষ্টা পূর্বদিনের সেই যুবতী দু'জনের আরেকজন। চেহারা কেমন যেন বিমর্ষ মলিন, চোখমুখে ফুটে উঠেছে একটা ভয়ার্ত ভাব। সকলের অজ্ঞাতে যুবতী বারবার তাকাচ্ছে বনহুরের দিকে।

বনহুর একবারমাত্র তাকিয়ে যুবতীর দিকে পেছন ফিরে একটা চেয়ার দখল করে নিয়ে বসল। তাকে বাঁচাতে চেয়ে নিরপরাধ একটা জীবন বিনষ্ট হয়েছে। আর নয়, ঐ যথেষ্ট। যুবতী যেটুকু বলে গেছে তাই আত্মরক্ষায় তাকে সতর্ক রাখবে।

বনহুর আসন গ্রহণ করতেই রহমান বনহুরের পেছনে একটি চেয়ারে বসে পড়ল। এদিকে মুখ করে বসলে সর্দারের দৃষ্টির আড়ালে যা ঘটে বা হয়। সেটা দেখতে পাবে সে! সতর্ক দৃষ্টি মেলে চারদিকে লক্ষ্য রাখল সে।

হোটেল কক্ষ নানা ধরনের মানুষে ভরে উঠল।

নারীপুরুষ সবাই এসেছে।

হঠাৎ চমকে উঠল বনহুর, হোটেলকক্ষে প্রবেশ করল একটি বিশাল বপুধারিণী নারীমূর্তি। তেলের পিপে বললে ভুল হবে না।

রহমান মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসল, সর্দারের দিকে তাকিয়ে দেখল-কিন্তু একি, সর্দারের চোখে একটা তীব্র চাহনি, রহমানও, এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগল মহিলাটিকে।।

অন্যান্য মহিলার মতই তার হাতে একটি ব্যাগ। কিন্তু ভ্যানিটি ব্যাগ নয়, একটা মস্তবড় চামড়ার ব্যাগ।

মহিলাটি হোটেলকক্ষে প্রবেশ করতেই হোটেলের কর্মচারিগণ শশব্যস্তে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। ম্যানেজার সোজা গিয়ে মহিলাটির হাত চুম্বন করল।

মহিলা এসবে খুশি হল না তেমন। একবার হোটেলকক্ষের চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভেতরের কক্ষে অদৃশ্য হল।

বনহুর পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে গেল মদের দোকানটার পাশে, বলল ম্যাচটা, পাও তো?

মদের বোতল নিয়ে প্রতীক্ষা করছিল দোকানী, তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ে ম্যাচটা বের করে বাড়িয়ে ধরুল বনহুরের দিকে।

বনহুর ম্যাচটা হাতে নিয়ে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে একমুখ ধোয়া ছাড়ল, তারপর বাঁকা চোখে মদের দোকানীর দিকে তাকিয়ে বলল যে সম্রাজ্ঞী এলেন উনি কে?

দোকানী চাপা গলায় বলল—এই হোটেলের মালিক।

হোটেলের উপযুক্ত মালিকই বটে! বনহুর কথাটা বলে নিজের আসনে গিয়ে বসল।

ততক্ষণে পূর্ব দিনের সেই বিমর্ষমনা যুবতী নাচতে শুরু করেছে।

এদিকে তখন পুরোদমে নাচগান চলছে, হোটেলের প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজে মত্ত, ঠিক তখন সকলের অজ্ঞাতে বনহুর, উঠে দাঁড়াল, দ্রুত এগিয়ে চলল সে কক্ষের দিকে, যে কক্ষে একটু পূর্বে ভীমকায় মহিলাটি প্রবেশ করেছে।

বনহুর সেই কক্ষের পাশের কক্ষে প্রবেশ করতেই তার কানে ভেসে এলো হাঁড়ির মত যেন কোন মহিলার কণ্ঠস্বর।

দেয়ালে কান লাগিয়ে দাঁড়াল বনহুর।

পাশের ঘর থেকে শোনা গেল হেঁড়ে গলায় মহিলার সুমিষ্ট ভাষণ-কুমার বাহাদুর জখম হয়েছে, কবে সারবে না সারবে তার জন্য আমি এহক ভাগিয়ে দেব? এমন মেয়েই নয় হেমাঙ্গিনী।

পরক্ষণেই নরম পুরুষকণ্ঠ-দেখুন হেমাঙ্গিনী দিদি এই সামান্য ক'টা পিম সবুর করুন, কুমার বাহাদুর অনেক করে বলে দিয়েছেন....

রেখে দাও তোমার কুমার বাহাদুর, বেটা পুরুষ নয়–পুরুষের বাচ্চাও নয়। সামান্য পায়ের হাড়ে গুলি লেগেছে তাই মরণ শয্যা নিয়েছে। অমন দশটা গুলি

আমার চামড়া কাটতে পারবে না।

দেখুন রাজার ছেলে, তাছাড়া তাদেরই রাজ্যে যখন আমরা বাস করি.....

বাস করি বলেই কি তারা আমাদের নাকে দড়ি লাগিয়ে নাচাবে, সে বান্দা হেমাঙ্গিনী নয়, মনে রেখ কেশব চাঁদ।

বনহুর বুঝতে পারল, এ হোটেলের ম্যানেজারের নাম কেশব চাঁদ।

ওদিকে রহমান পেছন ফিরে হতবাক, এত সতর্ক দৃষ্টির মধ্যেও সর্দার ভেগেছেন। গেলেন কোথায়, রহমান চারদিকে দেখতে লাগল!

এদিক ওদিক লক্ষ্য করতেই কখন যে আবার বনহুর নির্দিষ্ট আসনে এসে বসে নাচ দেখছে লক্ষ্যই করেনি রহমান। এবার অবাক হল, অস্ফুট কণ্ঠে বলল—সর্দার, কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?

একটা নতুন কিছু আবিষ্কারে! চুপ, নাচ দেখ।

বনহুর এবার উঠে গিয়ে জুয়ার টেবিলে বসল।

চমকে উঠল রহমান, কিন্তু সে ভয় পেল না। কারণ সে জানে, তাদের সর্দার সবচেয়ে বড় জুয়াড়ী। রহমান গিয়ে দাঁড়াল তার পেছনে, দূর থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখল কেউ যেন তার সর্দারকে পেছন থেকে আক্রমণ করতে না পারে।

খেলা চলছে।

রাত বেড়ে আসছে।

একি! সর্দার বার বার হেরে যাচ্ছে। এক হাজার, দু'হাজার তিন হাজার—দশ হাজার।

রহমানের চোখে ধাঁধা লাগছে। এতবার হেরেও তার সর্দার হাসিমুখে খেলে যাচ্ছে-ব্যাপার কি? সর্দার তো কোন দিন পরাজিত হয় না, হলেও তা সে কোন সময় স্বীকার করেন না। জিততেই হবে তার। তারপর টাকা হাতে পেয়ে ছড়িয়ে ফেলে দেবে তাদেরই মধ্যে তবুও পরাজয়ের কালিমা মুখে মাখবে না। রহমান বুঝতে পারে, ইচ্ছা করেই সর্দার আজ পরাজয়ের কালিমা বরণ করে নিচ্ছে।

বনহুরের নিকটে হাজার হাজার টাকা জিতে নিয়ে দুষ্ট লোকগুলো খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল, সবাই বনহুরকে পিঠ চাপড়ে দিল।

নিজের ক্যাবিনে ফিরে আসতেই রহমান বলল–সর্দার, আজ আপনি এমনভাবে নিজেকে–কথা শেষ না করে মাথা চুলকাতে লাগল সে।

বনহুর বুঝতে পারল কি বলতে চায় রহমান। বনহুর এবার শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে বলল উপস্থিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য টাকাগুলো ওদের হাতে তুলে দিলাম।

সর্দার!

জানি মৃত্যু সহজ নয়, তবু–যাক রহমান, সেজন্য তুমি ভেব না। ওনি আজ আমি একটা মস্তবড় সমাধান খুঁজে পেয়েছি। নাও শুয়ে পড় নিশ্চিন্তে। আর কেউ আমাদের আক্রমণ করবে না।

কিন্তু সর্দার, আমার যে চোখে ঘুম আসবে না।

কেন?

এখনও বাথরুমে লাশটা....

ভয় নেই, ও আর জাগবে না। নাও ঘুমাও।

গায়ে চাদর টেনে দিয়ে শুয়ে পড়ল বনহুর।

রহমানও শুয়ে পড়ল।

১৪.

এখানে তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে না তো সুফিয়া? বলল বিনয় সেন।

সুফিয়া আজ ক'দিন হল এই বজরায় আশ্রয় পেয়েছে, তারপর থেকে সুফিয়া কোন সময়ের জন্য এতটুকু কষ্ট বা দুঃখ পায়নি। এত সুখ বুঝি তার নিজের বাড়িতেও পায়নি। বিনয় সেনের কথায় বলল সুফিয়াভাইজান, আপনার দয়ায়

আমি যে কত সুখে আছি তা মুখে বলার ভাষা আমার নেই। অনেক ভাল আছি আমি।

বিনয় সেন এবার বলল-জানি, তোমার মনে একটা কষ্ট অহরহ যন্ত্রণা দিচ্ছে। সে হচ্ছে তোমার পিতামাতার নিকটে যাবার ইচ্ছা। বিনয় সেন হেসে বলল দুঃখ করনা বোন, জানত দুঃখের পর সুখ.....

সে আমি জানি, আপনার মত ভাইজান পেয়েই আমি বুঝতে পেরেছি, দুঃখ শেষ হয়ে এসেছে।

সুফিয়া, এবার শুয়ে পড়; রাত অনেক হল।

ভাইজান, আজ একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, জবাব দেবেন তো?

আজ নয় বোন, অন্য দিন তুমি যা জিজ্ঞাসা করবে তার জবাব পাবে। আজ চলি, ঘুমাও বোন।

আচ্ছা যান আপনি। সুফিয়া বিনয় সেনকে বিদায় দিল।

বিনয় সেন সুফিয়ার কক্ষ থেকে নিজের কক্ষে চলে গেলেও সুফিয়া ঘুমাতে পারল না। আজ প্রায় দু'সপ্তাহ হয়ে এল এই বজরায় আশ্রয় নিয়েছে সে। কিন্তু বজরায় তার কক্ষেই এসে বিনয় সেন সাক্ষাৎ করে যায়। একটি চাকর আছে-সেই খাবার দিয়ে যায়, অন্যান্য যা প্রয়োজন সব সেই চাকরটাই এনে দেয়। এমন কি এখানে তার শাড়ি, জামা-কাপড়, প্রসাধন সামগ্রী সব সে পেয়েছে। কোন অভাবই সে অনুভব করেনি বজরায় বাস করে।

কিন্তু আশ্চর্য, বিনয় সেনকে আজও ভাল করে জানতে পারল না সে। অসৎ ব্যক্তির সঙ্গে ওঠাবসা করেও মানুষ এত সৎ, এত মহৎ হতে পারে।

নানা চিন্তায় সুফিয়া মগ্ন হয়ে পড়ে। ঘুম তার চোখে আসছে না।

রাত অনেক হয়েছে।

হঠাৎ একটা শিস দেবার শব্দ সুফিয়ার কানে এসে পৌঁছল, চমকে উঠল সুফিয়া-একবার, দু'বার তিনবার ঐ রকম শব্দ। তারপর তার ভাইজান বিনয় সেনের কক্ষের দরজা খোলার শব্দ শুনা গেল।

সুফিয়া আজ স্থির থাকতে পারল না, সে চুপি চুপি নিজের বজরার দণ্ডা সামান্য ফাঁক করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

বিনয় সেন তখন বজরার সিঁড়ি বেয়ে নদীতীরে নেমে যাচ্ছে।

সুফিয়া চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখল বিনয় সেনকে।

নদীতীরে দুটি লোক তখনও দাঁড়িয়ে আছে, এটাও লক্ষ্য করল সুফিয়া।

বিনয় সেন নদীতীরে পৌঁছতেই লোক দুটি অভ্যর্থনা জানাল। বজরা থেকে নদীতীর মাত্র কয়েক হাত ব্যবধান। কথাবার্তা সব শোনা যাচ্ছে।

বিনয় সেন বলল—কি হলো, খবর কি!

লোক দু'টির একজন বলল-হুজুর, হেমাঙ্গিনী রাজী হতে চায় না বলে তার ওখানে নতুন মানুষ নিয়ে যাওয়া চলবে না। যেমন খুশি মেয়ে সে আপনাকে দিতে রাজী আছে, যত খুশি পাবেন।

সুফিয়া শিউরে উঠল, নদীতীরের লোকগুলোর কথাবার্তা সব সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। দেব সমতুল্য বিনয় সেনও হেমাঙ্গিনীর শরণাপন্ন। এমন লোকও চরিত্রহীন.... ঘৃণায় সুফিয়ার মন বিষিয়ে উঠল-ছিঃ ছিঃ মানুষ চেনা কঠিন!

এবার কানে ভেসে আসে বিনয় সেনের কণ্ঠ-আমাকে অবিশ্বাসের কিছু নেই। যত টাকা চায় তাই দেব কিন্তু আমার মনমত নারী চাই। ' সুফিয়া আর দাঁড়াতে পারল না, মাথাটা তার ঝিম ঝিম করে উঠল, এমন লোকের বজরায় সে বাস করছে। না না, এখানে থাকা আর চলবে না, এমন লোকের বিশ্বাস কি!

এক সময় লোকগুলো চলে গেল।

বজরায় ফিরে এল বিনয় সেন।

পাশের ক্যাবিনে বসে সব টের পেল সুফিয়া। গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল গত পনেরটা দিনের কথা। কই একটি দিনও তো বিনয় সেন তার সঙ্গে কোন অসৎ আচরণ করেনি! একা নিঃসঙ্গ পেয়েও কোনদিন এতটুকু কুৎসিত ইংগিত করেনি। আপন বোনের মতই স্নেহ করেছে, ভালবেসেছে সে তোকে!

অনেক ভেবেও সুফিয়ার মন স্বচ্ছ হল না, নিজ কানে সে বিনয় সেনের উক্তিগুলো শুনেছে। ঘৃণায় সুফিয়ার মন তিক্ত হয়ে উঠল।

পরদিন যখন বিনয় সেন সুফিয়ার কামরায় এল তার সঙ্গে দেখা করতে তখন সুফিয়া কিছুতেই বিনয় সেনের সঙ্গে কথা বলতে পারল না। কিছুতেই সে চোখ দুটো তুলে ধরতে পারল না বিনয় সেনের মুখে।

সুফিয়ার আচরণে বিস্মিত হল বিনয় সেন, ভেবে পেল না কি হয়েছে তার।

বিনয় সেন প্রশ্ন করলো—সুফিয়া, তোমার কি কিছু হয়েছে?

সুফিয়া নীরব রইলো, কোন জবাব দিল না।

বিনয় সেন আরও সরে এল সুফিয়ার পাশে, মাথায় হাত বুলিয়ে সন্দেহে বলল- আজ নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে তোমার। ছিঃ, অমন নিশ্চুপ রইলে কেন, বল কি হয়েছে?

সুফিয়া আরও জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল—কি বলবে সে! যা সে নিজ কানে শুনেছে, জেনেছে তা বলার নয়। তবু বলল সুফিয়া—কিছু হয়নি।

বিনয় সেন বলল-মিথ্যে কথা। আমায় লুকোচ্ছ তুমি। ছিঃ আমার কাছে লুকোতে নেই বোন, বল কি হয়েছে তোমার?

আমি এখানে আর থাকতে চাই না। কেন, কেন বল? ব্যস্তকণ্ঠে বলল বিনয় সেন!

সুফিয়া এবার মুখ তুলে তাকাল বিনয় সেনের দিকে। চট করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলো না সুফিয়া, নীল উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ–কই, সে চোখ দুটিতে নেই কোন লালসাপূর্ণ চাহনি। পবিত্র নির্মল একটি বলিষ্ঠ মুখ–হেসে বলল বিনয় সেন-কি দেখছ সুফিয়া?

সুফিয়া অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল—ভাইজান, আমাকে মাফ করুন ভাইজান। দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল।

বিনয় যেন বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলল–কি হল বোন। নিশ্চয়ই তোমার এমন কিছু ঘটেছে যা তোমার মনে অসহ্য বেদনা দিচ্ছে। বল কি হয়েছে?

সুফিয়া দু'হাতের তালুতে মুখ ঢেকে বলে উঠল-আমাকে মাফ করে দিন ভাইজান, আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম।

সেকি সুফিয়া!

হ্যাঁ ভাইজান, আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। আপনার ফেরেস্তার মত চরিত্র–না না, তা হতে পারে না। ভাইজান, আপনি মানুষ নন, ফেরেস্তা।

সুফিয়া, তোমার কথাগুলো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। হঠাৎ তোমার মধ্যে এমন একটা কিছু ঘটেছে যার জন্য তুমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছ, আমাকে খুলে বল সুফিয়া?

না না, সে কথা বলতে পারব না ভাইজান। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে, আমি কিছুতেই বলতে পারব না।

কিন্তু বনহুর নিজের কামরায় গিয়ে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল না, কি ঘটেছে, যার জন্য সুফিয়া তার সংগে প্রথমে কথাই বলল না। পরে কাঁদল, কি সব আবোল তাবোল বলল, ক্ষমা চাইল, লজ্জার কথা, বলা চলবে না। এসব হেঁয়ালি ভরা কথা —কিছুই বুঝতে পারে না বিনয় সেন।

এরপর থেকে বিনয় সেন সুফিয়ার কক্ষে যাওয়া বন্ধ করে দিল, দূরে থেকে সুফিয়ার সুবিধার দিকে লক্ষ্য করতে লাগল।

সুফিয়া ক'দিনের মধ্যেই বুঝতে পারল, সেদিনের ঘটনার পর বিনয় সেন তাকে যথেষ্ট এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে। যদিও এতে সুফিয়ার কোন অসুবিধা হচ্ছিল না তবু মনে শান্তি ছিল না তার। কারণ, আজ সে কোথায় থাকত, কেমন থাকত কে জানে। তার অপবিত্র দেহটা যে এতদিনে শিয়াল ককুরে খেত না, তারই বা কি নিশ্চয়তা আছে! ছিঃ ছিঃ কেন সেদিন সুফিয়া তার সঙ্গে অমন আচরণ করেছিল,

যার জন্য অমন ফেরেস্তার মত লোকের মনে একটা গভীর সন্দেহের রেখাপাত হয়েছে। সুফিয়া নিজেকে বড়ই লজ্জিত মনে করে।

.

হেমাংগিনী দেবী তার বিশাল বপু নিয়ে কেবলমাত্র শয্যা গ্রহণ করতে যাচ্ছিল, এমন সময় গোপীনাথ তার কক্ষে প্রবেশ করে আদাব জানাল।

গোপীনাথকে লক্ষ্য করে বলল হেমাংগিনী—এসেছে নাকি লোকটা?

হাঁ দিদি—এসেছেন তিনি।

দেখ বুঝেসুঝে কাজ কর, আমার কারবার যেন নষ্ট হয়ে না যায়, তাহলে তোমার কাঁধে মাথা থাকবে না।

সে তো আমি জানি দিদি, আমি কি আর বুদ্ধিহীন। সব দিক ভেবেচিন্তে তবেই কাজ করি।

যাও, বকবক কর না, নিয়ে এস।

আচ্ছা দিদি, এক্ষুণি আনছি।

এই শোন, টাকা-পয়সা কিন্তু একসিকি কম নেব না।

আরে ছোঃ পয়সা কম দেবেন বিনয় সেন, উনি তাহলে রাজকর্মচারী হলেন কেন! বেরিয়ে গেল গোপীনাথ।

একটু পরেই কক্ষে প্রবেশ করলো গোপীনাথ–সংগে বিনয় সেন।

হেমাংগিনী বিনয় সেনকে লক্ষ্য করেই আনন্দে আটখানা হল। বহু লোককে সে জীবনে দেখেছে, জেনেছে.–কত লোকই না আসে তার এখানে-কত রাজা মহারাজা, কত নবাব বাহাদুর, কত জমিদার, কত প্রজা, কিন্তু এমন সুন্দর চেহারার লোক তো সে কোনদিন দেখেনি। সবাই আসে হেঁইয়া গোঁফ, মাথায় পাগড়ী। কেমন উদ্ভট চেহারা। কেমন নেশায় ঢল ঢল, জড়িত কণ্ঠস্বর-আর এ যে একেবারে যুবরাজ।

হেমাংগিনী সকলের অজ্ঞাতে নিজের শরীরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিল। আঁচলটা যুবতী মেয়েদের মত মাজায় খুঁজে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, বলল এবার-আপনার নামই বুঝি–

হাঁ, আমার নামই বিনয় সেন। আর আপনি বুঝি হেমাংগিনী দেবী?

কোন জবাব না দিয়ে আঁচলের ডগাটা দাঁতে কামড়ে যুবতীদের অনুকরণে মাথাটা দোলাল।

বিনয় সেন বলল—চলুন, যে কারণে এসেছি—

হেমাংগিনী বাঁকা চোখে একটু টিপ্পনী কেটে বলল-এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। সব পাবেন, বসুন না একটু।

বিনয় সেন আসন গ্রহণ করল।

হেমাংগিনী এবার গোপীকে লক্ষ্য করে বলল–তুমি আবার অমন হা করে দাঁড়িয়ে আছ কেন, যাওনা বেরিয়ে। বখশিস যা দেবার পরে দেব, যাও।

হেমাংগিনী কথাগুলো মোলায়েম সুরেই বলে যেতে চেষ্টা করছিল কিন্তু হঠাৎ তার আসল কণ্ঠ বেরিয়ে আসে, সঙ্গে সঙ্গে চট করে গলার আওয়াজ মোলায়েম করে নিয়ে বলল—ওদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মেজাজ ঠিক থাকে না, আপনি কিছু মনে করবেন না তো?

না না, কিছু মনে করিনি।

গোপীনাথ ততক্ষণে কক্ষ ত্যাগ করেছিল।

বিনয় সেনের যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে একটা পর্বতের পাশে যেন বসে আছে সে। অস্বস্তি বোধ করলেও মুখোভাব স্বাভাবিক রেখে বলল বিনয় সেন—হেমাঙ্গিনী দেবী?

বলুন?

আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

সত্যি!

হাঁ সত্যি, আপনার মত মেয়ে আমি কোথাও দেখেছি কিনা সন্দেহ।

এ্যাঁ কি বললেন?

মানে আপনার মত সুন্দরী মেয়ে–

সত্যি!

সত্যি নয়তো কি মিছে বলব, তবে আপনার শরীরটা যদি একটু সরু হত তাহলে আপনাকে স্বর্গের অপ্সরী বললে ভুল হত! আহা, কি সুন্দর আপনার চোখ দুটো–

সত্যি!

হাঁ, আপনার ঠোঁট দু'খানা অতি সুন্দর। আপনার ভুরু যেন রামধনু। গোলাপের পাপড়ির মত আপনার চোখের পাতা–

বিনয় সেনের কথায় হেমাঙ্গিনী মোমের মত গলে যাবার উপক্রম হয়। সে পৃথিবীতে আছে না স্বর্গে গেছে ভাবতে পারে না। প্রেম গদগদ হেমাঙ্গিনী বিনয় সেনের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে।

বিনয় সেন ভেতরে ভেতরে বিপদ গুণলেও মুখে হাসি টেনে বলল–চলুন, মেয়েদের কোথায় রেখেছেন দেখাবেন চলুন। .

এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন বিনয় বাবু? আমার কাছে বসতে বুঝি মন চাইছে।?

ছিঃ ছিঃ ও কথা বলে লজ্জা দেবেন না হেমাঙ্গিনী দেবী। আপনাকে দেখা অবধি আমি–আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারছি না।

সত্যি বলছেন তো?

আমি মিথ্যা বলি না কোনদিন।

তবে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

ব্যস্ত হইনি তবে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে কিনা, পরের চাকরি করি!

আচ্ছা বিনয় বাবু রাজবাড়িতে আপনাকে কত মাইনে দেয়। অবশ্য মনে যদি কিছু না করেন তবেই বলুন?

না না, এতে আবার মনে করার কি আছে? তা রাজবাড়িতে চাকরি করে মাসে পাঁচ শ টাকা পাই।

ছিঃ ছিঃ এই সামান্য মাইনেতে আপনি কাজ করেন সেখানে?

তাছাড়া আর যে আমার কোন উপায় নেই হেমাঙ্গিনী দেবী।

তবে যে গোপী আমাকে বলেছিল আপনি নাকি অনেক টাকার মালিক?

সে কথা অবশ্য মিথ্যা নয়, যদিও আমি চাকরি করি মাত্র সামান্য টাকায় কিন্তু আমার বাবার অনেক বিষয়-আসয় আছে কিনা। বছরে লাখ দেড় লাখের উপরে পাই।

হেমাঙ্গিনীর চোখ দুটো জ্বলে উঠল, হেসে বলল—তাহলে চাকরি করার কি দরকার?

ওটা আমার নেশা! বসে থেকে আমার সময় কাটতে চায় না।

তাই চাকরি করি।

আচ্ছা বিনয় বাবু?

বলুন হেমাঙ্গিনী দেবী?

একটা কথা বলব?

স্বচ্ছন্দে বলুন-একটা কেন, হাজারটা বলুন। আপনার কণ্ঠস্বর আমার কানে সুধা বর্ষণ করছে।

সত্যি তো?

একবারই বলেছি মিথ্যা বলা আমার অভ্যাস নয়।

আপনি বড় ভদ্র, আপনার মত লোক আমি কোনদিন দেখিনি।

দাঁতে দাঁত পিষে বলল বিনয় সেন-সেই কারণেই তো আপনি এমন ফেঁপে উঠেছেন….

কি বলেন বিনয় বাবু?

না না, ও কিছু নয়মানে আপনি বড় অমায়িক মেয়ে, বড় লক্ষ্মী মেয়ে।

হাঁ, আমি লক্ষ্মীই বটে, নইলে দেখছেন না কত বড় বাড়ি, গাড়ি হাজার হাজার কর্মচারী আমার কাজ করছে। শহরে মস্তবড় একটা হোটেল আছে, নাম শুনেছেন বুঝি জানবাগ হোটেলের?

হাঁ শুনেছি, কিন্তু এখনও সেখানে যেতে পারিনি, এটা আমার দুর্ভাগ্য!

ছিঃ ছিঃ, এজন্য দুঃখ করবেন না বিনয় বাবু। আপনাকে আমি সব দেখাব, সব দেখাব-আমার বাড়ির কোথায় কেমন পরিবেশ, সব দেখাব। ও, যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা একেবারে ভুলেই গেছি। বলছিলাম কি জানেন?

বলুন?

মানে আপনি রাজবাড়িতে যখন মোটে পাঁচ শ’ পান, আমি যদি আপনাকে তার ডবল দেই মানে এক হাজার?

বিনয় সেন খুশিভরা কণ্ঠে বলে উঠল-এ অধমের প্রতি এত দয়া!

হেমাঙ্গিনী প্রেম গদগদ কণ্ঠে বলল অধম নন আপনি। আপনি অতি ভাগ্যবান। এক হাজার কেন, আমি আপনাকে আমার যথাসর্বস্ব দেবঅনেক দেবরাজপুত্রের মত করে রাখব।

বিনয় সেন বিপদ গুণল, হেমাঙ্গিনী তার প্রেম ভিখারিণী। এখন উপায়? যে কাজে সে এখানে এসেছে সব বুঝিপণ্ড হল!

বিনয় সেন উঠে দাঁড়াল—চলুন!

কোথায় যাবেন বিনয় বাবু?

আমি যে কারণে এসেছি।

ও, এখনও আপনি ঐ কথাই ভাবছেন? বেশ চলুন, কিন্তু একটা কথা আমার রাখতে হবে।

বলুন।

আপনাকে সেখানে ছদ্মবেশে যেতে হবে।–কেন? অবাক কণ্ঠে বলল বিনয় সেন।

হেমাঙ্গিনী মৃদু হেসে বলল-আপনার ঐ সুন্দর রাজপুত্রের মত চেহারা দেখলে আমার সবগুলো মেয়েই....।

ও, বেশ তো আমি ছদ্মবেশেই যাব।

আসুন আমার সঙ্গে।

হেমাঙ্গিনী বিনয় সেনকে নিয়ে একটা কক্ষে প্রবেশ করল। বিনয় সেন বেশ ঘাবড়ে উঠছিল, হেমাঙ্গিনী আবার তাকে এখানে নিয়ে এল কেন।

হেমাঙ্গিনী বলে উঠল-এটা আমার ছদ্মবেশ কক্ষ। এখানে আপনি ইচ্ছামত চেহারা পালটে নিতে পারেন। চলে যাচ্ছিলো হেমাঙ্গিনী, পুনরায় ফিরে এসে বলল-শুনুন, আপনি কিন্তু বেশ বুড়োর ড্রেস পরে নেবেন।

আচ্ছা। হেসে বিনয় সেন দরজা বন্ধ করল।

ড্রেসিং কক্ষ থেকে যখন বিনয় সেন বের হলো তখন সে সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ। যদিও তার চেহারায় প্রৌঢ়ত্বের ছাপ ফুটে উঠেছে, তবু তাকে দেখলে মনে হচ্ছে যেন কোন সম্ভ্রান্ত ধনবান ব্যক্তি। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, গোঁফ-দাড়ি রুচিসম্মত। শরীরে পাজামা আর পাঞ্জাবী। হাতে রূপোর বাটওয়ালা ছড়ি।

হেমাঙ্গিনীর সামনে এসে দাঁড়াল প্রৌঢ় ভদ্রলোকের বেশে বিনয় সেন।

খুশি হলো হেমাঙ্গিনী, আনন্দভরা কণ্ঠে বলল, হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। আসুন আমার সঙ্গে।

বিনয় সেন হেমাঙ্গিনীকে অনুসরণ করল।

হেমাঙ্গিনী তার বিশাল বপু নিয়ে হাতির মত দুলতে দুলতে এগিয়ে চলল আর বিনয় সেন চারদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার পেছনে পেছনে এগুতে লাগল।

নারীহরুণকারীদের গোপন আস্তানাই বটে। বাড়িটা বহুকালের পুরান হলেও এখনও কোথাও ভেঙ্গে খসে পড়েনি বা ধ্বসে যায়নি।

অনেকগুলো কক্ষ পেরিয়ে হেমাঙ্গিনী একটা ছোট্ট কক্ষের মধ্যে এসে দাঁড়াল। দিনের বেলাও বেশ অন্ধকার। হেমাঙ্গিনী সুইচ টিপে আলো জ্বালল। এবার বিনয় সেন দেখল কক্ষটা সিঁড়িঘর।

বেশ সরু ধরনের একটা সিঁড়ি সোজা নেমে গেছে নিচের দিকে। হেমাঙ্গিনী আর বিনয় সেন সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

সিঁড়িটা বেশ ঘুরে ঘুরে নিচের দিকে নেমে গেছে। সিড়িতেও আলো ছিল। কাজেই নামতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না বিনয় সেনের।

সিঁড়িমুখে পৌঁছে হেমাঙ্গিনী দেবী থমকে দাঁড়াল। সিঁড়ির শেষে একটা পরজা রয়েছে। দরজায় মস্তবড় একটা তালা আটকান। হেমাঙ্গিনী কোমর থেকে একগোছ চাবি বেছে নিল, তারপর তালাটা খুলে ফেলল। বিনয় সেন সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল কিন্তু কক্ষটা জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কিছুই দেখতে পেল না সে। হেমাঙ্গিনী এবার বিনয় সেনকে তার সঙ্গে আসার জন্য ইংগিত করল।

বিনয় সেন বলল-ঐ অন্ধকারে কোথায় যাব হেমাঙ্গিনী দেরী?

আসুন, আলো জ্বেলে দিচ্ছি। হেমাঙ্গিনী অন্ধকারে প্রবেশ করে দরজার পাশেই দেয়ালে হাত রেখে সুইচ টিপল, সঙ্গে সঙ্গে কক্ষ আলোময় হলো।

বিনয় সেন কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেল, কক্ষের ওপাশে আর একটা লোহার দরজা, সেই দরজাতেও মস্তবড় একটা তালা লাগান।

হেমাঙ্গিনী এ তালাটাও পূর্বের ন্যায় অতি স্বচ্ছন্দে খুলে ফেলল।

হেমাঙ্গিনীর সংগে বিনয় সেন কক্ষে প্রবেশ করতেই বিস্ময়ে আড়ষ্ট হল কয়েকটা যুবতীকে সেই কক্ষে দেখতে পেল। কেউ বা বসে কেউ বা বিছানায় শুয়ে রয়েছে। সকলেরই মুখমণ্ডল বিষণ্ন, মলিন। চোখ বসে গেছে। কেউ কেউ নীরবে কাঁদছে।

হেমাঙ্গিনীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল বিনয় সেন। হেসে বলল হেমাঙ্গিনী-এখন এই কটা মাত্র আছে বিনয় বাবু। বাকীগুলো চালান হয়ে গেছে।

হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে বিনয় সেন কক্ষে প্রবেশ করতেই যে যুবতীগুলো বিছানায় শুয়েছিল তারা উঠে দাঁড়াল। সকলের মুখেই ফুটে উঠল একটা আতঙ্কের ছাপ। ভয়ে আড়ষ্ট হয় সবাই। বিনয় সেন হেমাঙ্গিনীর পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল! বিনয় সেন বেশ বুঝতে পারল যুবতীগণ তাদের আগমনে ভীত হয়ে পড়েছে-না জানি কার এবার বিপদ আসবে!

বিনয় সেনকে লক্ষ্য করে বলল হেমাঙ্গিনী....পছন্দ হয়?

বিনয় সেন ঠোঁট উল্টে মাথা নাড়ল—উঁ হুঁ।

এ কথায় হেমাঙ্গিনী যেন খুশি হয়েছে বলে মনে হল, বলল সে–একটিও না?

বিনয় সেন কোন জবাব না দিয়ে প্রতিটি মেয়ের মুখে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগল। একটি মেয়ে তখনও ওদিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল।

বিনয় সেন তার দিকে এগুলো।

হেমাঙ্গিনী অমনি বিনয় সেনের পথ রোধ করে দাঁড়াল। দেখা তো হল, কোটা চাই বলুন বিনয় বাবু? '

ঠিক সেই মুহূর্তে ফিরে তাকাল ঐ যুবতী, যে এতক্ষণ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিল। যুবতী অন্য কেউ নয়, দস্যু বনহুরের প্রিয়তমা-মনিরা।

যুবতী মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই বিনয় সেন ওকে লক্ষ্য করল—চমকে উঠল সে-মুগ্ধ হল, এত সুন্দরী যুবতী রয়েছে এখানে।

হেমাঙ্গিনী বুঝতে পারল, বিনয় সেনের দৃষ্টি মনিরার ওপর পড়েছে। হেসে বলল—ওকে বুঝি পছন্দ হল?

বিনয় সেনের দাড়িভরা মুখে হাসি ফুটে উঠল, মাথা দুলিয়ে বলল—খুন। পছন্দ হয়েছে!

হেমাঙ্গিনী বিনয় সেনের কানে মুখ নিয়ে বললনাগরাণী!

তার মনে?

মানে ওকে কেউ বাগে আনতে পারে না। সুন্দরী বলে সবাই ওকে পছন্দ করে কিন্তু পরে জান বাঁচানো মুশকিল হয়ে পড়ে। একজনকে সে খুন করেছে, দু'জনকে করেছে আহত।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, সেই কারণেই তো আজও পড়ে আছে। ওর পরে কত এলো কত গল, তবু সে রয়েছে। এখন যে আসে তার কাছে মূল্য বেশি চাই, কাজেই নিতে পারে না, আমিও খুনের হাত থেকে বেঁচে যাই!

তাহলে তো অমন মেয়েই আমার দরকার। নিরীহ মেয়ে আমার ভাল লাগে না, যেমন আপনাকে আমার খুব পছন্দ হয়। আচ্ছা হেমাঙ্গিনী, ওর এন্য আপনাকে কত দিতে হবে?

তা আপনাকে... মানে আপনার যা খুশি দেবেন।

বিনয় সেন মৃদু হেসে বলল—বিশ হাজার।

এত বেশি!

তার চেয়েও বেশি দিতে রাজী আছি হেমাঙ্গিনী দেবী।

বেশ, কিন্তু দেখবেন খুন-জখম না হয়ে বসেন!

মরতে যখন একদিন হবেই তখন ওসবে আমার ভয় নেই। তা টাকাটা কখন দিতে হবে?

যখন আপনার খুশী।

এই নিন টাকা, আমি সঙ্গেই এনেছি। পকেট থেকে হাজার টাকার কয়েক খানা নোট বের করে হেমাঙ্গিনীর সামনে বাড়িয়ে ধরল।

হেমাঙ্গিনীর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে জ্বলজ্বল করে—একসঙ্গে বিশ হাজার টাকা! হেমাঙ্গিনীর মুখ দিয়ে কোন কথা বের হল না। হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে জামার ফাঁকে বুকের কাছে রাখল।

মনিরা তখন সব বুঝতে পেরেছে, এবার তারই পালা। চোখে মুখে ফুটে উঠল তার একটা প্রতিহিংসার হিংস্র ভাব।

হেমাঙ্গিনী এবার মনিরার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, গলার স্বর যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে বলল-উনি মস্ত বড়লোক; তোমাকে রাজরাণী করে গাখবেন, যাও-যাও তুমি!

না, যাব না। কেন বাছা আমাকে বারবার জ্বলচ্ছে? উনি ভদ্র সন্তান, উনি মস্ত ধনবান, উনি অনেক জ্ঞানবান।

তবু আমি যাব না।

দেখ মেয়ে, তুমি আমাকে হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়েছ, তোমার জন্য আমার অনেক টাকা লোকসানও গেছে। এবার আমি তোমাকে রেহাই দেব না।

আমি যাব না।

তিলে তিলে তোমাকে শুকিয়ে মারব।

মরতেই চাই আমি।

মরতে চাইলেই মরতে দেব? আমার টাকাগুলো জলে ভেসে যাবে, তা হচ্ছে না বাছাধন… এবার বিনয় সেনকে লক্ষ্য করে বলল হেমাঙ্গিনী-আপনার গাড়ি?

বিনয় সেন বলল-বাইরে অপেক্ষা করছে।

হেমাঙ্গিনী হাতে তিনটা তালি দিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনটা যমদূতের মত ভীষণ আকার লোক এসে দাঁড়াল। মনে হলো যেন পাতালপুরী রাজ্য থেকে এল ওরা। হেমাঙ্গিনী বললো–বাইরে অন্ধকারে যে গাড়িটা অপেক্ষা করছে সেইগাড়িতে তুলে দিয়ে এসো।

ভয়ঙ্কর লোক তিনজন এগুলো মনিরার দিকে।

মনিরার মুখমণ্ডল ভয়ার্ত বিবর্ণ হয়ে উঠল, জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল সে।

ভয়ঙ্কর লোক তিনটা যেমনি মনিরাকে ধরতে গেল, অমনি মনিরা আর্তকণ্ঠে বলে উঠল-না, না, আমি যাব না, আমি যাব না, আমাকে তোমরা স্পর্শ কর না।

লোক তিনটা তবু পাকড়াও করার জন্য হাত বাড়াল মনিরার দিকে।

হেমাঙ্গিনী বলে উঠল-দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে গাড়িতে উঠিয়ে দাও।

বিনয় সেন বলে উঠল-থাক, দড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে না। আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি। এই, তোমরা সরে দাঁড়াও। বিনয় সেনের কথায় লোক তিনটি থমকে দাঁড়াল।

বিনয় সেন এবার মনিরার দিকে এগুলো।

মনিরা তাকাল বিনয় সেনের দিকে। দু'চোখে ওর ঝরে পড়ছে ক্রুদ্ধ হিংস্র ভাব।

বিনয় সেন মুহূর্ত বিলম্ব না করে খ করে মনিরার হাত মুষ্ঠিতে চেপে ধরল।

মনিরা অমনি হাতখানা ছাড়িয়ে নেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু একচুলও হাত নড়াতে পারল না। বিনয় সেন অতি সহজেই মনিরাকে নাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল।

হেমাঙ্গিনী হতবাক হল, যে যুবতীকে একসঙ্গে তিন-চার জন বলিষ্ঠ লোক এতটুকু নড়াতে পারে না, আর কিনা একজন লোক তাকে এভাবে নিয়ে যেতে পারল।

বিনয় সেন মনিরাকে গাড়িতে তুলে নিতেই ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল। মনিরা তখনও নিজেকে বিনয় সেনের কবল থেকে বাঁচিয়ে নেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা

করতে লাগল। গাড়িতে বসেই বিনয় সেন মনিরার মুখে একটা রুমাল বেঁধে দিল যেন সে চিৎকার করতে না পারে। তবু মনিরা নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে ধস্তাধস্তি করছে দেখে বিনয় সেন তার হাত পিছমোড়া করে বাঁধল।

গাড়ি চালাচ্ছিল গোপীনাথ।

গাড়ি ছাড়ার পূর্বে গোপীনাথ বিনয় সেনকে জিজ্ঞাসা করল–কোথায় যাবেন হুজুর? রাজবাড়িতে আপনার বাসায়, না আপনার বজরায়।

বিনয় সেন বলল—আমার বজরায়।

গাড়ি শহর ছেড়ে বাইরের পথ ধরে ছুটে চলল।

বিনয় সেন মনিরাকে নিয়ে বিদায় হতেই হেমাঙ্গিনী অন্যান্য মেয়ের দিকে একবার সতৃষ্ণ নজরে তাকাল—এদের বিক্রি করে আর কত হাজার পাওয়া যেতে পারে, এটাই বুঝে ভেবে নিল সে। তারপর কক্ষের দরজায় তালা বন্ধ করে সিঁড়ি বেয়ে নিজের কক্ষে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। টাকাটা অন্য সময় সুযোগ বুঝি গুণে দেখবে, এখনকার মত রেখে দিল লোহার সিন্দুকে।

হেমাঙ্গিনীর আনন্দ আজ আর ধরে না, আজ তার বাঈজী জীবন সার্থক হয়েছে। বিনয় বাবুর মত একজন সুপুরুষ যুবক তার রূপের প্রশংসা করেছে। আর একটু হলেই তারই প্রেমে পড়ে যেত বিনয় বাবু, কিন্তু ঐ ছুড়ীটাই আর বাধার কারণ হয়ে দাঁড়াল। যাক, তবু তো একসঙ্গে এতগুলো টাকা! হেমাঙ্গিনী আজ নাচতে শুরু করে, জোয়ান থাকতে অনেক নেচেছে, কিন্তু সে আজ প্রায় বিশ বছর আগের কথা। এখনও সে বেশ নাচতে পারত, শুধু শরীরটায় যা মেদ হয়েছে, পা দু'খানা যেন আর নড়তে চায় না এই যা!

.

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের বেশে বিনয় সেন মনিরাকে নিয়ে নিজের বজরায় প্রবেশ করল। মনিরার হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা হয়েছে। মুখেও রুমাল বাঁধা। কাজেই মনিরা চিঙ্কার বা নড়াচড়া করতে পারছিল না। অসহায় মনিরার বুকের মধ্যে ঝড় বইছে। ভয়ঙ্কর একটা কিছুর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল সে। এই দুষ্ট শয়তানের কবল থেকে কি করে নিজেকে রক্ষা করবে সেই চিন্তা করতে লাগল।

ভাবছে মনিরা—এবার আর অর রক্ষা নেই, এই বুঝি তার জীবনের শেষ পরিণতি। সে নীড়হারা কপোতীর ন্যায় থর থর করে কাঁপছে।

বিনয় সেন মনিরাকে কক্ষে নিয়ে গিয়ে ওর হাতের এবং মুখের বাঁধন খুলে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে মনিরা সরে দাঁড়াল একপাশে। দু'চোখে তার ঝরে পড়ছে সর্পিনীর মত ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, নিঃশ্বাস দ্রুত বইছে, দাঁতে অধর দংশন করে সে।

বিনয় সেন মনিরার দিকে এগুলো না বা তাকে পাকড়াও করলো না, নিস্পন্দ নয়নে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

মনিরা অবাক হল লোকটা তার দিকে অমনভাবে তাকিয়ে আছে কেন। রাগও হলো মনিরার, সে পেছন ফিরে দাঁড়াল।

বিনয় সেন তখনও স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। মনিরার হৃৎপিণ্ড ঢিপ ঢিপ করছে, এই বুঝি তার ওপর হামলা করে বসল, বেশ কিছু সময় কেটে গেল এখনও তো লোকটা কিছু বলছে না বা তাকে কোন রকম বিরক্ত করছে না। ব্যাপার কি? মনে মনে কিছুটা সাহস হল মনিরার, আবার সে তাকাল বিনয় সেনের দিকে। একি এখন প্রৌঢ় ভদ্রলোক তার দিকে তেমনিভাবে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয়ই লোকটা ভারছে কোন কথা। হয়ত অনুরোধ জানালে মায়া হতে পারে। হাজার হলেও বুড়ো মানুষ তো, পিতার বয়সী। কিন্তু এতগুলো টাকা সে আমার জন্য দিয়েছে, এত সহজে ছাড়বে? তবুও যার হৃদয় বলে কিছু আছে সে কোনদিন এ জঘন্য বা হৃদয়হীন হতে পারে না।

মনিরা নিজেকে রক্ষার জন্য ওর পায়ে ধরবে তবুও যদি সে পরিত্রাণ পায়। এবার মনিরা ছুটে গিয়ে বিনয় সেনের পা জড়িয়ে ধরল-আমাকে বাঁচান....

বিনয় সেন মনিরাকে দু'হাতে বাড়িয়ে তুলে নিল, গম্ভীর স্থিরকণ্ঠে বলল–ভয় নেই, আমি তোমাকে কোন দুষ্ট মতলবে নিয়ে আসিনি।

মনিরা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকাল বিনয় সেনের মুখের দিকে।

বিনয় সেন বলল আমি তোমাকে ঐ নর-পিশাচিনীর কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যই এভাবে নিয়ে এলাম।

মনিরা এবার বলে উঠল—আপনি এত টাকা আমার জন্য নষ্ট করলেন

নষ্ট নয়, ও টাকা আমার সৎ উদ্দেশ্যে ব্যয় হয়েছে। তোমাকে দেখে আমার বড় মায়া হল তাই–বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল বিনয় সেনের কণ্ঠ।

মনিরার দু'গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দু'ফোটা অশ্রু। কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল তার মন, বলল সে-আপনার এ উপকারের কথা জীবনে ভুলব না। জানি না আপনি কে—আপনার পরিচয়ই বা কি, তবু আপনার মহৎ হৃদয়ের যে পরিচয় পেলাম কোনদিন তা আমার মন থেকে মুছে যাবে না।

বিনয় সেন এবার বলল—যদিও আমি ঝিন্দ শহরে বাস করি কিন্তু আমি ঝিন্দের অধিবাসী নই, আমি বিদেশী। আমার নাম বিনয় সেন। উপস্থিত আমি রাজকর্মচারী পদে নিযুক্ত রয়েছি। হাঁ, তুমি আমার এখানে নির্ভয়ে থাকতে পার। পাশের কামরায় তোমার মত আর একজন রয়েছে, সেও গৃহহারা, রিক্তা। আচ্ছা এবার বল তোমাকে কোথায় পৌঁছে দিলে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারবে?

মনিরা কিছুক্ষণ বিষণ্ন বদনে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ব্যথিত কণ্ঠে বলব–কোথায় যাব জানি না।

কেন, তোমার বাবা-মা স্বামী?

বড় অপয়া আমি, আজ আমি সর্বহারা।

ছিঃ দুঃখ করতে নেই, তুমি বস, বসে স্থির হয়ে কথা বল।

বসলো মনিরা। কতদিন পর আজ মনিরা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করল।

বিনয় সে জিজ্ঞাস করল—তোমার নাম কি?

আমার নাম মনিরা।

কোথায় বাড়ি তোমার?

কান্দাই শহরে।

সে তো এখান থেকে বহু দূরে।

হ্যাঁ

সেখানে তোমার কে আছেন?

আমার কেউ নেই, এক মামীমা আছেন।

বেশ, সেখানেই তোমাকে পৌঁছে দেব। কিন্তু দেখ মনিরা, আমার কাছে তুমি কিছু লুকাবে না, আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি।

হ্যাঁ, তা আমি বুঝতে পেরেছি। আপনার মত হৃদয়বান এ বিশ্বে বুঝি কেউ নেই।

আচ্ছা মনিরা, তোমার একমাত্র মামীমা ছাড়া আর কি কেউ নেই?

সব ছিল, আজ নেই।

তোমার বাবা-মা?

মারা গেছেন।

তোমার ভাই-বোন?

ছিল না।

তোমার স্বামী?

মনিরা নিশ্চুপ হয়ে পড়ল, ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো তার চোখ দিয়ে।

কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বলল—স্বামীর কাছে আমি অবিশ্বাসিনী হয়েছি।

অবিশ্বাসিনী!

হ্যাঁ, আমার স্বামীর মনে একটা মিথ্যা সন্দেহ প্রবেশ করেছিল তারপর থেকে তিনি আর আমার সন্ধান নেননি।

এত হৃদয়হীন তোমার স্বামী! মিথ্যা সন্দেহ করে তোমার মত স্ত্রীর প্রতি যে অবিচার করতে পারে

না না, আমার স্বামী হৃদয়হীন নন, তিনি অতি মহৎ, অতি মহান—

নারীমন অমনই হয়, নারীর কাছে স্বামী পরম গুরু তাই তার সকল দোষ স্ত্রীর নিকট মার্জনীয়। কিন্তু আমার কাছে তোমার স্বামী এক পাপীষ্ঠ–শুধু পাপীষ্ঠই নয়–নরপিশাচ–

না না, ওসব কথা বলবেন না। আমি সব সইতে পারি সব কষ্ট বুক পতে নিতে পারি কিন্তু আমার স্বামীর নামে কোন কথা সইতে পারি না–

মনিরা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

বিনয় সেন স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

অনেকক্ষণ কাঁদল মনিরা, তারপর বুকের তার কিছুটা যেন লাঘব হল, এবার সোজা হয়ে বসল আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে বলল—আমার স্বামীর কোন দোষ নেই, তিনি যে মুহূর্তে যেমন কথা শুনেছেন তাতে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। আপনি আমার গুরুজন তাই আপনার নিকট আমি সব বলছি–আমার এক ছেলে জন্মেছিল। দুর্ভাগ্য, সন্তানটি যখন আমার পেটে আসে তার কয়েক দিন পরই আমার স্বামী নিরুদ্দেশ হন। তারপর আবার তার সঙ্গে আমার যখন সাক্ষাৎ ঘটে, তখন আমার কোলে নবজাত শিশু। এবং যে মুহূর্তে আমার সঙ্গে আমার স্বামীর প্রথম সাক্ষাৎ হল সে মুহূর্তে এক দুষ্ট ব্যক্তি আমার সন্তান সম্বন্ধে কুৎসিত ইংগিত করেছিল, কাজেই নি ভুল করেননি।

বিনয় সেন বলল—কিন্তু লোকের কথা শুনেই ওভাবে তোমাকে তার করা উচিত হয়নি।

ত্যাগ তিনি করেননি, আমার অদৃষ্ট আমাকে এভাবে ঘুরপাক খাওয়া।

তোমার সন্তান এখন কোথায়?

পুনরায় মনিরার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল, ধরা গলায় বলল—সে নেই, এক সন্ন্যাসী তাকে নিয়ে গেছে।

কে বলল এ কথা?

ঐ হেমাঙ্গিনী তাকে কাপালিক সন্ন্যাসীর নিকট বিক্রি করেছিল।

বিনয় সেনের মুখমণ্ডল ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠল। দু'চোখ দিয়ে নির্গত হতে লাগল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, হেমাঙ্গিনী!

হাঁ, হেমাঙ্গিনী আমাকে আরও দুবার বিক্রি করেছিল কিন্তু খোদা আমার সহায়, তাই আজও আমি নিজের ইজ্জত রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছি। আমি ইজ্জত বাঁচাতে নরহত্যা করেছি নিশ্চয়ই একদিন আমার স্বামীর মনের ভুল ভেঙে যাবে। তিনি হয়তো আমার মনের কথা জানতে পারবেন, আমাকে বিশ্বাস করবেন, আমাকে গ্রহণ করবেন।

মনিরার কথায় বিনয় সেনের চোখ দিয়ে ফোটা ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

মনিরা বলল—আমার দুঃখে আপনি কাঁদছেন। সত্যি আমি বড় হতভাগী। নইলে অমন স্বামী, অমন সন্তান হারাব কেন?

মনিরা তুমি নিশ্চিন্ত থাক আমি তোমার স্বামীকে খুঁজে বের করব। তাকে সব খুলে বলব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক মনিরা।

মনিরা কোন জবাব দিতে পারল না।

বিনয় সেন উঠে দাঁড়াল–আমি চললাম হেমাঙ্গিনীকে তার উচিত সাজা দিতে।

না না, আপনি যাবেন না, আপনি যাবেন না। ওর সঙ্গে পারবেন না। অনেক লোক ওর রয়েছে–

মনিরা তুমি দোয়া কর আমি সব বিপদ যেন হাসিমুখে জয় করতে পারি–কথা শেষ করেই বেরিয়ে গেল বিনয় সেন।

•

ঝিন্দ পুলিশ অফিস।

পুলিশ অফিসারগণ এবং পুলিশবাহিনীর প্রায় সকলেই ঝিল অধিবাসী। সকলেরই চেহারা বলিষ্ঠ, মজবুত। ঝিন্দবাসীরা প্রায়ই কর্তব্যপরায়ণ এবং নিষ্ঠাবান। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঝিন্দাবাসী প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না বা পিছপা হয় না।

এমন দেশেও রয়েছে অনাচার-অবিচার অত্যাচার-উৎপীড়ন। লোকচক্ষুর অন্তরালে সর্বদা যে কত দুষ্কর্ম সাধিত হচ্ছে তার ঠিক নেই। যেমন আলোর পেছনে অন্ধকারের ঘনঘটা।

ঝিন্দ শহর অতি সুন্দর এবং মনোরম। রাজা জয়সিন্ধের ন্যায়বিচারে এখানে প্রজাগণ সুখে বসবাস করত। কিন্তু সেই ন্যায়বান রাজার অন্যায়বান পুত্র মঙ্গলসিন্ধের দুষ্কর্মে নগরবাসী হাঁপিয়ে উঠল, কিন্তু ভয়ে কেউ কোন কথা বলতে পারত না বা সাহস হত না। রাজা বিচার করতেন রাজদরবারে, আর রাজকুমার নির্যাতন চালাত লোকচক্ষুর অন্তরালে, কাজেই নগরের যত অনাচার অত্যাচার গোপনেই চলতো, বাইরে তেমনভাবে কিছু প্রকাশ পেত না।

গভীর রাত।

পুলিশ ইন্সপেক্টার শ্রী ধনঞ্জয় রায় এবং বড় দারোগা শ্রী বাসুদেব পুলিশ অফিসে বসে কোন গোপন ডায়েরী নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। দু’জন জমাদার ও কয়েকজন পুলিশ থানা ইনচার্জে রয়েছেন। পুলিশগণের হাতে গুলিভরা রাইফেল।

এত রাতে একখানা ট্যাক্সি এসে থামল পুলিশ অফিসের সামনে। নেমে এল বিনয় সেন, এখন তার শরীরে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের বেশ নেই! গাড়ি থেকে নেমে সোজা পুলিশ অফিসের দিকে এগুলো একদল পুলিশ জিজ্ঞাসা করল—আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

বিনয় সেন জবাব দিল-রাজবাড়ি থেকে?

রাইফেল নত করে দাঁড়াল পুলিশগণ।

বিনয় সেন পুলিশ অফিসের দরজায় গিয়ে কলিং বেলে চাপ দিল, সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল–কে?

বিনয় সেন জবাব দিল-আমি রাজকর্মচারী।

আসুন!

বিনয় সেন পুলিশ অফিসে প্রবেশ করল।

রাজকর্মচারীর আগমনে ধনঞ্জয় রায় এবং বাসুদেব উঠে অভ্যর্থনা জানালেন।

তারপর সকলে আসন গ্রহণ করার পর ধনঞ্জয় রায় জিজ্ঞাসা করলেন-এত রাতে?

বিনয় সেন বলল অতি গুরুতর খবর, একটা নারীহরণকারী গোপন আস্তানার সন্ধান আমি পেয়েছি।

ধনঞ্জয় রায়, বাসুদের ও অন্যান্য পুলিশ অফিসার কিছুদিন যাবৎ নারীহরণকারী দল সম্বন্ধে বেশ সচেতন হয়ে পড়েছেন, কারণ ইতোমধ্যে ঝিল শহরের কয়েকজন সুন্দরী তরুণী নিখোঁজ হস্কেছে। আজও এই ব্যাপার নিয়েই এতক্ষণ ধনঞ্জয় রায় ও বাসুদেবের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছিল! বিনয় সেনের কথায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন ধনঞ্জয় রায়, বললেন কি করে আপনি ঐ আস্তানার সন্ধান পেলেন?

বিনয় সেন বলল আমার বোনকে ওরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, তাকে উদ্ধার করতে গিয়েই আমি ওদের আস্তানার সন্ধান পেয়েছি। আপনারা আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করবেন না, এক্ষুণি প্রস্তুত হয়ে নিন। আরও একটা কথা, শুধু হেমাঙ্গিনীর বাড়িতে তার কারবার সীমাবদ্ধ নয়, তার দলকল অনেকেই জানবাগ হোটেলে রয়েছে। এ হোটেলটি হেমাঙ্গিনীর।

ধনঞ্জয় রায় আদেশ দিলেন পুলিশবাহিনীকে তৈরি হয়ে নেবার জন্যে।

অল্পক্ষণেই সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী তৈরি হয়ে নিল।

ধনঞ্জয় সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে চললেন হেমাঙ্গিনীর বাড়ি অভিমুখে, তাদের সঙ্গে রইল বিনয় সৈন।

আর বাসুদেব পুলিশবাহিনীর আর একটা দল নিয়ে চললেন জানবাগ হোটেল অভিমুখে।

নিশীথ রাতের জনহীন পথ বেয়ে সশস্ত্র বাহিনীসহ কয়েকটা মোটরকার দ্রুত ছুটে চলল।

ধনঞ্জয় রায় সেন দলবল নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন হেমাঙ্গিনীর বাড়ির সামনে। ধনঞ্জয় রায়ের ইঙ্গিতে পুলিশবাহিনী সঙ্গে সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর গোটাবাড়ি ঘেরাও করে ফেলল।

কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশসহ অন্তঃপুরে প্ররেশ করলেন ধনঞ্জয় রায়।

বিনয় সেন সেই অবসরে পথে অদৃশ্য হল।

১৮.

হেমাঙ্গিনী গভীর রাতে সিন্দুক খুলে টাকার অংক মিলিয়ে দেখছে। আজ তার কত টাকা সিন্দুকের টাকার সঙ্গে যোগ ইল। হেমাঙ্গিনীর চোখেমুখে আনন্দের দ্যুতি খেলে যাচ্ছে। এতগুলো টাকার মোহ তাকে আনন্দে আত্মহারা করে তুলছে। বার বার টাকার মাণ্ডিলগুলো নেড়েচেড়ে দেখছে সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল হেমাঙ্গিনীর সামনে। তার দক্ষিণ হস্তে উদ্যত রিভলবার।

হেমাঙ্গিনী চমকে চোখ তুলে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠল-কে তুমি?

কঠিন অথচ চাপাকণ্ঠে বলল ছায়ামূর্তি-আমি তোমার মৃত্যুদূত।

ছায়ামূর্তির হাতের রিভলবারের দিকে তাকিয়ে হেমাঙ্গিনীর কণ্ঠনালী শুকিয়ে গেল, ঢোক গিলে বলল-কি চাও?

সমস্ত টাকা!

না, তা হবে না, প্রাণ দেব তবুও টাকা দেব না—কে তুমি, আমি এখনই পুলিশ ডাকব।

পুলিশ তোমাকে ডাকতে হবে না, এখনই আসবে। শিগগির টাকাগুলো আমায় দিয়ে দাও।

না না, দেব না আমি টাকা।

দেখ, চিঙ্কার করলে এখনই তোমাকে হত্যা করব।

হত্যা!

হাঁ।

হেমাঙ্গিনী অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকলি দরজার দিকে।

ছায়ামূর্তি বললো—কেউ আসবে না। পুলিশ তোমার বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছে।

পুলিশ! ভয়ার্ত কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করল হেমাঙ্গিনী।

ছায়ামূর্তি বলে উঠল-আমি তোমাকে পুলিশের হাতে দেব না। একটানে হেমাঙ্গিনীকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে রিভলবার চেপে ধরল, তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বলল শয়তানী, নারীহরণ করে যে পাপ তুমি করেছ তার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে আমার হাতেই ভোগ করতে হবে–সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তির হাতের রিভলবার গর্জে উঠল।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে গেল হেমাঙ্গিনী।

ছায়ামূর্তি এবার দ্রুতহস্তে সিন্দুকের তালা খুলে টাকার বাণ্ডিলগুলো জামার চোরা পকেটে লুকিয়ে ফেলল। তারপর বিন্দুকের তালা বন্ধ করে চাবিগোছা ছুঁড়ে ফেলে দিল পাশের জানালা দিয়ে দোতলার নিচে বাগানে। এবার ছায়ামূর্তি রিভলবারখানা খুঁজে দিল প্রাণহীন হেমাঙ্গিনীর হাতের মুঠায়।

তারপর যে পথে ছায়ামূর্তি প্রবেশ করেছিল সেই পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ততক্ষণে পুলিশবাহিনীসহ ধনঞ্জয় রায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে।

ইতোমধ্যে বিনয় সেন এসে দাঁড়াল ধনঞ্জয় রায়ের পাশে।

ধনঞ্জয় রায় বলে উঠল-বাড়ির ভেতর থেকে একটা গুলির শব্দ এল-ব্যাপার কি?

আমিও সেই শব্দ শুনে এদিকে ছুটে এলাম ইন্সপেক্টার সাহেব। চলুনত দেখি।

বিনয় সেন আগে আগে, পুলিশবাহিনী তাকে অনুসরণ করলো।

হেমাঙ্গিনীর কক্ষে প্রবেশ করে স্তম্ভিত হলেন পুলিশ ইন্সপেক্টার ধনঞ্জয় রায় ও বিনয় সেন। হেমাঙ্গিনীর রক্তাক্ত দেহটা একটা পাহাড়ের মতো মেঝেতে পড়ে আছে। দক্ষিণ হাতে তার রিভলবার এখনও ধরা রয়েছে।

বিনয় সেন বলে উঠল—হেমাঙ্গিনী পুলিশের আগমন জানতে পেরে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিজেই করেছে। কিন্তু এখানে আর বিলম্ব নয়, এই মুহূর্তে তার দলবল যারা এ বাড়িতে আছে তাদের পাকড়াও করতে হবে, চলুন।

ধনঞ্জয় রায় হেমাঙ্গিনীর লাশের নিকটে একজন পুলিশ পাহারা রেখে বিনয় সেনের সঙ্গে এগিয়ে চললেন।

যে কক্ষে হেমাঙ্গিনীর দল নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল প্রথমে সে কক্ষে প্রবেশ করল পুলিশবাহিনী।

পুলিশের দল কাউকে রাইফেলের তো আর কাউকে বুটের লাথি দিয়ে জাগিয়ে তুলল।

ভীষণ আকার লোকগুলো জেগে উঠে হাবা বনে গেল। প্রত্যেকটা লোকের বুকের কাছে পুলিশবাহিনী রাইফেল উঁচিয়ে ধরেছে। সবাইকে। গ্রেফতার করতে আদেশ দিলেন ধনঞ্জয় রায়। কিন্তু সেই অবসরে গুণ্ডাদের নেতা যে পাশের কামরায় ঘুমাচ্ছিল জেগে উঠেই ব্যাপারটা আঁচ করে নিল, তারপর সকলের অলক্ষ্যে সরে পড়ল। লোকটার নাম ছিল গহর আলী।

বিনয় সেন কিন্তু গহর আলীকে দেখে ফেলল। এই মুহূর্তে তার পেছনে ধাওয়া করা উচিত মনে করল না সে, কারণ এখন তাকে এখানে বন্দী ঐ মেয়েদের উদ্ধার কার্যে নিযুক্ত হতে হবে।

পুলিশবাহিনী ততক্ষণে গুণ্ডাদলকে গ্রেফতার করে ফেলেছে!

বিনয় সেন এবার সেই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে চলল, ‘তার সঙ্গে ধনঞ্জয় রায় ও কয়েকজন পুলিশ।

যুবতীদের বন্দীকক্ষে প্রবেশ করে তাদের উদ্ধার করে নেয়া হল। একটি প্রাণীও এল না আজ পুলিশবাহিনীকে বাধা দিতে। যুবতীগণকে উদ্ধার করে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন ধনঞ্জয় রায়, বিনয় সেনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে ললেন-আপনার সহায়তায় এত বড় একটা জঘন্য নারীহরণ কারী দলকে অতি সহজে গ্রেফতারে সক্ষম তুলাম, সেজন্য অশেষ ধন্যবাদ বিনয় বাবু!

বিনয় সেন হেসে বলল-আপনার সাহায্য না পেলে আজ আমি কিছুই করতে পারতাম না ইন্সপেক্টার সাহেব, এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

ধনঞ্জয় রায় এবং বিনয় সেন যখন নারীহরণকারী গুণ্ডাদলকে গ্রেফতার ও যুবতীগণকে উদ্ধার করে নিয়ে পুলিশ অফিস অভিমুখে ফিরে চললেন, ঠিক তখন জনবাগ হোটেলে ভীষণ লড়াই চলছে। পুলিশবাহিনী আর হেমাঙ্গিনীর গুণ্ডাদল মিলে চলেছে ধস্তাধস্তি-মারামারি।

কয়েকজন গুণ্ড নিহত আঁর আহত হল। পুলিশদের মধ্যেও নিহত হল দু’তিনজন। তারপর গুণ্ডাদের পাকড়াও করতে সক্ষম হলো পুলিশবাহিনী। বাসুদেবও আহত হলেন জানবাগ হোটেলের ম্যানেজারের হাতে। ম্যানেজার বাসুদেবকে আহত করে পালাতে যাচ্ছিল কিন্তু সে পালাতে সক্ষম হল না, অজ্ঞাত গুলির আঘাতে নিহত হল।

শেষ পর্যন্ত পুলিশবাহিনী জয়ী হলো, জানবাগ হোটেলের কর্মচারীদের বন্দী করে নিয়ে ফিরে চলল তারা।

.

বনহুর অর রহমান অশ্বপৃষ্ঠে এগিয়ে চলেছে।

দু’জনের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল।

বনহুর বলল-রহমান, জানবাগ হোটেলের ম্যানেজার তাহলে তোমার গুলিতেই নিহত হয়েছে?

হাঁ, সর্দার, দারোগাকে আহত করে ভাগছিল, বেটা, আমি ওকে শেষ করে দিয়েছি।

ভালই করেছ রহমান।

সর্দার, নারীহরণকারী দল নিঃশেষ হল, এবার দেশে ফিরে যাওয়া থাক।

হাঁ, তাই যাব কিন্তু আরও কটা দিন আমাকে ঝিন্দে অবস্থান করতে হবে।

কেন সর্দার?

আরও কিছু কাজ বার্ক আছে। হেমাঙ্গিনীর সিন্দুক থেকে বহু অর্থ আমি উদ্ধার করেছি, এই অর্থ আমি ঝিন্দের দীন-দুঃখীর মধ্যে বিলিয়ে দিতে vাই। কারণ, ঝিন্দের টাকা আমি নিয়ে যেতে চাই না।

সর্দার, আপনিই তাহলে হেমাঙ্গিনীকে—

হাঁ রহমান, আমি হেমাঙ্গিনীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছি। কিন্তু হেমাঙ্গিনীর দক্ষিণ হাত গহর আলী মে এক ব্যক্তি সে এখনও জীবিত, এখনও পলাতক। যাক, ওকে আমি যেখানেই পাব, চিনতে পার তাতে কোন সন্দেহ নেই। রহমান, তুমি ছদ্মবেশে ঝিন্দ শহরে দীন-দুঃখীদের মধ্যে সন্ধান মাও সত্যিকার দুঃখী লোক কারা এবং তাদের কি সাহায্য প্রয়োজন, সেই মত তাদেরকে অর্থ সাহায্য করবে।

আচ্ছা সর্দার।

এবার বনহুর তার অশ্বের গতি বাড়িয়ে দিল।

রহমানও সর্দারকে অনুসরণ করল।

ঝিন্দ নদীর বালুকাময় তীর বেয়ে দ্রুত এগিয়ে চললো দস্যু বনহুর আর হমানের অশ্ব।

বিনয় সেন এক সময় মনিরার সঙ্গে সুফিয়ার দেখা করার সুযোগ করে দিল।

মনিরাকে দেখামাত্রই সুফিয়া চিনতে পারল। কারণ ওরা একই সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর বন্দীখানায় ছিল। মনিরাকে দেখতে পেয়ে সুফিয়া জড়িয়ে ধরল, আনন্দে অধীর হয়ে বলল–তুমি এখানে কি করে এলে?

মনিরা বলল—যিনি তোমাকে এখানে এনেছেন তিনি আমাকেও এনেছেন, তার দয়াতেই আমি হেমাঙ্গিনীর অভিশপ্ত নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পেরেছি। সত্যি বোন, আমরা উভয়েই আজ তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

মনিরা আর সুফিয়ার মধ্যে অনেক দুঃখের বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হল। সুফিয়া কি করে দুষ্ট শয়তানদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে; কিভারে রাজকর্মচারী বিনয় সেন তাকে উদ্ধার করলেন এবং তাকে বোনের আসনে প্রতিষ্ঠা করেছেন সব খুলে বলল সুফিয়া মনিরার কাছে।

একেই মনিরা বিনয় সেনের ব্যবহারে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিল, সুফিয়ার মুখে তার আরও প্রশংসা শুনে অনেক খুশি হল।

বিনয় সেন এই দুই যুবতীর মধ্যে দেখা দিত দুই আকারে। সুফিয়া জানে, বিনয় সেন সুন্দর সুপুরুষ যুবক। আর মনিরা জানে, বিনয় সেন প্রৌঢ় অমায়িক মহৎ হৃদয় এক ভদ্রলোক।

কিন্তু আসল পরিচয় তার কেউ জানে না-কে এই বিনয় সেন।

০১১. ঝিন্দের রাণী

ঝিন্দের রাণী – রোমেনা আফাজ [দস্যু বনহুর সিরিজের একাদশতম উপন্যাস।]

০১.

মঙ্গলসিন্ধ কারাগারে বাস করলেও বাইরের সব খবর তার নিকটে পৌঁছত। রাজার কয়েকজন দুষ্ট অনুচর ছিল, তারা গোপনে সব কথা জানাত কুমার বাহাদুরের নিকটে। একদিন কয়েকজন দুষ্ট অনুচরের সহায়তায় কারাগারের পাহারাদারকে হত্যা করে কারাগার থেকে বেরিয়ে এল মঙ্গলসিন্ধ। এখন মঙ্গলসিন্ধের পায়ের জখম সম্পূর্ণ সেরে গেছে। কারণ, রাজকুমার কারাগারে বাস করলেও তার চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয়নি।

মঙ্গলসিন্ধের প্রধান সহচর কঙ্কর সিং যেমন নির্দয় তেমনি নীচুমনা।

মঙ্গলসিন্ধ বন্ধুর কাছে এমন এক পরামর্শ পেল যা তার মনে এনে দিল প্রতিহিংসার বহ্নিজ্বালা।

সেদিন রাজা জয়সিন্ধ নিজের কক্ষে নিদ্রিত ছিলেন। সারাটা দিন তিনি প্রজাদের মঙ্গল-চিন্তায় মগ্ন থাকতেন এবং প্রজাদের যতটুকু উপকার করতে পারেন তার কোন ত্রুটি করতেন না। তার ন্যায়বিচারে প্রজাগণ সব সময় তুষ্ট ছিল।

গভীর রাতে মঙ্গলসিন্ধ কারাগার থেকে বেরিয়ে এল। হস্তে তার সুতীক্ষ্ণধার ছোরা, অতি গোপনে পিতার কক্ষে প্রবেশ করল সে। কঙ্কর সিং দাঁড়িয়ে রইল বাইরে।

মঙ্গলসিন্ধ পিতার শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দু'চোখে তার অগ্নিশিখা নির্গত হচ্ছে। কি ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করেছে মঙ্গলসিন্ধ দক্ষিণ হাতে তার সুতীক্ষ্ণধার ছোরা।

মঙ্গলসিন্ধ একবার তীব্র কটাক্ষে পিতার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, তারপর অতি দ্রুতহস্তে ছোরাখানা আমূল বসিয়ে দিল রাজা জয়সিন্ধের বুকে।

তীব্র একটা আর্তনাদ করে উঠলেন রাজা জয়সিন্ধ, তারপর নীরব হয়ে গেল সব।

কেউ জানল না, কেউ দেখল না, কে রাজাকে হত্যা করল পরদিন রাজ্যময় কথাটা ছড়িয়ে পড়ল পত্রিকায় পত্রিকায় প্রকাশ পেল ন্যায়বিচারক রাজা জয়সিন্ধের নির্মম হত্যা রহস্যের কথা।

সমস্ত রাজ্যে একটা গভীর শোকের ছায়া ঘনিয়ে এল। প্রজাগণ এবং দেশবাসী হাহাকার করে উঠল, আজ থেকে তাদের ন্যায়দণ্ড ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

কথাটা নিজের বজরায় বসে শুনল দস্যু বনহুর।

দক্ষিণ হাত তার মুষ্ঠিবদ্ধ হল, চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠল দাঁতে দাঁত পিষে বলল–রাজা জয়সিন্ধের খুন আমার মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে রহমান।

বনহুরের সামনে দণ্ডায়মান ছিল রহমান, বলল সে –এমন মহৎ সদাশয় রাজাকে কে হত্যা করল?

সে প্রশ্ন আমাকেও উত্তেজিত করে তুলছে রহমান। ভেবেছিলাম অচিরেই আমরা ঝিন্দা শহর ত্যাগ করে চলে যাব কিন্তু তা হল না।

সর্দার, আবার এখানে–

হাঁ, রহমান যতদিন আমি রাজা জয়সিন্ধের হত্যাকারীকে খুঁজে বের করে শাস্তি দিতে না পেরেছি ততদিন আমার ঝি ত্যাগ করা সম্ভব নয়। তুমি তো জান রহমান, দস্যু বনহুর অন্যায়ের বিরুদ্ধে জান কোরবান করতেও দ্বিধা বোধ করে না। তুমি

প্রস্তুত হয়ে নাও, আজ রাতেই আমরা বের হব, দেখতে চাই কে এই রাজা জয়সিন্ধের মৃত্যুদূত।

কথাগুলো বলার সময় বনহুরের মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠল। নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে বজরার মেঝেতে পায়চারী কবতে লাগলো সে।

রহমান বনহুরের উত্তেজিত ভাব লক্ষ্য করে ভীত হল। সর্দারকে সে এমনভাবে রাগতে খুব কমই দেখেছে। রহমান ভয়ঙ্কর একটা কিছুর প্রতীক্ষা করতে লাগল, তবু বুলল–সর্দার, ঝিন্দের রাজার মৃত্যু ঘটেছে তাতে আমাদের এত বিচলিত হবার কি দরকার?

রহমান, বনহুর শুধু যে দেশে জন্মেছে সে দেশের সন্তান নয়। সারা বিশ্ব তার জন্মস্থান। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ তার আপনজন। ন্যায় তার রীতি, অন্যায়ের বিরুদ্ধেই তার সংগ্রাম, এর কোনদিন পরিবর্তন হবে না।

বনহুরের এ কথার পর রহমান আর কিছু বলতে পারল না। সর্দারকে সে ভালভাবে জানে, সে একবার যা বলবে তা না করে ছাড়বে না।

সে বুঝতে পারল জয়সিন্ধের হত্যাকারীকে সর্দার খুঁজে বের করবেই এবং জয়সিন্ধের হত্যার প্রতিশোধ সে নেবেই।

০২.

সেদিন মনিরা আর সুফিয়া শুয়ে শুয়ে গল্প করছিল। এখন তাদের একসঙ্গেই উঠা-বসা, নাওয়া-খাওয়া এমনকি ওরা দু'জন এক সঙ্গে একই কক্ষে, একই বিছানায় শোয়।

নানা সুখ-দুঃখের গল্প করে, হাঁসে কাঁদে, কত রকম কথাবার্তাই না হয় মনিরা আর সুফিয়ার মধ্যে।

সেদিন কথায় কথায় বলে মনিরা—সত্যিই বোন সুফিয়া, আজ আমরা মহৎ হৃদয় বিনয় বাবুর জন্যই রক্ষা পেয়েছি, তার এ উপকারের কথা আমরা কোনদিন ভুলবো না। আজও তিনি আমাদের যে উপকার করে চলেছেন তা আর বলার নয়। তাঁর মত মহান লোক এ দুনিয়ায় খুবই কম আছেন।

মনিরার কথায় বলে উঠল সুফিয়া–ঠিকই বলেছ মনিরা, তার সুন্দর চেহারার সঙ্গে মনের অদ্ভুত মিল আছে। এমন সুন্দর সুপুরুষ আর বুঝি হয় না।

হ্যাঁ সুফিয়া, একদিন তিনি সুন্দর সুপুরুষই ছিল হয়তো, যদিও তিনি আজ বৃদ্ধ হয়েছেন, কিন্তু—

মনিরার কথা শেষ হয় না, সুফিয়া খিল খিল করে হেসে উঠল–বৃদ্ধকাকে তুমি বৃদ্ধ বলছ মনিরা?

কেন বিনয় বাবুর কথা বলছি, তিনি সত্যি এককালে সুন্দর সুপুরুষ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এসব কি বলছ মনিরা। কাকে তুমি বৃদ্ধ বলছ?

মনিরা একটু হকচকিয়ে যায়, অবাক কণ্ঠে বলে–হাসছ যে বড়?

তোমার কথাশুনে না হেসে পারছি না মনিরা–বিনয় বাবুকে তুমি বৃদ্ধ বললে কি করে?

মনিরা বিব্রত কণ্ঠে বলল–তিনি একেবারে বৃদ্ধ না হলেও প্রৌঢ় তো—

আবার হাসল সুফিয়া, তারপর বলল, তুমি কার কথা বলছ মনিরা, আমি বুঝতে পারছি না।

মনিরা গম্ভীর কণ্ঠে বললো–আমাদের উদ্ধারকর্তা বিনয় বাবুর কথা বলছি।

আশ্চর্য। তিনি তো যুবক, বৃদ্ধ দেখলে কখন?

তিনি যুবক!

হাঁ, তিনি সুন্দর সুপুরুষ যুবক।

মনিরা অন্যমনস্কভাবে অস্ফুট কন্ঠে বলল—তবে যে কথা শেষ না করে কিছু ভাবতে লাগল মনিরা, এসব কি শুনছে সে। বিনয় সেন তাহলে বৃদ্ধের ছদ্মবেশে তার কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে, তবে কে সে?

গভীররাত। সুফিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে পাশে?

মনিরার চোখে ঘুম নেই। কত কথাই না তার মনে উদয় হচ্ছে। পিতামাতা, মামা-মামীমা, স্বামী, শিশুপুত্র নূরের কথা একটার পর একটা স্মৃতি ছায়াছবির মত ভেসে উঠছে তার মানসপটে। মনিরার মনের ব্যথা অশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়ছে বালিশে। তারপর সব কথা মুছে নতুন করে একটা কথা আলোড়ন জাগাল তার বুকের মধ্যে। বিনয় বাবু তাকে বিশ হাজার টাকার বিনিময়ে কিনে নিয়েছিল পিশাচিনী হেমাঙ্গিনীর নিকট হতে। কিন্তু কোনদিন তার প্রতি কোন অসৎ আচরণ করেনি। বরং আজ বিনয় বাবুর মহত্ত্বের জন্যই সে নতুন জীবন লাভ করেছে। কিন্তু সুফিয়ার নিকটে আজ যে কথা সে শুনল তা অতি বিস্ময়কর। বিনয় বাবু বৃদ্ধ নন–যুবক, অতি সুন্দর সুপুরুষ–এ সব কি তবে সত্যি কথা? বিনয় সেনের তার নিকট বুদ্ধের ছদ্মবেশ ধারণের কারণ কি?

হঠাৎ মনিরার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল, নদীতীরে অশ্বপদশব্দে চমকে উঠল মনিরা, তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করে বজরার জানালায় গিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না মনিরা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও কিছুই নজরে পড়ল না, অশ্বপদশব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দূর হতে দুরান্তে।

মনিরা বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

মঙ্গলসিন্ধের বাগানবাড়িতে আবার আনন্দের বান ডেকে যাচ্ছে। নাচেগানে ভরপুর হয়ে উঠেছে বাগানবাড়ি। মঙ্গলসিন্ধ এখন স্বাধীন, তাকে বাঁধা দেবার বা তার কাজে আপত্তি জানাবার কেউ নেই।

পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে মঙ্গলসিন্ধ কিছুটা শোকের ভান করেছিল, প্রজাদের ডেকে দুঃখ জানিয়ে চোখে রুমাল চাপা দিয়ে কেঁদেছিল। সেদিনও বিনয় সেন দাঁড়িয়েছিল তার পাশে। মঙ্গলসিন্ধের চোখের পানি তার অন্তরেও ব্যথার সৃষ্টি করেছিল। মঙ্গলসিন্ধের কান্নায় প্রজাদের মনেও কষ্ট হয়েছিল অনেক। কঙ্করসিং বন্ধুর চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল–সবদিন কি কারও পিতা-মাতা জীবিত থাকে? কি হবে দুঃখ করে—এখন রাজ্য ভার গ্রহণ করে—প্রজাদের দুঃখভার লাঘব কর।

বিনয় সেন বলেছিল সেদিন—হাঁ কুমার বাহাদুর, কঙ্কর সিং ঠিকই বলেছেন, আপনি রাজ্যভার গ্রহণ করে রাজকার্য শুরু করুন।

অন্যান্য রাজকর্মচারী নীরব ছিলেন, কারণ তারা সবাই জানেন মঙ্গলসিন্ধ কেমন লোক। রাজকার্যভার সে গ্রহণ করলে দেশের ও দশের কি

অবস্থা দাঁড়াবে। মঙ্গলসিন্ধের আচরণে ভেতরে ভেতরে সবাই অসন্তুষ্ট ছিল। রাজকুমারের ব্যবহারে তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

মঙ্গলসিন্ধ যখন পিতার শোকে মুহ্যমান হয়ে বার বার রুমালে চোখ মুছিল, তখন রাজকর্মচারিগণ বাঁকা চোখে তাকিয়ে দেখছিলেন। মঙ্গলসিন্ধের এ কান্না যে নিছক একটা ভণ্ডামি এটা সবাই বুঝতে পেরেছিলেন। রাজার জীবিতকালে সে যথেচ্ছাচরণে প্রায়ই বাধা পেত। অনেক সময় পিতার নিকটে তিরস্কার শুনতে হত। এমনকি রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রকে অনেকবার ত্যাজ্যপুত্র করতে চেয়েছিলেন। এহেন পিতার মৃত্যুতে পুত্রের চোখের পানি যে একটা অহেতুক লোক দেখান কারসাজি, এটা অনেকেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছিলেন।

কিন্তু লোকে যতই যা ভাবুক বা মনে করুক রাজার মৃত্যু ঘটেছে, কাজেই রাজার প্রয়োজন। একমাত্র পুত্র মঙ্গলসিন্ধ ছাড়া রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর কেউ নেই।

মঙ্গলসিন্ধ রাজা হল।

মঙ্গলসিন্ধ রাজা হয়ে প্রথমেই বুড়ো মন্ত্রী কৃষ্ণ সেনকে রাজকার্য থেকে বহিস্কার করল। সে আসনে প্রতিষ্ঠা করল বন্ধু কঙ্কর সিংকে। আর বিনয় সেনকে করল তার প্রধান সহকারি।

বিনয় সেন মঙ্গলসিন্ধের এই আন্তরিকতায় খুশি হল।

মঙ্গলসিন্ধের রাজকার্যে বিনয় সেন যথেষ্ট সহায়তা করে চলল।

আর কঙ্কর সিং করে চলল ঠিক তার উল্টো, রাজকার্যে মঙ্গলসিন্ধকে সব সময় কুপরামর্শ দিতে লাগল। যতদূর সম্ভব কঙ্কর সিং নিজেও প্রজাদের ওপর চালাল নানা অত্যাচার আর উৎপীড়ন।

সেদিন মঙ্গলসিন্ধ নিজের বিশ্রামকক্ষে বসেছিল। আজকাল মদ পান তার বেড়ে গেছে। বাগানবাড়িতেও আজকাল প্রতিদিন বাঈজী নাচ চলছে। কঙ্কর সিং আর বিনয় সেনের সঙ্গে মঙ্গলসিন্ধের আলাপ আলোচনা হচ্ছিল।

কঙ্কর সিং বলল–কুমার, একটা বড় দুঃসংবাদ আছে।

মঙ্গলসিন্ধ মদের শূন্যপাত্রটা নামিয়ে রেখে বলল–দুঃসংবাদ। না, দুঃসংবাদ শুনতে আমি রাজী নই বন্ধু।

বিনয় সেন আগ্রহভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকাল শঙ্কর সিংয়ের মুখের দিকে তারপর শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলল–কোন রাজকার্যঘটিত দুঃসংবাদ না কি?

কঙ্কর সিং বলে উঠল-রাজকার্যঘটিত দুঃসংবাদ হলে তাতে তেমন ঘাবড়াবার কিছু ছিল না। এটা তার চেয়ে বড় দুঃসংবাদ।

এবার মঙ্গলসিন্ধের টনক নড়ল, বলল—তবে কিসের দুঃসংবাদ কঙ্কর?

হেমালিনী নিহত হয়েছে। হয়েছে—

হেমাঙ্গিনী নিহত হয়েছে। বল কি বন্ধু?

শুধু হেমাঙ্গিনীই নিহত হয়নি, তার আস্তানা পুলিশের দখলে চলে গেছে–

এও কি সব?

অসম্ভব কিছুই নয় কুমার, হেমাঙ্গিনীকে পুলিশ হত্যা করে তার আস্তানা গল করে নিয়েছে, তার সহকারীদের বন্দী করে, কারাগারে আবদ্ধ করেছে।

আর তার মাল?

তাদের পুলিশের হেফাজতে যার যার পিতা-মাতা আত্মীয় স্বজনের নিকটে পাঠান রয়েছে।

বল কি কঙ্কর, এত বড় ঘটনা কবে ঘটল?

সে আজ বেশ কিছুদিন হল, তুমি যখন কারাগারে বন্দী ছিলে–

মঙ্গলসিন্ধ চিৎকার করে উঠল–আমাকে জানাওনি কেন?

তুমি এমনিই বিমর্ষ এবং চিন্তাযুক্ত ছিলে তাই।

তুমি একথা আমাকে না জানিয়ে ভুল করেছ কঙ্কর। হেমাঙ্গিনীকে পুলিশ হত্যা করে আমার বুকের পাজর গুড়া করে দিয়েছে। আমি পুলিশদের সমুচিত শাস্তি দেব।

বিনয় সেন মৃদু হেসে বলল–আর আপনার পিতার হত্যাকারীকে শাস্তি দেবেন না কুমার বাহাদুর?

মঙ্গলসিন্ধ কিছু বলার পূর্বেই বলে উঠল কঙ্কর সিং–মহারাজ বৃদ্ধ হয়েছিলেন, অচিরেই তাঁর মৃত্যু ঘটত–সেক্ষেত্রে তাঁকে হত্যা করে হত্যাকারী তেমন কোন ক্ষতি করেনি।

বিনয় সেন কঙ্কর সিংয়ের কথার কোন জবাব না দিয়ে তাকাল মঙ্গলসিন্ধের দিকে।

মঙ্গলসিন্ধ তখন বোতল থেকে শূন্যপাত্রে খানিকটা তরল পদার্থ ঢেলে ঢক ঢক করে গলাধঃকরণ করল তারপর জড়িত কণ্ঠে বলল–বুড়োমানুষগুলো দুনিয়ার আবর্জনার মত জঞ্জাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাবা গেছে, তার অদৃষ্ট তাকে সরিয়ে নিয়েছে। তাকে কে হত্যা করল বা করেছে এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। তাছাড়া পিতার হত্যাকারীকে শাস্তি-হাঃ হাঃ হাঃ—বিনয় সেন আপনি–না না, থাক আজ নয়, পরে আরও পরে সব বলব, কিন্তু–

কঙ্কর সিং মঙ্গলসিন্ধের পিঠে থাবা দিয়ে বলে উঠল–কিন্তু আর নয়, চুপ কর।

হাঁ চুপ করলাম, কিন্তু হেমাঙ্গিনী ছাড়া আমার মনে কে শান্তি এনে দেবে বন্ধু?

বিনয় সেন হেসে বলল–এজন্য দুঃখ করে কি হবে। শ্রী কঙ্কর সিং থাকতে অমন হেমাঙ্গিনীর চেয়ে আরও কত হেমাঙ্গিনী রয়েছে শহরে, খুঁজে বের করবেন উনি।

কঙ্কর সিং বিনয় সেনের কথায় খুশি হল, বলল সে হাঁ কুমার, বিনয় সেন যা বলেছে অতি সত্য, এক হেমাঙ্গিনী গেছে আরও কত হেমাঙ্গিনী সৃষ্টি হবে যারা নিত্যনতুন মাল তোমাকে পরিবেশন করবে।

কিন্তু আমি যে বড় হাঁপিয়ে পড়েছি কঙ্কর। মঙ্গলসিন্ধের গলায় অসহায় ভাব।

বিনয় সেন বলে উঠল-বাঈজীদের নাচ কি আপনার মনে শান্তি এনে দেয় না কুমার বাহাদুর।

না বিনয় সেন, বাঈজীদের নীরস নাচ আর গান আমার মনে কোন আনন্দ দেয় না, আমি চাই নিত্য নতুন ফুল–কথা শেষ করে হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল মঙ্গলসিন্ধ–

কঙ্কর সিং বলে উঠল-হতাশ হবার কিছু নেই, আজই আমি নতুন একটা আমদানি করব। কুমার বাহাদুর কত টাকা দেবে বল?

যত খুশি চাও দেব। বন্ধু, এখন আমি রাজা মঙ্গলসিন্ধ, কুমার নই–বুঝেছ? টাকার জন্য তোমার কোন চিন্তা নেই।

চমৎকার! এই তো কথার মতো কথা, দাও পাঁচ হাজার। হাত পাতলো কঙ্কর সিং।

মঙ্গলসিন্ধ বিনয় সেনকে বলল–কোষাধ্যক্ষকে বলে দিন। কঙ্করকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দিতে।

বিনয় সেন উঠে দাঁড়াল, বলল–আচ্ছা।

০৩.

বাগানবাড়ি।

মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিং বসে আছে, সামনে মদের বোতল। অদূরে বসে বিনয় সেন। একটা নতুন মেয়ে নাচছিল, চোখেমুখে ভীতি ভাব। তবু নাচছে কম্পিত চরণ তুলে।

বার বার করতালিতে মুখর হয়ে উঠছিল কক্ষটা।

হঠাৎ কঙ্কর সিং উঠে দাঁড়ায় ইংগিত করল।

মঙ্গলসিন্ধ উঠে কঙ্কর সিংকে অনুসরণ করল।

দু’জন কানে মুখ নিয়ে কিছু বললো, তারপর বিনয় সেনকে লক্ষ্য করে বলল মঙ্গল সিন্ধ–আপনি এখন যেতে পারেন।

বিনয় সেনের ভালও লাগছিল না, উঠে দাঁড়াল চলে বাবার পূর্বে একবার নতুন নর্তকীর দিকে তাকিয়ে দেখল।

দুটো অসহায় দৃষ্টির সংগে বিনয় সেনের দৃষ্টির বিনিয়ম হল।

বিনয় সেন বাগানবাড়ি ত্যাগ করল।

অন্ধকারে এগিয়ে চলেছে বিনয় সেন, হঠাৎ তার সামনে একটা জমকালো মূর্তি এসে দাঁড়াল অন্ধকারেও বিনয় সেন বুঝতে পারল মূর্তিটার হাতে একটা রিভলবার।

বিনয় সেন কিছু বুঝতে না পেরে কিছুক্ষণ থ, মেরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলল–কি চাও?

জমকালো মূর্তিটা চাপাকণ্ঠে বলল–যদি মঙ্গল চাও তবে শীঘ্র রাজ বাড়ি ত্যাগ করে চলে যাও–

বিনয় সেন স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল—যদি না যাই?

মৃত্যু! তোমাকে মরতে হবে।

বিনয় সেন হাসল হাঃ হাঃ হাঃ, মৃত্যু ভয়ে ভীত নয় বিনয় সেন। রাজকার্য পরিচালনায় কুমার বাহাদুরকে সে সাহায্য করবেই। কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক লাথি মেরে জমকালো মূর্তির হাত থেকে রিভলবারখানা ফেলে দিল দূরে–তারপর চলল ধস্তাধস্তি। বেশিক্ষণ বিনয় সেনের সঙ্গে পেরে উঠল না জমকালো মূর্তি অন্ধকারে আত্মগোপন করে প্রাণ বাঁচালো।

বিনয় সেন আর বিলম্ব না করে ফিরে গেল নিজ বজরায়।

পথে নানা চিন্তার জাল তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। রাজা জয়সিন্ধের হত্যাকারী কে, তবে কি তার পুত্র মঙ্গলসিন্ধের চক্রান্তেই রাজা নিহত হয়েছেন? নাকি কঙ্কর সিংয়ের কাজ এটা। তাদের আচরণে যথেষ্ট সন্দেহের ছোঁয়া রয়েছে।

কিন্তু যতক্ষণ না সত্যিকার খুকে আবিষ্কার করতে পেরেছে বিনয় ‘ সেন ততক্ষণ তার মনে শান্তি নেই। যেমন করে হোক আসল খুনীকে তার খুঁজে বের করতেই হবে। মহৎ রাজার হত্যার প্রতিশোধ নিতেই হবে। কিন্তু কে এই জমকালো মূর্তি যে আজ তাকে রিভলবার দেখিয়ে রাজবাড়ি ত্যাগ করার জন্য ভয় দেখাচ্ছিল? কি এর অভিসন্ধি, আর কেনই বা তাকে সরে পরার জন্য এত তাগাদা–

বজরায় এসেও বিনয় সেনের মন থেকে এই চিন্তা দূর হল না। শয্যায় শুয়ে শুয়ে ঐ সব নিয়েই ভাবছে বিনয় সেন। বয় এসে তাকে খাবার জন্য বলল।

বিনয় সেন বয়কে জিজ্ঞাসা করল–সুফিয়া আর মনিরা কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

হ্যাঁ স্যার, তারা আর এতরাতে জেগে থাকতে পারেন, অনেকক্ষণ আগে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

বিনয় সেন বলল–তুই যা, আমি আসছি।

বয় চলে গেল।

বিনয় সেন শয্যা ত্যাগ করে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

গভীর চিন্তায় এতক্ষণ সে হাতমুখ ধোয়ার কথাও ভুলে গিয়েছিল।

বাথরুমে প্রবেশ করে পরিষ্কার পানিতে হাতমুখ ধুয়ে ফেলল বিনয় সেন, ক্লান্তি আর অবসাদ অনেকটা দূর হল তার। বজরায় এখন মনিরা আর সুফিয়া অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

কিন্তু বিনয় সেনের ধারণা সত্য নয়। সুফিয়া ঘুমালেও মনিরা ঘুমাতে পারেনি এখনও। গত কয়েকদিন ধরে মনিরার মনে একটা কথা সর্বদা ঘুরপাক খাচ্ছিল, বিনয় সেন বৃদ্ধা বা প্রৌঢ় নন, তিনি সুন্দর সুপুরুষ বলেছিল সুফিয়া। এ কথাটাই অহরহ মনিরার মনে দ্বন্দ্ব জাগাচ্ছিল, কে এই বিনয় সেন? তার কাছে নিজেকে গোপন করাই বা কারণ কি? আজ মনিরা দেখতে চায় কে এই বিনয় সেন–মনিরা চোরের মত চুপি চুপি শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। মনের মধ্যে একটা অনুভূতি তাকে উত্তেজিত করে তুলছিল। পা টিপে টিপে বজরার দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে অতি সন্তর্পণে বিনয় সেনের কক্ষের দরজায় এসে দাঁড়াল। গভীর অন্ধকার

রাত্রি। আকাশে অসংখ্যা তারার মেলা। মৃদু বাতাস বইছে, বজরাখানা একটু একটু দোল খাচ্ছে।

মনিরা দরজার ফাঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো বুকের মধ্যে আলোড়ন শুরু হয়েছে। নিজেকে সংযত করে উঁকি দিল ভেতরে।

বজরার কক্ষ শূন্য। কেউ নেই, শয্যা শূন্য–মনিরা ভীত হল, হঠাৎ যদি সুফিয়া জেগে উঠে তাকে বিছানায় না দেখে বেরিয়ে আসে–এখানে যদি দেখতে পায় কি ভাববে, ছিঃ ছিঃ লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। কিন্তু ফিরে যাওয়া চলবে না। আজ মনিরা দেখবে এই বিনয় সেন কে?

০৪.

মনিরা চমকে উঠল, কে যেন তার কাঁধে হাত রেখেছে ফিরে তাকাতেই বিবর্ণ ফ্যাকাশে হল তার মুখমণ্ডল, বিনয় সেন তার পেছনে দাঁড়িয়ে হেসে বলল বিনয় সেন—এখানে কি দেখছ মনিরা?

মনিরা লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল। ছিঃ ছিঃ কেন সে এভাবে এখানে এসেছিল। নিশ্চয়ই বিনয় সেন তাকে কিছু ভেবে বসেছেন। সুফিয়া তাকে জব্দ করার জন্যই হয়তো এ কথা বলেছে, না, না, সুফিয়ার কথায় বিশ্বাস করা তার ঠিক হয়নি।

বিনয় সেন মনিরাকে চিন্তা করতে দেখে বলল—গরমে বুঝি ঘুম হচ্ছে না তোমার?

মনিরা তার কথার কোন জবাব দিতে পারল না, বলল–আমায় কামরায় পৌঁছে দিন!

বিনয় সেন বলল–চল।

মনিরা নিজেদের কামরায় প্রবেশ করতেই দেখতে পায় সুফিয়া জেগে উঠেছে, মনিরাকে দেখে বলে—কোথায় গিয়েছিলে মনিরা?

বড্ড গরম বোধ করছিলাম–তাই একটু–

জানি।

কি জান সুফিয়া?

তুমি বিনয় সেনের কক্ষে যাওনি?

সুফিয়া!

মিথ্যা কথা বলো না মনিরা, আমি সব জানি।

কি জান সুফিয়া?

জানি, তুমি বিনয় সেনকে ভালবেসে—

ছিঃ ছিঃ একথা ভাবতে পারলে সুফিয়া?

মনিরা, আমি লক্ষ্য করেছি আজ বেশ কিছুদিন হল তুমি অত্যন্ত ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছ। সব সময় তুমি বিনয় সেনের জন্য–

সুফিয়া, আমি ভাবতেও পারিনি তোমার মনে এমন একটা ধারণা দানা বাঁধতে পারে। বিনয় সেন বৃদ্ধ, গুরুজন স্থানীয়–তাকে আমি শ্রদ্ধা করি—

মনিরা আর সুফিয়ার মধ্যে যখন কথা হচ্ছিল তখন কামরার বাইরে দাঁড়িয়ে শুনে ফেলল বিনয় সেন, একটা মৃদু হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠলো তার ঠোঁটের কোণে।

মন্থর গতিতে নিজের কামরায় চলে গেল বিনয় সেন।

এরপর থেকে বিনয় সেন লক্ষ্য করল মনিরা আর সুফিয়ার মধ্যে বেশ একটা মনোমালিন্য ভাব। দু'জন সব সময় দু'জনকে এড়িয়ে চলতে চায়। কিন্তু এক বজরায় বাস করে এও কি সম্ভব? বিনয় সেন চিন্তিত হল।

একদিন বিনয় সেন সুফিয়াকে নির্জনে ডেকে বলল—সুফিয়া, একটা কথা তোমাকে বলব।

বলুন ভাইজান।

তোমাকে আমি বোনের মতই ভালবাসি—

আমি জানি ভাইজান।

সে কারণেই আজ আমি তোমার শরণাপন্ন হয়েছি।

সুফিয়া তাকাল বিনয় সেনের মুখের দিকে, কি বলতে চান বিনয় সেন। আজ সুফিয়া বিনয় সেনের সুন্দর দীপ্ত মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব জ্যোতির লহরী লক্ষ্য করল। সুফিয়া তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

বিনয় সেন বলল–সুফিয়া, আমি মনিরাকে ভালবেসে ফেলেছি।

জানিনা, কেন আমার ওকে এত ভাল লাগে।

সুফিয়া চমকে উঠল–তাকাল বিনয় সেনের মুখের দিকে, পরক্ষণেই দৃষ্টি নত করে নিল।

বিনয় সেন বলে চলেছে–সুফিয়া, তুমিই একমাত্র আমার এ বাসনা পূর্ণ করতে পার।

সুফিয়া এবার বলল–মনিরা সুন্দরী, ওকে ভাললাগা স্বাভাবিক, আপনার মনের কথা আমি তাকে বলব।

হ্যাঁ সুফিয়া, তুমি যদি ওকে বুঝিয়ে কথাটা বল তাহলে আমি অত্যন্ত খুশি হব।

বেশ, আমি বলব।

সুফিয়া জানত এরকম একটা ঘটনা ঘটবে বা ঘটতে পারে। সে মনিরাকে এক সময় সব কথা খুলে বলল।

মনিরা স্তব্ধ হয়ে শুনল, তার মুখমণ্ডলে একটা গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। সে ভেবেছিল বিনয় সেন কোনদিন তার প্রতি খারাপ মনোভাব পোষণ করবে না। কিন্তু আজ তার মনের সে ধারণা নষ্ট হয়ে গেল। আশঙ্কায় বুকটা টিপ টিপ করে উঠল।

সুফিয়ার হাত মুঠায় চেপে ধরে বলল মনিরা সুফিয়া, তাকে তুমি বলে দিও তার উপকারের জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ, কিন্তু তাঁর কথায় আমি রাজী নই। আমাকে যদি তিনি হত্যাও করেন–তবুও না।

সুফিয়া মনিরার কথাগুলো বলল বিনয় সেনকে–ভাইজান, মনিরাকে আমি কিছুতেই রাজী করাতে পারলাম না। অতি কঠিন মেয়ে এই মনিরা।

বিনয় সেনের মুখে হাসি ফুটে উঠল, বলল সে–সুফিয়া, তোমার মনের ভুল ভেঙেছে তো?

সুফিয়া কথাটা বুঝতে না পেরে বলল–আমার মনের ভুল, কি বলছেন ভাইজান?।

সেদিন রাতে তুমি না মনিরাকে বলেছিলে সে আমার প্রতি আসক্তা–

সুফিয়া এবার বুঝতে পারল মনিরা আর তার মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল সব শুনেছেন বিনয় সেন। লজ্জিত হল সুফিয়া। সত্য সত্যই মনিরাকে সে একদিন সন্দেহ করেছিল। আজ সে সন্দেহ দূর হয়ে গেল।

এরপর থেকে মনিরা আর সুফিয়ার মধ্যে আবার ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠল। একসঙ্গে উঠা-বসা ও শোয়া সব হতে লাগল।

বিনয় সেন খুশি হল।

আবার সে স্বচ্ছ মনে রাজা জয়সিন্ধের হত্যারহস্য উদঘাটনে আত্মনিয়োগ করল।

০৫.

শিশু মনিকে নিয়ে নূরী দিনরাত ব্যস্ত থাকলেও সদাসর্বদা বনহুরের অভাব তার অন্তরে ব্যথার খোঁচা দিয়ে চলল। বনহুরই যে তার স্বপ্ন তার সাধনা। ওকে ছাড়া নূরী কোনদিন বাঁচতে পারে না। দিনের পর দিন কেটে চলল বনহুরের প্রতীক্ষায়, দিন গুণে নূরী। যখনই মনটা ওর অশান্তিতে ভরে উঠত তখনই শিশু মনিকে বুকে চেপে ধরত। একটা অনাবিল শান্তির ছোঁয়া তখন, তার হৃদয়কে শীতল করে দিত।

শিশু মনি এখন বেশ বড় হয়েছে। এক পা দু'পা করে হাঁটতে শিখেছে। সে। ফুলের মত সুন্দর ফুটফুটে মুখে অস্ফুট শব্দ করে বাব্বা–বাব্বা বা–

অমনি ছুটে এসে নূরী বুকে চেপে ধরত মনিকে, চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিত মুখখানা, বলত কোথায় তোমার বাবা? কে তোমার বাবা মনি?।

মনি দু'হাতে নূরীর গলা জড়িয়ে ধরে ফিক ফিক করে হেসে ফেলত। ফোকলা মুখে অপূর্ব সে হাসির ছটা।

নূরী প্রতিদিন শিশু মনিকে নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াত। ঝর্ণার ধারে বসে গান গাইত। চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে ডাকত–আয় আয় চাঁদ মামা, মনির কপালে টিপ দিয়ে যা। সোনার কপালে টিপ দিয়ে যা। কখনও বা দোলনায় শুইয়ে দোলা দিত আর গুনগুন করে গান গাইতে যে গান সে বনহুরের পাশে বসে কত দিন তার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গাইত। সে গান নূরী সব সময় গায়। মনে পড়ে বনহুরের কথা। দু'চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

বনহুর না থাকায় যদিও নূরীর তেমন কোন কষ্ট হয় না, আস্তানায় এখন বহু অনুচর রয়েছে যারা সদা সর্বদা নূরী এবং শিশুটির সুখ-সুবিধার দিকে নজর রেখেছে।

নূর যখন ঘুমায় নূরী তখন তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে; সে যেন স্পষ্ট দেখতে পায় শিশুমুখে তার বনহুরের প্রতিচ্ছবি। নূরী অবাক হয়ে ভাবে এ কেমন করে সম্ভব হল। তার হুরের চেহারার সঙ্গে এ শিশুর চেহারার এতটা মিল কি করে সম্ভব হল!

কিন্তু যতই নূরী শিশুটাকে দেখত ততই আরও আকৃষ্ট হত আরও গভীরভাবে ভালবাসত, স্নেহ করত। এক মুহূর্ত নূরী শিশুটিকে চোখের আড়াল করতে পারত না।

একদিন শিশু মনিকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে নূরী, ঘুমের ঘোরে স্বপ্নরাজ্যে চলে যায় সে। দেখতে পায় গহন একটা বনের মধ্যে সে বনহুরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কত কাটা বিধেছে তার পায়ে, কত আঘাত পেয়েছে শরীরে তবু আকুলভাবে খুঁজছে সে তার হুরকে। কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। হঠাৎ বন আলো করে একটা আলোর ছটা ফুটে উঠল। একি, নূরী অবাক হয়ে দেখল–সেই আলোর বন্যার মধ্যে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তার হুর আর একটি যুবতী। একি, এ যে সেই মেয়ে-যাকে সে একদিন কান্দাই বনের পোড়াবাড়িতে হুরের বাহুবন্ধনে দেখে সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিল, ছুটে গিয়ে পুলিশের নিকটে

বনহুরের সন্ধান দিয়েছিল। এ যে সেই মেয়ে–ওকি, ওদের মধ্যে একটা শিশু দাঁড়িয়ে, ছোট্ট শিশু এ যে তার মনি! মনি ওদের পাশে–নূরী ছুটে গিয়ে মনিকে বুকে তুলে নিল–সঙ্গে সঙ্গে নূরীর ঘুম ভেঙ্গে গেল, তাড়াতাড়ি পাশে শোয়া মনিকে টেনে নিল কোলের মধ্যে। মনের মধ্যে তখন একটা আলোড়ন শুরু হয়েছে। একি স্বপ্ন দেখল সে তার হুরের মনিই পাশে ঐ মেয়েটিকে আজ আবার নতুন করে দেখল। আর বা কেন তাদের পাশে?

নূরী যতই চিন্তা করতে লাগল–ততই একটা অসহ্য জ্বালা মনটাকে তার আচ্ছন্ন করে ফেলল।

গোটারাত তার ঘুম হল না।

সেদিন নূরীর মনে স্বপ্নটা একটা বিরাট পরিবর্তন এনে দিল। সব সময় ঐ স্বপ্নের দৃশ্যটা ওর চোখে ভেসে বেড়াতে লাগল। নূরী কিছুতেই নিজেকে প্রকৃতিস্থ রাখতে পারল না, বনহুরের অনুচর গহর আলীকে বললগহর আলী, তুমি যাবার আয়োজন কর আমি ঝিল শহরে যাব।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলল গহর আলী–ঝিন্দ শহরেই তো সর্দার গেছেন। হাঁ, সে কারণেই আমি যাব গহর, তুমি আমার যাত্রার সব বন্দোবস্ত করে দাও।

তা কি করে সম্ভব বল, সর্দার নিশ্চয়ই সেখানে তোমাকে দেখে খুশি হবেন না।

না গহর, আমি আর তার জন্য প্রতীক্ষা করতে পারি না। আমি যাবই।

এদিকে কে সামলাবে?

আমি সব ব্যবস্থা করে যাব। নাজির হোসেন আছে, ফরহাদ আছে, আরও অনেক অনুচর আছে, সবাই হুরের আস্তানা সামলাবে–আমি না থাকলেও ক্ষতি হবে না।

বেশ আমি আয়োজন করব। কিন্তু কে কে তোমার সঙ্গে যাবে নূরী?

তুমি এবং আরও সাতজন আমার সঙ্গে থাকবে।

আচ্ছা, আমি যাত্রার আয়োজন করছি।

এদিকে মনিকে নিয়ে নূরী যখন ঝিন্দে যাবার আয়োজন করছে তখন ঝিন্দে বনহুর রাজা জয়সিন্ধের হত্যারহস্য উদঘাটনে ব্যস্ত। রহমানও সব সময় তার পাশে পাশে রয়েছে ছায়ার মত।

গভীর রাতে গোটা বিশ্ব যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন দস্যু বনহুর রহমান সহ বেরিয়ে পড়ে। বনহুর তার অশ্ব তাজের পিঠে আর রহমান তার অশ্ব দুলকির পিঠে।

শরীরে তাদের জমকালো ড্রেস, মাথায় পাগড়ী, হাতে গুলিভরা রিভলবার।

শহরের পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে দুটি অশ্ব–দস্যু বনহুর আর রহমান। নির্জন পথ, দু'ধারে বাড়িগুলো যেন সজাগ প্রহারীর মত দন্ডায়মান রয়েছে। কোন কোন বাড়ির মুক্ত গবাক্ষে ডিমলাইটের অনুজ্জ্বল ক্ষীণ আলোকরশ্মি দেখা যাচ্ছে।

দূর হতে ভেসে আসছে বেওয়ারিশ কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ।

দস্যু বনহুর আর রহমান আরও কিছুক্ষণ চলার পর শহরের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়াল। অদূরে বিরাট একটা টিলা, টিলার উপর একখানা রাজ প্রাসাদ।

রাজপ্রাসাদ হলেও কালের নির্মম আঘাতে প্রাসাদটার আজ জীর্ণশীর্ণ অবস্থা। রাজা সূর্যসেনের মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র কন্যা সিন্ধিরাণীর অন্তর্ধানের পর বাড়িটা একেবারে পোডড়াবাড়ির মত হয়ে গেছে। বহুদিন বাড়িটার কোন যত্ন নেয়া হয়নি। কাজেই সব ভেঙে খসে পড়েছে।

বনহুর রহমানকে লক্ষ্য করে বলল–রহমান, সামনে যে প্রাসাদ দেখছ এটাই সূর্যসেনের বাড়ি।

সর্দার, এ বাড়িতে আমাদের কি প্রয়োজন?

প্রয়োজন আছে বৈকি! তুমি আমার সঙ্গে এসো। আর একটু অগ্রসর হবার পর আমাদের পায়ে হেঁটে যেতে হবে। কারণ অশ্বপদশব্দ আমাদের কার্যে ব্যঘাত ঘটাতে পারে।

রহমান সর্দারের কথার অর্থ ঠিকমত বুঝতে না পারলেও আর কোন প্রশ্ন করল না। সে সর্দারকে অনুসরণ করতে লাগল।

নিঝুম রাতি।

টিলার নিকট পৌঁছে অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়ালো বনহুর আর রহমান। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলাল সূর্যসেনের বাড়িখানার দিকে।

বাড়িখানার নিকটবর্তী হতেই বনহুর আর রহমানের কানে ভেসে এলো একটা তীব্র আর্তনাদ—কাউকে যেন কশাঘাত করা হচ্ছে বা ঐ ধরনের কোন যন্ত্রণা দেয়া হচ্ছে। আর্তনাদটা পুরুষ কণ্ঠের।

রহমান অন্ধকারে একবার তাকাল বনহুরের মুখের দিকে। তার মনে একটা প্রশ্ন উঁকি দিল—এ বাড়িখানার মধ্যে কে এমনভাবে তীব্র আর্তনাদ করছে?

বনহুর কোন জবাব না দিয়ে অগ্রসর হলো। দক্ষিণ হাতে তার উদ্যত রিভলবার। রহমানের হাতেও রিভলবার।

বাড়িটার ঠিক পেছন প্রাচীরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল বনহুর আর রহমান।

এখনও সেই আর্তনাদ থেমে থেমে শুনা যাচ্ছে।

বনহুর বলল–রহমান, সতর্কতার সঙ্গে প্রাচীর টপকে অন্দর মহলে যেতে হবে।

রহমান আর নিচুপ থাকতে পারল না, বলল–সর্দার, এই বাড়িতে আপনার আগমনের অর্থ কি এখনও আমি বুঝতে পারলাম না।

বনহুর বলল–গত কয়েকদিন হলো ঝিন্দের পুলিশ ইন্সপেক্টার ধনঞ্জয় রায় নিখোঁজ হয়েছেন, নিশ্চয়ই শুনেছ?

হাঁ, শুনেছিলাম। তিনি নাকি পুলিশ অফিস থেকে বাসায় ফেরার পথে উধাও হয়েছেন। পুলিশ অনেক অনুসন্ধান চালিয়েও তাকে পায়নি।

রহমান, আমার মনে হয় এই যে আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছ এটা ধনঞ্জয় রায়ের কণ্ঠস্বর। আমি তাঁরই সন্ধানে এখানে এসেছি। রহমান, তুমি প্রাচীর টপকে ওপারে যাও, আমিও যাচ্ছি।

অল্পক্ষণেই বনহুর আর রহমান রাজা সূর্যসেনের রাজ-অন্তপুরে প্রবেশ করল।

বহুদিন বাড়িখানায় লোকজনের বাস না থাকায় বাড়িটা একরকম পোড়োবাড়ির মতই নির্জন হয়ে পড়েছে। বাড়ির কোথাও আলো নেই। গাঢ় অন্ধকার সারা বাড়িটা ছড়িয়ে রয়েছে।

বনহুর আর রহমান অতি লঘু পদক্ষেপে এগুলো। এখনও সেই আর্তনাদ থেমে থেমে শোনা যাচ্ছে। যন্ত্রণাদায়ক করুণ আর্তনাদ।

বনহুর রহমানসহ এগিয়ে চলল যেদিক থেকে শব্দটা আসছে। বিরাট বিরাট কক্ষের টানা বারান্দা বেয়ে বনহুর আর রহমান এগুচ্ছিল। সম্মুখের একটি কক্ষে আলো জ্বলছে, নজরে পড়ল তাদের। বনহুর আর রহমান সেই কক্ষের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মুক্ত জানালায় উঁকি দিয়ে কক্ষে কেউ আছে কিনা দেখে নিল বনহুর-না, কেউ নেই—

কক্ষটা নির্জন, কিন্তু কক্ষে যে কেউ বাস করে এটা বেশ বুঝতে পারল সে।

বনহুর আর রহমান সেই কক্ষে প্রবেশ করল। কক্ষে একটা গ্যাসের আলো জ্বলছিল। বনহুর আর রহমান কক্ষে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাল। কক্ষটার একপাশে একটা খাট রয়েছে, খাটের উপরে বিছানায় একটি কম্বল আর একটি তেলচিটে বালিশ। খাটের চারপাশে ধূলো এত পুরু হয়ে পড়েছে যে খাটের রঙ বুঝার কোন উপায় নেই। একটা, পায়াভাংগা টেবিল এপাশের দেয়ালে ঠেশ দিয়ে রাখা হয়েছে। টেবিলে কয়েকটা সিগারেটের খালি বাক্স এবং ম্যাচের ঠোসা। মদের দুটো খালি বোতল, একটা কাঁচের গ্লাস।

হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে গেল দেয়ালে, কয়েকখানা তৈলচিত্র টাঙানো রয়েছে দেখতে পেল। ছবিগুলোর গায়ে যদিও ধূলা-বালি লেগে একেবারে রঙ পাল্টে গেছে বা ছবির চেহারা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবু বনহুর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল, তৈল চিএগুলো নিশ্চয় রাজা সূর্যসেনের বংশধরগণের। হঠাৎ একটা ছবির ওপর দৃষ্টি পড়তেই বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়াল, নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে রইল ছবিখানার দিকে।

সর্দারকে এভাবে ছবির দিকে নিম্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকতে দেখে রহমান আশ্চর্য হলো। শুধু তাই নয়, রহমান অবাক হয়ে দেখল তার সর্দারের দুচোখে অশ্রু ভরে উঠেছে। ছবিখানা একটি যুবতীর তৈলচিত্র।

রহমান জিজ্ঞেস করল সর্দার, এ চিত্রখানা কার?

বনহুর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল—রাজা সূর্য সৈনের কন্যা সিন্ধীরাণীর।

সে এখন কোথায় সর্দার?

বেঁচে নেই! একটু থেমে পুনরায় বলল বনহুর-এই সিন্ধীরাণী একদিন আমাকে সাগরতলে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

বনহুরের কথা শেষ হতে না হতে আবার শোনা যায় সে করুণ তীব্র আর্তনাদ-আঃ আঃ আঃ উঃ উঃ....

বনহুর আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে রহমানসহ কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়ল অন্ধকারে দ্রুত এগুলো।

কয়েকখানা ঘর পেরিয়ে একটা চোরাকুঠরির মত কক্ষের সামনে এসে, দাঁড়াল বনহুর আর রহমান। সেই কক্ষ হতেই করুণ আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল।

বনহুর আর রহমান দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তাকাল কক্ষের ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট কণ্ঠে বলল বনহুর—যা ভেবেছিলাম তাই। পুলিশ ইন্সপেক্টার ধনঞ্জয় রায়কে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

বনহুরের পাশ কেটে উঁকি দিল রহমান। ভয়ঙ্কর দৃশ্য। অর্ধ বয়স্ক এক ভদ্রলোককে দুহাতে শিকল বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। পা দু'খানা মাটি থেকে আধা হাত উপরে রয়েছে। একজন ভয়ঙ্কর চেরাহার লোক শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক দিয়ে আঘাত করছে ভদ্রলোকের দেহে। ভদ্রলোকের সারা শরীর বেয়ে দরদর করে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। অস্ফুট আর্তনাদ করছেন ভদ্রলোক। দুজন লোক দাঁড়িয়ে, শরীরে তাদের রাজকীয় পোশাক।

বনহুর বলল-রহমান, ওদের চিনতে পেরেছ যারা দাঁড়িয়ে আছে?

হ্যাঁ সর্দার, একজন রাজকুমার মঙ্গলসিন্ধ, অন্যজন কঙ্কর সিং।

ঠিকই ধরেছ, ওদের চক্রান্তেই ধনঞ্জয় নিরুদ্দেশ হয়েছেন এবং তাঁকে এখানে আটকে রেখে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ রহমান?

হ্যাঁ করেছি, ধনঞ্জয়ের সামনে একটা অগ্নিকুণ্ড দাউ দাউ করে জ্বলছে।

শুধু তাই নয়, অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দুটো লৌহশলাকা লক্ষ্য করেছ?

হ্যাঁ সর্দার।

ঐ লৌহশলাকা দুটি ধনঞ্চয় রায়ের চোখে প্রবেশ করান হবে...

কি নির্ম্মম...

তার পূর্বেই ধনঞ্চয় রায়কে উদ্ধার করে নিতে হবে।

ঐ দেখুন সর্দার, এবার লোকটা লৌহশপাকা দুটি হাতে তুলে নিচ্ছে।

আর বিলম্ব নয়, এসো আমার সঙ্গে-কথা শেষ করেই বনহুর বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল, তারপর একসঙ্গে বনহুর আর রহমান গুলিভরা উদ্যত রিভলবার হাতে কক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বনহুর রিভলবার ঠিক রেখে প্রচণ্ড এক পদাঘাতে লোকটার হাত থেকে অগ্নিদগ্ধ লৌহশলাকা দুটি দূরে নিক্ষেপ করল। নিরস্ত্র মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিং একপাশে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ জন্তুর ন্যায় ফোঁস ফোঁস করছে।

রহমান মঙ্গলসিন্ধ ও কঙ্কর সিংহের বুক লক্ষ্য করে রিভলবার উঁচু করে ধরল।

যে লোকটা এতক্ষণ চাবুক দ্বারা ধনঞ্জয় রায়কে আঘাত করছিল, বনহুর তার বুক লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো, সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটা। বনহুর নিজ হাতে পুলিশ ইন্সপেক্টার ধনঞ্জয় রায়ের হাতের শিকল মুক্ত করে তাঁকে নামিয়ে নিল। আঘাতে জর্জরিত ধনঞ্জয় রায় চাবুকের নির্ম্মম কশাঘাতে মৃত্যুপ্রায় হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তবু তিনি জ্ঞান হারাননি। তিনি যখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, ঠিক তখন হঠাৎ জমকালো পোশাক পরা দু'জন অদ্ভুত মানুষের আবির্ভাব এবং তাদের কার্যকলাপ তাকে অবাক করে তুলল। তারপর যখন জমকালো পোশাক পরা লোক দুটি তাকে বন্ধনমুক্ত করে দিল, তখন আরও অবাক হলেন ধনঞ্জয় রায়। জমকালো মূর্তিদ্বয়ের মুখ তাদের মাথার কাল পাগড়ীর আঁচল দিয়ে বাঁধা ছিল, তাই তাদের মুখ দেখা যাচ্ছিল না।

বনহুর ধনঞ্জয় রায়কে শূন্য থেকে নামিয়ে নিয়ে কাঁধে তুলে নিল, তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেল।

রহমান তখনও মঙ্গলসিন্ধ এবং কঙ্কর সিংয়ের বুকের কাছে রিভলবার উদ্যত করে ধরে আছে।

যতক্ষণ না বনহুর তাঁর অশ্বপৃষ্ঠে ধনঞ্জয় রায়কে উঠিয়ে নিল ততক্ষণ রহমান মঙ্গলসিন্ধ ও কঙ্কর সিংয়ের নিকট থেকে সরে যায় নি।

বনহুর ধনঞ্জয় রায়কে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে নিয়ে নিজেও উঠে বসল।

রহমান তখন রিভলবার ঠিক রেখে পিছু হটে কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়ল। আর তাকে কে পায়, সেও অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নিজের অশ্বের পাশে গিয়ে উপস্থিত হলে।

তারপর ছুটে চলল রহমান দুলকির পিঠে।

০৬.

বনহুর আর রহমান ধনঞ্জয় রায়কে নিয়ে তার বাড়িতে পৌঁছল। ধনঞ্জয় কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়লেন, নিজের বাড়ির দরজায় পৌঁছে জমকালো মূর্তিদ্বয়কে বললেন—জানি না আপনারা কে কি উদ্দেশ্যেই বা আপনারা আমাকে এই সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে নিলেন। যদিও আপনারা আমার অজানা বন্ধু তবু এটুকু জিজ্ঞেস করি, আপনারা কে বা কি নাম আপনাদের দুজনের?

গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল দস্যু বনহুরঅত্যাচারীর দমন, আর বিপদকারীর উদ্ধার সাধন এই দুটোই আমাদের কাজ। আমার নাম দস্যু বনহুর আর এর নাম রহমান-আমার সহকারী।

পুলিশ ইন্সপেক্টার ধনঞ্জয় রায়ের কণ্ঠ দিয়ে অস্ফুট শব্দ বের হলোদ বনহুর।

হ্যাঁ ইন্সপেক্টার। কিন্তু আমি আপনাদের দেশে অতিথি, দস্যু নই।

ধনঞ্জয়ের মুখ দিয়ে কোন কথা বের হলো না। অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালেন দস্যু বনহুরের মুখের দিকে। দস্যু বনহুরের নাম তার অজানা নয়।

সারা পৃথিবীতে এই নাম সুপরিচিত, কাজেই ধনঞ্জয় রায় এ নামের সঙ্গে পরিচিত হবেন তাতে সন্দেহ কি?

বনহুর এবার মৃদু হাসল, যদিও কাল পাগড়ীর আঁচলে তার মুখের নিচের অংশটুকু ঢাকা তবু তার কথা বুঝা গেল, পাওয়া গেল তার হাসির আওয়াজ, বললে বনহুর-ভয় নেই ইন্সপেক্টার, আপনার কোন অমঙ্গল আমি করব না। কথা শেষ করে সে অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসল।

রহমান আর দস্যু বনহুর যখন নিজ বজরায় এসে পৌঁছল তখন পূর্বদিক ফর্সা হয়ে এসেছে।

বনহুর তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়াল।

রহমান অনুসরণ করল সর্দারকে।

দু'জন অনুচর তাজ আর দুলকিকে নিয়ে গহন বনের দিকে চলে গেল।

বনহুর বজরার নিকটবর্তী হতেই রহমান বলল সর্দার, আমি এবার চলি?

বনহুর অন্যমনস্কভাবে বজরার দিকে এগুচ্ছিল, রহমানের কথায় থমকে দাঁড়িয়ে বলল—তোমাদের পানসী নৌকা কোথায় রেখেছ রহমান?

ঐ বড় নদীর বাঁকে, যেখানে বনটা ঘন হয়ে নদীর মধ্যে নেমে গেছে সেখানে।

তোমাদের কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?

না সর্দার, আমাদের কোন কষ্ট হচ্ছে না।

তোমরা এতগুলো লোক একসঙ্গে থাক....

পানসীখানা খুব বড় কিনা, ঝিন্দ দেশের পানসী নৌকা.... আপনি তো জানেন।

বেশ যাও। শোনো রহমান—

রহমান চলে যাচ্ছিল, সর্দারের ডাকে ধমকে দাঁড়ায়।

বনহুর দু'পা এগিয়ে আসে, তারপর বলে পুলিশরা বড় বেঈমান হয়। ইন্সপেক্টার ধনঞ্জয়ের মনোভাব ভাল মনে হলা না—আচ্ছা যাও তুমি।

রহমান কুর্ণিশ জানিয়ে নদীর তীর বেয়ে অগ্রসর হল।

বনহুর এগুলো তার বজরার দিকে।

নিজের কক্ষে প্রবেশ করে শর্য্যায় গা এগিয়ে দিল, ঝিল শহর তার অচিরেই ত্যাগ করা উচিত, কিন্তু কেন যেন সে দিন দিন ঝিন্দের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। কিছু পূর্বে পুলিশ ইন্সপেক্টার ধনঞ্জয় রায়ের কথা স্মরণ হলো, আর একটু বিলম্ব হলে বেচারার জীবনটা চিরদিনের জন্য অকেজো হয়ে যেত, দু'চোখ অন্ধ হত তার।

মনে পড়ল শয়তান মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিংয়ের কথা। ইচ্ছে করল। ওদের দু'জনকেও কীটের মত আজ হত্যা করতে পারত সে। কিন্তু ওদের হত্যা করলে অহেতুক নরহত্যা করা হবে। তাছাড়া রাজা জয়সিন্ধের বংশ লোপ পেয়ে যাবে। কাজেই বনহুর নিজেকে অতি কষ্টে সংযত করে নিয়েছিল তখন।

আরও একটা কাজ এখনও বনহুরের মনে অহরহ যন্ত্রণা দিচ্ছে তা হচ্ছে রাজা জয়সিন্ধের হত্যাকারী কে, মঙ্গলসিন্ধ না অন্য কেউ।

যদি মঙ্গলসিন্ধই রাজা জয়সিন্ধের হত্যাকারী হয় তবে বনহুর কিছুতেই তাকে ক্ষমা করবে না। ক্ষমা করবে না কঙ্কর সিংকেও, যদি মঙ্গলসিন্ধকে তার পিতা-হত্যায় উৎসাহিত করে থাকে বা সাহায্য করে থাকে।

বনহুর নানা চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ল।

তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নেই তার।

০৭.

মঙ্গলসিন্ধকে আজ অত্যন্ত উত্তেজিত মনে হচ্ছে। রাজকার্যে তার যেন, মন বসছে না। কঙ্করসিংয়ের মনোভাবে বেশ চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিনয় সেন শুধু শান্ত ধীরস্থির, গম্ভীরভাবে তার নিজ আসনে বসেছিল।

মঙ্গলসিন্ধ রাজকার্য অতি সংক্ষেপে শেষ করে উঠে দাঁড়াল। কঙ্করসিংকে লক্ষ্য করে বলল—বিনয় সেন সহ আমার বিশ্রামাগারে এস, কথা আছে।

মঙ্গুলসিন্ধ রাজসভা করে নিজ বিশ্রামাগারে প্রবেশ করল। কঙ্করসিং এবং বিনয় সেন অনুসরণ করল তাকে।

মঙ্গলসিন্ধ আসন গ্রহণ করার পর কঙ্করসিং ও বিনয় সেন আসন গ্রহণ করল।

মঙ্গলসিন্ধ সম্মুখস্থ পা-দানিতে প্রচণ্ড একটা পদাঘাত করে কঠিন কণ্ঠে বলল—আমার রাজ্যে কে এবং কারা এমন দুঃসাহসী আছে যারা আমার বুকে পিস্তল ধরে আমার বন্দীকে মুক্ত করে নিয়ে যায়?

কঙ্কর সিং বলে উঠলা, এত সাহস কাদের, কাদের বুকের পাটা

এত বড়?

বিনয় সেন বিস্ময়ভরা চোখে তাকাল মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্কর সিংয়ের মুখের দিকে, তারপর জিজ্ঞাসা করল—কুমার বাহাদুর, আপনাদের কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না। মঙ্গলসিন্ধ এবার শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল-সে কথা বলব বলেই আপনাকে ডেকেছি বিনয় সেন। একটা এমন কথা যা না বললেও নয়, অথচ অতি গোপনীয়।

বলুন কুমার বাহাদুর? বললো বিনয় সেন।

মঙ্গলসিন্ধ সোজা হয়ে বসলো দু'চোখে তার আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে, বললো-বিনয় সেন, আপনি জানেন পুলিশ ইন্সপেক্টার ধনঞ্জয় রায়কে হেমাঙ্গিনী হত্যার অপরাধে আমি আমার গুপ্ত অনুচর দ্বারা বন্দী করি।

হ্যাঁ, এ কথা আমি জানি কুমার বাহাদুর, আরও জানি তাকে রাজা সূর্যসেনের পোড়ো রাজ প্রাসাদের চোরাকুঠরিতে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

হয়েছিল, তার উপযুক্ত সাজাও দেয়া হচ্ছিল, কিন্তু কাল রাতে দুজন কাল পোশাক পরা লোক আচমকা সেখানে উপস্থিত হয় এবং আমার বুকে পিস্তল ধরে আমার বন্দী পুলিশ ইন্সপেক্টার ধনঞ্জয় রায়কে মুক্ত করে নিয়ে উধাও হয়।

বিনয় সেনের দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময় ফুটে উঠল, বলল সে—এ আপনি কি বলছেন কুমার বাহাদুর। ধনঞ্জয় রায়কে নিয়ে উধাও হয়েছে, কে তারা এমন দুঃসাহসী……

বিনয় সেন আপনি এই মুহূর্তে আমার রাজ্যে গোপনে গুপ্তচর নিযুক্ত করে দিন। কে বা কারা এমন দুঃসাহসী আছে যারা আমার বুকে পিস্তল ধরে আমার বন্দীকে মুক্ত করে নিয়ে যায়।

কঙ্কর সিংও মঙ্গলসিন্ধের কথায় যোগ দিয়ে বলল-হ্যাঁ, এই দুষ্ট লোক দুটিকে যেমন করে হোক খুঁজে বের করতেই হবে এবং তাদের পাকড়াও করে এনে উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা তাদের চক্ষুদ্বয় এবং জিহ্বা ছেদন করা হবে।

বিনয় সেনের চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠল, বলল সে- অত্যাচারীদের শাস্তি শুধু জিহ্বা ছেদন ও চক্ষুদ্বয়ে লৌহশলাকা প্রবেশ নয়, তাদের শাস্তি শরীরের চামড়া ছিড়ে ফেলে লবণ মাখিয়ে দেয়া।

মঙ্গলসিন্ধ বিনয় সেনের কথায় অত্যন্ত খুশি হয়ে বলল—বিনয় সেন, আপনি পারবেন এদের দুজনকে খুঁজে বের করতে এবং উপযুক্ত শাস্তি দান করতে। আজই আপনি গুপ্ত অনুচর দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দিন, যেন শীঘ্র তারা দুশমনদের খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়।

কঙ্কর সিং বলে উঠল—আমি স্বহস্তে তাদের শরীরের চামড়া খুলে তবে ছাড়বো–দাঁতে দাঁত পিষে সে তার মনোভাব প্রকাশ করল।

বিনয় সেন তাকল তার মুখের দিকে।

মঙ্গলসিন্ধ বলল—কঙ্কর, বিনয় সেন কাজের লোক, নিশ্চয়ই শয়তানদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হবে। আপনি যেতে পারেন এবার।

বিনয় সেন মঙ্গলসিন্ধকে অভিবাদন করে কক্ষ ত্যাগ করল।

মঙ্গলসিন্ধ এবার কঙ্কর সিংয়ের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল নতুন খোরাকের আশায় মনটা বড় হাঁপিয়ে উঠেছে কঙ্কর। হেমাঙ্গিনীর মৃত্যু আমার বুকের পাজর চূর্ণ করে দিয়েছে। বেচারী কত সুন্দর মেয়েই না আমদানি করত।

কঙ্কর সিং মুচকি হেসে বলল মঙ্গল, তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন, আমি কয়েকজন লোক নিযুক্ত করেছি। অচিরেই তারা আমাদের মনমত নারী সরবরাহ করতে সক্ষম হবে।

কিন্তু আর কত দিন এমনি কাটবে বন্ধু। চল আজ আমরা নৌকা বিহারে যাই।

হ্যাঁ, তাই কর মঙ্গল, অনেকদিন নৌকা বিহারে যাওয়া হয়নি।

০৮.

মনিরার মনটা আজ কেমন ছটফট করছে। কিছু ভাল লাগছে না। এমনি আর কত দিন কাটবে, কোনদিন কি তার স্বামীর মন থেকে অবিশ্বাসের কালোছায়া মুছে যাবে না। চিরদিনই কি এমনিভাবে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হবে?

সুফিয়া এমন সময় এলো তার নিকটে, হেসে বলল-কি ভাবছ মনিরা? আজ কিন্তু তোমাকে খুব বিষণ্ন মলিন দেখাচ্ছে-কি দুঃখ তোমার বলনা?

মনিরা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল—দুঃখই যার জীবনের সাথী তার আবার নতুন কি দুঃখ থাকতে পারে সুফিয়া। তুমি তো আমার সব কথা জান।

জানি কিন্তু আজ হঠাৎ আবার এতটা–

কি জানি সুফিয়া, আজ মনের মধ্যে বড় অশান্তি বোধ করছি। আমার জীবনে যখনই কোন অশান্তির ঘনঘটা এগিয়ে আসে, তার পূর্বে আমার মন বড় অস্থির হয়ে পড়ে। জানি না আরও কি দুর্ভোগ এগিয়ে আসছে আমার জন্য।

ছিঃ মনিরা, মিছামিছি অশান্তির কালোছায়া মনে স্থান দিয়ে নিজেকে এত বিমর্ষ করছ। বিনয় ভাইজান বলেছেন-ঝিন্দে তার কাজ শেষ হলেই আমাদের নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছে দেবেন। তিনি আমাদের কত যত্নে রেখেছেন, এতটুকু কষ্ট বা অসুবিধা নেই আমাদের, বল সত্যি কি না?

হ্যাঁ সুফিয়া, বিনয় বাবুর দয়ায় আমাদের কোন অসুবিধা বা কষ্ট নেই। তিনি সত্যি বড় মহৎ হৃদয়, উন্নত প্রাণ। তাঁর ঋণ আমরা জীবনে পরিশোধ করতে পারব না।

তবে কেন এত মন খারাপ কর? মনিরা, তোমার চেয়ে আমার ব্যথা কম নয়।

মনিরা মৃদু হাসল, বলল সে সুফিয়া, তোমার ব্যথার চেয়ে আমার ব্যথা অনেক বেশি, তুমি পিতা-মাতা, ভাই-বোন ছেড়ে অশান্তি ভোগ করছ, আর আমি….একটু থেমে বলল মনিরা-আর আমার এ দুনিয়ায় কেউ নেই, কিছু নেই, আমি সর্বহারা-চাপা কান্নায় কণ্ঠ ধরে আসে তার।

সুফিয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ বলে উঠল-দেখ দেখ মনিরা, একখানা নৌকা এদিকে আসছে।

মনিরা তাকাল, দেখতে পেল একটা নৌকা তাদের বজরার দিকে এগিয়ে আসছে। কয়েকজন লোকও আছে দেখা যাচ্ছে।

মনিরা বলল—কোন শিকারীদল হবে।

সুফিয়া বলল–আমার মনে হচ্ছে ওরা কোন সওদাগর, দেখছ না নৌকাখানা বেশ জাঁকজমকপূর্ণ।

মনিরা তখনও তাকিয়ে আছে বজরার সামনে পাটাতনে দাঁড়িয়ে, সুফিয়া বলল—ভেতরে চলো মনিরা।

নৌকাখানা তখন আরও অনেক এগিয়ে এসেছে। হঠাৎ সুফিয়া অস্ফুট স্বরে ভয়ার্তকণ্ঠে বলে উঠল—মনিরা, ঐ যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে ওকে যেন আমি কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। পরক্ষণেই বলে ওঠে সেচলে এস মারা, চলে এস, ওকে চিনতে পেরেছি, ও বড় শয়তান লোক। ওর কবল থেকেই বিনয় ভাইজান আমাকে বাঁচিয়ে নিয়েছিলেন।

মনিরা আর সুফিয়া দ্রুত বজরার মধ্যে প্রবেশ করল।

কিন্তু ততক্ষণে নৌকাখানা অতি নিকটে পৌঁছে গেছে। নৌকাখানা রাজা মঙ্গলসিন্ধের। নৌকায় মঙ্গলসিন্ধ, কঙ্করসিং এবং আরও দু'তিন জন তার সঙ্গী রয়েছে। কঙ্কর সিংয়ের পরামর্শেই মঙ্গলসিন্ধ নৌকাভ্রমণে এদিকে এসেছে। কারণ এটা ঝিল শহরের একেবারে নির্জন বনাঞ্চল, এদিকে সহজে লোকজন বড় আসে না, কঙ্করসিং বলেছিল, যেদিকে লোকজন কম বা নির্জন সেদিকে আজ যাব; বনের ধারে নদীতীরে, অনেক সময় হরিণ–জলপান করতে আসে, নৌকাভ্রমণও

হবে, শিকার করাও হবে। মঙ্গলসিন্ধ কঙ্করসিংয়ের কথামতই মাঝিগণকে এদিকে নৌকা আনতে বলেছিল।

নৌকা নিয়ে মনের আনন্দে চারদিক দর্শন করতে করতে আসছিল তারা। জনহীন নিস্তব্ধ নদীবক্ষ বেয়ে তাদের নৌকা এগিয়ে আসছে। হঠাৎ তারা দেখতে পায় অদূরে একটা বজরা দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথমে আশ্চর্য হয় মঙ্গলসিন্ধ, এই নির্জন নদীবক্ষে বজরা এল কোথা থেকে। পরক্ষণে আরও আশ্চর্য হয় যখন তাদের নজরে পড়ে বজরায় দুটি নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্করসিংয়ের কথামত মাঝিগণ নৌকার গতি বাড়িয়ে দেয়।

মনিরা আর সুফিয়া তাড়াতাড়ি সরে পড়লেও দুষ্ট মঙ্গলসিন্ধ এবং কঙ্করসিংয়ের দৃষ্টি এড়াতে পারল না। মনিরার অপূর্ব সুন্দর চেহারা মঙ্গলসিন্ধের মনে আগুন ধরিয়ে দিল।

নৌকা অল্পক্ষণেই বজরার কিনারে এসে ভিড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে বিনয় সেনের দুজন অনুচর যারা বজরা রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছিলো তারা এগিয়ে এল, একজন বলল–আপনারা কি চান?

নৌকা থেকে কঙ্করসিং প্রথমে উত্তর করল—এটা রাজা মঙ্গলসিন্ধের পানসী নৌকা। জানতে চাই তোমরা কে এবং কি কারণে এই নির্জন স্থানে অবস্থান করছ?

রাইফেলধারী পাহারাদাররা জবাব দিল আমরা বিদেশী শিকারী, এখানে এসেছি বন্য পশু শিকার করবো বলে।

তোমরা শিকারী, মিথ্যে কথা। তোমাদের বজরায় কে আছে বল? বলল কঙ্কর সিং।

পাহারাদার বলল–আমাদের মনিব শিকারে গেছেন, নৌকায় কেউ নেই।

এবার মঙ্গলসি হুঙ্কার ছাড়ল—কঙ্কর, এদের গ্রেফতার কর আমি বজরাখানা তল্লাশি করব।

সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কর এবং আরও দু'জন দুষ্ট লোক বজরায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। কঙ্কর সিং তার রাইফেলের প্রচণ্ড আঘাতে একজন পাহারাদারকে ধরাশায়ী করল। দ্বিতীয় পাহারাদার অক্রমণ করল কঙ্করসিংকে। ভীষণ ধস্তাধস্তি শুরু হল। ততক্ষণ বজরার মাঝিগণ যে যা পেল নিয়ে তুমুল যুদ্ধ শুরু করল।

মঙ্গলসিন্ধ তার রাইফেলের গুলিতে একে একে মাঝিদের হত্যা করল। তখনও দ্বিতীয় পাহারাদার আর কঙ্করসিংয়ের লড়াই চলছে, সে কিছুতেই মঙ্গলসিন্ধ এবং কঙ্করসিংকে বজরার প্রবেশ করতে দেবে না।

ওদিকে সুফিয়া তখন তীরবিদ্ধ হরিণীর মত কাঁপছে।

মনিরা ওর দিকে তাকিয়ে নিজের বিপদের কথা ভুলে গেল। বলল——ভয় কি সুফিয়া, মরতে হয় বীর রমণীর মত মরব, তবু নিজের ইজ্জত হারাবো না।

সুফিয়া কম্পিত গলায় বলল-আমি যে বড় নার্ভাস হয়ে পড়েছি মনিরা, ঐ শয়তানের কবল থেকে একবার রক্ষা পেয়েছি আর বুঝি নিজেকে বাঁচাতে পারব না।

তাহলে তুমি বিছানার নিচে লুকিয়ে পড়। যা অদৃষ্টে থাকে আমার হবে।

মনিরা কথা শেষ করে বিছানার নিচে সুফিয়াকে লুকিয়ে রাখল। যেমনি মনিরা সুফিয়াকে লুকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল ঠিক সেই মুহূর্তে বজরার কক্ষে প্রবেশ করল মঙ্গলসিন্ধ। দু'চোখে তার লালসা ভরা।

মঙ্গলসিন্ধ মনিরাকে দেখামাত্র ভুলে গেল সব, ভুলে গেল দ্বিতীয় কোন নারীর কথা। বিমুগ্ধ, বিমোহিত হয়ে তাকাল মনিরার দিকে। জীবনে সে বহু নারী দেখেছে কিন্তু এত সুন্দরী নারী সে কোনদিন দেখেনি। মনিরার অপূর্ব রূপ মঙ্গলসিন্ধের মনে এক অদ্ভুত মোহের সৃষ্টি করল।

মনিরা নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডাগর ডাগর চোখ দুটি মঙ্গলসিন্ধের মুখে সীমাবদ্ধ। অদ্ভুত এক দৃষ্টি মনিরার দু'চোখে ঝরে পড়ছে।

মঙ্গলসিন্ধ এক পাও অগ্রসর হতে পারল না। মুগ্ধ তন্ময় দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল।

এমন সময় কঙ্কর সিং দ্বিতীয় পাহারাদারকেও ঘায়েল করে বজরার কক্ষে প্রবেশ করল। মনিরাকে দেখতে পেয়ে সেও অবাক হল, তারপর দ্রুত এগুতে গেল তার দিকে, মঙ্গলসিন্ধ হাত বাড়িয়ে পথ রোধ করল–পঁড়াও।

কঙ্করসিং বিস্ময়ভরা চোখে তাকাল মঙ্গলসিন্ধের দিকে, তারপর বললস্বর্গের অপ্সরী।

হ্যাঁ কঙ্কর, স্বর্গের অপ্সরী বলেই মনে হচ্ছে—বললো মঙ্গল সিন্ধ।

কঙ্কর সিং এবার তাদের অনুচরগণকে ডাকল। পথ মুক্ত, বজরার পাহারাদারগণ কেউ বা আহত কেউ বা নিহত হয়েছে। কাজেই তারা আর কোন বাধাই পেল না, নির্বিঘ্নে বজরার কক্ষে প্রবেশ করে মঙ্গলসিন্ধ এবং কঙ্কর সিংয়ের সম্মুখে দাঁড়াল।

কঙ্কর সিং বলল-তোমরা ওকে জোরপূর্বক আমাদের নৌকায় উঠিয়ে নাও।

তৎক্ষণাৎ দু’জন গুণ্ডাধরনের লোক ক্ষিপ্তের ন্যায় এগুলো মনিরার দিকে, আর একটু হলেই মনিরাকে তারা ধরে ফেলবে।

সুফিয়ার কথায় এবং একটু পূর্বে নৌকার আরোহীদের কথায় মনিরা বুঝতে পেরেছিল ওটা রাজা মঙ্গলসিন্ধের নৌকা এবং এ যুবকই যে রাজা মঙ্গলসিন্ধ এটাও সে অনুমানে ধরে নিয়েছিল, কারণ তার শরীরে রাজকীয় পোশাক ছিল। মনিরা আরও জানে বিনয় সেন রাজা মঙ্গলসিন্ধের রাজদরবারে চাকরি করেএদের হাত থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। এরা সংখ্যায় অনেক বেশি কাজেই তার নারীশক্তি এদের কাছে কিছু নয়। মনিরা বুদ্ধির কৌশলে নিজেকে রক্ষা করার উপায় করে নিল।

লোকগুলো এগিয়ে আসতেই মনিরা বলল–তোমরা আমাকে স্পর্শ কর না, আমি তোমাদের সঙ্গে স্বেচ্ছায়ই যাব।

লোক দু’জন তবু এওচ্ছিল, কঙ্কর সিং বলল-ওর কথায় বিশ্বাস করনা, নিশ্চয়ই ও পালাবার ফন্দি করছে। তোমরা ওকে ধরে হাত-পা বেঁধে নৌকায়

উঠিয়ে নাও।

মঙ্গাসন্ধ আজ কঙ্কর সিংয়ের কথায় কান না দিয়ে বললো–থাম, ও নিজে যখন আমাদের সঙ্গে যেতে চাইছে তখন ওকে তোমরা ধর না। তারপর মঙ্গলসিন্ধ নিজেই এগিয়ে এল মনিরার সম্মুখে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমরা কেন এখানে এলাম বা এসেছি। কাজেই তোমার কোন আপত্তি আমরা শুনব না, চল আমাদের নৌকায়।

মনিরা সকলের অলক্ষ্যে একবার তার বিছানার দিকে তাকাল, মনে মনে বলল বিদায় সুফিয়া-বিদায়....।

মনিরাকে নিয়ে মঙ্গলসিন্ধের নৌকা যখন নদীর বাঁকে অদৃশ্য হল তখন সুফিয়া আর্তনাদ করে কেঁদে উঠল। চারদিকে মৃতদেহ ছড়ান, বজরার পাটাতন রক্ষে রাঙা হয়ে উঠেছে, তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে সুফিয়ার অবস্থা মর্মান্তিক হয়ে উঠল।

বজরার চারজন মাঝি, পাহারাদার, দু'জন বাবুর্চি সবাই নিহত হয়েছে। একজন পাহারাদার শুধু জীবিত ছিল, কঙ্কর সিং মনে করেছিল তার আঘাতে সেও মরে গেছে। যদিও তার মাথায় প্রচন্ড আঘাত লাগায় সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল কিন্তু অল্পক্ষণ পর তার জ্ঞান ফিরে আসে, কিন্তু সে নিশ্চুপ মৃতের ন্যায় পড়ে থেকে পাপিষ্ঠ শয়তানের কার্যকলাপ দেখছিল। যাতে মালিক এলে তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারে।

সুফিয়ার অবস্থাও তাই, যদিও সে বিছানার তলায় আত্মগোপন করে নিজেকে রক্ষা করে নিয়েছিল, কিন্তু মনিরাকে যখন দুষ্টের দল নিয়ে গেল তখন সে অতি কষ্টে নিজেকে সংযত রেখেছিল। বিনয় সেনকে বলে অন্ততঃ একটা কোন ব্যবস্থা যাতে করা যায় সে চেষ্টা করতে হবে।

এক্ষণে চারদিকে ছড়ানো মৃতদেহের মধ্যে দাঁড়িয়ে সুফিয়া ডুকরে কেঁদে উঠল। মনিরাকে পেয়ে শয়তানগণ তার কথা ভুলে গিয়েছিল, নইলে ওরা যখন প্রথমে কথা বলেছিল তখন তাদের কথায় সুফিয়া স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল, এ বজরায় দুটি নারী রয়েছে। ভয়ে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গিয়েছিল, মনিরা যদি তাকে এভাবে শয্যার নিচে লুকিয়ে না রাখত তাহলে তাকেও ওরা পাকড়াও করে নিয়ে যেত তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে পাহারাদারটি তখনও জীবিত ছিল তার নাম আসলাম। আসলাম অন্যান্য মৃতদেহের মধ্য হতে উঠে দাঁড়াল। সুফিয়াকে

আকুলভাবে কাঁদতে দেখে বলল—আপনি এভাবে কাঁদবেন না। মালিক এলে নিশ্চয়ই তিনি এর প্রতিশোধ নেবেন!

বিনয় সেন যখন তার বজরায় ফিরে এলো তখন বেলাশেষের সূর্যাস্তের ক্ষীণ রশ্মি এসে লালে লাল করে তুলছে তার বজরার প্রাঙ্গণ। চারদিকে মৃতদেহ আর জমাট রক্তে বজরাখানা ভয়াবহ হয়ে উঠছে।

০৯.

বিনয় সেনকে দেখতে পেয়েই ছুটে এলো আসলাম আর সুফিয়া কেঁদে কেঁদে সব কথা বলল তারা বিনয় সেনের নিকটে।

আসলাম বলল–মালিক, আমাকে আপনি হত্যা করুন। আমি বড় অপদার্থ। আমার চোখের সামনে সবাইকে নিহত করে ওরা তাকে নিয়ে পালাল অথচ আমি তাদের বাধা দিতে সক্ষম হলাম না, এর চেয়ে দুঃখ আর বেদনা কি হতে পারে মালিক!

বিনয় সেনের চোখেমুখে তখন প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। আসলামের কথায় কান না দিয়ে বলল সেসুফিয়া, সত্যই তুমি তাকে চিনতে পেরেছ যে একদিন তোমাকে সেই বাগানবাড়িতে.....

হাঁ ভাইজান, আমি তাকে দেখামাত্র চিনতে পেরেছি। কোনদিন তার চেহারা ভুলব না। শয়তান পাপিষ্ঠ রাজকুমার সে।

বিনয় সেন চারদিকে ছড়ানো লাশগুলোর দিকে তাকিয়ে দক্ষিণ হাতে নিজের মাথার চুল টানতে লাগল। এমন যে একটা ঘটনা অকস্মাৎ ঘটে যাবে ভাবতেও পারেনি বিনয় সেন। নিরীহ মাঝি আর পাহারাদারদের মৃত্যু তার অন্তরে প্রচন্ড আঘাত করল আর সবচেয়ে বড় মনঃকষ্ট হল তার মনিরার জন্য। শয়তান মঙ্গলসিন্ধ না জানি তার ওপর কি অকথ্য ব্যবহার করছে।

বিনয় সেন ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারী করতে লাগল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বজরার মৃতদেহের ওপর ঝাপসা অন্ধকারের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে।

বিনয় সেন বলল–সুফিয়া, এর প্রতিশোধ আমি না নিয়ে ছাড়বো না। তার চোখ দুটো সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে ধক ধক করে জ্বলে উঠল।

১০.

মঙ্গলসিন্ধ অন্যান্য নারীর মত মনিরার প্রতি জঘন্য আচরণ করতে পারল না। কেন যেন মনিরার চোখের দিকে তাকিয়ে শয়তান, মঙ্গলসিন্ধের মনেও দ্বিধা এলো। নিজের রাজবাড়ির এক কক্ষে মনিরাকে আবদ্ধ করে আখল সে।

কঙ্কর সিংয়ের ইচ্ছা মনিরাকে বাগানবাড়িতে আনা হোক কিন্তু মঙ্গলসিন্ধ চায় না এই যুবতীকে তার লালসার সামগ্রী করে। মনিরাকে মঙ্গলসিন্ধের বড় ভাল লেগেছে, ওকে সে চিরদিনের জন্য পাশে পেতে চায়। সে কারণেই অন্যান্য যুবতীর মত মঙ্গলসিন্ধ মনিরাকে ব্যবহার করতে পারল না।

মনিরাকে বন্দী করে রাখলেও তার প্রতি কোন মন্দ আচরণ করা হল না। সুন্দর সুসজ্জিত একটা কক্ষে তাকে আটকে রাখা হল। তার সেবা-যত্নের জন্য কয়েকজন দাসী নিযুক্ত করে দিল মঙ্গলসিন্ধ। বন্দিনী যাতে কোন রকম কষ্ট না পায় সেদিকে খেয়াল রাখল সে।

মনিরা নিজের বুদ্ধিবলেই মঙ্গলসিন্ধের হিংস্র থাবা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলল। সে জানত এখানে সে কত অসহায়। মঙ্গলসিন্ধের কাছে সে একটি হীন পুতুলের মতই নির্জীব। কারণ সে এখন বন্দিনী।

মনিরাকে যখন মঙ্গলসিন্ধ নৌকায় এনে জিজ্ঞেস করেছিল তুমি সেচ্ছায় এলে, কারণ কি যুবতী?

জবাবে বলেছিল মনিরা——যার দুনিয়ায় কেউ নেই তার আবার যেতে আপত্তি কি? ঐ বজরার মালিকও আমাকে বন্দী করে আটকে রেখেছিল, সুযোগ পেলেই এ দেশ ছেড়ে পালাবে, কাজেই আমি আপনার সঙ্গে যেতে সহজেই রাজী হয়েছি।

মনিরার কথায় মঙ্গলসিন্ধের মনে অভূতপূর্ব একটা আনন্দের উৎস বয়ে গিয়েছিল, তাহলে এ যুবতী অসহায় সম্বলহীন, একে সহজেই আপন করে নিতে সক্ষম হবে সে, একে মনিরার অপূর্ব রূপে মুগ্ধ হয়েছিল মঙ্গলসিন্ধ, তারপর মনিরার কণ্ঠস্বরে এবং আচরণে খুশি হল। মনিরাকে তাই মঙ্গলসিন্ধ বিয়ে করে একান্ত নিজের করে নেবে মনস্থ করল।

কথাটা মঙ্গলসিন্ধ বন্ধু কঙ্করসিংকে বলল কঙ্কর, জীবনে বহু নারী আমি দেখেছি এবং পেয়েছি, কিন্তু এ নারীর মত সুন্দর গুণবতী নারী আমি কোনদিন দেখিনি। আমি একে বিয়ে করে রাণী করতে চাই—

কথাটা শুনে অদ্ভুতভাবে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল কঙ্কর সিং, তারপর হাসি থামিয়ে বলল-অজ্ঞাত অপরিচিত এক নারী হবে ঝিন্দের রাণী....হাঃ হাঃ হাঃ.....হাঃ হাঃ হাঃ। কঙ্কর সিংয়ের অট্টহাসির শব্দে বাগানবাড়ির কাঁচের জানালা কপাটগুলো ঝন ঝন করে বেজে উঠল।

মঙ্গলসিন্ধ বলল—কঙ্কর, তুমি কেন, পৃথিবীর কেহ আমার এই–সংকল্পে বাধা দিতে পারবে না।

কঙ্কর সিং বলল—বেশ, তোমার যা মনে চায় তাই হবে।

কঙ্কর সিং মুখে 'বেশ হবে' বললেও অন্তরে তার একটা প্রচন্ড আক্রোশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সেদিন মেয়েটাকে আনতে তাকে বেশ হিমশিম খেতে হয়েছিল। তার হাতে নিহত হয়েছে দু'জন লোক। এই লোক দু'জনকে হত্যা করতে তার শরীরেও আঘাত পেয়েছে, অথচ সেই নারীকে মঙ্গলসিন্ধ একা গ্রহণ করবে, এ কোনদিন হতে পারে না।

কঙ্কর সিং মনে মনে মতলব আঁটতে লাগল, কেমন করে যুবতীটিকে হাতে আনবে।

মনিরার জন্যই কঙ্কর সিং আর মঙ্গলসিন্ধের মধ্যে একটা হিংসার সৃষ্টি হল। কঙ্কর সিং চায় মনিরাকে বাগানবাড়িতে এনে তাকে নিয়ে আমোদ করতে।

হিংস্র জন্তুর মতই ভেতরে ভেতরে ক্ষেপে গেল কঙ্কর সিং।

এমন দিনে কঙ্কর সিং সাথী হিসেবে পেল বিনয় সেনকে। সেদিন বাগানবাড়িতে একা একা বসে গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিল কঙ্কর সিং, বিনয় সেন এসে বসল তার পাশে। মৃদু হেসে বলল-সিং বাহাদুর, আজ আপনাকে বড় ভাবাপন্ন লাগছে, ব্যাপার কি? নতুন কোন আমদানি নেই বুঝি?

বিনয় সেনকে দেখে খুশি হল কঙ্কর সিং, সোজা হয়ে বসে বলল-বিনয় সেন, আপনি এসেছেন-ভালই হল। একটা উপকার করতে হবে।

বলুন আমি কি উপকার করতে পারি?

কঙ্কর সিং একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল, তারপর ফিসফিস করে বলল—সেদিন মঙ্গল আর আমি, নৌকা ভ্রমণে গিয়ে এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতী শিকার করে এনেছি।

বিনয় সেন বলে উঠল অপূর্ব সুন্দরী শিকার তাও নদী বক্ষে—আশ্চর্য?

কঙ্কর সিং হাসল বিশ্বাস হচ্ছে না? তা না হবারই কথা। তবে শুনুন, সেদিন আমি আর মঙ্গল বের হলাম। সঙ্গে শিকারের জন্য কিছু গোলাবারুদ নিলাম আর নিলাম কয়েকটা বন্দুক আর রাইফেল। ভোরে যাত্রা শুরু হল আমাদের। নদীবক্ষের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে করতে আমরা এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ আমি বললাম চল মঙ্গল, নদীর যে অঞ্চলে ঘন বন আছে সে দিকে চল-হরিণ শিকার করাও হবে, সে সাথে নৌকা ভ্রমণও সার্ধক হবে। একটু থামল কঙ্কর, বিনয় সেন স্তব্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছে। পুনরায় বলতে শুরু করল কঙ্কর আমার কথামতই মঙ্গল মাঝিদের আদেশ দিল নদীর দিকে চল। আমাদের নৌকা সেভাবে এগিয়ে চলল, যে দিকে ঘন বন।

বিনয় সেন বলে উঠল–তারপর?

তারপর আমাদের নৌকা যখন নদী বেয়ে বুলের দিকে এগুচ্ছিলো তখন আমরা দেখতে পাই ঘন বনের আড়ালে একটা ফাঁকা জায়গায় একটা বজরা। শুধু বজরাই নয়, বজরার সামনে দুটি নারীমূর্তি। আমরা তো অবাক হলাম, এমন নির্জন নদীবক্ষে ঘন বনের ধারে বজরা এলো কোথা থেকে? শুধু বজরাই নয়, নারীও রয়েছে।

অত্যন্ত আগ্রহে বিনয় সেনের দু'চোখ বড় হয়ে উঠল, বলল—তারপর? তারপর?

আমাদের নৌকা অতিশীঘ্র বজরাখানার নিকটে পৌঁছে গেল, কিন্তু তার পূর্বেই বজরার পাটাতন থেকে দুটি নারীমূর্তি অদৃশ্য হয়েছে-আমরা তো বজরার উপর লাফিয়ে নেমে পড়লাম, প্রথমেই বাধা দিতে এলো দু'জন পাহারাদার। একজনকে মঙ্গল নিহত করল আর একজনকে আমি। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন এগিয়ে এলো, কিন্তু আমাদের অস্ত্র আর শক্তির কাছে তারা অত্যন্ত দুর্বল। অল্পক্ষণেই

বজরার প্রায় সব পুরুষকে হত্যা করে ফেললাম। তারপর আমি আর মঙ্গল বজরার মধ্যে প্রবেশ করলাম। আর কেউ বাধা দেবার ছিল না, কাজেই স্বচ্ছন্দে বজরার কামরায় প্রবেশ করলাম। আশ্চর্য হলাম বজরার মধ্যে একটা অপ্সরীর মত সুন্দরী রমণীকে দেখে। তার চেয়েও আশ্চর্য হলাম রমণীর আচরণে। তাকে আমরা জোরপূর্বক পাকড়াও করে আনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি কিন্তু সে অতি সহজে নিজের ইচ্ছায় আমাদের সঙ্গে চলে এলো।

বিনয় সেন বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলল সে চলে এলো আপনাদের সঙ্গে–মানে আপনাদের নৌকায়?

হাঁ বিনয় সেন, অদ্ভুত নারী ঐ রমণী!

বিনয় সেন এবার ব্যস্তকণ্ঠে প্রশ্ন করল—কোথায় সে রমণী সিং বাহাদুর?

কঙ্কর পুনরায় আর একবার কক্ষের চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে চাপা গলায় বলল —এখন সে রাজ-অন্তপুরে।

রাজ-অন্তপুরে?

হাঁ, কারণ মঙ্গল বড় স্বার্থপর, আমার প্রচেষ্টায় সে এই অপ্সরীকে পেয়েছে অথচ সে আমাকে ফাঁকি দিয়ে একাই তাকে আত্মসাৎ করতে চায়।

বিনয় সেনের কণ্ঠ গম্ভীর হয়ে আসে, বলে-এ তার অন্যায়।

শুধু অন্যায় নয়, তার অপরাধ। মঙ্গল তাকে রাণী করতে মনস্থ করেছে। রাণী!

হ্যাঁ। বিনয় সেন, মঙ্গল এই যুবতীকে বিয়ে করে রাণী করবে।

আর আপনি?

হাঃ হাঃ হাঃ–আর আমি, দাঁতে দাঁত পিষে বলল কঙ্কর-আমি তাকে রেহাই দেব? বিনয় সেন, জানি আপনি রাজকর্মচারী, কিন্তু আমার অনুরোধ, আপনি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন।

কিন্তু……

এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই বিনয় সেন। আমি মঙ্গলকে হত্যা করব এবং সেই রমণীকে তার কবল থেকে উদ্ধার করব।

তারপর?

আবার হেসে ওঠে কঙ্কর-তারপর আমি তাকে হৃদয়ের রাণী করব।

বলে উঠল বিনয় সেনআমার স্বার্থ কি? সিং বাহাদুর?

আপনাকে আমি প্রচুর অর্থ দেব।

বলুন আমার কি কাজ? কি করতে হবে বলুন?

মঙ্গলসিন্ধ আপনাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করে, আপনি তার সঙ্গে যোগ দিয়ে তার মনের কথা জেনে নেবেন। তারপর একদিন তাকে বাগানবাড়িতে এনে হত্যা করব…শুধু জানবেন আপনি আর জানব আমি।

নরহত্যা।

ভয় পাচ্ছেন কেন বিনয় সেন, এ বান্দা নরহত্যা করতে এতটুকু বিচলিত হয় না। তাছাড়া মঙ্গল নিরপরাধ নোক নয়, সে গুরুতর অপরাধী, তাকে হত্যা করা পাপ নয়।

তার মানে?

বিনয় সেন, আপনি রাজকর্মচারী হলেও রাজ-অন্তপুরের অনেক কথাই জানেন না।

না, তা জানি না, জানবার বাসনাও করি না।

আপনাদের প্রিয় রাজা নিহত হবার কথাটাও না?

বিনয় সেন এবার করুণ কণ্ঠে বললহ, স্বর্গীয় রাজা জয়সিন্ধের খুনের ব্যাপারটা আজও আমার মনে বড় আঘাত হানছে।

শুনুন বিনয় সেন, আপনাদের প্রিয় রাজার হত্যাকারী অন্য কেউ নয়, তার পুত্র মঙ্গলসিন্ধই তাকে হত্যা করেছে।

বিনয় সেন পাথরের মূর্তির মত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল।

কঙ্কর সিং বলল—এখনও আপনি মঙ্গলকে হত্যা করা পাপ মনে করেন?

পিতৃ হত্যাকারীকে হত্যা করা তার প্রতি সুবিচার করা। পিতৃহত্যার শাস্তি তাকে সর্বশরীরে অস্ত্র দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করে লবণ মাখিয়ে তিলে তিলে শাস্তি দেওয়া।

হাঁ, ঠিকই বলেছেন বিনয় সেন, আমি মঙ্গলসিন্ধকে এভাবেই হত্যা করব।

তারপর রাজসিংহাসনের অবস্থা কি দাঁড়াবে সিং বাহাদুর?

এই চিন্তা, কেন আমি কি রাজ্য পরিচালনার অযোগ্য?

না না, ছিঃ ছিঃ আপনি এখন ঝিন্দের মন্ত্রীবর, আপনি কেন রাজকার্য পরিচালনায় অযোগ্য হবেন। কিন্তু একটা কথা আমি বলতে চাই সিং বাহাদুর।

আপনি আমাকে সিং বাহাদুর না বলে মন্ত্রীবর বলবেন—বিনয় সেন।

আপনার কথা মতই কাজ করব মন্ত্রীবর।

বলুন আপনি কি বলতে চাইছিলেন?

হাঁ, আমি বলছিলাম কি, কুমার বাহাদুর যাতে কিছু জানতে না পারে–যেমন সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে। রাজ্যও যেন পান আর সেই রূপসী তরুণীও যেন হাতছাড়া না হয়।

বলুন আমাকে কি করতে হবে?

মন্ত্রীবর, এ বাগানবাড়ি আমাদের এই গোপন আলোচনার উপযুক্ত স্থান নয়। বরং আপনার বাড়িতে....

হাঁ, ঠিকই বলেছেন বিনয় সেন, মঙ্গল যে কোন মুহূর্তে এখানে এসে যেতে পারে। চলুন আমরা অন্তপুরে গিয়ে বসি।

উঠে দাঁড়াল কঙ্কর সিং-চলুন। . বিনয় সেন কোনদিন কঙ্কর সিংয়ের অন্তপুরে আসেনি, আজ প্রথম এলো।

কঙ্কর সিং বিনয় সেনকে নিয়ে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে বসল বলল কঙ্কর সিং–বলুন বিনয় সেন?

হাঁ বলছিলাম, রাজা মঙ্গলসিন্ধ আপনাকে অনেক সমীহ করেন–বন্ধু বলে আপনার কথা মানেনও।

সে কথা মিথ্যা নয় কিন্তু আপনি কি আমাকে ভুলাচ্ছেন বিনয় সেন?

মোটেই না, আপনি যখন আমাকে বিশ্বাস করে একটা সাহায্য চেয়েছেন তখন আমি আপনার কথামত কাজ না করে কি পারি? আপনি যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা বলব?

বলুন বিনয় সেন, বলার জন্যই তো এখানে–মানে আমার অন্তঃপুরে আপনাকে...

হাঁ, তা আমি জানি, দেখুন মন্ত্রীবর, আপনি যাতে একসঙ্গে ঝিন্দ রাজ্য এবং ঝিন্দের রাণী লাভ করেন–

কি বললেন আমাকে এত বড় নীচ প্রবৃত্তির মানুষ বলে মনে করছেন। যাকে মঙ্গল স্ত্রী বলে গ্রহণ করবে সে নষ্ট মেয়েকে আমি আবার স্ত্রী বলে–

না, সে কথা আমি বলছি না, বলছি আপনি রাজ্যলাভ এবং স্ত্রী লাভ যেন একই সঙ্গে করতে পারেন।

আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না বিনয় সেন?

বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনি ধৈর্য ধরুন।

দেখুন বিনয় সেন, আমি চাই মঙ্গলসিন্ধ যেন ঐ সুন্দর তরুণীকে স্পর্শ করতে না পারে, এবং তাকে রাণী করার পূর্বেই যেন আমি মঙ্গলকে হত্যা করতে পারি। কারণ মঙ্গল আমাকে বলেছে জীবনে সে অনেক নারী দেখেছে কিন্তু এমন সুন্দরী নারী সে কোনদিন দেখেনি অপূর্ব অদ্ভুত নারী নাকি এই সুন্দরী। এবং সে কারণেই

মঙ্গল তাকে বাগানবাড়ির ক্ষণিকের সামগ্রী হিসেব নষ্ট করতে চায় না, তাকে চিরদিনের জন্য পাশে রাখতে চায়। মনস্থ করেছে সে তাকে বিয়ে করে রাণী করবে।

মৃদু হাসল বিনয় সেন, বলল—মঙ্গল সিন্ধের কবল থেকে তরুণী এত সহজে পরিত্রাণ পাবে এ কথা আপনি ভাবতে পারলেন মন্ত্রীবর?

বিনয় সেন, আপনি ভুল করছেন, মঙ্গল আমাকে বলেছেতাকে আমি বিয়ের আগে স্পর্শ করব না।

কঙ্কর সিংহের কথায় বিনয় সেন নিশ্চুপ হয়ে কিছুক্ষণ ভাবল তারপর কঙ্কর সিংয়ের কানে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কিছু বলল।

বিনয় সেনের কথায় কঙ্কর সিংয়ের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হলো। হেসে বলল কঙ্কর সিং-বিনয় সেন, সত্যিই আপনার মাথায় বুদ্ধি আছে। আপনার কথামত আমি কাজ করব।

বিনয় সেন তখনকার মত বিদায় গ্রহণ করল।

•

কঙ্কর সিং রাজদরবারে প্রবেশ করল। সংগে তার এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী, বলল কঙ্করসিং-ইনি একজুন সন্ন্যাসী এবং জ্যোতিষী।

মঙ্গলসিন্ধ রাজসিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসীকে অভিবাদনপূর্বক নিজ আসনের পার্শ্বে বসাল। বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল—হঠাৎ আপনার আগমনের কারণ কি জ্যোতিষী বাবাজী। যদি কিছু মনে না করেন অধমকে বলেন তাহলে কৃতার্থ হই। জটাজুটধারী সন্ন্যাসী অদ্ভুত একটা শব্দ করে বলল—আজ রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি, তাই মন্ত্রীবর মহাশয়কে বলে স্বপ্নের বিবরণ আপনাকেও জানাতে এসেছি।

কঙ্কর সিং গম্ভীর কণ্ঠে বলল হাঁ, সন্ন্যাসী বাবাজী যা বলছেন অতি সত্য কথা। এই বাবাজী পর্বতে বাস করেন, কোনদিন লোকালয়ে আসেন না। শুধু একবার এসেছিলেন বহুদিন পূর্বে যখন মহারাজ নিহত হবেন তখন।

চমকে উঠল মঙ্গলসিন্ধ।

কঙ্কর সিং বলল—তখন ইনি স্বপ্নে সব জানতে পেরেছিলেন।

মঙ্গলসিন্ধের মুখ মুহূর্তে ফ্যাকাশে বিবর্ণ হলো।

কঙ্কর সিং বলল—সন্ন্যাসী বাবাজী অত্যন্ত ভাল লোক। তিনি কোন সময় কারও অমঙ্গল কামনা করেন না। যার যা অদৃষ্টে আছে তার তাই ঘটবে, এতে বিচলিত হবার কোন কারণ নেই।

মঙ্গলসিন্ধ তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দেবার জন্য বলল–বাবাজী, আপনি স্বপ্নে কি জ্ঞাত হয়েছেন জানতে পারি কি?

সন্ন্যাসী পুনরায় মুখে একটা শব্দ করে বললেন, আমার স্বপ্নবার্তা জানাবার জন্যই আমি পর্বতের গুহা ত্যাগ করে এই রাজ দরবারে আগমন করেছি।

মঙ্গলসিন্ধ করজোড়ে বলল—বলুন দেব আপনার স্বপ্নবার্তা।

রাজদরবারের সবাই ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করছেন, না জানি কি বলবেন সন্ন্যাসী বাবাজী।

সন্ন্যাসী আসনে জেঁকে বসে হাতের চিমটাখানা মাটিতে তিনবার ঠক ঠক করে ঠুকে নিয়ে বললেন—ভোর রাতের স্বপ্ন অতি সত্য-অতি সত্য...মহারাজ, আমি স্বপ্ন দেখলাম একটা গহন বনের মধ্যে আপনি বিচরণ করে বেড়াচ্ছেন। আপনার চারদিকে গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এমন সময় আপনার অদূরে এক জ্যোতির্ময়ী নারীমূর্তি দেখা গেল....

থামলেন সন্ন্যাসী।

রাজা মঙ্গলসিন্ধের নিশ্বাস পড়ছে কিনা বুঝা যাচ্ছে না। কঙ্কর সিং তার নিজের আসনে বসে তাকাচ্ছে রাজা মঙ্গলসিন্ধের মুখের দিকে। রাজদরবারের অন্যান্য রাজকর্মচারী বিপুল আগ্রহে তাকিয়ে আছেন সন্ন্যাসী বাবাজীর মুখের দিকে।

হাঁ, তারপর....বলতে শুরু করলেন সন্ন্যাসী বাবাজী-আপনি তখন সেই নারীমূতির দিকে এগুচ্ছেন, কিন্তু কিছুতেই আপনি তার নাগাল পাচ্ছেন না।

আপনার চারপাশে অন্ধকারের ঘনঘটা আরও জমাট বেধে উঠেছে। অদূরে জ্যোতির্ময়ী নারী অসহায় দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে আপনার দিকে....

বলুন তারপর–ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করল মঙ্গলসিন্ধ।

সন্ন্যাসী বলে চলেছেন—আপনি তখন প্রাণপণে ঐ নারীর দিকে ধাবিত হলেন। এমন সময় হঠাৎ অদ্ভুত এক দেবপুরুষের আবির্ভাব হলো সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে আপনি স্তব্দ হয়ে দাঁড়ালেন। দেবমূর্তির চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এক অপূর্ব আলোর ছটা। দেবমূর্তি গম্ভীর কণ্ঠে আপনাকে লক্ষ্য করে বললেন–ক্ষান্ত হোন রাজা। ক্ষান্ত হোন——ঐ জ্যোতির্ময়ী নারী অতি পবিত্র। ওকে আপনি স্পর্শ করতে পারবেন না। আপনি তখন নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে তাকিয়ে আছেন দেবমূর্তির দিকে....

সন্ন্যাসী বাবাজী বলুন, তারপর কি হলো?

সন্ন্যাসী বাবাজী পুনরায় মাটিতে তিনবার হাতের চিমটাখানা ঠক্ ঠক করে ঠুকে নিয়ে বললেন-ব্যস্ততা কেন বৎস! আমি ধীরে ধীরে স্বপ্নদৃশ্যের সব কথাই আপনার নিকট ব্যক্ত করব। হাঁ, আপনার মঙ্গলের জন্যই আমি ঝিল পর্বত থেকে এ মানবপুরীতে এসেছি, আপনার মঙ্গলই আমার কামনা—আপনি যখন নিশ্চল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন, তখন সেই অদ্ভুত দেবমূর্তি বলে উঠলেন-জানি তুমি ওকে চাও, অতি নিজের করে পেতে চাও। কিন্তু ওকে স্পর্শ করার সংগে সংগেই তোমার মৃত্যু হবে-আপনি তখন চিৎকার করে বললেন, এর কি কোন প্রতিকার নেই? দেবমূর্তি বললেনআছে, কিন্তু সে অতি কঠিন কাজ। আপনি তখন প্রশ্ন করলেন–কি এমন কঠিন কাজ যা আমি ঐ নারীর জন্য করতে পারি না? তখন দেবমূর্তি খুশি হলেন, বললেন–তুমি ঐ জ্যোতির্ময়ী নারীকে তোমার হৃদয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠার পূর্বে তাকে তোমার রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা কর। তারপর ছ’মাস পর বিয়ে কর, তার পূর্বে নয়....এটুকু স্বপ্ন দেখার পর হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। ভোর রাতের স্বপ্ন, কাজেই আমার মনের মধ্যে বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। সত্যই যদি আপনার হৃদয় সিংহাসনে কোন জ্যোতির্ময়ী নারীকে প্রতিষ্ঠার আয়োজন করে থাকেন তবে আপনি বিরত থাকুন। নচেৎ মৃত্যু আপনার অনিবার্য।

মঙ্গলসিন্ধ ধ্যানগ্রস্তের মত এতক্ষণ সন্ন্যাসী বাবাজীর কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল। সে বুঝতে পারল সন্ন্যাসী যা বলছেন তা অতীব সত্য। কারণ, যে নারীকে সে

অজানা এক বজরা থেকে নিয়ে এসেছে ঠিক তার সংগেই তো মিলে যাচ্ছে সন্ন্যাসী বাবাজীর কথা। বলল মঙ্গলসিন্ধ-বাবাজী, আপনি অনুগ্রহ করে আমার অন্তপুরে চলুন, নিরালায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

চলুন মহারাজ, চলুন। আপনার মঙ্গল কামনাই আমার ধর্ম। উঠে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী বাবাজী।

মঙ্গলসিন্ধ তার রাজদরবারে সকলের নিকটে তখনকার মত বিদায় নিয়ে সন্ন্যাসী বাবাজীসহ রাজ-অন্তপুরে প্রবেশ করল।

.

নিজের বিশ্রামকক্ষে এসে বসল মঙ্গলসিন্ধ। সন্ন্যাসী বাবাজীকে তার নিজের শয্যা ছেড়ে দিল, আপনি আমার শয্যায় আরামে বসুন।

সন্ন্যাসী বাবাজী দুগ্ধফেননিভ শুভ্র বিছানায় জেঁকে বসলেন, তারপর বললেন-বৎস, এবার আপনি মনের কথা অকপটে ব্যক্ত করতে পারেন।

মঙ্গলসিন্ধ ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলল–আপনি যা স্বপ্নে অবগত হয়েছেন তা সত্য।

আমি সব জানি বৎস, সব জানি। স্বপ্নে আমি সবই অবগত হয়েছি।

বাবজী, আমার অন্তপুরে একটি তরুণী আবদ্ধা রয়েছে।

আবদ্ধা…বলেন কি! তবে যে আমি স্বপ্নে জানতে পারলাম তাকে আপনি সসম্মানে..

গুরুদেব, আপনি ভুল বুঝবেন না। আবদ্ধা হলেও আমি তার প্রতি অন্যায় আচরণ করিনি।

খুশি হলাম বস, কারণ যে নারী এখন আপনার অন্তপুরে স্থান লাভ করেছে, সে অতি পবিত্র-দেবী সমতুল্য।

আমি তাকে বিয়ে করে রাণী করতে চাই গুরুদেব।

খুশি হলাম বৎস, কিন্তু বিয়ের পূর্বেই তাকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে রাণী করতে হবে। তারপর ছ'মাস সে রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্টা থাকার পর তাকে মহাধুমধামের সঙ্গে বিয়ে করতে হবে।

আপনার কথা শিরধার্য গুরুদেব! আমি তাকে আমার সিংহাসনে বসিয়ে তাকে রাণী করব কিন্তু সে যদি রাণী হতে আপত্তি জানায়? এবং যতদূর সম্ভব সে নারী কিছুতেই রাণী হতে চাইবে না।

তাহলে তাকে কোনদিন আপনি স্পর্শ করতে পারবেন না, করলে আপনার মৃত্যু হবে। আচ্ছা, আজ আমি চলি, আমার জপের সময় প্রায় আগত। সন্ন্যাসী বাবাজী উঠে দাঁড়ালেন।

মঙ্গলসিন্ধুও সন্ন্যাসী বাবাজীর সংগে আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল, তার মুখমণ্ডলে একটা দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। করজোড়ে বলল মঙ্গলসিন্ধু— গুরুদেব, যদি কিছু মনে না করেন তবে আমার অন্তপুরে এসে যদি তার সংগে একটু দেখা করেন তাহলে আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

কিন্তু বৎস, আমিতো কোনদিন নারীমুখ দর্শন করি না মা কালীকা দেবীকে ছাড়া।

মা কালী দেবী আপনাকে সাক্ষাৎ দেন?

হাঁ বৎস, মা কালী, তার এ অধম পুত্রের সংগে সাক্ষাৎ না করে পারেন না।

কিভাবে আপনি তার সাক্ষাৎ লাভ করেন গুরুদেব?

সে অতি কঠোর কঠিন তপস্যা, সংক্ষেপে বলি। অমাবস্যার গভীর রাত্রে শোনে সদ্য মৃতদেহের উপর বসে আমাকে তপস্যা করতে হয়। তপস্যা দি সফল হয় তখন আকাশে মেঘ জমে ওঠে। ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ চমকায়, বজ্রপাত হয় —তারই মধ্যে মা কালী হাতে রক্তরাঙা খর্গ, গলায় নরমুণ্ডু, জিহ্বায় তাজা রক্তের আলপনা আমার সম্মুখে শশরীরে এসে দণ্ডায়মান হন…..

মঙ্গলসিন্ধের দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময়, অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলমা কালী শশরীরে এসে দণ্ডায়মান হন!

হাঁ বৎস, সেই একটি নারীমূর্তিই আমি জীবনে দেখেছি।

গুরুদেব, তাহলে আপনি তার সংগে সাক্ষাৎ করতে রাজী নন?

আপনি যখন বলছেন তখন না করি কেমন করে। তবে এক কাজ করতে হবে।

বলুন গুরুদেব কি করতে হবে?

আমি চক্ষু বন্ধ করে তার কক্ষে প্রবেশ করব, আপনি তার হাত আমার হাতের মুঠায় এনে দেবেন। আমি তাকে সব কথা বলব।

বেশ তাই করছি গুরুদেব, আসুন আমার সংগে।

.

মনিরা কেঁদে কেঁদে দু'চোখ লাল করে ফেলেছে; চোখের পানি যেন শুকিয়ে গেছে, আর কাঁদতে পারে না। হৃদয়টা পুড়ে যেন ছাই হয়ে গেছে তার। বারবার এই নির্মম পরিণতি—যার কোন শেষ নেই।

মনিরা শয্যায় শুয়ে নীরবে কাঁদছিল।

এমন সময় কক্ষের দরজা খুলে যায়, কক্ষে প্রবেশ করে মঙ্গলসিন্ধ, সংগে তার জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর দক্ষিণ হাত মঙ্গলসিন্ধের দক্ষিণ হাতের মুঠায়, চক্ষুদ্বয় মুদিত।

মনিরা মঙ্গলসিন্ধ এবং সন্ন্যাসী বাবাজীকে দেখে বিছানা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। মঙ্গলসিন্ধের পেছনে চক্ষু মুদিত সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে মনিরা বুঝতে পারল, সন্ন্যাসী অন্ধ।

মঙ্গলসিন্ধ বলল-যুবতী, কোন ভয় নেই, এই সন্ন্যাসী বাবাজী তোমাকে দুটি কথা বলবেন।

মনিরা পুনরায় তাকাল সন্ন্যাসীর মুখের দিকে। কোন উত্তর দিতে পারল না সে।

সন্ন্যাসী একটা শব্দ করে বলল–বৎস, ক্ষণিকের জন্য আপনাকে বাইরে যেতে অনুরোধ করছি।

মঙ্গলসিন্ধ নীরবে বাইরে চলে গেল।

সন্ন্যাসী এবার মুদিত আঁখি মেলে তাকাল, ক্ষিপ্রকণ্ঠে বলল–মনিরা, আমি বিনয় সেন।

মনিরা, অস্ফুট শব্দ করে সন্ন্যাসীর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো–আপত্তি এসেছেন।

হাঁ মনিরা, তোমাকে উদ্ধারের জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি। রাজা মঙ্গলসিন্ধকে আমি বলেছি তোমাকে রাণী করতে, ঝিন্দের রাণী।

এ আপনি কি বলছেন! চাই না আমি ঝিন্দের রাণী হতে।

মনিরা, তোমাকে ঝিন্দের রাণী করবে, বিয়ে করে রাণী নয়।

তুমি অমত করো না। আমি তোমাকে উদ্ধার করে নেব। দাও তোমার হাত আমার হাতে-দাও–দাও বিলম্ব করো না।

মনিরা সংকুচিতভাবে দক্ষিণ হাতখানা বাড়িয়ে দিল সন্ন্যাসীর দিকে।

সন্ন্যাসী মনিরার হাত স্পর্শ করে বিড় বিড় করে মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন।–

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করল মঙ্গলসিন্ধ, কড়জোড়ে বলল–গুরুদেব হয়েছে!

হ্যাঁ হয়েছে বৎস! আমি যোগমন্ত্রদ্বারা এই যুবতীকে ঝিন্দের রাণী হবার যোগ্যতা সমর্পণ করলাম। এবার মনিরার হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন সন্ন্যাসী–আসুন, এবার আমাকে রাজ-অন্তপুরের বাইরে নিয়ে চলুন। পস্যার সময় আগত, বিলম্বে অমঙ্গল ঘটতে পারে।

মঙ্গলসিন্ধ সন্ন্যাসীর হাত ধরে তাকে কক্ষের বাইরে নিয়ে গেল।

মনিরা এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। যাক বিনয় সেন তাহলে তার সন্ধান পেয়েছেন। এবার আর ভয়ের কোন কারণ নেই। হেমাঙ্গিনীর হাত থেকে রক্ষা করেছেন এবার রাজা মঙ্গলসিন্ধের হাত থেকে তিনি রক্ষা করলেন। বিনয় সেনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল মনিরার মন। চোখের পানি মুছে এলো চুলগুলো খোপা করে বেঁধে পুনরায় শয্যায় গিয়ে বসল এখন তার মুখমণ্ডল

পূর্বের ন্যায় গম্ভীর থমথমে নয়, চোখ দুটো অশ্রুভারাক্রান্ত নয়, একটা প্রসন্ন ভাব মুখে ফুটে উঠেছে।

.

কঙ্কর সিং বিনয় সেনের হাত দু'খানা চেপে ধরল। নরম মোলায়েম গলায় বলল-আপনিই এখন আমার একমাত্র ভরসা, সহায় সম্বল। আমি ঐ যুবতীর জন্য পাগল হয়ে যাব। অহরহ আমার মনে ঐ একটি মাত্র মুখ জেগে আছে। বলুন বিনয় সেন, তাকে কি পাব?

সেই কারণেই তো আমি সন্ন্যাসীর বেশে রাজা মঙ্গলসিন্ধের রাজ দরবারে গিয়েছিলাম। মন্ত্রীবর শুধু সেই সুন্দরী লাভই হবে না, তার সঙ্গে রাজ্যলাভও হবে।

।বিনয় সেন কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব, ভেবে পাচ্ছি না। দেখুন আমি রাজা হবার পর আপনাকে মন্ত্রী করবো।

মন্ত্রী!

হাঁ বিনয় সেন, আপনাকে আমি ঝিন্দ রাজ্যের মন্ত্রী করব।

খুশি হলাম। কিন্তু রাণী থাকাকালীন নয়, আপনি যখন রাজ সিংহাসনে উপবেশন করবেন তখন আপনি আমাকে যে পদে প্রতিষ্ঠিত করবেন, তাই হব। একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করব?

করুন?

আচ্ছা মন্ত্রীবর, আপনি রাজপরিবারের সমস্ত খবরই অবগত আছেন, তাই না?

হাঁ, রাজপরিবারের এমন কোন কথা বা কাজ নেই যা আমি জানি না। বিনয় সেন বেশ কিছুক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে মুখ তুলল তারপর বলল–মঙ্গলসিন্ধকে রাজ-সিংহাসনচ্যুত করে আপনাকে যখন আমরা ঝিন্দের রাজা করব তখন রাজা জয়সিন্ধের কোন বংশধর যদি প্রতিবাদ জানিয়ে বসে বা সে নিজে রাজ সিংহাসনে উপবেশনের দাবী জানায়?

এবার কঙ্কর সিং বেশ ভাবাপন্ন হল, ললাটে চিন্তারেখা ফুটে উঠল–বিনয় সেন, আপনি যা বলেছেন অতীব সত্য। মঙ্গলকে পৃথিবী থেকে বিদায় দিতে আমার বেশি বেগ পেতে হবে না কিন্তু–থামল কঙ্কর সিং।

বিনয় সেন বলল–কিন্তু কি মন্ত্রীবর?

হাঁ আছে, রাজা জয়সিন্ধের ভগ্নি মায়ারাণীর এক পুত্র বিজয়সিন্ধ আছে। সে অতি নিষ্ঠাবান সৎচরিত্রবান যুবক। মামার মৃত্যুর পর সে একবার ঝিন্দে এসেছিল, কিন্তু মঙ্গলসিন্ধের আচরণে সে দুঃখিত ব্যথিত হয়ে স্বদেশে ফিরে গেছে। রাজা জয়সিন্ধ তার এই ভাগিনাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। অনেক সময় মঙ্গলের ওপর রাগ করে তাকে ঝি রাজ্যের রাজা করবেন বলে বলতেন। মঙ্গলের পিতৃহত্যার আর একটা কারণ রাজা জয়সিন্ধের এই উক্তি।

বিনয় সেন তন্ময় হয়ে শুনছিল কঙ্কর সিংয়ের কথাগুলো, এবার বললরাজা জয়সিন্ধ তাহলে ভাগিনা বিজয়সিন্ধকে রাজা করার মনোবাসনা পোষণ করতেন?

হাঁ, কারণ মঙ্গলসিন্ধের ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও ব্যথিত ছিল।

বিজয়সিন্ধ কি জয়সিন্ধের আপন ভগ্নির গর্ভজাত পুত্র?

হাঁ, এবং সে কারণেই আমি নিশ্চিন্ত নই বিনয় সেন। যদিও বিজয়সিন্ধ একজন মহৎ ব্যক্তি তবু মঙ্গলসিন্ধের অভাবে সে নিশ্চয়ই নিশ্চুপ থাকবে বলে মনে হয় না।

গভীর চিন্তারেখা ফুটে ওঠে বিনয় সেনের ললাটে। কিছুক্ষণ মৌন থেকে বলল সে–ভাববার কথা, মঙ্গলসিন্ধের অভাবে সে ঝিন্দের রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী এটাও সত্য।

তাহলে কি করা যায় বিনয় সেন? আপনার ওপরই আমার সমস্ত আশাখাসা নির্ভর করছে।

ব্যস্ত হবেন না, মন্ত্রীবর, ধৈর্য ধারণ করুন।

কিন্তু কত দিন?

যতদিন না মঙ্গলসিন্ধ পৃথিবী থেকে মুছে যায়। পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ তাকে পেতেই হবে।

আমিও যে তাকে সহায়তা করেছিলাম বিনয় সেন।

আপনি তো রাজ-সিংহাসন লাভ করতে চলেছেন মন্ত্রীবর।

আমি সেই অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী—

ঝিন্দের রাণী হলে সে তো আপনার হাতের মুঠায় থাকবে।

বিনয় সেন, আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তার সঙ্গে এই নিন আমার কণ্ঠের মুক্তার মালা।

ওটা আমি কি করব মন্ত্রীবর। আপনি মন্ত্রী, মুক্তার মালা আপনার গলাতেই শোভা পায়।

তবে কি দেব আপনাকে বলুন?

যখন রাজ সিংহাসন এবং রাণী দুটো আপনার হাতে আসবে তখন আপনি যা দেবেন তাই আমি খুশিমনে গ্রহণ করব।

সত্যি আপনার মত মহৎ ব্যক্তি আর নেই ইহজগতে। ঝিন্দের রাজা হবার পর আপনাকে আমি রাজমন্ত্রী করব কথা দিলাম।

আচ্ছা সে হবে তখন।

বিনয় সেন কিছুক্ষণ পায়চারী করলো, তারপর বলল–মন্ত্রীবর এবার কয়েকটি প্রশ্ন করব আপনাকে, সঠিক জবাব দেবেন। কারণ, কার্যক্ষেত্রে পদার্পণ করলে প্রয়োজন হতে পারে।

বলুন বিনয় সেন, আপনি যা জানতে চাইবেন তারই জবাব পাবেন। আমি সত্যি কেমন যেন বিভোর হয়ে পড়েছি। ঝিন্দ রাজ্য আমার চাই, তার সঙ্গে চাই সেই তরুণী। তাকে দেখা অবধি আমার হৃদয়ে এক ফোটা শান্তি নেই সব সময় তার চিন্তা আমাকে দগ্ধীভূত করে চলেছে।

রাজা মঙ্গলসিন্ধ কার পরামর্শে রাজা জয়সিন্ধকে হত্যা করেছে?

আপনাকে পূর্বেই বলেছি বিনয় সেন, রাজা জয়সিন্ধকে যদিও মঙ্গলসিন্ধ হত্যা করেছে, কিন্তু তাকে উৎসাহিত এবং সুযোগ করে দিয়েছি আমি। তার এই রাজ্যলাভের পেছনে রয়েছে আমার আন্তরিক প্রচেষ্টা।

সত্যি, এজন্য আপনাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেয়া উচিত।

হাঁ, আমার বুদ্ধি বলেই সে আজ ঝিন্দের রাজা।

মন্ত্রীবর, আপনি মঙ্গলসিন্ধকে সরিয়ে ঝিন্দের রাজা হলে বিজয়সিন্ধ এসে আপত্তি করে বসতে পারে। কাজেই তাকেও সরাতে হবে।

ঠিক বলেছেন বিনয় সেন, ঝি-রাজ্য লাভ করতে হলে রাজবংশের কাউকে—

জীবিত রাখা চলবে না।

আমার মনের কথাই আপনি বলেছেন বিনয় সেন।

কিন্তু বিজয়সিন্ধকে সরাতে হলে কাজে নামার পূর্বে তার আবাসস্থলের ঠিকানা জানতে হবে।

এটা সামান্য ব্যাপার, বিজয়সিন্ধ ঝিল রাজ্যের জরাসন্ধী নগরে বাস করে। তার পিতামাতা বহুদিন পূর্বে মারা গেছে।

সে এখন কি করে মন্ত্রীবর?

ছবি আঁকা তার নেশা, পেশাও বলা চলে, কারণ বিজয়সিন্ধ নিজের আঁকা ছবি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে।

বিনয় সেন বলল–রাজভাগিনা হয়ে তাকে ছবি এঁকে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় কেন?

আপনি তাকে জানেন না বলে কথাটা বললেন বিনয় সেন। বিজয়সিন্ধ এত লোক, পরের সাহায্য সে কোন সময় কামনা করে না। তা ছাড়াও তার একটা দোষ

আছে, নিজের উপার্জন দিয়ে নিজেরই চলে না, তবু সে শহরের দীন-দুঃখীকে নিজে না খেয়ে বিলিয়ে দেয়। নিজে হয়তো উপোস করে মরে।

নিস্পলক নয়নে কঙ্কর সিংহের কথাগুলো শুনছিল বিনয় সেন, মুখমণ্ডলে তার অপূর্ব একটা জ্যোতির লহরী খেলে যায়। তাড়াতাড়ি বিনয় সেন নিজের মুখমণ্ডলে কঠিন ভাব ফুটিয়ে তোলে।

সেদিন আর বেশিক্ষণ কঙ্কর সিং এবং বিনয় সেনের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলে না।

.

জরাসন্ধী শহরের এক প্রান্তে ফুল্লরা নদী। নদীতীরে পাশাপাশি কয়েকখানা একতলা বাড়ি। নদীতীর ঘেঁষে যে বাড়িটা সেটা বেশ বড় এবং দোতলা। এককালে বাড়ির যে জৌলুস ছিল আজও তা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু বহুদিন বাড়িটা মেরামত না করায় স্থানে স্থানে ধ্বসে পড়েছে। তবু বাড়িখানা দাঁড়িয়ে আছে কাল প্রহরীর মত মাথা উঁচু করে।

নিশীথ রাত।

জরাসন্ধী শহরটা যেন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঝিন্দ রাজ্যেরই একটা অঙ্গ এই জরাসন্ধী। এ শহর ঝিন্দের মত পর্বত আর পাহাড়ে ঘেরা নয়, শস্যশ্যামলা বনানী ঢাকা একটা পরিচ্ছন্ন শহর।

রাত বেশি হওয়ায় শহরের পথ-ঘাট-মাঠ নীরব নিস্তব্ধ। দ্বাদশীর চাঁদ ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। আকাশে অসংখ্য তারার মেলা। বাতাস বইছে গৃহহারা পথিকের দীর্ঘশ্বাসের মতই থেকে থেকে। ..

ফুল্লরা নদীতীরে দোতলা বাড়িখানার একটা কক্ষে এখনও আলো জ্বলছে। তন্দ্রাচ্ছন্নের মত ক্যানভাসের ওপর তুলির পরশ বুলিয়ে চলেছে রাজা জয়সিন্ধের ভাগিনা বিজয়সিন্ধ। শিল্পীর তুলির আঁচড়ে চিত্রটি সজীব হয়ে উঠেছে।

শিল্পী ছবি আঁকা শেষ করে নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে তার অপূর্ব এই সৃষ্টির দিকে, অদূরস্থ কোন গীর্জা থেকে সময় সময় সংকেত শোনা যায়। রাত দ্বিপ্রহর।

বিজয়সিন্ধ তখনও নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে তার সম্মুখস্থ চিত্রখানার দিকে।

হঠাৎ চিত্রের উপরে একটা কাল ছায়া এসে পড়ল। চমকে ফিরে তাকাল বিজয়সিল্ক, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠল কে?

অতি নরম মোলায়েম কণ্ঠস্বর-শত্রু নই-বন্ধু।

কে-কে আপনি?

আমি একজন মানুষ।

আপনার নাম?

বিনয় সেন।

আপনি, আপনি—

হাঁ, আমি ঝিন্দের রাজকর্মচারী।

এখানে কি প্রয়োজন?

প্রয়োজন আছে বিজয়সিল্ক, আসুন কথা আছে আপনার সঙ্গে।

এত রাতে কি এমন কথা রাজকর্মচারী? আপনি কাল ভোরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে অনেক খুশি হতাম।

যে কথার জন্য এই মুহূর্তে আমি এখানে এসেছি, সে অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা।

হাসল বিজয়সিল্ক, তারপর বলল-ঝিন্দের রাজপরিবারের এমন কোন গুরুত্বপুর্ণ কথা থাকতে পারে না যা আমার অতি–

আপনি ভুল করছেন বিজয়সিন্ধ, আপনি আমার কথা শুনুন, আসুন আমার সঙ্গে।

চলুন রাজকর্মচারী, কিন্তু আমার বাড়িতে আপনাকে বসতে দেবার মত রাজকীয় আসন তো নেই।

এবার বিনয় সেনের ভ্রুকুঞ্চিত হল, বলল সে রাজকর্মচারী বলে কেন আপনি আমাকে উপহাস করছেন?

উপহাস করিনি বিনয় সেন, যা সত্য তাই বলেছি। শুনেছি আপনি রাজা মঙ্গলসিন্ধের দক্ষিণ হাত। আপনি মঙ্গলের রাজকর্মচারী হতে পারেন কিন্তু আমার কাছে আপনি একজন সাধারণ মানুষ ছাড়া কিছু নন।

হাঁ, তাই আমি চাই, আমি এখানে রাজকর্মচারী হিসেবে আসিনি, এসেছি একটি কথার জন্য।

কথা?

হাঁ, মঙ্গলসিন্ধ বা রাজপরিবারের কেউ আমাকে পাঠাননি।

তবে?

আমি—আমি এসেছি দয়া করে যদি আমার কথা শোনেন।

বিজয়সিন্ধ বিনয় সেনসহ নিজের শয়নকক্ষে এসে আসন গ্রহণ করল।

উভয়ে তাকিয়ে আছে উভয়ের মুখের দিকে।

বিজয় সেন লোকমুখে শুনেছে, বিজয় সেন রাজা মঙ্গলসিন্ধের সঙ্গীসাথী বা অনুচর। শয়তান মঙ্গলসিন্ধের সঙ্গী ও সাথী তারই মত কুৎসিত, কুচরিত্র, দুষ্টলোক হবে। কিন্তু বিজয়সিন্ধ যতই বিনয় সেনকে দেখছে ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার কথাবার্তা বা চালচলনেও তো নেই কোন দুষ্ট মনোভাব।

বিনয় সেনও বিজয় সিন্ধের দিকে তাকিয়ে আছে অপলক নয়নে বিজয়সিন্ধ শুধু সুন্দর পুরুষই নয়, একজন মহাপুরুষও বটে। সে যে একজন গুণী লোক তা তার চেহারায় ফুঠে উঠেছে। বিনয় সেন বুঝতে পারেন, কঙ্কর সিং-এর একটি কথাও মিথ্যা নয়। বিজয়সিন্ধ সত্যই অতি মহৎ ব্যক্তি।

বিনয় সেন ভাবছে বিজয়সিন্ধের কথা।

বিজয়সিন্ধ ভাবছে বিনয় সেনের কথা।

কথা বলল বিনয় সেন–রাজপুরী থেকে এলেও আমি রাজ আদেশে আসিনি।

আপনি কি তবে নিজের ইচ্ছামত এসেছেন?

হাঁ, একটা গোপনীয় কথা আছে বিজয়সিন্ধ।

বলুন?

আমি জানি আপনি মহারাজ জয়সিন্ধের অতি আদরের ভাগিনা।

হাঁ, মামা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

অবশ্য তার কারণ ছিল।

কারণ, কি কারণ থাকতে পারে বিনয় সেন? মামা যদি ভাগিনাকে আদর করে তার কারণ–

আছে, কারণ তাঁর পুত্র মঙ্গলসিন্ধ মানুষ নয়। মহারাজ জয়সিন্ধ নিজ পুত্রকে কোনদিন বিশ্বাস করতেন না।

বিজয়সিন্ধ নিশ্চুপ রইল।

বিনয় সেন বলে চলে–জয়সিন্ধ পুত্রের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি জানতেন তার অভাবে সুষ্ঠুভাবে রাজ্য চালনা মঙ্গলের পক্ষে অসম্ভব হবে। প্রজাদের দুঃখের সীমা থাকবে না। তাই প্রজাদরদী রাজা আপনাকেই তাঁর রাজ-সিংহাসনে বসাতে চেয়েছিলেন।

এ কথা আপনি জানলেন কি করে? এটা তিনি নিজের মনের মধ্যে পোষণ করতেন বটে এবং তা একমাত্র জানত মঙ্গল—

আমিও জানতাম বিজয়সিন্ধ, আর জানতাম বলেই আজ আমি আপনার নিকটে এসেছি।

কারণ? কারণ, ঝিন্দ রাজসিংহাসনে উপযুক্ত রাজার প্রয়োজন।

মুহূর্তে বিজয়সিন্ধের মুখ কাল হয়ে উঠল আপনি আমাকে রাজ্যের মোহ দেখিয়ে–

না না, আপনি ভুল বুঝছেন বিজয়সিল্ক, আমি আপনার হিতৈষী।

রাজ্যলোভ আমার নেই, আপনি যেতে পারেন। তাছাড়া মঙ্গলই আপনাকে পাঠিয়েছে আমার মনোভাব জানতে, তাই নয় কি?

না, মঙ্গলসিন্ধ আমাকে পাঠাননি বা আমি তার কথাতে আসিনি।

তবে?

আমি একজন ঝিন্দ নাগরিক। আমি ঝিরাজ্যের অধিবাসীগণের মনের ব্যথা সর্বান্তকরণে উপলব্ধি করে রাজকাজে নিযুক্ত হয়েছি। প্রজাদের দুঃখ বেদনা যে রাজা বুঝে না, তাকে সরিয়ে সিংহাসনের উপযুক্ত লোককে রাজসিংহাসনে বসাতে চাই। এটা আমার কল্পনা নয়, আমার আন্তরিক বাসনা। বিজয়সিন্ধ, আপনি আমার অনুরোধ অবহেলা করবেন না। কথা দিন।

আপনি যা বলছেন তা সম্ভব নয়। কেন?

প্রথমত, রাজ্যলোভ আমার নেই, দ্বিতীয়ত মঙ্গল এখন ঝিন্দের রাজা, তৃতীয়ত রাজা হবার যোগ্যতা আমার নেই।

বিনয় সেন হাসল–রাজ্যলোভ আপনার নেই, এ আমি জানি, আর নেই বলেই আপনি রাজা হবার যোগ্য ব্যক্তি। মঙ্গলসিন্ধ রাজা হবার একেবারে অযোগ্য কাজেই তাকে রাজসিংহাসন থেকে সরাতে হবে।

বিনয় সেন, আমি অন্যায় কোনদিন মানি না। মঙ্গল আযোগ্য হলেও সে রাজসিংহাসনের অধিকারী, আমি এ কথায় রাজী হতে পারি না।

মঙ্গলসিন্ধ রাজসিংহাসনের অধিকারী হলেও প্রজাগণ তাকে চায় না। প্রজাদের মঙ্গল সাধনই তো রাজধর্ম। কিন্তু মঙ্গলসিন্ধ তার বিপরীত, সে প্রজাদের রক্ত শুষে নিচ্ছে। প্রজাদের ওপর চালাচ্ছে অকথ্য অত্যাচার। তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, তাদের স্ত্রী-কন্যা জোর করে নিয়ে এসে করছে ব্যভিচার-বিজয়সিন্ধ এতে শুনেও কি আপনার মনে দয়া হয় না? আপনার নিজের জন্য

নয়, প্রজাদের সুখের জন্য আপনাকে ঝিন্দ রাজসিংহাসনে উপবেশন করতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানই তো মানবধর্ম।

বিনয় সেনের মুখের দিকে নিস্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকে বিজয় সিন্ধ। অনেকটা নরম হয়ে আসছে সে। বলল এবার মঙ্গল সিন্ধ রাজা হবার অযোগ্য হলেও সে এখন রাজসিংহাসনের অধিকারী, কাজেই

আপনি শুধু মত করুন বিজয়সিন্ধ আর সমস্ত দায়িত্ব আমার।

বেশ, ন্যায়ের জন্য আমি আপনার কথা মেনে নিলাম।

বিনয় সেন উঠে দাঁড়াল–এত রাতে আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে আমাকে ক্ষমা করবেন।

বিজয়সিন্ধ আবেগভরা গলায় বলল–আপনার ব্যবহারে আমি, তুষ্ট হয়েছি। রাজকর্মচারী হয়ে আপনি এত সদয় সেজন্য সত্যি আমার আনন্দ হচ্ছে।

আচ্ছা চলি তাহলে, যখন ডাকব তখন কিন্তু চাই আপনাকে।

নিশ্চয়ই! আপনার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারব না।

বিনয় সেন বেরিয়ে যায়।

নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকে বিজয়সিন্ধ, ভাবে আশ্চর্য এই যুবক! যেমন সুন্দর চেহারা তেমন অদ্ভুত সুন্দর ব্যবহার ও কথাবার্তা।

.

মনিরা আজ ঝিন্দের রাণী।

মণিমাণিক্য খচিত রাজকীয় পোশাক তার শরীরে শোভা পাচ্ছে। মাথায় মুকুট। হাতে ঝি রাজ্যের প্রতীক ন্যায়দণ্ড।

স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্টা মনিরা।

রাজদরবারে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট রাজকর্মচারিগণ।

মনিরা তাকায় একটি আসন শূন্য। অনুমানে বুঝে সে এটাই বিনয় সেনের আসন, কিন্তু সে কোথায়?

মনিরা নিজেকে বিপন্ন মনে করে। ঝিন্দের রাজসিংহাসনে সে উপবিষ্ট হয়েছে একমাত্র বিনয় সেনের অনুরোধে, কিন্তু কোথায় সে?

মনিরা মঙ্গলসিন্ধকে লক্ষ্য করে বলল–কুমার, রাজদরবারে সবাই কি এসেছেন?

না, একমাত্র বিনয় সেনকে দেখছি না।

ঠিক সেই মুহূর্তে রাজদরবারে প্রবেশ করলেন জটাজুটধারী সেই সন্ন্যাসী। দক্ষিণ হাতে আশা, বাঁ হাতে চিমটা, মুখে বম বম্ শব্দ। রাজদরবারে সন্ন্যাসীর আগমন হতেই সিংহাসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল ঝিন্দের রাণী মনিরা। সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়াল, মঙ্গলসিন্ধ কঙ্কর সিং সকলেই—

সন্ন্যাসীর চক্ষুদ্বয় মুদিত, অতি ধীরে ধীরে এগুলেন তিনি। মঙ্গলসিন্ধ দ্রুত এগিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীর হাত ধরে রাজসিংহাসনের পাশে নিজের আসনে বসল। তারপর বিনীত কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে—গুরুদেব, আপনার আগমনের কারণ যদি দয়া করে বলেন? হাঁ বলার জন্যই আজ আমার আগমন।

বলুন গুরুদেব?

ঝিন্দ রাজসিংহাসনে উপযুক্তা রাণীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে দেখে অনেক খুশি হলাম।

এ আপনার অনুগ্রহ দেব।

এবার বিচার চাই।

বিচার?

হাঁ, আমার ওপর স্বপ্নদেশ হয়েছে, মহারাজ জয়সিন্ধের হত্যার বিচার হোক।

মঙ্গলসিন্ধ একবার মন্ত্রী কঙ্করসিংয়ের মুখে দিকে তাকিয়ে নিল।

মন্ত্রী কঙ্করসিং দৃষ্টি নত করে নিল, তার মনোভাব হত্যাকারীর বিচার হওয়াই প্রয়োজন। মনে মনে এটাই কামনা করে সে। কাজেই কংকর সিং নীরব রইল।

সন্ন্যাসী তার আশা বার কয়েক মাটিতে ঠুকে বললেন রাণী, এই বিচার করুন। আমি এই কক্ষের সকলেরই হাত গণনা করব।

সন্ন্যাসী নিজের হাত বাড়ালেন–চক্ষুদ্বয় তখনও মুদিত, বললেন তিনি–আমি কারও মুখ বা হাতের রেখা চোখে দেখব না শুধু স্পর্শ করে বলব।

মঙ্গলসিন্ধের বুকের মধ্যে তখন টিপ টিপ শুরু হয়েছে। সর্বনাশ হবে–এবার উপায়?

ইতোমধ্যে রাজকর্মচারীগণ একে একে উঠে দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন সন্ন্যাসী বাবাজীর দিকে।

সন্ন্যাসী সবাইকে তাদের মনোভাব প্রকাশ করে বলে দিচ্ছেন। অদ্ভুত মশল সন্ন্যাসীর।

ভয়বিহ্বলে মঙ্গলসিন্ধ বারবার তাকাচ্ছে সন্ন্যাসীর দিকে। হঠাৎ বলেই বসল সে–গুরুদেব, রাজদরবারের সকলের হাত স্পর্শ করেই আপনি সকলের মনের কথা বলে দিলেন। এবার সকলেরই হাত দেখা শেষ হয়েছে, আমার পিতার হত্যাকারী রাজদরবারে নেই।

সন্ন্যাসী বিড় বিড় করে মন্ত্র পাঠ করলেন, তারপর বললেন–আমি যোগবলে জানতে পারছি মহারাজ জয়সিন্ধের হত্যাকারী এই রাজদরবারেই রয়েছে।

এ্যাঁ, বলেন কি গুরুদেব। কে সে হত্যাকারী নরাধম? আমার পিতাকে যে হত্যা করেছে তাকে এই মুহূর্তে আমি বন্দী করব।’

সন্ন্যাসী বললেন–ঝিন্দরাণী, আপনি আপনার সৈন্যদের আদেশ করুন মহারাজ জয়সিন্ধের হত্যাকারীকে বন্দী করতে। আমি এই মুহূর্তে আমার গণনা–

মঙ্গলসিন্ধ ভয়ার্তকণ্ঠে বলল–বিনয় সেনকে আমি রাজদরবারে দেখছি, নিশ্চয়ই সেই আমার নিরপরাধ পিতাকে হত্যা করেছে এবং সেই কারণেই সে আজ রাজদরবারে আসেনি।

সন্ন্যাসী বললেন–আমারও তাই মনে হচ্ছে, কিন্তু এখনও দু'জনের হাত দেখা বাকী আছে। আসুন রাজা মঙ্গলসিন্ধ, আপনার হাত খানা দিন। আসুন, বিলম্বে অমঙ্গল হবে।

মঙ্গলসিন্ধ কম্পিত পদক্ষেপে এগিয়ে গেল সন্ন্যাসীর দিকে। অতি অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাতখানা এগিয়ে দিল।

সংগে সংগে সন্ন্যাসী অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন–আমি এটা কার হাত স্পর্শ করেছি?

রাজদরবারের সকলেই একসঙ্গে উচ্চারণ করলেন–কুমার মঙ্গল সিন্ধের।

চিৎকার করে উঠলেন সন্ন্যাসী—বিশ্বাস হচ্ছে না, আমি চক্ষু খুললাম–

চোখ মেলে মঙ্গলসিন্ধকে দেখে বলে উঠলেন সন্ন্যাসীকুমার, আপনি পিতৃহন্তা।

সেই মুহূর্তে ঝিরাণী মনিরা কঠিনকণ্ঠে বলল–গ্রেফতার কর পিতৃহন্তা মঙ্গলসিন্ধকে।

অমনি সশস্ত্র সৈনিক মঙ্গলসিন্ধকে ঘিরে দাঁড়াল। তাদের উদ্যত তরবারির অগ্রভাগ গিয়ে ঠেকলো মঙ্গলসিন্ধের বুকে। হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া হলো।

এবার সন্ন্যাসী মন্ত্রী কঙ্করসিংয়ের দিকে হাত বাড়াল–এসো বৎস তোমার হাত দেখা এখনও বাকী।

কঙ্কর সিং জানত সন্ন্যাসী অন্য কেউ নয়, বিনয় সেন এবং তার সঙ্গে পরামর্শ করেই সে এ কাজ করেছে, কাজেই সে অতি সহজেই এগিয়ে গেল সন্ন্যাসীর দিকে।

সন্ন্যাসী কঙ্কর সিংয়ের হাত ধরে বিড় বিড় করে কিছু মন্ত্র পাঠ করলেন তারপর বললেন–রাজা মঙ্গলসিন্ধের পিতৃহত্যার পরামর্শ দাতা এই মন্ত্রীবর, একেও গ্রেফতার করা হোক।

মুহূর্তে কঙ্করসিং ভয়ংকর এবং হিংস্র মূর্তি ধারণ করল, সঙ্গে সঙ্গে তরবারি খুলে আঘাত করল সন্ন্যাসীর মাথায়।

সন্ন্যাসী ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সরে দাঁড়াল, আঘাত তার আসনে গিয়ে বিদ্ধ হল।

রাণী আদেশ দিল–বন্দী কর–মন্ত্রীকে, বন্দী কর।

সৈনিকগণ এবার মন্ত্রীবর কঙ্করসিংকেও বন্দী করে ফেলল।

মঙ্গলসিন্ধ এবং কঙ্করসিং বন্দী হয়ে হিংস্র জন্তুর মত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। মঙ্গলসিন্ধের দু'চোখে রাগ, ক্ষোভ, দুঃখ ফুটে উঠেছে আর কঙ্করসিংয়ের চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে, দাঁতে দাঁত পিষে বলল–বিনয় সেন, তোমার ভণ্ডামি বুঝতে পেরেছি। সেই কারণেই তুমি আমার নিকটে মহারাজ হত্যার গোপন রহস্য জেনে নিয়েছ। তোমাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করব না।

বিনয় সেন তখন নিজের সন্ন্যাসী ড্রেস খুলে ফেলল। মঙ্গলসিন্ধ হুঙ্কার ছাড়ল এবার–শয়তান বিনয় সেন তুমি, মিথ্যা সন্ন্যাসী সেজে আমাকে ধোঁকা দিয়েছ। সৈনিকগণ আমি রাজা, আমার আদেশ বিনয় সেনকে গ্রেফতার কর! গ্রেফতার কর!

কিন্তু রাজদরবারের সবাই মঙ্গলসিন্ধ ও কঙ্কর সিং বন্দী হওয়ায় যারপরনাই খুশি হয়েছেন। মহারাজ হত্যারহস্য উদঘাটন হওয়ায় সকলেই বিনয় সেনের বুদ্ধির প্রশংসা করছেন, সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন–ঝিরাণী কি জয়! ঝিরাণী কি জয়! বিনয় সেন কি জয়–

সৈনিকগণ মঙ্গলসিন্ধের কথা কানেও নিল না। সবাই এক সঙ্গে ন্দিরাণী আর বিনয় সেনের জয়ধ্বনিতে রাজদরবার মুখরিত করে তুলল।

রাগে, ক্ষোভে, ক্রোধে মঙ্গলসিন্ধের মুখমণ্ডল কাল হয়ে উঠেছে। কঙ্কর সিং ক্রুদ্ধ সিংহের মত দাঁত কড়মড় করছে, এই মুহূর্তে ছাড়া পেলে সে দেখে নিত বিনয় সেনকে। কিন্তু সে সুযোগ দিল না সৈনিকগণ। ঝিন্দারাণীর আদেশে মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্করসিংকে বন্দী অবস্থায় দরবারকক্ষ থেকে নিয়ে গেল কারাগারের দিকে।

.

দুশ্চরিত্র লম্পট রাজা মঙ্গলসিন্ধ রাজচ্যুত এবং বন্দী হওয়ায় প্রজাদের মনে আনন্দ ধরে না। সেই সঙ্গে মন্ত্রী কঙ্করসিং বন্ধী হওয়ায় প্রজারা অত্যন্ত খুশি হয়েছে।

মহারাজ জয়সিন্ধের অকস্মাৎ মৃত্যু প্রজাদের হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল। প্রজাদের মনে আশংকা ছিল মহারাজের মৃত্যুর পর রাজ্যের কি পরিণতি হবে। মঙ্গলসিন্ধ রাজা হলে তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠবে, এটা তারা মনে প্রাণে উপলব্ধি করত।

মহাপ্রাণ রাজার মৃত্যুর পর মঙ্গলসিন্ধ যখন রাজা হলো, এবং তার অসৎচরিত্র বন্ধুবর কঙ্করসিংকে যখন মন্ত্রী করা হলো তখনই প্রজাদের মুখ কাল হয়ে উঠল, চোখে সবাই অন্ধকার দেখতে লাগল। এবার তার অবস্থা যে কি দাঁড়াবে তাই চিন্তা করতে লাগল সবাই।

প্রজাগণ যা ভেবেছিল তাই সত্য হলো। মঙ্গলসিন্ধ রাজা হওয়ার পর রাজ্যময় শুরু হলো এক অশান্তির জ্বালাময় পরিস্থিতি। প্রজাদের ধরে এনে অযথা নির্যাতন শুরু হলো। কাউকে কারাগারে বন্দী করা হলো, কাউকে দাসরূপে ব্যবহার করতে লাগল, কারও স্ত্রী-কন্যা মঙ্গলসিন্ধ আর কঙ্করসিংয়ের দৃষ্টিপথে পতিত হলে তার নিস্তার নেই, বাগানবাড়িতে তাকে চাই-ই-চাই।

মহারাজ জয়সিন্ধ থাকাকালীন কুমার মঙ্গলসিন্ধ প্রজাদের ওপর অত্যচার উৎপীড়ন করলেও তাকে করতে হত গোপনে। অনেক সময় এজন্য পিতার নিকট কুমারকে কঠিন শাস্তিও পেতে হত। কাজেই প্রজাদের ওপর নির্যাতন করে তার তৃপ্তি হত না।

সে কারণেই কঙ্করসিংয়ের পরামর্শে মঙ্গলসিন্ধ পিতাকে হত্যা করেছিল এবং নিজে রাজসিংহাসনে উপবেশন করে প্রজাদের প্রতি স্থলে। মুনিবা ঝিন্দের বন্যায়বিচারে বিনা করতের কোন অঙ্গ চালাচ্ছিল নির্মম অত্যাচার। বিনা দোষে বহু নিরীহ প্রজা মঙ্গলসিন্ধের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে লাগল। কাউকে স্ত্রী-কন্যা সঁপে দিয়ে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে ফিরে যেতে হয়েছে, কেউ বা কলংকের কালিমা মুছে ফেলার জন্য ঝিন্দ নদীতে আত্মবিসর্জন দিয়েছে।

রাজা মঙ্গলসিন্ধ আর মন্ত্রী কঙ্করসিংয়ের অত্যাচারে দেশবাসী যখন অতিষ্ঠ ঠিক সেই মুহূর্তে ঝিন্দের সিংহাসনে ঝিন্দের রাণী হিসেবে অধিষ্ঠিত হলো মনিরা।

মনিরা ঝিন্দের রাণী হয়ে বিনয় সেনের পরামর্শমত রাজ্য চালনা করতে লাগল। রাণীর ন্যায়বিচারে ঝিন্দবাসীর মনে আনন্দ আর ধরে না। সবাই মনেপ্রাণে ঝিরাণীর মঙ্গল কামনা করতে লাগল।

বিনয় সেনের সহযোগিতায় রাজ্য চালনায় মনিরার কোন অসুবিধা হলো না।

এখানে মনিরা যখন ঝিন্দের রাণী তখন শূন্য বজরায় সুফিয়া একা একা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। আজকাল বিনয় সেনও সব সময় বজরায় আসে না। তবু সুফিয়ার মনে সদা ভয়, না জানি আবার কখন কোন বিপদ এসে পড়বে।

বিনয় সেন একদিন বজরায় ফিরে এলে বলল সুফিয়া–ভাইজান মনিরার কোন সন্ধান পেলেন?

আজ বিনয় সেনের চেহারায় একটা আনন্দ ভাব ফুটে উঠেছে। শুধু ঝিন্দের রাজসিংহাসনে ঝিন্দের রাণী হিসেবে মনিরাই প্রতিষ্ঠিতা নয়, দুষ্ট রাজা মঙ্গলসিন্ধ ও শয়তান মন্ত্রী কঙ্কর সিং বন্দী। বিনয় সেন এখন ঝিন্দের কাজ অনেকটা গুছিয়ে এনেছে। এখন বাকী ঝিন্দ সিংহাসনে উপযুক্ত রাজা, সে কাজও প্রায় ঠিক করে ফেলেছে বিনয় সেন, এখন শুধু বিজয়সিন্ধকে এনে ঝিন্দের রাজা হিসেবে অভিষেক করা। সুফিয়ার কথায় বলল সে মনিরার সন্ধান আমি পেয়েছি বোন, সে এখন ঝিন্দের রাণী।

বলছেন কি ভইজান, এ কথা সত্য।

হাঁ, সত্য।

তাহলে কি রাজা মঙ্গলসিন্ধ তাকে–

না, বিয়ে করে রাণী নয়, মনিরা মঙ্গলসিন্ধ ও তার দুষ্ট মন্ত্রী কঙ্করসিংকে বন্দী করে রাণী হয়েছে।

সত্যি?

হাঁ সত্যি!

কি যে আনন্দ হচ্ছে আমার! আচ্ছা ভাইজান, তাহলে মনিরাকে আমি আর কোনদিন দেখতে পাব না?

পাবে সুফিয়া। সে কান্দাই শহরের মেয়ে, ঝিন্দে সে চিরদিন থাকতে পারবে না, কাজেই সে আবার তোমার সঙ্গে মিলিত হবে এবং কান্দাই শহরে ফিরে যাবে।

তাহলে ঝিন্দের রাজসিংহাসনের অবস্থা কি হবে?

ঝিল রাজ্যের ন্যায্য অধিকারী ব্যক্তিই রাজা হবেন এবং অচিরেই হবেন।

মনিরার ফিরে আসার কথা শুনে সুফিয়ার মনে অনাবিল একটা আনন্দস্রোত বয়ে চলল।

বিনয় সেন বুঝতে পারল, সুফিয়া মনিরার আগমন আশায় খুশিতে আত্মহারা হয়েছে। আর কতদিন বেচারী এমন একা একা নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে পারে।

.

ঝিন্দের রাণীর ন্যায়বিচারে একদিন পিতৃহন্তা রাজকুমারের ফাসি হয়ে গেল। আর কঙ্কর সিংয়ের হলো দ্বীপান্তর। বহুদূরে নীল সাগরের ওপারে তাকে রেখে আসা হলো।

এবার বিনয় সেন ঝিন্দ রাজ্যের উপযুক্ত লোক বিজয়সিন্ধকে ঝিন্দ রাজসিংহাসনে বসল। অভিষেক করল বিনয় সেন নিজে।

ঝি রাজ্যের প্রজাগণ পূর্ব হতেই বিজয় সিন্ধকে জানত। তার ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ ছিল। বিজয়সিন্ধ ঝিন্দের রাজসিংহাসনে আরোহণ করায় ঝিন্দ রাণীর মনে আনন্দের উৎসব বয়ে চলল। সবাই খুশিতে মাতোয়ারা হয়ে উৎসবে মেতে উঠল। ঝিন্দ নগরী আলোয় আলোময় হয়ে উঠল।

বিজয়সিন্ধ ঝিন্দের বাজার হলো। এবার ঝিরাণী মনিরা প্রজাদের কাছে বিদায় নিয়ে বিনয় সেনের সঙ্গে ফিরে এলো তার বজরায়।

ঝিন্দারাণীকে বিদায় দিতে ঝিন্দবাসীদের চক্ষু অশ্রুসজল হলো। দু'মাস ঝিল রাজসিংহাসনে উপবেশন করেছিল মনিরা ঝিরাণী হিসেবে। এ দু'মাস প্রজাদের সুখের অন্ত ছিল না। আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল প্রজাগণ। বিনয় সেনের সহযোগিতায় 'মনিরা প্রজাদের ওপর ন্যায়বিচার করেছে। যাতে প্রজাদের মঙ্গল হয় সে কাজ করেছে, তাই মনিরাকে বিদায় দিতে ঝিন্দাবাসীর মনে দুঃখের ছোয়া লাগল।

কিন্তু বিজয়সিন্ধকে রাজা হিসেবে পেয়ে আবার তাদের মুখে হাসি ফুটে উঠল। ঝিল রাজ্যের উপযুক্ত রাজা হলো বিজয়সিন্ধ। সৌম্য সুন্দর দীপ্তকান্তি যুবক বিজয়সিন্ধ এখন ঝিন্দের রাজা। বিনয় সেনের পরামর্শেই পুনরায় বৃদ্ধমন্ত্রীকে তার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হলো। আবার শান্তি ফিরে এলো ঝি রাজ্যের বুকে।

বিনয় সেন এবার বিদায় চাইল।

বিজয়সিন্ধ তাকে আলিঙ্গন করে বলল—আপনি শুধু ঝিন্দ রাজকর্মচারীই ছিলেন না, আপনি একজন ঝিন্দ রাজ্যের মঙ্গলকামী ব্যক্তি ছিলেন। আপনাকে বিদায় দিতে আমার বুকের পাঁজর চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। বন্ধু, আপনি মানুষ নন– দেবতা।

বিজয়সিন্ধের কাছে বিদায় নিতে বিনয় সেনের চোখ দুটোও শুষ্ক ছিল। একটা মায়ার আবেষ্টনী অক্টোপাশের মত তাকে যেন আকর্ষণ করছিল।

চলে যাবার সময় বিনয় সেন একটা চিঠি বিজয়সিন্ধের হাতে দিয়ে বলল– আজ থেকে দশ দিন পর এ চিঠির খাম ছিড়ে আপনি পড়বেন, সাবধান তার পূর্বে নয়।

চিত্রাপিতের ন্যায় বিজয়সিন্ধ বিনয় সেনের দেওয়া খামে ভরা চিঠিখানা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিনয় সেন বিদায় নিয়ে চলে গেল রাজ–অন্তপুর থেকে।

বিজয়সিন্ধ কিছুতেই বিনয় সেনের কথা অমান্য করতে সাহসী হলো না। চিঠিখানা অতি যত্নসহকারে রেখে দিল শেফের মধ্যে। দশ দিন পর সে দেখবে কি লেখা আছে ওর মধ্যে।

.

নূরী তার শিশু মনিকে নিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক অনুচরসহ ঝিন্দের দিকে রওনা দিল। সঙ্গে নিল প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ। দস্যুকন্যা নূরীর বুকে অপরিসীম দুঃসাহস। সে নিজেও পুরুষের বেশে সজ্জিত হয়ে একখানা রাইফেল পিঠে ঝুলিয়ে রাখল।

নিখুঁতভাবে নিজেকে পুরুষের বেশে সজ্জিত করেছিল নূরী। তাকে দেখলে কেউ নারী বলে চিনতে পারবে না। যতক্ষণ না সে কথা বলে।

নূরীর মনোভার কেউ তাদের ওপর হামলা চালালে ওদের সে কিছুতেই ক্ষমা করবে না।

কান্দাই নদীর বুক চিরে তরতর করে এগিয়ে চলেছে নূরীর শ্যামাদ বজরা। অতিদ্রুতগামী এবং অতি মজবুত বজরা এই শ্যামচাঁদ। দু'জন মাঝি আর একজন দাড়ি বজরায় ছিল–আর ছিল দস্যু বনহুরের কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর। কায়েসও আছে এদের মধ্যে।

নূরী স্বয়ং বজরায় সবাইকে পরিচালনা করছিল। পথের নির্দেশ দিচ্ছিল কায়েস।

দিনরাত অবিরাম গতিতে শ্যামচাঁদ বজরা এগিয়ে চলেছে। বনহুরের সঙ্গে মিলনের আশায় নূরীর হৃদয়ে উত্তাল তরঙ্গের মত আনন্দের উৎস বয়ে চলেছে। ঝিন্দ শহরে বনহুর কি করছে,কেন সে এতদিন ফিরে এলো না, এটাই নূরীর একমাত্র চিন্তা।

নির্জন নদীবক্ষে নূরী মনিসহ বজরার ছাদে বসে থাকে। গভীর নীল সচ্ছ জলের বুকে দাঁড়ের ঝুপঝাপ শব্দের তালে তালে মনি অস্ফুট শব্দ করে কথা বলে। সুর করে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গান গায়, নূরীও যোগ দেয় তার গানের সুরে।

হাসে কায়েস আর অন্যান্য অনুচর। সকলের মনেই অফুরন্ত উচ্ছ্বাস আর উন্মাদনা।

কখনও বা মনিকে কোলে করে বজরার ডেকে এসে দ আংগুল বাড়িয়ে দেখায় আকাশে উড়ে চলা শুভ্র বলাকাগুলো।

মনির সামনের মাত্র ক'টা দাঁত উঠেছে। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁতগুলো বের করে ফিক ফিক করে হাসে মনি।

নূরীও হাসে।

•

ঝিন্দরাজ্য ছেড়ে যেতে কেন যেন আমার মনে ব্যথা জাগছে সুফিয়া। বজরার ডেকে দাঁড়িয়ে বলল মনিরা।

সুফিয়া দূরে অনেক দূরে ছেড়ে আসা ঝিন্দ শহরের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে- ঝিন্দের রাণী তুমি, ঝিল ছেড়ে যেতে তোমার ব্যথা না লাগবে তো লাগবে কার? আমার কিন্তু খুব আনন্দ হচ্ছে।

মনিরা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল–তোমার আনন্দ হবারই কথা,কারণ তুমি ফিরে আব্বা-আম্মা ভাই-বোনদের সঙ্গে মিলিত হবে, আর আমি–নিঃসঙ্গ একা–চাপাকান্নায় মনিরার কণ্ঠ ধরে এলো।

সুফিয়া আর মনিরার পেছনে কখন যে বিনয় সেন এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি কেউ। মনিরা ফিরে তাকাতেই বিনয় সেন সরে গেল সেখান থেকে। মনিরা বুঝতে পারল তার কথাটা বিনয় সেনের মনে ব্যথা দিয়েছে। বিনয় সেনের চোখ দুটো যে অশ্রু ছলছল হয়ে উঠেছিল এটা লক্ষ্য করেছিল সে।

বজরার ডেকে দাঁড়িয়ে সুফিয়া আর মনিরার মধ্যে অনেক কথা হলো।

মনিরার মনে সর্বহারার বেদনা আর সুফিয়ার হৃদয়ে আপন জনের সঙ্গে মিলন আশার উদ্দীপনা।

দু'দিন দু'রাত অবিরাম চলার পর বিনয় সেনের বজরা এবার মধুমতি নদী বেয়ে–এগুচ্ছে। নদীর মধ্যে সবচেয়ে বড় নদী এই মধুমতি।

মধুমতি গভীর এবং প্রশস্ত নদী হলেও বেশ শান্ত। কাজেই নিশ্চিন্ত মনে বজরাখানা এগিয়ে চলেছে।

রাত গভীর। বজরায় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মনিরার। পাশে অঘোরে ঘুমাচ্ছে সুফিয়া। নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাচ্ছে। আর কদিন পর পিতামাতার সঙ্গে মিলিত হবে সে।

আর মনিরা চির অসহায় অভাগিনী। অহরহ মনের মধ্যে তার তুষের আগুন জ্বলছে। আহার-নিদ্রা একরকম তার নেই বললেই চলে। খেতে বসলে সবাইকে

দেখায় সে খাচ্ছে, কিন্তু আসলে সে কিছুই খেতে পারে না বা খায় না। বিছানায় শুয়ে, চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে, কিন্তু ঘুমায় না ঘুমাতে পারে না।

সুফিয়া জানে মনিরা ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু ঘুম আসে না। মিছামিছি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে বিছানায়। আজও তেমনই শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল কত কি ভাবছিল সে, কখন, যে একটু তন্দ্রামত এসেছিল খেয়াল নেই তার। হঠাৎ জেগে উঠল মনিরা, শুনতে পেল সে একটা অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর। পাশের ক্যাবিনে কে যেন কাউকে বলছে–চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমাদের বজরা চালাবে, বুঝেছ?

বুঝেছি সর্দার।

আচ্ছা, তুমি যাও, বজরার ছাদে দাঁড়িয়ে চোখে দূরবীক্ষণ লাগিয়ে দূরে লক্ষ্য রাখবে–

মনিরা কিছুতেই নিজকে শয্যায় ধরে রাখতে পারল না। বিদ্যুৎ গতিতে শয্যা ত্যাগ করে ক্যাবিনের বাইরে বেরিয়ে এলো, এ যে তার অতি কমানার অতি সাধারণ জনের গলার আওয়াজ–তবে, তবে কি সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু কই না তো, ঐ তো, সেই কণ্ঠ যা তার মনের কন্দরে করে গাঁথা হয়ে রয়েছে। কোনদিন সে এই গলার স্বর বিস্মৃত হবে না–হতে পারে না।

বিনয় সেনের ক্যাবিন থেকে পুনরায় ভেসে এলো পূর্বের সেই আওয়াজ তুমি এবার যেতে পার।

মনিরা সঙ্গে সঙ্গে নিজের ক্যাবিনের দরজার আড়ালে আত্মগোপন করল, কিন্তু দৃষ্টি তার বাইরে অন্ধকারে নিবদ্ধ রইল। দেখল মনিরা, এক লোক অন্ধকারে বিনয় সেনের ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে বজরার ছাদের দিকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল।

লোকটা বজরার ছাদে অদৃশ্য হতেই মনিরা বেরিয়ে এলো ক্যাবিনের বাইরে। আসার সময় একবার বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখে নিল মনিরা, অঘোরে ঘুমাচ্ছে সুফিয়া। মনিরা অতি লঘু পদক্ষেপে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বিনয় সেনের ক্যাবিনের দরজায় এসে দাঁড়াল। এই মুহূর্তে লোকটা বেরিয়ে যাওয়ায় দরজা কিঞ্চিৎ ফাঁক ছিল, মনিরা আলগোছে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি ফেলল কক্ষের মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে মনিরার হৃদয়ে একটা অনাবিল আনন্দের

শিহরণ বয়ে গেলো, বিস্ময়ে পুলকে স্তব্ধ হয়ে গেল সে। বিনয় সেনের শয্যা তার কামনার, চির সাধারন রত্নতার স্বামী–দস্যু বনহুর! কোথায় সে বাবড়ি চুল, মুখে ছাটকরা দাড়ি। একজোড়া গোঁফ, বড় আঁচল, কোথায় সে বিনয় সেন!

মনিরা ভুলে গেল সব কথা, ভুলে গেল সে নিজেকে, ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বামীর বুকে। কোন কথা তার মুখ দিয়ে বের হলো না।

বনহুর গভীর রাতে বিনয় সেনের রাজকীয় ড্রেস পরিবর্তন করে সবেমাত্র নিজের ক্যাবিনে এসে বিশ্রামের আয়োজন করছিল, এমন সময় অতর্কিতে মনিরাকে তার ক্যাবিনে প্রবেশ করতে দেখে চমকে উঠল। বুঝতে পারল আজ মনিরার নিকটে সব ফাঁস হয়ে গেছে। বনহুর মনিরাকে নিবিড় করে টেনে নিল বুকে, কিন্তু তারও কণ্ঠ দিয়ে কোন শব্দ বের হলো না। গভীর আবেগে মনিরার পিঠে, মাথায় হাত বুলিয়ে চলল সে। মুখটা নেমে এলো ওর চুলের ওপর।

মনিরার দু'চোখে বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতের মত অশ্রুধারা নেমে এলো। স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে আকুলভাবে কাঁদতে লাগল মনিরা। এই দেড়টি বহরের ঘাত-প্রতিঘাতের জমান বেদনা অঝোরে ঝরে পড়তে লাগল তার দু'নয়নে।

ফুলে ফুলে কাঁদছে মনিরা।

বনহুর নীরব। শুধু চিবুকটা বারবার ঘষছে মনিরার চুলে। বনহুরের চোখেও অশ্রু, ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ছে মনিরার মাথার ওপর।

মনিরা ইচ্ছামত কাঁদল, বনহুর একটু বাধাও দিল না, কারণ জানে সে এখন ওকে বাধা দেয়া ঠিক হবে না। বুকের মধ্যে ওর জমে রয়েছে ব্যথার পাহাড় কাঁদুক, কেঁদে কেঁদে ওর মনটা যদি একটু হাল্কা হয়!

অনেকক্ষণ কাঁদল মনিরা, তারপর এক সময় শান্ত হয়ে এলো।

বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে ডাকল মনিরা। বল তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ?

হঠাৎ আগ্নেগিরির মত জ্বলে উঠল মনিরা, ক্রুদ্ধ বাষ্পভরা কণ্ঠে বললএত ছিল তোমার মনে! ছেড়ে দাও আমাকে যেতে দাও এবার–

বনহুর ওকে আরও এঁটে ধরল, আবেগ মধুর কণ্ঠে বলল–মনিরা আমি নরাধম পাপী–আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারবে না জানি তবু মনিরা তোমার–

না না, আমি কিছুতেই আমার এ মুখ তোমাকে দেখাব না। আমাকে তুমি ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

কেন মনিরা?

আমি অসতী ব্যভিচারিণী–

বনহুর মনিরার মুখে হাতচাপা দিল—আমাকে তুমি মাফ করে দাও মনিরা। মাফ করে দাও–

মনিরার হৃদয়ে আজ ক্ষুব্ধ অভিমান মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। কিছুতেই সে নিজেকে প্রকৃতিস্থ রাখতে পারছে না। কেন তার স্বামী তাকে এমনভাবে নির্মম ব্যথা দিয়েছে। কেন সেদিন তাকে কিছু বলার সুযোগ পর্যন্ত দেয়নি। কেন সে দিনের পর দিন আর তার সন্ধান নেয়নি। কেন সে বিচার করে দেখেনি সত্যি মনিরা অসতী-ব্যভিচারিণী কিনা। তারপর যদিও এতদিন পর তাকে খুঁজে পেয়ে পাপপুরী থেকে উদ্ধার করে আনল তবু কেন সে এতদিনও তার কাছে আত্মগোপন করে রয়েছে। সব ব্যথা আর দুঃখ আজ মনিরার হৃদয়ে আঘাতের পর আঘাত করে চলল। তাই সে ক্ষুব্ধ অভিমানে নিজেকে স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে ছাড়িয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু মনিরা দস্যু বনহুরের বাহু দুটিকে এতটুকু শিথিল করতে সক্ষম হলো না। বনহুর বললো–মনিরা, বিনা কারণে আমি তোমার প্রতি অন্যায় করেছি। ভুল করেছি মনিরা, আমি ভুল করেছি–বনহুর নতজানু হয়ে মনিরার পায়ের কাছে বসে পড়ল।

অদ্ভুত এ দৃশ্য!

যে দস্যুর ভয়ে সমস্ত দেশবাসীর মনে আতঙ্কের সীমা নেই, যে দস্যুর জন্য গোটা পৃথিবীর পুলিশবাহিনী তটস্থ, যে দস্যু সব দস্যুর চেয়ে শক্তিমান, সেই দম্রাট আজ, আজ একটা নারীর পদতলে উপবিষ্ট।

মনিরার পদপ্রান্তে যখন দস্যু বনহুর নতজানু হয়ে মাফ চাইছিল ঠিক তখন পাশের একটা ছোট জানালায় দাঁড়িয়ে সব দেখছিল সুফিয়া। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল সে–একি দেখছে! বিনয় সেনের স্থানে কে ঐ অপূর্ব সুন্দর যুবক। আর মনিরাই বা এ ক্যাবিনে কেন! কি ওদের পরিচয় আর কেনই বা যুবক মনিরার চরণতলে উপবিষ্ট। সুফিয়ার দু'চোখে রাজ্যের প্রশ্ন।

মনিরা স্বামীকে তাড়াতাড়ি তুলে নিল হাত ধরে। যত রাগ অভিমান মুছে গেল নিমিষে। করুণ ব্যথাভরা কণ্ঠে বলল-একি করছ। তুমি আমার স্বামী, কেন তুমি আমাকে অপরাধী করছ।

মনিরার কথায় আড়ালে দাঁড়িয়ে চমকে উঠল সুফিয়া। বিস্ময়ের ওপর বিস্ময় জাগল তার মনে স্বামী, মনিরার স্বামী এই যুবক? তবে কি বিনয় সেন রূপে অন্য কেউ যার পরিচয় সে এখনও জানে না। সুফিয়ার হৃদয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগতে লাগল।

সুফিয়া পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো ক্যাবিনের মধ্যে। এবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারল না, অপূর্ব স্বর্গীয় সে দৃশ্য–যুবকের বাহু বন্ধনে মনিরা, যুবকের ঠোঁট দু'খানা মনিরার মুখের ওপর ঝুকে পড়েছে।

এমন সময় বজরার সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল। সুফিয়া আর দাঁড়াল হঠাৎ যদি কেউ দেখে ফেলে তখন কি হবে। সুফিয়া এবার নিজের ক্যাবিনে ফিরে এলো। শয্যা গ্রহণ করলো বটে, কিন্তু মনের অস্থিরতা কমলো না। কে এই যুবক যে এতদিন বিনয় সেনের রূপ ধরে তাদের মধ্যে রয়েছে। এভাবে তার আত্মগোপন করার অর্থই বা কি? একসঙ্গে নানা প্রশ্ন ধাক্কা দিয়ে চলল সুফিয়ার মনে।

রাত বেড়ে আসছে।

এতক্ষণও মনিরা ফিরে আসছে না, অস্বস্তি বোধ করে সুফিয়া—ভয় হয় হঠাৎ যদি বজরার কেউ ওদের এই মেলামেশা দেখে ফেলে। ছিঃ ছিঃ কি কেলেঙ্কারিটাই না হবে। মনিরার প্রতিও ঘৃণায় মন বিষিয়ে উঠল সুফিয়ার। লুকিয়ে লুকিয়ে কবে সে ছদ্মবেশী বিনয় সেনকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছিল। ভেতরে ভেতরে মেয়েটা নষ্ট চরিত্রা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ সুফিয়ার নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে উঠল ঘৃণায়।

এমন সময় মনিরা অতি সন্তর্পণে ক্যাবিনে প্রবেশ করল। সুফিয়া ঘুমিয়ে আছে মনে করে নিজে ওর পাশে শুয়ে চাদরটা টেনে নিল গায়ে। মনে তার অফুরন্ত আনন্দ, কতদিন পর আজ–সে স্বামীকে ফিরে পেয়েছে। এখন মনিরার মত সুখী কে! শত ব্যথা-কষ্ট নিমিষে মুছে গেছে, অনাবিল আনন্দস্রোতে ভেসে গেছে তার হৃদয়ের যত ব্যথা আর দুঃখ।

মনিরা শয্যা গ্রহণ করতেই সুফিয়া বিছানায় উঠে বসল, গম্ভীর তীব্রকণ্ঠে বলল–কোথায় গিয়েছিলে মনিরা?

মনিরা সুফিয়ার কথায় চমকে উঠল, তাহলে কি সুফিয়া সব জানতে পেরেছে! হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না সে, নীরব রইলো

সুফিয়া পুনরায় বলল–মনিরা, আমি সব জানি মিছামিছি কিছু গোপন করতে চেষ্টা করনা।

মনিরাও এবার শরীর থেকে চাদর সরিয়ে উঠে বসলো, ক্যাবিনের নীলাভ আলোতে তাকালো সুফিয়ার মুখের দিকে। দেখল ঘৃণায় সুফিয়া কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

মনিরার মুখে ফুটে উঠল একটা হাসির রেখা। দীপ্ত উজ্জ্বল তার মুখমণ্ডল। তখনও মনিরার শরীরে শিহরণ জাগাচ্ছে তার স্বামীর স্বর্গীয় পরশ। বুকের মধ্যে তখনও আনন্দের ছোঁয়া দোলা জাগাচ্ছে, সত্যই মনিরা আজ ধন্য! বলবে–সত্য কথাই বলবে, এতে আপত্তির কিছু নেই। মনিরা বলতে শুরু করল সুফিয়া, জানি তুমি এখন যা শুনেছ বা দেখেছ তাতে আমার ওপর তোমার ঘৃণা জন্মাবার কথাই। যে কেউ এটা দেখলে আমাকে এ ভাবে প্রশ্ন করত। তাই তোমার এ সন্দেহ অহেতুক নয়।

সুফিয়ার মুখ তখনও গম্ভীর থমথমে। মনিরাকে সুফিয়া অনেক বিশ্বাস করে, ভালবাসে। সে ভাবতেও পারে না মনিরা নষ্ট চরিত্রা মেয়ে। তাই সে এমন একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে, যা তার মনকে বিষাক্ত করে তুলছিল।

মনিরা বলে চলল–সুফিয়া, তোমাকে আমি আমার জীবন কাহিনী সব বললেও একটা কথা এখনও বলিনি, আমি বিবাহিতা–আমি সন্তানের জননী–

সুফিয়া অস্ফুট শব্দ করে উঠল—সত্যি!

হাঁ সুফিয়া। শোন, আজ তোমাকে আমার সব গোপন কথা খুলে বলব, বলার পূর্বে তোমার মনের ভুল আমি ভেঙ্গে দিচ্ছি। যিনি তোমার আমার উদ্ধারকারী বিনয় সেন, তিনিই আমার স্বামী।

তোমার বিবাহিত স্বামী?

হাঁ সুফিয়া, আমার স্বামী।

তোমার স্বামীর এ ছদ্মবেশের কারণ কি মনিরা? তিনি বিনয় সেনের বেশে চেহারা এবং কণ্ঠস্বর পাল্টিয়ে আমাদের কেন এভাবে ছলনা করে চলেছিলেন?

সুফিয়া, তার বুদ্ধির শেষ নেই, বলছি সব শোন। ছদ্মবেশে না থাকলে তিনি আজ ঝিন্দের ভাগ্যাকাশে নতুন সূর্যের আবির্ভাব ঘটাতে পারতেন না। তুমি তো জান, ঝিন্দবাসী কিভাবে রাজা মঙ্গলসিন্ধের নিষ্ঠুর, নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হয়ে চলেছিল। আমার স্বামীর প্রাণে ঝিন্দবাসীদের এই করুণ পরিণতি দারুণ ব্যথা জাগিয়েছিল,তাই তিনি নিজেকে গোপন রেখে দেশ ও দশের জন্য কঠিন ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে তবেই আজ জয়ী হতে পেরেছেন। আমার কাছেও তিনি নিজেকে প্রকাশ করেননি, জানতেন আমি তার কাজে বাধার সৃষ্টি করে বসব। সুফিয়া, কত কষ্টই না এতদিন ভোগ করেছেন তিনি। আমি এতটুকু সহায়তা তাকে করতে পারিনি বা করিনি–

মনিরা সব খুলে বলল, যদিও সে পূর্বে তার জীবন কাহিনী সুফিয়ার কাছে বলেছিল, কিন্তু সে স্বামী এবং সন্তান সম্বন্ধে সব গোপন করে গেছে। আজ একটা কথা ছাড়া সব কথাই বলল সুফিয়ার কাছে। তার স্বামীর আসল পরিচয় আজও মনিরা গোপন করে গেল।

মনিরার সব কথা শুনে সুফিয়া হেসে বলল–ভাগ্যবতী নারী তুমি মনিরা! তোমার মত স্বামীরত্ন পাওয়া কত বড় সৌভাগ্যের কথা, আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারছি না।

দু'বান্ধবী মিলে অনেকক্ষণ ধরে গল্প হলো, তারপর একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ল মনিরা আর সুফিয়া।

পাশের ক্যাবিনে ঘুমিয়ে পড়েছে দস্যু বনহুর। বিনয় সেনের অন্তর্ধান হয়েছে। মনিরার নিকটে আত্মগোপন করার জন্যই সে এই বেশে বজরায় অবস্থান করত।

আজ অনাবিল এক আনন্দে বনহুরের হৃদয় পরিপূর্ণ। বহুদিন পর আজও সে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

.

দূরবীক্ষণ চোখে লাগিয়ে বজরার ছাদে দাঁড়িয়ে দূরে লক্ষ্য করছে দস্যু দুহিতা নূরী। পাশে দাঁড়িয়ে দস্যু বনহুরের অনুচর কায়েস।

বজরার মধ্যে অঘোরে ঘুমাচ্ছে শিশুমনি।

অন্যান্য অনুচর সজাগভাবে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে নূরীর শরীরে পুরুষের ড্রেস। পিঠের সঙ্গে গুলিভরা রাইফেল ঝুলছে।

বজরাখানা মাঝনদী দিয়ে এগুচ্ছিল। শান্ত নদীর বুকে একটা জীবন্ত জীবের মত ঝুপঝুপ শব্দ করে চলেছে বজরাখানা।

হঠাৎ নূরী বলে উঠল–কায়েস, দেখ মনে হচ্ছে একটা বজরা এদিকে এগিয়ে আসছে।

কায়েস বলে ওঠে বজরা–

হাঁ, কায়েস, বজরা বলেই মনে হচ্ছে। নূরী চোখে দূরবীক্ষণ লাগিয়ে দূরে লক্ষ্য করে কথাটা বলল।

নূরীর হাত থেকে কায়েস দূরবীক্ষণ নিয়ে দেখল সত্যি একখানা বজরা এগিয়ে আসছে এদিকেই। কায়েস বলল–আমার মনে হচ্ছে কোন যাত্রীবাহী বজরা।

নূরী চাপাকণ্ঠে বলে উঠল—আমারও তাই মনে হচ্ছে কায়েস। তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও আমরা এই বজরায় হানা দেব। নূরীর দু'চোখে খেলে গেল বিদ্যুতের চমকানি।

কায়েস নূরীর কথায় খুশি হল–এটাই তো কাজ। সর্দার না থাকায় আজকাল বনহুরের অনুচরগণ বেশ ঝিমিয়ে পড়েছে, কেমন যেন একটা শিথিলতা দেখা দিয়েছে তাদের মধ্যে। সর্দারের অবর্তমানে অনুচরগণ হাঁপিয়ে উঠেছিল, আজ

নূরীর কথায় আনন্দে নেচে উঠল কায়েসের মন। দস্যুবৃত্তিভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠল ধমনীর রক্তে।

নূরীর আদেশে কায়েস তার দলবলকে সম্মুখস্থ বজরায় হানা দেবার জন্য প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে অনুচরগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল! নূরী নজেও রাইফেল বাগিয়ে বজরার সম্মুখে এসে মাঝিদের নির্দেশ দিতে লাগল।

অতি সন্তর্পণে মাঝিরা দাঁড় চালিয়ে এগুতে লাগল। সম্মুখস্থ বজরার সবাই যে দ্রিামগ্ন এটা বেশ বুঝতে পারল তারা। কারণ, বিপরীত বজরার গতি অতি মন্থর ছিল। মাত্র দু'তিনজন দাড় টেনে এগুচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

নূরীর বজরার দস্যুগণ প্রবল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে প্রবল বজরাখানা নিকটবর্তী হলেই তারা আক্রমণ চালাবে।

নূরীর জীবনের একটি অদ্ভুত কাহিনী আছে। নূরী তখন সবে আট ন' বছরের ছোট বালিকা। পরনে ঘাগড়া, পায়ে মল, হাতে বালা, গলায় ফুলের মালা, ছোট্ট কাঁকড়ান একরাশ চুল। একদিন নূরী তীর-ধনু নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বনহুর তখন পনের-ষোল বছরের কিশোর বালক, সেও নূরীর পাশে ছিল। হঠাৎ তারা গভীর বনের মধ্যে এসে পড়ল, এমন সময় একটা চিতাবাঘ আক্রমণ করল তাদের দুজনকে। বাঘটা আচমকা বনহুরকেই আক্রমণ করে বসল। বনহুর যদিও হঠাৎ এমনভাবে চিতাবাঘের কবলে পড়বে বলে আশা করেনি, তবু নিজে তীর ধনু নিয়ে বাধা দিতে গেল কিন্তু ব্যর্থ হলো সে, পড়ে গেল মাটিতে। কিশোর বালক বনহুর একটা চিতাবাঘের সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল, নূরী এই বিপদমুহূর্তে হতভম্ব হলো না, সে নিজের তীর দিয়ে বিদ্ধ করল চিতাবাঘকে। সঙ্গে সঙ্গে চিতাবাঘটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কিছুক্ষণ ছট ফট করে মরে গেল বাঘটা। কারণ তীর-ধনুতে ছিল বিষ মাখান।

নূরীর জন্যই সেদিন প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল বনহুর।

তা ছাড়াও নূরীর জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে যা তাকে করে তুলছে দুর্দান্ত-দুঃসাহসী।

আজ নূরীর ধমনীতে দস্যুরক্ত উষ্ণ হয়ে উঠেছে। সমস্ত দস্যু অনুচরদের নিয়ে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে নূরী। সম্মুখস্থ বজরাখানা মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছে।

নূরী আর একবার বজরার মধ্যে প্রবেশ করে ঘুমন্ত মনির মুখে চুমু দিয়ে দাসীকে বলল–খুব সাবধানে ওকে রাখবে। যতক্ষণ আমি বজরায় ফিরে না আসি, ততক্ষণ তুমি মনিকে নিয়ে বাইরে যাবে না। কথাগুলো বলে বেরিয়ে গেল নূরী।

ততক্ষণে ঐ বজরাখানা অনেকটা এগিয়ে এসেছে।

আকাশে চাঁদ না থাকলেও অন্ধকার খুব জমাট ছিল না। বজরাখানা স্পষ্টভাবে দেখা না গেলেও বেশ বুঝা যাচ্ছিল।

নূরী আর তার দলবল অস্ত্র নিয়ে বজরায় পেছন দিকে লুকিয়ে রইল।

নূরীর ইঙ্গিতে তাদের বজরাখানাও সম্মুখস্থ বজরার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। অতি নিকটে পৌঁছে গেছে।

এবার নূরীর বজরার গতি বেড়ে গেল, দ্রুত এগিয়ে গেল সামনের বজরার দিকে। যেইমাত্র দুটি বজরা পাশাপাশি হয়েছে অমনি নূরী দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বজরাখানার উপরে।

বজরার সবাই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, নূরীর দল মাঝিদের বুকে রাইফেল চেপে ধরতেই তারা চুপ হয়ে পড়ল। বজরার ছাদে ছিল দু'জন, তাদের বুকেও রাইফেল ধরা হলো। কেউ কোন শব্দ করতে পারল না। অনুচরগণ অন্ধকারে ঘুমন্ত লোকজনদের মজবুত করে বেঁধে ফেলল।

নির্জন নিস্তব্ধ নদীবক্ষে দু'খানা বজরার মধ্যে চলেছে একটা অদ্ভুত কার্যকলাপ। নূরীর অনুচরগণ বজরার সবাইকে বেঁধে ফেলল।

নূরীর আদেশে কয়েকজন প্রবেশ করলো সামনের ক্যাবিনে। দেখল দুটি যুবতী, অঘোরে ঘুমাচ্ছে। নূরী নির্দেশ দিল এদের দুজনকে ঘুমন্ত অবস্থায় মুখে রুমাল বেঁধে আমাদের বজরায় উঠিয়ে নাও।

সঙ্গে সঙ্গে নূরীর অনুচরগণ ঘুমন্ত যুবতীদ্বয়ের মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাত পা মজবুত করে বেধে ফেলল, তারপর নিয়ে গেল নিজেদের বজরায়।

অতি অল্প সময়ে এ সব হলো।

যুবতীদ্বয় অন্য কেউ নয়–মনিরা ও সুফিয়া।

এ বজরাখানি দস্যু বনহুরের।

এত কাণ্ড যখন হচ্ছে তখন বনহুর গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

বহুদিন সে এমন নিশ্চিন্তে ঘুমায়নি, আজ তাই আরানে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমের ঘোরে একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখছিল সে–নীল তারাভরা আকাশ, মাঝখানে চাদ হাসছে। একটা সুন্দর বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সে একা। তার শরীরে সাদা ধবধবে মূল্যবান পোশাকে মণি মাণিক্য আর জরির কাজ করা। জ্যোস্নার আলোতে তার দেহের পোশাকগুলো ঝকঝক করছে। মাথায় পাগড়ী, পায়ে জরির বুটিতোলা নাগরা। বাগানের মধ্যে ফুর ফুরে হাওয়া বইছে। নানা রকম ফুলের সুবাস ভেসে আসছে বাতাসে। তার দেহের পোশাক হাওয়ায় উড়ছে, অদ্ভুত সুন্দর লাগছে তাকে।

বনহুর এত সুখেও শান্তি পাচ্ছে না। বড় একা একা লাগছে। চারদিকে তাকাচ্ছে সে কারও অন্বেষণে। না, কোথাও কেউ নেই। বনহুর ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। জ্যোস্নার আলোতে ফুলগুলো দূলে দুলে যেন হাসছে, হাতছানি দিয়ে যেন ডাকছে বনহুরকে। সুন্দর অপূর্ব এ দৃশ্য। বনহুর হঠাৎ দেখল তার অদূরে একটা ক্ষুদ্র নৌকা ভেসে চলেছে চমকে উঠল বনহুর, নৌকায় একটি তরুণী দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথায় কাঁকড়ানো এলো চুল, শরীরে সুন্দর ঝকঝকে শাড়ি। ডাগর ডাগর দুটি চোখ বনহুর ভাল করে তাকাল এ যে তার মনিরা। কোথায় যাচ্ছে মনিরা! বনহুর ছুটে গেল মনিরা হাসছে, নৌকাখানা আপনা-আপনি এগিয়ে এলো তার দিকে। মনিরা হাত বাড়াল বনহুর ওর হাত ধরে উঠে পড়ল নৌকাখানায়।

বনহুর মনিরাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করল।

মনিরা নিজেকে সপে দিল বনহুরের বাহুবন্ধনে। তারাভরা আকাশে আলোর বন্যা। বনহুর আর মনিরা নৌকায় বসে হাসছে, হাওয়ায় দুলছে তাদের

নৌকাখানা। মনিরা নদীর স্বচ্ছ পানি তুলে নিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে বনহুরের চোখে-মুখে।

হাতের পিঠে চোখে-মুখে পানি মুছে ফেলে হাসছে বনহুর। মনিরাকে পেয়ে আনন্দ তার ধরছে না।

বনহুর আর মনিরা যখন মনের খুশিতে দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে দু'জনের আনন্দোচ্ছ্বাস, তখন হঠাৎ একটা কুমীর ভেসে উঠল বনহুর তাকিয়ে দেখল কুমীরটার পিঠে দাঁড়িয়ে নূরী। হাতে তার ভোলা তরবারি। চোখে যেন আগুন ঝরে পড়ছে। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নূরী, তাদের দিকে।

বনহুর কিছু বলতে যাচ্ছে, বুঝাতে চেষ্টা করছে; কিন্তু পারছে না। নূরী তারবারি বাগিয়ে আসছে তাদের দিকে। মনিরা ভয়ে বনহুরকে আঁকড়ে ধরছে।

বনহুরও ওকে ধরে রয়েছে।

নূরী হঠাৎ তার তরবারি দিয়ে আঘাত করল ওদের দুজনকে।

বনহুর হাত দিয়ে ধরে ফেলল নূরীর অস্ত্র। আশ্চর্য, বনহুরের হাত নূরীর অস্ত্রে দ্বিখণ্ডিত হলো না। নূরী তখন ক্রুদ্ধ হয়ে পুনরায় আঘাত করল, এবারও বনহুর নূরীর অস্ত্র থেকে বাঁচিয়ে নিল মনিরাকে।

নূরী যতই আঘাত করছে, বনহুর ততই তার আঘাত নীরবে রোধ করে যাচ্ছে। এবার হাসছে বনহুর, স্বপ্নঘোরেই হাসছে সে।

বনহুর যখন স্বপ্ন দেখছে ঠিক সে মুহূর্তে নূরী দলবল নিয়ে প্রবেশ করল তার ক্যাবিনে।

ক্যাবিনের স্বল্পালোকে দেখল নূরী, একটা লোক শয্যায় শুয়ে আছে, মুখটা তার ওদিকে ফেরান রয়েছে।

নূরী কথা না বলে ইংগিত করল ওকে বেঁধে ফেলতে।

নূরীর সঙ্গে কায়েসও দাঁড়িয়েছে, হাতে গুলিভরা বন্দুক।

কায়েসই প্রথম এগিয়ে এলো শয্যার পাশে। বন্দুকের নলের আগা চেপে ধরল ঘুমন্ত দস্যু বনহুরের পিঠে।

মুহূর্তে ঘুম ভেঙ্গে গেল বনহুরের, ফিরে তাকাল সে।

সঙ্গে সঙ্গে কায়েস বিস্ময়ভরা অস্ফুট শব্দ করে উঠল–সর্দার। কায়েসের হাত থেকে খসে পড়ে গেল বন্দুকটা। ভূয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠল ওর মুখমণ্ডল।

নূরী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অন্যান্য অনুচর ভীত হয়ে দৃষ্টি নত করে দাঁড়িয়ে রইল। সকলেরই ব্রাহি ত্রাহি ভাব।

বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। বনহুরের চোখে মুখেও বিস্ময় ভাব, এগিয়ে গেল নূরীর দিকে। নূরীর শরীরে পুরুষ ড্রেস থাকায় চট করে চিনতে পারল না। নিকটে এসে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে হেসে উঠল হাঃ হাঃ হাঃ করে, তারপর বলল-নূরী তুমি!

নূরীর মুখ দিয়ে চট করে কোন কথা বের হলো না। চিত্রাপিতের ন্যায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বনহুরের মুখ থেকে তখনও মৃদু হাসির রেখামুছে যায়নি। বলল বনহুর–কদিন হলো কাজে নেমেছ?

নূরী একবার নিজের অনুচরদের মুখের প্রতি দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে তাকাল বনহুরের মুখের দিকে, তারপর শান্তকণ্ঠে বলল—হুর, আমি জানতাম না এটা তোমার বজরা।

সাবাস নূরী, দস্যু বনহুরের বজরায় হানা দিয়ে তাকে বন্দী করতে চেয়েছিলে, এটা কম সাহসের পরিচয় নয়।

বনহুর এবার কায়েস ও অন্যান্য অনুচর যারা একটু পূর্বে তাকে বন্দী করার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছিল, তাদের দিকে তাকাল–গম্ভীর কন্ঠে বলল–বেরিয়ে যাও।

মুহূর্তে সবাই কক্ষ ত্যাগ করল।

বনহুর এবার আংগুল দিয়ে নূরীর নাকের নিচ থেকে সরু গোঁফ জোড়া খুলে নিল। তারপর হাত দিয়ে ওর মাথার পাগড়ীটা ঠেলে ফেলে দিল পেছনে। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ কোঁকড়ান চুল ছড়িয়ে পড়ল নূরীর পিঠে।

বনহুর আবার হাসল।

নূরী তাকাল ওর মুখের দিকে লজ্জা, সঙ্কোচ আর দ্বিধাভরা ভাব নিয়ে। কিছু বলতে গেল, ঠোঁট দুখানা কেঁপে উঠল–

বনহুর বলল–কি বলতে চাও?

আমি ভুল করেছি হুর, তুমি আমাকে মাফ করে দাও।

ভুল তুমি করনি নূরী, ঠিকই করেছ। আমার অনুপস্থিতকালে তুমি আমার অনুচরদের মনে খোরাক দিচ্ছ, নাহলে ওরা হাঁপিয়ে পড়বে যে।

তুমি আমার সংগে ঠাট্টা করছ।

মৃদু হেসে বলল বনহুর নূরী, ঠাট্টা আমি করিনি। সত্যই তুমি দস্যু দুহিতা। তোমার সাহস দেখে আমি খুশি হয়েছি নূরী।

হুর, তোমাকে হঠাৎ এভাবে পাব ভাবতেও পারিনি। নূরী বনহুরের জামাটা আঁকড়ে ধরে বুকে মাথা রাখল—হুর, তুমি জান না অমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারি না? কেন তুমি এতদিন ধরে আমাকে ছেড়ে দূরে রয়েছ?

বনহুর নূরীর চিবুকটা ধরে বলল—কত কাজ ছিল আমার, তাইত এত বিলম্ব হলো।

কাজ-কাজ–সব সময়ই তোমার কাজ। ঝিন্দে তোমার কি কাজ ছিল হুর?

সব কান্দাইয়ে ফিরে গিয়ে বলব।

ওরা কে হুর? ওরা?

কাদের কথা বলছ নূরী?

অভিমানভরা কন্ঠে বলল নূরী–ঐ যুবতী দু'জন?

তাহলে তাদের সন্ধান পেয়েছ?

কেন, আমার কাছে গোপন করে রাখতে চেয়েছ বুঝি?

না।

তবে যে ওকথা বলছ?

বলছি তুমি তাদের—

হাঁ, আমি ওদের দু'জনকে বন্দী করেছি।

বন্দী করেছ।

হাঁ হুর! দৃঢ় কণ্ঠস্বর নূরীর।

কিন্তু জান ওরা কে?

জানার কোন দরকার নেই, তবে এটুকু জানি ওরা তোমার বান্ধবী।

হাসল বনহুর–তোমার অনুমান ঠিক নূরী।

ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত ফোঁস করে উঠল নূরী–যেখানেই যাও, নারী নিয়ে তোমার কাজ।

গর্জে উঠল বনহুর-নূরী!

আমি মিথ্যা বলিনি, তার প্রমাণ ঐ যুবতী দু'জন।

নূরী, তুমি সত্যই জানতে চাও ওদের পরিচয়?

বল, আমি শুনতে চাই কে ওরা?

তবে শোন, একজন কান্দাইয়ের পুলিশ সুপারের কন্যা মিস সুফিয়া আর দ্বিতীয় যুবতী তোমার পরিচিত।

না, ওকে আমি চিনি না।

ভাল করে লক্ষ্য করলেই চিনতে পারতে।

আমি তোমার মুখেই শুনতে চাই হুর যুবতীর পরিচয়।

তবে শোন নূরী, দ্বিতীয় যুবতী চৌধুরী কন্যা মনিরা।

অস্ফুট ধ্বনি করে উঠল নূরী–মনিরা।

বলল বনহুর–চমকে উঠলে কেন? নূরী, আমি তাকে বিয়ে করেছি। সে আমার বিবাহিতা স্ত্রী।

উঃ! একটা আর্তনাদ করে দু'হাতে মাথাটা টিপে ধরল নূরী, তারপর তাকাল অগ্নিদৃষ্টি নিয়ে বনহুরের মুখের দিকে–সত্যি বলছ?

হ্যাঁ নূরী। আমি তাকে দু'বছর আগে বিয়ে করেছি।

অস্ফুট কণ্ঠে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল নূরী—দু'বছর আগে হ্যাঁ।

হ্যাঁ।

আমাকে–তুমি বলনি কেন?

আমি জানি তুমি সহ্য করতে পারবে না, তাই বলিনি নূরী–

নূরী, আমি জানতাম তুমি সহ্য করতে পারবে না। বনহুর নূরীকে দু'হাতে টেনে নিল বুকের মধ্যে, গভীর আবেগে ডাকল নূরী। নূরী পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে গেছে। দু'চোখে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। তার দেহে প্রাণ আছে কি নেই বুঝা যাচ্ছে না। বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নিয়ে মুখখানা তুলে ধরল– আমি জানি তুমি আমাকে কত ভালবাস। তোমার প্রাণের চেয়ে তুমি আমাকে বেশি ভালবাস নূরী আর আমি-আমি তোমাকে পরিহার করে চলি—

বনহুরের অশ্রু ফোটা ফোটা নূরীর মাথায় ঝরে পড়তে লাগল। বনহুর আবার ডাকল নূরী নূরী।

নূরী নির্বাক-নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

০১২. দস্যু দুহিতা

দস্যু দুহিতা – রোমেনা আফাজ [দস্যু বনহুর সিরিজের দ্বাদশ উপন্যাস।]

০১.

ভোরের শীতল হাওয়া শরীরে লাগতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল দস্যু বনহুরের। হাই তুলে শয্যায় উঠে বসল সে। গত রাতের ঘটনাগুলো একেরপর এক মনে পড়তে লাগলো–সর্বপ্রথম স্মরণ হলো নূরীর কথা, না জানি সে ঘুমোতে পেরেছে কিনা—

হঠাৎ বনহুরের চিন্তাজালে বাধা পড়ল ক্যাবিনের দরজায় এসে দাঁড়াল রহমান-সর্দার–

বনহুর তাকে ডাকল–ভেতরে এসো রহমান

রহমান ক্যাবিনে প্রবেশ করতেই বনহুর বলল–এবার বজরা ছাড়ার আয়োজন কর।

রহমান মুখ তুলল, বিমর্ষ মলিন তার মুখ, বেদনাভরা গলায় বলল সে–সর্দার নূরী নেই।

চমকে উঠলো বনহুর বিস্ময়ভরা আরষ্ঠ কণ্ঠে বললো–নূরী নেই।

কখন যে নূরী বজরা থেকে চলে গেছে আমরা জানি না।

বনহুর ব্যস্তভাবে শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়াল, রহমানকে লক্ষ্য করে বলল–দুটো বজরাই খুঁজে দেখেছ?

হ্যাঁ সর্দার, দুটো বজরাই খুঁজে দেখা হয়েছে।

এমন সময় দ্বিতীয় বজরায় নূরীর দাসী কাঁদতে কাঁদতে এসে দাঁড়াল সেখানে—হুজুর, মনি নেই। ওকে খুঁজে পাচ্ছি না।

চিত্রার্পিত্রের ন্যায় দাঁড়িয়ে বনহুর প্রতিধ্বনি করে উঠল—মনিও নেই।

দাসী ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে বললনা।

বনহুরের চোখের সামনে সীমাহীন চিন্তাজাল জট পাকাতে শুরু করল। নুরী যখন গত রাতে তার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল তখন তাকে অতি বিষণ্ন মলিন দেখাচ্ছিল। নূরী তারপর একটি কথাও বলতে পারেনি তাকে। বনহুর নূরীকে সান্ত্বনা দেবার অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে সে। নূরীর মুখে বনহুর কিছুতেই হাসি ফোটাতে পারেনি।

নূরীকে তার বজরায় বনহুর নিজে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। তারপর সবকিছু ঠিকঠাক করে রাতটুকুর মত কোন নির্জন স্থান দেখ বজরা বাঁধার নির্দেশ দিয়েছিল সে নিজে। তখন কি বনহুর ভেবেছিল যে, নূরী পালিয়ে যাবে। তাহলে কিছুতেই সে বজরা বাঁধার আদেশ দিত না।

আজ নূরীর অভাব বনহুরের হৃদয়ে প্রচন্ডভাবে আঘাত করল। বনহুর কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে চিন্তা করে বলল—তাজকে নিয়ে কায়েস বোধ হয় কান্দাই পৌঁছে গেছে।

হাঁ সর্দার, তাজ আর দুলকী এতদিনে কান্দাই পৌঁছে গেছে। সর্দার, বজরা ভাসান হবে না?

না। যতক্ষণ নূরীকে খুঁজে না পাই ততক্ষণ বজরা এখানেই থাকবে। রহমান, তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও, এখনই যাব নূরীকে খুঁজতে।

রহমান আর বনহুরের মধ্যে যখন কথাবার্তা হচ্ছে, তখন মনিরা এসে দাঁড়াল সেই ক্যাবিনে। মনিরা বনহুরের মুখোভাব লক্ষ্য করে বেশ বুঝতে পারল তার মনোভাব স্বাভাবিক নেই। ইতোমধ্যে গত রাতের মেয়েটি-যে তাদের বন্দী করেছিল সে উধাও হয়েছে কথাটা তারও কানে গিয়েছিল। রাতের অন্ধকারে মেয়েটিকে সামান্য দেখে মনিরা তাকে চিনতে পারেনি, কারণ তার শরীরে ছিল পুরুষের পোশাক। আজ সকালে একজন অনুচরের মুখেই শুনতে পেয়েছে, সেই যুবক পুরুষ নয়-নারী। এবং এটাও মনিরা জানতে পেরেছিল—তার নাম নূরী। সেই

থেকে তার মনের কোণে যন্ত্রণার কাঁটা বিঁধছিল। তাই মনিরা ছুটে এসেছে, কিন্তু এসে স্বামীকে গম্ভীর ভাবাপন্ন বিষণ্ন দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল।

রহমান বেরিয়ে গেল ক্যাবিন থেকে।

মনিরা স্বামীর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল—এই গহন বনে নামবে তুমি?

হাঁ মনিরা।

কিন্তু…

উপায় নেই।

আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

তা হয় না।

কেন?

এসব বন অতি ভয়ঙ্কর স্থান। জানি না নূরী এতক্ষণ বেঁচে আছে কিনা, তাছাড়া তার কোলে শিশু মনি আছে।

বনহুরের কথায় মনিরার কুঞ্চিত হল, নূরীর পরিচয় সে জানত। কান্দাইয়ের পোড়ড়াবাড়িতে নূরীর সঙ্গে একবার তার দেখাও হয়েছিল, তা ছাড়া এ নামটা বনহুরের মুখেও দু'এক দিন শুনেছিল মনিরা। আর এটাও মনিরা জানত, নূরী বনহুরকে ভালবাসে শুধু ভালবাসে নয়, প্রাণ দিয়ে সে চায় ওকে। সেই নূরীর কোলে শিশুসন্তান–মনিরার মনে সন্দেহের দোলা লাগে।

বনহুর ততক্ষণে নিজের কাল দস্যু ড্রেস পরতে শুরু করেছে।

মনিরা নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে দেখতে লাগল। কতদিন সে স্বামীকে এই ড্রেসে দেখেনি। বড় সুন্দর লাগছে বনহুরকে। স্বামীর বুকে মাথা রাখার জন্য মনিরার মন হাহাকার করে উঠল। কিন্তু এখন বনহুরের মনোভাব সম্পূর্ণ অন্য রকম। কোনদিকে যেন তার খেয়াল নেই। নূরী আর তার কোলের শিশুটাই যেন তার একমাত্র লক্ষ্য। অভিমানে ভরে উঠল মনিরার মন।

বনহুরের পোশাক পরা হয়ে গেছে। রাইফেলটা হাতে তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল—মনিরা, তোমরা সাবধানে থাকবে। যতক্ষণ না ফিরে আসি বজরার বাইরে কেউ বের হবে না। একবার মনিরার মুখের দিকে তাকিয়ে বনহুর দ্রুত কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

রহমান তার ড্রেস পরে রাইফেল হাতে কক্ষের বাইরে প্রতীক্ষা করছিল।

রহমান আর বনহুর বজরার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নদীতীরে নেমে গেল। মনিরা ছুটে এসে বজরার মুক্ত জানালায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

বনহুর আর রহমান গহন বনের মধ্যে অদৃশ্য হতেই মনিরা ছুটে এসে লুটিয়ে পড়ল বনহুরের শূন্য বিছানায়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আজ মনিরার মনে নানা কথা উদয় হচ্ছে। তার নারী জীবনে কি এতই বিড়ম্বনা ছিল। স্বামী-সন্তান নিয়ে সবাই সুখের ঘর বাঁধে, ছোট একটা পরিচ্ছন্ন সংসার গড়ে তোলে, আর তার জীবনটা এসব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। স্বামীভাগ্য তার সত্যি অতি অদ্ভুত, যা কোন নারীর ভাগ্যে হয় না। দস্যু বনহুরকে স্বামীরূপে পাওয়া—এ চরম, সার্থক নারী জীবনের পরম উপলব্ধি। কোন মেয়ে যা কোনদিন কল্পনা করতে পারে না বা পারেনি, বজরার জীবনে সেই কল্পনা বাস্তবে পরিণত হয়েছে সেই দুর্লভ রত্ন সে লাভ করেছে এর চেয়ে আর কি সে কামনা করতে পারে। কিন্তু তবুতো মনিরার জীবন আজ অভিশপ্ত, এত পেয়েও না পাওয়ার হাহাকারে তার অন্তর জর্জরিত, নিষ্পেষিত। এর চেয়ে না পাওয়াটাই ছিল তার জীবনের সান্ত্বনাময় একটি দিক। এখন পেয়ে না পাওয়ার দীর্ঘশ্বাসের জ্বালা বড়ই অসহ্য তীক্ষ্ণ। মনিরা ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে।

গোটা রাতের ঝড়-ঝঞ্ঝার ঝাপটায় সুফিয়ার শরীর ক্লান্তি আর অবসাদে ভরে উঠেছিল, অঘোরে ঘুমাচ্ছিল সে। ঘুম ভাঙতেই মনিরাকে না দেখে উঠে বসে বিছানায়।

বজরার জানালাপথে তখন ভোরের সূর্যের আলো মেঝেতে এসে পড়েছে। সুফিয়ার মনে গত রাতের ঘটনাগুলো ধীরে ধীরে ভেসে উঠল। মনে পড়ল মনিরার কথাগুলো, বিনয় সেন মনিরার স্বামী কাল রাতে মনিরা তার কাছে সব কথাই খুলে বলেছে। তবে কি আজ ভোর হতে না হতেই মনিরা তার স্বামীর কক্ষে গিয়েছে? হয়তো তাই, বহুদিন পর স্বামীর সন্ধান পেয়েছে বেচারী, তদুপরি যা তা

স্বামী নয়! পুরুষের মত পুরুষ বটে বিনয় সেন। মনিরার স্বামীভাগ্য অতি গৌরবময়।

সুফিয়ার মনে একটা অতৃপ্ত কামনা উঁকি দিয়ে গেল। শিহরণ জাগল তার হৃদয়ে। নিশ্চয় এখন তার স্বামীর বুকে মাথা রেখে অনাবিল শান্তি অনুভব করছে। স্বামীর বাহুবন্ধনে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তার নারীজীবন সার্থক করে তুলেছে। এ দৃশ্য না জানি কত মধুর, স্বর্গীয়, সুফিয়া উঠে দাঁড়াল, চুপি চুপি পাশের মুক্ত জানালার পাশে গিয়ে উঁকি দিল। কক্ষে দৃষ্টি পড়তেই সুফিয়ার কল্পনাজাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হলো –একি, কোথায় সেই মহাপুরুষ–মনিরাই বা বিছানায় লুটিয়ে অমন করে কাঁদছে কেন?

সুফিয়া কিছুক্ষণ নির্বাক পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অতি লঘু পদক্ষেপে কক্ষে প্রবেশ করে ডাকল—মনিরা।

সুফিয়ার কণ্ঠস্বরে মনিরার কান্নার বেগ যেন আরও বেড়ে গেল। বাঁধভাঙা স্রোতধারার মত বাধা বন্ধনহীনভাবে নেমে এলো মনিরার অশ্রু।

সুফিয়া মনিরার পাশে এসে বসল, সস্নেহে পিঠে হাত রেখে ডাকল–মনিরা, কি হয়েছে বোন?

মনিরা কি বলবে, বলার মত কিছুই যে নেই। অন্তরে যে না পাওয়ার বহ্নিজ্বালা অহরহ ধিকধিক করে জ্বলছে তা বলার নয়। নারীর স্বামীই যে একমাত্র সম্বল।

সুফিয়া পুনরায় জিজ্ঞেস করলমনিরা কি হয়েছে তোমার ভাইজানই বা কোথায়?

মনিরা এবার মুখ তুলে তাকাল। দু’চোখে তার অশ্রুধারা ঝরে পড়ছে। অন্তরের ব্যথা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে তার কোমল সুন্দর মুখমণ্ডলে।

কতদিন কত সাধনার, কত প্রতীক্ষার পর দেখা পেয়েছিল মনিরা তার অবাধ্য দেবতার। পেয়েছিল ক্ষণিকের জন্য সমস্ত অন্তরের অনুভূতি দিয়ে তাকে উপলব্ধি করার সময়ও পায়নি মনিরা! যতই পেয়েছে ততই ভয় হয়েছে এই বুঝি হারাই।

মনিরার দুশ্চিন্তা সত্যে পরিণত হলো—রাত্রি অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই এক মহাবিচ্ছেদের দাবানল তার অন্তরকে জ্বালিয়ে দিল অগ্নিদগ্ধ লৌহ-শলাকার মত।

সেই বিচ্ছেদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠল বুকের ভেতরটা। এই অজানা-অচেনা গহন বনের কোণে অশরীরী আত্মার অদৃশ্য হাতছানি তার সমস্ত কামনাকে চূর্ণ করে দিল! নূরী-নূরীই তার সমস্ত পাওয়াকে মুছে নিয়ে চলে গেছে।

মনিরা বলল—সে চলে গেছে!

সুফিয়ার চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল চলে গেছে! ভাই জান গেছে কোথায়, কেন?

মনিরা সোজা হয়ে বসে বলল—ঐ যুবকবেশী নারী অন্য কেউ নয়—সে নূরী। নূরী চলে গেছে, তারই সন্ধানে গেছে সে।

নূরী! কে এই নারী?

ওর পরিচয় আমি জানি না, সুফিয়া। এইটুকু জানি, সে আমার স্বামীকে ভালবাসে।

ভাইজানকে সে ভালবাসে।

হাঁ।

কিন্তু সে যে তোমার।

আমার স্বামী, কিন্তু তাকে ধরে রাখার সামর্থ আমার নেই। ধূমকেতুর মত ক্ষণিকের জন্য তাকে কাছে পাই, আবার কোথায় মিলিয়ে যায় কোন স্বপ্নরাজ্যের মায়াময় জগতে। সুফিয়া, আমি বড় হতভাগিনী।

সুফিয়া মনিরাকে নিবিড়ভাবে টেনে নেয় কাছে। সেও তো নারী নারীর হৃদয়ের ব্যথা তার অন্তরেও নাড়া দেয়। যদিও সে স্বামী কি জিনিস আজও তা উপলব্ধি করেনি, কিন্তু বুঝতে তো পারে। মনিরার অন্তরের ব্যথা তাই সুফিয়ার মনে এক অভিনব দোলা জাগায়। বলে সে মনিরা, একদিন, তোমার পাওয়া সার্থক হবে। আর সে চলে যাবে না তোমার পাশ থেকে,

সেদিন তুমি ওকে অক্টোপাশের মত সর্বক্ষণ ঘিরে থেক।

কিন্তু সেদিন বুঝি কোনদিন আমার জীবনে আসবে না, আমি বুঝি কোনদিন ওকে তেমন করে পাব না সুফিয়া।

ছিঃ এত অবুঝ হলে কেন মনিরা? সে গেছে হয়তো এক্ষুণি ফিরে আসবে। তছাড়া ঐ যে নূরী না কে বললে, এলোই বা সে তার সঙ্গে, কিন্তু তার কি অধিকার আছে তোমার স্বামীর উপর? সে হয়তো তাকে ভালবাসে, তাই বলে স্ত্রীর দাবী নিয়ে কোন সময় তার পাশে এসে দাঁড়াতে পারবে না।

সুফিয়ার কথায় মনিরা সান্ত্বনা খুঁজে পায় না, একটা অজ্ঞাত ব্যথা গুমরে ফেরে তার মনের কোণে। মনিরা জানে নূরী বনহুরের আস্তানায় থাকে। বনহুরকে নিজের করে পাবার জন্য নূরীর চেষ্টার ত্রুটি নেই। নানাভাবে নানা কৌশলে বনহুরকে সে বশীভূত করার চেষ্টা করছে। বনহুর মুখে না বললেও সে দিন কান্দাই বনের পোড়োবাড়ির ঘটনাতেই বেশ অনুমান করে নিয়েছে যে নূরী বনহুরের জন্য উন্মাদ। নিশ্চয়ই নূরী ওকে পাবার জন্য সদা ব্যাকুল থাকে। পুরুষ কতক্ষণ সংযত রাখতে সক্ষম হবে? তবে কি নূরীর কোলে শিশুসন্তান সে তারই... স্বামীর না না, এই চিন্তা তাকে পাগল করে ফেলবে। মনিরা সব বলতে পারে কিন্তু, স্বামীর সম্বন্ধে এ কথাটা কি করে সুফিয়ার কাছে বলবে? অসম্ভব।

সুফিয়া বলে উঠল-কোন চিন্তা করো না। তোমার স্বামী অদ্ভুত শক্তিশালী পুরুষ। তার কাছে বন্য জন্তুর শক্তিও হার মানে। নিশ্চয়ই এসে যাবে। চলো আমরা কক্ষে যাই।

উঠে দাঁড়ায় মনিরা, আঁচলে অশ্রু মুছে বলে চলো।

০২.

গহন বন।

চারদিকে হিংস্র জন্তুর গর্জন আর ভয়াবহ থমথমে ভাব। নূরী শিশুমনিকে বুকে আঁকড়ে ধরে এগুচ্ছে। কোন বাধাবিঘ্নই আজ তার পথ রোধ করতে সক্ষম হচ্ছে না।

সূর্য প্রায় মাথার ওপর।

বেলা অনেক হয়েছে।

নূরী ক্ষুধায় কাতর হলেও তেমন কিছু আসে যায় না। মনির জন্য যত ভাবনা। মনি ক্ষুধায় বার বার নড়েচড়ে উঠছে। লক্ষ্মী ছেলে বলে এখনও তেমনি নীরব

রয়েছে। মনি দুষ্ট হলেও বেশ ধীর শান্ত ছেলে, হাজার ক্ষুধা পেলেও সে চিৎকার করে কাঁদত না। ক্ষুধার সময় একটা অদ্ভুত শব্দ করত মনি, আর মাঝে মাঝে দু'হাতের মুঠি দিয়ে চোখ ঘষতো।

নূরীর অজানা ছিল না এসব।

ছোট্ট নাদুস নুদুস কচি কচি হাত দু'খান দিয়ে মনি যখন নাকমুখ ঘষে একটা অস্ফুট ভাঙ্গা শব্দ করতে থাকে, তখন নূরীর মনটা অস্থির হয়ে ওঠে। নিজের জন্য তার চিন্তা হচ্ছে না, চিন্তা তার মনিকে নিয়ে।

ঘন বনের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলেছে নূরী। পাতার ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের আলো পড়ায় ঘন বনের জমাট অন্ধকার কিছু কিছু হালকা হয়ে এসেছে।

একটা গাছের তলায় এসে বসল নূরী।

মনি তখন বেশ অস্থির হয়ে পড়েছে। হবে না কেন, মনি তো কচি শিশু। হঠাৎ নূরীর কানে আসে একটা জলধারার ক্ষীণ শব্দ। নূরী উঠে দাঁড়ায় মনিকে বুকে নিয়ে সেই শব্দ লক্ষ্য করে এগুতে থাকে। কিছুদূর এগুতেই নূরীর নজর পড়ে অদূরে ঘন বনের মাঝখান দিয়ে একটি পাহাড়িয়া ঝর্ণা কুল কুল করে বয়ে চলেছে।

মনিকে কোলে করে নূরী ঝর্ণার পাশে এসে দাঁড়াল। নির্মল স্বচ্ছ জলধারা। মনিকে হাঁটুর উপরে বসিয়ে নূরী ঝর্ণার পানি দক্ষিণ হাতে তুলে ওর মুখে ধরল। পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছিল মনি, প্রাণভরে পানি খেল। নূরী নিজেও ঝর্ণার শীতল স্বচ্ছ পানি খেয়ে ক্লান্তি আর তৃষ্ণা দূর করলো।

পানি পান শেষ করেই ফিরে দাঁড়াল নূরী, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে চমকে উঠল। একদল ভীমকায় লোক তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সকলের হাতেই শরকি, বল্লম আর তীর ধনুক।

নূরীর মুখমণ্ডল মুহূর্তে ফ্যাকাশে বিবর্ণ হলো। ওরা যে কোন দস্যুদল এটা সহজেই অনুমান করে নিল নূরী। কারণ এ পোশাক এবং এ ধরনের লোকজন তার অপরিচিত নয়। শিশু মনিকে বুকে আঁকড়ে ধরে ভীতকণ্ঠে বলল—তোমরা কে? কি চাও?

একজন ঐ দলের সর্দার বা দলপতি হবে সে এগিয়ে এলো নূরীর পাশে, নূরীর শরীরে পুরুষের ড্রেস অথচ তার নারী কণ্ঠ শুনে কিছুটা আশ্চর্য হলো, বলল, তুমি কে?

নূরী চট করে বলল—আমি দস্যু দুহিতা।

লোকটার চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। অচেনা-অজানা একটা গহন বনের বাসিন্দা হলেও দলপতি যে তার কথাটার মর্ম বুঝতে পারল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মনে মনে খুশিই হলো দলপতি, বলল এবারদস্যু দুহিতা মানে দস্যুকন্যা।

হাঁ, আমি দস্যুকন্যা।

এ বনে কোথা থেকে এলে তুমি?

পথ ভুলে।

ও তোমার কে?

আমার....আমার সন্তান।

এবার দলপতি কঠিন কণ্ঠে বলল-জান এ বনের একচ্ছত্র অধিপতি ডাকু ভীম সেন।

নূরী হেসে নিজেকে স্বচ্ছ করে নিতে চাইল, ভয় পেলে এখন তার চলবে। সেও যে সে মেয়ে নয়, দস্যুরক্ত তার ধমনিতেও প্রবাহিত। গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে–তুমিই বুঝি ডাকু ভীম সেন?

না, আমরা ডাকু ভীম সেনের অনুচর। আমি এই দলের নেতা।

ও, তুমি ভীম সেন নও। হাসবার চেষ্টা করল নূরী, বলল তোমাদের দলপতির কাছে নিয়ে যাবে আমাকে?

যে এতক্ষণ নূরীর সঙ্গে আলাপ করছিল, সে ভীম সেনের প্রধান অনুচর রঘু ডাকু।

রঘু বলল—তোমার সাহস দেখে আমি মুগ্ধ হলাম দস্যু দুহিতা। যে ভীম সেনের নাম শুনে মানুষের হৃদকম্প শুরু হয়, সমগ্র আন্দামান রাজ্যের মানুষ যার ভয়ে তটস্থ, সেই ভীম সেনের সঙ্গে তুমি সেচ্ছায় দেখা করতে চাও? সত্যি তুমি সাহসী রমণী। তারপর নিজের দলের দিকে তাকিয়ে বলল রঘু ডাকু—একে সঙ্গে করে নিয়ে চলো আমাদের আখড়ায়।

নূরী ভেতরে ভেতরে যে, ভীত না হয়েছে তা নয়, কিন্তু মুখোভাবে সে ভয়ের চিহ্ন ফুটতে দিল না ডাকাত দলের সঙ্গে এগিয়ে চলল নূরী। পুরুষদের তালে তালে পা ফেলে এগুতে খুব কষ্ট হচ্ছিল তার, তবু মনিকে বুকে আঁকড়ে ধরে চলতে লাগল।

কত বন, জঙ্গল আর ছোট ছোট নদীর মত ঝর্ণা পেরিয়ে এগুলো তারা।

গহন বন ছাড়িয়ে তারা একটা পাহাড়িয়া জঙ্গলায় এসে পৌঁছল। সন্ধ্যার ঝাপসা আলো তখন পৃথিবীর বুকে নববধুর মত ঘোমটা টেনে দিয়েছে।

মস্তবড় একটা গুহার সামনে এসে দাঁড়াল রঘু ডাকু ও তার দলবল।

রঘু তিন বার হাতে তালি দিল।

সঙ্গে সঙ্গে মেঘ গর্জনের মত একটা শব্দ হলো। নূরী বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল সম্মুখস্থ গুহার মুখের প্রকাণ্ড পাথরখণ্ড ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। পাহাড়টা যেন কোন অদৃশ্য ইংগিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

অল্পক্ষণেই গুহার মুখ একটা সুড়ঙ্গপথে পরিণত হলো। রঘু তার দলবল নিয়ে প্রবেশ করল সুরঙ্গপথে। নূরীও রয়েছে তার সঙ্গে।

দস্যু বনহুরের সঙ্গিনী নূরী, নিজেও সে দস্যু দুহিতা—কিন্তু এসব যেন তার কাছে নিজেদের আস্তানার চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর বলে মনে হলো।

নূরী রঘু ডাকুর সঙ্গে এগুচ্ছে।

পেছনে ডাকাতদল সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে আসছে।

নূরীর হৃদয়ে ভয়-ভীতি আর দুশ্চিন্তা জোট পাকাচ্ছিল। সে নারী-এতগুলো পুরুষের সঙ্গে একা। না এসে কোন উপায় ছিল না, জোর করেই ওকে ধরে

আনত, কাজেই স্বেচ্ছায় এসেছে সে। এখন কৌশলে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে হবে। নারী হলেও সে অন্যান্য মেয়ের মত দুর্বল প্রাণ নয় এত সহজেই ভীত হলে তার চলবে কেন?–

নূরী মনিকে কোলে নিয়ে রঘু ডাকুর সঙ্গে এগুচ্ছে।

পাথর কেটে যেন সুড়ঙ্গপথটা তৈরি করা হয়েছে।

কিছুটা এগুনোর পর রঘুর অনুচরগণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে সুড়ঙ্গের দু'পাশে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। নূরী অবাক হয়ে তাকাল পেছনে।

রঘু ডাকু বলল—এরপর আর যাওয়া চলবে না, শুধু তুমি চলো আমার সঙ্গে।

নূরীর মনে কেমন একটা ভয় দোলা দিয়ে গেল। যা হোক, এতগুলো লোক থাকায় তবু একটু সাহস ছিল তার মনে। কেমন যেন দুর্গম পথ। গাঢ় অন্ধকার কিছুটা দূরীভূত করেছে সুড়ঙ্গের মাঝে মাঝে জ্বলন্ত মশালের আলো।

রঘু ডাকু আর নূরী, কোলে তার শিশু মনি, দু'জনেই এগুচ্ছে।

বেশ কিছুটা চলার পর সামনে তাকিয়ে হঠাৎ চমকে, শিউরে উঠল নূরী। সুউচ্চ পাথরাসনে ভয়ঙ্কর জমকালো একটা লোক বসে রয়েছে। তার দু'পাশে দু'জন ঐ রকম চেহারা লোক সুতীক্ষ্ণধার বল্লাম হাতে দণ্ডায়মান।

দেয়ালের দু'পাশে দুটো মশাল দপ দপ করে জ্বলছে। মশালের আলোতে ডাকাত দলপতি ভীম সেনের জমকালো চেহরার জমাট পাথরের মূর্তি বলেই মনে হচ্ছে। মাথায় কঁকড়া চুল। মস্ত একজোড়া গোঁফ। চোখ দুটো যেন আগুনের ভাটার মত জ্বলছে।

নূরী দস্যু দুহিতা হলেও এই ভীষণ চেহারার লোকটার সামনে ভীত হয়ে পড়ল।

রঘু ডাকু কিছু বলার পূর্বেই গর্জন করে উঠল ভীম সেন–এ কে?

রঘু নতমস্তকে কুর্ণিশ জানিয়ে বলল–দস্যু দুহিতা।

দস্যু দুহিতা! কি রকম?

এ পুরুষ নয়-নারী।

তা এখানে কি করে এলো?

পথ ভুল করে আন্দামানের বনে এসে হাজির হয়েছিল।

আর তুমি তাকে ধরে এনেছ?

রঘু মস্তক অবনত করে রইল।

ভীম সেন পুনরায় হুংকার ছাড়ল—তা ওর কাছে কি পেলে?

রঘু এবারও নত মস্তকে রইল কোন জবাব দিল না।

ভীম সেন বজ্রকঠিন কণ্ঠে বলল—জান এখানে নারীর প্রবেশ নিষেধ?

চোখ তুলে তাকাল রঘু, নিজের ভুল বুঝতে পেরে হকচকিয়ে গেল, বললো—আমার কোন দোষ নেই সর্দার। এই মেয়েটি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিল।

তাই তুমি নিয়ে এলে? এত সাহস তোমার! এ জন্য তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো।

রঘু আর্তনাদ করে উঠল—সর্দার!

নূরী তখন কেমন যেন সংজ্ঞাহারার মত হয়ে পড়েছে। একি হলো! রঘু ডাকু তার জন্য মৃত্যুবরণ করবে। একটা প্রাণ যাবে তার জন্য?

নূরী নিশ্চুপ ছিল এতক্ষণ, হঠাৎ বলে উঠল-বাবা, আমি নারী হলেও তোমাদের কোন অন্যায় বা ক্ষতি করব না। আমাকে তুমি মেয়ে বলেই জেন।

হঠাৎ নূরীর কণ্ঠে বাবা সম্বোধন ভীম সেনের কঠিন হৃদয়ে আলোড়ন জাগাল। নিঃসন্তান ভীম সেন জীবনে কোনদিন বাবা ডাক শুনেনি। আজ এ ডাক তাকে অভিভূত করে ফেলল। কিছুক্ষণ ভীমসেন নির্বাক নয়নে তাকিয়ে রইল নূরীর দিকে–শিশু মনি তার কোলে, ক্ষুধায় কাতর মনি ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ।

ভীম সেন এবার বলে উঠল—বাবা! কে তোমার বাবা?

তুমি।

না, আমার কোন সন্তান নেই।

নূরী করুণ কণ্ঠে বলল আমি তোমার সন্তান, দয়া কর বাবা, আমার জন্য রঘুকে হত্যা কর না। তার চেয়ে তুমি আমাকেই হত্যা কর।

ভীম সেন কি যেন ভাবতে লাগল। ডাকাত হলেও সে তো মানুষ! তার দেহেও তো রক্ত-মাংস রয়েছে। নূরীর কথাগুলো ভীম সেনের অন্তরে সাড়া জাগাল।

ভীম সেন চিন্তা করছে।

রঘু মৃত্যুভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

নূরী ব্যাকুল আগ্রহে তাকিয়ে আছে ভীম সেনের মুখের দিকে। দু'চোখে তার করুণ অসহায় চাহনি। নূরীর কোলে ঘুমন্ত শিশু মনি।

ভীম সেন এবার বলে উঠল—মা, আমি তোমার কথায় রঘুকে ক্ষমা করে দিলাম। জীবনে ভীম সেন কাউকে ক্ষমা করেনি, এই তার প্রথম ক্ষমা।

রঘু মুখ তুলে তাকাল।

নূরীর মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তে জেগে উঠলো মনি। ক্ষুধায় কেঁদে উঠল সে।

ভীম সেন কোনদিন শিশু দেখেনি, মনির অপরূপ চেহারা তাকে স্নেহকাতর করে তুলল। বলল ভীম সেন-রঘু, ওদের নিয়ে যাও। শিশুর ক্ষুধা পেয়েছে, খাবার ব্যবস্থা কর।

রঘুর দু'চোখে আনন্দের ছটা ফুটে উঠল। সর্দারকে রঘু জানে তার কঠিন আদেশের নড়চড় নেই। নিশ্চিত মৃত্যু থেকে মুক্তি পেল রঘু! নূরীকে লক্ষ্য করে বলল সে–চলো।

রঘুর পেছনে পা বাড়াল নূরী।

এই নির্জন বনে নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থায় যে কোন আশ্রয়ই তার কাছে খোদার দান বলে মনে হলো।

০৩.

গোটা বন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও বনহুর ও রহমান নূরী আর শিশু মনিকে পেল না। শক্তিমান বনহুর আর বলিষ্ঠ হৃদয় রহমান এক সময়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

বনহুরের সুন্দর মুখমণ্ডল বিষণ্ন, মলিন হলো। ললাটে ফুটে উঠল গভীর চিন্তারেখা—তবে সে গেল কোথায়? বাঘ-ভালুকে কি তাকে খেয়ে ফেলেছে? কিন্তু তাহলেও তার জামাকাপড়ের কোন চিহ্ন পাওয়া যেত। রক্তমাংসের দাগ দেখতে পেত। নূরী কি তবে বেঁচেই আছে। কিন্তু কোথায় সে অদৃশ্য হয়েছে? ক্লান্তকণ্ঠে বলল বনহুর রহমান, নূরীকে বুঝি আর আমরা ফিরে পাব না!

রহমান নতমস্তকে ব্যথাভরা কণ্ঠে বলল সর্দার, হতাশ হবার কিছু নেই। নূরী সাধারণ মেয়ে নয়—সে দস্যু কন্যা, তার ধমনিতে প্রবাহিত হচ্ছে দস্যুরক্ত। এত সহজে সে নিজেকে বিলীন হতে দেবে না।

কিন্তু এই গহন বনে, এক, নিরস্ত্র, একটি শিশু তার কোলে, কি করে সে নিজেকে রক্ষা করবে বা করতে পারে? এ বনে নানা হিংস্র জন্তুর আনাগোনা রয়েছে। বনহুরের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ভীষণ গর্জন ভেসে এলো—বাঘের ভীম গর্জন।

বনহুর আর রহমান তটস্তভাবে উঠে দাঁড়াল। সামনে ঝোপটার দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠল, রহমানকে লক্ষ্য করে বলল বনহুর——ঐ দেখ।

রহমান সেদিকে চেয়ে দেখল-একটা ভয়ঙ্কর বিরাট বাঘিনী ঝোপটার পাশে শুয়ে আছে। পাশে কয়েকটা বাচ্চা খেলা করছে।

রহমান মুহূর্তে রাইফেল উদ্যত করে ধরল।

বনহুর রহমানের রাইফেলের মাথাটা হাত দিয়ে নত করে দিয়ে বলল, মের না রহমান।

সেকি সর্দার। মনে মনে আশ্চর্য হলো রহমান। যে সর্দার মানুষের বুকে রাইফেল ছুড়তে দ্বিধাবোধ করে না, আজ সেই সর্দার একটা হিংস্র জন্তুর বুকে গুলি ছুড়তে বারণ করছে? অবাক না হয়ে পারল না রহমান।

বনহুর রহমানের মনোভাব বুঝতে পেরে বলল কি হবে ওকে মেরে। অযথা কতগুলো অসহায় বাচ্চার কষ্ট হবে।

রহমান কোন জবাব দিতে পারল না।

বনহুর বলল-চল রহমান, সাবধানে এখান থেকে সরে পড়ি। এখন বাঘিনী তার বাচ্চাদের নিয়ে আনন্দ উপভোগ করছে। হাঁ, একেই বলে মায়ের প্রাণ।

বনহুর আর রহমান অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলল। কিন্তু বেশিদূর এগুতে পারল না। একটা বন্য শুকর সুতীক্ষ্ণ ধারাল দাঁত বিস্তার করে তীর বেগে ছুটে এলো।

মুহূর্তে রহমানকে ঠেলে দিয়ে বনহুর রাইফেল উদ্যত করে গুলি করল—অব্যর্থ লক্ষ্য বনহুরের, শুকর ছুটে আসতে গিয়ে গুলির আঘাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। পড়ে গিয়ে আবার উঠতে গেল কিন্তু ততক্ষণে বনহুরের রাইফেলের আর একটা গুলি শুকরের পৃষ্ঠদেশ ভেদ করে চলে গেল। আর সে উঠতে পারল না।

বনহুর আর রহমান বনে বনে আরও সন্ধান করল, কিন্তু নূরীর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না।

রহমান লক্ষ্য করল, তার সর্দারকে আজ বড় বিষণ্ন, বড়ই উদাসীন মনে হচ্ছে। নূরীর ব্যথা তাকে অস্থির করে তুলেছে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো এক সময়!

ঘন বনের মধ্যে চারদিক থেকে শোনা যাচ্ছে হিংস্র জন্তুর গর্জন। রহমান বলল —সর্দার!

জানি তুমি কি বলতে চাচ্ছ। কিন্তু নূরীকে এই গহন বনে একা রেখে আমি যাব কোন্ প্রাণে?

সর্দার, রাত হয়ে আসছে। এখানে বিলম্ব করা মোটেই উচিত হবে না। নূরীর সন্ধান করে তাকে পাওয়া এখন দুরাশা।

হাঁ, দুরাশাই বটে। গহন বন। অন্ধকার রাত। কোথায় আমি তাকে খুঁজব রহমান?

খুঁজে আর ফল হবে না সর্দার। ওর অদৃষ্টে যা ছিল তাই হয়ে গেছে।

নূরী তবে নেই বলতে চাও?

না, কারণ এই হিংস্র জন্তু ভরা গহন বনে তার বেঁচে থাকাটা অসম্ভব সর্দার।

রহমান!

হাঁ সর্দার, নূরী আর বেঁচে নেই।

বনহুরের মুখমণ্ডল সন্ধ্যার অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা না গেলেও এটা বেশ বুঝতে পারল রহমান, তার সুন্দর দীপ্ত মুখমণ্ডল কাল হয়ে উঠেছে। সর্দার নূরীকে কতখানি ভালবাসে, রহমান হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে অনুভব করল।

বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে নিজেকে সংযত করে নিল বনহুর। তারপর বলল। চল রহমান।

সর্দার।

হাঁ চল, আর বিলম্ব করে লাভ নেই।

বনহুরের প্রতীক্ষায় মনিরা ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া বজরার সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন নিয়ে অপেক্ষা করছিল সর্দারের। সন্ধ্যা ঘনিয়ে যখন রাতের অন্ধকার নেমে এলো তখন সবাই হতাশ হয়ে পড়ল। এই অজানাঅচেনা গহন বনে শুধুমাত্র দুটি প্রাণী কি করে এতক্ষণ হিংস্র জন্তুর কবল থেকে বাঁচতে পারে।

মনিরা কায়মনে খোদাকে স্মরণ করতে লাগল। মনিরার ব্যথাকরুণ অবস্থা দেখে সুফিয়ার চোখেও পানি এলো। সান্ত্বনা দিতে গেল, কিন্তু তার কণ্ঠও রোধ হয়ে এলো? সত্যি যদি আর ওর স্বামী ফিরে না আসে।

কিন্তু যখন বনহুর বজরায় ফিরে এলো তখন দু'টি বজরার সব লোকই খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়ল। কিন্তু নূরী ফিরে না আসায় সবাই মর্মাহত হলো।

ছুটে এলো মনিরা আর সুফিয়া।

সুফিয়া থমকে দাঁড়াল, আজ প্রথম সে বনহুরকে কাল ড্রেসে সজ্জিত দেখল—অপরূপ সুন্দর লাগছে বনহুরকে। সুফিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল বনহুরের সুন্দর মলিন-বিষণ্ন মুখখানার দিকে।

মনিরা ছুটে গিয়ে বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরল-কেন তুমি এত বিলম্ব করলে?

বনহুর মনিরার প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারল না। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেল সে অতি সাবধানে।

স্বামীর মুখোভাব লক্ষ্য করে মনিরার হৃদয় গুমড়ে কেঁদে উঠল। কি করে ঐ মুখে হাসি ফুটাবে ভাবতে লাগল সে।

সুফিয়া ধীরে ধীরে সরে পড়ল সেখান থেকে।

এ সময় এখানে থাকা তার উচিত হবে না।

বেশ কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর বলল বনহুর—নূরীকে খুজে পাওয়া গেল।

মনিরা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল—সে চলে গিয়েছিল কেন?

জানি না।

আচ্ছা, একটা কথা তুমি আমায় বলবে?

বল।

ওর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ...

মনিরার কথা শেষ হয় না, রহমান এসে দাঁড়ায় দরজার বাইরে সর্দার!

বনহুর বলে এসো।

রহমান ক্যাবিনে প্রবেশ করে বললসর্দার, যা হবার হয়ে গেছে। এখানে বিলম্ব করা আর উচিত হবে না।

একথা আমিও চিন্তা করেছি রহমান, বজরা ছাড়ার আদেশ দেব কিনা ভাবছি।

সর্দার, একে অজানা-অচেনা দেশ, তারপর এসব বন রাত্রিকালে আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। নানা হিংস্র জীবজন্তুর আবির্ভাব ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

আচ্ছা, তুমি বজরা ছাড়তে বল।

রহমান কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

মনিরা তাকায় বনহুরের মুখের দিকে। সে মুখ যেন বিষাদে ভরা। মুক্ত জানালা দিয়ে দূরে অন্ধকারে নদীবক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল বনহুর। বুকের মধ্যে তার একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছে, এটা বুঝতে কষ্ট হলো না মনিরার।

মনিরা কোন কথা বলতে পারল না বা বলার সাহস পেল না, এ সময় বনহুরকে বিরক্ত করতেও তার মন চাইনা।

মনিরা চলে যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়াল, বনহুর ডাকলমনিরা!

মনিরা থমকে দাঁড়াল। কোন কথা বলল না। বনহুর মনিরাকে টেনে নিল কাছে, বলল—তুমি কি প্রশ্ন করেছিলে না?

না, কিছু না! আমি যাই এখন।

মনিরা, তুমি যেও না। আরও ঘনিষ্ঠভাবে মনিরাকে টেনে নিল বুকের মধ্যে বনহুর।

আগে এবং পেছনে দু'খানা বজরা এগিয়ে চলেছে।

মনসা নদী পেরিয়ে যোগিনী নদীর বুক চিরে এগুচ্ছে বনহুরের বজরা দু'খানা।

স্বামীর বুকে মাথা রেখে মনিরা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। দু'ফোঁটা অশ্রু তখনও চিকচিক করছে মনিরার চোখের কোণায়। মনিরা ঘুমিয়ে গেলেও দস্যু বনহুরের চোখে ঘুম নেই। ধীরে ধীরে মনিরার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল সে? এখনও তার হাতখানা সম্পূর্ণ থেমে যায়নি। অতি মৃদু সঞ্চারণ হচ্ছিল মনিরার চুলে! বনহুর গভীর চিন্তায় মগ্ন। ফিরে গেছে সে অতীতে তলিয়ে যাওয়া একটা দিনে–বালক বনহুর অস্ত্রশিক্ষা করছিল দস্যু কালু খাঁর কাছে। অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে অস্ত্রচালনা করেছিল বনহুর। বৃদ্ধ কালু খাঁর দু'চোখে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন। হাস্য-উচ্ছলতায় মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত, মাঝে মাঝে অস্ফুটধ্বনি করছে সে-সাবাস! সাবাস বেটা! সাবাস!

বালক বনহুরের শিরায় শিরায় তখন উষ্ণ রক্তের প্রবাহ, হৃদয়ে অফুরন্ত উন্মাদনা। চোখমুখ প্রতিভাদীপ্ত, তীব্র উত্তেজিত। অস্ত্রশিক্ষার প্রচণ্ড পিপাসা তাকে উম্মাদ করে তুলেছে। বালক বনহুরের হাতের প্রচণ্ড আঘাতে এক সময় কালু খাঁর অস্ত্র ঝন ঝন করে খসে পড়ল।

উচ্ছ্বসিত আনন্দে কালু খাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দু'হাত প্রসারিত করে জড়িয়ে ধরল বালক বনহুরকে বুকের মধ্যে।—সাবাস বেটা! সাবাস!

কালু খাঁ যখন বনহুরকে বুকে টেনে আদর করছিল তখন তার একজন অনুচর এসে দাঁড়াল—সর্দার দলবল এসে গেছে।

কালু খাঁ বনহুরকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল—চল।

যতক্ষণ কালু খাঁ আর বনহুরের লড়াই হচ্ছিল ততক্ষণ একটা পেয়ারা গাছের ডালে পা দুলিয়ে পেয়ারা খাচ্ছিল আর গুরুশিষ্যের খেলা দেখছিল। নূরী। গলায় দুলছিল তার একটা বনফুলের মালা।

কালু খাঁ তার অনুচরদের সঙ্গে চলে যেতেই নূরী লাফ দিকে গাছ থেকে নেমে ছুটে এলো বনহুরের পাশে, তৃপ্তির হাসিতে তার মুখ উজ্জ্বল। নিজের গলা থেকে মালাটা খুলে নিয়ে পরিয়ে দিল বনহুরের গলায়—হুর তোমার জয় হয়েছে—সে জন্য এটা আমি তোমাকে উপহার দিলাম।

বনহুর নূরীর দিকে তাকিয়ে হাসল, তারপর মালাটা নেড়ে দেখল।

এমনি আরও কত কথা, কত দৃশ্য ভেসে উঠতে লাগল বনহুরের চোখের সামনে।

ঝর্ণার পানিতে সাঁতার কাটছিল বনহুর ও নূরী।

কিশোর বনহুর আর কিশোরী নূরী। উচ্ছল হাসিতে মেতে উঠেছে দু'জন। সাঁতার কাটতে কাটতে এ-ওর দিকে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছিল। তাদের পাশে নদীর বুকে সাঁতার কাটছিল শুভ্র রাজহংসীর দল। হঠাৎ একটা বাচ্চা হাঁস ভেসে চলে গিয়েছিল স্রোতের টানে। নূরী হাঁসটাকে ধরার জন্য এগিয়ে যায়, কিন্তু সে নিজেও স্রোতের মুখে পড়ে হাবুডুবু খায়। এই ডুবে যায়, আর কি!

বনহুর লক্ষ্য করে দ্রুত এগিয়ে গেল। প্রখর স্রোত ধারায় অতি কষ্টে নূরীকে সেদিন বাঁচিয়ে নিল বনহুর। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে নূরীর আনন্দ আর ধরে না। কি দিয়ে যে সে বনহুরকে কৃতজ্ঞতা জানাবে। দু'হাতে বনহুরের গলা জড়িয়ে ধরে নিস্পাপ নূরী দুটো চুম্বনরেখা এঁকে দিয়েছিল ওর গণ্ডে ৭ হেসে বলেছিল নূরী আমার জীবনের বিনিময়ে কি দেব তোমাকে তাই–

নূরীর স্বাভাবিক স্বচ্ছ হাসির সঙ্গে সেদিন তাল মিলিয়ে হেসেছিল বনহুর। আজ বারবার সেই দিনগুলোর স্মৃতি ভেসে উঠতে লাগল বনহুরের মানসপটে।

নূরীর জন্য আজ বনহুরের হৃদয় হাহাকার করে কেঁদে উঠল। মনিরার ঘুমন্ত মাথাটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল নিজের বালিশের ওপর। তারপর উঠে দাঁড়াল, অতি সন্তর্পণে ক্যাবিনের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে।

জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন সমস্ত বজরাখানা।

কয়েকজন পাহারাদার নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল। মাঝিদের দাড়ের ঝুপঝাপ শব্দ হচ্ছে।

বনহুর বজরার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল, অদূরে দাঁড়িয়ে রহমান। গুলিভরা রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে।

বনহুর ডাকল—রহমান!

রহমান এগিয়ে এলো অন্ধকারে—সর্দার!

তাদের অলক্ষ্যে অদূরে অন্ধকারে এসে দাঁড়াল একটা ছায়ামূর্তি। নিঃশব্দে ওদের কথাবার্তা শুনতে লাগলো।

বনহুর বলছে-নূরী কি সত্যই বেঁচে নেই রহমান।

ঐ হিংস্র জীবজন্তু ভরা ভয়ংকর জংগলে বেঁচে না থাকাই স্বাভাবিক।

কিন্তু আমার মন বলছে সে বেঁচে আছে।

কিন্তু গোটা বন তো আমরা তন্নতন্ন করে খুঁজেছি সর্দার?

এমন কোন জায়গায় সে আছে যেখানে আমরা যেতে পারিনি বা যাইনি।

হ্যাঁ তা হতে পারে সর্দার।

রহমান!

বলুন সর্দার।

আমরা সেই বন ছেড়ে কতদূর এসেছি বলতে পার?

পারি সর্দার। দশ মাইলের বেশি হবে।

দশ মাইল!

তারও বেশি হবে।

ভোর হলে আবার আমরা ফিরে যাব।

কিন্তু তা সম্ভব নয়।

কেন?

বহুদিন সবাই বাড়িছাড়া, মাঝিরা কেউ আর ফিরে যেতে চাইবে না।

আমার হুকুম, বজরা ফিরাতেই হবে।

সর্দার!

হাঁ রহমান।

নিজের ক্যাবিনে প্রবেশ করতেই চমকে উঠল বনহুর, মনিরা নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত দরজার পাশে দাঁড়িয়ে।

বনহুর ফিরে তাকাতেই মনিরা দৃঢ়কণ্ঠে বললনা, এ বজরা আর ফিরবে না।

বনহুর অস্ফুট কণ্ঠে বলল—মনিরা!

সবাই তোমার দাপটে ভীত হতে পারে, কিন্তু আমি নই, তোমরা সবাই ফিরে যেতে পার কিন্তু আমাকে এই মাঝনদীতে নামিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

মনিরা!

হাঁ। আমি শপথ করেছি, এই নদী থেকে আমি কিছুতেই পেছনে ফিরে যাব না। আমার জীবনের সব মুছে নিয়ে গিয়েছিল ঐ সিন্ধি নদী, ঐ মনসা-ঐ যোগিনী নদী। না, না, আমাকে আজ তোমরা পেছনে নিয়ে যেতে পারবে না। হয় মনিরাকে বিসর্জন দেবে, নয় নূরীকে।

মনিরা!

সব আমি সইতে পারি কিন্ত আকুলভাবে কেঁদে ওঠে মনিরা।

বনহুর এ দৃশ্য সহ্য করতে পারে না। দস্যুপ্রাণ হলেও মনিরার ব্যথা তাকে অস্থির করে তোলে, এগিয়ে গিয়ে মনিরাকে টেনে নেয় কাছে।

মনিরা স্বামীর প্রশস্ত বুকে মুখ লুকিয়ে উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে ওঠে—জান, তোমার জন্য আজ আমি সর্বহারা। পিতা-মাতা, মামা-মামী, আত্মীয়স্বজন, আমার একমাত্র নয়নের মনি নূরকেও আমি হারিয়েছি শুধু তোমার জন্য–শুধু তোমার জন্য—আর আমি কোন ব্যথা সহ্য করতে পারব না। এই নদীতে নিজেকে সঁপে দিয়ে তোমাকে আমি মুক্তি দেবো। যাও, যেখানে খুশি চলে যেও, কেউ থাকবে না তোমাকে বাধা দেবার জন্য।

বনহুর গভীর আবেগে মনিরাকে টেনে নিল বুকের মধ্যে। কোন কথা বলতে পারল না সে।

কেঁদে কেঁদে মরিয়ম বেগম শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। আগে যা একটু সংসার দেখতেন এখন তাও দেখেন না। ঝি-চাকর নিজেরাই যতটুকু পারে গুছিয়ে নিয়ে করে। নকিব পুরোন চাকর–সেই মাতব্বর হয়ে সবাইকে চালনা করে, আদর করে।

বৃদ্ধ সরকার সাহেব বাইরের যত দেখাশুনা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি না থাকলে আজ বুঝি চৌধুরী বাড়ির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ত।

মরিয়ম বেগম নিজে কিছুই দেখেন না, দেখার চেষ্টাও করেন না। কত টাকা আসছে, কত টাকা ব্যয় হচ্ছে সব, সরকার সাহেব হিসেব রাখেন। একদিন সরকারের অনুপস্থিতিতে মরিয়ম বেগম কোন কাজে সিন্দুক খুললেন। সিন্দুকের তালা খুলে বেগম সাহেবার চক্ষুস্থির! সিন্দুকে টাকা আর ধরছে না। ব্যাংকেও তাদের প্রচুর টাকা জমা রয়েছে, জানেন তিনি। আবার সিন্দুকেও টাকা রাখার জায়গা নেই

এত টাকা, আনন্দ হবার কথা কিন্তু মরিয়ম বেগমের খুশির বদলে দু'চোখে অশ্রু ভরে উঠেছিল। আছে অনেক কিন্তু খরচ করার লোক নেই।

একদিন মরিয়ম বেগম সরকার সাহেবকে ডেকে বলে দিলেন, আবর্জনাগুলো সিন্দুকে জমা করে রেখে কি হবে সরকার সাহেব, তার চেয়ে কিছু বিলিয়ে দিন দিন-দুঃখীদের মধ্যে যারা না খেয়ে আছে তারা বাঁচবে।

সরকার সাহেব নতমুখে বলেছিল সেদিন—চৌধুরীবাড়ি থেকে কোনদিন কোন দীন-দুঃখী রিক্তহস্তে ফিরে যায় না বেগম সাহেবা। যা দেবার, যা তাদের প্রয়োজন, আমি দিয়ে দেই।

তবে অতসব হলো কি করে?

বেগম সাহেব, এ সংসারে খানেওয়ালা তো মাত্র আপনি আর ঐ চাকর-বাকরের দল। খরচ তো তেমন কিছু হয় না। ড্রাইভারকে মাসে তার পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছি। বাগানের ফুলগাছ আর নতুন করে লাগান হয় না, তবু মালীকে তার মাসিক টাকা ঠিকভাবেই বুঝিয়ে দেই।

বুঝেছি, আমার সংসারে ডুমুর ফুল এসেছে।

সত্যি তাই বেগম সাহেবা।

সেদিন রাত হয়ে গেছে। মরিয়ম বেগম নিজের ঘরের দাওয়ায় একটা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে শুয়েছিলেন। পাশে অনতিদূরে একটা চেয়ারে বসে সরকার সাহেব। সংসার সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা চলছিল। একথা-সে কথার মাঝে রাত বেড়ে আসে।

নবিক এসে বলে-বেগম সাহেবা ঠাণ্ডা পড়ে গেছে, ঘরে চলুন। বাতের ব্যথাটা আবার বেশি হবে ক্ষন।

হবে না হবে না। তোরা আমার জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন, আমাকে আরও বাঁচিয়ে রাখতে চাস?

সরকার সাহেব বলে উঠলেন–না বেঁচে যে কোন উপায় নেই বেগম সাহেবা- যতদিন আপনার মনির ফিরে আসে ততদিন আপনাকে এ বোঝ বইবার জন্য বেঁচে থাকতেই হবে।

কিন্তু বেঁচে থাকা কি আমার নিজস্ব ইচ্ছা সরকার সাহেব?

যদিও নয়, তবু আপনাকে সাহসে বুক বাঁধতে হবে।

তারপর কি হবে?

মনির ফিরে আসুক।

সে কি কোনদিন মানুষ হয়ে ফিরে আসবে!

আসবে সরকার সাহেবের কথা শেষ হয় না। গম্ভীর মধুময় একটা কণ্ঠস্বর শোনা যায়-মা!

কে—কে–আমার মনি, আমার মনি!

ততক্ষণে বনহুর মায়ের পাশে এসে দাঁড়ায়। মনিরা তার পেছনে। মনিরা অস্ফুট আর্তনাদ করে মরিয়ম বেগমের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে-মামীমা!

আমার মা মনিরা! কোথায় ছিলি মা এতদিন?

মনিরা মামীর বুকে মুখ গুঁজে ছোট বালিকার মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। এতদিনের জমানো ব্যথা আজ অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে তার দুচোখে।

নকিব এমনভাবে প্রকাশ্যে কোনদিন বনহুরকে দেখেনি। আজ বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল বনহুরের দিকে। খুশিতে নকিবের দু'চোখে আনন্দের বান বয়ে যায়। যেমন মা তেমনি তার সন্তান। তাই তো বেগম সাহেব সর্বদা এমন হা হুতাশ করেন।

মনিরাকে ফিরে পেয়ে বাড়িতে খুশীর ফোয়ারা বইল। ঝি-চাকর সবাই যেন তাদের হারানো ধন ফিরে পেয়েছে।

মরিয়ম বেগম কিছুতেই পুত্রকে ছেড়ে দিলেন না।

রাতে নিজের পাশে বসিয়ে বললেন—মনির, এবার তোর সংসার তুই বুঝে নে। আয় দেখবি আয়-পুত্রের হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন মরিয়ম বেগম সিন্দুকের পাশে। ডালা খুলে বললেন দস্যুতা আর তোকে করতে হবে না। নিয়ে যা, আমাকে রেহাই দে মনির।

মা!

না না, তোর কোন কথাই আমি শুনতে চাই না। বল, তুই আমাকে রেহাই দিবি কি না?

মা, তুমি কি মনে কর আমি অর্থের লালসায় দস্যুবৃত্তি করি?

তা না হলে তুই কি চাস? রক্ত! রক্ত চাস? নে, আমার বুকের রক্ত তুই চুষে নে। আমার বুকের রক্ত নিয়েও যদি তুই ক্ষান্ত হোস। দেয়ালে মাথা ঠুকে চলেন মরিয়ম বেগম।

বনহুর শক্ত হাতে ধরে ফেলল——মা, মা, মাগো।

না, আমি কোন কথাই শুনব না।

মনিরা এতক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে দেখছিল সব। নীরবে দেখা ছাড়া কিইবা করার আছে তার। মনিরা জানে, কোন বাধাই তার স্বামীকে ধরে রাখতে পারে না। বাধা বন্ধনহীন জলস্রোতের মত তার গুতি।

মরিয়ম বেগমের ললাট কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ল।

মায়ের এই দৃশ্য বনহুরকে বিচলিত করে তুলল। মায়ের পদ তলে বসে পড়ে বলল–মা, তুমি আমাকে ক্ষমা করো মা। শত শত অসহায় দীন হীন জনগণ। যারা এখনও তোমার সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করছে। বল কোনটা আমাকে করতে বল? সংসার না দেশ মাতার সেবা?

কেন, দেশ ও দশের সেবা করার কি অন্য কোনো উপায় নেই? কাঁদতে কাঁদতে বললেন মরিয়ম বেগম।

আছে কিন্তু তোমার অর্থে কদিন কুলাবে মা?

তাই বলে তুই অন্যায়ভাবে টাকা সংগ্রহ করে—

মা?

জানি তুই কি বলতে চাস?

মা, তোমার সন্তান কোনদিন অন্যায়ভাবে কারও টাকা কেড়ে নেয়নি, নেবেও না। যাদের অসৎ পথে উপার্জিত অর্থে সিন্দুক কেঁপে ওঠে, তাই আমি হালকা করে দেই। তাদের অপ্রয়োজনীয় অর্থগুলোর সৎগতি করি। এতে তাদেরও কোন ক্ষতি হয় না। আর যারা দিনের পর দিন না খেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মরছে, যারা লজ্জা নিবারণের জন্য একখণ্ড বস্ত্র সংগ্রহ করতে অক্ষম, যাদের রুক্ষ চুলে মাসের মধ্যে একটি দিন তেল পড়ে না, আমি তাদের হাতে তুলে দেই সেই অর্থ–এতটুকু উপকার যদি হয় তাদের? মা বল, একি আমার অন্যায়?

মরিয়ম বেগম কিছুক্ষণ স্থির হয়ে ভাবেন, পুত্রের কথাগুলোই বুঝি তার মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে! শত শত দীন-দুঃখীর ব্যথাকরুণ মুখ ভেসে উঠেছে বুঝি তার মনের গহনে। দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

বনহুর উঠে দাঁড়িয়ে নিজের রুমালে মায়ের অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে বলল তোমার চোখে অশ্রু আমাকে পাগল করে ফেলবে। মা, তুমি যা বলবে তাই আমি করব। বল, বল আমাকে তুমি কোনপথে যেতে বল?

মরিয়ম বেগম ধ্যানগ্রস্তের মত নিশ্চুপ হয়ে গেছেন। এদিকে তাঁর সোনার সংসার-পুত্র, পুত্রবধু, তাদের সন্তান-সন্ততি, আর এক দিকে দেশের শত শত দীন হীন অসহায় জনগণ কোন দিকটা তিনি চান, কোন দিকটাকে তিনি মনের মনিকোঠা থেকে গ্রহণ করবেন।

কোন জননী না চায় পুত্র, পুত্রবধু তাদের সন্তান সন্ততি নিয়ে সংসার বাঁধতে? কিন্তু বিবেকের কাছে পরাজিত হন মরিয়ম বেগম। নিজের দিকে দেখতে গিয়ে দেশের অসহায় জনগণের কথা ভুলে যাবেন কোন মুখে, কোন প্রাণে? একমাত্র পুত্রের বিনিময়ে তিনি যদি শত শত পুত্রের দুঃখব্যথা মুছে ফেলতে পারেন তাহলে তাঁর মত সুখী কে! কি হবে তার একার সুখ আর আনন্দ দিয়ে দেশের অগণিত নর-নারী যদি ক্ষুধায় মরে যায়, তাদের হাহাকারে দেশ যদি অশান্তিময় হয়ে ওঠে, তবে সে সুখ কাম্য নয় মরিয়ম বেগমের।

তিনি বলে উঠলেন—মনির, যা যা তুই, আমি তোকে ধরে রাখতে চাই না।

মা, তুমি রাগ করেছ?

না, রাগ আমি করিনি করতে পারি না। তোকে আমি পেটে ধরলেও তুই আমার একার সন্তান নস্। শত শত মায়ের ছেলে হয়ে জন্মছিস। তোকে কি আমি ধরে রাখতে পারি।

মা, মাগো। বনহুর মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে ছোট্ট শিশুর মত আনন্দধ্বনি করে উঠল।

০৪.

মনিরাকে মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলো বনহুর তার বজরায়। একটা দিকে নিশ্চিত হলো বনহুর। এবার সুফিয়া। পুলিশ সুপার আহমদ সাহেবের আধুনিক কন্যা সুফিয়া। তাকে তার পিতামাতার নিকটে পৌঁছে দিয়ে তবে নিশ্চিত হবে সে। কিন্তু মনিরাকে যত সহজে পৌঁছে দিতে পেরেছে তত সহজ নয় সুফিয়াকে পৌঁছান। অনেক চিন্তা করে তবেই এ কাজ সমাধা করতে হবে।

এতদিন পর সুফিয়া যদি সহজভাবে বাড়ি ফিরে যায়, নিশ্চয়ই তাকে সমাজ সহজে গ্রহণ করবে না। পিতামাতার মনেও একটা সন্দেহের দোলা খোঁচা দেবে। হয়তো নিস্পাপ সুফিয়ার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। সুফিয়াকে শুধু তার পিতামাতার নিকটে পৌঁছানই বড় কাজ নয়—সুফিয়া যে সত্যিই একটা সতী মেয়ে, সে কথাও স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে হবে তাদেরকে।

এ-কথা সুফিয়াই বলেছিল মনিরার কাছে। বলেছিল, মনিরা তুমিতো যাচ্ছ, তোমার স্বামী তোমাকে যাচাই করে নিয়েছেন। সকল সন্দেহ থেকে তুমি মুক্ত। আর আমি, যদিও আমি মা-বাবার নিকটে যাচ্ছি বা যাব কিন্তু তারা কি আর আমাকে আগের মত স্বচ্ছ মন নিয়ে গ্রহণ করতে পারবেন? আমি কেমন করে সবাইকে বুঝাব আমি নিস্পাপ নিষ্কলঙ্ক।

মনিরা সব বলেছিল বনহুরের কাছে, এ কথাও বলেছিল–সুফিয়াকে শুধু পৌঁছে দেবার দায়িত্বই তোমার নয়, ওর জীবনে যেন কোন কলঙ্কের কালিমা লেপন না হয়, একাজও তোমাকে করতে হবে।

কাজেই সুফিয়াকে শুধু পৌঁছে দেওয়াই নয় ওর বিরাট একটা পরিণতি নির্ভর করছে দস্যু বনহুরের ওপর। লোকসমাজ জানে—দস্যু বনহুর শুধু দুর্দান্ত দস্যুই নয়, সে লম্পট নারীহরণকারী।

বনহুর আধুনিক যুবকের বেশে সুফিয়াসহ পুলিশ সুপারের বাড়ির গেটে হাজির হলো।

নতুন ছোট্ট কুইন গাড়িখানা গেটে পৌঁছতেই সেলুট করে সরে দাঁড়ালো পাহারাদারগণ।

গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি পৌঁছতেই সুফিয়া নেমে ছুটে গেল অন্দরমহলে। একমাত্র কন্যার অন্তর্ধানে মিঃ আহমদ ও মিসেস আহমদ একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। মিসেস আহমদ একরকম প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। সুফিয়া ছুটে গিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে ডাকল—আম্মা! আব্বা!

মুহূর্তে মিঃ আহমদ ও মিসেস আহমদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠল। আকাশের চাঁদ যেন ফিরে পেলেন তাঁরা।

সুফিয়া পিতার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল–আব্বা। আব্বা।

মিঃ আহমদ কন্যাকে সস্নেহে বুকে আঁকড়ে ধরে বললেন মা কোথায় কোথায় গিয়েছিলি?

আব্বা, সব বলব–সব শুনবে। সুফিয়া আবার মায়ের বুকে মুখ লুকায়, কতদিন পর আজ সে মাকে পেয়েছে। সুফিয়া তারপর বলেআব্বা, তুমি বাইরে যাও। আমার রক্ষাকারী যিনি তিনি গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।

বলছিস কি মা? তাকে গাড়ি-বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিস? চল দেখি– বেরিয়ে যান আহমদ সাহেব।

হঠাৎ সুফিয়ার নজর চলে যায় পিতার বিছানার একপাশে। ইংরেজি দৈনিক পত্রিকাখানা পড়ে রয়েছে সেখানে। একটা ছবিতে দৃষ্টি পড়তেই বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল সুফিয়া। এ যে মনিরার স্বামীর ছবি! যিনি তাকে এইমাত্র পৌঁছে দিতে এসেছেন। সুফিয়া তাড়াতাড়ি পত্রিকাখানা হাতে তুলে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরল একি! সুফিয়ার চোখ ছানাবড়া হলো।

মিসেস আহমদ বললেন সুফিয়া, তোকে হরণ করার অপরাধে দস্যু বনহুরের নামে

সুফিয়া অস্ফুট ধ্বনি করে উঠল–মা!

কি হলো, কি হলো সুফিয়া?

সুফিয়া মায়ের কথার কোন জবাব না দিয়ে ছুটে গেল। কিন্তু কয়েক পা এগুতেই কানে ভেসে এলো পাশের কক্ষে পিতার চাপা কণ্ঠস্বর, ফোনে আলাপ করেছন তিনি। মিঃ হারুন এই মুহূর্তে পুলিশ ফোর্স নিয়ে চলে আসুন। আমার হলঘরে দস্যু বনহুর–এরপর আর শোনার অপেক্ষা করল। ছুটে গেল হলঘরে, কিন্তু একি, হলঘর শূন্য। ব্যস্তভাবে চারদিকে তাকাল সুফিয়া। কই কোথাও তো তিনি নেই। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল সোফার দিকে। ভাঁজ করা একটা কাগজ পড়ে রয়েছে সোফার ওপর।

সুফিয়া তাড়াতাড়ি কাণজখানা হাতে তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করল।

“বোন সুফিয়া, তোমার মঙ্গলই আমার কামনা। তোমার নিস্পাপ পবিত্র জীবন চিরসুন্দর এবং সুখের হোক।”

তোমার ভাইয়া
–দস্যু বনহুর।

মিঃ আহমদ কক্ষে প্রবেশ করে বললেন—ও কই—

কে?

যে তোমাকে চুরি করে নিয়ে ফেরত দিয়ে গেল।

আব্বা! তুমি ভুল বুঝেছ।

সুফিয়া, দস্যু কোনদিন সাধু হয় না। তোমার নারীজীবন কলঙ্কময় করে এসেছে তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে সাধুগিরি দেখাতে!

এই দেখ সে মানুষ নয়—ফেরেস্তা।

সুফিয়া!

হাঁ, তুমি এই কাগজের টুকরাখানা পড়লেই সব বুঝতে পারবে। সে আমাকে নিজের বোনের মত মনে করত। তাছাড়া তার চেষ্টাতেই আমি নিজেকে ফিরে পেয়েছি। রক্ষা করেছেন তিনি আমাকে, রক্ষা করেছেন নারীর অমূল্য সম্পদ সতীত্ব। তিনি আমার বড় ভাইয়ের সমান।

মিঃ আহমদ কন্যার হাত থেকে কাগজের টুকরাখানা নিয়ে তুলে ধরলেন চোখের সামনে।

ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবেশ করলেন মিঃ হারুন ও তার পেছনে পুলিশ ফোর্স। সকলের হাতে উদ্যত রাইফেল। মিঃ হারুনের হাতে রিভলবার।

ব্যস্তকণ্ঠে বললেন মিঃ হারুন—স্যার, কোথায় সেই নরপিচাশ?

মিঃ আহমদ বললেন—পালিয়েছে!

মিঃ হারুন সুফিয়াকে দেখে চোখমুখে বিস্ময় এনে বললেন–ইনি।

মিঃ আহমদ ছোট্ট কাগজের টুকরাখানা মিঃ হারুনের হাতে দিলেন–পড়ে দেখুন।

হিঃ হারুন চিরকুটখানা পড়ে পরপর কয়েকবার তাকালেন বনহুরের লেখা চিঠিখানা ও সুফিয়ার মুখের দিকে, তারপর বললেন আশ্চর্য!

সুফিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলল–আশ্চর্য নয়, সবই সত্য। আপনারা বসুন, আমি সব ঘটনা বলছি।

মিঃ আহমদ বললেন হাঁ, এখনও সুফিয়ার মুখে কোন কথাই আমাদের শোনা হয়নি।

মিঃ হারুন পুলিশ ফোর্সকে ইংগিতে বাইরে যেত বললেন।

পুলিশ ফোর্স তৎক্ষণাৎ কক্ষত্যাগ করল।

মিঃ আহমদ বললেন–বসুন। নিজেও আসন গ্রহণ করলেন আহমদ সাহেব।

সুফিয়া নিজে একটা আসনে বসে বলতে শুরু করল–আব্বা আমাকে যখন গুণ্ডাদল কৌশলে হাত-পা-মুখ বেঁধে তাদের গোপন আস্তানায় নিয়ে গেল, তখন আমি মনে করেছিলাম, নিশ্চয়ই আমি দস্যু বনহুরের কবলে পড়েছি এবং আমি ভয়ে মুষড়ে পড়লাম, কেঁদে কেটে অস্থির হলাম। এমন কি ওরা যত টাকা চায় তাই দেবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম।

তারপর? বললেন মিঃ হারুন?

সুফিয়া তখনও বলে চলেছে–তবু আমাকে ওরা মুক্তি দিল না। আমাকে এমন এক কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়েছে যে কক্ষে আরও কয়েকজন যুবতী ছিল। তাদের সঙ্গে আমিও সেই অন্ধকার কক্ষে বন্দী অবস্থায় রইলাম। তারপর গভীর রাতে আমাদের কয়েকজনকে হাত-পামুখ বেঁধে একটা নৌকায় উঠান হলো।

মিঃ আহমদ অস্ফুট ধ্বনি করলেন নৌকায়?

হাঁ, আব্বা, সেই নৌকা অবিরত কয়েকদিন চলার পর অজানা-অচেনা এক শহরে গিয়ে পৌঁছল। সেখানেও গভীর রাতে আমাদের পূর্বের মতই অবস্থা করে

একটা ঘোড়ার গাড়িতে উঠান হলো। তারপর গাড়িখানা উঁচুনীচু পথ বেয়ে চলতে লাগল। আমাদের শরীরে সে ঝাঁকুনির ব্যথা অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়ে উঠল। তবু সহ্য করতে বাধ্য হলাম। তাছাড়া কোন উপায়ও ছিল না।

উঃ! শয়তান নরপিচাশের দল–আহমদ সাহেব দাঁতে দাঁত পিষে বললেন।

মিঃ হারুন বলে উঠলেন–দস্যু বনহুরের কাজ ছাড়া এ কারও কাজ নয়। আমরা জানি, সে যেমন হৃদয়হীন দস্যু তেমনি নারী

সুফিয়া কঠিন কণ্ঠে বলে উঠলআপনি ভুল করছেন। তাঁর মত হৃদয়বান দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই—

মিঃ হারুন হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন—মিস সুফিয়া, আপনি তার উপরের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু তার

না, আপনি চুপ করে শুনুন—তারপর বলবেন।

মিঃ আহমদ বলেন, হাঁ ইন্সপেক্টার, আগে ওর কথা শোনা যাক, তারপর সাব বুঝা যাবে। আচ্ছা তুমি বল মা।

আব্বা, আমি এক নারীহরণকারী গুণ্ডাদলের হাতে পড়েছিলাম যারা ঐ ব্যবসায়ে লাখ লাখ টাকা উপার্জন করছিল।

বল মা, তারপর কি হলো?

হাঁ আব্বা, আমাকে একটা পুরানো বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। শুধু আমাকে নয়, আমার সঙ্গিনীগণকেও সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। সে বাড়ি নারী ব্যবসায়ী এক মহিলার। আপনাদের বুঝিয়ে বলতে পারব না সে কি রকম স্থান। সেই মহিলার চেহারা মনে হলে আজও হৃদয় ভয়ে শিউরে ওঠে। ভীমকায়, বিরাটদেহী এক মহিলা। যার প্রভাব গোটা দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে। ওই মহিলার অনুচরগণ বিভিন্ন দেশ থেকে নারী এবং শিশুদেরহরণ করে নিয়ে যেত সেখানে। সেখান থেকে চালান হত বিভিন্ন জায়গায়। আমাকে সেই মহিলা একটি বিরাট কক্ষে বন্দী করে রাখল। সেখানে আমার মত আরও কত যে যুবতী ধরে এনে আটকে রাখা হয়েছে, তার শেষ নেই। প্রতি রাতে ওই মহিলার কাছে লোক

আসত। যাকে পছন্দ হত উচিত মূল্য দিয়ে ক্রয় করে নিয়ে যেত। আমিও একদিন বিক্রি হলাম। ঝিন্দের রাজকুমারের এক গুণ্ডা অনুচর আমাকে কিনে নিয়ে গেল।

অবশ্য এ কথা আমি পরে জানতে পেরেছিলাম। মাতাল ঝিন্দ রাজকুমারের জঘন্য মনোবৃত্তি থেকে সেদিন আমার উদ্ধার ছিল না, যদি এই মহান ব্যক্তি আমাকে বাঁচিয়ে না নিতেন, সুফিয়া আনমনা হয়ে পড়ল।

মিঃ আহমদের চোখ-মুখেও ভাবের উদয় হলো, তিনি কন্যার অন্তরের কথা হৃদয় দিয়ে উপলদ্ধি করলেন।

কিন্তু মিঃ হারুনের মুখে একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল, বললেন—দস্যু বনহুরের এটাও মস্ত অভিনয়। নইলে এতগুলো যুবতীকে নারীহরণকারীদের হাতে রেখে শুধু আপনাকে সে উদ্ধার করত না, আপনি যদি পুলিশ সুপারের কন্যা না হতেন। পুলিশ সুপারের মেয়েকে উদ্ধার করে তার পিতার নিকটে ফিরিয়ে দিয়ে দস্যু নিজেকে সাধু বানাতে চেয়েছিল।

আপনি এসব তার সম্বন্ধে অন্যায় উক্তি করছেন। সত্যি তিনি মহৎ মহান দস্যু হলেও তিনি একজন হৃদয়বান লোক। আপনি বলেছেন, তিনি শুধু আমাকেই উদ্ধার করেছেন, তা নয় পুলিশ যা পারেনি রাজ্য পরিচালকগণ যা করতে সক্ষম হয়নি, সেই অসাধ্য সাধন করেছেন দস্যু বনহুর। তিনি নারীহরণকারীদের শুধু সায়েস্তাই করেননি, সমূলে তাদের ধ্বংস করেছ।

মিঃ আহমদ অস্ফুট কন্ঠে ধ্বনি করে উঠলেন–কি বলিস মা।

হাঁ আব্বা, নারীহরণকারীদেরকে এক এক করে তিনি হত্যা করেছেন। তারপর যত যুবতী তাদের বন্দীখানায় ছিল, সবাইকে তিনি বোনের মত সম্মান দিয়ে যার যার আবাসে পৌঁছে দিয়েছেন। আর যাদের তিনি পৌঁছে দিতে পারেননি, তাদের থানা অফিসারদের হেফাযতে দিয়েছেন যেন ওরা স্বদেশে নিজ নিজ পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজনের নিকট পৌঁছতে সক্ষম হয়। বলুন আপনারা, তিনি এসব করে অন্যায় করেছেন?

মিঃ হারুন কোন কথা বললেন না।

মিঃ আহমদ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন কন্যার মুখের দিকে।

০৫.

ভীম সেন নূরীকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছে। সকল অনুচরকে বলে দিয়েছে—এই তাদের রাণী। যা বলবে সে, তাই যেন ওরা করে বা শোনে। ভীম সেন নিজেও নূরীর কথা মানতো, যেখানেই দস্যুতা করতে যাক নূরীর পরামর্শ নিত, ভীম সেন নূরীর মধ্যে এমন একটা আলোর সন্ধান পেয়েছে। যা তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। দস্যু দুহিতা নূরী নিজের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে ভীম সেনের দলের মধ্যে, নূরীর বুদ্ধি এবং কৌশলে সবাই তাকে রাণী বলে মেনে নিতে অস্বীকার করল না।

ভীম সেন যখনই জাহাজে দূরদেশে দস্যুতা করতে যেত তখনই নূরী তাদের সঙ্গে যেত, মনিও যেত তাদের সঙ্গে।

মনি এখন হাঁটতে শিখেছে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা বলতে শিখেছে। নূরীকে মনি মা বলে ডাকে।

দিন যায়।

নূরী এখন ভীম সেনের দলের একচ্ছত্র রাণী। ডাকু ভীম সেন এবং রঘু নূরীর কথায় উঠে-বসে, এমনকি নুরী যেদিন দস্যুতা করতে যাবার জন্য আগ্রহ দেখায় তখনই ভীম সেন দলবল নিয়ে যাত্রা করে।

ভীম সেনের দলকে নূরী নিজের বশীভূত করার পেছনে ছিল একটা গোপন অভিসন্ধি। যেদিন নূরী বজরা ত্যাগ করে চলে আসে, সেদিন যে শপথ গ্রহণ করেছিল, বনহুর তার ভালবাসার প্রতিদানে চরম আঘাত দিয়েছে—এর প্রতিশোধ সে নেবে। তার হৃদয়ে যে বিষের আগুন সে জ্বেলে দিয়েছে, সে আগুন দিয়ে বনহুরকে নূরী দগ্ধীভূত করবে। বনহুরকে চরম আঘাত দিতে পারলে তবেই হবে তার শান্তি। চৌধুরীকন্যা মনিরার সকল সাধ সে ধূলায় মিশিয়ে দেবে। বনহুরকে নূরী শিশুকাল থেকে ভালবেসে এসেছে, প্রাণের চেয়েও অধিক সে ভালবাসা, মায়া মমতা। সেই গভীর প্রেমকে বনহুর পদদলিত করে অন্য একটি মেয়েকে স্ত্রীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সব আঘাত নূরী সইতে পারে। মাথায় যদি বজ্রাঘাত হত তাতেও নূরী বিচলিত হত না যাত আঘাত পেয়েছে সে, বনহুর যখন বলেছে, মনিরাকে সে বিয়ে করেছে। না না, এ কথা নূরী ভাবতেও পারে না। হুরসে যে তার একার! ওকে ছাড়া নূরী বাঁচতে পারে না। সে বিষের জ্বালা নূরীর

মনে দাউ দাউ করে জ্বলছিল। যতক্ষণ এর প্রতিশোধ সে না নিতে পেরেছে ততক্ষণ তার মনের সে আগুন নিভবে না।

আজ সেই দিন সামনে উপস্থিত।

নূরী চেয়েছিল নিজে একটা দস্যুদল গঠন করবে। তারপর বনহুরকে কেমন করে শায়েস্তা করতে হয় দেখিয়ে দেবে। দেখিয়ে দেবে তার প্রেমকে উপেক্ষা করার কি পরিণতি। তার সে ইচ্ছা অতি সহজেই পূরণ হলো–ভাগ্যই তাকে টেনে নিয়ে এসেছে ডাকু ভীম সেনের গুহায়।

নুরী মনের অভিসন্ধি মনে চেপে দিনের পর দিন নিজের দলকে অতি নিপুণভাবে তৈরি করে নিল যাতে দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করতে তার এতটুকু বেগ পেতে না হয়।

কিন্তু দিনরাত নুরী মনের সঙ্গে দ্বন্দ করে চলল, শেষ পর্যন্ত বনহুরের নিকট তার দলের যদি পরাজয় হয়। বনহুরকে যদি পাকড়াও করতে না পারে তাহলে? কিন্তু তবু যে কোন উপায়ে, হোক ওকে সমুচিত শাস্তি না দেয়া পর্যন্ত তার হৃদয়ের জ্বালা নিভবে না। প্রতিশোধ চাই, প্রতিশোধ–

একদিন ভীম সেনকে বলল নূরী বাপু, তোমার কাছে আমি কোনদিন কিছু চাইনি, একটা কথা তোমাকে রাখতে হবে।

ভীম সেন হেসে বলল–বল, কি কথা তোমার রাখতে হবে মা! আমার জীবন দিয়েও তা রাখতে চেষ্টা করব।

বাপু, আমি জানি, পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ডাকু তুমি।

হাঁ মা, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ভীম সেনের মত বিখ্যাত ডাকাত আর ত্রিভুবনে নেই। কেন মা?

বাপু, শুনেছি দস্যু বনহুর নাকি মস্ত দস্যু। কেউ নাকি তাকে কোনদিন বন্দী করতে পারে না, আমি চাই তাকে বন্দী করতে।

হাঃ হাঃ হাঃ এই কথা। দস্যু বনহুর সে আবার একজন মস্ত দ কি যে বল মা। কিন্তু হঠাৎ এ সখ কেন হলো মা?

বাপু, আমার বড় রাগ হয় যখন শুনি দস্যু বনহুর নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দস্যু। তাই ওকে বন্দী করে কিছুটা সাজা দেয়া আমার ইচ্ছা।

বেশ বেশ, তোমার ইচ্ছা আমি কি পূরণ না করে পারি?

ভীম সেন সেই দিনই তার অনুচরগণকে ডেকে বলল–তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও। আমি আজ রাতেই দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করতে যাব।

নূরী চমকে উঠল, কথাটা সে নিজে বলেছে সত্য, কিন্তু অপরের মুখে এ কথাটা যেন তার কানে গরম সীসা ঢেলে দিল। অনেক চিন্তা করার পর নিজেকে কঠিন করে নিল নূরী। না, সে কিছুতেই নিজেকে বিচলিত করবে না। মনকে সে পাষাণ করবে। বনহুর তার সব আশা-আকাঙ্খা-বাসনা ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছে। কিছুতেই সে ওকে ক্ষমা করবে না। কিন্তু ভীম সেনের দল কি পারবে তাকে বন্দী করে আনতে? কারও সাধ্য নেই বনহুরকে বন্দী করে। শুধু নূরী—নূরী পারে তাকে বন্দী করতে। তাকে নাকানি চুবানি খাওয়াতে।

নূরী গোপনে ভীম সেনের কানে কিছু গোপন কথা বলে নিল। যা বলল, তাতে দস্যু বনহুরকে বন্দী করা মোটেই কঠিন হবে না।

কয়েকখানা বড় নৌকা নিয়ে ভীম সেনের দল নদীপথে রওয়ানা দিল। নূরী এবং মনিও চলল তাদের সঙ্গে। পথে যাতে নূরী ও তার শিশুর কোন কষ্ট না হয় সেজন্য ভীম সেনের লক্ষ্য কম ছিল না। দিনের বেলায় নৌকাগুলো নদীর কোন জঙ্গলময় স্থানে লুকিয়ে রাখা হত, আর গোটা রাত ধরে চলত তাদের পথচলা। কয়েকদিন অবিরত চলার পর কান্দাই বনের অদূরে শম্ভ নদীর একটা গোপন স্থানে তারা নৌকা রাখল। জায়গাটা জঙ্গলে ঘেরা একটা বাঁক। সহসা কারও নজরে পড়বে না নৌকা। নূরী বহুদিন বনহুরের সঙ্গে শম্ভু নদীতীরে ঘোড়ার চড়ে বেড়াতে এসেছে। কাজেই এসব পথ তার অতি পরিচিত।

নূরী ভীম সেনের অনুচরদের নিয়ে নৌকা থেকে নেমে পড়ল। একে অন্ধকার রাত তদুপরি ভীম সেনের জংলী অনুচরগণের জমকালো চেহারা। কাল রাতের অন্ধকারে ওদের কাল দেহ মিশে যেন এক হয়ে গেল।

সবাই অস্ত্র নিয়ে নূরীকে অনুসরণ করল।

নূরী নৌকা থেকে নেমে পুনরায় একবার সবাইকে বলল–তোমাদের কাছে আমার বারবার অনুরোধ, দস্যু বনহুরকে তোমরা জীবন্ত পাকড়াও করবে, ভুল করেও যেন তার শরীরে আঘাত কর না।

রঘু বলল–যদি সে আক্রমণ করে?

নূরী কিছু বলার পূর্বেই বলল ভীম সেন–তোমরা শুধু নিজেদের রক্ষা করবে।

নূরী, ভীম সেন ও রঘু চলল আগে, আর তাদের দলবল চলল পেছনে।

অন্ধকার রাতে চলা ডাকাত বা দস্যুদের কষ্টকর কিছু নয়। এসব তারা অভিজ্ঞ ও অভ্যস্ত। কাজেই ভীম সেনের দল নূরী ও সর্দারের পদশব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চললো।

যে পথে নূরী অগ্রসর হলো সে পথ অতি গোপনীয়। এ পথের সন্ধান আর কেউ জানে না—একমাত্র বনহুর আর নূরী ছাড়া। আর জানে রহমান।

নূরী বনহুরের আস্তানার নিকটবর্তী হয়েই ভীম সেন ও তার দলবলকে বলল–আমি গোপনে আস্তানার মধ্যে প্রবেশ করছি, যতক্ষণ ফিরে না আসব ততক্ষণ তোমরা এই বনের মধ্যে ঝোপঝাড়ের আড়ালে অতি সাবধানে লুকিয়ে থাকবে—দেখ কোনরকম যেন শব্দ না, হয় আমি এসে বাঁশীতে ফুঁ দেব। সেই বাঁশী টেনে আনবে বনহুরকে।

ভীম সেন বলল বাশী। বাঁশী তুমি কোথায় পাবে মা?

সে অনেক কথা–বলব পরে।

ইতোমধ্যে নূরী যখন ভীম সেনের দলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছিল তখনও একবার ভীম সেন প্রশ্ন করেছিল—এসব পথ তুমি কি করে চিনলে মা?

নূরী বলেছিল, বাপু, একদিন সব তোমাকে খুলে বলব আজ তুমি কিছুই জানতে চেওনা।

ভীম সেন বাশী সম্বন্ধে প্রশ্ন করে একটু লজ্জা পেল। নূরী চলে গেছে ততক্ষণে।

ভীম সেন দলবল নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হলো। এসব ব্যাপার তার কাছে এমন কোন নতুন নয়। ভীম সেন নূরীকে নিয়ে সতর্ক রইলো কখন নূরী ফিরে আসে।

নূরী আসার সময় মনিকে নৌকায় ঘুমপাড়িয়ে রেখে এসেছে। দু'জন অনুচরকে তার পাহারায় রেখে এসেছে সে। কাজেই নূরী মনির ব্যাপারে নিশ্চিন্ত। নূরী অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আস্তানায় প্রবেশ করল। যে পথে নূরী আস্তানায় প্রবেশ করল এ পথ অত্যন্ত গোপন পথ। কাজেই এদিকে বনহুরের কোন অনুচর পাহারায় থাকত না। নূরী অতি সতর্কতার সঙ্গে কৌশলে এগিয়ে চলল। অনেক দিন আগে ছেড়ে যাওয়া তার নিজের কক্ষের দিকে।

নূরী নিজ কক্ষের পাশে এসে থমকে দাঁড়াল। ঐ স্থান থেকে বনহুরের কক্ষ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কক্ষে আলো জ্বলছে তখন। নিশ্চয়ই আজ বনহুর আস্তানা ছেড়ে বাইরে যায়নি। এটাই নূরী চেয়েছিল, মনে মনে খুশি হলো সে।

অতি কৌশলে নিজের কক্ষে প্রবেশ করল নূরী। কক্ষ শূন্য। কক্ষে কোন আলো না থাকায় কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু আজও নূরীর মানসপটে কক্ষের প্রতিটি স্থান ও তার নিজ হাতে রাখা জিনিসপত্রের অস্তিত্ব অনুভব করল। নূরী হাতড়িয়ে এগুলো। পূর্বধারে তার বিছানা পাতা ছিল। হাঁ, ঠিক সে ভাবেই রয়েছে। একপাশে আলনায় তার জামা কাপড়গুলো সাজান ছিল—হাঁ, সেগুলোও ঠিক তেমনি আছে। কোন জিনিস নড়চড় হয়নি। নূরী এবার দেয়াল হাতড়িয়ে তাক খুঁজে দেখতে লাগল। হাঁ পেয়েছে ছোট্ট একটা লম্বা বাক্স। নূরী অন্ধকারেই বাক্সটা চেপে ধরল বুকে। এ বাক্সে রয়েছে তার অতি প্রিয় বাঁশী, যে বাঁশীর সুর শুধু কান্দাই বনের গাছের শাখায় শাখায় দোলা জাগায়নি, বনের প্রতিটি পশুপক্ষী সে সুরে তন্ময় হয়ে গেছে। তন্ময় হয়েছে বনহুরের অনুচরগণ। স্তব্ধ হয়ে গেছে কান্দাই বনের আলো-বাতাস।

নূরী যখন ঝর্ণার পাশে বসে বাঁশী বাজাত তখন দস্যু বনহুর যেখানেই থাক বাঁশীর সুর কানে পৌঁছামাত্র আত্মহারা হয়ে ছুটে আসত তার পাশে। এমন কোন শক্তিই ছিল না যে শক্তি বনহুরকে বাধা দেয়।

আজ নূরী সেই যাদুকাঠি তুলে নিল হাতের মুঠায়। তার দু'চোখে আজ প্রতিহিংসার তীব্র জ্বালা। অতি সন্তপর্ণে নূরী নিজ কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো।

এত সহজে সে আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে ভাবতে পারেনি। নূরী, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো কিন্তু একটা আশঙ্কা বারবার জাগতে লাগল তার হৃদয়ে। বুকটা টিপ টিপ করছে।

নূরী এসে দাঁড়াতেই ভীম সেন আর রঘু বেরিয়ে এলো। ভীম সেন বলল–কি হলো মা? খবর ভাল?

হাঁ। গলাটা কাঁপলো নূরীর। রঘু বলল, দস্যু বেটা আজ তাহলে বাইরে যায়নি?

নূরী কম্পিত ঠোঁটে বাঁশীখানা চেপে ধরল। বহুদিন পর আজ আবার সেই সুর। নূরীর ঠোঁটে বাঁশীর সুর কেঁপে কেঁপে উঠল। বনের শাখায় শাখায় পাখিগুলো পাখা ঝাপটা দিয়ে উঠল, স্তব্ধ বাতাসে জাগল স্পন্দন। দোলা লাগল পাতায় পাতায়।

নূরী চাপাকণ্ঠে বলল–দস্যু বনহুর নিশ্চয়ই আসবে, অতি সাবধানে তাকে ধরে ফেল তোমরা। দেখো যেন আঘাত করোনা। আবার নূরী বাঁশীতে ঠোঁট রাখল। অপূর্ব সুরের মুর্ঘনায় অন্ধকার বনভূতি মুখর হয়ে উঠল।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট–কই সে তো আসছে না। নূরীর বাঁশীর সুরে আরও জোরে ঝঙ্কার উঠল।

ঐ তো শুকনো পাতায় মানুষের পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। নূরীর বাঁশীর সুর লক্ষ্য করে কে যেন এগিয়ে আসছে।

ভীম সেন রঘুকে ইংগিত করল।

পদশব্দ আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। ওইতো সামনে এগিয়ে আসছে, কে। রঘু শিস্ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে ভীম সেনের দল ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মুহূর্তে থেমে গেল নূরীর বাঁশীর সুর।

প্রচণ্ড ধস্তাধস্তির শব্দ। পরমুহূর্তে ভীম সেনের কঠিন গম্ভীর কণ্ঠস্বর–খবরদার, নড়ো না।

নূরী একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখল—একজনকে প্রায় পঞ্চাশ জন লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘিরে ধরেছে। নিশ্চয়ই বনহুর ছাড়া অন্য কেউ নয়। কেমন জব্দ করেছে নূরী তাকে।

ভীম সেন দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করার জন্য শিকল সঙ্গে এনেছিল, ওকে মজবুত করে বেঁধে ফেলা হলো। তারপর সবাই মিলে নিয়ে চলল তাকে।

.

হঠাৎ এ অবস্থার জন্য বনহুর একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। গভীর রাতে যখন সে বিছানায় শুয়ে নানা কথা চিন্তা করছিল–মা, মনিরা নূরী–পর পর সকলের কথা ভেসে উঠছিল তার মনের পর্দায়। কিছুতেই ঘুম আসছিল না তার চোখে, এমন সময় তার কানে ভেসে আসে সেই সুর–যে সুর তার অতি পরিচিত। বহুদিন বনহুর এই সুরের আকর্ষণে ছুটে গেছে বন হতে বনান্তরে। নূরী কোন গোপন স্থানে লুকিয়ে বাঁশী বাজাত। বনহুর তাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যেত। নূরী লুকিয়ে থেকে হাসত খিল খিল করে। আজ সেই বাঁশির সুর বনহুরকে তন্দ্রাচ্ছন্নের মত করে ফেলে। বনহুর জানে নূরী হারিয়ে গেছে। রাগ বা অভিমান করে চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না। তবে কি নূরী ফিরে এসেছে? সেই পরিচিত সুরে তাকে আহ্বান জানাচ্ছে? বনহুর কিছু চিন্তা না করে নিরস্ত্রভাবে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল? ভুলে গিয়েছিল সেখানে কোন বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে।

বুদ্ধিমান দস্যু বনহুর নূরীর চিন্তায় গভীরভাবে মগ্ন হয়ে পড়েছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে নূরীর বাঁশীর সুর–বনহুর ভুলে গিয়েছিল নিজের অস্তিত্ব প্রবল একটা আকর্ষণে ছুটে এসেছিল সে এখানে–নইলে তাকে বন্দী করা এত সহজ ছিল না। শুধু নূরীর বাঁশীর সুরই তাকে এই পরাজয়ের মালা পরিয়ে দিল।

দস্যু বনহুরকে বন্দী করে এ সাধ্য ছিল না ভীম সেন বা তার দলের। যতবড় ডাকাত বা দস্যু হোক, কিছুতেই ওকে বন্দী করতে সক্ষম হত না, যদি নূরী কৌশল অবলম্বন না করত। নূরীর বুদ্ধি ও চতুরতায় বন্দী হলো দস্যু বনহুর।

বনহুরকে শিকলে বেঁধে নৌকায় তুলে নেয়া হলো। বনহুর জানল, না কে তাকে এভাবে বন্দী করল। আর কোথায়ই বা তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কয়েক দিন অবিরত চলার পর ভীম সেনের আস্তানায় পৌঁছল তারা।

বনহুরকে পূর্বের ন্যায় শিকলাবদ্ধ অবস্থায় এখানে আনা হলো পাহাড়ের একটি গুহায় আবদ্ধ করে রাখা হলো। ক্রুদ্ধ সিংহ বন্দী হলে তার যেমন অবস্থা হয়, তেমনি হলো দস্যু বনহুরের।

ক'দিন সম্পূর্ণ অনাহারে রয়েছে সে।

কিছু মাংস আর রুটি তাকে নৌকায় খেতে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু বনহুর তা খায়নি শুধু পানি খেয়েছিল মাঝে মাঝে।

অন্য নৌকায় থাকলেও নূরী এ খবর পেয়েছিল। যতই কঠিন হতে যাক সে, তবু পারছিল না। মনের মধ্যে ব্যথার কাঁটা খচখচ করে বিঁধছিল। যার এতটুকু কষ্ট তার কোন দিন সহ্য হয় না, যার মলিন ব্যথাভরা মুখ দেখলে নূরীর হৃদয় ডুকরে কেঁদে উঠে, যার জন্য নূরী প্রাণ দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না, সেই হুর আজ ক'দিন সম্পূর্ণ অনাহারে রয়েছে। নূরীর অন্তরটা গুমড়ে কেঁদে মরলেও কিছু বলতে বা করতে পারছিল না। কারণ বন্দীর প্রতি অনুরাগ দেখান শোভা পায় না তার। তাছাড়া ভীম সেন এতে সন্তুষ্ট হবে না। নূরী এখন তীব্র জ্বালায় মরছে। না পারছে বনহুরের কষ্ট সহ্য করতে, না পারছে তার প্রতি কোন দরদ দেখাতে। নূরী নিজে ভেতরে ভেতরে ছটফট করতে লাগল। কাউকে মনের কথাও বলবে না বা বলার সাহসও নেই নূরীর। বনহুরকে বন্দী করে আনতে ভীম সেনের দলকে যা দারুণ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তা বলার নয়। এত করার পর বন্দী সম্বন্ধে সহানুভূতি দেখান তার পক্ষে সমীচীন হবে না। ভীম সেন ডাকাত–কঠিন প্রাণ মানুষ। হয়ত হিতে বিপরীত হতে পারে। হয়ত ভুল বুঝতে পারে। মনের কোণে দারুণ ব্যথা নীরবে সহ্য করে চলল নূরী।

একটা অন্ধকার গুহায় বনহুরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়েছে। গুহার এককোণে একটা মশাল দপ দপ করে জ্বলছে। গুহার দরজায় দু'জন ভীষণ চেহারার দস্যু সুতীক্ষ্ণ বর্শা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

গুহার সামনে অগ্নিকুণ্ড দাউ দাউ করে জ্বলছে।

ভীম সেনের আস্তানা আজ ঝিমিয়ে পড়েছে। গত কদিনে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম আর জাগরণের পর সবাই বিশ্রামের জন্য শয্যা গ্রহণ করেছে।

কিন্তু নূরীর চোখে ঘুম নেই।

বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে সে। পাশে ঘুমন্ত মনি। নূরী শয্যা ত্যাগ করল, নিজের খাবার সে অতি যত্নে ঢেকে রেখেছে। তার হুর আজ ক'দিন উপবাস রয়েছে আর সে খাবে কোন মুখে। খাবারের থালা হাতে দরজার পাশে এসে উঁকি দিল, কোন রকমে যদি একবার ওর মুখে একটু খাবার তুলে দিতে পারত। কিন্তু উপায় নেই। নূরী ভেবেছিল, বনহুরকে কঠিন শাস্তি দিলে তার মনে শান্তি আসবে। কই, তা তো হলো না। বরং ওকে বন্দী করে নূরীর হৃদয়ের জ্বালা আরও দশগুণ বেড়ে গেছে। নূরী খাবারের থালা হাতে ফিরে এলো কুঠরির মধ্যে। পাথরের খণ্ডটার উপরে খাবারের থালা রেখে বসে পড়ল হতাশায় ভরে উঠল তার মন।

রাত ভোর হলো, গাছে গাছে পাখি পাখা ঝাপটে জেগে উঠল বিছানায় জেগে উঠল মনি। নূরী তখনও খাবার থালার সামনে বসে অশ্রু বিসর্জন করছে।

মনি বিছানার পাশে নূরীকে না দেখে আধো ভাঙ্গা কণ্ঠে ডাকল মাম্মা। মাম্মা। কই।

নূরী তাড়াতাড়ি চোখ মুছে উঠে আঁড়াল, ফিরে তাকিয়ে দেখল মনি বিছানায় বসে দু'হাত প্রসারিত করে তাকে আহ্বান জানাচ্ছে। সুন্দর ছোট্ট ফুটফুটে মুখে এ কিসের আকুলতা। ওর ঐ মুখখানা কেন নূরীকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় তার হুরের কথা। সেই নাক, সেই মুখ, সেই গভীর নীল দুটি চোখ। নূরী এগুতে গিয়ে এগুতে পারে না। সুন্দর ছোট ললাটে কুঞ্চিত একগোছা চুল ঠিক তার হুরের মত। নূরী ছুটে এসে বুকে তুলে নেয়, আদর করে ডাকে মনি, আমার মনি, বাপ আমার —

মনি নূরীর গলা জড়িয়ে আনন্দে স্কুট ধ্বনি করে ওঠে–মাম্মা! মাম্মা! তুমি ঘুমোওনি?

সুন্দর ভাঙা ভাঙা অস্ফুট ধ্বনি নূরীর কানে মধু বর্ষণ করে।

নূরী বলে—না বাপ, আমি ঘুমাইনি।

কেন আম্মা?

নূরী তার কোন জবাব দিতে পারল না।

মনির ফুটফুটে নধর শরীরে তখন কোন জামা ছিল না। নূরী মনির দক্ষিণ হাতখানা নিয়ে বারবার দেখতে লাগল। মনির দক্ষিণ বাজুতে একটা জট রয়েছে। নূরী মাঝে মাঝে এই জট অবাক হয়ে দেখত, সুন্দর ফর্সা হাতে একটি কায়লা সঙ্কেতচিহ্ন।

নূরী মনিকে নিয়ে বনহুরের কষ্টের কথা ভুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু যখন শুনল, বনহুরকে পাথরে বেঁধে চাবুকের আঘাত করা হবে, তখন নূরী কিছুতেই নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। একে আজ কদিন অনাহারে কাতর সে, তারপর এই নির্মম শাস্তি না না, কিছুতেই এ হতে পারে না। ভীম সেনকে বলে সে এই আদেশ রদ করবে।

নূরী ছুটে গেল ভীম সেনের গুহায়, কিন্তু তার পূর্বেই বনহুরকে পাথরখণ্ডের সঙ্গে দু'হাত বেঁধে চাবুক দিয়ে মারা হচ্ছে। অন্ধকার গুহায় মশালের আলো দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। গুহায় পাথরের ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখল নূরী। একজন জমকালো লোক চাবুক নিয়ে বনহুরের দেহে আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে। ভীম সেন সামনে দণ্ডায়মান। সকল অনুচর অস্ত্র হাতে দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। রঘু ডাকু ভীম সেনের পাশে একটা ছোরা হাতে দণ্ডায়মান।

আঘাতের পর আঘাত পড়ছে বনহুরের শরীরে। দেহের জামা ছিড়ে একপাশে ঝুলে নেমেছে। দেহের কতক অংশ বেরিয়ে পড়েছে। কয়েক জায়গা কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

নূরী দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেলল। একি নির্মম দৃশ্য। কেন সে এমনভাবে প্রতিশোধ নিতে গেল কেন সে এমন ভুল করল।

বনহুরের শরীরে আঘাত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নূরী নিজের শরীরে সেই আঘাত যেন অনুভব করতে লাগল। বিকৃত হলো তার মুখমণ্ডল।

দু'হাতে বুক চেপে ধরে ছুটে গেল। নিজের গুহায়। মনিকে বুকে তুলে নিয়ে ফুঁপিয়ে কেদে উঠল। চোখের সামনে ভাসতে লাগল বনহুরের প্রতি

সেই নির্মম যন্ত্রণার করুণ দৃশ্য। নূরী উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠল।

বহু চেষ্টা করেও নূরী বনহুরকে উদ্ধার করার উপায় খুঁজে পেল না।

নূরীকে কাঁদতে দেখে মনির মনের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। কিছুতে ভেবে পাচ্ছে না তার মা এমন করে কাঁদছে কেন?

মনি অস্ফুট কন্ঠে বলল–আম্মা, তুমি অমন করে কাঁদছ কেন?

নূরী কি বলবে, কি জবাব দেবে শিশু মনির প্রশ্নের? কি করে বলবে যাকে ধরে আনা হয়েছে সে অপর জন নয়, সে তার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। কেমন করে এ কথাটা কচি মনিকে বুঝিয়ে বলবে।

নূরী নীরবে কাঁদে।

আজও গোটা দিন নূরী কিছু মুখে দিল না। সেই মর্মস্পর্শী হৃদয় বিদারক দৃশ্যটা বারবার মনের পর্দায় ভেসে উঠতে লাগল। দেয়ালের সাথে হাত দুটো শিকলে বাঁধা—বনহুরের শরীরে চাবুকের আঘাত করা হচ্ছে তার সুন্দর দেহ কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। মুখোভাবে ফুটে উঠেছে দারুণ যন্ত্রণার চিহ্ন। অথচ নীরব সে। একটি শব্দও সে করছে না। যতই সে দৃশ্যের কথা ভাবে নূরী, ততই তার মনে বেদনার কাটা শেল হয়ে বিদ্ধ হয়। নূরী কি জানত বনহুরের কষ্ট ব্যথা তারই হৃদয়ে এসে আঘাত করবে।

আজও বনহুর জানে না, কেন এভাবে বন্দী করে আনা হয়েছে। কেন তার ওপর এই নির্মম কশাঘাত করা হচ্ছে। কার অদৃশ্য ইংগিত রয়েছে এর পেছনে, কিছুই জানে না সে।

বনহুর জানে নূরী বেঁচে নেই।

আর বেঁচে থাকলেও সে কোথায় আছে, কেমন আছে, কে জানে?

.

গভীর রাত।

নূরী শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল। ওপাশ থেকে একটা মাটির ছোট্ট পাতিল তুলে নিল হাতে, তারপর বেরিয়ে এলো গুহা থেকে। অদূরে আর একটা গুহার মুখে দু’জন ভীম চেহারার দস্যু সুতীক্ষ্ণ ধারাল বর্শা হাতে পাহাড়া দিচ্ছে। সামনে অগ্নিকুণ্ড দাউদাউ করে জ্বলছে।

নূরী মাটির ছোট্ট পাতিল হাতে চারদিক সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগুলো। নিস্তব্ধ বনভূমির জমাট অন্ধকার অগ্নিকুণ্ডের আলোতে যদিও কিঞ্চিত আলোকময় হয়ে উঠলো, তবুও বেশ অন্ধকার বোধ হচ্ছিল। নূরী অতি সতর্কতার সঙ্গে ভীম চেহারার পাহারদার দু'জনের পাশে এসে দাঁড়াল।

নূরীকে দেখে বিস্ময় ফুটে উঠল পাহারাদারদের চোখেমুখে। বলল একজন—রাণীমা, তুমি!

নূরী ফিস্ ফিস করে বলল তোমাদের জন্য একটু তাল রস রেখেছিলাম, এনেছি খাবে?

পাহারাদার দু'জনের চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হলো।

তালরস পেলে এরা সব ভুলে যায়। তাছাড়া রাণীমা যখন নিজ হাতে নিয়ে এসেছে—কম কথা নয়।

পাহারাদার দু'জন নূরীর হাত থেকে মাটির পাতিলটা নিয়ে ঢক ঢক করে এক নিঃশ্বাসে কিছুটা খেয়ে দ্বিতীয় জনের হাতে দেয়। সেও খুশিতে আত্মহারা, অল্পক্ষণেই ছোট পাতিলটা শূন্য হয়ে গেল।

ঢুলু ঢুলু করছে পাহারাদার দস্যু দু'জনের চোখ। এ ওর গায়ে ঢলে পড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'জন চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল অগ্নিকুণ্ডের পাশে।

নূরী দ্রুত হাতে পাহারাদার দু'জনের কোমর হাতরে গুহার দরজা খোলার চাবি বের করে নিল। তারপর ফিরে গেল নিজের গুহায়, দ্রুত হাতে কিছুটা খাবার নিয়ে পুনরায় ফিরে এলো, তারপর দরজা খুলে প্রবেশ করল বনহুরের অন্ধকার গুহার মধ্যে।

গুহার এক পাশে মশাল জ্বলছে। সেই আলোতে নূরী তাকিয়ে দেখলো অদূরে একটা প্রশস্ত পাথরের উপরে উবু হয়ে শুয়ে আছে বনহুর।

নূরী কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়াল। বনহুর ঘুমাচ্ছে। গোটা দিন তার উপরে যে নির্মম যন্ত্রণা চলেছে সে অতি জঘন্য। নূরীর গণ্ড বেয়ে দরদর করে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। ধীরে ধীরে এগুলো নূরী বনহুরের দিকে। পাশে গিয়ে খাবারের থালাটা রাখলতারপর বসে পড়ল ওর পাশে। মশালের আলোতে দেখল, বনহুরের

পিঠের চামড়া কেটে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। ব্যথিত দৃষ্টিতে নূরী দেখতে লাগল। বনহুরের জামাটা ছিড়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে। পিঠ ও দক্ষিণ হাতখানা সম্পূর্ণ বেরিয়ে পড়েছে। নূরীর দৃষ্টি হঠাৎ চলে গেল বনহুরের দক্ষিণ বাজুতে। একটা কাল জট তার সুন্দর হাতের বাজুতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নূরী চমকে উঠল এ চিহ্ন যে তার মনির বাজুতেও রয়েছে। কিন্তু ভেবে পায় না নূরী, বনহুরের সঙ্গে তার মনির এত মিল রয়েছে কেন? যাক ক্ষতগুলোর দিকে। ব্যথায় দিয়ে উঠল নূরীর হৃদয়। মোচড় নিজের ওসব ভাবনার সময় এখন তার নেই। নূরী আবার তাকাল বনহুরের পিঠে অজ্ঞাতে হাতখানা ওর পিঠে এসে পড়ল। খুব ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল নূরী।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের ঘুম ভেঙে গেল, কার কোমল হাতের স্পর্শ তার পিঠে এসে পড়েছে। বনহুর চট করে উঠে বসল কিন্তু নূরী ততক্ষণে মাথায় ঘোমটা টেনে সরে বসে।

বনহুর উঠে বসে তাকাল, কঠিন স্বরে বলল-কে তুমি?

নূরী এভাবে ঘোমটা টেনে দিয়েছিল যে তাকে চিনার কোন উপায় ছিল। নূরীর চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। কোন কথা বলল না।

বনহুরের অভ্যাস নয় কোন নারীর দেহ স্পর্শ করা। সে ইচ্ছা করলেই নূরীর ঘোমটা সরিয়ে ফেলতে পারে কিন্তু সে তা করল না।

নূরী নীরবে খাবার থালাটা এগিয়ে দিল বনহুরের সামনে।

বনহুর বিস্ময়ভরা দৃষ্টি মেলে তাকাল ঘোমটা ঢাকা মুখখানার দিকে–কে এই নারী? তার প্রতি এত দরদই বা কেন? আর এই গহন বনে অজানা দস্যু-গুহায় সাধারণ মেয়ে মানুষ এলোই বা কি করে?

ক্ষুধার্ত বনহুর অবহেলা করতে পারল না। থালাখানা টেনে নিয়ে গোগ্রাসে খেতে শুরু করল।

বনহুরের খাওয়া শেষ হলে নূরী থালাটা হাতে তুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

এরপর থেকে প্রতিদিন নূরী বনহুরের গুহায় আসত। নিজের খাবার থেকে কিছু বাঁচিয়ে বনহুরকে খাইয়ে রেখে যেত। কিন্তু সাবধান থাকত সে, কোন সময়

ঘোমটা সরাত না বা কোন কথা বলত না।

অজানা নারী মনে করে বনহুরও কোন কথা বলত না—প্রশ্ন করত না কিছু।

বনহুর একা এই গুহায় প্রহর গুণত, কখন আসবে সেই নারী মূর্তি, যার নীরব মায়ায় তার হৃদয় আচ্ছন্ন হয়েছে। অজানা অচেনা এই নারী সম্বন্ধে বনহুরের অনেক চিন্তা। নারীটি কে? কি এর পরিচয়? এই বদ্ধগুহায় প্রবেশই বা করে সে কেমন করে? আর রোজ তাকে এমনি খাবার খাইয়ে যায়? বনহুর ভাবে, একদিন ওর ঘোমটা খুলে ফেলবে—দেখবে কে সে। কেনই বা আমার নিকট অমন করে নিজেকে লুকিয়ে রাখে।

পরদিন গভীর রাতে নূরী এলো অতি সন্তর্পণে ঘোমটা মুখ ঢেকে, হাতে খাবারের থালা।

বনহুর মিছামিছি ঘুমের ভান করে শুয়ে রইলো পাশ ফিরে। আজ সে কথা না বললে কিছুতেই জাগবে না বা খাবে না।

নূরী অতি লঘু পদক্ষেপে বনহুরের পাশে এসে দাঁড়াল। বনহুরকে ঘুমন্ত মনে করে খাবারের থালাটা মেঝেতে শব্দ করে রাখল।

কই, তবু তো ঘুম ভাঙল না ওর।

নূরী পুনঃ পুনঃ থালার শব্দ করল।

ঘুমন্ত মানুষকে জাগানো যায়, জাগ্রত মানুষকে জাগানো যায় না। নূরী বেশ চঞ্চল হয়ে পড়ল ভয় হঠাৎ যদি কেউ এদিকে এসে পড়ে তাহলে উপায় কি হবে?

নূরী বনহুরের পাশে বসে গায়ে হাত রাখল, একটু নাড়া দিল কই, তবুও ঘুম ভাঙছে না? বনহুরের দুষ্টামি বুঝতে পারল নূরী। নিশ্চয় তাকে কথা বলাতে চায়।

নূরী খাবার রেখে বেরিয়ে যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়াল। অমনি বনহুর উঠে নূরীর পথ রোধ করে দাঁড়াল।

থমকে দাঁড়াল নূরী, ঘোমটার ফাঁকে তাকিয়ে দেখল বনহুর তার মুখের দিকে নিস্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। এবার বলল বনহুর–আজ তোমার মুখের

আবারণ খুলে ফেলতে হবে। কে তুমি?

নূরীর বুকটা ধক করে উঠলো। জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ালো সে।

বনহুর এগিয়ে এলো–তুমি যদি তোমার মুখের ঘোমটা না সরাও তবে আমি জোর করে খুলে ফেলব।

নূরী তবু নীরব।

বনহুরের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। সে একটানে ঘোমটা খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠল বনহুর নূরী!

নূরী উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠে বনহুরের বুকে মুখ লুকাল।

বনহুর বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়। যে নূরীর সন্ধানে সে বনে বনে ঘুরে ফিরছে, যে নূরীর চিন্তায় বনহুরের রাতের দ্রিার ব্যাঘাত ঘটেছে সেই নূরী তার সামনে জীবিত সে।

বনহুর গভীর আবেগে নূরীকে টেনে নিল বুকে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললনূরী, তুমি এখানে কি করে এলে?

নূরী সে কথার জবাব না দিয়ে বলল—হুর, তুমি আমাকে হত্যা কর! হত্যা কর হুর। আমিই তোমার এ অবস্থার জন্য দায়ী।

নূরী!

হাঁ হুর, আমিই সেদিন কান্দাই বনে বাঁশী বাজিয়ে তোমাকে ঘর থেকে বনে নিয়ে এসেছিলাম। ভীম সেন ডাকাতের দ্বারা তোমাকে বন্দী করিয়েছি।

নূরী!

হুর, তোমাকে নির্মম শাস্তি দিতে আমিই ডাকাতদলকে বাধ্য করেছি।

বেশ, এতেই যদি তোমার শান্তি হয়, আমি তোমার সে দান মাথা পেতে নেব।

হুর! নূরী আবার লুটিয়ে পড়ল বনহুরের বুকে, আমাকে তুমি মাফ কর হুর, আমাকে তুমি মাফ কর।

বনহুর পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নূরী কেঁদে কেঁদে এক সময় শান্ত হল। বলল নূরী হুর, চলে যাও তুমি, এই মুহূর্তে চলে যাও হুর।

গম্ভীর কণ্ঠে বলল বনহুর–আর তুমি? আমি আর ফিরে যাব না।

নূরী, জানি না কেন তুমি আমার প্রতি এত অবিচার কর? কেন তুমি সেদিন বজরা থেকে অমন চুপ করে পালিয়ে গিয়েছিলে? আমাকে ব্যথা দিয়ে তুমি কি শান্তি পাও নূরী?

হাঁ, তুমি ঠিক বলেছে হুর। তোমাকে ব্যথা দিয়ে আমি আনন্দ পাই। নূরী! হুর, তুমি চলে যাও। চলে যাও!

না, তোমাকে না নিয়ে আমি কিছুতেই যাব না।

কিন্তু—

কিন্তু কি?

ভীম সেন ডাকু আমাকে নিজ কন্যার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাকে আমি ধোকা দিতে পারি না।

আর আমাকে তো তুমি ধোকা দিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছিলে নূরী? কেন আমি কি তোমায় একটুও ভালবাসি না।

হুর।

বল নূরী?

এই মুহূর্তে তুমি চলে যাও।

আর তুমি?

আমি মনিকে নিয়ে এখানেই কাটিয়ে দেব।

মনি! তোমার মনি বেঁচে আছে নূরী?

হাঁ, সে এখন অনেক বড় হয়েছে। কথা বলতে শিখেছে।

নূরী আমি তোমাকে একা ফেলে যাব না।

তুমি আমার জন্য ভেবো না হুর, আমি এখানেই ভাল থাকব।

আবার যদি আমাকে বন্দী করে নিয়ে আস?

তোমাকে বন্দী করে রেখেছি আমার মনের সিংহাসনে। তোমার বাহ্যিক দেহটার কোন প্রয়োজন নেই আমার।

নূরী! গভীর আবেগে নূরীকে টেনে নেয় বনহুর।

না, তুমি যাও, তুমি যাও।

আমি যাব না।

সেকি!

হাঁ, তোমাকে রেখে আমি যেতে পারব না। যেতে পারব না নূরী—

নূরী নিজেকে হারিয়ে ফেলে বনহুরের মধ্যে।

•

বনহুর ভীম সেনের হাত ধরে শপথ করে আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না।

খুশি হয় ভীম সেন।

দস্যু বনহুরকে বশীভূত করা কম কথা নয়। ভীম সেন বনহুরের শিকল নিজ হাতে খুলে দেয়।

বনহুর আর ভীম সেন বুকে বুক মিলিয়ে একতাবদ্ধ হয়।

রঘু কিন্তু এ মিলনে খুশি হতে পারল না কেমন একটা হিংসা তার মনে জট পাকাতে লাগল। ভীম সেনের প্রিয় এবং বলিষ্ঠ জন ছিল রঘু। বয়স রঘুর খুব বেশি নয়, বনহুরের চেয়ে দু'এক বছরের বেশি হবে।

বনহুর এমন বেশে স্বচ্ছভাবে ভীম সেনের দলের সঙ্গে মিশে গেছে। ভীম সেন তাকে নিজের দলের একটা শ্রেষ্ঠ আসন ছেড়ে দিয়েছে। রঘুর এটাও একটি ঈর্ষার কারণ হলো।

বনহুর দেখল শক্তি এদের কম নেই। কিন্তু বুদ্ধির অভাব যথেষ্ট।

একদিন বনহুর ভীম সেনের দলের সঙ্গে জলপথে যাত্রা করল।

উদ্দেশ্য—কোন বজরা বা নৌকা লুট করা।

বনহুর কিন্তু ভীম সেনকে বলল–তার চেয়ে চল কোন ধনীর বাড়ি হানা দিয়ে মোটা সোনাদানা নিয়ে আসি। নৌকা বা বজরার যাত্রীদের কাছে কতই বা পাওয়া যাবে!

বনহুরের কথামত এক গ্রামে ধনবান এক মহাজনের বাড়িতে হানা দিয়ে তারা বহু অর্থ আর অলঙ্কার নিয়ে ফিরে এলো। ভীম সেন জীবনে এত অর্থ ও অলংকার এক সঙ্গে কোনদিন লুট করে আনতে সক্ষম হয়নি। আজ ভীম সেনের আনন্দ আর ধরে না।

আস্তানায় একটা উৎসবের আয়োজন করল ভীম সেন।

অনেক ছোরা, তরবারি, লাঠি খেলা দেখাল। পুরুষরা নাচও দেখাল অনেকে।

এখানে যখন ভীম সেনের দল আনন্দে মাতোয়ারা। তখন বনহুর ধীরে ধীরে সরে পড়ল সেখান থেকে। নূরীর সন্ধানে চারদিকে তাকাল।

নূরী আজ উৎসবের স্থানে নেই। ঘন বনের মধ্যে একটা পাহাড়িয়া নদী, নাম তার মন্দিনা–নূরী মন্দিনার তীরে একটা পা ঝুলিয়ে বসেছিল। জ্যোস্নাভরা আকাশ, রাত কিন্তু বেশ হয়েছে। মনি ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ।

সেদিনের পর থেকে নূরী আর বনহুরের সামনে যায়নি। রাগ না অভিমান, না অন্য কিছু—এ সে নিজেই জানে না। যতদূর সম্ভব নূরী বনহুরকে এড়িয়ে চলে। কোন সময় বনহুরকে সে দেখা দেয় না।

নূরীর এই পালিয়ে বেড়ান বনহুরের কাছে অসহ্য লাগে। এত লোকের মধ্যে থেকেও নিজেকে সে বড় একা বোধ করে। কিসের জন্য যদি না নূরীর ইংগিত থাকত এর পেছনে।

নূরীর পাশে এসে বনহুর দাঁড়াল।

নূরী তন্ময় হয়ে কিছু ভাবছিল। বনহুরের পদশব্দে ফিরে তাকাতেই চমকে উঠে বলে–তুমি!

বনহুর ওর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে পড়ল–আর এখানে তুমিও বা কেন?

হুর, আমি চাই না তুমি ভীম সেনের সঙ্গে যোগ দিয়ে দস্যুতা কর।

এতে তোমার অমত কেন নূরী? বনহুর নূরীর চিবুকটা তুলে ধরে দক্ষিণ হাতে–আজ ক'দিন তোমাকে দেখিনি।

আমি তোমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চাই।

সে কারণেই তুমি সরে এসেছিলে বুঝি?

হাঁ।

কিন্তু আমি যদি তোমাকে–

নূরী বনহুরের মুখে হাতচাপা দেয় –চুপ কর।

নূরী নিজেকে কিছুতেই বনহুরের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে নিতে পারল না।

আকাশে চাঁদ হাসছে।

বনহুরের বাহুবন্ধনে নূরী। মৃদুমন্দ বাতাস দোলা দিয়ে যাচ্ছে নূরীর কুঞ্চিত কেশগুচ্ছতে। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ছে নূরীর চোখে মুখে। বনহুর নূরীর ললাট

থেকে কেশগুচ্ছ সরিয়ে দিয়ে বলে উঠে–চল নূরী, আমরা ফিরে যাই।

কিন্তু—

কিন্তু কি নূরী?

তোমার মনিরাকে ছাড়তে পারবে?

অস্ফুট ধ্বনি করে উঠল বনহুর মনিরা–ধীরে ধীরে আনমনা হয়ে গেল বনহুর। উদাসভাবে তাকাল দূরে–অনেক দূরে, মন্দিনা নদীর অপর পারে।

নূরীর মুখমণ্ডল বিষণ্ণ মলিন হয়ে ছিল। বুকের মধ্যে কে যেন. তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে আঘাত করল।

কখন যে নূরী বনহুরের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে চলে এসেছে খেয়াল নেই। ঘুমন্ত মনিকে বুকে চেপে চোখের পানিতে বালিশ সিক্ত করে ফেলেছে। সব ব্যথা ছাপিয়ে মনে পড়ছে নূরীর একটা কথা–বনহুরকে সে কোনদিন ফিরে পাবে না।

মনিরা তার মন চুরি করে নিয়েছে।

•

নকিব একখানা কাগজের টুকরা এনে মনিরার হাতে দিল–আপা মনি একজন বুড়ো মানুষ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

বুড়ো মানুষ? মনিরা ভাজকরা কাগজখানা খুলতে খুলতে বলে।

তারপর কাগজখানায় দৃষ্টি ফেলতেই চমকে উঠে,লেখা রয়েছে শুধু মাত্র দু'লাইন—বৌ রাণী, কথা আছে।

মরিয়ম বেগম পাশে বসে একটা বই পড়ছিলেন। চশমার ফাঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন–কে মা? কি লিখেছে?

মনিরা উঠে কাপড় ঠিক করতে করতে বললআগে নয় এসে বলব। দ্রুত চলে গেল মনিরা নিচে।

হলঘরে উদ্বিগ্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে এক বৃদ্ধ।

মনিরা প্রথমে চমকে উঠল–পরে নিজের মনে খেয়াল করে নিল রহমানের চেহারাটা।

মনিরাকে দেখে এগিয়ে এলো রহমান–বৌরাণী।

রহমান খবর কি? ও কেমন আছে?

নতমুখে জবাব দিল–সেই খবর নিয়েই এসেছি।

উৎকণ্ঠাভরা গলায় বলল মনিরা শিগগির বল কি খবর রহমান?

রহমানের চোখ অশ্রু ছলছল করছে–ধরা গলায় বলল—

সর্দার আজ কদিন হলো নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

নিরুদ্দেশ হয়েছে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে মনিরা। তারপর পুনরায় বলে ওঠে–কোথায়? কবে? কি করে?

আমরা কিছুই জানি না বৌরাণী। একদিন ভোরে আমরা সর্দারের কক্ষে প্রবেশ করে দেখি তিনি নেই—বিছানা শূন্য।

তোমাদের না বলে কোথায় গেল?

তিনি যেখানেই যান আমাকে না বলে কোথাও যান না। তা ছাড়া সর্দার নিরস্ত্রভাবে কোথাও যাবেন না, এটা আমরা জানি।

তার মানে?

সর্দার তার কোন অস্ত্রই সঙ্গে নিয়ে যাননি। এমনকি তার রিভলবার খানাও টেবিলে যেমন রেখেছেন, তেমনি আছে।

এ তুমি কি বলছ রহমান!

হাঁ, বৌরাণী, আমরা সবাই বড়ই চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। সর্দার কোনদিন আমাদের না জানিয়ে কোথাও যান না। আর গেলেও নিরস্ত্রভাবে যান না–

তবে কি হলো রহমান?

কেমন করে বলব বৌরাণী। আজ কদিন তার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করে তবে এসেছি আপনাকে কথাটা জানাতে।

এ তুমি কি সংবাদ আনলে রহমান! একটু থেমে বলল মনিরা আর তোমরা সবাই চুপ করে বসে আছো?

রহমান গম্ভীর কণ্ঠে বলল—না, আমরা চুপ করে বসে নেই বৌরাণী, আমাদের বিভিন্ন দল দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি নিজেও বহু জায়গায় সন্ধান নিয়েছি, এমনকি পুলিশ অফিসেও খোঁজ নিয়ে জেনেছি সর্দার কোথাও বন্দী হয়েছেন কিনা। আজ তাহলে চলি। আবার ঝিন্দে যাব। যদি সেখানে কোন কারণে গিয়ে থাকেন।

আচ্ছা যাও। হতাশভরা কণ্ঠে রহমানকে বিদায় জানাল মনিরা। রহমান চলে গেল। মনিরা ফিরে এলো বিষণ্ন মলিন মুখে।

মরিয়ম বেগম মনিরাকে বিষণ্ন মুখে ফিরে আসতে দেখে চিন্তিত হলেন, বললেন—কে এসেছিল মা মনিরা?

মনিরা মামীমার পাশে এসে বসল, বলল–রহমান।

রহমান! সে আবার কে?

তোমার ছেলের সহকারী।

মনিরের সহকারী? কি সংবাদ ওর? আমার মনির তো ভাল আছে?

সেই সংবাদই তো নিয়ে এসেছে সে।

কি সংবাদ ব মা, দেরী করিসনে।

তোমার ছেলে নিরুদ্দেশ হয়েছে। তাকে ক'দিন থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আর্তনাদ করে উঠলেন মরিয়ম বেগম–আমার মনিরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

না।

এ তুই কি বলছিস মনিরা?

হাঁ মামীমা, আজ ক'দিন নাকি তার কোন সন্ধান নেই।

মরিয়ম বেগম ললাটে করাঘাত করলেন–হায়, একি হলো। আমি এই রকম একটা ভয়ই করছিলাম। কি হবে মা এবার?

মনিরার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল অশ্রুধারা। সত্যিই তার যদি কিছু হয় বা হয়ে থাকে, তাহলে মনিরা, বাঁচবে কাকে নিয়ে। কার পথের দিকে তাকিয়ে প্রহর গুণবে।

মনিরা ছুটে গেল নিজের ঘরে। তার আর শিশু বনহুরের ফটোখানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ফটোখানা খুলে নিয়ে চেপে ধরল বুকের মধ্যে, আপন মনেই বলে উঠল–তুমি কোথায়? ওগো তুমি কোথায়? আমার জীবনের একমাত্র প্রদীপ তুমি। আমার জীবনের একমাত্র সম্বল।

কেঁদে কেঁদে মনিরার দু'চোখ রাঙা হয়ে উঠল।

চৌধুরী বাড়িতে নেমে এলো এক দুর্যোগময় ঘটনা। বাড়ির সরকার আর নকিব ছাড়া কেউ জানল না এ বাড়িতে কি ঘটেছে, যার জন্য, মরিয়ম বেগম এবং মনিরার অশ্রু শুকাচ্ছে না।

কেঁদে কেটে আকুল হলেন মরিয়ম বেগম, কিন্তু কোন উপায় নেই যাতে তার সন্তানের খোঁজ পাবেন।

সরকার সাহেব অনেক সান্ত্বনা দিতে লাগলেন কিন্তু কিছুতেই প্রবোধ মানলেন না মরিয়ম বেগম।

মনিরার মনের অবস্থাও তাই।

চৌধুরী বাড়িতে যখন বনহুরকে নিয়ে চিন্তার অবধি নেই, তখন বনহুর ভীম সেনের দলে শ্রেষ্ঠ আসন দখল করে বসেছে।

ভীম সেন সব সময় বনহুরকে নিজের পাশে রেখে কাজ করে। তারই পরামর্শে চলে।

রঘুর হিংসা দিন দিন বেড়ে চলল। যাকে বন্দী করে নিয়ে আসা হলো সে এখন সর্দারের সহকারী। গোপনে সে নিজের দল গঠনে লেগে পড়ল এবং সুযোগ খুঁজতে লাগল কেমন করে বনহুরকে হত্যা করবে।

বনহুর সরল স্বাভাবিক মন নিয়ে মেতে রয়েছে নিজের কাজে। ভীম সেন যাতে খুশি থাকে সেই কাজ করে সে। আবার সুযোগ পেলেই ছুটে যায় নূরীর পাশে।

মন্দিনা নদীতীরে নূরী আর বনহুর হাসে, গান গায়—বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। মনিও থাকে তাদের সঙ্গে।

এ দৃশ্য একদিন রঘুর চোখে পড়ে যায়।

বনহুর আর নূরী সেদিন একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে গল্প করছিল। হাসছিল ওরা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে।

রঘু দূর থেকে লক্ষ্য করল। চুপ করে গিয়ে জানাল ভীম সেনের কাছে।

ভীম সেন তখন অস্ত্র পরীক্ষা করে দেখছিল, রঘু গিয়ে দাঁড়াল তার পাশে—সর্দার।

ভীম সেন তাকাল তার মুখের দিকে।

রঘুর দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে, কঠিন কণ্ঠে বললসর্দার, বনহুর রাণীর সঙ্গে প্রেম করছে।

গর্জে উঠল ভীম সেন–প্রেম!

ভীম সেনের আদেশ ছিল, তার আস্তানায় কোন নারী থাকবে না বা কোন অনুচর নারীর সংশ্রবে যাবে না। নূরীকে ভীম সেন কন্যার আসনে স্থান দিয়েছিল এবং তার প্রতি সেই রকম আচরণ সে নিজে করত আর অনুচরগণকেও করার

জন্য আদেশ দিয়েছিল। বনহুরের সঙ্গে নূরীর যে কোন সম্বন্ধ বা পরিচয় থাকতে পারে, একথা ভীম সেন কোন সময় ভেবে দেখেনি বা ভাবার মত তার মনোভাব হয়নি।

হঠাৎ রঘুর মুখে ‘প্রেম’ শব্দটা শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল ভীম সেন, বলল —বনহুর রাণীর সঙ্গে প্রেম করছে?

হাঁ, সর্দার। আমার সঙ্গে এসো, দেখবে চল।

ভীম সেন আর রঘু খোলা তরবারি হাতে দ্রুত এগিয়ে চলল। একটা গাছের আড়ালে এসে দাঁড়াল ওরা দু’জন। একটু পূর্বে যেখান থেকে রঘু দেখে গিয়েছিল বনহুর আর নুরীকে।

ভীম সেনের মুখ কঠিন হয়ে উঠল, দেখলো বনহুর শিশু মনিকে নিয়ে আদর করছে। নূরীর চিহ্ন নেই সেখানে। ভীম সেন রঘুকে অবিশ্বাসী বলে গাল দিল।

রঘু সর্দারের মুখে এই শব্দ প্রথম শুনল। রাগে ক্ষোভে অধর দংশন করল রঘু। তারপর চলে গেল সেখান থেকে। এমন অপদস্থ জীবনে সে কোনদিন হয়নি। এ তার চরম অপমান।

রঘুর মনে প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। প্রকাশ্যে কিছু না বললেও ভেতরে ভেতরে নূরীর প্রতি রঘুর লালসা ছিল। শুধু ভীম সেনের ভয়ে সে কোনদিন নূরীর প্রতি হস্তক্ষেপ করার সাহস পায়নি।

নূরী নিজের গুহায় বসে জামা সেলাই করছিল। মনির এবং নিজের জামাকাপড় নূরী নিজেই সেলাই করত। আজ একটা জামা সেলাই করছিল আর গুন গুন করে গান গাইছিল। নূরীর মনে আজ কোন দুঃখ নেই। তার হুরকে সে জয় করে নিয়েছে, সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে ওকে সে পেয়েছে।

নূরী বনহুরের চিন্তায় মগ্ন, ঠোঁটে গানের মৃদু দোলা। চোখের সামনে ভাসছে অতীতের কত দৃশ্য।

হঠাৎ পেছন থেকে রঘু নূরীর মুখ চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে মুখে গুঁজে দিল একটা রুমাল। অতি সহজে তুলে নিল কাঁধে। গুহার অদূরে অন্ধকারে কয়েকজন

রঘুর অনুচর অপেক্ষা করছিল। নূরীকে নিয়ে রঘু পৌঁছতেই তারা ওকে ধরে মন্দিনা নদীবক্ষে ছোট্ট একটা ডিঙ্গি নৌকাতে তুলে নিল।

রঘু ফিরে এলো আস্তানায়।

নূরীকে যখন মুখে রুমাল গুঁজে মন্দিনা নদীবক্ষে ডিঙ্গি নৌকায় উঠিয়ে নেয়া হলো তখন বনহুর নিজের গুহায় পাথরের শয্যায় শুয়ে বিশ্রাম করছে।

পরদিন ভীম সেনের দলের মধ্যে একটা মহা আলোড়ন শুরু হলো–নূরী নিরুদ্দেশ হয়েছে।

বনহুরের কানেও কথাটা গেল। শুনে সে চিন্তিত হলো, এই গহন বনে সে যাবে কোথায়?

মনি মায়ের জন্য আকুলভাবে কাঁদছে।

বনহুর মনিকে তুলে নিল বুকে। কিন্তু নূরী গেল কোথায়? বনহুর ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ল। এখানে সে কার জন্য রয়েছে? শুধু নূরী-সূরীর জন্য সে আজও এই ভীম. সেনের আড্ডায় পড়ে রয়েছে।

বনহুর শিশু মনিকে কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারছে না।

ভীম সেন অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। নিজের অনুচরগণকে নূরীর সন্ধানে ছড়িয়ে দিল সে বনের বিভিন্ন স্থানে।

ভীম সেন নিজেও বের হলো ঘোড়ায় চেপে।

রঘু হাসল মনে মনে।

বনহুর রঘুর মুখোভাব লক্ষ্য করে দাঁতে দাঁত পিষলো।

নূরীকে যখন ডিঙ্গিনৌকায় তুলে নেওয়া হলো তখন নূরী চিৎকার করতে না পারলেও সে নিজের হাতের আংটি এবং মাথার কাঁটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল নদীতীরে।

কয়েকজন বলিষ্ঠ লোক তাকে মজবুত করে হাত-পা বেঁধে ডিঙ্গির উপর ফেলে রাখল।

গোটা রাত ধরে ডিঙ্গি চলল। ভোর হবার পূর্বেই একটা দ্বীপের মত জায়গায় এসে তারা ডিঙ্গি নৌকাখানা বেঁধে ফেলল। নূরীকে এবার বন্ধনমুক্ত করে দিল।

নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল নূরী। এতক্ষণ মুখে রুমাল বাঁধা থাকায় নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল।

নূরীকে জোরপূর্বক টেনে হিচড়ে নিয়ে চলল বলিষ্ঠ লোকগুলো।

নূরী শত চেষ্টা করেও ওদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে পারলো না।

চারদিকে পানি আর মধ্যে এই অদ্ভুত ধরনের দ্বীপ। বড় বড় পাথর আর টিলার মত উঁচুনীচু অসমতল জায়গা। মাঝে মাঝে বড় বড় জংগল আর গাছপালা।

নূরীকে এই দ্বীপের এক স্থানে এনে নামিয়ে নেওয়া হলো। কতগুলো পাথর এক জায়গায় পাকার হয়ে পড়ে রয়েছে। লোকগুলো নূরীকে নিয়ে সেই পাথরের স্তুপের কাছে এসে থামল। কয়েকজনে ধরে একটা পাথর সরিয়ে ফেলল, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো একটা সুড়ঙ্গপথ।

লোকগুলো সেই সুড়ঙ্গপথে নূরীকে নিয়ে চলল।

নূরীকে যখন লোকগুলো সুড়ঙ্গপথে নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি করছিল তখন নুরী নিজের আংগুল কমড়ে কিছুটা কেটে ফেলল। রক্ত বেরিয়ে এলো নুরীর আংগুল বেয়ে। নূরী সেই রক্ত পাথরের গায়ে একটা সংকেত চিহ্নের আকারে মুছে নিল।

নূরীকে নিয়ে লোকগুলো সুড়ঙ্গপথে অগ্রসর হল। কোথায় চলেছে, পথের যেন শেষ নেই। অন্ধকার পথ, একটা লোক মশাল হাতে আগে আগে চলেছে।

সমতল সুড়ঙ্গপথ।

মাঝে মাঝে বাঁক ঘুরে চলে গেছে অন্যদিকে। নূরী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। যেখানে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে পথের যেন শেষ নেই। নূরী নিজের জীবনের আশা

ত্যাগ করল।

মৃত্যু ছাড়া এখান থেকে বের হবার আর কোন পথ নেই তার।

হুর–মনি তার মনি না জানি কত কাঁদছে। কচি মনির মুখখানা নূরীর চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল।

এবার প্রশস্ত একটা জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল লোকগুলো।

নূরী মশালের আলোতে দেখলো, গভীর মাটির নিচে একটি প্রশস্ত কক্ষ। চারদিকে পাথরের দেয়াল, মাঝে মাঝে গাছের গুড়ির থাম দিয়ে ছাদটা আটকে রাখা হয়েছে। কেমন ভিজে স্যাতসেঁতে মেঝে। একপাশে গাছের গুড়ির তৈরি একটি খাটিয়া, কয়েকটা মোটা ধরনের লতাগুল্মের তৈরি বসার আসন। আরও দেখল নূরী, একপাশে মেঝেতে পড়ে রয়েছে দুটো মাটির কলসী। কয়েকটা বড় বড় বোতল।

শিউরে উঠল নূরী, এগুলো কিসের বোতল তা সে জানে। এত গভীর মাটির নিচে মদের বোতল এলো কি করে! নিশ্চয়ই এটা শয়তানদের গোপন আস্তানা।

নূরীর অনুমান মিথ্যা নয়।

শয়তান রঘু গোপনে এই আস্তানা তৈরি করে নিয়েছে। এখানেই তার গোপন বৈঠক চলে। আর চলে মদের আড্ডা। রঘু দুর্দান্ত এবং চালাক ডাকু। ভীম সেন সর্দার হলেও তাকে রঘু ভেতরে ভেতরে কমই পরোয়া করত। মাঝে মাঝে ছদ্মবেশে লোকালয়ে গিয়ে বিলেতী মদ নিয়ে আসত। স্বভাবও তার মোটেই সৎ ছিল না। নূরী এখানে আসার পর থেকে তার মনে কুচিন্তা দানা বেঁধেছে। কিন্তু ভীম সেনের আস্তানায় থেকে তার মনোবাসনা সিদ্ধ হবে না। কাজেই সেই থেকে রঘু নূরীকে সরাবার জন্য কৌশলে জাণ বিস্তার করছিল। অজানা-অচেনা এক দ্বীপে সে সুড়ঙ্গ কেটে একটা জায়গা তৈরি করে নিচ্ছিল, যেখানে সে নূরীকে নিয়ে চিরদিনের জন্য সরে যেতে পারে। ভীম সেন কেন, ভীম সেনের বাবা এলেও আর তার ও নূরীর সন্ধান পাবে না।

কিন্তু সময়ের প্রয়োজন।

তাই রঘু ধীরে ধীরে তার লক্ষ্য পথে অগ্রসর হচ্ছিল। এমন দিনে হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে বনহুর এসে পড়ল তাদের দলে। কেঁচো তুলতে সাপ বেরিয়ে পড়ল। নূরীকে সরাতে তার কোন বেগ পেতে হত না, কিংবা কয়েকদিন পরে সরালেও চলত, কিন্তু তা হবার উপায় নেই। তাই রঘু নূরীকে দ্রুত সরিয়ে ফেলল ভীম সেনের আস্তানা থেকে। একমাত্র বনহুরের জন্য তাকে এত তাড়াতাড়ি করতে হলো।

একদিন নয়, আরও কয়েকদিন রঘু বনহুর আর নূরীকে একসঙ্গে মিশতে দেখেছে। আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত পিষেছে। কিন্তু নীরব রয়েছিল

সে, বললে সব কাজ হয়ত ফাঁস হয়ে যাবে।

তবু একদিন বলেছিল রঘু ভীম সেনের কাছে। তাতেও হিতে বিপরীত হয়েছে। ভীম সেন তাকে অবিশ্বাসী বদনাম দিয়েছে। নূরীকে সরিয়ে বনহুরকে শেষ করবে, এই তার মনের বাসনা।

নূরীকে তার অনুচর দ্বারা সরিয়ে ফেললেও রঘু ভীম সেনের পাশে পাশে রইল। তাকে যেন কোনরকম সন্দেহ না করে।

ভীম সেন বনে বনে নূরীর সন্ধান করতে লাগল। বনহুর আর রঘু তার সঙ্গে রয়েছে।

বনহুরের মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাবাপন্ন।

আর রঘুর মুখোভাব দুষ্টামিতে ভরা, গোপনে বারবার সে বনহুরের মুখ লক্ষ্য করে নিচ্ছিল আর মনে মনে খুশি হচ্ছিল।

ভীম সেন ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সে সত্যিই নূরীকে মেয়ের মত ভালবেসে ফেলেছিল। নূরীর অদর্শনে ভীম সেনের হৃদয়ে শান্তি ছিল না।

মন্দিনা নদীতীরে এসে দাঁড়াল ভীম সেন, রঘু আর দস্যু বনহুর। ভীম সেন নদীর দিকে তাকিয়ে দু'হাত জুড়ে বলল—মা গঙ্গে, তুই আমার মাইয়ারে এনে দে। মা গঙ্গে–

ভীম সেন চোখ মুদে নদীর নিকটে প্রার্থনা জানাতে লাগল, তার মুদিত চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। এত দুঃখেও বনহুরের হাসি পেল। নদী কি করে তার মেয়েকে এনে দেবে, ভেবে পেল না বর্নহুর।

হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে গেল নদীর ধারে একটা স্থানে। কি যেন পড়ে রয়েছে সেখানে। বনহুর এগিয়ে এলো, নত হয়ে যেমনি জিনিসটা হাতে উঠিয়ে নিতে যাবে, অমনি রঘু পায়ের চাপে মাটিতে দেবে দিল।

বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়াল, কঠিন মুখোভাব নিয়ে তাকাল রঘুর দিকে।

রঘু কোন জবাব না দিয়ে মাটি থেকে জিনিসটা হাতে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল নদীর পানিতে। তারপর বলল—বাপু চলো!

ভীম সেন হাতের পিঠে চোখ মুছে দাঁড়াল।

ভীম সেনের সঙ্গে রঘু পা বাড়াল। বনহুর ফিরে তাকাল পূর্বের সেই স্থানটিতে। যেখানে ইতোপূর্বে কোন একটা জিনিস সে দেখেছিল যা রঘু নদীগর্ভে নিক্ষেপ করেছিল। জিনিসটা কি ছিল, কেনই বা রঘু তাকে দেখতে দিয়ে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করল? বনহুর তাকাতেই অদূরে ঠিক তার কাছ থেকে হাত দুই দূরে কি যেন চকচক করে উঠলো। বনহুর এবার ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে গিয়ে চকচকে জিনিসটা হাতের তালুতে উঠিয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল বনহুর, এ যে নূরীর আংটি! বনহুরই একদিন নূরীকে এটা উপহার দিয়েছিল। বনহুর তাকিয়ে দেখল ভীম সেন আর রঘু অনেক দূরে এগিয়ে গেছে।

বনহুর আংটিটা হাতে নিয়ে এবার ভাবতে লাগল, তারপর তাকাল অদূরে এগিয়ে চলা রঘুর দিকে। নিশ্চয়ই রঘুর চক্রান্তেন নূরী নিরুদ্দেশ হয়েছে এবং তাকে এই নদীপথেই সরানো হয়েছে। নূরী চিহ্নস্বরূপ তার আংটি রেখে গেছে নদীতীরে। বনহুর লক্ষ্য করল যেখানে আংটিটা পেয়েছে সেখানে এবং তার আশেপাশে ভিজে মাটিতে বেশ কিছু সংখ্যক পায়ের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

বনহুর বুঝতে পারল, নূরীকে নৌকাপথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বনহুরও এগুলো ভীম সেন ও রঘুর পেছনে পেছনে।

নূরী বন্দিনী অবস্থায় ভূগর্ভে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে চলল।

রঘুর অনুচরগণ তাকে সেখানে রেখে কিছু খাবার ও এক কলসী পানি ছাড়া আর কিছুই দিয়ে যায়নি।

নূরী এই নির্জন পাতাল গহ্বরে একা কি করবে। এখান থেকে আর তার উদ্ধার নেই। বাঁচার কোন আশাও নেই। মৃত্যুর জন্য নূরী ভীত নয়। ভয় এই নির্জন পাতালপুরীতে কেউ যদি তার ওপর হামলা করে বসে। ভয় তার ইজ্জতের, ভয় তার সতীত্বের।

যা ভেবেছিল তাই হলো।

একদিন অকস্মাৎ আবির্ভাব হলো রঘু ডাকুর। সে কি ভীষণ চেহারা, মদ পান করে মাতাল হয়ে এসেছে সে। হাতে তার মদের বোতল।

নুরী রঘুকে দেখেই ভয়ে বিবর্ণ হলো।

তাকে যে রঘুই হরণ করে এনে এখানে লুকিয়ে রেখেছে, এ কথা সে জানে। কারণ, তাকে যখন নৌকায় তুলে নেওয়া হচ্ছিল তখন রঘুই তাকে কাঁধে করে এনেছিল।

নূরী ভীত হলেও ঘাবড়াল না, বলল রঘু, তুমিই আমাকে একদিন বাঁচিয়েছ, আর আজ তুমিই....

অট্টহাসিতে ফেটে ছিল রঘু, তারপর হাসি থামিয়ে বললবাঁচিয়েছিলাম বলেই আজ আমি তোমাকে চাই।।

রঘু, তুমি না বাপুর কাছে শপথ করেছ, কোন নারীকে তুমি স্পর্শ করবে না?

হাঃ হাঃ হাঃ, শপথ–রেখে দাও তোমার শপথ। আমি ওসব মানি না। যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছি, ঐ দিন তোমাকে জীবন সঙ্গিনী করবো বলে শপথ করেছি। আমি তোমাকে চিরদিনের জন্য চাই–আর তারই জন্য আমার এত প্রচেষ্টা। জান এই পাতাল গহবরে আমি কত কষ্ট, কত পরিশ্রম করে এই গোপন স্থানটি তৈরি করে নিয়েছি। এখানে কেউ তোমার সন্ধান পাবে না। সর্দার ভীম সেনও না।

নূরী অসহায়ভাবে বলে উঠল কিন্তু পাপ তোমার চাপা থাকবে না।

পাপ হাঃ হাঃ হাঃ, পাপ! রঘু ডাকু পাপকে ভয় করে না সুন্দরী। ডাকু লোক পাপকে ডরায় না। পাপ ডরায় ডাকুকে দেখে, বুঝেছ? এসো সুন্দরী! রঘু এগোয় নূরীর দিকে।

নূরী ভীতভাবে পিছু হটতে থাকে।

বনহুর একটা ছোট ছিপ নৌকা বেয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে। মন্দিনা নদীর বুকে বনহুরের বৈঠার ঝুপঝাপ শব্দ দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল।

বনহুরের শরীর ঘেমে নেয়ে উঠেছে। দ্রুত হাত চালাচ্ছে সে।

বনহুর রঘুকে অনুসরণ করেই নৌকা ভাসিয়েছিল। ও যাতে টের না পায় সেজন্য বেশ দূরত্ব রেখে ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল। তার লক্ষ্য ছিল রঘুর নৌকায়।

রঘুর নৌকা যখন দ্বীপে এসে ভীড়লো তখন বনহুরের ছিপনৌকা রঘুর নৌকা থেকে প্রায় দু'শ হাতের বেশি দূরে। রঘু নৌকা রেখে দ্বীপে. অদৃশ্য হবার পর বনহুর এসে পৌঁছল রঘুর নৌকার পাশে।

প্রখর সূর্যের তাপে বনহুরের মুখমণ্ডল রাঙা হয়ে উঠেছে। সুন্দর ললাটে ফুটে উঠেছে ক্লান্তির ছাপ। তবু কোন হতাশ নেই, প্রবল উত্তেজনা নিয়ে ছুটে এসেছে সে নূরীর সন্ধানে।

নূরী নিরুদ্দেশ হবার পর বনহুর রঘুর প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল। কারণ, প্রথমেই তার সন্দেহ হয়েছিল রঘুকে। যদিও নূরী অদৃশ্য হবার পর রঘু ভীম সেনের আস্তানা ছেড়ে একবারও বাইরে যায়নি, তবুও বনহুরের মনে এ সন্দেহ বদ্ধমূল হয়েছিল যে, রঘুই নূরীকে সরিয়েছে। সেদিনের পর থেকে তাই বনহুরের চোখে নিদ্রার অবসান হয়েছে। সর্বদা বনহুর রঘুকে পাহারা দিত। রাতে বিছানায় শুয়ে গোপনে তাকিয়ে থাকত রঘুর দিকে। দিনে রঘু যেখানেই যেতো বনহুরও থাকত ওর পাশে। সুচতুর রঘু অনেক করেও বনহুরের দৃষ্টির বাইরে যেতে পারেনি। বনহুর রঘুর চেয়ে কম চতুর নয়।

বনহুর সেদিনই বুঝতে পেরেছিল, যেদিন সে নদীতীরে নূরীর আংটি কুড়িয়ে পেয়েছিল-বুঝতে পেরেছিল কোন পথে নূরীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেদিন হতেই বনহুর প্রস্তুতি নিচ্ছিল–নদীপথে শয়তানকে অনুসরণ করতে তার যেন

কোন ভুল না হয়। অসুবিধা না হয়। অতি গোপনে একটা ছিপনৌকা সংগ্রহ করে নিতে সক্ষম হয়েছিল সে।

আজ বনহুর সেই ছিপনৌকা নিয়েই রঘুকে গোপনে অনুসরণ করছিল।

বনহুর দ্রুতহস্তে ছিপনৌকাখানা টেনে খানিকটা উপরে তুলে নিল। তারপর ছুটতে শুরু করল বালির উপর রঘুর পদচিহ্ন লক্ষ্য করে। কিন্তু কিছুদূর এগুতেই বালুভূমি শেষ হয়ে উঁচুনীচু অসমতল জঙ্গলাকীর্ণ পথ শুরু হলো। বনহুর কোন দিকে এগুবে ভাবতে লাগল। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবার তার সময় নেই। আবার এগুতে শুরু করল।

বনহুর যখন বনভূমি ডিংগিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল, ওদিকে তখন রঘুর কবলে নূরী হিংস্র বাঘের থাবায় যেমন মেষশাবকের অবস্থা হয় তেমনি নিজেকে রক্ষার জন্য কক্ষময় ছুটাছুটি করছিল।

প্রসারিত থাবা মেলে রঘু নূরীকে ধরার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। আর নূরী নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টায় পিছু হটছে।

নূরী কয়েকবার মদের খালি বোতল ছুড়ে মেরেছে।

রঘু অতি কৌশলে নিজের মাথা বাঁচিয়ে নিয়েছে।

ক্ষুদ্ধ শার্দুলের মত রঘু নূরীকে ধরার জন্য উম্মাদ হয়ে উঠেছে।

বনহুর তখন বনময় ছুটাছুটি করছে, কোথায় রঘু অদৃশ্য হলো। না জানি নূরীকে সে কোথায় বন্দী করে রেখেছে, তার উপর কি অত্যাচার করছে তাই বা কে জানে। বনহুর পাগলের ন্যায় অন্বেষণ করে চলেছে। হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে অদূরে কয়েকটা পাথর পাশাপাশি পড়ে রয়েছে। একটা পাথরের উপর নজর পড়তেই বনহুর চমকে উঠল, পাথরটার গায়ে রক্তের একটা ক্রস চিহ্ন।

ইতোপূর্বে রঘু এখানেই, এই পথেই এসেছে এবং সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেছে, কিন্তু ঐ রক্তের চিহ্ন তার নজরে পড়েনি। কারণ সে তখন স্বাভাবিক মনোভাব নিয়ে ছিল না। কিছুটা মদ সে এখানে দাঁড়িয়েই পান করে নিয়েছিল। একটা ছিপিও বনহুর কুড়িয়ে পেল।

এবার বনহুরের কাছে সব স্বচ্ছ হয়ে এলো। অতি সহজেই পাথরখন্ড সরিয়ে ফেলল বনহুর। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো সামনে একটা সুড়ঙ্গপথ দেখতে পেল সে।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করল।

ওদিকে রঘু নূরীকে ধরে ফেলেছে।

নূরী নিজেকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে! কিল, চড়, লাথি দিয়ে ও রঘুর হাত থেকে উদ্ধার পাচ্ছে না সে। নূরী কামড়ে রঘুর হাত রক্তাক্ত করে দিয়েছে, তবু রঘু তাকে প্রবলভাবে এটে ধরেছে। চোখে মুখে রঘুর উন্মত্ত নেশা।

নূরী মরিয়া হয়ে ধস্তাধস্তি করছে। মনে প্রাণে খোদাকে সে স্মরণ করছে, হে দয়াময়! তুমি আমাকে বাঁচাও! আমার ইজ্জত রক্ষা কর।

আর বুঝি নিজেকে রক্ষা করতে পারে না নূরী।

এই বুঝি তার জীবনের চরম পরিণতি। নূরী হাত-পা ছোড়ে, দাঁত দিয়ে কামড় দেয়, তবু নিজেকে রঘুর কবল থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হচ্ছে না।

রঘু আর নূরীতে ভীষণ ধস্তাধস্তি হচ্ছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর এসে দাঁড়াল সুড়ঙ্গমুখে। কঠিন কণ্ঠে গর্জে উঠল নূরীকে ছেড়ে দাও রঘু।

রঘু সামনে যম দেখলেও বুঝি এত চমকে উঠত না।

সঙ্গে সঙ্গে রঘু নূরীকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

ক্ষুব্ধ শার্দুলের কবল থেকে হরিণ শিশু ছাড়া পেয়ে যেমন ছুটে যায় মায়ের পাশে, তেমনি নূরী রঘুর কবল থেকে ছাড়া পেয়ে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল, বনহুরের বুকে।

বনহুর নূরীকে গভীরভাবে বুকে টেনে নিল, পরক্ষণেই নূরীকে সরিয়ে দিয়ে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করল রঘুকে।

রঘু ভাবতেই পারেনি এই পাতালপুরীতে কেউ তার সন্ধান পাবে।

রঘু আর বনহুরে চলল লড়াই।

অসীম শক্তিশালী ওরা দু'জনই।

রঘু নিরস্ত্র বলে বনহুর নিজের ছোরা ব্যবহার করল না। নইলে এক নিমেষে ওকে শেষ করে ফেলত।

রঘু অল্পক্ষণেই টের পেল, তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী দস্যু বনহুর।

এবার রঘু পালাবার জন্য পথ খুঁজতে লাগল।

হঠাৎ বনহুরকে ধাক্কা দিয়ে সুড়ঙ্গপথের বিপরীত দিকে অগ্রসর হলো রঘু।

ওদিকে দেয়াল।

রঘু কোথায় যেন চাপ দিল, সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে একটা পথ বেরিয়ে এলো। রঘু সেই পথে ছুটতে শুরু করল। বনহুরও তার পেছনে ছুটে চলল।

আবার ধরে ফেলল বনহুর রঘুকে।

রঘু পড়ে গেল মেঝেতে।

চলল আবার ধস্তাধস্তি।

নূরী কিছুতেই একস্থানে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারল না। সেও বনহুরের পিছু পিছু ছুটে এলো।

এদিকে যে এমন একটা পথ আছে একটুও বুঝার উপায় ছিল না।

বনহুর আর রঘুর লড়াই চলেছে।

রঘু নিজেকে বাঁচাবার জন্য বহু চেষ্টা করছে। হঠাৎ বনহুরকে ধরাশায়ী করে রঘু ছুটে পালাল। মাত্র এক মুহূর্তে, বনহুর উঠে রঘুর পেছনে ধাওয়া করল।

কিন্তু কি আশ্চর্য, আর অল্প দূরে গিয়েই রঘু লাফিয়ে পড়ল একটা গর্তের মধ্যে।

বনহুর আর নূরী ছুটে গিয়ে দেখল, গর্তটা খুব গভীর এবং নিচে পানির ভীষণ ছলছল কলকল শব্দ হচ্ছে।

বনহুরও লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু নূরী ওকে জাপটে ধরে ফেলল-না না, হুর, তুমি ও কাজ করনা। ক্ষান্ত হও।

বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়াল।

শরীর বেয়ে ঘাম ঝরে পড়েছে। জামাটা ভিজে চুপসে গেছে। নূরী বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে বলে উঠল—হুর!

বনহুর নূরীকে নিবিড়ভাবে টেনে নিল কাছে। অস্ফুট কণ্ঠে ডাকল–নূরী!

নিজের আঁচলে নূরী বনহুরের ললাটের এবং মুখের ঘাম মুছে দিতে লাগল।

.

ভীম সেনের সামনে দাঁড়িয়ে রঘু।

ভীম সেনের দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। কঠিন কণ্ঠে গর্জে উঠল ভীম সেন-তোমার কথা সত্য?

হাঁ সর্দার, সব সত্য। আপনার কন্যা সমতুল্য নূরীকে ঐ শয়তান বনহুর গোপনে লুকিয়ে রেখেছিল। আমি আজ তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলেছি। আর নূরীকে উদ্ধার করতে গিয়ে এই দেখুন আমার অবস্থা....নিজের শরীরের ক্ষতগুলো দেখায় রঘু।

ভীম সেনের দেহের রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠল।

সে তখনই তার অনুচরগণকে আদেশ দিল নিয়ে এসো ধরে যেখানে পাবে বনহুরকে। আমি তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারব।

ভীম সেন যখন তার হুকুম পেশ করছিল তখন নূরীকে নিয়ে হাজির হলো বনহুর।

রঘুকে ভীম সেনের সামনে দণ্ডায়মান এবং ভীম সেনকে ক্রুদ্ধ দেখে বনহুর সমস্ত ব্যাপারখানা বুঝে নিল।

কিন্তু তার পূর্বেই রঘুর ইংগিতে বনহুরের বুকে তীর-ধনু বাগিয়ে ধরা হলো।

ভীম সেনের অন্যান্য অনুচর বনহুরকে বন্দী করে ফেলল।

অবশ্য বনহুর নিজে একা হলে তাকে বন্দী করার সাধ্য তাদের তখন ছিল না, সবাইকে পরাজিত করে পালাতে সক্ষম হতো সে, কিন্তু নূরী আর

মনিকে রেখে পালাবে কি করে?

নূরী আর মনির জন্যই বনহুর আজ ভীম সেনের দলের হাতে নিজেকে সমর্পন করল।

নূরী অনেক করে বুঝিয়ে বলল, বনহুর তাকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। সব দোষ রঘুর। রঘুই তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল-সব বলল। কিন্তু ভীম সেন সে কথা কিছুতেই বিশ্বাস করল না। . রঘুর চক্রান্তভরা কথাই ভীম সেন মেনে নিল।

ভীম সেন নারীহরণের অপরাধে বনহুরকে কঠিন শাস্তি-অগ্নিদগ্ধ করবে মনস্থ করে ফেলল।

বনহুরকে আবার সেই অন্ধকারময় গুহায় শিকলে আবদ্ধ করে রাখা হলো।

ভীম সেন আদেশ দিল শুকনো কাঠ আর ডালপালা সংগ্রহ করতে, বনহুরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হবে।

ভীম সেনের আদেশ লংঘন হবার উপায় নেই।

বনের মধ্যে একটা জায়গায় শুকনো কাঠ আর শুকনো ডালপালার স্তুপাকার হয়ে উঠাল একটা উঁচু জায়গায় বনহুরকে হাত-পা বেঁধে দাঁড় করিয়ে আগুন ধরিয়ে দেবায় আয়োজন করা হলো।

নূরী মনিকে বুকে চেপে কাঁদতে লাগল। এবার আর ওকে বাঁচান সম্ভব হবে না। নিজের দোষে আজ নূরী বনহুরের হত্যার কারণ হয়ে দাঁড়াল। নানাভাবে চিন্তা

করতে লাগল, কোন উপায় ওকে বাঁচাতে পারে কিনা, কিন্তু কোন কৌশলেও সম্ভব হবে না।

এক সময়ে ভীম সেনের নিকটে গিয়ে সে কেঁদে পড়ল—বাপু, তোমার মনে পড়ে, বলেছিলে এ পথ তুমি চিনলে কি করে? যেদিন আমি বনহুরকে ধরার জন্য কান্দাই বনে যাই? মনে পড়ে বাঁশীর সুরে আমি যখন বনহুরকে ঘর থেকে বের করে আনি তখন বলেছিলে-ওর সংগে তোমার বাঁশীর সুরে যোগাযোগ হলো কি করে? আমি বলেছিলাম বলব পরে।

হাঁ, তুমি বলেছিলে বেটি, বলেছিলে। কিন্তু কি কথা তা তো আজও বলনি?

বাপু, শোন আজ বলছি। আমি দস্যু দুহিতা, বনহুর আমার স্বামী!

স্বামী! অস্ফুট ধ্বনি করে উঠল। তাকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে নূরীর মুখের দিকে। তারপর বললো—এ কথা আগে বলিসনি কেন মা? আমি ওকে পরপুরুষ জেনে তোকে মিথ্যাবাদী ঠাউরিয়েছি। আর তাই তো ওকে আগুনে পুড়িয়ে মারার আয়োজন করেছি।

নূরীর মনের আকাশ মুহূর্তে মেঘমুক্ত হয়ে গেল। গভীর উত্তেজিত কণ্ঠে বলল- বাপু, রঘুই আমাকে গোপনে ওর অনুচর দ্বারা চুরি করে অজানা একটা দ্বীপে বন্দী করে রেখেছিল এবং আমার ইজ্জত নষ্ট করার জন্য উম্মাদ হয়ে উঠেছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে রঘু গুহায় প্রবেশ করল—সর্দার, বনহুরকে তার আসনে আনা হয়েছে।

ভীম সেন তাকাল রঘুর মুখে।

রঘু দেখল নূরী ভীম সেনের সম্মুখে দণ্ডায়মান।

ভীম সেন বলল—হয়েছে?

হাঁ সর্দার, হয়েছে। এখন আপনি গেলেই শুকনো কাঠে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে।

ভীম সেন হঠাৎ হেসে উঠল ভীষণভাবে—হাঃ হাঃ হাঃ, চমৎকার। চল তাহলে।

ভীম সেন এগুলো, পাশে চলল রঘু।

নূরী পেছনে।

ভীম সেনের হাসির শব্দে নূরীর হৃৎপিণ্ড থরথর করে কেঁপে উঠল। একটু পূর্বে তার হৃদয়ে যে ক্ষীণ আশার আলো জ্বলে উঠেছিল, দপ করে তা নিবে গেল নিমেষে।

শিথিল পা দুখানা টেনে নিয়ে নূরী এসে দাঁড়লে ভীম সেনের পাশে। তাকাল সামনে।

উঁচু একটা বেদীর মত জায়গায় বনহুরকে শিকল দিয়ে দু'হাত দুটো গাছের গুঁড়ির সঙ্গে মজবুত করে বেঁধে দেয়া হয়েছে। পা দুটোও বাঁধা হয়েছে শিকলে। তার চারপাশে স্তুপাকার শুকনো কাঠ আর ডালপালা।

একজন ভীষণ চেহারার লোক জ্বলন্ত মশাল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে। আদেশের প্রতীক্ষা মাত্র।

নূরী দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেলল।

বনহুর তাকিয়ে আছে নূরীর দিকে।

নূরী কাঁদছে।

বনহুরের মুখমণ্ডল কঠিন পাথরের মত। এতটুকু বিচলিত হয়নি বা ঘাবড়ে যায়নি সে। মৃত্যু যখন একদিন হবেই তখন এতে ঘাবড়াবার কি আছে! কিন্তু মরার সময় মা, মনিরা এদের সঙ্গে দেখা হলো না এই যা দুঃখ।

এখানে যখন বনহুর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে, তখন কান্দাই শহরে চৌধুরীবাড়ির একটা কক্ষে মরিয়ম বেগম নামাযান্তে দু'হাত তুলে পুত্রের মঙ্গল কামনা করে খোদার নিকটে দোয়া প্রার্থনা করছিল। দু'গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল তাঁর অশ্রুধারা।

মরিয়ম বেগমের দোয়া খোদার আরশে গিয়ে পৌঁছল। তিনি মায়ের দোয়া মঞ্জুর করলেন।

ভীম সেন কঠিন কণ্ঠে আদেশ দিল-বনহুরকে মুক্তি দাও। রঘুকে বন্দী কর।

সঙ্গে সঙ্গে একদল অনুচর রঘুকে ঘিরে ফেলল। অপর দল বনহুরের শিকল খুলে দিতে লাগল।

রঘু এ অবস্থার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে আনন্দিত মনে প্রতীক্ষা করছিল, বনহুরের অগ্নিদগ্ধ দেহটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে নূরীকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হবে। কিন্তু সব আশা তার মুহূর্তে ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল।

শিকলে আবদ্ধ হলো রঘু।

বনহুরের স্থানে রঘুকে মজবুত করে বাঁধা হলো। মাত্র কয়েক মুহূর্ত, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল লেলিহান অগ্নিশিখা। রাতের অন্ধকার আলোয় গোটা বন আলোময় হয়ে উঠল।

গনগনে অগ্নিকুন্ডের মধ্যে থেকে ভেসে এলো রঘুর আর্তচিৎকার–মরে গেলাম! জ্বলে গেল। জ্বলে গেল। মরলাম....মরলাম...

ভীম সেন অট্টহাসি হেসে উঠলনারীহরণকারীর জ্বলে মরাই উচিত সাজা।

নূরী ছুটে গিয়ে বনহুরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে টেনে নিল।

ভীম সেন আনন্দের হাসি হাসল।

বনহুর এবার বিদায় চাইল ভীম সেনের কাছে।

ভীম সেন বনহুরকে বুকে জড়িয়ে ধরে বিদায় দিল।

.

মন্দিরা নদীর বুকে নৌকা ভাসল। বনহুর আর নুরী পাশাপাশি বসে হাত নাড়ছে, ওদের মাঝখানে মনি। সেও ছোট্ট হাত নেড়ে ভীম সেন এবং তার দলকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে।

ধীরে ধীরে ভীম সেনের দলসহ নদীতীর অদৃশ্য হলো।

নূরী মনিকে তুলে নিল বুকে।

বনহুর হাসল।

নূরী তাকিয়ে দেখল বনহুরের মুখের দিকে। অপূর্ব সে হাসি। বনহুরের দীপ্ত মুখমণ্ডলে এক অদ্ভূত উজ্জ্বলতার ছাপ।

নদীবুকে দুলে দুলে নৌকা এগিয়ে চলেছে।

বনহুরের বুকে মাথা রেখে নূরী শুয়ে আছে। পাশে ঘুমন্ত মনি!

বনহুর নূরীর চুলে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

নিস্তব্ধ রাত।

জোস্নাভরা আকাশ।

নদীর জলে জোস্নার আলো অপূর্ব এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে। ঝুপঝাপ দাঁড়ের শব্দের সঙ্গে পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ মিশে একটানা সংগীতের মত মনে হচ্ছে।

নৌকা বেয়ে চলছে ভীম সেনের দু'জন অনুচর।

আকাশের দক্ষিণ কোণে ভেসে ওঠে একখণ্ড কাল মেঘ।

বনহুর আর নূরী তা টের পায় না। ওরা তখন নৌকার মধ্যে আপ কথায় মগ্ন। বনহুর নূরীর মুখখানা তুলে ধরে হাতের তালুতে–নূরী, আজ আমার জয়যাত্রা।

নূরী সোজা হয়ে বসল, হেসে বলল-তোমার নয় আমার, এ জয়যাত্রা আমার।

উঁহু, আমার নূরী। কারণ আমি তোমাকে জয় করে নিয়ে চলেছি।

না, আমি তোমায় জয় করে নিয়েছি, হুর!

দু’জনই হেসে উঠল উচ্ছ্বসিতভাবে।

নূরীর গালে মৃদু টোকা দিয়ে বলল-নূরী, তুমি কোন দিন সিনেমা দেখেছ?

সে কি রকম জিনিস?

ছায়াছবি। ছবি কথা বলে, গান গায়, হাসে, কাঁদে….

সত্যি?

হ্যাঁ, জীবন-কাহিনী নিয়ে তৈরি হয় এই ছায়াছবি।

আশ্চর্য!

নূরী, জান ছবির প্রধান চরিত্র হলো ছবির নায়ক-নায়িকা। একজন নায়িকা, হয়তো তার বিপরীতে থাকে দু’জন নায়ক। দু’জনই ভালবাসে একজনকে। কিন্তু আসল নায়ক হলো একজন, দ্বিতীয় জন ভিলেন বা আসল নায়কের ভালবাসায় বাধা প্রদানকারী।

নূরী অত্যন্ত মনোযাগের সঙ্গে বনহুরের কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল। বললহা বুঝলাম।

বনহুর বলে চলে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভিলেনের পরাজয় হয়-হয় মৃত্যু, নয় মতের পরিবর্তন। এক নায়িকার দুই নায়ক থাকতে পারে না কোনদিন।

হ্যাঁ, এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন–অসম্ভব।

বনহুর মৃদু হেসে বলল——আর এক নায়কের যদি দুই নায়িকা হয়?

তাও অসম্ভব! একটি প্রাণ কোনদিন দু’জনের হয় না। কিন্তু এসব তুমি আমায় বলছ কেন হুর?

নূরী, তুমি জান আমি মনিরাকে বিয়ে করেছি।

মুহূর্তে নূরীর মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। যদিও নূরী এ কথা জানে তবু বনহুরের মুখে কথাটা শুনে হৃদয়টা খান খান হয়ে গেল ওর। ব্যথায় মুচড়ে উঠল ভেতরটা।

মুখ ফিরিয়ে তাকাল অন্য দিকে।

আকাশে তখন মেঘ জমাট বেঁধে উঠেছে।

মাঝিদের মনে আশঙ্কা জাগল। তবু দাড় টেনে চলেছে তারা দ্রুত হস্তে। চাঁদ এখনও সম্পূর্ণ মেঘের নিচে ঢাকা পড়ে যায়নি। তাই জোছনার আলো নদীবক্ষে ঝিকমিক করছিল।

নৌকার মধ্যে নূরী আর বনহুর টের পায়নি কিছু।

বনহুর বুঝল এবং জানে, মনিরাকে নূরী সহ্য করতে পারে না –মনিরাও সহ্য করতে পারে না নূরীকে। কিন্তু উভয়ে গভীরভাবে ভালবাসে একজনকে—সে হলো বনহুর নিজে।

এমন অবস্থায় বনহুরের কি কর্তব্য? বনহুর নিজের মনে বিচার করে দেখেছে, সে উভয়কেই ভালবাসে। নূরী ছাড়া বনহুর ভাবতে পারে না। মনিরাকে, মনিরাকে বাদ দিয়েও নূরীকে ভাবতে পারে না। এই দুই নারীর প্রেম ভালবাসা-মমতা বনহুরকে সমানভাবে দখল করে বসেছে।

বনহুর জানে, পৃথিবীতে একজন-একজনকেই মনপ্রাণ সব দিতে পারে, দু'জনকে নয়। কিন্তু তার অবস্থা পৃথিবীর সকলের চেয়ে অন্য রকম। মনিরা আর নূরী বনহুরের কাছে সমান বলে মনে হয়।

মনিরা বনহুরের হৃদয়ে জাগায় শিহরণ, নূরী জাগায় স্পন্দন। মনিরার মধ্যে বনহুর রচনা করে খুশির উৎস। মনিরা তার হৃদয়ের রাণী আর নূরী তার প্রাণ প্রতিমা। কাউকে বনহুর তুচ্ছ বা নগণ্য মনে করতে পারে না। আজ তাই বনহুর নূরীকে হঠাৎ এই প্রশ্ন করে বসল।

বনহুর নূরীর চিবুকটা ফিরিয়ে নিল নিজের দিকে, শান্তকণ্ঠে বলল-কি হলো নুরী?

কিছু না।

কিন্তু পৃথিবীতে যা না হয়েছে আমি তাই চাই নূরী। আমি চাই তোমাদের দুজনকে।

নূরী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল–তা কি সম্ভব?

নূরী, যা সম্ভব নয় আমি তাই চাই–গভীর আবেগে নূরীকে কাছে টেনে নেয় বনহুর।

মনি এমন সময় নড়ে ওঠে। নূরী বলে—ছিঃ মনি জেগে যাবে যে?

ঠিক সেই মুহূর্তে মাঝির কণ্ঠে শোনা গেল ভয়ার্ত স্বর-হুজুর, ঝড় আইবো। আকাশে দারুণ মেঘ অইছে।

বনহুর আর নূরী ছৈয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো বাইরে। গাঢ় মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। বনহুরের আর একটা দিনের কথা বিদ্যুতের মত খেলে গেল মনের আকাশে। এমনি সেদিনও সে দাঁড়িয়ে ছিল পিতার পাশে, আকাশে ঘন মেঘ জমাট বেঁধে উঠেছিল। পরক্ষণেই ঝড়-বৃষ্টি তুফান–তারপর সব ওলোট পালট হয়ে গিয়েছিল, এমন কি তার জীবনটাও।

বনহুর আজ সেই ছোট্ট বালকটি নেই, আজ সে বলিষ্ঠ যুবক।

বনহুর দ্রুত নিজে গিয়ে দাঁড় তুলে নিল হাতে। নূরীকে লক্ষ্য করে বলল-শিগগির ভেতরে যাও নূরী, মনিকে কোলে নিয়ে বস।

আর তুমি?

আমি দেখি নৌকাটাকে বাঁচাতে পারি কিনা–বনহুরের কথা আর শোনা যায় না ঝড়ো হাওয়ায়। নূরী গিয়ে ঘুমন্ত মনিকে তুলে নেয় কোলে।

ঝড়ের দাপটে নৌকাখানা দোলনার মত দুলতে লাগল। দু’জন মাঝি আর বনহুর নিজে নৌকাখানা বাঁচানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল।

বৃষ্টির পানি আর উচ্ছ্বসিত ঢেউয়ের পানিতে বনহুরের সমস্ত শরীর ভিজে চুপসে গেল। বলিষ্ঠ হাতে দাঁড় ঠিক রেখে নৌকাকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল সে।

হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ঝাপটায় বনহুর নৌকার গলুই থেকে ছিটকে পড়ল নদীতে। সঙ্গে সঙ্গে নৌকাখানা একটা ঘুরপাক খেয়ে তীরবেগে ছুটতে লাগল

লক্ষ্যহীনভাবে!

•

একদল সখী পরিবেষ্ঠিত রাজকুমারী হীরাবাঈ গঙ্গাস্নান সেরে বাড়ি ফিরছিল। খুব ভোরে রোজ হীরাবাঈ সখীদের নিয়ে গঙ্গাস্নানে আসে। অপূর্ব সুন্দরী হীরা বেলা ওঠার পূর্বে রাজপথ বেয়ে গঙ্গাতীরে যায়। আবার লোক জাগার পূর্বেই রাজপুরীতে ফিরে আসে। যতক্ষণ হীরা রাজপথ দিয়ে গঙ্গাস্নান সেরে ফিরে না যায় ততক্ষণ নগরীর দোকানপাট বা যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।

সাত ঘোড়ার গাড়িতে হীরাবাঈ সাত সখী পরিবেষ্ঠিত হয়ে গঙ্গাতীরে স্নানে আসে। এমন কি ঘোড়াগাড়ি চালক পর্যন্ত নারী। হীরাবাঈ বাল্যবিধবা, ব্রাহ্মণ-কন্যা। রাজা নারায়ণ দেব অতি নিষ্ঠাবান রাজা। কন্যা বিধবা হলেও তার কোন স্বাদ-আহলাদ থেকে তিনি বঞ্চিত করেননি। যা হীরাবাঈ ভালবাসে চায়, তাই করেন রাজা নারায়ণ দেব।

প্রতিদিনের মত আজও হীরাবাঈ সাত সখী নিয়ে গঙ্গায় স্নান সেরে বাড়ি ফেরার জন্য গঙ্গাতীর বেয়ে গাড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

হঠাৎ হীরাবাঈয়ের দৃষ্টি চলে যায় অদূরে, সে দেখল বালুচরে পড়ে রয়েছে একটি লোক। সংগিনীদের দেখিয়ে বলল হীরা–দেখ দেখ ও কে পড়ে আছে!

হীরা সখীদের নিয়ে অগ্রসর হলো।

নিকটে পৌঁছে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো হীরা। সখীরাও কম আশ্চর্য হলো। অপূর্ব সুন্দর এক যুবক অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রয়েছে বালুচরে।

হীরা পুরুষ মানুষ তেমন করে কোনদিন দেখেনি। যদিও দেখেছে দূরে, এত কাছে একমাত্র পিতাকে ছাড়া কাউকে দেখার সুযোগ তার কোনদিন হয়নি।

হীরা অবাক নয়নে তাকিয়ে রইল যুবকের মুখের দিকে।

সখীরা এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। হীরা বাল্যবিধবা, কোন পুরুষ দেখা তার পাপ। সখীরাও যুবকের অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেছে।

হীরা বসে পড়ল যুবকের পাশে। তাড়াতাড়ি বুকে কান রেখে বলল-পারুল এ জীবিত!

পারুল বলল—হয়ত কোন নৌকাডুবি লোক।

হীরা ব্যস্তকণ্ঠে বলল-একে নিয়ে চল পারুল।

সর্বনাশ, মহারাজ যদি জানতে পারেন?

আমি ওকে কিছুতেই এখানে রেখে যাব না পারুল, ওকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর। নিশ্চয়ই কোন রাজকুমার হবে।

একজন সখী বলল—কিন্তু পোশাক তো রাজকুমারের মত নয়। দেখছ না জামা ছেড়া।

অন্য একজন সখী বলল—সত্যি, এ অপূর্ব সুন্দর কিন্তু।

আর একজন বলল—দেবকুমারের মত দেখতে।

পারুল বলল-আমার হীরার সংগে সুন্দর মানত যদি সে বিধবা না হত–

হীরা গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল-ন্যাকামি রাখ দেখি। আহা বেচারী না জানি কে, কি এর পরিচয়!

পারুল হেসে বলল জ্ঞান ফিরলেই সব জানা যাবে।

হীরা বলল—তাড়াতাড়ি তুলে নে আমার গাড়িতে।

সবাই মিলে যুবকের সংজ্ঞাহীন দেহটা তুলে নিল গাড়িতে।

জ্ঞান ফিরতেই চোখ মেলে তাকাল বনহুর।

একি! বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো। দুগ্ধ-ফেনিল শুভ্র বিছানায় নরম তুলতুলে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছে সে। বনহুর ধীরে ধীরে তাকাল কক্ষের চারদিকে। সুন্দর করে সাজান কক্ষটি। নানা রকমের বিচিত্রময় কারুকার্যখচিত দেয়াল। বড় বড় ঝাড়বাতি আর মূল্যবান লণ্ঠন ঝুলছে। যে খাটে শুয়ে রয়েছে সে খাটখানা অতি

সুন্দরভাবে তৈরি। খাটের সংগে মখমলের ঝালর টাঙানো রয়েছে। খাটের পাশে গোল মার্বেল পাথরের টেবিল। টেবিলে মস্তবড় একটা ফুলদানি। ফুলদানিতে অনেকগুলো ফুল গোঁজা রয়েছে।

বনহুর এবার বিছানায় উঠে বসল, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল সে। পাশের একটা লম্বা সোফায় অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী নিদ্রামগ্ন। গোলাপের পাপড়ির মত মুদিত দুটি আঁখিযুগল। আপেলের মত গণ্ডদ্বয়। বনহুর তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে ঘুমন্ত যুবতীর মুখের দিকে।

একি সে স্বপ্ন দেখছে! বনহুর স্মরণ করতে চেষ্টা করল এখন সে কোথায়?-মনে পড়ল সব কথা। নৌকা থেকে নবীবক্ষে ছিটকে পড়ার দৃশ্য ভেসে উঠল তার মানসপটে। মনে পড়ল নূরী আর মনির কথা। না জানি তাদের অবস্থা কি হয়েছে। হয়ত সলিল সমাধি লাভ করেছে ওরা। ব্যাথায় টনটন করে উঠল বনহুরের মন।

কিন্তু এখানে এলো সে কি করে!

নদীর উচ্ছ্বসিত জলরাশির সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে কখন তার হাত দু'খানা অবশ হয়ে এসেছিল, তারপর কখন যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, খেয়াল নেই কিছু।

বনহুর নিজেকে এই সুসজ্জিত রাজকক্ষে দেখে অনুমানে কিছুটা বুঝে নিল। কিন্তু এটা কোন দেশ, কে এই যুবতী, তাকে কি করেই বা এখানে আনল। ইচ্ছা করলে এখনই বনহুর কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু কিছু না জেনে হঠাৎ এমনভাবে বাইরে বের হওয়া এখন তার পক্ষে উচিত হবে না।

বনহুর জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দেখল, রাজবাড়িই বটে। ফিরে এলো সে ঘুমন্ত যুবতীর পাশে, ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল সত্যি অদ্ভুত সুন্দরী মেয়েটি। নিশ্চয়ই রাজকন্যা হবে। কিন্তু সে রাজকন্যার শয়ন কক্ষে এবং বিছানায় শায়িত কেন? মোমবাতি নিয়ে বনহুর হীরার মুখটা ভাল করে দেখতে লাগল!

হঠাৎ এক ফোটা তপ্ত মিম ঝরে পড়ল হীরার গণ্ডে।

চমকে জেগে উঠল হীরাবাঈ। চোখ মেলতেই দেখল সেই যুবক তার পাশে দাঁড়িয়ে। দক্ষিণ হাতে তার মোমবাতি।

বনহুর তাড়াতাড়ি সরে যাচ্ছিল; হীরা পিছু ডাকল শোন।

থমকে দাঁড়িয়ে বনহুর ফিরে তাকাল।

হীরা মৃদু হেসে উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে এলো তার পাশে। বললোযুবক, কে তুমি? কেমন করে নদীতীরে এসেছিলে?

বনহুর বুঝতে পারল—সে মন্দিরা নদী থেকে প্রবল ঝড়ের দাপটে ঢেউয়ের আঘাতে কোন অজানা দেশে এসে পড়েছে। নদীতীরে হয়ত পড়েছিল সে, এরা তাকে তুলে এনেছে। কিন্তু এ যুবতীর কক্ষে কেন?

হীরা পুনরায় প্রশ্ন করল কি ভাবছো যুবক? আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছ না কেন?

বনহুর শান্তকণ্ঠে বলল—আমি বনহুর।

হীরা বনহুরের কথাটা পুনরাবৃত্তি করল—বনহুর! তারপর বলল—কোন দেশের রাজকুমার তুমি?

আমি রাজকুমার নই।

তবে কে তুমি?

আমি দস্যু।

দস্যু! ডাকু তুমি?

হাঁ, কিন্তু তুমি?

হীরাবাঈ। আমার বাবা নারায়ণ দেব সিন্ধু রাজ্যের মহারাজ।

হুঁ, রাজকুমারী হীরাবাঈ। কথাটা আপন মনেই বলল বনহুর। একটু থেমে বলল সে আমাকে নদীতীর থেকে কুড়িয়ে এনে ভাল করনি হীরাবাঈ।

কেন?

আমি তোমার সব অলঙ্কার লুটে নিতে পারি।

তুমি আমার সাথে অন্যায় করবে?

করব না, কারণ তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ। বনহুর সরে এলো হীরাবাঈয়ের পাশে আমাকে চলে যাবার পথ দেখিয়ে দাও এবার।

চলে যাবে?

হাসল বনহুর—না গিয়ে কি পারি?

তুমি চিরদিন এখানে থাকতে পার না?

বনহুর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল হীরাবাঈয়ের মুখের দিকে।

হীরা দৃষ্টি নত করে নিল।

বনহুর দেখল, হীরাবাঈয়ের মুখমণ্ডলে একটা অব্যক্ত ব্যথার্ত ভাব ফুটে উঠেছে। কি যেন বলতে চায়, কিন্তু পারছে না।

বনহুর এসে বসল বিছানার একপাশে, হীরাকে লক্ষ্য করে বলল–এখানে আমাকে কে নিয়ে এসেছে হীরাবাঈ?

হীরা মুখ তুলে তাকাল, এগিয়ে এলো বনহুরের পাশেবলল আমি আর আমার সখীগণ।

তোমার বাবা নারায়ণ দেব আমার কথা জানেন না?

না।

সেকি!

হ্যাঁ, আমার বাবা তোমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।

কেন, তোমরা তাকে বলোনি আমার কথা?

না, আমার বাবা তোমার কথা জানতে পারলে আর কোনদিন তোমাকে আমার কাছে আসতে দেবেন না।

বনহুর হীরাবাঈয়ের কথা যতই শুনছিল ততই অবাক হয়ে যাচ্ছিল। তাই বনহুর প্রশ্ন করে কেন?

হীরা এবার বসল বনহুরের পাশে, বললপুরুষলোক আমার দেখা মানা।

মানা!

হ্যাঁ, কারণ আমি বিধবা।

বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করে বনহুর—তুমি বিধবা! কিন্তু তোমার বয়স তো তেমন বেশি বলে মনে হচ্ছে না হীরাবাঈ?

আমি বাল্যবিধবা। খুব ছোট্টবেলায় আমার বিয়ে হয়েছিল। আমি স্বামীকে চিনার আগেই সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।

সে কারণে পুরুষলোক দেখা তোমার মানা?

ব্রাহ্মণ বিধবা আমি, কাজেই আমার কোনদিন–চুপ হয়ে যায় হীরাবাঈ।

বনহুর এবার সব বুঝতে পারে। করুণাভরা নয়নে তাকাল ওর মুখের দিকে। হীরার কথাগুলো তার হৃদয়ে আঘাত করল। বনহুর জানত হিন্দুঘরের বিধবা মেয়েদের কাহিনী অত্যন্ত করুণ, বেদনাদায়ক। কিন্তু চাক্ষুষ দেখার বা অনুভব করার সুযোগ এই তার প্রথম।

বনহুর হীরাঈবায়ের অপরূপ সৌন্দর্যভরা যৌবন ঢলঢল চেহারার দিকে তাকিয়ে স্তব্দ হয়ে যায়। এর জীবনটা কি তাহলে এমনিভাবে নষ্ট হয়ে যাবে। ফুল ফুটে নীরবে যদি ঝরে যায়, কেউ যদি তার ঘ্রাণ গ্রহণ করতে না পারে, তবে সে ফুলের জীবনে সার্থকথা কি?

বনহুর আনমনা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ হীরার দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চোখ তুলে তাকায়।

হীরা বলে ওঠে–তোমাকে কোনদিন যেতে দেব না।

একটুকরা ম্লান হাসি ফুটে উঠল বনহুরের ঠোঁটের কোণে। কোন জবাব দিল না সে।

পূর্বাকাশ তখন ফর্সা হয়ে এসেছে।

সাত সখী প্রবেশ করল কক্ষে। বনহুর ও হীরাবাঈকে পাশাপাশি বসে কথা বলতে দেখে থমকে দাঁড়াল।

হীরাবাঈ হেসে বলল–ভয় নেই, ওরা আমার সখী।

বনহুর ভয় পাবে নারীদের দেখে। তবু চোখেমুখে ভীতিভাব এনে বলল বাচলাম।

একসঙ্গে সখীগণ হেসে উঠল।

হীরা বলল-ওদের সাহায্যেই আমি তোমাকে এখানে এনেছি।

ও, তাই বল। তুমি একা নও।

আমি কি পারি তোমার ওই বলিষ্ঠ দেহটা একা তুলতে। আচ্ছা তুমি আমার এই কক্ষে থাক, আমি গঙ্গাস্নান করে আসি।

সখীদের মধ্য থেকে পারুল বলল—এরই মধ্যে খুব যে ভাব জমিয়ে নিয়েছ হীরা, দেখ সাবধান। বাঁকা চোখে একবার বনহুরের দিকে তাকিয়ে দেখে নিল সে।

হীরা সখীদের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

নগরী জাগরিত হওয়ার পূর্বেই আবার ফিরে আসবে ওরা।

.

ইচ্ছা থাকলেও বনহুর হীরাবাঈ আর তার সাত সখীর নিকট হতে পালাতে সক্ষম হলো না। বিশেষ করে হীরার চোখের পানি তাকে অভিভূত করে ফেলল। বড় মায়া হলো বনহুরের, চাইল হীরার জীবনটা যেন নষ্ট হয়ে না যায় তাই করতে।

সব সময় বনহুর ভাবতে লাগল—কি করে হীরার জীবন সুখের এবং আনন্দের করা যায়! কিন্তু এ সবের মধ্যেও বারবার বনহুরের মনে নূরী আর মনির কথা উদয় হতে লাগল। সেই মন্দিনা নদী থেকে এদেশ কত দূরে। কত দুরে সেই কান্দাই নগর, যেখানে তার মা আর মনিরা তার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে। নূরী আর মনির জন্যই বনহুরের মন বেশি বেদনাবিধুর হয়ে পরেছে। ইচ্ছা করলে এখনই সে চলে যেতে পারে কিন্তু হীরা হীরাকে এমনভাবে ফেলে মন তার যেতে চাইল না।

বনহুর যখন হীরাবাঈয়ের জন্য গভীরভাবে চিন্তা করছে, হীরা তখন বনহুরকে কেন্দ্র করে রচনা করে চলেছে স্বপ্নসৌধ।

হীরা বাগানের ফোয়ারার পাশে বসে বীণা বাজাচ্ছিল। আর ভাবছিল বনহুরের কথা। ওকে আর কোনদিন ছেড়ে দেবে না হীরা। যোক সে বাল্যবিধবা, মানবে না ওসব কিছু। গোপনে বনহুরকে সে লুকিয়ে রাখবে নিজের অন্তঃপুরে, যেখানে কোন পুরুষের প্রবেশ নিষেধ, কেউ জানবে না ওর কথা।

হীরা মাঝে মাঝে পারুলের কাছে মনের কথা সব খুলে বলত। আজ পারুল এসে বসল হীরার পাশে। ওকে চমকে দেবার জন্য পেছন থেকে হীরার চোখ দুটি চেপে ধরল।

হীরার হাতে বীণার সুর থেমে গেল।

হীরা চমকে উঠলো, বনহুরের চিন্তায় হীরা তন্ময় ছিল, কাজেই সে চট করে বলল তুমি?

পারুল হীরার চোখ ছেড়ে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। হীরা লজ্জিত কণ্ঠে বলল-ও তুই?

দু'সখী মিলে যখন কথা হচ্ছিল, অদূরে এসে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল বনহুর। যেখান থেকে হীরা আর পারুলের কথা সব শুনতে পাবে।

পারুল বসে পড়ল হীরার পাশে, হীরার গালে টোকা দিয়ে বললসব সময় তার ধ্যানেই মগ্ন থাকবি?

পারুল্ল!

হীরা, আমি সব জানি।

আমি ওকে ছাড়া বাচব না পারুল।

কিন্তু তুমি যে হিন্দু ঘরের বিধবা–

পারুল! চিৎকার করে ওঠে হীরা।

পারুল বলে কিন্তু জান এর পরিণতি কি হবে?

বাবা আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন।

হ্যাঁ, তিনি যেমন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ রাজা—তোমার জন্য তিনি নিষ্ঠা নষ্ট করবেন না। সমাজের তিনি অধিপতি–

পারুল, সমাজের জন্য, নিষ্ঠার জন্য আমার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে? আমার কি কাউকে ভালবাসার অধিকারটুকু নেই?

হীরা। তুমি তো জান, তোমার মাসিমা দেবীকা বাঈ তাঁর মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণেও গিয়েছিলেন।

আমাকে তাহলে তখন স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় পুড়ে না মেরে জীবিত রেখেছিল কেন? না, না, আমি বাঁচতে চাই না পারুল, আমি বাঁচতে চাই না–পারুলের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে হীরাবাঈ।

বনহুর আড়ালে দাঁড়িয়ে অধর দংশন করে। অব্যক্ত একটা ব্যথা তার মনে চাড়া দিয়ে ওঠে। দাঁতে দাঁত পিষে ভাবে হিন্দু সমাজের টুটি ছিড়ে ফেলবে সে। হীরাকে বিয়ে দিয়ে নিষ্ঠাবান রাজার দর্প চূর্ণ করবে কিন্তু পাত্র কোথায়? কোথায়?

সেদিন হীরা সখীদেরকে নিয়ে বনহুরকে নাচ দেখাচ্ছিল। একটা আসনে বনহুর বসে ছিল, হীরা আর তার সখীগণ নেচে চলেছে।

বনহুর তস্ময় হয়ে দেখছে, হীরা অপূর্ব সুন্দর নাচছে।

হীরা এত সুন্দর নাচতে পারে, ভাবতেও পারেনি বনহুর।

সেদিন হীরার বীণার সুর তাকে বিমুগ্ধ করে ফেলেছিল।

বনহুর ভাবে, এত সুন্দর একটা জীবন নীরবে শুকিয়ে যাবে, তা হয় না।

নাচা শেষ হলে সখীরা চলে যায়।

হীরা তাকায় বনহুরের মুখের দিকে। হীরার মুখে ঘামের বিন্দুগুলো ঠিক যেন মুক্তার মত চক চক করছিল। অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে।

বনহুর সরে আসে হীরার পাশে। মধুর কণ্ঠে ডাকে–হীরাবাঈ।

হীরা গম্ভীর হয়ে বলে—উঁহু, শুধু হীরা বলে ডেক।

বেশ, তাই ডাকব। হীরা, অপূর্ব নেচেছ!

উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে হীরা—সত্যি!

হ্যাঁ হীরা!

হীরা আবেগমাখা কণ্ঠে বলল-বনহুর!

হীরা!

বল?

সেদিন পারুলকে তুমি যা বলেছ সব শুনেছি।

চমকে উঠল হীরা–শুনেছ?

হ্যাঁ, কিন্তু তুমি যা বলছ তা সম্ভব নয়। আমি মুসলমান।

হীরা একবার তাকাল বনহুরের দিকে, তারপর বলল কিন্তু আমি যে তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি!

ভাল আমিও তোমাকে বেসেছি হীরা।

বনহুর!

হাঁ, তোমাকে আমি বোনের মত স্নেহ করি।

চমকে তাকাল হীরা, অস্ফুট কণ্ঠে বলল-তুমি–তুমি–

হীরা, আমি বিবাহিত, আমার স্ত্রী আছে,–এমনকি একটি সন্তানও কথা শেষ না করে থেমে যায় বনহুর।

হীরা পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোটা ফোটা অশ্রু।

বনহুর হীরার চোখের পানি নিজের আংগুলে মুছে দিল।

হীরা আবেগভরা কণ্ঠে বলল—এ তুমি কি করলে? সঙ্গে সঙ্গে হীরা ঢলে পড়ল মেঝেতে।

বনহুর তাড়াতাড়ি হীরার মূর্ছিত দেহটা ধরে ফেললো দু'হাত দিয়ে। তারপর তুলে নিল হাতের উপর।

ঠিক সেই মুহূর্তে পারুল এসে দাঁড়াল—একি! ওকে আপনি স্পর্শ করলেন?

বনহুর একটু হকচকিয়ে গেল, বলল—হঠাৎ হীরা অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

কিন্তু জানেন তো, আমাদের জাতের মধ্যে যে পুরুষ একবার কোনো নারীকে স্পর্শ করে তাকেই বিয়ে করতে হয়।

বনহুর হাসল—চল আগে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিই।

পারুল আর বনহুর হীরার সংজ্ঞাহীন দেহটা এনে বিছানায় শুইয়ে দিল।

পারুল হীরার চোখে-মুখে পানির ঝাপটা দিতে দিতে বলল—একি করলেন! একি করলেন আপনি?

আমি–আমি তো কিছু করিনি।

কথা দিন ওকে বিয়ে করবেন?

সে কথা তোমার সখীর সংগে হয়ে গেছে পারুল।

ও, তাই বুঝি হীরা আনন্দে....

হাঁ, আনন্দে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। আচ্ছা পারুল, তুমি সখীর পাশে এসে সেবা কর, আমি পাশের কক্ষে বিশ্রাম করছি।

তা হয় না, অপনি বরং বসুন, আপনার জন্যই বেচারীর এ অবস্থা।

কিন্তু আমার যে বড্ড ঘুম পাচ্ছে।–বনহুর চট করে উঠে চলে গেল পাশের ঘরে। তারপর খিল এঁটে দিল।

বনহুর সম্মুখ দরজায় খিল দিয়ে পেছনের জানালার কাঁচ খুলে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল। অনেক চেষ্টা করে একটা চাকু সংগ্রহ করে নিল বনহুর। তারপর কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর জানালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাইরে।

ছাদের রেলিং বেয়ে অতি কষ্টে এগুতে লাগল মহারাজার কক্ষের দিকে।

বনহুর মহারাজের কক্ষের নিকটে এসে পৌঁছল। এবার অতি সহজে তার কক্ষের মুক্ত জানালাপথে ভেতরে প্রবেশ করল। কক্ষে প্রবেশ করেই দেয়ালে টাঙানো সুতীক্ষ্ণধার ছোরাখানা তুলে নিল দক্ষিণ হাতের মুঠোয়। পকেট থেকে রুমালখানা বের করে মুখে বাঁধল যেমন দস্যুরা বাঁধে।

বনহুর এবার সুতীক্ষ্ণ ছোরা হাতে মহারাজ নারায়ণ দেবের শয্যার পাশে এসে দাঁড়াল। একটানে তাঁর শরীরের চাদর সরিয়ে দিল সে।

ধড়ফড় করে উঠে বসলেন রাজা নারায়ণ দেব। সম্মুখে তাকিয়ে চোখ তার ছানাবড়া হলো। ঢোক গিলে বললেন–কে তুমি? কি চাও?

আমি দস্যু বনহুর।

দস্যু বনহুর! কি চাও আমার কাছে? যা চাইবে তাই দেব। শুনেছি কান্দাই জঙ্গলে দস্যু বনহুর বলে এক ভয়ঙ্কর দৃস্যু আছে, সেই দস্যু তুমি?

হাঁ, আমিই।

আরও শুনেছি, দস্যু বনহুর নাকি ভয়ঙ্কর হলেও দয়ার প্রতীক। দীন-হীন জনের বন্ধু। বহুদিনের আশা আমার সফল হলো। মনে মনে বহুদিন তোমাকে দেখার বাসনা আমার মনে উঁকি দিত। দস্যু হলেও তুমি দেবতার সমান–

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল বনহুর—মায়াভরা কথাতে দস্যু বনহুরের হৃদয় কোমল হয় না মহারাজ।

তুমি যাই বল, তুমি আমারও বন্ধু–কারণ, আমি চাই আমার দ্বীনহীন প্রজাদের মঙ্গল, আমার অনাথ মা বোনদের শান্তি–

এবার বনহুর ছোরাখানা মহারাজ নারায়ণ দেবের বুকের কাছে চেপে ধরল – তোমার নিজের ঘরের দিকে দেখেছ রাজা?

দেখেছি, ও অর্থ আমার নয়। সব আমার প্রজাদে–

সে কথা বলছি না, বলছি–তুমি মা-বোনদের শান্তি চাও?

চাই–শতবার চাই।

তোমার কন্যার মনের দিকে তাকিয়ে একবার দেখেছ রাজা?

চমকে ওঠেন মহারাজ নারায়ণ দেব–আমার কন্যা?

হাঁ, তোমার কন্যা হীরাবাঈ।

চঞ্চলকণ্ঠে বলে উঠলেন মহারাজ-হীরা! আমার হীরার কি হয়েছে দস্যু?

তোমার যদি এতটুকু বিবেক থাকত রাজা, তাহলে নিজের কন্যাকে টুটি টিপে হত্যা করতে না।

হত্যা! আমার হীরাকে হত্যা করেছি টুটি টিপে?

তা নয় তো কি? শিশুকালে তাকে বিয়ে দিয়ে বৈধব্য যন্ত্রণা তার ঘাড়ে চাপিয়ে তিলে তিলে তাকে হত্যা করছ।

একি বলছ? তার অদৃষ্টে যা ছিল তা ঘটেছে।

অদৃষ্টে ছিল না—তুমিই তার জীবনটাকে বিনষ্ট করে দিয়েছ। তার চিরদিনের স্বাদ আহলাদ সব, তুমি নষ্ট করে দিয়ে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিচ্ছ।

হাঁ, আমরা যে ব্রাহ্মণ, আমাদের ধর্মে মেয়েদের একবারই বিয়ে হয়।

স্বামীকে যে কোনদিন দেখেনি, স্বামী কি জিনিস যে বুঝেনি তার আবার বিয়ে? হাঃ হাঃ হাঃ এই তোমাদের হিন্দুধর্ম! বল রাজা, তোমার কন্যা হীরার আবার বিয়ে দেবে না মৃত্যুবরণ করে নেবে-কোনটায় তুমি রাজী?

তা হয় না। আমাদের হিন্দুমতে ব্রাহ্মণকন্যার পুনঃবিবাহ হয় না।

হতে হবে–নইলে আমি তোমাকে হত্যা করব।

তুমি যত টাকা চাও নিয়ে যাও দস্যু। তবু আমার নিষ্ঠা ভঙ্গ কর না।

তোমার কন্যার জীবনের বিনিময়ে তুমি আমাকে অর্থ দিতে চাও, নিজের জীবনের বিনিময়ে নয়?

আমি নিরুপায়।

না, তোমাকে হীরার বিয়ে দিতেই হবে।

কিন্তু কে তাকে বিয়ে করবে? বিধবাকে কে বিয়ে করবে বল?

আমি তোমার কন্যার পাত্র খুঁজে দেব। বল রাজী?

রাজী।

তিন বার বল রাজী, তিন সত্য করে বল।

রাজী। রাজী। রাজী।

বনহুর যেমন আচম্বিতে এসেছিল তেমনি মুহূর্তে জানালাপথে অদৃশ্য হলো।

পরদিন মহারাজ নারায়ণ দেব রাজসভায় গেলেন না। কোন পরিষদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করলেন না। রাজকার্য করলেন না। রাজকর্মচারিগণ বিস্মিত

হলেন। আত্মীয়-স্বজন দুশ্চিন্তায় পড়ল, মহারাজের হঠাৎ এক রাত্রের মধ্যে কি হলো।

আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন মহারাজ। সদা চিন্তা করতে লাগলেন, কি করে তার বিধবা কন্যাকে আবার বিবাহ দেবেন। সমাজে তার মাথা হেট হয়ে যাবে। নিষ্ঠাভঙ্গ হবে। সবাই ছিঃ ছিঃ করবে। এর চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল।

বনহুর সেই দিনের পর থেকে সিন্ধু রাজ্যে প্রতি ঘরে ঘরে পাত্র খোঁজ করে চলল। হীরার পাত্র সুন্দর, সুপুরুষ, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান এবং কুলীন ব্রাহ্মণ হতে হবে।

পেয়েও গেল সে একদিন।

পাশের রাজ্যে ব্রাহ্মণ তরুণ রাজা জহর সেনকে আবিষ্কার করল বনহুর।

তারপর একদিন গোপনে হীরার ছবি নিয়ে রাজা জহর সেনের রাজসভায় বৃদ্ধ জ্যোতিষীর বেশে গিয়ে হাজির হলো।

রাজা জহর সেন যেমন সুন্দর তেমনি হৃদয়বান এবং মহৎ। সে জ্যোতিষীকে আদর করে নিজের পাশে বসাল।

বনহুর জ্যোতিষীর বেশে নিজকে আসনে প্রতিষ্ঠা করে গম্ভীর কণ্ঠে বলল – মহারাজা আপনার জয় হোক।

সসম্মানে বলল জহর সেন—জ্যোতিষী আপনার আগমনের কারণ জানতে পারি কি?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই পারেন মহারাজ। আমি এসেছি একটি শুভবার্তা নিয়ে।

বলুন জ্যোতিষী।

বনহুর থলের মধ্যে হতে হীরার ফটোখানা বের করে বলল –এই মেয়ে পছন্দ হয়?

কুমার জহর সেন বনহুরের হাত থেকে ফটোখানা নিয়ে দেখতে লাগল। চোখ মুখ মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ তন্ময় হয়ে তাকিয়ে দেখল জহর সেন, তারপর বলল হাঁ, জ্যোতিষী এ মেয়েটি আমার অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে।

সত্যি রাজা?

হাঁ এবং অতি শীঘ্র একে আমি বিয়ে করতে চাই।

বেশ, তাই হবে। উঠে দাঁড়ায় বনহুর।

জহর সেন নিজ কণ্ঠের মুক্তার মালা খুলে জ্যোতিষীর হাতে দিতে যায়–এই নিন আপনার পুরস্কার।

না। শুভ কাজের পর আমি পুরস্কার নেবআগে নয়। এখন চললাম।

জহর সেন প্রণাম জানায়। জ্যোতিষী বিদায় গ্রহণ করে।

.

পৃথিবীর বুকে যেন একটা ধ্বংসের লীলা খেলা হয়ে গেছে। গত রাতের ঝড় সব তচনচ করে দিয়ে গেছে। নূরী শিশু মনিকে নিয়ে নৌকায় বসে আছে। নৌকা আপন মনে দুলে দুলে এগিয়ে চলেছে। কোথায় চলেছে, কোথায় এর শেষ-কেউ জানে না।

নৌকার মাঝিদ্বয় বনহুরকে উদ্ধারের জন্য নদীবক্ষে লাফিয়ে পড়েছিল, ফিরে আর আসেনি। কোথায় চলে গেছে ওরা কে জানে। ঝড় থেমে গেছে। প্রকৃতি শান্ত ধীর স্থির হয়েছে। নদীর উচ্ছ্বসিত জলরাশি নিটল নির্মল হয়েছে। কিন্তু এ কোথায় এসে গেছে নূরী আর মনির নৌকা। যেদিকে তাকায় নূরী শুধু জল আর জল। কোথাও তীরের চিহ্ন নেই।

নূরী ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠল। ক্ষুধা পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে এসেছে। মনির তো কথাই নেই। বার বার মনি বলছে–আম্মা, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

নূরী মনিকে বুকে চেপে বলে উঠে কেমন করে বলব বাবা।

আম্মা, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।

হু হু করে কেঁদে উঠল নূরীর মন, বলল–কি খাবে বাপ। কিছুই যে নেই।

কিন্তু কতক্ষণ এমনি করে ওকে ভুলিয়ে রাখা যাবে।

গোটা দিন কেটে গেল। রাত এলো—

নূরী আর মনি নৌকার মধ্যে ভেসে চলেছে—দিকহারা, দিশেহারা যাত্রী তারা।

সে রাত গেল, আবার ভোর হলো।

গোটা পৃথিবী সূর্যের আলোতে ঝলমল করে উঠল।

নূরী আর মনির নৌকা ভেসে চলেছে।

মনির সুন্দর গোলাপকুড়ির মত মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। কাঁদতে পারছে না মনি, কণ্ঠ নীরস শুষ্ক।

নূরী হতাশ হয়ে পড়ল। চোখে অন্ধকার দেখল আর বুঝি মনিকে সে বাঁচাতে পারল না।

এলিয়ে পড়েছে মনি নূরীর কোলে।

নূরীর চোখ বসে গেছে, কণ্ঠ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না। নূরী নিজের এবং মনির জীবনের আশা ত্যাগ করল।

আর নূরীর মনে হলো, মনিকে সে রেখে ভুল করেছে।

কেন যে মনিকে তার বাপ-মার কাছে ফেরত দেয়নি।

তাহলে মনি আজ এমনভাবে শুকিয়ে মরত না। কে এর বাবা-কে এর মা, কার এ শিশু-নূরীর চোখ দিয়ে দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। হয়ত তখন সন্ধান করলে এর বাবা মাকে খুঁজে পাওয়া যেত। নিশ্চয়ই ইচ্ছা থাকলে উপায় হত, কিন্তু নূরীই তা হতে দেয়নি। একটা গভীর স্নেহ তার নারী-হৃদয়ে দানা বেঁধে উঠেছিল।

নৌকা ভেসে চলেছে।

নূরীর কোলে মনি ঘুমন্ত না জাগ্রত বুঝার উপায় নেই। চোখ দুটো মুদে আছে। নূরী মাঝে মাঝে ভাবে মনির মৃতদেহ নদীবক্ষে বিসর্জন দিয়ে নিজেও নদীবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়বে, বাস্ সব শেষ হয়ে যাবে।

যেখানে তার হুর গেছে, তার মনি যাবে, সেখানেই হবে নূরীর চিরশান্তি।

নৌকা দুলে দুলে এগিয়ে চলেছে।

উপরে প্রখর সূর্যের তাপ অগ্নিবর্ষণ করছে।

নিচে সীমাহীন অথৈ জলরাশি—

০১৩. বন্দিনী

বন্দিনী – দস্যু বনহুর সিরিজ – রোমেনা আফাজ

চারদিকে সীমাহীন অথৈ জলরাশি। শুধু জল আর জল। শেষ প্রান্তে জলের সঙ্গে মিশে গেছে যেন নীল আকাশখানা। শান্ত ছেলের মতই নীরব আজ নদীবক্ষ। নেই কোনো উচ্ছলতা। মৃদু মন্দ বাতাসে দোল খেয়ে খেয়ে এগিয়ে চলেছে নূরীর নৌকা। কোলে তার অর্ধ অচেতন মনি। নূরী ব্যাকুল আঁখি মেলে তাকাচ্ছে মনির শুষ্ক মুখখানার দিকে। মাঝে মাঝে তার দৃষ্টি চলে যাচ্ছে দিক থেকে দিগন্তে। যতদূর চোখ যায় নিপুণ দৃষ্টি মেলে সন্ধান করছে তীর দেখা যায় কিনা।

আজ এক সপ্তাহের বেশি হলো তাদের এই অবস্থা হয়েছে। নৌকায় কিছু পানি আর সামান্য খাবার ছিলো তাই দিয়ে দুতিন দিন চালিয়ে নিয়েছিলো নূরী। এ খাবারটুকুর সন্ধান নূরী জানতো না। মাঝিরা পথে খাবে বলে হয়তো এটুকু নিয়েছিলো। তাই একদিন নূরীর নজরে পড়ে গিয়েছিলো। কোনোরকমে সেই সামান্য খাবারে চালিয়ে নিয়েছিলো। কিন্তু এক সপ্তাহ বা তার বেশিদিন না খেয়ে বাঁচা তো সম্ভব নয়। প্রায় চারটি দিন ওরা সম্পূর্ণ অনাহারে। নিজের জন্য নূরীর দুঃখ নেই, মরতে হয় মরবে। কিন্তু এই অসহায় শিশু যার মুখের দিকে তাকিয়ে নূরীর দুনয়ন অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। কি করে তার এই মর্মবিদারক অবস্থা দর্শন করতে পারে সে! নূরী কায়মনে খোদাকে স্মরণ করে চলেছে।

বেলা শেষ হয়ে এলো, অস্তমিত সূর্যের শেষ রশ্মি এসে পড়লো নূরী

আর মনির মুখে।

হঠাৎ নূরীর মনটা কেঁপে উঠলো, সূর্য অস্ত হবার পর নেমে আসবে জমাট অন্ধকার। পৃথিবীর আলো মুছে যাবে চোখ থেকে। কাল আবার ভোর হবে, সূর্য

উঠবে। সোনালী আলোয় বসুন্ধরা ঝলমল করে উঠবে, বাতাস বইবে, দিগ হতে দিগন্তে ফুটে উঠবে কত রঙের মেলা। কিন্তু আর জাগবে না তার মনি। এই আলোর অতলে তলিয়ে যাবে একটি ছোট্ট ফুলের মত সুন্দর জীবন। আর কোনোদিন ঐ মুদিত আঁখি দুটি মেলে তাকাবে না। আর ডাকবে না, মাম্মা বলে। নূরী উচ্ছসিতভাবে কেঁদে ওঠে মনি–মনি–ওরে তুই আর একবার চোখ মেলে দেখ। আর একবার মাম্মা বলে ডাক্, ওরে ডাক!

নূরীর কান্নার দোলা লাগে যেন নদীবক্ষে। হঠাৎ যেন নৌকাখানা একটু বেশি নড়ে উঠলো। চমকে উঠলো নূরী! আজ কদিন তার নৌকা একই–ভাবে মৃদু মন্থর গতিতে ধীরে অতি ধীরে এগিয়ে চলেছে। এতটুকু ছিলো না কোনো রকম পরিবর্তন।

এবার নৌকাখানা যেন বেশ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে বলে মনে হলো। সূর্য তখন ডুবে গেছে। নদীবক্ষে নেমে এসেছে একটা ঘোলাটে আলোছায়া।

নূরী চমকে উঠলো। বেশ দোলা লাগলো নূরীর দেহে। বুঝতে পারলো তার নৌকাখানা স্রোতের টানে দ্রুত ছুটতে শুরু করেছে। একি, কোথাও নীচু দিকে চললো নাকি তাদের নৌকা? ভয় হলো নূরীর মনে। কিন্তু পরক্ষণেই বুকে সাহস এলো তার। মৃত্যু যখন অনিবার্য তখন ভয় পেয়ে কি লাভ–মরতে তো একদিন হবেই।

নৌকাখানা এবার বেশ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। মাঝে মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছিলো, আবার ছুটছিলো আপন গতিতে। বেলা ডুবে গেছে। নৌকার ভেতর জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। নূরী মনির মুখখানা আর দেখতে পাচ্ছে না। মনিকে বুকে চেপে ধরে রইলো নূরী। দুচোখ বন্ধ করে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো সে।

নূরী জানে, এসব পাহাড়িয়া নদী। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড় আর পাথরখণ্ড লুকিয়ে আছে। যেভাবে তাদের নৌকা এগোচ্ছে তাতে যে কোনো পাহাড় বা উঁচু পাথরের গায়ে নৌকাখানা ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে হবে তাদের সলিল সমাধি।

নূরীর মনে শেষ বারের মত বনহুরের মুখখানা ভেসে উঠলো। সেই সুন্দর দীপ্ত দুটি চোখ। নূরী অন্ধকারে তার হুরের স্মরণ করে এত বিপদেও তৃপ্তি অনুভব

করলো, পেলো অনাবিল এক আনন্দ। এ জীবন যৌবন সবই যে হুরের–এই নদীবক্ষেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে তার হুর? সেও করবে। তারপর মিলিত হবে ওরা দুজন নির্মল জলের তলায়।

স্থিরভাবে বসে আছে নূরী।

নৌকা স্রোতের টানে তীরবেগে ছুটে চলেছে।

কখন যে নূরী নৌকায় ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তার খেয়াল নেই। আজ কদিন উপবাসী, তারপর সব সময় কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে নৌকার গায়ে ঢলে পড়েছে সে।

ঘুমিয়ে রয়েছে নূরী—

হঠাৎ নূরীর ঘুম ভেঙ্গে গেলো।

ভোরের মৃদু বাতাসে দেহটা শীতল হয়ে এসেছে। এমন সময় নূরীর কানে এসে পৌঁছলো পাখীর কলরব! তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে দৃষ্টি মেললো সে! সঙ্গে সঙ্গে দুনয়ন তার জুড়িয়ে গেলো। নৌকার ছৈয়ের বাইরে সবুজ বৃক্ষলতা, আলোছায়াভরা প্রকৃতি। পাখীরা ডালে বসে কিচমিচ করছে। কেউ বা উড়ে বেড়াচ্ছে মুক্ত আকাশে।

নূরী প্রাণভরে নিশ্বাস নিলো! ভাল করে লক্ষ্য করতেই দেখলো তাদের নৌকাখানা একটা নালার মত জায়গায় আটকে আছে। দূপাশে দুখানা পাথরে চাপে তাদের নৌকা আর এগুতে পারেনি। একটা জলপ্রপাতের শব্দ কানে এলো নূরীর। নূরী মনিকে কোলে নিয়ে ছৈয়ের বাইরে এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আঁতকে উঠলো সে। পাথরখন্ডের হাত কয়েক দুরেই প্রায় দুশ ফিট গভীর খাদ। সেই খাদে জলধারা সশব্দে গিয়ে আছড়ে পড়ছে। ভাগ্যিস তাদের নৌকাখানা দুপাশের দুটো পাথরখন্ডের সঙ্গে আটকে পড়েছিলো, তাই এতক্ষণও বেঁচে আছে তারা নইলে দিনের সূর্যের আলো দেখার ভাগ্য আর তাদের হতো না। নূরী দুহাত তুলে খোদার নিকটে শুকরিয়া আদায় করলো।

না,মনিও বেঁচে আছে, ক্ষুধায় একেবারে কাতর হয়ে পড়লেও এখনও প্রাণ আছে তার দেহে।

নূরী নৌকা থেকে ধীরে ধীরে নেমে দাঁড়ালো। অতি সাবধানে নামলো সে, হঠাৎ নৌকাখানা যদি খুলে যায় তাহলে আর তাদের রক্ষা থাকবে না। নূরী নেমে দাঁড়ালো তীরে। ধার দিয়েই নির্মল স্বচ্ছ জলধারা বয়ে যাচ্ছে। সে আর তৃষ্ণা ধরে রাখতে পারলো না। মনিকে বুকে চেপে উবু হয়ে পানি পান করলো। না, এ পানি অতি সুস্বাদু, লবণাক্ত নয়। নূরী মনির মুখে আঁজলা দিয়ে একটু একটু করে পানি দিতে লাগলো। মনির ঠোঁটে পানির ছোঁয়া। লাগতেই ঠোঁট দুখানা ধীরে নড়ে উঠলো। একটু পানি খেলো মনি। নূরীব। মনে একটা ক্ষীণ আশা দেখা দিলো, হয়তো মনি বাঁচলেও বাঁচতে পারে।

এক সময় মনি চোখ মেলে তাকালো।

আশায় আনন্দে নূরীর মনে দোলা জাগলো, মনি তাহলে এ যাত্রা বেঁচে গেলো। কিন্তু সামান্য পানি খাইয়ে কতক্ষণ বাঁচাতে পারবে নূরী এই ছোট শিশুটিকে।

কোনো আশ্রয়ের আশায় নূরী মনিকে বুকে করে এগিয়ে চললো।

নূরী যতই এগোয় ততই অবাক হয় সে। বন হলেও গভীর নয়–সুন্দর পরিষ্কার বন।আগাছা বা ঐ ধরনের গাছ-গাছড়া নেই। বেশ বড় বড় আর সুন্দর সুন্দর, ঝাউগাছ জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে নাম না জানা অনেক রকম ফুল গাছ। এক মধুর স্নিগ্ধ সুরভি নূরীর মনকে প্রফুল্ল করে তুললো।

আরও কিছুটা এগুতেই নূরী দেখলো সুন্দর পরিস্কার একটা জায়গা, দেখে মনে হলো কোনো লোক সেখানে একটু আগে ছিলো, এই মুহূর্তে উঠে গেছে। পরিস্কার জায়গাটায় স্পষ্ট পায়ের ছাপ রয়েছে। নূরীর চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বাঁচবার আশা দোলা দিয়ে গেলো তার মনে। নূরী মনিকে কোলে নিয়ে তাকাতে লাগলো চারদিকে।

নূরী কতক্ষণ বনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু আশ্চর্য এখন পর্যন্ত একটি হিংস্র প্রাণী তাঁর নজরে পড়েনি। এমন কি একটি বানর বা শিয়াল পর্যন্তও দেখতে পায়নি সে।

নূরী অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো, মনিকে কোলে করে বসে পড়লো সেই পরিস্কার জায়গাটিতে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো নূরীর কানে বৎস, এদিকে এসো!

চমকে উঠলো নূরী, মনিকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

সচকিতভাবে তাকালো চারদিকে কোথা থেকে ভেসে এলো এ কণ্ঠস্বর, কে তাকে ডাকলো কি তার উদ্দেশ্য! নূরীর চোখে মুখে ফুটে উঠলো ভীতি ভাব। কই, কোথাও তো জনমানব দেখা যাচ্ছে না বা কোথাও কোনো ঘর বা কুটিরও নেই।

নূরী যখন ভয়বিহ্বলভাবে তাকাচ্ছে এদিকে ওদিকে তখন পুনরায় সেই কণ্ঠ– ভয় নেই বৎস। পূর্ব দিকে সোজা চলে এসো।

নূরী ভয়চকিত হরিণীর মত কম্পিত পদক্ষেপে এগুলো, কোলে তার মনি।

ধীরে ধীরে এগুচ্ছে নূরী।

চারদিকে বন, কিন্তু অন্ধকার নয়!

সব পরিস্কার, স্বচ্ছ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে নূরী চারদিকে। ভয় ও আতঙ্কে ধকধক করছে তার বুক।

গাছের ওপরে একটা পাখী পাখা ঝাপটে উড়ে গেলো।

চমকে উঠলো নূরী। মনিকে বুকে চেপে ধরলো জোরে। হঠাৎ নূরীর দৃষ্টি চলে গেলো সোজা পূর্ব দিকের একটি বৃক্ষমূলে। একি, বিস্ময়ে আরষ্ট হলো সে। অদূরে একটি বট বৃক্ষতলে জটাজুটধারী ভস্মমাখা এক সন্ন্যাসী উপবিষ্ট। দাঁড়ি-গোফ আর মাথার জটাজুটে তাকে কিম্ভুত কিমাকার দেখাচ্ছে।

নূরী ভীত চোখে তাকিয়ে আছে, আর এক পাও এগুতে পারছে না সে।

পুনরায় সন্ন্যাসী গম্ভীর গলায় বললো–ভয় নেই, এসো।

নূরী এবার পা বাড়ালো, কিন্তু মনের মধ্যে ঝড় বইছে। ভয় হচ্ছে সন্ন্যাসীটা নরখাদক নয় তো?

নূরী নিকটে আসতেই সন্ন্যাসী হাত তুলে বললো–বসো।

নূরী তখনও সন্ন্যাসীর নিকট হতে প্রায় দশ হাত দূরে রয়েছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো নূরী, বসে পড়লো সেখানে। সন্ন্যাসীর চেহারা তার মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে

চলেছে। নূরীর মত সাহসী মেয়েও ভয়ে ঘেমে উঠতে লাগলো। সন্ন্যাসীর দেহটা ঠিক পাথর বা ঐ ধরনের শক্ত কিছুর তৈরি বলে মনে হলো, এ যেন মানুষের দেহ নয়। মাথায় জটা মূলোর মত মোটা, আর লম্বায় প্রায় তিন হাতের মত, মাটিতে স্তুপাকার হয়ে রয়েছে। দাঁড়ি আর গোঁফেও জট ধরেছে। দাড়িগোঁফও দেড় দুহাত লম্বা। ভুরুগুলো একে বারে সাদা ধবৃধবে হয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য সন্ন্যাসীর চোখ দুটো ঠিক কাচের মত স্বচ্ছ বলে মনে হলো। বাঘের চোখের মত যেন জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। কি তীব্র সে চাহনি! নূরী বসে পড়ে মনিকে বুকে আঁকড়ে ধরলো। এবার বুঝি আর তাদের রক্ষা নেই। নরখাদক সন্ন্যাসী তার আর মনির রক্ত শুষে নেবে।

হঠাৎ সন্ন্যাসী বিকট শব্দে হেসে উঠলো–হাঃ হাঃ হাঃ—

মনি সে হাসির শব্দে নূরীর বুকে মুখ লুকালো।

শিউরে উঠলো নূরী। দুচোখে ফুটে উঠলো রাজ্যের ভয় আর ভীতি। সন্ন্যাসী বললো-বৎস, ভয়ের কোনো কারণ নেই। জানি তুমি নিঃসহায়, নইলে এতক্ষণ তোমাকে আমি ভস্ম করে দিতাম।

নূরী অসহায় দৃষ্টি নিয়ে তাকালো সন্ন্যাসীর দিকে।

সন্ন্যাসীর মুখমন্ডল যদিও দাঁড়ি গোঁফ আর জটাজুটে আচ্ছাদিত তবু সে মুখে একটা প্রসন্নতার আভাস ফুটে উঠেছে। নূরী কিছুটা আশ্বস্ত হলো।

সন্ন্যাসী পুনরায় বললো–নৌকায় তুমি যখন ভেসে চলেছিলে যোগ বলে আমি তা জানতে পেরেছিলাম। এক সপ্তাহকাল না খেয়ে মানুষ কোনোদিন বাঁচতে পারে না, আমিই তোমাকে আর তোমার ঐ পালিত সন্তানকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছি। দয়াময়ের নিকট আমি তোমাদের জীবন ভিক্ষা চেয়ে নিয়েছি।

স্তম্ভিত নূরী হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে। একি, তার সব কথা যে বলে দিচ্ছে সন্ন্যাসী! সত্যই যা ঘটেছে তাই বলছে। কি করে জানলো এসব কথা সে!

নূরী যখন এসব ভাবছে তখন সন্ন্যাসী হাসলো, বললো–আমি সব জানতে পারি। একশ বছর আমি জল গ্রহণ না করে তপস্যা করে সর্বশক্তি যোগবল লাভ

করেছি! তোমার এবং তোমার পালিত সন্তানের নামও অবগত আছি। তোমরা ক্ষুধায় এখন অত্যন্ত কাতর। যাও দক্ষিণে, তোমাদের খাবার প্রস্তুত রয়েছে।

নূরী চিত্রাপিতের ন্যায় উঠে দাঁড়ালো।

মনিকে কোলে করে এগুলো দক্ষিণ দিকে।

কিছুদূর এগুতেই নূরী লক্ষ্য করলো, সম্মুখে সুন্দর একটা কক্ষ। বিস্ময়ে অবাক হলো নূরী, একটু পূর্বেও এখানে কোনো কক্ষ ছিলো না।

নূরী ভয়চকিতভাবে পা বাড়ালো কক্ষের দিকে।

কক্ষের সামনে উপস্থিত হতেই দরজা মুক্ত হয়ে গেলো। নূরী মনিকে নিয়ে থমকে দাঁড়ালো, কক্ষে প্রবেশ করবে কিনা ভাবছে।

এমন সময় সেই কণ্ঠস্বর-ভয় নেই বৎস, প্রবেশ করো। নূরী ক্ষুধায় এত কাতর হয়ে পড়েছিলো যে, ভয় তার বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না বা চিন্তা করবার সময় হলো না।

কক্ষে প্রবেশ করলো নূরী।

কক্ষে প্রবেশ করতেই নানাবিধ খাদ্য সম্ভার নজরে পড়লো তার। কক্ষের মেঝেতে থালায় সাজানো থরে থরে নানা রকম ফলমূল আর বাটিভরা দুধ।

নূরী মুহূর্ত বিলম্ব করতে পারলো না, মনিকে নিয়ে বসে পড়লো খাবারের পাশে।

বাটি থেকে খানিকটা দুধ ছোট একটা গেলাসে ঢেলে মনির মুখে ধরলো।

মনি দুধটুকু ধীরে অতি ধীরে খেয়ে ফেললো।

নূরী ফলমূল আর দুধ খেয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো।

পেট পুরে আজ খেলো নূরী। মনি বেশী খেলো না, তবু যা খেলো তাতেই সে সুস্থ হয়ে উঠলো।

সেই কক্ষের মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়লো নূরী।

ঘুম যখন ভাঙলো নূরী দেখলো সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সবল সুস্থ হয়ে উঠেছে। মনিও যেন পূর্বের মত সুস্থ চেহারা আর হাসি খুশীতে ভরে উঠেছে, ফিক্ কি করে হাসছে সে।

খুনী জেগে উঠতেই মনি নূরীর গলা জড়িয়ে ধরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে বললো–মাম্মা, আমলা কোথায় এসেছি?

নূরী হেসে বললো–দাদুর ওখানে।

একটা হাসির শব্দ হলো তার কানের কাছে—হাঁ বৎস, ঠিক বলেছো।

নূরী আর মনি চমকে তাকালো, কিন্তু কেউ কোথাও নেই। নূরী এবার মনিকে মি বেরিয়ে এলো, ঘরের বাইরে এসে সোজা চললো সন্ন্যাসীর নিকটে।

নূরী অবাক হয়ে দেখলো–সন্ন্যাসীকে সে তখন যে ভাবে যে স্থানে বসে থাকতে দেখেছে সে, ঠিক সেইভাবে সেই স্থানে বসেই আছে। আশ্চর্য, একচুল এদিক সেদিক হয়নি।

এসব নিয়ে নূরী যখন বিস্ময় বোধ করছে তখন সন্ন্যাসী হেসে বললো—আশ্চর্য হবার কিছু নেই বৎস! তুমি আজ কয়েক দন্ড পূর্বে আমাকে এভাবে এখানে দেখে অবাক হচ্ছে, কিন্তু জানো না আমি এই বটবৃক্ষ তলে আজ একশ বছর পূর্বে এক সন্ধ্যায় বসেছিলাম।

নূরী অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো–একশ বছর পূর্বে!

হাঁ বৎস। সরে এসো, লক্ষ্য করে দেখো আমার দেহে আর মাংসপিণ্ড নেই। বটবৃক্ষের শিকড় এবং মাটি জমে জমাট হয়ে গেছে আমার দেহটা। কিন্তু আমি এখনও জীবিত আছি।

নূরী হঠাৎ বলে উঠলো–বাবা, তুমি আহার-ন্দ্রিা করোনা?

সন্ন্যাসীর সেই ভারী কণ্ঠস্বর–না, আহার-নিদ্রার আমার কোনো প্রয়োজন হয় না। আমি যখন যা ভাবি তখন সেই অভাব পূরণ হয়ে যায়। যখন ক্ষুধা অনুভব করি তখন যা খাবার আমার খেতে ইচ্ছা করে সেই খাবার দ্বারা আমার উদর পূর্ণ

হয়। নিদ্রা অনুভব করলে, জেগেই আমি নিদ্রিত হই, কোনো অসুবিধা আমার হয় না।

বাবা!

বৎস, জানি তুমি বড় ব্যথিত, বড় নিঃসঙ্গ।

হাঁ বাবা!

বৎস, আমার আশ্রয়ে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। শুধু তুমি পশ্চিমে ভুলেও কোনোদিন যাবে না।

আমি যাবো না বাবা।

মনিকেও তুমি সাবধানে রাখবে, সেও যেন কোনোদিন ওদিকে না যায়। একটা কথা জেনে রাখো বৎস, পশ্চিমে আমার কোনো যোগবল খাটে না।

আচ্ছা বাবা।

০২.

নূরী আর মনির এখন কোনো কষ্ট নেই।

সুন্দর একটা কুটিরে তারা বাস করে। পাশের ঝর্ণায় স্নান করে। যখন যা খাবার ইচ্ছা হয় তাই খেতে পায়।

কিন্তু তবু সর্বদা নূরী আনমনা হয়ে থাকে, বনহুরের কথা স্মরণ করে সে সর্বক্ষণ চোখের পানি ফেলে। সময় সময় ভাবে—বলবে সে সন্ন্যাসী বাবার কাছে, কোন্ অতলে হারিয়ে গেছে তার হুর। কিন্তু এ কথা সে বলতে পারে না কিছুতেই। এখনও জানে নূরী, তার হুর মরেনি, মরতে পারে না। কিন্তু সন্ন্যাসী বাবা যদি বলে তার মৃত্যু হয়েছে তখন কি উপায় হবে। সহ্য করতে পারবে কি সে ঐ কথা! তার হুর এই পৃথিবীর বুকে বেঁচে আছে, এই আশা নিয়ে নুরীও বেঁচে থাকবে। অনন্তকাল ধরে বেঁচে থাকবে প্রতীক্ষা করবে সে হুরের।

দিন যায়, মাস আসে।

দিনে দিনে গড়িয়ে যায় একটি বছর।

মনি এখন বেশ ভালভাবে হাঁটতে শিখেছে। দীপ্ত সুন্দর ফুলের কুঁড়ির মত অর্ধ ফুটন্ত চেহারা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল, ঘাড়ের ওপর ঝুলে পড়েছে। গভীর নীল দুটি চোখে মনোমুগ্ধকর চাহনি। ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দে অস্ফুট ধ্বনি করে, সারাদিন খুটখুট করে হেঁটে বেড়ায়।

নূরীর ওকে নিয়ে আশঙ্কার শেষ নেই, না জানি কখন কোন দিকে চলে যাবে, কোনো হিংস্র জানোয়ার কখন ঘাড় মটকে খেয়ে ফেলবে কে জানে।

নূরী মনিকে নিয়ে যতই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে সন্ন্যাসী বাবা সান্ত্বনা দেন–ভয় নেই বৎস, এ বনে আমার সীমানায় কোনো পাপাচারী প্রবেশে সক্ষম হবে না। কিন্তু সাবধান, পশ্চিমে যেন তোমার মনি না যায়।

০৩.

সিন্ধুর মহারাজ নারায়ণ দেবের বিধবা কন্যা হীরাবাঈকে বিয়ে দিতে বাধ্য করেছিলো দস্যু বনহুর। হীরা এ বিয়েতে প্রথমে রাজী হয়নি, সে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলো বনহুরকে। ওকে ছাড়া সে বাঁচতে পারবেনা এ কথাও জানিয়ে দিলে ছিলো তাকে। কিন্তু বনহুর ধরা দেবার পাত্র নয়

হীরা বনহুরকে নিয়ে স্বপ্নসৌধ রচনা করেছিলো। সব সময় ওকে নিয়ে মেতে থাকতো, বনহুর যদিও হীরা আর তার সখীদের মধ্যে নিজকে ছেড়ে দিয়েছিলো, কিন্তু নিজকে সে সংযত রাখতো অতি সাবধানে।

পুরুষ মন মাঝে মাঝে বিচলিত হতো। হীরার সান্নিধ্য তাকে করে তুলতো চঞ্চল, একটা অনুভূতি নাড়া দিয়ে যেতো বনহুরের মনে যখন হীরাবাঈ নিভৃতে এসে বনহুরের বুকে মাথা রাখতো গভীর আবেগে জানাতো—আমি তোমাকে ভালবাসি বনহুর!

বনহুর হীরার কথায় মৃদু হাসতো, জবাব দিতো না কিছু। নিজকে সংযত রাখতো দৃঢ়চিত্তে।

হীরা তার সুকোমল বাহু দুটি বেষ্টন দিয়ে ধরতে বনহুরের গলা –আমি তোমাকে কোনোদিন ছেড়ে দেবো না!

বনহুরের চোখে তখন ভাসতো মনিরার মুখখানা। না জানি তার এই বহুদিনের অদর্শনে মনিরা ও তার মা কত চিন্তিত ও মর্মাহত হয়ে পড়েছেন। আরও মনে পড়তো নূরী আর মনির কথা। কোথায় তারা, বেঁচে আছে না মরে গেছে তাই বা কে জানে। আনমনা হয়ে যেতো বনহুর।

হীরা বনহুরের গম্ভীর ভাবাপন্ন ভাব লক্ষ্য করে বিমর্ষ হতো। ব্যথায় মনটা তার গুমরে কেঁদে উঠতো, অভিমান করে চলে যেতো সে বনহুরের কাছ থেকে!

সখীরা হীরার বিষণ্ন ভাব লক্ষ্য করে চিন্তিত হতো, ব্যস্তও হতো তারা। হীরাকে নানা প্রশ্ন করতো।

একদিন হীরাবাঈ মুখ গম্ভীর করে বসেছিলো, সখীরা প্রমাদ গুণলো। সবাই ঘিরে ধরে সখীর মনোভাব প্রসন্ন করার চেষ্টা করতে লাগলো, কিন্তু হীরার মুখোভাব কিছুতেই সচ্ছ হলো না বরং অশ্রু গড়িয়ে পড়লো তার দুগণ্ড বেয়ে।

সখীরা উদ্বিগ্ন হলো, নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু কি ঘটেছে ভেবে পায় না তারা।

সখীরা গিয়ে ধরে বসলো বনহুরকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললো।

হেসে বললো বনহুর—তোমাদের হীরা বিয়ে করতে চায়। পা

রুল সবার হয়ে বললো–তা কি করে সম্ভব, সে যে বিধবা!

কিন্তু বিধবার বিয়ে হয়।

অসম্ভর!

তাহলে হীরাকে আমার সঙ্গে মিশতে দাও কেন?

বন্ধু হিসাবে।

হীরা কি তাতেই খুশী?

না হয়ে উপায় নেই। সে জানে হিন্দু বিধবার বিয়ে হতে পারে না।

তাহলে আজ তোমাদের সখী হীরা অমন রাগ বা অভিমান করতো না।

সত্যি তাহলে–

হাঁ, হীরা, শুধু ভালবাসাই চায় না, তার জীবনটা সার্থক করে তুলতে চায়, স্বামী সন্তান সংসার নিয়ে সুখী হতে চায়।

পারুলের দুচোখে বিস্ময় ঝরে পড়ছে, বললো সেমহারাজ যদি একথা জানতে পারেন?

বনহুর শান্ত গলায় বললো–মহারাজ রাজী হয়েছেন।

এ আপনি কি বলছেন?

হাঁ পারুল, হীরার আবার বিয়ে হবে এবং অতি শীঘ্রই হবে।

পারুলের দুচোখে আনন্দ ঝড়ে পড়ে। ছুটে গেলো সখীদের নিয়ে হীরার পাশে। বললো পারুল-সখী, এবার বুঝতে পেরেছি তোমার মনের কথা। জানি তোমার কোথায় এতো ব্যথা। হু– পারুল হীরার গালে মৃদু আঘাত করে।

হীরা সখীদের খুশীভরা ভাব দেখে কিছুটা প্রসন্ন হয়, বলে যা, তোরা বড় দুষ্ট!

পারুল জড়িয়ে ধরে হীরাকে—এবার সব দুঃখ সব ব্যথা দূর হবে সখী। বন্ধুকে পাবি এবার অতি আপন করে।

হীরা অবাক হয়ে বলে–সত্যি?

সত্যি নয় তো মিথ্যা বলছি!

কে বললো এ কথা তোকে পারুল?

তোর বন্ধু।

ও বলেছে?

সেদিন হীরা ভেবেছিলো বনহুরকেই সে স্বামীরূপে পাবে। আশায় আনন্দে নেচে উঠেছিলো তার মন। অফুরন্ত খুশী নিয়ে প্রতীক্ষা করছিলো সেই দিনটির যেদিন বন্ধুকে সে একান্ত আপনার করে পাবে।

হীরা যতই বনহুরের কথা ভেবে আনন্দ উপভোগ করছিলো বনহুর ততই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিলো। গোপনে সে পাশের রাজ্যের অবিবাহিত রাজার সঙ্গে হীরার বিয়ের সব আয়োজন ঠিক করে ফেললো।

একদিন বিয়ের শুভ লগ্ন এগিয়ে এলো।

হীরার আনন্দ আর ধরে না।

হীরা যতই বনহুরের সঙ্গ কামনা করে, বনহুর ততই নিজকে সরিয়ে রাখে ওর কাছ থেকে। গোপনে পালিয়ে থাকে এদিকে সেদিকে।

একদিন বনহুর পুকুরের শান বাঁধানো ঘাটে বসে নিজের কাজের কথা ভাবছিলো, হীরা চুপি চুপি গিয়ে বনহুরের চোখ দুটো টিপে ধরলো।

বনহুর হেসে বললো-হীরা!

হীরার দুচোখে আনন্দের দ্যুতি খেলে গেলো। বসে পড়লো বনহুরের পাশে কি ভাবছো?

তোমার বিয়ের কথা।

লজ্জায় হীরার মুখ লাল হয়ে ওঠে, বলে–তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

খুব!

সত্যি?

সত্যি।

এরপর একদিন সত্যিই হীরার বিয়ের দিন এগিয়ে এলো।

মহারাজ নারায়ণ দেব কন্যার বিয়ের সব আয়োজন করলেন। যদিও প্রজাগণ এ বিয়েতে সন্তুষ্ট ছিলো না তবু মহারাজের মতের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে পারলে না।

একমাত্র রাজগুরু বেঁকে বসলেন, মহারাজকে জানালেন–বিধবা কন্যার বিয়ে দিলে অমঙ্গল হবে।

রাজগুরুর আদেশ অমান্য করা কারও সাধ্য নয়। মহারাজ নারায়ণ দেব। চোখে সর্ষে ফুল দেখলেন। এটা কি তারই ইচ্ছা, দস্যু বনহুর তাঁকে বাধ্য করেছেনইলে মৃত্যু তাঁর অনিবার্য। মহারাজের হৃদয়ে ঝড়ের তান্ডব শুরু হলো।

একদিকে দস্যু বনহুরের তীক্ষ্ণধার ছোরা আর একদিকে রাজগুরুর। অমঙ্গল বাণী। নারায়ণ দেব সমস্যায় পড়লেন। এদিকে বিয়ের সব আয়োজন সমাধা হয়েছে।

পাত্র কে এবং কেমন দেখতে কিছুই জানেন না মহারাজ, এসব দায়িত্ব নিয়েছে বনহুর নিজে।

মহারাজকে বলেছে সে আপনার কন্যার মঙ্গল কামনাই আমার লক্ষ্য। আপনার জামাতা কুলীন ব্রাহ্মণ এবং সে অন্য এক রাজ্যের রাজা। দেখতে শুনতে বেশ। হীরার সাথে মানাবে ভাল। বিয়ের দিন বর আসবে বিয়ে হবে। তারপর শুভ দৃষ্টির সময় বরের মুখের আবরণ উন্মোচন করা

হবে।

বিয়ের দিন।

হীরা বাঈকে ঘিরে সখীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে।

নানা জনে নান রকম আলাপ ঠাট্টা করছে তার সঙ্গে। হীরার মনে খুশীর উৎস বয়ে চলেছে। আজ সে বনহুরকে নিজের করে পাবে। আর কোনদিন সে চলে যাবে না তাকে ছেড়ে।

বিয়ে হয়ে গেলো।

এবার শুভ দৃষ্টি।

বরের মুখ এতক্ষণ একটা সুন্দর চাদরে ঢাকা ছিলো। কতগুলো ফুলের মালাও ছিলো ছোট চাদারের সংগে আঁটা। তবে বরকে ভালই লাগছিলো, যদিও তার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না।

শুভ দৃষ্টির সময় চমকে উঠলো হীরা, এ তো তার বনহুর নয়। কিছু বলতে পারলো না, একটা অস্ফুট শব্দ করে ঢলে পড়লো সে। কিন্তু আর কোনো উপায় নেই। অগ্নিস্বাক্ষী রেখে বিয়ে তাদের হয়ে গেছে।

হীরা যখন স্বামীর সঙ্গে বাসর কক্ষে প্রবেশ করলো তখন বনহুর একটা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে দ্রুত বেগে ছুটে চলেছে রাজ্যের শেষ প্রান্তে।

এরপর আর কোনদিন হীরা বা তার সখীরা বনহুরকে দেখতে পেলো।

০৪.

অজানার পথে ছুটে চলেছে বনহুর। কোথায় চলেছে তা সে নিজেই জানে না। দিকহারা, দিশেহারা উদভ্রান্ত পথিকের মত যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে অশ্ব চালনা করছে।

দিন যায়, রাত আসে–আবার দিন হয়! আবার রাত হয়! বনহুরের চলার বিরাম নেই।

একদিন পথের শেষে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো। আশে পাশে কোথাও কোনো লোকালয় নেই। বনহুর আর এগুলো সমীচীন মনে করলো না। একটা গাছের সংগে ঘোড়াটা বেঁধে গাছটার নীচে শুয়ে পড়লো। পথ চলার ক্লান্তি আর অবসাদে বনহুরের শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছিলো,

অল্পক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়লো সে!

একটা ধস্তাধস্তির শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেলো বনহুরের। তাড়াতাড়ি উঠে বসলো, তাকালো সামনের দিকে! অন্ধকারে কিছুই নজরে পড়ছে না—শুধু তার ঘোড়াটা যেখানে বাধা ছিলো সেইখানে প্রচন্ড শব্দ হচ্ছে।

বনহুর কিছু বুঝতে না পেরে অগ্রসর হলো।

একটু এগিয়েছে অমনি পায়ের সংগে বিরাট গাছের গুঁড়ির মত কিছু লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। সর্বনাশ, কি ঠান্ডা সেই জিনিসটা। বনহুর ভয় পাবার পাত্র নয়, চট করে উঠে দাঁড়ালো। অন্ধকারে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মুহূর্তে তার মুখমন্ডল বিবর্ণ হলো, বিস্ময়ে আড়ষ্ট হলো সে।

বনহুরের মত নির্বীক দস্যুও বিচলিত হলো।

বিরাট একটা অজগর তার অশ্বটার অর্ধেক গিলে ফেলেছে আর অর্ধেকটা এখনও ঝুলছে অজগরের মুখ গহ্বরে। ঘোড়াটার সামনের ভাগ অজগরের মুখের ভেতরে প্রবেশ করেছে, আর পেছনের অংশ এখনও ছটফট করছে। বনহুর নিরস্ত্র নয়, তার সংগে একটা রাইফেল রয়েছে। এটা বনহুর মহারাজ নাবায়ণ দেবের অস্ত্রাগার থেকে নিয়ে এসেছিলো। বনহুর রাইফেল বাগিয়ে ধরলো, কিন্তু গুলী ছুঁড়বার পূর্বে মনে হলো ওকে মেরে কোনো ফল হবে না। ঘোড়াটা প্রাণ হারিয়েছে, আর তাকে ফিরে পাওয়া যাবে না। রাইফেল নীচু করে নিলো বনহুর।

কিন্তু এখানে আর বিলম্ব করা মোটেই উচিত নয়। বনহুর রাতের অন্ধকারেই দ্রুত চলতে লাগলো।

অশ্বটাকে হারিয়ে বনহুর বিপদে পড়লো। এই নির্জন নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে কোন দিকে কোথায় যাবে। কোথায় কোন বিপদ ওত পেতে আছে কে জানে।

বেশী দূর না এগিয়ে বনহুর সামনে একটা বৃক্ষ দেখতে পেয়ে তাতেই চড়ে বসলো।

সেদিন রাতে আর ঘুম হলো না।

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই বনহুর নেমে পড়লো। ঘোড়াটা না থাকায় বড় অসুবিদা হয়ে পড়লো তার। পায়ে হেটে কতদূর যাবে, কোথায় যাবে সে?

তবু চলতে লাগলো, দক্ষিণ হাতে গুলীভরা রাইফেল। এটাই এখন তার সম্বল।

বনবাদাড়, পথ-ঘাট মাঠ পেরিয়ে এগিয়ে চললো বনহুর। গোটা দিন চলার পর দূরে অনেক দূরে দেখা গেলো বড়বড় দালানকোঠা আর ইমারত।

বনহুর দ্রুত পা চালালো।

ক্ষুধায় পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলো সে। তবু এগুচ্ছে যেমন করে হোক তাকে শহরে পৌঁছতেই হবে।

প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি, বনহুর শহরের সিংহদ্বারে এসে পৌঁছলো। একটা সরাইখানা দেখতে পেয়ে সেখানে প্রবেশ করলো।

বনহুরের দেহের পোশাক পরিচ্ছদ রাজ রাজার মতই ছিলো। হীরার ইচ্ছায় তাকে এ পোশাক পরতে হয়েছিলো। একটা মূল্যবান পাগড়ীও ছিলো তার মাথায়। পায়ে মূল্যবান নাগরা।

বনহুরকে দেখে সরাইখানার মালিক সসম্মানে অভ্যর্থনা জানালো।

বনহুর একটা চেয়ারে গিয়ে বসলো। তাকিয়ে দেখতে লাগলো সরাইখানার চারদিকে। প্রত্যেকটা টেবিলের পাশে জটলা পাকিয়ে লোকজন বসে আছে। মাঝে মাঝে দুচারজন নারীও রয়েছে।

সব টেবিলেই মদের বোতল আর নানা রকম ফলমূল সাজানো। বনহুর সরাইখানায় প্রবেশ করতেই কক্ষস্থ সবাই একবার তার দিকে তাকিয়ে দেখলো। অবশ্য বনহুরকে এ সরাইখানায় তারা এই প্রথম দেখলো। তাই আশ্চর্য হলো অনেকেই।

কয়েকটা যুবতী বসেছিলো, তারা বনহুরকে দেখে নিজেরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিলো। সবাই বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে।

একটি অর্ধ উলঙ্গ নারী নাচতে শুরু করলো।

একপাশে বাদ্যকরগণ দাঁড়িয়ে বাজনা বাজাচ্ছে।

বনহুরের সামনে এক বোতল মদ আর কিছু মাংস ও ফলমূল এনে সাজিয়ে রাখলো।

বনহুর অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলো, খেতে শুরু করলো।

কিন্তু যখন স্মরণ হলো, তার পকেট তো শূন্য, তখন কুঞ্চিত করে ভাবতে লাগলো। খেয়েছে এখন পয়সা দিতে হবে তো?

পয়সার চিন্তায় বেশ অশ্বস্তি বোধ করলো। সে দস্যু হতে পারে, লুটতরাজ করে নিতে পারে, বিপাকে পড়লে খুন করতেও তার বাধে না। কিন্তু সে তো পয়সা ছাড়া খেতে পারে না। বনহুর অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করছে। ঠিক সেই মুহূর্তে নাচনেওয়ালী নাচতে নাচতে তার পাশে এসে দাঁড়ালো, অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঝুকে পড়লো বনহুরের দিকে।

বনহুর তাকালো, দেখনো নাচনেওয়ালীর গলায় ঝকঝক করছে একছড়া হার। মূল্যবান হার ছড়ার দিকে তাকিয়ে বনহুর উঠে দাঁড়ালো। হাত বাড়ালো নাচনেওয়ালীর দিকে।

নাচনেওয়ালী বনহুরের চেহারায় মুগ্ধ হলো। দুহাত বাড়িয়ে বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে নাচার ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়লো।

সেই ফাঁকে অদৃশ্য হলো নর্তকীর কণ্ঠের হার।

বনহুর এসে বসলো টেবিলের পাশে।

নর্তকীর নাচ তখন শেষ হয়ে গেছে। অনেকেই বেরিয়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো। তাদের সংগে বনহুরও উঠে দাঁড়ালো।

সরাইখানার মালিক একপাশে গদি আঁটা সোফায় বসে আলবোলা টানছিলো।

বনহুর ভীড় ঠেলে বেরিয়ে যাবার সময় চট করে হারছড়া সরাইখানার মালিকের হাতে গুঁজে দিয়ে দ্রুত সরে পড়লো।

সরাইয়ের মালিক হারছড়া হাতে নিয়ে অবাক হয়ে দেখছে, আর ভাবছে, সামান্য ভুরিভোজনে একটা মূল্যবান হার–ব্যাপার কি?

সরাইখানার মালিক হারছড়া হাতে নিয়ে দেখছে, এমন সময় নর্তকীর করণ অর্তিকণ্ঠ শোনা গেলো আমার হার কি হলো! আমার হার কি হলো?

সরাইখানার মালিক নর্তকীর দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ভরা চোখে দেখলো তার গলা শুন্য, হার নেই। সব বুঝতে পারলো এটাই নর্তকীর হার। আশ্চর্য, এ হার নতুন আগন্তুক লোকটির নিকটে কি করে গেলো এবং সে না নিয়ে তার হাতে দিয়ে গেলো কেন ভাবতে লাগলো সরাইয়ের মালিক। তারপর হারটা ফিরিয়ে দিলো সে নর্তকীর হাতে।

বনহুর পথ চলেছে। রাতের মত ক্ষুধা পূরণ হয়ে গেছে তার। এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। বহু পথ আজ সে হেঁটে এসেছে। এক রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে।

শিথিল পা দুখানা টেনে টেনে চলছিলো বনহুর। এখনও তার সঙ্গী রাইফেলটা রয়েছে।

রাত বেড়ে আসছে।

একটা নির্জন পথ ধরে এগুচ্ছিলো বনহুর। মাঝে মাঝে দুএকটা পথিক তার পাশ কেটে চলে যাচ্ছিলো।

এখানে কেউ তাকে চেনে না, যদি কেউ জানতো এ লোক স্বাভাবিক পথিক নয়, তাহলে আঁতকে উঠতো। কিন্তু এদেশের কেউ বনহুরকে চেনেনা জানে না।

বনহুর আপন মনে এগিয়ে চলেছে।

অন্য একটা সরাইখানা পেলে উঠে পড়বে, রাতের মত একটু আশ্রয় তার চাই।

হঠাৎ বনহুরের কানে ভেসে এলো একটা নারীকন্ঠের তীব্র করুণ আর্তনাদ– আঃ, আঃ, আঃ–ক্রমে থেমে এলো শব্দটা।

বনহুরের জড়তা মুহূর্তে ছুটে গেলো, সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো চারদিকে।

বনহুর লক্ষ্য করলো পথের ধারে একটা বাড়ীর দোতলা থেকে এই শব্দটা এসেছে। বাড়ীটা মস্তবড়। দ্বিতলের একটা কক্ষে আলো দেখা যাচ্ছে।

বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়ালো, তাকিয়ে রইলো দোতলার বৈদ্যুতিক আলোক রশ্মির দিকে। একটা ছায়ার মত কিছু নড়ছে দেখতে পেলো সে। আর একদন্ড বিলম্ব না

করে রাইফেলখানা পিঠের সঙ্গে বেঁধে বাড়ীখানার দিকে এগিয়ে গেলো সে। লক্ষ্য করে দেখলো কিভাবে ওপরে যাওয়া যায়। নিশ্চয়ই কোনো নারী বিপদে পড়েছে।

বনহুর কিছু ভাবছে ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ট্যাক্সি থামলো বাড়ীখানার সামনে।

বনহুর মুহূর্তে সরে দাঁড়ালো দেয়ালের আড়ালে।

বনহুর আড়াল থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলো।

ট্যাক্সিখানা পৌঁছতেই বাড়ার মধ্যে সিঁড়িতে দ্রুত পদশব্দ হতে লাগলো। ভারী জুতোর শব্দ, কেউ সিঁড়ি বেয়ে দোতলা থেকে নেমে আসছে মনে হলো।

বনহুর স্তব্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

দরজা খুলে গেলো, চমকে উঠলো বনহুর। দেখতে পেলো আপাদমস্তক জমাকালো আলখেল্লায় ঢাকা একটা লোক দ্রুত গাড়ীটায় উঠে বসলো।

মাত্র দুজন লোক গাড়ীতে। একজন ড্রাইভার অন্যজন সেই অদ্ভুত আলখেল্লাধারী।

বনহুর ভাবলো, এই মুহূর্তে এদের দুজনকে কাবু করা তার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়, কিন্তু এই যে একটা আর্তনাদ তারপর এদের দ্রুত পলায়ন, এর পেছনে কি রহস্য লুকিয়ে আছে কে জানে।

বনহুর লোক দুটিকে অনুসরণ করবে না দোতলায় গিয়ে দেখবে ভাবতে লাগলো। এমন সময় গাড়ীখানা স্টার্ট দিয়ে চলতে শুরু করলো। বনহুর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর চাকা লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো।

চাকার হাওয়া বেরিয়ে গেলো। গাড়ী কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে থেমে পড়লো। বনহুর দ্রুত ছুটলো গাড়ীর দিকে।

লোকগুলোও সজাগ ছিলো গাড়ী থেমে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নেমে পড়লো, তারপর একটা বাড়ীর আড়ালে অদৃশ্য হলো।

বনহুর গাড়ীর নিকটে পৌঁছে হতবাক হলো।

আলখেল্লাধারী ও গাড়ীর ড্রাইভার উভয়েই কোনো বাড়ীর অন্তঃপুরে আত্মগোপন করেছে।

ঘন বাড়ীঘর আর দালানকোঠা থাকায় শয়তানদ্বয় পালাতে সক্ষম হলো, নইলে বনহুরের হাতে তাদের রক্ষা ছিলো না।

বনহুর এবার দ্রুত ছুটে চললো সেই পূর্বের বাড়ীটার দিকে। যে বাড়ী থেকে পূর্বে একটা করুণ আর্তনাদ ভেসে এসেছিলো।

বনহুর প্রাচীর বেয়ে উপরে উঠলো, তারপর পাইপ বেয়ে উঠতে লাগলো। দোতলা হলেও বেশ উঁচু বাড়ীখানা। বনহুর অনেক চেষ্টায় উঠে পড়লো। তারপর রেলিং টপকে প্রবেশ করলো দোতলার বারান্দায়। সতর্কভাবে চারদিকে তাকিয়ে দেখলো। গোটা বাড়ীটা নিস্তব্ধ। বনহুর আর বিলম্ব না করে কক্ষের দরজায় এসে ধাক্কা দিলো, সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেলো।

কক্ষে প্রবেশ করতেই স্তম্ভিত হতবাক হলো সে।

কক্ষের মেঝেতে লুকিয়ে পড়ে আছে একটি রক্তাক্ত যুবতী। যুবতীর বুকের রক্তে মেঝের কার্পেট লালে লাল হয়ে গেছে।

বনহুর যুবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো,

একি! এ যে সেই যুবতী!

সন্ধ্যায় সরাইখানায় এই যুবতীই অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় নেচেছিলো এবং যার গলা থেকে বনহুর মূল্যবান হারছড়া গোপনে খুলে নিয়েছিলো। কিন্তু একে হত্যা করলো কে? কি কারণ রয়েছে এর হত্যার পেছনে? এতবড় বাড়ীতে যুবতী একাই বা থাকে কেন এর কি কেউ নেই?

বনহুরের মনে নানা প্রশ্নে উঁকি দিচ্ছে। নিহত যুবতীকে ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলো সে। দেখলো যুবতীর বুকে গভীর ক্ষত ছোরার আঘাতে তাকে হত্যা করা হয়েছে। এখনও ক্ষত দিয়ে তাজা লাল টকটকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

বনহুরের দৃষ্টি হঠাৎ চলে গেলো যুবতীর গলায়। একটা আঁচড়ের লাল দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সেখানে। যুবতীর হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ দেখে বনহুর দ্রুতহস্তে ওর

হাতের মুঠি খুলে ফেললো। চমকে উঠলো বনহুর, নিহত যুবতীর মুঠার মধ্যে দেখতে পেলো চেনের খানিকটা অংশ, একটা মূল্যবান পাথরও রয়েছে চেনের সঙ্গে। বিদ্যুতের আলোতে চেনের পাথরটা ঝকমক করে উঠলো। বনহুরের স্মরণ হলো-সন্ধ্যায় যুবতীর গলায় এই হারছড়াই সে দেখেছিলো এবং এটাই সে খুলে নিয়েছিলো। হারে অন্ততঃপক্ষে এই রকম পাঁচখানার. বেশী পাথর ছিলো এও বেশ মনে আছে তার।

বনহুরের নিকটে যুবতীর হত্যা-রহস্য এবার পরিস্কার হয়ে এলো। দুঃখ, হলো তার হারছড়া তখন যদি ফিরিয়ে না দিতো তাহলে আজ এই মুহূর্তে যুবতীর মৃত্যু ঘটতো না।

বনহুর যুবতীর হাতের মুঠা থেকে মালার টুকরোখানা নিয়ে দাঁড়ালো, শপথ করলো সে—এই যুবতীর হত্যাকারীকে সে খুঁজে বের করবেই, এবং নিজ হাতে এর শাস্তি তাকে দেবে।

বনহুর উঠতে যাবে—এমন সময় সিঁড়িতে দ্রুত বুটের শব্দ শোনা গেলো।

বনহুর এবার বুঝতে পারলো, কোনো লোক এই হত্যার সন্ধান পেয়েছে। এখন তারা যদি এসে তাকে এখানে এই অবস্থায় দেখে ফেলে তাহলে আর রক্ষা নেই। তাকেই যুবতীর হত্যাকারী বলে জানবে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে বনহুর একটা আলমারীর পেছনে লুকিয়ে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করলো কয়েকজন পুলিশ অফিসারসহ এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ও এক যুবক। বনহুর দেখতে পেয়েই চিনতে পারলো প্রৌঢ় লোকটি অন্য কেউ নয়, সরাইখানার মালিক যাকে তখন বনহুর মালাছড়া দিয়ে এসেছিলো আর যুবকটিকেও তখন সে দেখেছিলো সরাইখানার একটি টেবিলের পাশের চেয়ারে।

পুলিশ অফিসারাগণ ও প্রৌঢ় ভদ্রলোক যুবতীর লাশের নিকটে এসে দাঁড়ালেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক বারবার রুমালে চোখ মুছতে লাগলেন। পুলিশ অফিসার একজন—বোধ হয় পুলিশ ইন্সপেক্টার হবেন, তিনি ঝুঁকে পড়ে লাশ পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলে উঠলেন—না জানি কোন দুশমন আমার কন্যা মালতীকে খুন করেছে।

বনহুর এবার বুঝতে পারলো, নিহত যুবতী সরাইখানার মালিকের কন্যা, নাম মালতী। কিছুটা অবাকও হলো বনহুর প্রৌঢ় ভদ্রলোকের রুচির পরিচয় পেয়ে। নিজ কন্যার দ্বারা এভাবে অর্থ উপার্জন ছাড়া তার কি কোনো উপায় ছিলো না? কিন্তু সঙ্গের যুবকটি কে? যে এখনও একটি কথাও উচ্চারণ করেনি। লাশটার একপাশে দাঁড়িয়ে স্থিরচোখে তাকিয়ে আছে সে।

পুলিশ ইন্সপেক্টার লাশ পরীক্ষা শেষ করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, কুঞ্চিত করে বললেন আপনার কন্যার হত্যাকান্ড অত্যন্ত রহস্যজনক।

প্রৌঢ় ধরা গলায় বললেন-হাঁ স্যার, সেই রকমই মনে হচ্ছে।

ইন্সপেক্টর বললেন-আপনি এবার সব কথা আমার কাছে স্পষ্টভাবে বলুন। কারণ, আপনার বলার বিবরণে নির্ভর করবে আপনার কন্যার মৃত্যু-রহস্য উদঘাটন।

প্রৌঢ় বলল–বলুন কি জানতে চান।

ইন্সপেক্টার একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে একমুখ ধোঁয়া ছুড়ে বললেন–আপনার কন্যা কি এ বাড়ীতে একাই থাকতো?

না। যুবকটির দিকে তাকিয়ে বললেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক-ও নীচের তলায় থাকে। আজ সে ছিলো না, সরাইখানার একটা জরুরী কাজে তাকে বাইরে পাঠিয়েছিলাম।

আপনি কোথায় থাকেন?

আমি–আমাকে সরাইখানার কাজে প্রায়ই সেখানে থাকতে হয়। আমি সরাইখানার একটি কামরায় থাকি।

আপনার কন্যা নিহত হওয়ার সংবাদ কি করে পেলেন?

এখানে একটি চাকর থাকে, সেই ছুটে গিয়ে আমাকে সংবাদ দেয়। ইরে রহমত, এদিকে আয়।

একটা জমকালো লোক কক্ষে প্রবেশ করে একপাশে দাঁড়ালো। লোকটা নিগ্রো বা ফ্রি বলে মনে হলো।

পুলিশ ইন্সপেক্টার লোকটার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন–তুমি এ বাড়ীতে থাকো?

হাঁ। কাফ্রি লোকটা জবাব দিলো।

ইন্সপেক্টার পুনরায় প্রশ্ন করলেন—তুমি মিস মালতীর হত্যা সম্বন্ধে কি জানো বলো?

কাফ্রি খাঁটি বাংলায় বললো—আমি আজ সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কারণ–যুবকের দিকে তাকিয়ে বললোঊনিও ছিলেন না, একা একা কি করবো। দিদিমণির খাবার সাজিয়ে রেখে শুয়ে পড়েছিলাম।

তোমার দিদিমণি কখন বাসায় ফিরে এসেছিলো জানো?

জানি। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে জেগে পড়েছিলাম। মনে করেছিলাম, দিদিমণির খাবার এবং অন্য সব কিছু তো গুছিয়ে রেখেছি, তবু যদি ডাকেন তবে উঠে পড়বো। কিন্তু তিনি আর ডাকলেন না। আমিও উঠলাম না। চুপ করে শুয়ে থেকেই শুনতে পেলাম সিঁড়িতে একসংগে দুজন লোকের পায়ের শব্দ।

দুজন লোকের পায়ের শব্দ?

হাঁ স্যার। আমার মনে হলো অরুণ বাবু আর মালতী দিদি এক সংগে ফিরে এলেন। কাফ্রি লোকটা যুবকটির দিকে আর একবার তাকালো।

বনহুর আড়ালে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলো, যুবকটির নাম অরুণ বাবু। আলমারীর আড়ালে আত্মগোপন করতে গিয়ে মশার কামড়ে পা দুটো জ্বালা করছে। কিন্তু উপায় নেই একটু নড়বার। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ওদের কথাবার্তা শুনছে বনহুর।

পুলিশ ইন্সপেক্টার এবার যুবকে লক্ষ্য করে বললেন অরুণ বাবু, আপনি কি মিস মালতীর সংগে ফিরে এসেছিলেন? সত্যি কথা বলবেন।

সত্য কথাই বলবো আমি তার সংগে ফিরে আসিনি। গম্ভীর স্থির কণ্ঠস্বর অরুণ বাবুর।

তবে কে এসেছিলো মিস মালতীর সঙ্গে? প্রশ্ন করলেন ইন্সপেক্টার।

অরুণ বাবু পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো—সে কথা নিহত মালতী ছাড়া কেউ জানেনা।

হুঁ। অস্ফুট শব্দ করলেন পুলিশ ইন্সপেক্টার।

আড়ালে দাঁড়িয়ে বনহুরের ভূকুঞ্চিত হলো।

এবার ইন্সেপক্টার প্রশ্ন করলেন কাফ্রি চাকরটাকেএসড়িতে উঠাকালে মালতী এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির কথাবার্তা শুনতে পাওনি?

না স্যার। সিঁড়িতে তাদের কোনো কথাবার্তা শুনতে পাইনি। তবে একটু পরে দিদিমণির কক্ষে অরুণ বাবুর গলার স্বরের মত আওয়াজ পেয়েছিলাম একটু।

অরুণ বাবু বলে উঠলেন–মিথ্যে কথা! আমি কিছুক্ষণ পূর্বে আমার কাজ সেরে সরাইখানায় ফিরে মালতীর হত্যাকান্ডের কথা জানতে পারি এবং উনার সঙ্গে চলে আসি। মালিককে দেখিয়ে বললো–অরুণ বাবু।

ইন্সপেক্টার এবার কাফ্রি চাকরটাকে প্রশ্ন করলেন–তুমি মালতীর হত্যা ব্যাপারে কখন জানতে পেরেছিলে?

কাফ্রি চট করে বললো–আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছি, হঠাৎ একটা আর্তনাদে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। আর্তনাদের শব্দটা দিদিমণির বলেই মনে হলো–ছুটে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে, ওপরে গিয়ে হতবাক হলাম, দেখলাম দিদিমণির রক্তাক্ত দেহ মেঝেতে পড়ে আছে।

পুলিশ ইন্সপেক্টার বললেন–তারপর?

কাফ্রি একবার সকলের অলক্ষ্যে অরুণ বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলে, অরুণ বাবুও তাকিয়েছিল তার দিকে। দিষ্টি বিনিময় হতেই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল সে আমি কখন কি করবো ভেবে না পেয়ে ছুটলাম, সরাইখানার দিকে।

আলমারীর আড়ালে দাঁড়ালো বনহুর, দাঁতে দাঁত পিষলো, কারণ কাফ্রির কপাট। সম্পূর্ণ মিথ্যা। সে ভালোভাবে লক্ষ্য করেছে—এ বাড়ী থেকে দুজন লোকটা ট্যাক্সিতে পালিয়েছে। এ ছাড়া অন্য কেউ এ বাড়ীর বাইরে যায়নি। কাফ্রি চাকরটা একেবারে মিথ্যা কথা বানিয়ে বললো।

পুলিশ ইন্সেপেক্টর বললেন–তুমি যখন সরাইখানায় গিয়ে পৌঁছলে, তখন সেখানে কি অরুণ বাবু ছিলেন?

না, ছিলেন না। আমি দিদিমণির হত্যাকান্ডের কথা মালিককে জানিয়ে বেরিয়ে আসছি, এমন সময় অরুণ বাবু সেখানে উপস্থিত হলেন।

ইন্সপেক্টর গম্ভীরভাবে একটু ভেবে নিয়ে সরাইখানার মালিককে লক্ষ্য করে বললেন–মিঃ শর্মা, আপনি কি জানেন আপনার কন্যার সঙ্গে আর কোনো ব্যক্তির বিশেষ ঘনিষ্ঠতা বা নিবিড় যোগাযোগ ছিলো?

বাসুদেব শর্মা ব্যথাকাতর কণ্ঠে বললেন–আমার কন্যা মালতীর তেমন কোনো বন্ধু-বান্ধব ছিলো না। সে সব সময় অরুণের সঙ্গেই ওঠা–বসা করতো।

আপনি খুব ভালভাবে চিন্তা করে বলুন আর কারও সঙ্গে তার মেলামেশা ছিলো কি না?

বেশ কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন বাসুদেব ছিলো, সে হচ্ছে ধনবান মিঃ লুই এর পুত্র জন। জনকে এক সময় মালতী গভীরভাবে ভালবাসতো। জনও ভালোবাসতো মালতীকে। কিন্তু জন লন্ডনে চলে যাবার পর মালতী একমাত্র অরুণ ছাড়া আর কারও সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশতো না।

ইন্সপেক্টর বললেন-জন কি এখন লন্ডনেই অবস্থান করছে?

না, সে কিছুদিন হলো ফিরে এসেছে।

এখনও কি সে আপনার কন্যার সংগে পূর্বের ন্যায় মেলামেশা করতো?

না, লন্ডন থেকে ফিরে আসার পর সে মালতীর সঙ্গে দেখাই করতে আসেনি। মালতীই নাকি গিয়েছিলো তার সঙ্গে দেখা করতে। শুনেছি সে মালতীর সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেনি।

পুলিশ ইন্সপেক্টর মিঃ লাহিড়ী একটা শব্দ করলেন। তারপর বললেন-মালতী ফিরে এসে কিছু বলেছিলো আপনাকে?

হাঁ। বলেছিলো, জন নাকি কোন মেয়েকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে। একটু থেমে বললেন বাসুদেব–মালতী জনকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিলো। সেদিন ওর ওখান থেকে ফিরে গোটা রাত কেঁদে কেঁদে কাটিয়েছিলো মা আমার। একটু থেমে বললেন পুনরায়—জনের সুন্দর চেহারাই আমার মালতীর কাল হয়েছিলো ইন্সপেক্টর।

ইন্সপেক্টার একবার সকলের অলক্ষ্যে অরুণ বাবুর মুখমন্ডল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন। তারপর লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে তখনকার মত বিদায় গ্রহণ করলেন।

ইন্সপেক্টার সংগীদের নিয়ে চলে যেতেই অরুণ বাবু বলে উঠলো–একি, শটে গেলো কাকাবাবু?

সরাইখানার মালিক বাসুদেব তখনও কাঁদছিলেন। একমাত্র কন্যার মৃত্যু তার অন্তরে যেন শেলবিদ্ধ করেছে। বাববার তিনি রুমালে চোখ মুছছিলেন। অরুণ বাবুর কথায় তাকালেন তার দিকে, একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন-সবই জানেন সেই সর্বজ্ঞ।

কাফ্রি চাকরটা তাকালো অরুণ বাবুর দিকে, তারপর বললো-এ ঘরে বেশীক্ষণ থাকতে মন আমার চাইছে না। কেমন যেন ভয় ভয় করছে।

অরুণ বাবু বলে উঠলো–চলুন কাকাবাবু, আমারও বড় অস্বস্তি লাগছে।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—চলো।

সবাই কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলো।

অরুণ বাবু চলে যাবার সময় একবার কক্ষের চারদিকে লক্ষ্য করে দেখে নিলো, তারপর নিঃশব্দে অনুসরণ করলো সরাইখানার মালিক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে।

সবাই কক্ষ ত্যাগ করতেই আলমারীর আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো বনহুর, চোখেমুখে তার একটা উন্মাদনা।

০৫.

কক্ষে অরুণ বাবু অস্থিরভাবে পায়চারী করছে। চোখে তার ঘুম নেই। দেয়ালঘড়িটা ঠক্ ঠক্ শব্দ করে আপন মনে নিজের গন্তব্য পথে এগিয়ে চলেছে।

অরুণ বাবুর ললাটে গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে। চোখ দুটোতে কেমন জ্বালাময় চাহনি। মনের অস্থিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তার মুখোভাবে। কি যেন ভাবছে, কখনও মাথার চুল ধরে টানছে, কখনও বা অধর, দংশন করছে।

এক সময় অরুণ বাবু ঘরের টেবিলের ড্রয়ার খুলে ফেললো, বের করলো সুতীক্ষ্ণ ধার একখানা ছোরা-তুলে ধরলো চোখের সামনে। তারপর অতি সতর্কতার সঙ্গে জামার আড়ালে ছোরাখানা লুকিয়ে ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ছায়ামূর্তি সরে গেলো জানালার একপাশে।

অরুণ বাবু চারদিক তাকিয়ে দেখে নিলো। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে। অন্ধকারে দ্রুত এগিয়ে চললো।

ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে অতি সংগোপনে অরুণ বাবুকে অনুসরণ করলো।

অরুণ বাবু টানা বারান্দা ধরে কিছুদূর এগিয়ে থমকে দাঁড়ালো তাকালো চারদিকে, তারপর অতি দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগলো।

পেছনে অনতিদূরে আত্মগোপন করে এগিয়ে চলেছে একটি ছায়ামূর্তি।

অরুণ বাবু বাড়ীর সামনে বাগানটার মধ্যে এসে দাঁড়ালো পুনরায় সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো পেছনে। এবার বাগানস্থ পুকুরঘাটে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো অরুণ বাবু। ছোরাখানা দ্রুত জামার আড়াল থেকে বের করে নিয়ে যেখনি সে

পুকুরের পানিতে নিক্ষেপ করতে যাবে অমনি পেছন থেকে ছায়ামূর্তি স্থপ করে চেপে ধরলো অরুণ বাবুর হাতখানা।

চমকে ফিরে তাকালো অরুণ বাবু, মুখমন্ডল তার বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। অন্ধকার হলেও অরুণ বাবু চিনতে পারলে, অস্ফুট কণ্ঠে বললো–ইন্সপেক্টার!

গম্ভীর কণ্ঠে পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ লাহিড়ী বললেন—হাঁ, আমি। এবার আপনার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো তো?

অরুণ বাবু থমমত খেয়ে বললো–আপনি বিশ্বাস করুন, আমি মালতীকে খুন করিনি।

মিঃ লাহিড়ী হুইসেলে ফু দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন পুলিশ এসে অরুণ বাবু আর ইন্সপেক্টারের সম্মুখে দাঁড়ালো।

মিঃ লাহিড়ী বললেন–বন্দী করো একে।

ইতিমধ্যে অরুণ বাবুর হাত থেকে ছোরাখানা মিঃ লাহিড়ী কেড়ে নিয়েছিলেন।

অরুণ বাবু হঠাৎ এভাবে বন্দী হবে ভাবতেও পারেনি। ভেবেছিলো সে ছোরাখানা পুকুরের পানিতে নিক্ষেপ করে নিজে নির্দোষ হবে। কিন্তু পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ লাহিড়ী অতি চতুর ব্যক্তি, তিনি লাশ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে নিজেও দলবল নিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু একেবারে চলে গেলেন না। সবার অলক্ষ্যে লুকিয়ে পুনরায় ফিরে এলেন এই বাড়ীখানাতে। গোপনে অনুসরণ করলেন সন্দিগ্ধ ব্যক্তিকে।

মিঃ লাহিড়ী যা ভেবেছিলেন তাই, অরুণ বাবুকেই তার প্রথম থেকে সন্দেহ হয়েছিলো।

পুলিশ ইন্সপেক্টার যখন অরুণ বাবুকে বন্দী করে নিয়ে চললেন, তখন হঠাৎ একটা হাসির শব্দ তাদের কানে এলো। মুহূর্তে ফিরে তাকালো সবাই, কিন্তু কোথা থেকে এই হাসির শব্দ ভেসে এলো কেউ বুঝতে পারলো না।

০৬.

পুলিশ অফিসে গত রাতের মালতী হত্যা রহস্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো। মিঃ লাহিড়ী, পুলিশ অফিসার মিঃ রায় ও থানা অফিসার মিঃ আলী ছিলেন সেখানে।

অরুণ বাবুই যে মিস মালতীর হত্যাকারী এ ব্যাপারে মিঃ লাহিড়ী একেবারে নিঃসন্দেহ হয়ে পড়েছেন। কারণ, তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন, অরুণ বাবু রাতের অন্ধকারে পুকুরের পানিতে একখানা ছোরা নিক্ষেপ করতে যাচ্ছিলেন।

মিঃ লাহিড়ী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার যখন এই হত্যা ব্যাপার নিয়ে আলোচনায় রত ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করে এক যুবক। সুন্দর সুপুরুষ। শরীরে মূল্যবান পোশাক।

মিঃ লাহিড়ী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার বিস্ময়ভরা চোখে তাকালেন যুবকের দিকে।

লাহিড়ী কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার পূর্বেই যুবক বলে উঠলো —আমি মিঃ লুই—এর পুত্র মিঃ জন।

মিঃ লাহিড়ী উঠে দাঁড়িয়ে সহাস্যে বললেন–আপনি মিঃ জন?

হাঁ, আমি মিস মালতীর হত্যা সংবাদ জানতে পেরে এসেছি।

বসুন মিঃ জন। লাহিড়ী মিঃ জনকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন।

জন আসন গ্রহণ করলো।

মিঃ লাহিড়ী পুনরায় নিজ আসনে বসে সিগারেট কেসটা বের করে মেলে ধরলেন জনের সম্মুখে–গ্রহণ করুন।

জন মিঃ লাহিড়ীর সিগারেট কেস থেকে একটি সিগারেট তুলে নিয়ে বললো- ধন্যবাদ।

সিগারেটটা ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে অগ্নিসংযোগ করে ম্যাচের কাঠিটা বাড়িয়ে ধরলো জন মিঃ লাহিড়ীর দিকে।

মিঃ লাহিড়ী কথা শুরু-করবার আগেই বললো জন মিস মালতীর হত্যাকান্ড আপনার নিকট কেমন মনে হয়?

মিঃ লাহিড়ী কিছুক্ষণ জনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—মিঃ জন, আপনি যদি কিছু মনে না করেন আমি আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

নিশ্চয়ই করুন। একটু থেমে বললো জন–মিস মালতীর হত্যা আমাকে বিচলিত করেছে ইন্সপেক্টার।

শুনেছি আপনি নাকি তাকে ভালোবাসতেন।

হাঁ ইন্সপেক্টার, আমি তাকে গভীরভাবে ভালোবাসতাম। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেলো জন।

মিঃ লাহিড়ী তাকিয়ে দেখলেন জনের মুখ ব্যথাকরুণ হয়ে উঠেছে। এবার বললেন তিনি আমার যতদূর বিশ্বাস আপনার প্রিয়াকে যে হত্যা করেছে তাকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি।

ক্রুদ্ধ, হিংস্র হয়ে উঠলো জনের মুখমন্ডল, বললো—সত্যি বলছেন?

হাঁ মিঃ জন, সত্যি বলছি।

আশ্চর্য, আপনি এত সহজেই হত্যাকারীকে গ্রেপ্তারে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু যাকে আপনারা গ্রেপ্তার করেছেন সেকি সত্যিই হত্যাকারী—এ সম্বন্ধে

আপনি নিশ্চিত?

কতকটা তাই।

কিভাবে আপনি তাকে হত্যাকারী বলে নিশ্চিত হলেন?

কোথায় মিঃ লাহিড়ী জনকে প্রশ্ন করবেন তা নয়, জনই মিঃ লাহিড়ীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললেন।

মিঃ লাহিড়ী জনের বুদ্ধিদীপ্ত কণ্ঠস্বরে এবং তার মধুময় ব্যবহার ও কথাবার্তায় মুগ্ধ হলো অতি স্বাচ্ছন্দে জনের প্রশ্নের জবাব দিয়ে চললেন। বললেন মিঃ লাহিড়ী–আমরা যাকে গ্রেপ্তার করেছি তাকে আপনি নিশ্চয়ই জানেন, তার নাম অরুণ বাবু!

হাঁ তাকে আমি জানি, যদিও তাকে দেখিনি কোনোদিন কিন্তু তার নাম আমি মিস মালতীর মুখে অনেকবার শুনেছি। আচ্ছা, এবার বলুন মিঃ লাহিড়ী, তাকে সন্দেহ করার কি কারণ থাকতে পারে?

মিঃ লাহিড়ী এবার বললেন—প্রথম কারণ, অরুণ ও মিস মালতী উভয়ে একই বাড়ীতে বাস করতো। দ্বিতীয় কারণ, যেদিন মিস মালতী নিহত হয় সেদিন অরুণ বাসায় বা সরাইখানায় ছিলো না। তৃতীয় কারণ, অরুণ বাবু হত্যারাত্রে গোপনে একখানা ছোরা লুকিয়ে পুকুরের পানিতে নিক্ষেপ করতে যাচ্ছিলো এবং সেই মুহূর্তে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আচ্ছা ইন্সপেক্টার, আপনার কি মনে হয় মিঃ অরুণ যে ছোরাখানা পুকুরের পানিতে নিক্ষেপ করতে যাচ্ছিলেন সেই ছোরা দিয়েই মিস মালতীকে হত্যা করা হয়েছে?

না, তেমন কোন প্রমাণ এখনও আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি, তবে সেই ছোরাখানা দিয়েই যে মিস মালতীকে খুন করা হয়েছে এটা সঠিক। নাহলে অরুণ বাবু রাতের অন্ধকারে আত্মগোপন করে ছোরাখানা পুকুরের পানিতে নিক্ষেপ করতে যেতো না।

এর অন্য কোনো কারণও তো থাকতে পারে।

সে অবশ্য ঠিক কিন্তু যতদূর সম্ভব সে-ই খুনী।

ইন্সপেক্টার, আপনারা যদি সম্মত হন তবে এই মালতী হত্যা রহস্য উদ্ঘাটনে আমি আপনাদের সহায়তা করতে পারি।

আনন্দভরা কণ্ঠে মিঃ লাহিড়ী বললেন–নিশ্চয়ই। এটা তো খুশীর কথা। তাছাড়া মালতীর বাবা বাসুদে বাবু শুনলে তিনিও আনন্দিত হবেন।

সত্যি ইন্সপেক্টার, মালতীর হত্যা আমাকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত করে তুলেছে। জন কথার ফাঁকে দাঁতে দাঁত পিষলো। একটু থেমে পুনরায় বললো—মালতীর পোষ্টমর্টেমের রিপোর্টখানা আমাকে অনুগ্রহ করে দেখাবেন?

নিশ্চয়ই। মিঃ জন, আপনার মত একজন মহান ব্যক্তিকে আমরা সঙ্গী হিসেবে পেলে উপকৃত হবো। আপনি আমাদের সহায়তায় এগিয়ে আসছেন, আমরা ও

পুলিশ বাহিনী এ ব্যাপারে আপনাকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবো।

ধন্যবাদ ইন্সপেক্টার। কথাটা বলে জন উঠে দাঁড়ালো। আবার দেখা হবে। গুডবাই।

ইন্সপেক্টার এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার উঠে তাকে বিদায় সম্ভাষণ, জানালেন।

জন বেরিয়ে গেলো।

আসন গ্রহণ করে বললেন মিঃ লাহিড়ী-ধনবান লুই-এর পুত্র জন এতদিন লন্ডনে ছিলেন, সবে ফিরে এসেছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, উনারও পরিচয় ছিলো বাসুদেবের মেয়ে মালতীর সঙ্গে।

মিঃ রায় বললেন মিস মালতীর সঙ্গে শহরের প্রায় ধনবান ব্যক্তিরই পরিচয় ছিলো, অবশ্য এটা তার বাবা বাসুদেবেরই সহযোগিতায় হয়েছে।

মিঃ লাহিড়ী বললেন–এতোবড় একটা সরাইখানার মালিক হয়ে বাসুদেব শর্মা নিজ কন্যাকে অর্থের লোভে ব্যভিচারে লিপ্ত করেছিলো। সুন্দরী যুবতীর লোভে পুরুষ পতঙ্গের দল ছুটে আসতো তার সরাইখানায়।

মৃত মালতীর মৃত্যু রহস্য নিয়ে পুনরায় মিঃ লাহিড়ী তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত হলেন।

০৭.

একদিন দ্বিপ্রহরে কুটিরের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে নূরী, মনিও ঘুমিয়ে ছিলো পাশে। হঠাৎ মনির ঘুম ভেঙ্গে গেলো। খেজুর পাতার শয্যায় উঠে বসলো মনি, তাকালো নূরীর ঘুমন্ত মুখের দিকে। দেখলো মাম্মি ঘুমাচ্ছে।

দুষ্ট মনি নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো বাইরে। পা পা করে এগিয়ে চললো সামনের দিকে। কুটিরের মধ্যে নূরী ঘুমিয়ে আছে, কেউ তাকে বাধা দেবার নেই। ছোট্ট মনি আপন মনে চলতে লাগলো।

মনি সোজা বনের পশ্চিম দিকে এগুচ্ছে। বয়স তার বেশী নয়-মাত্র তিন বছরে পা দিয়েছে মনি, বুদ্ধি বলতে কিছুই তেমন হয়নি। কিছুদূর এগুনোর পর মনি দেখলো, তার সামনে সুন্দর একটা ফুলের বাগান, নানা রকম ফুল ফুটে রয়েছে সেখানে। মনি আলগোছে প্রবেশ করলো বাগানের মধ্যে। একটা সুন্দর ফুল দেখে মনি যেমনি ফুলটা ছিঁড়ে ফেললো, অমনি একটি ধুম্ররাশি আচ্ছন্ন করে ফেললো গোটা বাগানটাকে। মনির হাত থেকে ফুটা খসে পড়লো, কেঁদে উঠলো মনি। কে একজন নারী মূর্তি তখন মনিকে কোলে তুলে নিয়েছে।

সন্ন্যাসীর আহ্বানে ঘুম ভেঙ্গে গেলো নূরীর। সচকিতভাবে উঠে পাশে তাকাতেই অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—মনি কোথায়?

সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো-বৎস, মনি মায়াজালে আবদ্ধ হয়েছে।

নূরী উম্মাদিনীর ন্যায় ছুটে চললো সন্ন্যাসী বাবাজীর নিকটে। আছাড় খেয়ে পড়লো তার পায়ের কাছে—বাবাজী এখন উপায়?

কোনো উপায় নেই আর মনিকে উদ্ধারের—কারণ, সে এখন মায়ারাণীর মায়াজালে আবদ্ধ হয়েছে।

নূরী আকুলভাবে কেঁদে উঠলো—তাকে আর ফিরে পাবো না তাহলে গুরুদেব?

বৎস, আমি পূর্বেই বলেছিলাম,এ বনের সর্বত্র আমার আধিপত্য রয়েছে শুধু পশ্চিম দিকে ছাড়া, ঐ দিকে আমার কোনো বল খাটবে না।

নূরী ব্যাকুল কণ্ঠে বললো—কিন্তু মনিকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো। বলুন গুরুদেব, আমি কি করে তাকে ফিরে পেতে পারি?

সন্ন্যাসী বাবাজী এবার বলে উঠলেন—পশ্চিম ছাড়া তোমার মনি যেখানেই যেতো, সে কেমন আছে কি করছে সব তোমাকে বলতে পারতাম বৎস, এখন আমি অক্ষম।

তবে আমিও ঐ পশ্চিমে যাবো, দেখবো আমার মনি কোথায়, কেমন আছে?

সর্বনাশ! ওদিকে তুমি যেও না, গেলে আর কোনোদিন ফিরে আসতে পারবে না।

০৮.

সন্ন্যাসী বাবাজী যতই নিষেধ করুন, নূরী মনির জন্য অত্যন্ত অধীর হয়ে পড়লো। সর্বক্ষণ চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে চললো। একদিন নির্জন . প্রভাতে নূরী বনের পশ্চিম দিক লক্ষ্য করে রওনা দিলো–মরতে হয় সেও মরবে, তবু মনির সন্ধান নেবে সে।

ঘন বনের অন্তরালে নূরী এগিয়ে চললো। সে জানে, ওখানে গেলে আর কোনোদিন ফিরে আসতে পারবে না, এই তার জীবনের শেষ অধ্যায়—তবু নূরী নির্ভীকভাবে এগুচ্ছে।

পেছন থেকে ভেসে এলো সন্ন্যাসী বাবাজীর কণ্ঠস্বর—যেও না, যেও না, বিপদ রয়েছে।

নূরী দুহাতে কান চেপে ধরলো, তারপর দ্রুত পা চালালো।

কিছুদুর এগুতেই সামনে তাকিয়ে দেখলো নূরী সুন্দর একটি বাগান, ফুলে ফুলে ভরে রয়েছে বাগানটা। নূরী মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে রইলো বাগানটার দিকে, ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেলো নূরী মনির কথা।

নিজের অজ্ঞাতেই নূরী প্রবেশ করলো বাগানে। সামনে একটি সুন্দর ফুল গাছ দেখে একটি ফুল ছিঁড়ে ফেললো হঠাৎ সে। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ ধূয়া আচ্ছন্ন করে ফেললো নূরীর চারদিকে। নূরী চীৎকার করে উঠলো-একি হলো একি হলো! মুহূর্তে অনুভব করলো সে তার হাত দুখানা লৌহশিকলে আবদ্ধ করা হয়েছে।

প্রাণপণ চেষ্টা করেও নূরী হাত দুখানাকে মুক্ত করে নিতে সক্ষম হলো মী।

তারপর একসময় নূরী দেখলো, তার চারদিকের ধূম্ররাশি ক্রমান্বয়ে মিশে আসছে। এবার পরিষ্কার দেখতে পেলো—যেখানে সে দাঁড়িয়েছিলো সেখানে কোন বাগান নেই, একটা অন্ধকার কক্ষে সে বন্দিনী। হাত-পা শৃঙ্খলাবদ্ধ! আকুল কণ্ঠে চীৎকার করতে গেলো কিন্তু একটু শব্দও তার মুখ দিয়ে বের হলো না। নূরী এবার বুঝতে পারলো, সন্ন্যাসী বাবাজীর কথা মিথ্যে নয়, সে মায়ারাণীর মায়াজালে আবদ্ধ হয়েছে। কি করবে নূরী। একে মনির জন্য মন তার আকুল, তারপর নিজের অবস্থাও মহাসঙ্কটময়। মনিকে উদ্ধার করতে এসে সেও বন্দিনী

হলো। চারদিকে তাকালো নূরী-নিঃশ্বাস যেন তার বন্ধ হয়ে আসছে-কিন্তু কোথায় মনি।

নুরী যখন মনির জন্য এবং নিজের অবস্থা ভেবে আকুল হয়ে কাঁদছে, ঠিক সেই মুহূর্তে দেখলো একটি নারীমূর্তি তার সামনে এসে দাঁড়ালো, সাদা ধবধবে পরিচ্ছদে দেহ তার আবৃত –মাথায় মুকুটহাতে একটা পণ্ডের মত কিছু রয়েছে। চোখ দুটো কাজল টানা, জ দুটি ধনুকের মত বাঁকা–অদ্ভূত দেখতে নারীমূর্তিটা।

নূরীর সামনে দাঁড়িয়ে নারীমূর্তি বললো—কেঁদে আর কোনো লাভ হবে না, আর কোনোদিন তুমি মায়ারাজ্য থেকে বাইরে যেতে পারবে না। অট্টহাসি হেসে উঠলো নারীমূর্তি-হাঃ হাঃ হাঃ–_ নুরী শিউরে উঠলো, করুণ চোখে তাকালো নারীমূর্তির দিকে, তারপর মিনতির সুরে বললো–আমার মনি কোথায়? আমার মনি?

আবার হেসে উঠলো নারীমূর্তি অদ্ভুতভাবে তোমার মনি…হাঃ হাঃ হাঃ, তোমার মনিকেও আর কোনোদিন ফিরে পাবে না।

কি বললে, মনিকে আর কোনোদিন ফিরে পাবো না?

না না। জানো এ কোন্ রাজ্যে তুমি এসেছো?

জানি মায়ারাণী, আমি এখন তোমার মায়ারাজ্যে এসেছি।

হাঁ, তুমি আমার বন্দিনী।

আমার অপরাধ?

আমার মায়ারাজ্যে যে প্রবেশ করবে তাকেই আমার বন্দী হতে হবে।

বলো আমার মনি কোথায়?

সেও বন্দী।

পিশাচী, এতটুকু শিশুকে তুমি বন্দী করেছো?

আমার কাছে শিশু বা যুবক-বৃদ্ধ বলে কিছু নেই—আমার ঐ মায়া–বাগানে যে প্রবেশ করবে, সে-ই আবদ্ধ হবে আমার মায়াজালে! শুধু তুমি নও, তোমার মত

শত শত নর-নারী যুবক-বৃদ্ধ-শিশু আমার মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে মায়ারাজ্যে বন্দী হয়ে রয়েছে। এখানে কারও সাধ্য নেই কাউকে মুক্ত করে নিয়ে যায়।

নূরী অবাক হয়ে মায়ারাণীর কথাগুলো শুনে যাচ্ছিলো। এসব কি শুনছে সে। পৃথিবীতে কি এমন জিনিস আছে যা যাদুবিদ্যা বা মায়াজালে মানুষকে এভাবে আচ্ছন্ন করতে পারে! এমন তো সে কোনোদিন শোনেনি বা দেখেনি। একি অদ্ভুত ব্যাপার সে দেখছে? শুধু দেখছে নয়, মন-প্রাণে উপলব্ধি করছে। নূরী ভাবে, কি করে এই মায়ারাণীর মায়াজাল থেকে মুক্তি পাবে।

নূরী যখন আপন চিন্তায় বিভোর তখন হঠাৎ মায়ারাণী ধীরে ধীরে হাওয়ায় মিশে গেলো। বিস্ময়স্তব্ধ চোখে তাকিয়ে রইলো নূরী-মায়ারাণী যে স্থানটিতে অদৃশ্য হলো সেইদিকে।

হঠাৎ নূরীর কানে ভেসে এলো মনির কান্নার শব্দ। উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদছে মনি, কেউ যেন ওকে মারছে বা কোনো রকম কষ্ট দিচ্ছে।

নূরী ক্ষিপ্তের ন্যায় ছুটে গেলো সেইদিকে, যেদিক থেকে ভেসে এসেছিলো কান্নার শব্দটা, কিন্তু একি! শব্দটা ঠিক কোন্ দিক থেকে আসছে বোঝা যাচ্ছে না। নূরী থমকে দাঁড়ালো, সামনে সুউচ্চ একটা প্রাচীর তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। মনির কান্না যেন ঐ প্রাচীরটার ওপাশ থেকেই আসছে বলে মনে হচ্ছে তার। নূরী অনেক চেষ্টা করেও প্রাচীর পার হতে পারলো না। নূরী যতই দেখছে ততই আশ্চার্য হচ্ছে মায়াজাল সে কোনোদিন বিশ্বাস করতো না, আজ বিশ্বাস না করে পারলো না। পৃথিবীতে যাদু বা মায়াজালও রয়েছে। কে এই মায়ারাণী যার যাদুবলে এত সব হতে পারে। নূরীও কম মেয়ে নয়, সে দেখে নেবে মায়ারাণীর মায়াজাল ছিন্ন করতে পারে কিনা।

ততক্ষণে মনির কান্নার শব্দ থেমে গেছে। কেমন যেন একটা গম্ভীর নীল রশ্মি তার চারদিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কোথায় সেই কক্ষ, নূরী দেখলো এবার একটা গোলাকার প্রাচীর ঘেরা জায়গায় সে নিজে দাঁড়িয়ে আছে।

মায়ারাণীর মায়াজালে বন্দিনী নূরী।

পৃথিবীর সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধই নেই, কোথায় এসেছে, কোথায় আছে, সে নিজেই বুঝতে পারছে না। সব সময় নূরী অনুভব করে তার চারপাশে কোন

অশরীরী আত্মার দীর্ঘশ্বাস। কেউ যেন অতি লঘু পদক্ষেপে তার চারদিকে হেঁটে বেড়ায়। কখনও কখনও নূরী তার আশেপাশে অনতিদূরে শুনতে পায় ফিস ফিস কণ্ঠস্বর। ভয়ে নূরী পালাতে চায়, কিন্তু কোথায় পালাবে। যে দিকে যায় সেইদিকেই সে দেখতে পায় সুউচ্চ প্রাচীর তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। এক পাও এগুতে পারে না নূরী, বসে পড়ে মাথায় হাত দিয়ে। সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে, সে জীবিত আছে কিনা, তাই সন্দেহ জাগে তার মনে।

০৯.

মিঃ লুই এর তিনতলা বাড়ী।

শহরের সেরা ধনবান ব্যক্তি মিঃ লুই। সংসারে তার একমাত্র সন্তান জন খাড়া আর কেউ নেই। মিঃ লুই গত কয়েক মাস হলো ব্যবসার ব্যাপারে জার্মানে অবস্থান করছেন, বাড়ীতে রয়েছে শুধু জন ও দুজন কর্মচারী।

জন একটু আলাদা ধরনের যুবক, সব সময় একা নির্জনে থাকতে ভালোবাসে। সংসারের যত কাজকর্ম বা অন্যসব তত্ত্বাবধান করে তার কর্মচারী দুজন। নির্জন কক্ষে জন সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চলে, আর মোটা মোটা, বই পড়ে। লন্ডন থেকে ফিরে আসার পর সে বাইরে বের হওয়া এক রকম প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। মনের মত কাউকে পায় না। তাই সে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে নানা রকম বই-পুস্তকের মধ্যে। মাঝে মাঝে বাসুদেবের সরাইখানায় দেখা যেতো মিঃ জনকে, গভীর রাতে যখন সরাইখানার লোকজন বিদায় গ্রহণ করতো তখন মিঃ জনের নতুন ঝকঝকে নীল রঙের বিরাট গাড়ী এসে দাঁড়াতো বাসুদেবের সরাইখানার সামনে। পর পর দুটো হর্নের আওয়াজ হতো—অমনি ছুটে বেরিয়ে আসতো মালতী, সুমিষ্ট কণ্ঠে ধ্বনি করে উঠতো—হ্যালো জন, এসে গেছে?

জন নেমে আসতো গাড়ী থেকে, উভয়ে হাত ধরে এগিয়ে যেতে সরাইখানার একটি নির্দিষ্ট কক্ষে, তারপর চলতো নাচ-গান, হাসি-গল্প। মালতীর কাছে জন একেবারে যেন পালটে যেতো, কোথায় চলে যেতো তার গুরুগম্ভীর ভাব।

এবার জন লন্ডন থেকে ফিরে আসার পর বাসুদেবের সরাইখানায় একটি দিনের জন্যও যায়নি বা মালতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেনি। মালতী জনের লন্ডন থেকে ফিরে আসার সংবাদ পেয়ে নিজেই গিয়ে দেখা করে এসেছিলো তার সঙ্গে!

সেই মালতীর আকস্মিক মৃত্যু জনকে বিচলিত করবে তাতে অবান্তর কি আছে?

আজও গভীর রাতে জন মালতীর মৃত্যু-রহস্য নিয়েই গভীরভাবে চিন্তা করছিলো। সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চলেছে সে।

হঠাৎ একটা শব্দ শোনা গেলো তার জানালার শার্শীর পাশে। খুট করে একটা শব্দ। চমকে উঠলো জন, হাতের সিগারেটটা, এ্যাসট্রের ওপর রেখে উঠে দাঁড়ালো, নিঃশব্দে এগিয়ে চললো জানালার দিকে। স্পষ্ট দেখলো—

একটা আবছা কালো মূর্তি দ্রুত সরে গেলো জানালার পাশ থেকে।

জন কুঞ্চিত করে কিছু ভাবলো, পুনরায় ফিরে এলো নিজের আসনে, সুন্দর ললাটে ফুটে উঠলো গভীর চিন্তারেখা।

ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে চললো। জনের চোখে ঘুম নেই। প্রতিহিংসার একটা তীব্র জ্বালা তার অন্তরে দাহ সৃষ্টি করে চলেছে। মালতীর হত্যাকারী কে, তাকে খুঁজে বের করতেই হবে…।

পায়চারী করছে জন, মালতীকে সে ভালবাসতো ঠিকই। সরাইখানার নর্তকী বলে ঘৃণাও করতো সে মনে মনে–তাই বলে তার হত্যা চিন্তা করতে পারে না সে কোনো সময়! জন এবারে ড্রয়ার খুলে ফেললো–দ্রুতহস্তে কাগজপত্র বের করে কি যেন খুঁজতে লাগলো, পর পর কয়েকটা ড্রয়ার খুলে হঠাৎ একটা ডায়রী তুলে নিলো হাতে। মুহূর্তে জনের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

ডায়রী খানা নিয়ে ফিরে এলো জন নিজের শয্যায়। টেবিল ল্যাম্পের সলতে বাড়িয়ে দিয়ে ডায়রী খানা মেলে ধরলো চোখের সামনে।

পরদিন জন একটা টেলিগ্রাম পেলো, তার ভাবী পত্নী মিস এ্যানি আসছে, সন্ধ্যায় এরোড্রামে তাকে রিসিভ করে আনতে যেতে হবে।

টেলিগ্রাম পাবার পর জনের সুন্দর মুখমন্ডল গম্ভীর হয়ে উঠলো। দাঁতে অধর দংশন করে কি যেন ভাবতে লাগলো সে। তারপর একসময় ড্রইংরুমে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলো। দেয়ালে টাঙ্গানো তার নিজের ছবিখানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, নির্বাক নয়নে তাকিয়ে রইলো ছবিখানার দিকে।

সন্ধ্যায় এ্যানিকে আনবার জন্য গাড়ী নিয়ে এরোড্রামে হাজির হলো জন।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ একটা মেয়েলী কণ্ঠস্বর-হ্যালো জন, তুমি এখানে?

জন একটু থতমত খেয়ে বললোহা, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

ততক্ষণে যুবতীটি জনের পাশে এসে তার কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরেছে–ভালো আছো তো?

জন একটু হেসে বললো—আছি। তুমি?

আমিও ভাল। চলো।

গাড়ীতে উঠে বসলো ওরা দুজন।

জন নিজে ড্রাইভ করে চললো। এ্যানি বসলো তার পাশে।

জনের মুখ গম্ভীর, আপন মনে ড্রাইভ করছে সে।

মিস এ্যানি জনের কাঁধে মাথা রেখে আবেগভরা কণ্ঠে বললো–জন, এ দুবছরে তুমি যেন কেমন হয়ে গেছো?

সামনে দৃষ্টি রেখে বললো জন–কেমন হয়ে গেছি এ্যানি?

ঠিক যেমন ছিলে তার উল্টো।

মানে?

এরোড্রামে আমাকে দেখেও তুমি যেন চিনতেই পারছিলে না, আমি কথা বললাম তবে তুমি জবাব দিলে।

এ্যানি, আমি আজকাল চোখে একটু কম দেখি কিনা। তা ছাড়া চোখে কালো চশমা ছিলো, সন্ধ্যার ঝাপসা অন্ধকারে তোমাকে স্পষ্ট দেখতেই পাইনি।

চোখে কম দেখো! কোনো অসুখ বিসুখ হয়েছিলো নাকি তোমার?

হ্যাঁ, মাঝখানে অসুখে অনেক ভুগেছি।

এখন কেমন দেখো?

বললাম তো কিছুটা কম, সেই কারণেই কালো চশমা পরি।

বড় দুঃখ হচ্ছে তোমার জন্য জন।

কিন্তু কি উপায় আছে বলো!

জন, তোমার স্বরও যেন কেমন পালটে গেছে, নতুন লাগছে তোমাকে।

অনেক দিন পর কিনা!

জন, সত্যি এ দুবছর আমি তোমাকে ছেড়ে কিভাবে যে কাটিয়েছি, শুধু আমিই জানি। সেই যে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে এলে মনে পড়ে সেদিনের কথা?

পড়ে।

সত্যে তোমার চিঠি পেয়ে আমি সেই দিনটির প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিলাম। এবার দেখবো তোমার কথা কতখানি সত্য হয়।

আচ্ছা।

নাঃ আজ তুমি বড় স্বল্পভাষী হয়ে গেছো জন।

মিস এ্যানি…

মিস মিসকই তুমি তো এর আগে মিস বলে ডাকোনি কোনোদিন!

হাসলো মিঃ জন—মিস বলতে আমার ভাল লাগছে তাই।

মিঃ লুইয়ের বাড়ীর গেটে গাড়ী এসে থামলো।

দারোয়ান এসে গাড়ীর দরজা খুলে ধরলো, নেমে দাঁড়ালো এ্যানি, ততক্ষণে জনও নেমে দাঁড়িয়েছে।

এ্যানি সহ জন অন্তঃপুরে প্রবেশ করলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা খামের আড়ালে সরে দাঁড়ালো একটি ছায়ামূর্তি।

এ্যানিকে তার বিশ্রামকক্ষে পৌঁছে দিয়ে জন, নিজের কক্ষে প্রবেশ করলো। হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে গেলো পাশের দেয়ালে, থামের আড়ালে লুকিয়ে থাকা ছায়ামূর্তির ছায়া এসে পড়েছে সেই দেয়ালে। জনের মুখে ফুটে উঠলো একটা হাসির রেখা! নিজের কক্ষে প্রবেশ করে শয্যায় গা এলিয়ে দিলো সে।

অল্পক্ষণ পর বয় এসে জানালোস্যার, একজন ভদ্রলোক আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান।

মিঃ জন উঠে পড়লো–চলো।

হলঘরে প্রবেশ করতেই মিঃ লাহিড়ীকে দেখতে পেলো জন। মনে মনে বিস্মিত হলেও মুখোভাব প্রসন্ন রেখে বললো–হঠাৎ আপনি?

দেখা করতে এলাম।

বসুন ইন্সপেক্টার।

মিঃ লাহিড়ী আসন গ্রহণ করলেন।

জনও আসন গ্রহণ করে বললোমিস মালতীর হত্যা রহস্যের কিছু উদ্ঘাটন করতে পেরেছেন কি?

এখনও কোন নতুন ক্লু আবিষ্কার হয়নি। আমি ঐ কারণেই আপনার নিকটে এলাম মিঃ জন।

বলুন?

আপনি বলেছিলেন, মালতী হত্যারহস্য উদ্ঘাটনে আপনি আমাদের যথাসাধ্য সহায়তা করবেন।

হাঁ ইন্সপেক্টার, আমি করবো।

আপনি সেই যে চলে এলেন, এ কদিনের মধ্যে আর একটি বারও আমার সঙ্গে দেখা করলেন না। একটু বাঁকা হাসি হাসলেন মিঃ লাহিড়ী।

জন গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আপনার ওখানে না গেলেও আপনার সাক্ষালাভ আমার প্রায়ই ঘটেছে ইন্সপেক্টার আমরা উভয়ে উভয়কে দেখলেও কোনো আলাপ-আলোচনা হয়নি এই যা।

তার মানে?

মানে আপনি আমাকে দেখেছেন, আমি আপনাকে দেখেছি।

আপনার হেঁয়ালি ভরা কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না মিঃ জন?

গভীরভাবে চিন্তা করতে পারবেন। যাক, শুনুন ইন্সপেক্টার, আমি আপনার অফিসে গিয়ে দেখা না করলেও মালতী হত্যারহস্য উদঘাটনে অত্যন্ত আগ্রহশীল রয়েছি। একদিন মালতীকে সত্যি আমি গভীরভাবে ভালোবাসতাম....এবং সেই কারণেই আমি মালতীর হত্যাকারীকে আবিষ্কার করতে চাই।

এমন সময় এ্যানি সেই কক্ষে প্রবেশ করলো। হাতমুখ ধুয়ে নতুন ড্রেসে সজ্জিত হয়েছে এ্যানি, শুভ্র মোলায়েম পোশাকে তাকে খুব সুন্দর লাগছিলো।

এ্যানি ঘরে প্রবেশ করতেই মিঃ লাহিড়ী বিস্ময়ভরা চোখে তাকালেন তার দিকে।

জন একটু হেসে বললো-ইনি আমার ভাবী পত্নী মিস এ্যানি।

মিঃ লাহিড়ী একটু হাসবার চেষ্টা করলেন।

জন এবার এ্যানির নিকটে মিঃ লাহিড়ীর পরিচয় দিলো আর ইনি আমাদের পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ লাহিড়ী। মিঃ বাসুদেব শর্মার কন্যা মিস মালতীর হত্যারহস্য উদ্ঘাটন করার ব্যাপারে উনি আমার নিকটে এসেছেন।

এ্যানি অবাক হলো কথাটা শুনে, প্রশ্নভরা চোখে তাকালো জনের দিকে।

জন বললো-সব তোমাকে বলবো এ্যানি, কেমন?

আচ্ছা।

এখন তুমি ভেতরে যাও এ্যানি, ওনার সঙ্গে কথা শেষ করে আসছি।

মিঃ লাহিড়ী হেসে বললেন আপনি যেতে পারেন মিঃ জন, আজ আমার কথা শেষ হয়েছে।

ধন্যবাদ।

মিঃ লাহিড়ী উঠে দাঁড়ালেন, জন তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

মিঃ লাহিড়ী বিদায় হতেই এ্যানি জনের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো, জ্ব কুঞ্চিত করে বললো—মিস মালতীর হত্যারহস্য উদঘাটনে তোমার নিকটে তার কি দরকার জানতে পারি কি?

নিশ্চয়ই পারো এ্যানি। চলো বলছি সব।

চলো।

মিঃ জন আর এ্যানি গিয়ে বসলো পাশাপাশি দুটি সোফায়। এ্যানি প্রশ্ন করলোবলো মিস মালতী কে?

মালতী! মালতী আমার এক পরিচিত যুবতী।

বাঁকা চোখে তীব্রকণ্ঠে বললো এ্যানি—শুধু কি পরিচিত না অন্য কোনো সম্বন্ধ ছিলো তোমার সঙ্গে তার?

এ্যানি!

তুমি তাহলে কেন বললানি এতদিন তার কথা?

এমন সামান্য কথাও তোমাকে বলতে হবে এটা আমার ধারণার বাইরে।

জন, তোমার ব্যবহার তো এমন ছিলো না। তোমার কথাবার্তা আমার কাছে বড্ড নীরস বলে মনে হচ্ছে। আমি জানি, তুমি আমাকে ছাড়া এ পৃথিবীর কাউকে ভালবাসতে পারো না।

হাঁ এ্যানি। চলো রাত অনেক হলো—শোবে চলো।

এ্যানি জনের হাত ধরে উঠে দাঁড়ালো–চলো ডার্লিং।

জন এগুলো, এ্যানির হাতের মুঠোয় তার হাতখানা।

জনের হাত ধরে কক্ষে প্রবেশ করলো এ্যানি। শয্যায় নিজের দেহটা এলিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি শোবে না?

আমার কাজ আছে এ্যানি, তুমি ঘুমোও।

ডার্লিং, তুমি কেমন যেন হয়েগেছ। শয্যায় উঠে বসলো এ্যানি।

জন তখন দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে।

এ্যানি জনের দক্ষিণ হাত চেপে ধরলো–চলে যাচ্ছো?

হাঁ।

জন, তোমার কি হয়েছে বলো তো? এসো, অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। এ্যানি জনের হাত ধরে টেনে এনে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে নিজে বসে পড়লো তার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে। তারপর বঙ্কিল গ্রীবা দুলিয়ে বললোকি বলেছিলে মনে নেই তোমার?

জন চোখের কালো চশমাটা ঠিক করে নিয়ে বলে—এদিকে নানা ঝামেলায় সব ভুলে গেছি এ্যানি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

অভিমানে এ্যানির মুখমন্ডল আরক্ত হয়ে আসে। রাগত কণ্ঠে বলে ওঠে—তুমি কি মানুষ। জন, আমি ভেবেছিলাম সত্যি তুমি আমাকে ভালবাসো——কিন্তু সব তোমার ছলনা—সব মিথ্যা, ভুয়ো।

এ্যানি!

না, আজই আমি চলে যাবো এখান থেকে।

এ্যানি শান্ত হও।

না না, আমি তোমার কোন কথাই শুনতে চাইনে। কি ভয়ঙ্কর লোক তুমি। দাও ফিরিয়ে দাও তুমি আমার সেই জিনিসটা।

জন নির্বাক হয়ে বসে থাকে, এ্যানি কথায় সে কোনো জবাব দেয় না।

এ্যানি ক্ষিপ্তের ন্যায় চীৎকার করে উঠলো এবার আমি সব বুঝতে পেরেছি, তুমি সেই মালতীকে ভালবেসেছিলে!

এ্যানি যদি তাই মনে করো, তবে সত্যি তাই।

কি বললে, জানো আমার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ?

জানি! বিয়ে করবো কথা দিয়েছিলাম যদি না করি?

জন! চীৎকার করে ওঠে এ্যানি–দাও, আমার জিনিসটা তবে ফিরিয়ে দাও তুমি।

দেবো।

এখনিই দাও, আমি চলে যাবো তোমার এখান থেকে।

জন ধীরে ধীরে নমনীয় হয়ে এলো, নরম গলায় বললো—এ্যানি, তুমি একি ছেলেমানুষি করছো! যেখানে আমাদের বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে।

না, আমি তোমার কোনো কথা শুনবো না। তুমি আমার জিনিস ফেরত দাও। . এ্যানি, তুমি বিশ্বাস করো আমি তোমাকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসিনি, বাসতে পারিনা। এ্যানি, তুমি আমাকে মাফ করে দাও। জন

এ্যানির হাত দুখানা চেপে ধরে বিনীতভাবে কথাগুলো বললো।

এ্যানির মুখোভাব পরিবর্তন হয়ে এলো, গলার স্বর শান্ত করে বললোজানি, জানি বলেই তো আমি ছুটে এসেছি তোমার পাশে! একটু থেমে পুনরায় বললে—কিন্তু তোমার অবহেলা ভার আমাকে…

এ্যানি, আমি একটা দুশ্চিন্তায় আছি, তাই তোমার সঙ্গে ঠিক পূর্বের মত আচরণ করতে পারছিনে। জানো এ্যানি, মিস মালতীর হত্যা ব্যাপারে পুলিশ

আমাকেও সন্দেহ করছে, এবং সদা আমার ওপর তাদের সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে।

কেন পুলিশ তোমাকে সন্দেহ করছে? তুমি যে বললে—মালতীর সঙ্গে, তোমার কোন সম্বন্ধ ছিলো না?

না এ্যানি, তুমি বিশ্বাস করো, মিস মালতীকে আমি সব সময় এড়িয়ে চলতাম। কিন্তু মালতী আমার পেছনে জোঁকের মত লেগে থাকতো। আমি তাকে ঘৃণা করতাম।

জন, সত্যি বলছো?

সম্পূর্ণ সত্যি এ্যানি।

ডার্লিং!

এ্যানি!

ডালিং, তুমি ঐ কালো চশমা খুলে ফেলল। এ্যানি জনের কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরে।

জন ধীরে ধীরে এ্যানির কোমল বাহু দুটি সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়—এ্যানি, আমার জরুরী একটা কাজ আছে। এক্ষুণি বাইরে যাবো।

উঁ হুঁ, আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো না, ডার্লিং!

প্রিয়ে তুমি জানো না কত জরুরী আমার কাজ। চলি-গুডবাই!

অস্ফুট কণ্ঠে বললো এ্যানি—গুডবাই!

জন বেরিয়ে গেলো।

এ্যানি বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লো বিছানায়।

১০.

নূরী আর মনি মায়ারাণীর মায়াজালে বন্দী। শত চেষ্টা করেও নূরী নিজেকে উদ্ধার করতে পারলো না কিংবা মনির সাক্ষাৎ পেলো না। চোখের পানিতে নূরীর

বুক ভেসে গেলো, তবু মায়ারাণীর মনে মায়া হলো না।

অদ্ভুত এক নারী এই মায়ারাণী। আসলে সে নারী নয়, যাদুকর হরশঙ্কর নারীর রূপ নিয়ে নূরীর নিকট হাজির হতো, তাকে নানা ভাবে ভোলাতে চেষ্টা করতো। কখনও বা যাদুর দ্বারা আচ্ছন্ন করে রাখতো।

মাঝে মাঝে হরশঙ্কর মনিকে নিয়ে শহরে যেতো, নানা যাদুর খেলা দেখাতো, সুযোগ পেলে মানুষকে হত্যা করে তার যথাসর্বস্ব লুটে নিতো। অতি পিচাশ পাপাচার এই হরশঙ্কর। নারীর রূপে নূরীকে নানা ছলনায় ভোলাতে চেষ্টা করলেও হরশঙ্কর নূরীকে সংস্পর্শ করতে পারলো না।

দিনের পর দিন নূরী এই গহন বনে একটি অন্ধকারময় কুটিরের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে চললো। একদিকে মনির অদর্শন, অন্যদিকে এই বন্দিনী অবস্থা।

যাদুকর হরশঙ্কর শুধু নূরী আর মনিকেই বন্দী করেনি, তার কবলে আরও অনেক নারী ও শিশু নরক জ্বালা ভোগ করছে তীব্র কষ্ট ভোগের পর কেউ এখনও বেঁচে আছে, কেউ চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছে ধরণীর বুক থেকে।

যাদুকর হরশঙ্কর শুধু যাদুকরই নয়—বনাঞ্চলে যেমন তার আধিপত্য, তেমনি শহরেও তার বিচরণ সর্বত্র।

সপ্তাহে হরশঙ্কর দুদিন তার যাদুর খেলা দেখাতে শহরে যেতো। মনি নিতান্ত শিশু, কাজেই প্রায় দিনই বিভিন্ন ছেলে নিয়ে যেতো সে দেশ হতে দেশান্তরে। কোন শহর বা নির্দিষ্ট জায়গায় হরশঙ্কর স্থায়ীভাবে থাকতো না। নানা বেশে নানা দেশে সে যাদুর খেলা দেখাতে চলে যেতো।

বিশেষ করে রাতের বেলায় সে যাদু খেলা দেখাতো। তার কয়েকজন অনুচর ছিলো যখন হরশংকর খেলা দেখাতো তখন তার নানা ছদ্মবেশে থাকতো তার আশেপাশে। হরশঙ্করের যাদু খেলায় যখন দর্শকগণ আচ্ছন্ন। হয়ে পড়তো, ঠিক সেই মুহূর্তে তার সঙ্গীরা হরণ করতো তাদের মূল্যবান সামগ্রী।

কয়েকজন যুবতীও ছিলো হরশংকরের বনের কুটিরে। তাদের নিয়ে মাঝে মাঝে সে শহরে নাচ দেখাতো ও খেলা দেখিয়ে পয়সা উপার্জন, করতো।

নূরীকেও হরশংকর সেইভাবে তৈরী করে নিতে চেষ্টা করছিলো। নিজে নারীর ছদ্মবেশে নানা কৌশলে তাকে বশীভূত করছিলো। কিন্তু নূরী সাধারণ মেয়ে নয়, তাকে আয়ত্তে আনা যাদুকর হরশংকরের কাজ নয়। যাদুকর। হরশংকর বেশীদিন নূরীর কাছে আত্মগোপন করে নারীর ছদ্মবেশে থাকতে পারলো না। একদিন ধরা পড়ে গেলো সে নূরীর কাছে।

সেদিন নূরীকে কাছে টেনে বললো মায়ারাণী বেশী হরশংকর তোমাকে আমি বোনের মত ভালবাসি। তুমি আমাকে ভালো বাসতে চেষ্টা করো। তোমার লাল টুকটুকে সুন্দর মুখখানা আমাকে উন্মত্ত করে তুলেছে কথার ফাঁকে সে নূরীকে আকর্ষণ করছিলো।

চমকে উঠছিলো নূরী—এ তো কোন নারীর কোমল হাতের স্পর্শ নয়। ভয়ে সংকুচিত হয়ে সরে গিয়েছিলো নূরী মায়ারাণীর পাশ থেকে। হেসেছিলো মায়ারাণী!

নূরী ওর চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠেছিলো, বুঝতে পেরেছিলো মায়ারাণী নারী নয়—পুরুষ।

এরপর থেকে নূরী সব সময় মায়ারাণীকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করতো, ও এলেই বিব্রত বোধ করতো নূরী।

কিন্তু নূরী ভয়ে ভীত হবার মেয়ে নয়। সে দুর্দান্ত ভয়ংকর মেয়ে, নানা ছলনায় কৌশলে পালাবার পথ খুঁজতো কিন্তু মনিকে না নিয়ে যাবে না—এই তার শপথ।

একদিন গভীর রাতে নূরীর হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলো। শুনতে পেলো পাশে কোথাও নুপুরের শব্দ হচ্ছে। শয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়লো নূরী, কুটিরের ঝাপ সরিয়ে উঁকি দিলো বাইরে। অবাক হয়ে দেখলো—একটা খাটিয়ার ওপরে বসে আছে একটা লোক, লোকটার হাতে চাবুক! সামনে নৃত্যরত একটি যুবতী। নৃত্যরত যুবতীর অনতিদূরে কয়েকটা মশাল জ্বলছে। মশালের আলোতে নূরী দেখলো, খাটিয়ায় বসা লোকটা যেন তার পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। কোথায় দেখেছে ভ্রূকুঁচকে ভাবতে লাগলো সে, হঠাৎ মনে পড়লো এ তো মায়ারাণীর মুখ। নূরীর চোখের সামনে লোকটার মুখ মিশে সেখানে ভেসে উঠলো। একটি অসাধারণ নারীমুখ। আজ সব পরিস্কার হয়ে গেলো নুরীর কাছে। তার ধারণা সত্যি মায়াঁরাণী আসলে নারী নয়, সে পুরুষ বুঝতে পারলো নূরী।

আরও অবাক হলো নূরী——যুবতীকে মাঝে মাঝে লোকটা চাবুক দ্বারা। আঘাত করছে। মেয়েটি মাটিতে পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠে নাচতে চেষ্টা করছে।

নূরীর সে রাতে আর ঘুম হলো না, কে এই মায়ারাণী বেশী শয়তান। নিশ্চয়ই লোকটা ভেলকিবাজি জানেনইলে এক এক সময় এক এক রূপ সে ধরে কি করে! আর সব কিছুর এমন পরিবর্তনই বা করে কেমন করে মনে পড়লো প্রথম দিনের কথা, সন্ন্যাসী বাবাজীর নিষেধ সত্ত্বেও মনির সন্ধানে নূরী এসেছিলো পশ্চিম দিকে। হঠাৎ তার সামনে দেখতে পেয়েছিলো সুন্দর একটি ফুলের বাগান, কত রকমের ফুলের সমারোহ সে বাগানে। বিমুগ্ধ নূরী হঠাৎ একটা ফুল ছিঁড়ে ফেলে ছিলো ভুল করে, সঙ্গে সঙ্গে একরাশ ধোঁয়া তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। তারপর একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব তার সমস্ত সত্তাকে লুপ্ত করে দিয়েছিলো তখন, দেখতে পেয়েছিলো তার চারপাশে যেন প্রকান্ড প্রকান্ড দেয়াল, কোনোদিকে পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছিলো না। কিন্তু তারপর আবার দেখেছিলো একটা অন্ধকার কক্ষে বন্দিনী সে। আজ দেখছে সে কক্ষও কোথায় উধাও হয়েছে। একটা কুটিরের মধ্যে আটক রয়েছে। নূরীর কাছে সব যেন কেমন ঘোলাটে হয়ে এসেছে। সে বুঝতে পেরেছে নিশ্চয়ই যাদুর নাগপাশে তাকে বন্দী করা হয়েছে।

১১.

শিশু মনির অবস্থা আরও দুর্বিষহ। তাকে একটা বৃদ্ধার নিকটে রাখা হয়েছে। শুধু মনিই নয়, আরও কয়েকজন শিশু বালককেও সেই বৃদ্ধা দেখাশোনা করে। মনিহত বৃদ্ধাকে দেখলেই ভয়ে কুঁকড়ে যায়, কাঁদতে শুরু করে সে। বৃদ্ধার চেহারা অতি ভয়ংকর আর বিশ্রী। নাকটা চ্যাপ্ট—মাথাটা মস্ত বড় মাথায় আধাপাকা মোটা মোটা একগাদা চুল। শরীরটা জমাট পাথরের খোদাই করা মূর্তির মত শক্ত। মাঝে মাঝে খড়িমাটির মত সাদা দাঁত বের করে কথা বলে। মনি কিছুতেই ওকে সহ্য করতে পারে না।

ওকে দেখলেই মনি প্রাণফাটা চীৎকার করে ওঠে, তবু বৃদ্ধা জোর করে ওকে কোলে তুলে নেয়, মিছামিছি আদর করতে চেষ্টা করে—দুধ-কলা খেতে দেয়। ছোট্ট মনি কিছুই বোঝে না, বৃদ্ধাকে দেখলে ভয়ে চুপসে যায় আর সেই মুহূর্তে হরশংকর এসে ডাকলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার কোলে। হরশংকর মনিকে নানাভাবে যাদুর দ্বারা নিজের বশীভূত করে নিয়েছে যা বলে হরশংকর শিশু হলেও মনি তাই করে। মনিকে নিয়ে যাদুর খেলা দেখাতে গেলে দর্শক হয় বেশী। তার কারণ, মনি

শিশু হলেও খেলা দেখিয়ে দর্শকদেরকে অবাক ও মুগ্ধ করে। তাছাড়া মনির অপূর্ব সুন্দর চেহারাও দর্শকগণকে মুগ্ধ করে। মনি হরশংকরের যাদু খেলায় লাকি হয়ে দাঁড়ালো।

গহন বনে নূরী ছটফট করলেও শান্তভাবে গোপনে সে এখানকার রহস্যজাল ভেদ করবার চেষ্টা করতে লাগলো। হরশংকরের মনোভাব সে বুঝে নিলো কিছুদিনের মধ্যেই! নূরী একদিন হরশংকরকে বললো-আপনার মনঃতুষ্টির জন্য আমি সব করতে পারি। আপনি পুরুষ তাও আমি জানি, কেন আমার কাছে আপনি নারীর রূপ ধরে আসেন?

হরশঙ্কর নূরীর কথায় আশ্চর্য হলো, তার এই নিখুত নারীর ছদ্মবেশেও এই যুবতী তাকে চিনতে পেরেছে শুনে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলো হরশঙ্কর। তারপর কি যেন ভেবে বললো–তোমার অদ্ভুত বুদ্ধিবল দেখে আমি খুশী হয়েছি সুন্দরী। সঙ্গে সঙ্গে নিজের শরীর থেকে নারীর পোশাক খুলে ছুড়ে ফেলে দিলো দূরে, তারপর নূরীর দিকে দুহাত বাড়িয়ে বললো সুন্দরী, তোমাকে আমি প্রথম দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু আমি নিজকে অতি কঠিনভাবে সংযত রেখে এতদিন শুধু তোমার অপূর্ব রূপসুধা পান করেই এসেছি, তোমাকে স্পর্শ করিনি। এসো, আজ তুমি আমার বাহুবন্ধনে। এসো প্রেয়সী–

নূরী ভেতরে শিউরে উঠলেও মুখে হাসি টেনে বললো–তোমার বলিষ্ঠ দীর্ঘ চেহারা আমাকেও মুগ্ধ করেছে, কিন্তু আমার মনিকে না পেলে আমি কিছুতেই তোমাকে–কথা শেষ না করে মাথা নত করলো।

দুষ্ট যাদুকর ক্রুদ্ধ হলো, মনিকে সে মায়াজালের আবেষ্টনীতে স্মৃতিচ্যুত করে রেখেছে, কোনো রকমেই তাকে নূরীকে দেখানো সম্ভব নয়। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো সে সুন্দরী, তোমার মনি নেই।

মনি নেই!

না।

কোথায় আমার মনি?

তার রূপ পালটে গেছে।

তার মানে?

মনি তোমাকে দেখলে আর চিনতে পারবে না বা তোমার নিকটে আসতে চাইবে না।

না না, তা হতে পারে না, মনিকে আমি চাই। এনে দাও, এনে দাও আমার মনিকে।

অসম্ভব! তুমি তাকে কোনোদিনই পাবে না।

আমি তোমাকে হত্যা করবো শয়তান! নূরী দুহাতে হরশঙ্করের গলা টিপে ধরলো জোরে।

অতি সচ্ছ সহজভাবে হাসতে লাগলো হরশঙ্কর নূরীর হাত দুখানা তার গলায় যেন পুষ্পহারের মত অনুভূত হলো। হরশঙ্কর ধরে ফেললো নূরীকে। নূরী ভীষণভাবে কামড়ে দিলো যাদুকরের হাতে। যাদুকর যন্ত্রণায় ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টি অগ্নিবাণের মত নূরীর চোখে এসে লাগলো নূরী ধীরে ধীরে সংজ্ঞা হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো।

যাদুকর হরশঙ্কর হেসে উঠলো হাঃ হাঃ করে, তারপর কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো।

নূরীর যখন জ্ঞান ফিরলো তখনও সে মেঝেতেই পড়ে আছে। উঠে বসলো নূরী। বেরিয়ে এলো কুটিরের বাইরে, চারদিকে তাকিয়ে দেখলো—

কোথাও কেউ নেই। নূরী এগুলো সামনের দিকে। একি! চারপাশে বেড়াজাল কেন! বাধা পেলো নূরী। বেড়া পার হবার জন্য অনেক চেষ্টা করলো-কিন্তু কিছুতেই সক্ষম হলো না! নূরী জানে তাকে যাদুর বেড়াজালে আবদ্ধ করা হয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও সে বাইরে যেতে পারলো না। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো নূরী। হঠাৎ মনির কণ্ঠের শব্দ তার কানে এলো। চমকে উঠলো নূরী, সামনে তাকাতেই দেখতে পেলো বেড়ার একপাশে দাঁড়িয়ে মনি চোখ রগড়াচ্ছে।

নূরী মনিকে দেখামাত্র ছুটে গেলো তার দিকে, উচ্ছ্বসিতভাবে ডাকলোমনি হাত বাড়ালো মনিকে কোলে নেবার জন্য। কিন্তু মনি নূরীর দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলো। বিস্মিত ব্যথিত নূরী, ডেকে উঠলো–মনি, মনি-মনি ফিরেও তাকালো না

নূরীর দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা অট্টহাসির শব্দ ভেসে এলো পেছন থেকে-হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ–

চমকে ফিরে তাকালো নুরী, সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্ট হলো সে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে বিকট স্বরে হাসছে হরশঙ্কর। মনি নূরীর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে। নিয়েছে বলেই তার এই অদ্ভুত হাসি হাসি যেন থামতে চায় না।

হরশঙ্কর বিদ্রুপের সুরে বললো–নাওনা তোমার মনিকে।

নূরী চিত্রাপিতের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সামনে বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে মনি—এখনও মনি চোখ রগড়াচ্ছে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

নূরী দুহাত বাড়িয়ে কোলে নিতে গেলো—মনি কিছুতেই নূরীর কোলো এলো না-কেঁদে উঠলো সে চীৎকার করে। কাঁদতে লাগলো মনি হাত-পা ছুড়ে। হরশঙ্কর এগিয়ে এসে হাত বাড়াতেই মনি তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

দুহাতের মধ্যে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠলো নূরী।

হরশঙ্কর মনিকে নিয়ে ততক্ষণে চলে গেছে সেখান থেকে।

নূরীর মাথাটা কেমন যেন বনবন করে ঘুরে উঠলো। মাটিতে বসে পড়লো সে।

১২.

নিজের কক্ষে বসে আপন মনে ডায়ারীর পাতা উল্টাছিলো জন। আজ কদিন অবিরত কক্ষের প্রতিটি কাগজপত্র আর বাক্স স্যুটকেস তন্ন তন্ন করে কিসের যেন অনুসন্ধান করছে সে। আজও তার চারপাশে স্তুপাকার কাগজপত্র। ঘরময় জিনিসপত্র ছাড়ানো মাঝখানে একটা চেয়ারে বসে ডায়রী দেখছিলো জন অতি নিপুণ দৃষ্টি মেলে ডায়রীর পাতায় দেখছিলো, এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে এ্যানি!

চমকে ফিরে তাকায় জন, এ্যানিকে দেখতে পেয়ে দ্রুত ডায়রীখানা লুকিয়ে ফেলে।

এ্যানি এসে বসলো জনের চেয়ারের হাতলে, দুহাতে জনের কণ্ঠ বেষ্টন করে বলে—ডার্লিং তুমি সারাক্ষণ শুধু এ ঘরেই কাটাবে? তা ছাড়া এ কি হয়েছে তোমার ঘরের অবস্থা?

আর বলো না এ্যানি, বিশেষ দরকারী একটা জিনিস হারিয়ে ফেলেছি, খুঁজে পাচ্ছিনে।

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ জনের কণ্ঠ ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসলো এনি–আমার জিনিসটা হারাওনি তো?

মাথা চুলকায় মিঃ জন—আরে না না, ওটা ঠিক আছে।

এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে এ্যানি—উহ, বাঁচালে জন! আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। একটু থেমে বললো এ্যানি-আমি কাউকেই বিশ্বাস করিনি জন, তাই ওটা আমি তোমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছি।

হাঁ এ্যানি, আমিও সেই কারণে ওটাকে খুব যত্ন করে রেখেছি।

তুমি লন্ডন যাবার সময় ওটাকে ঠিক করে রেখেছিলে তো?

কালো চশমার ফাঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো জন এ্যানির মুখে। একটু চিন্তা করে বললোহাঁ, ওটা আমি নিরাপদ স্থানে রেখেই গিয়েছিলাম।

ডার্লিং,এবার তো আমরা সব কাজ শেষ করে ফিরে এসেছি। বিয়ের তারিখটা এবার ঠিক করে ফেললা, কেমন?

আমিও সেই কথাই ভাবছি এ্যানি, এবার আমাদের বিয়েটা শীঘ্র হওয়া দরকার।

ডালিং, আমার সত্যি বড় আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু কবে সেই দিনটি আসবে প্রিয়?

এ্যানি জনের মুখের কাছে মুখখানা এগিয়ে এনে প্রশ্ন করলো। দক্ষিণ হাতে জনের চোখের কালো চশমা খুলে নিতে গেলো এ্যানি, জন তাড়াতাড়ি মুখটা সরিয়ে বললো—উহু।

না না, তোমার ঐ কালো চশমা খুলে ফেলো! তোমার চোখ দুটো আমাকে দেখতে দাও।

এ্যানি, চশমা খুললে আমি বড় অস্বস্তি বোধ করি, চশমা আমার সম্বল!

জন!

এ্যানি, আমাকে কি তোমার ভাল লাগছে না?

অতি উত্তম—অতি মধুর–ডার্লিং তুমি এবার আমাকে ধরা দিচ্ছো না কেন? কেমন যেন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছো আমার কাছ থেকে?

এই তো আর কটা দিন, আমাদের শুভ বিবাহটা আগে হয়ে যাক, তখন আমরা দুজন এক হয়ে যাবো, মিশে যাবো, দুজন দুজনার মধ্যে।

আমার বিলম্ব সইছে না ডালিং–এ্যানি জনের বুকে মাথা রাখলো আগে কিন্তু তুমি এমন ছিলে না।

জন বিব্রত বোধ করলো, কিছু বলতে যাচ্ছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে জানালার শার্সীর ফাঁকে দুখানা চোখ ভেসে উঠলো।

এ্যানি লক্ষ্য না করলেও জনের চোখে ধরা পড়ে গেলো। জন এ্যানির কানে ফিস ফিস করে বললো—এ্যানি, কেউ আমাদের লক্ষ্য করছে।

বলো কি! এ্যানি সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

জন উঠে গেলো জানালার দিকে, ইতিমধ্যে চোখ দুটি অন্তর্ধান হয়েছে।

জন ফিরে এলো এ্যানির পাশে—এ্যানি, আমার পেছনে কেউ ছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, সদাসর্বদা সে আমাকে অনুসরণ করছে।

ভীতকণ্ঠে বললো এ্যানি-আমার কিন্তু ভয় করছে।

ভয় পাবার যদিও তেমন কিছু নেই তবু সাবধানে থাকা নিতান্ত দরকার।

কি করবো জন?

এখন তুমি সব সময় নিজের ঘরে থাকবার চেষ্টা করবে। এমনকি আমার কক্ষেও আসবে না এ্যানি।

একি বলছো ডার্লিং!

হ্যাঁ এ্যানি, আমিই যাবো তোমার ঘরে।

না গেলে আমি কিন্তু আনেক দুঃখ পাবো।

এ্যানি, তার চেয়ে আমিই বেশী দুঃখ পাবো তোমার পাশে না গেলে।

সত্যি!

সত্যি এ্যানি–জন এ্যানির চিবুক খানা তুলে ধরলো—তাহলে তুমি এখন যাও, এ্যানি!

যাচ্ছি। তুমিও এখন শুয়ে পড়া জনহাতঘড়িটা দেখে নেয় এ্যানি–রাত অনেক হয়ে গেছে।

এ্যানি বেরিয়ে যায়, হাই তোলে জন—তারপর দরজা বন্ধ করে এগিয়ে যায় জানালার শার্শীর পাশে খুলে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখে নেয়। না কোথাও কেউ নেই। আবার ভাল ভাবে জানালার শার্শী বন্ধ করে ফিরে আসে চেয়ারের পাশে, অতি সন্তর্পণে প্যান্টের পকেট থেকে ডায়ারীখানা বের করে মেলে ধরলো চোখের সামনে। কিছুক্ষণ দৃষ্টি বুলিয়ে উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো, কালো চশমাটা খুলে রাখলো আপন মনে হেসে উঠলো হাঃ হাঃ করে। এবার দ্রুত অন্য একটি ড্রেস পরে নিলো জন। তারপর কালো চশমাটা পুনরায় পরে নিলো চোখে। দরজা খুলে সোজা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো। গাড়ী বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলোজম গাড়ীতে উঠে ষ্টার্ট দিলো।

গভীর রাতের জনহীন পথ বেয়ে জনের নতুন নীল রঙের গাড়ীখানা দ্রুত এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে দুএকজন পথচারী এদিক সেদিক চলে যাচ্ছিলো। ট্রাফিক পুলিশ পথের মোড় থেকে বিদায় নিয়েছে অনেকক্ষণ।

আঁকাবাঁকা পথ ঘুরে ফিরে একটা অন্ধকার গলির মধ্যে এসে গাড়ী থামিয়ে নেমে পড়লো জন। রাস্তার ওপাশে একটা বহুদিনের পুরোন রঙচটা বাড়ী। বাড়ীর দরজায় একটা তালা লাগানো। জন সেই দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিলো, তারপর দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলো।

এগিয়ে চললো সামনের দিকে। পাশাপাশি সারিবদ্ধ কয়েক খানা পুরোন ইটের গাঁথুনি করা চুনবালি খসে পড়া ঘর। টানা বারান্দা বেয়ে জন শেষ কক্ষের নিকটে এসে থামলো, পুনরায় পেছনে তাকিয়ে দেখে নিলো অতি সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। কক্ষটা অন্যান্য কক্ষের চেয়ে একটু বিশেষ ধরনের। এ দরজাতেও মস্ত একটা তালা লাগানো। তালা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলো সে। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো বাদুড় ও চামচিকে পাখি ঝাপটে এদিক থেকে সেদিকে উড়ে গেলো।

জন পকেট থেকে একটা ছোট টর্চ লাইট বের করে জ্বালালো দেখতে পেলো, মেঝেতে একটা কাঠের বাক্স পড়ে রয়েছে। জন বাক্সটি সরিয়ে ফেলতেই একটা সুড়ঙ্গ পথ বেরিয়ে এলো।

জন সেই সুড়ঙ্গপথে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলো। ভূগর্ভেও ওপরের মত পাশাপাশি কয়েকখানা কক্ষ। একটা কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে জন থমকে দাঁড়ালো, অদূরে দুগ্ধফেননিভ শুভ্র বিছানায় শায়িত এক যুবক। শরীরে মূল্যবান স্যুট। চীৎ হয়ে শুয়েছিলো সেজনের পদশব্দে বিছানায় উঠে বসলো। ফিরে তাকাতেই জন বললো—গুড ইভনিং।

শয্যায় উপবিষ্ট যুবক কোনো কথা উচ্চারণ করলো না, একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বসলো। যুবকের চেহারা, সুন্দর, বলিষ্ঠ, দীপ্তময়, মাথায় কোঁকড়ানো একরাশ চুল, প্রশস্ত ললাটে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি মুখোভাব গম্ভীর উদাস।

জন যুবকের পাশে এসে বসলো—পিঠে হাত রেখে ডাকলো বন্ধু, কেমন আছো?

এবারও কোনো জবাব দিলো না যুবক, মাথা নীচু করে নীরবে বসে রইলো।

শয্যার পাশেই একটা চৌকোনা টেবিল, টেবিলে নানা রকম ফলমূল সাজানো। জন একথোকা আঙ্গুর তুলে নিয়ে একটা ছিঁড়ে মুখে ফেললো, তারপর চিবুতে

চিবুতে বললো—কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?

যুবক তবু নিরুত্তর। জন হেসে বললো আর কটা দিন–কথার ফাঁকে চোখের কালো চশমা খুলে টেবিলে রাখলো।

যুবক তাকালো জনের মুখের দিকে।

হাসলো জন, তারপর পকেট থেকে একটা চেঁক বের করে বাড়িয়ে ধরলো—এখানে সই দাও বন্ধু।

না, আমি সই দেবো না।

তোমার একটা পয়সাও বাজে নষ্ট করবো না।

কি করবে তুমি এত টাকা?

সমস্ত হিসেব পাবে।

না, আমি কিছুতেই সই দেবো না।

দেবে না?

না!

জন প্যান্টের পকেট থেকে বের করলো একটা ছোট্ট রিভলবার চেপে ধরলো যুবকের বুকে—সই না দিলে আর কোনোদিন তুমি পৃথিবীর আলো দেখতে পাবে না বন্ধু!

যুবক ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো জনের মুখের দিকে। তারপর চোখ। নামিয়ে তাকালো রিভলবারের দিকে, এবার ধীরে ধীরে জনের হাত থেকে পেনটা নিয়ে চেকে সই করলো সে।

চেকটা পকেটে ভাঁজ করে রেখে জন উঠে দাঁড়ালো—আবার দেখা হবে। গুডবাই!

জন রিভলবারখানা পকেটে রেখে দ্রুত বেরিয়ে গেলো।

পথের পাশে গাড়ীখানা অপেক্ষা করছিলো, জন গাড়ীতে উঠে ষ্টার্ট দিলো।

নিজ বাড়ীর গাড়ী-বারান্দায় গাড়ী পৌঁছতেই জন লক্ষ্য করলো—তার হলঘরের দরজার ওপাশে কেউ যেন আত্মগোপন করলোজন ঘরে প্রবেশ করে সুইচ টিপে আলো জ্বালালো। তারপর ওদিকের দরজা খুলে ধরলোআসুন মিঃ লাহিড়ী।

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার থেকে সরে এলেন পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ লাহিড়ী। তাঁর মুখোভাব কিছুটা বিব্রত, হতভম্ভ।

জন হেসে বললো—নিশ্চয় আমার জন্য অপেক্ষা করছেন!

মিঃ লাহিড়ী কক্ষে প্রবেশ করে বললেন—হাঁ, মানে আপনার কাছে একটু দরকার ছিলো, তাই

আসুন, আমি একটা কাজে বাইরে গিয়েছিলাম।

মিঃ লাহিড়ী আসন গ্রহণ করে বললেন–এত রাতে বাইরে আপনার কি এমন জরুরী কাজ ছিলো, মিঃ জন?

সব কথাই তো বলা যায় না, তবে আপনাকে বলা উচিত মনে করি।

বলুন?

আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু আজ পনেরোবিশদিন হলো অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

ওঃ–মিঃ লাহিড়ী একটা শব্দ করলেন!

এবার জন নিজের সিগারেট কেসটা মিঃ লাহিড়ীর সামনে বাড়িয়ে ধরে বললো—নিন।

মিঃ লাহিড়ী একটা সিগারেট তুলে নিতে নিতে বললেন—এত রাতে আপনাকে বিরক্ত করা আমার উচিত হলো না মিঃ জন!

না, পুলিশের লোকের আবার সময় অসময় আছে নাকি! যখনই আপনি প্রয়োজন বোধ করবেন তখনই অনুগ্রহ করে আসবেন খুশী হবো।

ধন্যবাদ মিঃ জন।

জন একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বললো-মিঃ লাহিড়ী মিস মালতী হত্যারহস্য উদঘাটনে কতদূর অগ্রসর হয়েছেন, জানতে পারি কি?

না, তেমন বেশী এগুতে পারিনি। তবে হাঁ, খুব শিগগির মালতী হত্যারহস্য উদঘাটিত হবে এটা সুনিশ্চয়!

অরুণ বাবু এখনও হাজতে আছেন?

হাঁ, অরুণ বাবু এখনও হাজতে।

কেন, কেউ কি তাকে জামিনে মুক্ত করে নেয়নি? মিঃ বাসুদেবও কি তার জামিনের আবেদন করেননি?

না, তিনি মিস মালতী হত্যার পর কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেছেন। হাজার হলেও কন্যার মৃত্যুশোক কম নয়, বৃদ্ধ বয়সে এমন একটা অঘটন তাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে।

আচ্ছা মিঃ লাহিড়ী, আমি একবার অরুণ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই, কয়েকটা প্রশ্ন করবো!

স্বাচ্ছন্দে মিঃ জন!

ধন্যবাদ।

মিঃ লাহিড়ী এবার মাথা চুলকান, তারপর বলেন—মিঃ জন, আপনি আমার একটা প্রশ্নের ঠিক জবাব দেবেন?

নিশ্চয়ই, বলুন?

আচ্ছা মিঃ জন, মিস মালতীর সংগে আপনার কেমন সম্বন্ধ ছিলো? অবশ্য এ প্রশ্ন আমি আগেও আপনাকে করেছি, পুনরায় করছি!

হাঁ, করবেন, একবার কেনো প্রয়োজনে দশবার করবেন। তার সঙ্গে আমার বান্ধবীর সম্বন্ধ ছিলো।

আপনি তাকে গভীরভাবে ভালবাসেননি?

হাঁ। বাসলে আমি এ্যানিকে বিয়ে করবার পাকা কথা দিতে পারতাম না।

এবার আপনি লন্ডন থেকে ফিরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি কেন?

এ্যানিকে বিয়ে করবার পাকা কথা দিয়ে অন্য একজন যুবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আমার বিবেকে বেধেছে।

সে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলো—একথা সত্য?

হাঁ সত্য।

সেদিন আপনি তাকে সরাইখানায় পৌঁছে দিয়ে আসেননি?

না, সে নিজেই—একটু থেমে বললো জন-আমি তাকে পৌঁছে দিয়েছিলাম, কিন্তু সরাইখানায় নয়-তার নিজ বাড়ীতে।

তখন কি অরুণ বাবু বাড়ীতে ছিলো?

না, কেউ ছিলো না! মিস মালতীকে আপনি কি বাড়ীর ভেতরে পৌঁছে দিয়েছিলেন না বাড়ীর সদর দরজা থেকেই বিদায় নিয়েছিলেন।

জন নিশ্চুপ হয়ে কি যেন ভাবলো, তারপর বললো—মালতী আমাকে ছেড়ে দেয়নি, আমি তার সংগে তার কক্ষে গিয়েছিলাম।

কতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন আপনি সেখানে?

মিনিট পনেরো–কিন্তু–আপনি কি আমাকে সন্দেহ করছেন মিঃ লাহিড়ী?

আমরা পুলিশের লোক—সন্দেহ করা আমার স্বভাব। মিঃ জন, আজ আমি চললাম, কাল আপনি থানায় আসবেন?

হাঁ, আমাকে যেতে হবে একটু, কারণ অরুণ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমার একান্ত প্রয়োজন।

চলি? উঠে পড়লেন মিঃ লাহিড়ী।

জন নিজের কামরায় গিয়ে দরজা বন্ধ করলো। বার দুই হাই তুলে হাতঘড়ির দিকে তাকালো তারপর একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লো। প্যান্টের পকেট থেকে ডায়রীখানা বের করে মেলে ধরলো চোখের সামনে।

হঠাৎ একসময় জনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ডায়রীর পাতায় এক জায়গায় বারবার পড়তে লাগলো সে। তারপর ডায়রীখানা পকেটে রেখে কিছুক্ষণ ধীর পদক্ষেপে কক্ষে পায়চারী করলো। তার মুখোব স্বচ্ছ দীপ্তময়, একটা পাষাণভার যেন তার বুক থেকে নেমে গেছে বলে মনে হলো। ঠোঁটের কোণে একট। তীক্ষ্ণ হাসির রেখা ফুটে উঠেছে।

এবার শয্যায় গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো জন, অল্পক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়লো সে।

বেলা হয়ে গেছে অনেক——এখনও জনের ঘুম ভাঙলো না! অঘোরে ঘুমাচ্ছে সে। কক্ষে প্রবেশ করলো এ্যানি। খাবার টেবিলে বসে চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে তবু জনের সাক্ষাত না পেয়ে এ্যানি চলে এলো জনের কক্ষে।

জন পাশের টেবিলে তার কালো চশমাটা খুলে রেখে উবু হয়ে শুয়ে ছিলো বালিশটা আঁকড়ে ধরে।

এ্যানি গিয়ে বসলো জনের পাশে, পিঠে হাত রেখে ডাকলো—ডার্লিং, এত ঘুমাচ্ছো! ওঠো!

জনের ঘুম ভেঙে গেলো আচম্বিতে কিন্তু সে নিশ্চুপ ঘুমের ভান করে শুয়েই রইলো। এ্যানি মাথাটা রাখলো জনের পিঠের ওপর—ওঠো, ডালিং!

উ হুঁ, শরীরটা বড় খারাপ লাগছে।

এ্যানি তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসে জনকে টেনে এদিক করতে গেলো কিন্তু জন। কিছুতেই পাশ ফিরলো না, বললো এবার—এ্যানি, প্রিয়ে, আর একটু ঘুমোতে দাও।

অনেক বেলা হয়েছে, ছিঃ এত ঘুমায় না!

এ্যানি!

বলো?

লক্ষ্মীটি, আমাকে আর একটু ঘুমাতে দাও।

বেশ আমি যাচ্ছি। যাবার সময় টেবিল থেকে কালো চশমাটা কাপড়ের নীচে লুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

জন এবার পাশ ফিরে হাত বাড়ালো টেবিলে চশমাটার জন্য কিন্তু একি? চশমা কোথায়? জন বিপদে পড়লো। তাড়াতাড়ি বাথরুমে প্রবেশ করে ড্রেসিং আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো, চোখটা তার এখনও সম্পূর্ণ সারেনি।

১৩.

বাসুদেব সরাইখানার দোতলার একটা কক্ষে থাকতেন; এটাই তাঁর বিশ্রামকক্ষ। মাঝে মাঝে কন্যা মালতীর বাড়ী বেড়াতে যেতেন কিংবা কখনও তাকে রাখতে যেতেন বাসুদেব স্বয়ং। কিন্তু মালতী নিহত হবার পর। আর বাসুদেব মালতীর শূন্য বাড়ীতে যাননি। কন্যার শেষ নিঃশ্বাস যে বাড়ীর হাওয়ায় মিশে রয়েছে, যে বাড়ীর শুষ্ক মেঝে তার কন্যার বুকের রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছিলো, সে বাড়ী তাঁর কাছে অসহ্য।

আজকাল বাসুদেব, সব সময় তার নিজের ঘরেই থাকেন। কখনও বিশেষ প্রয়োজনে এসে বসেন তিনি সরাইখানার গদিতে।

ভাবগম্ভীর প্রবীণ ব্যক্তি বাসুদেব কন্যার মৃত্যুতে সত্যিই একেবারে মুষড়ে পড়েছেন। পুলিশ অফিসারগণ আসনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, যেটুকু না বললে নয় তাই তিনি বলেন।

সেদিন অনেক রাতে বাসুদেব বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিলেন। সরাইখানা সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যায়নি, নীচে খানাপিনা নাচ গান তখনও চলছে।

হঠাৎ বাসুদেবের জানালার শার্শী খুলে কক্ষে প্রবেশ করলো জন, দক্ষিণ হাতে তার উদ্যত রিভলবার।

বাসুদেব পদশব্দে মুখ ফেরাতেই চমকে উঠলেন, অস্ফুট কণ্ঠে বললেনজন, তুমি!

দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এলো জনহাঁ আমি, চিনতে তাহলে ভুল হয়নি মিঃ দেব?

সাত বছর পর তোমাকে দেখলাম কিন্তু কি কারণে তুমি এখানে এসেছো?

একটা জরুরী কাজে।

তা সামনে দিয়ে না এসে পেছনের জানালা দিয়ে কেন?

বহুদিন পর কিনা সরাইখানার সবাই আমাকে দেখলে অবাক হবে–তাই আত্মগোপন করে এলাম।

কিন্তু ওটা কেন তোমার হাতে? জনের হাতের রিভলবারখানা দেখান বাসুদেব।

হাসে জন—যে প্রশ্ন করবো সঠিক জবাব না দিলে এটার দরকার হতে পারে!

বাসুদেবের মুখমন্ডল ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠলো, আমতা আমতা করে বললেনকি এমন প্রশ্ন করবে জন?

আপনার কন্যা সম্বন্ধে দুচারটা কথা।

সে জন্য রিভলবার দেখাতে হবে না জন। মালতীর সম্বন্ধে তুমি যা জিজ্ঞাসা করবে তাই বলবো, মা মালতী আমাকে শোকসাগরে ভাসিয়ে রেখে গেছে। রুমালে চোখ মোছেন বাসুদেব।

সত্যই বাসুদেব কন্যাকে হারিয়ে উন্মাদের মত হয়ে পড়েছেন। একমাত্র কন্যা ছিলো তাঁর সম্বল।

জন বললোআমি যখন লন্ডন যাই তখন আপনার কন্যা মিস মালতীর নিকটে আমার একছড়া হীরার হার রেখে যাই, সেটার জন্য আজ আমি এসেছি।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে ওঠেন বাসুদেব হীরার হার!

হাঁ, পাঁচখানা হীরার খন্ড সেই হারে গাঁথা ছিলো।

একটু চিন্তা করে বললেন, বাসুদেব—হাঁ, আমি সেই রকম এক ছড়া হার তার গলায় দেখেছিলাম। আমি তাকে সেই হার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সে বলেছিলো তোমার কথা–তুমি নাকি তাকে ওটা উপহার দিয়েছে। দিয়েছিলাম, কিন্তু আজ সে নেই—কাজেই ওটা আমি ফেরত নিতে এসেছি।

বাসুদেবের চোখ দুটোতে ক্রুদ্ধ ভাব ফুটে উঠলো, বললেন—সে হারের কথা আমি জানিনা। হারের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করলে আমি তার জবাব দিতেও রাজী নই।

জন রিভলবারখানা একবার ঘুরিয়ে নিলো হাতের মধ্যে। কক্ষের স্বল্পালোকে রিভলবারখানা চকচক করে উঠলো।

বাসুদেব ঢোক গিলে বললেন—সে নিহত হবার পর হারের সন্ধান আমি জানি না।

জন হাসলো-জানেন না, কিন্তু মালতী নিহত হওয়ার সময়ও সেই হার তার গলায় ছিলো মিঃ দেব।

এ কথা তুমি কি করে জানলে জন? নিশ্চয় তুমি তাকে হত্যা করেছো?

সেই কথা জানাতেই আমি এসেছি মিঃ দেব।

কি, এত সাহস তোমার। মালতীকে তুমিই তাহলে হত্যা করেছো?

হত্যা করিনি, কিন্তু মালতীকে যখন হত্যা করা হয় তখন আমি সেখানেই ছিলাম।

বাসুদেবের মুখমন্ডল কালো হয়ে উঠলো—আমার কন্যার হত্যাকান্তে, তুমি ছিলে সেখানে অথচ হত্যাকারীকে তুমি–

হাঁ, আমিই তাকে পালাবার সুযোগ দিয়েছি।

কেন? কেন?

হারছড়া পরে তার কাছে পাবো এই আশায়।

তাহলে আমার কক্ষে কেন এসেছো জন?

হারছড়া এখন আপনার কক্ষেই আছে কিনা—

না না, আমার কক্ষে কেন সেই হার থাকবে। জন, তুমি ভুল করছো। আমার কন্যাকে আমি হারিয়েছি, তার চেয়ে কোনো জিনিসই আমার কাছে মূল্যবান নয়।

এমন সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ শোনা গেলো। জন একবার দরজার দিকে তাকিয়ে দ্রুত যে পথে এসেছিলো সেই পথে প্রস্থান করলো।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন বাসুদেব শর্মা।

কক্ষে প্রবেশ করলেন মিঃ লাহিড়ী ও দুজন পুলিশ। পেছনে হোটেলের ম্যানেজার রজতবাবু।

রজতবাবু বললেন–এই কিছুক্ষণ আগেও কেউ ছিলো। মিঃ লাহিড়ী বললেন—বাসুদেব বাবু, এখানে কেউ এসে ছিলো?

হাঁ, এই মুহূর্তে মালতীর হত্যাকারী এখানে এসে আমাকে হত্যা করতে যাচ্ছিলো।

হোয়াট?

হাঁ, ইন্সপেক্টার আর একটু হলেই আমার মৃতদেহ আপনারা দেখতে পেতেন।

এসব কি বলছেন মিঃ শর্মা!

হাঁ, সব সত্য। ইন্সপেক্টার মালতীর হত্যাকারী আর কেউ নয়জন জনই তাকে হত্যা করেছে।

জন!

হাঁ, ইন্সপেক্টার! জনই আমার কন্যাকে হত্যা করেছে।

মিঃ লাহিড়ীর মুখমন্ডল কুঞ্চিত হয়ে এলো, তিনি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললেনজন মালতীর হত্যাকারী একথা আপনাকে কে বললো? সে নিজেই কি বলেছে?

না নিজে বলেনি, নিজে কেউ বলেওনা।

তবে?

তার কথাবার্তায় প্রকাশ পেয়েছে।

কি রকম?

প্রথমতঃ জন আমার পরিচিত লোক, সে গোপনে পেছনের জানালা দিয়ে আমার কক্ষে প্রবেশ করার কোনো কারণ থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ জনের হাতে গুলীভরা রিভলবার ছিলো। তৃতীয়তঃ জন নাকি মালতীকে একছড়া হীরার হার উপহার দিয়েছিলো। সে হার ছিলো অত্যন্ত মূল্যবান। সে ঐ হার পুনরায় নিতে এখানে এসেছিলো! হার আমার নিকেট না পাওয়ায় সে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়।

তারপর?

জন বলে, মালতীকে যখন হত্যা করা হয় তখন সে নাকি সেই স্থানে উপস্থিত ছিলো।

একথা সে নিজে স্বীকার করেছে? হাঁ করেছে।

এটাই কি আপনার জনকে মালতীর হত্যাকারী বলে সন্দেহ হওয়ার কারণ?

এছাড়াও জনের সবকিছুই আমার কাছে বেশ রহস্যজনক বলে মনে হলো ইন্সপেক্টার।

রজতবাবু বললেন—জন তাহলে সরাইখানার সম্মুখভাগ দিয়ে না এসে পেছনের শার্শী খুলে এসেছিলো কেন?

হাঁ, সবতো শুনলেন। বললেন বাসুদেব।

এমন সময় কাফ্রি চাকরটা হাঁপাতে হাপাতে এসে বললো–হুজুর হুজুর,–একটা লোক সরাইখানার পেছনে দাঁড়িয়েছিলো আমি তাকে দেখে ফেলায় সে ছুটে পালিয়ে গেলো।

মিঃ লাহিড়ী বিষ্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন পালিয়ে গেলো!

হা, স্যার,কোট-প্যান্ট পরা একটা সাহেবের মত লোক। এখনও সে বেশী দূর যেতে পারেনি হুজুর–

মিঃ লাহিড়ী প্রশ্ন করলেন কোন দিকে গেছে বলতে পারো?

নিশ্চয়ই পারি। দক্ষিণ দিকে গেছে লোকটা।

মিঃ লাহিড়ী আর বিলম্ব না করে দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

বাসুদেব এতক্ষণে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। একে কন্যাশোকে তিনি মুহ্যমান, তার ওপর এসব উপদ্রব তাঁর মনটাকে একেবারে যেন ছেচে দিয়েছে!

মিঃ লাহিড়ী অনেক সন্ধান করেও জন বা অন্য কাউকে সরাইখানার আশেপাশে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখলেন না।

অফিসে ফিরতেই মিঃ রায় জানালেন—মিঃ লাহিড়ী, মিঃ জন আপনার সাক্ষাৎ কামনায় বহুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন।

বিস্মিত হলেন মিঃ লাহিড়ী—তিনি এইমাত্র বাসুদেবের মুখে শুনে এলেন—জন নাকি একটু আগেই তার ওখানে হামলা, দিয়েছিলো। অবাক হলেও তিনি কথাটা প্রকাশ করলেন না। জনকে লক্ষ্য করে বললেন—হ্যালো মিঃ জন, আমি একটু বাইরে কাজে গিয়েছিলাম।

জন গম্ভীর মুখে বললো—যাক, এসেছেন ভালই হলো—আমি অরুণ বাবুর সঙ্গে একটু সাক্ষাৎ করতে চাই।

আসুন মিঃ জন!

জনকে নিয়ে মিঃ লাহিড়ী হাজত কক্ষে এলেন।

জন অরুণ বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে। লম্বা ছিপছিপে গঠন, মাথায় কোঁকড়ানো চুল, গায়ের রঙ ফর্সা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়িবেশ কদিন শেভ করা হয়নি। চোখ দুটোতে করুণ চাউনি।

মিঃ লাহিড়ী বললেন—আপনার যা বলবার তাড়াতড়ি বলে নিন মিঃ জন।

ইয়েস! আমি সামান্য কটি কথা ওকে জিজ্ঞাসা করবো। অরুণ বাবুকে লক্ষ্য করে বললো জন-অরুণ বাবু, আপনার সঙ্গে তেমন করে আমার পরিচয় নেই। আমি মিস মালতীর পুরোনো বন্ধু জন।

অরুণ বাবু অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো আপনি জন!

হাঁ আমি জন। দেখুন আপনাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করবো। আপনি যদি সঠিক জবাব দেন তাহলে মালতীর হত্যা রসহস্য উদ্ঘাটন হবে আপনি যদি সত্যই নির্দোষ হন তাহলে আপনার মুক্তির পথও পরিস্কার হবে।

বলুন। আগ্রহভরাদৃষ্টি নিয়ে তাকালো অরুণ বাবু মিঃ জনের মুখের দিকে।

জন একবার মিঃ লাহিড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললো—আচ্ছা মিঃ অরুণ বাবু, মিস মালতীর সঙ্গে আপনার কত দিনের পরিচয়?

একটু ভেবে নিয়ে বললো অরুণবাবুবছর তিন হবে।

তার সঙ্গে আপনার কেমন সম্বন্ধ ছিলো? লজ্জা বা সংকোচ করবেন না, যদিও মিস মালতী আমারও বান্ধবী ছিলো।

না না, তা করবো না।

বলুন তবে!

মালতীকে আমি ভালবাসতাম।

শুধু কি ভালবাসতেন, না তার সঙ্গে অন্য কোনো রকম সম্পর্ক–মানে আপনাকে প্রথমেই বলেছি কোনো রকম দ্বিধা করবেন না আমার কাছে।

হাঁ, মালতী বলেছিলো সে আমাকে বিয়ে করবে এবং সে কারণেই আমি তাকে ভালবাসতাম ও তার বাড়ীতে থাকতে রাজী হয়েছিলাম।

জন আর একবার মিঃ লাহিড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো।

মিঃ লাহিড়ীও অরুণবাবুর কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনে যাচ্ছিলেন।

জন বললো-শুধু কি মিস মালতীর কথাতেই আপনি তার বাসায় থাকতে রাজী হয়েছিলেন?

না, তার বাবা বাসুদেবও আমাকে ওখানে থাকবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

আপনি কি একাই মালতীর বাড়ীতে থাকতেন?

না, একটা কাফ্রি চাকরও থাকতো। সে নিচের তলায় ঘুমাতো।

আর আপনি?

আমি–আমি একটু ইতস্ততঃ করে বললো অরুণ বাবু—আমি মালতীর পাশের কামরায় থাকতাম। তবে আমাকে প্রায় রাতেই বাইরে কাটাতে হতো।

কেন?

বাসুদেব নানা কাজে আমাকে বাইরে পাঠাতেন।

তখন মালতীর কাছে, মানে ঐ বাসায় কে থাকতো?

ঐ কাফ্রি চাকরটা। আমি কোনো কোনো দিন রাতে ফিরে আসতাম।

জন কি যেন ভাবলো, তারপর বললো—মিঃ লাহিড়ী আপনি মনোযোগ সহকারে এর কথাগুলো শুনে যাবেন।

হাঁ, মিঃ জন আমি আপনাদের উভয়ের কথা বার্তাই অতি মনোযোগ সহকারে শুনে যাচ্ছি।

ধন্যবাদ মিঃ লাহিড়ী! পুনরায় ফিরে তাকায় জন অরুণ বাবু মুখের দিকে—— আচ্ছা অরুণ বাবু?

বলুন?

মিস মালতী সরাইখানা থেকে কত রাতে বাসায় ফিরতো?

তার কোন ঠিক সময় ছিলোনা। কারণ সে কোনো কোনো রাত দুটো-তিনটে পর্যন্ত সরাইখানায় কাটাতো।

শুধু কি নাচ গানের জন্যই সরাইখানায় তাকে অত রাত পর্যন্ত রাখতে তার বাবা বাসুদেব?

অরুণবাবু মাথা নত করলো, কোনো জবাব দিলো না?

জন ও মিঃ লাহিড়ী দৃষ্টি বিনিময় করলো। উভয়ের মুখেই মৃদু হাসির আভাস ফুটে উঠে মিলিয়ে গেলো।

মিঃ লাহিড়ী বললেন—অর্থের লোভে মানুষ কতদূর নীচ হতে পারে! আপন কন্যাকেছিঃ ছিঃ ছিঃ।

জন মিঃ লাহিড়ীর কথার কোনো জবাব না দিয়ে অরুণ বাবু বললো—এসব জেনেও আপনি মালতীকে বিয়ে করতে রাজী ছিলেন?

অরুণ বাবু কোনো জবাব না দিয়ে একবার মিঃ জনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো। পুনরায় দৃষ্টি নত করে সে।

মিঃ লাহিড়ী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—উনি যা প্রশ্ন করছেন তার জবাব দিন অরুণবাবু। লজ্জার স্থান এটা নয়।

অরুণ বাবু পুনরায় চোখ তুললো।

জন বললো মালতীর চরিত্রহীনতার কথা জেনেও আপনি তাকে ভালবাসতেন?

হাঁ, ওকে আমার ভাল লাগতো।

সেটা কি ওর অর্থ, না ওকে?

ওকে।

তাই বুঝি কোনো ঘৃণা ছিলো না ওর ওপর?

হাঁ, যাকে ভালবাসা যায় তাকে ঘৃণা করা যায় না।

অদ্ভুত মানুষ আপনি অরুণবাবু। একটু হেসে বললো জনআমিও একদিন মালতীকে গভীরভাবে ভালবাসতাম, সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসতাম। আমার ভাবী স্ত্রী মিস এ্যানি আমার নিকটে একটা হীরার হার গচ্ছিত রেখে লন্ডন গিয়েছিলো ওর বাবার সঙ্গে। মিস মালতীর সঙ্গে আমার যখন ভালবাসা গভীরভাবে জমে ওঠে তখন আমি এ্যানির সেই গচ্ছিত হীরার হার তাকে উপহার দেই।

তারপর একদিন লন্ডন থেকে আমার ডাক এলো। চলে গেলাম। যবার সময় মালতী আমাকে অনেক কথাই বলেছিলো। সে বলেছিলো জন তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি তোমার প্রতীক্ষা করবো যদিও তুমি অন্য মেয়েকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তবু আমি তোমাকে অন্তর দিয়ে। ভালবাসি ও চিরদিন বাসবো। কিন্তু আমি লন্ডন থেকে ফিরে জানতে পারলাম—সে তার পিতার সরাইখানার নাচনে ওয়ালী হয়েছে। কন্যার যৌবন বিক্রি করে বাসুদেব অর্থ উপার্জন করছে। কথাটা শোনার পর আমার মস্ত মন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো, আমি আর মালতীর পাশে যেতে পারিনি অবশ্য সেই একদিন এসেছিলো আমার সঙ্গে দেখা করতে। হাঁ, আমি শেষ পর্যন্ত তাকে তার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েও এসেছিলাম কিন্তু আগের মত সচ্ছ মন নিয়ে তাকে আর ভালবাসতে পারিনি।

মিঃ লাহিড়ী হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন আপনার ভাবী স্ত্রীর গচ্ছিত সেই b্যবান হীরার হার কি মিস মালতীর নিকটেই রয়ে গেলো?

হাঁ, ওটা আমি আর ফেরত নিতে পারলাম না।

মিঃ লাহিড়ী সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন জনের মুখের দিকে।

জন অরুণ বাবুকে প্রশ্ন করলেন-অরুণ বাবু, ঠিক করে বলুন দেখি, আপনি সেই হীরার হার দেখেছিলেন?

হাঁ দেখেছিলাম, এমন কি মৃত্যুর দিনও ঐ হার তার গলায় ছিলো।

মিঃ লাহিড়ী বললেন—কিন্তু কি আশ্চর্য কই মৃত্যুকালে তার কণ্ঠে তো কোনো হার ছিলো না। তবে পোষ্টমর্টেম রিপোর্টে জানা গেছে মিস মালতীর গলায় একটা আঁচড়ের চিহ্ন ছিলো।

সেই চিহ্নই হলো মিস মালতীর নিহতের কারণ।

তাহলে কি ঐ হারছড়া—

হাঁ ইন্সপেক্টার, ঐ হারছড়াই মালতীর মৃত্যু ঘটিয়েছে।

কঠিন হয়ে উঠলো মিঃ লাহিড়ীর মুখমন্ডল-এ হার আপনিই তাকে দিয়েছিলেন?

সে কথা তো বলেছি। এ সন্দেহ মিথ্যে নয় ইন্সপেক্টার। আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না যে আপনি এতদিনও আমাকে এরেষ্ট না করে নিশ্চপ আছেন। একটু থেমে বললো জন–আমি হার নিলে তাকে হত্যা করতে হতো না, আমার বাসায় যখন সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলো তখন তার কণ্ঠে হার ছিলো কিন্তু আমি অতখানি নীচ হতে পারিনি। যাক, একথা মুখে বলে বিশ্বাস করানো বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়।

আচ্ছা অরুণবাবু হারটা কি মালতী সব সময় পরতো?

না, কোনো কোনো বিশেষ দিন ছাড়া ঐ হার সে পরতো না এবং হারছড়া সে অতি সাবধানে ব্যাঙ্কে রেখে আসতো, এমনকি কোনোদিন রাতে ঐ হার নিজের বাসায় রাখতো না।

কেন, তার বাবা বাসুদেবকেও সে বিশ্বাস করতো না কি?

না, সে কথা নয়। মালতী ঐ মূল্যবান হারছড়া বাসায় বা সরাইখানায় রাখা নিরাপদ মনে করতো না। যদিও অনেক সময় বাসুদেব বলেছেন-হারছড়া তাঁর কাছে রাখলে কোনো ভয় নেই চুরি যাবার।

হুঁ, মিস মালতীর এত সাবধানতা সত্ত্বেও একবার হারছড়া চুরি গিয়েছিলো না অরুণবাবু?

হাঁ গিয়েছিলো।

কিছুক্ষণ পর পুনরায় ফেরত পায় তাই না?

এ কথা আপনি কি করে জানলেন?

আরও জানি—সেইদিনই মালতী নিহত হয়।

আপনি–আপনি—

আমি সব জানি!

মুহূর্তে অরুণ বাবুর মুখমন্ডল ফ্যাকাশে হয়ে যায়। মিঃ লাহিড়ীর মুখে ভাবও বেশ ভাবাপন্না হয়ে ওঠে। ভ্রূ-কুঞ্চিত করে তাকান জনের মুখের দিকে।

জন বলে ওঠে—চলুন মিঃ লাহিড়ী। অরুণ বাবুর কাছে আমার যা জানবার ছিলো জানা হয়ে গেছে।

পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ লাহিড়ী ও জন হাজত কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো বাইরে।

জন বললো মিস মালতীর পোষ্টমর্টেম রিপোটখানা একটু দেখতে চাই।

মুখোভাব পূর্বের ন্যায় গম্ভীর করে বললেন মিঃ লাহিড়ী—আচ্ছা চলুন।

পুলিশ অফিস থেকে জন যখন ফিরলো তখন ভোর হয়ে গেছে। সূর্যের আলোয় ঝকমক করছে গোটা পৃথিবী।

১৪.

হরশঙ্কর আজকাল নূরীকে নাচ শিক্ষা দিচ্ছে। তার কথামত নাচতে না পারলে চাবুকের আঘাতে জর্জরিত করে তোলে তাকে। নানাভাবে যন্ত্রণা অর কষ্ট দেয়া হয়। অন্যান্য মেয়ের চেয়ে নূরী অনেক সুন্দরী, নূরীকে নাচিয়ে। হরশঙ্কর বেশী

পয়সা উপার্জন করবে তাই ওকে মেরেপিটে সুন্দরভাবে নতুন নতুন নাচ শেখাচ্ছে।

নূরীর নাচ শিক্ষা চলছে—আর মনিকে নিয়ে দেখানো হচ্ছে নানা রকম যাদুখেলা। মনিকে নিয়ে শহরে শহরে যায় হরশঙ্কর বহু দূরদেশেও চলে যায়। নৌকা-ষ্টিমারে জাহাজে। কখনও ট্রেনে বা প্লেনেও যায় হরশঙ্কর। সে তো আর সাধারণ যাদু খেলোয়াড় নয়। তার খেলা অতি ভয়ঙ্কর, অতি সাংঘাতিক। পয়সাও পায় সে প্রচুর। দেশ হতে দেশান্তরে তার বিচরণ। হরশঙ্করের অসাধ্য কোনো কাজ নেই। যে যুবক বা যুবতীর সাথে একবার নিভৃতে তার দেখা হয়েছে তাকেই সে মায়াজালের আবেষ্টনীতে আবদ্ধ করে ফেলেছে। বহু বালক-যুবতী-শিশুকে সে ফুসলিয়ে নিয়ে এসে অন্য জায়গায় বিক্রি করে মোটা পয়সা পেয়েছে। যাকে সে বাধ্য করতে পেরেছে বা যাকে দিয়ে পয়সা উপার্জন করা যাবে বলে মনে করেছে তাকে রেখে দিয়েছে নিজের যাদুর প্রাচীরে ঘেরা গহন বনের মধ্যে। যেখানে সাধারণ লোক বা জীবজন্তু প্রবেশে সক্ষম নয়।

দিন যায়। নূরী সুন্দরভাবে নাচ শিখে ফেলে, অদ্ভুত সে নাচ। সাধারণ নারীর পক্ষে সে ধরনের নাচ অসম্ভব।

হরশংকর একদিন মনিকে সঙ্গে করে প্লেনযোগে রওয়ানা দিলো দূরদেশে। আরাকান, হাবলুন হয়ে একদিন কান্দাই শহরে পৌঁছলো হরশংকর আর মনি। অবশ্য সঙ্গে তাদের আরও কয়েকজন তোক ছিলো-এরা হরশংকরের সঙ্গী বা সাথী।

কান্দাই-এ হই হই রই রই পড়ে গেলো, বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর হরশঙ্কর যাদুর খেলা দেখাতে এসেছেন কান্দাই শহরে।

শহরের সেরা থিয়েটার হলে হরশংকর তার খেলা দেখাবেন। বেলা চারটা থেকে টিকিট বিক্রি হচ্ছে। হল লোকে লোকারণ্য।

সন্ধ্যার পর খেলা শুরু হবে।

সংবাদটা একসময় চৌধুরীবাড়ীতেও গিয়ে পৌঁছলো। নকীব একটা বিজ্ঞাপন নিয়ে হাজির হলো মরিয়ম বেগমের সামনে আম্মা, কান্দাই এ একজন খুব নামকরা যাদুকর এসেছে। সে নাকি অনেক অদ্ভুত খেলা দেখায়। একটা ছোট্ট

ছেলেকে নিয়ে এসেছে যাদুকর। এই দেখো বাচ্চাটার ছবিও রয়েছে বিজ্ঞাপনে। ছেলেটা বাঘের সঙ্গে লড়াই করবে।

মরিয়ম বেগম বিজ্ঞাপনটা হাতে নিয়ে দেখলেন। সেই যে বনহুর বলে যাবার পর থেকে মনমরা হয়ে গেছেন, দুনিয়ার কোনো কিছুই তিনি মন প্রাণে গ্রহণ করতে পারেন না। মনিরার অবস্থাও মরিয়ম বেগমের চেয়ে কম। নয় কিন্তু তবু সে মনটাকে শক্ত করে নিয়েছিলো; মামীমাও ভেঙ্গে পড়েছেন, সেও যদি মুষড়ে পড়ে তাহলে চলবে কি করে। তার মন বলছে বনহুর বেঁচে আছে, একদিন ফিরে সে আসবে। কিন্তু এসে যদি সে তাদের কাউকে না দেখে সে ফিরে আসার আগেই তারা যদি মরে যায়–না না, বেঁচে থাকতে হবে, মরলে তার চলবে না। তার বনহুর আসবে কত আশা কত বাসনা নিয়ে মনিরার মনে সেই আশার স্বপ্ন তাকে বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায়।

মরিয়ম বেগমকে সান্ত্বনা দেয় মনিরা, মামীমা তুমি হারিয়েছো তোমার সন্তান, আর আমি হারিয়েছি স্বামী-পুত্র দুজনকেই। ভেঙ্গে পড়লে সব শেষ হয়ে যাবে-নিঃশেষ হয়ে যাবে সবকিছু। সে যদি কোনোদিন ফিরে আসে তখন কি হবে? কে তাকে সামলাবে তোমার ছেলে যে বড়ই আঘাত পাবে সেদিন।

মরিয়ম বেগম বলেছিলেন আমার মনির বেঁচে আছে?

হাঁ, মামীমা, মন বলছে সে বেঁচে আছে।

এরপর থেকে মরিয়ম বেগম ভেতরে ভেতরে গুমড়ে কেঁদে মরলেও প্রকাশ্যে আর তেমন করে কাঁদাকাটি করতেন না, পাষাণের মত হৃদয়কে শক্ত করে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মনকে কঠিন করলেও অন্তরে দুঃসহ জ্বালা দগ্ধীভূত করছিলো।

আজ নকীব বিজ্ঞাপনটা তার হাতে এনে দিলে তিনি একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মনিরাকে বললেন—দেখতো কি এটা?

অদূরেই মনিরা বসে কি যেন সেলাই করছিলো। মামীমার কথায় নকীব বিজ্ঞাপনখানা তার হাত থেকে নিয়ে মনিরার হাতে দিয়ে বললো—এক যাদুকর এসেছে খুব সুন্দর খেলা দেখায়।

তাই নাকি? মনিরা বিজ্ঞাপনখানা নকীবের হাত থেকে নিয়ে দেখতে লাগলো। বিজ্ঞাপনে একটা ছোট্ট শিশু একটা বাঘের সঙ্গে লড়াই করছে, বড় ভাল লাগলো ওর কাছে। বললো সেমামীমা, সত্যি বড় অদ্ভুত এতটুকু তিন-চার বছরের একটা ছেলে বাঘের সঙ্গে লড়াই করবে এটা কম কথা নয়। যাবে মামীমা দেখতে?

ওসব আমার ভাল লাগে না মনিরা।

মামীমা, আমার বড় দেখতে ইচ্ছে করছে।

তাহলে সরকার সাহেবকে বলে দাও টিকিট করে আনতে।

মনিরা খুশী হয়ে নকীবকে বললো–সরকার সাহেবকে পাঠিয়ে দাও।

নকীব চলে গেলো।

যাদুর খেলা শুরু হবার অনেক পূর্বেই মামীমা ও সরকার সাহেব সহ মনিরা স্বপ্নরাগ থিয়েটার হলে গিয়ে হাজির হলো। আজ যেন মনিরাকে কোনো মায়ার আকর্ষণ প্রবলভাবে আকর্ষণ করে নিয়ে এসেছে এখানে। কেমন যেন একটা বিপুল আগ্রহ তার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। যাদুকরের বাচ্চা শিশুটাকে দেখবার জন্যই মনিরা ছুটে এসেছে আজ যাদুকরের যাদুখেলা দেখতে।

সামনে ভেলভেটের গভীর লাল পর্দা ঝুলছে। পর্দার ওপর আঁকা শিশু আর বাঘের লড়াইয়ের ছবি। বাঘটা নীচে পড়ে রয়েছে একটি শিশু বাঘটার গলা টিপে ধরেছে। অদ্ভুত দৃশ্য, মনিরার হৃদয়ে একটা অনুভুতি নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে মনিরা ঐ পর্দার ওপরে কালো কাপড়ে আঁকা ছবির দিকে।

একটা অদ্ভুত ধরনের বাঁশির সুর ভেসে আসছিলো পর্দার ওপাশ থেকে। গোটা হলঘরের মধ্যে সেই সুরের আবেশ মোহ সৃষ্টি করে তুলেছিলো। দর্শকগণ তন্দ্রাচ্ছন্নের মত তাকিয়েছিলো লাল পর্দাটার দিকে।

এমন সময় পর্দা নড়ে উঠলো।

আকুল আগ্রহে তাকালো সবাই সেইদিকে।

ছুরি দিয়ে চিরে দুফাঁক করার মত ধীরে ধীরে দুদিকে সরে গেলো লাল পর্দাটা। সামনে স্পষ্ট দেখা গেলো লম্বা একটা টেবিল। টেবিলে কাপড়ে ঢাকা রয়েছে কোনো একটা জিনিস। টেবিলের পাশে দাঁড়ানো বলিষ্ঠ অদ্ভুত চেহারার একটা লোক। লোকটার শরীরে গাঢ় লাল রঙের কোট-প্যান্ট। সবকিছুই লাল, এমনকি গলার টাইটাও লাল টকটকে! যাদুকরের চোখ দুটোও যেন তার পোশাকের সংগে খাপ খেয়ে গেছে, লাল গোলাকার দুটি চোখ। মাথার ক্যাপ রয়েছে ক্যাপটার দুপাশ দিয়ে যতটুকু চুল বেরিয়ে আছে তাও লাল দেখা যাচ্ছে। লোকটার শরীরের রঙ তামাটে। দক্ষিণ হাতে একটি কঙ্কালের টুকরা।

যাদুকর এবার কঙ্কালের টুকরাখানা নিয়ে উঁচু করে ধরলো। একবার টেবিলে কাপড় ঢাকা জিনিসটার ওপর বুলিয়ে নিয়ে বললো—এই কাপড়ের নিচে কি আছে আপনারা কেউ জানেন না। আমি কাপড়টা তুলে ফেলছি দেখুন–

কাপড়টা তুলে ফেললো, সবাই দেখলো একটি বালিকা মৃতের ন্যায় টেবিলে শায়িত। বালিকা নিদ্রিত না জাগরিত ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

দর্শকগণ সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সেইদিকে। যাদুকর নিদ্রিত বালিকাটিকে পুনরায় কাপড়চাপা দিলো। এবার যাদুকর হাড়খানা নিয়ে একবার কাপড়-ঢাকা বালিকার দেহের ওপর বুলিয়ে নিলো, তারপর কাপড়খানা তুলে ফেললো, আশ্চর্য হয়ে সবাই দেখলো-টেবিল শূন্য-একটি লম্বা বলিশ পড়ে রয়েছে টেবিলটার ওপরে। যাদুকর এবার বালিশটা ঢেকে নিয়ে হাড়খানা বুলিয়ে বললো —আপনারা বালিশটাকে কিসের আকারে দেখতে চান?

একজন দর্শক বলে উঠলো—কুকুরের আকারে।

অন্য সকলেই বললো-হাঁ, আমরা সবাই একমত।

যাদুকর হাসলো, তারপর কাপড় ঢাকা বালিশটার ওপরে হাড়-খানা বুলিয়ে বিড় বিড় করে কি যেন মন্ত্র পাঠ করলো। তারপর তুলে ফেললো কাপড়খানা!

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময় সবাই স্তব্ধ দৃষ্টি মেলে দেখলো টেবিলে শুয়ে রয়েছে একটি কুকুর। কাপড়খানা তুলে ফেলতেই কুকুরটা ঝাপটা দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

দর্শকের করতালিতে ভরে উঠলো হলঘর।

আরও বিস্ময়কর অনেক খেলা দেখালো যাদুকর হরশঙ্কর।

হলঘর স্তব্ধ।

দর্শকগণ নির্বাক নয়নে খেলা দেখছিলো, এমন খেলা তারা কোনোদিন দেখেনি।

মনিরা ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলো—সেই শিশু বাঘের সঙ্গে লড়াইর দৃশ্যটা দেখবার জন্য।

সবশেষ খেলা সেটা।

সমস্ত দর্শক বিপুল আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করছিলো।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে যাদুকর তার বাঁ হাতে সেই কঙ্কালের টুকরাখানা আর দক্ষিণ হাতে একটা চাবুক।

একটা শিস দিলো যাদুকর।

অল্পক্ষণের মধ্যেই একজন বলিষ্ঠ লোক একটা তিন চার বছরের শিশুসহ মঞ্চে উপস্থিত হলো। পেছনে চাকাওয়ালা একটা কাঠের বাক্স টেনে

আনছে আর একজন বলিষ্ঠ লোক।

শিশুটিকে এনে দাঁড় করানো হলো।

দর্শকমন্ডলী একসঙ্গে তাকিয়ে আছে। মনিরা শিশুর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো, বিস্মিত হলো সে। হৃদয়ে একটা আলোড়ন শুরু হলো তার। এ মুখখানা যেন তার কোনো পরিচিত মুখের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এক মাথা সুন্দর কোঁকড়ানো চুল। ছোট্ট দেহ হলেও সুন্দর নধর চেহারা। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ। গভীর নীল দুটি চোখ। মনিরা কেমন যেন আনমনা হয়ে যাচ্ছে। নিজেই সে বুঝতে পারছে না তার এমন লাগছে কেন। অপলক নয়নে তাকিয়ে আছে মনিরা শিশুটির দিকে। অভূতপূর্ব একটা আকর্ষণ মনিরাকে হাতছানি দিচ্ছে। প্রবল বাসনা জাগছে তার মনে। একটি বার ঐ শিশুটিকে বুকে নিতে পারলে তার সমস্ত হৃদয় যেন জুড়িয়ে যেতো। কিন্তু মনিরা ভেবে পায় না কেন তার এমন হচ্ছে। ঐ ক্ষুদ্র মুখখানার সঙ্গে

তার মনিরের মুখের হুবহু মিল সে যেন খুঁজে পাচ্ছে। না না তার ভুল নেই তার স্বামীর মুখখানাই যেন ঐ শিশুর মুখে লুকিয়ে রয়েছে। মনিরার মনে ভীষণ এক অশান্ত আলোড়ন শুরু হলো।

খেলা শুরু হয়ে গেছে।

যাদুকর একপাশে উদ্যত চাবুক হাতে দন্ডায়মান।

বলিষ্ঠ লোকটা চাকাওয়ালা কাঠের বাক্সটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

বাক্সের মধ্যে শিকের ফাঁকে বিরাট বাঘটা হুম হুম করে গর্জন করছে।

দর্শকগণ ভয়ে কম্পিত হলো হঠাৎ বাঘটা যদি তাদের আক্রমণ করে বসে তখন কি হবে! তবু সবাই বুকে সাহস নিয়ে দুচোখে রাজ্যের ব্যাকুল আগ্রহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো, খেলাটা তাদের দেখতেই হবে।

বলিষ্ঠ লোকটা কাঠের বাক্সের দরজা খুলে দিতে গিয়ে শিশুটিকে হাতের ইশারায় ডাকলো।

শিউরে উঠলো মনিরা, এও কি সম্ভব—এইটুকু কচি শিশু একটা বিরাট বাঘের সঙ্গে লড়াই করবেনা না, এ খেলা সে দেখতে পারবে না। কেন যেন তার বড্ড অস্বস্তি লাগছে।

যাদুকর এগিয়ে এলো, সঙ্গে সঙ্গে কাঠের বাক্সটার দরজাটা মুক্ত করে দিয়ে সরে দাঁড়ালো।

মুহূর্তে বাঘটা গর্জন করে বেরিয়ে এলো।

সঙ্গে সঙ্গে শিশু মনি বাঘটার গলা জাপটে ধরে ফেললো, চড়ে বসলো বাঘের পিঠে দুহাতে বাঘটার গলা চেপে ধরে চাপ দিতে শুরু করলো। শুরু হলো বাঘের সংগে শিশুর লড়াই।

যাদুকর মাঝে মাঝে তার চাবুক উঁচু করে সপাং করে একটা শব্দ করেছিলো বাঘটা তখন মাটিতে চীৎ হয়ে পড়ে যাচ্ছিলো শিশু মনি চেপে বসছিলো তার বুকের ওপর। অনেকক্ষণ ধরে শিশু আর বাঘটার লড়াই চললো—হঠাৎ এক

সময় শিশু মনি পড়ে গেলো নীচে, অমনি বাঘটা ঝাপিয়ে পড়লো ওর বুকের ওপর।

দর্শকমন্ডলী হা, হা করে উঠলো–যারা এতক্ষণ স্তব্ধ নিঃশ্বাসে শিশু আর বাঘের খেলা দেখে হতবাক–অবাক হচ্ছিলো তারা আর্তনাদ করে উঠলো এবার।

সঙ্গে সঙ্গে মনিরা দুহাতে চোখ ঢেকে ফেললো।

তারপর আর কিছু মনে নেই মনিরার।

যখন মনিরার সংজ্ঞা ফিরে এলো, তখন সে দেখলো তার নিজের কক্ষে বিছানায় সে শুয়ে আছে। শিয়রে বসে রয়েছেন মরিয়ম বেগম দুচোখে তার রাজ্যের আকুলতা আর উদ্বিগ্নতা। একপাশে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ সরকার সাহেব ও নকীব। পাশে একটা চেয়ারে বসে ডাক্তার।

মনিরা চোখ মেলেই বলে উঠলো—মামীমা!

বলো মা?

আমার নূর কেমন আছে?

নূর! নূর কোথায়?

মনিরা তার হারিয়ে যাওয়া শিশু নূরের সম্বন্ধে মরিয়ম বেগমের নিকটে অনেক কথাই বলেছিলো। নূর কেমন আছে বলতেই মরিয়ম বেগম বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন—কোথায়, কোথায় তোমার নূর মনিরা?

মনিরা চারদিকে তাকিয়ে দেখে বললো—ঐ যে বাঘের সঙ্গে লড়াই করছিলো!

সে তো যাদুকরের ছেলে।

না, আমার নূর ছাড়া সে অন্য কেউ নয়! মামীমা, তুমি দেখোনি সেই মুখ সেই চোখ দক্ষিণ বাজুতে সেই অদ্ভুত চিহ্ন—মামীমা, আমার নূর ছাড়া সে অন্য কেউ নয়। বলো বলো মামীমা সে বেঁচে আছে-বাঘটা তাকে মেরে ফেলেনি তো?

নারে না, তুই অমন হয়ে পড়লি—তোকে নিয়েই আমরা অস্থির হয়ে পড়লাম- ওদিকে দেখবার সময় ছিলো না।

তাহলে তোমরা জানো আমার নূরের কি হলো?

ডাক্তার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আপনি চুপ করে থাকুন। এখন বেশী কথা বললে খারাপ হবে।

না, আমি চুপ করে থাকতে পারবো না, আগে বলুন আমার নূর কেমন আছে?

কোথায় আপনার নূর? সে তো যাদুকরের ছেলে।

না, সে আমার নূর। কি করে বুঝলেন সে আপনার নূর?

আমি চিনবো না, আমার নূরকে চিনবো না সেই মুখ সেই চোখ, দক্ষিণ বাজুতে সেই চিহ্ন-আমার নূর ছাড়া ও আর কেউ নয়।

ডাক্তার এবারও বললেন–হুঁ, সে সুস্থ আছে।

সত্যি বলছেন?

হাঁ।

সেদিনের পর থেকে মনিরা কেমন যেন আনমনা হয়ে পড়লো, সব সময় যাদুকরের যাদুখেলা দেখতে যাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

কিন্তু মরিয়ম বেগম কিছুতেই তাকে যাদুখেলা দেখতে যাবার অনুমতি দিলেন না। মরিয়ম বেগমের বিশ্বাসমনিরা তার নিজের সন্তানের মত চেহারার ছেলেকে দেখে অমন আত্মহারা হয়ে পড়েছে! আসলে ওর ছেলে কোথায় হারিয়ে গেছে, এতটুকু ছেলে বেঁচে আছে না মরে গেছে তাই বা কে জানে। মনিরার এই ব্যথা করুণ ভাব মরিয়ম বেগমকেও বেশ চঞ্চল করে তুললো। মরিয়ম বেগম মনিরাকে যতই সাবধানে রাখুন না কেন একদিন সকলের অলক্ষ্যে মনিরা একটা টেক্সি ডেকে বেরিয়ে পড়লো।

খেলা শুরু হবার পূর্বে স্বপ্নরাগ হলের সামনে অসংখ্য ভীড় জমে উঠেছে। রাস্তার অগণিত গাড়ী সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। শহরের সেরা লোকজনও বাদ

যায়নি হরশংকরের যাদু খেলা দেখা থেকে।

মনিরার গাড়ী এসে থামলো স্বপ্নরাগ হলের সামনে, গাড়ীর ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে পড়লো মনিরা। জনস্রোতের মধ্যে মিশে গেলো সে।

অতি সন্তর্পণে আত্মগোপন করে হরশংকরের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করলো মনিরা। হরশংকর তখন মঞ্চে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। অদূরে একটা শয্যায় শায়িত শিশু মনি একটা কিছু নিয়ে খেলা করছে সে। মনিরা লুকিয়ে পড়লো এক পাশের একটা খামের আড়ালে। হরশংকর এবার বেরিয়ে গেলো, যাবার সময় শিশু মনিকে লক্ষ্য করে বললো সেমানু, ঘুমাবে না খবরদার।

মনি ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো—না, আমি ঘুমাবো না।

হরশংকর বেরিয়ে গেলো।

শিশু মনি শয্যায় বসে হাই তুলতে লাগলো—দ্বিপ্রহরে একটা শো হয়ে গেছে। মনি ক্লান্ত হয়েছে–এলিয়ে পড়ছে তার ছোট্ট শরীরটা। কিন্তু হরশংকরের ভয়ে সে ঘুমাতে পারছে না। ছোট মনি কতক্ষণ নিদ্রাহীন। থাকতে পারে কতক্ষণই বা হরশংকরের চাবুকের কথা তার স্মরণ থাকে একসময় হাতের খেলনাটা খসে পড়লো একপাশে, মনি এলিয়ে পড়লো বিছানায়।

ওদিকে হরশঙ্করের যাদুখেলায় মুগ্ধ দর্শকবৃন্দের করতালিতে হলঘর মুখরিত।

এদিকে বিশ্রামকক্ষ থেকে হরশঙ্করের সাথীগণ সবাই ওদিকে চলে গেছে, একা মনি শয্যায় কাৎ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

মনিরা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছিলো এই মুহূর্তটির। এবার সে অতি লঘু পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে মনির শয্যার পাশে দাঁড়ালো ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলো মুনির মুখখানা। তারপর অতি সন্তর্পণে মনির দক্ষিণ হাতখানা উঁচু করে ধরলো চোখের সামনে এই তো সেই স্মরণীয় চিহ্ন যা আজও তার মনের পাতায় গভীরভাবে আঁকা হয়ে রয়েছে। মনিরা অতি ধীরে ধীরে মনির হাতখানা নামিয়ে রাখলো। পেয়েছে সে তার বহু দিনের হারানো রত্নকে। মনিরা কিছুতেই নিজকে সংযত রাখতে পারলো নালঘু হস্তে বুকে তুলে নিলো মনিকে।

কদিন অবিরত খেলা দেখিয়ে মনির শিশু দেহ ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলো, মনিরার কোমল হস্তের পরশে তার ঘুম ভাঙলো না।

মনিরা শিশু মনিকে বুকে তুলে নিতেই দরজার বাইরে কারও পদশব্দ শোনা গেলো।

মনিরা এই মুহূর্তে সম্বিৎ হারালো না, সে দ্রুত এবং অতি সন্তর্পণে দরজার একপাশে আত্মগোপন করলো।

একজন বলিষ্ঠ লোক প্রবেশ করলো সেই কক্ষে।

শিউরে উঠলো মনিরা এই মুহূর্তে যদি লোকটা তার অবস্থিতি জান? পারে তাহলে আর রক্ষা নেই নূরকেও হারাবে, নিজেও বিপদে পড়বে। মনিরা খোদার নাম স্মরণ করতে লাগলো।

লোকটা যেমনি ওপাশে মনির বিছানার দিকে এগিয়ে গেছে ঠিক সেই সময় মনিরা দরজার পাশ থেকে বেরিয়ে গেলো বাইরে। তারপর অতি আলগোছে আত্মগোপন করে একটা গাড়ীর পাশে এসে দাঁড়ালো। চারদিকে নজর বুলিয়ে নিয়ে ড্রাইভারকে বললো—ভাড়া যাবে?

ড্রাইভার বললো–হাঁ মাজী। আপ যাওগী?

হাঁ চলো। মনিরা শিশু মনিকে নিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলো।

ড্রাইভার স্টার্ট দিলো গাড়ীতে। গাড়ী এবার উল্কাবেগে ছুটতে লাগলো।

ঘুম ভেঙে গেলো মনির গাড়ীর ভেতরে অন্ধকার থাকায় সে কিছুই দেখতে না পেলেও অবাক হলো বললো—আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?

মনিরা বললো–বাড়ীতে।

তুমি কে? কচি মনি স্পষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করে বসলো।

আমি-আমি তোর মা!

না, আমার মা তুমি নও। তুমি কে আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?

গিয়ে দেখো বাবা।

এদিকে যখন মনিকে নিয়ে মনিরা গাড়ীতে ছুটে চলেছে, তখন স্বপ্নরাগ থিয়েটার হলের হরশঙ্করের বিশ্রামকক্ষে হুলস্থুল পড়ে গেছে। তাদের খেলার শিরোমণি মানু নেই।

হরশঙ্কর মনির নাম রেখেছিলো মানু।

মানুর অন্তর্ধানে হইহুল্লোড় পড়ে গেলো, হরশঙ্কর রাগে বোমার মত ফেটে পড়লো। তাজ্জব ব্যাপার—এত সতর্কতার মধ্যেও কি করে মানু হারালো! কোথায় গেলো, কে তাকে নিয়ে গেলো?

সেদিন আর তেমন করে খেলা জমলো না।

ওদিকে মনিকে নিয়ে মনিরার গাড়ী চৌধুরী বাড়ীর গাড়ী বারান্দায় পৌঁছতেই শশব্যস্তে ছুটে এলেন সরকার সাহেব ও নকীব।

মনিরা ততক্ষণে মনিকে কোলে করে গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে দশ টাকার কয়েকটা নোট ড্রাইভারের হাতে গুঁজে দিয়ে দ্রুত অন্তপুরে প্রবেশ করলো।

সরকার সাহেব ও নকীব হতবাক হয়ে অনুসরণ করলো তাকে। সরকার সাহেব শিশুটিকে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন, এই শিশুই কাল রাতে তাদের সকলের সামনে একটা বিরাট বাঘের সঙ্গে লড়াই করেছিলো।

আগে আগে চলেছে মনিরা কোলে তার শিশু মনি।

পেছনে বিস্ময়ভরা চোখে এগুচ্ছে সরকার সাহেব ও নকীব।

মনিরা ছুটে এলো মামীমার কক্ষে—মামীমা, দেখো দেখো কে এসেছে!

মনিরার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েই মরিয়ম বেগম ব্যস্তভাবে এগিয়ে এলেন। মনিরার দিকে তাকিয়ে তার কোলে গত রাতের সেই শিশুটিকে দেখতে পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই বললেন-—একে তুই কোথায় পেলি মনিরা?

মামীমা, এ যে আমার নূর। একে তুমি চিনতে পারছো না?

পাগলী মেয়ে, তোর নূরকে হারিয়েছিস ছোট এক বছরের শিশু আর একে তুই চিনলি কি করে?

এই দেখো–মামীমা, মনির কচি হাতখানা তুলে ধরলো। এই সেই চিহ্ন যা আজও আমি ভুলতে পারিনি।

মরিয়ম বেগমের চোখের সামনে আর একটি কচি বাহু ভেসে উঠলো। আতুর ঘরে তার নিজের সন্তান মনিরের বাহুখানা। দাইমা নবজাত শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে বলেছিলো—বেগম সাহেবা, আপনার ভাগ্য অতি প্রসন্ন। রাজটিকা নিয়ে রাজকুমার এসেছে আপনার ঘরে। এ মস্ত একজন হবে —মরিয়ম বেগম আজ সেই কথা স্মরণ করেন। এ যে তার দক্ষিণ বাহুর সংকেত চিহ্ন–তবে কি, তবে কি এটাই তার বংশের প্রতীক তার মনিরের সন্তান, মরিয়ম বেগম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলেন ওকে। হঠাৎ মরিয়ম বেগম অস্ফুট ধ্বনি, করে উঠলেন- মনিরা তোর হারানো ধন ফিরে পেয়েছিস সেই মুখ, সেই চোখ, সেই নাক, আমার মনিরের সব চেহারাই পেয়েছে–

শিশু মনি এসব দেখে হাবা বনে গেছে। অবাক হয়ে দেখছে এসব। ছোট্ট হলেও তার মন বা হৃদয় বলে তো একটা জিনিস আছে। শিশুকাল থেকে সে বন বাদাড়েই মানুষ হয়েছে সভ্য সমাজে মিশবার তেমন সুযোগ হয়নি এখনও। চৌধুরীবাড়ীর সাজসজ্জা, বিরাট বাড়ী নানা রকমের আসবাবপত্র আলোর ঝড় কত রকমের কারুকার্যখচিত ফুলদানি এসব শিশু মনির চোখে রাজ্যের বিস্ময় জাগালো। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে সব দেখতে লাগলো।

মনিরা মনিকে পেয়ে আকাশের চাঁদ যেন হাতে পেলো। সর্ব প্রথম মনিকে নিয়ে ছুটে গেলো মনিরা বনহুরের ছোট বেলার ফটোখানার পাশে। মনিকে দাঁড় করিয়ে বার বার তাকিয়ে দেখতে লাগলো বনহুরের ছোটবে–চেহারাখানা আর শিশু মনিকে। ডাকলো মামীমা, দেখে যাও। দেখে যা এসে, দেখে যাও এসে।

মরিয়ম বেগম এলেন, সন্তানের ছবির পাশে মনিকে দেখে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তারপর জড়িয়ে ধরলেন মনিকে বুকের মধ্যে–দাদু! ওরে আমার নয়নের মনি, হৃদয়ের ধন–মরিয়ম বেগমের চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুবিন্দু।

মনিরার চোখও শুষ্ক ছিলো না, স্বামীর কথা স্মরণ করে বুকটা তার ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছিলো।

যাদুকর হরশংকর, তার অমূল্য রত্ন মনিকে হারিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। যাদুর খেলা বন্ধ করে দিয়ে শহরময় চষে বেড়াতে লাগলো কোথায় তার মানু।

কখনও সাপুড়ের বেশে, কখনও বানর খেলোয়াড়ের ছদ্মবেশে, কখনও বা ভিখারীর বেশে হরশঙ্কর শহরের আনাচে কানাচে প্রতিটি বাড়ীতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কখনও বা নানা রকমের খেলনা নিয়ে বিক্রি করতো শহরের পথে পথে।

হরশংকরের চাতুরি মনিরার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে পরাজিত হলো। কত সাধনা আর আরাধনার পর মনিরা তার নূরকে ফিরে পেয়েছে। এক মুহূর্ত মনিরা তার সন্তানকে নিজের কাছছাড়া করতো না। মনিরা জানতো, যাদুকর নূরকে হারিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন ও উন্মত্ত হয়ে পড়বে কারণ তার সেরা খেলাটাই সে নূরকে দিয়ে দেখাতো। তাই নূর ওর অমূল্য সম্পদ। নিশ্চয়ই যাদুকর নূরের সন্ধানে শহরটাকে তন্ন তন্ন করে চষে ফেলবে। তাই মনিরা যতদূর সম্ভব নূরকে সাবধানে রাখতে চেষ্টা করতো।

মনিরা যখন সন্তানকে নূর বলে ডাকলো তখন সে কোনো জবাব দিলো না, মনিরা তাই ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলো বাবা তোমাকে কি বলে ডাকতো ওরা?

কচি মুখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কন্ঠে জবাব দিয়েছিলো সে—মাম্মা আমাকে মনি বলে ডাকতো।

আর যাদুকর?

ঐ দাদা? যাদুকরকে নূর দাদা বলে ডাকাতো।

হ্যাঁ, দাদা তোমায় কি বলে ডাকাতো?

দাদা ডাকতো মানু বলে।

মনিরা ওকে বুকে চেপে ধরে বললো তুমি আমার নূর। আমি তোমার নাম রেখেছিলাম নূর!

মাথা কাৎ করে বললো নূর–আচ্ছা।

অনেক সন্ধান করেও হরশংকর আর মানুকে খুঁজে পেলো না। শহরের নানা জায়গায় খুঁজে খুঁজে হয়রাণ পেরেশান হয়ে গেলো সে।

প্রায় এক সপ্তাহকাল কান্দাই শহর চষে ফিরে ক্লান্ত অবসন্ন হরশংকর, একদিন ফিরে চললো নিজের দেশে, যেখানে নূরী অহরহ চোখের পানিতে বুক ভাসাচ্ছে সেই গহন বনে।

হরশংকরকে দেখে ছুটে এলো নূরী-অনি, আমার মনিকে আমায় ফিরিয়ে দাও। আমি ওকে না দেখলে মরে যাবো যে!

হরশংকর অন্যদিন হলে অট্টহাসি হেসে উঠতো। আজ যেন সে হাসতে পারলো না, কেমন গম্ভীর মুখে বসে রইলো নিশ্চুপ হয়ে।

এরপর হরংশংকর নূরীকে নিয়ে বের হবে মনস্থ করলো। এবার যাদুর খেলা স্থগিত রেখে চলবে নাচ-গান এতেই মোটা পয়সা উপার্জন হবে তার। আর দূরদেশে নয়, নিজ দেশের মধ্যেই চালাবে সে তার ব্যবসা।

১৫.

পুলিশ অফিস।

জন গাড়ী রেখে নেমে পড়লো। পুলিশ অফিসে প্রবেশ করতেই মিঃ লাহিড়ী এবং মিঃ রায় তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। অসময়ে জনকে পুলিশ অফিসে দেখে মিঃ লাহিড়ী কিছুমাত্র অবাক হলেন না, কারণ জন এমন আচম্বিতে আরও অনেক দিন পুলিশ অফিসে এসে হাজির হয়েছে। এটা যেন তার স্বভাব আর কি!

আজও মিঃ রায় এবং মিঃ লাহিড়ী কিছুমাত্র অবাক না হয়ে তাকে বসতে অনুরোধ জানালেন।

জন আসন গ্রহণ করেই বললো–এক্ষুণি আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে মিঃ লাহিড়ী।

কোথায়? জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ লাহিড়ী।

পরে সব জানতে পারবেন। আপনার সঙ্গে মিঃ রায় ও কয়েক জন পুলিশ থাকবে।

মিঃ লাহিড়ী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আপনার হেঁয়ালিভরা কথা অটে কিছু বুঝতে পারছি না মিঃ জন।

একটু হেসে বললো জনমালতী হত্যারহস্য আজ উদ্ঘাটন করতে চাই মিঃ লাহিড়ী। আজ আপনি খুনীকে গ্রেপ্তারে সক্ষম হবেন।

হোয়াট?

ইয়েস, ইন্সপেক্টার! আপনি বিলম্ব না করে এই মুহূর্তে তৈরী হয়ে নিন।

মিঃ লাহিড়ী মিঃ রায়ের দিকে লক্ষ্য করে বললেন—কয়েকজন পুলিশসহ তৈরী হয়ে নিন মিঃ রায়, মিঃ জনের সঙ্গে বেরুবো।

জন নিজেই ড্রাইভ করে চললো তার গাড়ীখানা। জনের গাড়ীতে মিঃ লাহিড়ী আর মিঃ রায়। পেছনে একটি পুলিশ ভ্যান—কয়েকজন পুলিশ রয়েছে তাতে!

শহরের বড় রাস্তা ধরে গাড়ীখানা উল্কাবেগে ছুটে চললো।

রাত প্রায় বারোটা হবে!

পথের জনতা অনেক কমে এসেছে।

দোকানপাট কতকগুলো বন্ধ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

একটা স্বর্ণকারের দোকানের অদুরে এসে জন গাড়ী থামিয়ে ফেললো।

পূর্বেই বলা ছিলো জনের গাড়ীর প্রায় বিশ গজ দূরে পুলিশ ভ্যান থামাবে ঠিক তাই থেমে পড়লো।

জন মিঃ লাহিড়ীকে লক্ষ্য করে বললো—আপনারা বাইরে অপেক্ষা করুন আমি স্বর্ণকারের দোকানে প্রবেশ করবো। খুনী এই দোকানে অপেক্ষা করছে।

মিঃ লাহিড়ী বললেন খুনীর উপযুক্ত প্রমাণ না পেলে আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে মিঃ জন।

নিশ্চয়ই দেবো মিঃ লাহিড়ী। কথা শেষ করে জন স্বর্ণকারের দোকানে। প্রবেশ করলো।

মিঃ লাহিড়ী এবং মিঃ রায় ওদিকের জানালার শার্শির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেখান থেকে কক্ষের ভেতর পরিস্কার সব দেখা যাচ্ছিলো। মিঃ লাহিড়ী চমকে উঠলেন, স্বর্ণকারের দোকানে মিঃ বাসুদেব শর্মা।

এত রাতে নিহত মালতীর পিতা বাসুদেব স্বর্ণকারের দোকানে কি করছে? ভাল করে লক্ষ্য করতেই বিস্ময় জাগলো মিঃ লাহিড়ী এবং মিঃ রায়ের মনে।

বাসুদেব কোনো একটা জিনিস স্বর্ণকারের হাতে দিতে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে জন সেখানে উপস্থিত হলো।

বাসুদেব জনকে লক্ষ্য করতেই জিনিসটা লুকিয়ে ফেললেন জামার পকেটে। কিন্তু জন সেটা দেখে ফেললো।

বাসুদেব জনকে দেখেই উঠতে যাচ্ছিলো।

জন রিভলবার উদ্যত করে ধরলো–খবরদার পালাতে চেষ্টা করবেনা।

বাসুদেব বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখে পুনরায় বসে পড়লেন।

জন উচ্চকণ্ঠে ডাকলো—ইন্সপেক্টার!

মিঃ লাহিড়ী এবং মিঃ রায় কক্ষে প্রবেশ করলেন।

স্বর্ণকার ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগলেন।

বাসুদেব বললেন–আমাকে এভাবে জব্দ করছো কেন জন?

জব্দ নয় মিঃ শর্মা, আপনাকে সম্মান দেখাতে এসেছি। প্রথমে জবাব দিন-এত রাতে এখানে কেন, কি কারণে এসেছেন?

বাসুদেব ঢোক গিলে জবাব দিলেন——আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার তোমাকে জানাতে রাজী নই।

ঠিক সেই মুহূর্তে ওদিক থেকে কাফ্রি লোকটা সরে পড়তে যাচ্ছিলো, জন ইংগিত করলো মিঃ রায়কে-ওকে লক্ষ রাখবেন যেন না পালায়।

মিঃ রায় মুহূর্তে সজাগ হয়ে দাঁড়ালেন, তার হাতেও পিস্তল ছিলো।

কাফ্রি চাকরটা কাঁচুমাচু মুখে বসে পড়লো বেঞ্চের ওপরে।

মিঃ লাহিড়ী অবাক হয়েছেন বাসুদেব মালতীর পিতাতাকে এরকম অপদস্ত করার কি মানে হয়ই তিনি যেন কিছু বুঝতে পারছেনা গম্ভীর মুখে তিনি দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করতে লাগলেন।

মিঃ শর্মা ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও পুলিশের কাছে আপনাকে তা জবাব দিহি করতে হবে।

মিঃ লাহিড়ী বললেন—হাঁ, আপনাকে যখন যা জিজ্ঞাসা করা হবে সঠিক জবাব দেবেন আশা করি।

নিশ্চয়ই দেবো ইন্সপেক্টার।

জন দৃঢ়কণ্ঠে বললো—মালতীর হত্যাকারী স্বয়ং বাসুদেব।

বাসুদেব বিবর্ণ মুখে কম্পিত কণ্ঠে বললেন—মিথ্যা কথা!

জন বলে উঠলো–সম্পূর্ণ সত্য, আপনিই তাকে হত্যা করেছেন মিঃ শর্মা।

মিঃ লাহিড়ী বললেন—তার প্রমাণ?

প্রমাণ আছে মিঃ লাহিড়ী। তার পূর্বে আমি জানাতে চাই–মিস মালতী বাসুদেবের কন্যা নয়। বললো জন।

বাসুদেব ফেটে পড়লেনমালতী আমার কন্যা এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

মিঃ শর্মা, আপনার ঐ কাফ্রি চাকর বারো বছর আগে পাঁচ বছরের এত শিশুকন্যাকে চুরি করে এনে দেয়নি?

মিথ্যা—সব মিথ্যা! বাসুদেব যেন ফেটে পড়লেন।

জন এক টানে কাফ্রি চাকরটাকে সরিয়ে এনে তার বুকে রিভলবার চেপে ধরলো—বলো, মিস মালতী কার মেয়ে?

কাফ্রি চাকর একবার বাসুদেবের মুখে তাকিয়ে পুনরায় ফিরে তাকায় নিজের বুকে ঠেকানো রিভলবারের ডগায়।

জন বললোসঠিক জবাব না দিলে এই মুহূর্তে তোমাকে হত্যা করবো।

কাফ্রি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো কিছু বলতে গেলো, কিন্তু বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল সে।

মিঃ লাহিড়ী জনের এই আচরণে খুশী হতে পারছিলো না। কিন্তু নিশ্চুপ হয়ে দেখা ছাড়া উপায়ও ছিলো না কিছু বলার।

জন বললোআর দুমিনিট সময় দিলাম।

কাফ্রি এবার বলে উঠলো—হাঁ, আমি বারো বছর আগে মালতীকে চুরি করে এনেছিলাম।

কার মেয়ে সে? বললা, নচেৎ–

এক পুলিশ ইন্সপেক্টারের মেয়ে, ওর বাবার নাম যতীন্দ্র মোহন রায়।

আচম্বিতে বৃদ্ধ মিঃ রায় প্রতিধ্বনি করে উঠলো—যতীন্দ্র মোহন রায়ের কন্যা মালতী? বারো বছর আগে আমার প্রথমা কন্যা মাধুরী পাঁচ বছরের শিশু বাইরের বারান্দা থেকে হারিয়ে গিয়েছিলো সেই কামান্না শহর থেকে,

কাফ্রি বলে উঠলোহা বাবু, ওকে আমি কামান্না শহর থেকেই চুরি করে এনেছিলাম।

মিঃ রায় ছুটে এসে কাফ্রির গলাটিপে ধরলেন–ওরে শয়তান, নর পিচাশ…তুই আমার মাধুরীকে…।

জন মিঃ রায়কে ছাড়িয়ে দিয়ে বললেন—যা হবার হয়ে গেছে মিঃ রায়, এখন পূর্বের সেই শোক বিস্মৃত হয়ে নতুনভাবে এর বিচার করুন। এবার আপনারা স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, মিস মালতী বাসুদেবের কন্যা নয়।

বাসুদেব নতমুখে বসে রইলেন।

মিঃ লাহিড়ীর চোখ দুটি তীব্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, বললেন—আশ্চর্য!

জন এবার বললো—এবার বুঝতে পারছেন? আরও পারবেন একটু পরে।

মিঃ লাহিড়ী পুনরায় বললেন কিন্তু মিস মালতীকে বাসুদেব যে হত্যা করেছে তার প্রমাণ?

প্রমাণ আছে মিঃ লাহিড়ী।

হঠাৎ বাসুদেব বলে উঠেন—তুমি তাকে হত্যা করেছে জন। যে হীরার হার তুমি তাকে দিয়েছিলে সেটা ফিরিয়ে নেবার জন্যই তুমি তাকে হত্যা করেছো এবং হার নিয়ে গেছো।

মিস মালতীকে যে হত্যা করেছে, সেই হার তার নিকটেই আছে একথা সত্য।

বাসুদেব কেমন যেন শিউরে উঠলেন। একটু নড়েচড়ে বসলেন তিনি।

মিঃ রায় বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়েছিলেন, বার বার ঐ কাফ্রি চাকরটার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকাচ্ছিলেন—এই মুহূর্তে কেউ বাধা না দিলে ওকে তিনি গলা টিপে হত্যা করতেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আজ সেই বারো বছর আগে হারিয়ে যাওয়া পাঁচ বছরের একটি শিশুকন্যার মুখ বার বার ভেসে উঠছিলো তাঁর চোখের সামনে। মিঃ রায় দাঁতে অধর দংশন করছিলেন।

জন এবার বাসুদেবকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলো এবং পর মুহূর্তেই তার পকেটে হাত দিয়ে একছড়া হীরার হার বের করে আনলো। এতোদ্রুত হস্তে এ কাজ করলো জন অবাক হলেন মিঃ লাহিড়ী।

জনের চোখে আজও সেই কালো চশমা রয়েছে, যা সে কোনো সময়ের জন্যও চোখ থেকে খোলে না।

জন সেই হারছড়া হাতে নিয়ে উঁচু করে ধরলো—এই হার ছাড়াই মালতীর মৃত্যুর কারণ।

অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন মিঃ লাহিড়ী-বাসুদেব তাহলে….

হাঁ, বাসুদেবই মালতীর হত্যাকারী।

মিথ্যা কথা। মালতী আমার কন্যা না হলেও তাকে আমি কন্যার মতই স্নেহ করতাম। কথা কয়টি বললেন বাসুদেব।

জন বললো—মালতীর মৃত্যুর পূর্বেও এ হার তার কণ্ঠে ছিলো। মিঃ লাহিড়ী, নিহত মালতীর কণ্ঠে যে আঁচড়ের দাগ পাওয়া গেছে তা এই ছিন্ন হারের।

বাসুদেব আবার বললেন, এ হার মৃত্যুকালে মালতীর কণ্ঠে ছিলো, এটা সে মৃত্যুর কদিন আগে আমাকে রাখতে দিয়েছিলো।

না, এ হার মালতীর মৃত্যুর পূর্বেও তার কণ্ঠে ছিলো এবং এই হারের জন্যই তাকে হত্যা করা হয়েছে। জন হারছড়া স্বর্ণকারের হাতে দিয়ে বললো—দেখুন তো এটা নিখুঁত আছে কিনা?

স্বর্ণকার হারছড়া পরীক্ষা করে বললোনা, এটা নিখুঁত নেই। এট, থেকে একটি হীরা নেয়া হয়েছে।

বাসুদেব ফ্যাকাশে মুখে কিছু বলতে গেলো কিন্তু পারলো না।

হারখানা যখন মালতীর কণ্ঠ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় তখন মালতী নিজের দক্ষিণ হাত দিয়ে হারছড়া চেপে ধরেছিলো, তবু সেটা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিলো এবং হারের একটি পাথরসহ খানিকটা চেন মালতীর হাতের মুঠায় আবদ্ধ হয়ে রয়েছিলো।

মিঃ লাহিড়ী বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন—কিন্তু কই, মৃত মালতীর হাতের মুঠোয় কোনো পাথর খন্ড বা কোনো চেন পাওয়া যায়নি তো?

আপনারা সেখানে পৌঁছবার পূর্বেই এক ব্যক্তি সেখানে পৌঁছেছিলো এবং মিস মালতীর হাতের মুঠা থেকে সে ঐ পাথরটা সরিয়ে নিয়েছিলো!

বাসুদেব এবার রাগতকণ্ঠে বললেন—মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। মৃত মালতীর হাতে কোনো হীরক হারের অংশ ছিলো না ইন্সপেক্টার।

মিঃ লাহিড়ী বললেন—এ কথা আপনি কি করে জানলেন মিঃ জন?

আমি সেই ব্যক্তি। এই দেখুন মিঃ লাহিড়ী…মিঃ জন পকেট থেকে একটি হীরা ও কিছুটা চেন বের করে বললো—এটাই ছিলো মিস মালতীর হাতের মুঠোয়।

মুহূর্তে বাসুদেবের মুখমন্ডল অমাবস্যার অন্ধকারের মত হয়ে উঠলো।

জন বলে চলেছে—হীরার হারখানা সম্পূর্ণ নিতে পারেনি খুনী, একখানা হীরা মালতী আঁকড়ে ধরে রেখেছিলো। আর হাঁ, মালতী শেষ পর্যন্ত খুনীকে চিনতে পেরেছিলো এবং সেই কারণেই খুনী তাকে হত্যা করেছে। সেই খুনী

অন্য কেউ নয়, মালতীর পিতার রুপধারী বাসুদেব শর্মা।

মিঃ জনের কথা শেষ হতে না হতে মিঃ লাহিড়ী পকেট থেকে বাঁশী বের করে ফুদিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন পুলিশ কক্ষে প্রবেশ করলো। মিঃ লাহিড়ী বললেনবাসুদেবকে গ্রেপ্তার করো!

সঙ্গে সঙ্গে বাসুদেবের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দেওয়া হলো। কাফ্রি চাকরটা সেই সুযোগে পালাতে যাচ্ছিলো, মিঃ রায় তার ওপর বাঘের মত লাফিয়ে পড়লেন, তৎক্ষণাৎ তাকেও এরেষ্ট করা হলো।

মিঃ লাহিড়ী এবার বললেন মিঃ জন, আপনি সেদিন ওখানে যাবার কারণ কি?

আমি মালতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার একটু পূর্বেই তাকে হত্যা করা হয়েছিলো। আমি জানতাম সেই মুহূর্তে সত্যি কথা বললেও আপনারা কেউ আমাকে বিশ্বাস করতে পারতেন না বরং উল্টো আমাকে গ্রেপ্তার করে আটকে রাখতেন। তাই আমি হীরার হারটি মৃত মালতীর হাতের মুঠো থেকে খুলে নিয়ে আত্মগোপন করেছিলাম এবং শপথ শ্রহণ করেছিলাম মালতীর হত্যাকারীকে খুজে বের করবো। হত্যাকারীকে আবিষ্কার করতে গিয়ে আপনাদের

অনেক সময় অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে পঁড়িয়েছি, আমাকেও আপনারা খুনী বলে সন্দেহ করেছেন তাতেও আমি কিছুমাত্র উদগ্রীব বা বিচলিত হইনি।

মিঃ লাহিড়ী লজ্জিত কণ্ঠে বললেন–আপনার অনুমান সত্য মিঃ জন, আমি সন্দেহপরবশ হয়ে বহু সময় আপনাকে অনুসরণ করেছি।

জন বললো—মিঃ লাহিড়ী, অরুণ বাবু সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাকে অযথা বন্দী করে রেখেছেন। সে মালতী হত্যা ব্যাপারে ঘাবড়ে গিয়ে ভয় পেয়ে রাতের অন্ধকারে নিজের ছোরাখানাকেই গোপনে পুকুরের পানিতে নিক্ষেপ করতে গিয়েছিলো। আসলে সে মালতীকে সত্যই গভীরভাবে ভালবাসতো।

হাঁ, এবার তাকে মুক্তি দেবো মিঃ জন।

মিঃ লাহিড়ী স্বর্ণকারকে গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছিলেন, জন বললো-ওকে এরেষ্ট করবার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ স্বর্ণকার সম্পূর্ণ নির্দোষ। এবং সে আমাকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। স্বর্ণকারের সাহায্য ছাড়া আমি হয়তো এতো শীঘ্র এই খুনের সমাপ্তি বা রহস্য উদঘাটনে সক্ষম হতাম না। কাজেই স্বর্ণকার মহাশয়কে আমার অশেষ ধন্যবাদ।

স্বর্ণকার এবার হাস্যেজ্জ্বল মুখে বললেন–আপনি ঠিক সময় আমাকে ঐ একটি হীরা আর চেনখন্ড দেখিয়ে ছিলেন বলেই আমি আসল খুনীকে বাকী। চারখানা হীরা সহ আবিষ্কার করতে সক্ষম হই এবং আপনার কথা অনুযায়ী কাজ করি। ওটা আমি কিনবো বলে তাকে কথা দেই এবং আপনাকে সংবাদ দিয়ে জানাই।

মিঃ লাহিড়ী জনের পিঠ চাপড়ে বললেন আপনার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে আমাদের পুলিশ বাহিনীও নতি স্বীকার করলো মিঃ জন।

জন হাসলো। . মিস মালতীর হত্যারহস্য উদঘাটিত হলো।

বাসুদেব শর্মা ও কাফ্রি চাকরটাকে বন্দী করে নিয়ে পুলিশ ভ্যান এগিয়ে চললো।

জন মিঃ লাহিড়ী ও মিঃ রায়কে নিয়ে গাড়ীতে স্টার্ট দিলো।

পুলিশ অফিসে মিঃ লাহিড়ী এবং মিঃ রায়কে পৌঁছে দিয়ে ফিরে চললো জন।

বাড়ী পৌঁছেতেই এ্যানি ছুটে এলো জনের পাশে—হ্যালো ডালিং, কোথায় ছিলে তুমি এ কদিন?

জন চোখের কালো চশমাটা ঠিক করে নিয়ে বললো–মালটে হত্যারহস্য উদঘাটন করলাম।

ডালিং, তুমি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে তো?

হাঁ এ্যানি।

তবে এবার আমাদের আনন্দ করতে কোনো ভয় নেই?

এ্যানি, কিন্তু…কিছু বলতে গিয়ে জন থেমে গেলো।

এ্যানি ততক্ষণে জনের মুখের কাছে ঝুঁকে এসেছে, আবেগভরা কণ্ঠে বললো—ডার্লিং, তুমি কত সুন্দর!

এ্যানি, আমি শীঘ্রই আমাদের বিয়ের দিন ধার্য করে ফেলবো।

সত্যি?

হাঁ এ্যানি।

ডার্লিং—

এ্যানি, আমাকে এক গেলাস ঠান্ডা পানি পান করাতে পারো?

নিশ্চয়ই পারি। তুমি বসো আমি আনছি।

এ্যানি বেরিয়ে যায়।

একটু পরে ফিরে আসে এ্যানি, দক্ষিণ হাতে তার ঠান্ডা পানির গেলাস। কিন্তু জন কই?

এ্যানি ব্যস্তভাবে তাকালো কক্ষের চারদিকে, উচ্চকণ্ঠে ডাকলো জন! জন! জন! তুমি কোথায়? হঠাৎ এ্যানির দৃষ্টি পড়লো সামনের টেবিলে, বিস্মিত হলো সেজনের কালো চশমাটা পড়ে আছে টেবিলের ওপরে।

এ্যানি তুলে নিলো চশমাটা হাতে, পুনরায় উচ্চস্বরে ডাকলো-জন… জন….জন….

এ্যানির কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি জাগালোজন-জন-জন।

০১৪. মায়াচক্র

মায়াচক্র – রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর যুবকের পাশে এসে কাঁধে হাত রাখলো। চমকে ফিরে তাকালো যুবক।

বনহুর শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললো–মিঃ জন, এবার আপনি মুক্ত। যেতে পারেন, বাইরে আপনার গাড়ী অপেক্ষা করছে।

মিঃ জন ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো–তুমি কে? আর কেনই বা আমাকে এভাবে ভূগর্ভে আটকে রেখেছিলে?

মিঃ জন, আপনি বাড়ী ফিরে গিয়ে সব জানতে পারবেন। আসুন, আর বিলম্ব নয়…….

বনহুর আর মিঃ জন পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ীর পাশে এসে দাঁড়ালো। গাড়ীর দরজা খুলে ধরে বললো বনহুর—নিন উঠুন।

মিঃ জন ড্রাইভ আসনে উঠে বসে ষ্টার্ট দিলো।

বনহুর হাত নেড়ে তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো—গুডবাই, গুডবাই….

.

মিঃ লাহিড়ী ও মিঃ রায় পুলিশ অফিসে বসে আজকের ঘটনা নিয়েই আলাপ আলোচনা করছিলেন, এমন সময় টেবিলে ফোনটা ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠলো

—মিঃ লাহিড়ী রিসিভার হাতে উঠিয়ে নিলেন—হ্যালো, স্পিকিং মিঃ লাহিড়ী। আপনি কে কথা বলছেন?

ও পাশ থেকে ভেসে এলো বনহুরের কণ্ঠ—আমি মিঃ জন।

আপনি! ব্যাপার কি?

আমি এবার বিদায় নিচ্ছি বন্ধু।

সেকি? হ্যালো, সেকি কথা বলছেন?

হাঁ, আসলে মিঃ জন আমি নইমিঃ জনের ভূমিকায় আমি অভিনয় করেছি।

আপনি—আপনি এ সব কি বলছেন?

মিঃ লাহিড়ী, আমার নাম জানলে আপনি আমাকে গ্রেপ্তার না করে ছাড়বেন না। আমি যেই হই, আমার উদ্দেশ্য ছিলো মালতীর আসল হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা এবং একমাত্র সেই কারণেই আমি বাধ্য হয়েছিলাম আপনাদের সকলের চোখে ধূলো দিয়ে মিঃ জনের চরিত্র, বেছে নিতে। সে জন্য আমি তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। শুধু তাই নয়, আপনাদের নিকট আমাকে অনেক মিথ্যা বলতে হয়েছে। আসল জন ফিরে এসেছেন, আমি এবার বিদায় নিচ্ছি।

হ্যালো.....হ্যালো, আপনি কে? বলুন আপনি কে? মিঃ লাহিড়ীর মুখমন্ডল উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলো।

অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণ অবাক হতভম্ভ হয়ে মিঃ লাহিড়ীর মুখভাব লক্ষ্য করছিলো। মিঃ রায় বুজতে পারছিলেন, নিশ্চয়ই ওপাশে এমন কোন আলোচনা চলছে যা মিঃ লাহিড়ীকে ভীষণভাবে উত্তেজিত করে তুলছে।

তখনও মিঃ লাহিড়ী বার বার হ্যালো.....হ্যালো করছিলেন।

হঠাৎ তিনি যেন মনোযোগ সহকারে নিশ্চুপ হয়ে পড়লেন, শান্তকণ্ঠে বললেন—আপনার পরিচয় দিন।

ওপাশ থেকে ভেসে এলো সেই অতি পরিচিত কণ্ঠ—আমি দস্যু বনহুর।

মিঃ লাহিড়ীর হাত থেকে রিসিভার খসে পড়লো–আচম্বিতে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন তিনি—দস্যু বনহুর!

মুহূর্তে পুলিশ অফিসার সকলের চোখেমুখে একটা প্রচন্ড ভীতিভাব ছড়িয়ে পড়লো। দূর দেশ হলেও দস্যু বনহুরের নাম তাদের কাছেও অতি পরিচিত। কারণ, দস্যু বনহুর সম্বন্ধে তারা যথেষ্ট অভিজ্ঞ।

মিঃ রায় বলে উঠলেন—মিঃ লাহিড়ী, কে আপনার সঙ্গে কথা বলছিলো?

মিঃ লাহিড়ী তখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছেন, তিনি বললেন-দস্যু বনহুর।

দস্যু বনহুর! এখানেও তার আবির্ভাব ঘটেছে?

হাঁ মিঃ রায়। শুধু ঘটেনি, সে একদিন আমাদের মধ্যেই বিচরণ করছিলো।

বলেন কি?

মিঃ রায়, প্রথমেই আমার সন্দেহ হচ্ছিলোলোকটির আচরণ স্বাভাবিক ছিলো না। যদিও তার গতিবিধি আমার কাছে অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ মনে হচ্ছিলো, তবু আমি তাকে কিছুই করতে বা বলতে পারছিলাম না।

মিঃ রায় বলে উঠেন—কারণ, তার কার্যে দোষণীয় কিছু ধরা পড়েনি কোন সময়।

হাঁ, সে কথা সত্য।

বরং সে আমাদের উপকারই করেছে।

মিঃ লাহিড়ী বললেন——উপকার করলেও সে অপরাধী মিঃ রায়। সে একজন দুর্ধর্ষ দস্যু।

অন্য একজন পুলিশ অফিসার বলে উঠেন-দস্যু বনহুর তাহলে এই মহানগরেও এসে হাজির হয়েছে?

অপর একজন থানা অফিসার বলে উঠলেন দস্যু বনহুর যে এই দেশেও এসে হাজির হবে, এ যেন ধারণার বাইরে।

মিঃ রায় উৎকণ্ঠা ভরা কণ্ঠে বললেন-সত্যি আশ্চর্য।

মিঃ লাহিড়ী ভাবগম্ভীর গলায় বলে উঠলেন-দস্যু বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই মিঃ রায়। তার মত দুর্ধর্ষ দস্যু পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। একটু থেমে বললেন তিনিকান্দাই নগর থেকে মহানগর তো সামান্য। পৃথিবীর যে কোন স্থানে তার আবির্ভাব ঘটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। মিঃ রায়, দস্যু বনহুর শুধু দস্যুই নয়, সে একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি।

হাঁ, এ কথা আমরা অবগত আছি মিঃ লাহিড়ী। সত্যই এই দস্যু অদ্ভুত।

কিন্তু দস্যু মহাপ্রাণ হলেও তাকে আইনের চোখে ক্ষমা করা যায় না। মিঃ রায়, আপনি এখনই তৈরী হয়ে নিন–আমার সঙ্গে বেরুতে হবে।

কোথায় যাবেন?

মিঃ জনের ওখানে। কথা শেষ করেই উঠে পড়েন মিঃ লাহিড়ী।

০২.

মিঃ জনের গাড়ী এসে থামলো গাড়ী-বারান্দায়।

ছুটে এলো এ্যানি গাড়ী দেখতে পেয়ে, উৎফুল্ল কণ্ঠে ডাকলোডার্লিং কোথায় গিয়েছিলে…..কথা শেষ হয় না এ্যানির, বিস্ময় ভরা চোখে থমকে পাড়ায়।

মিঃ জন এ্যানির মুখের দিকে তাকিয়ে উফুল্ল হতে গিয়ে থ মেরে যায়—কারণ, এ্যানি তাকে চিনতে পারছে না। তার মুখে খোঁচা খোঁচা এক মুখ দাড়ি, মাথার চুলগুলো রুক্ষ, দেহটাও কেমন জীর্ণ হয়ে গেছে। মিঃ জন গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়ালো।

এ্যানি পিছিয়ে গেলো কয়েক পা।

মিঃ জন বলে উঠলো—এ্যানি।

কে, কে তুমি? এ্যানির দুচোখে রাজ্যের বিস্ময়।

এ্যানি, আমি জন। আমাকে তুমি চিনতে পারছো না?

না…..জন, জন কই?

এ্যানি, তুমি বিশ্বাস করো আমিই জন।

এ্যানি অপলক নয়নে তাকালো, মুখে চোখে তার গভীর বিস্ময় ফুটে উঠেছে। বললো সে-তুমি জন…..কিন্তু…..

হাঁ, এ্যানি আমিই জন, আর যাকে তুমি এতদিন জন ভেবে এসেছিলে, সে জন নয়।

কে তবে সে?

আমিও জানি না এ্যানি, কে সে? চলো অনেক কথা আছে, সব শুনলে তুমি বুঝতে পারবে।

এ্যানির মন থেকে সন্দেহ দুর হয় না, সে তখনও কেমন একটা ভাব নিয়ে তাকাচ্ছিলো জনের মুখের দিকে।

জন বললো–চলো এ্যানি।

এ্যানি অনুসরণ করলো জনকে।

কক্ষের মধ্যে গিয়ে একটা সোফায় বসে পড়লো জন, বললো—এ্যানি, বসো।

এ্যানি জনের নিকট থেকে বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে একটা সোফায় বসে পড়লো।

জন নিজের খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভরা চিবুকে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললো —এখনও তুমি আমাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছোনা এ্যানি?

এ্যানি কোন জবাব না দিয়ে শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল জনের মুখের দিকে, মাঝে মাঝে এ্যানির দৃষ্টি জনের পা থেকে মাথা অবধি বিচরণ করে

ফিরছিলো।

বললো জন–বলো, কবে তুমি লন্ডন থেকে এসেছে?

এ্যানি এবার জবাব দিলো জুনের পহেলা তারিখে।

জন একটু চিন্তা করে বললো—দেড় মাস হলো এসেছো এ্যানি?

হাঁ।

আর আমি এ বাড়ি ত্যাগ করেছি পুরো দুমাস হলো।

কেনো? আচম্বিতে প্রশ্ন করে বসে এ্যানি।

জন একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে—এ্যানি, আমার অদৃষ্টে যা ছিলো। তাই ঘটেছে। তোমার কাছে সব খুলে বলবো, তুমি বিশ্বাস করো—আমিই জন।

আর সে?

বললাম তো জানি না কে সে, কি তার পরিচয়…

জনের কথা শেষ হয় না; কক্ষে প্রবেশ করেন মিঃ লাহিড়ী এবং মিঃ রায়।

মিঃ লাহিড়ীকে দেখে উঠে দাঁড়ায় এ্যানি, কারণ তার সঙ্গে পূর্ব হতেই পরিচয় ছিলো এ্যানির।

এ্যানিকে উঠে দাঁড়াতে দেখে জনও আসন ত্যাগ করলো। জন ছিলো অত্যন্ত ঘরোয়া ধরনের যুবক, তাই সে মিঃ লাহিড়ী কিংবা মিঃ রায়ের সঙ্গে পরিচয় ছিলো না। জন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো পুলিশ অফিসার দুজনার মুখে।

এ্যানিও কেমন বিব্রত রোধ করছিলো, কারণ জনকেই সে এখনও সম্পূর্ণ চিনে উঠতে পারেনি।

মিঃ লাহিড়ী বুঝতে পারলেন এদের দুজনার মধ্যেই এখন একটা দ্বন্দ্ব চলছে। তিনি নিজেই পরিচয় দিলেন—আমি পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ লাহিড়ী আর ইনি ইন্সপেক্টর রায়। বসুন মিঃ জন, আপনার সঙ্গেই সাক্ষাৎ করতে এলাম।

মিঃ লাহিড়ী নিজেই আসন গ্রহণ করলেন।

অন্যান্য সকলেই আসন গ্রহণ করলো।

মিঃ জন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে পুলিশ অফিসারদ্বয়ের মুখে।

এ্যানি নিশ্চুপ।

মিঃ রায় অবাক হয়ে জনকে দেখছেন। আসল জন আর নকল জনের মধ্যে কতখানি তফাৎ ছিলো। জুনও সুপুরুষ বটে, কিন্তু নকল জনের মত অতোখানি অদ্ভুত সুন্দর নয়। লম্বা চেহারা, উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, মাথায়। কোঁকড়ানো একরাশ চুল। ওর চোখ দুটি কোন দিন দেখে নাই বা দেখবার সুযোগ ঘটেনি কারো। এর চোখ দুটি স্বাভাবিক অনুজ্জল।

মিঃ লাহিড়ী বললেন—হাঁ, কি বলছিলেন আপনারা?

জন বললো-ইন্সপেক্টার, আপনারা নিশ্চয়ই এ ব্যাপার জানেন, আমাকে এক অজ্ঞাত যুবক অখ্যাত এক গলির অন্ধকারে একটি পড়োবাড়ীর ভূগর্ভে আটক করে রেখেছিলো।

না, এ ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মিঃ জন, আপনার নিকটে এ ব্যাপারটা আমি পুরোপুরিভাবে জানতে চাই। অবশ্য যদি আপনি কিছুমাত্র না গোপন করে বলেন?

মিঃ জন বললো—হাঁ, আমি কিছুমাত্র গোপন না করে সব বলবো এবং যতক্ষণ না বলতে পেরেছি ততক্ষণ আমি কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিনা। এ্যানির দিকে তাকিয়ে বললো, এ্যানিও এখনো আমাকে জন বলে বিশ্বাস করতে পারনি।

আচ্ছা, তাহলে আপনার সব কথা আমাদের যেমন শোনার প্রয়োজন, তেমনি মিস এ্যানিরওকেমন, তাই না?

এ্যানি একবার মিঃ লাহিড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি নত করে নিলো। মনোভাব—নিশ্চয়ই জানা দরকার।

জন বলতে শুরু করলো আজ থেকে প্রায় মাস দুই আগে একদিন আমি নিজের ঘরে টেবিলের পাশে বসে একখানা চিঠি লিখছিলাম, রাত তখন দেড়টার বেশী হবে। চিঠি খানা আমি লন্ডনে এ্যানির কাছেই লিখছিলাম। অনেক রাত–তবু চোখে ঘুম আসছে না, বার বার মনে পড়ছে এ্যানির কথা। এ্যানিকে লন্ডন ছেড়ে এসে মন আমার কিছুতেই সুস্থির হচ্ছিলো না। চিঠি লেখা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, নীচে নাম লিখে এবার উঠে দাঁড়াবো, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার পিঠে একটা ঠান্ডা শক্ত কোন জিনিস অনুভব করলাম। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে তাকালাম পিছনে। ভয়ে বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম।

মিঃ লাহিড়ী এবং মিঃ রায় স্তব্ধ হয়ে শুনছেন।

মিস এ্যানির অবস্থাও তাই, তার চোখে প্রবল আগ্রহ আর উদ্দীপনা। জনের কথাগুলো যেন সে গিলছে বলে মনে হলো।

জন বলে চলেছে–আমি দেখলাম, মুখে কালো রুমাল বাঁধা একটা লোক আমার পিঠে রাইফেল ঠেশে ধরেছে। আমি চীৎকার করতে যাবো, অমনি লোকটা মুখে হাত চাপা দিয়ে বললো চীৎকার করলেই মরবে। কাজেই আমি জীবনের ভয়ে চুপ করে গেলাম! যুবকটা আমাকে বললো তখন, ভয় নেই, আমি তোমাকে কিছুই বলবো না বা হত্যা করবো না, শুধু আমার কথামত তোমাকে কিছুদিন সরে থাকতে হবে। আমি এবার তাকে প্রশ্ন করলাম–কে তুমি? কি চাও? জবাব দিলো সে আমি কে, পরে জানতে পারবে। আর চাইনা কিছুই; শুধু দরকার—তোমার জিনিস-পত্র ব্যবহার করবো।

যুবকটা তারপর আমাকে আমার গাড়ীতে বসিয়েই নিয়ে গেলো নিজেই ড্রাইভ করে। তারপর এক পোড়োবাড়ীর গভীর মাটির তলায় একটা ঘরের মধ্যে আটকে রাখলো।

বলেন কি? বলে উঠলেন মিঃ রায়।

হাঁ, আমাকে আটকে রাখলো সে ঐ কক্ষটার মধ্যে।

মিঃ লাহিড়ী বললেন—আপনার সেখানে অসুবিধা হলো না?

ইন্সপেক্টার, কোন অসুবিধা আমার হয়নি সেখানে। যদিও সেদ্ধ পাক-শাক আমার পেটে পড়েনি, কিন্তু অজস্র ফল-মূল আমার খাবার জন্য সদা প্রস্তুত

থাকতো। পানীয় এবং দুধ আমার সেখানে দেওয়া হয়েছিলো। তবু আমি নিজকে সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করতে পারিনি, কারণ নানা দুশ্চিন্তা আমাকে অহরহ যাতনা দিয়েছে। এমন কি আমাকে সেখানে সেভ করার সরঞ্জাম দেওয়া স্বত্ত্বেও আমি সেভ করতে পারিনি।

তারপর মিঃ জন?

তারপর বেশ কিছু দিন চলে গিয়েছে, আজ হঠাৎ সেই যুবক আমাকে মুক্ত করে দিয়ে বললো–এবার আমার কাজ শেষ হয়েছে আপনি যেতে পারেন। আমি তার পরিচয় জানতে চাইলে বললো সে-সব জানতে পারবেন। বলুন ইন্সপেক্টার, আপনি তার পরিচয় জানেন কি?

হাঁ মিঃ জন, জানি।

মিঃ জন ও এ্যানি এক সঙ্গে তাকালো মিঃ লাহিড়ীর মুখের দিকে।

মিঃ লাহিড়ী বললেন—আপনাকে আটকে রাখার মূলে রয়েছে একটি হত্যাকান্ড।

অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো মিঃ জন—হত্যাকান্ড?

হাঁ, হত্যাকান্ড।

তাহলে সেই যুবক খুনী?

না, আপনি শুনুন মিঃ জন, সব বলছি।

বলুন ইন্সপেক্টার?

মিস মালতী নিহত হয়েছে।

মিস মালতী নিহত! বলেন কি?

হাঁ, তারই হত্যারহস্য উদ্ঘাটন করার ব্যাপারে আপনাকে আটক রেখে রহস্যজাল ভেদ করেছে সেই যুবক। কারণ, আপনার চরিত্র তাকে এ হত্যারহস্য উদঘাটন করারব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

কে-কে তাকে হত্যা করেছে ইন্সপেক্টার?

তার পিতা বাসুদেব।

বাসুদেব। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠে মিঃ জন।

হাঁ, বাসুদেব মিস মালতীর হত্যাকারী, এবং সে তার পিতা নয়।

পিতা নয়?

না।

কি কারণে বাসুদেব মালতীকে হত্যা করেছে?

সেই হীরক হার যা আপনি মিস মালতীর নিকটে গচ্ছিত রেখেছিলেন—

মিঃ লাহিড়ীর কথা শেষ হয় না, এ্যানি ক্ষিপ্তের ন্যায় বলে উঠলো–আমার হীরক হার মালতীর নিকটে গচ্ছিত....দুহাতে মাথা টিপে ধরে এ্যানি—একি বলছেন?

মিঃ লাহিড়ী বলে উঠেন—ব্যস্ত হবার কিছু নেই মিস এ্যানি। কারণ, আপনার হীরক হারটি পুনরায় আপনার হাতে ফিরে এসেছে....কথা শেষ করে মিঃ লাহিড়ী এ্যানির হীরক হার ছড়া তার সম্মুখে বাড়িয়ে ধরলেন–আপনার ভাগ্য ভালো মিস এ্যানি। তাই এতে ঘটনার পরও আপনি হীরক হার ফিরে পেলেন।

এ্যানির চোখে মুখে খুশীর উৎস। আনন্দিত মনে মিঃ লাহিড়ীর হাত থেকে হার ছড়া নিয়ে এ্যানি নিজের চোখের সামেন তুলে ধরলো। এতো খুশী সে বুঝি আর কোন দিন হয় নাই। বললো এবার সে-ইন্সপেক্টার, আপনাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মিঃ লাহিড়ী বলে উঠলেন—মিস এ্যানি, এ হার ছড়া ফিরে পাবার জন্য ধন্যবাদ পাবার পাত্র আমি নই।

তবে?

দস্যু বনহুর!

এক সঙ্গে এ্যানি আর মিঃ জন অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো-দস্যু বনহুর।

হাঁ, দস্যু বনহুর। তার অফুরন্ত চেষ্টা আর সহায়তায় মিস মালতীর হত্যা-রহস্য উদ্ঘাটন হয়েছে, এবং আপনার মূল্যবান হীরক হার ছড়া উদ্ধার পেয়েছে।

মিঃ জন বলে উঠেন—কি আশ্চর্য-দস্যু বনহুর?

হাঁ, দস্যু বনহুর। দস্যু বনহুরই আপনাকে আটক রেখেছিলো মিঃ জন।

মিস এ্যানির দুচোখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। আনমনা হয়ে গেলো এ্যানি....কালো চশমা পরা সুন্দর একটি মুখ ভেসে উঠলো তার মানসপটে... ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে টেবিল থেকে চশমাটা তুলে নিলো হাতে।

০৩.

কান্দাই থেকে মহানগর হাজার হাজার মাইল দূরে।

কান্দাই আর মহানগরের প্রায় মাঝামাঝি হলো ঝিল শহর। বনহুর যখন ঝিল শহরে বিরাজ করছিলো তখন বনহুরের কার্যকলাপ এবং তার সমস্ত খবরা খবর মহানগরের জনগণের কানে কানে ছড়িয়ে পড়েছিলো। দস্যু বনহুরের দুর্ধর্ষ আচরণের কথা সবাই জ্ঞাত ছিলো। সেই দস্যুর আর্বিভাব সংবাদ যখন প্রতিটি পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় বৃহৎ আকারে প্রকাশ পেলো, তখন মহানগরের প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রত্যেকটি মানুষের প্রাণে জাগলো একটা ভীত ভাব। বনহুরকে তারা চোখে না দেখলেও তার সম্বন্ধে সকলের মনেই রয়েছে একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক। দস্যু বনহুর মহানগরে পদার্পণ করেছে—খবরটা বিদ্যুৎ গতিতে মহানগরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো।

দোকানে, হোটেলে, ক্লাবে, জলসায় পথে-ঘাটে দস্যু বনহুরের সম্বন্ধে আলোচনা চলতে লাগলো। সকলের মনেই ভয়াতুর ভাব। না জানি সে কেমন দেখতে.....কেমন ভয়ঙ্কর তার চেহারা, এমনি কত কি। দস্যু বনহুর নাকি দিব্য দিনের আলোতেও লোকের বুকে ছোরা বসিয়ে দিতে দ্বিধা বোধ করেনা। পথে-ঘাটে কোন মেয়ে বের হবার জো নেই, সে নাকি প্রকাশ্যে তাদের চুরি করে নিয়ে যায়। কেউ বাধা দিতে পারে না তার কাজে। আরও গুজব ছড়ালো লোকের মুখে মুখে, দস্যু বনহুর নাকি নর-মাংস ভক্ষণ করে।

হোটেল লারফাং আলোয় ঝলমল করছে। শহরের সবচেয়ে বড় হোটেল এটা। এখানে আভিজাত্য আর বংশ গৌরবে যারা গৌরবান্বিত, তাদেরই পদার্পণ হয়ে থাকে। সাধারণ কোনো নাগরিকের হোটেল লারফাং এ প্রবেশের উপায় নেই।

লারফাং সরগরম হয়ে উঠছে।

টেবিলে টেবিলে চলেছে নানা রকম খানা-পিনা আর হাসি গল্প। নানা জাতীয় যুবক-যুবতী হাসি আর গল্পের লহরীতে ভরে উঠছে লারফাং হোটেল।

এক পাশের একটি টেবিলের সম্মুখে আনমনে বসে কফি পান করছিলো বনহুর। ভাবছিলো সে.....এবার তার এখানের কাজ শেষ হয়েছে। মালতী হত্যা-রহস্য উদঘাটনে সক্ষম হয়েছে, নিরাপরাধ অরুণবাবু মুক্তি পেয়েছে। মালতীর নিহতকারী বাসুদেব বন্দী, বিচারে তার ফাসি কিংবা দ্বীপান্তর হয়ে। যাবে—তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবার বনহুর ফিরে যাবে নিজের দেশে, সেই কান্দাই শহরে। মনিরা তার প্রতীক্ষায় পথচেয়ে বসে আছে। তার মা না জানি কত উগ্রীব হয়ে পড়েছেন। হয়তো বা কত কান্দা-কাটা করছেন তিনি। মনিরার মুখখানা মনে পড়তেই বনহুরের হৃদয়ে একটা অপুলক শিহরণ বয়ে গেলো। মনের মধ্যে একটা আলোড়ন শুরু হলো, মনিরাকে কাছে পাবার প্রবল বাসনা তাকে উন্মত্ত করে তুললো। হঠাৎ মনে পড়ে গেলো নূরীর কথা মুহর্তে একটা বিষণ্নতার ছাপ ছড়িয়ে পড়লো বনহুরের। গোটা মুখে। নূরী আজ বেঁচে নেই, তার হয়ত সলিল সমাধি হয়ে গেছে। নিষ্পাপ ফুলের মত একটি জীবন....নূরীর পবিত্র প্রেম-শিখা বনহুরের গোটা অন্তরে ছড়িয়ে আছে ধূপশিখার মত। এতোটুকু প্রেম ভালবাসার জন্য নূরী কিইনা করেছে। নূরীর অতৃপ্ত আত্মার কথা স্মরণ করে বনহুরের চোখ দুটো আশ্রু ছলছল হয়ে উঠে, তার মনের পর্দায় ভেসে উঠে আর একটি ছোট্ট সুন্দর কচি মুখ-মনি, সেও মুছে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে....বনহুর এবার রুমালে চোখ মোছে।

এমন সময় হঠাৎ বনহুরের কানে আসে হোটেলের মাইকে একটি গম্ভীর কণ্ঠস্ব—আপনারা সাবধানতা সহকারে চলাফেরা করবেন, মহানগরেও দস্যু বনহুরের আর্বিভাব ঘটেছে। যে কোন মুহূর্তে দস্যু বনহুর আপনাদের উপর হামলা চালাতে পারে।

বনহুর তখন কফির খালি কাপটায় শেষ চুমুক দিয়ে টেবিলে নামিয়ে রাখছিলো। হাতখানা তার থেমে গেল কাপটার পাশে, একটা মৃদু হাসির রেখা

ফুটে উঠলো তার ঠোঁটের কোণে। মিঃ লাহিড়ী তাহলে তার উপস্থিতিটা মহানগরের প্রতিটি নাগরিকের কানে পৌঁছে দিয়েছে।

বনহুরের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়লো, হোটেল লারফাং ভরে উঠলো মৃদু গুঞ্জনে। সকলেরই চোখেমুখে দেখা দিলো ভীতি ভাব। বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো লারফাং এর প্রতিটি জনতার মুখমন্ডল। সবাই তাকাতে লাগলো হোটেলের দরজার দিকে।

হোটেল কক্ষের দক্ষিণ দিকে একটা টেবিলে বসে ছিলো দুজন যুবতী-কোন ধনিক দুহিতা হবে। অঙ্গে শোভা পাচ্ছে মূল্যবান অলঙ্কার। যুবতীদ্বয়ের মুখভাব অত্যন্ত ভয়-কাতর হয়ে পড়লো। তাদের সঙ্গে কোন পুরুষ নেই বোঝা গেলো, তাই এতো ভীতভাব দেখা দিয়েছে তাদের মধ্যে। যুবতীদ্বয় ফিস ফিস করে কথা বলতে শুরু করলো। বনহুরের অনতি দূরেই তাদের টেবিল, কাজেই তাদের কথাবার্তা যদিও নীচুস্বরে চলছিলো তবু কানে ভেসে আসতে লাগলো তার।

প্রথম যুবতী চাপা স্বরে দ্বিতীয় যুবতীকে লক্ষ্য করে বললো—পত্রিকার সংবাদটা জানার পর আমাদের এভাবে বের হওয়া ঠিক হয় নাই মলি!

দ্বিতীয় যুবতী ফ্যাকাশে মুখে কক্ষের দিকে একবার ভীতভাবে তাকিয়ে নিয়ে বললো—সত্যি জলি, আমার হৃদকম্প শুরু হয়েছে। দস্যু বনহুর নাকি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

হাঁ মলি, আমি শুনেছি–সে নাকি দিন-দুপুরে মানুষের বুকে ছোরা বসিয়ে দেয়। অসুরের শক্তি নাকি তার দেহে, দশ বিশজন শক্তিশালী পুরুষ। নাকি তার কাছে কিছু নয়।

শুধু কি তাই, দস্যু বনহুর নরমাংস ভক্ষণ করে।

সত্যি?

বনহুর কথাটা শুনে আপন মনেই হেসে উঠলো। বনহুরের হাসির শব্দে ফিরে তাকালো জুলি, বনহুর তখন একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে তাকালো উপরের দিকে নিজকে সংযত করে নেবার জন্য।

মলি বললো–আপনি হাসলেন কেনো?

বনহুর দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকালো যুবতীদ্বয়ের মুখের দিকে, একটু গম্ভীর হয়ে নিয়ে বললো-দস্যু বনহুর মানুষ হয়ে মানুষের মাংস ভক্ষণ করে কথাটা শুনে।

জলি বনহুরের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলো, এতোক্ষণ জলি এবং মলি বনহুরকে তেমন করে লক্ষ্যই করে নাই। বনহুরের সুন্দর বলিষ্ঠদীপ্ত চেহারায় মুগ্ধ হলো ওরা। জলি সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলো না।

মলিই প্রশ্ন করলো–কেনো, আপনার বিশ্বাস হচ্ছেনা বুঝি?

হাসার চেষ্টা করে বললো বনহুর–বিশ্বাস না করে উপায় নেই। কারণ, তাকে যখন চোখে দেখিনি কোন দিন।

ভয় বিবর্ণ মুখে বললো মলি–সর্বনাশ, আপনি দস্যু বনহুরকে স্বচক্ষে দেখবার বাসনা রাখেন নাকি?

হাঁ, রাখি।

ভয় করে না আপনার?

সে তো বাঘ নয়। বললো বনহুর।

এবার জলি বললো–বাঘের চেয়েও সে ভয়ঙ্কর।

তাই নাকি? বললো বনহুর।

হাঁ, আপনি কি এ কদিনের পত্রিকা পড়েন নি? বললো মলি!

বনহুর যদিও সবগুলি পত্রিকা এবং সংবাদ সংগ্রহ করেছিলো বা পড়েছিলো তবু একটু না জানার ভান করে বললো বিশেষ কোন কারণে পত্রিকা দেখবার সময় আমার হয়ে উঠেনি।

মলি এবার বললো আসুন না আমাদের টেবিলে। প্লিজ আসুন। আমাদের বড্ড ভয় করছে।

বনহুর উঠে মলি আর জলির টেবিলে গিয়ে বসলো। জলি অপূর্ব সুন্দরী বটে, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ গায়ের রঙ, মাথায় কৃষ্ণ কালো চুল। টানা টানা ডাগর দুটি চোখ,

উন্নত নাসিকা, লম্বা গঠন-সুন্দরী না বলে উপায় নেই। নিঃসঙ্গ সন্ধ্যাটা বনহুরের কাছে যেন স্বপ্নময় হয়ে উঠলো। হেসে বললো বনহুর কেনো, আপনাদের সঙ্গে কেন.....

না, আমাদের সঙ্গে কোন পুরুষ নেই, তাই আপনি যদি একটু....থেমে গেলো জলি।

বলুন কি করতে পারি?

মলিই বলে উঠলো-আমাদের একটু বাড়ী অবধি পৌঁছে দেবেন? অবশ্য মনে যদি কিছু না করেন।

এতো শীঘ্রই চলে যাবেন? বনহুর হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বললো... এখন তো সবে আটটা বাজে।

আমাদের বড্ড ভয় করছে। বললো জলি।

বনহুর ভ্রূকুঞ্চিত করে বললো—কেনো এতো ভয়?

মলি বললো–দস্যু বনহুরের জন্য ভয় পাচ্ছি আমরা–আপনাকে তো বললাম।

মুখভাব স্বাভাবিক করে নিয়ে বললো বনহুর-এতোগুলো লোকের মধ্যে দস্যু বনহুর প্রবেশ করবে, এতোবড় সাহস আছে তার?

জলি আর মলি এক সঙ্গে বলে উঠলো—কি বললেন?

বললাম, সে এই ভর সন্ধায় এই লোকজনে ভরা হোটেলে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে?

আপনি ঠিক্ জানেন না, দস্যু বনহুর স্বাভাবিক দস্যু নয়।

সে নরখাদক, তাই না? বনহুর কোন রকমে হাসি চাপতে চেষ্টা করে।

হ্যাঁ সে নর-মাংস খায়। তার চেহারা নাকি অতি ভয়ঙ্কর বিশ্রী। রাক্ষসের মত....

এবার বনহুর চোখ বড় বড় করে বললো—এ রকম চেহারার লোক, আছে নাকি দুনিয়ায়?

নেই, বলেন কি? দস্যু বনহুরকে যদি দেখতেন একবার…..তাহলে তো আমার জীবন নিয়ে ফিরে আসা দায় হতো।

জলি, মলি আর দস্যু বনহুর যখন আলাপ আলোচনা চলছিলো, তখন সমস্ত হোটেল কক্ষেই প্রতিটি লোক দস্যু বনহুরকে নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সকলেরই মুখে ঐ এক কথা–না জানি কোন্ মুহূর্তে দস্যু বনহুরের এই হোটেলে আবির্ভাব হবে।

জলি উঠে দাঁড়ালো—আমার ভয় হচ্ছে, আর বিলম্ব করা উচিৎ নয় মলি।

মলিও ততক্ষণে উঠে পড়েছে–চলো, এখন ভালয় ভালয় বাড়ী পৌঁছতে পারলে বেঁচে যাই।

জলি বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো-অনুগ্রহ করে আপনি যদি আমাদের সঙ্গে..•••

নিশ্চয়ই চলুন। বনহুর উঠে দাঁড়ালো, তখনও তার ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসির আভাষ লেগে রয়েছে।

জলি আর মলি বনহুরের পাশে পাশে হোটেল কক্ষ ত্যাগ করলো।

জলি বললো—আমাদের গাড়ী আছে, আসুন।

অদূরে থেমে থাকা একটা গাড়ীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো জলি আর মলি। জলি পিছনের দরজা খুলে ধরে বললো-উঠুন।

বনহুর উঠে বসলো।

জলি ড্রাইভ-আসনে বসলো, মলি তার পাশে।

গাড়ী ছুটতে আরম্ভ করলো।

অদ্ভুত এ পরিবেশটা বনহুরের কাছে ভালই লাগছে। যার ভয়ে ভীত আতঙ্ক গ্রস্ত, তাকেই নিজেদের গাড়ীতে বসিয়ে নিয়ে চলেছে। আপন মনে হাসতে লাগলো বনহুর।

জলি বললো-ভাগ্যিস, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে এসেছেন, নইলে ভয়ে মরে যেতাম।

মলিও বান্ধবীর কথায় যোগ দিয়ে বললো—সত্যি, কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো। আচ্ছা আপনার নাম বা পরিচয় এখনও জানা হয়নি কিন্তু।

বনহুর বললে—যদি বলি আমিই দস্যু বনহুর।

এক সঙ্গে হেসে উঠলো জলি আর মলি।

মলি বললো-দস্যু বনহুর যদি আপনি হতেন তবে তো আমাদের আনন্দের সীমা থাকতো না।

তাই নাকি?

মলি পুনরায় বললো–যদি আপনার আপত্তি না থাকে, বলুন না আপনার পরিচয়টা?

আমার নাম নাসিম চৌধুরী। মহানগরের একজন নাগরিক আমি। আর আপনারা? বললো বনহুর।

মলিই জবাব দিলো—আমি মিঃ রায় এর কন্যা মলি। আর আমার বান্ধবী পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ লাহিড়ীর একমাত্র কন্যা জলি।

বনহুর চমকে উঠলো, অন্ধকার বলে মলি লক্ষ্য করতে পারলো না। জলি তো ড্রাইভ করছিলো।

এ শহরের আর কেউ তাকে না চিনুক মিঃ রায় এবং মিঃ লাহিড়ী তাকে চিনতে পারবেন—এ সুনিশ্চয়। বনহুর প্রমাদ গুণলো, এদের পৌঁছে দিতে গিয়ে মিঃ লাহিড়ীর নিকটে পাকড়াও না হয়ে পড়ে। এখন কি ভাবে এদের কবল থেকে ফসকানো যায়।

হঠাৎ বলে উঠলো জলি—এসে গেছি। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী থেমে পড়লো।

জলি নেমে দাঁড়িয়ে বললো-আসুন মিঃ নাসিম।

ততক্ষণে বনহুর নেমে দাঁড়িয়েছে গাড়ী থেকে আপনারা পৌঁছে গেছেন, এবার আমি চলি?

না তা হয় না মিঃ নাসিম, আপনি আসুন-বাবার সঙ্গে আপনার পরিচয় হলে অনেক খুশী হবেন। কথাগুলো বললো, জুলি।

মলিও জেদ ধরে বসলো—এতোখানি উপকার যখন করলেন তখন আর একটু বইতে নয়, আসুন না জলি যখন বলছে।

বনহুর অগত্যা জলি আর মলিকে অনুসরণ করলো।

পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ লাহিড়ীর ড্রইং রুম।

মিস মলি আর জলির সঙ্গে বনহুর প্রবেশ করলো ড্রইংরুমে। সুসজ্জিত কক্ষ, ফিকে নীল রঙ করা দেয়াল। মেজের কার্পেটখানাও ফিকে নীল, কক্ষের মাঝখানে কাপের্টের বুকে গোলাকার করে সাজানো কয়েকটা সোফা সেট। সোফার কভারগুলোও ফিকে নীল রঙ এর। দরজা জানালার পর্দাও ফিকে নীল রঙ কাপড়ের তৈরী। কক্ষ মধ্যে একটা নীল রঙ এর আলো জ্বলছিলো।

মিস জলি বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো—বসুন, বাবাকে ডেকে আনছি।

জলি ভিতরে চলে গেলো, মলিও অনুসরণ করলো তাকে।

একটু পরে ফিরে এলো মলি আর জলি—সঙ্গে সঙ্গে মিঃ লাহিড়ী। কক্ষে প্রবেশ করে হতবাক স্তম্ভিত—কেউ নেই কক্ষে!

মিঃ লাহিড়ী অবাক হলেন, বললেন–কই সেই ভদ্রলোক যিনি তোমাদের পৌঁছে দিয়েছেন?

জলি আর মলি এক সঙ্গেই বলে উঠলো—এখানেই তো তিনি বসেছিলেন!

হঠাৎ মিঃ লাহিড়ী দেখতে পেলেন—সোফার উপর একটি কাগজের টুকরা পড়ে আছে। তিনি কাগজের টুকরাখানা হাতে তুলে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরলেন, সঙ্গে সঙ্গে তার মুখমন্ডল অন্ধকার হয়ে উঠলো।

জলি বললো-কি হলো বাবা?

মিঃ লাহিড়ী গম্ভীর, কণ্ঠে বললেন-পড়ে দেখো।

জলি কাগজের টুকরোখানা নিয়ে উচ্চ কণ্ঠে পড়লো। তাতে লিখা রয়েছে মাত্র কয়েকটা শব্দ :

মিঃ লাহিড়ী।

আপনার কন্যা মিস জলি আর তার বান্ধবী মিস মলি দস্যু বনহুরের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ায় তাদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেলাম।

–দস্যু বনহুর।

জলি আর মলির চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। মিঃ লাহিড়ী রাগে গস গস করে উঠলেন।

জলি আর মলির মুখে কোন কথা বের হচ্ছে না। দুজন তাকাচ্ছে দুজনার মুখের দিকে।

মিঃ লাহিড়ী বলে উঠলেন—বাইরের কাউকে বিশ্বাস করো না তোমরা। দস্যু বনহুর তোমাদের উপর কোন অন্যায় আচরণ করে নি তো?

মিস জলি বলে উঠলোনা বাবা, তার ব্যবহার অত্যন্ত মধুর ছিলো। আমাদের প্রতি কোন রকম খারাপ ব্যবহার করেনি।

মিঃ লাহিড়ী তখনও রাগে অধর দংশন করছিলেন।

জলি পুনরায় বললো—দস্যু বনহুর অমন হবে তা ভাবতেও পারিনি।

মিঃ লাহিড়ীর কন্যার কথায় কান না দিয়ে তখনই অফিসে ফোন করলেন। জানিয়ে দিলেনদস্যু বনহুর তাদের আশে-পাশেই বিচরণ করে ফিরছে। পুলিশ

বাহিনী যেন সদা সজাগ থাকে এবং শহরময় যেন সজাগ করে দেওয়া হয় এ ব্যাপারে।

০৪.

এই ঘটনার পর কেটে গেছে বেশ কয়েকটা দিন।

বনহুর সম্বন্ধে শহরময় নানা আতঙ্ক ভরা ভাবের সৃষ্টি হলেও বনহুর আজও কারো উপর হামলা চালায় নি বা কারো ধনভান্ডার লুটে নেয় নি, কিংবা কারো বুকে ছোরা বসিয়ে রক্তপাত ঘটায় নি।

শান্ত নাগরিকের মতই বনহুর মহানগরের বুকে আত্মগোপন করে রইলো।

শহরবাসীর মন থেকে দস্যু বনহুরের ভীতিভাব সম্পূর্ণ প্রশমিত না হলেও অনেকটা হাল্কা হয়ে এসেছে। সবাই আপন আপন মনে নিজ নিজ কাজ করে চলেছে।

নগরবাসী বনহুর সম্বন্ধে কিছুটা আশ্বস্ত হলেও পুলিশ মহল তাকে নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন রইলো, শহরের নানা স্থানে নানাভাবে সি আই ডি পুলিশ গোপনে অনুসন্ধান করে চললো। কিন্তু এতো করেও তারা বনহুরের সন্ধান পেলোনা।

বনহুর তখন লারফাং হোটেলের দ্বিতল একটি ক্যাবিনে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় দৈনিক পত্রিকাখানা পড়ছিলো। বাম হস্তের আংগুলের ফাঁকে অর্ধদগ্ধ সিগারেট থেকে ক্ষীণ একটি ধুম্র রেখা ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছিলো।

অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পত্রিকার পাতায় দৃষ্টি বুলিয়ে যাচ্ছিলো। দস্যু বনহুরের আবির্ভাবে মহানগরে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিলো। প্রতিটি পত্রিকার পাতায় পাতায় বিরাট আকারে প্রকাশ পেতো বনহুরের আগমন বার্তা।

সমস্ত পত্রিকাখানায় একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বনহুর স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। পত্রিকা ওয়ালারা বনহুরের নামে এ কদিনে বেশ দুপয়সা কামিয়ে নিয়েছে। কারণ, দস্যু বনহুরের আবির্ভাব সংবাদ পত্রিকায় এমন একটা আতঙ্ক আনয়ন করেছিলো যার ফলে নগরের প্রতিটি জনগণ সর্বক্ষণ পত্রিকার অপেক্ষায় প্রহর গুণতো। ধনী-দরিদ্র নারী-পুরুষ বিদ্বান-অবিদ্বান সবাই খরিদ করতে একখানা

দৈনিক পেপার। দস্যু বনহুরের সংবাদ জানবার জন্য উদগ্রীব হয়ে সবাই পেপার দেখতো।

আজ পত্রিকার পৃষ্ঠায় দস্যু বনহুর সম্বন্ধে কোন তাজা খবর ছিলোনা। বনহুর নিজেও এ কদিন পত্রিকায় তার নামে নানা ধরনের আজগুবি গুজব পড়ে একটা কৌতুক অনুভব করতো, নিজ মনেই হাসতো সে।

বনহুর আজ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, যাক পত্রিকাগুলি তাহলে আশ্বস্ত হয়েছে। হঠাৎ বনহুরের নজর চলে গেলো পত্রিকা খানার একটি জায়গায়—আজ সন্ধ্যায় আন্দাম বন্দর থেকে জাহাজ কাংঙ্গেরী কান্দাই অভিমুখে রওয়ানা হচ্ছে। কান্দাই–কান্দাই শব্দটা বনহুরের হৃদয় স্পর্শ করলো, আচম্বিতে মনের পর্দায় ভেসে উঠলো দুটি ব্যাকুল আঁখি উগ্রীব নয়নে তাকিয়ে আছে চৌধুরী বাড়ীর মুক্তাগবাক্ষে। তাকিয়ে তাকিয়ে হতাশ হয়ে যাচ্ছে আঁখি দুটি গন্ড বেয়ে, গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। তার মনিরা–বনহুর মনস্থির করে ফেললোআজ সন্ধ্যায় সে আন্দাম থেকে কাংঙ্গেরী জাহাজে কান্দাই এর পথে রওয়ানা দেবে।

সন্ধ্যার পূর্বেই হোটেল লারফাং ত্যাগ করে ট্যাক্সিতে উঠে বসলো দস্যু বনহুর। মহানগর ত্যাগ করতে মনটা তার আজ কেমন যেন আনচান করছিলো। একটা বেদনা বোধ হচ্ছিল তার হৃদয়ে, কোন আপন জনকে যেন ছেড়ে যাচ্ছে সে এই মহানগরের বুকে।

ট্যাক্সি আন্দাম বন্দরে পৌঁছতেই ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে পড়লো বনহুর।

আন্দাম, বিরাট বন্দর।

অগণিত জাহাজ ভাসমান অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে বন্দরের আশে পাশে। জেটিতে ভিড়ে পঁড়িয়েছে জাহাজ কাংঙ্গেরী। অগণিত যাত্রি জেটির সিঁড়ি বেয়ে এগুচ্ছে জাহাজ অভিমুখে।

ভোঁ বেজে উঠলো।

জেটি ত্যাগ করে কাংঙ্গেরী এগুতে লাগলো গভীর জলের দিকে।

ফার্স্ট ক্লাশ ক্যাবিনের একটি সোফায় গা এলিয়ে বসেছিল বনহুর। সম্মুখের কাঁচের জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিলো সে, ছেড়ে আসা মহানগরীর দিকে।

আন্দাম বন্দর ছেড়ে কাংঙ্গেরী দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়ে আসছে মহানগরী। উচ্ছল জলরাশি খলখল শব্দে পিছিয়ে যাচ্ছে পিছনের দিকে। এবার বনহুর একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে অগ্নিসংযোগ করলো।

সন্ধ্যার অন্ধকার এখন কাংঙ্গেরীর বুকে জমাট হয়ে উঠেছে। ক্যাবিনে ক্যাবিনে জ্বলে উঠেছে বৈদ্যুতিক নীলাভ,আলো। যাত্রীরা সব আপন আপন জায়গা বেছে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। দূর দেশের যাত্রী সবাই, বহুদিন তাহাদের কাটাতে হবে এই ভাসমান আবাসে। কাজেই সবাই চায় একটা আরামদায়ক সুখময় স্থান।

যাত্রীদের হই-হুল্লোড় আর জাহাজের ঝকঝক শব্দ মিলে একটা অদ্ভুত শব্দের সৃষ্টি করে চলছিলো।

ক্রমান্বয়ে রাত বেড়ে আসে।

জাহাজ এখন সাগরবক্ষে এসে পড়েছে।

যাত্রিগণ স্ব স্ব স্থান বেছে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে পড়ায় তেমন হই-চই আর নেই। তবু বেশী জনতার কলকণ্ঠের একটা প্রতিধ্বনি জাহাজটাকে মুখর করে রেখেছিলো।

বনহুর অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে নিক্ষেপ করে আর একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করতে গেলো, ঠিক সেই মুহূর্তে একটা নুপুরের শব্দ ভেসে এলো তার কানে; নুপুরের শব্দের সঙ্গে একটা বাঁশীর সুর।

বনহুর একমুখ ধুয়া সম্মুখের দিকে ছুড়ে দিয়ে সোফায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। তারা ভরা আকাশের খানিকটা অংশ ভেসে ভেসে সরে যাচ্ছে তার চোখের সম্মুখ দিয়ে কাঁচের শার্শী পথে। আনমনে চেয়ে আছে সে।

বাঁশীর সুরের সঙ্গে নুপুরের আওয়াজ এখন আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। সঙ্গে আরও কিছু শব্দ ভেসে আসছে জনগণের করতালি আর হাস্যধ্বনি।

বনহুর নিশ্চিন্ত মনে ধূম পান করে চলেছে।

ডেকে কোন নর্তকী হয়তো নাচ দেখাচ্ছে, ভাবলো বনহুর। বেশ কিছুক্ষণ হলো নুপুরের শব্দের সঙ্গে বাঁশীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে জনগণের হর্ষধ্বনি আর করতালি।

নিজের অজ্ঞাতেই বনহুর সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, এগিয়ে চললো ডেকের দিকে। দক্ষিণ হস্তের আংগুলের ফাঁকে তখনও অর্ধদগ্ধ একটী সিগারেট। তাকিয়ে দেখলো বনহুর সম্মুখের দিকে। ডেকের উজ্জ্বল আলোতে নজরে পড়লো কতকগুলি লোক ডেকের দক্ষিণ দিকে গোলাকার ভাবে দাঁড়িয়ে কিছু দেখছে।

বনহুর থমকে দাঁড়ালো, যাবে কিনা ওখানে ভাবছে। এমন সময় পাশে এসে দাঁড়ালো জাহাজের ক্যাপ্টেন মিঃ মুঙ্গের। বনহুরকে সম্বোধন করে বললেন—হ্যালো মিঃ সেন, চলুন নাচ দেখবেন।

দস্যু বনহুর এ জাহাজে মিঃ চন্দ্রসেন নামে নিজকে পরিচিত করেছিলো। ক্যাপ্টেনের কথায় হেসে বললো-ধন্যবাদ, চলুন।

ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরের সঙ্গে বনহুর এগিয়ে চললো ডেকের দিকে।

জাহাজ তখন সীমাহীন জলরাশি অতিক্রম করে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে কোন অজানার পথে। চারিদিকে শুধু জল আর জল, স্থলের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

তারা ভরা আকাশ।

সপ্তমীর চাঁদ ডুবে গেছে কিছুক্ষণ আগে।

জনতামন্ডলীর পাশে এসে ঘাড় উঁচু করে উঁকি দিলো বনহুর—একটি নর্তকী এদিকে পিছনে ফিরে নাচছে। অপূর্ব অদ্ভুত সে নাচ। একটি লোক বাঁশী বাজাচ্ছে, শরীরে ঢিলা পাজামা আর পাঞ্জাবী মাথায় মস্তবড় একটা পাগড়ী বাধা। লোকটার বাঁশীর সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচছে নর্তকী। এতোটুকু শিথিলতা নেই সেই দুটি চরণ যুগলে।

বনহুর অবাক হয়ে নর্তকীর পা দুখানা লক্ষ্য করছিলো। লোকটার বাঁশীর সুরে যেন কোন যাদু আছে, যার জন্য নর্তকীর পা দুখানা যন্ত্রের মত দ্রুত ভাবে চলছিলো। আশ্চর্য এ নাচ।

হঠাৎ নর্তকী ঘুরে নাচতে লাগলো।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো-নূরী! দুচোখে তার অতীব বিস্ময়। .

ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী দাঁড়িয়ে ছিলেন বনহুরের পাশে, তিনি মিঃ সেনকে হঠাৎ নূরী শব্দ উচ্চারণ করতে দেখে এবং তার মুখভাব লক্ষ্য করে অবাক হলেন,বললেন- আপনি ওকে চেনেন?

যদিও বনহুর নূরীকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন তবু চট করে নিজকে সংযত করে নিয়ে বললো—নাচনেওয়ালীকে এর পূর্বে আর একবার দেখেছিলাম।

ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী হেসে বললেন–ও।

নূরী তখনও চঞ্চল চরণে নেচে চলেছে। বংশীবাদকের বাঁশীর সুরে তার চরণ যুগল যেন আরও দ্রুত হয়ে উঠছিলো।

বনহুরের মুখমন্ডল গম্ভীর হয়ে উঠলো। নূরী বেঁচে আছে; আনন্দিত হওয়ার চেয়ে ক্রুদ্ধ হলো সে বেশী। নূরী নর্তকী হয়ে পথে-ঘাটে নেচে বেড়াচ্ছে-ছিঃ ছিঃ ছিঃ এর চেয়ে ওর মৃত্যু হলেও খুশী হতো সে। বনহুর তাকালো বংশীবাদকের মুখের দিকে। নরপিশাচের মতই দেখতে লোকটা। লম্বা-বিরাট দেহ; মস্ত মাথা, লম্বা নাক, মস্ত মস্ত একজোড়া গোঁফ, গোল গোল দুটি চোখ, কেমন শয়তানী ভরা চাহনী। বনহুরের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। আর দাঁড়াতে পারলো না সে, ফিরে এলো নিজের কামরায়।

কিছুক্ষণ পূর্বেও বনহুরের মনোভাব স্বাভাবিক ছিলো। হাজার ব্যথাও তাকে একেবারে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দিতে পারেনি। হঠাৎ নূরীকে এভাবে দর্শন করায় বনহুর যেন সত্তা হারিয়ে ফেললে। সে ভাবতেও পারেনি–নূরী একজন নাচনে ওয়ালী হতে পারে।

ক্যাবিনের মেঝেতে ক্রুদ্ধভাবে পায়চারী করতে লাগলো বনহুর। মাঝে মাঝে অধর দংশন করছে, নূরীকে সে এভাবে দেখবে আশা করেনি কোন দিন। নূরীর প্রেমকে সে এতো দিন অতি নির্মল সচ্ছবলে জেনে এসেছে। নূরীর ভালবাসা তার কাছে ফুলের মতই পবিত্র মনে হয়েছে, আর সেই নূরী কিনা–বনহুর দুহাতে নিজের মাথার চুল টেনে ছিড়তে লাগলো।

ডেকের বুকে নূরীর নুপুরের শব্দ বনহুরের কানে গরম সীসা ঢেলে দিচ্ছে যেন। বনহুর দুহাত কান চেপে ধরলো।

রাত বেড়ে আসছে।

এক সময় গোটা জাহাজটা সুপ্তির কোলে ঢলে পড়লো। নীরব হয়ে এলো যাত্রীদের কলকণ্ঠ। জাহাজের ইঞ্জিনের ঝক ঝক শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না।

বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো,বেরিয়ে এলো ক্যাবিনের বাইরে। সমস্ত জাহাজখানা নিস্তদ্ধ, ঘুমিয়ে পড়েছে যাত্রিগণ।

বনহুর অতি সৃন্তর্পণে এগিয়ে চললো। হঠাৎ চমকে উঠলো বনহুর তার অদূরে একটা ক্যাবিনের পাশ কেটে অন্ধকারে আর একটি ছায়ামূর্তি এগিয়ে যাচ্ছে। বনহুর থমকে দাঁড়ালো, লক্ষ্য করলো কে এই লোক। কিন্তু বনহুর আশ্চর্য হয়ে দেখলো–লোকটার আপাদ মস্তক কালো আলখেল্লায় আবৃত। বুঝতে পারলো বনহুর-আলখেল্লাধারী নিশ্চয়ই কোন শয়তান। কোন কুমতলবে সে এগুচ্ছে। বনহুর অনুসরণ করলো আলখেল্লাধারীকে কিন্তু কিছু দূর এগুতেই হঠাৎ তার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী। হাস্য উজ্জ্বল মুখে বললেন—হ্যালো মিঃ সেন।

বনহুর হেসে বললো—বড় গরম বোধ করছিলাম।

হাঁ, আজ আবহাওয়াটা বড় সুবিধে নয়। কেমন যেন একটি গুমোট ভাব দেখা দিয়েছে। ঝড় আসতে পারে।

তাই বুঝি আপনি–

না, ঠিক সে কারণে নয়, ইঞ্জিন-মেশিনটা একটু খারাপ বোধ হচ্ছিলো তাই দেখে এলাম। আচ্ছা, চলি মিঃ সেন। কথা শেষ করে ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী চলে গেলো নিজের ক্যাবিনের দিকে।

বনহুর ফিরে তাকালো যে দিকে কিছুক্ষণ পুর্বে সেই আলখেল্লাধারীটিকে দেখতে পেয়েছিলো। কিন্তু কি আশ্চর্য লোকটা যেন হাওয়ায় মিশে গেছে।

বনহুর বিলম্ব না করে ফিরে এলো নিজের কামরায়।

শয্যায় শুয়েও এতোটুকু ঘুম এলোনা বনহুরের চোখে। সব সময় তার কানের কাছে যেন নূরীর চরণের নূপুরধ্বনি ভেসে আসছে। নূরী–নূরী–ছোট বেলা থেকে নূরীকে বনহুর সাথী রূপে পেয়েছিলো। নূরীর প্রেম-ভালবাসা তার মনকে আচ্ছন্ন করতে না পারলেও বনহুর তাকে কোনদিন উপেক্ষা করতে পারেনি। নূরীকে সে অন্তরের অনুভূতি দিয়ে ভালবেসেছে। নূরীর পবিত্র ভালবাসার মধ্যে আত্মসমর্পণ করেছে বনহুর। সেই নূরীকে সে আজ এরূপে দেখবে ভাবতে পারেনি–বনহুর এবার সোজা ডেকের বুকে এসে দাঁড়ালো। অদূরে যে ক্যাবিনটা দেখা যাচ্ছে-নূরী ওটাতেই রয়েছে। একবার ভাবলো বনহুর-সোজা নূরীর ক্যাবিনে প্রবেশ করে বলবে, কেনো-কেনো সে এ পথ বেছে নিয়েছে। এ পথ ছাড়া তার কি আর কোন গতি ছিলো না। রাগে ক্ষোভে অধর দংশন করে বনহুর। উষ্ণ হয়ে উঠে তার ধমনীর রক্ত।

বনহুর ক্যাবিনের শার্শী খুলে প্রবেশ করলো ভিতরে।

অদূরে মেঝেয় কম্বল বিছিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে নূরী। ক্যাবিনের স্বল্পালোকে তাকিয়ে দেখলো নূরীকে।

কতদিন পর নূরীকে দেখছে বনহুর, কিন্তু কোন বিস্ময় তার মনে জাগলোনা, জাগলোনা কোন অনুভূতি। বনহুরের শিরায় শিরায় তখন উষ্ণ রক্তের প্রবাহ।

ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় বনহুর এগিয়ে গেলো নূরীর পাশে। দাঁতে দাঁত পিষছিলো বনহুর, রাগে তার মাংসপেশীগুলি শক্ত হয়ে উঠছিলো। হাটু গেড়ে

বসে পড়লো নূরীর শয্যার পাশে দুহাত বাড়িয়েটিপে ধরলো নূরীর গলা।

সঙ্গে সঙ্গে নূরী জেগে গেলো চীৎকার করতে গেলো সে। বনহুর দক্ষিণ হস্তে চেপে ধরলো নূরীর মুখ।

নূরী তাকালো বনহুরের দিকে।

কিন্তু একি! বনহুরকে দেখেও নূরীর চোখে কোন ভাবের পরিবর্তন এলোনা।

নূরীর দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বনহুরের হাত দুখান যেন শিথিল হয়ে এলো। নূরীর কণ্ঠ ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে। নূরী নিজের গলায় হাত বুলোচ্ছে এবং তাকাচ্ছে বনহুরের মুখের দিকে-আশ্চর্য! নূরী বনহুরকে দেখে একটা শব্দও উচ্চারণ করলোনা। নূরী যে তাকে চিনতে পেরেছে এমন মনে হলোনা।

বনহুরের মুখেও কোন কথা বের হচ্ছেনা, তবে কি নূরী তাকে চিনতে পারছেনা।

হঠাৎ বলে উঠলো নূরী–কে তুমি?

বিস্মিত বনহুর আরও বিস্মিত হলো, নূরী তাকে তাহলে চিনতে পারেনি। না তার মিথ্যা অভিনয়। বনহুর গম্ভীর চাপা কণ্ঠে দাঁতে দাঁত পিষে বললো-নূরী, তোমাকে এ ভাবে দেখবার পূর্বে তোমার মৃত্যু হলে অনেক খুশী হতাম।

নূরী আশ্চর্য দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে, বনহুরের কথায় তার চোখ দুটো আরও অবাক হলো। সে ওর কথাগুলো ঠিক বুঝে উঠতে পারছেনা।

বনহুর পুনরায় বলে উঠলো-নূরী, আমাকে তুমি থোকা দিতে পারবেনা।

নূরী এবার বলে উঠলো—কে তুমি? এসব কি বলছো?

বনহুর নূরীর কথায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো তার মুখের দিকে। তবে কি এ নূরী নয়, নূরীর আকারে অন্য কোন মেয়ে? হয়তো তাই হবে নাহলে এতোক্ষণ তাকে চিনতে পারবেনা—এও কখনও হতে পারে! বনহুর, অবাক নয়ননে নূরীর পা থেকে মাথা অবধি নিপুণ আঁখি মেলে। দেখতে লাগলো। না না, ভুল তার হয়নি—ঐ তো নূরীর কপালে সেই ক্ষত চিহ্নটা-যা একদিন তারই আঘাতে হয়েছিলো। সেই মুখ সেই চোখ-একি, কোনদিন ভুলে যাবার! সেই কথা বলবার ভঙ্গী। নূরী ছাড়া এ অন্য কোন মেয়ে নয়–তবে কি নূরী তার সঙ্গে মিথ্যা ছলনা করছে?

বনহুর দৃঢ় মুষ্ঠিতে চেপে ধরলো নূরীর দক্ষিণ হাত-নূরী।

না, আমার নাম নূরী নয়।

নূরী নও তুমি? ছেড়ে দিলো বনহুর নূরীর হাত খানা, প্রশ্ন করলোকে তুমি? কি তোমার নাম?

নূরী বনহুরকে চিনতে পারেনি এটা সত্য। নূরীকে যাদুকর যাদুর মায়াজালে নিজ সত্তা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিলো। নূরী যা করছিলোসব যাদুকরের যাদুর মায়ায়। এমনকি নূরীর দৃষ্টিশক্তিও অন্যরকম হয়ে গিয়েছিলো, আপন জনকে সে দেখলেও চিনতে পারবে না বা পারছিলো না। বনহুর নূরীর স্বপ্ন-সাধনা–প্রাণের চেয়েও সে ওকে ভালবাসে, অথচ আজ সেই বনহুরকে কাছে পেয়েও নূরী চিনতে পারে না। বনহুরের প্রশ্নে নূরী জবাব দেয়–আমি নাচনেওয়ালী। আমার নাম মায়া।

অস্ফুট ধ্বনি করে উঠে বনহুর–মায়া। হাঁ মায়া।

বনহুরের দৃষ্টি ধীরে ধীরে নত হয়ে আসে। সে অন্য একটি মেয়েকে নূরী বলে ভ্রম করেছে। আবার তাকালো বনহুর নূরীর মুখের দিকে—না, ভুল তার হয়নি—এই তো সেই নূরী–কিন্তু এর নাম যে মায়া।

বনহুর যেমনভাবে এসেছিলো তেমনি বেরিয়ে গেলো। একটা অব্যক্ত বেদনা তার সমস্ত অন্তরটাকে যেন নিষ্পেষিত করে চললো নূরী ছাড়া সে কেউ নয়। কিন্তু একি পরিবর্তন নূরীর মধ্যে!

গোটা রাত নানা দুশ্চিন্তায় কাটলো বনহুরের।

পরেরদিন।

বনহুর ডেকে দাঁড়িয়ে সিগারেট পান করছিলো। ভোরের মিষ্টি হাওয়ায় দেহটা শান্ত-স্নিগ্ধ হলেও মনটা তখনও গুমড়ে কেঁদে মরছিলো। গত রাতের নূরীর কথাই স্মরণ হচ্ছিলো বার বার। যে নূরী তাকে না পেলে অস্থির হয়ে পড়তে, যে নূরী তার এতোটুকু ভালবাসার জন্য উদগ্রীব থাকতো-সেই নূরীর একি পরিবর্তন! হঠাৎ বনহুরের চিন্তাজালে বাধা পড়ে, সেই নুপুরের শব্দ।

বনহুর হাতের অর্ধদগ্ধ সিগারেট সাগরের জলে নিক্ষেপ করে ফিরে দাঁড়ালো। অদুরে অনেকগুলি লোক জটলা পাকিয়ে গোলাকার ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিক থেকেই ভেসে আসছিলো নূপুরের শব্দ।

বনহুরের মুখমন্ডল কঠিন হয়ে উঠলো, আর দাঁড়াতে পারলো না, সে চলেগেলো নিজের ক্যাবিনে।

এমন সময় ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী বনহুরের ক্যাবিনের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো-হ্যালো মিঃ সেন, আসুন নাচ দেখা যাক।

না ক্যাপ্টেন, আমার শরীরটা ভাল বোধ হচ্ছে না আসুন এখানে বসে গল্প সল্প করা যাক।

ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী প্রবেশ করলো বনহুরের ক্যাবিনে। বনহুরের পাশের আসনে বসে পড়লেন ক্যাপ্টেন–এতো অল্প সময়ে অসুস্থ বোধ করলে। চলবে কি করে মিঃ সেন? এখনও বেশ কিছুদিন জাহাজ কোন বন্দরে ভিড়ছে না।

না না, তা বলছি না, আসলে মানে শরীরটা যেন একটু কেমন লাগছে আর কি।

বনহুর আর ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী কথাবার্তা হচ্ছিলো এমন সময় ডেকের জনতামন্ডলীর মধ্যে একটা হট্টগোলের শব্দ শোনা যায়।

ক্যাপ্টেন উঠে পড়েন-ব্যাপার কি, চলুন মিঃ সেন দেখা যাক।

বনহুরের ইচ্ছা না থাকলেও উঠতে বাধ্য হলো, এগিয়ে চললো সে ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরীর সঙ্গে।

জনতার ভীড় ঠেলে এগুতেই চমকে উঠলো বনহুর অদূরে ডেকের উপর সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে আছে নূরী। পাশেই সেই পাগড়ীওয়ালা বংশীবাদ হাতে আজ তার বাঁশী নেই-এক গাছা বেত। লোকটার চোখ-মুখ হিংস্র হয়ে উঠেছে।

ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী এগুতেই দর্শকের মধ্য হতে একজন বলে উঠলো–যেভাবে ওকে প্রহার করেছে জ্ঞান হারাবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

অন্য একজন বললো-মরে যায়নি তো?

বনহুর সিংহের ন্যায় গর্জন করে উঠলো—কেনো ওকে মারা হয়েছে বলতে পারেন?

তা আর পারবো না সাহেব। মেয়েটা নাচতে চাইছিলো না। কথাটা বললো প্রথম ব্যক্তি।

বনহুরের ভ্রু কুঁচকে উঠলো, লোকটাকে দেখলেই শয়তান বলে মনে হচ্ছে তার। বনহুর তাকিয়ে রইলো লোকটার দিকে।

লোকটা তখন বিড়বিড় করে কি যেন মন্ত্র পাঠ করে নূরীর চোখেমুখে ফুঁ দিচ্ছিলো। কি আশ্চর্য, অল্পক্ষণের মধ্যেই নূরী চোখ মেলে তাকালো।

লোকটা এবার নূরীকে হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে একটা গেলাসে পানির মধ্যে কিছুটা ঔষধ মিশিয়ে নূরীর সম্মুখে বাড়িয়ে ধরলো-খেয়ে নে।

নূরী গেলাসটা হাতে নিতেই বনহুর দ্রুত এগিয়ে গেলো এবং সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় গেলাসটা নূরীর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো দূরে।

মুহূর্তে শয়তান যাদুকর উঠে দাঁড়ালো দুচোখে তার আগুন ঝরে পড়ছে।

ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী স্তম্ভিত হলেন। মিঃ সেন কেনো একাজ করতে গেলো ভেবে পেলেন না।

অন্যান্য দর্শকগণও হকচকিয়ে গেলো।

নূরী তখন তন্দ্রাচ্ছন্নের মত তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে। কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছেনা। বনহুর কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে চলে গেলো সেখান থেকে।

বংশীবাদক অন্য কেহ নয়–শয়তান হরশঙ্কর।

হরশঙ্কর বনহুরের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত পিষলো। মুখভাব তখন তার পিশাচের চেয়েও ভয়ঙ্কর দেখা যাচ্ছিলো।

সেদিন আর হরশঙ্করের নাচ-গান জমলো না।

বনহুর এ ব্যাপারের পর গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো। নিশ্চয়ই লোকটা কোন যাদুকর যাদুর মোহে নুরীকে সে তার সজ্ঞান অবস্থা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। না হলে নূরীর উপর সে এ ভাবে নির্মম ব্যবহার করতো না। বনহুরের মনে নূরীর প্রতি যে একটা অহেতুক রাগ হয়েছিলো সেটা এক্ষণে নষ্ট হয়ে গেলো-বুঝতে পারলো সে নূরী কোন শয়তান যাদুকরের মায়াচক্রে আবদ্ধ হয়েছে। যেমন করে হোক নূরীকে এই মায়াচক্রের আবেষ্টনী থেকে উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু তার উপায় কি নূরী তাকে কিছুতেই চিনতে পারছে না বা তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

বনহুর চিন্তাসাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলো। শয়তান লোকটাকে যেমন করে হোক পরাজিত করে নূরীকে উদ্ধার করা তার পক্ষে বিশেষ কোন কষ্টকর হবে না, কিন্তু নূরী যদি তার সঙ্গে না আসে কিংবা তাকে বিশ্বাস করতে না পারে তাহলে সব প্রচেষ্টা-সব সাধনা নষ্ট হয়ে যাবে।

সেদিন বৈকালে. ডেকের ধারে রেলিং ঠেশ দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো নূরী। দৃষ্টি তার সাগর বক্ষে সীমাবদ্ধ।

আশে পাশে কোন লোক নেই।

বনহুর নূরীকে লক্ষ্য করে ধীরে পদক্ষেপে এগুলো। পাশে এসে দাঁড়ালো নূরীর।।

চমকে ফিরে তাকালো নূরী, বনহুরকে দেখতে পেয়ে দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করতে যাচ্ছিলো।

বনহুর নূরীর দক্ষিণ হাত মুঠায় চেপে ধরলো—নূরী, যেওনা।

নূরী বিরক্তপূর্ণ চোখে তাকালো বনহুরের দিকে।

বনহুর পুনরায় ব্যাকুল কণ্ঠে বললো—নূরী আমাকে তুমি চিনতে পারছে? আমি–চাপা কণ্ঠে বলে উঠে সে আমি বনহুর।

নূরী বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে চিনবার জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই সে. স্মরণ করতে পারে না-কোথায় কখন তাকে দেখেছে বা তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ ছিলো কিনা মনে পড়ে না কোন কথা।

এমন মুহূর্তে অদূরে দেখা যায় হরশঙ্করকে সে নূরীকে তার কক্ষে না দেখে হন্তদন্ত হয়ে ডেকের দিকে আসছিলো। তখনকার সেই যুবকের পাশে নূরীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হরশঙ্করের চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠলো।

নূরীকে উদ্দেশ্য করে ইংগিত করলো হরশঙ্কর।

নূরী আর দাঁড়ালো না, চলে গেলো সেখান থেকে।

বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো।

হরশঙ্কর একবার কটমট করে বনহুরের দিকে তাকিয়ে চলে গেলো সেখান থেকে।

০৫.

যে কোন বন্দরে জাহাজ পৌঁছানোর পূর্বেই নূরীকে উদ্ধার করতে হবে, না হলে শয়তান ওকে নিয়ে উধাও হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যতক্ষণ না নূরী স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে পেয়েছে ততক্ষণ তাকে রক্ষা করবার কোনো উপায় নেই। এ কদিন বনহুর নূরীকে, আরও আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেছে নূরী বনহুরকে আজও চিনতে পারেনি।

এক সপ্তাহ হলো জাহাজ আন্দাম বন্দরে থেকে যাত্রা করেছে। এর মধ্যে কোন বন্দরে জাহাজ নোঙ্গর করেনি। বনহুর সতর্ক দৃষ্টি সব সময় হরশঙ্কর ও নূরীকে অক্টোপাশের মত ঘিরে রেখেছে। এমনকি বনহুরের রাতের নিদ্রা অন্তর্ধান হয়েছে। সদা-সর্বদা সে সজাগ রয়েছে কোন সময় যেন শয়তান লোকটা নূরীকে নিয়ে পালাতে না পারে।

বনহুরের শ্যেন্য দৃষ্টি নূরী এবং হরশঙ্করের উপরে যেমন রয়েছে তেমনি হরশঙ্করও বনহুরকে সদা লক্ষ্য রেখে চলেছে। বনহুরের আচরণ তার কাছেও সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে। জাহাজে কত না লোক আছে–কেউ তো তাকে এ ভাবে ফলো করে না বা তার কার্যকলাপে কোন রকম আপত্তি করে না। কিন্তু ঐ যুবকটা কেনো তার সঙ্গে এমনভাবে লেগে রয়েছে। হরশঙ্করও কম লোক নয় সেও ওকে দেখে নেবে।

সেদিন রাতে ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী যাত্রিগণকে জানিয়ে দিলেন আর দুদিন পর জাহাজ কাংঙ্গেরী চাই বন্দরে পৌঁছবে তারপর সেখানে চব্বিশ ঘন্টা অবস্থান করার পর পুনরায় লুইয়া বন্দর অভিমুখে যাত্রা করবে কাংঙ্গেরী।

বনহুর বুঝতে পারলোকান্দাই পৌঁছতে কাংঙ্গেরীর এখনও একমাসের বেশী সময় লাগবে। কিন্তু কান্দাই পৌঁছবার পূর্বেই নূরীকে উদ্ধার করে নিতে হবে।

হঠাৎ একটা শব্দে বনহুরের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়লো। রাত এখন দুটোর বেশী হবে। বনহুর নিজের ক্যাবিনে বসে কাঁচের শার্শীর ফাঁকে তাকিয়ে ছিলো ডেকের ওদিকে যেখান থেকে নূরীর কক্ষ দেখা যায়। বনহুর কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো। শব্দটা তারই ক্যাবিনের দরজার বইরে থেকে আসছিলো। বনহুর বুঝতে পারলে কেউ তার ক্যাবিনের দরজা বাইরে থেকে খোলার চেষ্টা করছে।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে বনহুর নিজের শয্যায় এসে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো। চাদরের ফাঁকে চোখ দুটি সে সজাগ করে রাখলো। দক্ষিণ হাতখানা বালিশের পাশে রইলো যেখানে রয়েছে বনহুরের জমকালো রিভলভার খানা।

ক্যাবিনের দরজা খুলে গেলো।

অতি লঘু পদক্ষেপে কক্ষে প্রবেশ করলো একটা ছায়ামূর্তি সমস্ত শরীর তার কালো আলখেল্লায় ঢাকা। বনহুর চাদরের নীচে চমকে উঠলো, এই আলখেল্লাধারীকেই সে একদিন জাহাজের ডেকে আত্মগোপন করে বেরাতে দেখেছে। কি অভিসন্ধি নিয়ে তার ক্যাবিনে প্রবেশ করেছে এই ছায়ামূর্তি! বনহুর আপন মনে একটু হাসলো।

লোকটা সতর্ক চোখে তাকালো শয্যার দিকে, তারপর অতিলঘু পদক্ষেপে এগিয়ে গেলো টেবিলের পাশে। আলখেল্লাধারী এবার অতি সাবধানে টেবিলে থেকে সিগারেট কেসটা তুলে নিলো হাতে-তারপর কি যেন করলো লোকটা সিগারেট কেসটা পুনরায় টেবিলে রেখে বেরিয়ে গৈলো বাইরে।

বনহুর সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলো। ইচ্ছে করলে আলখেল্লাধারী যেই হোক তাকে কাবু করার তার পক্ষে কোনই কষ্টকর ছিলোনা, কিন্তু তাকে ধৈর্য ধরতে হলো, কাজ এখনও শেষ হয় নাই।

লোকটা ক্যাবিন ত্যাগ করতেই বনহুর শয্যা ছেড়ে নেমে দাঁড়ালো। সিগারেট—কেসটা হাতে তুলে নিয়ে একবার দেখলো একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠে মিলিয়ে গেলো বনহুরের ঠোঁটের কোণে। সিগারেট কেসটা : প্যান্টের পকেটে রেখে দ্রুত সেও ক্যাবিনের বাইরে বেরিয়ে এলো, সম্মুখে তাকাতেই দেখলো-ছায়ামূর্তি দ্রুত সম্মুখের একটা ক্যাবিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বনহুর আর একদন্ড দেরী না করে রেলিং এর আড়ালে আত্মগোপন করে আলখেল্লাধারীকে অনুসরণ করলো।

একি! এ যে ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরীর ক্যাবিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপার কি! তাহলে কি মুঙ্গেরীকেও হত্যা করবার চেষ্টা চলেছে? ক্যাবিনের নিকটে এসেই আলখেল্লাধারী যেন হাওয়ায় মিশে গেলো।

বনহুর আড়ালে দাঁড়িয়ে ভাবলো–তার চোখেও ধুলো দিলো, এমন জন। এই আলখেল্লাধারী। কিন্তু ততক্ষণ বা কদিন বনহুরের দৃষ্টির আড়ালে আত্মগোপন করে থাকবে?

বনহুর ফিরে এলো নিজের ক্যাবিনে।

এবার বড় লাইটটা জেলে সিগারেটকেসটা হাতে তুলে নিলো বনহুর। একটা সিগারেট হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো–না, সিগারেটগুলি সম্পূর্ণ নিখুঁত রয়েছে। কিন্তু এ সিগারেটগুলি যে তার নিজস্ব সিগারেট নয় তার বেশ বুঝতে পারলো বনহুর। এগুলো নিশ্চয়ই কোন মারাত্মক বিষ দ্বারা তৈরী তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর একটা সিগারেট পান করলেই মৃত্যু তার অনিবার্য।

বনহুর সিগারেটগুলি সিগারেটকেস থেকে বের করে নিক্ষেপ করলো কাছের শার্শী দিয়ে সাগরবক্ষে। তারপর ক্যাবিনের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে শার্শী খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে। ডেকের রেলিংএর রড এগুলো—একটু পা ফসকে গেলেই অথৈ জল রাশি। নীচেই ইঞ্জিনের দাঁতওয়ালা চাকা, একবার যদি পড়ে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের চাকার মধ্যে দেহটা নিষ্পেষিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বনহুর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রেলিং বেয়ে এগুতে লাগলো। যেমন করে হোক নূরীর কক্ষে তাকে পৌঁছতে হবে।

ক্যাবিনের সম্মুখ ভাগ দিয়ে গেলে নিশ্চয়ই সে আলখেল্লাধারী তাকে দেখে ফেলবে বা দেখে ফেলতে পারে। কাজেই বনহুর এই পথে নূরীর ক্যাবিনের দিকে এগুচ্ছে। নূরীর ক্যবিনে পৌঁছতে আরও দুটি ক্যাবিন পার হয়ে তবে যেতে হবে। হঠাৎ বনহুরের কণ্ঠে ভেসে আসে চাপা গম্ভীর কণ্ঠস্বর। দুজন পুরুষ গুরুগম্ভীর গলায় কোনকিছু আলোচনা করছে বলে মনে হলো।

বনহুর অতি সাবধানে রেলিংএর উপর দিয়ে ক্যাবিনটার পিছনে শার্শীর পাশে এসে পৌঁছলো। একবার নীচে তাকিয়ে দেখে নিলো সে। নীচে অসীম জলরাশি গর্জণ করে ছুঁটে চলেছে। জাহাজের ইঞ্জিনের ঝক ঝক শব্দ আর ঝাকুনি বনহুরের দেহে এবং মনে এক অদ্ভুত আলোড়ণ সষ্টি করে চলেছিলো। অতি মনোযোগ সহকারে কান পাতলো বৃনহুর পিছনে শার্শীর ফাঁকে শুনতে পেলো কে যেন গম্ভীর চাপা গলায় বলছে–বন্দরে পৌঁছবার আগেই ওকে সরাতে হবে। অন্য আর একটি কন্ঠ–বোট নৌকাখানা তাহলে জাহাজের পিছনে অংশে বেঁধে রাখলেই চলবে। পূর্বের কণ্ঠ হ পিছনেই বোট-নৌকা বাধা থাকবে। তারপর গভীর রাতে মেয়েটিকে নিয়ে বোটে চাপতে হবে। দ্বিতীয় ব্যক্তির গলায় আওয়াজ– মেয়েটি সজ্ঞানে এভাবে বোটে চাপতে রাজি হবেনা। অন্য কণ্ঠ—না, ওকে অজ্ঞান অবস্থায় নিতে হবে বুঝলে? কাল রাত দুটো মনে রেখো।

বনহুর বুঝতে পারলো, নূরীকে সরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নিশ্চয়ই তার গতিবিধি ওরা ধরে ফেলেছে। জাহাজ বন্দরে পৌঁছার পূর্বেই একাজ তারা সমাধা করবে।

বনহুরের কানে এলো আবার প্রথম ব্যক্তির কণ্ঠ-লোকটাকে আমার প্রথম থেকেই কেমন সন্দেহ হয়েছিলো। মায়ার নাচ দেখেই লোকটা কেমন। যেন গম্ভীর হয়ে পড়লো।

বনহুরের ঠোঁটের কোণে এবার একটা হাসির ক্ষীণ রেখাফুটে উঠলো। আর শোনার কিছু নেই। বনহুর অতি সাবধানে এগুলো এবার নিজের ক্যাবিনের দিকে। আজ আর চিন্তার কিছু নেই,কালকের জন্য তাকে তৈরী হতে হবে।

ক্যাবিনে ফিরে এসে সিগারেট কেসটায় সিগারেট ভর্তি করে টেবিলে রাখলো বনহুর, তারপর শয্যায় শুয়ে পড়লো নিশ্চিন্ত মনে।

পরদিন বেলা অনেক হয়ে গেছে তবু ঘুম ভাংছেনা বনহুরের।

ক্যাবিনের দরজায় এসে দাঁড়ালো ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী মৃদু টোকা দিয়ে ডাকলেন —মিঃ সেন, মিঃ সেন?

বনহুর পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করলো।

পুনরায় ক্যাবিনের দরজায় টোকা পড়লো—মিঃ সেন?

দরজায় ধাক্কা দিতেই খুলে গেলো। মুঙ্গেরী ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ করে দ্রুত এগিয়ে গেলো শয্যার দিকে মিঃ সেন, মিঃ সেন? গলায় তাঁর উৎকণ্ঠা ভাব।

ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরীর ধাক্কায় গা মোড়া দিয়ে পাশ ফিরে উঠে বসলো বনহুর হাই তুলে বললো-ক্যাপ্টেন।

গুডমর্নিং, মিঃ সেন।

গুডমর্নিং, বড়ড় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বসুন ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী, বসুন।

মুঙ্গেরী আসন গ্রহণ করেন।

বনহুর শয্যা ত্যাগ করে সোফায় এসে বসলো। টেবিল থেকে সিগারেট–সেটা হাতে তুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরলো মিঃ মুঙ্গেরীর দিকে–নিন।

থ্যাঙ্ক ইউ। সিগাটে আমার কাছেই আছে। কথা শেষ করে নিজের পকেট থেকে সিগাটে-কেসটা বের করে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলেন ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী।

বনহুর একটা সিগারেট নিজের কেস থেকে নিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরলো।

ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরীর মুখমন্ডল ক্ষণিকের জন্য বিবর্ণ হলো যেন, পর মুহূর্তেই নিজকে সামলে নিয়ে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে ম্যাচের কাঠিটা বাড়িয়ে ধরলো বনহুরের ঠোঁটে চেপে ধরা সিগারেটটার দিকে।

বনহুর একটু নীচু হয়ে নিজের সিগারেটটা ক্যাপ্টেনের বাড়িয়ে ধরা ম্যাচে কঠি থেকে অগ্নি সংযোগ করে নিলো। এক মুখ ধোয়া ছেড়ে বললো বনহুর-আজ গোটারাত ঘুমিয়েছি ক্যাপ্টেন–আপনি?

আমিও ঘুমিয়েছি মিঃ সেন।

সুখনিদ্রা —কি বলেন?

হাঁ মিঃ সেন। কথার ফাঁকে ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর সিগারেট থেকে ধুমরাশি নিক্ষেপ করলো সামনের দিকে।

ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী উঠে দাঁড়ালো—আমি একটু কাজে যাচ্ছি মিঃ সেন, পুনরায় অর্ধঘন্টা পর ফিরে আসছি।

আচ্ছা ক্যাপ্টেন।

গুডবাই। অস্ফুট কণ্ঠে বললো বনহুর—গুড বাই।

০৬.

গভীর রাত।

বনহুর বার বার হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। একবার সে প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে রিভলভারের অস্তিত্ব অনুভব করে নিলে। আজ আকাশের অবস্থা খুব ভাল নয়। সন্ধ্যার পর থেকে কেমন একটু ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ঝড় তুফান না হলেও দুর্যোগপূর্ণ রাত এটা।

সমস্ত জাহাজটা নিস্তব্ধ নিঝুম।

জাহাজের একটানা ঝক ঝক শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছেনা। জাহাজের ঝক ঝক শব্দের মধ্যে তলিয়ে গেছে বৃষ্টির ঝুপ ঝাপ শব্দটা।

বনহুর ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এলো বাইরে।

অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চললো পিছনে ডেকের দিকে।

কেউ যেন তাকে দেখে না ফেলে এইভাবে অতি সাবধানতার সঙ্গে আত্মগোপন করে চলেছে বনহুর।

ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরীর ক্যাবিনের সম্মুখে এসে থামলো।

দক্ষিণ হাতখানা প্যান্টের পকেটে প্রবেশ করিয়ে বের করে আনলো গুলীভরা রিভলভারখানা তারপর অতি দ্রুত প্রবেশ করলো ক্যাবিনের মধ্যে।

ক্যাবিনের মেঝে তখন দাঁড়িয়ে আছে জমকালো পোষাক পরা একটি মূর্তি।

বনহুরকে উদ্যত রিভলভার হাস্ত ক্যবিনে প্রবেশ করতে দেখে আলখেল্লাধারীর চোখ দুটো আগুনের, ভাটার মত ধক করে জ্বলে উঠলো। মুহূর্ত বিলম্ব না করে ঝাপিয়ে পড়লো আলখেল্লাধারী বনহুরের উপর।

বনহুর চট করে সরে দাঁড়ালো এক পাশে।

অলখেল্লাধারী হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো ভূতলে।

বনহুর সেই দন্ডে চেপে বসলো আলখেল্লাধারীর বুকের উপর। বাম হতে টিপে ধরলো ওর গলা, দক্ষিণ হস্তে গুলীভরা রিভলভারখানা আলখেল্লাধালীর কণ্ঠনালীতে চেপে ধরে আলখেল্লাধারীকে কাবু করে ফেললো।

বনহুরের সঙ্গে পেরে উঠা সহজ ব্যাপার নয়।

বনহুরের বাম হাতখানা আলখেল্লাধারীর গলায় সাড়াশীর মত এটে বসলো।

বনহুর এবার দুই হাতে টিপে ধরলো ওরা গলা।

খানিকক্ষণ ছট ফট করে নীরব হয়ে গেলো আলখেল্লাধারীর দেহটা।

এবার বনহুর দ্রুতহস্তে আখেল্লাধারীর মুখের আবরণ উন্মোচন করে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো–শয়তান, ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী সেজে খুব বাহাদুরী করছিলে।

এবার বনহুর দ্রুত হস্তে মৃত মুঙ্গেরীর শরীর থেকে ঐ ড্রেস খুলে নিয়ে নিজে পরে নিলো। ক্যাবিনের আয়নায় দাঁড়িয়ে দেখলো, না আর তাকে চিনবার কোন উপায় নেই।

বনহুর এবার রিভলভার পকেটে রেখে ক্যাবিনের একপাশে এগিয়ে গেলো। সম্মুখেই একটা চাকার আকারে জিনিস নজরে পড়লো তার। বনহুর দ্রুত চাকার মত জিনিসটায় চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা তক্তা খসে পড়লো। ভিতরে একটা খুপড়ীর মত কুঠি জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় মেঝেতে পড়ে রয়েছে একটি লোক। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ দুটো কোঠরাগত; বুকের হাড় কখানা যেন গোনা যাচ্ছে। বনহুর ভূতলে লুণ্ঠিত লোকটার পাশে হাটু গেড়ে বসে ক্ষিপ্রহস্তে ওর শরীরের বাধন মুক্ত করে দিলো। লোকটা ক্ষীণ কণ্ঠে বললো-পানি–

বনহুর পাশের ক্যাবিনে প্রবেশ করে এক গ্লাস পানি নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে গেলো লোকটার পাশে। হাতে দিয়ে বললো-খাও।

এক নিশ্বাসে গ্লাসের পানিটুকু পান করে বললো—শয়তান, কেনো তুমি আমাকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছো? আমাকে তার চেয়ে হত্যা করো।

বনহুর বুঝতে পারলো, আলখেল্লাধারী একে এই কুঠরিতে আটকে রেখে ভয়নক কষ্ট দিয়েছে।

বনহুর লোকটাকে বললো এবার আর তোমাকে কষ্ট দেবোন, তুমি মুক্ত।

লোকটা হাত-পায়ের বন্ধন মুক্ত হওয়ায় অনেকটা শান্তি পাচ্ছিলো। হাতে এবং পায় হাত বুলিয়ে বললোসত্যি তুমি আমাকে মুক্ত করে দিলে?

হাঁ, ক্যাপ্টেন মুঙ্গেরী আপনি মুক্ত। আর সেই শয়তান নকল মুঙ্গেরীকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত দিয়েছি।

তাহলে তুমি—তুমি কে?

আমি দস্যু বনহুর।

দস্যু বনহুর।

হাঁ, ভয় পাবার কিছু নেই।

কিন্তু–

আমি এই মুহূর্তে জাহাজ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি।

তুমি–চলে–যাচ্ছো? টেনে টেনে কথাটা বললেন মিঃ মুঙ্গেরী।

হাঁ বন্ধু। কথা শেষ করে বনহুর হাতঘড়িটার দিকে তাকালোদুটো বাজতে মাত্র কয়েক মিনিট বাকী।

বনহুর জাহাজের পিছন ডেকে এসে দাঁড়ালো।

দেখতে পেলো, একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। আলখেল্লাপরা বনহুরকে দেখে সরে এলো দ্রুত গতিতে তারপর বললো—এতো বিলম্ব হলো কেন তোমার?

কণ্ঠস্বরে বনহুর চিনতে পারলো এটাই সেই বংশীবাদক-নূরীর নৃত্যকালে বাঁশী বাজাতো।

বনহুর চাপা কণ্ঠে বললো—হঠাৎ মিঃ সেন অজ্ঞান হয়ে পড়ায়—

তাহলে সিগারেটের বিষক্রিয়া এতোক্ষণে শুরু হলো?

হাঁ, সেই রকম মনে হচ্ছে।

বেটা ঘুঘু দেখেছিলো কিন্তু ফাঁদ দেখেনি। আমার পিছনে লেগেছিলো সে, লোভ-মেয়েটিকে হস্তগত করা।

আমারও সেই রকম মনে হয়েছিলো। আচ্ছা সর্দার—

হেসে উঠলো ইরশঙ্কর—তুমি আবার সর্দার বলা শিখলে কবে থেকে?

আলখেল্লার মধ্যে বনহুর বিব্রত বোধ করলো। সর্বনাশ তার কথাটা তাহলে ভুল হয়েছে। তাড়াতাড়ি বললো বনহুর–আমি এখন থেকে সর্দার বলেই ডাকাবো।

কেনো হে, তুমি কি আমাকে সম্মান দেখাচ্ছো? পূর্বে যেমন হরশঙ্কর বলে ডাকতে তাই ডেকো। কিন্তু আর বিলম্ব নয়, সময় হয়ে এসেছে।

এদিকের সব কাজ ঠিকভাবে হয়ে গেছে তো? মানে ওকে বোটে উঠানো হয়েছে? কথাগুলো অতি সাবধানে বললো বনহুর।

হয়েছে। এদিকের সব কাজ শেষ-শুধু তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

তাহলে চলো বন্ধু।

আজ তোমাকে বেশ খুশী খুশী লাগছে কেশব। এমন না হলে চলে!

বললো আলখেল্লাধারী বনহুর—এতোক্ষণ মিঃ সেন হয়তো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

তাই বুঝি এতো আনন্দ?

হাঁ হরশঙ্কর কিন্তু এখন আমাদের জাহাজ ত্যাগ না করলেও চলতো। পথের কাঁটা দূর হলো তো?

এরি মধ্যে ভুলে গেলে সব কথা। আসছে পূর্ণিমায় আমার যোগিণী পূজা আছে। তার পূর্বে আমাকে আশ্রমে পৌঁছতে হবে। না হলে আমার যাদুর মায়াচক্র নষ্ট হয়ে যাবে।

তাহলে যাত্রা শুরু না করলেই পারতে হরশঙ্কর। কি দরকার ছিলো এ জাহাজে এসে?

হেসে উঠলো হরশঙ্কর–তুমি এমন হয়ে গেলে কবে থেকে, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? জাহাজে আসার উদ্দেশ্যটাও ভুলে গেছো দেখছি।

ওঃ এবার সব মনে পড়েছে। চলো আর দেরী করা ঠিক নয়। মনে পড়ছে বললো বটে বনহুর, কিন্তু কেনো শয়তান হরশঙ্কর এ জাহাজে আশ্রয় নিয়ে এতোদূর এসে আবার ফিরে যাচ্ছে সেটা এখনও সে বুঝতে পারলোনা।

সেটা বুঝলে মোটর বোটে বসে।

হরশঙ্কর নিজে ইঞ্জিনে গিয়ে বসলো।

বোটের মধ্যে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে একটি নারীমূর্তি। বনহুর বুঝতে পারলো-নূরী ওটা। ওর দুপাশে দুটি বলিষ্ঠকায় লোক বসে। আলখেল্লাধারী বনহুর বসলো এক পাশে।

মোটর বোটখানার তলায় স্তুপকার নানা ধরনের মূল্যবান সামগ্রী। স্যুটকেস, ব্যাগ, নানা রকমের আরও কত কি রয়েছে। বনহুর বুঝতে পারলো-এগুলি চুরি করার জন্যই শয়তান হরশঙ্কর এ জাহাজে আশ্রয় নিয়ে লোককে নাচ-গান শুনিয়ে মাতিয়ে রাখতো। আসল উদ্দেশ্য হলো এ সব লুটে নেওয়া।

বনহুর নীরবে বসে রইলো, এই মুহূর্তে সে এদের তিন জনকে কাবু করে সাগরের জলে নিক্ষেপ করতে পারে কিন্তু তাহলে তার সব উদ্দেশ্য সফল হবেনা। নূরী এখন স্বাভাবিক জ্ঞানে নেই বিশেষ করে ওকে নিয়ে বড় অসুবিধা হবে হয়তো হিতে বিপরীত হতে পারে। নূরী সাগরবক্ষে ঝাপিয়েও পড়তে পারে-কাজেই বনহুর নিশ্চুপ রইলো।

চলন্ত জাহাজের পিছনে উচ্ছল জলরাশির বুকে মোটর বোটখানা ছোট্ট একটা কুটোর মত দোল খাচ্ছিলো।

জাহাজ থেকে মোটর-বোটখানা খুলে নেওয়া হলো।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরপাক খেয়ে মোটর বোটখানা ছিটকে গেলো প্রায় এক শত গজ দূরে।

হরশঙ্কর কৌশলে ইঞ্জিন ঠিক রেখে ডুবু ডুবু মোটর বোট-খানাকে সামলে নিলো।

বনহুর অবাক না হয়ে পারলোনা, অতি দক্ষ শয়তান এটা বুঝতে পারলো।

নূরী পড়তে যাচ্ছিলো, বনহুর নূরীকে ধরে ফেলেছিলো অতি সাবধানে। মোটর-বোটখানা সোজা হতেই বনহুর নূরীকে ছেড়ে দিলো ক্ষিপ্রগতিতে। অন্য কেউ লক্ষ্য করবার পূর্বেই সে একাজ করে ফেললো।

নূরী চীকার করেছিলো বটে, কিন্তু কিসের ভয়ে সে চীৎকার করেছিলো কেউ বুঝতে পারলোনা। মোটর-বোট ডুবে যাওয়ার ভয়ে না, আলখেল্লাধারী তাকে ধরে ফেলেছিলো সেই জন্যে। অন্য কেউ না বুঝলেও বনহুর বুঝতে পেরেছিলোনূরী তাকেই দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলো।

মোটর বোট থেকে লক্ষ্য করলো বনহুর, জাহাজখানা ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছে।

তীর বেগে ছুটে চলছে মোটর বোটখানা।

হরশঙ্কর দক্ষ মোটর-বোট চালকের মত বোটখানা চালিয়ে চলেছে।

এক সময় বললো হরশঙ্করের একজন অনুচর-গুরুদেব তোর হবার পূর্বেই কি আমরা আশ্রমে পৌঁছতে সক্ষম হবো?

হাঁ মহন্ত হবো। বললো হরশঙ্কর।

অন্য একজন অনুচর বলে উঠলো—গুরুদেব, আমাদের বন্ধ্যা বন ছেড়ে মহানগর কত দূর ছিলো?

পুনরায় হরশংকর জবাব দিলো-হাজার হাজার মাইল দূরে। আমরা প্রায় এক সপ্তাহ কাল চলে মহানগরে পৌঁছেছিলাম। এ কথা নিশ্চয়ই তোমাদের স্মরণ আছে?

হাঁ গুরুদেব, আছে।

এবার বললো আলখেল্লাধারী বনহুরহরশঙ্কর আমরা জাহাজে বন্ধ্যা বনের–

হাঁ কেশব, আমরা জাহাজে আমাদের বন্ধ্যা বনের অতি নিকটে এসে গেছি। ভোর হবার পূর্বেই আমরা আশ্রমে পৌঁছবো আশা করি।

হরশঙ্করের কথা সত্য হলো।

অবিরাম গতিতে মোটর বোটখানা চালিয়ে হরশঙ্কর ভোর হাবার কিছু পূর্বে বন্ধ্যা বনের ধারে এসে নেমে পড়লো।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো বনহুর। পথে দিনের আলো ফুটে উঠলো আত্মগোপন করায় অসুবিধা হতো তার।

হরশঙ্করের সঙ্গে এগিয়ে চললো তার অনুচরদ্বয় ও নূরী। পিছনে আলখেল্লাধারী বনহুর।

সুন্দর বনটা, কোথাও এতোটুকু আগাছা বা ঝোপঝাড় নেই। মনে হচ্ছে কেউ যেন গোটা বনটা পরিস্কার করে রেখেছে।

এই সেই বন।

যে বনে নূরী মনিকে নিয়ে প্রথম পদার্পণ করেছিলো, যে বনে সন্ন্যাসী বাবাজী তাকে আশ্রয় দিয়েছিলো এই সেই বন-বন্ধ্যা এর নাম।

বেশ কিছু দূর এগুনোর পর হরশঙ্কর পূর্বদিকে অগ্রসর হলো।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো অন্যান্য অনুচারগণ ও নূরী। অগত্যা বনহুরও দাঁড়িয়ে পড়লো।

হরশঙ্কর আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে গহণ বনের অন্তরালে অদৃশ্য হলো।

অনুচরদ্বয় নূরীসহ অগ্রসর হলো পশ্চিমে।

বনহুরও তাদেরকে অনুসরণ করলো।

০৭.

মনিরা সন্তানকে ফিরে পেয়ে খুশীর অন্ত নেই তার। এটাই যে তার নূর তাতে কোন সন্দেহ নেই। এক বছরের শিশু নূরকে যখন হারিয়েছিলো মনিরা তখন নূরের শিশু মুখ খানা আকাঁ ছিলো মায়ের হৃদয়পটে। সেদিন খেলা দেখতে গিয়ে মনিরার কিছুমাত্র ভুল হয়নি নূরকে চিনতে।

এতো সহজেই মনিরার তার নূরকে পাবে কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। মনিরা ভেবেছিলে নূরকে কপালিক সন্ন্যাসিগণ হত্যা করে ফেলেছে। আর কোনদিন তাকে ফিরে পাবে না। ঐ সুন্দর ফুটফুটে মুখখানা আর দেখতে পাবে না কোনদিন। কিন্তু সবই খোদার ইচ্ছা—তিনি কি না পারেন। তার ইচ্ছায় আজ মনিরা তার হারানো রত্ন ফিরে পেলো। হাজার হাজার শুকরিয়া করে মনিরা খোদার দরগায়।

শিশু নূরকে পেয়ে শুধু মনিরাই খুশী হয়নি, খুশী হয়েছেন মরিয়ম বেগম। তার সুপ্ত হৃদয়ে যেন আবার অনন্দের বান বয়ে চলছে। খুশীর অন্ত নেই। চৌধুরী বাড়ী বহুদিন পরে আবার শিশুর কলরবে মুখর হয়ে উঠেছে।

বৃদ্ধ সরকার সাহেবও আজ আনন্দে আত্মহারা।

চৌধুরী বাড়ীর সুখ-দুঃখের সঙ্গে তিনি যে নিবিড়ভাবে জড়ানো। এ বাড়ীতে যখন দুঃখ আর বেদনার ছায়া ঘনিয়ে আসে, বৃদ্ধ সরকার সাহেবের মন তখন ব্যথায় কুঁকড়ে যায়, মুখের সাদা হাস্যময় ভাব বিলুপ্ত হয় কোন অজানার অন্ধকারে। আবার যখন চৌধুরী বাড়ীতে খুশীর বান ডেকে যায় তখন সরকার সাহেবের মুখে হাসি ফুটে উঠে, আনন্দে তিনি ছোট্ট শিশুর মতই উৎফুল্ল হয়ে উঠেন।

নূরকে পেয়ে বৃদ্ধ সরকার সাহেব ছোট্ট শিশুর মতই আনন্দে মেতে উঠেন।

এতো সুখেও এ বাড়ীতে যেন এতোদিন কোন সুখ ছিলোনা। অভাব ছিলোনা কোন জিনিসের, তবু যেন সদা অভাব কিসের অনুভব করতো বাড়ীর সবাই।

সারাটা দিন চৌধুরী বাড়ীর হিসেব-নিকেশ নিয়ে এতোটুকু অবকাশ ছিলোনা সরকার সাহেবের—আজ এতো কাজের মধ্যেও প্রচুর সময় তিনি নূরকে নিয়ে কাটিয়ে দেন। নূরও সরকার সাহেবকে পেলে কোন কথা নেই, আনন্দে আত্মহারা হয় সে।

নূর সরকার সাহেবকে দাদু বলে ডাকে।

ড্রইংরুমে দাদু আর নাতি মিলে চলতো কত হাসি আর গল্প।

ভূত-প্রেত আর রাক্ষসের গল্প শুনতে ভালবাসতো নূর। যুদ্ধ আর লড়াইয়ের কথা শুনলে শিশু নূরের ধমনীর রক্ত যেন উষ্ণ হয়ে উঠতো।

সরকার সাহেবকে বলতো নূর-এসো দাদু, লড়াই করি।

হেসে বলতেন সরকার সাহেব-না দাদু, আমি তো বাঘ নই,যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে।

এসো না একটু দাদু।

নূর বৃদ্ধ সরকার সাহেবকে নাজেহাল ও পেরেশান করে তবে ছাড়তো।

বৃদ্ধ সরকার সাহেবকে হারিয়ে দিয়ে ছুটে যেতো নূর মায়ের পাশে–আম্মা আম্মা, আমি দাদুকে হারিয়ে দিয়েছি। দাদুকে হারিয়ে দিয়েছি।

মনিরা হাস্য উজ্জ্বল মুখে এগিয়ে আসে দুহাতে নূরকে কোলে তুলে নিয়ে বলে–ছিঃ দাদুকে বুঝি হারিয়ে দিতে আছে।

ততক্ষণে বৃদ্ধ সরকার সাহেব এসে দাঁড়ান মা ও পুত্রের পাশে, মিষ্টি হেসে বলেন—মা মনিরা, তোমার ছেলে বড় হলে মস্ত একজন বীর পুরুষ হবে। এখন দাদুকে হারিয়ে দিয়ে জয়ী হয়েছে তখন হাজার হাজার সৈনিককে পরাজিত করে রাজ্যজয় করবেও।

হাসতো মনিরা।

মরিয়ম বেগমও এসে দাঁড়াতেন তাদের পাশে, তাঁর মুখেও তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠতো।

নূর মনিরার পাশে শুয়ে বলতো—আম্মা আমার কিন্তু আর একটা মাম্মা ছিলো ঠিক তোমার মত।

নূরের উপর থেকে যাদুকরের যাদুক্রিয়া দূর হয়ে যাওয়ায় এখন তার মনে পড়তো নূরীর কথা। মাঝে মাঝে নূরীর জন্য মন খারাপ হতো শিশু নূরের।

সেদিন মনিরা খোলা জানালার পাশে দুগ্ধ-ফেননি বিছানায় শুয়ে আছে। কোলের কাছে নূর।

আকাশে দ্বাদশীর চাঁদ হাসছে।

জোছনার আলো এসে পড়েছে মনিরা ও নূরের মুখে।

মনিরা নূরের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছে আর এক জনের কথা—যার দান এই অমূল্য রত্ন। না জানি সে আজ কোথায় কেমন আছে। বেঁচে আছে কিনা তাই বা কে জানে।

শিশু নূরের ছোট্ট সুন্দর ললাট থেকে কোঁকড়ানো চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে মনিরা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো। গন্ড বেয়ে গড়িয়ে এলো দুফোটা অশ্রু।

এমনি আরও বহুদিন মনিরা তার স্বামীর জন্য নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেছে। কিন্তু শিশু নূরের সম্মুখে সে কোন দিন চোখের পানি ফেলে নি। যতদূর সম্ভব

মনিরা নিজকে সংযত করে রাখতো নূরের কাছে।

আজ মনিরার চোখে অশ্রু দেখে বললো নূর—আম্মা, তুমি কাঁদছো!

তাড়াতাড়ি চোখের পানি মুছে ফেলে বললো মনিরা-কই না তো। এমনি চোখে কুটো পড়েছিলো বাবা।

আম্মা, আমার কিন্তু আর একটা মাম্মা ছিলো ঠিক্ তোমার মত।

আমার মত?

হাঁ, মাম্মা সুন্দর গান জানতো। আমি না ঘুমোলে মাম্মা গান গেয়ে আমাকে ঘুম পাড়াতো।

আশ্চর্য হয়ে শোনে মনিরা, শিশু নূরকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলে সে-আচ্ছা নূর–

দুহাতে মনিরার গলা জড়িয়ে ধরে বলে নূর আম্মা, তুমি আমাকে নূর বলে ডাকো কোনো? আমার নাম যে মনি, মাম্মা আমাকে মনি বলে ডাকতো।

অবাক হয়ে শুনতো মনিরাকে সে নারী, যে তার সন্তানকে এতো স্নেহ-আদর দিয়ে মানুষ করেছে। ঐ শয়তান যাদুকরের সঙ্গে সে নারীর কি সম্বন্ধ কে জানে।

মনিরা বললো-বাপ, আমি তোমার নাম নূর রাখলাম। কেনো নূর নামটা তোমার ভাল লাগে না?

বেশ, তুমি আমাকে নূর বলে ডেকো আর মাম্মা আমাকে মনি বলে ডাকবে, আমার দুটো নাম হবে—কি সুন্দর, তাই না? তুমি নূর আর মাম্মা মনি–শুনো আম্মা, মাম্মা আমাকে অনেক ভালবাসতো।

আমি তোমাকে একটুও ভালবাসতে পারিনা তাই না?

তুমিও ভালবাসো। কিন্তু গান গাইতে জানো না, তাই—

তাই আমাকে ভাল লাগে না বুঝি?

আমার মাম্মার জন্য মন কেমন করছে।

শিশু নূর মুখখানা গম্ভীর বিষণ্ণ করে ফেললো।

মনিরা বুকে চেপে ধরে বললো-ওরে আমি যে তোর মা।

না, আমার মাম্মা আছে। আমি তার কাছে যাবো।

কোথায় আছে তোমার সেই মাম্মা?

জানি না।

তা হলে কি করে যাবে তার কাছে?

আমি বুঝি কোন দিন মাম্মার কাছে যেতে পারবো না?

পারবে। তোমার মাম্মা আসবে।

আমাকে নিতে?

মনিরা শিউরে উঠে, জবাব দিতে পারে না।

নূর মায়ের মুখে হাত দিয়ে নাড়া দিয়ে বলে-মাম্মা আমাকে কবে নিতে আসবে আম্মা বলো?

আসবে। তুমি এখন ঘুমোও নূর।

না, আমার চোখে ঘুম আসছেনা।

গান গাইলে ঘুমাবে?

তুমি গান গাইতে জানো আম্মা?

একটু একটু জানি বাপ।

তবে গাও–আমি ঘুমোবো আম্মা। নুর চোখ বন্ধ করে।

মনিরা নূরের গায়ে মৃদু মৃদু দোলা দিয়ে গান ধরে। সুমিষ্ট মধুর সুরে গান মনিরা:

আমার নূর ঘুমাবে
আকাশে চাঁদ হাসবে।
হাস্নাহেনার গন্ধ নিয়ে
সমীরণ ভাসবে।
তারার দল মিটি মিটি
চেয়ে চেয়ে দেখবে।
আমার নূর ঘুমাবে।

এতো সুন্দর সুরে গাইতে পারে তার আম্মা ভাবতেই পারেনি নূর, আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে—তুমি এতো সুন্দর গান গাইতে জানো আম্মা! রোজ এমনি করে গান গাইবে—আমি ঘুমোবো।

আচ্ছা, তুমি ঘুমোও নূর, আমি গান গাইছি।

মনিরার গানের সুরে ঘুমিয়ে পড়ে নূর। মনিরা জোছনার আলোতে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকে পুত্রের ঘুমন্ত ঘুমের দিকে।

ধীরে ধীরে আনমনা হয়ে যায় মনিরা তাকায় জোছনায় ভরা আকাশের দিকে। চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে বনহুরের মুখখানা। মনে পড়ে অতীতে বিলীন হয়ে যাওয়া কত স্মৃতি–স্বামীর বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছে মনিরা। নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নেয় বনহুর ওকে মাথায় হাত বুলিয়ে ডাকে-মনিরা!

মনিরা মুখ তুলে তাকায় স্বামীর মুখের দিকে—বলো?

তুমি একি করলে মনিরা?

কেনো?

আমাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে তুমি ভুল করলে।

না, ভুল আমি করিনি। তোমাকে স্বামীরূপে পেয়ে আজ আমি ধন্য হয়েছি।

বনহুর মনিরার চিবুকটা তুলে ধরে—মনিরা।

মনিরা স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে অনুভব করে স্বর্গের শান্তি।

সব কথা মনের পর্দায় ভেসে উঠে মনিরার। কোথায় গেলো তার জীবনের স্বর্গসুখ। কোথায় গেলো তার এতো খুশী এতো আনন্দ–হাসিগান–

মনিরার বালিশ সিক্ত হয়ে উঠে চোখের পানিতে।

ঘুমন্ত নূরকে বুকে আঁকড়ে ধরে ডাকে মনিরা-বাপ আমার।

আকাশে চাঁদ তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে।

০৮.

বন্ধ্যার জঙ্গলে বনহুরকে ধরে রাখে এমন জন কেউ নেই। পিঞ্জরাবদ্ধ হিংস্র জন্ত ছাড়া পেলে যেমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে তেমনি দুর্দান্ত হয়ে উঠলো বনহুর।

হরশঙ্করের দলের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপন করলো সে বন্ধ্যার জঙ্গলে।

গাছের ফল আর ঝর্ণার জল হলো বনহুরের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের একমাত্র সম্বল। দিনের আলোতে সে লুকিয়ে থাকে গাছের শাখার অন্তরালে। রাতের অন্ধকারে নেমে আসে সে গহন বনের মধ্যে। চারিদিকে সর্তক দৃষ্টি নিয়ে বিচরণ করে বেড়ায় গোটা বনভূমি।

বনহুরের একমাত্র চিন্তা নূরীকে উদ্ধার করা।

কিন্তু যতক্ষণ নূরী তার স্বাভাবিক জ্ঞানে ফিরে না এসেছে ততক্ষণ বনহুর যেন নিরুপায়। নূরীকে জোর করে হরণ করতে পারে সে। পারলে কি হবে, তাকে নিয়ে এ বন ছেড়ে চলে যেতে হবে তো। চলে যাবার পথ কোথায়? বনপথে কিসে যাবে-ঘোড়া নেই। আর জল পথে যাওয়া যায় তবু নৌকা বা জলযানের প্রয়োজুন।

বনহুর নূরীর উদ্ধার চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লো। সুযোগ খুঁজতে। লাগলো-এই দলের নেতা হরশঙ্করকে হত্যা করবে নাহলে কোন উপায় নেই।

বনহুর দুষ্টজনকে হত্যা করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেনা। বরং আনন্দ লাভ করে।

বনহুর একদিন গভীর রাতে বন্ধ্যা বনের মধ্যে বিচরণ করে ফিরছিলো। অনেক সন্ধান করেও হরশঙ্করকে সে আজও আবিস্কার করতে সক্ষম হয়নি। আশ্চর্য হয়ে গেছে সে, লোকটা গেলো কোথায়।

গহন বনের মধ্যে একটা কাঠের তৈরী কুঠি নজরে পড়লো। বনহুর। জঙ্গলে আত্মগোপন করে কুঠিখানার নিকটে পৌঁছলো। বিস্ময়ে আরষ্ট হলে বনহুর কুঠির ফাঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলো–শুধু নূরী নয় অমনি আরও কতকগুলি যুবতীকে সেই কুঠিতে আটকে রাখা হয়েছে। যুবতীদের দেহে তেমন কোন বস্ত্র নেই প্রায় উলঙ্গের মত রয়েছে সবাই।

বনহুর লজ্জায় দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো।

আশ্চর্য, যুবতীগুলি যেন পাথরের মূর্তির মত চুপচাপ বসে আছে, কেমন এক তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব তাদের চোখে মুখে।

বনহুর নূরীর কথা স্মরণ করে আবার কুঠরীর মধ্যে তাকালো নূরীকে উদ্ধার করতে হলে লজ্জা তাকে বিসর্জন দিতে হবে।

বনহুর প্রতিটি নারীর উপর দৃষ্টি বুলিয়ে চললো। যদিও এটা তার অন্যায়, কোন পুরুষ নারীর যৌবন লুকিয়ে দেখা ঠিক নয়। বনহুরের দৃষ্টি হঠাৎ থেমে গেলো একটি যুবতীর উপর এই তো তার নূরী পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে বসে আছে এক পাশে জড়োসড়ো হয়ে।

বনহুরের চোখে পানি এলো,তার চিরচঞ্চল নূরী কোনদিন এমনতো ছিলোনা। কি হয়েছে তার কেনই বা সে তার স্বাভাবিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

বনহুর যখন এই সব কথা ভাবছে ঠিক সেই মুহূর্তে কুঠির দরজা খুলে গেলো।

কুঠির মধ্যে প্রবেশ করলো হরশঙ্কর ও আরও দুজন পুরুষ। কুঠির মধ্যভাগে একটি মশাল জ্বলছিলো। মশালের আলোতে বনহুর সব কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

হরশংকর কুঠির মধ্যে এসে দাঁড়ালো।

পিছনের একটি লোকের হাতে মস্তবড় একটি মাটির পাতিল। হরশঙ্কর ইংগিত করতেই পিছনের আর একজন লোক মাটির পাতিল হতে একটি গেলাসে তরল পদার্থ জাতীয় কিছু তুলে নিয়ে প্রতিটি মেয়ের মুখে ধরলো।

হরশংকর গুরুগম্ভীর কণ্ঠে গর্জে উঠলো-খাও।

যুবতী ভয় কাতর চোখে তাকালো হরশঙ্করের দিকে। তারপর নিঃশব্দে পান করলো তরল পদার্থ।

বনহুর কাঠের ফাঁকে তখনও নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে।

হরশঙ্কর যমমূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। আর লোক দুটি মাটির পাতিল থেকে তরল পদার্থ নিয়ে পান করাচ্ছে একজনের পর একজনকে।

বনহুরের দুচোখে বিস্ময় এবার বুঝতে পারলো সে শয়তান হরশঙ্কর কোন মারাত্মক রস দ্বারা এ সব যুবতীকে সংজ্ঞাহারা করে রেখেছে। প্রতিদিন সে এইভাবে এদের ঐ রস খাওয়ায়। এবং ইচ্ছামত যাকে খুশী নিয়ে গিয়ে শহরে নাচ–গান দেখিয়ে পয়সা উপার্জন করে তৎসহ করে চুরি ডাকাতি এমনি আর কত কি। রাগে বনহুরের শরীর জ্বালা করে দুচোখে তার আগুন ঠিকরে বের হয়।

বনহুর দেখলো, লোকটা এবার নূরীর দিকে গেলাস হাতে এগুচ্ছে।

বনহুর অধর দংশন করে।

লোকটা নূরীর মুখে গেলাস উঁচু করে ধরতেই বনহুরের রিভলবার থেকে একটা গুলী এসে বিদ্ধ হলো তার বুকে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো ভূতলে।

হরশংকর কুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জন করে ছুটে গেলো কুঠিরের বাইরে।

বনহুর তখন অদৃশ্য হয়েছে।

এরপর হরশঙ্কর বুঝতে পারলো-শত্রু তার অতি নিকটে পৌঁছে গেছে। তার অনুচরগণকে জানিয়ে দিলো এ বনের চারিদিকে তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করতে।

হরশঙ্কর গহন বনে থাকলেও তার বিরাট একটা দল আছে। তার অনুচরগণ এক এক জন এক একটী নারী নিয়ে কেউ বা শিশুদের নিয়ে নানা রকমের যাদু খেলা দেখাতে দূর হতে দূর দেশে চলে যায়।

এই দোল পুর্নিমায় সবাই দূর দেশ থেকে ফিরে আসে বন্ধ্যার জঙ্গলে। হরশঙ্কর নরহত্যা করে দোল পূর্ণিমায় তার পূজা শেষ করে।

হরশঙ্করের অনুচরগণ সবাই এখন বন্ধ্যার জঙ্গলে রয়েছে। গুরুদেবের আদেশ পাওয়া মাত্র সবাই ছড়িয়ে পড়লো গোটা বনের মধ্যে। কে এই শত্রু, যার গুলীতে তাদের একজন নিহত হলো।

কেউ বা বল্লম, কেউ বা শরকী, দা, কুঠার, খর্গ-যে যা পারলো তাই নিয়ে চষে ফিরতে লাগলো বনভূমি।

কিন্তু কোথায় কাউকে খুঁজে পেলো না।

সন্ধ্যার পূর্বে সবাই হরশঙ্করের সম্মুখে হাজির হলো।

নত মস্তকে সবাই জানালো বনভূমি তারা চষে ফেলেছে কিন্তু কাউকে পাওয়া যায় নি।

একজন অনুচর এগিয়ে এলো-গুরুদেব আমি কাউকে খুঁজে না পেলেও এমন একটা জিনিস পেয়েছি যার দ্বারা বোঝা যায়-আমাদের এই বন্ধ্যা জঙ্গলে কোন–

কথা শেষ হয় না লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় মাটিতে। লোকটার বুকের রক্তে রাঙা হয়ে উঠে বন্ধ্যা জঙ্গলের শুকনো মাটি।

হরশঙ্কর ও অন্যান্য অনুচরগন শুনতে পেয়েছিলো একটা গুলীর শব্দ, পরক্ষণেই লোকটা পড়ে গিয়েছিলো ভূতলে।

হরশঙ্কর ইংগিত করলো অনুচরগণকে যেতে। কিন্তু কোন দিক থেকে। গুলীটা এসেছিলো এটা কেউ বলতে পারলোনা। তবু সবাই বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে।

হরশঙ্কর এগিয়ে গেলো মৃতলোকটার দিকে, কি পেয়েছিলো। সে, যার জন্য তার মৃত্যু ঘটলো।

হরশঙ্কর ঝুকে পড়লো লোকটার হাতের উপর, দেখতে পেলো-একটা সিগারেটের টুকরা রয়েছে তার হাতের মুঠায়।

হরশঙ্কর মৃতের হাতের তালু থেকে সিগারেটের টুকরাটা তুলে নিয়ে হেসে উঠলো-হাঃ হাঃ হাঃ–হাঃ হাঃ হাঃ।

০৯.

যাদুকর হরশঙ্করের দল যখন সমস্ত বন খুঁজে খুঁজে হয়রান পেরেশান তখন বনহুর সুউচ্চ এক ডালের ঘন পাতায় ফাঁকে হেলান দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসে মৃদু মৃদু হাসছে। একবার রিভলবারটা খুলে দেখে নিলো-মাত্র আর তিনটা গুলী অবশিষ্ট রয়েছে। ইচ্ছা করলে এ গুলী তিনটা দিয়ে তিন জনকে পর পারে পাঠাতে পারে কিন্তু এতো শীঘ্র রিক্তহস্ত হলে তার চলবেনা। যতক্ষণ নূরীকে উদ্ধার করা না যায় ততক্ষণ তাকে এ গুলী কটি সাবধানে ব্যয় করতে হবে।

কিন্তু সেই দিনের পর থেকে আবার হরশঙ্কর উধাও হলো।

বনহুর আশ্চর্য হলো—লোকটা আবার গেলো কোথায়। যেখানেই থাক বনহুর, হরশঙ্করের উপর ছিলো তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বনহুর গাছের ডালে ডালে থেকে সর্তক অনুসন্ধান চালালো। এ মুহূর্তে নূরীকে উদ্ধার করা মোটেই কোন অসুবিধাজনক নয়। কিন্তু নূরীকে উদ্ধারের পূর্বে জানতে হবে—কে এই পাষন্ড নরপিশাচ? কোথায় এর বাস, কি উদ্দেশ্য এর? .

বনহুর একদিন গাছের শাখায় বসে তাকাচ্ছিলো দূর হতে দূর-যত দূর তার দৃষ্টি যায়। হঠাৎ নজর তার চলে গেলো অদূরে এক বটবৃক্ষতলে এক সন্ন্যাসীর উপর।

চমকে উঠলো বনহুর-সন্ন্যাসী বাবাজী এই গহণ বনে!

বনহুরের চোখদুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এই সমস্ত জঙ্গলে মহৎ ব্যক্তিও বাস করে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে মিলন আশায় উদগ্রীব হয়ে উঠলো বনহুর।

হঠাৎ বনহুর শুনতে পেলো একটা গুরুগম্ভীর কণ্ঠ–বস, এসো, আমি তোমার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছি।

বনহুর বিস্ময়ভরা চোখে তাকালো, তার এখানে উপস্থিতি সন্ন্যাসী বাবাজী জানলো কি করে। বনহুর বৃক্ষ শাখা ত্যাগ করে নেমে এলো নীচে।

সন্ন্যাসী বাবাজী বললো-বৎস তুমি ঐখানে উপবেশন করো। বনহুর বসে পড়লো আদুরে একটা গাছের গুড়ির পাশে।

সন্ন্যাসী বললো-বৎস, জানি তুমি কিসের সন্ধানে আজ এই বন্ধ্যার জঙ্গলে এসেছে।

বনহুরের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

কিন্তু বৎস, তুমি কোন সময় এ বনের পশ্চিম অংশে যাবে না।

বনহুর প্রশ্ন করলো—কেনো?

সন্নাসী বাবাজী বললো–ঐদিকে বিপদ আছে।

বিপদ!

হাঁ, মায়ারাণীর মায়াজালে জড়িয়ে পড়বে।

মায়ারাণীর মায়াজাল……..হঠাৎ অট্টহাসিতে ভেংগে পড়লো বনহুর। মুহূর্ত বিলম্ব না করে সন্ন্যাসীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। রিভলভার চেপে ধরলো সন্ন্যাসীর কণ্ঠনালীতে।

কঠিন কণ্ঠে গর্জে উঠলো বনহুর তুমি সন্ন্যাসী সেজে মায়ারাণীর মায়াজালে জড়িয়ে পড়ার ভয় দেখাচ্ছো হরশঙ্কর-জানো আমি কে?

সন্ন্যাসী বেশী হরশঙ্কর একটুও নড়লো না, চোখ দুটো দিয়ে অগ্নি বর্ষণ করলো। বনহুর ওর দৃষ্টির দিকে তাকাতেই কেমন যেন অসুস্থ বোধ করলো, টলতে লাগলো তার পা দুখানা। এতে তেজ হরশঙ্করের চোখে! বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে রিভলভার থেকে গুলী ছুঁড়লো।

একটা আর্তনাদ হলো মাত্র।

বনহুর অবাক হয়ে দেখলো-হরশঙ্কর যেমন বসে ছিল তেমনি রইলো। একটু সরলো না সে।

বনহুর এবার ভাল করে লক্ষ্য করতেই আশ্চর্য হলো, সন্ন্যাসী বেশী হরশংকরের দেহটা সম্পূর্ণ বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

বনহুর হাত দিয়ে নাড়া দিতে লাগলো, মনের মধ্যে সন্দেহ জাগলো–হরশঙ্কর না হয়ে যদি সত্যই কোন সন্ন্যাসী হয়, তা হলে একটা নিরপরাধ মহৎ জনকে খুন করার অপরাধে অপরাধী হবে সে। বনহুর দাড়ি ধরে টানতেই খসে এলো– জটাজুটসহ মাথার চুলও খুলে এলো তার হাতের মুঠায়। এবার বনহুর আশ্বস্ত হলো, তার অনুমান তা হলে মিথ্যে হয়নি। অহেতুক একটি মহৎ জীবন নামের অপরাধে অপরাধী নয় তবে সে।

বনহুর এবার হরশঙ্করের মাথা ধরে টেনে তুলে ফেললো। আশ্চর্য একটা খোলসের মধ্যে সে জমাটভাবে বসেছিলো। খোলসটা দেখলে ঠিক বটবৃক্ষের শিকড় বলে ভ্রম হয়, অতি কৌশলে এ খোলসটা সে তৈরী করেছিলো তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বনহুর হরশঙ্করকে এতো সহজে মৃত্যুবরণ করতে দেখে হতবাক হয়েছিলো। এবার বুঝতে পারলো—গাছের শিকড়ে তৈরী খোলসটা অত্যন্ত আঁটসাট, ওর মধ্যে প্রবেশ করলে কেউ নড়তে পারবে না। যতক্ষণ না ধীরেসুস্থে সে পিছন দিয়ে বের হয়।

বনহুর খোলসটা নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলো।

হঠাৎ খোলসের ভিতরে এক জায়গায় নজর পড়তেই বিস্ময়ে আড়ষ্ট হলো। কতকগুলো কল-কজার মত জিনিস আঁটা রয়েছে। বনহুর একটা সুইচের মত জিনিসে চাপ দিতেই অকস্মাৎ ধূম্র রাশিতে ভরে উঠলো স্থানটা। অবাক হলো বনহুর। আর একটা চাকার মত জিনিস নজরে পড়লো তার। এবার সে ঐ চাকার মত জিনিসটায় হাত দিলো। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলো। সম্মুখে একটা জায়গার মাটি সরে গেলো ধীরে ধীরে এক পাশে। বনহুর দ্রুত এগিয়ে গেলো, দেখলো একটি সুড়ঙ্গ পথ বেরিয়ে এসেছে।

বনহুর দ্রুত সেই সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করলো।

ভয় ভীতি বলতে কিছুই ছিলোনা তার। সুড়ঙ্গের ধাপে ধাপে পা রেখে সন্তর্পণে নীচে নামতে লাগলো। কিছুদূর এগুতেই বনহুরের শরীরে একটা গরম তাপ অনুভব করলো। আর একটু এগুতেই দেখতে পেলো একটা মেশিনের মত জিনিস অবিরাম চক্রাকারে ঘুরপাক খাচ্ছে। তারই একটা নল উঠে গেছে উপরের দিকে বনহুর বুঝতে পারলো—এই মেশিনটাই গভীর মাটির নীচে ধূম্র সৃষ্টি করছে, আর ঐ নলটা দিয়ে ধূম্র-রাশি উপরে উঠে যাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। হরশঙ্কর তার বটবৃক্ষের শিকড়ের খোলসের মধ্যে বসে এই সব যন্ত্র চালনা করতো। এটাই ছিলো মায়াজালের মায়াচক্র। এখান থেকে সৃষ্টি করতো সে নানা সময় না না অদ্ভুত জিনিস।

বনহুর আর বিলম্ব না করে দ্রুত সুড়ঙ্গ বেয়ে উঠে এলো উপরে, কিন্তু সুড়ঙ্গের বাইরে আসার সুযোগ তার হলো না, সঙ্গে সঙ্গে মাথায় প্রচণ্ড একটা আঘাত অনুভব করলো।

হরশঙ্করের কয়েকজন অনুচর দাঁড়িয়েছিলো সুড়ঙ্গ পথের মুখে, তারা গুরুদেবের মৃতদেহ বটবৃক্ষ তলায় পড়ে থাকতে দেখে বুঝতে পেরেছিলোনিশ্চয়ই কোন অজ্ঞাত লোক গুরুদেবকে হত্যা করেছে এবং তারা দেখতে পেয়েছিলো, সুড়ঙ্গের মুখ খোলা, তাই পূর্ব হতেই প্রস্তুত ছিলো।

বনহুর অকস্মাৎ মস্তকে আঘাত পাওয়ায় টাল সামলাতে পারলো না, ঘুরপাক খেয়ে পড়ে গেলো নীচে।

তারপর যখন জ্ঞান ফিরলো অসহ্য, একটা চাপ অনুভব করলো নিজের বুকে। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো বনহুর, কিন্তু চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়লোনা। দক্ষিণ হাতখানা বুকের দিকে আনতেই বুঝতে পারলো তার বুকের উপর বিরাট একখানা পাথর রাখা হয়েছে।

বনহুরের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে। মাথায় হাত বুলাতেই হাতখানা ভিজে চুপসে উঠলো। কেমন চটচটে মনে হলো, তবে কি তার মাথাটা কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়েছিলো!

বনহুর এবার বুকের উপর থেকে পাথরটা নামিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলো। অসমী শক্তির অধিকারী বনহুর। যদিও পাথরখণ্ডটা বিরাট বড় এবং ভয়ঙ্কর ভারী, তবু বনহুর অল্পক্ষণের মধ্যেই সেটা নামিয়ে ফেলতে সক্ষম হলো।

উঠে বসলো বনহুর, তাকালো চারিদিকে।

জমাট অন্ধকার।

একটা শব্দ কানে ভেসে আসছে বনহুরের। ভাল করে লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলো—এটা সেই সুড়ঙ্গর মধ্যের মেশিন-কক্ষ। এতোক্ষণ সে ঐ মেশিন-কক্ষের মেঝেই শুয়েছিলো।

উঠে দাঁড়ালো বনহুর।

অতি সাবধানে এগুতে লাগলো, হঠাৎ যদি ঐ ঘূর্ণিয়মান মেশিনটায় গিয়ে পড়ে তাহলে তার দেহটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তাই বনহুর যে দিকে থেকে শব্দটা আসছিলো সেদিক না এগিয়ে অপর দিকে এগুতে লাগলো।

বনহুর আন্দাজেই বুঝে নিলো, সুড়ঙ্গ মুখটা তখন কোন দিকে ছিলো। অল্প সময়ে সুড়ঙ্গ মুখ আবিষ্কার করে নিলো সে। এবার বনহুর এগুতে লাগলো সুড়ঙ্গ পথে, কিন্তু সুড়ঙ্গ মুখ বন্ধ থাকায় বের হতে পারলো না।

সুড়ঙ্গ পথটা অত্যন্ত সংকীর্ণ ও চাপা হওয়ায় কয়েক বার মাথায় আঘাত পেলো বনহুর। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে। একটা ভ্যাপসা গন্ধে তার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো।

বনহুর বাইরে বের হবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলো।

অসহ্য লাগছে, বৈশীক্ষণ এভাবে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হলে মৃত্যু তার অনিবার্য।

বনহুর সুড়ঙ্গ পথের দেয়াল হাতড়ে দেখতে লাগলো ভিতর থেকে। বাইরে বের হবার কোন উপায় আছে কিনা। কিন্তু আর যেন দাঁড়াতে পারছে না, নিশ্বাস নিতে ভয়ংকর কষ্ট হচ্ছে। তবু অনেক কষ্টে দেয়াল হাতড়ে চললো বনহুর।

এই বুঝি তার জীবনের শেষ পরিণতি!

এক অন্ধকার সুড়ঙ্গ মধ্যে ছিলো দস্যু বনহুরের মৃত্যু!

বসে পড়লো বনহুর,খুব কষ্ট হচ্ছে তার।

সমস্ত শরীর ঘেমে নেয়ে উঠেছে। হাঁপাচ্ছে সে। তবু অনেক কষ্টে আবার উঠে দাঁড়ালো, মৃত্যুর পূর্বে আর একবার শেষ চেষ্টা করবে সে।

কিন্তু দাঁড়াতে পাড়লো না বনহুর, পা দুখানা শিথিল হয়ে আসছে। পড়ে গেলো হুমড়ি খেয়ে......

এখানে বনহুর যখন মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকলো—মা......

ঠিক সেই মুহূর্তে মরিয়ম বেগম ফজরের নামাজান্তে খোদার নিকটে হাত তুলে মোনাজাত করছিলেন–হে দয়াময়, পাক-পরওয়ারদেগার, তুমি আমার মনিরকে সুস্থ সবল রেখো। যেখানেই থাক সে, তাকে তুমি রক্ষা করো, দেখো প্রভু।

মায়ের এ প্রার্থনা খোদা কবুল করলেন।

বনহুর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েও বুক দিয়ে এগুতে লাগলো। হঠাৎ তার হাতে একটা লম্বা হ্যাণ্ডেলের মত কিছু লাগলো বলে মনে হলো তার।

বনহুর প্রাণ পণ চেষ্টায় হ্যাণ্ডেলের মত জিনিসটা ধরে টান দিলোসঙ্গে সঙ্গে সুড়ঙ্গ মুখ থেকে একটা বিরাট কিছু সরে যাচ্ছে বলে অনুভব করলো। একট ঝাপসা আলোর রশ্মি সুড়ঙ্গ পথে নেমে এলো নীচে।

বনহুর এতোক্ষণে বাঁচবার ভরসা পেলো। বুঝতে পারলো—ঐ হ্যাণ্ডেলটা অন্য কিছু নয়, সুড়ঙ্গ মুখের আবরণ উন্মোচন করার একটি যন্ত্র।

এবার বনহুর হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও বা বুকে চলে সুড়ঙ্গ-মুখের বাইরে এসে পৌঁছলো।

প্রাণভরে নিশ্বাস নিলো বনহুর।

তারপর উঠে দাঁড়ালো, কপাল বেয়ে তখনও রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। হাতের পিঠে গড়িয়ে পড়া রক্ত মুছে নিয়ে ফিরে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো, দুজন যমদূতের মত বলিষ্ঠ লোক বর্শা হাতে ছুটে আসছে তাকে দেখতে পেয়ে।

বনহুর মুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে নিলো।

মুক্ত বাতাসে প্রাণভরে নিশ্বাস নিয়ে সে আবার পূর্ব শক্তি সঞ্চয় করে নিতে পেরেছে।

ভয়ঙ্কর লোক দুটো তীর বেগে ছুটে আসছে।

বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, পালাবার জন সে নয়। দাঁড়িয়ে থেকে মৃত্যুকে বরণ করবে, নয় ওদেরকে পরাজিত করবে।

লোক দুটি বর্শা উঁচিয়ে ছুটে এলো।

বনহুর সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে উবু হয়ে শুয়ে পড়লো।

অমনি লোকদুটি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো ভূতলে।

বনহুর মুর্হত বিলম্ব না করে একজন ভূতলশায়ী লোকের হাত থেকে বর্শা কেড়ে নিয়ে সজোরে বসিয়ে দিলো তার বুকে।

তীব্র আর্তনাদ করে লোকটা মুখ বিকৃত করে ফেললো।

অন্য একজন সে ধড়মড় করে উঠে রুখে এলো বনহুরের দিকে। কিন্তু বনহুরের সঙ্গে পেরে উঠা তার একার কাজ নয়। লোকটা যখন এগুলো অমনি বনহুরের বর্শা বিদ্ধ হলো তার বুকে।

বনহুর এক ঝটকায় লোকটার বুক থেকে বর্শা উচিয়ে নিতেই হুমড়ি খেয়ে লোকটা পড়ে গেলো ভূতলে,ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো।

আর এক দণ্ড বিলম্ব না করে বনহুর বর্শা হাতেই ছুটলো বনের পশ্চিমাংশে।

কাঠ দিয়ে তৈরী সেই কুটির নিকটে পৌঁছে হতবাক হলো। কাঠের তৈরী কুটিরখানা শূন্য পড়ে রয়েছে—কুঠরিতে একটি জনপ্রাণী নেই।

বনহুর হতভম্ব হলো, এতোগুলি নারী সব গেলো কোথায়? কোথায়ই বা

নূরী, বনহুরের মাথায় যেন আকাশ ভেংগে পড়লো। নূরীকে বুঝি পেয়েও আবার হারালো সে।

ক্ষুধায় পিপাসায় অত্যন্ত কাতর বনহুর। প্র

থমে তার এতোটুকু পিপাসা নিবারণের প্রয়োজন।

বনহুর চারিদিকে লক্ষ্য করে দ্রুত এগুতে লাগলো বনের মধ্যে পাহাড়িয়া নদীটার দিকে।

এতো বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো বনহুর, আর হাটতে পারছেনা তবু চললো সে।

নদীটার নিকটবর্তী হয়ে বনহুর হাটু গেড়ে বসে পড়লো।

সচ্ছ সাবলীল জলধারা কল কল করে ছুটে চলেছে। বনহুর আজলা ভরে পানি তুলে নিয়ে পান করলো। একটা অনাবিল তৃপ্তি বনহুরের সমস্ত দেহ। মনকে ভরিয়ে দিলো। প্রাণ ভরে সুশীতল পানি পান করলো সে।

এমন সময় হঠাৎ একটা ঝুপ ঝাপ শব্দ কানে ভেসে এলো বনহুরের। ফিরে তাকালো আচম্বিতে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো বনহুর। অদূরে নদীবক্ষে একটা মোটর-বোট দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই একটা লোক একটি যুবতীকে মোটর-বোটটায় তুলে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে।

বনহুর তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো-লোকটা যুবতীকে টেনে হিচড়ে মোটর-বোটে উঠিয়ে নিলো।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে বনহুর ছুটলো সেই দিকে।

যুবতী যেই হোক তাকে নিশ্চয়ই কোন শয়তান জোরপূর্বক হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে।

বনহুর প্রাণপণে ছুটলো।

লোকটা তখন যুবতীর হাত পা মজবুত করে বাঁধছিলো।

যুবতী হাত পা ছোড়াছুড়ি করায় বাঁধতে বিলম্ব হচ্ছিল তার। হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিলো লোকটা।

বনহুরকে ছুটে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি ইঞ্জিনের পাশে গিয়ে বসেলো; যেমন স্টার্ট দিতে যাবে, অমনি বনহুর ব্যাঘের মত ঝাপিয়ে পড়লো মোটরবোট খানার উপরে।

বলিষ্ট মুষ্ঠিতে চেপে ধরলো লোকটার গলা।

লোকটাও কম শক্তিশালী নয়, সেও দুহাত দিয়ে নিজকে বাঁচিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো।

শুরু হলো ভীষণ ধস্তাধস্তি।

একবার বনহুর পড়ে যাচ্ছে নীচে, লোকটা চেপে বসছে তার বুকে। আবার লোকটা নীচে পড়ে যাচ্ছে, বনহুর উঠে বসছে ওর বুকে। চললো সেকি অদ্ভুত লড়াই।

কিন্তু বনহুরের সঙ্গে পেরে উঠা সেকি যার তার কর্ম!

দৃঢ় মুষ্ঠিতে বনহুর টিপে ধরলো লোকটার গলা। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চাপ দিতে লাগলো।

একটা গোঙ্গানীর শব্দ বেরিয়ে এলো লোকটার মুখ থেকে। পরক্ষণেই তাজা লাল টুকটুকে রক্ত গড়িয়ে পড়লো মোটর-বোট খানার, মেঝেয়। কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে নীরব হয়ে গেলো লোকটার দেহ।

বনহুর এবার উঠে দাঁড়ালো লোকটার বুক থেকে, তারপর যুবতীর দিকে ফিরে তাকাতেই বিস্মিত হলো, যুবতী অন্য কেহ নয়-নূরী। আনন্দে বনহুরের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

নূরী তখন বনহুরের দিকে অপরিচিতের মত তাকিয়ে আছে।

বনহুর দ্রুত এগিয়ে এলো নূরীর নিকটে, আবেগ ভরা কণ্ঠে ডাকলো–নূরী!

নূরী ভীতভাবে তাকিয়ে বললো, না না আমি তোমাকে চিনি নে। কে তুমি?

নূরী, আমি তোমার হুর—তোমার সাথী।

না, আমার মনে পড়ে না তোমার কথা। তোমাকে আমি কোন দিন দেখি নি।

অস্ফুট ধ্বনি করে উঠে বনহুর-নূরী। দুহাতে ওকে টেনে নিতে যায় কাছে।

ঠিক সেই সময় অদূরে শোনা যায় অনেকগুলি লোকের চীৎকার–পালালো—পালালো ধরে ফেললা—ধরে ফেললা........

বনহুর দেখলো বনের মধ্যে থেকে বর্শা আর বল্লম হাতে তীর বেগে ছুটে আসছে অগণিত লোক।

বনহুর দ্রুত হস্তে মৃত দেহটাকে পানিতে নিক্ষেপ করে ইঞ্জিনে ষ্টার্ট দিলো।

একটা শব্দ করে মোটর-বোটখানা তীর বেগে ছুটতে শুরু করলো। ততক্ষণে নদী তীরে অসংখ্য শয়তান বদমাইশের দল বল্লম আর বর্শা হস্তে এসে দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ মোটর-বোট লক্ষ্য করে বল্লম আর বর্শা ছুঁড়ে মারতে লাগলো।

কেউ কেউ নদীবক্ষে ঝাপিয়ে পড়ে মোটর-বোটখানা ধরতে গেলো। কিন্তু বনহুরের হস্তে বোটখানা উল্কা বেগে ছুটে চলেছে।

একটা বর্শা ছিটকে এসে পড়লো মোটর-বোর্টের উপরে। ভাগ্যিস, বনহুরের পিঠে বিদ্ধ না হয়ে হলো ঠিক পাশে, মোটর-বোটের তক্তায়।

বনহুর একবার ফিরে তাকিয়ে দেখি নিলো মাত্র, তারপর অতি দ্রুত চালাতে লাগলো মোটর-বোটখানা।

ক্রমে শয়তান লোকগুলির কলকণ্ঠ আর চিৎকার মিশে এলো। আর দেখা যাচ্ছেনা ওদের। বনহুর এবার তার মোটর-বোটের গতি স্বাভাবিক করে নিলো।

কিন্তু এখনও বন্ধ্যা বন শেষ না হওয়া পর্যন্ত বনহুর নিশ্চিন্ত নয়!

মাঝে মাঝে বনহুর নূরীর দিকে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলো।

বোটের একটি আসনে চুপটি করে বসে আছে সে। চুল-গুলি এলোমেলো, চোখ দুটিতে কেমন অসহায়ার দৃষ্টি। মুখমণ্ডল বিষণ্ন মলিন।

বনহুরের মায়া হচ্ছিলো নূরীর দিকে তাকিয়ে।

হাস্যময়ী নূরীর একি অবস্থা হয়েছে।

বনহুর কোনদিন কল্পনাও করেনি, নূরীকে সে এইভাবে দেখবে।

অবিরাম গতিতে প্রায় কয়েক ঘন্টা চালানোর পর বন্ধ্যা বনের বাইরে এসে পৌঁছলো বনহুরের মোটর-বোটখানা। এবার চারিদিকে শুধু ফাঁকা, দুধারে সমতল ভূমির মধ্যে মাঝে মাঝে দুএকটা ঝোপঝাড় ও টিলা দেখা যাচ্ছে।

এখানে নদীটা পূর্বের চেয়ে অনেকটা প্রশস্ত। গভীরও বেশ মনে হচ্ছে। স্রোতও রয়েছে খুব।

মোটর-বোটখানা যেন আপন মনে ছুটতে শুরু করলো।

একি! বনহুর চমকে উঠলো, বনহুর বাধ্য হয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলো, তবু তীরবেগে মোটর-বোটখানা ছুটে চলেছে।

বনহুর মোটর-বোটখানার মোড় ফেরাতে চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু কিছুতেই বাগে আনতে সক্ষম হচ্ছেনা সে। বনহুর এবার বুঝতে পারলোকোন নীচু জলপ্রপাতের সঙ্গে এ নদীটার যোগাযোগ রয়েছে। পাহাড়িয়া নদী অসম্ভব কিছু নেই।

বনহুর ভীত হলো—সত্যই যদি তাই হয়, এই জলধারা যদি কোন উচু স্থান থেকে গভীর নীচে গিয়ে আছড়ে পড়ে তাহলে উপায়! মৃত্যুছাড়া কোন পথ নেই।

কিন্তু এতো করে বেঁচে আসার পর মরতে হবে!

বনহুর সম্মুখের খরস্রোত জলধারার দিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে লাগলো।

নূরীও তখন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে। সেও বুঝতে পারছে, তাদের মোটর-বোটখানা কোন বিপদের মুখে ছুটে যাচ্ছে। আজ যদি নূরীর পূর্বের কথা স্মরণ থাকতো তাহলে তার মনে ভেসে উঠতো আর একদিনের কথা। যেদিন নূরী মৃতবৎ শিশু মনিকে নিয়ে নৌকার মধ্যে এমনি এক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলো।

আজ নূরী সম্পূর্ণ অতীতকে বিস্মৃত হয়েছে।

যাদুকর হরশঙ্কর তাকে এমন একটা ঔষধ খাইয়ে দিয়েছে যার জন্য নূরী কিছুতেই পূর্ব কথা স্মরণ করতে সক্ষম হচ্ছিলো না।

নূরী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছিলো শুধু। বুঝতে পারছিলো, বিপদ তাদের ঘনিয়ে আসছে।

বনহুর আর নূরীর মোটর-বোট আজ যেদিক ছুটে চলেছে, একদিন ঐ পথেই নূরী আর মনিসহ নৌকাখানা ছুটে চলেছিলো। ভাগ্য সেদিন প্রসন্ন ছিলো, তাই নৌকাখানা আটকে গিয়েছিলো দুটি পাথর খণ্ডের সঙ্গে। আর আজ ঠিক তার অপর দিক দিয়ে বনহুর আর নূরীর নৌকা দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে।

আর বেশী নয়, প্রায় অর্ধমাইল দূরেই সেই ভীষণ জলপ্রপাত। হাজার হাজার ফিট নীচে আছড়ে পড়ছে খরস্রোত নদীটা।

বনহুর আর নূরী মৃত্যুর জন্য যেন প্রতীক্ষা করছে। নদীবক্ষে এবার মাঝে মাঝে পাথরখণ্ড দেখা যাচ্ছে। বনহুর আতঙ্কিত হলো, হঠাৎ যদি ওর একটা পাথরের সঙ্গে তাদের মোটর-বোট খানা ধাক্কা খায় তাহলে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে বোট-খানা, সঙ্গে সঙ্গে তাদের অবস্থাও হবে মর্মবিদারক।

বনহুর আর নূরীর মোটর বোট অতি অল্পক্ষণে সেই ভয়ঙ্কর জলপ্রপাতের নিকটবর্তী হয়ে পড়লো।

শিউরে উঠলো বনহুর।

তার সাহসী প্রাণও কেঁপে উঠলো। মুর্হত বিলম্ব না করে নূরীকে নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লো নদীবক্ষে।

প্রচণ্ড জলোচ্ছাসে সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেলো উভয়ে।

বনহুর নূরীকে দৃঢ় হস্তে ধরে রাখলো অতি সাবধানে।

কিন্তু কিছুতেই বনহুর নিজকে স্থির রাখতে পারছেনা। খরস্রোতে ভেসে যাচ্ছে ওরা দুজনা।

নূরীও মরিয়া হয়ে ধরে আছে বনহুরকে।

সেকি দারুণ অবস্থা, একবার ডুবছে, একবার উঠছে, কখনও ভেসে যাচ্ছে। অদূরেই জলপ্রপাত।

হাজার হাজার ফিট নীচে আছড়ে পড়ছে পানিগুলো।

বনহুর আর নূরী মোটর-বোট থেকে নদীবক্ষে লাফিয়ে পড়তেই বোটখানা তীর বেগে ছুটে গেলো, পরক্ষণেই হাজার ফিট নীচে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো।

বনহুর আর নুরী ঝাপটা ঝাপটি করছে।

দুজন দুজনাকে আঁকড়ে ধরে আছে প্রাণপণে।

তবু ভেসে ভেসে গড়িয়ে যাচ্ছে ওরা, কিছুতেই আর রক্ষা নেই। হঠাৎ বনহুর সম্মুখে একটা পাথর পেয়ে আঁকড়ে ধরলো। প্রথম হাত ফসকে গেলো, এই হয়েছিলো আর কি, আবার বনহুর এটে ধরলো পাথরটা। কোনরকমে নূরীকে নিয়ে পাথরটার উপরে চড়ে বসলো বনহুর।

রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে।

নূরীর শরীরের ওড়নাখানা কখন যে ভেসে গেছে স্রোতের টানে। শুধু ঘাড় আর একটা আট-সাট ব্লাউজ রয়েছে তার শরীরে।

বনহুর তাকালো এবার নূরীর দিকে।

নূরী নিজের ভিজে চুপসে যাওয়া শরীরের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় কুঁকড়ে যাচ্ছিলো।

এতা বিপদেও বনহুরের হাসি পেলো। এখনই মৃত্যু যার অনিবার্য ছিলো তার আবার এতো লজ্জা।

বনহুর নিজের গা থেকে জামাটা খুলে এগিয়ে ধরলো-নাও।

নূরী দ্রুত হস্তে বনহুরের হাত থেকে জামাটা নিয়ে নিজের যৌবন ভরা শরীরে চাপা দিলো।

মাথার উপরে অসীম আকাশ।

নীচে যমদূতের মত জলোচ্ছাস।

সামান্য একটা পাথরখণ্ডে উপবিষ্ট দুটি প্রাণ।

ভয়ঙ্কর বিপদের গভীর বেদান ভরা মুহূর্তেও বনহুর নূরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো-নূরী, এখনও তুমি আমাকে চিনতে পারছোনা? আমি কে?

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ালো নূরী, বললো–না।

নূরী! ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকলো বনহুর।

নূরী দুচোখের ভীতি আর উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো নূরীর পাশে।

প্রচণ্ড প্রচণ্ড ঢেউগুলি আছাড় খেয়ে পড়ছে পাথরটার গায়ে। উচ্ছ্বসিত জলরাশি বনহুর আর নূরীর শরীরকেও বার বার ভিজিয়ে দিচ্ছিলো। যে কোন মুহূর্তে তারা গড়িয়ে পড়তে পারে এই অশান্ত জলস্রোতের মধ্যে। তখন কোন উপায় থাকবে না রক্ষার।

বনহুর নূরীকে ঐ ভীষণ জলপ্রপাতের দিকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো–হঠাৎ যদি পড়ে যাও তাহলে ঐ হাজার ফিট নীচে গড়িয়ে পড়বে।

শিউরে উঠে নূরী।

সেই মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড ঢেউ আছড়ে পড়ে তাদের গায়ে।

নূরী ভয়-বিবর্ণ মুখে আঁকড়ে ধরে বনহুরকে।

বনহুর ওকে নিবিড়ভাবে টেনে নেয় কাছে।

বনহুরের প্রশস্ত বুকের মধ্যে নিজকে নির্ভয়শীলা মনে করে নূরী।

কিন্তু চোখে-মুখে তখনও তার অপরিচিতার ভাব। নূরী এখনও চিনতে পারেনি বনহুরকে।

গোটা বেলা কেটে গেলো, কতক্ষণ এইভাবে সামান্য একটা পাথরখণ্ডে বসে কাটানো যায়। সম্মুখে মৃত্যুদূত দাঁড়িয়ে। যে কোন দন্ডে গড়িয়ে পড়লে আর নিস্তার নেই।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

অস্তমিত সূর্যের রশ্মি এসে পড়লো বনহুর আর নূরীর মুখে। সন্ধ্যা হবার আর বেশী বিলম্ব নেই। বনহুরের ললাট কুঞ্চিত হয়ে উঠলোএখন উপায়? যতক্ষণ না এই স্থান থেকে তীরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে, ততক্ষণ বাঁচবার কোনও ভরসাই নেই তাদের।

বার বার ঢেউ এর উচ্ছ্বসিত জলরাশিতে বনহুর আর নূরীর দেহ স্কি হয়ে উঠছিলো। তার সঙ্গে ছিলো দমকা হাওয়া-নূরীর শরীরে কাঁপন ধরে গেলো।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এলো।

চারিদিকে শুধু জলোচ্ছ্বসের প্রচণ্ড শব্দ

বনহুর আর নূরী উভয়ে উভয়েকে আঁকড়ে ধরে বসে রইলো—এতোটুকু নড়লে বা গড়িয়ে পড়লে মৃত্যু অনিবার্য।

সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘন জমাট হয়ে উঠলো।

এখন কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছেনা। মৃত্যুর বিভীষিকা যেন মহাকালবেগে গ্রাস করতে আসছে বনহুর আর নূরীকে।

যার দৃষ্টির কাছে নূরী কিছু সময় আগেও লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে পড়ছিলো, যাকে সে বিশ্বাস করতে পারছিলোনা, এক্ষণে তারই বুকের মধ্যে খুঁজে নিয়েছে সে আশ্রয়।

বনহুর সজাগ ভাবে নূরীকে ধরে রাখলো।

এতোটুকু শিথিলতা এলেই নূরীকে হারাবে সে। রাত্রি বেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে নূরী ঝিমিয়ে পড়েছে। বনহুর বুঝতে পারলো, এতো বিপদের মধ্যেও তার দুচোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে। কিছুতেই নূরী নিজকে জাগিয়ে রাখতে পারছে না।

এক সময় নূরীর দেহটা ঘুমে এলিয়ে পড়লো।

বনহুর অতি সাবধানে ধরে রাখলো ওকে।

১০.

ভোরের আলো ফুটে উঠার সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠলো নূরী। তাকালো চোখ মেলে। ফুটন্ত গোলাপ কুঁড়ির মত দুটো আঁখির পাতা মেলে ধরলো বনহুরের মুখের দিকে। এতোক্ষণে যেন লজ্জা আর সঙ্কোচ এসে তাকে সঙ্কুচিত করে তুললো। তাড়াতাড়ি সরে বসতে গেলো নুরী।

বনহুরের দ্রিাহীন চোখ দুটিতে ফুটে উঠলো অপরূপ এক দৃষ্টি, এক টুকরা হাসি দেখা দিলো তার ঠোঁটের কোণে। নূরীর গালে মৃদু চাপ দিয়ে বললো—নড়লেই ছিটকে পড়বে, আর রক্ষা থাকবে না।

নূরী ছুটে আসা ঢেউগুলির দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলো।

বনহুর নূরীর ভয়-বিহুল মুখের দিকে তাকিয়ে বললো ভয় নেই নূরী। আমি তোমাকে মরতে দেবোনা।

পূর্ব আকাশ রাঙা করে তখন উষার কিরণ ফুটে উঠেছে।

বনহুর ভাবতে লাগলো, কি করে এই মরণ-বিভীষিকা থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। দিনের পর দিন এখানে প্রতীক্ষা করলেও কোন নাবিক বা কোন জলযানের সাক্ষাতের সম্ভাবনা নেই। ক্ষুধায় কাতর তারা, ভাগ্য পানিটা লবণাক্ত নয়—তাই রক্ষা। যখন উচ্ছ্বসিত ঢেউগুলি আছড়ে পড়ে তাদের গায়ে এবং আশে পাশে, তখন নূরী আর বনহুর আজলা, ভরে পান করে সেই পানি। কিন্তু শুধু পানি পান করে কতক্ষণ এই পাথরটার উপরে বেঁচে থাকা যাবে!

যতই বেলা বেড়ে উঠছে, বনহুর ততই বিষণ্ন মলিন হয়ে পড়ছে আর বুঝি রক্ষার কোন উপায় নেই। দেহের শক্তিও ক্রমান্বয়ে শিথিল হয়ে আসছে যেন।

বেঁচে থাকার যে উদ্দীপনা, সব যেন নিভে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। বনহুর যখন উদ্ধারের কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছে না, ঠিক তখন দূরে একটা মস্ত বড় কালো মত কিছু যেন এদিকে ভেসে আসছে বলে মনে হলো তার। বনহুর ভাল করে লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলো-বিরাট একটা গাছ গড়িয়ে ভেসে আসছে। ধ্বসে পড়া তীরস্থ কোন বটবৃক্ষ বা ঐ ধরনের কোন বৃক্ষ হবে।

এতো বেশী স্রোতের টানেও অতি ধীরে ধীরে গাছটা গড়িয়ে আসছে। বনহুর বুঝতে পারলো-গাছটা ছোট খাটো বা পাতলা কোন গাছ নয়–অত্যন্ত ভারী এবং বৃহৎ বৃক্ষ।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো, আশেপাশে তাদের পাথরটার অদূরে আরও কতকগুলি বড় বড় পাথর জলস্রোতের মধ্যে কচ্ছপের পিঠের মত উঁচু হয়ে আছে। আশায় আনন্দে ওর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কারণ, ঐ বিরাট গাছটা যদি কোনক্রমে তাদের এতোদূর এসে পড়ে তাহলে আর সামনে গড়িয়ে যেতে পারবে না। অনেকগুলি বড় বড় পাথর তার পথে বাধার সৃষ্টি করবে।

বিপুল আগ্রহ নিয়ে বনহুর তাকিয়ে রইলো গাছটার দিকে।

ধীরে ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে আসছে গাছটা?।

বনহুর নূরীকে আঁকড়ে ধরে বললো–নূরী, এবার আমরা বাঁচবো। ঐ গাছটা আমাদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসছে।

নূরী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো, কোন জবাব দিলো না।

নূরীর জবাবের প্রতীক্ষা না করে বনহুর আবার তাকালো গাছটার দিকে।

অনেক এগিয়ে এসেছে গাছটা।

হঠাৎ একটা পাথরখণ্ডে গাছটা আটকে গেছে বলে মনে হলো বনহুরের, কারণ আর এগুচ্ছে না গাছটা।

বনহুরের গোটা মন হতাশায় ভরে উঠলো। হায়, এবার উপায়-গাছটা আর এগিয়ে আসতে সক্ষম হবে না। পাথরটার সঙ্গে আটকে গেছে গাছটা।

কিন্তু এখনও উচ্ছ্বসিত ঢেউএর আঘাতে দোল খাচ্ছে গাছটা। কোন ক্রমে পাথরটা গা থেকে ছাড়া পেলেই চলে আসতো তাদের দিকে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বনহুরের আশা পূর্ণ হলো, ঢেউএর আঘাতে গাছটা খসে এলো পাথরটার গা থেকে।

বনহুর আনন্দ ধ্বনি করে উঠলো–সাবাস!

এবার গাছটা বেশ দ্রুত গতিতে এগুচ্ছে। স্রোতের টান–এদিকে আরও শতগুণ বেশী।

ভীষণ বেগে ছুটে আসছে এবার গাছটা।

কিন্তু যে ভাবে আসছে, হঠাৎ পাথরটার গায়ে ধাক্কা খেয়ে তারা দুজনা ছিটকে না পড়ে।

বনহুর নূরীকে শক্ত করে এটে ধরলো, গাছটার ধাক্কা বা আঘাতে তারা যেন বিছিন্ন হয়ে না পড়ে।

এসে গেছে, অতি নিকটে এসে পড়েছে গাছটা।

যা ভেবেছিলো বনহুর, গাছটা তীরবেগে ছুটে এসে ঝাপটা খেয়ে আটকে পড়লো কয়েকটা পাথরখণ্ডের সঙ্গে।

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি বা ঐ রকম কিছুর আশা করেছিল বনহুর কিন্তু আশ্চর্য, এতোটুক ঝাকুনি বা কোন রকম অসুবিধা হলোনা তাদের।

গাছটা সম্পূর্ণ আড়াআড়িভাবে লম্বা হয়ে আটকে পড়লো। এবার আর কোন জলস্রোতেই তাকে ভাসিয়ে নিতে সক্ষম হবে না। কোনদিনই গাছটা ঐ হাজার ফিট জলপ্রপাতের নীচে পাথরের উপর আছড়ে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবেনা অনেকগুলি পাথরের গায়ে আটকে পড়েছে গাছটা।

বনহুরের চোখে-মুখে খুশীর উৎস।

এ ভাবে যে তাদের উদ্ধারের পথ হয়ে যাবে, কল্পনাও করতে পারেনি সে।

এবার বনহুর আর নূরী উঠে দাঁড়ালো, তাদের পাশেই গাছটার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে আছে। বিরাট গাছ, প্রায় বিশ-পঁচিশ গজ লম্বা হবে। পুরোনো বটবৃক্ষ এটা। গাছটার গুড়ি প্রায় তীরের সন্নিকটে পৌঁছে গেছে। হাত কয়েক দূরেই তীর ভূমি।

বনহুর নূরীকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো, বললো বনহুর–নূরী, আমি তোমাকে ধরছি, তুমি দক্ষিণ হস্তে গাছটার ডাল ধরে গুড়িটার উপরে উঠে পড়ো। সাবধান, কোন সময় শাখা ছেড়ে দেবে না।

নূরী মাথা কাৎ করে জানালো—আচ্ছা।

১১.

অনেক কষ্টে গাছটার শেষ সীমান্তে এসে উপস্থিত হলো বনহুর আর নূরী। গাছটা ঢেউ এর চাপে দুলছে, সাবধানে এগুতে হয়েছে তাদের। নূরীকে বনহুর অতি কৌশলে ধরে ধীরে এতোদূর নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এখন উপায়, এখনও তীর প্রায় পাঁচ ছহাত দূরে। বনহুর একা হলে চিন্তা ছিলোনা, সে অতি কৌশলে সাঁতার কেটে এই জায়গাটুকু পার হয়ে আসতে পারতো। কিন্তু নূরীকে নিয়ে কি ভাবে এই ভয়ঙ্কর খরস্রোত পার হবে।

বনহুর যেন বিপদে পড়লো।

কিন্তু কোন উপায় নেই, সাঁতার দিয়ে এই জায়গাটুকু পার হতেই হবে।

বনহুর নূরীকে বললো-নূরী, হয় জীবন ফিরে পাবো, নয় মৃত্যু। চলো–অস্ফুট কণ্ঠে বললো নূরী–কোথায়?

এতো দুঃখেও বনহুরের মুখে হাসি ফুটলো, বললো সে-ঐ নদীবক্ষে।

ভয়ে নূরী বনহুরকে আঁকড়ে ধরলো।

বনহুর আর বিলম্ব না করে বললো নূরী, আমাকে শক্ত করে ধরে রেখো, কোন রকমেই যেন তোমার হাত খসে না যায়। ধরো আমার গলা…

নূরী বনহুরের গলা জড়িয়ে ধরলো শক্ত করে।

বনহুর লাফিয়ে পড়লো ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাত ভেসে গেলো দূরে, সেই মৃত্যুর মুখের দিকে, কিছুদূরেই জলপ্রপাত।

বনহুর প্রাণপণ চেষ্টায় সাঁতার কাটতে লাগলো।

তবু কিছুতেই স্রোতের অপর দিকে এগুতে সক্ষম হচ্ছেনা।

নূরীর হাত দুখানা ক্রমে শিথিল হয়ে আসছে। আর রক্ষা নেই। এমন সময় বনহুর যেন পায়ে মাটির ছোয়া পেলো।

অতি কষ্টে, অতি সাবধানে বনহুর তীরে উঠে আসতে সক্ষম হলো।

কিন্তু নূরী তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

ক্ষুধা তৃষ্ণার কাতর নূরী, তারপর এই প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের বেগে কিছুতেই স্থির থাকতে পারলোনা, অজ্ঞান হয়ে পড়লো।

বনহুর যতই শক্তিশালী পুরুষই হোক, তবু মানুষতো।

তার অবস্থাও নাজেহাল হয়ে পড়েছে। কিন্তু সে একেবারে হতাশ হয়ে। পড়েনি। নূরীর জ্ঞান ফেরানোর জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করতে লাগলো।

এতোটুকু সান্তনা এখন বনহুরের বুকে তারা তীরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। মস্ত একটা বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছে বনহুর আর নূরী।

ঘন্টা কয়েক পরে জ্ঞান ফিরে এলো নূরীর।

বনহুরের মুখে খুশী ফুটে উঠলো।

নূরীকে নিবিড় ভাবে টেনে নিতে গেলে বনহুর কিন্তু নূরী ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়লো। অস্ফুট কন্ঠে বললো–আমাকে ছেড়ে দাও, নইলে ঐ জলস্রোতে ঝাপিয়ে পড়বো।

বনহুর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠলো—নূরী।

নূরী রাগে অধর দংশন করে বললো–তোমাকে আমি চিনিনা।

নূরী।

আমাকে তুমি যেতে দাও।

কোথায় যাবে?

নূরী আনমনা হয়ে যায়, গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করে।

বনহুর বলে–তাহলে যাও।

নূরী নতমুখে বসে থাকে।

বনহুর পুনরায় বলে উঠে—তুমি স্মরণ করো নূরী, মনে করতে চেষ্টা করো....... সেই কান্দাই বন, সেই ভূগর্ভে আস্তানা, তোমার বনহুর.... মনে পড়ে? নূরী, কোথায় তোমার সেই মনি? নূরী–নূরী, কি হয়েছে তোমার? বনহুর দুহাতে নিজের মাথার চুল টানতে থাকে, অধর দংশন করে সে।

নূরী বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবে, কি যেন সব এলোমেলো হয়ে যায়, স্মরণ হয় না কিছু। অনেক চিন্তা করেও নূরী মনে করতে পারেনা ওর কথাগুলো।

১২.

গাছের ফল পেড়ে বনহুর নূরীকে দেয়—খাও।

নুরী নিজে খায়, ভাবে লোকটা তাকে সত্যি কত স্নেহ করে–ভালবাসে। বনহুর নূরীকে খেতে দিয়ে নিজে চুপ চাপ বসে থাকে বিমর্ষ মুখে।

নূরী দুঃখ পায়, সে খাচ্ছে অথচ লেকাটা খাচ্ছেনা। ব্যথা পায় হৃদয়ে। একটা ফল হাতে তুলে নিয়ে বনহুরের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে—তুমি খাও।

বনহুর ফিরে তাকায় নূরীর দিকে, অফুরন্ত একটা আনন্দ নাড়া দিয়ে যায় তার মনে। নূরীর হাত থেকে ফলটা নিয়ে খায় বনহুর।

একটা গাছের ছায়ায় ঘাসের উপর ঘুমিয়ে পড়ে বনহুর। আজ দুদিন তার চোখে এতোটুকু ঘুম নেই।

নূরী বসে থাকে তার পাশে।

বনহুরের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নূরী নিষ্পলক নয়নে। এর পূর্বে কোথাও তাকে দেখে ছিলো কিনা স্মরণ করতে চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতে ওর মনে পড়ে না কোন কথা।

নূরীর মায়া হয়লোকটা তার জন্য কতইনা কষ্ট করেছে তাকে বাঁচাবার জন্য নিজের জীবন বিনষ্ট করতেও সে কুণ্ঠা বোধ করছিলোনা। নূরী এগিয়ে আসে, বনহুরের মাথাটা ধীরে ধীরে তুলে নেয় নিজের কোলে।

বনহুর গভীর ঘুমে মগ্ন থাকলেও সতর্ক ছিলো। একটু মাথায় হাত লাগতেই জেগে উঠলো, কিন্তু সে চোখ মেললো না। ঘুমের ভান করে চোখ বন্ধ করে রইলো।

নূরী ধীরে ধীরে বনহুরের চুলগুলি আংগুল দিয়ে আঁচড়ে দেওয়ার মত ঠিক করে দিতে লাগলো অতি যত্ন সহকারে বেশ কিছুক্ষণ এই কাজ করলো নূরী।

বনহুর হঠাৎ উঠে বসলো।

নূরী লজ্জায় মরিয়া হয়ে মাথা নত করলো।

বনহুর বললো—এতে লজ্জার কি আছে। সত্যি তুমি কত সুন্দর নূরী!

নূরী আরও জড়োসড়ো হয়ে পড়লো।

বনহুর নূরীর চিবুক ধরে উচু করে তুলে বললো আমাকে তোমার কেমন লাগে?

নূরী নীরব রইলো, কোন জবাব দিলোনা।

বনহুর নূরীর দক্ষিণ হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে আবেগ ভরা কন্ঠে বললো নূরী, জবাব দাও? জবাব দাও?

নূরী পাথরের মূর্তির মতই নিশ্চুপ বসে রইলো।

বনহুর হঠাৎ প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিলো নূরীর গালে।

নূরী তবু স্থিরভাবে যেমন বসেছিলো তেমনি রইলো।

বনহুর নূরীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের হাতখানাকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলতে লাগলো, হঠাৎ এ–সে কি করে বসলো। নূরীকে সে আঘাত করলো! বনহুর নিজের হাতখানাকে মাটিতে আছড়াতে লাগলো।

নূরী ধরে ফেললো বনহুরকে।

বনহুর স্থির দৃষ্টি নিয়ে তাকালো নূরীর দিকে, একি নূরীর চোখে পানি নেই। এতোটুকু বিচলিত হয়নি সে।

বনহুর দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো ছোট্ট বালকের মত।

নূরী অবাক হয়ে দেখছে তার দিকে।

১৩.

বনহুর নূরীকে যতই স্মরণ করাতে চেষ্টা করছে, ততই মূরী যেন কিছুই বুঝতে পারছেনা। বনহুর যতই পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে, ওকে নিবিড়ভাবে পেতে চায়, নূরী ততই সরে যায় দূরে, সঙ্কুচিতভাবে নিজকে সরিয়ে রাখে বনহুরের পাশ থেকে।

কিন্তু রাতের বেলায় হয় যত মুস্কিল।

গহন বন। অন্ধকার রাত্রি, চারিদিকে হিংস্র জন্তুর গর্জন। নূরী ভয়ে কাঁপতে থাকে, তখন জড়োসড়ো ভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে বনহুরের কাছে।

অন্ধকারে নূরীর গতিবিধি লক্ষ্য করে হাসে বনহুর।

এমনি করে কেটে যায় দুটি দিন আর দুটি রাত।

নূরী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে এসেছে। বনহুর এবার বুঝতে পারলো–নূরীর হাটতে এখন কোন কষ্ট হবেনা!

নদীর ধার ধরে বনহুর আর নূরী এগিয়ে চললো।

সমস্ত দিন একটানা চলার পর ক্লান্ত অবশ পা দুখানা আর যেন উঠতে চায়না তাদের। বনহুর যদিও তেমন কোন অসুবিধা বোধ করছেনা তবু নূরীর জন্য তাকেও ধীরে ধীরে চলতে হচ্ছিলো বা বনহুর নূরীকে হাত ধরে চলায় সাহায্য করছিলো।

গোটা দিন অবিরাম চলে এমন একস্থানে এসে তারা পৌঁছলো যেখানে নদীটা প্রশস্ত হয়ে সাগরে গিয়ে মিশেছে। তীর থেকে সম্মুখে তাকালে শুধু জল আর জল। আকাশ যেন মিশে গেছে ঐ সাগরবক্ষে।

বনহুর নূরীকে লক্ষ্য করে বললো নূরী, আমরা সাগর তীরে এসে গেছি। হয়তো কোন জাহাজ এই পথে এসে যেতে পারে, তাহলেই আমরা বাচবো।

নূরীর কণ্ঠ শুকিয়ে এসেছে।

এ কয়টা দিন একমাত্র গাছের জংলী ফল খেয়ে বেঁচে আছে তারা। পানি পান করবার সুযোগ হয়নি আর।

নূরীর ক্লান্ত অবসন্ন করুণ মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে বললো বনহুর তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না নূরী?

নূরী মাথা নীচু করলো।

বনহুর বুঝতে পারলোনূরীর আর চলবার শক্তি নেই। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো বনহুর–কোথাও গাছ-পালা বা কোন ছায়া নেই, ফল-মূল তো দূরের কথা।

বনহুর নিজের জন্য যতখানি চিন্তিত না হলো, তার চেয়ে বেশী হলো নূরীর জন্য। নূরীকে আর বুঝি রক্ষা করা যাবে না।

নূরী বালির উপর বসে পড়লো।

বনহুর তাড়াতাড়ি নূরীর পাশে হাটু গেড়ে বললো—খুব কষ্ট হচ্ছে?

হাঁ, আমি আর পারছিনা।

নূরী, কি করবো বলো?

নূরী নীরব আঁখি দুটি তুলে ধরলো বনহুরের মুখের দিকে।

বেলা শেষ হয়ে এসেছে।

সূর্যের আলোকরশ্মি স্তিমিত হয়ে আসছে।

শুভ্র বলাকার দল ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে দূর হতে দূরান্তে।

বনহুর বললো–নূরী, ঐ পাখীগুলির আশ্রয় আছে। তারাও সন্ধ্যার আগে ফিরে যাচ্ছে নিজ নিজ ঘরে আর আমরা.......... আমাদের কোন আশ্রয়

নেই, নেই কোন মাথা লুকোবার ঠাই। কোথায় যাই বলো?

নূরী নীরব।

অসহ্য লাগে বনহুরের কাছে নূরীর এ নীরবতা। ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা করে তার। কিন্তু কি হবে কেঁদে, তার কাদা নূরীর প্রাণে এতোটুকু দোলা জাগাবেনা।

ঐ রাত্রি বালির মধ্যেই কেটে গেলো বনহুর আর নূরীর।

পরদিন আবার হলো তাদের যাত্রা শুরু।

এবার বনহুর আর নূরী সাগর তীরে ধরে এগিয়ে চললো। যদিও নূরী অবসন্ন ক্লান্ত তবু বনহুরের হাত ধরে অতি কষ্টে এগুতে লাগলো।

চলেছে তো চলেছে।

কিন্তু নূরী আর পারছে না, বসে পড়লো ভূতলে।

বনহুর বিপদে পড়লো, বুঝতে পারলোনূরী একেবারে ক্ষীণ দুর্বল হয়ে পড়েছে। চলতে আর পারছেনা—এখন উপায়!

না চললেও নয়, যতক্ষণ নিশ্বাস আছে ততক্ষণ বাঁচার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতেই হবে।

বনহুর নূরীকে তুলে নিলো হাতের উপরে।

নূরী লেতিয়ে পড়লো, আর বাধা বা আপত্তি করতে পারলো না।

বেশ কিছুদূর এগুলো বনহুর নূরীকে ঐ ভাবে দুহাতের উপর তুলে নিয়ে। হঠাৎ বনহুরের নজরে পড়লো, দূরে—কিছু দূরে দুটি লোক বালির উপরে ভীষণভাবে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে।

নূরীকে নিয়ে থমকে দাঁড়ালো বনহুর। ভাল করে লক্ষ্য করতেই চমকে উঠলো, একটি লোকের হস্তে সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা অপর ব্যক্তি নিরস্ত্র। ছোরাওয়ালা লোকটার কবল থেকে স্যুটপ্যান্ট পরা লোকটা নিজেকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ভীষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি চলেছে। আশেপাশে বেশ কিছুটা ঝোপঝাড় রয়েছে।

বনহুর বুঝতে পারলো কোন অসহায় ভদ্রলোক কোন দস্যু কবলে। আক্রান্ত হয়েছে। বনহুরের ধমনীর রক্ত মুহূর্তে উষ্ণ হয়ে উঠলো, যদিও সে আজ কদিন সম্পূর্ণ উপবাসী—তবু এতোটুকু বিচলিত হলোনা। নূরীকে বালির উপর নামিয়ে দিয়ে দ্রুত ছুটে চললো সে লোক দুটির দিকে।

বনহুরের লক্ষ্য আর কোন দিকে নেই, সোজা সে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো লোক দুটির উপরে। ছোরাওয়ালা লোকটার নাকে প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিতেই, চারিদিক থেকে বেরিয়ে এলো কতকগুলো স্যুট-প্যান্ট-ক্যাপ পরা লোক, একসঙ্গে সবাই বলে উঠলো–আহা একি করছেন? একি করছেন?

বনহুর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকালো—এ কি! তার চারপাশে অনেকগুলি ভদ্রলোক গোলাকার হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। অদূরে তাকাতেই। বনহুরের মাথাটা লজ্জায় নুয়ে এলো। একি করেছে সে! কিছুদূরে একটা ঝোপের পাশে ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক মোটা মত ভদ্রলোক, মুখে-চোখে তার বিরক্তির ছাপ।

ভীড় ঠেলে বনহুরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন পরিচালক স্বয়ং, গম্ভীর শান্ত কণ্ঠে বললেন—আপনি নিশ্চয়ই ভুল করেছেন, আমাদের কুন্তিবাঈ ছবির সুটিং হচ্ছিলো।

বনহুর হেসে বললো—মাফ করবেন—না জেনে.....

নিশ্চয়ই? কিন্তু আপনি কে?

অন্যান্য সবাই তখন বিপুল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে, কে এই লোক—নির্জন সাগর সৈকতে এলোই বা কোথা থেকে। যে লোকটার নাকে বনহুর প্রচণ্ড ঘুষি লাগিয়ে দিয়েছিলো, তার নাক দিয়ে তখন রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। লোকটা বারবার রুমালে গড়িয়ে পড়া রক্ত মুছে নিচ্ছিলো।

পরিচালকের প্রশ্নের জবাবে একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিলো বনহুর জাহাজডুবিতে আমাদের এই অবস্থা হয়েছে। কোন রকমে আমি ও আমার বোন প্রাণে বেঁচে গেছি। কান্দাই শহরে আমার বাড়ী।

পরিচালক উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন-কান্দাই শহরে আপনার বাড়ী? আপনার পরিচয়?

জনাব হায়দার উদ্দিন চৌধুরীর সন্তান আমি। আমার নাম মকছুদ চৌধুরী।

বনহুর কান্দাই এর সবচেয়ে ধনি ব্ল্যাক মার্কেটার হায়দার চৌধুরীর সন্তান বলে নিজকে পরিচিত করলো।

পরিচালক খুশী হয়ে বললেন আমাদের বাড়ী বসুন্দা নগরে। যদিও কান্দাই থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে, তবু কান্দাই এর সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট যোগাযোগ রয়েছে। জনাব হায়দার উদ্দিন চৌধুরীর নাম শুনেছি। তিনি মস্ত ধনবান ব্যক্তি একথাও আমরা জানি। আপনি তারই পুত্র............ পরিচালকের গলা ব্যথায় জড়িয়ে এলো।

বনহুর বলে উঠলো—হাঁ, আজ আমারই এ দশা...........

দুঃখ করবেন না, সবই অদৃষ্ট। কই, আপনার ভগ্নি কোথায়?

বনহুর দূরে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো—ঐ যে ওখানে। আজ কদিন আমি এবং আমার ভগ্নি সম্পূর্ণ উপবাসী। ওর খুব কষ্ট হচ্ছে।

পরিচালক বনহুরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—আপনাদের আর কোন চিন্তা নেই। এবার আমাদের হাতে আপনারা এসে গেছেন। তারপর নিজেদের

লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন–এসো, আগে এনাদের ব্যবস্থা ঠিক করে তবে আবার সুটিং শুরু করবো।

অদূরে একটা বাকের মত জায়গায় কুন্তিবাঈ ছবির ইউনিটের জাহাজ নোঙ্গর করে ছিলো। ছোট ছোট কয়েকখানা বোটনৌকা ছিলো তাদের সঙ্গে, বনহুর আর নূরীকে নিয়ে পরিচালক নাহার সাহেব তাদের জাহাজে গেলেন। এবং বনহুর আর নুরীর জন্য একটা ক্যাবিন ছেড়ে দিলেন। থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থা তিনি নিজে করলেন। বনহুর ও নূরীর জামা-কাপড় নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো, এসবও তিনি সংগ্রহ করে দিলেন। জাহাজে এসব জিনিসের কোন অভাব ছিলো না।

কুন্তিবাঈ এর নায়িকা জ্যোছনা রায় ও তার সহচরী অনেক যুবতীই ছিলো এই জাহাজে, কাজেই নূরীকে পেয়ে তারা খুশীই হলো।

বনহুর যখন বাথরুম থেকে বের হলো তখন তাকে রাজ পুত্রের মতই সুন্দর লাগছিলো।

পরিচালক নাহার চৌধুরী জড়িয়ে ধরলেন বনহুরকে, বনহুরের অপরূপ সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করে ফেললো।

এতোক্ষণ বনহুরের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ থাকায় তার সত্যিকারের রূপ, ঢাকা পড়েছিলো, এখন সেভ করে নতুন পোষাক পরায় তাকে অপরূপ দেখাচ্ছে।

কুন্তিবাঈ ছবির সুপুরুষ নায়ক অরুণ সেন বনহুরের দীপ্ত চেহারার কাছে সঙ্কুচিত হলো। সে মনে করতো, তার চেয়ে সুন্দর সুপুরুষ আর বুঝি কেউ নেই। হিংসা হলো অরুণ সেনের মনে, সকলের অলক্ষ্যে তাকালো অরুণ সেন জ্যোছনা রায়ের দিকে।

অদূরে দাঁড়িয়ে জ্যোছনা রায় তখন নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে।

পরিচালক অরুণ সেন ও জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন বনহুরের।

আমার ছবির নায়িকা জ্যোছনা রায়।

হাত জুড়ে নমস্কার জানালো জ্যোছনা রায়।

আর ইনি নায়ক অরুণ কুমার সেন।

বনহুর অরুণের দিকে হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডসেক করলো।

বৈকালে বাকী সুটিং শেষ করে কুন্তিবাঈ ছবির ইউনিট যাত্রা শুরু করলো।

হঠাৎ বনহুরের ভাগ্য এতো প্রসন্ন হবে, ভাবতেও পারেনি সে নিজে। মৃত্যুর মুখ থেকে যেন ফিরে এলো তারা।

পরিচালক নাহার চৌধুরী বনহুরের সঙ্গে গভীরভাবে ভাব জমিয়ে ফেললেন। এমন একজন ব্যক্তি যদি তাদের দলে থাকে তবে তাদের সৌভাগ্য বলতে হবে। নাহার চৌধুরী জানেন–কান্দাই এর হায়দার উদ্দিন চৌধুরী বিরাট ধনবান, ইচ্ছা করলে তিনি এক সঙ্গে পাঁচখানা ছবির প্রযোজনা করতে পারেন। আর এমন সুন্দর সুপুরুষ তার ছেলে, হিরো বাইরে খুঁজতে হবে কেনো। কিন্তু বড় বেরসিক ভদ্রলোক, এতো অর্থের মালিক হয়েও এ ব্যবসায় দৃষ্টি দেন না।

পথে আরও একটা দৃশ্যের সুটিং শেষ করে তবেই ফিরবেন পরিচালক। একটা ঘোড়দৌড়ের দৃশ্য নেওয়া হবে। কিন্তু সেই দৃশ্যটা এমন স্থানে হতে হবে যেখান বেশ ফাঁকা বিস্তৃত মাঠ ও কিছুটা পাহাড় রয়েছে, আরও থাকতে হবে কিছু ঝোপ-ঝাড়-টিলা। এই দৃশ্যটা নেওয়া হলেই কুন্তিবাঈ ছবির ইউনিট স্বদেশে ফিরে যাবে।

জাহাজখানা তীরের অনতিদূর দিয়ে এগুতে লাগলো। ডেকে দাঁড়িয়ে দুরবীক্ষণ যন্ত্র চোখে লাগিয়ে দেখছেন পরিচালক স্বয়ং। ক্যামেরাম্যান অনন্ত বাবুও মাঝে মাঝে পরিচালকের হাত থেকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা নিয়ে দেখছিলেন।

কিন্তু মনমতো জায়গা কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। যদি পাওয়া যায় সুন্দর বালুকাময় বিস্তৃত প্রান্তর, আশেপাশে কোথাও টিলা বা পাহাড়ের চিহ্ন নেই আবার যদি পাওয়া যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড়, আশেপাশে কোন ফাঁকা মাঠ বা বিস্তৃত প্রান্তর নেই। গোটা দুটো দিন মনমতো জায়গার অভাবে কেটে গেলো কুন্তিবাঈ ইউনিটের।

জাহাজ আজ দক্ষিণ পূর্ব কোণ ধরে এগুচ্ছে।

পরিচালক নাহার চৌধুরী দুরবীক্ষণ যন্ত্র চোখে লাগিয়ে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। হঠাৎ একদিন জুটে গেলো তার মনমতো জায়গা।

তীরের অনতিদুরে জাহাজ নোঙ্গর করলো।

ঠিক পরিচালকের মনের মত স্থান। খুশীতে আত্মহারা হলেন নাহার চৌধুরী। জাহাজ থেকে বোট নামানো হলো, সবাই বোটে চেপে তীরে এলেন।

পরিচালকের আনন্দ আর ধরছেনা।

যেমনটি চেয়েছিলেন ঠিক তেমনটিই নাকি পেয়েছেন।

বিস্তৃত বালুকাময় বেলাভূমি, মাছে মাঝে ছোট ছোট টিলা আর ঝোপঝাড়। একটু দূরেই ছোটখাটো কয়েকখানা পাহাড়।

সুটিং শুরু করবেন পরিচালক।

জাহাজ থেকে দুটো ঘোড়া নামিয়ে আনা হলো। একটি সাদা ধবধবে, একটি সাদা-কালো মেশানো! ঘোড়া দুটি যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি তেজী।

জায়গা বেছে নিয়ে ক্যামেরা বসানো হলো।

নায়িকা জ্যোছনা রায়কে মেকআপ দিচ্ছেন মল্লিক বাবু।

এ দৃশ্যে থাকবে নায়িকা, নায়ক ও ভিলেন।

নায়ক অরুণ কুমার ও ভিলেন নায়ক বিশুর মেকআপ নেওয়া হয়ে গেছে। এ দৃশ্যে থাকবে.....

নায়িকা কলসী কাখে জল নিয়ে ফিরছিলো।

একটা ঘোড়ার পিঠে হঠাৎ এগিয়ে এলো ভিলেন। রাজার সেনাপতির বেশ চোখে মুখে লালসা পূর্ণ ক্ষুব্ধ শার্দুলের চাহনী। অশ্বপষ্ঠে ছুটে আসছে। ভিলেন নায়িকার দিকে, নায়িকার পাশ কেটে চলে যাবার সময় এক ঝটকায় ভিলেন নায়িকাকে তুলে নিলো ঘোড়ার পিঠে। নায়িকার হাত থেকে ভরা কলসীটা পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেলো। নায়িকা তীব্র চীৎকার করে উঠলো–বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও...

অদূরে একটা ঘোড়ার পিঠে নায়ক ছুটে আসে, দাঁড়ায় একটু ঘোড়াটা দুপা উঁচু করে চিহি শব্দ করে তারপর তীর বেগে ছুটে যায়....

মেকআপ নেওয়া হয়ে গেলো।

নায়িকা কলসী কাখে এসে দাঁড়ালো পথের মধ্যে।

পরিচালক স্ক্রিপ্ট খুলে তার কার্যসূচী বুঝিয়ে দিলেন নায়িকা জ্যোছনা রায়কে।

ক্যামেরা নায়িকাকে ধরে এগুচ্ছে।

নায়িকা আপন মনে কলসী নিয়ে পথ বেয়ে চলেছে।

পরিচালক চীকার করে উঠলো-কাট।

এদিকে অশ্বপৃষ্ঠে দ্রুত এগিয়ে আসছে ভিলেন। ক্যামেরা এবার অশ্বসহ ভিলেনকে ধরলো। ক্যামেরা ধীরে ধীরে ঘুরছে।

দ্রুত এগিয়ে আসছে ভিলেন।

পরিচালক নাহার চৌধুরীর কণ্ঠস্বর-কাট।

আবার নায়িকাকে ধরলো ক্যামেরা, ছুটে আসছে ভিলেন অশ্বপৃষ্ঠে। ক্যামেরায় এক সঙ্গে ধরা হলো ভিলেন নায়িকাকে এক ঝটকায় তুলে নিলো অশ্বপৃষ্ঠে, তারপর অশ্বপৃষ্ঠে নায়িকা সহ ভিলেন ছুটে চলেছে। কলসীটা নায়িকার হাত থেকে খসে পড়ে খান খান হয়ে ভেংগে গেলো। এ দৃশ্যটাও ক্যমেরা ম্যান অনন্ত বাবু ধরে নিলেন একই সঙ্গে।

পরিচালক আনন্দধ্বনি করে উঠলেন–সাবাস!

এখন নায়ক অরুণ কুমারের কাজ।

অরুণ কুমার তার সাদা ধবধবে ঘোড়াটার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

ক্যামেরা ঠিক করে নিলেন অনন্ত বাবু।

পরিচালক অরুণ বাবুর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন স্ক্রিপ্ট হাতে।

অন্যান্য যার যা কাজ সবই ঠিক হয়ে কাজ শুরু করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন।

শব্দযন্ত্রী কাওসার আহম্মদের এখন কোন কাজ নেই। তিনি ঘোড়ার খুঁড়ের শব্দ পরে সংযোগ করে নেবেন, এখন তিনি কাজ দেখে যাচ্ছেন শুধু।

অরুণ কুমারকে পরিচালক তার কাজ বুঝিয়ে দিতেই অরুণ বাবুর মুখ বিবর্ণ হলো, তাকে অনেক করে ঘোড়া চড়া শেখানো হয়েছিল, কিন্তু আজ বলছেন, আমি এটা পারবো কিনা সন্দেহ।

পরিচালক বিপদে পড়লেন; এমনটি যে হবে কল্পনাও করতে পারেন নি। তিনি ভেবেছিলেন, অরুণ কুমারকে যে ভাবে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়ে নেওয়া হলো তাতেই কাজ চলবে।

কিন্তু এখন একেবারে তিনি বেঁকে বসলেন, ঘোড়ায় চড়ে দৌড়তে পারবেন না।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন পরিচালক নাহার চৌধুরী।

স্টুডিওতে ছবির প্রাথমিক কাজ শেষ করে আউটডোরে সুটিং এ বেরিয়েছেন নাহার চৌধুরী। আউটডোরের কিছু দৃশ্য গ্রহণের পর ইনডোরে কাজ শুরু করবেন —এই তার ইচ্ছা। হিরোর দুটো মাত্র দশ্য ইতিপূর্বে গ্রহণ করা হয়েছে। ঘোড়া চড়া দৃশ্যগুলি বাকী রেখে, তাকে ঘোড়া চড়া শেখানো হচ্ছিলো।

আজ পরিচালক নাহার চৌধুরী বিপদে পড়ে গেলেন। এ দৃশ্য এই স্থানেই গ্রহণ করতে হবে। বিস্তৃত বালুকাভূমি, মাঝ মাঝে টিলা আর ঝোপ জাড়, অদূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে।

পরিচালক অরুণ কুমার চেষ্টা নিতে বললেন।

তিনি ঘোড়ায় চড়লেন বেটে কিন্তু ঘোড়ার পিঠে এই উঁচু নীচু স্থান দিয়ে দৌড়াতে রাজি হলেন না, ভয়ে কুকড়ে গেলেন—যদি পড়ে গিয়ে মেরুদণ্ড ভেংগে যায়!

বেশ কিছুক্ষণ এ সব নিয়েই কেটে গেলো।

এবার উপায়? অন্ততঃপক্ষে ঘোড়ায় চড়া ব্যাপারটা আর একজনকে নিয়েও চালানো যায়, কিন্তু তাদের ইউনিটে কেউ ঘোড়ায় চাপতে জানেনা। পরিচালক এনিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

পরিচালক যখন উপায়ন্তর না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়লেন তখন বনহুর এগিয়ে এলো—নায়ক ছাড়া যদি চলে তবে আমি একবার চেষ্টা নিতে পারি কি?

আনন্দে অস্ফুট ধ্বনি করে বনহুরকে জড়িয়ে ধরলেন পরিচালক নাহার চৌধুরী। খুশীতে যেন ফেটে পড়লেন বললেন–আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো।

হেসে বললো বনহুর—থাক আগে কাজ হোক।

দৃশ্যটা গ্রহণ করা হয়ে গেলো।

গোটা ইউনিট জয়ধ্বনি করে উঠলো।

বনহুরকে সামান্য মেকআপ দেওয়া হয়েছিলো–তাতেই তকে অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছিলো। তাছাড়া ঘোড়ায় চড়া কালে মুখ স্পষ্টভাবে দেখানো হয় নাই, কাজেই অসুবিধা হলোনা কিছু।

পরিচালক নাহার চৌধুরী জড়িয়ে ধরলেন বনহুরকে।

সুদক্ষ অভিনেতার মতই নাকি সে কাজ করেছে। বনহুরের প্রশংসায় সকলে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। এতো অল্প সময়ে এতো সুন্দরভাবে কোন অভিজ্ঞ অভিনেতাও নাকি কাজ করতে পারেনা।

সেদিনের সুটিং শেষ করে আবার যাত্রা শুরু করলেন পরিচালক নাহার চৌধুরী।

কিন্তু সেদিনের পর হঠাৎ অরুণ কুমার বেঁকে বসলেন, এ ছবিতে তিনি আর কাজ করবেন না।

পরিচালক কথাটা শুনে আকাশ থেকে পড়লেন।

অনেক করেও অরুণ কুমারকে মত করানো গেলোনা।

সেদিনে বনহুরের কৃতিত্ব তার আত্মমর্যাদায় চরম আঘাত করেছিলো। একেই অরুন কুমার বনহুরের সৌন্দর্য দর্শনে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। চিত্রজগতে অরুন কুমার নামকরা সুপুরুষ। শহরের বহু যুবতী অরুণ কুমারের সঙ্গে এতোটুকু আলাপ করার জন্য সদা উন্মুখ। সেই অরুণ কুমার সেনের এই চরম অপমান। তার সৌন্দর্য ম্লান হয়ে গেছে মকছুদ চৌধুরীর কাছে। নিজকে অপমানিত বোধ করে অরুণ কুমার।

অরুণ কুমার কুন্তিবাঈ ছবির জন্য চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি অসম্ভবভাবে বেঁকে বসলেন।

পরিচালক নাহার চৌধুরী ভেংগে পড়বার লোক না। অরুণ কুমার তার ছবিতে কাজ না করলেও তিনি ছবি ছেড়ে পালাবেন না। কুন্তিবাঈ ছবির প্রযোজক আরফান উল্লাহর দৃঢ় বিশ্বাস নাহার চৌধুরীর উপর। ভদ্রলোকের আরও তিনখানা ছবিতে নাহার চৌধুরী পরিচালনা করেছেন। প্রত্যেকটা ছবি তিনি আপ্রাণ চেষ্টা ও আন্তরিকতা নিয়ে সমাধা করেছিলেন। তিন খানাই হিট ছবি হয়েছিলো। প্রচুর পয়সা পেয়েছেন প্রযোজক আরফান উল্লাহ!

.

নাহার চৌধুরী প্রত্যেকটা ছবিতে নতুন মুখ আবিষ্কার করেন। প্রাণঢালা যত্নে তিনি এদের শিখিয়ে কার্যক্ষম করে গড়ে তোলেন। এহেন জন অরুণ কুমারের এই অহেতুক অভিমানে হতাশ হলেন না।

সেদিন বনহুর আর নূরী ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস দেখছিলো, আর মাঝে মাঝে বনহুর নুরীকে দুএকটা পূর্ব কথা বলে তার স্মরণশক্তি ফেরবার চেষ্টা করছিলো বনহুর যতই যা করুক, সব সময় নূরীর জন্য তার চিন্তার অন্ত নেই। নারীর স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে না আসা অরধি নানাভাবে নানা কাজের মধ্যে দিয়ে ওকে পূর্ব কথা স্মরণ করাতে চেষ্টা করত সে। আজও এ-কথা সে-কথা বলে নূরীর জ্ঞান পরীক্ষা করছিলো।

এমন সময় পরিচালক নাহার চৌধুরী ও নায়িকা জ্যোছনা রায় এসে দাঁড়ালেন তাদের পাশে।

আকাশে পূর্ণ চন্দ্র।

জ্যোছনার আলোতে ডেকখানা আলোকিত।

নাহার চৌধুরী হেসে বললেন-আপনারা এখানে; আর আমরা খুঁজে এলাম আপনাদের ক্যাবিনে।

হেসে বললো বনহুর-সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস দেখছিলাম।

সত্যি, প্রকৃতির অপরূপ লীলা–কিন্তু এ সব দেখবার বা উপভোগ করবার শক্তি কজনার আছে বলুন? সারা দিন থাকি ছবির চিন্তা নিয়ে। রাতে যে ঘুমোবা তারই কি যো আছে; পর দিনের প্রোগ্রাম ভাবতেই গোটা রাত কাবার হয়ে যায়। তারপর ফিরে তাকালেন নাহার চৌধুরী জ্যোছনা রায়ের দিকে—কি বললা জ্যোছনা, সত্যি কিনা?

জ্যোছনা রায় একটু হাসলো।

নাহার চৌধুরী এবার বললেন–মিঃ মকছুদ, আপনার সঙ্গে একটি জরুরী কথা আছে।

বেশ বলুন?

এখানে নয়, চলুন ক্যাবিনে সেখানেই বলবো।

ধন্যবাদ। চলুন। বনহুর এবার নূরীকে লক্ষ্য করে বললো—তুমি ক্যাবিনে যাও নূরী, আমি এক্ষুনি আসছি।

নূরী নীরবে তাদের নিজ ক্যাবিনের দিকে চলে গেলো।

বনহুর এগুলো নাহার চৌধুরী আর জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে।

পরিচালক নাহার চৌধুরীর ক্যাবিনে এসে তিন জন মুখো-মুখী বসলো। ক্যামেরা ম্যান অনন্ত বাবুও আছেন সেখানে।

অনন্ত বাবু বয়সী ভদ্রলোকে—ধীর গম্ভীর মানুষ। ক্যামেরায় তার দক্ষতা অপরিসীম। অনন্ত বাবু নীরবে সিগারেট পান করছিলেন। ক্যাবিনে চতুর্থ জন

অনন্ত বাবু ছাড়া আর কেউ ছিলেন না।

নাহার চৌধুরী সিগারেট-কেসটা বাড়িয়ে ধরলেন বনহুরের দিকে নিন। বনহুর একটা সিগারেট তুলে নিলো আংগুল দিয়ে।

নাহার চৌধুরী নিজেও একটা সিগারেট নিয়ে খুঁজলেন ঠোঁটের ফাঁকে। তারপর অগ্নি সংযোগ করে এক মুখ ধোয়া ছুড়ে দিলেন সম্মুখে।

বনহুর আপন মনে সিগারেট থেকে ধূম্র নির্গত করছিলো।

নাহার চৌধুরী তাকে এখানে কি কথা বলার জন্য ডেকে এনেছেন, এখনও সে জানে না।

বনহুর একবার নিজের অজ্ঞাতে তাকালো জ্যোছনা রায়ের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে জ্যোছনা রায়ের দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো তার। জ্যোছনা রায় নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

বনহুরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই জ্যোছনা রায় দৃষ্টি নত করে নিলো।

নাহার চৌধুরী বললেন——মিঃ মকছুদ, আপনাকে যে কথা বলবো বলে এখানে ডেকেছি—সত্যি তা বলতে আমি কুণ্ঠা বোধ করছি, কাজেই আমাকে কিছুটা ভূমিকা গ্রহণ করতে হচ্ছে।

বলুন? হেসে বললো বনহুর।

নাহার চৌধুরীর হাতের সিগারেটে বেশ জোরে কয়েকটা টান দিয়ে এ্যাসট্রেতে সিগারেটটা নিক্ষেপ করে সোজা হয়ে বসলেন।

বনহুর ও অন্যান্য সবাই তাকালো নাহার চৌধুরীর মুখের দিকে।

নাহার চৌধুরী বললেন এবার আপনি শুনেছেন এবং জানেন আমার কুন্তিবাঈ ছবির নায়ক অরুণ কুমার সেন। অরুণ কুমারকে আমি এ ছবির জন্য পঁচিশ হাজার টাকা কন্ট্রাক করেছি। কিন্তু অরুণ কুমার এখন বেঁকে বসেছেন—এ ছবিতে তিনি কাজ করবেন না।

বনহুর কিছুমাত্র আশ্চর্য হলোনা, কারণ এ কথা সে পূর্বেই শুনেছিলো। নিচুপ ধুম নির্গত করে চললো সে। দৃষ্টি তার ক্যাবিনের ছাদে সীমাবদ্ধ। সোফায় ঠেস দিয়ে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে নাহার চৌধুরী ও শুনে যাচ্ছিলো বনহুর।

নাহার চৌধুরী বলে যাচ্ছেন—অনেক অনুরোধ করা সত্বেও তাকে রাজি করাতে সক্ষম হলাম না। এখন আমি বিপদগ্রস্ত।

বনহুর এবার শান্ত কণ্ঠে বললো-চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করা সত্ত্বেও তিনি কি করে মত পাল্টান?

কি করবো বলুন, সব ওদের ইচ্ছা।

না, এ হতে পারে না, তাকে বাধ্য করতে হবে ছবি ব্যাপারে।

কিন্তু তা হয় না মিঃ মকছুদ, জোর করে কাউকে দিয়ে অভিনয় আদায় করানো যায় না।

বনহুর সোজা হয়ে বসলো, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো সে–আপনি এতো সোজায় তাকে ছাড়বেন কেনো? শুনেছি ছবির কয়েকটা দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে অরুণ বাবু আছেন।

হাঁ, কিন্তু মাত্র দুটি দৃশ্যে অরুণ বাবু কাজ করেছেন। এখন সে সরে পড়েলেও আমাদের তেমন কোন ক্ষতি হবেনা।

তাহলে অন্য কোন নায়ক....

বনহুরের মুখের কথা লুফে নিলেন নাহার চৌধুরী হাঁ, আমি সেই কথাই ভাবছি মিঃ মকছুদ এবং সেই চিন্তাই করছি। আগামীকাল আমাদের জাহাজ বসুন্দায় পৌঁছে যাবে। আজ জাহাজে আমাদের শেষ দিন, তাই ভাবছি আপনাকে একটা কথা বলবো.....

থামলেন নাহার চৌধুরী।

বনহুর তার কথা শুরু করবার পূর্বেই জানতে পেরেছে তাকে কি বলবেন বা বলবার জন্য নাহার চৌধুরী এখানে ডেকে এনেছেন। মনে মনে হাসলো বনহুর

আজ যদি তার আসল পরিচয় জানতো, তাহলে.....

বনহুরের চিন্তাধারায় বাধা পড়লো, বললেন নাহার চৌধুরী–বসুন্দায় পৌঁছেই আমার ছবির কাজ শুরু হবে। নায়ক-নায়িকা উভয়ের কাজ একাধারে চলবে। নাহার চৌধুরী রুমাল বের করে নিজের মুখখানা একবার মুছে নিলেন, তারপর ঢোক গিলে একটু কেশে বললেন–আমার ইচ্ছা, আপনি যদি আমাদের কুন্তিবাঈ ছবির..... মানে......নায়ক হিসাবে কাজ করেন......

বনহুর মিছামিছি বিস্ময় টেনে বললো–এ আপনি কি বলছেন মিঃ নাহার? অসম্ভব এটা।

না, অসম্ভব নয়। এতোক্ষণে নাহার চৌধুরী নিজের কণ্ঠে জোর পেলেন যেন। যা বলতে গিয়ে এতোখানি ভুমিকা টানলেন, এতোক্ষণে যেন সব স্বচ্ছ হয়ে গেছে। একটু থেমে বললেন–আপনার কাছে আমার অনুরোধ মিঃ মকছুদ। হাতজুড়ে কথাটা বললেন তিনি।

বনহুর দস্যু হলেও তার মানুষের প্রাণ, তাছাড়াও আজ নাহার চৌধুরী ছাড়া তার জীবন রক্ষা পেতোনা। শুধু তার নয়–নরীও না খেয়ে শুকিয়ে মরতো ঐ নির্জন সাগর সৈকতে। এতোখানি উপকার যে করেছে তাকে কি করে বনহুর বিফল করবে। কিন্তু কত দিন দেখে নাই তার মাকে, মনিরাকে....... ওদের জন্য মনটা ছট ফট করে উঠলো, আনমনা হয়ে গেলো বনহুর।

নাহার চৌধুরী অনুনয়ের সুরে বললো আপনি আমাকে বাঁচান মিঃ মকছুদ।

বনহুর সম্বিৎ ফিরে পেলো, বললেন—আমি তো অভিনয় জানিনা।

বনহুরের কথায় নাহার চৌধুরীর দুচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বনহুরের নরম সুরে তিনি যেন ভরসা পেলেন খুজে। আনন্দ ভরা কণ্ঠে বললেনআপনি শুধু রাজি হলে আমরা কৃতার্থ। অভিনয় আপনাকে জানতে হবেনা, যা করতে হয় আমি সব শিখিয়ে নেবো!

বেশ রাজি।

নাহার চৌধুরী আর একবার বনহুরকে জড়িয়ে ধরলেন আনন্দের আতিশয্যে।

অনন্ত বাবুর চোখমুখেও খুশীর উচ্ছ্বাস, তিনি এতোক্ষণ গম্ভীর মুখে প্রতীক্ষা করছিলেন মিঃ মকসুদ রাজি হন কি না। অনন্ত বাবুই নাহার চৌধুরীকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, অরুণ বাবু কাজ করতে চান না বেশ ভাল কথা। দেখুন যদি মিঃ মকছুদ সাহেবকে রাজি করাতে পারেন.....

বাস্-কথাটা নাহার চৌধুরীর মনে লেগে গিয়েছিলো। তিনিও অন্তরে অন্তরে এমনি চিন্তাই করছিলেন, কিন্তু প্রকাশ করতে পারেননি। অনন্ত বাবু। কথাটা বলায় তার মনে একটা উদ্যম বাসনা ছাড়া নিয়ে উঠেছিলো, তিনি খুশী হয়েছিলেন খুব। এবং কথাটা ছবির নায়িকা, জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে আলাপ করে আরও আনন্দিত হয়েছিলেন।

জ্যোছনা রায় বলেছিলো—অরুণ কুমার বাবু যদি কাজ না করতে চান তবে তাকে দিয়ে জোর করে কাজ আদায় করা যাবে না। এতে ছবি হতে পারে কিন্তু ছবির মধ্যে কোন আন্তরিকতা থাকবে না। শেষ পর্যন্ত ছবি হিট না-ও করতে পারে। মিঃ মকছুদ সাহেব যদি রাজি হন তবে কোন কথা নেই।

নাহার চৌধুরীর মন খুশীতে ভরে উঠেছিলো। তিনি জ্যোছনা রায় সহ, তাই মিঃ মকছুদের পাশে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন।

বনহুর রাজি হওয়ায় জ্যোছনা রায়ের মুখমণ্ডল দীপ্তময় হয়ে উঠলো।

বনহুর ওর দিকে চাইতে হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানালো জ্যোছনা রায়।

১৪.

বৈকালে নির্জন শান্ত পরিবেশে ডেকে দাঁড়িয়েছিলো বনহুর। ফুরফুরে হওয়ায় বনহুরের কোঁকড়ানো চুলগুলি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিলো। বনহুর বারবার হাত দিয়ে চুলগুলি পিছনে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলো। দক্ষিণ হস্তে ধুমায়িত সিগারেট।

জ্যোছনা রায় এসে দাঁড়ালো বনহুরের পাশে হ্যালো মিঃ মকছুদ।

ফিরে তাকালো বনহুর, স্মিত হাসি হেসে বললো—আসুন।

জ্যোছনা রায় এক থোকা রজনী গন্ধার মত বনহুরের পাশে এসে দাঁড়ালো, সুমধুর কণ্ঠস্বরে বললো–আপনার বোন কোথায়?

বললো বনহুর-ক্যাবিনে।

এই সুন্দর বৈকালে ক্যাবিনের অন্ধকারে? আশ্চর্য মেয়ে সত্যি আপনার বোনটা। কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চান না।

হাঁ, আগে ঠিক অমন ছিলোনা, জাহাজডুবির পর থেকে ওর কি যেন হয়েছে— কারো সঙ্গে মিশতে বা কথা বলতে চায় না। এমন কি আমার সঙ্গেও ঠিকভাবে কথাবার্তা বলে না।

জ্যোছনা রায় বললো সত্যি বড় দুঃখের কথা! নিশ্চয়ই ব্রেনে কোন গোলযোগ হয়েছে।

হাঁ, আমারও তাই মনে হয়।

ওকে ঠিকভাবে চিকিৎসা করা দরকার।

শহরে পৌঁছে ওর চিকিৎসা ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে।

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরবে কাটে।

জ্যোছনা রায়ের দেহে আজ ফিকে গোলাপী শাড়ী! ব্লাউজটাও ঠিক শাড়ীর রঙ-ফিকে গোলাপী। একরাশ কালো কোঁকড়ানো চুল মাথায় উপরে চূড়ো করে বাধা। একটা গোলাপ ফুল গোজা রয়েছে চূড়োর বাম পাশে। ফুলটা অবশ্য সত্যি গোলাপ নয়, প্লাষ্টিকের ফুল। কিন্তু দেখলে কেউ ভাবতে পারবে না ওটা নকল ফুল। একেবারে যেন সদ্য গাছ থেকে তুলে আনা গোলাপ ওটা। পায়ের জুতোও গোলাপী, ভ্যানিটি ও রুমালখানাও সে শাড়ীর সঙ্গে ম্যাচ করে পরেছে। তার দুধে আলতা মেশানো দেহটার সঙ্গে মিশে গেছে যেন এসব। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে জ্যোছনা রায়কে আজ।

অভিনেত্রী জ্যোছনা রায় শুধু সুন্দরীই নয়। তার মিষ্টি হাসিটুকু দর্শকগণকে উন্মাদ করে তোলে। জ্যোছনা রায় যে ছবিতে থাকে সে ছবি হিট না করে যায় না।

সমস্ত দেশজোড়া নাম জ্যোছনা রায়ের। জ্যোছনা রায়কে না দেখলে দর্শকমণ্ডলীর প্রাণই যেন ভরে না।

সেই সুন্দরী অভিনেত্রী জ্যোছনা রায় এসে দাঁড়িয়েছে বনহুরের পাশে। সেন্টের একটা সুমিষ্ট গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চার ধারে। সদ্য ফোটা গোলাপ ফুলের সুবাসের মত। বনহুর চট করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারলো না। তাকিয়ে রইলো নির্নিমেষ নয়নে।

মৃদু হেসে বললো জ্যোছনা রায়–কি দেখছেন?

অপূর্ব।

কি?

আপনি।

বনহুরের মুখে এই কথাটা শুনবার জন্যই যেন জ্যোছনা উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতিক্ষা করছিলো। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো যে সে। দৃষ্টি নত করে নিয়ে বললো জ্যোছনা রায় –বেশী বাড়িয়ে বলছেন।

মোটেই না। মিস রায়, সত্যি আপনি অপূর্ব।

যাক ওসব বাজে কথা।

এটা যদি বাজে কথা হয় তবে কোনটা কাজের কথা, বলুন?

সত্যি, আপনি আমার বিপরীতে কাজ করবেন জেনে অনেক খুশী হয়েছি। ধন্যবাদ জানাতে এলাম আপনাকে।

ও? এই কথা? হাঁ, আপনার ধন্যবাদটুকু, এখনও পাইনি। কিন্তু এখন তো আপনারা খুব ধন্যবাদ দিচ্ছেন, যখন দেখবেন ক্যামেরার সম্মুখে দাঁড়িয়ে একেবারে সব গোল পাকিয়ে দেবো তখন হবে মজা। কথা শেষ করে হেসে উঠলো বনহুর।

জ্যোছনা রায় বনহুরের হাস্য উজ্জ্বল দীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো নিষ্পলক নয়নে।

০১৫. চিত্রনায়ক দস্যু বনহুর

চিত্রনায়ক দস্যু বনহুর (১৫)

০১.

স্টুডিও থেকে ফিরতে রাত প্রায় দুটো বেজে গেলো বনহুরের। স্বয়ং প্রযোজক তাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। সেদিনের সেটে ভিলেন বিশু রায়ের সঙ্গে জ্যোছনা রায়ের কাজ ছিলো, কাজেই পরিচালক নাহার চৌধুরী আসতে পারলেন না। সুটিং শেষ হতে ভোর হয়ে যেতে পারে। কাজেই বনহুরের কাজ হয়ে যেতেই আর বিলম্ব না করে বাসায় ফিরে এলো সে।

পথে গাড়িতে বসে অনেক কথা হলো আরফানউল্লাহর সঙ্গে বনহুরের। আরফানউল্লাহ বললেন তার মত একজন সুদর্শন যুবককে তাঁর ছবির নায়ক হিসেবে পেয়ে অনেক খুশি হয়েছেন তিনি। অনেকদিন থেকে তিনি এমনি একটা ছেলেকে খুঁজছিলেন—এ কথাটাই বারবার বললেন আরফানউল্লাহ। অদৃষ্ট প্রসন্নতাই পেয়েছেন নাকি তাকে। আরও বললেন, একদিন তার বাড়িতে বনহুরকে নিয়ে যাবেন। আতিয়া নাকি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী।

বনহুর এ কথায় বলেছিলো, তার বাড়িতেই রয়েছি, অথচ আজও তার সাথে পর্যন্ত দেখা হলো না। আমারই কি কম আগ্রহ তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার! নিশ্চয়ই যাবো–কথা দিয়েছে বনহুর।

বাসায় ফিরে সর্বাগ্রে নূরীর কক্ষে প্রবেশ করলো বনহুর।

খাটের উপর অঘোরে ঘুমাচ্ছে নূরী।

যে মেয়েটাকে নূরীর দেখাশোনার জন্য রেখেছে বনহুর সে তখনও জেগে ছিলো, বনহুর ফিরে আসতেই সে বললো–আমি এবার যাই হুজুর।

বনহুর বললো-তুমি ঘুমাওনি?

না হুজুর।

বেশ যাও, ঘুমাওগে।

মেয়েটা কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলো নিজের কক্ষের দিকে।

নিজের অজ্ঞাতে নূরীর ঘুমন্ত মুখের দিকে বনহুরের দৃষ্টি চলে গেলো আবার। কিছুক্ষণ নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে রইলো বনহুর তার মুখের দিকে।

হঠাৎ ইয়াসিনের কণ্ঠস্বরে সম্বিৎ ফিরে এলো বনহুরেরসাহেব, টেবিলে আপনাগো খাবার দেওয়া অইছে।

কে, ইয়াসিন?

দরজার বাইরে থেকে আবার শোনা গেলো ইয়াসিনের কণ্ঠস্বর–হ সাহেব, আমি ইয়াসিন। টেবিলে খাবার দেওয়া অইছে।

আচ্ছা আসছি। বনহুর কথাটা বলে নিজের কক্ষে ফিরে আসে। জামাকাপড় ছেড়ে বাথরুমে প্রবেশ করে বনহুর।

অনেকক্ষণ ধরে ঠাণ্ডা পানিতে হাতমুখ ঘোয়। এখন বেশ স্বস্তি বোধ করছে সে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে খাবার টেবিলে গিয়ে বসে সে।

ইয়াসিন জড়োসড়োভাবে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

খেতে খেতে বললো বনহুর-ইয়াসিন, তুমি ঘুমাওনি?

না সাহেব, আপনি না খাইলে আমি কি ঘুমাইতে পারি?

সত্যি, তুমি খুব ভাল।

কিন্তু বাড়ির মালিক কন, আমি নাকি একেবারে অকেজো।

না না, ঠাট্টা করে ওকথা তোমাকে বলেন তিনি। আচ্ছা, ইয়াসিন?

কন হুজুর!

তুমি কতদিন হয় আছে এখানে?

তা সায়েব বছর বিশ-একুশ অইব—

ওঃ তুমি তো তাহলে খুব পুরোনো লোক।

সাহেবের মাইয়ার যখন সাত বছর বয়স তখন আমি আইছি।

এখন বুঝি সাহেবের মেয়ে খুব বড় হয়েছে?

কার কথা কইছেন, আতিয়া আপার কথা?

হাঁ।

মস্ত বড়, আপনাগো দুইডা অইব।

তাই নাকি?

হ।

এমনি নানা কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বনহুরের খাওয়া শেষ হলো।

কিন্তু বিছানায় শুয়ে কিছুতেই দুচোখ বন্ধ করতে পারলো না সে। ঘুম পেলে জোর করে তো ঘুমানো যায় না। বিছানায় ছটফট করলো কিছুক্ষণ। তারপর উঠে বসলো—কি যেন ভাবলো, আবার বালিশটা আঁকড়ে ধরে শুয়ে পড়লো। আজকের ঘটনাগুলো ভেসে উঠলো তার মনের পর্দায়। সুটিংয়ের অবসরে যখন বনহুর বিশ্রামকক্ষে একটা সোফায় বসে সিগারেট পান করছিলো, তখন জ্যোছনা রায় প্রবেশ করলো সেই কক্ষে।

এ কক্ষটা শুধু নায়কের বিশ্রামের জন্যই নির্দিষ্ট করা।

বনহুর পদশব্দে ফিরে তাকাতেই অবাক হলো।

অসময়ে তার কক্ষে জ্যোছনা রায়কে দেখে উঠে দাঁড়ালো বনহুর। কিছু পূর্বেই জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে বাসর কক্ষের একটা দৃশ্যের শুটিং হয়েছে। এখনও জ্যোছনা রায়ের দেহে নববধুর ড্রেস শোভা পাচ্ছে। মেকআপের উপর চন্দনের ফোটাগুলো বড় সুন্দর লাগছিলো।

বনহুর হেসে অভ্যার্থন জানালো—আসুন মিস রায়।

সুন নয়, এসো বলুন-যেমন একটু আগে বলেছিলেন।

তাহলে আপনি খুশি হবেন মিস রায়?

খুব খুশি হবো। জ্যোছনা রায় বসে পড়লো একটা সোফায়।

বনহুর তখনও দাঁড়িয়ে। সিগারেট থেকে একরাশ ধোঁয়া নির্গত করে বললো—এখানে আপনি?

গোটা রাত কাজ আছে, ভাল লাগছে না।

বনহুর একটু হাসলো। আজ কয়েকদিন হলো সে লক্ষ্য করেছে—জ্যোছনা রায় তার সঙ্গে যখন কাজ করে তখন তার মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দেয়। চোখে মুখে ফুটে ওঠে একটা উচ্ছসিত ভাব, যা অতি চেষ্টা করেও গোপন রাখতে সক্ষম হয় না জ্যোছনা রায়। বনহুরের সঙ্গই যেন তার কামনা। তবে কি জ্যোছনা রায় তাকে ভালবেসে ফেলেছে!–বনহুরের ললাট কুঞ্চিত হয়ে উঠলো।

স্টুডিওর সবাই বনহুরকে মকছুদ চৌধুরীর পরিবর্তে শুধু মিঃ চৌধুরী বলে সম্বোধন করতো।

জ্যোছনা রায়ের কথায় সম্বিৎ ফিরে পায় বনহুর, বলে সে-অস্বস্তি বোধ করছেন না তো! বলুন তাহলে ডাক্তার ডাকি।

না না, অসুস্থ নয়–কিছু বলতে গিয়ে জ্যোছনা রায় থেমে গেলো।

বনহুর বুঝতে পেরেছে, তবু না বোঝার ভান করে বললো–এ ড্রেসে বুঝি আপনার কাজ আছে আরও?

হাঁ।

কার সঙ্গে?

বিশু রায়ের সঙ্গে।

একটু থেমে বললো জ্যোছনা রায়-মিঃ চৌধুরী, আপনি কি এখনই চলে যাবেন?

আমার কাজ যখন শেষ হয়েছে তখন আর রাত জেগে কি হবে বলুন?

জ্যোছনা রায়ের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে উঠলো, উঠে দাঁড়ালো সে-চলি, গুড নাইট।

বনহুর তাকালো জ্যোছনা রায়ের দিকে সে মুখে বনহুর দেখতে পেলো একটা ব্যথারুণ আভাস। কি বলতে এসেছিলো জ্যোছনা রায়, যা সে বলতে চেয়েও বললো না।

বাড়ি ফিরে আসার পর বারবার জ্যোছনা রায়ের কথাই মনে পড়ছে বনহুরের। স্টুডিওতে আর একটা ব্যাপার বিশেষভাবে তার দৃষ্টিতে পড়েছিলো এবং সেই কারণেই বনহুর জ্যোছনা রায়ের মনের কথা জানার বাসনা থাকলেও এড়িয়ে গেছে সাভাবে।

বনহুর আর জ্যোছনা রায়ের যখন কথা হচ্ছিলো ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষের শার্শির ফাঁকে দুটো চোখ ভেসে উঠে মিলিয়ে গিয়েছিল।

বনহুর চিনতে পারেনি। তার চিনতে পারাও অসম্ভব ছিলো। কারণ শুধুমাত্র দুটো চোখই সে দেখতে পেরেছিলো।

আরও কয়েকবার বনহুর এই চোখ দুটি দেখেছে।

যখনই জ্যোছনা তার কাছে এসেছে তখনই বনহুর লক্ষ্য করেছে কে যেন তাদেরকে দেখছে।

কিন্তু কে সে? যার দৃষ্টি জ্যোছনা রায় ও তার মধ্যে একটা অদৃশ্য প্রাচীর সৃষ্টি করেছে?— এ চোখ দুটো শুধু বনহুরই লক্ষ্য করেছে, জ্যোছনা রায় বিন্দুমাত্র টের

পায়নি।

বনহুর জ্যোছনা রায়কে ইচ্ছা করেই বলেনি কথাটা। কিন্তু সে নিজে সব সময় সংযত রয়েছে, জ্যোছনা রায় তার পাশে এলেই বনহুর তাকে নিজের কাছ থেকে দূরে রেখেছে-কিছু বলতে গেলে কথার মোড় অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে সাবধান হয়েছে কিন্তু কোন্ অদৃশ্য ব্যক্তির এ চোখ দুটি!

শুনেছিলো বনহুর-চিত্রনায়ক অরুণ সেন গভীরভাবে ভালবাসতো জ্যোছনা রায়কে–তবে কি–

বনহুর চুলে আঙ্গুল চালাতে লাগলো। যেন অস্বস্তি বোধ করছে সে। না, আর ওসব কথা ভেবে মন চঞ্চল করবে না। চোখ বন্ধ করলো বনহু, ঘুমাবে এবার। কিছুক্ষণ নিপ পড়ে রইলো, কিন্তু ঘুম এলো না তার চোখে। এপাশ ওপাশ করতে লাগলো বনহুর। তারপর হঠাৎ শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো, স্লিপিং গাউনটা আলনা থেকে টেনে পরে নিলো গায়ে। কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারী করলো সে। কক্ষের মাঝের দরজার দিকে তাকালো। ওপাশে নূরীর কক্ষ।

কখন যে সে নূরীর বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বনহুর নিজেই

খেয়াল করতে পারেনি।

কক্ষে. ডিমলাইট জ্বলছিলো, বনহুর নির্নিশেষ নয়নে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে। তারপর সাবধানে আলগোছে হাত রাখলো নূরীর কপালে।

সঙ্গে সঙ্গে নূরীর ঘুম ছুটে গেলো, চমকে উঠে বসলো বিছানায়। সম্মুখে তাকিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো সে আপনি!

বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়ালো, কোনো কথা বললো না।

নূরী রাগে ফোঁস করে উঠলো-শুধু আজ নয়, আরও কয়েক দিন আপনি কথা শেষ করতে পারে না নূরী।

বনহুর নূরীর পাশে বসে পড়ে, ওর দক্ষিণ হাতখানা মুঠোয় চেপে ধরে অবেগভরা কণ্ঠে বলে-নূরী!

আমি বলছি আমি নূরী নই, আপনি ভুল করছেন।

নূরী, তুমি কি হয়ে গেছে! আজও তুমি আমাকে চিনতে পারলে না! নূরী তাকিয়ে দেখো, ভাল করে তাকিয়ে দেখো আমার মুখের দিকে।

না, কোনো কথাই আমার স্মরণ হচ্ছে না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে রেহাই দিন–

এবার বনহুর রাগতকণ্ঠে বললো-নূরী, কি চাও তুমি?

আমাকে বিদায় দিন, যেদিকে আমার দুচোখ যায় চলে যাবো।

গর্জে উঠলো বনহুর-নূরী!

শিউরে উঠলো নূরী। বনহুরের গম্ভীর কঠিন কণ্ঠে নূরীর বুক কেঁপে উঠলো।

বনহুরের নিশ্বাস দ্রুত বইছে, দৃষ্টিতে ঝরে পড়ছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

বনহুরের এ রুদ্রমূর্তি দেখে নূরী ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো, বুকটা ওর ধকধক করতে লাগলো। এতদিনের মধ্যে নূরী কোনোদিন বনহুরকে এমনভাবে রাগান্বিত হতে দেখেনি।

বনহুরের হাতের মুঠায় হাত দুখানা যেন নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছিলো, খুব কষ্ট হচ্ছিলো নূরীর।

গম্ভীর স্থিরকণ্ঠে বললো বনহুর-আজ আমি নিঃসহায় সঙ্গীহীন–তুমি–তুমি–কি হলো তোমার! বেশ, আর তোমাকে বিরক্ত করবো না-বনহুর নুরীকে ছেড়ে দিয়ে নিজের কক্ষে ফিরে যায়। স্লিপিং গাউনটা খুলে ছুড়ে ফেলে দেয় দূরে মেঝেতে। তারপর ধপ করে শুয়ে পড়ে বিছানায়। দুহাতে নিজের মাথার চুল টানতে লাগলো, একি হলো নূরীর! তার সম্বিৎ কোনোদিন কি আর ফিরে আসবে না? নূরীকে বনহুর গভীরভাবে ভালবাসে-যেমন বাসে মনিরাকে।

অসহ্য একটা ব্যথা গুমড়ে কেঁদে ফিরতে লাগলো বনহুরের মনে, কিন্তু কোনো উপায় নেই–নূরী আজ সম্বিৎহারা।

বনহুর চলে আসতেই নূরী সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলো।

চমকে উঠলো বনহুর। দরজাটা যেন তার বুকের পাজরে ধাক্কা মারলো।

এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো বনহুর।

সুন্দর দীপ্ত মুখমন্ডলে তখনও ফুটে রয়েছে গভীর চিন্তার সুস্পষ্ট ছাপ।

ওদিকে দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসলো নূরী। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় লাল হয়ে উঠছে ওর চোখ দুটো। কেমন যেন এলোমেলো লাগছে সব ওর কাছে। অনেক ভেবে আজও নূরী স্মরণ করতে পারেনি-কে এই যুবক, যে তার জন্য মরণের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধার করে এনেছে। সত্যিই কি তার পরিচিত লোক ঐ যুবক? কিন্তু কই, মনে পড়ে না তো, ওকে কোথাও কোন সময় দেখেছে বা পরিচয় ছিলো তার সঙ্গে।

বেশি ভাবতে গেলেই নূরীর মাথা টনটন করে ওঠে। সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যায়।

খুব ভোরে শয্যা ত্যাগ করলো নূরী। গত রাতের কথা স্মরণ হলো। যুবকটার জন্য মনটা হঠাৎ চিন্তিত হয়ে পড়লো। বনহুরকে চিনতে না পারলেও ওর জন্য মায়া হলো নূরীর। কিন্তু কেমন যেন সহ্য করতে পারতো

সে ওকে। দূর থেকেই নূরী বনহুরকে দেখতো, সুন্দর লাগতো ওকে। ভালো লাগতো, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো, কেবল সে কাছে এলে তার বুক কেমন যেন দুরু দুরু করে কাঁপতো। নূরী কোনো সময় নিজে বনহুরের কাছে যেতো না বা কথা বলতো না। একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে কি কথা বলবে সে।

গত রাতের কথা মনে করে নূরীর অনুশোচনা হলো। ব্যথার খোঁচা লাগলো মনের কোণে। দরজা খুলে এ ঘরে প্রবেশ করলো নূরী। তাকিয়ে দেখলো, দুগ্ধফেনিল শুভ্র বিছানায় অঘোরে ঘুমাচ্ছে বনহুর।

ভীতা হরিণীর মত লঘু পদক্ষেপে পা পা করে এগিয়ে এলো সে বনহুরের বিছানার পাশে।

মেঝেতে পড়ে থাকা বনহুরের স্লিপিং গাউনখানা স্পর্শ করতেই নূরীর সমস্ত শরীরে একটা অভূতপূর্ব শিহরণ জাগলো। বুকে চেপে ধরে-মুখে গালে লাগালো। তারপর তুলে রাখলো আলনায়।

খাটের পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলো বনহুরের মুখের দিকে।

মনের মধ্যে আশঙ্কা জাগলো নূরীর, হঠাৎ যদি জেগে ওঠে-তখন কি হবে, পালাবার পথ পাবে না সে।–যেমন মন্থর গতিতে এসেছিলো তেমনি তাড়াতাড়ি চুপি চুপি বেরিয়ে গেলো নূরী।

আজ একটু বেলা করে ঘুম ভাঙলো বনহুরের। ইয়াসিন অনেকক্ষণ চা টেবিলে রেখে শিয়রে দাঁড়িয়েছিলো। বার দুই ডেকেও ছিলো সে, কিন্তু ঘুম ভাঙলো না বনহুরের।

গোটা রাত অনিদ্রায় কাটিয়ে ভোরের দিকে ঘুমিয়েছিলো, তাই জাগতে এত বেলা হয়েছিলো।

ঘুম ভাঙতেই বললো ইয়াসিন-সাহেব, একজন ভদ্রলোক আপনাগো লগে দেখা করতে আইছেন।

চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে থেমে পড়লো বনহুর, বললো-কোথায় তিনি?

বসবার ঘরে বইসেছেন।

আচ্ছা, চলো দেখি। চা

যে ঠাণ্ডা অইয়া যাইবো?

হতে দাও। বনহুর শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো, স্লিপিং গাউনটার দিকে হাত বাড়াতেই মনে পড়লো, ওটা কাল মেঝেতে পড়েছিলো-আলনায় রাখলো কে? তবে কি ইয়াসিন ওটা উঠিয়ে রেখেছে? স্লিপিং গাউনটা হাতে নিয়ে পরতে পরতে বললো বনহুর-ইয়াসিন, এটা তুমি উঠিয়ে রেখেছিলে?

মাথা চুলকে বলে ইয়াসিন-না সাহেব, ওটা আলনাতেই ছিলো।

বনহুর আর কোনো কথা না বলে একটু অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবলো, তারপর বললো-দুকাপ চা ড্রইংরুমে পাঠিয়ে দিও।

আচ্ছা সাহেব।

বনহুর ড্রইংরুমে প্রবেশ করতেই অবাক হলো, অরুণ কুমার সেন বসে আছে তার প্রতীক্ষায়।

বনহুর আদাব জানালো।

অরুণ কুমার বনহুরের আদাব গ্রহণ না করেই বললো-মিঃ চৌধুরী, আপনাকে সকাল বেলা বিরক্ত করলাম, করতে বাধ্য হলাম।

হেসে আসন গ্রহণ করলো বনহুর। বললো-হঠাৎ কি মনে করে এলেন। মিঃ সেন?

অরুণ কুমার গম্ভীর মুখে বসে ছিলো, গম্ভীর কণ্ঠেই বললো–একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে।

বলুন? প্রশ্নভরা দৃষ্টি মেলে তাকালো বনহুর অরুণ কুমারের মুখের দিকে।

অরুণ কুমার কক্ষে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো-মিঃ চৌধুরী, আপনি নিশ্চয়ই জ্ঞানী, বুদ্ধিমান.....

বনহুর বললো-ভূমিকার দরকার নেই, বলুন?

বনহুরের কথায় অরুণ কুমারের মুখমণ্ডল মুহূর্তে রাঙা হয়ে পরক্ষণেই স্বাভাবিক হলো। ভ্রূকুঞ্চিত করে বললো সে-আপনি জানেন আমি. মিস রায়কে ভালবাসি।

বনহুরের মুখখাভাবে কিছুমাত্র পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলো না। স্বচ্ছকণ্ঠে বলে সে-এ কথা শোনাবার জন্যই কি আপনি.....

হাঁ মিঃ চৌধুরী, শুধু এ কথা শোনাবার জন্যই আমি এই সাত সকালে ছুটে এসেছি। জানি আপনি সারাদিন ব্যস্ত থাকেন, অন্য সময় আপনাকে পাওয়া মুশকিল, তাই....।

তাই আপনি অনুগ্রহ করে এসেছেন মিস রায়কে ভালোবাসেন কথাটা জানাতে!

হাঁ তাই। অরুণ কুমারের মুখমণ্ডল অমাবস্যার রাতের মত অন্ধকার হয়ে

কাজেই আমি যেন আপনার পথে বাধার সৃষ্টি না করি, তাই না? বললো বনহুর।

এমন সময় ইয়াসিন ট্রে হাতে কক্ষে প্রবেশ করলো।

ট্রে টেবিলে নামিয়ে রাখতেই বনহুর এক কাপ চা অরুণ কুমারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো-নিন।

চা আমি খাই না। বললো অরুণ কুমার।

বনহুর একটা কাপ হাতে উঠিয়ে নিতে নিতে মুখ নীচু করে একটু হাসলো। তারপর কাপে চুমুক দিয়ে বললো-ভয় নেই, আপনার চলার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াবো না।

ধন্যবাদ। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো অরুণ কুমার।

বনহুর কিছু বলবার পূর্বেই কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলো সে। পরক্ষণেই বাইরে মোটর স্টার্টের শব্দ হলো।

বনহুর আপন মনেই হেসে উঠলো-হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ...

ইয়াসিন সে হাসির শব্দে ছুটে এলো।

নূরীও ঘরে বসে সে হাসির শব্দ শুনতে পেলো, চমকে উঠলো সে।

বনহুরের হাসি শেষ হতেই কক্ষে প্রবেশ করলেন প্রযোজক আরফান উল্লাহ-গুড মনিং মিঃ চৌধুরী!

বনহুরের হাসির রেশ তখনও ড্রইংরুমের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। আরফান উল্লাহকে দেখে জবাব দিলো-গুড মর্নিং, আসুন!

আরফান উল্লাহ তাঁর বিরাট বপু নিয়ে এগিয়ে এসে একটা সোফায় বালির বস্তার মত ধপ করে বসে পড়লেন।

বনহুর উঠে দাঁড়িয়েছিলো, পুনরায় আসন গ্রহণ করলো। একটা প্রশ্ন উঁকি দিলো বনহুরের মনে। রাতেই দেখা হয়েছে তার সঙ্গে, তাছাড়া স্বয়ং আরফান

উল্লাহই তাকে পৌঁছে দিয়ে গেছেন অথচ ভোরেই আবার এমন কি প্রয়োজন যার জন্য তিনি ছুটে এসেছেন তার কাছে।

বনহুর লোকমুখে শুনেছে, নিজেও গোপন অনুসন্ধান নিয়ে জেনেছেআরফান উল্লাহ শুধু এক চলচ্চিত্র ব্যবসা নিয়েই থাকেন না, তার আরও বিভিন্ন কারবার আছে। শুধু ছবিই তাঁকে লাখ লাখ টাকা এনে দেয় না, এমন কিছু গোপনীয় ব্যবসা তিনি করেন, যা তাঁকে অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারী করেছে।

আরফান উল্লাহ আসন গ্রহণ করে বললেন-আমার কন্যা মিস্ আতিয়া আজ আপনার এখানে আসবে।

কথাটা শুনে মনে মনে বিরক্তি বোধ করলেও মুখোভাব প্রসন্ন রেখে বললো বনহুর-আমার পরম সৌভাগ্য মিঃ উল্লাহ। কিন্তু উনি কষ্ট করে না এসে, বরং আমিই....।

ভেবে দেখলাম তা হয় না, আপনি আমাদের সম্মানিত অতিথি, কাজেই আতিয়া নিজেই আসবে আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে।

ধন্যবাদ। কিন্তু কবে আসবেন উনি?

সে কথা জানাবার জন্যই আমি এলাম মিঃ চৌধুরী, আপনি তাকে আসার অনুমতি দিলেই সে.....

ছিঃ ছিঃ, কেন আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন মিঃ উল্লাহ! তার বাড়ি, তিনি যখন খুশি আসতে পারেন।

থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ। শুনে খুশি হলাম মিঃ চৌধুরী।

বনহুর ইয়াসিনকে ডাকলো-ইয়াসিন?

ইয়াসিন এসে দাঁড়ালো-জ্বী সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে আরফান উল্লাহর উপর নজর পড়তেই বিবর্ণ হলো ইয়াসিনের মুখমণ্ডল। লম্বা সালাম ঠকে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়ালো।

বনহুর বললো-ইয়াসিন, চা-নাস্তা নিয়ে এসো।

আরফান উল্লাহ ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠলেন-মাফ করবেন, এইমাত্র নাস্তা করে এসেছি।

শুধু এক কাপ চা।

তা-ও না।

আচ্ছা, তাহলে উনি…মানে আপনার কন্যা মিস আতিয়াকে কবে কখন নিয়ে আসছেন? আমার এবার একনাগাড়ে কদিন সুটিং আছে কিনা!

এ কদিন কি জ্যোছনা রায়ের সঙ্গেই আপনার কাজ হবে?

সে কথা এখনও মিঃ নাহার আমাকে সঠিক জানাননি।

আচ্ছা। উঠে দাঁড়িয়ে অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন-গুড বাই।

বনহুর একটা সিগারেটে অগ্নিংসযোগ করে অন্তঃপুরের দিকে পা বাড়ালো। ভোর হতে না হতে পর পর দুজন ব্যক্তির আগমন-একজন তার পথ হতে সড়ে দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ, অপরজন তাকে কন্যার সঙ্গে পরিচিত করার জন্য আগ্রহশিল।

আজ বনহুরের কোন সুটিং ছিলো না, গোটা দিনটা তার হাতে। বই পড়ে, শুয়ে থেকেও সময় কাটতে চায় না তার। কয়েকবার নূরীর কক্ষে উঁকি দিয়ে দেখেছে বনহুর-নূরী আপন মনে বসে আছে, কখনও বা রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে শূন্য আকাশের দিকে। এত কাছে নূরী, তবু যেন কত দূরে। বনহুরের বুক চিরে বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস।

বিকেলে বনহুর বাইরে বের হবার জন্য তৈরি হচ্ছে। কাপড় পরা তার হয়ে গেছে, চিরুণী দিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছিল, এমন সময় নূরী এসে দাঁড়ায় তার পাশে।

হঠাৎ পাশে শব্দ শুনে ফিরে তাকায় বনহুর, বিস্ময়ে বলে ওঠে-তুমি!

নূরী আজ এই প্রথম স্বেচ্ছায় এসেছে বনহুরের পাশে।

বনহুর বললো-কিছু বলবে?

নূরীর ঠোঁট দুখানা কেঁপে উঠলো, কিছু বলতে চায় সে।

বনহুর ঝুঁকে পড়লো নূরীর মুখের কাছে-বলো, বলো নূরী? নূরী বনহুরের চোখের দিকে তাকিয়ে ছুটে পালাতে যাচ্ছিল, বনহুর খপ করে ধরে ফেললো ওর হাতখানা-নূরী যেও না।

ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন আমাকে। নূরী বনহুরের হাতের মুঠা থেকে নিজের হাত দুখানা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো।

কিন্তু বনহুরের হাতের মুঠা থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতে পারলো।

বনহুর বললো-কি বলতে চাও নূরী, বলো?

নূরী ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো, বললো-আমাকে ছেড়ে দিন।

নিশ্চয়ই ছেড়ে দেবো, বলল কি বলতে এসেছিলে তুমি?

আপনি চলে গেলে একা একা আমার বড্ড খারাপ লাগে।

নুরী!

বনহুর খুশির আবেগে নুরীকে টেনে নিলো কাছে। এই প্রথম নূরীর মুখে স্বাভাবিক স্বর শুনতে পেলো। আবেগভরা কণ্ঠে বললো বনহুর নূরী, নূরী... আমার নূরী। বনহুর নূরীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেললো।

নূরী বনহুরের বাহুবন্ধনে ঘেমে উঠলো।

পালাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়লো সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে মোটরের হর্ন বেজে উঠলো। পরক্ষণেই ইয়াসিনের কণ্ঠস্বর-সাহেব, সাহেব, মালিক আইসেছেন-মালিকের মাইয়াও আইসেছেন।

বনহুর নূরীকে মুক্ত করে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

নূরী ছাড়া পেয়ে দ্রুত পালিয়ে গেলো সেখান থেকে। বনহুর বেরিয়ে এলো কক্ষ থেকে।

ইয়াসিন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলো, বললো-বসবার ঘরে তারা বইছেন।

বনহুর এগিয়ে গেলো ড্রইংরুমের দিকে।

কক্ষে প্রবেশ করার পূর্বে টাইটা ঠিক করে নিলো বনহুর।

আরফান উল্লাহ এসেছেন তার কন্যা আতিয়াকে নিয়ে পরিচয় করাতে। কিন্তু আজ কতদিন হলো এসেছে সে এই বাড়িতে-কই, আতিয়া তো একদিনও এলো না, অথচ আরফান উল্লাহ কন্যার গল্পে পঞ্চমুখ-সে নাকি তার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহশিল!

বনহুরও কম আগ্রহান্বিত নয় আতিয়ার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য।

যার এত আছে, বাড়ি-গাড়ি, নিজস্ব স্টুডিও, ইণ্ডাস্ট্রি আরও কত কি, না জানি সে কেমন!

যে বাড়িটাতে বনহুর এখনও বসবাস করছে, সে বাড়িও তো তার। বাড়িটার সৌন্দর্য বনহুরকে মুগ্ধ করেছিলো। বনহুর কল্পনায় বাড়ির অধিনায়িকার যে ছবি মনের পর্দায় এঁকে রেখেছিলো তা মনোমুগ্ধকর এক নারীর।

এ বাড়িতে আসবার পর হতে বনহুরের ইচ্ছা বাড়ির অধিনায়িকার সঙ্গে পরিচিত হওয়া, কিন্তু আরফান উল্লাহ কেন যে তার কন্যাকে এতদিনেও আনলেন না এবং তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন না বুঝতে পারে না কস্তু।

আজ বনহুর অত্যন্ত আগ্রহশিল হয়ে প্রবেশ করলো ড্রইংরুমে।

রুমে প্রবেশ করেই মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বনহুর। সম্মুখস্থ সোফায় বসে আছেন আরফান উল্লাহ, পাশে একটা তরুণী-পিপে বা তেলের জালা বললেও ভুল হবে না! তরুণীর গায়ের রঙ আবলুসের মত কালো। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মেমদের মত বক করে ছাটা।

বহুর প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেও পরক্ষণে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললো-হ্যালো মিঃ উল্লাহ?

আরফান উল্লাহ হেসে বললেন-মিঃ চৌধুরী, এ আমার কন্যা মিস আতিয়া। আর উনি মিঃ চৌধুরী।

বনহু হাত তুলে বললো-আদাব! আতিয়া হাসলো একটু, যেন মেঘের কোলে বিদ্যুৎ চমকালো।

বনহুর জীবনে বহু নারীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, কিন্তু মিস আতিয়ার মত নারী সে কোনোদিন দেখেছে কিনা সন্দেহ।

আতিয়াই কথা বললো প্রথম-বসুন। বন থ মেরে গিয়েছিলো, বসবে না দাঁড়িয়ে থাকবে, না আর একবার অন্তপুরে প্রবেশ করে নিজেকে স্বচ্ছ করে আসবে, ভেবে পাচ্ছিলো না।

এমন সময় শুনলো আতিয়ার চিকন বাশির মত সুর-বসুন।

বনহুরের এই বুঝি প্রথম কোনো নারীর সামনে হকচকিয়ে যাওয়া। আসন গ্রহণ করলো বনহুর। কি বলবে বা কি বলে কথা শুরু করবে ভেবে পেলো না। নিজের অজ্ঞাতেই বার কয়েক দৃষ্টি তার চলে গেলো মিস আতিয়ার মুখের দিকে।

সর্বনাশ! এমন মেয়েও জন্মে পৃথিবীতে। বনহুর হাঁপিয়ে উঠছিলো।

আরফান উল্লাহই কথা বললেন-মিঃ চৌধুরী, আপনি বুঝি বাইরে বেরুচ্ছিলেন?

হাঁ, মানে একটু কাজ আছেবাইরে কিনা...বনহুর অবশ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলে মিঃ আরফান উল্লাহ ও তাঁর কন্যা মিস আতিয়ার হাত থেকে রেহাই পেতে চেষ্টা করলো।

কিন্তু হলো বিপরীত, আতিয়া আনন্দধ্বনি করে উঠলো-কোথায় যাবেন, চলুন না আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।

হাঁ ঠিক বলেছো মা, আর তার যখন বাইরে কাজ আছে তখন তাঁকে আটকে রাখা ঠিক হয় না। তুমি যাও তাঁকে তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিয়ে এসোগে। আর একদিন এসে বসা যাবে।

বনহুর মনে মনে প্রমাদ গুণলো, সবে পরিচয় তাতেই এত-সর্বনাশ হয়েছে এবার! এতদিন পরিচয় না ঘটে ভালই ছিলো।

বনহুর বললো-একটু চা-নাস্তা……

আরফান উল্লাহ বললেন-তা আতিয়া তো কোনোদিন আসেনি। বুঝতেই পারছি, আপনি ছাড়বার পাত্র নন, বেশ, বলুন আনতে।

বনহুর ডাকলো-ইয়াসিন?

নিকটে কোথাও ছিলো ইয়াসিন। ছুটে এসে হাত জুড়ে দাঁড়ালো-সাহেব, আমাকে ডাকতেছেন।

হাঁ, চা-নাস্তা নিয়ে এসো।

ইয়াসিন চলে যাচ্ছিলো, আরফান উল্লাহ বললেন-দেখেশুনে ধীরে সুস্থে চা-নাস্তা তৈরি করে আনবি।

ইয়াসিন মাথা দুলিয়ে বললো-জ্বী আচ্ছা। চলে গেলো সে। আরফান উল্লাহ বললেন-জানেন, আতিয়া যেমন তেমন জিনিস খেতে পারে না। ছিমছাম আর পরিস্কার জিনিস ওর পছন্দ।

হাঁ, তা তাঁকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি মিঃ উল্লাহ।

কি আর বলবো মিঃ চৌধুরী, এই একটি মাত্র মেয়েই আমার সম্বল-ওর জন্যই সবকিছু।

তা আমি জানি। বললো বনহুর।

জানেন আপনি? হাঁ, আর জানবেনই না বা কেন? সবাই জানে আতিয়া ছাড়া আমার সবকিছু অন্ধকার।

এক মেয়ে যখন তখন তো হবেই।

দেখুন মিঃ চৌধুরী, আতিয়ার সুখের জন্য কি না করেছি।

আমি সব অবগত আছি মিঃ উল্লাহ।

বনহুর কথা যতই সংক্ষিপ্ত করে আনতে চায় ততই আরফান উল্লাহ চান কথা বাড়িয়ে লম্বা করে আনতে ছোটবেলায় মা মরা মেয়ে, কত কষ্ট করেই না মানুষ করেছি! আতিয়া আমার ছেলে-মেয়ে উভয়ই। মেয়েটা আমার লক্ষী-যেমন আদর্শবতী, তেমনি জ্ঞানবতী, রুচিশিলা, দেখছেন না এ বাড়িটা আমার আতিয়ার রুচিমতেই তৈরি করা হয়েছে।

পিতার প্রশংসায় আতিয়া খুশিতে ডগমগ। মুখখাভাবে একটা অহেতুক লজ্জাবোধ ফুটে ওঠে। মাঝে মাঝে শাড়ির আঁচলখানা দাঁতে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছিলো, আসলে সত্যিই ছিড়বার জন্য নয়-লজ্জায়।

বনহুর চোখ তুলে তাকাতেই আতিয়ার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো, ক্ষুদে পিটপিটে আঁখি দুটিতে যেন ঝরে পড়ছে অফুরন্ত প্রেম নিবেদন।

অসহ্য, অসহ্য-বনহুরের দমন বিষিয়ে উঠলো কিছুক্ষণের মধ্যে।

ইয়াসিন আজ যেন একেবারে কুঁড়ে বনে গেছে, চা-নাস্তা আনতে এত বিলম্ব করছে কেন। বনহুর উঠে দাঁড়ালো-দেখি ইয়াসিন এমন দেরী করছে কেন?

আরফান উল্লাহ বলে ওঠেন-আসতে দিন, এত তাড়া কিসের?

আমার একটু শিঘ্র যেতে হবে কি না......

তা আতিয়া আপনাকে পৌঁছে দেবে, মা আতিয়া নিজেই ড্রাইভ জানে..

না, না, তাকে কষ্ট করতে হবে না, আমার ড্রাইভার আছে।

আতিয়া হেসে বললো-এতে আমার কোন কষ্ট হবে না মিঃ চৌধুরী।

হাঁ, বরং আতিয়া এসব কাজে আনন্দ পায়।

বনহুর স্বাভাবিক মানুষ নয়, তার কঠিন মন, কঠিন হৃদয়, অল্পে সে কোনোদিন কাবু হয় না, আজ বনহুর নাচার হয়ে পড়লো যেন। বাপ আর মেয়ের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার উপায় খুঁজতে লাগলো।

এমন সময় ইয়াসিন ট্রে হাতে কক্ষে প্রবেশ করলো।

আরফান উল্লাহ বললেন-নাও মা, আরম্ভ করো-উনি আবার বাইরে যাবেন....

হাঁ, আরম্ভ করুন মিস আতিয়া।

আপনি নেবেন না?

এইমাত্র ওসব সেরে নিয়েছি।

আরফান উল্লাহ ততক্ষণে খেতে শুরু করেছেন।

আতিয়াও খেতে আরম্ভ করলো।

বনহুর অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো পিতা ও কন্যার মুখের দিকে।

খেতে খেতে বললেন আরফান উল্লাহ-চমক্কার নাস্তা তৈরি করেছিস ইয়াসিন।

ইয়াসিন হাত কচলাতে লাগলো।

বনহুর ততক্ষণে সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চললো।

আরফান উল্লাহ এবার খেতে খেতে বনহুরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন-জানো মা আতিয়া, মিঃ চৌধুরী শুধু দেখতেই অপূর্ব নন, তার অভিনয়ও অদ্ভুত।

কই, একদিনও তুমি আমাকে সুটিং দেখতে আনলে না?

এবার তো মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে পরিচিত হলে, যখন খুশি এসো-উনাকে সঙ্গে করে স্টুডিওতে গিয়ে কত সুটিং দেখবে দেখো..কি বলেন মিঃ চৌধুরী, সত্যি কি না?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই-কিন্তু আমি তো, মানে সব সময় বাড়ি থেকে সুটিংয়ে যাই না, কখনো বাইরে থেকেই চলে যাই..

বনহুর যতই যা বলুক আরফান উল্লাহ ও আতিয়ার কবল থেকে রক্ষা পাওয়া মুশকিল। •

শেষ পর্যন্ত আতিয়ার গাড়িতে বনহুরকে বেরুতে হলো। কিন্তু যাবে কোথায়? সত্যি বাইরে তো আজ তার কোনো কাজ নেই। বনহুর বেরুচ্ছিলো হয় ক্লাব বা কোনো লেকের ধারে কিংবা পার্কে যাবার জন্য।

আতিয়া স্বয়ং ড্রাইভ করছে। পাশের আসনে বনহুর।

গাড়ি জন মুখর রাজপথ বেয়ে চলেছে।

আতিয়া বললো-কোথায় যাবেন বললেন না যে?

যে কাজ ছিলো এখন গিয়ে আর হবে না, কোথায় যাই ভাবছি।

বড় দুঃখের বিষয় মিঃ চৌধুরী, আপনার কাজটা আমাদের জন্যই হলো না।

আতিয়ার থ্যাবড়া মুখে চিকন সুর বড় বেখাপ্পা লাগছিলো। বনহুর ভেতরে ভেতরে রাগলেও মুখে হাসি টেনে বললো-না না, তেমন জরুরী। কাজ নয়, তা এখন কোথায় যাওয়া যায় বলুন তো? বাসায় ফিরে যাওয়া যাক, কেমন?

আতিয়া বলে উঠলো-মিঃ চৌধুরী, আপনি এরই মধ্যে ফিরতে চান? কিন্তু কেন?

ভাল লাগছে না।

প্লিজ মিঃ চৌধুরী, চলুন পার্কে যাই।

বনহুর ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিলো, কিন্তু মুখোভাবে তা প্রকাশ না করে ভ্রু কুঁচকে বললো-পার্কে? কিংবা লেকের ধারে?

না!

চলুন না, প্লিজ…

বনহুর গাড়ির মধ্যে যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো, বললো সেচলুন যেখানে আপনার মন চায়।

থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ চৌধুরী, থ্যাঙ্ক ইউ, নির্জন লেকের ধারেই ভাল লাগবে এখন।

বনহুর কোনো কথা বলে না, নিশ্চুপ বসে থাকে স্থবিরের মত। লেকের ধারে গাড়ি রেখে নেমে পড়লো আতিয়া-আসুন মিঃ চৌধুরী।

আতিয়া বনহুরের হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বললো-চলুন।

বনহুর সুবোধ বালকের মত গাড়ি থেকে নেমে পড়লো।

আতিয়ার হাতের মুঠায় বনহুরের বলিষ্ঠ হাতখানা ঘেমে উঠলো যেন, একটা মাংসপিণ্ডের মধ্যে তার হাতখানা যেন বসে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

লেকের ধারে এসে দাঁড়ালো আতিয়া-পাশে বনহুর। বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো আতিয়া-কেমন লাগছে আপনার?

আতিয়ার প্রশ্নে বনহুরের সারা শরীর জ্বালা করে উঠলো, দাঁতে দাঁত পিষলো, কিন্তু মুখে হাসি টেনে বললো-স্বপ্নময়, অপূর্ব।

সত্যি মিঃ চৌধুরী, এটা আপনার মনের কথা?

মনের নয়, অন্তরের।

বনহুরের কথায় আতিয়ার চোখ দুটো চক চক করে উঠলো। প্রেমে ঢল ঢল হয়ে পড়লো আতিয়া। বনহুরের হাত ধরে বললো-ঠাট্টা করছেন না তো?..

ছিঃ ঠাট্টা করবো আপনার সঙ্গে, কি যে বলেন!

দেখুন মিঃ চৌধুরী, সবাই আমার উপরের চেহারাটা দেখে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে-কেউ আমার মনের সন্ধান জানে না বা নেয় না। আসুন ওদিকে গিয়ে বসি…..বললো আতিয়া।

বনহুর স্বপ্নগ্রস্তের মত অনুসরণ করলো তাকে। লেকের ধারে একটা নিজন স্থান বেছে নিয়ে বসলো আতিয়া। বনহুরকে হাত ধরে বসিয়ে দেয় নিজের পাশে।

আবেগভরা কণ্ঠে বললো আতিয়া–মিঃ চৌধুরী, ওরা জানে না আমারও হৃদয় আছে, প্রেম-ভালবাসা, স্নেহ-মায়া-মমতা সব আছে…তবু..আমাকে কেউ ভালবাসতে পারে না। কথা বলতে বলতে কণ্ঠ ধরে আসে আতিয়ার!

বনহুরের মনে একটা আঘাত করে। চোখ তুলে তাকায় বনহুর আতিয়ার মুখের দিকে।

আতিয়ার মুখটা বেদনায় আরও বিকৃত দেখাচ্ছে। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে ওর ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

আতিয়া রুমাল দিয়ে নিজের চোখের পানি মুছে ফেললো, তারপর বললো আবার অনেকেই আমার ঐশ্বর্যের লোভে আমাকে বিয়ে করতে এসেছে কিন্তু আমাকে দেখেই তারা পালিয়ে গেছে। আমি কি ক্ষতি করেছি তাদের, কেন তারা এভাবে চলে যায়...দুহাতে মুখ ঢেকে আবার উচ্ছসিতভাবে কেঁদে ওঠে আতিয়া।

বনহুরের বুকের মধ্যে তখন প্রচণ্ড ঝড় বইছে।

বৈচিত্রময় জীবন বনহুরের। এ বয়সে সে অনেক অবস্থায় পড়েছে। কিন্তু আজকের মত অবস্থা বুঝি তার জীবনে কোনোদিন আসেনি! কি বলবে, কি কি বলে সান্ত্বনা দেবে বনহুর ওকে, ভেবে পায় না।

কান্নার আবেগে আতিয়ার দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

বনহুর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো আতিয়ার দিকে। একটু প্রেমভালবাসা স্নেহ বই তো নয়—ক্ষতি কি, জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে তাকে ছবির জন্য অভিনয় করতে হচ্ছে, আর একটি প্রাণের জন্য সে পারবে না একটু স্বার্থ ত্যাগ করতে? ছবির জন্য তাকে অভিনয় করতে হচ্ছে আর এখানে করতে হবে একটা অবলা নারীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য...বনহুর মনস্থির করে নেয়।

বনহুর হাত রাখলো আতিয়ার পিঠে-কাঁদবেন না।

মুহূর্তে আতিয়ার কান্না থেমে গেলো, একটা আনন্দময় মধুর হাসি ফুটে উঠলো তার চোখেমুখে, গদগদ কণ্ঠে বললো-মিঃ চৌধুরী, আপনি কত ভাল!

বনহুর এবার রুমাল দিয়ে আতিয়ার চোখের পানি মুছে দিয়ে বললো-মিস আতিয়া, আপনার মনের ব্যথা কেউ না বুঝলেও আমি বুঝতে পেরেছি।

আতিয়া বনহুরের হাতখানা নিবিড়ভাবে টেনে নেয়, গালে-ঠোঁটে ঠেকিয়ে আবেগভরা কণ্ঠে বলে-মিঃ চৌধুরী।

বনহুর নিজের হাতখানা আতিয়ার হাতের মধ্যে ছেড়ে দেয়, ইচ্ছে করেই টেনে নেয় না সে।

দস্যু হলেও বনহুরের হৃদয়ে ছিলো অপরিসীম দয়া। লক্ষ লক্ষ টাকা বনহুর ডাকাতি করে, আবার তেমনি বিলিয়ে দেয় দীন-দুঃখীদের মধ্যে অকাতরে। নরপিশাচ শয়তানদের যেমন সে শত্রু, তেমনি অসহায় বিপদগ্রস্তদের সহায়ও। এ দুনিয়ায় এমন কোনো কাজ নেই যা সে পারে না বা করেনি। শুধু একটু ভালবাসা কি আতিয়াকে দিতে পারবে না সে।

আতিয়া এখন অনেকখানি শান্ত স্থির হয়ে এসেছে।

বনহুর বললো এবার চলুন ফেরা যাক।

আতিয়া বললো-আর একটু বসবেন না?

আজ আর নয়।

উঠে দাঁড়ালো বনহুর।

এবার বনহুর স্বয়ং ড্রাইভ করে চললো।

আতিয়া বসে রইলো বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠভাবে।

বনহুরের দৃষ্টি গাড়ির সম্মুখভাগে, আতিয়া তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে।

০২.

বনহুরের কাঁধে মাথা রেখে বসে আছে জ্যোছনা রায়। জ্যোছনা রায়ের শরীরে আজও পূর্ব দিনের ড্রেস, সেই নববধূর পরিচ্ছদ। ললাটে চন্দনের টিপ, খোপায়, গলায়, হাতে ফুলের মালা। আজ ঘোমটায় মুখ ঢাকা নয় জ্যোছনা রায়ের। ঘোমটা আজ খসে পড়ে আছে কাঁধের ওপর।

বনহুরের শরীরেও বিবাহের ড্রেস।

গলায় ফুলের মালা, চোখে সুরমার রেখা, মুখে মিষ্টি হাসির ছোঁয়াচ।

অদূরে ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অনন্ত বাবু। সার্চ লাইটগুলো তৈরি রয়েছে পরিচালকের আদেশের অপেক্ষায়।

মাথার উপরে ঝুলছে শব্দ যন্ত্র।

সহকারী পরিচালকদ্বয় সেটের জিনিসগুলো ঠিক করে দিচ্ছিলো। মেহগনি খাটের উপর মালাগুলো লম্বা করে ঝুলছে। সেগুলো আর একটু নেড়েচেড়ে ঠিক জায়গায় সরিয়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালেন পরিচালক নাহার চৌধুরী।

স্ক্রিপ্ট খুলে আর একবার নায়ক-নায়িকাকে বুঝিয়ে দিলেন তাদের ভুমিকা।

এবার নাহার চৌধুরী দ্রুত সরে এলেন ক্যামেরার পাশে, অনন্ত বাবুর পাশ কেটে নিজে একবার দেখলেন তাকিয়ে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন-রেডি! লাইট!

সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত বাবু ক্যামেরায় চোখ রাখলেন।

পুনরায় পরিচালকের উচ্চকণ্ঠ-ক্যামেরা, সাউণ্ড...

বনহুর এবার জ্যোছনা রায়ের মুখটা তুলে ধরলো-রত্না!

লজ্জাভরা দৃষ্টি তুলে তাকায় রত্নার ভূমিকায় জ্যোছনা রায় বনহুরের মুখে- বলো!

আমি মুসলমান, আর, তুমি ব্রাহ্মণ-কন্যা-এ বিয়েতে তুমি কি সুখী হবে রত্না? বললো মাসুদের ভূমিকায় বনহুর।

তোমাকে স্পর্শ করে আমি শপথ করছি, আমি...

জ্যোছনা রায়ের কথা শেষ হয় না, একটা সুতীক্ষ্ণধার ছোরা এসে গেঁথে যায় জ্যোছনা রায়ের কাছে.....।

পরিচালক নাহার চৌধুরী চীৎকার করে ওঠেন-কাট।

সঙ্গে সঙ্গে সার্চ লাইটের আলো নিভে যায়।

ক্যামেরা থেকে সরে দাঁড়ান অনন্ত বাবু।

পরিচালক আনন্দধ্বনি করে ওঠেন-গুড!

পরবর্তী শ্যুটের জন্য প্রস্তুত হন নাহার চৌধুরী।

বনহুর উঠে দাঁড়ায়, জ্যোছনা রায় বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে-সত্যি বড় নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম।

বনহুর জ্যোছনার কথায় বলে-বেশ করেছেন কিন্তু।

নাহার চৌধুরী এগিয়ে আসেন-আপনারা উভয়েই চমৎকার অভিনয় করেছেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুরের দৃষ্টি চলে যায় অদূরে ক্যামেরার ওপাশে শার্শীটার দিকে। কক্ষের উজ্জ্বল আলোতে দেখা যায়-দুটি চোখ শার্শীর ফাঁকে জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠলো। পরক্ষণেই সরে গেলো চোখ দুটো।

বনহুর ওদিকে শার্শীটার দিকে তাকিয়ে ছিলো।

জ্যোছনা রায় তাকালো সেইদিকে-কি দেখছেন?

বনহুর স্বাভাবিক হয়-কিছু না।

জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে বনহুরের আরো কয়েকটা শট নিলেন নাহার চৌধুরী। এবার ছুটি হলো জ্যোছনা রায়ের। নাহার চৌধুরী বললেন-মিস রায়, আপনি যেতে পারেন। আমাদের স্টুডিওর গাড়ি আপনাকে পৌঁছে দেবে।

হঠাৎ কেন যেন বনহুরের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো মিস রায়, আপনি আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, এই শটটার পর আমি আপনাকে পৌঁছে দেবো। কারণ, আজ আর আমার কোনো কাজ নেই।

ধন্যবাদ মিঃ চৌধুরী। জ্যোছনা রায়ের কণ্ঠে একরাশ আনন্দ।

বনহুরের কাজ শেষ হতে বেশি বিলম্ব হলো না।

বনহুর আর জ্যোছনা রায় গাড়িতে এসে বসলো।

এমন সময় হঠৎ বনহুর দেখতে পেলো-স্টুডিওর ছাদে একটা থামের আড়ালে সরে গেলো অরুণ কুমার সেন।

বনহুর গাড়িতে স্টার্ট দিলো কিন্তু মনটা তার কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলো। মনে পড়লো কিছু দিন আগের এক সকালের কথা। অরুণ কুমার এসেছিলো বনহুরের কাছে। কি উদ্দেশ্যে এসেছে বনহুর তা জানতো। তাই সে বলেছিলো; ভয় নেই অরুণ বাবু, আমি আপনার পথে কাঁটা হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

বনহুর সে কথাই ভাবছিলো।

জ্যোছনা রায় বনহুরকে গম্ভীর মুখে গাড়ি চালাতে দেখে হেসে বললো-হঠাৎ আপনাকে বড় ভাবাপন্ন লাগছে মিঃ চৌধুরী?

জ্যোছনা রায়ের কথায় বনহুরের সম্বিৎ ফিরে আসে।

বললো বনহুর-মিস রায়, একটা কথা আপনাকে বলবো?

বলুন?

আপনি নিশ্চয়ই জানেন, অরুণ কুমার সেন আপনাকে গভীরভাবে ভালবাসেন!

মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো জ্যোছনা রায়ের মুখমণ্ডল। কিন্তু পরমুহূর্তেই মুখোভাব স্বাভাবিক করে বললো সে-এ কথা তিনি আমাকে অনেকবার বলেছেন। কিন্তু আমি তাকে ভালবাসতে পারিনি। মিঃ চৌধুরী, তিনি জানেন না, মনের ওপর কারও জোর চলে না।

বনহুর স্তব্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছিলো জ্যোছনা রায়ের কথাগুলো।

বলে চলেছে জ্যোছনা রায়-অরুণ বাবু এমনও বলেছেন, তিনি আমার জন্য সব করতে পারেন, এমন কি নিজের জীবন পর্যন্ত দিতেও নাকি কুণ্ঠিত নন।

এত জেনেও আপনি তাকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন মিস রায়?

আপনিও অবুঝের মতো কথা বললেন মিঃ চৌধুরী, কারণ অরুণ বাবুকে আমি শত চেষ্টা করেও ভালবাসতে পারিনি, পারবোও না।

কিন্তু ওর মনের দিকটা তো আপনার ভেবে দেখা উচিত।

তা হয় না মিঃ চৌধুরী।

কেন হয় না?

তা আপনাকে বোঝাতে পারবো না। এই যে আমার বাড়ি এসে গেছে। আসুন না আজ আমাদের ওখানে?

আজ নয়, আর একদিন আসবো।

অমন অনেকদিন বলেছেন, এসেছেন কোনোদিন। আসুন মিঃ চৌধুরী, এখানে আমার মা আর আমি থাকি। আপনার সঙ্গে পরিচিত হলে মা অনেক খুশি হবেন।

অগত্যা বনহুরকে নামতে হলো। জ্যোছনা রায়কে অনুসরণ করলো বনহুর। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলো। ওরা দুজন। জ্যোছনা রায় বললো-আসুন, বসবার ঘরে নয়, একেবারে মায়ের ঘরে।

সেকি উনি..

না না, উনি কিছু মনে করবেন না। আমার মা কিন্তু খুব ভাল-মা মা, দেখ কে এসেছেন!

প্রথমে কক্ষে প্রবেশ করলো জ্যোছনা রায়। বনহুর পেছনে। কক্ষে প্রবেশ করে সামনে তাকালো বনহুর, মধ্যবয়স্কা এক ন্দ্র মহিলা বৈদ্যুতিক ল্যাম্পের সামনে বসে বই পড়ছিলেন। জ্যোছনা রায়ের কণ্ঠস্বরে বইখানা বন্ধ করে সোজা হয়ে বসলেন। চোখে সোনার ফ্রেমে বাঁধানো পাওয়ার ওয়ালা চশমা। একটা চওড়া লালপেড়ে শাড়ি পরনে। কপালে সিঁদুরের টিপ, সিথিতেও সিদুরের রেখা। হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললেন মহিলা-জ্যোছনা।

হাঁ মা, দেখ কাকে আজ ধরে এনেছি।

বনহুরের দিকে তাকিয়ে বললেন ভদ্রমহিলা-তোদের স্টুডিওর লোক বুঝি?

জ্যোছনা রায় বললো-উনি কুন্তিবাঈ ছবির হিরো।

বসুন, আপনার বিপরীতেই বুঝি জ্যোছনা কাজ করছে?

ভদ্রমহিলা চশমাটি ঠিক করে নিয়ে বললেন আবার-জ্যোছনার মুখে আপনার অনেক প্রশংসা শুনেছি। সত্যি বাবা, আজ আপনাকে দেখে অনেক খুশি হলাম।

বনহুর বুঝতে পারলো-জ্যোছনা রায় তার সম্বন্ধে আগেই মায়ের কাছে অনেক কিছু বলেছে। বনহুর কোনো জবাব না দিয়ে চুপ রইলো।

কিন্তু বনহুর এভাবে বেশিক্ষণ বসে থাকার মত শান্ত লোক নয়। উসখুস করতে লাগলো তার মন। কিন্তু উঠি বললেন তো ওঠা হবে না। এসেছে যখন কিছু কথাবার্তা বলতে হবে। কাজেই বনহুর বললো-আপনি আমাকে তুমি বলবেন।

হ্যাঁ ঠিক বলেছো বাবা, আপনি বলতে আমারও কেমন বাধছিলো। কিন্তু কথা দাও, এখন থেকে আসবে তুমি?

হঠাৎ পরিচয় হতেই ভদ্রমহিলা একেবারে নিজের করে নিলেন যেন।

এবার জ্যোছনা রায় হেসে বললো-দেখলেন তো মিঃ চৌধুরী, বলেছিলাম না আমার মা খুব ভাল। এবার থেকে মায়ের অনুরোধ ফেলতে পারবেন না নিশ্চয়ই।

বনহুর বললেন-পরিচয় যখন হলো, সুযোগ পেলেই আসবো।

না না, তা হবে না, ওসব সুযোগ টুযোগ বুঝি না। দেখো বাবা, একা একা থাকি, সময় কাটতে চায় না-জ্যোছনার সঙ্গে এলে অনেক খুশি হবো।

জ্যোছনা রায় উঠে দাঁড়ালো, সেও মায়ের পাশে আসনে বসে পড়েছিলো, বললো-যাই, একটু জলযোগের ব্যবস্থা করিগে।

বহু বাধা দিয়ে বললো-মোটেই না। উঠি আজ?

উঠি বললেই কি ওঠা হয় বাবা? এসেছো যখন তখন একটু যা হয় মুখে দিয়ে তবে যেতে হবে।

জ্যোছনা রায় ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে কক্ষ থেকে!

জ্যোছনা রায় বেরিয়ে যাবার পর ভদ্রমহিলা সোফায় আরও জেঁকে বললেন, বললেন বনহুরকে-দেখো বাবা, জ্যোছনা আমার ঘরের লক্ষ্মী। ও যতক্ষণ বাইরে থাকে, মনে আমি এতটুকু শান্তি পাই না। কিন্তু কি করবো, বাধ্য হয়েছি ওকে বাইরে পাঠাতে। তুমি হয়তো মনে করবে অভিনয় করানো আমাদের পেশা আসলে তা নয়, জ্যোছনার সখ-ও অভিনয় করবে।

বেশ তো, এটা মন্দ কি?

কিন্তু আমার ভাল লাগে না? শুধু ওর আর ওর বাবার ইচ্ছায়....

জ্যোছনা রায় এসে পড়ায় চুপ হলেন ভদ্রমহিলা।

বনহুরও কোনো কথা তুললো না এর পরে।

জলযোগের পর বনহুর বিদায় গ্রহণ করলো। জ্যোছনা রায়ের জননীর ব্যবহারে খুশি হলো বনহুর।

বিদায়কালে ভদ্রমহিলা বনহুরকে বারবার অনুরোধ জানালেন আবার আসতে।

বনহুর গাড়িতে চেপে বসলো, হঠাৎ পাশে হাতের কাছে একটা ভাজকরা কাগজ দেখতে পেলো সে।

বনহুর কাগজখানা পকেটে রেখে গাড়িতে স্টার্ট দিলো।

জ্যোছনা রায় বনহুরকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এসেছিলো। বনহুর তার অলক্ষ্যেই কাগজখানা সরিয়ে ফেলেছিলো।

বাড়ি ফিরে সর্ব প্রথম বনহুর আলোর কাছে গিয়ে সেই ভাজকরা কাগজখানা মেলে ধরলো। মাত্র কয়েক লাইন লেখা

এত করে বলা সত্ত্বেও আপনি পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন না। এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়ংঙ্কর। পুনরায় সাবধান করে দিচ্ছি।

.

হঠাৎ অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো বনহুর। হাসি থামিয়ে ফিরে তাকাতেই চমকে উঠলো সে, আতিয়া দাঁড়িয়ে আছে তার পেছনে, মুখে বিকৃত হাসি। হাতে একটা বেতের তৈরি ভ্যানিটি ব্যাগ। মূল্যবান শাড়ি এবং অলঙ্কারে সজ্জিত।

বনহুর তাকাতেই বললো আতিয়া-হ্যালো মিঃ চৌধুরী।

বনহুর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো-আপনি কখন এলেন।

কখন থেকে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি মিঃ চৌধুরী। কথা বলতে বলতে আতিয়া বনহুরের গা ঘেঁসে দাঁড়ালো।

বুঝতে পারলো বনহুর, আতিয়া এ বাড়িরই কোনো কক্ষে ছিলো এতক্ষণ।

বনহুর সংকুচিতভাবে একটু সরে দাঁড়ালো। নূরী যদি দেখে ফেলে কি যে মনে করবে!

আতিয়া বললো-আব্বা, আমাকে স্টুডিও থেকে ফোন করেছিলেন, আপনি নাকি বেশ কিছুক্ষণ হলো স্টুডিও থেকে বেরিয়েছেন।

মিঃ উল্লাহ স্টুডিওতে ছিলেন নাকি? কই, তার সঙ্গে তো আমার সাক্ষাৎ হয়নি? বনহুর অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবতে লাগলো।

আতিয়া বললো-আপনার বোন এখানে আছেন-কই তার সঙ্গে তো আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন না?

চোখ তুললো বনহুর-বোন। হাঁ আছে, কিন্তু তার শরীরটা তেমন ভাল নয়, কাজেই…।

ও, উনি বুঝি অসুস্থ?

ঠিক অসুস্থ না, তবে মাথায় একটু-মানে—

মাথায় গণ্ডগোল আছে বুঝি আপনার বোনের?

হাঁ, একটা দুর্ঘটনায় তার মাথায় কিছুটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে। চলুন ড্রইংরুমে গিয়ে বসি?

বনহুর এতক্ষণ আতিয়াকে এ ঘরে বসার জন্য অনুরোধ জানায়নি।

আতিয়া বললো-চলুন।

বনহুর যখন আতিয়ার সঙ্গে বেরিয়ে গেলো তখন নূরী দরজার আড়াল থেকে লক্ষ্য করছিলো।

নূরীর মুখমণ্ডল কালো হয়ে উঠলো, নতমুখে কি যেন ভাবতে লাগলো সে।

এর পূর্বে আরও কয়েকদিন আতিয়া এসে বনহুরকে জোর করে নিয়ে গেছে বাইরে। বনহুরের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে টেনে নিয়ে যায়। নূরীর মনকে এ দৃশ্য কেমন যেন চঞ্চল করে তোলে, ভাবে কত কথা। কিন্তু সব এলোমেলো হয়ে যায়। নূরী তখন শয্যায় শুয়ে থাকে চুপ করে।

ইয়াসিন অনেকদিন বলেছে, বেগম সাহেবা, আপনি অমন চুপ চাপ থাকেন কেন?

বাড়ির অন্যান্য চাকর বাকর প্রশ্ন না করলেও অবাক হয়েছে নূরীর নীরবতা লক্ষ্য করে।

কিন্তু কেউ জবাব পায়নি।

নূরী নির্বিকার পুতুলের মত গোটা দিন বসে থাকে নিজের শয়নকক্ষে। নূরীর দেখাশুনার জন্য যে মেয়েটাকে রাখা হয়েছিলো, সে সব সময় নূরীকে নাওয়া-খাওয়া করাতো-কোনো কোনো সময় বাগানে নিয়ে গিয়ে দস্যু বসতো, চুল আঁচড়ে দিতো, গল্প করতো, কিন্তু নূরী চিত্রাপিতের ন্যায় গল্প শুনতো বা যা বলতো সেই কাজ করতো।

আতিয়ার সঙ্গে বনহুরের কদিন মেলামেশা লক্ষ্য করে নুরীর মধ্যে একটু যেন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলো। আর কেউ এটা লক্ষ্য না করলেও ধৰা পড়ে গেলো বনহুরের কাছে।

বনহুর যখন আতিয়ার সঙ্গে ড্রইংরুমের দিকে যাচ্ছিলো তখন মুরীর ওপর তার চোখ দুটো চলে গিয়েছিলো। একটা জিনিস বনহুর লক্ষ্য করেছিলো যা তার মনে এনেছিলো ক্ষীণ আশ্বাসবাণী। আতিয়ার সঙ্গে তাল মেলামেশাটা নূরীর কাছে

সন্তোষজনক নয় বলে মনে হয়েছিলো। একটা হাসির রেখা। ফুটে উঠেছিলো তখন বনহুরের ঠোঁটের কোণে।

ড্রইংরুমে আতিয়ার পাশে এসে বসলো বনহুর-মিস আতিয়া এত রাতে হঠাৎ কি মনে করে?

যদি বলি আপনাকে দেখতে? কিন্তু....

না, কিন্তু নয়, কারণ এত রাতে আমি এমনিই আসিনি।

আপনি জানতেন আজ আমার সুটিং ছিলো। তবু জেনেশুনে কেন এত কষ্ট করে এসেছেন এবং আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

মিঃ চৌধুরী, আব্বার মুখে শুনেছিলাম সন্ধ্যার পরই আপনার কাজ শেষ হবার সম্ভাবনা আছে, কাজেই...

কিন্তু শেষ নাও তো হতে পারে, এটাও আপনার ভেবে দেখা উচিত ছিলো।

কি জানি মিঃ চৌধুরী, সব সময় আপনাকে মনে-আপনার পাশে থাকবার। বাসনা আমার মনকে অস্থির করে রাখে।

আতিয়ার প্রেম গদ গদ কণ্ঠস্বরে বনহুরের মন বিষিয়ে ওঠে। ভ্রুকুঞ্চিত করে তাকায় সে ওর মুখের দিকে।

বনহুর মনে মনে বিরক্তি বোধ করলেও আতিয়ার যাওয়া-আসা বেড়েই উঠলো দিনের পর দিন।

বনহুরকে নিবিড় করে পাবার জন্য আতিয়া যেন উন্মাদ হয়ে উঠলো। আরফান উল্লাহ কন্যাকে যোগাতে লাগলেন উৎসাহ আর প্রেরণা। মিঃ চৌধুরীকে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ করার এই একমাত্র উপায়। যেমন করে হোক তাকে কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিতে পারলেই তিনি যেন নিশ্চিন্ত হন।

একসঙ্গে কন্যার জামাতা লাভ এবং নিজের ছবির হিরো সংগ্রহ! কিন্তু বনহুর নির্বোধ নয়। প্রথম দিন আরফান উল্লাহর সঙ্গে পরিচিত হয়েই সে বুঝতে

পেরেছিলো তার মনোভাব সুবিধার নয়। লোকটার উদ্দেশ্যমূলক কথাবার্তা তার মনে জাগিয়েছিলো সন্দেহের দোলা।

বনহুর সতর্ক হয়ে গিয়েছিলো নিজের ব্যাপারে।

ইচ্ছা করলেই বনহুর আরফান উল্লাহ এবং নাহার চৌধুরীর নাগপাশ থেকে যে কোন মুহূর্তে মুক্ত হয়ে উধাও হতে পারতো। বনহুরকে আটকায় এমন কেউ নেই এ দুনিয়ায়, কিন্তু সে আপন ইচ্ছাতেই রয়ে গেছে, তা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে নয়। ছবিতে.লক্ষ টাকা চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন আরফান উল্লাহ। শুধু অর্থের জন্যও নয়, পেছনে আর একটা ব্যাপার রয়েছে। বনহুর গোপনে সন্ধান নিয়ে জানতে পেরেছে প্রযোজক আরফান উল্লাহ একজন অসৎ ব্যবসায়ী।

বনহুর ছবির কাজ শেষ করে টাকা নেবে এবং সেই সঙ্গে আরফান উল্লাহর অসৎ ব্যবসার অবসান ঘটাবে।

গভীর রাত।

একটা গাড়ি এসে থামে আরফান উল্লাহর বাড়ির পেছনভাগে। গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো একজন জমকালো আলখেল্লাধারী। সমস্ত শরীর কালো আলখেল্লায় ঢাকা। মুখে কালো মুখোশ। শুধু চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলছিলো আলখেল্লার ভেতরে।

আলখেল্লাধারী অতি কৌশলে পেছন প্রাচীর টপকে প্রবেশ করলো অন্তঃপুরে। একবার প্যান্টের পকেটে হাত রেখে রিভলবারের অস্তিত্ব অনুভব করে নিলো।

সোজা এসে দাঁড়ালো আলখেল্লাধারী দোতলার পেছনের দিকে। অতি নিপুণতার সঙ্গে পাইপ বেয়ে উঠতে লাগলো উপরে।

যে কক্ষটার পাইপ বেয়ে আলখেল্লাধারী উপরে উঠলো সেই কক্ষের মধ্যে তখন আরফান উল্লাহ ও আর একজন লোক বসে অতি নিম্নস্বরে আলোচনা হচ্ছিলো।

আলখেল্লাধারী পাইপ বেয়ে একেবারে জানালার শার্শির পাশে এসে পৌঁছলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষ হতে ভেসে এলো আরফান উল্লাহর চাপা কণ্ঠ-আহমদ, আবার তোমাকে বলে দিচ্ছি-রাত একটায় গঞ্জপুর থেকে রওয়ানা দেবে, জোড়াপুলের উপর পৌঁছতে যেন রাত দুটো হয়। কারণ, তখন ট্রাফিক পুলিশ জোড়াপুলের মুখ থেকে সরে পড়বে। তারপর নিশ্চিন্তে পৌঁছে যাবে আমার গুদামে। সেখানে পৌঁছলে আর কোনো ভয় থাকবে না। সাবধান! কেউ যেন টের না পায়-ট্রাকের চিনির বস্তার মধ্যে সোনা আছে।

নাহি বাবু সাব, টের না পাবে। হামি লোক বহুৎ হুঁশিয়ার আছি! চিনির বস্তায় সোনা আছে-কেউ টের না পাবে।

আলখেল্লাধারীর চোখ দুটে জ্বলে উঠলো।

কক্ষে এবার শোনা গেলো-হামি এবার চলি?

যাও আহমদ, মনে রেখো-তুমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে একজন।

হাসির শব্দ-হামাকে তা বলতে হবে না। সালাম বাবু সাব।

আরফান উল্লাহর কণ্ঠ–সালাম।

আলখেল্লাধারী যেমন এসেছিলো তেমনি পাইপ বেয়ে তর তর করে নেমে গেলো নিচে।

বাড়ির পেছন অংশে পৌঁছতেই আলখেল্লাধারী শুনতে পেলো মোটর ষ্টার্টের শব্দ। বাড়ির দক্ষিণ অংশে কোনো গোপন জায়গা আছে, যেখানে গাড়ি রাখলে সামনে থেকে কেউ দেখতে পায় না।

আলখেল্লাধারী যখন তার শব্দবিহীন গাড়িখানা নিয়ে বাড়ির সামনে দিয়ে পেছন দিকে আসছিলো, তখন বাড়ির সামনের গাড়ি বারান্দায় কোনো গাড়ি, ছিলো না।

আলখেল্লাধারী গাড়িতে বসে ষ্টার্ট দিলো।

মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেলো গাড়িখানা।

পরদিন।

রাত দুটো বাজবার কিছু বিলম্ব আছে।

আলখেল্লাধারী নিজের গাড়িখানা জোড়াপুরে অদূরে একটা ঝোপের আড়ালে রেখে নেমে দাঁড়ালো। অন্ধকারে রেডিয়াম হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো, এখনো দুটো বাজতে পঁচিশ মিনিট বাকী।

শহর ছেড়ে প্রায় একশ মাইল দূরে এই জোড়াপুল। মধুগঙ্গার উপর দিয়ে ঝুলানো এই পুলখানা চলে গেছে গঞ্জপুরের দিকে। পুলটার ঠিক মাঝখানে একটা জোড়া রয়েছে, তাই এর নাম জোড়াপুল।

মধুগঙ্গা দিয়ে যখন বড় বড় নৌকা বা ষ্টিমার চলে তখন জোড়াপলের জোড়া খুলে যায়।

পুলের দুই মাথায় দুজন ট্রাফিক পুলিশ দণ্ডায়মান থাকে, তারাই পুলের জোড়া খুলে দেয়। পুলের দুপাশে দুটো হ্যাণ্ডেলের মত জিনিস রয়েছে, সেটা জোরে সামনে ঠেলে দিলে পুল স্বাভাবিক হয়ে যায়, আর পেছনে ঠেলে দিলে মাঝখান ফাঁক হয়ে যায়। তখন যে কোনো স্টিমার বা বড় বড় নৌকা পাল তুলে অনায়াসে এদিক থেকে সেদিক চলে যায়।

আলখেল্লাধারী এসে দাঁড়ালো পুসের সামনে যেখানে রয়েছে পুলের চাবিকাঠি।

ঠিক সেই মুহূর্তে মধুগঙ্গার ওপারে রাস্তায় দুটো লাইটের আলো তীরবেগে ছুটে আসছে জোড়াপুলের দিকে।

আলখেল্লাধারীর চোখ দুটোও জ্বলে উঠলো ঠিক ঐ দুটো লাইটের আলোর মতই।

স্পীডে এগিয়ে আসছে একটা ট্রাক।

এখানে হ্যাণ্ডেলে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে আলখেল্লাধারী। আর মাত্র কয়েক মিনিট-তাহলেই তার দক্ষিণ হাতখানা নুয়ে পড়বে একপাশে।

আলখেল্লাধারীর দৃষ্টি ঐ সার্চলাইটের আলোর ওপর স্থির হয়ে আছে।

গাড়িখানা সবেগে উঠে পড়লো জোড়াপুলের উপর। তীরবেগে এগিয়ে আসছে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, জোড়াপুলের মাঝখান ফাঁক হয়ে গেলো আচম্বিতে।

ঝপ করে একটা শব্দ হলো।

একটা ক্ষীণ আর্তনাদ বাতাসে ভেসে উঠে মিলিয়ে গেলো মুহূর্তে।

পরক্ষণেই একটা অট্টহাসিতে মুখর হয়ে উঠলো মধুগঙ্গার তীর। আলখেল্লাধারী এবার হাসি থামিয়ে গাড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

ভোরে ঘুম ভাঙতেই পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ, হোসাইন দেখলেন তার নামে একখানা জরুরী চিঠি এসেছে। মুখহাত না ধুয়েই খুলে ফেললেন চিঠিখানা। মাত্র দুটো লাইন লেখা আছে

ইন্সপেক্টার, গত রাত দুটোয় জোড়াপুলের মাঝখানে মধু গঙ্গায় একটি ট্রাক নিমজ্জিত হয়েছে। ট্রাকে চিনির বস্তার মধ্যে বহু সোনা আছে। বিলম্ব না করে উদ্ধার করুন।

–অজ্ঞাত

ইন্সপেক্টার মিঃ হোসাইন কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তার হাতে চিঠিখানা তখনও ধরা। মধুগঙ্গায় ট্রাক নিমজ্জ্বিত, চিনির বস্তায় সোনা– কয়েকবার পড়লেন মিঃ হোসাইন চিঠিখানা।

হাতমুখ ধোয়া বা নাস্তা খাওয়া কোনোটাই তাঁর হলো না, তখনই তিনি চিঠিখানাসহ ছুটলেন পুলিশ অফিসে।

সহকারী মকসুদ মিয়াকে তখনই আদেশ দিলেন কয়েকজন পুলিশ নিয়ে মধুগঙ্গায় জোড়াপুলের নিকটে যেতে। অল্পক্ষণ পর তিনি আসছেন বলে জানালেন।

হঠাৎ মধুগঙ্গায় জোড়াপুলের নিকটে কি প্রয়োজন ভেবে পান না মকসুদ মিয়া।

মিঃ হোসাইন আরও বলে দিলেন-তিনি পৌঁছবার পূর্বে কেউ যেন মধুগঙ্গায় না নামে।, মকসুদ মিয়া কোনো প্রশ্ন করতে পারলেন না, তিনি কয়েকজন পুলিশ

নিয়ে রওয়ানা হলেন মধুগঙ্গার দিকে।

সহকারী মকসুদ মিয়া বিদায় হতেই মিঃ হোসাইন চিঠিখানা নিয়ে পুলিশ সুপারের নিকটে হাজির হলেন।

চিঠিখানা তাঁর হাতে দিয়ে বললেন-স্যার, চিঠির কথা সত্য মিথ্যা জানি না, তবু আমি আমার সহকারী মকসুদ মিয়াকে কয়েকজন পুলিশসহ মধুগঙ্গার তীরে পাঠিয়েছি। এবার কি করা যায় বলুন?

পুলিশ সুপার বেশ কিছুক্ষণ চিঠিখানার দিকে তাকিয়ে থেকে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন-যতদূর বিশ্বাস চিঠির লেখা সত্য বলেই মনে হচ্ছে।

তাহলে আমি ডুবুরী নিয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখবো?

নিশ্চয়ই দেখতে হবে।

পুলিশ সুপারের সঙ্গে যখন পুলিশ ইসপেক্টার মিঃ হোসাইন নিমজ্জিত ট্রাক, সোনা চিঠি নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলেন, তখন বনহুর নিজের ড্রাইরুমে বসে চা পান করছিলো।

এমন সময় পাগলের মত এলোমেলো বেশে কক্ষে প্রবেশ করলেন মিঃ আরফান উল্লাহ-মিঃ চৌধুরী, সর্বনাশ হয়েছে, আমার সর্বনাশ হয়েছে–মাথায় হাত দিয়ে ধপ করে সোফায় বসে পড়লেন তিনি।

বনহুর শশব্যস্তে ওঠে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো-হঠাৎ কি হলো, আপনার মিঃ উল্লাহ?

মিঃ চৌধুরী, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

সর্বনাশ হয়ে গেছে! আতিয়ার কোনো অমঙ্গল ঘটেনি তো? বনহুর চোখেমুখে আশংকাভাব টেনে কথাটা বললো।

আরফান উল্লাহ বললেন-না, না, আতিয়ার কোনো অমঙ্গল ঘটেনি মিঃ চৌধুরী।

তবে কি হলো?

দুলাখ টাকা, দুলাখ টাকা আমার চলে গেছে মিঃ চৌধুরী ও হো হো হো আকুলভাবে কেদে উঠলেন.আরফান উল্লাহ।

বনহুর যেন কিছু বুঝতে পারলো না এমনি থ বনে যায়।

আরফান উল্লাহর মুখমণ্ডল কালো হয়ে উঠেছে। গা ঘেমে দরদর করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে।

বনহুর ফ্যানের স্পীড বাড়িয়ে দিলো।

আরফান উল্লাহ বললেন কি করবো বলুন, কি করবো?

বলুন কি ঘটনা ঘটেছে? না বললে বুঝবো কি করে?

মিঃ চৌধুরী, আপনাকে আমি বিশ্বাস করি—

হাঁ বলুন?

আমার দুলাখ টাকার সোনা কাল মধুগঙ্গার বুকে নিমজ্জিত হয়েছে।

দুলাখ টাকার সোনা। বনহুর যেন আকাশ থেকে পড়লো।

হ্যাঁ হ্যাঁ, মিঃ চৌধুরী শুনুন–কাল রাতে গঞ্জপুর থেকে এক ট্রাক। বোঝাই চিনি আসছিলো–

চিনি।

হ্যাঁ, সে চিনির বস্তার ভেতরে ছিলো আমার দুলাখ টাকার সো–না–কথাটা তার বুক চিরে বেরিয়ে এলো যেন।

বনহুর বললো–কি করে জানলেন সেগুলো মধুগঙ্গায় নিমজ্জিত হয়েছে?

ড্রাইভার–মিঃ চৌধুরী, কোনো রকমে সাঁতার কেটে ড্রাইভার প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছে।

বনহুর ভ্রূকুঞ্চিত করে কি যেন চিন্তা করলো, তারপর বললো ড্রাইভার প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছে।

হাঁ, তার মুখেই সংবাদ পেলাম মিঃ চৌধুরী। এখন কি করি বলুন? কি করে আমার সোনাগুলো উদ্ধার করি?

বনহুর এবার শান্তকণ্ঠে বললো-ভয় নেই মিঃ উল্লাহ। মধুগঙ্গার পানিতে আপনার চিনির বস্তা দিয়ে সরবৎ তৈরি হলেও বস্তার মধ্যে সোনার দলা গলে যাবে না।

কিন্তু দিনের আলোতে কি করে এগুলো উদ্ধার করা যাবে? আমার মাথা গুলিয়ে গেছে, আমি কিছুই ভেবে পাচ্ছি না–

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করলো গত রাতের আহম্মদ। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো-মিঃ উল্লাহ সাহেব, বহুত খারাপ বাত আছে!, আরফান উল্লাহ ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠলো-কি খবর বলল, বলো আহম্মদ? ঐ খবরের পর আর কি খারাপ থাকতে পারে বলো?

হামাকে আপনি মধুগঙ্গার ধারে পাঠাইয়া এখানে আসিলেন। কিন্তু আমি যাইয়া দেখিলাম-বহুত পুলিশ মধুগঙ্গার জোড়াপুলে ভীড় জমিয়া গিয়াছে।

পুলিশ!

হাঁ, পুলিশ। আরও দেখিলাম উহারা পানিতে নামিবার জন্য তৈরি হইতেছে।

আহম্মদের জামার আস্তিন চেপে ধরলেন আরফান উল্লাহ, আকল কণ্ঠে বললেন-পুলিশ কি করে টের পেলো? আহম্মদ, পুলিশ কি করে টের পেলো?

বনহুর দুচোখ কপালে তুলে বললো-সর্বনাশ তো তখন হয়নি, হলো এখন। পুলিশ যখন সন্ধান পেয়েছে তখন আর কোনো–

উপায় নেই! কথাটা টেনে টেনে হতাশার সুরে বললেন আরফান উল্লাহ।

আরফান উল্লাহকে তখন এমন দেখাচ্ছিলো যেন তার দেহে প্রাণ নেই।

বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন আরফান উল্লাহ মিঃ চৌধুরী, আমি কাউকে বিশ্বাস করি না, শুধু আপনার ওপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস–

বলুন কি প্রয়োজন?

পুলিশ যখন জানতে পেরেছে তখন করবার আর কিছু নেই, কিন্তু কথাটা যেন বাইরে প্রকাশ না পায়, মানে সোনাগুলো যে আমার—

জানতে পারবে না মিঃ উল্লাহ। সোনাগুলোই শুধু হারিয়েছেন, আপনি বেঁচে গেছেন।

আরফান উল্লাহ বনহুরের দক্ষিণ হাতখানা চেপে ধরলেন– একথা শুধু আপনি জানলেন মিঃ চৌধুরী।

হাঁ, ভয় নেই কোন।

আরফান উল্লাহ যখন বনহুরের ওখান থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন, তখন মনে হলো তার দেহে প্রাণ নেই, কোনো রকমে দেহকে টেনে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন।

পরদিন পত্রিকায় বড় বড় অক্ষরে প্রকাশ পেলো গত দিনের সোনা উদ্ধারের খবরটা?

পুলিশ কর্তৃক মধুগঙ্গা থেকে প্রচুর সোনা উদ্ধার ও নম্বরবিহীন একটি নিমজ্জিত ট্রাক ও কয়েকখানা বস্তা উদ্ধার করা হয়েছে।

শহরে একটা ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা দিলো। একি অদ্ভুত ঘটনা। ট্রাকই বা। এলো কোথা হতে আর সোনাই বা এলো কি করে, কিন্তু এর জবাব কেউ দিতে পারলো না।

আরফান উল্লাহ বেশ কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছিলেন। দুলাখ টাকা তার পানিতে ভেসে গেছে, কম কথা নয়। পুলিশের হাতে চলে যাওয়া মানে পানিতে ভেসে যাওয়ার মতই।

আরফান উল্লাহ ঝিমিয়ে পড়লেও একেবারে ভেঙে পড়লেন না। ভেঙে পড়লে তার চলবে কেন? মেরুদণ্ড সোজা করে আবার তিনি পা বাড়ালেন সামনের দিকে।

বিদেশিদের সঙ্গে বছরে তার বেশ কয়েক লাখ টাকার গোপন কারবার চলতো। তাছাড়া অন্যান্য অনেক চোরা কারবার ছিলো আরফান উল্লাহর, কাজেই আরফান উল্লাহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেন।

এতগুলো টাকা বিনষ্ট হওয়ায় আরফান উল্লাহ ঝিমিয়ে পড়লেও তার অনুচর ও কর্মচারীরা নীরব ছিলো না। তারা ঠিকভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলো।

কুন্তিবাঈ ছবির সুটিং কয়েকদিন বিশেষ কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, আবার শুরু হলো।

সেদিন আউটডোর সুটিংয়ের জন্য একটা গ্রামাঞ্চলে যেতে হলো। কুন্তিবাঈ ছবির ইউনিটকে।

আজকের সুটিংয়ে খুব বেশি লোকজনের দরকার হবে না।

পরিচালক নাহার চৌধুরী, ছবির নায়ক মিঃ চৌধুরী, নায়িকা জ্যোছনা রায় এবং সহনায়ক বিশু সেন ও অন্যান্য লোক নিয়ে রওয়ানা দিলেন শহর ছেড়ে দশ মাইল দূরে একটি গ্রামের উদ্দেশ্যে।

দুখানা ট্যাক্সি আর একটা ট্রাক নিয়ে রওয়ানা দিলেন নাহার চৌধুরী। সামনের ট্যাক্সিতে পরিচালক স্বয়ং এবং নায়ক-নায়িকা ও সহনায়ক। মাঝখানে ইউনিটের বিভিন্ন লোক এবং খাবার জিনিসপত্র। পেছনের ট্রাকে ক্যামেরা এবং অন্য আসবাবপত্র–ছবির জন্য প্রয়োজন। শহর ছেড়ে গাড়িগুলো দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। ড্রাইভারের আসনের পাশে বনহুর আর জ্যোছনা রায় বসেছে। পেছন আসনে নাহার চৌধুরী ও সহনায়ক বিশু সেন।

অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ জ্যোছনাকে বেশ গম্ভীর ভাবাপন্ন লাগছিলো, দুএকটা হুঁ না ছাড়া তেমন কোনো কথা আজ বলেনি জ্যোছনা রায়।

অন্য কেউ লক্ষ্য না করলেও বনহুর লক্ষ্য করেছিলো-হাস্যময়ী জ্যোছনা রায় আজ বেশ চুপচাপ।

এবার জিজ্ঞাসা করলো বনহুর-মিস রায়, এমন নিশ্চুপ রয়েছেন কেন?

জ্যোছনা রায় একটু হেসে বললো-না,কিছু না।

জ্যোছনা রায় মুখে কিছু না বললেও মনের গহনে তার ঝড় বইছিলো। কারণ রওয়ানা দেবার পূর্বমুহূর্তে একটি ঘটনা ঘটে গেছে। বিদায়ের কিছু পূর্বে জ্যোছনা রায় যখন তার বিশ্রামকক্ষে ড্রেস পরিবর্তন করছিলো ঠিক সে মুহূর্তে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছিলো অরুণ কুমার।

দুচোখে তার অসহায় দৃষ্টি।

জ্যোছনা রায় অরুণ কুমারকে দেখে আচম্বিতে চমকে ওঠে। দুচোখে রাগ–ক্রোধ ঝরে পড়ে, বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলেছিলো জ্যোছনা রায়-এখানে–আপনি কার হুকুমে এসেছেন?

অরুণ কুমার বলেছিলো-জ্যোছনা, আমি কারও হুকুমে এখানে আসিনি, মনের আকর্ষণে ছুটে এসেছি। আমি তোমাকে ভালবাসি।

এ কথা আরো অনেকবার আপনার মুখে আমি শুনেছি।

আজও বলছি জ্যোছনা আমার প্রতি সদয় হও!

না, যা হবার নয় তা কোনোদিন হবে না। জ্যোছনা! অস্ফুট শব্দ করে উঠেছিলো অরুণ কুমার। তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বলেছিলো-যদি তোমাকে কোনোদিন না পাই তবে জানো কি হবে তোমার পরিণতি?

জানতে চাই না-যান, যান আপনি।

জ্যোছনা, মনে রেখো আমার হাত থেকে তোমার পরিত্রাণ নেই। যেখানেই যাবে তুমি, সেখানেই আমার দৃষ্টি তোমাকে অনুসরণ করবে-হয় তোমাকে পাবো, নয় তোমাকে এ দুনিয়া থেকে চিরবিদায় দেবো।

জ্যোছনা সে ভয়ে ভীত নয়।

তাই নাকি?

হাঁ, মরতে হয় মরবো, কিন্তু তবু আপনাকে—

জ্যোছনার মুখ চেপে ধরেছিলো অরুণ কুমার, কথা শেষ করতে পারেনি। সে মুহূর্তে বাইরে ভেসে উঠেছিলো নাহার চৌধুরীর কণ্ঠস্বর-হালো মিস রায়, আপনার হলো?

সঙ্গে সঙ্গে অরুণ বাবু অদৃশ্য হলেছিলো ড্রেসিং টেবিলের আড়ালে।

নাহার চৌধুরীর কণ্ঠস্বর পুনরায় ভেসে এসেছিলো বাইরে থেকে আসতে পারি?

শুষ্ক কণ্ঠে বলেছিলো জ্যোছনা রায়–আসুন।

হয়েছে আপনার?

হয়েছে।

চলুন।

নাহার চৌধুরীকে অনুসরণ করেছিলো জ্যোছনা রায়।

এখন বনহুরের পাশে বসে সে কথাই ভাবছিলো জ্যোছনা রায়। মনের মধ্যে তার ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়েছিলো। বারবার মনে পড়ছিলো অরুণ কুমারের কথাগুলো-যেখানেই যাবে তুমি সেখানেই আমার দৃষ্টি তোমাকে অনুসরণ করবে। হয় তোমাকে পাবো, নয় তোমাকে এ দুনিয়া থেকে বিদায় দেবো।–জ্যোছনা রায়ের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে।

পরিচালকের কণ্ঠস্বর-ঐ সামনে ফাঁকা জায়গাটায় গাড়ি রাখো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই জ্যোছনা রায়দের গাড়ি একটা বনানী ঘেরা ফাঁক, জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লো।

পাশাপাশি তিনখানা গাড়ি এসে দাঁড়ালো। দুখানা জিপ আর একটা ট্রাক।

কুন্তিবাঈ ইউনিট নেমে পড়লো জায়গাটায়। বনহুর জ্যোছনা রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো আবার বেশ জায়গাটা, না?

ছোট্ট একটা শব্দ করলো জ্যোছনা রায় হ্যাঁ।

অন্যদিন হলে হাসি-খুশি আনন্দে চঞ্চল হরিণীর মত এতক্ষণ ছুটাছুটি শুরু করে দিতো জ্যোছনা রায়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চল খুব প্রিয় স্থান জ্যোছনা রায়ের।

বনহুরের সঙ্গে এগুতে লাগলো জ্যোছনা রায়।

পরিচালক স্বয়ং তার অন্যান্য সহকারীকে নিয়ে স্থান নির্বাচনে আত্মনিয়োগ করলেন।

অন্যান্য সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বনহুর ঘুরেফিরে জায়গাটা দেখছিলো।

হঠাৎ নজর চলে গেলো পাশে-কই, জ্যোছনা রায় নেই তো! গেলো কোথায়? চারদিকে দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলো। দেখলো বনহুর অদূরে একটি গাছের নীচে ঘাসের উপর বসে আছে জ্যোছনা রায়।

আরে আপনি এখানে! বনহুর গিয়ে দাঁড়ালো জ্যোছনা রায়ের পাশে।

জ্যোছনা রায় বললো-এখানে একটু ঠাণ্ডা মিঃ চৌধুরী, তাই বসলাম।

হাঁ, জায়গাটা বেশ আরামদায়ক।

সত্যি যেখানে জ্যোছনা রায় বসে পড়েছিলো, সে জায়গাটা একটা বকুল ফুলের গাছতলা। ফুলে ফুলে গাছটা যেন নুয়ে এসেছে একেবারে।

ফুরফুরে হাওয়ায় বকুলের মিষ্টি গন্ধ জায়গাটাকে যেন স্বর্গিয় করে তুলেছিলো।

বনহুর বিলম্ব না করে বসে পড়লো জ্যোছনা রায়ের পাশে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললো-সত্যি করে বলুন তো আজ আপনার কি হয়েছে?

বললাম তো কিছু হয়নি।

মিথ্যে কথা। আর একবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বললো বনহুর-আসার পূর্বে অরুণ বাবুর সঙ্গে আপনার কি কথা হয়েছিলো মিস রায়?

চমকে উঠলো জ্যোছনা রায়-আপনি কি করে জানলেন।

আমি সব জানি মিস রায়।

আশ্চর্য! আপনি তখন—

যদিও গাড়িতে ছিলাম তবুও—

মিঃ চৌধুরী।

মিস রায় অরুণ বাবু আপনাকে এমন কোনো কথা শুনিয়েছিলো যে অত্যন্ত অপ্রীতিকর।

হাঁ, আপনার অনুমান মিথ্যা নয় মিঃ চৌধুরী। একটু চিন্তা করে বললো জোছনা রায়-অরুণ বাবু আমাকে ভয় দেখিয়ে বলেছিলো-যেখানেই যাবে। তুমি সেখানেই আমার দৃষ্টি তোমাকে অনুসরণ করবে।

কথাটা শোনামাত্র বনহুরের মুখমণ্ডলে ফুটে ওঠে একটা চিন্তারেখা, গম্ভীর কণ্ঠে বললো সে।

জোছনা রায় বললো আবার–মিঃ চৌধুরী, অরুণ বাবু আরও বললো-তোমাকে যদি না পাই, মনে রেখো-এ দুনিয়াতে তোমাকে বাঁচতে দেবো না।

বনহুর স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো-মিস রায়, এসব জানার পর আপনি কি জবাব দিয়েছিলেন?

বলেছি মৃত্যুভয়ে জ্যোছনা রায় ভীত নয়। মরতে হয় মরবো তবু আপনাকে আমি গ্রহণ করতে পারবো না। কথাগুলো বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়ে জ্যোছনা রায়।

বনহুর মুখে হাসি টেনে বললো-মিস রায়, কেন আপনি ওর প্রতি এত নারাজ?

এর কোনো জবাব দিতে পারবো না মিঃ চৌধুরী।

অরুণ বাবু বড়লোকের একমাত্র সন্তান-রূপ গুণ সব আছে তার। সুপুরুষ সে, অথচ জানি না কেন আপনি–

মিঃ চৌধুরী, আপনাকে আমি এর উত্তর দিতে রাজী নই। শুধু আজ নয়, সে আমার পেছনে বেশ কয়েক বছর ধরে ঘুরে ফিরছে।

আপনার প্রথমেই তাকে বলে দেওয়া উচিত ছিলো।

দিয়েছিলাম।

তবু?

হাঁ, তবুও সে সব সময় আমাকে বিরক্ত করতো।

বনহুর কিছু বলতে যাচ্ছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে মেকআপ ম্যান ডাক দিলেন- আসুন মিঃ চৌধুরী, মিস জ্যোছনা রায়, আপনাদের এখন মেকআপ নিতে হবে।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো-চলুন মিস রায়।

জ্যোছনা রায়ও উঠে পড়লো–চলুন।

ছবির কাজ শুরু হলো।

ক্যামেরাম্যান অনন্ত বাবু ক্যামেরার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

সেনাপতি জয় সিংহের ভূমিকায় ভিলেন বিশু সেন ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে আসছে। পাশে রাজা পরশ রায়ের ভূমিকায় দেব শর্মা।

পরিচালক নাহার চৌধুরী চীৎকার করে বললেন-ক্যামেরা। সঙ্গে সঙ্গে দেব শর্মা ও বিশু সেন ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো।

ক্যামেরা ঘোড়াসহ দেবশর্মা ও জয়সিংকে ধরে নিয়ে পেছনে সরতে লাগলো।

জয়সিংবেশি বিশু সেন এবার ঘোড়াসহ ক্যামরার সামনে এসে, দাঁড়িয়ে পড়লো। পাশে দেবশর্মা।

নাহার চৌধুরী এতক্ষণ স্ক্রিপট ধরে তাকিয়ে ছিলেন জয় সিং ও দেবশর্মার দিকে।

এবার উচ্চকণ্ঠে বললেন-কাট।

অনন্তবাবু ক্যামেরা থেকে সরে দাঁড়ালেন, বললেন-গুড শট হয়েছে।

পরবর্তী দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন নাহার চৌধুরী।

এবারের দৃশ্যে থাকবে হিরো মাসুদের ভূমিকার মিঃ চৌধুরীবেশি দস্যু বনহুর। রত্নাদেবীর ভূমিকায় জ্যোছনা রায়। রাজা পরশ রায়ের ভূমিকায় আহম্মদ আলী এবং সেনাপতি জয় সিংয়ের চরিত্রে বিশু সেন। সহনায়িকা নাসিমা বানু থাকবে জ্যোছন রায়ের সঙ্গে। নাসরিনের ভূমিকায় অভিনয় করছে নাসিমা বানু। মাসুদের পিতা মাহমুদের চরিত্রে থাকবেন আসগর হোসেন। অদুরে পাশাপাশি কয়েকটা তাবু পড়েছে।

তাবুর অদুরে একটা খাটিয়ার বসে রাজা পরশ রায় ও জয়সিং। একটা মোড়ার মত বসবার আসনে বসে মাহমুদ। তিনজনের মধ্যে আলাপ হচ্ছে।

ক্যামেরা তাদের ধরে নিয়ে এগুলো।

পরিচালক উচ্চকণ্ঠে বললেন-কাট।

এবার ক্যামেরা এলো তাবুর মুখে, জ্যোছনা রায় ও নাসিমা বানু বেরিয়ে এলো বাইরে। উভয়ে উভয়ের মুখে তাকিয়ে হাসছে। জয়সিং ইঙ্গিত করলো রাজা পরশ রায়কে।

রাজা পরশ রায় আর জয়সিং তাকিয়ে আছে ওদিকে।

পেছনে এসে দাঁড়ালো মাসুদ–কি দেখছেন?

চমকে একসঙ্গে ফিরে তাকালো রাজা পরশ রায় আর জয়সিং।

জ্যোছনা রায় আর নাসিমা বানুর মুখ থেকে ক্যামেরা এসে পড়লো রাজা পরশ রায় আর রাজা জয় সিংয়ের ওপর।

পরিচালক বললেন-কাট।

শটের পর শট গ্রহণ চললো।

সন্ধ্যা অবধি একটানা সুটিং চলার পর শেষ হলো পরিচালক নাহার চৌধুরীর কাজ।

কুন্তিবাঈ ইউনিট ফিরে চলার জন্য সবাই গাড়িতে উঠে বসলো।

এবারও সামনের গাড়িতে ড্রাইভ আসনের পাশে বসলো বনহুর আর। জ্যোছনা রায়।

পেছনের আসনে পরিচালক নাহার চৌধুরী, বিশু সেন ও আহম্মদ আলী।

ড্রাইভার গাড়িতে ষ্টার্ট দিতে যাবে ঠিক সে মুহূর্তে একটা সুতীক্ষ্ণধার ছোরা এসে বিধে গেলো খচ করে জ্যোছনা রায়ের কাঁধের পাশ ঘেষে ড্রাইভারের পিঠে।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে ড্রাইভার উবু হয়ে পড়ে গেলো গাড়ির হ্যাণ্ডেলের ওপর।

মুহূর্তে এতবড় একটা অঘটন ঘটে গেলো।

পেছনে আসনের দরজা খুলে ব্যস্তভাবে নেমে পড়লেন নাহার চৌধুরী ও তাহার সহকর্মিগণ।

বনহুর ততক্ষণে ছোরাখানা ড্রাইভারের পিঠ থেকে তুলে নিয়েছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে।

কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড।

কোন দিক থেকে ছোরাটা এলো–কেন ছোরা মারা হয়েছে, কে মেরেছে–হই হই পড়ে গেলো গোটা ইউনিটে।

কিন্তু কেউ এর সঠিক জবাব খুঁজে পেলো না।

তবে এটা স্পষ্ট বুঝা গেলো-যেখান থেকেই ছোরাটা এসে থাকুক বা যেই মেরে থাকুক জ্যোছনা রায়কে উদ্দেশ্য করেই ছোরাটা নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো। ছোরাটা তার দেহে না লেগে গেঁথে গিয়েছে ড্রাইভারের পিঠে।

জ্যোছনা রায়কে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই যে ছোরাখানা নিক্ষেপ করা হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

যেদিক থেকে ছোরাখানা এসেছিলো সেদিকে অনেক সন্ধান করা হলো কিন্তু কারও খোজ পাওয়া গেলো না।

হঠাৎ এই দুর্ঘটনার জন্য গোটা ইউনিট চিন্তিত এবং ব্যথিত হয়ে পড়লো। নাহার চৌধুরী একেবারে বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। এত বড় একটা ঘটনা কম কথা নয়।

সেদিনের পর থেকে জ্যোছনা রায় ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো। জীবনের মায়া কার না আছে। জ্যোছনা রায়ের সম্পূর্ণ সন্দেহ ছোরা নিক্ষেপকারী অন্য কেউ নয়-অরুণ বাবু।

কথাটা এক সময় বললো জ্যোছনা রায় বনহুরকে-মিঃ চৌধুরী, আপনি যাই বলুন, আমাকে লক্ষ্য করে ছোরা নিক্ষেপ করেছিলো অরুণ বাবু।

হেসে বললো বনহুর-সেই যে ছোরা নিক্ষেপ করেছিলো তার প্রমাণ কি?

সুটিংয়ে যাবার পূর্বে সে আমাকে মৃত্যুভয়ে ভীত করতে চেষ্টা করেছিলো।

বনহুর বললো আবার-সত্যি যদি অরুণ বাবু আপনাকে ভালবেসে থাকে মিস রায়, তাহলে সে আপনাকে যতই মৃত্যুভয় দেখাক আসলে আপনাকে হত্যা করতে পারবে না।

মিঃ চৌধুরী, আপনার কথায় সাহস পাচ্ছি না, কিন্তু একটু থেমে বললো জ্যোছনা রায়-মিঃ চৌধুরী, ভালবাসা কোনোদিন জোর করে আদায় করা যায় না। অরুণ কুমারকে আমি কোনোদিন ভালবাসতে পারবো না।

তার অপরাধ?

অপরাধ তার কিছু নেই। একদিন বলেছি-মনের ওপর কারও হাত নেই।

নিহত ড্রাইভারকে ট্রাকে উঠিয়ে নিয়ে আবার কুন্তিবাঈ ইউনিট শহর অভিমুখে রওয়ানা দিলো।

এবার জ্যোছনা রায়কে গাড়ির মাঝখানে বসিয়ে নেয়া হলো। নাহার চৌধুরীর দুশ্চিন্তার অন্ত নেই, জ্যোছনা রায় নিহত হলে শুধু চিত্রজগতেরই ক্ষতি হবে না, তিন লাখ টাকা ব্যয়ে কুন্তিবাঈ ছবিটাও সমুলে বিনষ্ট হবে। ছবির তিন ভাগ কাজ শেষ হয়ে গেছে, এখন এক ভাগ কাজ বাকী।

পথে আর কোনো বিপদ হলো না সত্য, কিন্তু সকলের মুখোভাব মলিন বিষণ্ন, কারও মুখে কোনো কথা নেই।

ব্যাপারটা যখন প্রযোজক আরফান উল্লাহর কানে গেলো তখন তিনি একেবারে যেন ভেঙ্গে পড়লেন। একে তার বহু সোনা মধুগঙ্গার বুকে সমাধিস্থ হয়েছে তারপর তার ছবির নায়িকার ওপর এই অদ্ভুত হামলা আরফান উল্লাহকে একেবারে ভাবিয়ে তুললো।

কে এমন ব্যক্তি তার পিছু লেগেছে যে তার সর্বান্তকরণে অমঙ্গল চায়। তাকে সর্বস্বান্ত করেই সে খুশি নয়, তাঁর ছবিটাকেও সমুলে নষ্ট করতে চায়?

কিন্তু অনেক ভেবেও কোনো সন্দিগ্ধজনের সন্ধান আরফান উল্লাহ পেলেন না।

মিস রায়, এ কথা আমিও জানি। কথাটা বলে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে গেলো বনহুর।

জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে ড্রইংরুমে কথা হচ্ছিলো বনহুরের।

এমন সময় বাইরে মোটরের শব্দ হয়।

ইয়াসিন এসে জানায়-স্যার, আপামনি আইসেছেন।

বনহুর স্বকণ্ঠে বলে-আসতে বলল।

চলে যায় ইয়াসিন।

আতিয়ার আগমনের খবর শুনে জ্যোছনা রায় বেশ চঞ্চল হয়ে উঠলো মুহূর্তে তার মুখমণ্ডলে একটা উৎকণ্ঠার ভাব ফুটে উঠলো।

বনহুরের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে গেলো, যদিও জ্যোছনা রায় বনহুরের কাছে নিজের উদ্বেগ গোপন করবার চেষ্টা করছিলো।

কিন্তু বেশিক্ষণ ভাববার সময় পেলো না বনহুর, কক্ষে প্রবেশ করলো আতিয়া।

বনহুর উঠে দাঁড়িয়ে আতিয়াকে সাদর সম্ভাষণ জানালো-হ্যালো মিস আতিয়া।

গুড ইভনিং মিঃ চৌধুরী–আতিয়ার কথা শেষ হয় না, জ্যোছনা রায়ের ওপর দৃষ্টি পড়তেই তার মুখোভাব কঠিন হয়ে উঠলো।

জ্যোছনা রায় জড়োসড়োভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুর একবার জ্যোছনা রায় ও আতিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো, বললো-বসুন মিস আতিয়া।

আসন গ্রহণ করলো আতিয়া। তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে ক্রুদ্ধ ভাব।

জ্যোছনা রায় বললো এবার-চলি মিঃ চৌধুরী।

আতিয়াই জবাব দিলো জ্যোছনা রায়ের কথায়–যাবেন কেন, বসুন।

কথাটা স্বাভাবিক হলেও আতিয়ার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক শোনালো। কেমন যেন বেসুরো লাগলো বনহুরের কাছে।

জ্যোছনা রায় বসে পড়লো।

আতিয়া বললো আবার মিস জ্যোছনা, আপনার কাজ স্টুডিওতে, এখানে নয়। আমি শুনেছি, আপনি নাকি প্রায়ই এখানে আসেন, কিন্তু কেন, জানতে পারি কি? তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো আতিয়া জ্যোছনা রায়ের মুখের দিকে।

জ্যোছনা রায় শিক্ষিতা আধুনিকা তরুণী। আতিয়ার পিতার অর্থের বিনিময়ে কাজ করলেও সে কাউকে ভয় করে না। ভয় করে সে আত্মমর্যাদার হানি হওয়াকে।

আতিয়ার কথায় জ্যোছনা রায়ের মুখমণ্ডল কালো হয়ে উঠলো, অধর দংশন করতে লাগলো সে।

বনহুর কোনো কথা না বলে উভয়ের মুখোভাব লক্ষ্য করছিলো।

আতিয়ার প্রশ্নের জবাবে বললো জ্যোছনা রায়-মিস আতিয়া আপনি ভুল করছেন। আপনাদের ছবিতে কাজ করি বলেই স্টুডিওর বাইরে যাওয়া আমার মানা নেই।

বোমার মতই ফেটে পড়ে আতিয়া-এত সাহস আপনার মিস জ্যোছনা। জানেন আমি যা খুশি তাই করতে পারি?

যা খুশি তাই করতে পারলেও আমার জীবনপথে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন না-এটাও আমি জানি।

মিস জ্যোছনা, এত বড় কথা আমার মুখের ওপর বলতে সাহস হলো আপনার!

আপনার আপত্তিজনক কথাগুলোই আমাকে বলতে সাহসী ও বাধ্য করেছে।

মিস জ্যোছনা, মনে রাখবেন এটা আমার বাড়ি–

এবার যেন জ্যোছনা রায়ের চেহারা কেমন বিমর্ষ দেখালো। নিজের অলক্ষ্যে দৃষ্টি চলে গেলো বনহুরের মুখের দিকে।

আতিয়া বললো-এর পর আর কোনোদিন যেন এ বাড়িতে আপনাকে না দেখি।

আতিয়ার কথা শেষ হয় না, বনহুর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো–মিস আতিয়া, এ বাড়ি এখন আমার! এ বাড়িতে কাউকে আসতে নিষেধ করলে তা আমিই করবো, আপনি নন।

আতিয়া ভীষণ ক্রোধভরে উঠে দাঁড়ালো–মিঃ চৌধুরী, আপনি-আপনি এত বড় কথা–

হাঁ, আমাকে যখন আপনি এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন তখন মিস রায়কেও দিতে পারবেন, তার পূর্বে নয়।

আতিয়ার কুৎসিত মুখমণ্ডল আরও কুৎসিত হয়ে উঠলো। যেন একটা মাটির পাতিলের তলা। একবার বনহুর আর একবার জ্যোছনা রায়ের মুখে তাকিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলো সে কক্ষ থেকে।

হঠাৎ যেন প্রচণ্ড একটা দমকা হাওয়ায় কক্ষের বাতিগুলো দপ্ করে নিভে গেলো মুহূর্তে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো বনহুর আর জ্যোছনা রায়।

জ্যোছনা রায়ই প্রথমে কথা বললো-মিঃ চৌধুরী, আমার জন্য কেন আপনি নিজের অমঙ্গল ডেকে আনলেন।

হঠাৎ অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো বনহুর-হাঃ হাঃ হাঃ–হাঃ হাঃ হাঃ–হাঃ হাঃ হাঃ–

হাসি যেন থামতে চায় না বনহুরের।

জ্যোছনা রায় হতবাক স্তম্ভিত হয়ে পড়লো, তাকিয়ে রইলো সে কিংকর্তব্যবিমূঢ়র মত। এমন হাসি সে কোনোদিন শোনেনি।

হাসি থামিয়ে বললো বনহুর-অমঙ্গল। আমাকে এ বাড়ি ছাড়তে হবে, এইতো? মিস রায়, আপনি মনে রাখবেন-যতক্ষণ কুন্তিবাঈ ছবি শেষ না হবে ততদিন শুধু আমাকেই নয়, এ বাড়ি থেকে আপনাকেও তাড়াতে সক্ষম। হবে না আতিয়া।

আপনি জানেন না মিঃ চৌধুরী আতিয়া কত ভয়ঙ্কর মেয়ে! ভয়ঙ্কর তার চেহারা, কিন্তু মনটা সত্যি ভয়ঙ্কর নয়। আজকের ঘটনার পরও আপনি ওর সম্বন্ধে এমন উক্তি করতে পারলেন মিঃ চৌধুরী,

মিস আতিয়ার আসল রূপ আমি দেখেছি মিস রায়, মুখে বললেও সত্যি সে হৃদয়হীনা নয়।

জ্যোছনা রায় গম্ভীর হলো।

বনহুর বললো-চলুন কোথাও বেড়াতে যাওয়া যাক।

মন ভাল নেই, আজ থাক।

মন ভাল নেই বলেই তো যাবো। উঠুন মিস রায়।

জ্যোছনা রায় এবার আর কোনো আপত্তি করতে পারলো না।

বনহুর সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে কক্ষের বাইরে বেরুলো।

জ্যোছনা রায় অনুসরণ করলো তাকে।

আরফান উল্লাহ বিশ্রামকক্ষে বসে কি যেন একটা হিসাব নিকাশ করছিলেন। মনের অবস্থা খুব ভাল নয়। এ মাসে তার সবদিকে প্রচুর লোকসান গেছে।

আজও একটা গোপন ব্যবসার হিসেব দেখছিলেন আরফান উল্লাহ।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করলো আতিয়া। চোখেমুখে তার ক্রুদ্ধভাব ফটে উঠেছে।

কন্যার পদশব্দে চোখ তুলে তাকালেন আরফান উল্লাহ, বললেন–আতিয়া, খবর কি মা?

আব্বা, তুমি আমার সম্মান চাও, না অর্থ চাও?

একি কথা একি কথা বলছো মা?

সত্যি কথা!

কি হয়েছে বলো? বললেন আরফান উল্লাহ।

রাগত কণ্ঠে বললো আতিয়া–মিঃ চৌধুরী আমাকে অপমান করেছেন।

মিঃ চৌধুরী তোমাকে অপমান করেছেন, বলো কি!

হাঁ, কিন্তু আসলে তার কোনো দোষ নেই।

মানে? ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালেন আরফান উল্লাহ কন্যার মুখের দিকে।

আতিয়া পিতার পাশের সোফায় ধপ করে বসে পড়ে বললো-জ্যোছনা রায়ের কারণেই মিঃ চৌধুরী আমাকে অপমান করলেন।

একটা অদ্ভুত হাসির রেখা ফুটে উঠলো আরফান উল্লাহর মুখে, বললেন-মিস রায়?

হাঁ, আব্বা, আমি আরও লক্ষ্য করেছি-সুটিংয়ের পর প্রায়ই সে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে বাইরে যায়, এটা কিন্তু ভারী অন্যায়। আব্বা তুমি বলেছো মিঃ চৌধুরীকে তুমি–ভাবী জামাতা–

হাঁ, তাকেই আমি জামাতা করবো, এটা ঠিক। শুধু জামাতা নয়, মিঃ চৌধুরীকে আমার ছবির কাজের জন্য চিরদিনের জন্য আটকে রাখবো, এও ঠিক–

আর যদি মিস জ্যোছনা রায়–

হেঃ হেঃ হেঃ জ্যোছনা রায়! জ্যোছনা রায় আমার কাজে বাদ সাধবে। লক্ষ জ্যোছনা রায় এলেও আমার কাজে বা আমার ইচ্ছায় বাধা দিতে পারবে না। মিঃ চৌধুরীকে আমি জামাতা করবোই।

কিন্তু আব্বা—

না, রাগ বা অভিমান নয়। মিঃ চৌধুরী যাতে ক্ষুন্ন না হয়, তাই করবে আতিয়া।

আমি সেখান থেকে রাগ করে চলে এসেছি।

তাতে কি আছে, আবার যাবে।

এতে আমার সম্মানে বাধবে না?

স্বার্থের জন্য সম্মানবোধ বিসর্জন দিতে হবে মা! তুমি গিয়ে মিঃ চৌধুরীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে।

তা আমি পারবো না আব্বা।

পারতে হবে মা, পারতে হবে।

তুমি আমার সঙ্গে যাবে আব্বা?

বেশ, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

সেদিন সুটিং শেষ করে বনহুর আর জ্যোছনা রায় স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এলো বাইরে। ঐ দুর্ঘটনার পর জ্যোছনা রায়ের মা বাসন্তী দেবী পরিচালক নাহার

চৌধুরীকে ডেকে বলেছিলেন-দেখুন, আমাদের একমাত্র কন্যার কোনো কিছু যেন না হয়।

আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন নাহার চৌধুরী-আপনারা নিশ্চিন্ত থাকবেন, জ্যোছনা রায়ের দায়িত্বভার আমি গ্রহণ করছি। ছবি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি নিজে তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাবো। আমার কোনো অসুবিধা থাকলে প্রযোজক মিঃ আরফান উল্লাহ নিজে পৌঁছে দেবেন।

কিন্তু জ্যোছনা রায় তার পৌঁছানোর দায়িত্বটা স্বেচ্ছায় তুলে দিয়েছিলো মিঃ চৌধুরীর ওপর। অনুরোধ করে বলেছিলো সে–মিঃ চৌধুরী, আমাদের বাসার পথ হয়েই আপনাকে ফিরতে হয়। আমাকে একটু পৌঁছে দিয়ে যাবেন রোজ। একথাও বলেছিলো জ্যোছনা রায়-কারও কাজ আগে হয়ে গেলে আমরা উভয়ে উভয়ের জন্য অপেক্ষা করবো, কেমন?

বনহুর হেসে জবাব দিয়েছিলো-আচ্ছা; কিন্তু যেদিন আমার কাজ একেবারেই থাকবে না সেদিন?

জ্যোছনা রায় চিন্তিতভাবে বলেছিলো-সেদিন অগত্যা বেছে নেবো একজনকে। নাহার চৌধুরী কিংবা মিঃ আরফান উল্লাহর গাড়িতে ফিরবো।

এমন সময় নাহার চৌধুরী এসেছিলেন সেখানে। পকেট থেকে কপালের ঘাম মুছে রুমালখানা পকেটে রাখতে রাখতে বলেছিলেন-আমরা দুজনে অগত্যা, কেমন?

একসঙ্গে চমকে উঠছিলো বনহুর আর জ্যোছনা।

জ্যোছনা রায়ের কথাগুলো তাহলে শুনে ফেলেছেন নাহার চৌধুরী।

জ্যোছনা রায় লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলো যেন। নাহার চৌধুরী হেসে বললেন-তবু যে আমাদের গাড়িতে যেতে চাইলেন এটাও আমাদের কম সৌভাগ্য নয় মিস রায়।

সে কথাও অবশ্য মিথ্যা নয়। তখন চলচ্চিত্র জগতে নায়িকা হিসেবে জ্যোছনা রায় সর্বশ্রেষ্ঠ। জ্যোছনা রায়ের বিপরীতে কাজ করার জন্য সবগুলো নায়ক অতি আগ্রহান্বিত!

কিছুদিন আগে একসঙ্গে বেশ কয়েকখানা ছবিতে জ্যোছনা রায়কে কাজ করতে হয়েছে। বিভিন্ন ছবির হিরো ছিলো বিভিন্ন জন। অনেকগুলো নায়কের বিপরীতে নায়িকার চরিত্রে কাজ করেছে সে।

কিন্তু ইদানীং জ্যোছনা রায় কুন্তিবাঈ ছবি ছাড়া কোনো ছবিতে অভিনয় করছে না। তার কারণ, আরফান উল্লাহ্ তার ছবির নায়িকাকে অন্য ছবিতে কাজ করতে দিতে রাজী নন, অবশ্য এজন্য আরফান উল্লাহ জ্যোছনা রায়কে মোটা টাকা দিয়েছিলেন।

কুন্তিবাঈ ছবি করাকালীন বহু ছবিতে অভিনয় করতে জ্যোছনা রায়ের ডাক এসেছে, কিন্তু জ্যোছনা রায় নিরুপায়-কুন্তিবাঈ ছবি শেষ না হলে কোনো ছবিতে সে কাজ করতে পারবে না।

বহু ছবির হিরো গোপনে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেছে। অনেকে প্রকাশ্যে বলেছে জ্যোছনা রায় ছাড়া তার নাকি মুড আসে না।

জ্যোছনা রায়ের প্রতীক্ষায় অনেক প্রযোজক দিন গুণছেন, কুস্তিবাঈ শেষ হলে ছবির কাজ শুরু করবেন না।

জ্যোছনা রায়কে পেয়ে কে না ধন্য হবে বলুন? এবারও বললেন নাহার চৌধুরী।

হাসলো বনহুর।

কিন্তু জ্যোছনা রায় মিঃ চৌধুরী ছাড়া কারও গাড়িতেই ফিরতে চায় না। এটা যেন তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

বনহুর কোনো আপত্তি করতে পারে না।

সেদিন স্টুডিও থেকে বেরিয়ে বনহুর আর জ্যোছনা রায় পাশাপাশি গাড়ির। দিকে এগুচ্ছিলো।

উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন কথা নিয়ে হাসাহাসি করছিলো।

পেছন থেকে ডাকলেন নাহার চৌধুরী-মিস রায়! থমকে দাঁড়িয়ে পেছনে ফিরে তাকালো জ্যোছনা রায় এবং বনহুর।

নাহার চৌধুরী এগিয়ে এলেন-আংগুলের ফাঁকে ধুমায়িত অর্ধ দগ্ধ সিগারেট।

জ্যোছনা রায় এবং বনহুরকে লক্ষ্য করে বললেন নাহার চৌধুরী–আপনাদের কাজ তো হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, আমাদের কাজ হয়ে গেছে। বললো জ্যোছনা রায়।

নাহার চৌধুরী হস্তস্থিত অর্ধগ্ধ সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সিগারেটের টুকরাটা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে ফেললেন। তারপর বললেন-মিস রায়, আপনার সঙ্গে কথা আছে।

জ্যোছনা তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

নাহার চৌধুরী হেসে বললেন-আজ না হয় আমার সঙ্গেই যাবেন।

বনহুর বললো–মিস রায়, তাই যাবেন। তাছাড়া আজ একটু আমাকে অন্য পথে ফিরতে হচ্ছে।

জ্যোছনা রায়, কোনো কথা বললো না।

বনহুর জ্যোছনা রায় ও নাহার চৌধুরীকে লক্ষ্য করে বললো–গুডবাই।

জ্যোছনা রায় অস্ফুট কণ্ঠে বললো–গুডবাই।

নাহার চৌধুরী বললেন-আসুন মিস রায়।

জ্যোছনা রায় নাহার চৌধুরীকে অনুসরণ করলো।

স্টুডিওর বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করলেন নাহার চৌধুরী।

পেছনে জ্যোছনা রায়।

বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করে চমকে উঠলো জ্যোছনা রায়, কক্ষে একটা সোফায় বসে আছে আতিয়া, দুচোখে তার আগুন ঠিকরে পড়ছে যেন।

জ্যোছনা রায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। তাকালো সে নাহার চৌধুরীর মুখের দিকে।

কথা বললেন নাহার চৌধুরী প্রথমে-মিস রায়, আপনি জানেন কুন্তিবাঈ ছবির নায়িকার চরিত্রে কাজ করছেন আপনি, আর নায়কের চরিত্রে কাজ করছেন মিঃ চৌধুরী।

বলুন! রাগতকণ্ঠে বললো জ্যোছনা রায়।

নাহার চৌধুরী এবার ভূমিকা ত্যাগ করে বললেন-ছবির নায়ক এবং নায়িকা সম্পর্ক আপনার আর মিঃ চৌধুরীর মধ্যে। বলুন সত্য কি না?

হাঁ।

মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে ছবির কাজ ছাড়া আপনার মেলামেশা অত্যন্ত অসন্তোষজনক। আমরা চাই না আপনি তাঁর সঙ্গে বাড়ি ফেরেন বা মেশেন।

জ্যোছনা রায় ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলো-আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি কারও কথা শুনতে রাজী নই। জ্যোছনা রায় কথাটা শেষ করে দ্রুত বেরিয়ে গেলো।

নাহার চৌধুরী তাকালেন আতিয়ার মুখের দিকে।

আতিয়া কুদ্ধ নাগিনীর মত ফোঁস ফোঁস করছে।

হেসে বললেন নাহার চৌধুরী-দেখুন মিস আতিয়া, ছবি শেষ না হওয়া পর্যন্ত মিস জ্যোছনা রায়কে কঠিনভাবে কিছু না বলাই ভাল। তা ছাড়া আজ তাকে কথাটা অমনভাবে বলা উচিত হয়নি, যদিও আমিই বলেছি–

কি উচিত কি অনুচিত আমি জানি মিঃ নাহার। কথাটা বলে বেরিয়ে গেলো আতিয়া।

নাহার চৌধুরী হাসলেন আপন মনে।

বাসায় ফিরে জ্যোছনা রায় নিজের ঘরে গিয়ে শয্যায় শুয়ে পড়লো। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো সে।

তার মা মেয়েকে কাঁদতে দেখে ব্যস্ত, উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। একমাত্র কন্যাই তাঁদের সম্বল, আশা-ভরসা সব। সংসারে এমন অভাব নেই যার জন্য জ্যোছনা রায়কে চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে হচ্ছে। অভিনয় জ্যোছনার পেশা নয়-নেশা।

যদিও পিতামাতার ইচ্ছা ছিলো না তবু কন্যার জিদেই বাধ্য হয়ে তারা কন্যাকে মত দিয়েছিলেন অভিনয়ে।

জ্যোছনা অল্পদিনেই শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

কন্যার কৃতিত্বে জননীর মন ভরে উঠেছে। একটা উজ্জ্বল আশার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন তাকে মোহগ্রস্ত করে তুলেছে। তিনি সব সময় ওর মঙ্গল কামনা করেন।

কন্যাকে স্টুডিও থেকে বিষণ্ন মুখে ফিরে বিছানায় লুটিয়ে পড়তে দেখে মায়ের প্রাণ আশঙ্কিত হলো, ব্যাকুলভাবে ছুটে এলেন তিনি কন্যার পাশে। পিঠে হাত রেখে ডাকলেন-জ্যোছনা, মা-কি হয়েছে তোর?

মায়ের স্নেহভরা কথায় জ্যোছনার মন আরও আকুলভাবে কেদে উঠলো। অনেকক্ষণ মায়ের কোলে মাথা রেখে কাঁদলো জ্যোছনা রায়।

মা নীরব রইলেন কিছুক্ষণ, ভাবলেন কেঁদে মেয়ে কিছুটা শান্ত হয়েনিক। এবার জিজ্ঞাসা করলেন-মা, কি হয়েছে তোর?

জ্যোছনা রায় মুখ তুলে তাকালো মায়ের দিকে-মা, তুমি জানো আমি মিঃ চৌধুরীকে ভালবাসি। তিনি সত্যিই একজন মহৎ ব্যক্তি—

মায়ের কোলে মাথা রেখে যখন জ্যোছনা রায় কথাগুলো বলছিলো ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর দরজার বাইরে এসে থমকে দাঁড়ালো। তার কানে ভেসে এলো জ্যোছনা রায়ের কথাগুলো। বনহুর স্টুডিওতে লক্ষ্য করেছিলোজ্যোছনা রায়কে পরিচালক নাহার চৌধুরী ডেকে নিয়ে যাবার সময় তার মুখোভাব খুব প্রসন্ন ছিলো না, হঠাৎ জ্যোছনাকে এভাবে ডেকে নিয়ে যাবার কারণ কি থাকতে পারে– বনহুরকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছিলো ব্যাপারটা। তাই সে জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে এসেছে দেখা করতে–কেন তাকে নাহার চৌধুরী ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন তা জানতে। যদিও এটা স্বাভাবিক ব্যাপার তবুও বনহুরের মনে হঠাৎ আজ কেন যেন একটা আশঙ্কা বারবার উঁকি দিচ্ছিলো বাসায় ফিরে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলো না বনহুর। কাজেই চলে এসেছে জ্যোছনার নিকট সব জানতে।

বনহুর পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলো জ্যোছনা রায়ের বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বর-মা, আমি তাকে ভালোবেসে কোনো ভুল করিনি। তার বাইরের সৌন্দর্যের চেয়েও ভেতরটা আরও সুন্দর যার তুলনা হয় না। এতটুকু কুৎসিত ইংগিত নেই তাঁর মধ্যে–মা, আমি জানি না কেন ওরা আমাকে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে মিশতে দিতে চায় না? কেন তারা আমাকে সন্দেহ করে–আজ আমাকে তার সঙ্গে এক গাড়িতে আসতে দিলো না, ডেকে নিয়ে গেলেন পরিচালক, কথা আছে নাকি আমার সঙ্গে। জানো মা, গিয়ে কি দেখলাম?

বিছানায় সোজা হয়ে বসলো জ্যোছনা রায়।

জ্যোছনার মা ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন-কি মা, কি দেখলি?

মা, সে অতি বিস্ময়কর দৃশ্য। নাহার চৌধুরীর সঙ্গে বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করে স্তম্ভিত হলাম। মিস আতিয়া বসে আছে, দুচোখে যেন তার আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

প্রযোজক আরফান উল্লাহর মেয়ে আতিয়া?

হাঁ মা।

কেন রে, কেন সে অমনভাবে সেখানে বসেছিলো?

সে কথাই তোমাকে বলছি মা, শোনো। মিস আতিয়া আমাকে দেখে অধর দংশন করতে লাগলো। আমাকে সে যে সহ্য করতে পারে না, এটা আমি জানতাম। কি করেছি, কেন আমাকে ডেকে আনা হলো সে কথাই আমি ভাবছিলাম। আমি মিস আতিয়ার মুখে তাকাতেই সে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলো। বললেন নাহার চৌধুরী-মিস জ্যোছনা রায়,আপনাকে কেন ডেকেছি শুনুন–মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ছবির সুটিং মুহূর্তে-তারপর নয়। ছবির কাজের বাইরে আপনাদের মেলামেশা সন্তোষজনক নয়। আমরা চাই না আপনি তাঁর সঙ্গে বাড়ি ফেরেন বা মেশেন–মা, বলো কি এমন অপরাধ করেছি যে, তাঁর সঙ্গে মিশতে পারবো না।

জ্যোছনা, আমি আগেই বলেছিলাম ওসব ভালো নয়, আজ বুঝতে পারছিস তো?

মা, আমি আর অভিনয় করবো না।

পাগলী মেয়ে, তা কি হয়।

কেন হবে না–সত্যি আমি আর অভিনয় করবো না।

এমন সময় পর্দা ঠেলে কক্ষে প্রবেশ করে বনহুর।

জ্যোছনার মা বলে ওঠেন–বাবা তুমি এসেছো?

আজকাল জ্যোছনার সঙ্গে প্রায়ই বনহুরকে এ বাড়িতে আসতে হতো, জ্যোছনার তা তাই তাকে তুমি বলেই সম্বোধন করতেন।

বনহুর একটা আসনে বসে পড়ে বললো-মিস রায় কখন এসেছেন?

এই তো কিছুক্ষণ হলো।

আমি জানতে এলাম উনি পৌঁছেছেন কিনা! চলি তাহলে?

না না, একটু বসো বাবা। বললেন জ্যোছনার মা। একটু থেমে পুনরায় বললেন-জানো, জ্যোছনা আর ছবিতে কাজ করতে রাজী নয়।

হাসলো বনহুর-মুখে রাজী নয় বলা সহজ, আসলে অতো সহজ নয়, কারণ উনি চুক্তিবদ্ধ বিশেষ করে কুন্তিবাঈ ছবি ওঁকে শেষ করতেই হবে, তারপর ইচ্ছা করলে অভিনয় থেকে সরে আসতে পারেন।

তাই ভালো হবে। তাই ভালো হবে বাবা।

এবার বললো জ্যোছনা রায়-কিন্তু তাদের কথা অনুযায়ী কাজ করতে রাজী নই আমি।

শান্তকণ্ঠে বললো বনহুর-এই তো সামান্য আর কিছুদিন। কৃত্তিবাঈ ছবির সুটিং শেষ হতে আর মাসখানেক লাগতে পারে–

হ্যাঁ, এরপর আমি আর কোনো ছবিতে কাজ করবো না।

বেশ, তাই হবে। জ্যোছনা রায়ের কথায় বললো বনহুর।

জ্যোছনার মা উঠে দাঁড়ালেন-বসো বাবা, তোমাদের জন্য একটু জলখাবার নিয়ে আসি।

না থাক। বললো বনহুর।

কিন্তু ততক্ষণ বেরিয়ে গেছেন জ্যোছনার মা।

জ্যোছনা রায় তাকিয়ে ছিলো বনহুরের দিকে। তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই বললো সে-মিঃ চৌধুরী, জানেন আমাকে আজ পরিচালক কেন তখন ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন? ছবির কাজের বাইরে আপনার সঙ্গে–

মিস রায়, আমি সব শুনেছি; আপনি যখন মায়ের কাছে বলছিলেন তখন দরজার বাইরে আমি দাঁড়িয়েছিলাম।

মিঃ চৌধুরী।

হাঁ মিস রায়, আপানি নাভাস হবেন না।

কিন্তু–থামলো জ্যোছনা।

বলুন?

কিন্তু আমার নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি কারও কথা শুনতে রাজী নই। ছবির কাজের বাইরে আমার ইচ্ছামত যা খুশি তাই করবো বা করতে পারি।

আচ্ছা, আমি পরিচালক নাহার চৌধুরীকে বলবো আপনার কথাটা।

তাকে নয়, আরফান উল্লাহকে বলবেন দয়া করে। একটু থেমে বললো জ্যোছনা রায়–জানি না, আতিয়া কেন আমাকে বারবার এমনভাবে অপমান করছে।

কুন্তিবাঈ ছবির পর সব শেষ হয়ে যাবে মিস রায়। কারণ, আতিয়ার যত আক্রোশ আমার ওপর।

আপনার ওপর!

হাঁ, আমার ওপর, আর তারই জের চলছে আপনার ওপর বুঝলেন?

জ্যোছনা রায় সরে এলো বনহুরের পাশে–মিঃ চৌধুরী, আমার মনে হয় মিস আতিয়া আপনাকে–

ভালবাসে এই তো বলতে চাইছেন?

হাঁ মিঃ চৌধুরী, নাহলে সে কিছুতেই আপনার পাশে আমাকে সহ্য করতে পারছে না কেন?–আপনি ঠিকই বলেছেন মিস রায়।

তবে কি–তবে কি আপনি–আপনি–

সঙ্গে সঙ্গে জ্যোছনা রায় দুহাতে মাথাটা টিপে ধরলো। তারপর স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকালো বনহুরের সুন্দর দীপ্ত মুখমণ্ডলে।

বনহুরও তাকিয়ে আছে।

জ্যোছনা রায়ের শরীর যেন টলছে-পড়ে যাবে এই মুহূর্তে।

বনহুর এগিয়ে এসে ওকে ধরে ফেললো।

জ্যোছনা রায় বনহুরের কাধে মাথা রাখলো, কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বের হলো না।

বনহুর পুনরায় বললো-মিস রায়? আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?

হাঁ, আমাকে শুইয়ে দিন।

বনহুর জ্যোছনা রায়কে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে বললো-মিস রায়, আপনি ঘুমান, আমি চললাম।

জ্যোছনা কোনো জবাব দিলো না। বনহুর লঘু পদক্ষেপে কক্ষ ত্যাগ করলো।

পরমুহূর্ত কক্ষে প্রবেশ করলেন জ্যোছনার মা, হাতে তার জল খাবারের ট্রে। অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন-সে কই জ্যোছনা?

চলে গেছে।

চলে গেছে! বলিস কি, আমি জলখাবার আনতে গেলাম।

কেন গেলো মা? তুমি জানো না–মিঃ চৌধুরীর মনও পাল্টে গেছে। আমি বড় হতভাগি–দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো জ্যোছনা রায়।

জ্যোছনার মা হতবাক স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, কন্যার বুকের ব্যথা মায়ের অন্তরেও আঘাত করলো।

০৩.

বনহুরের অন্তর্ধানের পর আস্তানায় একটা বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে সত্য, কিন্তু তাই বলে এতগুলো অনুচর একেবারে চুপচাপ বসে থাকতে পারে না।

সর্দারের অনুপস্থিতিতে রহমান তার অনুচরগণকে পরিচালনা করছে বটে কিন্তু বনহুরের অভাব তারা সব সময় অনুভব করছে। বিশেষ করে অশ্ব তাজ একেবারে জীর্ণশির্ণ হয়ে পড়েছে। বনহুর নিজে ওকে ছোলা, ঘাস খাওয়াতে, গা নেড়ে আদর করতো। তাজ সবচেয়ে বেশি প্রিয় দস্যু বনহুরের।

আজ কতদিন মনিবের স্পর্শ পায়নি তাজ, সে একেবারে ঝিমিয়ে পড়েছে।

রহমানের মনের অবস্থাও তাই; কতকটা তাজের মতোই। কিন্তু, তাজ পশু আর রহমান মানুষ। মনকে শক্ত করে নিয়েছে রহমান, ভেঙ্গে পড়লে তার চলবে না। সর্দারের এত পরিশ্রমে গড়া আস্তানা নষ্ট হতে দেবে না সে।

রহমান শুধু আস্তানাই ঠিক রাখেনি, মাঝে মাঝে শহরে গিয়ে সর্দার গৃহিণীর সন্ধানও জেনে আসে।

একদিন মনিরা দোতলার রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ তার নজর চলে গেলো সামনের বাগানে। বাগানে খেলা করছিলো নূর। অদূরে একটা পাথরাসনে বসে নূরকে খেলা দিচ্ছিলেন বৃদ্ধা সরকার সাহেব।

একটা বল নিয়ে ছুটাছুটি করছিলো নূর। বৃদ্ধ সরকার সাহেব হাসছিলেন।

হঠাৎ মনিরা লক্ষ্য করলো-বাগানের মধ্যে হাস্নাহেনা ঝোপের আড়ালে গালপাট্টা বাঁধা একটা লোক উঁকিঝুকি মারছে। লোকটার বলিষ্ঠ চেহারা, দীর্ঘ দেহ।

সন্দেহ হলো মনিরার।

কে এই লোক, কি এর উদ্দেশ্য, কেনই বা অমনভাবে উকিঝুঁকি মারছে? উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই মহৎ নয় কিন্তু কি উদ্দেশ্য ওর? নূরকে চুরি করতে এসেছে নিশ্চয়ই–মনিরা দ্রত কক্ষে প্রবেশ করে বন্দুকটা বের করে গুলি ভরে নিলো। তারপর ফিরে এসে দাঁড়ালো পূর্বের সেই স্থানে যেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নূর এবং সরকার সাহেবকে।

কিন্তু সরকার সাহেব কই, একটু পূর্বেই সরকার সাহেবকে যে স্থানে বসে থাকতে দেখেছিলো মনিরা সেখানে তিনি নেই।

অবশ্য সরকার সাহেব ঠিক সেই দণ্ডে কোনো একটা কাজে বাগানের গেটে গিয়েছেন, এক্ষুণি ফিরে আসবেন তিনি।

মনিরা চমকে উঠলো, নূর কোথায়, কিন্তু পরক্ষণেই বিষ্ময়ে স্তম্ভিত হলো, গালপাট্টা বাঁধা লোকটা নূরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে নূরকে আদর করছে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে মনিরা বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

এক সেকেণ্ড–তাহলেই লোকটার বুকে গিয়ে বিদ্ধ হবে মনিরার বন্দুকের গুলী, কিন্তু ছুড়তে পারছে না-কারণ লোকটার কোলে তখন নূর।

মনিরার নিঃশ্বাস দ্রুত বইছে। লোকটা নিশ্চয়ই নুরকে চুরি করতে এসেছে। কিন্তু আজ মনিরা কিছুতেই শয়তানটাকে ক্ষমা করবে না।

লোকটা নূরকে তখনও আদর করছে। মাঝে মাঝে সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক।

মনিরা অধর দংশন করছে। শয়তানটা তার নুরকে নিয়ে পালাবে এবার মনে হচ্ছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! লোকটা নূরকে আদর করে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এবার লোকটা চলে গেলো ঝোপটার আড়ালে। বারকয়েক লুকিয়ে ঝুকে দেখলো নূরকে, তারপর চলে গেলো সেখান থেকে বাগানের বেড়া টপকে ওপারে।

মনিরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। বন্দুকসহ হাতখানা নামিয়ে নিলো নীচে।

সরকার সাহেব ততক্ষণে এসে পড়েছেন নুরের পাশে। মনিরা ফিরে এলো নিজের কক্ষে, ভাবতে লাগলো–কে এই লোকটা? কি উদ্দেশ্যে সে এখানে এসেছিলো? নূরকে অমন করে আদর করলোই বা কেন?

মনিরা ভাবছে, কিন্তু ভেবে ভেবে কোনো জবাব খুঁজে পেলো না।

এমন সময় নূর বল হাতে ছুটে এলো মনিরার পাশে। সরকার সাহেব পেছনে পেছনে এসে দাঁড়ালেন সেখানে।

মনিরা তখনও সেই চিন্তা করছিলো। নূর আর সরকার সাহেবকে দেখে বললো সে-আপনারা এসেছেন!

সরকার সাহেব বললেন-নূরের খেলা শেষ হয়েছে মা মণি!

নূর জড়িয়ে ধরলো মনিরাকে–আম্মা, জানো একটা লোক আমাকে আদর করলো–

মনিরা বললো এবার সরকার সাহেবকে লক্ষ্য করে-সরকার চাচা, আপনি নূরকে ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলেন?

কেন মা?

আপনি যখন বাগান থেকে সরে গিয়েছিলেন তখন একটা গাল-পাট্টা বাঁধা লোক নূরকে কোলে নিয়ে আদর করছিলো–

তারপর? তারপর মা?

তারপর আমি তো মনে করলাম নিশ্চয়ই কোনো দুষ্ট লোক নূরকে চুরি করতে এসেছে। কারণ, আমি রেলিংয়ের ধারে তখন দাঁড়িয়েছিলাম। লোকটার সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে আমি ছুটে এসে বন্দুকটা বের করে গিয়ে দাঁড়ালাম, যদি নূরকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করে তাহলে শেষ করে দেব। কিন্তু আশ্চর্য, লোকটা নূরকে আদর করে পুনরায় নামিয়ে দিলো কোল থেকে। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলাম।

সরকার সাহেব অবাক হয়ে শুনলেন, অস্ফুট কণ্ঠে বললেন–কই, আমি তো কিছু জানিনা মা?

আপনি তখন সরে গিয়েছিলেন ওপাশে।

ওঃ আমাকে একজন লোক ডেকে জিজ্ঞেস করছিলো-এটাই কি চৌধুরীবাড়ি? আমি তার প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলাম কিন্তু তা তো সামান্য কয়েক মিনিট?

হাঁ সরকার চাচা, ঐ সময়ের মধ্যেই গালপাট্টা বাঁধা লোকটা এসেছিলো সেখানে।

সত্যি আমি আশ্চর্য হচ্ছি। নিশ্চয়ই সে কোনো কুমতলব নিয়ে এসেছিলো। কথাগুলো বললেন সরকার সাহেব।

মনিরা বললো-সরকার চাচা, আমার মনে হয় সে যেই হোক, কোনো খারাপ মতলব নিয়ে আসেনি। কারণ, সে প্রচুর সময় পেয়েছিলো, নূরকে নিয়ে পালাতে পারতো। অবশ্য পালাবার পূর্বেই আমি তাকে যমালয়ে পাঠাতাম।

মনিরা নূরকে বুকে তুলে নিয়ে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলো ওর গাল দুটো।

নূর কচি দুটি হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো মার গলা।

সরকার সাহেব হাসতে লাগলেন।

এমন সময় মরিয়ম বেগম এলেন কক্ষে। যদিও তিনি পুত্রশোকে মুহ্যমান। তবু মনিরা ও নূরকে পেয়ে তার বুকে একটা অনাবিল আনন্দ ও শান্তিধারা বয়ে যায়। মরিয়ম বেগম খুশিভরা কণ্ঠে বললেন-মা-ছেলে খুব যে আনন্দ করা হচ্ছে!

এখানে নূরকে নিয়ে সরকার সাহেব, মরিয়ম বেগম এবং মনিরা যখন আনন্দে আত্মহারা, তখন কান্দাই বনের পথে দুজন অশ্বারোহী পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে।

অশ্বারোহীদ্বয় একজন রহমান, দ্বিতীয়জন কায়েস।

কিছুক্ষণ পূর্বে চৌধুরীবাড়ির বাগানে গালপাট্টা বাঁধা যে ব্যক্তি নূরকে আদর করছিলো সে ব্যক্তি অন্য কেউ নয়-বনহুরের প্রধান অনুচর রহমান।

মাঝে মাঝে রহমান গোপনে মনিরার সন্ধান নিতে আসতো।

আজও কায়েসকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলো সে মনিরার সন্ধান নিতে।

একটা চাকরের নিকট মনিরার সুসংবাদ গ্রহণ করে যখন ফিরছিল রহমান তখন হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে গিয়েছিলো বাগানে খেলায়রত নূরের ওপর। কেমন যেন চমকে উঠেছিলো রহমান-এ যে তার সর্দারের হুবহু প্রতিচ্ছবি-সেই চোখ, সেই মুখ; সেই নাক–অবিকল দেখতে তারই মত। বিস্ময় জেগেছিলো রহমানের মনে, নিশ্চয়ই এটা তাদের সর্দারের সন্তান।

কায়েসকে ডেকে দেখিয়ে বলেছিলো রহমান-কায়েস, দেখতে পাচ্ছো?

কি?

ঐ দেখো বাগানের দিকে তাকিয়ে।

কায়েস তাকিয়ে থ বনে গেলো হঠাৎ আনন্দধ্বনি করতে যাচ্ছিলো কায়েস, রহমান ওর মুখে হাতচাপা দিয়ে বললো-চুপ।

কায়েস সামলে নিলো নিজেকে। তাই তো, এ যে একেবারে রাজপুত্র। আনন্দ বিগলিত কণ্ঠে বললো কায়েস-এ যে আমাদের সর্দারের ছেলের মত মনে হচ্ছে।

রহমান বললো-মনে হচ্ছে নয়, নিশ্চয়ই তার সন্তান।

কিন্তু তা কেমন করে হয়। একটু ভেবে বললো কায়েস।

রহমান গম্ভীর গলায় বললো-আমি বললাম এই শিশু আমাদের সর্দারের সন্তান না হয়েই পারে না।

রহমান আর বিলম্ব না করে বাগানের বেড়া টপকে প্রবেশ করে ছিলো ভেতরে। তারপর, শিশুটাকে আদর করবার সুযোগ করে নিয়েছিলো। সাবধানে।

রহমান বললো এবার কায়েসকে–কায়েস, আমি শপথ করে বলছি, এটাই সেই ছেলে-যাকে নূরী একদিন সন্তানের মত মানুষ করেছিলো–

কেমন করে বুঝলে রহমান?

যদিও বেশ বড় হয়েছে, কিন্তু চিনতে আমার ভুল হয়নি। কিন্তু আর একটা কথা, আমি খোকাকে নাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

কায়েস আগ্রহভরা কণ্ঠে বললো-তারপর?

খোকা বললো, আমার নাম নূর। কিন্তু নূরীর শিশুটার নাম ছিল মনি।

কায়েস চমকে উঠলো—কি বললে রহমান, খোকা তার নাম বললো নূর?

হাঁ, ঐ নাম সে বলেছে।

কায়েসের মুখে হাসি ফুটে উঠলো-বললো নূর–সে নূর–ঠিক ধরেছো। রহমান, এটাই আমাদের সর্দারের সন্তান নূর-বৌরাণীর ছেলে।

মনিরা ও নূরের কাহিনী সব বললো কায়েস রহমানের কাছে। তারপর থেকেই রহমান প্রায়ই যেতে শুরু করলো শহরে। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে আসতো নূরকে। কোনোদিন ফলমূল, কোনোদিন সোনার আংটি, কোনোদিন সোনার মালা পরিয়ে দিয়ে আসতো তার গলায়।

মনিরার বিস্ময় চরমে উঠলো, কে এই লোক-যে তার সন্তানকে এভাবে এসব দিতে শুরু করেছে। মনে মনে ভাবলো মনিরা নিশ্চয়ই কোনো অভিসন্ধি নিয়ে এসব দিচ্ছে লোকটা।

একদিন মনিরা সরকার সাহেব বা নকীবের সঙ্গে নূরকে বাইরে না পাঠিয়ে সে নিজে এলো বাগানে নূরের সঙ্গে। নূরকে খেলতে দিয়ে চুপ করে সরে গেলো মনিরা আড়ালে।

নূর বল নিয়ে খেলা করছে আপন মনে। কিন্তু লোকটা এলো না।

একদিন দুদিন তিনদিন কেটে গেলো–লোকটার সাক্ষাৎ নেই। মনিরা অনেক সুযোগ দিয়েছে, নূরকে একা রেখে সরে থেকেছে আড়ালে।

সেদিনও মনিরা এলো নূরকে নিয়ে বাগানে। প্রতিদিনের মত আজও মনিরা নূরকে খেলায় মাতিয়ে দিয়ে সরে পড়লো। একটা পাইন ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে দেখতে লাগলো।

প্রায় ঘন্টাখানেক কেটে গেলো, মনিরা ভাউলো–লোকটা আজও আসবেনা। পাইন ঝাড়ের আড়াল থেকে যেমনি বের হতে যাবে, অমনি একটা খস খস শব্দ কানে এলো মনিরার। সচকিতভাবে সরে দাঁড়ালো মনিরা, পাইন ঝাড়ের আড়ালে তাকিয়ে দেখলো-হাঁ, সেই লোকটা গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে লোকটা।

অদূরে নূর বল নিয়ে ছুটাছুটি করছে।

মনিরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগলো, আজ সে হাতে নাতে ধরে ফেলবে। কে ঐ লোকটা যে দিনের পর দিন তার নূরকে এভাবে আকর্ষিত করছে?

লোকটা নূরের পাশে গিয়ে আস্তে শিস দিলো।

নূর অমনি ফিরে তাকালো তার দিকে, সঙ্গে সঙ্গে বল ছেড়ে ছুটে এলো লোকটার পাশে।

লোকটা দুহাত প্রসারিত করে ওকে তুলে নিলো কোলে।

মনিরা শুনতে পেলো নূরের কণ্ঠস্বর-সিপাহী, আজ আমার জন্য কি এনেছো?

মনিরা স্তব্ধ হয়ে শুনছে ওর কথাবার্তা।

ফিস ফিস করে বললো লোকটা-কি নেবে তুমি বলো?

নূরের কণ্ঠ–আমি–আর কিছু নেবো না।

কেন?

আম্মা বকবেন।

এই দেখো কি এনেছি তোমার জন্য–

সঙ্গে সঙ্গে মনিরা বেরিয়ে এলো পাইন ঝাড়ের আড়াল থেকে। নূর এবং লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে কঠিন কণ্ঠে বললো সে-কে তুমি? শয়তান কোথাকার–

রহমান নূরকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

মনিরা নূরকে টেনে নিলো নিজের কাছে। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলো সে, ঠিক সেই মুহূর্তে বেরিয়ে এলো আড়াল থেকে কায়েস–বৌরাণী, বৌরাণী–ও শয়তান নয়, রহমান–

মনিরা চমকে উঠলো, কোথায় যেন এই স্বর সে শুনেছে? কোথায় যেন দেখেছে ওকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো মনিরা কায়েসের দিকে।

কায়েস বললো-বৌরাণী, আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি-আমিই সে কায়েস–

মনিরা অস্ফুটধ্বনি করে উঠলো-কায়েস।

হাঁ, আমি কায়েস আর আপনার সামনে যে দণ্ডায়মান সে সর্দারের প্রধান অনুচর রহমান। কিন্তু বৌরাণী, এই শিশু কে? বলুন-বৌরাণী, এই কি আপনার সেই নূর?

কায়েস, সত্যিই ধরেছে, এটাই আমার সেই হারানো ধন নূর। মনিরা রহমানের দিকে তাকালো-আমাকে মাফ করো রহমান, আমি তোমাকে চিনতে না পেরে–

রহমান বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো-বৌরাণী!

নূর এবার বুঝতে পারলো-তার আম্মা লোকটার ওপর প্রথমে বিরক্ত হলেও পরে বেশ স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। নূর একবার আম্মা আর একবার রহমানের মুখে তাকাচ্ছে।

রহমান নূরকে টেনে নিলো আবার কোলের কাছে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো-বৌরাণী, আমরা সর্দারকে হারিয়ে একেবারে মূহ্যমান হয়ে পড়েছি। জানিনা তিনি জীবিত না মৃত—

মনিরা নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো। তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়লো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

কায়েস আর রহমানের চোখও অশ্রু হল হল করছে।

মনিরা বললো এবার-জানি, তোমরাও আমারই মত ব্যথিত দুঃখিত তোমাদের সর্দারের জন্য। কিন্তু মনে রেখো রহমান, তোমাদের সর্দার মৃত নয় জীবিত আছে- আমার মন বলছে সে জীবিত আছে।

রহমান আর কায়েসের মুখমণ্ডল প্রসন্ন হয়ে উঠলো, বললো। রহমান-বৌরাণী, আপনার কথা যেন সত্য হয়।

আচ্ছা, আমরা তাহলে চলি বৌরাণী? বললো কায়েস।

মনিরা আঁচলে চোখের পানি মুছে বললো-বসবে না?

রহমান বললো আমরা আবার আসবো–নূরকে আদর করে বললো-সর্দারের অভাব আমরা ওকে দিয়েই পূরণ করবো বৌরাণী। আচ্ছা, আজ যাই আমরা?

এসো। বললো মনিরা।

রহমান আর কায়েস অদৃশ্য হলো বাগানের ওপাশে।

মনিরা নূরকে কোলে করে দাঁড়িয়ে রইলো ওদের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে।

·

সেদিনের পরে জ্যোছনা রায় বনহুরের গাড়িতে একটা দিনও বাড়ি ফেরেনি বা ইচ্ছা করে কোনো সময় তার সঙ্গে কথা বলেনি। বনহুর বুঝতে পেরেছে-জ্যোছনা রায় সেদিন তার ঐ কথার পর ভীষণ মুষড়ে পড়েছে। তার অন্তরে যে একটা ব্যথার জ্বালা তাকে অহরহ দগ্ধীভূত করছে, জ্যোছনা। রায়ের মুখোভাবে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

বনহুর যতদূর সম্ভব জ্যোছনা রায়কে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করতো। সুটিং ছাড়া জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে সে তেমন কোনো কথা বলতো না। বরং আতিয়ার সঙ্গে

ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে দিলো।

এখন আতিয়া সুটিংয়ের পর নিজে বনহুরকে নিয়ে যায় প্রতিদিন। পৌঁছে দেয় তার বাসায়।

জ্যোছনা রায় চেয়ে দেখে, কোনো কিছু বলে না।

সুটিংয়ের অবসরেও আতিয়া জ্যোছনা রায়কে দেখিয়ে দেখিয়ে বনহুরের হাত ধরে স্টুডিওর বাগানে গিয়ে বসে, হাসে, গল্প করে, কখনও বা বাগান থেকে গোলাপ ছিঁড়ে গুঁজে দেয় তার কোটের কলারের ফাঁকে।

জ্যোছনা রায় স্টুডিওর রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখে। একটা ক্ষুব্ধ ভাব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তার মনে। সরে যায় তখন সে রেলিংয়ের পাশ থেকে।

হয়তো গিয়ে দাঁড়ায় ওদিকের নির্জন রেলিংটার ধারে। আজ কাল জ্যোছনা রায়ের কাছে নির্জনতাই যেন বেশি প্রিয়। ছবিতে কাজ না করলে নয় তাই সে আসে স্টুডিওতে। যতক্ষণ ছবির প্রয়োজন ততক্ষণই স্টুডিওতে থাকে। সুটিং শেষ হলেই আস্তে স্টুডিওর সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে নীচে। গাড়িতে বসে ড্রাইভারকে বলে–চলো।

প্রযোজক কিংবা পরিচালক কারও গাড়িতেই সে যায় না, তাদের নিতান্ত অনুরোধেও জ্যোছনা রায় রাজী হয়নি তাদের গাড়িতে যেতে।

ইতিমধ্যে জ্যোছনা রায় স্টুডিওর বিশ্রামকক্ষে বসে আর এক দিন অরুণ কুমারের একখানা চিঠি পেয়েছিলো। চিঠিটা এইরূপঃ

জ্যোছনা,

তোমার অভাবে আজ আমি অন্ধকার দেখছি। এতটুকু দয়া-মায়া তুমি করলে না। কিন্তু মনে রেখো-হয় তুমি আমার হবে, নয় যমের ঘরে যাবে। হত্যা তোমাকে আমি করবোই। কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

অরুণ

এ চিঠি পাবার পরও জ্যোছনা রায় এতটুকু ঘাবড়ে যায়নি বা বিচলিত হয়নি।

পরিচালক নাহার চৌধুরী চিঠিখানা পুলিশে ডায়রী করে দিয়েছেন, তাঁদের ছবির নায়িকার জীবন হানি যাতে না হয় তার জন্য নাহার চৌধুরী এবং আরফান উল্লাহ পুলিশের সাহায্য কামনা করে অনুরোধ জানিয়েছেন।

হঠাৎ যদি কোনো একটা অঘটন ঘটে বসে তাহলে সম্পূর্ণ ছবি নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। কাজেই সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তায় পড়েছেন আরফান উল্লাহ এবং এ কারণেই তিনি নিজে জ্যোছনা রায়কে সাবধানে চলাফেরার জন্য বারবার বলে দিয়েছেন।

কিন্তু জ্যোছনা রায় কারও কথা কানে নেয় না, নিজের প্রতি আজকাল সে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়েছে।

আজ সুটিং শেষে জ্যোছনা রায় যখন রেলিংয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, তখন তার দেহ মন শিথিল হয়ে এসেছে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নির্জন রেলিংটার ধারে এসে দাঁড়ালো সে।

একটু পূর্বে জ্যোছনা রায়ের সামনে দিয়ে আতিয়া মিঃ চৌধুরীকে ধরে নিয়ে গেলো বাগানের দিকে। কি যেন কথা নিয়ে হাসছিলো আতিয়া।

মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই জ্যোছনা রায় দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিলো অন্যদিকে।

আতিয়ার চিকন হাসির সুর এখনও কানে লেগে আছে জ্যোছনা রায়ের। রেলিংয়ে ভর দিয়ে তাকিয়েছিলো সে সামনের ধূসর আকাশের দিকে। মনের আকাশেও তার কালো মেঘ জমাট বেঁধে উঠেছে। কত প্রশ্নই না আজ উঁকি দিয়ে যাচ্ছে তার হৃদয়ের কোণে। বিশ্বাস হয় না জ্যোছনা রায়ের, মিঃ চৌধুরী তাকে এতদিন ছলনা করে এসেছেন। মিথ্যা অভিনয় তিনি করেছেন, তার সঙ্গে...না না, বিশ্বাস হয় না তার এ কথা –এতদিনের কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে তার সাথে। আজ সব তার মানসপটে স্পষ্ট ভেসে উঠছে।

কখন যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে খেয়াল নেই জ্যোছনা রায়ের।

সে স্টুডিওর বিপরীত দিকে নির্জন রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিলো। অন্য সবাই চলে গেছে, মিঃ আরফান উল্লাহ এবং নাহার চৌধুরী জ্যোছনা রায়ের খোঁজ

করেছিলেন কিন্তু তাঁরাও জ্যোছনা রায় চলে গেছে মনে করে স্টুডিও ত্যাগ করেছিলেন।

কিন্তু বনহুর লক্ষ্য করেছিলো, জ্যোছনা রায় আজ স্টুডিও থেকে যায়নি। সে বাগানে আতিয়ার পাশে বসে থাকলেও দৃষ্টি ছিলো স্টুডিওর পথে। কে যায় বা আসে সেদিকে খেয়াল ছিলো তার।

জ্যোছনা রায় স্টুডিও থেকে বেরিয়ে যায়নি সে তা দেখেছে। মিঃ আরফান উল্লাহ যখন জ্যোছনা রায়ের খোঁজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-মিঃ চৌধুরী, মিস রায় কি চলে গেছে?

বনহুর জবাব দেবার পূর্বেই বেশ কড়া মেজাজে বলে উঠেছিলো আতিয়া-জ্যোছনা রায়ের খোজ উনি কি করে বলবেন? খুঁজে দেখোগে আব্বা। তোমাদের ছবির হিরোইন শেষে হারিয়ে না যায়!

বনহুরের মনে কথাটা যেন বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিলো। একটা ঘৃণার ভাব তার অন্তরে খোঁচা দিতে শুরু করেছিলো, তবে কোনো কথাই আর বলেনি বন তখন।

আতিয়া যখন পুনরায় বলেছিলো-মিঃ চৌধুরী, অমন হয়ে পড়লেন কেন? বনহুর হেসে বলেছিলো-আতিয়া, ভুলেই গিয়েছিলাম, আমার একটু দরকার আছে। ফিরতে বিলম্ব হবে। তুমি বরং আজ তোমার আব্বার সঙ্গে যাও। কিন্তু মনে রেখো, কাল সকালে তোমার জন্য চায়ের টেবিলে অপেক্ষা করবো।

বনহুরের মুখের কথাগুলো তার কানে মধু বর্ষণ করলো। অন্যদিন হলে আপত্তি করে বসতো-তা হবে না, চলুন আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে তবে বাড়ি ফিরবো। কিন্তু আজ আতিয়া সে ব্যাপারে কোনো কথা বললো না।

একটু হেসে বললো-নিশ্চয়ই আসবো মিঃ চৌধুরী। তারপর পিতাকে লক্ষ্য করে বললো আতিয়া-আব্বা, ওনার আজ একটু কাজ আছে। চলো, আমরা যাই।

আরফান উল্লাহ কি যেন ভেবে বললেন-আমারও কিছু কাজ আছে। বাসায় ফিরতে দেরি হবে, তুমি বরং একাই যাও মা।

আতিয়া হাসিমুখে বললো-বেশ, আজ তোমরা না গেলে, আমিই চললাম।

ভ্যানিটি দুলিয়ে গাড়ির দিকে পা বাড়ালো আতিয়া।

আরফান উল্লাহ বনহুরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন-স্টুডিওর অফিসে আমার কাজ আছে। চলি, গুড বাই!

বনহুর অস্ফুটকণ্ঠে বললো-গুড বাই।

সন্ধ্যার ঝাপসা অন্ধকারে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে জ্যোছনা রায়। বনহুরের সাথে বিগত দিনের স্মৃতি মন্থন করে চলেছে সে।

.

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার কখন যে জমাট বেঁধে উঠেছে খেয়াল নেই জ্যোছনা রায়ের।

হঠাৎ চমকে উঠলো জ্যোছনা রায়, কে যেন পাশে এসে দাঁড়ালো বলে মনে হলো তার। বললো জ্যোছনা রায়-কে?

অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর-আমি।

আপনি এখানে কেন?

জ্যোছনা, এখনও তমার দিব্যচক্ষু খুললো না?

অরুণ বাবু, আমি আপনার কোন কথা শুনতে রাজি নই।

কবেই বা তুমি আমার কথা শুনেছো বা শুনতে রাজী হয়েছে?

জ্যোছনা রায় কুদ্ধকণ্ঠে বললো-আমাকে কোনো কথা বলে লাভ হবে না অরুণ বাবু।

চাপাস্বরে হেসে উঠলো অরুণ কুমার, তারপর হাসি থামিয়ে বললো-জ্যোছনা, ভুল করে আলেয়ার আলোর পেছনে ধাওয়া করো না। মিঃ চৌধুরী তোমাকে চায় না, আর তুমি তার জন্য পাগল। হাঃ হাঃ হাঃ, অদ্ভুত মেয়ে তুমি!

জ্যোছনা রায় অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালো অরুণ কুমারের দিকে, তারপর দ্রুত চলে যাচ্ছিলো, অরুণ কুমার খপ্ করে ধরে ফেললো জ্যোছনা রায়ের হাত-জ্যোছনা, আজ তোমাকে ছাড়ছি না।

ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন বলছি।

কিছুতেই ছাড়বো না।

আমি চীৎকার করবো।

স্টুডিও বন্ধ হয়ে গেছে, কেউ নেই এদিকে।

ছেড়ে দিন, নইলে ভাল হবে না বলছি।

ভাল আর কবে হলো, জানি হবেও না কোনোদিন। জ্যোছনা রায়কে জোর করে টেনে নিয়ে চললো অরুণ কুমার স্টুডিওর গেটের দিকে।

জ্যোছনা রায় চীৎকার করে উঠলো-বাঁচাও, বাঁচাও.....। ঠিক সেই মুহূর্তে কে একজন অন্ধকারে দ্রুত এসে চেপে ধরলো অরুণ কুমারের গলা। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা ঘুষি এসে পড়লো তার নাকের ওপর।

অরুণ কুমার টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলো মাটিতে।

জ্যোছনা রায় দাঁড়িয়ে রইলো থ মেরে।

আক্রমণকারী পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়লো অরুণ কুমারের ওপর। চললো ভীষণ ধস্তাধস্তি।

ইতিমধ্যে জ্যোছনা রায়ের আর্তচীৎকারে টুডিওতে যে দুতিনজন তখনও কর্মরত ছিলো, তারা ছুটে এলো ব্যস্তভাবে।

যে স্থানে এই ঘটনা ঘটেছিলো সেই স্থানটি ছিলো সম্পূর্ণ অন্ধকার। কয়েকজন টর্চলাইট নিয়ে ছুটে এলো সেখানে। আলো জ্বলতেই চক্ষুস্থির সকলের। দেখলো সবাই, অরুণ কুমারের বুকে বসে তার টুটি টিপে ধরেছে মিঃ চৌধুরী।

মুখে আলো পড়তেই মিঃ চৌধুরী মানে দস্যু বনহুর উঠে দাঁড়ালো, রাগে অধর দংশন করছে সে।

দুজন লোক এগিয়ে গিয়ে অরুণ কুমারকে উঠিয়ে শরীরের ধুলো ঝেড়ে দিতে লাগলো। নাক দিয়ে তখন রক্ত গড়িয়ে পড়ছিলো তার। ক্রুদ্ধ হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলো অরুণ কুমার বনহুর আর জ্যোছনা রায়ের মুখের দিকে।

জ্যোছনা রায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মত।

বনহুরের মুখোভাবে কোনো পরিবর্তন নেই। সে গুটানো জামার আস্তিন খুলে নিচ্ছিলো।

এমন সময় অন্ধকার থেকে এগিয়ে এলেন আরফান উল্লাহ। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন-এসব কি কাণ্ড? তারপর জ্যোছনা রায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন-আপনি এখনও স্টুডিওতে ছিলেন মিস রায়? আমরা মনে করেছি চলে গেছেন।

অরুণ কুমার গায়ের ধুলো ঝাড়ছিলো। তার চোখেমুখে হিংস্র ক্রুদ্ধভাব ফুটে উঠেছে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বনহুর ও জ্যোছনা রায়কে দেখে নিচ্ছিলো সে, দুচোখে যেন অগ্নিবাণ বর্ষিত হচ্ছে অরুণ কুমারের। অন্যান্য কারও মুখে কোনো কথা নেই। আরফান উল্লাহর আগমনে উপস্থিত সকলেই নিশ্চুপ হয়ে পড়েছিলো। কারণ, তার সামনে কে কোন কথা বলে অপরাধী হবে!

আরফান উল্লাহ গর্জন করে উঠলেন-মিঃ কুমার, আপনাকে বারণ করা।

সত্ত্বেও আপনি স্টুডিওতে কেন এসেছেন? .

জবাব দিতে আমি রাজী নই। কথা শেষ করে দ্রুত বেরিয়ে গেলো অরুণ কুমার।

জ্যোছনা রায় তাকালো বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর জ্যোছনা রায়ের দিকেই তাকিয়ে ছিলো। দৃষ্টি বিনিময় হতেই চোখ নামিয়ে নিলো জ্যোছনা রায়।

আরফান উল্লাহ বললেন-চলুন মিস রায়, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

জ্যোছনা রায় বললো-আমাকে পৌঁছে দিতে হবে না মিঃ উল্লাহ। আমি একাই বাসায় ফিরে যেতে পারবো। জ্যোহনা রায় আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে বেরিয়ে গেলো সেখান থেকে।

আরফান উল্লাহ চিন্তিত কণ্ঠে বললেন-পথে না আবার কোনো বিপদ ঘটে! আসুন মিঃ চৌধুরী, ভাগ্যিস আপনি ছিলেন, নইলে পাজি অরুণ বাবু কি যে কাণ্ড করে বসতো!

পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন আরফান উল্লাহ ও বনহুর। স্টুডিওর দিকেই এগুচ্ছেন তারা।

এমন সময় নাহার চৌধুরী ব্যস্তসমস্তভাবে সামনে এসে দাঁড়ালেন-এই যে মিঃ চৌধুরী, কি একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেলো!

বিশ্রী ঘটনা নয় মিঃ নাহার, অতি মনোরম.....কথাটা বললো বনহুর।

মিঃ আরফান বললেন-মিঃ নাহার চৌধুরী, আমাদের কাজ আর কতদিনে শেষ হতে পারে?

আমার মনে হয় এক সপ্তাহের মধ্যেই সুটিং শেষ হবে। বাকী কাজ শেষ হতে মাসখানেক লাগবে।

আরফান উল্লাহ বললেন, জ্যোছনা রায়ের শেষ শট কবে নাগাদ শেষ হচ্ছে?

মিস রায়ের আর একদিন সুটিং আছে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে...তাহলেই ওর কাজ শেষ!

বনহুর আর বিলম্ব না করে আরফান উল্লাহ এবং নাহার চৌধুরীর কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর জানে, জ্যোছনা রায় আরফান উল্লাহর গাড়িতে এসেছিলো। কাজেই ফিরবার পথে ভাড়াটে গাড়ি ছাড়া তার উপায় নেই। শহর ছেড়ে স্টুডিও বেশ দূরে, কাজেই সব সময় সেখানে গাড়ি পাওয়া মুশকিল। স্টুডিও ছেড়ে বেশ খানিকটা

পথ চলার পর তবেই গাড়ি মিলবে। বনহুর বুঝতে পারে, জ্যোছনা রায় এখনও গাড়ির স্ট্যান্ডে পৌঁছতে পারেনি।

বনহুর নিজে রাগ করে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এলো। স্পীডে চালিয়ে যেতে যেতে পথের দুপাশে লক্ষ্য করে দেখতে লাগলো। দুশ্চিন্তায় মনটা ভরে উঠলো বনহুরের। জ্যোছনা রায়ের এভাবে একা যাওয়া কি উচিত হয়েছে? জানে না সে– তার বিপদ এগিয়ে আসছে।

অরুণ বাবু তাকে পুনরায় আক্রমণ করেছে কিনা কে জানে!

বনহুর এসব চিন্তা করছিলো, আর পথের দুপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে গাড়ি চালাচ্ছিলো।

অনেকটা পথ চলে গেলো বনহুর, কোথাও জ্যোছনা রায়ের সন্ধান পাওয়া গেলো না। আর কিছু দূরেই গাড়ির স্ট্যান্ড। এমন সময় হঠাৎ বনহুর দেখলো অদূরে একটা তরুণী এগিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই জ্যোছনা রায় ছাড়া অন্য কেউ নয়। বনহুর গাড়ি নিয়ে তার পাশে গিয়ে ব্রেক কষে থামিয়ে ফেললো।

থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালে জ্যোছনা রায়।

বনহুর ঝুঁকে বললো-আসুন মিস রায়।

দরকার হবে না, স্ট্যাণ্ডে এসে গেছি।

মিস রায়, আপনার এ সময় ভাড়াটে গাড়িতে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। আসুন।

জ্যোছনা রায় কেন যেন আজ অভিমান করতে পারলো না, বনহুরের পাশে উঠে বসলো।

গাড়ি পুনরায় ছুটতে শুরু করলো।

বেশ কিছুক্ষণ উভয়েই নিশ্চুপ রইলো!

প্রথম কথা বললো বনহুর-মিস রায়, রাগ করেছেন?

না।

মিথ্যা বললেন আপনি!

কোনো জবাব দিলো না জ্যোছনা রায়। মুখ ফিরিয়ে বসে রইলো চুপ করে।

বললো আবার বনহুর-আপনি বড় অবুঝ মিস রায়। আপনি অভিনয় করেন, কিন্তু অভিনয় বোঝেন না।

জ্যোছনা রায় তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। লাইট পোস্টের আলোতে উভয়েরই চোখাচোখি হলো। বনহুর। বললো-মিস রায়, একমাত্র আমার জন্য আজ আপনি বিপদগ্রস্ত। বলুন, তাই নয় কি?

জ্যোছনা রায় এবারও কোনো জবাব দিলো না।

বনহুর বলে চললো-সত্যি করে বলছি, আমি আতিয়ার সঙ্গে শুধু অভিনয় করে চলেছি। কিন্তু কেন জানেন? শুধু আপনার জন্য।

আমার জন্য!

হাঁ, শুধু আপনার জন্য। মিস রায়, সব কথা ঐ দিন বলবো যেদিন আমাদের ছবির কাজ শেষ হবে।

জ্যোছনা রায় নিশ্চুপ শুনে যাচ্ছিলো। একটু পূর্বেই মিঃ চৌধুরীর অন্তরের পরিচয় সে পেয়েছে। মিঃ চৌধুরীই তাকে রক্ষা করেছেন, নইলে কি যে হতো! কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো জ্যোছনা রায়ের মন!

বনহুর জ্যোছনা রায়কে তার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলো নিজের বাসায়।

গোটা রাত ঘুমাতে পারলো না সে।

কত কথা আজ বনহুরের মনের আকাশে ভেসে উঠে বিলীন হয়ে যাচ্ছিলো।

স্বদেশে ফিরবার জন্য মন তার আকুলি-বিকুলি করছে।

বহুদিন বাইরে কাটালো সে। নানা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছে সে। না জানি তার আস্তানার অবস্থা কি। রহমান তার অনুপস্থিতিতে কি করছে। তারা কেমন আছে। মায়ের কথা স্মরণ হতেই অশ্রুসজল হলো বনহুরের চোখ দুটো। মনিরা কেমন আছে, নিশ্চয়ই সে কেঁদে কেঁদে আকুল হয়ে পড়েছে। মনিরার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বনহুরের মন চঞ্চল হয়ে পড়লো।

এদিকে নূরীর চিকিৎসার আশু প্রয়োজন।

আস্তানায় ফিরে না গেলে কিছুই হচ্ছে না।

ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় নতুন এক পথে পা বাড়িয়েছিলো সে। দস্যু হয়ে চিত্রনায়করূপে.আত্নপ্রকাশ করেছে। ছবির কাজ শেষ, এবার তার ছুটি।

কিন্তু স্বদেশে ফিরে যাবার পূর্বে আর একটা কাজ তাকে করে যেতে হবে। জ্যোছনা রায়কে বুঝিয়ে দিতে হবে, সে স্বাভাবিক মানুষ নয়। বনহুরকে পাবে না কোনোদিন, কারণ সে দস্যু-মানুষ নামের কলঙ্ক।

০৬.

কয়েক দিন কেটে গেলো।

আজ কুন্তিবাঈ ছবির শেষ সুটিং চলছে।

নাহার চৌধুরী অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটাছুটি করছেন।..

ক্যামেরাম্যান অনন্ত বাবুর অবস্থাও তাই। আজ তিনি যেন বেশি করে। ঝুঁকে পড়েছেন কাজে। ইউনিটের প্রায় সবাই আজ এসেছেন স্টুডিওতে।

বনহুর আর জ্যোছনা রায়ের মধ্যে শেষ শট নেওয়া হবে। বনহুর আর জ্যোছনা রায় মেকআপ নিচ্ছে।

আজ ওদের দুজনকে অপূর্ব সুন্দর লাগছে। বিশেষ করে মিস জ্যোছনা রায়কে আজ মেকআপে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে।

সুটিং শুরু হলো।

সেটে বনহুর আর. জ্যোছনা রায়।

জ্যোছনা রায়ের মন থেকে সব অভিমান মুছে গিয়েছিলো।

একটা কৃতজ্ঞতার ছাপ গোটা অন্তরে ছড়িয়ে পড়েছিলো তার।

বনহুরও আজ জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে অপূর্ব অভিনয় করলো। ছবির শেষ দৃশ্য নাহার চৌধুরীর মনে এনে দিলো অফুরন্ত আনন্দ ও পরিতৃপ্ত।

পরিচালক নাহার চৌধুরী বনহুর আর জ্যোছনা রায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন।

বনহুর অবাক হলো-আজ শেষ সুটিংয়ের দিন অথচ মিঃ আরফান উল্লাহ স্টুডিওতে নেই। মিস আতিয়া ছিলো, কিন্তু কিছুক্ষণ বসার পর সরে পড়েছে সে। বোধ হয় মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে জ্যোছনা রায়ের অভিনয় সহ্য করতে পারেনি।

সুটিং আজ থেকে শেষ, স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো জ্যোছনা রায়। স্টুডিওর বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করে একটা সোফায় গা এলিয়ে দিলো। অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ মনটা তার বেশ স্বচ্ছ মনে হচ্ছে। মিঃ চৌধুরী সম্বন্ধে তার অন্তরে যে একটা দ্বন্দ্ব ছিলো সেটা মুছে গেছে তার মন থেকে।

মিঃ চৌধুরী লোককে দেখান তিনি আতিয়াকে ভালবাসেন কিন্তু সে কথা তাঁর মনের কথা নয়। আতিয়াকে মিঃ চৌধুরী কখনও ভালবাসতে পারেন না। ধন, সম্পদ, অর্থই সবচেয়ে বড় কথা নয়। অন্তর বলে একটা জিনিস আছে, যা কোনদিন ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে পুর্ণ হয় না। তাছাড়া মিঃ চৌধুরীকে সে। এতদিন বেশ ভালো করেই জেনেছে, অর্থের লালসা তার নেই। নিজেই তিনি একটা ঐশ্বর্যের সম্ভার।

মিস জ্যোছনা রায়ের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দীপ্তিময় হয়ে ওঠে। বিশ্রামকক্ষে আসার পূর্বে মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে তার কয়েক মিনিট কথা হয়েছে। নির্জন রেলিংয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো মিঃ চৌধুরী ও জ্যোছনা রায়।

আজ থেকে কাজ শেষ মিস রায়। বলেছিলো বনহুর।

হাঁ, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। জবাব দিয়েছিলো জ্যোছনা রায়। কিছু সময় নিশ্চুপ থেকে বলেছিলো বনহুর-যা বলার আজ বলবো মিস রায়। কারণ আবার কখন কোথায় দেখা হবে কে জানে!

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলেছিলো জ্যোছনা রায়-কেন?

বলে চলে বনহুর-আতিয়াকে আমি ভালবেসেছিলাম শুধু আপনাকে রক্ষা। করার জন্য। কারণ আমি সবাইকে দেখাতে চেয়েছি-আমি আতিয়ার প্রেমে আত্মহারা, জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে আমার অভিনয়ের সম্বন্ধ ছাড়া কোনো সম্পর্ক নেই। মিস রায়, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না, মিস আতিয়ার। সঙ্গে আমার যে ঘনিষ্ঠতা দেখেছেন তা শুধু অভিনয় ছাড়া কিছু নয়.... .

মিঃ চৌধুরী।

হাঁ, আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। মিস আতিয়াকে আমি কোনো দিন ভালবাসিনি-ভালবাসতে পারিনি।

অনাবিল একটা আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছিলো জ্যোছনা রায়ের হৃদয় আকাশে। গভীর আবেগে হারিয়ে ফেললো সে নিজের সত্তা, বনহুরের বুকে মাথা রেখে বললো-মিঃ চৌধুরী, আমাদের অভিনয় তো সত্য?

বনহুরের দৃষ্টি সেই মুহূর্তে চলে গেলো স্টুডিওর ওদিকে একটা শার্শীর ফাঁকে....একজোড়া চোখ দ্রুত সরে গেলো শার্শীর ফাঁক থেকে।

বনহুর চট করে জ্যোছনা রায়কে সরিয়ে দিতে পারলো না, মোহগ্রস্তের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো.....

জ্যোছনা রায় বিশ্রামকক্ষে বসে তখনকার কথাগুলোই স্মরণ করলো। আজ তার মনের সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে গেছে, স্বচ্ছ নির্মল হয়েছে তার হৃদয়। মিঃ চৌধুরী মিস আতিয়াকে ভালবাসেননি, বাসতে পারেন নি....

বনহুর স্টুডিওর অন্যান্য কাজ শেষ করে গাড়ির দিকে এগুতেই মনে পড়লো জ্যোছনা রায়ের কথা। কথা দিয়েছিলো, তাকে নিয়ে তবে বাসায় ফিরবে।

বনহুর মিঃ আরফান উল্লাহ, পরিচালক নাহার চৌধুরী ক্যামেরাম্যান অনন্ত বাবু এবং অন্যান্য সকলের কাছে বিদায় নিয়ে পা বাড়ালো জ্যোছনা রায়ের বিশ্রামকক্ষের দিকে।

ছবির কাজ আজ থেকে সমাধা হলো, এবার নিশ্চিন্ত হলো বনহুর। শুধু স্টুডিও থেকেই বিদায় নিচ্ছে না, বিদায় নিচ্ছে চলচ্চিত্র থেকে। অভিনয় শুধু সে ক্যামেরার সামনেই করেনি, অভিনয় করেছে প্রতিটি ব্যক্তির সঙ্গে। আপন মনেই হাসলো বনহুর…দস্যু বনহুর হয়েছে চিত্রনায়ক।

দ্রুত প্রবেশ করলো সে জ্যোছনা রায়ের বিশ্রামকক্ষে। সঙ্গে সঙ্গে অকুটধ্বনি করে থমকে দাঁড়ালো-উঃ!

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখলো বনহুর-সোফায় অর্ধশায়িত অবস্থায় বসে আছে মিস জ্যোছনা রায়। বুকে একটা সুতীক্ষ্ণধার ছোরা সমূলে বিদ্ধ হয়ে আছে। লাল টকটকে তাজা রক্তে ভেসে যাচ্ছে বক্ষবসন। কিছুটা রক্ত গড়িয়ে পড়েছে মেঝেতে কার্পেটের ওপর। চোখ দুটো ভোলা, তাকিয়ে আছে যেন সামনের দিকে।

বনহুর মুহূর্তে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

চোখ দুটো তার ঝাপসা হয়ে এলো খানিকের জন্য। প্রাণহীন জ্যোছনা রায়ের কপালে হাত রাখলো-মিস রায়, আপনার কাজ শেষ হয়েছে। ধীরে ধীরে দক্ষিণ হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে দিলো ওর।

ঠিক সেই মুহূর্তে দুটো চোখ শার্শির ফাঁকে ভেসে উঠে সরে গেলো।

বনহুরের দৃষ্টি বিনিময় হলো শার্শীর চোখ দুটির সাথে। এমন সময়ে বাইরে পদশব্দ শোনা গেলো!

বনহুর ক্ষিপ্ত পদক্ষেপে পেছনে খোলা জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেলো বাইরে।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করলেন নাহার চৌধুরী-মিস রায়, চলুন মিঃ উল্লাহ আপনাকে ডাকছেন-কথা শেষ করেই আর্তচীৎকার করে উঠলেন তিনি-খুন, খুন, খুন….

চারদিক থেকে ছুটে এলো লোকজন। অল্পক্ষণের মধ্যেই আরফান উল্লাহ, ক্যামেরাম্যান অনন্ত বাবু এবং ইউনিটের সবাই জ্যোছনা রায়ের বিশ্রামকক্ষে এসে জড়ো হলেন। সকলেরই চোখেমুখে ভীত উৎকণ্ঠা ভাব। সবাই স্তম্ভিত হতবাক। জ্যোছনা রায় কেন খুন হলো, কে তাকে খুন করলো, কি করে খুন হলো-কিন্তু কে জবাব দেবে এই হত্যা রহস্যের? যে তাকে খুন করেছে সেই জানে আর জানে মৃত জ্যোছনা রায়।

.

আপন কক্ষে পায়চারী করছে বনহুর। মুখমণ্ডল গম্ভীর। ললাটে গভীর চিন্তারেখা ফুটে উঠেছে। মাঝে মাঝে অধর দংশন করছে সে। মিস জ্যোছনা রায়ের হত্যাকাণ্ড নিয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন সে।

কে এই নির্মম হত্যাকারী যে একটা নিষ্পাপ ফুলের মতো জীবন চিরতরে বিনষ্ট করে দিলো? কার ঐ চোখ দুটো যা সর্বক্ষণ জ্যোছনা রায়কে অনুসরণ করতো? ঐ চোখ দুটি যার সেই যে জ্যোছনা রায়ের হত্যাকারী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কার ঐ চোখ দুটো....বনহুর পায়চারী। করছে আর মনোযাগ দিয়ে স্মরণ করছে, কার ঐ চোখ দুটো?

পুরুষের না নারীর!

ঢং ঢং করে দেয়াল ঘড়িটা রাত বারোটা ঘোষণা করলো।

বনহুর থমকে দাঁড়ালো। পাশের কামরায় ঘুমিয়ে আছে নূরী। ইয়াসিন ছাড়া চাকর বাকর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

ড্রয়ার খুলে রিভলবার বের করে আনলো বনহুর, প্যান্টের পকেটে রেখে, চাবির গোছা তুলে নিলো হাতে-আলমারী খুলতে যাবে, এমন সময় বাইরে মোটর থামার শব্দ হলো।

বনহুর তাড়াতাড়ি আলমারীর চাবি বন্ধ করে শয্যায় এসে শুয়ে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো।

এমন সময় ইয়াসিন এসে দরজার বাইরে থেকে বললো-সাহেব, মালিক আইছেন।

বনহুর ধড়মড় করে উঠে বসলো–বলো গিয়ে আসছি।

চলে যায় ইয়াসিন।

বনহুর দ্রুত শরীরের পোশাক পাল্টে নাইট ড্রেস পরে নেয়। তারপর চুলগুলো আংগুল দিয়ে এলোমেলো করে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখোভাব স্বাভাবিক করে নেবার চেষ্টা করে। আরফান উল্লাহ যেন বুঝতে না পারেন জ্যোছনা রায়ের হত্যাকাণ্ডের কথা সে জানে।

স্লিপিং গাউনটা পরে নিয়ে বেল্টের ফিতা বাঁধতে বাঁধতে কক্ষ থেকে। বেরিয়ে আসে বনহুর। সে যেন হত্যাকাণ্ডের কিছুই জানে না, এমন স্বাভাবিক ভাব মুখে ফুটিয়ে তোলে।

হলঘরে প্রবেশ করতেই বনহুর দেখতে পেলো হলঘরের মেঝেতে উৎকণ্ঠিত এবং ব্যস্তভাবে পায়চারী করছেন আরফান উল্লাহ। মুখোভাব গম্ভীর থমথমে, আষাঢ়ের আকাশের মতোই অন্ধকার।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করেই হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললো-হ্যালো মিঃ উল্লাহ, আপনি!

আরফান উল্লাহ ফিরে তাকালেন বনহুরের মুখে, ঢোক গিলে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন-মিঃ চৌধুরী, বড় দুঃসংবাদ!

দুঃসংবাদ! বনহুর চোখে মুখে বিস্ময় টেনে বললো।

হাঁ, মিস জ্যোছনা রায় নিহত হয়েছেন।

কি বললেন, মিস রায় নিহত হয়েছেন!

হাঁ। তার কাজ হয়ে গেছে-কথাটা বলে বনহুর আরফান উল্লাহর মুখে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো।

আরফান উল্লাহ বনহুরের কথায় যেন একটু চমকে উঠলেন!

বনহুর বললো-বসুন মিঃ উল্লাহ।

আরফান উল্লাহ বসে পড়লেন একটা সোফায় ধপ করে।

বনহুরের ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠলো, বললো যে একটা উজ্জ্বল তারকা খসে পড়লো চিরতরে।

হাঁ মিঃ চৌধুরী, আপনি সত্য কথা বলেছেন। জ্যোছনা রায় একটা দীপ্ত প্রতিভা ছিল।

কে সেই দীপশিখা নিভিয়ে দিলো বলতে পারেন?

আমি-আমি কেমন করে বলবো মিঃ চৌধুরী?

সে কথা সত্য, আপনি কি করে বলবেন মিস রায়ের হত্যাকারী কে। কিন্তু আমি জানি কে তাকে হত্যা করেছে।

আপনি-আপনি জানেন? জানেন কে জ্যোছনা রায়কে হত্যা করেছে?

জানি। কারণ আমি জানতাম, মিস রায় নিহত হবে।

জানতেন!

হাঁ, জানতাম মিঃ উল্লাহ। আপনি ঐ কক্ষের শার্শীর ফাঁকে দেখুন, হত্যাকারী ঐ কক্ষে আছে। বনহুর পাশের কক্ষে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো।

মিঃ উল্লাহ উঠে দাঁড়ালেন এবং বেরিয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে।

হাঁ, সেই দুটি চোখ।

ফিরে এলো বনহুর ড্রইংরুমে।

কয়েক মিনিট পর এলেন আরফান উল্লাহ-ও ঘরে তো কাউকে দেখলাম না মিঃ চৌধুরী?

আশ্চর্য! একটু পূর্বেই তো আমি ও ঘরে অরুণ বাবুকে বসিয়ে রেখে এসেছিলাম।

বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললেন আরফান উল্লা–অরুণ বাবু! একটু থেমে বললেন-আমারও ঐ রকম সন্দেহ হয়েছিলো।

কিন্তু এই হত্যার মূল কারণ আমি।

আপনি! বলেন কি মিঃ চৌধুরী।

যা সত্য তাই বলছি মিঃ উরাহ, আমিই জ্যোছনা রায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী!

আরফান উল্লাহ অবাক কণ্ঠে বললেন-আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথা।

বুঝতে পারবেন, যেদিন হত্যাকারী আপনার সামনে উপস্থিত হবে।

অরুণ বাবুকে আমারও সন্দেহ হয়েছিলো প্রথম থেকে। কারণ সে তাকে হত্যার হুমকি দিয়ে চিঠি দিয়েছে।

বনহুর একটা শব্দ করলো-লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে?

হাঁ, পুলিশ তদন্তের পর লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

তার বাড়িতে সংবাদ দেওয়া হয়েছে? মানে মিস জ্যোছনা রায়ের বাড়িতে তার হত্যার সংবাদ দিয়েছেন?

হাঁ, তার মা এসেছিলেন আহা, বেচারী একেবারে পাগলিনী হয়ে পড়েছেন।

বনহুর কোনো কথা বললো না।

আরফান উল্লাহ বলে চলেছেন-মিস জ্যোছনা রায়কে হারিয়ে আমি অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি। আমার ব্যবসারও ভীষণ ক্ষতি হলো ওকে হারিয়ে।

না হলে আপনি এত রাতে আসবেন কেন? যাক, যা ওর ভাগ্যে ছিলো হয়ে গেছে।

হাঁ সে কথা অবশ্য সত্যি। অমন হিরোইন আর পাবো কিনা সন্দেহ।

তা মিস আতিয়া.....

ঠাট্টা করছেন?

ঠাট্টা নয়, আপনার পরবর্তী ছবির হিরোইন হবে আতিয়া।

আর হিরো?

আমি, আমিই আতিয়ার বিপরীতে কাজ করবো। মিঃ উল্লাহ, সেই ছবি হবে অদ্ভুত-অপূর্ব! সে ছবি বক্স অফিস হিট করবে।

আনন্দের আতিশয্যে অস্ফুটধ্বনি করলেন আরফান উল্লাহ-মিঃ চৌধুরী।

যা গেছে তা নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই, আপনি আগামী ছবির জন্য প্রস্তুত হোন মিঃ উল্লাহ।

আমি আনন্দে আত্মসংযম হারিয়ে ফেলছি মিঃ চৌধুরী। পরবর্তী ছবিতে আপনি যত টাকা চাইবেন দেবো! যা চাবেন পাবেন।

ভ্রূকুঞ্চিত করে আরফান উল্লাহর মুখে তাকিয়ে রইলো বনহুর।

খুশিতে দুলে উঠছে আরফান উল্লাহর ভুঁড়িটা।

বনহুর বললো এবার-মিঃ উল্লাহ, রাত বেড়ে আসছে।

হাঁ, দুটোর বেশি হয়ে গেছে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন আরফান উল্লাহ।

বনহুর হাই তুলে উঠে দাঁড়ালো-মিস আতিয়াকে, সকালে আসতে বলবেন, কথা আছে তার সঙ্গে।

আস্থা, নিশ্চয়ই বলবো। খুশিতে আরফান উল্লাহর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো।

বনহুর আরফান উল্লাহকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলো।

বাড়ি ফিরে আরফান উল্লাহ নিশ্চিন্ত মনে শয্যা গ্রহণ করলেন। রাজপ্রাসাদের মত মস্ত বাড়ির দ্বিতল একটা কক্ষে, দুগ্ধফেননিত বিছানায় গা ঢেলে দিলেন আরফান উল্লাহ। রাত তখন চারটে বাজতে কয়েক মিনিট বাকী। শিয়রে আলমারী। লক্ষ লক্ষ টাকা, প্রতিদিন আলমারীতে এসে জমা হচ্ছে। অর্থলোভী আরফান উল্লাহ দুলাখ টাকা মূল্যের সোনা মধুগঙ্গার বুকে, হারিয়ে উম্মাদ হয়ে উঠলেন-আরও অর্থ চাই তার, আর চাই মিঃ চৌধুরীকে-এমন সুপুরুষ যুবককে তার প্রডাকশনের প্রতিটি ছবির নায়ক রূপে পেলে অর্থের কোনো অভাব হবে না। হিরো পাওয়া খুব মুশকিল নয়, অর্থ হলে সব হয়। শুধু ছবির হিরোর জন্য আরফান উল্লাহ ব্যস্ত নন-তার একমাত্র আদরিণী কন্যার জামাতারূপেও মিঃ চৌধুরী অপূর্ব!

মিঃ চৌধুরী অনেকখানি নমনীয় হয়ে এসেছে। আতিয়াকে এবার সে। বিয়ে করতে রাজী হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পাশের কামরায় আতিয়া তখন বিছানায় ঘোৎ ঘোৎ করে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন গুড় গুড় করে আষাঢ়ে মেঘ ডাকছে।

বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছেন আরফান উল্লাহ। বালিশের তলায় আলমারীর চাবির গোছা একবার হাত দিয়ে দেখে নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলেন। তারপর নিশ্চিন্তে চোখ দুটো বন্ধ করলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন জানালার শার্শী খুলে গেলো। সারা শরীরে জমকালো পোশাক পরিহিত, মুখে মুখোশ, দক্ষিণ হাতে সুতীক্ষ্ণধার ছোরা, কক্ষে প্রবেশ করলো এক ব্যক্তি।

একটা শব্দ হতেই আরফান উল্লাহ বিছানায় দ্রুত উঠে বসলেন, ফিরে তাকাতেই বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো তার মুখমণ্ডল।

ততক্ষণে জমকালো পোশাক পরিহিত মূর্তি ছোরা উদ্যত করে আরফান, উল্লাহর সামনে এসে দাঁড়ালো।

ভীত কম্পিত কণ্ঠে বললেন আরফান উল্লাহ-কে তুমি?

গভীর চাপা কণ্ঠস্বর জমকালো মূর্তির-যমদুত!

ঢোক গিলে বললেন আরফান উল্লাহ-কি চাও তুমি?

জানতে চাই জ্যোছনা রায়কে কেন তুমি হত্যা করেছে?

আমি-আমি জ্যোছনা রায়কে হত্যা করিনি!

মিথ্যা কথা বলতে চেষ্ট করোনা।

কে তুমি?

একটু পরেই আমার পরিচয় পাবে। তার পূর্বে জবাব দাও-জ্যোছনা রায়কে কেন তুমি হত্যা করেছো?

আমি তাকে হত্যা করিনি।

তুমি তাকে হত্যা করোনি?....বাম হাতে আরফান উল্লাহর টুটি টিপে ধরলো জমকালো মূর্তি, তার হাতের ছোরাখানা ডিমলাইটের আলোতে ঝক্‌ঝক করে উঠলো।

আরফান উল্লাহর চোখ দুটো ছানাবড়ার মত হয়ে উঠেছে। মুখটা হা হয়ে গেছে, গোঁ গোঁ শব্দ করে বললেন-আমাকে প্রাণে মেরো না। আমাকে প্রাণে মেরো না, বলছি....বলছি....

জমকালো মূর্তি সোজা হয়ে দাঁড়ালো, বাম হাত আরফান উল্লাহর গলা থেকে সরিয়ে বললো-বলো?

আমি....আমিই জ্যোছনা রায়কে হত্যা করেছি। আমিই তাকে... হত্যা..ক..রে..ছি... আরফান উল্লাহর চোখেমুখে ফুটে উঠলে খুনীর সুস্পষ্ট ছাপ।

জমকালো মূর্তি পুনরায় চাপস্বরে গর্জে উঠলো-কি অপরাধ সে করেছিলো তোমার?

অপরাধ! অপরাধ...সে...থামলেন আরফান উল্লাহ।

জমকালো মূর্তি দাঁতে দাঁত পিষে বললো-একটা কথা মিথ্যা উচ্চারণ করলেই এই ছোরা তোমার বুকে বিদ্ধ হবে-ভুলে যেও না, তুমি যমদুতের সামনে কথা

বলছে।

আরফান উল্লাহ ভয়ার্ত চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগলেন ছোরাখানার দিকে। একখানা মৃতুমলিন বিবর্ণ মুখ ভেসে উঠলো সেই মুহূর্তে তার চোখের সামনে। অসহায় করুণ দুটি নিষ্পাপ চোখ। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ভরা করুণ কণ্ঠস্বর....আপনি...আমাকে হত্যা করবেন...কি অপরাধ আমি করেছি...কোনো জবাব সে পায়নি, একখানা সুতীক্ষ্ণধার ছোরা সমূলে বিদ্ধ হয়েছিলো জ্যোছনা রায়ের বুকে। একটা তীব্র আর্তনাদ শুধু ক্ষণিকের জন্য ছড়িয়ে পড়েছিলো কক্ষে- দৃশ্যটা আরফান উল্লাহর চোখে ফুটে উঠলো। ভয়বিহ্বল দৃষ্টি মেলে তাকালেন তিনি জমকালো মূর্তির দিকে।

আরফান উল্লাহ এবার বললেন-অপরাধ সে কিছুই করেনি কিন্তু-কিন্তু...

কেন তুমি তাকে হত্যা করলে?

আমার কন্যা আতিয়ার সুখের জন্য....

বলো থামলে কেন?

মিঃ চৌধুরীকে আমার আতিয়া ভালবাসে কিন্তু মিঃ চৌধুরী ভালবাসে মিস জ্যোছনা রায়কে...তাই...তাই পথের কাঁটা আমি সরিয়ে ফেলেছি। তাই ...হত্যা করেছি ওকে...

একটানে মুখের কালো আবরণ খুলে ফেললো জমকালো মূর্তি।

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ভরা অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলেন আরফান উল্লাহ মিঃ চৌধুরী...আপনি...

হাঁ, কিন্তু মিঃ চৌধুরী নয়, দস্যু বনহুর।

দস্যু বনহুর! আমার কুন্তিবাঈ ছবির নায়ক দস্যু বনহুর! এ্যাঃ এ্যাঃ...আপনি... আপনি-আমার আতিয়া তবে-তবে সে ভুল করেছে-কোনোদিন সে মিঃ চৌধুরীকে পাবে না?

শুধু আতিয়াই ভুল করেনি, ভুল করেছো তুমি-জ্যোছনা রায়কে হত্যা করে যে ভুল তুমি করেছো তার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করো–

সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের হাতের ছোরা সমূলে বিদ্ধ হলো কুন্তিবাঈ ছবির প্রযোজক আরফান উল্লাহর বুকে। তীব্র একটা আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে গড়িয়ে পড়লেন তিনি খাটের নীচে। চীৎ হয়ে পড়ে রইলো আরফান উল্লাহ। তাজা লাল টকটকে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো মেঝের মূল্যবান কার্পেটের ওপর।

বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

প্যান্টের পকেট থেকে মূল্যবান ছোট টেপ রেকর্ডার বের করে টেবিলে রাখলো। এতক্ষণ বনহুরের পকেটে চালু ছিলো টেপরেকর্ডার। প্রথম থেকে আরফান উল্লাহর সঙ্গে বনহুরের যে কথাবার্তা হয়েছিলো সব রেকর্ড হয়ে গেছে। এবার সুইট টিপে টেপরেকর্ডটা বন্ধ করে দিলো বনহুর।

তারপর বালিশের তলা থেকে বের করে নিলো চাবির গোছা। এগুলো আলমারীটার দিকে যার মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে আরফান উল্লাহর উপার্জিত লাখ লাখ টাকা।

.

পুলিশ অফিস।

ইন্সপেক্টারের টেবিলে ফোনটা বেজে উঠলো ক্রিং ক্রিং করে। ফোনটা বেজেই চলেছে সশব্দে।

ভোর সাড়ে পাঁচটা।

দুজন পুলিশ পাহারারত। অফিস-ইনচার্জ ও, সি ধরলেন—হ্যালো-হ্যালো–

ওদিক থেকে ভেসে এলো দস্যু বনহুরের কণ্ঠস্বর-মিঃ আরফান উল্লাহ খুন হয়েছেন। এইমাত্র তাকে খুন করা হলো–

ওসির হাত থেকে রিসিভার খসে পড়তে যাচ্ছিলো, শক্ত করে ধরে বললেন তিনি-হ্যালো, আপনি কে কথা বলছেন? কোথা থেকে বলছেন?

ওদিক থেকে ভেসে এলো বনহুরের গলা-দস্যু বনহুর কথা বলছি। কুন্তিবাঈ ছবির প্রযোজক আরফান উল্লাহর বাড়ি থেকে।

দস্যু বনহুর!

মুহূর্ত বিলম্ব না করে চলে আসুন। পুলিশ ফোর্সসহ চলে আসুন…হ্যালো, দেরী করবেন না, চলে আসুন-ওদিকে রিসিভার রাখার শব্দ হলো।

ওসির হাত কাঁপছিলো, তাড়াতাড়ি রিসিভার রেখে একটু সুস্থ হয়ে নিলেন, পরক্ষণেই আবার রিসিভার হাতে তুলে নিয়ে ইন্সপেক্টারকে ফোন করলেন- আরফান উল্লাহ খুন হয়েছেন। এক্ষুণি সেখানে যেতে হবে–

পুলিশ ভ্যান যখন আরফান উল্লাহর বাড়ির গেটে এসে থামলো তখনও আতিয়ার ঘুম ভাঙ্গেনি।

ওদিকে তখন দস্যু বনহুর নূরীসহ তার নতুন গাড়িখানা নিয়ে অজানা পথ ধরে স্পীডে এগিয়ে যাচ্ছে। রাত ভোর হবার পূর্বেই এ শহর ছেড়ে দূরে-বহুদূরে চলে যেতে হবে তাকে।

০১৬. কান্দাই-এর পথে দস্যু বনহুর

কান্দাই-এর পথে দস্যু বনহুর – দস্যু বনহুর সিরিজ – রোমেনা আফাজ

ডবল স্পীডে গাড়িখানা ছুটে চলেছে। ড্রাইভ করছে স্বয়ং দস্যু বনহুর। গাড়ির পিছনের আসনে সংজ্ঞাহীন নুরী। মাঝে মাঝে বনহুর নূরীর দিকে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলো, আসনের নীচে গড়িয়ে পড়ে না যায়।

বনহুরের দৃষ্টি গাড়ির সম্মুখ পথে থাকলেও মনের মধ্যে নানা চিন্তার জাল ছড়িয়ে পড়ছিলো।...জ্যোছনা রায়কে হত্যার জন্য বনহুর হত্যা করলো আরফান উল্লাহকে। কারণ, আরফান উল্লাহই জ্যোছনা রায়ের হত্যাকারী। বনহুর যখন স্টুডিওতে প্রথম দিন পদার্পণ করেছিলো, সেই দিনই বিশ্রাম–কক্ষে জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে আলাপকালে দেখেছিলো দুটি চোখ। শার্শির ফাঁকে চোখ দুটো ক্ষণিকের জন্য ভেসে উঠে মিশে গিয়েছিলো তখনই। বনহুর জ্যোছনা রায়কে এ কথা না বলেই দ্রুত পদে গিয়েছিলো শার্শির পাশে। জানালার শার্শি খুলে লক্ষ্য করেছিলো বারান্দার চারপাশে কিন্তু কাউকেই নজরে পড়ে নি। বনহুরের সন্দেহ হয়েছিলো, জ্যোছনা রায়ের সঙ্গে তার মেলামেশা কেউ যেন ফলো করছে। এবং সে লোকটি অরুণ বাবু ছাড়া অন্য কেহ নয়। সেদিনের পর থেকেই বনহুর অরুণ বাবুর উপর গোপনে নজর রেখেছিলো তীক্ষ্ণভাবে।

বনহুর জানতো, অরুণ বাবু জ্যোছনা রায়কে গভীরভাবে ভালবাসে, এবং সে জন্যই সে তার পিছনে লেগে রয়েছে ছায়ার মত। বনহুরের সঙ্গে জ্যোছনার মেলামেশা তার কাছে অসহ্যনীয়।

কিন্তু বনহুর শেষ পর্যন্ত সর্বান্তঃকরণে অনুভব করেছিলো, অরুণ বাবু জ্যোছনা রায়কে বার বার হত্যার হুমকি দেখালেও আসলে সে কোন দিন জ্যোছনা রায়কে হত্যা করতে পারতো না। কারণ, অরুণ বাবু তাকে। ভালবাসতো সত্যি করে।

প্রেম-প্রীতি ভালবাসা দিয়েও যখন সে জ্যোছনা রায়ের কাছে এতোটুকু করুণা পায়নি, তখন সে ক্ষেপে উঠেছিলো চরম ভাবে। তখনই সে হত্যার হুমকি দেখাতেও কসুর করেনি জ্যোছনা রায়কে।

তারপর বনহুর আবিস্কার করেছিলো জ্যোছনা রায়ের আসল হত্যাকারীকে। শুধু আবিস্কার করেই সে ক্ষান্ত হয় নি, নিজ হস্তে জ্যোছনা রায়ের হত্যাকারীকে সমুচিত শাস্তি দিয়ে তবেই নিশ্চিন্ত হয়েছিলো।

পুলিশের হাতেও সঁপে দিতে পারতো বনহুর আরফান উল্লাহকে। কিন্তু তা সে করে নি। কারণ, হত্যাকারী কোটিপতি, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে তার কিছুমাত্র কষ্ট হতো না। পুলিশের হাত থেকে অনায়াসে সে নিজেকে মুক্তি করে নিতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই বনহুর স্বয়ং আরফান উল্লাহকে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত দিয়েছিলো।

আরফান উল্লাহই যে জ্যোছনা রায়ের হত্যাকারী, এটাও বনহুর প্রমাণ করে দিয়েছিলো পুলিশের কাছে টেপ রেকর্ডের মাধ্যমে। কাজেই কে আসল খুনী সেটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো।

আরফান উল্লাহকে হত্যার পূর্বে বুদ্ধিমান দস্যু বনহুর টেপ রেকর্ড রেখে কথোপকথন করেছিলো তার সঙ্গে এবং শেষ পর্যন্ত হত্যা করেছিলো তাকে, এমন কি নিজের পরিচয়টাও আরফান উল্লাহকে দিয়েছিলো স্বয়ং দস্যু বনহুর।

পুলিশ যখন আরফান উল্লাহর লাশের পাশে আবিষ্কার করলো টেপ রেকর্ড, এবং টেপ রেকর্ড থেকে জানতে পারলো জ্যোছনা রায়ের আসল হত্যাকারীকে, তখন পুলিশ মহল শুধু বিস্মিতই হলোনা, স্তব্ধও হলো।

খুনীকে গ্রেপ্তারের পূর্বেই সে নিহত হয়েছে, এবং তাকে হত্যা করেছে যে ব্যক্তি, সে অন্য কেহ নয়–স্বয়ং দস্যু বনহুর।

এদিকে পুলিশ মহলে যখন জ্যোছনা রায় ও আরফান উল্লাহর হত্যাকাণ্ড নিয়ে তোলপাড় শুরু হলো, ঠিক তখন দস্যু বনহুর সংজ্ঞাহীন নূরীকে নিয়ে কান্দাই-এর পথে ছুটে চলেছে।

নূরীকে সংজ্ঞাহীন করেছে বনহুর, না হলে সে রাতের অন্ধকারে হঠাৎ এ ভাবে তার সঙ্গে রওয়ানা দিতে রাজি হতো না। একটা বিভ্রাট ঘটিয়ে বসতো হয়তো সে।

সেই কারণেই বনহুর এই উপায় অবলম্বন করছে।

জ্যোছনা রায়ের হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে বনহুর যখন তার বাসায় ফিরে গিয়েছিলো তখন নূরী নিজের কক্ষের বিছানায় গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলো।

বনহুর কিছু পূর্বে আরফান উল্লাহকে হত্যা করলেও ঠিক পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক ছিলো, এতোটুকু পরিবর্তন আসেনি তার মধ্যে। কারণ, বনহুরের নরহত্যা নেশা না হলেও এটা তার অভ্যাসগত ব্যাপার, কাজেই বিচলিত হবার কিছুই ছিলো না বনহুরের।

নূরীর কক্ষে প্রবেশ করে সোজা গিয়ে দাঁড়ালো নূরীর শয্যার পাশে। এই রাতেই তাকে এ শহর ত্যাগ করতে হবে। কাজ শেষ হয়েছে, এবার ফিরতে হবে কান্দাই-এ। যেখানে তার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছে স্নেহময়ী জননী আর প্রেয়সী স্ত্রী মনিরা। কিন্তু নূরী আজ স্বাভাবিক জ্ঞানবতী নেই, তাকে পাগল বললেও ভুল হয় না। যাদুকরের কোন বিষময় ঔষধে আজ সে জ্ঞানশূন্য।

এই গভীর রাতে নূরী কিছুতেই তার সঙ্গে পালাতে রাজি হবে না সহজে। হয়তো একটা হট্টগোল বাধিয়ে বসতে পারে। তাই বনহুর নূরীকে অজ্ঞান করে তুলে নিলো হাতের উপরে।

সমস্ত বাড়িখানা ঝিমিয়ে পড়েছিলো, এমন কি বাড়ির চাকর বাকররাও ঘুমিয়ে ছিলো আরামে।

বনহুর নূরীর সংজ্ঞাহীন দেহটা হাতের উপর তুলে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো বাইরে।

অদূরে পাইন গাছের আড়ালে দণ্ডায়মান নতুন গাড়িখানার পাশে এসে একবার সচকিতভাবে তাকিয়ে দেখে নিলো বাড়ির খানার দিকে। আজ এক বছরের কত স্মৃতি জড়ানো রয়েছে ঐ বাড়িখানায়। ক্ষণিকের জন্য একবার বনহুরের মনে ভেসে উঠেছিলো আতিয়ার মুখখানা।

গাড়ির পিছন আসনে নূরীকে শুইয়ে দিয়ে ড্রাইভ আসনে এসে বসলো বনহুর। তারপর গাড়িতে স্টার্ট দিলো। বনহুর একবার পকেটে হাত দিয়ে রিভলভারখানার অস্তিত্ব অনুভব করে নিতে ভুললো না।

জনহীন রাজপথ বেয়ে বনহুর উল্কাবেগে গাড়ি চালিয়ে চললো। রাত ভোর হবার পূর্বেই তাকে শহরের বাইরে গিয়ে পৌঁছতে হবে।

০২.

পূর্ব আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে।

বনহুরের গাড়ি এখন শহর ছেড়ে একটা পাহাড়ের পাশ কেটে এগুচ্ছে। এতো স্পীডে গাড়ি চালিয়ে এসেছে বনহুর যে, মাত্র কয়েক ঘন্টায় শহর ত্যাগ করতে সক্ষম হয়েছে।

বনহুরের ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। চুলগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে ললাটের চারপাশে।

এখনও নূরীর সংজ্ঞা ফিরে আসে নি। ছিন্ন লতার ন্যায় পিছন আসনে লুটিয়ে আছে নূরী। এক গুচ্ছ রজনী গন্ধার মতই সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে।

বনহুর একটি নির্জন স্থানে গাড়ি রাখলো। দক্ষিণ পাশে উঁচু পাহাড়। ঝোপ-ঝাপ আর আগাছায় ভরা জায়গাটা। মাঝে মাঝে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ কালের প্রহরীর মত মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে। কোন কোন স্থানে বন আর গভীর জঙ্গল। এসবের পাশ কেটেই এগিয়ে গেছে একটা প্রশস্ত পথ সম্মুখের দিকে।

বনহুর ঐ পথ ধরেই গাড়ি চালাচ্ছিলো। এই এতোটা পথ আসতে তার তেমন কোন অসুবিধা বা কষ্ট হয়নি, কারণ পথটা সম্পূর্ণ পাকা না হলেও বেশ মসৃণ এবং সমতল ছিলো।

একটা শাল বৃক্ষের তলায় গাড়ি রাখলো বনহুর। প্যান্টের পকেট থেকে রুমালখানা বের করে ললাটের ঘাম মুছে ফেললো সে। তারপর ড্রাইভ

আসন থেকে নেমে এলো নীচে।

ইতিমধ্যে নূরীও চোখ মেলে তাকাচ্ছে ধীরে ধীরে। বনহুর পিছন আসনে উঠে বসলো, নূরীর চুলে হাত বুলিয়ে ডাকলো–নূরী!

নূরী চোখ মেলে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। উঠে বসতে গেলো। বনহুর নূরীকে শুইয়ে দিয়ে বললো–আর একটু শুয়ে থাকো। নূরী চারদিকে তাকিয়ে অবাক হলো, এটাতো তার শয়নকক্ষ নয়! ঘন বন আর পাহাড় ছাড়া কিছুই দেখতে পেলো না।

নূরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো বনহুর নূরী, এটা তোমার কক্ষ নয়, এটা মোটরগাড়ি।

আমি কোথায়? নূরীর কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা শব্দ।

বনহুর আরও একটু ঝুকে পড়লো নূরীর মুখের উপর, বললো–তুমি এখন শহরের বাইরে।

উঠে বসলো নূরী এবার, পুনরায় চারদিকে তাকিয়ে বললো সে–এ আপনি আমায় কোথায় নিয়ে এসেছেন?

ভয় নেই, আমি তোমাকে ভাল জায়গায় নিয়ে যাবো।

না, আমি যাবো না আপনার সঙ্গে।

এতোদিন তো আমার সঙ্গেই আছো, কই কোনদিন তো আমার সঙ্গে কোথাও যেতে আপত্তি করোনি।

নূরী নিপ কিছু ভাবতে লাগলো।

বনহুর বললো-নূরী, যেখানে ছিলাম সেখানে আমাদের জন্য বিপদ দেখা দিয়েছিলো, ওখানে থাকা আর সম্ভব নয়, তাই…।

তাই আবার আপনি আমাকে পাহাড়ে জঙ্গলে নিয়ে এলেন। আমার কিন্তু ভয় করছে, আবার যদি ঐ যাদুকর শয়তানটা আমাকে ধরে নিয়ে যায়?

হাসলো বনহুর, কুঞ্চিত করে তাকালো–নূরী, সে, শয়তান আর বেঁচে নেই, যাদুকরকে আমি হত্যা করেছিলাম।

নূরী এতোদিনে যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলো। বললো সে–সত্যি?

হাঁ নূরী, সত্যি। বনহুর নূরীর দক্ষিণ হাতখানা মুঠায় চেপে ধরলো। নির্নিমেষ নয়নে তাকালো সে নূরীর মুখের দিকে।

নূরীও তাকিয়ে ছিলো অপলক চোখে বনহুরের দিকে। বনহুর ব্যাকুল কণ্ঠে বললো–নূরী, আজও তুমি আমায় চিনতে পারলে না? গলার স্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো তার।

নূরী অনেক বার একথা শুনেছে বনহুরের মুখে; অনেকদিন ভেবেছেস্মরণ করতে চেষ্টা করেছে; কিন্তু কিছুই তার মনে পড়েনি। আজও নূরী ভাবে–কিছুতেই স্মরণ হয়না কোন কথা।

বনহুর হতাশভাবে নেমে যায় পিছন আসন থেকে। ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে স্টার্ট দেয়। আবার ছুটতে শুরু করে বনহুরের গাড়িখানা।

অবিরাম এগিয়ে চলে সম্মুখের দিকে। পাহাড়ের গা বেয়ে আঁকাবাঁকা পথ। এবার সাবধানে গাড়ি চালাতে হচ্ছে বনহুরকে; কারণ একটু এদিক ওদিক হলেই আর কি-হাজার ফিট নীচে গাড়িখানা পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

বনহুর নূরীকে সাবধানে চুপ করে বসে থাকতে বললো।

সত্যি, বনহুর যে পথে গাড়ি চালাচ্ছিলো সে পথ অতি দুর্গম, অতি ভয়ঙ্কর পথ। এই পথটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কেউ জানেনা। বনহুর লোকমুখে শুনেছিলো, এ পথটা নাকি চলে গেছে পাহাড়ের গা বেয়ে বহু দুরে–কোন এক নগরের বুকে গিয়ে মিশেছে। আর সে পথ বেয়ে বনহুর অজানা নগরের দিকে ছুটে চলেছে।

এ পথে তেমন কোন গাড়ি বা লোকজনের আনাগোনা ছিলোনা, কাজেই বনহুরের গাড়ি চালাতে অন্য কোন বাধা সৃষ্টি হচ্ছিলো না।

বেলা ক্রমেই বেড়ে উঠছিলো, বনহুর নিজে বেশ ক্ষুধা অনুভব করলো। নূরীর যে ক্ষুধা পেয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। গত রাতে তারা আহার করেছিলো আর আজ এতো বেলা হলো কোন কিছু মুখে পড়েনি।

এমন জায়গা,–পাহাড় আর পাথর ছাড়া কিছুই নেই কোনখানে। হঠাৎ দুএকটা বৃক্ষাদি নজরে পড়ে কিন্তু সেগুলো কোন ফলবৃক্ষ নয়। বনহুর নিজের জন্য

চিন্তিত না হলেও নূরীর জন্য বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। কি করা যায়, একটু কিছু নূরীকে খাওয়াতে পারলে কতকটা নিশ্চিন্ত হতে পারতো সে।

বনহুরের গাড়ি এখন স্বাভাবিক গতিতে এগুচ্ছিলো। এখন পথটা আরও সঙ্কীর্ণ দুর্গম। অতি সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছিলো বনহুর।.

নূরী নিপ বসেছিলো পিছন আসনে। মুখে তার কোন কথা নেই। বনহুর মাঝে মাঝে নূরীর সঙ্গে দুএকটা কথাবার্তা বলে তাকে উৎসাহিত করছিলো। নূরী তার কথায় দুএকটা জবাব দিলেও তেমন কোন ভাব ছিলো

তার মধ্যে বনহুর যার মধ্যে কোন আনন্দ বা উৎসাহ খুঁজে পায় না। বনহুর ভাবছিলো, কোন রকমে একবার কান্দাই-এ নিজ আস্তানায় পৌঁছতে পারলে নূরীর চিকিৎসার সুযোগ আসবে। যাদুকর নূরীকে এমন কোন ঔষধ দ্বারা তার স্বাভাবিক জ্ঞান সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছিলো যার জন্য আজও নূরী তাকে চিনতে পারছে না বা পারেনি। যে নূরী তাকে এক মুহূর্ত

দেখলে ব্যস্ত হয়ে পড়তো, একটু কথা না বললে অভিমানে মুখ ভার করে থাকতো, আজ সে নূরী—

বনহুরের চিন্তাজালে বাধা পড়লো, একটা শব্দ ভেসে আসছে তার কানে। দূরে বহু দূরে কোন মোটর গাড়ির শব্দ হচ্ছে যেন।

বনহুর বেশ চিন্তিত হলো। গাড়ির শব্দটা সম্মুখ দিক থেকেই যেন আসছে।

পথটা এতো সঙ্কীর্ণ, যে পাশাপাশি দুখানা গাড়ি চলা কঠিন। কাজেই সম্মুখ দিকে কোন গাড়ি এসে পড়লে বিপদ অনিবার্য।

শব্দটা ক্রমেই স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে আসছে, সম্মুখের গাড়িখানা যে অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে আসছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বনহুর নিজের গাড়ি থামিয়ে ফেললো, এবং নূরীকে বললো–শিঘ্র নেমে পড়ো নূরী।

বনহুর গাড়ি থেকে নেমে পিছন আসনের দরজা খুলে ধরলো–এসো নূরী।

নূরীকে নামিয়ে নিয়ে বনহুর পথের একধারে সরে দাঁড়ালো, শব্দটা অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে আসছে।

স্তব্ধ নিশ্বাসে বনহুর প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

গাড়ি ছেড়ে প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে একটা সমতল স্থানে নূরীসহ বনহুর দাঁড়িয়ে রইলো। জায়গাটা ঝোপ-ঝাড়ে আর আগাছায় ভরা, কাজেই পথ থেকে সহজে কেউ তাদের দেখতে পাবে না।

বনহুর আর নূরী হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠলো, সম্মুখে তাকিয়ে দেখলো—একটা মস্ত বড় ট্রাক সাঁ সাঁ করে ছুটে এসে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারলো পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা তাদের গাড়িখানায়। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা একটা খেলনা গাড়ির মত ছিটকে পড়লো একেবারে হাজার ফিট নীচে।

নূরী গাড়িখানার এ মর্মান্তিক অবস্থা দেখে শিউরে উঠলো, দুহাতে চোখ ঢেকে ফেললো সে।

বনহুর নূরীর কানে মুখ নিয়ে বললো–আর একটু হলেই আমাদের অবস্থা কি হতো বলতো? ঐ গাড়িখানার মত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতাম।

নূরী ভীত দৃষ্টি মেলে তাকালো হাজার ফিট নীচে গড়িয়ে পড়া চ্যাপটা গাড়িখানার দিকে।

বনহুর এবার বললো–খোদর কাছে হাজার শুকরিয়া নূরী, আমরা শোচনীয় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলাম।

বনহুর এবারে তাকিয়ে দেখলো–ট্রাকখানা তাদের গাড়িটায় ধাক্কা খেয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে থেমে পড়েছে। বিস্ময়ে অবাক হয়ে দেখলো বনহুরট্রাক বোঝাই করা কি সব জিনিসপত্র রয়েছে। সে সব জিনিসের উপর বসে রয়েছে কয়েকজন বলিষ্ঠ চেহারার মানুষ। লোকগুলোর দেহে অদ্ভুত ধরনের পোশাক। গায়ে বু রং এর প্যান্ট, শরীরে ঐ রং এরই সার্ট, মাথায় চোস্ত টুপি। টুপি দিয়ে সমস্ত মাথা আর মুখ টাকা, শুধু চোখগুলো জ্বল জ্বল করতে টুপির সম্মুখ ভাগের দুটো করে ফুটো দিয়ে।

ড্রাইভারের শরীরেও ঐ ধরনের ড্রেস। কিন্তু ড্রাইভ আসনের পাশে যে লোকটি বিশাল বপু নিয়ে বসেছিলো তার দেহের পোষাক সম্পূর্ণ আলাদা। গাঢ় সবুজ তার ড্রেস। মাথায় ক্যাপ ধরনের টুপি। চোখে গগলস। কানের এবং মুখের সংগে কোন যন্ত্র আঁটা রয়েছে বলে মনে হল বনহুরের!

প্রত্যেকটা লোকের বেল্টের সঙ্গে হোরা ঝুলছে, দেখতে পেল বনহুর। কিছুক্ষণ তাকিয়ে বুঝতে পারলো, লোকগুলো স্বাভাবিক নাগরিক বা জনগণ নয়। এরা কোন দস্যুদল নিঃসন্দেহে। শহর বা অন্য কোথাও ডাকাতি করে ফিরে চলেছে আস্তানায়।

বনহুর নূরীকে চুপ থাকতে বলে ঝোপের আড়াল থেকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ট্রাকের আরোহীদের কার্যকলাপ দেখতে লাগলো।

লোকগুলো ততক্ষণে ট্রাক ছেড়ে পথের উপর নেমে পড়ছে।

ড্রাইভ আসন ত্যাগ করে মোটা লোকটাও নেমে পড়েছে। লোকটা ঐ দলের নেতা বা দলপতি হবে।

ওরা সবাই ঝুকে পড়ে তাচে চূর্ণ-বিচূর্ণ গাড়িখানা দেখছে। নিজেদের মধ্যে কোন কথাবার্তাও চলছে বলে মনে হলো।

বনহুর নূরীকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল দিয়ে এগুলো, এবার আরও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। বনহুর দেখলো, দুজন লোককে ওরা দড়ি দিয়ে মজবুত করে বেঁধে রেখেছে ট্রাকে মালপত্রের সঙ্গে।

প্রখর সূর্যের তাপে লোক দুটি কালো হয়ে উঠেছে। মুখ ও হাত পা বাধা থাকায় তারা নড়তে পারছে না বা চিষ্কার করে কাঁদতে পারছে না। মাঝে মাঝে পাকাল মাছের মত শরীরটা কুঁকড়ে নিচ্ছে।

সর্দার বা দলপতি গলায় ঝোলানো যন্ত্রটা মুখে লাগিয়ে কি যেন বললো, তারপর আবার চেপে বসলো গাড়িতে।

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য লোকগুলি সবাই গাড়িতে চেপে বসলো। ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দেবার আয়োজন করছে, এমন সময় বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভারখানা বের করে গুলী চুড়লো ডাইভারটির বুক লক্ষ্য করে।

একটা তীব্র আর্তনাদ ভেসে এলো বনহুর আর নূরীর কানে। ট্রাক-চালক মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে গাড়ির হ্যান্ডেলের উপর। মুহূর্তে ট্রাক থেকে নেমে পড়লো দলপতি।

তৎক্ষণাৎ অন্যান্য অনুচরগণ ট্রাক থেকে লাফিয়ে নীচে পথের উপর নেমে দাঁড়ালো। সকলের চোখে-মুখে বিস্ময় মনোভাব,–এই নির্জন স্থানে গুলী এলো কোথা থেকে।

দলপতির ইংগিতে সুতীক্ষ্ম ধার ছোরা হাতে খুলে নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

নূরী এ দৃশ্য লক্ষ্য করে ছুটে এসে বনহুরের বুকের মধ্যে মুখ লুকালো। বনহুর নূরীকে অভয় দিয়ে বললো–ভয় নেই, ওরা তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

নূরী থর থর করে কাঁপছে।

মুহূর্তের জন্য বনহুরের মনে পড়লো, নূরী এত সহজে ভীত হবার মেয়ে ছিল না, সেও দস্যু দুহিতা……আর আজ এতো সামান্যে নূরী হরিণ শিওর মতই দুর্বলমনা হয়ে পড়েছে। বনহুর নূরীকে সান্ত্বনা দিয়ে পুনরায় বললোনূরী, তুমি আমার পাশে থাকতে কোন ভয় নেই।

হঠাৎ বনহুর দেখলো, দুজন অদ্ভুত ড্রেস পরা লোক তাদের ঝোপটার দিকে এগিয়ে আসছে। বুঝতে পারলো, ওরা আন্দাজ করে নিয়েছে—গুলীটা এদিক থেকেই গিয়েছিলো।

কিন্তু আর কিছু ভাববার সময় নাই-বনহুর প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

লোক দুটি এগিয়ে আসতেই বনহুর নূরীকে এক পাশে সরিয়ে ঝাপিয়ে। পড়লো একজনের ঘাড়ে। প্রচণ্ড এক ঘুষিতে লোকটিকে ধরাশায়ী করে পুনরায় আক্রমণ করলো দ্বিতীয় জনকে।

বনহুরের বলিষ্ঠ হস্তের মুঠ্যাঘাতে লোকদুটি কেমন হতভম্ব হয়ে পড়েছিলো। তাদের হাতের ছোরা ছিটকে পড়েছিলো দূরে।

লোক দুটি উঠে তাড়াতাড়ি পালাতে পারলে যেন বেঁচে যায়। ভূতল শয্যা ত্যাগ করে প্রথম ব্যক্তি দিল ভোঁ দৌড়। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বনহুর পালাবার অবসর না দিয়ে পর পর তাকে ভূতলশায়ী করতে লাগলো।

ততক্ষণে অন্যান্য লোকগুলো দ্রুত এদিকে ছুটতে শুরু করছে-সকলের হস্তেই সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা। সূর্যের আলোতে ছোরাগুলো ঝকমক করে উঠছে। এক সঙ্গে যেন কতগুলো বিদ্যুৎ লহরী ছুটে আসছে এদিকে।

বনহুর দ্বিতীয় লোকটাকে শূন্যে তুলে ছুড়ে মারলো দূরে।

দলপতিসহ অন্যান্য লোকগুলো দ্রুত এগিয়ে আসছিলো। লোকটা ধপ করে এসে পড়লো তাদের সম্মুখে।

দলপতি মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালো। বনহুর কালবিলম্ব না করে রিভলবার উদ্যত করে ধরলো খবরদারএগুলোই মারব।

এক সঙ্গে সবাই দাঁড়িয়ে পড়লো। দলপতি তার মুখোসের মধ্যের চোখ দুটি দিয়ে তাকালো। বনহুরের আজ পর্যন্ত বহু দস্যুর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটেছে কিন্তু কারো চোখ এমন অগ্নিগোলকের মত তীব্র মনে হয় নি।

বনহুরের হস্তস্থিত রিভলভারের দিকে তাকিয়ে দলপতি গর্জে উঠলো–কে তুমি?

বনহুর পাল্টা প্রশ্ন করলো–তুমি কে?

হাঃ হা করে হেসে উঠলো দলপতি–আমাকে চেনোনা? আবার নিরন্তু পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত হলো সেই হাসির শব্দ, বললো দলপতি–আমার নাম কে না জানে। ডাকু হাঙ্গেরুর নাম জানেনা! আমি সেই হাঙ্গেরু ডাকু।

বনহুর একটু হেসে বললো–ওঃ তা তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি।

দলপতি গর্জে উঠলো–আমার গাড়ির চালককে তুমি হত্যা করলে কেন? কেন করেছি তার জবাব পাবে এই মুহূর্তে.......

বনহুরের কথা শেষ না হতেই দলপতির ছোরা এসে বিদ্ধ হল বনহুরের বাম বাজুতে।

ডাকু হাঙ্গেরুর ছোরা এতো দ্রুত গিয়ে বনহুরের শরীরে বিদ্ধ হয়েছিলো যে, বনহুর সরে দাঁড়াবার সুযোগ পায়নি।

আহত জন্তু যেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, তেমনি হাঙ্গেরুর ছোরার আঘাতে হিংস্র হয়ে উঠলো দস্যু বনহুর। রিভলভার উচু করে গুলী ছাড়লো হাঙ্গেরুর বুক লক্ষ্য করে।

হাঙ্গেরু বিকট একটা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো ভূতলে, সঙ্গে সঙ্গে অবাক হলো বনহুর, হাঙ্গেরুর দলবল সব যে দিকে পারে অকস্মাৎ ছুটে পালাতে লাগলো।

দলপতির মর্মান্তিক অবস্থা তার অনুচরদের একেবারে হকচকিয়ে দিয়েছে। তারা ভাবতেও পারেনি তাদের দলপতির এ অবস্থা হতে পারে। যে দিকে পারলো ছুটে পালালো।

বনহুর এবার রিভলভার পকেটে রেখে দক্ষিণ হস্তে বাম বাজু থেকে সূতীক্ষ্ণ ধার ছোরা খানা এক টানে তুলে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো।

নূরী এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলো, এবার এগিয়ে এলো। বনহুরের বাজু থেকে রক্ত ঝরতে দেখে দুহাতে চোখ ঢেকে ফেললো নূরী।

বনহুর বললো–ভয় পাবার কিছু নেই। তুমি আমাকে একটু সাহায্য করো নূরী। আমার রুমালখানা দিয়ে হাতটা শক্ত করে বেঁধে দাও।

নূরী বনহুরের নির্দেশ মত কাজ করলো।

বনহুর একবার ফিরে তাকালো ডাকু হাঙ্গেরুর মৃতদেহের দিকে। তারপর নূরীসহ এগিয়ে চললো অদূরস্থ ট্রাকখানার পাশে।

ট্রাকের উপরে হাত-পা-মুখ বাধা লোক দুটি তখনও ছটফট করছে। বনহুর নিজের ব্যথা ভুলে গেলো, ট্রাকের উপর উঠে গিয়ে লোক দুটির হাত পা আর মুখের বাধন মুক্ত করে দিলো।

লোক দুটি বনহুরের দয়ায় মুক্তি লাভ করে উঠে বসলো।

বনহুর ওদের দুজনাকে নীচে নামিয়ে দিয়ে ট্রাকের ছায়ায় বসিয়ে দিলো।

লোক দুজনার মধ্যে একজন বললো–আপনি কে? আমাদের জীবন দান করলেন।

বনহুর বললো–আমি একজন মানুষ।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো–আপনি আমাদের রক্ষা না করলে আমরা মারা পড়েছিলাম আর কি। ঐ শয়তান ডাকাতের দল আমাদের সব লুটে নিয়ে, আমাদেরকেও বেঁধে আনছিলো। ওরা আমাদের আটক রেখে, আমাদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট হতে আরও অর্থ সগ্রহ করতো।

বনহুর বললো এবার–সব খোদার দয়া, তার নিকটেই শুকরিয়া করুন।

লোক দুটির চেহারা দ্র এবং ব্যবসায়ী ধরনের। বনহুর বুঝতে পারলো, ট্রাকে যে মাল রয়েছে এদেরই। নিশ্চয়ই গতরাতে শয়তান ডাকু হাঙ্গেরু তার দলবল নিয়ে এদের উপরে হামলা চালিয়ে এ সব লুটে নিয়ে এসেছে।

লোক দুটির সঙ্গে আরও কয়েকটা কথাবার্তায় বনহুর বুঝতে পারলো, এখান থেকে শহর বহু দূরে। হেঁটে যাবার কোন উপায় নেই। এ পথে কোন যান-বাহন যাতায়াত করে না, এককালে লোক চলাচলের সুন্দর ব্যবস্থা থাকলেও আজ আর নেই, কারণ,এ পথটা দস্যু আর ডাকুতে ছেয়ে গেছে। কচিৎ কোন গাড়ি এদিকে আর চলে না।

কাজেই কোন যানবাহনের আশা নেই।

ট্রাকখানা কোনক্রমে ওদিকে ফেরাতে পারলেই উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যেত, কিন্তু ফেরাববা কি করে সামান্য চওড়া জায়গা হলেও বনহুরের কাছে অসাধ্য ছিলো না।

এদিকে বনহুরের বাহু দিয়ে তখনও রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। যন্ত্রণা যে না হচ্ছে তা নয়, কিন্তু এখন ব্যথায় মুষড়ে পড়লে চলবে না। নিজে বাঁচতে হবে আর এদেরকেও বাঁচাতে হবে।

বনহুর কিছু ভেবে নিলো, তারপর যে দিকে তারা এখন অগ্রসর হবে, মানে যে দিক থেকে ট্রাকখানা এসেছিলো সে দিকে এগুতে লাগলো।

হস্তপদ মুক্ত লোকদ্বয় ও নূরী দাঁড়িয়ে রইলো ট্রাকখানার পাশে।

বনহুর চলে গেলো, আর তার ফিরবার কথা নাই।

বেলা প্রায় গড়িয়ে আসছে, এমন সময় ফিরে এলো বনহুর। মুখভাব কিছুটা প্রসন্ন। প্যান্টের পকেট থেকে রুমালখানা বের করে মুখমন্ডল মুছে নিয়ে বললো, পেয়েছি, উপায় পেয়েছি, কিন্তু জীবন-মরণ সমস্যা।

প্রথম ব্যক্তি বললো–কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?

বনহুর একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে এক মুখ ধূয়া নির্গত করে বললো–গাড়ি ফেরানোর মত খানিকটা জায়গা আবিষ্কার করে তবেই ফিরলাম। নিন, আপনারা গাড়িতে চেপে বসুন, আমি গাড়ি ব্যাক করে নিয়ে যাচ্ছি।

প্রথম ব্যক্তি বললো–যে দুর্গম পথ, গাড়ি ব্যাক করা কি সহজ হবে? হঠাৎ যদি পড়ে যায়?

তাহলে মৃত্যু। বললো বনহুর।

শিউরে উঠে বললো দ্বিতীয় ব্যক্তি কাজ নেই, হেঁটেই চলুন।

যে কদিন লাগে লাগবে।

বনহুর তার কথা শুনে হাসলো, তারপর বললো–আচ্ছা, আপনারা হাঁটতে শুরু করেন, আমি গাড়ি ব্যাক করে নিয়ে যাচ্ছি।

বনহুর গাড়ির ড্রাইভ আসনে উঠে বসলো।

স্তব্ধ নিশ্বাসে লোক দুটি তাকিয়ে রইলো তাদের মূল্যবান সামগ্রী সহ গাড়িখানার দিকে।

বনহুর গাড়িখানা সাবধানে ব্যাক করে নিয়ে চললো। লোক দুজন ও নূরী চলতে লাগলো গাড়িখানাকে অনুসরণ করে।

অতি কৌশলে আঁকাবাঁকা উঁচু নীচু পাহাড়ে পথ দিয়ে বনহুর নিপুণতার সঙ্গে গাড়ি ব্যাক করে চালিয়ে চললো। হঠাৎ যদি একটু এদিক-ওদিক হয়ে যায়

তাহলেই গাড়িখানা গড়িয়ে পড়ে যাবে হাজার ফিট নীচে, পাথরের উপরে।

অদ্ভুত সাহসী দস্যু বনহুর–এই দুর্গম পথে গাড়ি পিছন দিকে চালিয়ে নিতে এতোটুকু ঘাবড়ে গেলোনা বা বিচলিত হলোনা। নির্ভীক সৈনিকের মত সে স্থিরভাবে গাড়ি ড্রাইভ করে চললো।

পাহাড়ের গা ঘেষে সঙ্কীর্ণ পাথুরে পথ, তাও সমতল নয়, মাঝে মাঝে বেশ উঁচু নীচু। একবার হঠাৎ গাড়িখানা কাৎ হয়ে গিয়ে ছিলো আর কি, বনহুর অতি সাবধানে কোন রকমে সামলে নিলো। সমস্ত শরীর ঘেমে উঠেছে ওর। সুন্দর মুখমণ্ডল রাঙা হয়ে উঠেছে ভীষণ ভাবে। জীবনে বনহুর অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম করেছে, কিন্তু আজকের মত এমন সঙ্কটময় পথ তার জীবনে এই যেন প্রথম।

প্রায় ঘন্টা কয়েক চলার পর তার নির্দিষ্ট স্থানে এসে পৌঁছতে সক্ষম হলো।

গাড়িখানা রেখে নেমে দাঁড়ালো বনহুর, জায়গাটা আর একবার তাকিয়ে দেখে নিলো। এ স্থানে পাহাড়ের গা কিছুটা ঢালু তবে সম্পূর্ণ প্রশস্ত নয়। গাড়ি কোন রকমে ব্যাক করে ঘুরিয়ে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু হঠাৎ যদি গড়িয়ে পড়ে তাহলে আর রক্ষা নাই।

বনহুর যখন ভাবছে–কিভাবে গাড়িখানা ব্যাক করে সামনের দিকে মুখ ফেরাবে, ঠিক তখন কতগুলো অসভ্য জংলী লোক হুম হুম করে এগিয়ে এলো পাহাড়ের গা বেয়ে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য থেকে।

বনহুর এই মুহূর্তে এমন কিছু আশা করে নেই। কিন্তু তাকে তখনই প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াতে হলে, বিলম্ব করার সময় ছিল না।

কতগুলো জংলী এক সঙ্গে ছুটে এলো তার দিকে। বনহুর রিভলভার উদ্যত করে গুলী ছুঁড়লো একজন জংলীর বুক লক্ষ্য করে।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো, তারপর গড়াতে গড়াতে এসে পড়লো বনহুরের পায়ের কাছে।

বনহুর আর একজনকে লক্ষ্য করবার পূর্বেই অসংখ্য সূতীক্ষ্ম ধার বর্শা এসে গেঁথে যেতে লাগলো তার চার পাশের মাটিতে।

আশ্চর্য কৌশলে নিজকে বাঁচিয়ে নিতে লাগলো বনহুর। ভাগ্যিস, তখনও ট্রাকের সেই লোকদ্বয় ও নূরী একটু দূরে একটা ঝোপের আড়ালে এসে পৌঁছেছিলো।

জংলী লোকগুলো তাদের কাউকেই দেখতে পায়নি। কাজেই সকলে একযোগে আক্রমণ করেছে বনহুরকে।

জংলীগণ আরও নিকটে এসে পড়েছে।

একখানা তীক্ষ্ম বর্শা সাঁ করে চলে গেলো বনহুরের কানের পাশ কেটে। আরও দুখানা এক সঙ্গে ছুটে এলো, বনহুর চট করে সরে দাঁড়ালো। বর্শা দুখানা গিয়ে বিদ্ধ হলো পিছনের ট্রাকের গায়ে।

বনহুর এবার দ্রুত হস্তে প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভার বের করে গুলী ছুড়তে শুরু করলো।

বনহুরের গুলীর আঘাতে এক একজন জংলী ভূতলশায়ী হতে লাগলো। কিন্তু আশ্চর্য, জংলীরা এতে এতটুকু বিচলিত হলো না, বরং আরও উন্মত্ত হয়ে আক্রমণ করলো বনহুরকে।

এতোগুলো হিংস্র জংলীর কবলে বনহুর একা, মরিয়া হয়ে সে লড়াই করে চললো।

রিভলভারের গুলী শেষ হতেই একখানা বর্শা তুলে নিলো বনহুর হাতে। কিছুক্ষণ পূর্বে তার বাম বাহুতে দুষ্ট ডাকু হাঙ্গেরুর ছোরা বিদ্ধ হওয়ায় যদিও বেশ কষ্ট পাচ্ছিলো, তবু সে এতটুকু দুর্বল হলো না।

বনহুর জংলীদের বর্শার আঘাত তার হস্তস্থিত বর্শা দিয়ে প্রতিরোধ করে চললো, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার নিকটস্থ আক্রমণকারী জংলীদের ভূতলশায়ী করতে লাগলো। কেউ বা বনহুরের বর্শার আঘাতে ছিটকে পড়লো নীচে; কেউ বা আহত হলো, কেউ বা হলো নিহত।

বনহুরের অসীম শক্তির কাছে জংলীর দল কিছুক্ষণের মধ্যেই পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হলো। কতগুলো জংলী নিহত হলো, কতক আহত অবস্থায় ছুটে

পালালো, এমন কি যারা অক্ষত অবস্থায় ছিলো তারা দৌড় দিল উদ্ধশ্বাসে, ফিরে তাকালো না আর।

এতগুলো জংলীর সঙ্গে বনহুর একা প্রাণপণে লড়াই করে অত্যন্ত হাঁপিয়ে পড়েছিলো। ট্রাকের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছতে লাগলো।

ওদিকে লোক দুটি আর নূরী এতোক্ষণ একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ঠক্ ঠক করে কাঁপছিলো। এবার জংলীদের পালাতে দেখে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো তারা।

বনহুরের পাশে এসে দাঁড়ালো। লোক দুজন বনহুরকে অনেক সহানুভূতিজনক কথা বলতে লাগলো। নূরী আজ স্বাভাবিক জ্ঞানসম্পন্ন হলে ছুটে গিয়ে ঝাপিয়ে পড়তো বনহুরের বুকে। আজকের এ বিপদ মুহূর্তে বনহুরকে ফিরে পেয়ে তার আনন্দের সীমা থাকতো না। কিন্তু নূরী নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো, একটি কথাও সে বললো না!

বনহুর কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয়ে বললো–আপনারা আর বিলম্ব করবেন না, গাড়িতে উঠে বসুন। তারপর নূরীকে লক্ষ্য করে বললো সে–নূরী, এসো আমার পাশে।

বনহুরের কথায় নূরী ট্রাকের ড্রাইভ আসনের পাশে উঠে বসলো।

আর ব্যবসায়ী লোক দুজন ট্রাকের পিছনে উঠে বসলো।

বনহুর গাড়ি স্টার্ট দিলো।

এই সে জীবনের প্রথম ট্রাক চালকের ভূমিকা গ্রহণ করলো।

০৩.

পথে আর কোন বিপদ দেখা দিল না।

বনহুর ট্রাক সহ এসে পৌঁছলো ঝাঁম শহরে।

ব্যবসায়ী লোক দুজন বনহুরের দয়ায় নিজেদের জীবন ও তাদের লুষ্ঠিত দ্রব্যাদি ফিরে পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হলো। নিজেদের বাড়িতে বনহুর আর নূরীকে নিয়ে গেলো তারা অতি সমাদর করে।

লোক দুজন অত্যন্ত ধনবান তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিরাট বাড়িগাড়ি, শহরের মধ্যে বড় বড় দোকান-পাট অনেক রয়েছে তাদের। ব্যবসায়ী লোক হিসাবে শহরময় তাদের অনেক নাম রয়েছে।

হঠাৎ গত দুদিন আগে ব্যবসায়ীদ্বয় নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় শহরময় একটা ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিলো। পুলিশ হন্তদন্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলো। কিন্তু এ লোক দুজনার কোন সন্ধান করে উঠতে পারেনি।

ব্যবসায়ীদ্বয়ের বাড়িতে কান্নাকাটি শুরু হয়ে গিয়েছিলো। এমন দিনে আবার ফিরে পেলো তারা তাদের হারানো ধনকে। ব্যবসায়ীদ্বয়ের আত্মীয়স্বজন সবাই বনহুরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগলো। শহরের বহু ব্যক্তি এলেন দেখা করতে বনহুরের সঙ্গে।

এদের মধ্যে শহরের এক অভিজ্ঞ ডাক্তারও এলেন, ব্যবসায়ী প্রথম ব্যক্তির বন্ধুলোক তিনি।

ব্যবসায়ীদ্বয়ের প্রথম ব্যক্তির নাম কামরান আলী ও দ্বিতীয় জনের নাম জামশেদ মিয়া, উভয়ে আপন সহোদর ভাই না হলেও তারা উভয়ে উভয়ের পরম আত্মীয়।

অভিজ্ঞ ডাক্তার জামরুদী কামরানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

জামরুদী বনহুরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত খুশি হলেন।

কামরান বনহুরকে নিয়ে একটা ভোজের আয়োজন করলেন, কাজেই এক দিনের জন্য বনহুরকে ঝাম শহরে বাধ্য হয়ে থেকে যেতে হলো।

কথায় কথায় ডাক্তার জামরুদী ও বনহুর অনেকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো। একথা সে কথায় বনহু জানতে পারলো–ডাক্তার জামরুদী শুধু ডাক্তারই নন, তিনি মস্তবড় বৈজ্ঞানিক। জীবনে তিনি বহু দেশ ঘুরেছেন এবং বহু রোগের ঔষধ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন।

ডাক্তার জামরুদীর কথায় বনহুরের মনের আকাশে একটা আশার আলো উঁকি দিয়ে গেলো। নূরী আজ জ্ঞান-শূন্যা। যাদুকরের কোন ঔষধ তা স্বাভাবিক জ্ঞান লুপ্ত করে দিয়েছে।

বনহুর এক সময় ডাক্তার জামরুদীর নিকটে নূরীর সম্বন্ধে সমস্ত কথা খুলে বললো।

বনহুরের কথায় জামরুদী গভীরভাবে কিছু চিন্তা করলেন, তারপর হেসে বললেন তিনি–আমি তাকে দেখতে চাই।

বনহুর সেই মুহূর্তেই নূরীকে ডেকে আনলো ডাক্তার জারুদীর সম্মুখে।

নূরীকে কিছু সময় পরীক্ষা করে জামরুদী বললেন–মিঃ চৌধুরী, আপনি চিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আপনার বোনকে সুস্থ করে দেবো। আবার সে স্বাভাবিক জ্ঞান শক্তি ফিরে পাবে।

বনহুর নিজের নাম মিঃ ইউসুফ চৌধুরী ও নূরীকে বোন বলে পরিচয় দিয়েছিলো এখানে। সত্যি পরিচয় দিলে বনহুরকে তারা নিশ্চয়ই সুনজরে দেখবে না, কাজেই তাকে এই মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছিলো। ডাক্তারের কথায় বনহুর খুশি হলো। মনে মনে খোদাকে ধন্যবাদ জানালো বনহুর।

কামরান আলী ও জমশেদ মিয়ার বাড়িতে বনহুর আতিথ্য গ্রহণ করবার পর বিদায় নিয়ে ডাক্তার জামরুদীর বাড়িতে গেলো। জামরুদী অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বনহুর আর নূরীকে নিজ আবাসে নিয়ে রাখলেন।

নূরীর চিকিৎসা করবেন স্বয়ং জামরুদী।

যেদিন নূরীকে জামরুদী নিজের চেম্বারে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে বনহুর।

জামরুদী বললেন–মিঃ ইউসুফ, আপনার বোনকে আমি এমন একটা ঔষধ সেবন করাবো, যে ঔষধ সেবনের পর আপনার বোন সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়বে। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে কয়েক দিন আমি রাখবো।

বনহুরের মনে একটা দুশ্চিন্তার ঝড় বইলেও সে বিচলিত হলো না। কারণ, একদিনে ডাক্তার জামরুদীকে চিনতে বাকী রাখেনি বনহুর। লোকটা মহৎ এবং

নিষ্ঠাবান তাতে কোন ভুল নেই। বয়স তার পঞ্চাশের বেশি হবে, ধীর-স্থির সৌম-সুন্দর পুরুষ। ডাক্তার জামরুদীকে কথা দিলো বনহুর, তিনি যে ভাবে নূরীকে সুস্থ করতে চান তাতেই রাজি আছে সে।

বন আর নূরী এসে বসলো ডাক্তার জামরুদীর চেম্বারে। কক্ষটা খুব প্রশস্ত নয়, মাঝারি গোছের। কক্ষের চারদিকে আলমারী আর টেবিল সাজানো। প্রত্যেকটা আলমারীতে নানাবিধ শিশি সুন্দরভাবে রাখা হয়েছে। সবগুলো শিশিতে তরল পদার্থ। টেবিলে নানারকম বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি থরে থরে সাজানো রয়েছে। এক পাশে একটি রবারের শয্যা পাতা রয়েছে।

এ শয্যায় রোগিগণকে শোয়ানো হয়।

বনহুর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে নিপুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো।

হেসে বললেন ডাক্তার জামরুদী, খুব বিস্ময় লাগছে আমার এ সব দেখে, না?

হাঁ, সত্যি আমি অবাক হচ্ছি ডক্টর, ইতিপূর্বে আমি কোন বৈজ্ঞানিকের চেম্বারে প্রবেশ করিনি।

ডাক্তার জামরুদী বললেন–ইতিপূর্বে আমার চেম্বারেও কোন বাইরের আগন্তক প্রবেশে সক্ষম হয় নি মিঃ চৌধুরী, আপনিই সর্ব প্রথম ....

তাহলে আপনি আমাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করেছেন?

হাঁ, আপনার কথাবার্তা ও ব্যবহারে আমি সত্যি মুগ্ধ হয়েছি। আমি রোগির কোন আত্মীয়কে আমার চেম্বারে প্রবেশে অনুমতি দেই না।

ডাক্তার জামরুদী কথা শেষ করে পাশের দরজার পর্দা ঠেলে চলে গেলেন। কোথায় গেলেন কে জানে।

বনহুর আর নূরী দুটি আসনে বসে রইলো চুপচাপ। বনহুরের বিস্ময় তখনও কমেনি, সে নিপুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিলো সব।

নূরী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছিলো এদিকে ওদিকে।

বনহুর বললো–নূরী, জানো এখানে কেনো এসেছি?

নূরী মাথা দোলালো, বললো-জানি, আমার চিকিৎসার জন্য!

কি করে বুঝলে তোমার চিকিৎসার জন্য?

ডাক্তারের কথা আমি কি বুঝতে পারিনি ভাবছেন?

নূরী, এসব যদি বুঝতে পারো, তবে আমার মনের ব্যথা কেনো বুঝতে পারো না? আজও কেনো তবে আমাকে চিনতে পারো না?

নূরী মাথা নাড়লো, কিছু স্মরণ করতে চেষ্টা করলো, কিন্তু পারছে না। ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠলো।

বনহুর নূরীর দক্ষিণ হাত মুঠায় চেপে ধরলো–নূরী, তোমাকে ডাক্তার কয়েক দিনের জন্য.....

কথা শেষ হয় না বনহুরের, কক্ষে প্রবেশ করেন ডাক্তার জামদ–মি চৌধুরী, আসুন, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা নিভতে কথা আছে।

বনহুর নূরীকে লক্ষ্য করে বললো–বসো তুমি, এক্ষুণি ভাসছি। ডাক্তার জামরুদীকে অনুসরণ করলো বনহুর।

পাশের কামরায় প্রবেশ করে বনহুর আরও বিস্মিত হলো! সমস্ত কক্ষ গাঢ় রক্তাভ আলোকে আলোকিত।

মনে হলো সমস্ত কক্ষটায় রক্ত ছড়িয়ে আছে। এ কক্ষে পূর্বে কফ চেয়ে অনেক বেশি শিশি ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি রয়েছে। নানা রকম জং ও কাচপাত্র ঔষধপূর্ণ। রক্তাভ আলোতে কাচ পাত্র ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপতি কেমন যেন লাল টক টকে দেখাচ্ছে।

বনহুরকে বসতে বললেন ডাক্তার জামরুদী।

বনহুর ডাক্তারের কথা অনুযায়ী আসন গ্রহণ করলো বটে, কিন্তু তার মধ্যে একটা আশঙ্কা দোলা জাগালো। কক্ষটার মধ্যে একটা উট ঔষও গন্ধ ছড়িয়ে ছিলো। বনহুরের যেন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগলো।

ডাক্তার জামরুদী সম্মুখের কাচের টেবিলে একটি কাচ পাত্রে গাঢ় সবুজ রং এর ঔষধ রেখে পরীক্ষা করছিলেন। সবুজ তরল ঔতার উপরে ভাল আলো কেমন যেন কালো রঙ এর সৃষ্টি করছিলো। বললো ভ্রামদী মিঃ চৌধুরী, আপনিও ঘাবড়ে গেছেন?

ব্যস্তভাবে বলে উঠলো বনহুর–না না, আপনি ভুলে বুঝছেন ডক্টর। ডাক্তার জামরুদী বনহুরের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন–দেখুন মিঃ চৌধুরী, আমি আপনার বোনের উপর এখনই ঔষধ প্রয়োগ করবো, এবং আপনার সাক্ষাতে করবো।

ধন্যবাদ ডক্টর।

এই আমার জীবনে প্রথম কোন আত্মীয়ের সম্মুখে রোগিকে তার স্বাভাবিক জ্ঞান থেকে বিলুপ্ত করা। আপনি কোন রকম বিচলিত হবেন না তো?

হাসলো বনহুর–আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন ডক্টর।

থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ চৌধুরী, যান, আপনার ভগ্নিকে নিয়ে আসুন এ কক্ষে।

বনহুর চলে গেলো। একটু পরে ফিরে এলো নূরী সহ।

এ কক্ষে প্রবেশ করে নূরী বেশ ঘাবড়ে গেলো। কক্ষটা সত্যি অত্যন্ত ভীতিকর ছিলো।

বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো নূরী আমাকে আপনারা হত্যা করবেন না তো?

বনহুর হেসে বললো–উনি দস্যু বা ডাকু নন যে, তোমাকে হত্যা করবেন।

বনহুরের কথায় গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ডাক্তার জামরুদী–চৌধুরী, আপনি ভুল করছেন, কারণ দস্যু বা ডাকু হলেই তারা বিনা কারণে হত্যা করে না।

আপনিই ভুল করছেন ডক্টর, দস্যু বা ডাকুদের হত্যা করা একটা নেশা।

ওকথা আপনি জানেন না বলেই বলছেন মিঃ চৌধুরী, দস্যু বনহুরের কথা নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে।

হাঁ, শুনেছি তার নাম। বললো বনহুর।

ডাক্তার জামরুদী বললেন–দস্যু হলেও সে এক মহান ব্যক্তি। যদিও তাকে কোনদিন চোখে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি, কিন্তু তার নাম আমি অন্তরে গেথে রেখেছি।

ডক্টর!

হাঁ মিঃ চৌধুরী, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি! দস্যু হলেও সে মানুষ, কিন্তু আজ শত শত মানুষরূপী ব্যক্তি, যারা সমাজের বুকে স্বনামধন্য হয়ে জেকে বসে আছেন, তারা দস্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর,

ডক্টর, আপনার অন্তরকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। পৃথিবীতে এমন জনও আছে, যারা মানুষের নকল রূপের পিছনে আসল রূপটা দেখতে পায়।

জামরুদী দস্যু বনহুরের কথায় বেশ আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছিলেন, তাড়াতাড়ি স্বাভাবিকভাবে কণ্ঠে বললেন–ওঃ এবার কাজ শুরু করবো।

বনহুর নূরীর দিকে তাকালো–ভয় নেই, আমি আছি নূরী।

ডাক্তার জামরুদী নূরীকে নিয়ে একটি সোফায় বসালেন। সোফার চারদিকে কয়েকটা বৈদ্যুতিক আলোর সুইচ ছিলো। পাশেই একটা রবারের শয্যা।

জামরুদী সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষটা গাঢ় লালে ভরে উঠলো। নূরীকে দেখে মনে হলোতার সমস্ত দেহে কে যেন একপোঁচ রক্ত মাখিয়ে দিয়েছে। বনহুর নূরীর অদূরে এসে দাঁড়ালো। চোখে-মুখে তার একটা ভীতির ভাব ফুটে উঠলো, আজ তার নিজের এ অবস্থা হলে এতোটুকু ঘাবড়ে যেতোনা সে। কিন্তু নূরীর জন্য আশঙ্কা–যদি নূরীর জ্ঞান আর ফিরে না আসে।

ডাক্তার জামরুদী টেবিল থেকে সবুজ তরল পদার্থ সহ কাচপাত্রটা হাতে উঠিয়ে নিলেন।

বনহুর তাকিয়ে আছে নির্বাক নয়নে নূরীর মুখের দিকে।

ডাক্তার জামরুদী কাঁচ-পাত্রটা নূরীর মুখের কাছে নিয়ে এলেন।

নূরী নিঃশব্দে পান করল তরল সবুজ পদার্থটুকু।

জামরুদী এবার দ্রুত হস্তে কাঁচ-পাত্র টেবিলে রেখে নূরীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।

বনহুর তাকিয়ে আছে তখনও নূরীর দিকে অপলক নয়নে। ধীরে ধীরে নূরীর চোখ দুটো যেন মুদে আসছে।

মাথাটা নুয়ে আসছে সম্মুখের দিকে।

বনহুর স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে..... হঠাৎ বনহুর নূরীকে ডাকতে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে জামরুদী ঠোঁটে আংগুল চাপা দিয়ে বারণ করল তাকে কথা বলতে।

নূরী টলে পড়ে যাচ্ছিলো, জামরুদীর ইংগিতে নূরীকে ধরে ফেললো বনহুর। তুলে নিলো সে নূরীর ছিন্ন লতার মত সংজ্ঞাহীন দেহটা হাতের উপর।

ডাক্তার জামরু এবার কথা বললেন–ঐ বিছানায় শুইয়ে দিন।

বনহুর নূরীকে ওপাশের রবারের বিছানায় শুইয়ে দিলো ধীরে ধীরে। তারপর নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো শিয়রে।

ডাক্তার জামরুদী বললেন–আজ থেকে পরশু পর্যন্ত অজ্ঞান থাকবে। তারপর চতুর্থ দিনে জ্ঞান ফিরে আসবে। মিঃ চৌধুরী ঐ দিন আপনার ভগ্নি আপনাকে নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন।

ডক্টর, আপনার দয়ায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

প্রবল আগ্রহ নিয়ে বনহুর নূরীর পাশে বসে আছে। তাকিয়ে আছে সে। তার মুদিত আঁখি দুটির দিকে।

০৪.

আজ চতুর্থ দিন। কক্ষে যে গাঢ় লাল আলো জ্বলছিলো, প্রতি দিন একটি করে সুইচ টিপে এক একটি আলো নিভিয়ে দিচ্ছিলেন ডাক্তার জামরুদী। আজ শেষ

বাবের সুইচ টিপলেন ডাক্তার।

কমধ্যে আজ কোন লাল রঙের আলো নেই।

একটা উজ্জ্বল আলো কক্ষটিকে আলোকিত করে রেখেছিলো। এতদিন কক্ষটা গভীর আলোতে আলোকিত থাকায় বনহুরের চোখে ধাধা লেগে গিয়েছিলো।

মাঝে মাঝে বাইরে গিয়েছে বনহুর আহার ও স্নানের জন্য। কিন্তু সর্বক্ষণ সে নূরীর শয্যার পাশ থেকে সরে যায়নি। কোন কোন সময় ডাক্তার জামরুদীর অন্দরে পাশের চেম্বারে একটু বিশ্রাম করে নিয়েছে সে, কিন্তু ঘুম তার চোখে আসেনি। নানা দুশ্চিন্তায় মনটা সর্বক্ষণ ভরে থাকতো। নূরীকে বনহুর শুধু ভালই বাসেনা নূরী বনহুরের একজন জীবন-সঙ্গিনী।

নূরীর অমঙ্গল আশঙ্কা বনহুরকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তুলেছিলো। কখন জ্ঞান ফিরে আসবে কে জানে ফিরবে কি না তাইবা কে বলতে পারে।

আজ চতুর্থ দিবস। নূরীর শিয়রে বসে উত্তেজিত হয়ে প্রতীক্ষা করছে বনহুর।

ডাক্তার জামরুদীও উন্মুখ হৃদয় নিয়ে অপেক্ষা করছেন, একটা কি যেন ঔষধ সহ পাইপ ধরে আছেন নূরীর নাকের কাছে। মাঝে মাঝে নার্ভ পরীক্ষা করে দেখছেন তিনি।

চতুর্থ দিনও প্রায় শেষ হয়ে এলো।

ডাক্তার জামরুদীর ললাট কুঞ্চিত হলো, মুখভাবে ফুটে উঠলো গভীর চিন্তার ছাপ। কেমন যেন বিহ্বল মনে হচ্ছে তাকে।

বনহুর বুঝতে পারলো–নূরীর জীবন আশঙ্কাজনক। ডাক্তার জামরুদীর মুখভাব লক্ষ্য করে বনহুরের মনের মধ্যে আলোড়ন শুরু হলো। তাহলে নূরীকে ও হারালো এবার।

ক্রমেই বনহুরের মুখ কঠিন হয়ে উঠতে লাগলো। একটা জীবন নিয়ে। ছিনিমিনি খেলা, এ মুহূর্তে ডাক্তার জামরুদীকে সমুচিত শাস্তি দিতে পারে। বনহুর তবু ধৈর্য সহকারে বললো—ডক্টর, কেমন দেখছেন?

জামরুদী বললেন–আমি ইতিপূর্বে আরও অনেকগুলো এ ধরণের কেস সুস্থ্য করেছি, কিন্তু–থেমে যান ডাক্তার জমরুদী।

বনহুর ডাক্তারের কলার চেপে ধরলো–থামলেন কেনো বলুন? বলুন ডক্টর, নূরীর জ্ঞান ফিরবে তো?

ডাক্তার জমাদী বলে উঠেন–হাঁ হাঁ ফিরবে–কিন্তু—কিন্তু—

কিন্তু কি? বলুন, বলুন ডাক্তার?

এমন তো কোনদিন হয়নি!

কি বলছেন! বনহুর যেন আর্তনাদ করে উঠলো।

ডাক্তার জামরুদীর ললাটে ফুটে উঠলো বিন্দু বিন্দু ঘাম। মুখ মণ্ডল অন্ধকার হলো, অস্ফুট কণ্ঠে বললেন তিনি–পারলাম না মিঃ চৌধুরী ....

জামরুদীর কথা শেষ হতে না হতে গর্জে উঠলো বনহুরের হাতের রিভলভার।

একটা আর্তনাদ করে ডাক্তার জামরুদী পড়ে গেলেন তার ল্যাবরেটরীর মেঝেতে। জামরুদীর বুকের রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো ল্যাবরেটরীর মেঝের কার্পেট।

বনহুর রিভলভার পকেটে রেখে ফিরে তাকালো শয্যায় শায়িত নূরীর দিকে। নূরীর মুদিত আঁখি কোণে দুফোটা অশ্রু মুক্তা বিন্দুর মত চক্ চক্

করছে।

বনহুর নিজেকে কিছুতেই সংযত রাখতে পারলো না। নূরীর দক্ষিণ হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বালকের ন্যায় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে ল্যাবরেটরীর বাইরে শোনা গেলো দ্রুত পদ শব্দ। রিভলভারের গুলীর শব্দ বাইরে গিয়ে পৌঁছেছে, তারই শব্দে ছুটে আসছে ডাক্তার জামরুদীর কর্মচারীগণ।

বনহুর একবার তাকালো ল্যাবরেটরীর পিছন শার্শির দিকে। ক্ষিপ্র হস্তে খুলে ফেললো পিছন শার্শিটা।

পুনরায় ফিরে এলো নূরীর শয্যার পাশে।

ল্যাবরেটরীর বাইরে দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে কেউ ডাকছে–স্যার, স্যার কি হলো? স্যার...

বাইরে এসে সবাই জড়ো হয়েছে কিন্তু ল্যাবরেটরীর ভিতরে প্রবেশের কেউ সাহস পাচ্ছে না।

বনহুর হাতের উপর তুলে নিলো নূরীর মৃতবৎ দেহটা। এক বার তাকালো ভুলুণ্ঠিত ডাক্তার জমরুদীর রক্ত মাখা দেহটার দিকে।

জামরুদীর মুখে এখনও গভীর চিন্তার ছাপ স্পষ্ট ফুটে রয়েছে। রোগিকে হত্যার করার অভিপ্রায় তার ছিলো না, তিনি চেয়েছিলেন রোগিকে নতুন জীবন দান করতে।

বনহুর নূরীর এলিয়ে পড়া দেহটা নিয়ে পিছন শার্শি দিয়ে লাফিয়ে পড়লো। বাইরে।

নির্জন নদীর তীর।

নূরীর নিস্তব্ধ দেহটার পাশে পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। বনহুর। গোটা রাত এমনি ভাবে কেটে গেছে বনহুরের, একবারও সে নূরীর দেহের পাশ থেকে সরে যায়নি কোথাও। সত্যি কি নূরী পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চিরদিনের জন্য চলে গেলো? কিছুতেই যেন বিশ্বাস হয়না বনহুরের। কত বার নূরীর নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখেছে সে, মনে হয়েছে অতি ধীরে মৃধু ভাবে নিশ্বাস বইছে। একটা ক্ষীণ আশা এখনও ত্যাগ করতে পারেনি বনহুর। উন্মুখ হৃদয় নিয়ে ব্যাকুল আঁখি মেলে নূরীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

ভোরের হাওয়া বইছে।

পূর্ব আকাশ রাঙা করে উঁকি দিলো অরুণ আলো। গোটা বিশ্ব নতুন জীবন লাভ করলো যেন।

বনহুর নির্ণিমেষ নয়নে তাকালো নুরীর স্থির-নিশ্চল মুখমণ্ডলের দিকে। গাছে গাছে পাখির কলরব জেগে উঠলো। নদীর কুল কুল ধ্বনির সঙ্গে ভেসে এলো ভোরের আযানের শব্দ।

হঠাৎ বনহুরের চোখে মুখে ফুটে উঠলো এক অপূর্ব আনন্দ উচ্ছ্বাস। নূরী ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো।

বনহুর ব্যাকুল আগ্রহে ঝুঁকে পড়লো নূরীর মুখের কাছে। গভীর আবেগে ডাকলো–নূরী! নূরী।

নূরীর সমস্ত দেহটা নড়ে উঠলো, হাতখানা উঁচু করতে গিয়ে আবার পড়ে গেলো এক পাশে।

বনহুর হাতখানা ধরে ফেললো হাতের মুঠোয় পুনরায় ডাকলো–নুরী।

নূরীর ঠোঁট দুখানা কেঁপে উঠলো, অস্পষ্ট কণ্ঠে বললো–পানি।

বনহুর ব্যস্তভাবে নদীর দিকে এগিয়ে গেলো, দুহাতে খানিকটা পানি নিয়ে দ্রুত ফিরে এলো নূরীর পাশে।

হাটু গেড়ে বসে পানিটুকু নূরীর মুখে দিলো।

এতোক্ষণে নূরীর গলা কিছুটা যেন ভিজে শব্দ বেরিয়ে এলো, অস্ফুট কণ্ঠে বললো–আমি কোথায়?

বনহুর নূরীর কপালে মুখে হাত বুলিয়ে বললো–তুমি আমার পাশে, নূরী।

নুরী দুহাতে চোখ দুটো একবার মুছে নিলো–আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি না, তুমি …………তুমি…….

বলো, বলো……. বলো নূরী?

তুমি আমার হুর ……. হুর……..

বনহুর উচ্ছ্বসিত আনন্দে নূরীকে ভূতল থেকে তুলে নেয় হাতের উপর, : আকুলভাবে বলে সে–নূরী আমি, আমি তোমার বনহুর!

নূরী ক্ষীণকণ্ঠে বললো–আমি কেনো তোমাকে দেখতে পাচ্ছিনা হুর?

জানিনা, জানিনা নুরী কেনো, তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছো না!

নূরী, দুহাতে চোখ রগড়ে ভাল করে তাকালো–আমার চোখে পানি, দাও! পানি দাও!

বনহুর আবার নূরীকে নদী তীরস্থ দূর্বাকোমল শয্যায় শুইয়ে দিয়ে পানি আনতে ছুটলো। এবার রুমাল ভিজিয়ে পানি নিয়ে এলো সে। নূরীর চোখ মুখে পানির ছিটা দিতে লাগলো।

নূরী এবার তাকালো মুক্ত আকাশের দিকে। আজ নূরী নব জীবন লাভ। করলো। আকাশের নীল রঙ তার দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করে তুললো। নূরী তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। মুহূর্তে নূরীর চোখে-মুখে এক খুশির উচ্ছাস ফুটে উঠলো। দুহাত বাড়িয়ে দিলো বনহুরের দিকে বনহুর তুমি.... তুমি....

বনহুর গলাটা এগিয়ে দিলো নূরীর দিকে, নিজের হাত দুখানা দিয়ে নূরীর অবশ হাত দুখানা তুলে নিলো।

নব জীবন লাভ করলে নূরী। বহুদিন পর আজ প্রথম বনহুরের নাম ধরে ডাকলো আর চিনতে পারলো তাকে।

বনহুর এতো খুশি হয়েও ব্যথায় মুষড়ে পড়লো, ভুল করে সে ডাক্তার জামরুদীকে হত্যা করেছে। ভুল শুধু বনহুরেরই হয়নি, ভুল করেছিলো জামরুদী-তার ঔষধ তিন দিনের স্থানে চার দিন সময় নিয়েছিলো, কারণ ঔষধের মাত্রা সামান্য একটু বেশি হয়ে গিয়েছিলো সেবনকালে। এবং সে জন্যই নূরীর সংজ্ঞালাভে বিলম্ব ঘটেছিলো। ডাক্তার জামরুদী হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, মনের দুর্বলতা প্রকাশ করেছিলো বনহুরের নিকটে।

বনহুরের ধৈর্যের বাধ ভেংগে গিয়েছিলো সে মুহূর্তে। জামরুদী ইচ্ছা করেই তার নূরীকে হত্যা করেছে মনে হয়েছিলো তার। তাই বনহুর হত্যা করেছিলো ডাক্তার জামরুদীকে।

এখানে নিজের ভুল বুঝতে পেরে ব্যথায় বনহুরের অন্তর জর্জরিত হলো।

নূরী তখন বনহুরের মুখে-মাথায়-গলায় হাত বুলিয়ে গভীরভাবে অনুভব করছিলো, সত্যি তার বনহুর ফিরে এসেছে কিনা তার পাশে।

বনহুর অশ্রু ছলছল চোখে তাকিয়ে দেখছিলো নূরীকে। কত দিনের প্রতীক্ষার পর আজ যেন সে তার আকাঙ্খিত জিনিসটিকে খুঁজে পেয়েছে।

বনহুর নূরীকে নিবিড়ভাবে টেনে নিলো কাছে। আবেগভরা কণ্ঠে বললোনুরী!

বলো?

তুমি কি হয়ে গিয়েছিলে নূরী? কেন তুমি অমন হয়ে গিয়েছিলে? কেনো এতোদিন তুমি আমায় হুর বলে ডাকোনি?

আমি তো এ সব কিছুই জানিনা। আমি কি ছিলাম তোমার পাশে?

হাঁ নূরী, কিন্তু পাশে থেকেও তুমি ছিলে অনেক দূরে। কোন দিন আমি তোমার নাগাল পাইনি।

বনহুর, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। কিন্তু আমার মনি-মনি কই? ওকে কোথায় রেখেছো? ব্যাকুল কণ্ঠে নূরী বনহুরকে প্রশ্ন করে বসলো।

হঠাৎ নূরীর প্রশ্নের জবাব দিয়ে উঠতে পারলো না বনহুর। কেমন যেন থ মেরে গেলো। একটু চিন্তা করে বললো সে–মনি আছে।

কোথায়? কোথায় সে বলো? বনহুর এবার বিপদে পড়লো, মনি কোথায় সে-ই জানেনা। বেঁচে আছে

মরে গেছে কে জানে। কিন্তু হঠাৎ এখন মনি নেই কথাটা বলা ঠিক হবে না নূরীর কাছে। হয়তো আবার তার মস্তিষ্কে কোন গণ্ডগোল হয়ে যেতে পারে। ভয় হলো বনহুরের, একটু হাসবার চেষ্টা করে বললো–দেখছো না এটা অন্য দেশ? তোমার মনি আস্তানায় আছে।

আনন্দভরা কণ্ঠে বললো নূরী–সত্যি বলছো তো?

হাঁ-হাঁ, নূরী। বনহুর, আমাকে নিয়ে চলো, আর বিলম্ব সইছে না। কখন আমি মনিকে বুকে পাবো। চলো চলো হুর..........

চলো।

বনহুর আর নূরী উঠে দাঁড়ালো।

নূরীর শরীর অত্যন্ত দুর্বল, কাজেই বনহুর নূরী সহ একটি বড় হোটেলে কয়েক দিনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করলো। শহরের সবচেয়ে সেরা এবং উৎকৃষ্ট হোটেল-বনহুর ও নুরীর কোন অসুবিধা হলো না এখানে। নানা রকম ফল-মূল ও ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা করে দিলো বনহুর নূরীর জন্য।

নূরীকে নিয়ে মাঝে মাঝে বনহুর শহর ভ্রমণে বের হতো। কখনও পার্কে বা লেকের ধারে গিয়ে বসতো।

কিন্তু এতো করেও নূরীর মনে বনহু শান্তি আনতে পারলো না। নূরী সব সময় মনির জন্য ব্যস্ত উক্তণ্ঠিত হয়ে রয়েছে। নূরীর মুখের হাসি যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে।

বনহুর আবার নূরীর জন্য চিন্তিত হলো। কোথায় মনি কে জানে আর কি তাকে কোন দিন ফিরে পাবে। অসম্ভব সে আশা–নূরীর জন্য বনহুর বেশ আশঙ্কিত হয়ে পড়লো। এখন মিছেমিছি মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে রাখছে–মনি তাদের আস্তানায় আছে, কিন্তু আস্তানায় ফিরে যখন নূরী মনিকে খুঁজে পাবেনা, তখন কি বলবে বনহুর তাকে?

বনহুরও চিন্তিত হয়ে পড়লো, এখানে মিথ্যা বলে নূরীকে ভুলিয়ে রাখলেও কান্দাই পৌঁছে তাকে কিছুতেই মিথ্যা ছলনায় ভুলানো যাবে না।

০৫.

সেদিন হোটেলের ক্যাবিনে নিজের বিছানায় বনহুর আপন মনে চিন্তা করছিলো।

নূরী এসে দাঁড়ালো তার পাশে, বনহুরের চুলের ফাঁকে আংগুল চালাতে চালাতে বললো–হুর, আর আমি থাকতে পারছিনা।

বনহুর একটু হেসে বললো–কেনো?

নূরী এবার বসে পড়লো বনহুরের পাশে–মনিকে না দেখে।

ওঃ এই কথা! আচ্ছা নূরী!

বলো?

মনিকে তুমি বেশি ভালবাসো, না আমাকে?

নূরী গম্ভীর কণ্ঠে বললো–এ প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য?

দেখো নূরী, মনিকে তোমার ছাড়তে হবে, নয় আমাকে……

কি বললে? নূরী যেন আর্তনাদ করে উঠলো।

বনহুর কথাটা বলে ভুল করছে বুঝতে পারলো। তাড়াতাড়ি কথার মোড় ফিরিয়ে নিয়ে বললো–নূরী, তোমার মন বুঝলাম। তুমি কান্দাই পৌঁছেই তোমার মনিকে পাবে।

নূরীর গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়লো ফোটা ফোটা অশ্রু।

বনহুর ওকে টেনে নিলো কাছে। স্নেহ ভরা কণ্ঠে বললো–নূরী, এতো অল্পে তুমি ভেংগে পড়ো, কই আগে তো এমন ছিলেনা?

বনহুরের প্রশস্ত বুকে মাথা রেখে বললো নূরী-. আর কোন দিন তুমি ওরকম প্রশ্ন আমাকে করোনা।

না, আর করবো না, কথা দিলাম তোমাকে।

নূরীর চোখের পানি হাত দিয়ে মুছে দিলো বনহুর, বললো–যাও, তৈরি। হয়ে নাও নূরী, আজই আমরা কান্দাই এর পথে রওয়ানা হবো।

খুশিতে নূরীর মুখমন্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো–সত্যি বলছো?

হুঁ।

নূরী আনন্দে মেতে উঠে, ছুটে চলে যায় সে নিজের কামরায়।

ঝাম শহর থেকে প্লেনযোগে কান্দাই পৌঁছানো যায়। বনহুর প্লেনের দুখানা টিকিট কেটে নিলো। কত দিন পর বনহুর আর নূরী কান্দাই ফিরে চলেছে–কত আনন্দ হবার কথা, কিন্তু বনহুরের মনে পূর্বের সে আনন্দ নেই। নূরীকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়েছে সে–মনিকে কান্দাইয়ে তাদের আস্তানায় গিয়েই দেখতে পাবে। সে সান্ত্বনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বনহুর ভিতরে ভিতরে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লো।

মেঘের বুক চিরে প্লেনখানা এগিয়ে চলেছে। পাশ কেটে ভেসে যাচ্ছে পেঁজা তুলার মত খণ্ড খণ্ড মেঘের স্তুপগুলো। বনহুর নিজের আসনে বসে তাকিয়ে ছিলো পাশের শার্শী দিয়ে নীচের দিকে।

খণ্ড খণ্ড মেঘের ফাঁকে পৃথিবীটাকে ঠিক ছবির মতই মনে হচ্ছিলো। ছোটবড় দালান-কোঠা আর নদী-নালাগুলো যেন রূপকথার স্বপ্নপুরীর মতই মনে হচ্ছিলো।

নূরী বসেছিলো বনহুরের পাশে। প্লেনে সে কোনদিন উঠে নি, বিস্ময় জাগছিলো তার মনে। অবাক হয়ে সব দেখছিলো নূরী।

বোয়িং বিমান এটা।

অগণিত যাত্রী নিজ নিজ আসন দখল করে নিয়ে বসে আছে।

বনহুরের সম্মুখ আসনে বসে ছিলে কয়েকজন মহিলা, একটি যুবতিও ছিলো বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে। যুবতীর শরীরে আধুনিক আটসাট পোশাক।

যুবতী বার বার বনহুরের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করছিলো।

বনহুরের চোখ দুটো শার্শির ফাঁকে নিবদ্ধ থাকলেও যুবতীর গতিবিধি লক্ষ্য করছিলো। মনে মনে হাসলো বনহুর। যুবতীর কণ্ঠে একটা মূল্যবান লকেট জ্বলজ্বল করছে।

বনহুরের চোখ দুটো ধক করে জ্বলে উঠলো, ঐ মূল্যবান লকেটখানা তার চাই।

প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেটের কেসটা বের করে একটি সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো বনহুর।

প্লেনখানা তখন মেঘের মধ্য দিয়ে বাম্পিং করে এগোচ্ছিলো।

একটা সমুদ্রের উপর দিয়ে যাচ্ছিলো প্লেনখানা।

বনহুর সিগারেটের ধুম্ররাশির ফাঁকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলো যুবতীটিকে।

যুবতীটিও তাকাচ্ছিলো বার বার বনহুরের দিকে।

দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছিলো বনহুর আর যুবতীর মধ্যে।

যুবতীর হৃদয়ে এক অপলক আনন্দের লহরী দোলা জাগাচ্ছিলো।

এক সময় বোয়িং কান্দাই শহরের আকাশে এসে পৌঁছলো। বনহুর নূরীকে লক্ষ্য করে বললো–কতদিন পর কান্দাইয়ের হাওয়া গ্রহণ করলাম, নুরী।

নূরীর চোখে আনন্দের দ্যুতি ফুটে উঠেছে।

যুবতী বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেই বসলো–আপনি কি কান্দাইয়ে নামবেন?

বনহুর হেসে জবাব দিলো–হাঁ, কান্দাই আমার গন্তব্য স্থান।

যুবতী প্রফুল্ল কণ্ঠে বললো–কান্দাই আমিও নামবো।

যুবতীর গায়ে পড়ে আলাপ ভালো লাগলো না নূরীর। যুবতী পুনরায় বলে উঠলো–ওনি বুঝি আপনার.......

আমার আত্মীয়া।

ওঃ–যুবতীর বুক থেকে একটা জমাট অন্ধকার পরিষ্কার হয়ে গেলো। যুবতী নিজেই বলে উঠলো–গুলবাগ হোটেলের মালিক আমার আব্বা। আসবেন একদিন গুলবাগে, দেখা হবে আমার সঙ্গে।

বনহুর বললো–মহব্বৎ আলী আপনার আব্বা?

হাঁ, ফুলবাগের পাশেই আমাদের বাড়ি।

যুবতী যখন বনহুরের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় রত, তখন মাইকে ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ শোনা গেলো–আপনারা নিজ নিজ আসনে স্থির হয়ে বসুন। এবং বেল্ট বেধে নিন। কান্দাই এরোড্রামে এসে গেছি আমরা।

প্লেনের যাত্রীগণ আসনের সঙ্গে নিজ নিজ বেল্ট বেধে নিলো।

কান্দাই এরোড্রামের উপরে চক্রাকারে উড়ে বেড়াতে লাগলো প্লেনখানা। আশায় আনন্দে উফুল্ল সমস্ত যাত্রীগণ। এক সময় রানওয়েতে প্লেন অবতরণ করলো। এরোড্রামে উনখ জনতা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছে। যার যার আত্মীয়-স্বজন এসেছে তাদের রিসিভ করে নিতে। প্লেন এসে এবোড্রামে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে যাত্রীগণ।

যুবতী বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো–নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দেখা করবেন?

হেসে বললো বনহুর–নিশ্চয়ই।

একসঙ্গে সারিবদ্ধভাবে যাত্রীগণ প্লেন থেকে অবতরণ করছে। যুবতী ইচ্ছা করেই একটু পিছিয়ে পড়লো, বনহুরের পাশে গা ঘেষে সিঁড়ি। বেয়ে নামতে লাগলো।

বনহুর এ সময়টুকুর প্রতীক্ষাতেই ছিলো।

আলগোছে কখন যুবতীর কণ্ঠ থেকে মূল্যবান লকেটখানা বনহুরের পকেটে গিয়ে পৌঁছলো।

বনহুর আর নূরী যুবতীর নিকটে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলো এরোড্রাম থেকে।

যুবতী এগিয়ে গেলো তার আত্মীয়-স্বজনের দিকে।

অনেকেই এসেছে যুবতী পারভিনকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে। তার পিতা মহব্বৎ আলীও এসেছেন।

কন্যাকে দেখেই এগিয়ে গেলেন মহব্বৎ আলী–হ্যালো পারভিন, প্লেনে কোন কষ্ট হয়নি তো?

আব্বা, কোন কষ্ট হয়নি।

মহব্বৎ আলী বললেন–তোমার লকেটটা খুলে রেখেছো কেনো মা?

লকেট! অস্ফুট ধবনি করে নিজের গলায় তাকালো পারভিন। সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠলো। আমার পকেট গেলো কোথায়?

এখানে যখন মহব্বৎ আলী এবং পারভিন লকেট খোজা নিয়ে তোলপাড় শুরু করলো, বনহুর আর নূরী তখন ট্যাক্সিতে চেপে বসেছে।

কান্দাই এর একটা হোটেলে গিয়ে উঠলো বনহুর ও নুরী।

বনহুর জানে, দিনের আলোতে কান্দাই শহরে সে নিরাপদ নয়।

কান্দাই এর পুলিশ মহলের অনেকেই দস্যু বনহুরের আসল রূপ দেখেছেন। তারা অতি সহজেই বনহুরকে চিনে নিতে পারবেন।

রাতের অন্ধকারে নূরীকে আস্তানায় নিয়ে যেতে হবে।

নূরী কিন্তু অস্থির হয়ে পড়লো, মনিকে দেখার জন্য ভীষণ ভাবে ছটফট করতে লাগলো।

বনহুর কান্দাই পৌঁছে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলো না। আস্তানায় গিয়ে কি জবাব দেবে নূরীকে যখন নূরী তার মনিকে চাইবে?

০৫.

কান্দাই শহরে সাড়া পড়ে গেছে–মতি মহল সিনেমা হলে আজ মহা সমারোহে মুক্তিলাভ করবে নতুন ছবি কুন্তিবাঈ। দেয়ালে দেয়ালে, দোকান-পাটে, গাড়িতে কুন্তিবাঈ ছবির পোষ্টার লাগানো হয়েছে।

বছরের সেরা ছবি কুন্তি বাঈ।

ছবি এসেছে দূর দেশ থেকে শুধু কান্দাই শহরেই নয়, আরও কয়েকটি শহরেও এক সঙ্গে মুক্তি লাভ করছে ছবিটা।

সেদিন মনিরা নিজের ঘরে বসে বই পড়ছিলো, অদূরে একটা ছোট্ট গাড়ি নিয়ে খেলা করছিলো নূর।

এমন সময় নকিব কক্ষে প্রবেশ করে–আপামনি!

ই থেকে চোখ না তুলেই বলে মনিরা কিছু বলবি?

নকিবের হাতে একটা বিজ্ঞপ্তি, বলল নকিব–আপামনি, দেখুন মতি মহল ছবিঘরে নতুন একটা ছবি এসেছে। শুনলাম, ছবিটা নাকি খুব ভাল। নায়কটা কিন্তু ঠিক আমাদের দাদা মনির মত।

কথাটা শুনে মনিরা চোখ তুলে তাকালো নকিবের দিকে।

নকিব এগিয়ে গিয়ে বিজ্ঞপ্তিটা তুলে দিলো মনিরার হাতে–সত্য করে

বলছি আপামনি, দেখুন নিজের চোখে।

মনিরা নকিবের হাত থেকে বিজ্ঞপ্তি নিয়ে মেলে ধরলো চোখের সামনে। পাশা-পাশি দুখানা মুখ হিরো আর হিরোইনের। একি? এ যে তার স্বামীর চেহারা! না না, ভুল নেই–ঠিক সেই নাক-মুখ সব। মনিরা স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে বিজ্ঞপ্তিখানার দিকে।

নকিব মনিরার মনোভার বুঝতে পেরে বললো–তাইতো আমি বিজ্ঞপ্তিটা পথের একটা ছেলের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এলাম।

মনিরার চোখের সম্মুখে তখন স্বামীর মুখখানা ভাসছে। অনেক দিন স্বামীর কোন সন্ধান না পেয়ে মুষড়ে পড়েছিলো মনিরা। আজ আবার নতুন করে মনের পর্দায় ভেসে উঠলো স্বামীর স্মৃতি।

মনিরা বই রেখে বিজ্ঞপ্তি হাতে উঠে দাঁড়ালো, কি যেন চিন্তা করে বললো নকিব, সরকার সাহেবকে পাঠিয়ে দে। আমি মামীমার ঘরে রয়েছি।

নকিব চলে গেলো, মনিরা বিজ্ঞপ্তিটা আবার মেলে ধরলো চোখের সামনে, নিপুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। মানুষের মত কত মানুষ আছে, কিন্তু তার মন এমন করছে কেনো! মামীমাকে এ বিজ্ঞপ্তি দেখাবে না–বলবে না এ

সম্বন্ধে কোন কথা। ছবি দেখতে নিয়ে যাবে তাকে, হাজার হলেও মা আর সন্তান। যদি সত্যিই সে হয়, তাহলে মায়ের চোখে ধরা না পড়ে যাবে না। যত লোকেরই ভুল হোক, মায়ের কোন দিন ভুল হবে না সন্তানকে চিনতে।

মনিরাকে একটা কাগজ তন্ময় হয়ে দেখতে দেখে গাড়ি রেখে ছুটে এলো নূর, বললো–আম্মা, কি দেখছো অমন করে?

কিছু না বাবা, কিছু না। তাড়াতাড়ি বিজ্ঞপ্তিটা লুকিয়ে ফেললো মনিরা জামার ফাঁকে। তারপর নূরকে কোলে তুলে নিয়ে বললো মনিরা–বাপু, ছবি দেখতে যাবে? সিনেমা?

ইতিপূর্বে একদিন মনিরা নূরকে নিয়ে মতি মহল হলে ছবি দেখতে গিয়েছিলো। নূর তাই কিছুটা পরিচিত হলো সিনেমা সম্বন্ধে। বললো নূরদাবো আম্মা। আমি দাবো, সত্য নিয়ে দাবে তো আমাকে?

হাঁ বাবা, নিয়ে যাবো।

তারপর নূরকে কোলে করে মামীমার কক্ষে প্রবেশ করলো মনিরা।

মামীমা কোন একটা কিছু করছিলেন মনিরাকে দেখামাত্র সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, নূরের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন–কি দাদু, খুব যে। মায়ের কোলে চাপা হয়েছে। বলি ব্যাপার কি?

মনিরা নূরকে লক্ষ্য করে বললো–বলোনা বাবা, তুমি কি বলবে তোমার দাদীমাকে?

এগিয়ে এলেন মরিয়ম বেগম, নূরের গাল টিপে দিয়ে বললেন–বলো দাদু? বলো?

নূর মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বললো–দাদীমা, আজ আমলা ছবি দেখতে যাবো।

ছবি!

মনিরা বললো এবার মামীমা, নূর সখ করেছে, আজ নাকি সে ছবি দেখতে যাবে!

বেশ তো, সরকার সাহেবকে বলো, নিয়ে দাবেন উনি।

মামীমা।

বলো মা?

মতি মহল হলে সুন্দর একটা নাকি ছবি হচ্ছে, নতুন ছবি।

তাই নাকি? নতুন ছবি? যাও, মা-ছেলে দেখে এসো গে। নকিবকে বলে, সবার সাহেবকে ডেকে দেবে খন।

এমন সময় সরকার সাহেব প্রবেশ করলেন কক্ষ মধ্যে–আমাকে ডেকেছেন?

মরিয়ম বেগম বললেন–সরকার সাহেব, মতি মহল হলে নাকি নতুন ছবি এসেছে?

জি হ্যাঁ। বললেন সরকার সাহেব।

বললেন মরিয়ম বেগম–মনিরা ও নূর ছবি দেখতে যাবে, ওদের নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে।

মনিরা বলে উঠে–মামীমা, তোমাকেও যেতে হবে। মান হাসলেন মরিয়ম বেগম– আমার ও সব সখ মিটে গেছে মা, তোমরা যাও।

মনিরা পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো–আজ নূর তোমাকে ছাড়া কোথাও যাবেনা। নূর, সত্যি বলো তো, তোমার দাদীমাকে ছাড়া তুমি ছবি দেখতে যাবে?

মাথা দোলালো নূর–দাদীমা, আজ তোমাকে দেতে হবে। তুমি না দেলে আমি দাবোনা।

শুনলে মামীমা, শুনলে তো?

পাগলা দাদু, আমি বুঝি ছবি দেখতে যাবো?

কোনো দাবেনা দাদীমা? আমি তোমাকে ধলে নিয়ে দাবো। কথাটা বলে নূর মায়ের কোল থেকে নেমে মরিয়ম বেগমের হাত ধরে টানাটানি শুরু করলো।

সরকার সাহেব হেসে বললেন–আজ নূর আপনাকে না নিয়ে গিয়ে ছাড়বে না বেগম সাহেবা।

মরিয়ম বেগম হাসতে লাগলেন।

মনিরা বললো–চলুন না মামীমা, নূর যখন সখ করেছে!

শেষ পর্যন্ত মরিয়ম বেগম মনিরা ও নূরের সঙ্গে ছবি দেখতে যাওয়ার। জন্য রাজি হলেন।

·

অগণিত জনতায় মতিমহল হলের সম্মুখভাগ ভরে উঠেছে। পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে অগণিত মোটর গাড়ি। নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতীর অসংখ্য ভীড়।

শো শুরু হবার আর বেশি বিলম্ব নেই।

মতিমহল হলে আজ প্রথম শুভমুক্তি কুন্তি বাঈ-হল ফুল। বক্সের আসনে বসে আছে মরিয়ম বেগম আর মনিরা। সরকার সাহেব অদূরে নূরকে কোলে করে বসে আছেন, ফিস ফিস করে কথা বলছেন তিনি তার সঙ্গে।

মরিয়ম বেগম অনেক দিন হতে সিনেমা দেখেন না, কাজেই তিনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

মনিরা উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতীক্ষা করছিলো। ছবি দেখা তার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য তার ছবির নায়ককে দেখবে–সত্যই অন্য কেহ না, তার স্বামী দুস্য বনহুর।

পাশের আসনে এক যুবতী বসেছিলো।

মরিয়ম বেগম যুবতীর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন, কারণ শো শুরু হবার এখনও কয়েক মিনিট বাকি।

বললেন মরিয়ম বেগম–তোমার বাড়ি কোথায় মা?

যুবতী অন্য কেহ নয়, গুলবাগ হোটেলের মালিকের কন্যা মিস পারভিন; যার লকেট এখন বনহুরের পকেটে।

তার বহু মূল্যবান লকেট খানা হারিয়ে যাওয়ায় যদিও মন মোটেই ভাল নয়, তবু নতুন ছবি দেখবার সখ দমিয়ে রাখতে পারেনি সে। এসেছে মা ও বোনের সঙ্গে।

মা ও বোন এক পাশে বসেছিলো, পারভিন কয়েকটা সিট সরে এসে বসেছে, এখান থেকে ছবি নাকি তার চোখে ভাল লাগে।

কথায় কথায় অনেক কথা বললো পারভিন, তার লকেট হারিয়ে যাওয়ার কথাও বললো সে মরিয়ম বেগম ও মনিরার কাছে।

শো শুরু হলো।

টাইটেল দেখানো হচ্ছে।

মরিয়ম বেগম অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকিয়ে আছেন পর্দার দিকে। মনিরা পর পর চরিত্র ও নামগুলো পড়ে যাচ্ছিলো।

আতিয়া ফ্লিমের দ্বিতীয় অবদান কুন্তি বাঈ, প্রযোজক আরফান উল্লাহ, পরিচালক............

মনিরা দ্রুত চরিত্র ও নামগুলো পড়ে যাচ্ছিলো।

আতিয়া ফ্লিমের দ্বিতীয় অবদান কুন্তি বাঈ। প্রযোজক আরফান-উল্লাহ। পরিচালক নাহার চৌধুরী। শ্রেষ্ঠাংশেঃ জ্যোছনা রায় ও মকছুদ চৌধুরী.........

মনিরার কণ্ঠ দিয়ে অস্ফুট শব্দ বের হলো–মকছুদ চৌধুরী....

পাশের চেয়ার থেকে পারভিন বলে উঠলো–নতুন কোন নায়ক হবে।

মনিরা কোন জবাব দিলো না।

শো শুরু হলো।

কয়েকটা দৃশ্যের পরই ছবির হিরোর আবির্ভাব হলো।

সঙ্গে সঙ্গে মনিরা স্তব্ধ হয়ে গেলো–না না, তার মন যা বলেছিলো সেই সত্য। মকছুদ চৌধুরী নয়তার স্বামী বনহুর।

মরিয়ম বেগম কি বলেন শোনার জন্যে উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতীক্ষা করে মনিরা। পর্দায় তাকিয়ে থাকলেও মন তার পড়ে রইলো মামীমার কণ্ঠস্বর শোনার জন্য।

মরিয়ম বেগম বললেন–একি, আমি কি চোখে ধাঁ ধাঁ দেখছি? মনিরা, কি দেখছিস মা?

মামীমা, তুমি যা দেখছো তাই দেখছি।

এযে আমার মনির ছাড়া কেউ নয়। সরকার সাহেবকে লক্ষ্য করে ডাকলেন এখানে আসুন তো!

মরিয়ম বেগম আর মনিরার কথাবার্তায় বিরক্ত বোধ করছিল পারভিন। সেও কম আশ্চর্য হয়নি, এই যুবকই আজ সকালে তাদের প্লেনে কান্দাই এলেন। নিশ্চয়ই তিনি কুন্তি বাঈ ছবির হিরো। পারভিন স্বচক্ষে এই হিরোকে দেখেছে, এমন কি তার সঙ্গে আলাপ আলোচনাও করেছে সে। পারভিন ভুলে গেলো তার লকেটের শোক। কৃন্তি বাঈ ছবির হিরোর সঙ্গে তার প্রকাশ্য আলাপ হয়েছে–এ কম কথা নয়। মনিরাকে লক্ষ্য করে গর্ব করে বললো–আজই আমি কুন্তি বাঈ ছবির হিরো মকছুদ চৌধুরীর সঙ্গে একই প্লেনে এলাম।

কথাটা কানে যেতে মনিরা ছবি দেখা বন্ধ করে তাকালো পারভিনের মুখের দিকে মকছুদ চৌধুরীকে আপনি চেনেন?

হাঁ, তার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে। আজই তিনি তার এক বান্ধবী সহ কান্দাই এসে পৌঁছেছেন।

সত্যি! মনিরা পারভিনের হাত মুঠোয় চেপে ধরলো।

পারভিন মনিরার ব্যাকুলতা লক্ষ্য করে বিস্মিত হলো। এ এমন করছে কেন? মকছুদ চৌধুরীর অপরূপ রূপ একে একবারে উন্মুক্ত করে তুলছে। কিছুটা রাগও

হলো পারভিনের, ছবি দেখায় অসুবিধা হচ্ছে, কাজেই পারভিন উঠে চলে গেলো, যেখানে বসে ছবি দেখছিলো তার মা আর বোন।

মরিয়ম বেগম তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে আছে পর্দার দিকে। দুচোখে তার অপলক চাহনী। নিশ্বাস পড়ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। বিড় বিড় করে হঠাৎ বলে উঠেন–আমার মনির ছাড়া ও কেউ নয়। মকছুদ চৌধুরী ও নয়। আমার মনির… দেখছোনা সেই?

সরকার সাহেব চশমাটা খুলে মুছে নিয়ে আবার বললেন–তাই তো মনে হচ্ছে বেগম সাহেবা!

মনিরা কিন্তু নিশ্চুপ স্থির হয়ে পর্দায় তাকিয়ে আছে। বেঁচে আছে, সুখে আছে, দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে চিত্রনায়ক হয়েছে আর এক বারও মনে পড়ছে তার কথা। কোথায় মা, কোথায় মনিরা আর কোথায় নূর। পুরুষ জাতটাই কি হৃদয়হীন!

ক্রমেই মনিরার অন্তর অভিমানে ভরে উঠে।

নায়িকার সঙ্গে স্বামীর এই ঘনিষ্ঠতা মনিরার হৃদয়ে একটা তীব্র জ্বালা ধরিয়ে দিলো। অসহ্য-অসহ্য এ দৃশ্য। বাসর কক্ষের দৃশ্যে মনিরা দুহাতে চোখ ঢেকে ফেললো, না না, এসব সে নিজ চোখে দেখতে পারবে না। উঠে দাঁড়ালো মনিরা, নূরকে সরকার সাহেবের কোল থেকে টেনে নিয়ে বললোচলো মামীমা, আর দেখবো না।

মরিয়ম বেগম তার হারানো ধন ফিরে পেয়েছেন, তিনি হাঁ করে দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখছেন আর বিড় বিড় করে বলছেন–আমার মনির বেঁচে আছে। আমি আগেই বলেছিলাম–সে আবার ফিরে আসবে।

মনিরা উঠে দাঁড়াতেই বললেন মরিয়ম বেগম–চলে যাচ্ছিস মা?

হাঁ, চলো মামীমা, ভাল লাগছে না।

মরিয়ম বেগম বললেন–আর একটু বস্ মা, ওকে দেখতে দে। প্রাণভরে একটু দেখতে…….

অগত্যা মনিরা বসতে বাধ্য হলো।

ইচ্ছে করেই মুখ ফিরিয়ে বসে রইলো মনিরা। কিন্তু বেশিক্ষণ মুখ ফিরে থাকতে পারলো না সে। বহুদিন পর স্বামীকে দেখার লোভটুকু সংযত রাখা তার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ালো।

ছবি শেষ হলে হল থেকে বেরিয়ে এলো তারা।

মরিয়ম বেগমের চোখে মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস। তিনি গাড়িতে বসে বললেন– আমার মনির বেঁচে আছে, খোদার কাছে আমি লাখো শুকরিয়া করছি।

মনিরা কোন কথা বললো না, নিশ্চুপ বসে রইলো স্থবিবের মত গাড়ির এক পাশে।

নূর তখন সরকার সাহেবকে একটির পর একটি প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে।

বাড়ি ফিরে মরিয়ম বেগম শোকরানার নামায আদায় করলেন। চাকরবাকরদের ডেকে বললেন–ওরে তোরা শুনছিস–আমার মনির বেঁচে আছে। ভাল আছে সে। হাঁ, ভালই আছে, যেখানেই থাক সে, ভাল আছে।

মনিরা যে খুশি হয়নি তা নয়, স্বামী বেঁচে আছে, সুস্থ আছে–এতে কি তার আনন্দ নয়? অন্তরে আনন্দের হিল্লোল বইলেও মুখে তা প্রকাশ পেলোনা। একটা অভিমান দানা বেধে উঠলো তার মনের গহনে। তার স্বামী সুস্থ্য থেকেই তাকে ভুলে আছে, আজ দুবছর হলো একটি দিনের জন্যও কি মনে পড়েনি একবার তাকে। পুরুষ-প্রাণ ঐ রকমই পাষাণ হয়।

নূরু ঘুমিয়ে পড়েছে কখন–পাশের ঘরে ঘুমিয়েছেন মরিয়ম বেগম। গোটা চৌধুরী বাড়ি ঝিমিয়ে পড়েছে। একটি প্রাণীও জেগে নেই।

শুধু চৌধুরী বাড়িই নয়, সমস্ত শহর সুপ্তর কোলে ঢলে পড়েছে। মাঝে মাঝে দুএকটা প্রাইভেট মোটর-কার এদিক থেকে ওদিকে চলে যাবার শব্দ শোনা যাচ্ছিলো।

মনিরা বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিলো, কিছুতেই ঘুম আসছিলো না তার চোখে।

এ কি হলো! এমন তো কোন দিন হয়নি, আজ এতো অস্থির লাগছে। কেনো। সেই যে ছবি দেখে আসার পর একটি বারের জন্য তার চোখের সম্মুখ হতে মুছে যায়নি স্বামীর মুখখানা। সেই পৌরুষ ভরা কণ্ঠস্বর। সেই দীপ্ত সুন্দর নীল চোখ দুটি। সেই কুঞ্চিত কেশ রাশি। প্রশস্ত ললাট, বলিষ্ঠ বাহু, মিষ্টি হাসি, সব যেন আজ আবার বেশি করে মনটাকে আচ্ছন্ন করে তুলছে। কিছুতেই নিজকে সংযত রাখতে পারছে না, স্বামীর বুকে মুখ রাখবার জন্য আকুল হয়ে উঠলো মনিরার প্রাণ।

নূরের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে রইলো।

রাত বেড়ে আসছে।

দূর দূরান্ত থেকে ভেসে আসছে কুকুরের গলার আওয়াজ।

মনিরা নিদ্রাহীন চোখে ঠিক তেমনি করে বসে আছে। যেমন সে বসেছিলো নূরের শিয়রে।

আলোটা ডিম করা ছিলো। মনিরা ভাবছিলো, তার স্বামী যার সঙ্গে অভিনয় করলো কে সে মেয়ে, কে সে জ্যোছনা রায়। সত্যি কি তার স্বামীর সঙ্গে জ্যোছনা রায়ের কোন সম্বন্ধ ঘটেছে। হয়তো তাই হবে নইলে এতোদিন কি করে সে ভুলে থাকতে পারে তাকে, আর স্নেহময়ী জননীকে।

মনিরার গণ্ড রেখে গড়িয়ে পড়তে লাগলো অশ্রুধারা।

ঠিক সেই মুহূর্তে পিছন শার্শি খুলে গেলো আচম্বিতে।

মনিরা চমকে উঠলো, মশারীর বাইরে বেরিয়ে এলো, সে ভয় বিহ্বল চোখে তাকালো শার্শির দিকে।

পর মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করলো বনহুর। সমস্ত শরীরে জমকালো ড্রেস। মুখে কালো রুমাল বাধা। দক্ষিণ হস্তে রিভলভার।

বনহুরকে দেখেই মনিরার চোখ দুটো ক্ষণিকের জন্য আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, ছুটে এসে ঝাপিয়ে পড়লো সে তার বুকে। অস্ফুট কণ্ঠে বললোএসেছো?

বনহুর নিজের মুখের রুমাল খুলে ফেললো, গভীর আবেগে মনিরাকে বুকের মধ্যে নিবিড়ভাবে চেপে ধরে বললো–এসেছি। মনিরা কেমন ছিলে?

মনিরা ভুলে গিয়েছিলো অভিমান, ভুলে গিয়েছিলো কিছুক্ষণ আগের কথাগুলো। স্বামীর প্রথম দর্শনে সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলো সে।

এবার মনিরার মনে উঁকি দেয় রাগ, ক্ষোভ আর অভিমান। স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত করে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলে মনিরা। কেনো এলে তুমি!

বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলে উঠে বনহুর–সেকি মনিরা?

হাঁ, না এলেই খুশি হতাম বেশি। মনিরা!

ব্যাকুল কণ্ঠে বললো বনহুর।

মনিরার অভিমান মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো ভীষণভাবে। এতোদিনের স্বামীর বিরহ-বেদনা আজ একযোগে ধাক্কা মারলো তার বুকে। কঠিন গলায় বললো–আমি বেশ ছিলাম, আবার কেনো আমাকে বিরক্ত করতে এলে বলো তো?

মনিরা, এ তুমি কি বলছো?

না, না, তুমি চলে যাও, আমি চাইনা তোমাকে।

বনহুরের মুখমণ্ডল কালো হয়ে উঠেছে। কত আশা আর আকাখা নিয়ে সে আজ হোটেল থেকে রাতের অন্ধকারে চলে এসেছে। এখনও সে আস্তানায় গিয়ে পৌঁছে নাই। নূরীকে হোটেলে রেখে সে এই রাতের প্রতীক্ষায় ছিলো। সব বাসনা মুহূর্তে ধুলিস্মাৎ হয়ে গেলো।

বনহুর টেবিলের পাশে চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়লো। দু হাতে মাথার চুলগুলো টেনে ছিড়তে লাগলো সে। অধর দংশন করতে লাগলো।

মনিরা নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বনহুরের অন্তরের দাহ মনিরার হৃদয়ে যে আঘাত করছেনা, তা নয়। তার মনটাও ব্যথায় গুমড়ে কেঁদে উঠছে। কতদিন পর স্বামীকে পেয়েও সে যেন পাচ্ছে না, কোথায় যেন বাধা।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো, টেবিল থেকে রিভলভারটা হাতে তুলে নিয়ে বললো–বেশ, আর আসবোনা।

মনিরার অন্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিলো, কিন্তু একটা দারুণ অভিমান তাকে যেন সংজ্ঞাহারা করে ফেলেছিলো। স্বামী চলে যাচ্ছে, তবু এক পাও এগুতে পারছে না।

বনহুর যেমন এসেছিলো তেমনি বেরিয়ে গেলো মনিরার কক্ষ থেকে।

বনহুর বেরিয়ে যেতেই মনিরা ছুটে গিয়ে ঘুমন্ত নূর কে বুকে চেপে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলো। কেনো সে এমন ভুল করলো, কেনো সে স্বামীকে অমন বিমুখ করে ফিরিয়ে দিলো। কেনো বলতে পারলো না মনের গোপন কথা। সে তো কিছুই জানলোনা বা বুঝতে পারলোনা। মনিরা যা বললো সে তার মনের কথা নয়। সে ভুল বুঝলো তাকে, হয়তো আর কোন দিন সে আসবেনা। একি করলো মনিরা, কত আরাধনার পর তবেই না তাকে ফিরে পেয়েছিলো। কেনো সে এমন কাজ করলো। ব্যথা-বেদনায় ভেংগে পড়লো মনিরা।

০৭.

মনিরার নিকট থেকে বিমুখ হয়ে ফিরে চললো বনহুর। বহুদিন পর কত আশা আকাংখা আর বাসনা নিয়ে ছুটে গিয়েছিলো সে মনিরার পাশে। মনিরা আজ তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে–ভাবতেও পারেনি সে।

মনিরাকে একটু দেখবার জন্য কতদিন ধরে মন তার অস্থির হয়ে পড়েছিলো। মনিরার বিরহ-বেদনা তাকে অহঃরহঃ উদ্বিগ্ন করে রাখতো, আর আজ সেই মনিরা তাকে ....না, না, মনিরা তো এমন ছিলনা কোনদিন। আজ সে এতোদিন পর তাকে কাছে পেয়েও এতোটুকু খুশি হলো না। কেনো, কেনো মনিরা এমন হলো...

বনহুর আপন মনে পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ তার কানে এলো কোন এক করুণ কণ্ঠের বিলাপ ধ্বনি।

–মায় ভূখা হু, খোদা কে ওয়াস্তে মুঝে কুছ খানা দো–মায় ভূখা ই–

থমকে দাঁড়ালা, বনহুর, কান পেতে শুনলো শব্দটা কোন্ দিক থেকে আসছে।

তখনও করুণ আর্তকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে–খোদা কে ওয়াস্তে মুঝে কুছ খানা দো।

বনহুর অন্ধকারে এগিয়ে গেলো, দেখতে পেলো–অদূরে ফুটপাতে এক বৃদ্ধ বসে বসে ধুকছে, আর বিলাপ করছে।

বনহুর বৃদ্ধের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো, পকেটে হাত দিয়ে বিমর্ষ হলোপকেট শূন্য। দ্বিতীয় পকেটে হাত দিতেই হাতে উঠে এলে সেই লকেটখানা, যে লকেটখানা বনহুর কৌশলে পারভীনের কণ্ঠ থেকে আত্মসাৎ করেছিলো।

বনহুর বেশি কিছু চিন্তা করবার অবসর পেলো না, লকেটটা খুঁজে দিলো বৃদ্ধের হাতের মুঠায়।

দুহাত তুলে বৃদ্ধ দোয়া জানাতে লাগলো।

বনহুর তখন নিজের গন্তব্য পথে পা বাড়িয়েছে।

০৮.

হোটেল কক্ষে প্রবেশ করে এগিয়ে গেলো শয্যার দিকে। চমকে উঠলো বনহুর নূরী তার বিছানায় শায়িত। শিয়রের টেবিলে ডিম লাইট জ্বলছে।

বনহুর নূরীর ঘুমন্ত মুখে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ।–মনিরার মুখখানা ভেসে উঠলো তার চোখের সম্মুখে। নূরীর মুখ মুছে গেলো ধীরে ধীরে।

বনহুর নূরীর পাশে বসে হাত রাখলো নূরীর হাতে।

চমকে জেগে উঠলে নূরী, ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে চোখ রগড়ে বললো নূরী–হুর, কখন এলে?

নুরী জেগে উঠতেই বনহুর উঠে দাঁড়িয়ে ছিলো, মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে বললো–এখনই এলাম।

কোথায় গিয়েছিলে?

বনহুর কোন জবাব না দিয়ে ওদিকের খোলা জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়।

নূরী শয্যা ত্যাগ করে উঠে আসে বনহুরের পাশে–ও ঘরে আমার বড়। ভয় করছিলো।

বেশ, তুমি এ কক্ষেই শোও।

আর তুমি?

আমার ঘুমের কোন প্রয়োজন হবে না।

সেকি হুর?

নূরী! বনহুর নূরীকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নিলো। কিন্তু মুহূর্তে নূরীকে সরিয়ে দিয়ে বললো বনহুর–তুমি শুয়ে পড় নূরী, আমি মেঝেতে শুচ্ছি।

বনহুর একটা চাদর আর বালিশ নিয়ে হোটেল কক্ষের মেঝেতে শুয়ে পড়লো

নূরী দাঁড়িয়ে রইলো স্তব্ধ হয়ে।

বনহুর পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করে বললো–রাত বেশি নেই। খুব ভোরে আমরা আস্তানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবো। একটু ঘুমিয়ে নাও।

নূরী বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

০৯.

বনহুর যখন আস্তানায় পৌঁছলো তখন তার অনুচরগণের মধ্যে একটা আনন্দমুখর সাড়া পড়ে গেলো। সর্দারকে ফিরে পেয়েছেএ যেন তাদের রাজ্যজয়ের আনন্দ। সর্দার তাদের শুধু মনিব নয়, পরম আপন জনের চেয়েও অধিক।

সমস্ত আস্তানাটা ঝিমিয়ে পড়েছিলো যেন। কারো মনে ছিলোনা এতটুকু খুশি। সবাই খেতো–ঘুমাতো-বেড়াতো। দরকার মত দস্যুতা করতেও বের হতো কিন্তু তবু যেন কারো মনে শান্তি ছিলোনা।

রহমান তাদের পরিচালনা করতো বটে, তা হলেও সর্দারের অভাব সকলের মনে একটা হাহাকার জাগাতো। কি যেন ছিলো, কি যেন নেইএমনি লাগতো

সকলের। যদিও অনুচরগণ দস্যু বনহুরকে ভয় করতো ভীষণ ভাবে, তবুও শ্রদ্ধা করতো অনেক।

বিশেষ করে অশ্ব তাজকে নিয়ে আস্তানার সকলের মনে একটা দুঃশ্চিন্তার ঝড় বয়ে চলেছিলো।

তাজের শরীর দিনদিন ক্ষীণ হয়ে পড়ছিলো। প্রভুর অন্তর্ধানে পশু হলেও তাজ মানুষের মত ব্যথায় মুষড়ে পড়েছিলো। বনহুর যেবার কারাগারে বন্দী হয়েছিলো সেবারও তাজকে নিয়ে বনহুরের অনুচরগণ বড় দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলো।

বনহুরের অনুপস্থিতিতে. তাজ কিছুই খেতোনা, সব সময় এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতো, কার যেন প্রতীক্ষায় সর্বক্ষণ উন্মুখ থাকতো। রহমান নিজে জোর করে তাজের মুখে তুলে ভোলা আর ধান খাইয়ে দিতো। পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতো। গা ঘেষে দিত।

আজ বনহুরকে পেয়ে তাজ যেন আনন্দে আপ্লুত হলো। মুখ মাথা ঘষতে লাগলো সে বনহুরের শরীরের সঙ্গে। শুকতে লাগলো নাক দিয়ে বনহুরের গোটা শরীর। সম্মুখের পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে লাগলো তাজ।

বনহুরও তাজের মনোভাব বুঝতে পারলো–পিঠ ঘাড় নেড়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলো।

তাজ যে সম্মুখের পা মাটিতে আঘাত করে প্রভুকে পিঠে উঠার জন্য ইংগিত করছে, বুঝতে পারলো বনহুর।

বনহুর যখন তাজকে আদর করছিলো তখন বনহুর দাঁড়িয়ে ছিলো তার পাশে। অদূরে দাঁড়িয়ে বনহুরের আদেশের প্রতিক্ষা করছিলো আরও কয়েকজন অনুচর। আজ সকলের মুখমণ্ডলই আনন্দোজ্জ্বল।

শুধু আস্তানা আর অনুচরগণের মনেই খুশির জোয়ার বয়ে চলেনি, সমস্ত বনভূমি যেন আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠেছে। বসন্ত ফিরে এলে বসুন্ধরা যেমন নতুন রূপ ধারণ করো তেমনি বনহুরের আগমনে গাছের শাখায় শাখায় দোলা জাগলো, ফুল ফুটলো, বাতাস বইলো, ডালে ডালে পাখি গান গাইলো।

বনহুরের মনেও যে খুশির দোলা লাগেনি তা নয়। বহুদিন তার পর তার মনে এক অফুরন্ত আনন্দ দ্যুতি খেলে যাচ্ছিলো, কিন্তু এতো খুশির মধ্যেও বনহুর সম্পূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করছিলো না। মনিরার কঠিন বাক্যগুলো তার হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানছিলো। যতই সে ভুলে যাবার চেষ্টা করছিলো, ততই আরও বেশি করে মনে হচ্ছিলো মনিরার মুখখানা। এদিকে নূরীকে নিয়ে আর একটা বিভ্রাট শুরু হলো। আস্তানায় পৌঁছেই আমার মনি কই, মনি কই বলে সবাইকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো।

বনহুর আস্তানায় পৌঁছেই রহমানকে বলে দিয়েছিলো, তারা যেন নূরীকে বলে– তার মনি আছে, এক ধাত্রীর কাছে তাকে লালন-পালনের জন্যে দেওয়া হয়েছে। এবার ফিরিয়ে আনা হবে।

বনহুর এক সময় রহমানকে নিকটে ডেকে নিয়ে নিভৃতে সব কথাই বললো। চলে যাবার পর থেকে তার জীবনে কি ঘটেছে সমস্তই বললো সে রহমানের কাছে। নূরীর হারিয়ে যাওয়া এবং তাকে উদ্ধার করা কোন কথাই বাদ দিলো না। তারপর নূরী কি ভাবে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলো, কিভাবে তার জ্ঞান লাভ হলো, বললো বনহুর। অনুচরদের মধ্যে সে রহমানকে সব চেয়ে বিশ্বাস করতো এবং মনের কথা সব বলতো তার কাছে।

রহমানের মুখে বনহুর শুনলো মনিরার সংবাদ।

ছদ্মবেশে রহমান প্রায়ই শহরে গিয়ে মনিরার সন্ধান নিতো, মনিরা সর্দারের জন্য কত চিন্তিত-ব্যথিত, জানতো সে। মনিরার মুখে রহমান কোনদিন হাসি দেখে নি, যেদিনই সে তাকে দেখেছে অশ্রু ছাড়া কিছুই দেখতে পায়নি।

রহমান সব খোলসা করে বললো সর্দারের নিকট।

রহমানের কথা শুনে হেসে বললো বনহুর রহমান, তুমি যা বললে, সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে আমার মনে হচ্ছে।

রহমান মনিবের মুখে এমন উক্তি শুনবে আশা করেনি, বললো সে-সর্দার, আপনার সম্মুখে মিথ্যা বলার দুঃসাহস আমার নেই।

বনহুর ললাট কুঞ্চিত করে বললো–বৌ রাণীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে রহমান। আমি গত রাতে তার নিকটে গিয়েছিলাম।

রহমানের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। উন্মুখ হৃদয় নিয়ে পরবর্তী কথা শুনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো সে।

বনহুর বসেছিলো, উঠে দাঁড়ালো, নিজের চুলের মধ্যে আংগুল চালাতে চালাতে বললো–তার কাছে যে ব্যবহার আমি কাল পেয়েছি, বলবার নয়।

সর্দার! অস্ফুট কণ্ঠে প্রতিধ্বনি করে উঠলো রহমান।

বনহুর কিছুক্ষণ আপন মনে পায়চারী করতে লাগলো। মুখভাব গম্ভীর।

রহমান নিশ্চুপ তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে।

হঠাৎ পায়চারী বন্ধ করে থমকে দাঁড়িয়ে বললো বনহুর রহমান!

সর্দার!

রহমান, বিয়ে আমি করিনি, আমার মায়ের আদেশ পালন করেছি মাত্র…

সর্দার!

ওখানে আর কোন দিন তুমি যাবে না রহমান, আমার আদেশ।

সর্দার আপনি ভুল করছেন। বৌ-রাণীর উপর আপনি অযথা রাগ করছেন। সর্দার, বৌ-রাণীই শুধু নেই সেখানে, সেখানে রয়েছে আপনার সন্তান,…

বনহুর রাগত কণ্ঠে গর্জে উঠলো–আমার সন্তান?

হাঁ, বৌ রাণী নূরকে খুজে পেয়েছে।

নূর!

সর্দার, নূর আপনার সন্তানের নাম। ভুলে গিয়েছেন আপনি?

ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালো বনহুর রহমানের মুখের দিকে।

রহমান অন্যদিন হলে ভড়কে যেতো, আজ এতটুকু বিচলিত হলো না, গলায় জোর দিয়ে বললো–সর্দার, নূর–সে যে আপনারই প্রতিচ্ছবি। নূরের মধ্যে আমরা খুঁজে পেয়েছি আপনাকে! সর্দার বৌ-রাণীর প্রতি আপনি বিমুখ হবেন না।

০৯.

রহমান দস্যু হলেও তার মন উন্নত ছিলো এবং জ্ঞান গরিমাতেও সে কম ছিলো না। বনহুরকে নানা ভাবে বুঝাতে লাগলো রহমান।

বনহুর যখনই একা বসে বিশ্রাম করতো তখনই পাশে গিয়ে দাঁড়াতে রহমান-সর্দার!

বনহুর মনের চঞ্চলতাকে গোপন করবার জন্য মুখভাব স্বাভাবিক করে বলতে–কে রহমান?

হাঁ সর্দার?

কি খবর বলো?

সর্দার, আপনি বৌ-রাণীকে…

বৌ-রাণী–বৌরাণী তোমাকে বলেছি, ও নাম আমার সম্মুখে আর মুখে আনবে না।

সর্দার, আমি জানি বৌ-রাণীকে আপনি ভুল বুঝছেন। বৌ রাণীকে আজও আপনি চিনতে পারেননি।

বনহুর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠে আমার চেয়ে তোমরাই তাকে বেশি চেনেনা বলতে চাও?

সর্দার, কিন্তু বলছিলাম যে বৌ-রাণীর উপর আপনি অযথা রাগ করেছেন। তিনি এমন কোন কারণে আপনার উপর …

রহমানকে কথা শেষ করতে দেয় না বনহুর, হুঙ্কার ছাড়ে সে–বনহুর নারী জাতিকে করুণা করে, সমীহ নয়। আমি মনিরাকে করুণা করেই গ্রহণ করেছিলাম।

সর্দার, আপনি বলতে চান বৌ-রাণীকে আপনি ভাল না বেসেই বিয়ে করেছেন? করুণাই আপনাকে এতদূর অগ্রসর করতে সক্ষম হয়েছে?

রহমান আজ ভুলে গেলো–সে সর্দারের সঙ্গে কথা বলছে। যে সর্দারের মুখের দিকে তাকিয়ে সে কোনদিন কথা বলতে পারেনি–আজ রহমান চোখ-মুখ বন্ধ করে জলস্রোতের মতই বলে চললো। সর্দার, আপনি আজ কদিন এসেছেন, কই একটি দিনও তো আপনাকে প্রাণ খুলে হাসতে দেখলাম না। অহঃরহ অন্তরে আপনার মনে একটা ঝড়ের তাণ্ডব বয়ে চলেছে, এটা আর কেউ না বুঝলেও আমি বুঝতে পেরেছি। সবার চোখে ধুলো দিলেও আমার চোখে ধুলো দিতে পারবেন না। বলুন সর্দার, বৌরাণীকে আপনি ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন না করুণা করে? বলুন?

শক্তিতে বনহুর শক্তিমান হলেও রহমানের কথায় সে পরাজিত হলো তার কাছে। সত্যিই তো মনিরাকে সে করুণা করে বিয়ে করেনি। বিয়ে করেছে। মায়ের অনুরোধে আদেশে। মনিরাকে ভালবাসতো বনহুর–সে কথা মিথ্যা নয়। তাই বলে ভালবাসার বিনিময়ে কি বিয়ে,

বনহুরের চিন্তায় বাধা দিয়ে বলে উঠলো রহমান সর্দার।

বনহুর এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললো–রহমান, আমি স্বীকার করলাম, মনিরাকে আমি ভালবাসি। তাই বলে কোন নারীর রূঢ় আচরণ দস্যু বনহুর সহ্য করবে না।

এরপর রহমান আর কোন কথা বলতে পারলো না, ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করলো নূরী।

বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো–রহমান ভাইকে অমন করে বকলে কেনো হুর?

বনহুর আর একটা কঠিন উক্তির জন্য অপেক্ষা করছিলো। ভেবেছিলো, নূরী আড়াল থেকে সব শুনেছে কিন্তু এখন বুঝতে পারলো, রহমান আর তার মধ্যে যে আলোচনা হলো,কিছুই শুনতে পায়নি নূরী। শুনতে পেলে একটা ঝড়-ঝাপটা শুরু হতো এতোক্ষণ। কারণ, বৌ-রাণী নামটা নূরী কিছুতেই ভালভাবে গ্রহণ করতে পারবে না।

নূরী বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে পড়লো–মনিকে কবে আনবে বলো?

বনহুর শান্ত কণ্ঠে বললো–সে জন্যই তো রহমানকে বকলাম।

কেনো?

মনিকে আজও সে আনতে যায়নি বলে?

আচ্ছা, আমিও ওকে দেখাচ্ছি মজাটা। নূরী উঠতে গেলো, বনহুর অমনি হাতখানা চেপে ধরলো নূরীর।

-বসো নূরী।

না, আমার মনির জন্য মন কেমন করছে। হুর, আমার মনিকে কেনো তোমরা এনে দিচ্ছো না?

বলেছি তো সে তার ধাত্রীমাতার নিকটে আছে।

আমি কোন কথা শুনবো না, আমার মনিকে এনে দাও। আমার মনিকে এনে দাও। হু, আমার মনিকে এনে দাও...... মনিকে এনে দাও.....

নূরী বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে আমি কোন কথা শুনবো না। আমার মনিকে এনে দাও। প্রবলভাবে ঝাকুনি দিতে লাগলো নূরী।

বনহুরের মনের অবস্থা আজ মোটেই ভাল ছিলো না, নূরীর হাত দুখানা এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো–আমি জানিনা কোথায় তোমার মনি।

সঙ্গে সঙ্গে নুরী পাথরের মূর্তির মত বন্ধ হয়ে পড়লো, ঠোঁট দুখানা একটু নড়ে উঠলো মাত্র। স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো বনহুরের দিকে।

বনহুর অধর দংশন করতে লাগলো, বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠলো তার ললাটে।

কিছুক্ষণ দ্রুত পায়চারি করে ফিরে তাকালো বনহুর নুরীর দিকে। নূরী তখনও স্থির ভাবে বসে আছে কেমন যেন চিত্রাপিতের মত।

নূরীকে এভাবে পুতুলের মত নিশ্চুপ বসে থাকতে দেখে চমকে উঠলো বনহুর। দুশ্চিন্তায় মনটা ভরে উঠলো, আবার ওর মাথাটা গুলিয়ে যাবে না তো! ভিতরে ভিতরে আশঙ্কিত হলো সে। এগিয়ে গেলো বনহুর, নূরীর চিবুক ধরে উঁচু করে তুলে বললো–নুরী।

নূরী, তোমার মনিকে আমি এনে দেবো। এনে দেবো নূরী......

নূরীর গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

বনহুর নূরীর পাশে বসে ওকে টেনে নেয় কাছে, চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। সান্ত্বনার কণ্ঠে বলে–লক্ষ্মীটি কেঁদোনা, তোমার নূরীকে আমি এনে দেবোকথা শেষ করে বনহুর আনমনা হয়ে যায়। সত্যি কি সে মনিকে এনে দিতে পারবে? কোথায় মনি, সে এমন কত বড় হয়েছে। বেঁছে আছে না মরে গেছে কে জানে। এতো বড় মিথ্যা বলে বনহুর চিন্তিত হয়ে পড়লো।

নূরীর মাথায় হাত বুলিয়ে চললো বনহুর।

নূরী বনহুরের বুকে মাথা গুঁজে উচ্ছ্বসিত ভাবে কেঁদে উঠলো। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো মনি ছাড়া আমি বাঁচবো না। বাঁচবো না হুর।

নূরী! কেঁদোনা লক্ষ্মীটি .....

.

মনিবের মনের অস্থিরতা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করতে লাগলো রহমান। বহুদিন পর সর্দারকে তারা ফিরে পেয়েছে কত আনন্দ! কিন্তু সর্দার যদি সব সময় চিন্তিত থাকে তবে কিভাবে তাদের কাজ হবে।

শহরের নানা স্থানে আবার দেখা দিয়েছে নানা রকম অরাজকতা। পুলিশের চোখে ধুলি দিয়ে শয়তান লোকগুলো আবার কেঁপে উঠেছে বেলুনের মত। গোপনে তারা অসহায় জনগণের রক্ত শুষে নিচ্ছে নীরবে।

রহমান সব সন্ধানই নিয়েছে। তাদের যতটুকু সম্ভব সায়েস্তাও করেছে কিন্তু আরও প্রয়োজন। এবং ওদের সায়েস্তা করতে হলে চাই সর্দারের সহায়তা।

রহমান প্রায়ই ছদ্মবেশে শহরে প্রবেশ করতো। গোপনে সন্ধান নিয়ে ফিরতো সে! বনহুরের প্রধান অনুচর রহমান, বনহুরের মতই তার মহৎ উদেশ্য। ধনীর ধন লুটে নিয়ে ধনহীন অনাথাদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়াই তার ব্রত।

আজও রহমান ভাল বাসেননি কোন নারীকে, নূরীই ছিলো তার একমাত্র স্বপ্ন। কিন্তু যখন সে জানতে পেরেছে নূরী ভালবাসে তার মনিব দস্যু বনহুরকে–সে দিন থেকে রহমান নূরীকে এড়িয়ে চলতো। নূরীর স্মৃতির হৃদয় সিংহাসনে সংগোপনে রেখে ভুলে থাকতো মানবদেহী নূরীকে। দূর থেকে নূরীকে রহমান পূজা করতো, কিন্তু কোনদিন বিরক্ত করতে না সে তাকে।

একদিন বনহুর আর রহমান বসেছিলো নির্জন ঝর্ণার ধারে। অদূরে তাজ আপন মনে ঘাস খাচ্ছিলো।

বনহুর একটা ঘাসের খন্ড নিয়ে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলছিলো। মুখভাব গম্ভীর ভাবাপন্ন। তাকিয়ে ছিলো সে সম্মুখস্থ বয়ে চলা ঝরণার পানির দিকে।

বনহুরের অদূরে রহমান বসেছিলো, তার মুখমণ্ডলও বেশ চিন্তাযুক্ত। বললো রহমান সর্দার বহুদিন আপনি দেশছাড়া। এতো দিন দেশে আপনি না। থাকায় নানা রকম অনাচার শুরু হয়েছে। পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে কতগুলো চোরাকারবারী যা ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছে। কত নিরীহ জনগণের রক্ত যে তারা শোষণ করছে তার ঠিক নেই।

বনহুর সোজা হয়ে বসলো–তুমি এতোদিন কি করেছিলে রহমান?

সর্দার, আমি যতটুকু সম্ভব শয়তানদের সায়েস্তা করতে চেষ্টা নিয়েছি। কিন্তু বেশি কিছু করে উঠা সম্ভব হয়নি। কারণ পুলিশের সহায়তায় তারা বেঁচে গেছে। পুলিশ মনে করেছে, তারা হৃদয়বান লোক, কাজেই……..

বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কারা সেই দুষ্ট শয়তানদের দল?

সর্দার, সবচেয়ে দেশের জনগণের বিস্তর ক্ষতি সাধন করছে একটি ধনবান ব্যক্তি, নাম তার মহব্বৎ আলী। সে শুধু জনগণের ক্ষতিই সাধন করছে না, দেশের চরম শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কি করেছে সে?

মহব্বৎ আলী প্রচুর অর্থবান লোক। শহরে এবং বিদেশে তার বহু কারবার আছে, যে সব কারবারে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন হয়ে থাকে। একটা হোটেল আছে–যেখানে শহরের সৎ ব্যক্তিদের প্রলোভন দেখিয়ে অসৎ পথে আনা হয়। মদ পান, জুয়া খেলা এবং বাঈজী নাচ সব হয়ে থাকে সে হোটেলে। হোটেলের অভ্যন্তরে আরও অনেক কুৎসিৎ কাজ সমাধা হয়ে থাকে।

হু। বনহুর একটা শব্দ করে উঠলো।

রহমান বুঝতে পারলো, তার মনিবের চিন্তাধারা বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়েছে। সব সময় সর্দারের বিমর্ষতা অন্যান্য অনুচরদের তেমন করে ভাবিয়া

তুললেও, রহমান বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো। এবার ঔষধ ধরেছে, রহমান মহব্বৎ আলীকে সায়েস্তা করতে না পেরে ভীষণভাবে ক্ষেপেছিলো।

বনহুর কুঞ্চিত করে কিছু ভাবতে লাগলো।

রহমানের অতি পরিচিত সর্দারের এ. মুখভাব, মনে মনে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলো সে।

বনহুর বললো–রহমান, প্রস্তুত থেকো, আজ রাতেই একবার শহরে যাবো।

আচ্ছা, সর্দার।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো—চলো।

রহমানও নীরবে অনুসরণ করলো।

বনহুরের অশ্ব আর রহমানের অশ্ব তখন পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে।

উভয়ে উঠে বসলো নিজ নিজ অশ্বে।

.

রহমান এক সময় ছদ্মবেশ ধারণ করে নিজ অশ্ব নিয়ে রওয়ানা দিলো। কাউকে সে কোন কথা বললো না–কোথায় যাচ্ছে, কেনো যাচ্ছে। বনবাদাড় আর

জঙ্গল ছেড়ে রহমানের অশ্ব শহরের পথ ধরে এগুলো। রহমানের শরীরে আজ পাহারাদারের শুভ্র ড্রেস।

একটা বড় দোকানের সামনে অশ্ব রেখে নেমে পড়লো রহমান। কিছু খাবার আর খেলনা নিয়ে উঠে বসলো আবার অশ্বপৃষ্ঠে।

সোজ গিয়ে পৌঁছলো রহমান চৌধুরী বাড়ির বাগানের পাশে।

আজ কদিন থেকে মনিরার মনের অবস্থা অত্যন্ত অবর্ণনীয়। নাওয়াখাওয়া সব সে ত্যাগ করেছে। এমনকি নূরকে আদর করাও সে ভুলে গেছে যেন।

হঠাৎ মনিরার এ অবস্থা দর্শন করে মরিয়ম বেগম অত্যন্ত চিন্তিত এবং বিচলিত হয়ে পড়লেন। ভেবে পান না কেনো সে এমন হলো।

সেই ছবি দেখার দিন হতে মনিরার মধ্যে এ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। মরিয়ম বেগম। বুঝতে পেরেছেন স্বামীর কথাই মনিরাকে এভাবে চিন্তাক্লিষ্ট ও ভাবাপন্ন করে ফেলেছে।

তাই মরিয়ম বেগম তেমন করে কোন কথা না বললেও মাঝে মাঝে বলতেন–মা মনিরা, ভাবিসনে, আমার মন বলছে–সে আসবে। আমি মা, ওর কিছু হলে আমার মন বলতো। কিন্তু আমার মনে সান্ত্বনা আছে সে আসবে...

মরিয়ম বেগমের কথার কোন জবাব দেয় না মনিরা। সে আসবে—মায়ের মনে কত আশা। জানেন না তিনি। যার আসার আশায় তিনি পথ চেয়ে আছেন, সে এসেছিলো। এসে আবার সে চলে গেছে, তাঁকে বিমুখ–করে ফিরিয়ে দিয়েছে মনিরা নিজে।

মরিয়ম বেগম যতই মনিরাকে সান্ত্বনা দিতেন ততই মনিরার হৃদয়ের ব্যথা না কমে আরও বেড়ে যেতো। কোন রকমে মামীমার দৃষ্টির আড়ালে চলে এসে বালিশে মুখ লুকিয়ে কাঁদতো।

হয়তো নূর দেখে ফেলতো, ছুটে এসে মায়ের পাশে বসে কাঁদো কাঁদো মুখে বলতো–আম্মা, তুমি কাঁদতো কেনো? আম্মা, বলো না তুমি কাঁদতে কেনো?

মনিরা শিশু-পুত্রের হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতো।

নূর কিছু বুঝতে না পেরে ছুটে যেতো মরিয়ম বেগমের কাছে। গলা জড়িয়ে ধরে বলতো নূর–দাদীমা, আমাল আম্মার কি হয়েতে? আমাল আম্মা কাঁদতে কেনো?

মরিয়ম বেগম অবাক হয়ে বলতেন–সেকি! আম্মা কাঁদছে? চলো তো দেখি।

ছোট্ট নাতীর হাত ধরে মরিয়ম বেগম আসেন মনিরার কক্ষে।

মনিরা তখন বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

মরিয়ম বেগম মনিরার পিঠে হাত রেখে বললেন–ছি ও মা, অমন করে কাঁদতে নেই! আমি মা হয়ে দেখতে, বুকে কেমন পাষাণ চাপা দিয়ে আছি। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে তার, গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন আবার তিনি–ওর সঙ্গে তোকে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করে আমি ভুল করেছি মনিরা। ভেবেছিলাম তোকে দিয়ে ওকে আমি আটকে রাখবো, কিন্তু সে আশা আমার বিফল হয়েছে। বনের পাখিকে কেউ কোনদিন খাচায় আবদ্ধ রাখতে পারেনা, তাকে যতই দুধ কলা খাওয়ানো যায়.....

মামীমা! মামীমা....... মনিরা মরিয়ম বেগমের কোলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে উচ্ছ্বসিত ভাবে কেঁদে উঠে।

মনিরা, যে ভুল আমি করেছি তার প্রতিকার নেই। একটা জীবন এমনি করে আমার চোখের সম্মুখে বিনষ্ট হয়ে যাবে, আর আমি তাই সহ্য করবে। মা, আমাকে তুই তিরস্কার কর, তিরস্কার কর মা।

মনিরা সোজা হয়ে বসলো, আঁচলে চোখের পানি মুছে বললো মামীমা, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। কে বললো, তোমাকে, আমার জীবন বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে?

আমি কি কিছুই বুঝিনা মনিরা? তোর অন্তরের ব্যথা আমি কি কিছুই। উপলব্ধি করতে পারিনা? মা হলেও আমি নারী। নারীর সর্ব যে তার স্বামী..........

মামীমা!

মনিরা, কি করবো বল, আমি তোকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিচ্ছি। এ বয়সে কে তার স্বামীকে পাশে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়। কাঁদ, আরও কাঁদ, কেঁদে কেঁদে তবু যদি

বুকটা তোর হালকা হয়।

একটু থেমে কঠিন কণ্ঠে বললেন মরিয়ম বেগম–আমি মা হয়ে ওকে অভিসম্পাত করছি, ওর যেন.......

মনিরা দক্ষিণ হস্তে মরিয়ম বেগমের মুখ চাপা দিয়ে বলে উঠলো– না না, তাকে তুমি অভিসম্পাত করোনা। অভিসম্পাত করোনা মামীমা। মায়ের অভিশাপ সবচেয়ে মন্দ। ওর কোন অমঙ্গল হবে এ আমি সইতে পারবো না। তিলে তিলে আমি মরণ বরণ করবো, কিন্তু ওকে আমি অভিশাপ দিতে দেবব না–মামীমা–মামীমা–

মরিয়ম বেগমের গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো অশ্রুধারা। নীরবে তিনি মনিরার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে চললেন।

নূর তখন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মা-ই বা কাঁদছে কেনো, আর দাদীমা-ই বা কাঁদছে কোননা, কিছুই বুঝতে পারে না অবুঝ শিশু নূর।

এমন সময় নকীব এলো; যদিও সে মরিয়ম বেগম ও মনিরাকে অশ্রুরা নয়নে দেখতে পেলো তবু না বলে পারলো না, বললো সে আপামনি সেই লোকটা এসেছে, ঐ যে নূরকে যে ভালবাসে, খেলনা দেয়:...

মনিরা জানে রহমান আসে–সে-ই নূরের জন্য খেলনা আর খাবার নিয়ে। আসে। অনেক করে বারণ করা সত্বেও সে এ কাজ করে। অনেক দিন মনিরাকে বলেছে রহমান-বৌ-রাণী, আমি তো নিজের টাকায় এ সব করছিনা, ওর বাপের টাকার জিনিস। কেনো আপনি রাগ করেন বৌ-রাণী?–নকীবের কথায় রহমানের কথাগুলো মনের পর্দায় ভেসে উঠে মনিরার।

আঁচলে চোখের পানি মুছে উঠে দাঁড়ায় মনিরা, হঠাৎ যেন তার মুখের ভাব বদলে যায়। মরিয়ম বেগমকে লক্ষ্য করে বলে সে মামীমা, রহমান : এসেছে। আয় নূর-নূরকে কোলে করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যায় মনির।

মরিয়ম বেগম আশ্বস্ত হন। রহমানের পরিচয় তিনি জানেন। মনিরা মামীমাকে সব খুলে বলেছেন–রহমান তার স্বামীর প্রধান অনুচর। এ বাড়ির আর একজন জানেন রহমানের আসল পরিচয়–তিনি হলেন বৃদ্ধ সরকার সাহেব। মনিরা

মরিয়ম বেগম ও সরকার সাহেব ছাড়া কার কেউ জানেনা–রহমান কে। এমন কি বিশ্বাসী চাকর নকীবও না।

পুত্রের প্রধান অনুচর এবং বিশ্বাসী জন বলেই মরিয়ম বেগম মনিরাকে কোনদিন রহমানের সম্মুখে যেতে বারণ করেননি। মনিরা প্রায়ই রহমানের মুখে তার স্বামীর আস্তানার সংবাদ শুনতো। আরও কত কথা বলতো রহমান, সর্দারের গুণগানে মুখর হয়ে উঠতো সে।

মনিরার শুষ্ক প্রাণে স্বামীর কাহিনী কিছুটা শান্তি দান করতো। আজ কতদিন রহমান বনহুরের পাশে রয়েছে, বনহুরকে সে যেমন করে জানতো আর কেউ তেমন করে জানতো না। তাই রহমানের কাছে মনিরা সন্ধান পেতো তার স্বামীর।

নূরকে কোলে করে মনিরা এসে দাঁড়ালো হল ঘরে।

রহমান যেমন করে কুর্ণিশ জানায় তার সর্দারকে, তেমনি করে কুর্ণিশ জানাতো বৌ-রাণীকে।

কুর্ণিশ জানিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো রহমান।

নূর মায়ের কোল থেকে ছুটে গিয়ে জাপটে ধরলো রহমানকে–আমার জন্যে কি এনেতো সিপাহী?

মনিয়া রহমানকে সিপাহী বলে সম্বোধন করতো। নূরও মায়ের কাছে এ উক্তিটাই শিখে নিয়েছিলো।

নূরকে রহমান তুলে নিলো কোলো, হেসে বললো–ছোট সর্দার, তোমার জন্য অনেক জিনিস এনেছি।

কই, দাও?

রহমান পাশের টেবিলে রাখা প্যাকেটগুলো তুলে দিলো নূরের হাতেএই নাও ছোট সর্দার।

রহমান নূরকে ছোট সর্দার বলতো।

মনিরা অবশ্য প্রথম প্রথম রাগ করত। বলতো–ও নাম ধরে ডেকোনা সিপাহী।

রহমান হেসে বলতো–কেন বৌ-রাণী?

না, ও নাম আমার সহ্যের বাইরে। তোমাদের সর্দার অমানুষ বলে, আমার নূর অমানুষ হবে?

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠছিলো রহমান, বলেছিলো–আমাদের সর্দার অমানুষ কে বললো এ কথা আপনাকে? মানুষ যদি থাকে তবে মানুষ আমার সর্দার। ভয় কাকে বলে জানে না সে। শয়তান জানোয়ার যারা নিরীহ মানুষের বুকে বসে রক্ত শুষে খায়, তাদের টুটি ছিঁড়ে ফেলতে কসুর করেনা। দুষ্ট লোকদের বুকে গুলী করতে এতটুকু হাত কাঁপেনা। শয়তানের শত্রু,

অনাথার বন্ধু–তাকে আপনি অমানুষ বলেছেন বৌ-রাণী?

এর পর থেকে আর কোনদিন মনিরা রহমানকে ছোট সর্দার বলে ডাকতে আপত্তি করতে পারেনি।

নূর রহমানের হাত থেকে খাবার আর খেলনা হাতে নিলো। মনিরা বললো–যাও বাবা, দাদীমার কাছে যাও।

নূর খুসী হয়ে চলে গেলো উপরে।

মনিরা স্থির হয়ে দাঁড়ালো, দৃষ্টি রইলো রহমানের মুখে।

বললো রহমান–বৌ রাণী, কি হয়েছে আপনাদের? আমাদের?

হাঁ সর্দারকে আমরা ফিরে পেয়েছি বটে, কিন্তু তার আসল রূপ কোথায় অন্তর্ধান হয়েছে। সব সময় গম্ভীর ভাবাপন্ন। কি হয়েছে বৌ-রাণী?

মনিরা কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললো–জানিনা।

না, আপনাকে বলতেই হবে?

আমি বললাম জানিনা।

বৌ-রাণী, আমার কাছে আপনি কোন কথা গোপন করবেন না। জানেন তো, সর্দার আমাদের সর্বস্ব। তার বিষণ্ন মলিন ভাব আমাদের মনে অহঃরহ যন্ত্রণা

দিচ্ছে। বলুন বৌ-রাণী, কি হয়েছে?

তোমরাই কি শুধু তাকে ভালবাসো, আমি কি তাকে একটুও ভালবাসি না? সিপাহী, আমি-আমিও কম মনঃকষ্ট ভোগ করছিনা। আমার হৃদয়েও দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে,–আজ কদিন আমি এতটুকু শান্তি পাইনি। এতটুকু না। সিপাহী, আমি তাকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দিয়েছি, আমি তাকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দিয়েছি–গলা ধরে আসে মনিরার।

রহমান নতমুখে দাঁড়িয়ে ছিলো, এবার চোখ তুলে তাকালো সে মনিরার মুখের দিকে।

মনিরা বলে চললো–আমিই অপরাধী। আমিই অপরাধী সিপাহী। আমি তাকে ভুল বুঝে বিমুখ করে ফিরিয়ে দিয়েছি....

এবার বললো রহমান–বৌ-রাণী, সর্দার বড় জেদী মানুষ। এক বার অভিমান হলে সহজে তাকে খুশি করা মুসকিল। আমি তাকে অনেক করে বলেছি, আপনার এখানে আসার জন্য অনেক অনুরোধ করেছি।

কিছুক্ষণ চিন্তা করলো মনিরা, তারপর বললো–আমাকে একবার তার কাছে নিয়ে যেতে পারো?

সর্দারের কাছে!

হাঁ সিপাহী, তার কাছে একবার আমি যেতে চাই।

কিন্তু •••

না না, কিন্তু নয়, তুমি আমাকে তার কাছে যাবার ব্যবস্থা করে দাও সিপাহী! নইলে আমি আত্মহত্যা করবো।

বৌ-রাণী–

জানো–নারীর স্বামী না হলে সে জীবনের কোন দাম নেই। স্বামীই যে সব। আমি ভুল করেছি রহমান, আমি ভুল করেছি।

তাহলে আপনি...

হাঁ, আমাকে যেমন করে পারো একবার তার কাছে নিয়ে চলো।

আস্তানায় যাওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয় বৌ-রাণী। একটু চিন্তা করে বসলো রহমান–আজ সর্দার ব্যস্ত থাকবেন। এর পর যেদিন সুযোগ আসবে আপনাকে আমি সর্দারের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দেবো।

সিপাহী।

বৌ-রাণী, আপনি আমার উপর ভরসা রাখবেন, সর্দারের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হবেই।

সিপাহী।

চলি বৌ-রাণী।

এসো সিপাহী!

রহমান পুনরায় মনিরাকে কুর্নিশ জানিয়ে বলে–খোদা হাফেজ।

মনিরা অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করে–খোদা হাফেজ।

বেরিয়ে যায় রহমান।

মনিরা তাকিয়ে থাকে রহমানের চলে যাওয়া পথের দিকে।

ছাদের উপরে তখন মরিয়ম বেগম আর নূরের আনন্দ ভরা কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

১১.

হোটেল গুল বাগের সম্মুখে এসে একটা গাড়ি থামলো। গাড়ি থেমে নেমে এলো দুটি যুবক। শরীরে তাদের মূল্যবান কোট প্যান্ট-টাই। প্রথম যুবকের চোখে কালো চশমা।

যুবকদ্বয় হোটেলের মধ্যে প্রবেশ করতেই একজন বয় এগিয়ে এলো।

প্রথম যুবক একটা কার্ড হাতে দিয়ে বললো–মিস পারভিনকে দাও।

কার্ড হাতে বয় চলে গেলো।

যুবকদ্বয় নিম্ন স্বরে কিছু আলাপ করতে লাগলো।

বয়ের বিলম্ব দেখে প্রথম যুবক একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো। সিগারেট থেকে ধূম নির্গত করতে করতে হোটেল-কক্ষের চারদিকে সূতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগলো সে।

এমন সময় পারভিন এসে দাঁড়ালো তাদের সম্মুখে।

প্রথম যুবককে দেখতে পেয়ে আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো তার চোখ দুটো, উচ্ছাসিত কণ্ঠে বললো–হ্যালো, আপনি! আসুন আমার সঙ্গে।

যুবকদ্বয় অন্য কেহ নয়, প্রথম জন দস্যু বনহুর দ্বিতীয় জন তার প্রধান অনুর রহমান।

বনহুর আর রহমান অনুসরণ করলো পারভিনকে।

হোটেল কক্ষ হলেও এটা পারভিনের নিজস্ব কক্ষ।

সুন্দরভাবে সজ্জিত এ কক্ষে প্রবেশ করে বনহুর বললো–মিস পারভিন, অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করলাম।

মোটেই আমি বিরক্ত হইনি, আপনারা বসুন।

বনহুর চোখের চমশাটা খুলে টেবিলে রাখলো, তারপর আসন গ্রহণ করলো।

রহমান যদিও কোনদিন প্রভুর সম্মুখে আসন গ্রহণ করে নাই, আজ তার ইংগিতে আসন গ্রহণ করলো।

পারভিনের চোখে মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস। সেদিনের পর পারভিন মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারেনি প্লেনের সেই যুবকটিকে। তার পর ছবিতে যখন তাকেই সে দেখলো তখন আরও মুগ্ধ হলো। শয়নে-স্বপনে জাগরণে-সব সময় ঐ মুখানা

ভাসছিলো তার মানস পটে। এই ক্ষণে তার কামনার জনকে পেয়ে কি যে আনন্দ হলো!–পারভিন যেন আত্মহারা হয়ে পড়লো।

পারভিন আসন গ্রহণ করতেই বললো বনহুর রহমানকে লক্ষ্য করে বন্ধু, তোমার সঙ্গে এর পরিচয় নেই। ইনি গুলবাগ হোটেলের মালিক মহব্বৎ আলীর কন্যা মিস পারভিন আর এ আমার বন্ধু রহমান।

পারভিন হেসে বললো–আপনার পরিচয় আজও কিন্তু আপনি বলেননি। আপনি কি কুন্তি বাঈ ছবির নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেছেন?

হাঁ, আপনার অনুমান সত্যি। আমিই মুকছুদ চৌধুরী।

আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সত্যি, আপনার অভিনয় আমাকে মুগ্ধ করেছে।

খুশি হলাম শুনে।

আপনি নিশ্চয়ই ছবিটা দেখেছেন মিঃ চৌধুরী।

না, সে সুযোগ এখনও আমার হয়নি।

সে কি?

হাঁ মিস পারভিন, সুটিং শেষ করেই আমাকে বিদায় নিতে হয়েছিলো।

বনহুর, রহমান আর পারভিন যখন হোটেল-কক্ষে বসে আলাপ করছিলো। তখন হোটেলে একটা হট্টগোল শোনা গেলো।

অল্পক্ষণ পর একটা বয় ব্যস্তভাবে কক্ষে প্রবেশ করে পারভিনকে লক্ষ্য করে বললল–আপা, আপ কা লকেট মিল গিয়া।।

পারভিন অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো–সকেট পাওয়া গেছে। পর মুহূর্তে পারভিন বললো–আপনারা কয়েক মিনিটের জন্য বসুন এক্ষুনি আসছি।

আপ কো লকেট মিল গিয়া কথাটা শুনে চমকে উঠেছিলো বনহর। পারভিনের কথায় বললো–আচ্ছা, আসুন।

বেরিয়ে গেলো পারভিন।

বনহুর রহমানের কানে মুখ নিয়ে বললো–রহমান, আর একটা বিভ্রাট ঘটলো।

বিভ্রাটঃ

হাঁ, পারভিনের লকেট আমিই নিয়েছিলাম, কিন্তু সেদিন পথে একটা বৃদ্ধ ভিখারীকে দিয়েছিলাম ওটা, ভুল করেই ওটা আমি দিয়েছিলাম...... কারণ, আমার পকেটে তখন ঐ লকেট ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।

ঠিক সেই মুহূর্তে হোটেল থেকে ভেসে এলো এক বৃদ্ধের ব্যথা কাতর কণ্ঠস্বর— মায় নেহি জানতা, কাওন আদমী মেরে হাত মে ও চীজ দিয়া....

সঙ্গে সঙ্গে শুনা গেলে কর্কশ কন্ঠে–শালা বদমাশ বুড়হে, তুম লকেট বেচনে গিয়া, আর লকেট তুম চোরায়ে নেহি?

বুড়োকে আঘাতের শব্দ ভেসে এলো সেই সঙ্গে।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো।

রহমান উঠে গিয়ে উঁকি দিয়ে ফিরে এলো–সর্দার, কয়েকজন পুলিশ একটা বৃদ্ধকে প্রহার করছে।

বনহুর পা বাড়ালো দরজার দিকে।

রহমান বললো–সর্দার, ঠিক হবে না আপনার যাওয়া, বরং বৃদ্ধকে মুক্তির উপায় করতে হবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে পদশব্দ শোনা যায়।

বন আর রহমান আসন গ্রহণ করে।

বনহুর সিগারেট কেসটা বের করে উল্টে পাল্টে নাড়াচাড়া করতে থাকে, নিজকে স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করে সে।।

পারভিন কক্ষে প্রবেশ করে আনন্দ ভরা গলায় বলে উঠে–মিঃ চৌধুরী, আমার লকেট ফিরে পেয়েছি। এই দেখুন।

বনহুরের সম্মুখে মেলে ধরে পারভিন লকেটখানা।

বনহুর ভ্রূকুঞ্চিত করে বলেন–এ লকেটখানাই বুঝি প্লেনের মধ্যে আপনি হারিয়ে ছিলেন মিস পারভিন?

হ্যাঁ, সত্যি আমার লকেটখানা কি করে যে বুড়োটা পেয়েছিলো সেই জানে। নিশ্চয়ই সে চুরি করেছিলো ওটা।

বলে বনহুর-বুড়োটা কি সেদিন প্লেনে ছিলো?

ছিলো না কিন্তু একটু চিন্তা করে বলে উঠলো পারভিন–হয়তো লোকটা আদতে বুড়ো মানুষ নয়, কোন চোর।

তখনও বাইরে থেকে বুড়োর আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে–মায় নেহি জানতা বাবুজী...... মায় নেহি জানতা...

পুলিশের কণ্ঠস্বর-হাজত মে ভরনে ছে তুম ঠিক হোগা, নেহি তো সাচ বাত বোলো।

পুলিশের হান্টারের আঘাত গিয়ে পড়লো বৃদ্ধের কোঁকড়ানো পিঠে!

অমনি হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো বৃদ্ধ-খোদা তু দেখ মেরা কিয়া কসুর...

একটা হাসির শব্দ শোনা গেলো, অট্টহাসির শব্দ। গোটা হোটেলটা যেন প্রকম্পিত হয়ে উঠলো, হাসি বন্ধ করে বললো লোকটা–তুমহারি জান নেকাল লেঙ্গে। মেরা নাম মহব্বৎ আলী–হাঃ হাঃ হাঃ বুড়হে, তুম মেরা পারভিকা লকেট লিয়া

নেহি নেহি হাম নেহি—

বনহুর অধর অংশন করতে লাগলো।

পারভিন বনহুরের মনোভাব বুঝতে পেরে উৎকণ্ঠিত হলো। বললো রহমান–আজ আমাদের আর এক জায়গায় যাওয়ার কথা ছিলো যে?

বনহুর আনমনা ভাবে উঠে দাঁড়ালো–মিস পারভিন, চলি, গুডবাই।

পারভিন কিছু বলার পূর্বেই বেরিয়ে গেলো বনহুর আর রহমান।

১২.

বনহুর ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো।

রহমান বললো–সর্দার, মহব্বৎ আলীকে চিনেছেন?

হাঁ রহমান, কিন্তু তার পূর্বে চিন্তা বৃদ্ধ ভিখারীকে বাঁচিয়ে নেওয়া। কি করে ওকে বাঁচাননা যায়!

আমি সে কথাই ভাবছি। দেখ রহমান, এ বৃদ্ধের পরাভোগের জন্য দায়ী। আমি। আমিই দায়ী।

আপনিতো ওর অমঙ্গল চিন্তা করে ওটা দেননি!

কিন্তু বেচারী–কথা শেষ না করে বনহুর হোটেল ছেড়ে কিছুটা দূরে একটা গলির মধ্যে গাড়ি রাখলো। প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

অল্পক্ষণ পরে দুজন পুলিশ আর দুজন লোক–বোধহয় একজন কোন স্বর্ণকার, দ্বিতীয় জন হোটেলের কোন ব্যক্তি। সঙ্গে বৃদ্ধ ভিখারী। ভিক্ষারীর হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি পুলিশদ্বয় হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে বৃদ্ধ ভিখারীটিকে।

যেমন গলির পাশ কেটে চলে যাচ্ছিলো, আর ঠিক সে মুহূর্তে বনহুর ঝাপিয়ে পড়লো পুলিশদের উপর।

রহমানও প্রচণ্ড ভাবে আক্রমণ করলো।

এক এক মুষ্টিঘাতে এক একজনকে ধরাশায়ী করলো বনহুর ও রহমান।

পুলিশ রাইফেল তুলে ধরবার মত অবসর পেলো না।

বনহুর আর রহমান বৃদ্ধ ভিখারীকে মুক্ত করে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হলো গাড়ি নিয়ে।

পুলিশ ও লোক দুজন শরীরের ধূলো ঝেড়ে ছুটলো কেউ পুলিশ অফিসে, কেউ হোটেল গুলবাগে।

·

বেটা, তুম্ কাওন? বৃদ্ধ কুঁকড়ে যাওয়া শরীর নিয়ে সোজা হয়ে বসলো। চোখে-মুখে তার কৃতজ্ঞতার ছাপ।

বনহুর বৃদ্ধের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলো।

রহমান বৃদ্ধের হাত এবং কোমরের বন্ধন মুক্ত করে দিয়ে বললো–তুম্ ডাকু বনহুরকে সামনে।

কিয়া? বৃদ্ধের চোখে মুখে একটা বিষ্ময় ভাব ফুটে উঠলো। আনন্দ বিচলিত গলায় বললো বৃদ্ধ–ডাকু বনহুর, মুঝে খালাস কিয়া?

হাঁ, আব উসিকে পাশ রাহোগে, তুমহারা খানা পিনা কই তকলিফ নেহি হোগি।

বাপুজী সাচ?

হাঁ, সাচ।

এবার বৃদ্ধ রহমানের মুখে তাকিয়ে বললো–খোদা তেরি ভালা করে।

রহমান বললো, এবার বাবা, হাম নেহি ডাকু বনহুর। তুম্ হারা সামনে খাড়া অহি আদমী–

তুম্! আংগুল দিয়ে বনহুরকে দেখায় বৃদ্ধ।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠে–হাঁ, বাবা। মুঝে তুম্ মাফ করদো। লকেট তুমহে মায় দিয়া থা।

তুম্ মুঝে লকেট দিয়াথা?

হাঁ, হাম্ ভুল কিয়া। তুম মুঝে মাফ করদো বাবা?

খোদা তুঝে মাফ কিয়া বেটে।

সেদিনের পর থেকে বৃদ্ধ ভিখারী বনহুরের আস্তানায় স্থান লাভ করলো।

বনহুর জানে, এর পর বৃদ্ধকে শহরের পথে দেখলে কোন পুলিশ তাকে ক্ষমা করবেনা। নিরপরাধ ভিখারী কেনো কষ্ট পাবে। তার চেয়ে তার আস্তানায় থাকাই শ্রেয়।

বৃদ্ধ ভিখারী হলেও দরবেশ ধরণের লোক ছিলো। বনহুরের দয়ায় আর তাকে ভিক্ষার জন্য চিন্তা করতে হয় না, এখানে খায়-দায়, গজল গান গায়, আর খোদার এবাদত করে।

বৃদ্ধকে ভালই লাগে বনহুরের, মাঝে মাঝে বৃদ্ধের পাশে গিয়ে বসে বনহুর–নানা রকম ধর্ম আলোচনা করে সে।

বৃদ্ধ যখন গজল গায় তখন বনহুর তন্ময় হয়ে শোনে, মন প্রাণ ভরে উঠে অনাবিল এক আনন্দে।

একদিন বৃদ্ধ নির্জন স্থানে বসে গজল গাইছিলো। জ্যোছনা রাত, অদুরে নিঝরিনী ঝর্ণাধারা ছল ছল শব্দ করে বয়ে চলেছে। আপন মনে গজল গাইছিলো বৃদ্ধ দুচোখ তার মুদিত।

অদূরে একটা পাথরাসনে বসে দস্যু বনহুর।

অন্য একটা পাথরে ঠেস দিয়ে সেও দুচোখ বন্ধ করে ছিলো। জ্যোছনার আলোতে বনহুরকে দেব কুমারের মত সুন্দর লাগছিলো। শরীরে তার শুভ্র পোশাক।

বনানী ঢাকা পাথরাসনে পাতার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোছনার আলো খেলা করছিলো; খানিকটা জ্যোছনার আলো এসে পড়ছিলো বনহুরের চোখেমুখে। তন্ময় হয়েছিলো বনহুর বৃদ্ধের গজল গান।

এমন সময় অদূরে একটি নারীমূর্তি এগিয়ে আসে, পাশে একটি লোক। গাছের ছায়ায় আধো অন্ধকারে অতি লঘু পদক্ষেপে এগুচ্ছিলো তারা।

পুরুষ লোকটি এবার বললো–বৌ-রাণী, আপনি অপেক্ষা করুন। আমি বাবাজীকে আস্তানায় নিয়ে যাই। তারপর আপনি ....

নারীমূর্তি অন্য কেহ নয়, দস্যু বনহুরের পত্নী মনিরা।

পুরুষ ব্যক্তিটি রহমান।

রহমানের কথা বললো মনিরা–যাও সিপাহী, আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

এখানে আপনি একা থাকবেন বৌ-রাণী? কোন জীব......

ভয় নেই সিপাহী, হতভাগিকে কেউ খাবেনা। তুমি যাও।

মনিরা দাঁড়িয়ে পড়লো।

রহমান চলে গেলো সম্মুখের দিকে।

বৃদ্ধের গজল প্রায় শেষ হয়ে এসেছিলো।

রহমান বনহুরের পাশে এসে দাঁড়ালো।

বৃদ্ধের গজল শেষ হলে বললো–সর্দার!

বনহুর যেমন বসেছিলো তেমনি বসে রইলো, বললো–বসসা রহমান।

আজকাল মাঝে মাঝে বনহুর রহমানকে নিয়ে এই নির্জন ঝর্ণার ধারে এসে বসতো, কাজেই আজও বললো তাকে বসতে।

রহমান অন্যদিন হলে বসে পড়তো নীচের কোন পাথরখণ্ডে। আজ বসলোনা, বললো রহমান বাবাজীর শরীর আজ ভাল নয়, ওকে আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

আচ্ছা যাও।

রহমান একবার বৃদ্ধের পাশে এসে বললো–বাবাজী, আভি তুম চলল। রাত বহুং হুয়ে……।

আচ্ছ, চলো বাপু।

বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালো।

রহমান বৃদ্ধের হাত ধরে নিয়ে চললো বনপথ ধরে।

বনহুর আবার পাথরখণ্ডে ঠেস দিয়ে ভাল হয়ে বসলো। বনানী ঢাকা ঝর্ণার ধারে ফুরফুরে মিষ্টি হাওয়ায় আজ তার বড় ভাল লাগছে। আজ সে কোথাও যায়নি, অবশ্য রহমানের বিশেষ অনুরোধেই সে রয়ে গেছে। আগামীকাল মহব্বৎ আলীর হোটলে আবার সে পদার্পণ করবে। কাল কি করতে হবে–রহমানের সঙ্গে এ নিয়েই আলোচনা হবে এখানে। রহমান বৃদ্ধকে আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে, সেজন্য বনহুর অপেক্ষা করছে এখানে।

কোমল একটা হাতের স্পর্শ অনুভব করলো বনহুর নিজের মাথার চুলে।

বনহুর চোখ মেলে তাকিয়ে চমকে উঠলো–কে তুমি?

ঘোমটায় মনিরা মুখটা অর্ধেক ঢেকে রেখেছিলো, বনহুরের কণ্ঠস্বরে বুকটা ধক ধক করে উঠলো। একটু সরে দাঁড়িয়ে রইলো, কোন কথা বললোনা।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো বিদ্যুৎ গতিতে; গম্ভীর কঠিন কণ্ঠে বললো কে? এক ঝটকায় মনিরার মাথার ঘোমটা সরিয়ে দিলো বনহুর। সঙ্গে সঙ্গে জ্যোছনার এক খণ্ড আলো এসে পড়লো মনিরার মুখে। বনহুর বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলে উঠলো–তুমি!

মনিরা দুহাতে জড়িয়ে ধরলো বনহুরের পা দুখানা–ওগো, আমায় তুমি মাফ করে দাও। মাফ করে দাও ……

পাথরের মূর্তির মত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো বনহুর, কোন কথা বললোনা। মুখমণ্ডল কঠিন, দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানো।

মনিরার অশ্রুতে সিক্ত হয়ে উঠলো বনহুরের পা দুখানা।

তবু নীরব বনহুর।

সেদিন মনিরার উপেক্ষা বনহুরের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করেছিলো। জীবনে সে বুঝি এতোবড় আঘাত আর কোনদিন পায়নি।

মনিরার হাতের মধ্য হতে পা দুখানা সরিয়ে নিয়ে সরে দাঁড়ালো বনহুর, কঠিন কণ্ঠে বললো–রহমান তোমাকে পথ দেখিয়ে এনেছে বুঝি? এর জন্য ওকে শাস্তি পেতে হবে।

না না, ওর কোন দোষ নেই, আমি–আমিই এসেছি। আমাকে তুমি মাফ করো। যে ভুল আমি করেছি সেদিন, তার জন্য অহঃরহ আমি জ্বলে মরছি। আমাকে তুমি মাফ করো ……..

আর কোনদিন বিরক্ত করবোনা তোমাকে মনিরা।

এ তুমি কি বলছো? মনিরা অশ্রুসিক্ত নয়নে উঠে দাঁড়ালো।

হাতের মধ্যে হাত রগড়ে আবার বললো–তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারিনা। আমাকে তুমি হত্যা করো …….

বনহুর রাগত কণ্ঠে বললো—তুমি তো বেশ ছিলে, বরং আমার উপস্থিতি তোমাকে বিরক্ত করে তুলেছিলো …।

উঃ আজও তুমি মনে রেখেছো সব কথা? তুমি বিশ্বাস করো, ওগুলো আমার মনের কথা নয়…….. তুমি বিশ্বাস করো….

মনিরা বনহুরের হাত দুখানা মুঠায় চেপে ধরলো।

বনহুর তখনও নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখমণ্ডল গম্ভীর কঠিন। মনিরার অশ্রু যে তাকে বিচলিত করেনি তা নয়, এর চেয়ে আরও কত কঠিন কথা মনিরা বনহুরকে বলেছে কতদিন, কিন্তু সেদিনের কথাগুলো বনহুরের মনে তীরফলকের মতই বিদ্ধ হয়ে আছে যেন।

মনিরা স্বামীর বুকে মাথা ঠুকতে লাগলো–তুমি বিশ্বাস করো, ও আমার মনের কথা নয় ……. ও আমার মনের কথা নয় …

বনহুর তখনও স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

মনিরার বিলাপধ্বনি ওর কানে পৌছোচ্ছে কিনা কে জানে।

হঠাৎ মনিরা ছুটে চললো ঝর্ণার দিকে, যাবার সময় বললো মনিরা বেশ, ক্ষমা না করতে পারো, এ জীবন আমি বিসর্জন দেবো, তবু ফিরে যাবো না।

মনিরা ছুটে গিয়ে ঝর্ণার পাশে দাঁড়ালো।

বনহুর আর নিজকে সংযত রাখতে পারলো না, উচ্চ কণ্ঠে বললো–মনিরা শোন।

অভিমানে মনিরার বুক ভরে উঠেছে, এ মুহূর্তে সে নিজ জীবন বিসর্জন করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবে না। ঝাপিয়ে পড়বে মনিরা কিন্তু আর পারলো না, বনহুরের কণ্ঠস্বর তার কানে যেন মধু বর্ষণ করলো। থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালো।

বনহুর ততক্ষণে মনিরার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

মনিরা, এবার লুটিয়ে পড়ে স্বামীর বুকে।

বনহুর ভুলে যায় যত অভিমান।

.

রাত যত বেড়ে আসে নূরী ততই বনহুরের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বনহুর আজ বাইরে কোথাও যায়নি জানে সে। আস্তানার আশেপাশে কোথাও আছে কিংবা বৃদ্ধের গজল শুনছে সে ঝর্ণার পাশে বসে। কিন্তু এতোক্ষণে ও ফিরে আসছেনা কেনো। নূরী আস্তানার বাইরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই রহমান পথ রোধ করে দাঁড়ালো–কোথায় যাচ্ছো?

নূরী গম্ভীর কণ্ঠে বললো–বনহুরের সন্ধানে। পথ ছেড়ে দাও।

না, পথ ছাড়বোনা।

কেনো?

সর্দার ওদিকে নেই।

হাঁ, আমি শুনলাম, সে ঝর্ণার পাশে বসে বাবাজীর গজল শুনছিলো।

কে বললো তোমাকে?

কায়েস।

ও জানেনা।

আমি বাবাজীর কাছে শুনে আসছি, দাঁড়াও।

নূরী চলে গেলো বাবাজীর কক্ষের দিকে।

বৃদ্ধ তখন শোবার আয়োজন করছিলো।

নূরী প্রবেশ করলো সেখানে।

রহমান চিন্তিত হলো এবার। সর্দার ঝর্ণার ধারেই আছে, এবং সে একা নেই-তার পাশে আছে বৌ-রাণী।

নূরী কক্ষে প্রবেশ করতেই বললো বৃদ্ধ—কাওন্?

নূরী।

তুম্ এনা রাত পর এঁহা?

এক বাত কইয়ে বাবাজী?

বোলো?

সর্দার কাহা তুম্ জানতে হো বাবাজী?

হাঁ মায় জানতা হু, সর্দার বেটা ওহি ঝর্ণাকে কিনারে।

রহমান যেন হাবা বনে গেলো।

নূরী রহমানের মুখে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো–এতো মিথ্যা বলতে পারো তুমি রহমান।

নূরী যেওনা। আমিই সর্দারকে ডেকে আনছি।

না, আমিই যাবো।

এতো রাতে সর্দার তোমাকে ওখানে দেখলে খুশি হবে না।

কিসে সে খুশি হবে না হবে শুনতে চাইনা রহমান।

একাই যাবে?

যদি মনে করো এসো আমার সঙ্গে। নূরী কথা শেষ করে এগিয়ে চললো।

এদিকে নূরী আর রহমান যখন বনপথ ধরে এগিয়ে আসছে, তখন বনহুর আর মনিরা উঠে দাঁড়িয়েছে। বললো বনহুর–চলো মনিরা, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মনিরা আর বনহুর এগুলো, অদূরে একটা গাছের সঙ্গে বাধা ছিলো তাজ।

বনহুর মনিরাকে তাজের পিঠে উঠিয়ে দিয়ে নিজেও বসলো। মনিরা স্বামীর বুকে নিবিড় ভাবে ঠেস দিয়ে বললো–আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। এই তো আমার বেহেস্ত।

বনহুর মনিরার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। তারপর তাজের লাগাম টেনে ধরলো।

ধমকে দাঁড়ালো নূরী, তাজের খুঁড়ের শব্দ তার অতি পরিচিত। বললো নূরী–রহমান, তাজের পদশব্দ না?

রহমান মনে মনে হাজার শুকরিয়া করে বললো–সর্দার বুঝি শহরে গেলো।

শহরে?

হাঁ, কাজ আছে সেখানে।

কই, তুমি তো গেলেনা?

সর্দারের গোপন কাজ কিনা।

তুমি জানো রহমান, কোথায় গেলো সে?

না নূরী, আমি জানিনা।

ঐ চৌধুরী বাড়ি গেলো না তো?

রহমান সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বললো–নূরী, অনেক দিন বলেছি, আজও বলছি–মিছামিছি সর্দারের পথ চেয়ে কোন ফল হবে না।

নূরী মুখ গম্ভীর করে ফেললো, বললো–রহমান, আমি যে তারই কাঙ্গাল।

কিন্তু সে যদি তোমাকে কোনদিন ....

চিরদিন আমি তার পথ চেয়ে থাকবো।

জীবনটা নষ্ট করে দিবে নূরী?

না না, আমার জীবন নষ্ট হবার নয়, আমার হুর–সেই তো আমার সব।

কিন্তু ...

না, কিন্তু নয় রহমান। হুর আমার, আমি তার–আমি তার–আনমনা হয়ে যায় নূরী!

রহমান অলক্ষ্যে রুমাল দিয়ে নিজের চোখ মুছে নেয়।

বলে রহমান–চলো নূরী।

চলো–

নূরী নিজের কক্ষে প্রবেশ করে শয্যা গ্রহণ করে, কিন্তু মন তার চলে গেছে দূরে বহু দূরে সুদূর অতীতে–বনহুরের সঙ্গে ছোট বেলার স্মৃতিগুলো হাতড়ে চলে

একটির পর একটি করে। ছোট বেলায় দুজনে বনে বনে লুকোচুরি খেলা। তীর ধুন নিয়ে শিকার করা। নদীতে দুজনে মিলে সাঁতার কাটা। নূরী পাথরখণ্ডে বসে বাঁশি বাজাতো, বনহুর চুপি চুপি পিছন থেকে এসে চোখ দুটো টিপে ধরতো ওর। দুজনে হাসতো খিল খিল করে। কত দিন বন থেকে ফুল তুলে নিয়ে গুঁজে দিয়েছে বনহুর নূরীর খোপায়–এসব কি ভুলবার। শুধু আজ নয়, যেদিন নূরীর চোখে ঘুম আসতো না বা কোন চিন্তার বেড়াজাল তাকে জড়িয়ে ধরতো সে দিন নূরীর মনের পর্দায় ভেসে উঠতো ছোট বেলায় তার আর বনহুরের স্মৃতিগুলো।

১৪.

জানো আর একজন আছে এ কক্ষে? বললো মনিরা।

বনহুর তাকালো কক্ষের চারদিকে, কোথাও কাউকে না দেখে বললো–মশারীর নীচে তো?

হাঁ। বলতো কে?

তোমার নূর।

কি করে জানলে তুমি?

রহমান সব বলেছে।

এসো নূরকে দেখো। মনিরা বনহুরের দক্ষিণ হাত ধরে নিয়ে আসে খাটের পাশে। মশারী উচু করে বলে মনিরা চিনতে পারছো?

নূর পাশ ফিরে এদিকে মুখ করে শুয়ে ছিলো। হাত-ছোট গেঞ্জি গায়েদক্ষিণ হাতখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হাতের বাজুতে সেই চিহ্ন।

বৈদ্যুতিক আলোতে স্পষ্ট দেখলো বনহুর নূরকে, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো। এ শিশুকেই একদিন সে কাপালিক সন্ন্যাসীর কবল থেকে রক্ষা করে নূরীর কোলে অর্পণ করেছিলো। যদিও কয়েক বছরের ব্যবধান ঘটেছে, তবু বনহুর চিনতে পারে নূরকে। বনহুরের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে অতীতের কয়েকটা ছবি। নূরী শিশুকে কোলে করে খুসীতে আত্মহারা, বলে–হুর, জানো এর নাম রেখেছি মনি! চমকে উঠেছিলো বনহুর, কারণ, তার মা তাকে ঐ নাম ধরে ডাকতো। বড্ড

অপেয়া নাম ওটা–বলেছিলো বনহুর। নূরী খোকনের গালে-মুখে চুমো দিয়ে ভরে দিয়েছিলো। তারপর আর একদিন নূরী খোকনটিকে কোলে করে প্রবেশ করেছিলো তার কক্ষে। বনহুরকে লক্ষ্য করে বলেছিল–দেখো দেখো হুর, তোমার দক্ষিণ বাহুর মত আমার মনির হাতেও একটা চিহ্ন।–আজ বনহুরের চোখের সম্মুখে সবগুলো দৃশ্য একের পর এক ফুটে উঠতে লাগলো। নূরীর মনিই মনিরার নূর! আশ্চর্য!

বললো মনিরা–কি ভাবছো?

উঁ।

কি ভাবছো?

নূরকে তুমি কোথায় পেলে মনিরা?

শুনবে, শুনবে তুমি সে কাহিনী?

হাঁ বলো, শুনবো।

বসো।

পাশাপাশি বসলো মনিরা আর বনহুর। মনিরা কিভাবে নূরকে পেয়েছে, সব কথা খুলে বললো বনহুরের কাছে।

অবাক হয়ে সব শুনলো বনহুর, এবার স্পষ্ট বুঝতে পারলো–এ শিশুই সেই মনি, যার জন্য নূরী দিন রাত অশ্রু বিসর্জন করেছে।

মনিরা যখন সব বলছিলো, তখন বনহুর চিন্তা করেছিলো, কথা দিয়েছে সে তার মনিকে এনে দেবে।

বনহুরের মনে নতুন এক অভিসন্ধি উঁকি দিয়ে যায়।

মনিরা বনহুরের জামার বোতাম লাগিয়ে দিতে দিতে বলে–নূরকে আদর করলেনা তো?

আনমনা হয়ে পড়েছিলো বনহুর, বললো–ঘুমুচ্ছে–ঘুমুতে দাও।

বললো মনিরা–সত্যি আমার নুর তোমারই প্রতিচ্ছবি। ওকে নিয়েই আমি বেঁচে আছি।

বনহুরের কানের কাছে ভেসে উঠে নুরীর করুণ কণ্ঠস্বর–মনি যে আমার জীবন। ওকে ছাড়া আমি বাঁচবোনা।

বনহুর যখন চিন্তা করছিলো নূরীর কথা তখন মনিরা হেসে বললোএকটা কথা বলবো তোমাকে রাখবে?

রাখবো, বলো?

সত্যি?

হুঁ।

মতি মহল হলে ভাল একটা ছবি হচ্ছে, আমাকে নিয়ে যাবে সঙ্গে?

চমকে উঠলো বনহুর, জানে সে মতি মহল হলে এখন কুন্তি বাঈ ছবি চলছে। যদিও সে ছবিটা এখনও দেখেনি কিন্তু শুনেছে এবং পথে স্থানে স্থানে পোষ্টার নজরে পড়েছে। আরও শুনেছে বনহুর-পুলিশ মহলে ভীষণ ভাবে আলোড়ন শুরু হয়েছে। কুন্তিবাঈ ছবির হিরোকে তারা চিনতে পেরেছে এবং এ নিয়ে পুলিশ মহল বেশ উদ্বিগ্ন রয়েছে।

কথাটা জনগণের কানে এখনও পৌঁছেনি, দস্যু বনহুরকে তারা কোনদিন চোখেও দেখেনি, কাজেই তারা কোন রকম দ্বিধা না করে ছবির হিরোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে।

মনিরার কথায় বনহুর গম্ভীর হয়ে পড়লো, বললো–সে–মনিরা, এ ছবি নাই বা দেখলে।

অভিমান ভরা কণ্ঠে বলে মনিরা। কেনো, এ ছবি দেখতে তোমার আপত্তি কিসে?

না, আপত্তি ঠিক নয়। তবে শুনেছি, এ ছবি নেহাত মন্দ।

মানে আমার দেখার অনুপযোগি, এইতো? কিন্তু তুমি যতই বলল। ছবিটা আমি দেখবো-তুমি নিয়ে যাবেনা আমাকে?

এতোই যদি সখ তাহলে আমার সঙ্গে না গিয়ে আর কারো সঙ্গে যাও।

উঁ হুঁ, তোমার সঙ্গে কোনদিন ছবি দেখিনি।

আমাকে তুমি বিপদে ফেলতে চাও?

তোমার বিপদ সে তো আমার মাথায় বজ্রাঘাত—

তবে কেনো জেদ করছো মনিরা?

বড় সখ এ ছবি তোমাকে সঙ্গে করে দেখবো।

বেশ। গম্ভীর কণ্ঠে বললো বনহুর।

মনিরা খুশি হলো-সত্যি তো? কথা দিলে?

দিলাম।

এর পর বিদায় চাইলো বনহুর মনিরার কাছে।

আজ মনিরা খুশি মনে বিদায় দিলো বনহুরকে।

১৫.

নূরের গায়ের উপর হাত রেখে ঘুমিয়ে আছে মনিরা।

আজ মনিরার মুখে নেই কোন বিষাদের কালো ছায়া। উজ্জ্বল দীপ্ত মুখে ঘুমিয়ে আছে সে। স্বামীর চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো মনিরা।

এমন সময় পিছনের জানালা দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলো বনহুর। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গেলো সে মনিরা আর নূরের বিছানার পাশে।

আজ শরীরে বনহুরের দস্যু ড্রেস।

জমকালো পোশাকে দেহ আচ্ছাদিত। মাথায় কালো পাগড়ি মুখে গালপট্টি বাধা। পায়ের জুতোও জমকালো পালিশ করা।

বনহুর মনিরার শিয়রে এসে দাঁড়ালো।

প্যান্টের পকেট থেকে বের করলো একটা রুমাল.। রুমালখানা ধীরে ধীরে মনিরার নাকের কাছে ধরলো, তারপর নূরের নাকে।

এবার রুমালখানা পকেটে রেখে নূরের দেহের উপর থেকে মনিরার হাতখানা আলগোছে সরিয়ে ফেললো বনহুর। তারপর দ্রুত নূরকে তুলে নিলো কোলে।

মনিরার দেহের চাদরখানা সরে গিয়েছিলো ফেললো এক পাশে।

বনহুর বাম বাহুতে নূরকে বুকের সঙ্গে এটে ধরে, দক্ষিণ হস্তে মনিরার গায়ে চাদরখানা টেনে দিলো। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

চৌধুরী বাড়ির অদূরে অন্ধকারে অপেক্ষা করছিলো তাজ।

বনহুর নূরকে নিয়ে তাজের পাশে এসে দাঁড়ালো, কৌশলে উঠে বসলো : তাজের পিঠে।

সঙ্গে সঙ্গে তাজ ছুটতে শুরু করলো।

সূচিভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে বনহুর নূরকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। শহর ছেড়ে গ্রামের পথ ধরে এগুচ্ছে বনহুর–তারপর বনাঞ্চল।

আস্তানায় পৌঁছতে প্রায় ভোব হয়ে এলো বনহুরের। নূরী তখনও ঘুম থেকে উঠেনি। বনহুর প্রবেশ করলো নূরীর কক্ষে, ধরে ধীরে নূরকে শুইয়ে দিলো নূরীর পাশে।

জেগে উঠলো নুরী, চোখ মেলে তাকিয়ে বিস্মিত হলো–তুমি! সঙ্গে সঙ্গে পাশে নজর পড়তেই আশ্চর্য কণ্ঠে বললো–এটা কে?

বনহুর হেসে বললো–তোমার মনি।

মনি।

হাঁ।

নূরী উঠে বসে ভাল করে লক্ষ্য করলো–তার মনি যখন হারিয়ে গিয়েছিলো, তখন ছিলো সে ছোট্ট এক রত্তি। এক পা দুপা করে কেবল হাটতো। আর আজ বেশ বড়সড় হয়ে গেছে। নূরী তাড়াতাড়ি এদিক ওদিক করে দেখতে লাগলো– দক্ষিণ হাতের বাজুতে নজর পড়তেই নিসন্দেহ হলো সে। ঘুমন্ত নূরকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলো, আদর করে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলো ওকে।

বনহুর মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো।

নুরী যখন নূরের ঘুম ভাঙ্গনোর জন্য ভীষণ ভাবে চেষ্টা করছে তখন বললো বনহুর সময় হলে নিজেই জাগবে। এখন ওকে ঘুমোতে দাও।

নূরী আলগোছে বালিশে শুইয়ে দিয়ে নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে রইলো নূরের মুখের দিকে।

.

মনিরার যখন জ্ঞান ফিরে এলো, দেখলো তার শয্যার পাশে মরিয়ম বেগম, সরকার সাহেব, নকীব আরও বাড়ির চাকর-বাকর সবাই অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে দাঁড়িয়ে আছে। মরিয়ম বেগম বসে আছেন তার শিয়রে, বার বার তিনি আচলে, চোখ মুছছেন।

মনিরা চোখ মেলে তাকিয়ে বিস্মিত হলো। মামীমা, সরকার সাহেবএরা সব এখানে কেনো! সবাই কাঁদছে–ব্যাপার কি? তবে কি তার কোন অসুখ হয়েছিল? তাই হয়তো হবে, মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে। কেমন যেন এলোমেলো লাগছে সব।

বললো মনিরা–কি হয়েছে আমার?

ডাক্তার একটু পূর্বে বারণ করে গেছেন–যতক্ষণ রোগি সম্পূর্ণ সুস্থ না হয় ততক্ষণ ওর কাছে কোন রকম কথা বলবেন না। নূরকে কে বা কারা চুরি করে নিয়ে গেছে–একথা একেবারে চেপে যাবেন।

ডাক্তারের কথাগুলো স্মরণ করে কোন কথাই বললেন না মরিয়ম বেগম।

সরকার সাহেব শুধু বললো–কিছুই হয়নি, তুমি ঘুমোও মা।

মনিরা চোখ বন্ধ করলো বটে কিন্তু ঘুম আর এলো না।

মনিরা সম্পূর্ণ সুস্থ হলো এক সময়।

উঠে বসলো শয্যায়, মামীমাকে ডেকে বললো আমার কি হয়েছিলো মামীমা?

কিছু হয়নি।

আমার নূরকে দেখছিনা কেনো?

মরিয়ম বেগমের দুচোখ ছাপিয়ে পানি আসছিলো, অতিকষ্টে নিজেকে সংযত রেখে বললেন–সরকার সাহেব ওকে বাইরে নিয়ে গেছেন।

এ অসময়ে নূরকে পাঠালে কেনো মামীমা?

তুই সুস্থ নস, তাই ও বিরক্ত করবে বলে......মিথ্যা বলতে বড় কষ্ট হচ্ছিলো মরিয়ম বেগমের–তবু বললেন, না বলে যে কোন উপায় ছিলোনা।

কিন্তু কতক্ষণ ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখবে বা রাখতে পারবে। এদিকে মনিরা পুত্র নূরের জন্য অস্থির হয়ে পড়লো।

মরিয়ম বেগম কি করে বলবেন, রাতে নরকে কে বা কারা চুরি করে নিয়ে গেছে। সরকার সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, এবং তাকেই বললেন। কথাটা বলতে।

মনিরা নকীবকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো–হারে নকীব, আমার নূর কোথায়? ওকে দেখছিনা কেনো?

নকীব কাঁধের গামছাটায় চোখ মুছে নিয়ে তাকালো এদিক ওদিক, তারপর ফিস ফিস করে বললো নকীব–বলতে মানা করে দিয়েছেন ডাক্তার সাহেব....

নকীবের কথায় মনিরা ভীত হয়ে পড়লো–ওর বলার ভঙ্গী দেখে বুঝতে পারলো, নিশ্চয়ই তার নূরের কোন অমঙ্গল ঘটেছে। আর্তকণ্ঠে বললো মনিরা

আমার কাছে লুকোচ্ছিস কেনো, বল্ বল্ নকীব, আমার নূর কোথায়? কি হয়েছে তার? বল্ বল্.....

নকীবের জামার খানিকটা অংশ চেপে ধরলো মনিরা।

নকীব না বলে আর পারলো না–আপামনি, নুরকে কাল রাত কে যেন চুরি করে নিয়ে গেছে।

চীৎকার করে উঠলো মনিরা–আমার নূরকে চুরি করে নিয়ে গেছে ..... পাশের কক্ষ থেকে ছুটে এলেন মরিয়ম বেগম এবং সরকার সাহেব। মনিরা তখন মাথা ঠুকছে খাটের সঙ্গে, নূর–নূর–নূর....আমার নূর–

মরিয়ম বেগম দ্রুত এসে মনিরাকে ধরে ফেললেন, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন–একি করছিস মা? শোন, শোন–

না না, বলল আমার নূর কোথায়, আমার নূর কোথায়। বলো মামীমা, আমার নূর .....

জানিনা মা–কিছুই জানিনা।

বলো মামীমা, আমার নূর কই?

মরিয়ম বেগম বললেন–ভোরে অনেক বেলা হয়ে গেলো তবু তুই দরজা খুলছি না। আমি মনে করলাম, ঘুমোচ্ছিস বুঝি–তাই নকীবকে বললাম তোকে জাগাতে। নকীব তো দরজায় অনেক ডাকাডাকি করেও তোকে জাগাতে পারলোনা। শেষ পর্যন্ত আমিও অনেক করে তোকে ডাকলাম, তখনই মনে আমার ভয় আর দুর্ভাবনা উঁকি দিয়ে গেলো। সেকি, আজ নরও তো জাগছেনা, ব্যাপার কি হলো! তারপর সরকার সাহেব এলেন, সবাই এলো। দরজা ভেংগে ভিতরে প্রবেশ করে বিস্ময়ে হতবাক হলাম, তুই একা বিছানায় অজ্ঞান হয়ে শুয়ে আছিস্–পাশে নূর নেই। ওদিকে নজর পড়তেই আঁতকে উঠলাম–পিছন শাসী খোলা।

মনিরা চীৎকার করে কেঁদে উঠলো–মামীমা, মামীমা আমার নূর তাহলে চুরি হয়ে গেছে! আমার নুরকে কে নিয়ে গেছে, কে নিয়ে গেছে—

গোটাদিন কাঁদা-কাটা করে কাটলো মনিরার। এ বাড়ির সবাই শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়লো।

সবাই অনেক করেও মনিরাকে কিছু খাওয়াতে পারলোনা।

সরকার সাহেব থানায় ডায়রী করে দিয়ে এলেন।

থানা অফিসার নতুন লোক, তিনি আশ্বাস দিলেন, নূরকে খুঁজে বের করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

এদিকে মনিরা যখন নূরের জন্য উন্মাদিনী প্রায় হয়ে পড়েছে, বনহুরের আস্তানায় তখন নূরী মনিকে নিয়ে মেতে উঠেছে–আনন্দে আজ সে আত্মহারা।

মনি যতই কাঁদছে, আমাল মাল কাছে দাবো–আমার মাল কাছে দাবো–নূরী ততই এটা-ওটা খেলনা–খাবার দিয়ে তাকে ভোলাতে চেষ্টা করতে লাগলো।

বনহুর আনন্দে আপ্লুত হলো, নূরীর মুখে হাসি ফুটেছে।

নূরী মনিকে নিয়ে দোলনায় দোল দিতে লাগলো, গান গাইতে লাগলো। ফুলের মালার মুকুট তৈরি করে মাথায়-গলায় পরিয়ে দিতে লাগলো। নূরী মনিকে পেয়ে খুশিতে ডগমগ।

মনি কিছুক্ষণের মধ্যেই কাঁদা ভুলে অবাক হয়ে নূরীর কাণ্ড কলাপ দেখতে লাগলো।

সেই ফাঁকে সরে পড়লো বনহুর। মনিরার হৃদয়ে ব্যথা দিয়ে বনহুর নূরকে চুরি করে এনেছে। বাপ হয়ে পুত্রকে হরণ করে এনেছে সে মায়ের বুক থেকে। শুধু নূরীকে খুশি করবার জন্যই একাজ করেনি বনহুর, নূরীর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার এটা একটা উপায়।

নুরী ভুলে থাকবে তার মনিকে নিয়ে, বনহুরের চলার পথে সে আর বাধার সৃষ্টি করবেনা।

নুরী যখন মনিকে নিয়ে মেতে আছে তখন বনহুর রহমানকে সঙ্গে করে দরবার কক্ষে প্রবেশ করলো।

সেখানে রহমান ও তার অন্যান্য অনুচরদের সঙ্গে কিছু আলাপ আলোচনা হলো।

রহমানকে আরও কিছু বললো বনহুর। রহমান মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালো।

বনহুর একবার নিজের কক্ষে প্রবেশ করে স্বাভাবিক ড্রেসে সজ্জিত হয়ে নিলো। স্যুট প্যান্ট-টাই, মাথায় ক্যাপ পরে নিলো সে।

রহমান দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালো, তার শরীরে সাধারণ ভদ্র ড্রেস। অদূরে অপেক্ষা করছিলো তাজ আর দুলকি।

বনহুর আর রহমান অশ্বদ্বয়ের পাশে এসে দাঁড়ালো। বনহুর চেপে বসলো তাজের পিঠে, আর দুলকির পিঠে রহমান।

বনবাদর, জঙ্গল-মাঠ অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে বনহুর আর রহমান। বনপথ শেষ হতেই পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মোটরকার।

বনহুর আর রহমান নিকটে পৌঁছতেই ড্রাইভার আসন ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো।

বনহুর তাকে জিজ্ঞাসা করলো—যে ভদ্রলোকদ্বয় হোটেল গুল বাগে ছিলো, তাদের সরানো হয়েছে?

হাঁ, সরানো হয়েছে।

কিভাবে এ কাজ তোমরা করলে মহসীন?

সর্দার। অনেক কৌশলে তাদের সরিয়েছি, তাদের ড্রাইভারকে সরিয়ে আমি ড্রাইভার সেজে গাড়িতে বসেছিলালাম।

তারপর?

লোক দুজন বাইরের কোন কাজে বেরুবে বলে তখনকার মত গাড়িতে এসে বসলো। আমি জানতাম তারা এ শহরে নতুন-কাজেই পথঘাট তাদের তেমন চেনা নাই। সেই সুযোগ নিয়ে আমি তাদের আমাদের শহরের আস্তানায় নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রেখেছি।

সাবাস! বললো রহমান।

বনহুর বললো–ওদের কোন কষ্ট দাওনি তো?

না সর্দার।

এবার বনহুর আর রহমান গাড়িতে চেপে বসলো।

ড্রাইভ আসনে উঠে বসলো মহসীন।

বনহুরের শহরেও একটা গোপন বাড়ি ছিলো। এ বাড়িখানা পূর্বের সেই বাড়িখানার চেয়ে অন্য ধরনের। শহরের প্রায় মাঝামাঝি কতগুলো দোকানপাট আছে, তারই পিছনে বাড়িটা।

বাড়িখানার আশে-পাশে আরও কতগুলো বাড়ি আছে। সেগুলোতে লোক বসবাস করে। কাজেই এ বাড়িখানা যে দস্যু বনহুরের একটা গোপন আস্তানায়, এটা কেউ সন্দেহ করতে পারে না।

এখানেও বনহুরের কিছু সংখ্যক অনুচর গুপ্তভাবে লুকিয়ে থাকে। অবশ্য একেবারে গোপনভাবে থাকে না, ছদ্মবেশে শহরে তারা ছড়িয়ে থাকে এখানে সেখানে। নানা ভাবে এরা নানা ধরনের সংবাদ সংগ্রহ করে এবং সেভাবে কাজ করে তারা।

রহমান এদের দ্বারাই সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছে হোটেল গুলবাগে নানা রকম অনাচার ও দুষ্কর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, বিদেশি লোকরা এখানে গোপনে নানা রকম ভেজাল ঔষধ পত্র পরিবেশন করে থাকে।

চোরের সঙ্গেই চোরের বন্ধুত্ব, কাজেই যত শয়তান আর দুষ্কর্মকারীর দল এখানে আনাগোনা করে থাকে।

মহসীন ও আর কয়েকজন অনুচর আজ যে লোক দুটিকে তাদের আস্তানায় আটক করেছে তারা মারাত্মক ঔষধ ব্যবসায়ী। বাইরের দেশ থেকে নানা ধরনের বিষাক্ত ঔষধ এনে এদের হাতে তুলে দেয় এবং প্রচুর অর্থ নিয়ে যায় এরা এসব দেশ থেকে।

কান্দাই শহরে এ ধরনের নানা ব্যবসায়ীর আমদানী হয়ে থাকে গুলবাগ হোটেলে।

আজ দুজনাকে আটক করতে সমর্থ হয়েছে বনহুরের দল। লোক দুটির একজনের নাম ডক্টর হংকিং রাও, দ্বিতীয় জন ডক্টর মং লাও। এবার এরা প্রচুর বিষাক্ত এবং ভেজাল ঔষধ এনেছিলো, মহব্বৎ খ এসব ঔষধ রেখেছে। পরে শহরের বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠানো হবে। ইতিমধ্যে হসপিটাল ও অনেক চিকিৎসা কেন্দ্রে বহু রোগি এ সব ধরনের ঔষধ সেবনে এবং ইনজেকশানে মৃত্যু বরণ করেছে।

সব সংবাদই বনহুরের কানে এসে পৌঁছেছে।

তাই বন আজ স্বয়ং বের হয়েছে এসব সন্ধানে।

বনহুর আর রহমানের গাড়ি এসে পৌঁছলো তার শহরের গোপন আস্তানায় সম্মুখে।

বনহুর আর রহমান নেমে পড়লো।

অন্তপুরে প্রবেশ করতেই দুজন রাইফেলধারী অনুচর বনহুরকে অভিবাদন জানালো।

বাড়িটা বাইরে থেকে স্বাভাবিক মনে হলেও ভিতরে স্বাভাবিক ছিলোনা। পর পর কয়েকখানা ঘর পেরিয়ে একটা ভোলা ছোট্ট উঠান–তার পরই আর একটা বড় ঘর। ঘরটা সুন্দর করে সাজানো। কিছু সংখ্যক বই পুস্তক থরে থরে সাজানো আলমারীতে। এরই একটা আলমারীর পিছনে রয়েছে। গুপ্ত সিঁড়ি।

বনহুর আর রহমান সহ মহসীন এই আলমারীটার পাশে এসে একটা স্থানে পা দিয়ে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে আলমারীটা একদিকে সরে গেলো। ধীরে ধীরে।

বেরিয়ে এলো সুন্দর একটা সিঁড়ি পথ।

বনহুর আর রহমান এ পথে অগ্রসর হলো। মহসীন পিছনে চললো। সিঁড়িটা বৈদ্যুতিক আলোতে আলোকিত রয়েছে, কোন অসুবিধা হলোনা, বনহুর আর রহমানের।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে একটা কক্ষে এসে উপস্থিত হলো তারা। কক্ষটা বেশ বড়, কক্ষ মধ্যে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। এক পাশে লৌহ শিক পরিবেষ্টিত খানিকটা জায়গা। সে জায়গায় বন্দী রয়েছে দুজন ভদ্রলোক।

লোক দুজনের চোখে মুখে দুর্ভাবনার ছাপ ফুটে উঠেছে। দুখানা চেয়ারের সঙ্গে লোক দুজনাকে বেধে রাখা হয়েছে মজবুত করে।

বনহুর এসে দাঁড়ালো এদের সম্মুখে।

রহমান বললো-সর্দার, এর নাম ডক্টর হংকিং আর ওর নাম মং লও।

বনহুর তীব্র চোখে তাকিয়ে দেখছিলো দুজনাকে। বললো সে-হুঁ।

মহসীন বললো এবার-সর্দার, এরা শুধু ঔষধের কারবারই করেনা, নিজেদের কোম্পানিতে এরা নানা রকম ভেজাল, বিষাক্ত ঔষধ তৈরি করে।

দাঁতে দাঁত পিষে বললো বনহুর অত্যন্ত লাভকর ব্যবসা।

বনহুর আর রহমানকে দেখে ডক্টর হংকিং রাও আর মং লাও খুশি হয়েছিলো, মনে করেছিলো মহব্বৎ আলীর লোক এরা। পর মুহূর্তে ভীত ভাবে তাকাতে লাগলো ওরা, বনহুর আর রহমানের দিকে।

বনহুর বললো-রহমান, এদের আমার গুম্ ঘরে নিয়ে চলো, সেখানে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করবো।

বনহুর দাঁড়িয়ে রইলো, রহমান ওদিকের একটা সুইচে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে কক্ষের মেঝেটা দুলে উঠলো। তারপর মেঝেটা সাঁ সাঁ করে নেমে গেলো কয়েক ফিটু নীচে।

বৃন্দীদ্বয় এবং রহমান ও বনহুর যেমন দাঁড়িয়ে ছিলো তেমন রয়েছে। মহসীনও আছে তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে।

বনহুরের আদেশে বন্দীদ্বয়কে লৌহ শিক বেষ্টিত স্থান থেকে বের করে আনা হলো।

বনূহুর একটা আসনে উপবেশন করলো।

বন্দীদ্বয় সম্মুখে দন্ডায়মান।

রহমান হাতে তালি দিতেই দুজন বলিষ্ঠ লোক হাজির হলো।

বনহুর ইংগিৎ করতেই বলিষ্ঠ লোক দুজন ডক্টর হংকিং ও মং লাও এর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। লোক দুটির হস্তে দুটি সুতীক্ষ্ণ লৌহদন্ড।

বনহুর বললো–ডক্টরদ্বয়, আমি যা জিজ্ঞাস করছি তার সঠিক জবাব দাও, নচেৎ...ঐ লৌহ শলাকা দিয়ে তোমার জিহ্বা ছেদন করা হবে।

ডক্টর হংকিং এর মুখে কোন ভীত ভাব ফুটে না উঠলেও ডক্টর মং লাও এর মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠলো।

বনহুর কিছু ভাববার অবসর না দিয়ে গর্জে উঠলো–মহববৎ আলীর সঙ্গে কত দিন হলো তোমাদের যোগাযোগ?

হংকিং কিছু বলবার পূর্বেই বললো মং লাও-সত্য কথা বললে ছেড়ে দেবেন তো?, বনহুর বললো নিশ্চয়ই দেবো। আর মিথ্যা বললে ঐ লৌহ শলাকা দিয়ে তোমাদের জিহ্বা ছেদন করবো।

না না, আমাদের জিহ্বা ছেদন করবেন না, সব সত্য কথা বলবো-যা জিজ্ঞাসা করবেন, সব বলবো।

ডক্টর হংকিং রক্তচক্ষু মেলে তাকাতে লাগলো মং লাও এর দিকে। রহমান এবার বললো–জবাব দাও, যা জানতে চাওয়া হলো?

মংলাও কিছু বলতে যাচ্ছিলো, হংকিং বলল–আমাকে বলতে দাও মংলাও।

মং লাও যে কথা বলতে যাচ্ছিলো তা আর বলা হলো না। বললো হংকিং–মহববং আলীকে আমরা চিনি না–

গর্জে উঠলো বনহু–চেনো না! মহববৎ আলীর সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ নেই বলতে চাও–

হাঁ আমি-মানে আমরা তাকে চিনি না। আমরা অন্য কার্য্য উপলক্ষে তার হোটেলে উঠেছিলাম।

বেশ, সেখানে থেকে ফিরে এসে তোমার সত্যতার পুরস্কার দেবো।

বনহুর উঠে দাঁড়াল।

রহমান ইঙ্গিত করতেই লৌহ শলাকা হস্তে বলিষ্ঠ লোকদ্বয় বনহুরকে কুর্ণিশ জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে হংকিং রাও ও মংলা বন্দী হলো লৌহ আবেষ্টনীর মধ্যে।

রহমান একটা মেসিনে চাপ দিলো, সঙ্গে সঙ্গে মেঝেটা সাঁ সাঁ করে উঠে আসতে লাগলো উপরের দিকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে পূর্বের স্থানে মেঝেটা এসে স্থির হলো।

বনহুর আর রহমান বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

মহসীন কৌশলে লৌহ দরজা বন্ধ করে দিলো।

বনহুর আর রহমান গাড়িতে এসে বসলো।

রহমানকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর-আমার ব্যাগটা গাড়ির মধ্যে আছে তো?

হাঁ, সর্দার, আছে।

হোটেল কক্ষে প্রবেশ করলো বনহুর আর রহমান।

এখন তাদের শরীরে ভিন্ন ড্রেস। বনহুরকে দেখলে ঠিক ডক্টর হংকিং রাও এবং রহমানকে ঠিক ডক্টর মং লাও বলে মনে হবে।

বনহুর আর রহমান যখন হোটেল গুলবাগে এসে পৌঁছলো তখন হোটেলের দারোয়ান ছালাম জানিয়ে বললো-সাহাব, আপ-লোক কাহা গিয়াথা। হুজুর আপ লোক কা খাতির মে বহুত পেরেশান হওয়া ....

বনহুর আর রহমান কোন কথা না বলে মহববৎ আলীর ক্যাবিনে প্রবেশ করলো।

মহববৎ আলী তার নিজস্ব কামরায় ব্যস্তভাবে পায়চারী করছিলো।

ডক্টর রাও ও মংলাওকে দেখে মহববৎ আলী থমকে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো- আপনারা কোথায় ডুব দিয়েছিলেন বলুন তো? এতো রাত হলো, আপনাদের টাকা-পয়সা চুকিয়ে দিয়ে বাসায় যাবো। আমার মেয়ে পারভিনের অসুখ কিনা!

বনহুর ইতিপূর্বে ডক্টর হংকিং রাও এর কণ্ঠস্বর নকল করে নিতে সক্ষম হয়েছিলো, মাথার ক্যাপটা আর একটু সম্মুখে টেনে দিয়ে বললো-একটা বিপদে পড়েছিলাম, বেঁচে গেছি।

আশ্চর্য হলো মহববৎ আলী-বিপদ! কি বিপদে পড়েছিলেন আপনারা?

দস্যু বনহুর আমাদের সন্ধান পেয়েছে–আমরা এ হোটেলে আছি।

দস্যু বনহুর?

হাঁ,দস্যু বনহুর। সে-ই আমাদের আটক করেছিলো, অতি কষ্টে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি।

বলেন কি, দস্যু বনহুর তাহলে....

হাঁ, আবার তার আবির্ভাব ঘটেছে। মংলাও–বেশি রহমান বনহুরের কথায় খুশি হরত পারলো না, কারণ এ কথাটা বলায় দেশবাসী আবার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বে, তাছাড়া পুলিশ মহলেও সাড়া পড়ে যাবে। বনহুর এখন তবু ছদ্মবেশে শহরের নানা স্থানে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে তখন রাতের অন্ধকার ছাড়া আর উপায় থাকবেনা।

কিন্তু সর্দার যা ভাল বুঝবে তাই তো করবে। রহমান উসখুস করছিলো। বনহুর তার পায়ে মৃদু আঘাত করলো।

কাজেই আজ রাতের প্লেনেই আমরা কান্দাই ত্যাগ করতে চাই।

বনহুর বার বার ভীত ভাবে বাইরের দরজার দিকে তাকাতে লাগলো।

মহববৎ আলী বললো-তাহলে তো ভয়ঙ্কর কথা। দস্যু বনহুর যদি আপনাদের কিছু নিয়ে থাকে তাহলে আমার হোটেল অবধি ধাওয়া করবে তাতে কোন সন্দেহ

নেই।

তাই তো আমার মনে হচ্ছে....

আসুন, আপনাদের টাকা-পয়সা সব গুছিয়ে নিন।

চলুন, আর মোটেই বিলম্ব করতে পারছিনা।

মহববৎ আলী হংকিং বৈশি বনহুর এবং মংলাওবৈশি রহমান সহ পাশের কামরায় গেলো। এ কক্ষেই ঔষধের বাক্সগুলো থরে থরে সাজানো ছিলো।

মহববৎ আলী যখন টাকার ব্যাগটা হংকিং রাও এর হাতে তুলে দিচ্ছিলো তখন হংকিং বেশি বনহুর চারদিকে এক নজর দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিলো।

টাকার ব্যাগ হাতে নিয়ে বনহুর দরজার দিকে পা বাড়ালো, মহববৎ আলী বলে উঠলো –আপনাদের স্যুটকেস এবং বেডিং–পত্র রইলো যে...

হংকিং রাও বললো-যেতে দিন ও সব। দস্যু বনহুর যদি এসে পড়ে তাহলে প্রাণ নিয়ে পালানো মুস্কিল হবে...।

হংকিং বেশি দস্যু বনহুর আর মংলাও বেশি রহমান গাড়িতে চেপে বসলো।

হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে মহববৎ আলী হাত নেড়ে তাকে বিদায় সাষণ জানিয়ে বললো–আবার আসবেন তো?

বনহুর বললো ড্রাই আসন থেকে অচিরেই আবার দেখা হবে বন্ধু...

গাড়ির শব্দে আর কিছু শোনা গেলনা।

পিছন আসনে রহমান আর ড্রাইভার বসে রইলো শুদ্ধ হয়ে।

সর্দারের কান্ডকলাপ দেখতে লাগলো তারা নির্বাক নয়নে।

শহরের পথ ধরে বনহুরের গাড়ি উল্কা বেগে ছুটে চললো।

•

কেঁদে কেঁদে মনিরা নাজেহাল হয়ে পড়েছে। একেবারে পাগলিনীর মত। সেদিনের পর থেকে কেউ তাকে দানা-পানি খাওয়াতে পারেনি। অহঃরহ। চোখের পানি বিসর্জন করে চলেছে মনিরা।

গভীর রাত।

মনিরা ক্লান্ত অবসন্ন দেহটা বিছানায় এলিয়ে দিয়েছে। কদিন অবিরত কাঁদাকাটা করে একেবারে যা তা হয়ে গেছে।

পাশের কক্ষে মরিয়ম বেগম-এখনও তার চোখে ঘুম আসে নি। নানা চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছেন তিনি। স্বামীর কাছ থেকে আজ পর্যন্ত যা ঘটেছে বা ঘটছে সব স্মরণ হচ্ছে একটির পর একটি করে। মরিয়ম বেগম কোন দিন কি ভেবেছিলেন- তার অমন মহানুভব স্বামী তোক চক্রান্তে নিহত হবেন। কে তাকে হত্যা করেছিলো, কেনই বা করেছিলো–আজও জানেন না তিনি। তারপর নিজ সন্তান আজ সভ্য সমাজের সৎ ব্যক্তি না হয়ে হয়েছে দস্যু-ডাকু। লোক সমাজে তার স্থান নেই। মনিরাকে নিয়েই বাঁচতে চেয়েছিলেন, ওকে বিয়ে দিয়ে সন্তানকে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে আশাও তার পুর্ণ হয়নি। দস্যু সন্তানকে মায়ার বন্ধনে বাঁধতে চেয়েও পারেনি। মরিয়ম বেগমের চোখের পানিতে বালিশ সিক্ত হয়ে উঠলো।

এশার আযান থেমে গেছে অনেকক্ষণ। দেয়াল ঘড়িটা টিক্ টিক শব্দে এগিয়ে চলেছে সীমাহীন অজানার পথে।

মরিয়ম বেগমের নিদ্রাহীন আঁখি দুটি অন্ধকারে ছল ছল করে উঠে বুক চীরে বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস। মনে মনে খোদার নাম স্মরণ করেন–হে দয়াময়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক…

হঠাৎ মরিয়ম বেগম চমকে উঠেন, শুনতে পান মনিরার কক্ষে একটা চাপা অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর। মরিয়ম বেগমের চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, তিনি কান পেতে চুপ করে রইলেন।

পাশের কক্ষ থেকে ভেসে এলো আবার–মনিরা, মনিরা আমি এসেছি—মনিরা —

মনিরার কণ্ঠস্বর কে–কে তুমি–ওগো তুমি এসেছো?–সঙ্গে সঙ্গে মনিরার কান্নার শব্দ শোনা গেলো। পর মুহূর্তেই ক্রন্দন রত কণ্ঠ মনিরার আমার নূর নেই, কে তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে....

আমার নূর নেই....

নীরব নিস্তব্ধ বনহুর, কোন কথা বললো না সে।

মনিরা স্বামীর বুকে মাথা ঠুকতে লাগলো। আমার নূর নেই। ওকে কারা সুরি করে নিয়ে গেছে—ওগো আমি কি নিয়ে বাঁচবো–আমি কি নিয়ে বাঁচবো–কান্নায় ভেংগে পড়ে মনিরা।

এতোক্ষণে কথা বলে বনহুর–মনিরা, এতো ভেংগে পড়লে চলবে কেনো? নূর তোমার সন্তান, কেউ তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে ধরে রাখতে পারবেনা। একদিন সে ফিরে আসবে তোমার পাশে...

আমি সে কথা শুনতে চাইনা, বলো আমার নূরকে তুমি খুঁজে এনে দেবে? বললা......ওগো বলো? বনহুরের জামা চেপে ধরে মনির।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলো–মনিরা, একটা কথার জবাব দাও আমাকে?

বলল, বলো তুমি? নূরকে চাও না আমাকে?

চিত্রাপিত্যের ন্যায় তাকায় মনিরা স্বামীর মুখে।